শীর্ষেন্দুর সেরা ১০১

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

শীষে..ুর সেরা
১০১

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

শীর্ষেন্দুর সেরা ১০১

পত্র ভারতী

www.bookspatrabharati.com

আমার কথা

বহুবছর ধরে ঠাকুরের কাজে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, উত্তরবঙ্গ বা কাছাড় ও ত্রিপুরার গাঁয়ে-গঞ্জে ঘুরে বেড়াচ্ছি। বাবু-ভ্রমণ নয়। ট্রেন, বাস, ভ্যানগাড়ি, নৌকা, লঞ্চ এবং অবশ্যই মাইলের-পর-মাইল পায়ে হেঁটেও। সাদা-সরল, অনতিশিক্ষিত এবং চাষীবাসী মানুষের সঙ্গেই থাকা। এঁরা অবশ্য আমার গুরুভাই। সাহিত্য-টাহিত্য এঁদের বেশিরভাগই বোঝেন না। আমার লেখাও পড়েননি। তাতে অবশ্য সমাদরের অভাব ঘটে না। কেওকেটা হোক না হোক, আপনজন তো বটে।

তা এইভাবে গাঁ-গঞ্জ চেনা হল আমার। ঠাকুরের কাজে না লাগলে এই অমিত মূল্যবান মনুষ্যচর্যা থেকে বঞ্চিত থাকতে হত। তাই নাগরিক গল্পের পাশাপাশি আমি প্রভূত পরিমাণে গাঁ-গঞ্জেরও গল্প লিখেছি। উপন্যাসও।

এই বৃহৎ সংকলনটিতে যে গল্পগুলি রয়েছে তা ধরে-ধরে বিশ্লেষণ করার সাধ্য আমার নেই। কারণ অনেক গল্পেরই অনুষঙ্গ এখন আর মনে পড়ে না। আবার অদ্ভুত কোনও কারণে কয়েকটা গল্প লেখার সময়কার পরিস্থিতি বেশ মনে আছে।

যেমন ধরা যাক ''উত্তরের ব্যালকনি'' গল্পটি। তখন বালি-তে থাকি। স্টেশনের পশ্চিমে দুর্গাপুর পল্লীতে। ছোট্ট বাসায় অতিশয় দারিদ্র্যপীড়িত জীবন। শারদীয়ায় গল্প দেওয়ার শেষ তারিখ অতিক্রান্ত। তাড়াতাড়ি গল্পটি না দিলেই নয়। আর তখন আমার একশো দুই-তিন ডিগ্রি জ্বর। তীব্র মাথার যন্ত্রণা। বিছানা থেকে ওঠার শক্তিই নেই। তবু প্রবল তাগিদে উঠলাম এবং কাঁপতে-কাঁপতে টেবিলের কাছে বসে কম্পিত হস্তেই লিখতে শুরু করলাম। আগাগোড়া জ্বরের ঘোরে লিখেছিলাম এই গল্পটি। আর ''দেখা হবে'' নামে ছোট্ট গল্পটি লিখেছিলাম আমার বন্ধু কল্যাণ চক্রবর্তীর অফিসে বসে আড্ডা মারতে-মারতে। বোধহয় ঘণ্টা দেড়েক সময় লেগেছিল। তা এরকম দু-চারটি ঘটনা ছাড়া অন্যান্য গল্পগুলি বিভিন্ন সম্পাদকের তাগাদায় ও তাগিদে লেখা। প্রথম কয়েক বছরের কথা বাদ দিলে আমার বেশিরভাগ লেখাই লিখিয়ে নিয়েছেন বা আদায় করেছেন সম্পাদকরা। তাঁরা না থাকলে আমার লেখা অনেক কমে যেত বা বন্ধই হয়ে যেতে পারত।

সঞ্চয়ী স্বভাব বা শৃঙ্খলাপরায়ণতা নেই বলেই আমি বেশ লক্ষ্মীছাড়া মানুষ। আমার বিস্তর গল্পের কপি তাই হারিয়ে গেছে। বারবার ঠিকানা বদল এবং ঠাঁইনাড়া হওয়াটাও

একটা কারণ। কিছু গল্প আমার ফাইল থেকে চুরিও গেছে। কিছু চলে গেছে পুরোনো কাগজের সঙ্গে। ''হেমেন-মিনতি সংবাদ'' গল্পটি যেমন নারায়ণগড় নামে এক গাঁয়ে স্বল্পকালীন শিক্ষকতা করার সময়ে লেখা। কোথায় যে হাপিস হল তার কপি, কে জানে। কোন পত্রিকায় প্রকাশ পেয়েছিল তাও আর মনে নেই। লীলা রায়ের পত্রিকায় বেশ কয়েকটা গল্প লিখেছিলাম। একটাও নেই।

একটা সময় ছিল যখন গল্পের বই প্রকাশকরা ছাপতে চাইতেন না। বিক্রি নেই বলে। অবস্থাটা বদলেছে। আমার প্রাথমিক যুগে তাই কোনও গল্প সংকলন বেরোয়নি। বেরোলে গল্পগুলি হয়তো বেঁচে যেত। বই প্রকাশের উন্মাদনাও আমার ছিল না। ঢিলাঢালা প্রকৃতির জন্য বিস্তর গুণোগার দিতে হয়েছে।

''বৃষ্টিতে নিশিকান্ত'' গল্পটি যে অঞ্চল নিয়ে লেখা সেটি ভারী প্রিয় জায়গা আমার। বাগনান বা উলুবেড়িয়া থেকে ভিতরের দিকে হাওড়া জেলার গ্রামাঞ্চল। খাড়ুবেড়ে, পলতাবেড়ে, শ্যামপুর, রাধাপুর, বেলপুকুর এইসব জায়গায় মাঠঘাট ভেঙে পায়ে হেঁটে বিস্তর ঘুরেছি। এইসব অঞ্চল নিয়ে অনেক গল্প লিখেছি। আবার সুন্দরবনের নানা প্রত্যন্ত গাঁয়ে প্রায় প্রতি বছরই হানা দিতে হয়েছে। সেইসব অভিজ্ঞতাও প্রকাশ পেয়েছে এবং আজও পায় নানা গল্প উপন্যাসে।

আর কলকাতা! এ আমার ভীষণরকমের প্রিয় শহর। এই শহরের আশ্চর্য রহস্যময়তা আর বৈচিত্র্য আজও আমাকে সম্মোহিত করে রাখে। বারবার এই কলকাতাকে নানা কাহিনির অনুষঙ্গে আমি খুঁজে বেড়িয়েছি।

''গঞ্জের মানুষ'' বা ''ঘণ্টাধ্বনি'' কখনও গাঁ-গঞ্জ, কখনও বা হাওড়ার ঘিঞ্জি পটভূমিকে রেখে লেখা। পটভূমিটাই বড় কথা নয়। আসল কথা, এক-এক পরিবেশে মানুষের আচরণ, ভাষা, অভ্যাসের বিভিন্নতা ঘটে। সেগুলো অনুধাবন না করলে গ্রাম বলতে গরু-বাছুর-গাছপালার আমদানিই শুধু ঘটবে, গ্রামের গভীর অস্তিত্বকে স্পর্শ করা যাবে না। পটভূমির বদল ঘটলেও আমি বরাবর মানুষকে তার নিজস্ব চালচিত্রে ধরার চেষ্টা করেছি মাত্র।

লেখক জীবনেরও বয়স বড় কম হল না। এইসব গল্প আমার জীবনে জড়িয়ে থাকা নানা স্মৃতি, দর্শন, চিন্তা ও উন্মোচনের দিনলিপি মাত্র। সাহিত্যের বিচারে তাদের কী মূল্যায়ন হবে তা জানি না। জীবনের প্রতি, পৃথিবীর প্রতি আমার দুর্মর ভালোবাসাই বোধহয় আমাকে লেখায়। পুরস্কার বা তিরস্কার তাই বাহুল্য মাত্র।

আমার স্নেহভাজন শ্রীমান শ্যামলকান্তি এই সংকলনের জন্য যে প্রভূত পরিশ্রম করেছেন, তাতে তাঁর ঋণ শোধ করা আমার অসাধ্য। তাঁকে প্রাণভরে শুধু আমার শুভেচ্ছা জানাই।

কলকাতা

২.১২.২০০৮

শ্রী সৌগত হালদার

শ্রীমতী শর্মি হালদার

করকমলেষু

''রা-স্বা''

বন্দে শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রম

শীষে..ু মুখোপাধ্যায়ের জন্ম ২ নভেম্বর, ১৯৩৫, ময়মনসিংহ-এ। শৈশব কেটেছে নানা জায়গায়। পিতা রেলের চাকুরে। সেই সূত্রে এক যাযাবর জীবন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কলকাতায়। এরপর বিহার, উত্তরবাংলা, পূর্ববাংলা, আসাম। পঞ্চাশের দশকের গোড়ায় কুচবিহার। মিশনারি স্কুল ও বোর্ডিং-এর জীবন। ভিকটোরিয়া কলেজ থেকে আই. এ.। কলকাতার কলেজ থেকে বি. এ.। স্নাতকোত্তর পড়াশোনা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। প্রথম উপন্যাস 'ঘুণপোকা'। প্রথম কিশোর উপন্যাস—'মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি'। কিশোর সাহিত্যে শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতিরূপে ১৯৮৫ সালে পেয়েছেন বিদ্যাসাগর পুরস্কার। পেয়েছেন আনন্দ পুরস্কার ও ১৯৮৯ সালের সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার।

পত্র ভারতী প্রকাশিত বই শীর্ষেন্দুর সেরা ১০১, রূপ- মারীচ রহস্য, ভৌতিক গল্প সমগ্র এবং পাঁচটি উপন্যাস।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

শীর্ষেন্দুর সেরা ১০১

'বহুবছর ধরে ঠাকুরের কাজে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, উত্তরবঙ্গ বা কাছাড় ও ত্রিপুরার গাঁয়ে-গঞ্জে ঘুরে বেড়াচ্ছি। বাবু-ভ্রমণ নয়। ট্রেনে, বাসে, ভ্যানগাড়ি, নৌকো, লঞ্চ এবং অবশ্যই মাইলের-পর-মাইল পায়ে হেঁটেও। সাদা-সরল, অনতিশিক্ষিত এবং চাষীবাসী মানুষের সঙ্গেই থাকা।...সাহিত্য-টাহিত্য এঁদের বেশিরভাগই বোঝেন না। তাতে অবশ্য সমাদরের অভাব ঘটে না।'...

গাঁ গঞ্জের পাশাপাশি তাঁর যে চেনা হল মানবজমিনও। অন্তর্দর্শী সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের সুষমামণ্ডিত কলমে যেভাবে বাংলার সাধারণ মানুষের কথা উঠে এসেছে, একালের আর কোনও লেখকের কলমে বোধহয় ততখানি আসতে পারেনি।

অনায়াসে সৃষ্টি হয়েছে অসামান্য গল্পের তরঙ্গমালা, যেগুলি পড়ে স্তব্ধ হয়ে পাঠক ভাববেন, এভাবে তো ভাবিনি। অসংখ্য চরিত্রের এই মিছিলের মূল সুর একটিই—ভালোবাসা।

চিরদিনের সেরা হয়ে ওঠার প্রত্যয় নিয়ে প্রকাশিত এই সংকলনে শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় নিজে সাজিয়ে দিয়েছেন ১০১টি গল্প। রয়েছে দুষ্প্রাপ্য থেকে এযাবৎ অগ্রন্থিত গল্পও। নিঃসঙ্কোচে বলা যায়, তাঁর লেখকজীবনের বিবর্তনের এক মূল্যবান দলিল বৃহৎ গ্রন্থখানি।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

শীর্ষেন্দুর সেরা ১০১

সূ চি

ঝুমকোলতার স্নানের দৃশ্য ও লম্বোদরের ঘাটখরচ

আমেরিকা

আরোগ্য

সম্পর্ক

পোকা

বাবা

দোলা

ছেলেটা কাঁদছে

লামডিঙের আশ্চর্য লোকেরা

নবদুর্গা

সাইকেল

গণ্ডগোল

বিয়ের রাত

পরপুরুষ

সাহেবের তলোয়ার

স্বপ্নের ভিতরে মৃত্যু

পেঁপেসেদ্ধ

বুদ্ধিরাম

পারিজাত ও ছোটকাকা

গড় র মানুষ
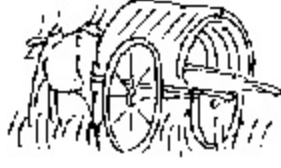
রাজা ফকিরচাঁদের ঢিবির ওপর দিনটা শেষ হয়ে গেল। একটা একা শিরীষ গাছ সিকি মাইল লম্বা ছায়া ফেলেছিল। সেই ছায়াটাকে গিলে ফেলল আঁধার রাতের বিশাল পাখির ছায়া। ফকিরচাঁদের সাত ঘড়া মোহর আর বিস্তর সোনাদানা, হিরে-জহরত সব ওই ঢিবির ভিতরে পোঁতা আছে। আর আছে ফকিরচাঁদের আস্ত বসতবাড়িটা। ঢিবির ওপাশ দিয়ে রেললাইন, এপাশ দিয়ে রাস্তা। পাথরকুচি ছড়ানো, গাছগাছালির ছায়ায় ভরা। এখন একটু অন্ধকার মতো হয়ে এসেছে, শীতের থম-ধরা বিকেলে একটু ধোঁয়াটে মতো চারধার। রাস্তার পাথরকুচিতে চটি ঘষটানোর শব্দ উঠছে। রবারের হাওয়াই চটি, এ পর্যন্ত সাতবার ছিঁড়েছে। তবু ফেলে দেয়নি নদীয়াকুমার।

তো এই সন্ধের ঝোঁকে আলো-আঁধারে নদীয়া যায়, না নদীয়ার বউ যায় তা ঠাহর করা মুশকিল। ভেলুরামের চোখে ছানি আসছে। নাতি খেলারাম বীরপাড়া গেছে তাগাদায়। সে এখনও ফেরেনি দেখে চৌপথীতে গিয়ে খানিক দাঁড়িয়ে দেখে এল ভেলু। বীরপাড়ার একটা বাস এসে ছেড়ে গেল। এ-গাড়িতেও আসেনি। আরও খানিক দাঁড়িয়ে থাকলে হত। নাতিটার জন্য বড্ড চিন্তাভাবনা তার। কিন্তু ভেলুরাম দোকান ছেড়ে বেশিক্ষণ বাইরে থাকতে ভরসা পায় না। তার ছেলে শোভারাম চোর-চোট্টা-বদমাশ হয়ে গেছে। এক নম্বরের হেক্কোড়। নেশাভাঙ আর আউরাৎ নিয়ে কারবার করে। বহুকাল আগে শোভারামের বউ পালিয়ে গেছে। ভেলু কেবল নাতিটাকে রেখে শোভারামকেও ঘরের বার করেছে। কিন্তু ছেলে মহা হেক্কোড়, দুনিয়ায় কাউকে ভয় খায় না। দরকার পড়লেই এসে ভেলুর দোকানে হামলা করে মালকড়ি ঝেঁকে নিয়ে যায়। তাই চৌপথী থেকে পা চালিয়ে ফিরছিল ভেলু। রবারের চটির আওয়াজে দাঁড়িয়ে গেল।

নদীয়া যায়, না নদীয়ার বউ যায়? মুশকিল হল, নদীয়ার বউ আজকাল মালকোঁচা মেরে ধুতি পরে, পিরান গায়ে দেয়, চুলও ছেঁটে ফেলেছে। কে বলবে মেয়েমানুষ? হাতে

চুড়ি-বালা সিঁথের সিঁদুর কিছু নেই। রাতবিরেতে লোকালয়ে ঘুরে বেড়ায়। তার ধারণা হয়েছে যে, সে পুরুষমানুষ, আর কালীসাধক। অবশ্য কালীর ভরও হয় তার ওপর। শুধু ভেলু কেন, গঞ্জের সবাই নদীয়ার বউকে ভয় খায়। নদীয়া নিজেও।

ভেলু শেষবেলার আকাশের খয়াটে আলোটুকুও চোখে সহ্য করতে পারে না, চোখে হাত আড়াল দিয়ে দেখে বুঝে ভয়ে-ভয়ে বলে—কে, নদীয়া নাকি?

—হয়। নদীয়া উত্তর দিল।

—কোন বাগে যাচ্ছ?

—বাজারের দিকেই।

—চলো, একসঙ্গে যাই।

—চলো।

দুজনে একসঙ্গে হাঁটে। ভেলুরামের নাগরা জুতোর ঠনাঠন শব্দ হচ্ছে, ফ্যাসফ্যাস করছে নদীয়ার চটি। ভারী দুঃখী মানুষ এই নদীয়া। বউ যদি পুরুষছেলে হয়ে যায় তো পুরুষমানুষের দুঃখ ঝুড়িভরা। কিন্তু ওই সাত জায়গায় ডিম-সুতোর বাঁধনওয়ালা হাওয়াই চটি দেখে যদি কেউ নদীয়ার দুঃখ বুঝবার চেষ্টা করে তো সে আহাম্মক। নদীয়ার দুঃখ ওই চটি জুতোয় নয় মোটেই। দু-দুটো মদ্দ হালুইকর নদীয়ার শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে দু-বেলা খাটে। গঞ্জে বলতে গেলে ওই একটাই মিষ্টির দোকান। আরও কয়েকটা নদীয়ার ভাত মারবার জন্য গজিয়েছে বটে, তবু নদীয়ার বিক্রিবাটাই সবচেয়ে বেশি। দোষের মধ্যে লোকটা কৃপণ। জামাটা জুতোটা কিনবে না, পকেটে পয়সা নিয়ে বেরোবে না। চটি ছিঁড়লে সেলাই করে পরবে। বউ কি সাধে পুরুষ সাজে!

যে যার নিজের জ্বালায় মরে। নদীয়া যেতে-যেতে কাঁদুনি গাইতে লাগল—সামনের অমাবস্যায় আমার বাড়িতে মচ্ছব লাগবে, বুঝেছ? আমার বউ নিজের হাতে পাঁঠা কাটবে। শুনেছ কখনও মেয়েছেলে পাঁঠা কাটে?

দেহাতি ভেলুরামের তিন পুরুষের বাস এই গঞ্জে। সে পুরো বাঙালি হয়ে গেছে, তবু মাঝে-মাঝে অভ্যাস রাখার জন্য সে দু-চারটে হিন্দি কথা ভেজাল দিয়ে নির্ভুল বাংলা বলে। যেমন এখন বলল—নদীয়া ভাই, আউরাৎ তোমার কোথায়? ও তো ব্যাটাছেলে হয়ে গেছে। সোচো মাৎ।

—তুমি তো বলবেই। আমি মরি স্বখাত সলিলে, তোমরা মাগনার মজা দেখছ।

ভেলুরাম নাগরার শব্দে যথেষ্ট পৌরুষ ফুটিয়ে বলল—ও মেয়েছেলেকে সোজা রাখতে হলে চার জুতি লাগাতে হয়।

বলে থেমে গিয়ে নিজের একখানা পা তুলে পায়ের নাগরা নদীয়াকুমারকে দেখিয়ে বলল—এইসন জুতি চাই। কিন্তু তুমি জুতি লাগাবে কি, তোমার তো একজোড়া ভালো জুতিই নেই। ওইরকম কুত্তার কানের মতো লটরপটর হাওয়াই চটি দিয়ে কি জুতো মারা যায়!

—রাখো-রাখো! নদীয়া ধমকে ওঠে—শোভারামের মা যখন নোড়া তুলে তাড়া করেছিল তখন তো বাপু ন্যাজ দেখিয়েছিলে, বুড়ো ভাম কোথাকার!

ভেলুরাম খুব হাসে। শোভারামের মা এখন আর বেঁচে নেই। নোড়া নিয়ে তাড়া করার সেই সুখস্মৃতিতে ভারী আহ্লাদ আসে মনে। এত আহ্লাদ যে চোখে জল এসে যায় ভেলুরামের।

আনাচে-কানাচে শোভারাম কুকুর-বেড়ালের মতো ঘুরঘুর করে। এমন অবস্থা ছিল না যখন মা গন্ধেশ্বরী জীবিত ছিল। তখনও বাপটা খড়মটা হুড়কোটা দিয়ে পেটাত বটে, কিন্তু তবু সংসারের বার করতে সাহস পেত না। মা গন্ধেশ্বরীকে ভূত-প্রেত পর্যন্ত ভয় পেত, কাবুলিওয়ালা কি দারোগা পুলিশকেও গ্রাহ্য করত না গন্ধেশ্বরী। ভেলুরাম তো সেই তুলনায় ছারপোকা। সেই গন্ধেশ্বরী ছিল শোভারামের সহায়। তখন শোভারামের মনখানা সবসময়ে এই গান গাইত—লুট পড়েছে, লুটের বাহার লুটে নে রে তোরা। তাই বটে। বাপ ভেলুরামের পাইকারি মশলাপাতি, মনোহারি জিনিস, পাট, তামাকপাতা, তেলের বীজ ইত্যাদির কারবার থেকে সে মনের আনন্দে লুট করত। বখা ছেলেদের সঙ্গে বিড়ি খেতে শিখেছিল ইস্কুলের প্রথম দিকটায়। ক্লাস থ্রিতে উঠলে লেখাপড়া সাঙ্গ হল। মাস্টাররা মারে বলে মা গন্ধেশ্বরী ইস্কুল থেকে ছাড়ান করাল। বাপের সঙ্গে কিছুদিন কারবার বুঝবার চেষ্টায় লেগেছিল। ভালো লাগত না। বাপটা পারেও বটে। দু-পয়সা চার পয়সার হিসেব নিয়ে পর্যন্ত মাথা গরম করত। শোভারামের এসব পোষায় না। বয়সকালে বউকে গাওনা করে দেহাত থেকে আনাল মা। কিন্তু সে বউয়েরও কি বা ছিল! শোভারাম ইতিমধ্যে বখাটেদের সঙ্গে ভিড়ে বিস্তর মেয়েমানুষের স্বাদ সংগ্রহ করেছে। দেহাতি মেয়ে বড্ড নোনতা। ভারী ঝাঁঝ তাদের হাবেভাবে। সেটা অপছন্দ ছিল না শোভারামের। কিন্তু বউয়েরও তো পছন্দ বলে কিছু আছে! শোভারাম নেশার ঘোরে পড়ে গেছে, গাঁজা ভাঙ তো আছেই, বোতলের নেশাও ধরে ফেলেছে কবে। মেয়েমানুষটা টিকটিক করত। খেলারাম হওয়ার পর থেকেই বাড়িতে দাঙ্গা-হাঙ্গামার উপক্রম। মা গন্ধেশ্বরী তখনও সহায়। ছেলের বউয়ের তেজ দেখে উদুখলের কোঁৎকাটা দিয়ে আচ্ছাসে ঝেড়ে দিল। সেই

পেটানো দেখে শোভারাম মুগ্ধ। মায়ের পায়ের ধুলো জিভে ঠেকিয়েছিল সেদিন। বছরখানেকের খেলারামকে ফেলে বউ ভেগে গেল ছ'মাস পর। বাপ ভেলু অবশ্য বরাবরই শোভার বিপক্ষে। তক্কে-তক্কে ছিল, কবে গন্ধেশ্বরী মরে। সেই ইচ্ছা পূরণ করে শোভারামকে জগৎসংসারে একেবারে দিগদারির দরিয়ায় ছেড়ে, গেল বছর মা গন্ধেশ্বরী সধবা মরল। গন্ধেশ্বরীর শ্রাদ্ধের দিন পার হতে-না-হতেই ভেলুরাম মহা হাঙ্গামা বাধায়। শোভারাম কিছু প্রতিবাদ করেছিল, কিন্তু বাপ ভেলুরাম মহকুমায় গিয়ে এস. ডি. ও. সাহেবের কাছে পর্যন্ত ছেলের বিরুদ্ধে দরবার করে। লজ্জায় ঘেন্নায় শোভারাম গৃহত্যাগ করে।

কিন্তু ঘর ছাড়লেই কী! তিরপাইয়ের বস্তিতে জগনের ঘরে একরকম আদরেই আছে শোভারাম। কিন্তু সে আদরে তো মালকড়ি আসে না। নেশা-ভাঙ আর কাঁহাতক ভিক্ষেসিক্ষে করে চলে! কাজবাজ বলতে কিছু নেই, রোজগারপাতি ঢুঢু, চুরি-চামারিও বড় সহজ নয়। মহকুমার সদরে গিয়ে অনেক ঘুরঘুর করেছে সে, কেউ কাজ দেয় না। তিন-চার বাড়িতে চাকর খেটেছিল, চুরি করে মারধর খেয়ে পালিয়ে এসেছে, পুলিশও খোঁজখবর করছে। বড় অব্যবস্থা চারদিকে। চুরির লাইনে পাকাপাকিভাবে ঢুকে পড়ার বাসনা ছিল। কিন্তু নেশা-ভাঙ করে শরীরে আর রস নেই, হাতটাত কাঁপে, বুক ধড়ফড় করে, মাথা গুলিয়ে যায়। মদনা চোরকে দেখে বুঝেছে যে চুরিও বড় সহজ কাজ নয়। সংযম চাই, ত্যাগ চাই, আত্মবিশ্বাস আর বুদ্ধি চাই। মদনা রোজ সকালে ব্যায়াম করে, ঘোড়ার মতো ছোলা খায়, নেশাটেশাও বুঝে-সমঝে করে। তা ছাড়া সে নানান মন্ত্র জানে। ভূতপ্রেত তাড়ানোর মন্ত্র, কুকুরের মুখবন্ধন, ঘুমপাড়ানি মন্ত্র। মদনা যে আজ বড় চোর হয়েছে সে-ও মাগনা নয়। যে দিকেই বড় হতে চাও কিছু গুণ থাকাই লাগবে। শোভারামের কিছু নেই।

তাই শেষপর্যন্ত ফের ভেলুরামের গদিতেই তাকে মাঝে-মাঝে চড়াও হতে হয়। কাকুতি মিনতে আজকাল কাজ হয় না, চোখ রাঙালেও না। ভেলুরাম তার ধাত বুঝে গেছে। খেলারাম বাপকে দূর-দূর করে। একটা বিলিতি কুত্তা রেখেছে, সেইটিকে লেলিয়ে দেয়। তবু দু-পাঁচ টাকা ওই বাপ কি ছেলেই ছুড়ে দেয় শোভারামকে আজও। সেই অপমানের পয়সা কুড়িয়ে নিয়ে আসে শোভারাম। চোখে জল আসে। তারই বাপ, তারই ছেলে, পয়সাও হক্কের, তবু ভিক্ষে করে আনতে হয়।

আজও গদির চারধারে ঘুরঘর করে বাতাস শুঁকছিল শোভারাম। মশলাপাতির একটা ঝাঁঝালো গন্ধ এখানে। বাজারের পিছন সারির দোকান আর গুদামের জায়গাটা খুব নির্জন। খেলারামের কুকুরটা কাঠের দোতলার বারান্দা থেকে তাকে দেখতে পেয়ে

চেঁচাচ্ছে। শোভারাম মুখ তুলে কুকুরটাকে দেখল। ভীষণ কুকুর। বলল—কুত্তার বাচ্চা কোথাকার!

গদিতে খেলা বা ভেলু কেউ নেই। শুধু বুড়ো কর্মচারী বসে হিসেবের লাল খাতা খুলে শক্ত যোগ অঙ্ক কষছে। দু-চারজন খদ্দের মশা তাড়াচ্ছে। আর খেলারামের মাস্টার শ্রীপতি কর্মকার বসে আছে উদাসভাবে। শ্রীপতি মাস্টার লোকটি বড় ভালো। সারাদিন বসে কী যেন ভাবে। লোকে বলে গঞ্জে শ্রীপতির মতো এত লেখাপড়া জানা লোক আর নেই। কিন্তু লেখাপড়া শিখে যে জীবনে কিছু হয় না, ওই শ্রীপতি মাস্টার তার প্রমাণ। মাইনর স্কুলে সামান্য বেতনের মাস্টারি করে, আর গোমুখ্যু ভেলুরামের নাতি, গজমুখ্যু শোভারামের ছেলে আকাটমুখ্যু খেলারামকে রোজ সন্ধেবেলা দু-ঘণ্টা পড়িয়ে মাসকাবারে বুঝি পঞ্চাশ টাকা পায়। আর ওই দু-ঘণ্টায় ভেলুরাম গদিতে বসে না হোক শতখানেক টাকা নাফা রোজ ঘরে তুলছে।

—রাম রাম মাস্টারজি। বলে শোভারাম গদির মধ্যে ঢুকে পড়ল। ভাবখানা এমন যে তারই গদি, রোজই সে এখানে যাতায়াত করে। কর্মচারীটা একবার মুখ গম্ভীর করে তাকাল। হাতের কাছেই ক্যাশবাক্স, কিন্তু ওতে কিছু নেই, শোভা জানে। থাকলেও ক্যাশবাক্স তালা-দেওয়া, আসল মালকড়ি লম্বা গেঁজের মধ্যে ভেলুরামের কোমরে প্যাঁচানো থাকে।

শ্রীপতি মাস্টার চিনতে পারল না, অন্যমনস্ক মানুষ। চুলগুলো সব উলোঝুলো, গায়ে ইস্তিরি ছাড়া জামা, ময়লা ধুতি। উদাস চোখে চেয়ে বলল—কোন হ্যায় আপ?

শ্রীপতি দারুণ হিন্দি বলে। প্রথম দিন খেলারামকে পড়াতে এসে সে বড় বিপদে ফেলেছিল ভেলুরামকে। খটাখট উর্দু মেশানো চোস্ত হিন্দিতে কথা বলে যাচ্ছে, ভেলু হাঁ করে চেয়ে আছে, কিছু বুঝতে পারছে না। তিন পুরুষ বাংলাদেশে থেকে আর বাঙালির সঙ্গে কারবার করে-করে হিন্দি-মিন্দি ভুলে গেছে কবে! উত্তরপ্রদেশে সেই কবে দেশ ছিল। মা গন্ধেশ্বরী কিছু-কিছু বলতে পারত। খেলারাম এখন ইস্কুলে হিন্দি শেখে।

শ্রীপতির হিন্দি শুনে ভয় খেয়ে শোভারাম বলে—আমি খেলারামের বাপ মাস্টারজি। আমার কথা ভুলে গেলেন আপনি?

—ও। বলে বিরস মুখে বসে থাকে শ্রীপতি। গঞ্জে থেকে তার জীবনটা অর্থহীন হয়ে যাচ্ছে। এমনকী সে যে এত ভালো হিন্দি জানে সেটুকু পর্যন্ত অভ্যাস রাখতে পারছে না, এমন লোকই নেই যার সঙ্গে দুটো হিন্দি বলবে। আর যা সব জ্ঞান আছে তার সেগুলো তো গেলই চর্চার অভাবে। গবেট খেলারাম এমনই ছাত্র যে বাঁ বলতে ডান বোঝে। পড়তে

বসে দশবার উঠে গিয়ে দোকানদারি করে আসছে। প্রতি ক্লাসে একবার দুবার ঠেক খেয়ে ক্লাস নাইনে উঠেছে। এর পরের চড়াই ঠেলে পার করা খুবই মুশকিল। তবু তার দাদু ভেলুরামের বড় ইচ্ছে যে খেলারাম বি.কম পাস করে হিসেবের ব্যাপারটায় পাকা হয়ে আসুক। তাই শ্রীপতি মাঝে-মাঝে ঠেস দিয়ে বলে, বুদ্ধি কম হলে কি আর বি.কম হওয়া যায়।

শোভারাম খুব বিনীতভাবে প্রশ্ন করে—একা বসে আছেন, খেলাটা গেল কোথায়?

শ্রীপতি মুখটাকে খাট্টা করে বলে—কোথায় আর যাবে, বাকি বকেয়ার তাগাদায় বীরপাড়া না কোথায় গেছে শুনছি। আমার আটটা পর্যন্ত টাইম, ততক্ষণ বসে উঠে যাব।

—সে তো ঠিক কথা। বলে শোভারাম একটু বাপগিরি ফলিয়ে বলে—খেলারামটা লেখাপড়ায় কেমন মাস্টারজি?

শ্রীপতি বলে—কিছু হবে না।

শোভারাম শুনে খুশিই হয়। বলে—আমিও তাই বলি। ঝুটমুট ওর পিছনে পয়সা গচ্চা যাচ্ছে।

বলতে-বলতে শোভারাম চারদিকে নজর করছে। হাতের কাছে সরাবার মতো কিছু নেই। শোভা তাই হাতের কাছে ক্যাশ বাক্সটায় একটু তেরে কেটে তাক বাজায় অন্যমনে। বয়স কম হল না তার। পঁয়তাল্লিশ তো হবেই! খেলারামেরও না হোক বাইশ-চব্বিশ হবে। এত বয়স পর্যন্ত এ গদিতেই কেটেছে তার। কাঠের দোতলার ওপর সে জন্মেছিল বিন্দি ধাইয়ের হাতে। এই বাজারের ধুলোয় পড়ে বড় হয়েছে। ভিতরবাগে একটা উঠোন আছে, সেখানে মা গন্ধেশ্বরী আচার রোদে দিত, পাঁপড় শুকিয়ে নিত। কিন্তু এখন সে গদিতে বাইরের লোক। বাপ যে এত অনাত্মীয় হতে পারে কে জানত!

সন্ধে পার হয়ে গেল। ইটখোলার দিক থেকে পশ্চিমা গানের আওয়াজ আসছে। সাঁঝবাজারে কিছু লোক নদীর মাছ কিনতে এসে বকবক করছে। তা ছাড়া বাজারটা এখন বেশ চুপচাপ। শীতটা সদ্য এসেছে, এবার জোর শীত পড়বে মনে হয়। গায়ের মোটা সুতির চাদরটা খুলে আবার ভালো করে জড়ায় শোভারাম। এইসব গায়ের বস্ত্র দিয়ে শীত আটকানোয় সে বিশ্বাসী নয়। শীত ঝেড়ে ফেলতে এক নম্বরির চাপানের মতো আর কি আছে! না হয় একটা ছিলিম বোমভোলানাথ বলে টেনে বসে থাকো, মা গন্ধেশ্বরীর হাতে ঠেঙা খেয়ে চোর বেড়াল যেমন লাফিয়ে পালাত, শীতও তেমনি পালাবে।

বাপ ভেলুরামের নাগরা জুতোর শব্দ আধ মাইল দূর থেকে শোনা যায়। সেটা শুনতে পেয়েই উঠে পড়ল শোভারাম। টালুমালু অসহায় চোখে চারদিকে আর-একবার তাকায়।

কিছুই হাতাবার নেই। পাথরপোতার এক ব্যাপারী বাংলা সাবান কিনতে এসে বসে ঢুলছিল। জুতো জোড়া ছেড়ে রেখেছে বেঞ্চির সামনে। বেশ জুতো—ঝা চকচকে নতুন, না হোক ত্রিশ টাকা জোড়া হবে।

শোভারাম নিজের টায়ারের চটি আর পায়ে দিল না। দেখি-না-দেখি না ভাব করে ব্যাপারীর জুতো জোড়া পায়ে গলিয়ে বেরিয়ে এল। একটা কাঠের বড় মুখ খোলা বাক্সে বিস্তর নোনতা বিস্কুটভরা প্ল্যাস্টিকের প্যাকেট। যাওয়ার সময়ে হাতপিছু করে দু-প্যাকেট তুলে চাদরের তলায় ভরে ফেলল। সেইসঙ্গে এক মুঠো তেজপাতা আর এক গোলা বাংলা সাবানও। যা পাওয়া যায়।

বাপ ভেলুরামের সঙ্গে মুখোমুখিই পড়ে যেত শোভা। কিন্তু একটুর জন্য বেঁচে গেল। ভেলু এখন সবজিবাজারের কাছে দাঁড়িয়ে নদীয়ার সঙ্গে কথা বলছে। জবুথবু কয়েকজন সবজিওয়ালা টেমি জ্বেলে নিঝুম বসে আছে আলু কপি বেগুন সাজিয়ে। ব্যাবসা মানেই হচ্ছে বসে থাকা। তাই শোভারাম মানুষের ব্যাবসা করা দু-চোক্ষে দেখতে পারে না। নতুন জুতো জোড়া বেশ টাইট মারছে। কয়েক কদম হাঁটলেই ফোসকা পড়ে যাবে। শোভারাম খুঁড়িয়ে মেছোবাজারের দিকে অন্ধকারে সরে যায়।

চটিজোড়া এই নিয়ে আটবার ছিঁড়ল। বাজারের ও-প্রান্তে দোকান, এখন বেশ খানিকটা দূর। নদীয়া ডানপায়ের চটিটা তুলে সবজিওয়ালার টেমির আলোয় দেখল। নতুন করে ছেঁড়েনি, রবারের নলী দুটো যেখানে ডিমসুতোয় বাঁধা ছিল সেই বাঁধনটাই ছিঁড়েছে। সুতোওয়ালারা আজকাল চোরের হদ্দ, এমন সব পচা সুতো ছেড়েছে বাজারে যে বাতাসের ভর সয় না। চটিটা আলোয় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে নদীয়া। নাঃ, গোড়ালিটা ক্ষয়ে গেছে আদ্দেক। আর-এক জোড়া না কিনলেই নয়। জুতো চটির যা দাম হয়েছে আজকাল। চটিটা ছেঁড়ায় ফের নিজেকে ভারী দুঃখী মানুষ বলে মনে হয় নদীয়ার। এ গঞ্জে তার মতো দুঃখী আর কে?

চামার সীতারামের দোকানটা সবজি বাজারের শেষে। দোকান না বলে সেটাকে গর্ত বলাই ভালো। একধারে লোহার আড়ত, অন্যধারে ভূষি মালের দোকান। তার মাঝখানে বারান্দার নীচের দিকে একটা গর্ত মতো জায়গায় সীতারাম মুচির দোকান ত্রিশ-চল্লিশ বছরের পুরোনো। ছোট চৌখুপিটার মধ্যে চারধারে কেবল জুতো আর জুতো। সবই পুরোনো জুতো। সামনের দিকে বাহার করার জন্য আবার জুতোর সারি ঝুলিয়ে রেখেছে সীতুয়া। তার বউ নেই, বালবাচ্চার কথাও ওঠে না। আছে কেবল পুরোনো জুতো। সেই জুতোর মধ্যেই সে দিনরাত শোয় বসে, সেখানেই রান্না করে খায়। পেল্লায় বুড়ো হয়ে

গেছে সীতুয়া, তবু এখনও গর্তের ভিতর থেকে শুকুনের মতো তাকিয়ে খদ্দেরদের দেখে নেয়।

ছেঁড়া চটিটা নিয়ে দোকানের মধ্যে কুঁজো হয়ে মুখ বাড়াতে গিয়ে কপালে ঝুলন্ত কার-না-কার পুরোনো জুতোর একটা ধাক্কা খেল নদীয়া। এমন কপালে জুতোই মারতে হয়। ইচ্ছে করেই নদীয়া কপাল দিয়ে আর-একবার ধাক্কা মারে ঝুলন্ত জুতোয়।

সীতুয়া ছেনির মতো যন্ত্র দিয়ে চামড়া কাটছে। কাঠের একটা ক্ষয়া টুকরোয় খসখস করে দু-চারবার ঘষে নিচ্ছে ছেনিটা। মুখ তুলতেই নদীয়া বলে—দ্যাখ বাবা, চটিটার একটা বন্দোবস্ত করতে পারিস কি না।

নদীয়াকুমার ভালো খদ্দের নয়, সীতারাম জানে। তাই গম্ভীরভাবে হাতের কাজ শেষ করে একবার খইনির থুক ফেলে হাওয়াইটা হাতে নিয়ে ভ্রূ কুঁচকে বলে—এ তো ভিখামাঙাদের চটি, আপনি কোথায় পেলেন এটা?

নদীয়া রেগে গিয়ে বলে—বড্ড বকিস বলেই চিরকাল এমন রয়ে গেলি সীতুয়া। দে দুটো সুতোর টান মেরে।

সীতারাম মাথা নেড়ে বলে—ফুটো হবে কোথায়? বিলকুল পচে গেছে রবার। ফিকে ফেলে দেন। নতুন কিনে নেন একজোড়া।

নদীয়া পকেটে হাত দিয়ে দেখল। জানা কথা পয়সা নেই। পকেটে থাকেও না কোনওদিন। খরচের ভয়ে নদীয়া পয়সা নিয়ে বেরোয় না। মিনতি করে বলল—দে বাবা সারিয়ে, দোকানে গিয়ে পাঁচটা পয়সা পাঠিয়ে দিচ্ছি।

সীতুয়া তার যন্ত্র দিয়ে চটির রবার ফুঁড়ে সুতোয় টান দিয়ে বলল—দেখবেন নদীয়াবাবু জুতো মাথায় মুখে লেগে যাবে। অত ঝুঁকবেন না।

—লাগবে কী, লেগেছে। বিরস মুখে বলে।

সীতুয়া মোষের শিঙের ফুটোয় যন্ত্রটা ঢুকিয়ে বের করে এসে ভুসভুসে রবার ফুটো করতে-করতে বলে—বাবুলোকেরা মাথা নীচু করতে জানে না তো, তাই ওইসব জুতো তাঁদের কপালে লাগে।

—এঃ, ব্যাটা ফিলজফার। বলে নদীয়া।

তারপর চটি পরে ফটাফট কাপ্তানের মতো হাঁটে।

দিনটাই খারাপ। খড়-কাটাই কলের সামনে নদীয়ার বউ দাঁড়িয়ে আছে। দৃশ্যটা আগে সহ্য হত না। আজকাল সয়ে গেছে। বউয়ের চেহারা দেখলে ভিরমি খেতে হয়। মাথায় টেরিকাটা পুরুষমানুষের চুল, পরনে পাঞ্জাবি-ধুতি, পায়ে চপ্পল, বাঁ-হাতে ঘড়ি। দাড়িগোঁফ নেই বলে খুবই ডেঁপো ছোকরার মতো দেখতে লাগে। চেহারাটা মন্দ ছিল না মেয়েমানুষ থাকার কালে। বুকটা ন্যাকড়া জড়িয়ে চেপে বেঁধে রাখে, তাই এখন আর মেয়েমানুষির চিহ্ন কিছু বোঝা যায় না।

বউকে দেখে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে নদীয়া। মুখটা অন্যধারে ঘুরিয়ে নেয়। সেই ঘটনার পর বছর ঘুরে গেছে। একদিন মাঝরাতে দুঃস্বপ্ন দেখছিল নদীয়া। সময় খারাপ পড়লে মানুষ স্বপ্নটাও ভালো দেখে না। তো সেই দুঃস্বপ্নের মধ্যেই একটা লাথি খেয়ে জেগে উঠে হাঁ করে রইল। তার বউ মন্দাকিনী তার নাম ধরে ডাকছে—ওঠ, ওঠ রে নদীয়া! নদীয়ার মুখের মধ্যে একটা মশা ঢুকে পিনপিন করছিল, সেটাকে গিলে ফেলে নদীয়া ফের হাঁ করে থাকে। দেখে, বউ মন্দাকিনী মস্ত কাঁচি দিয়ে চুল সব মুড়িয়ে কেটে ফেলেছে, ঘরের মেঝেময় মস্ত-মস্ত লম্বা সাপের মতো চুলের গুছি পড়ে আছে। নদীয়া ধুতি পরেছে মালকোঁচা মেরে, গায়ে গেঞ্জি। তাকে জেগে উঠতে দেখে হাতের কাঁচিটা নেড়ে বলল—খবরদার আজ থেকে আর আমাকে মেয়েমানুষ ভাববি না। মা কালী স্বপ্ন দিয়েছে, আজ থেকে আমি তাঁর সাধক। নদীয়া তেড়ে উঠে বউয়ের চুলের মুঠি ধরতে গিয়েছিল, কিন্তু সে আর ধরা হল না। চুল পাবে কোথায় ধরার মতো? তা ছাড়া বড় কাঁচিটা এমনধারা ঘোরাচ্ছিল যে খুব কাছে যেতে নদীয়ার সাহস হয়নি। সেই থেকে তার বউ মন্দাকিনী পুরুষমানুষ মেরে গেল। বাড়িতে থাকে, নদীয়ার পয়সাতেই খায় পরে, কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক কিছুমাত্র নেই। পড়শিরা ডাক্তার কবিরাজ করতে বলেছিল। সে অনেক খরচের ব্যাপার, তবু নদীয়া শশধর হোমিওপ্যাথকে দিয়ে চিকিৎসা করিয়েছে। কিন্তু ওষুধ খাবে কে? সেই বড় কাঁচিটা অস্ত্র হিসেবে সবসময়ে কাছে-কাছে রাখে মন্দাকিনী। কাছে যেতে গেলেই সেইটে তুলে তাড়া করে। এখন ওই যে খড়কাটাই কলটার কাছে দাঁড়িয়ে আছে, এখনও ওর কোমরে পাঞ্জাবির আড়ালে কাঁচিটা গোঁজা আছে, নদীয়া জানে।

ব্যাটাছেলে মন্দাকিনীর দিকে যতদূর সম্ভব না তাকিয়ে জায়গাটা পেরিয়ে যাচ্ছিল নদীয়া। সময়টা খারাপ পড়েছে। সীতুয়া চামার পাঁচটা পয়সার খয়রাতিতে ফেলে দিল। এখন এই হাওয়াইটা যদি ফেলে দিতেই হয়, আর নতুন একজোড়া কিনতেই হয়, তো এ পাঁচটা পয়সা না হক খরচা হল।

—এই নদীয়া! বউ ডাকল।

নদীয়া একপলক তাকিয়ে চলে যাচ্ছিল তবু! মন্দাকিনী ফের হেঁকে বলল—শুনে যা বলছি, নইলে কুরুক্ষেত্র করব।

মেয়েমানুষের স্বভাব যাবে কোথায়! ঝগড়ার ভয় দেখাচ্ছে। তবু নদীয়া কান পাততে উৎসাহ পায় না। ফকিরচাঁদের ঢিবির ওপর নাকি মায়ের মন্দির তুলে দিতে হবে, মায়ের স্বপ্নাদেশ হয়েছে। প্রায়ই হয়। এসব কথা কানে তোলে কোন আহাম্মক!

মন্দাকিনী পিছন থেকে এসে পিরান টেনে ধরল, ঘন শ্বাস ফেলে বলল—তোরটা খাবে কে শুনি! ছেলে নেই, পুলে নেই, নির্ব্বংশ হারামজাদা, কবে থেকে মায়ের মন্দিরের জন্য দশ হাজার টাকা চেয়ে রেখেছি! রক্ত বমি হয়ে মরবি যে।

ফস করে নদীয়ার মাথায় বুদ্ধি আসে। বাঁই করে ঘুরে মুখোমুখি তাকিয়ে বলে—ছেলেপুলে নেই তো কি! হবে।

—হবে? ভারী অবাক হয় মন্দাকিনী। কাঁচির জন্যই বুঝি কোমরে হাত চালিয়ে দেয়।

—আলবাত হবে। সদরে মেয়ে দেখে এসেছি। বৈশাখে বিয়ে করব। দেখিস তখন হয় কি না হয়! তোর মতো বাঁজা কিনা সবাই!

এত অবাক হয় মন্দাকিনী যে আর বলার নয়। কাঁচিটা টেনে বার করতে পর্যন্ত পারে না। তার মুঠি আলগা হয়ে নদীয়ার পিরানের কোণটা খসে যায়। আর নদীয়া চটি ফটফটিয়ে হাঁটে।

না, নদীয়ার মতো দুঃখী আর নেই। দোকানে এসে দেখে ভেলুর অপদার্থ ছেলে শোভারাম চায়ের ভাঁড় হাতে বসে আছে। দৃশ্যটা দেখেই নিজের দুঃখের ব্যাপকতা বুঝতে পারে নদীয়া। ওই যে চায়ের ভাঁড় ওর দাম কখনও উসুল হবে না। গঞ্জের একনম্বর হোক্কোড় হল ওই শোভারাম। খাবে, খাতায়ও লেখাবে, কিন্তু কোনওদিন দাম শুধবে না। বেশি কিছু বলাও যায় না, কবে রাত-বিরেতে এসে দলবল নিয়ে চড়াও হয়।

বাবাকেলে পুরোনো তুষের চাদরটা গা থেকে খুলে সযত্নে ভাঁজ করে রাখল নদীয়া। পা ধুয়ে এসে ছোট্ট চৌকির ওপর বিছানায় ক্যাশবাক্স নিয়ে বসল। টিকে ধরিয়ে পেতলের ধূপদানিতে ধোঁয়া করে অনেকক্ষণ গণেশবাবাকে প্রণাম ঠুকল। দুনিয়ার সব মানুষের বুদ্ধিসুদ্ধি হোক বাবা।

শীতে খদ্দের বেশি ভেড়ে না। দোকান ফাঁকাই।

নদীয়া ভারী দুঃখী মানুষ। ঠাকুর পেন্নাম ভালো করে শেষও হয়নি, শোভারামটা চটির খোঁটা দিল—ই কি গো, নদীয়াদা! তোমার চটির হালটা এরকম হল কবে? এ পরে বেড়াও

নাকি? খবরদার রবারের চটি পরো না, চোখ খারাপ হয়। আর ওই কুকুরে খাওয়া চটি ভদ্রলোকে পরে?

শোভারামের পায়ে নতুন জুতো। নদীয়া আড়চোখে দেখে। বেশ বাহারি জুতো। চামড়ার ওপরে মাছের আঁশের মতো নকশা তোলা, রংটাও ভালো। নদীয়ারই সময় খারাপ পড়ে গেছে। শ্বাস ফেলে বলে—নতুন কিনলি বুঝি জুতো জোড়া?

শোভারাম বিস্তর রংঢং দেখিয়ে বলে—ঠিক কেনা নয় বটে! শোভারাম ভেবে চিন্তেই বলে। কারণ, সে নিজের পয়সায় জুতো কিনেছে এটা নদীয়া বিশ্বাস নাও করতে পারে।

নদীয়া রসিকতা করে বলে—কিনিসনি! তবে কি শ্বশুরবাড়ি থেকে পেলি? না কি শেষ অবধি জুতো চুরি পর্যন্ত শুরু করেছিস।

অপমানটা হজম করে শোভারাম। কিন্তু লোক চরিয়েই সে খায়, খামোকা চটে লাভ কী! ভালোমানুষের মতো বলে—না গো নদীয়াদা, সে সব নয়। গেল হপ্তায় বৈরাগী মণ্ডলের হয়ে সদরে একটা সাক্ষী দিয়ে এলাম। টায়ারের চটিটা ফেঁসে গিয়েছিল হোঁচট খেয়ে। তো বৈরাগী মণ্ডল জুতো জোড়া কিনে দিল। কিন্তু তখন তাড়াহুড়োয় খেয়াল করিনি, মনে হচ্ছে এক সাইজ ছোট কিনে ফেলেছি! বেদম টাইট হচ্ছে। দ্যাখো তো, তোমার পায়ে লাগে কি না—

বলে শোভা জুতো খুলে এগিয়ে দেয়। নদীয়া উদাস হয়ে বলে—লাগলেই কী! ওসব বাবুগিরি কি আমাদের পোষায়!

শোভারাম অভিমানভরে বলে—তুমি চিরকালটা একরকম রয়ে গেলে নদীয়াদা! তাই তো তোমার বউ ওরকম ধারা ব্যাটাছেলে হয়ে গেল! নাও তো, পরে দ্যাখো! পায়ে লাগলে এমনিই দিয়ে দেব। ত্রিশ টাকায় কেনা, তো সে কত টাকা জলে যায়। পরে দ্যাখো।

নদীয়া এবার একটু নড়ে। বলে—কত টাকা বললি?

শোভারাম হাসে, বলে—ত্রিশ টাকা। মূর্ছা যেয়ো না শুনে। ওর কমে আজকাল জুতো হয় না।

নদীয়া উঠে এসে জুতো জোড়া পায়ে দিল। পাম্প-শুর মতোই কিন্তু ঠিক পাম্প-শু নয়। বেশ নরম চামড়া। দু-চার পা হেঁটে দেখল নদীয়া। আরে বা! দিব্যি ফিট করেছে তো! এই শীতে পায়ে বড় কষ্ট। চামড়া ফেটে হাঁ করে থাকে, ভিতরে ঘা, তাতে ধুলোময়লা ঢুকে কষ্ট হয়। তা ছাড়া পাথরকুচির রাস্তায় অসমান জমিতে পা পড়লে হাওয়াই চটিতে কিছু আটকায় না, ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত ঝিলিক দিয়ে ওঠে যন্ত্রণায়। এই জুতোজোড়া পরেই নদীয়া

টের পেল আরাম কাকে বলে। পায়ে গলিয়ে নিলেই পা দুখানা ঘরবন্দি হয়ে গেল। ধুলোময়লা, পাথরকুচি কিংবা শীত কিছুই করতে পারবে না।

শোভারাম খুশি হয়ে বলে—বাঃ গো নদীয়াদা, জুতোজোড়া যেন তোমার জন্যই জন্মেছিল। আমাদের ছোটলোকি পায়ে কি আর ওসব পোষায়! তুমিই রেখে দাও! আমি না হয় একজোড়া টায়ারের চটি কিনে নেব। বাজারের ওদিকে মহিন্দির টায়ারের চটির পাহাড় নিয়ে বসে আছে।

নদীয়া একটু দ্বিধা করে বলল—টায়ারের চটি কি সস্তা নাকি রে? হলে বরং আমিও একজোড়া—

—আরে না-না! শোভারামের মাথা নেড়ে বলে—সে বড় শক্ত জিনিস। তোমরা পায়ে দিলে ফোস্কা পরে কেলেঙ্কারি হবে। কড়া আর জীবনে সারবে না। ওসব কুলিমুজুরের জিনিস। তুমি এটাই রেখে দাও। যা হোক, দশ-বিশ টাকা দিয়ে দিয়ো, তোমার ধর্মে যা সয়।

সঙ্গে-সঙ্গে নদীয়া জুতোজোড়া খুলে ফেলে বলে—ও বাবা, বলিস কি সব্বোনেশে কথা, ডাকাত, কোথাকার! দশ বিশ টাকা পায়ের পিছনে খরচ! আমি আট টাকার ধুতি পরি।

শোভারাম অপলকে খানিকক্ষণ চেয়ে থাকে নদীয়ার দিকে তারপর খুব ধীরে বলে—তোমার লাভের গুড় পিঁপড়ে খাবে নদীয়াদা। ফৌত হয়ে যাওয়ার আগে নিজের আত্মাটাকে একটু ঠান্ডা করো। খাও না, পরো না, ও কীরকম ধারা রুগি তুমি? দুনিয়ার কত কী আরামের জিনিস চমকাচ্ছে —তুমিই কেবল নিভে যাচ্ছ।

নদীয়া না-না করে। আবার জুতোটা তার বড্ড ভালোও লেগে গেছে। ফের ছাড়া জুতো পায়ে পরে দেখে। বড় বাহার। আরামও কম কি! সেই কবে ছেলেবেলায় বাবা জুতো কিনে দিত, তখন পরেছে, নিজে রোজগার করতে নেমে আর বাবুগিরি হয়নি। বলল—দশ টাকা যে বড্ড বেজায় দাম চাইছিস রে!

—দশ কী বলছ? বিশ টাকা না হয় পনেরোই দিয়ো। সে-ও মাগনাই হল প্রায়। নেহাত জুতোজোড়া আমার ছোট হয়, আর তোমারও ফিট করে গেল। নইলে এখনও বাজার ঘুরলে বিশ পঁচিশ টাকায় বেচতে পারি।

—বারো টাকা দেব। ওই শেষ কথা। যা, ও মাসে নিবি।

হ্যা-হ্যা করে হাসে শোভারাম। বলে—বারো? তার চেয়ে এমনিই নাও না। ভেলুরামের ব্যাটা অনেক টাকা দেখেছে, বুঝলে নদীয়াদা!

সবশেষে তেরো টাকায় রফা হল। তাতে অবশ্য শোভারামের এক তিলও ক্ষতি নেই। যত তাড়াতাড়ি মাল পাচার করা যায়। নইলে বাংলা সাবান কিনতে আসা দোকানদারটা বাজারময় হাল্লাচিল্লা ফেলে দেবে। নগদ তেরো টাকা নিয়ে শোভারাম অন্ধকারে সাঁত করে মিলিয়ে গেল।

নদীয়া জুতোজোড়া লুকিয়ে ফেলল চৌকির পাশের ছায়ায়। বলা যায় না, শোভারাম শালা চোরাই মাল যদি গছিয়ে দিয়ে থাকে তো ফ্যাসাদ হতে পারে। থাক একটু লুকনো, নদীয়ার পায়ে দেখলে কেউ আর পরে সন্দেহ করতে পারবে না। দোকানের কর্মচারীটা ওদিকে বসে আগুন পোহাচ্ছিল, সব শুনেছে কি না কে জানে। নদীয়ার কোনও কাজই তো সহজপথে হয় না। সবই যেন কেমন রাহুগ্রস্ত। তার মতো দুঃখী...নদীয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। আড়চোখে একবার জুতো জোড়া দেখে নেয়। মিটিমিটিয়ে হাসে। খুব দাঁও মারা গেছে। তবু তেরোটা টাকা...ভাবা যায় না। কর্মচারীটা আবার জুতো কেনার সাক্ষী থাকল না তো!

দুটো গেঁয়ো লোক এই সময়ে উত্তেজিতভাবে এসে দোকানে ঢুকল। রাজভোগ সিঙাড়া আর চায়ের অর্ডার দিয়ে খুব গরম স্বরে কথা বলতে লাগল। দুজনের একজনের জুতো চুরি গেছে ভেলুরামের গদি থেকে। তাই নিয়ে আলোচনা। যার জুতো চুরি গেছে তার পায়ে শোভারামের নোংরা টায়ারের চটিটা। কান খাড়া করে শুনছিল নদীয়া। যা ভেবেছিল তাই।

নদীয়ার মতো দুঃখী কমই আছে দুনিয়ায়। সে একটা শ্বাস ফেলে আড়চোখে জুতোজোড়া দেখে নিল। আছে।

শ্রীপতি সাড়ে সাতটায় উঠতে যাচ্ছিল, এ সময়ে দেখে, অন্ধকার ফুঁড়ে গরিলাটা গদিতে উঠে আসছে। বাইশ-তেইশ বছরের আই জোয়ান চেহারা, যেমন মাথায় উঁচু তেমনি পেল্লায় শরীর। এই হল তার ছাত্র খেলারাম।

চেহারা পেল্লায় হলে কী হবে, ইঁদুর যেমন বেড়ালকে ডরায় তেমনি মাস্টারজিকে ভয় পায় খেলা। মাস্টারজি সটাং-ফটাং ইংরিজি বোলি ছাড়ে। কষাকষ হিন্দি বলে, খেলা তার কিছু বোঝে না।

গরিলাটাকে দেখে ভারী বিরক্ত হয় শ্রীপতি। ঘড়ি দেখে বলে—মাই টাইম ইজ আপ খেলারাম। গুড নাইট।

গরিলাটা ভ্যাবলার মতো মুখ করে বলে—আজ্ঞে।

শ্রীপতি সন্দেহবশত বলে—কী বললাম বল তো।

খেলারাম গলার কম্ফর্টারটা খুলে ফেলে অসহায়ভাবে দাদুর দিকে তাকায়। ভেলুরাম গদির ওপর বসে ছানিপড়া চোখে নাতির দিকে ভ্রু কুঁচকে বলে—বল।

খেলারাম ঘামতে থাকে।

শ্রীপতি আনমনে বলে—কিছু হবে না।

গরিলাটার বাবা একটু আগে চোখের সামনে দিয়ে একজোড়া জুতো চুরি করে পালিয়ে গেল। একই তো রক্ত। মাথা নেড়ে শ্রীপতি বাজারে কুয়াশায় নেমে গেল। তার ভিতরে কত বিদ্যে গিজগিজ করছে, কাউকে দেওয়ার নেই।

আসতে-আসতেই শুনল, দাদু ফেলুরাম নাতি খেলারামকে খুব ডাঁটছে—কোথায় সারাটা দিন লেগেছিল চুহা কোথাকার! বীরপাড়া থেকে আসতে এত দেরি হয়! পঞ্চাশ টাকার মাস্টার বসে-বসে চলে গেল! জুতোচোরের ব্যাটা।

বাজারটা এখন নিঝুম কুয়াশায় মাখা, একটু খয়াটে জ্যোৎস্নাও উঠেছে। বাতাসে একটু আঁশটে গন্ধ পায় শ্রীপতি মেছোবাজার পেরোবার সময়ে। তখনও কিছু লোক নদীর টাটকা মাছ নিয়ে বেচবার জন্য বসে আছে কুপি জ্বালিয়ে। এইসব লোকেরা শেলি কিটস পড়েনি, শেক্সপিয়রের নামও জানে না। ডাস ক্যাপিটাল কিংবা রবি ঠাকুর কী বস্তু তা জানা নেই। আশ্চর্য তবু বেশ বেঁচে-বর্তে আছে। তবে কি ওসবই জীবনের বাহুল্য শৌখিনতা মাত্র। না হলেও চলে? সত্য বটে একবার একজন অধ্যাপক শ্রীপতিকে বলেছিলেন—ইনফর্মেশন মানেই কিন্তু জ্ঞান নয়। যে লোকটা টকাটক নানা ইনফর্মেশন দিতে পারে তাকেই জ্ঞানী মনে কোরো না, যার উপলব্ধি নেই, দর্শন নেই, সে বিদ্যের বোঝা বয় বলদের মতো।

উপলব্ধির ব্যাপারটায় একটু কোথায় খাঁকতি আছে শ্রীপতির, এটা সে নিজেও টের পায়। এই যে গঞ্জের পরিবেশ, ওই ম্লান একটু কুয়াশামাখা জ্যোৎস্না, কিংবা ফকিরচাঁদের ঢিবিতে একা শিরীষের যে সৌন্দর্য এসব থেকে সে কোনও মানসাঙ্ক কষতে পারে না। বাইরের জগৎটা থেকে সে রস আহরণ করতে পারে না বটে মৌমাছির মতো, তবে সে বইয়ের জগতের তালেবর লোক। বিস্তর পড়াশোনা তার। তাকে টেক্কা দেওয়ার মতো কেউ জন্মায়নি এখানে। লোকে তাকে ভয়ও খায়। তবু কি একটা খাঁকতি থেকে যাচ্ছে। সে কি ওই উপলব্ধি বা দর্শনের?

বাজার পার হয়ে নিরিবিলি ফাঁকা জায়গা দেখে সে দাঁড়িয়ে পড়ল। না, একটু উপলব্ধির ব্যায়াম করা দরকার। সে জেদ ধরে দাঁড়িয়ে গোঁয়ারের মতো চারধারের জ্যোৎস্নামাখা শীতার্ত প্রকৃতি থেকে সেই উপলব্ধির গন্ধ পাওয়ার চেষ্টা করল।

হচ্ছে না। মনের পরদায় কিছুই ভেসে ওঠে না যে!

পাঁচ-সাতটা লোক হাল্লা-চিল্লা করতে-করতে কাছে এসে পড়ল। সবক'টা মাতাল। শ্রীপতি কিছু বুঝবার আগেই দলটা থেকে খেলারামের বাপ দৌড়ে এসে পায়ের ওপর হুমকি খেয়ে পড়ে বলতে লাগল—রাম রাম মাস্টারজি, আমার খেলারামকে জুতো চুরির ব্যাপারটা বলবেন না। বাপকে তাহলে নীচু-নজরে দেখবে খেলারাম। অনেক পড়িলিখিওয়ালা ব্যাটা আমার, আমি মুখ্যুর ঢিবি—

—আহা, ছাড়ো ছাড়ো! বলে শ্রীপতি পা টেনে পিছিয়ে আসে।

বাতাস দূষিত করে মদের গন্ধ ছাড়তে-ছাড়তে দাঁড়িয়ে উঠে শোভারাম বলে—এভাবে বাঁচা যায় মাস্টারজি? আমার বাপকে আর খেলারামকে একটু বলবেন, আমি সাফ-সুতেরো হয়ে গেছি। ভালো লোকের মতো থাকব, যদি আমাকে ফিরিয়ে নেয়।

নাকে রুমাল চেপে শ্রীপতি ঘাড় নাড়ল। পৃথিবীটা বড়ই পচা। দুর্গন্ধময়। এই পৃথিবী থেকে উপলব্ধি বা দর্শনের কিছু ছেঁকে নেওয়ার নেই। পুথিপত্রের মধ্যেই রয়েছে আশ্চর্য সুন্দর জগৎ।

লোকগুলো কোদাল গাঁইতি নিয়ে কোথায় যেন যাচ্ছে। যাওয়ার সময়ে শোভারাম হাতজোড় করে বলল—আশীর্বাদ করবেন মাস্টারজি। ফকিরচাঁদের ঢিবি খুঁড়তে যাচ্ছি আমরা, যেন কিছু পাই।

গম্ভীরভাবে শ্রীপতি বলে—হুঁ।

আজ পর্যন্ত বিস্তর হাঘরে ফকিরচাঁদের ঢিবিতে খোঁড়াখুঁড়ি করেছে। সকলেরই আশা, সাতঘড়া মোহর আর বিস্তর হিরে-জহরত একদিন ওখান থেকে বেরোবেই। পেল্লায় ঢিবি, খুঁড়ে শেষ হয় না। আজ পর্যন্ত সাপ-ব্যাং আর ইট-পাথর ছাড়া কিছুই বেরোয়নি। তবু অভাব পড়লেই কিছু লোক গিয়ে ঢিবিটা খুঁড়তে লেগে যায়।

নদীয়াকুমার তার দুঃখের কথা ভাবতে-ভাবতে দোকানের ঝাঁপ ফেলে ফিরছিল। নতুন জুতোজোড়া পুরোনো খবরের কাগজে জড়িয়ে র‍্যাপারের তলায় বগলসাই করে নিয়েছে। পায়ের পুরোনো হাওয়াই চটাস-পটাস শব্দ করে বোধহয় নদীয়াকেই গালমন্দ করছিল। করবেই। সময় খারাপ পড়লে সবাই করে ওরকম।

খুব একটা সাদাটে ভাব চারদিকে। কুয়াশায় জ্যোৎস্নায় যেন দুধে-মুড়িতে মাখামাখি হয়ে আছে। পাকা মর্তমানের মতো চাঁদ ঝুলছে আকাশে। পায়ের ফাটা জায়গাগুলোতে শীত সেঁধোচ্ছে। ভালো করে তুষের চাদরটায় মাথামুখ ঢেকে হাঁটছিল নদীয়াকুমার। চৌপথীর কাছে বাড়ি, মাঝপথে ফকিরচাঁদের ঢিবিতে কারা যেন গোপনে কীসব করছে। দু-চারটে ছায়াছায়া লোকজন দেখা গেল নদীয়া কদমের জোর বাড়ায়। কোমরের গেঁজেতে

বিক্রিবাটার টাকা রয়েছে। দিনকাল ভালো নয়। কপালটাও খারাপ যাচ্ছে। কেবল মাঝে-মাঝে নতুন জুতো জোড়ার কথা ভেবে এত দুঃখেও ফুক ফাক করে সখের হাসি হেসে ফেলছে নদীয়া। বেশ হয়েছে জুতোজোড়া। দিনদশ বাদ দিয়ে পরবে। চোরাই জুতো এর মধ্যে যদি খোঁজখবর হয় তো গেল তেরোটা টাকা। দামটা বেশিই পড়ে গেল। তবু জুতো একজোড়া দরকার। ভেলুরাম বলছিল বটে, বউকে জুতোতে হলেও তো একজোড়া জুতো লাগে। ছেঁড়া হাওয়াই চটি দিয়ে কি আর জুতোনো যায়?

বাড়ির দরজায় পৌঁছে ভয়ে আঁতকে ওঠে নদীয়াকুমার। কে একটা মেয়েছেলে ঘোমটা ঢেকে দাঁড়িয়ে আছে উঠোনের জবা গাছটার তলায়। মেয়েছেলে, নাকি ভূত-প্রেত। তার বাড়িতে আবার মেয়েছেলে কে আসবে?

নদীয়া বলল—রাম রাম, কে?

—আমি।

নদীয়া ফের আঁতকে উঠে বলে—কে আমি?

—আহা। বলে মেয়েছেলেটা এগিয়ে আসে তার কাছে। মুখে জ্যোৎস্না পড়েছে, ঊর্ধ্বমুখে তার পানে তাকাতেই ঘোমটা খসে গেল। পুরুষমানুষের মতো চুলওয়ালা মাথাটা বেরিয়ে পড়ল।

'আঁ, আঁ' করে ওঠে নদীয়াকুমার। এ যে মন্দাকিনী!

—তোমার এই সাজ? ভারী অবাক হয় নদীয়া।

মন্দাকিনী জ্যোৎস্নায় চোখের বিদ্যুৎ খেলিয়ে বলে—কেন, আমি মেয়েমানুষ সাজলে তোমার খুব অসুবিধে হয় বুঝি! সদরের কোন ডাইনিকে পছন্দ করে এসেছ, তাকে বৈশাখে ঘরে এনে ঘটস্থাপনা করবে—তাতে বুঝি ছাই দিলাম। ঝ্যাটা মারি—

এইসব বলতে-বলতে মন্দাকিনী প্রায় নদীয়ার জামাকাপড় ছিঁড়ে ফেলে আর কি টেনে হিঁচড়ে। কিন্তু তাতে নদীয়া কিছু মনে করে না। কপালটা কি তবে ফিরল! নতুন জুতো! বউ!

গহিন রাতে মন্দাকিনী শান্ত হয়ে কাঁদতে বসল। তার আগে পর্যন্ত বিস্তর বাসন আছড়ে, বিছানা ছুড়ে, জামাকাপড় ফেলে রাগ দেখিয়েছে। নদীয়া খুব আহ্লাদের সঙ্গে দেখেছে। বছরটাক আগে তো এরকমই ছিল মন্দাকিনী। এই রকমই অশান্তি করত।

মন্দাকিনী কাঁদছে দেখে নদীয়া বলে—কাঁদো কেন? ঝাল তো অনেক ঝাড়লে। আমি বড় দুঃখী লোক, কেঁদো না।

মন্দাকিনী জলভরা চোখে কটাক্ষ হেনে বলে—আমি এখন চুল পাব কোথায়! কত লম্বা চুল ছিল আমার। তুমি কি এখন আর আমাকে ভালোবাসবে চুল ছাড়া!

—দূর মাগি! নদীয়া আদর করে বলে—চুলে কী যায় আসে!

ভোর রাত পর্যন্ত সাত মাতালে ঢিবি খুঁড়ে পেল্লায় হাঁ বের করে ফেলেছে। শেষপর্যন্ত অবশ্য কার কোদাল যেন ঠং করে লাগল পেতলের কলসি বা ঘড়ার গায়ে। দ্বিগুণ উদ্যমে সবাই খুঁড়তে লাগে আরও। হ্যাঁ, সকলের কোদালেই ঠনাঠন ধাতুখণ্ডের আওয়াজ বেরোচ্ছে। জয় মা কালী। জয় মা দুর্গা। জয় দুর্গতিনাশিনী!

সাত মাতালের বুকের ভিতরে জ্যোৎস্নার ভাসাভাসি। সাত মাতাল এলোপাথাড়ি কোদাল, গাঁইতি আর শাবল চালিয়ে যেতে লাগল। ভোর হতে আর দেরি নেই। শোভারাম আর তার স্যাঙাতদের রাতও বুঝি কেটে গেল।

বেরোচ্ছে। বেরোচ্ছে। অল্প-অল্প মাটি সরে, আর বস্তুটা বেরোয়। কী এটা? অন্ধকারে ঠিক ঠাহর হয় না। তবে ঘড়া বা কলসি নয়, তার চেয়ে ঢের-ঢের বড় জিনিস। ফকিরচাঁদের বসত বাড়িটা নাকি?

খোঁড়খুঁড়ি চলতেই থাকে। হাতে ফোসকা, গায়ে এই শীতেও সপসপে ঘাম। কেউ জিরোতে চাইছে না। নেশা কেটে গিয়ে অন্যরকম নেশা ধরে গেছে।

ভোরের আবছা আলোয় অবশেষে বস্তুটা দেখা গেল স্পষ্ট। সাত মাতাল চারধারে ঘিরে দাঁড়িয়ে দেখে—একটা কবেকার পুরোনো রেলের মালগাড়ির পাঁজর আধখানা জেগে আছে মাটির ওপর; কবে বুঝি ডিরেইলড হয়ে পড়েছিল এইখানে। জংধরা লোহা হলদে রং ধরেছে।

কেউ কোনও কথা বলল না। হেদিয়ে পড়েছে।

খুব ভোরে খেলারামকে তুলে পড়তে বসিয়েছে ভেলুরাম!

খেলা দুলে-দুলে ইংরিজি পড়ছে।

গদির পাশ দিয়ে হা-ক্লান্ত, মাটিমাখা সাত মাতাল ফিরে যাচ্ছে; তাদের মধ্যে একজন শোভারাম, একটু দাঁড়িয়ে খেলারামের ইংরিজি পড়া শুনল। খুব জোর পড়ছে খেলা! ব্যাটা

বোধহয় ভদ্রলোক হবে একটা! ভেবে এত দুঃখের মধ্যেও ফিক করে একটু হেসে ফেলল শোভারাম।

হারানো জিনিস

নস্যির কৌটোটা কোথায় যে রাখলেন সুধন্য, কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছেন না। নাক দিয়ে জল আসছে, সুড়সুড় করছে, ভারী অস্বস্তি। সম্ভব অসম্ভব সব জায়গাতেই খুঁজেছেন। দু-একবার মিনমিন করে বউ হেমন্তবালাকেও জিগ্যেস করেছেন, জবাব পাওয়া যায়নি। হেমন্তবালা রেগে আছেন, ছোট মেয়ে বুঁচি পুরোনো তেঁতুলের শেষ একটা ডেলাও চুরি করে নিয়ে গেছে। পুরোনো তেঁতুলের একটা মাখা করতে গিয়ে হেমন্তবালা ডেলাটুকু বের করে ধনেপাতা, গুড়, লংকা সব গুছিয়ে রেখেছিলেন। পুরোনো তেঁতুলের এই মাখাটা তাঁর বড় প্রিয়। সবই পড়ে আছে। ধনেপাতা, লংকা, গুড়, কেবল তেঁতুলটুকুই নেই। একটু আগে ফ্রকের কোঁচড় ভরে মুড়ি নিয়ে গেল রান্নাঘর থেকে ওই হতচ্ছাড়া মেয়েটা। ওরই কাজ। সেই থেকে হেমন্তবালা কারও কথার উত্তর দিচ্ছেন না।

সুধন্যও তেমন সাহস পাচ্ছেন না বেশি জিজ্ঞাসাবাদ করতে। যৌবনকালটা এই নস্যি নিয়ে বড় অশান্তি গেছে।

ফুলশয্যার রাতে বউয়ের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের প্রাক্কালে সুধন্য এক টিপ প্রচণ্ড নস্যি নিয়ে স্নায়ু ঠিক রাখার চেষ্টা করেছিলেন। নতুন বউ হেমন্তবালা প্রথম কাছে এসে খুব অবাক হয়ে বলল, তুমি নস্যি নাও?

লজ্জিত সুধন্য বললেন, নিই মাঝে-মাঝে।

—এ মা গো। নোংরা জিনিস। সিগারেট খেতে পারো না?

সুধন্য নিভে গিয়েছিলেন। নতুন বউ নস্যি ঘেন্না পায়, কিন্তু তিনি করেন কী! ইস্কুলের নীচু ক্লাস থেকে নেশা—ছাড়ানোও যায় না।

তবু নতুন বউয়ের ঘেন্না দেখে বিয়ের পর-পর নস্যি ছেড়ে সিগারেট ধরেন। কিন্তু তাতে চোখে জল আসে, গলা খুসখুস করে। নেশা আসে না। উপরন্তু নস্যির অভাবে সারাদিন নাকে জল আসে, হাঁচি আসে, মাথাটা ঘোলাটে লাগে। এক টিপ নস্যির জন্য প্রাণ আনচান করে।

হেমন্তবালা বলতেন, নস্যি নেওয়া পুরুষ বড় বিশ্রী।

সুধন্যর বিশ্রী হওয়ার ইচ্ছে ছিল না। তবু পুরুষকার দিয়ে নস্যির ওপর জয়ী হওয়া যায়নি। তাঁর অবস্থা দেখে অবশেষে তাঁর মা তাঁকে ডেকে বলেন, বাবা, নস্যি না নিলে তুই কি বাঁচবি? সারাদিন তোর মুখচোখ কেমনধারা জলেডোবা মানুষের মতো দেখায় যে! নতুন বউ রাগ করে তো করুক, মেয়েরা বড় ট্যাটন হয়। ওসব মন বুঝে অত চলতে নেই। পেয়ে বসবে। তুই পুরুষ, পুরুষের মতো হ। নস্যি ধর আবার, নইলে শরীর পাত হয়ে যাবে। নেশা কি সহজে ছাড়া যায়?

মায়ের আদেশে সুধন্য আবার নস্যি ধরেন। নস্যি ধরে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন বটে, কিন্তু হেমন্তবালা এক সপ্তাহ কথা বললেন না। তারপর যখন বললেন সেই কথাও আগ্নেয়গিরির মুখ থেকে বেরিয়ে আসা লাভা ছাড়া কিছু নয়। তবু সুধন্য যেমন নস্যি ছাড়তে পারলেন না, তেমনি হেমন্তবালাও স্বামীকে ছাড়তে পারলেন না। তবে নস্যি তাদের বিবাহিত জীবনের একটা স্থায়ী অশান্তির কারণ হয়ে রইল। পরে হেমন্তবালা সুধন্যর নস্যির ন্যাকড়াও কেচে দিয়েছেন, তবু এই বুড়ো বয়সেও সুধন্যকে নস্যির জন্য কথা শুনতে হয়। রাগ হলে হেমন্তবালা এখনও সুধন্যর নস্যির কৌটো বাইরে ছুড়ে ফেলে দেন। কতবার নতুন ডিবে কিনতে হয়েছে।

আজ সকালেও নস্যি নিয়েছেন বেশ কয়েকবার। আজকাল কিছু বেশি নেন। সম্প্রতি চাকরি থেকে অবসর পেয়েছেন, হাতে কাজ নেই, ফালতু দিন, ফালতু সব সময়। এত ছুটি কাটাবেন কী করে তাই ভাবতে-ভাবতে টিপের-পর-টিপ নস্যি নিয়ে নেন। হিতাকাঙ্ক্ষীরা বলে—কপালে নস্যি জমে নাকি মানুষ মরে যায়!

সুধন্য ভাবেন—তা হবে। সিগারেট, তামাকপাতায় ক্যানসার হয়। মদে লিভার সিরোসিস হয়। আফিং খেলেও কিছু-না-কিছু হয়। নেশা করলে ওসব তো আছেই।

নস্যির কৌটোটা খুঁজে না পেয়ে খুবই অস্বস্তি হচ্ছিল। বিছানার তোশক উলটে দেখলেন, খাটের তলা খুঁজলেন, তাকটাকগুলো সবই খুঁজলেন। কোথাও নেই। একটা জীবন ধরে নিজের একটু বাড়ি করতে পেরেছেন তিনি। মফসসল শহর বলে জমির দাম বেশি লাগেনি, চুন-সুরকির গাঁথুনি দেওয়ার খরচ কমই হয়েছে। দু-খানা মাত্র ঘর

মাঝখানে একটু উঠোন, ওধারে রান্না আর স্নান ইত্যাদির ঘর। কিছুই না। তবু খুব কষ্ট গেছে এটুকু করতেই। দেওয়াল ওঠে তো ছাদ হয় না, ছাদ হল তো পলেস্তারা বাকি থাকল, সেটা করলেন তো বারান্দা সিমেন্ট করা বাকি থাকল। সে একটা লড়াই গেছে। লড়াই যখন শেষ হয়েছে তখন বয়সও শেষ। বাড়ি ভোগ করার বাকি আর অল্প দিনই। তবু একটু তৃপ্তি, শেষ তো হল। সারা জীবনে 'নিজের বাড়ি' বলে বলার মতো কিছু তো হল।

অন্যমনস্কভাবে ডিবেটা খুঁজতে-খুঁজতে বাইরের দিককার ঘরটায় এলেন। জোড়া বিছানায় বুঁচি আর তার দিদি শেফালি শোয়। দুটোই মেয়ে সুধন্যর। বেশি বয়সে বেশ পরপর দুটো মেয়ে হল। বিয়ে দেওয়ার সময় পাওয়া যাবে কি? বড় মেয়ে শেফালির বিশ বছর বয়স চলছে, বুঁচির মোটে বারো। শেফালির জন্য তোড়জোড় করতে হয়। হাত খালি বলে তেমন উৎসাহ পান না। মেয়ে তেমন সুন্দর নয়, যদিও খুবই আদরের।

এ-ঘরটায় পড়ার টেবিল রয়েছে কেরোসিন কাঠের। সস্তা আলনা, বইয়ের র‍্যাক। এসো-জন বোসো-জনের জন্য কয়েকখানা টিনের চেয়ার। তাতে শেফালি আর হেমন্তবালার নিজেদের হাতে কাজ করা সব ঢাকনা। দেওয়ালে রবি ঠাকুর আর বালগোপালের ছবি। পড়ার টেবিলের ওপর একটা সস্তা ট্র্যানজিস্টার রেডিও, নেভানো হারিকেন, ছড়ানো বইপত্র। সবই হাতড়ে দেখেছেন সুধন্য, তবু আর-একবার দেখলেন। হারিকেনের তলায় নস্যির ডিবে থাকার কথা নয়। তবু সন্দেহ থাকে কেন ভেবে সুধন্য হারিকেনের তলাও দেখলেন।

নাকটা সুড়সুড় করছে, জল আসছে। দীর্ঘ চল্লিশ বছরেরও বেশি কালের নেশা। নস্যি না হলে পাগল-পাগল লাগে।

দেওয়ালের পেরেকে একটা লাল ভ্যানিটি ব্যাগ ঝুলছে। শেফালির। আজকাল গরিবের মেয়েদেরও এসব থাকে—ভ্যানিটি ব্যাগ, লিপস্টিক, ঘড়ি। তাঁর মেয়েরও আছে। একটা জীবন ধরে ল্যান্ড সেটেলমেন্ট অফিসের কেরানি ছিলেন, বুড়ো বয়সে রিটায়ারমেন্টের আগে কিছুদিনের জন্য বড়বাবু হয়েছিলেন। কিন্তু নিজেরই পুরোনো অফিসের বড়বাবু হওয়ায় পুরোনো সহকর্মীরা তেমন মানসম্মান করত না, মানতও না খুব একটা। তবু বড়বাবু হয়েছিলেন। কিন্তু গা থেকে গরিব-গরিব গন্ধটা আর গেল না। নস্যির গুঁড়োর মতো লেগে রইল গায়ে। কিন্তু মেয়ে-বউকে কষ্ট দেননি তেমন। যথাসাধ্য অভাব মিটিয়ে গেছেন। যতদিন মা বেঁচেছিলেন ততদিন মাকেও সুখেই রেখেছেন। ধকল যা কিছু নিজের ওপর দিয়ে গেছে।

সেটেলমেন্ট অফিসের লোকদের কিছু উপরি আয় থাকে। সে তেমন কিছু নয়। সুধন্যরও ছিল। এ-বাড়ির গাঁথুনিতে সবই গাঁথা হয়ে গেছে। হাতে তেমন কিছু নেই।

ভ্যানিটি ব্যাগের মধ্যে ডিবেটার যাওয়ার কথা নয়। তবু তিনি শেফালির ব্যাগটা পেরেক থেকে নামিয়ে আনলেন। কিন্তু খুলতে পারছিলেন না। এ সময়টায় শেফালি তার কোন বান্ধবীর বাড়িতে পড়া বুঝতে যায়। পার্ট টু পরীক্ষা দিচ্ছে এবার। ধারেকাছে কেউ নেই। ব্যাগটার মুখ এমন হাঁসকল দিয়ে লাগানো যে নানা রকম টিপ আর চাপ দিয়েও অনেকক্ষণ খুলতে পারলেন না।

তারপর হড়াক করে টান দিতেই সহজে খুলে গেল। ভিতরে বেশি কিছু নেই। কয়েকটা খুচরো পয়সা, লিপস্টিক আর খুদে গোল আয়না, কলেজের মাইনের রসিদ বই, পেন, ভুরু আঁকার পেনসিল, একজোড়া গগলস। ডিবেটা নেই। কলেজের মাইনের রসিদ-বইটার ভিতর থেকে একটা ভাঁজ করা চিঠি বেরিয়ে আছে।

আজকাল সময় কাটে না। তাই চিঠিটা দেখে খুশি হলেন সুধন্য। মেয়ে চিঠিপত্র পাচ্ছে তাহলে! দেখতে ভালো নয় মেয়েটা, চিঠি পাওয়াটা সুলক্ষণ। ছেলেটা যদি জাতের হয় তো বরং উৎসাহই দেবেন!

চিঠিটা খুলে চশমা এঁটে দেখে একটু হতাশ হলেন। প্রেমপত্র নয়। আবার নয়ও বলা যায় না। অমল নামে একটা ছেলের চিঠি। সে পলাশি ছেড়ে কলকাতায় চলে গেছে। সেখান থেকে পলাশির জন্য মন-কেমন-করা চিঠিতে নানা জনের খবর জানতে চেয়েছে। কেষ্টনগর কলেজে একসঙ্গে পড়ত বোধ হয় একসময়ে। চিঠির শেষে 'ভালোবাসা'র বদলে 'প্রীতি ও শুভেচ্ছা' জানিয়েছে। নীরস চিঠি। বানান ভুলও অনেক চোখে পড়ে। বাঙাল ছেলে বোধহয়। 'বাড়ি বানান 'বারি' লিখেছে।

যথাস্থানে চিঠিটা রেখে দিলেন। ডিবেটা পাওয়া গেল না। কোথায় যে নিজেই রাখলেন, বা হেমন্তবালা ফেলে দিলেন—তা বোঝা যাচ্ছে না। আবার নতুন ডিবে আর নস্যি কিনতে বাজার পর্যন্ত ধাওয়া করা বড় ঝামেলার ব্যাপার।

পলাশিতে বাড়ি করাটাই কি ভুল হয়েছিল? এ অঞ্চলটা আসল পলাশি নয়, এর নাম মীরবাজার, আসল পলাশি অনেকটা দূর, সেখানে চিনিকল হয়েছে, আশেপাশে আখের চাষ হয়। সিরাজদ্দৌল্লার যুদ্ধক্ষেত্র এখন মাঠ জঙ্গল পড়ে আছে। সে আমবাগানও নেই। তবু পলাশি নামটা বড় বেশি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। কিন্তু স্টেশনের কাছে এই মীরবাজারও সেই আদ্যিকালে পড়ে আছে। কলকাতা চার ঘণ্টার পথ লালগোলা প্যাসেঞ্জারে। কেষ্টনগর না গেলে ভালো জিনিস পাওয়া মুশকিল। কলেজও কেষ্টনগরে। সেখানেই চাকরি করতেন

সুধন্য। ত্রিশ টাকায় ঘর ভাড়া করে থাকতেন। তারপর বন্ধু সুধীর বাঁড়ুজ্যের পাল্লায় পড়ে মীরবাজারে বাড়ির জন্য জমি কিনলেন। কোনও মানে হয় না। কতগুলো টাকা বাড়িটায় আটকে রইল। কেউ-কেউ পরামর্শ দিয়েছিল আরও ক'খানা ঘর তুলে ভাড়া দিতে। সেটা করেননি ভালোই করেছেন। কারণ ভাড়া নেওয়ার লোক জুটত না। মীরবাজারে কে আর থাকতে আসবে? তাই ভাবেন বাড়িটা করাই ভুল হয়েছিল। ত্রিশ টাকা করে বছরে তিনশো ষাট টাকা টেনে গেলেও হাতের পাত্রে কিছু থাকত, শেফালির বিয়েটা দিতে পারতেন; বুঁচিরও একটা গতি হত।

বুঁচি কোথায় খেলতে গিয়েছিল। সারাদিনই পাড়া বেড়ায়, ঘেমো শরীর নিয়ে হাঁসফাঁস করতে-করতে দৌড়ে ঘরে এল। বিছানার তোশক থেকে একটা ন্যাকড়ার পুতুল বের করে নিয়ে চলে যাচ্ছিল, হেমন্তবালা তক্কে ছিলেন, উঠে এসে ডাকলেন—বুঁচি?

বুঁচি দৌড়।

হেমন্তবালার হাতে একটা বেলনা। সেইটে বাগিয়ে নিয়ে তিনিও দৌড়ে বেরোলেন।

—বুঁচি-ই!

সুধন্যর সময় কাটে না।

তিনিও দৌড় প্রতিযোগিতা দেখতে বাইরে বেরিয়ে এলেন। খুবই চমৎকার দৌড় হচ্ছে। বুঁচি হরিণের মতো দৌড়োয় বটে, কিন্তু হেমন্তবালাও যে এ-বয়সে এত জোর ছুটতে পারেন তা সুধন্যর জানা ছিল না।

সামনের একটু মাঠ মতো, তারপর রাস্তা। বুঁচি রাস্তায় উঠে গিয়েও রেহাই পায়নি। হেমন্তবালা শাড়ি সামলে চমৎকার দ্রুতবেগে বুঁচির চার হাতের মধ্যে চলে গেছেন।

বুঁচি একবার পিছু ফিরে চেয়ে এত অবাক যে প্রায় ধরা পড়ে গিয়েছিল আর কি? একেবারে এক চুলের জন্য বেঁচে গেল। 'উ মা গো!' বলে আবার ঊর্ধ্বশ্বাসে বুঁচি দৌড়ে নাগালের বাইরে চলে গেল।

হেমন্তবালা কদমগাছটার তলায় দাঁড়িয়ে হাঁফাচ্ছেন।

কষ্ট হয় সুধন্যর।

হেমন্তবালা করুণ সুরে চেঁচিয়ে বললেন, বুঁচি!

বুঁচি দূরে দাঁড়িয়ে হি-হি করে হাসে।

হেমন্তবালা প্রায় কান্নার মতো স্বরে বলেন, বুঁচি রে, তোর ধর্ম কি এই বলে? অ্যাঁ? তোর ধর্ম তোকে এই বলে?

কী করুণ আবেদন! শুনে সুধন্যরও মায়া হয়।

কিন্তু হেমন্তবালার গলার স্বর হঠাৎ বদলে গেল। হাতের বেলনাটা তুলে পুলিশের মতো আস্ফালন করে চিৎকারে পাড়া মাত করে কর্কশ স্বরে বলতে থাকেন, আসিস আজকে। ভাতের পাতে ছাই বেড়ে দেব। খাবি না বুঁচি, অ্যাঁ? খেতে আসবি না? তখন দেখিস।

এই বলে হেমন্তবালা ফিরে আসছিলেন।

এ সময়টায় মুখোমুখি হওয়া ভালো নয়। অভিজ্ঞতাবলে সুধন্য জানেন, মেয়েদের ওপর রাগ করলে হেমন্তবালা আবার সুধন্যর ওপরেও অকারণে চটে যান।

সুধন্য ঘরের পিছনদিকে গা ঢাকা দিয়ে রইলেন একটু।

হেমন্তবালা যখন উঠোন পার হয়ে রান্নাঘরে যাচ্ছেন, তখনই সুধন্য দেখলেন চোর একটা বেড়াল দুটো খয়রা মাছ মুখে নিয়ে জবা গাছটার তলায় গিয়ে বসল। সুধন্য বড় ব্যথিত হলেন। সপ্তাহে তিনদিন মাছ হয়। একপো খয়রা মাছ কিনতে আজ তাঁকে দুটো টাকা নগদ দিতে হয়েছে। তার দুটো ওই গেল বেড়ালের পেটে।

বেড়ালটাকে তেড়ে গেলেন না সুধন্য। গিয়ে লাভ কী? বেড়ালের মুখের মাছ তো হেমন্তবালা আর হেঁশেলে তুলবে না, খাচ্ছে খাক।

হেমন্তবালার চিৎকার শোনা গেল একটু বাদেই, চোখের পলকে দু-দুটো মাছ হাওয়া হয়ে গেল। বুঁচির বাপ কি একটু চোখে-চোখেও রাখতে পারে না বাড়িঘর, না কি! কোথায় গেল লোকটা, অ্যাঁ?

নস্যির ডিবেটা এখনও পাওয়া যায়নি। সুধন্যর খুব অস্বস্তি হচ্ছে। বুঁচিটা বাড়ি ফিরলে ওর মায়ের হাতে আজ খুব পেটান খাবে।

দুপুরের কলকাতা যাওয়ার ট্রেনটা এসে স্টেশনে ঢুকল। সামনের মাঠ ভেঙে দুজন ধুতিপরা লোক গাড়ি ধরতে দৌড়োচ্ছে। চমৎকার দৌড়, কিছুক্ষণ চেয়ে থাকেন সুধন্য। পাবে কি? না, পাবে। স্টেশনের হাতায় প্রায় পৌঁছে গেছে। ঘন্টি বাজল, গার্ড হুইশল দিল, ইঞ্জিন কু দিল, সব নিয়ম মাফিক। ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছেন, ঠিক একইভাবে ট্রেন ছাড়ে। লোক দুটোর একজন সিগন্যালের তারে হোঁচট খেয়ে পড়তে-পড়তে সামলে গেল। সুধন্য হাঁ করে চেয়ে আছেন।

শেফালির গলা পেলেন—বাবা!

উত্তর দিলেন না, দেখছেন। না, পেয়ে গেল। ওই প্রথম লোকটা উঠে পড়েছে কামরায়। উঠে হাত ঝুলিয়ে দ্বিতীয় লোকটাকে চলন্ত গাড়িতে তুলে নিল টেনে।

বাঁচা গেল।

—বাবা! হাঁ করে দেখছ কী?

—উঁ!

মনটা ভালো নেই। কেন যে বুঁচিটা তেঁতুল চুরি করতে গেল! আজ দুপুরে খাওয়ার সময়ে ফিরে এলে খুব মার খাবে মেয়েটা। ছোট মেয়েটা যতই দামাল দুষ্টু হোক, ওর কান্না শুনলে সুধন্যর বুকটা কেমন করে যেন। ওটার ওপর তাঁর বড্ড মায়া। ছোট মেয়েটা।

—কী দেখছিলে? শেফালি জিগ্যেস করে ফের।

—দুটো লোক দৌড়ে ট্রেন ধরল, তাই দেখলাম। আজকাল আর দেখার আছেটা কী? যা চোখে পড়ে দেখি।

শেফালি এমনিতে শান্ত মেয়ে। কিন্তু খুব জেদি। রাগিও। তা ছাড়া বাপকে বাপ বলে বিশেষ গ্রাহ্য করে না। বেশি আদর দিলে যা হয়। যারা আদর দেয় তাদের ওজন কমে যায় এদের কাছে।

শেফালি বিরক্ত হয়ে বলল—শোনো, আমাদের বায়োসায়েন্স থেকে মহারাষ্ট্রে পাঠাচ্ছে স্পেসিমেন কালেকশনে। প্রায় কুড়িজনের টিম যাবে।

—ও।

—কলেজ একটা গ্র্যান্ট দিচ্ছে, যাতায়াতের ভাড়া ওরাই দেবে। থাকাখাওয়ার খরচ আমাদের। পার হেড দেড়শো টাকার মতো লাগবে।

—ও।

আমাকে সিলেক্ট করেছে।

সুধন্য চুপ করে থাকেন, শোনেন হেমন্তবালা বেড়ালের চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করছেন, সেই সঙ্গে বুঁচি আর সুধন্যকেও।

—টাকাটা দেবে বাবা?

—টাকা!

—টাকা মোটে দেড়শো। আচ্ছা, না হয় তুমি আরও কম দিও। একশোতেই আমি চালিয়ে নেব। একটা জায়গায় ঘোরাও হবে।

সুধন্য শ্বাস ফেলেন। দেবেন বইকী! না দিয়ে যাবেন কোথায়! বরাবর দিয়ে আসছেন।

বুঁচিটা বড্ড মার খাবে আজ। বেড়ালটা দুটো মাছ নিয়ে গেল, মোট পাঁচটার মধ্যে দুটো। শেফালি একশো টাকার ধাক্কায় ফেলে দিল। বাড়িটায় কত টাকা আটকে আছে। ছেলেও নেই যে ভোগ করবে। কী লম্বা ছুটি চলছে রে বাবা!

নস্যির ডিবেটা কখন কীভাবে হাতে এসে গেল কে জানে! ঠিক ম্যাজিশিয়ানের মতো, কোথাও কিছু না, হঠাৎ হাতে চেয়ে দেখেন, নস্যির ডিবেটা হাসছে।

বড় খুশি হন সুধন্য। ভগবান মঙ্গলময়। সুধন্য পৃথিবী ভুলে নস্যির ডিবের মুখে টোকা মারেন। খুব জোর একটা টিপ নেবেন।

অনুভব

সামনের বারান্দায় বসে খবরের কাগজ পড়তে পড়তেই হৃদয়ের সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়জ অনুভূতি কাজ করল। কাগজটা মুখ থেকে সরিয়ে দোতলার বারান্দা থেকে নীচের মাঝারি চওড়া রাস্তার দিকে চেয়ে সে দেখল তার ছেলে মনীশ, নাতি অঞ্জন আর পুত্রবধূ শিমুল আসছে। দৃশ্যটি এই শরতের মেঘভাঙা উজ্জ্বল সোনালি রোদে ভারী চমৎকার দেখাচ্ছে। মনীশের পরনে গাঢ় বাদামি রঙের চৌখুপিওলা ঝকঝকে পাতলুম, গায়ে হালকা গোলাপি জলছাপওলা হাওয়াই শার্ট। লম্বাটে গড়নের, ফরসা ও মোটামুটি স্বাস্থ্যবান মনীশকে বেশ তাজা ও খুশি দেখাচ্ছে। রাতে নিশ্চয়ই খুব ভালো ঘুমিয়েছে, স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া হয়নি এবং হাতে কিছু বাড়তি টাকা আছে। নাতির পরনে নীল চৌখুপি এবং ডোনাল্ড ডাকওলা বাবা সুট, শিমুলের শ্যামলা ছিপছিপে শরীরে আঁট হয়ে পেঁচিয়ে উঠেছে একটা বিশুদ্ধ দক্ষিণী রেশমের কাঁচা হলুদ রঙের চওড়া কালোপেড়ে শাড়ি।

দৃশ্যটা চমৎকার। মনীশের হাতে সন্দেশের বাক্স। শিমুলের কাঁধ থেকে ব্যাগ ঝুলছে। আজ রবিবার, ওরা সারাদিন থাকবে, সন্ধের পর বন্ডেল রোডের ফ্ল্যাটে ফিরে যাবে। মনীশ বাবাকে দেখতে পেয়ে হাত তুলে চেনা দিল। হৃদয়ও হাত তোলে। তারপর নিস্পৃহ হয়ে আবার ইজিচেয়ারে পিছনে হেলে বসে খবরের কাগজের দিকে তাকায়।

কিন্তু খবরের কাগজ পড়ে না হৃদয়। সে বসে তার সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়জ অনুভূতি বা ইনস্টিংকট-এর কথা ভাবতে থাকে। এই যে খবরের কাগজ পড়তে-পড়তে হঠাৎ মনের মধ্যে একটা ইশারা জেগে উঠল আর হৃদয় দোতলার বারান্দা থেকে রাস্তায় তাকিয়ে দেখল সপরিবারে তার ছেলে আসছে, এ ব্যাপারটা তাকে বেশ খুশি করে। এমন নয় যে ছেলেকে দেখে তার আনন্দ হয়েছে। বরং এই এ রবিবারের আগন্তুক মনীশকে সে খুব একটা পছন্দ করে না। ওর বউ শিমুলকে আরও নয়। মনীশের বয়স এখন বছর-

পঁচিশেক হবে, হৃদয়ের ধারণা শিমুলের বয়স মনীশের চেয়ে অন্তত বছর দুই-তিন বেশি। নাতি অঞ্জনকে এমনিতে খারাপ লাগে না হৃদয়ের, তবে তার বাপ-মা তাকে নিয়ে এত ব্যস্ত এবং সতর্ক যে হৃদয় তার সম্পর্কে খুব আগ্রহ বোধ করে না আজকাল। একটু ক্যাডবেরি কি সন্দেশ হাতে দিলেও অঞ্জনের বাপ-মা সমস্বরে 'ওয়ার্মস ওয়ার্মস' বলে আঁতকে ওঠে। আরে বাবা, কৃমি কোন বাচ্চার নেই? তা বলে কি বাচ্চারা মিষ্টি খাচ্ছে না? অন্য কেউ স্নান করালে নাকি ছেলের ঠান্ডা লাগে বলে শিমুলের ধারণা। এ বাড়িতে এসেই ছেলের জন্য শিমুল ফি রবিবার হাফ বয়েল্ড ডিম আর সবজির স্টু বানানোর বায়না ধরবে। অত যত্নের ছেলেকে ছুঁতে একটু ভয় করে হৃদয়ের। আর ভয় করলে ভালোবাসা বা স্নেহটা কিছুতেই আসতে চায় না।

কিন্তু হৃদয় তার ছেলে এবং ছেলের পরিবারকে দেখে খুশি হোক বা না হোক, এই প্রায় পঞ্চাশ বছরের কাছাকাছি বয়সে নিজের সূক্ষ্ম বোধশক্তি দেখে কিছু তৃপ্তি পেয়েছে। বলতে কী, এই ইনস্টিংকট যে তার আছে এ বিষয়ে বরাবর সে নিঃসন্দেহ ছিল। সেবার জামসেদপুর যাওয়ার সময় তার কামরায় টিটি একটা বিনা টিকিটের ছোকরাকে ধরেছিল। ছোকরা বারবার তার এ পকেট ও পকেট খুঁজে রাজ্যের কাগজপত্র, নোটবই রুমাল খুঁজে-খুঁজে হয়রান। বলছে—টিকিটটা ছিল তো! পকেটেই রেখেছিলুম! কেউ বিশ্বাস করছিল না অবশ্য। টিটি তাকে বাগনানে নামিয়ে জি আর পি-তে দিয়ে দেবে বলে শাসাচ্ছে। ছোকরা তখন হৃদয়ের দিকে চেয়ে সাদা মুখে বলেছিল—দাদা, ঝাড়গ্রাম স্টেশনের কাছেই আমার দোকান, আমার ভাড়াটা দিয়ে দিন, আমি ঝাড়গ্রামে নেমে ছুটে গিয়ে টাকা এনে দিয়ে দেবো আপনাকে। হৃদয়ের ইনস্টিংকট তখনই বলেছিল যে, এ-ছোকরা মিথ্যে বলছে না। চোখে মুখে সরল সত্যবাদিতার ছাপ ছিল তার। টিকিটও হয়তো কেটেছিল। কিন্তু ইনস্টিংকটকে উপেক্ষা করেছিল হৃদয়। ভেবেছিল, যদি আহাম্মকের মতো ঠকে যাই? পরে অবশ্য ছোকরা সে- কামরাতেই খুঁজে পেতে তার ঝাড়গ্রামের চেনা লোক বের করে ভাড়া মিটিয়ে দেয় এবং হৃদয়ের কাছে এসে এক গাল সরল হাসি হেসে বলে—দাদা, পেয়ে গেছি। শুনে মনটা বড় খারাপ হয়ে গিয়েছিল হৃদয়ের। সে তো জানত, মুখ দেখেই তার সূক্ষ্ম অনুভূতিবলে টের পেয়েছিল, ছোকরা মিছে কথা বলছিল না। তার সেটুকু উপকার সেদিন করতে পারলে আজ এই সুন্দর সকালের সোনালি রোদটুকুকে আর একটু বেশি উজ্জ্বল লাগত না কি তার কাছে।

ওরা দোতলায় উঠে এসেছে টের পাচ্ছিল হৃদয়। তার বউ কাজল দরজা খুলে নানারকম অভ্যর্থনা ও আনন্দের শব্দ করছে। করবেই। ছেলেমেয়েদের মধ্যে এই মনীশই যা একটু-আধটু আসে। আর সবাই দূরে। মেজো ছেলে অনীশ আমেরিকায়, ছোট ক্ষৌণীশ তার মেজদার পাঠানো টাকায় দেরাদুনে মিলিটারি অ্যাকাডেমিতে পড়ছে। একমাত্র মেয়ে

অর্পিতা বোম্বাইয়ে স্বামীর ঘর করে। এ- বাসায় কাজল আর হৃদয়, হৃদয় আর কাজল। শুনতে বেশ। কিন্তু আসলে যৌবনের সেই প্রথমকাল থেকেই কোনওদিন কাজলের সঙ্গে বনল না হৃদয়ের। ফুলশয্যার রাতেই কাজল প্রথম আলাপের সময় বলেছিল—আমি কিন্তু গানের ক্ষতি করতে পারব না তাতে সংসার ভেসে যায় যাক। তখনই হৃদয়ের ইনস্টিংকট বলেছিল—একথাটা এই রাতে না বললেও পারত কাজল। বিয়েটা হয়তো সুখের হবে না।

হয়ওনি। কাজল গান ছাড়েনি। এখনও রেডিওতে মাঝে-মাঝে গায়, দু-একটা গানের স্কুলে মাস্টারি করে। প্রাইভেটে শেখানো তো আছেই। কিন্তু ফুলশয্যার রাতে তার কথা শুনে যেমন মনে হয়েছিল এ মেয়ে বোধহয় লতা মঙ্গেশর হবে তেমনটা কিছুই হয়নি। বরং অতিরিক্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষার বশে জীবনে কিছু জটও পাকিয়েছে কাজল। তাকে বিভিন্ন ফাংশানে চান্স দিতে পারে বলে কিছু প্রভাবশালী লোকের খপ্পরে পড়ে নিজেকে নষ্ট করেছে। হৃদয় কানাঘুষো শুনেছে, কাজল নিজের পবিত্রতা বজায় রাখে না। এখানেও সেই ইনস্টিংকট। ছোট ছেলে ক্ষৌণীশকে কোনওদিনই নিজের ছেলে বলে ভাবতে পারে না হৃদয়।

মনীশ বারান্দায় এসে পাশের টুলের ওপর হৃদয়ের অভ্যস্ত ব্রান্ডের এক প্যাকেট সিগারেট আর এক বাক্স ভোটা দেশলাই রেখে বলে—কেমন আছ বাবা?

হৃদয় আজকাল কথা বলতে ভালোবাসে। কিন্তু কথায় ভেসে যেতে ভারী ভয় হয় তার। সূক্ষ্ম অনুভূতি তাকে সাবধান করে দেয়, কথা বোলো না, বেশি কথা বললেই ওরা বিরক্ত হবে। ভাববে তুমি বুড়ো হয়েছ। তোমার ব্যক্তিত্ব নেই।

হৃদয় সতর্ক হয়। এত বেশি সতর্ক হয় যে মুখই খোলে না। ঘাড় নেড়ে জানায় ভালো।

অনীশ আমেরিকা থেকে তার ডাক্তার দাদার জন্য খুবই আধুনিক ধরনের একটা ব্লাড প্রেশারের যন্ত্র পাঠিয়েছে। সেটা প্রতিবারই সঙ্গে আনে মনীশ। আজও এনেছে। টুলের ওপর রেখে হাত বাড়িয়ে বলল—হাতটা দাও, প্রেশারটা দেখি।

হৃদয় মাথা নাড়ে, না। খামোখা দেখো। হৃদয়ের প্রেশারের কোনও গণ্ডগোল নেই। তেমন কিছু বয়সও তো হয়নি তার। মোটে সাতচল্লিশ। একুশ বছর বয়সে সে বিয়ে করেছিল মায়ের বায়নায়। বাইশ বছর বয়সে মনীশ হয়। এখনও হৃদয়ের চেহারা ছিপছিপে, পঁয়ত্রিশ ছত্রিশের বেশি দেখায় না। চুল এখনও বেশ কুচকুচে কালো, চলাফেরা যুবকের মতো চটপটে। বয়সের বিন্দুমাত্র ছাপ নেই। তবে যে মনীশ প্রায়ই তার প্রেশার

দেখে সেটা একরকম তোষামোদ ছাড়া আর কিছুই নয়। বাপকে সে কোনওদিনই রোজগারের পয়সা দেয় না।

মনীশ চাপাচাপি করল না, তবে কৌতূহলভরে মুখের দিকে চেয়ে বলল—তোমার মেজাজটা আজ খারাপ নাকি?

বারান্দার ওদিকটায় নাতি-কোলে করে কাজল এসে দাঁড়াল। ওই দেখ, ওই দেখ বলে রাস্তায় আঙুল দিয়ে কী একটু দেখিয়ে ফিরে চাইল হৃদয়ের দিকে। বেশ কোমল গলায় বলল—দেখাও না প্রেশারটা। দেখাতে দোষ কী?

হৃদয় তার প্লাস পাওয়ারের চশমাটা খুলে কোলের ওপর রেখে বিতর্কের জন্য প্রস্তুত হয়ে ঠান্ডা গলায় বলে—কেন দেখাব?

এই স্বর চেনে কাজল। ভ্রূ কুঁচকে স্বামীর দিকে চায়। তার মুখের রেখা কঠিন হয়ে ওঠে। বলে—থাক থাক, দেখাতে হবে না।

মনীশ খুব চালাকের মতো বলে—বাবা, ডোন্ট মাইন্ড। জাস্ট চেক আপ করতে চেয়েছিলাম। জাস্ট চেক আপ, তা ছাড়া কিছু নয়।

কাজল ধমকে দেয়—থাক, তোকে দেখতে হবে না। যে চায় না তারটা দেখবি কেন?

হৃদয়ের ইনস্টিংকট বলল, আজকের দিনটা ভালো যাবে না। হয় দুপুরে, নয়তো রাত্রে একটা তুমুল ঝগড়া লাগবে কাজলের সঙ্গে। লাগবেই।

কাজল নাতিকে নিয়ে এবং মনীশ তার যন্ত্র নিয়ে ঘরে ফিরে যায়। হৃদয় বসে থেকে খবরের কাগজে চোখ বোলায়। জনতা গভর্নমেন্ট হয়তো বেশি দিন টিকবে না। ইন্দিরাও সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ক্ষমতা ফিরে পাবে বলে মনে হয় না। তাহলে নাইনটিন এইট্টিতে ভারতবর্ষ শাসন করবে কে? ভূতে?

যে যুবতী মেয়েটি তাদের রান্না করে সে এসে টুলের ওপর এক কাপ চা রাখল। মেয়েটির দিকে কোনওদিনই খুব ভালো করে তাকায় না হৃদয়। তাকাতে ভরসা হয় না। মেয়েটির বয়স ছাব্বিশ কি সাতাশ হবে। স্বামী নেয় না বলে কসবায় বাপের বাড়িতে থেকে কাজ করে খায়। এ বাড়িতে দুবেলা রাঁধে, সারাদিন নানা কাজ করে, সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরে যায়। মাইনে পঁচাত্তর টাকা। রাঁধে অবশ্য খুবই ভালো। ইংলিশ ডিনার থেকে মাদ্রাজি ইডলি দোসা সবরকম খাবার করতে পারে। কিন্তু সেটা কোনও যোগ্যতা নয়। আসল যোগ্যতা হল, ওর বয়স। চমৎকার বয়স। চেহারাখানা রোগাটে হলেও খাঁজকাটা শরীরের একটা লাবণ্য আছে। মুখখানা মোটামুটি। আগে উলোঝুলো ঝি-র মতো আসত।

এখন সাজে। পরিপাটি করে বাঁধা চুল, চুলে লাল নীল ফিতে, কপালে টিপ। হৃদয়ের সামনে আসবার আগে মুখখানা যে আঁচল দিয়ে ভালো করে মুছে আসে তা হৃদয় ইনস্টিংকট দিয়ে টের পায়।

আজও পেল। খবরের কাগজের ডানদিকের পাতায় কোণাচে একটা খুনের খবরে চোখ রেখেও হৃদয় বুঝতে পারে ললিতা তার দিকে খুব নিবিড় চোখে চেয়ে আছে। একটু চাপা গলায়, যেন গোপন কথা বলার মতো করে বলল—আপনার চা।

গভীর শ্বাস ছেড়ে হৃদয় বলে—হুঁ।

লক্ষ করেছে হৃদয়, বয়সে যথেষ্ট ছোট হলেও ললিতা তার বউকে বউদি আর তাকে দাদা বলেই ডাকে। আবার মনীশ আর তার বউকে বলে বড়দা আর বড়বউদি! কাজল বলে-বলেও তাকে আর হৃদয়কে মাসি-মেসোর গোছের কিছু ডাকাতে পারেনি ললিতাকে দিয়ে। এসবই একরকম ভালো লাগে হৃদয়ের। একটা গোপন অবৈধ তীব্র অনুভূতি। ললিতা তাকে মেসো বলে ডাকলে হয়তো এই অনুভূতিটা হত না তার।

কাজল গানের স্কুল বা টিউশনিতে যায়। ছুটির দিনে ফাঁকা বাড়িতে কত দিন একাই থাকে হৃদয় আর ললিতা। কোনওদিন হৃদয় সচেষ্ট হয়নি। ললিতাও না। তবে দুজনকে ঘিরে একটা তীব্র অনুভূতির বৃত্ত যে বরাবর তৈরি হয়েছে এটা ইনস্টিংকট দিয়ে কতবার টের পেয়েছে হৃদয়। কিন্তু বাইরে ভালোমানুষ এবং ভিতরে এক শয়তান হয়ে বেঁচে থাকা ছাড়া সে আর কীই বা করতে পারে?

হৃদয়ের আর কিছুই বলার ছিল না। ললিতা চলে গেল। কিন্তু হৃদয়ের কেমন যেন মনে হয়, ললিতা আজ তার কাছ থেকে কিছু শুনতে চায়। কিন্তু হৃদয়ের যে বলার মতো কথা নেই। জীবনে অন্তত একবার খারাপ হওয়ার বড় ইচ্ছে তার। কিন্তু কিছুতেই একটা মানসিক ব্যারিকেড ডিঙিয়ে যেতে পারে না।

এই ব্যারিকেড অনায়াসে ভেঙেছে কাজল। যতই বুঝতে পেরেছে যে, স্বাভাবিক পথে গানের জগতে সে ওপরে উঠতে পারবে না, ততই সে অলি গলি রন্ধ্রপথের সন্ধানে নিজেকে সস্তা করেছে। হৃদয়ের সঙ্গে সম্পর্কটা বিয়ের কয়েক বছরের মধ্যেই বিষিয়ে যায়। তাই হৃদয় একসঙ্গে থেকেও কাজলকে বিশেষ নজরে রাখেনি। কিন্তু টের পেয়েছে ঠিকই। তার ইনস্টিংকট কম্পাসের কাঁটার মতো নির্দেশ করে দিয়েছে। অনেক বছর আগে সন্ধেয় হৃদয় এমনি বারান্দায় বসে ঝুঁকে রাস্তা দেখছিল। তার দুপাশে কিশোর মনীশ আর কিশোরী অর্পিতা। হঠাৎ রাস্তার ভিড়ের মধ্যে সে কাজলকে ফিরতে দেখল। দৃশ্যটা নতুন কিছু নয়। প্রায়ই সন্ধে পার করে কাজল বাসায় ফেরে। তবু সেদিন নতমুখী,

অন্যমনা কাজলের হেঁটে আসার ভঙ্গির মধ্যে কী দেখে তার ইনস্টিংকট নিঃশব্দে চেঁচিয়ে উঠল—অস্পৃশ্য! অস্পৃশ্য! তখন মনীশ আর অর্পিতা ভারী খুশির গলায় চেঁচিয়ে উঠেছিল—মা! কাজল ওপরের দিকে তাকায়নি। খুব অন্যমনস্ক ছিল।

সেই রাত্রেই শোওয়ার ঘরে হৃদয়ের জেরার কাছে প্রায় ধরা পড়ে কাজল। কিন্তু স্বীকার করল না কিছু, উলটে কত ঝগড়া করল। কিন্তু তাতে হৃদয়ের অনুভূতি বদলে গেল না।

এতদিন বাদে এই সুন্দর শরতের ভোরে সেই সব পুরোনো কথা মনটা ভারী এলোমেলো করে দিল। বাতাসে কোল থেকে উড়ে গড়িয়ে পড়ল খবরের কাগজের আলগা পাতা। গত তিন চার বছর ধরে একটানা কাজলের সঙ্গে তার সম্পর্কহীনতা চলছে।

হৃদয় উঠল। কারও সঙ্গে কথা বলল না, পায়জামার ওপর একটা পাঞ্জাবি চড়িয়ে, মানিব্যাগটা পকেটে পুরে বেরিয়ে এল। বেরোবার মুখে শুনতে পেল তিনটে শোওয়ার ঘরের মধ্যে যেটা সবচেয়ে ভালো সেই পূর্ব-দক্ষিণ কোণের ঘরে মনীশ আর কাজল কথা বলছে। অঞ্জনকে ভিতরের ডাইনিং স্পেসে খাওয়াতে বসিয়েছে শিমুল। শিমুলকে ভালো করে চেনেও না সে। একদিন মনীশ ওকে রেজিস্ট্রি বিয়ে করে নিয়ে এসেছিল প্রণাম করাতে। সেই প্রথম দেখা। সামাজিক মতে একটু বিয়ের অনুষ্ঠান হয়েছিল পরে। তারপর থেকে ওরা আলাদা। শিমুল শ্বশুরকে দেখে নড়ল না, একটু ভদ্রতার হাসি হেসে বলল—ভালো তো?

হৃদয় ভ্রূ কোঁচকায়। এরা কারা, কোত্থেকে এল তা যেন ঠাহর পায় না। এত অনাত্মীয় এরা যে কথার জবাব পর্যন্ত দিতে ইচ্ছে করে না তার। দিলও না হৃদয়। ভিতরের বারান্দায় এসে সিঁড়ির দিকে পা বাড়ানোর সময় একবার অভ্যাসবশে রান্নাঘরের দিকে এক ঝলক তাকাল সে। ললিতা প্রেশার কুকারের স্টিম ছাড়ছে। ধোঁয়াটে বাষ্পের মধ্যে আবছা দেখায় তাকে। তবু দুখানা চোখের কৌতূহল ভরা দৃষ্টি স্পর্শ করে হৃদয়কে। কাউকে কিছু বলে আসেনি হৃদয়। কিন্তু কে জানে কেন ললিতার দিকে চেয়ে বলল—আমি একটু বেরোচ্ছি।

ললিতা তাড়াতাড়ি প্রেশার কুকার রেখে উঠে আসে। মুখে ঘেমো ভাব, চুল কিছু এলোমেলো, অকপটে চেয়ে থেকে বলল—ফিরতে কি দেরি হবে?

—হতে পারে।

ললিতা কিছু বলল না। কিন্তু সিঁড়ির রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে চেয়ে রইল, যতক্ষণ হৃদয় না চোখের আড়ালে গেল।

পুরোনো আড্ডা সবই ভেঙে গেছে। বাইরের পৃথিবীটা এখন আর আগেকার মতো নেই। বড্ড পর হয়ে গেছে সব। এখন হৃদয়ের সবচেয়ে প্রিয় জায়গা হল তার দোতলার ফ্ল্যাটের সামনের বারান্দাটুকু। এ গ্রেড ফার্মে সবচেয়ে উঁচু থাকের কেরানি হিসেবে তাকে অফিসে অনেকক্ষণ কাজ করতে হয়। সেটুকু সময় বাদ দিয়ে বাকি দিনটুকু সে বসে থাকে বারান্দায়। বেশ লাগে। অনেক মাইনে পায় হৃদয়! ওভারটাইম নিয়ে হাজার দুই-আড়াই কি কখনও তারও বেশি। পুজোর মাসে দেদার বোনাস পেয়েছে। সবটা তার খরচ হয় না। কাজলেরও আয় খারাপ নয়। দুজনের বনিবনা নেই বলে কাজল তার কাছে বড় একটা বায়না বা আবদার করে না। তাই হাতে বেশ টাকা থাকে হৃদয়ের, কিন্তু সেই টাকা খরচ করার পথ পায় না সে। কী করবে? মদ খেতে রুচি হয় না। জামা কাপড়ের শখ নেই। জিনিস কেনার নেশা নেই। কী করবে তবে?

বুক পকেটে মানিব্যাগটা টাকার চাপে ফুলে হৃৎপিণ্ডটা চেপে ধরেছে। ভারী লাগছে। ব্যাগে কত টাকা আছে তার হিসেব নেই হৃদয়ের। কয়েক শো হবে। হাজারখানেকের কাছাকাছিও হতে পারে।

চওড়া গলি পার হয়ে কালীঘাটের উলটোদিকের রসা রোডে এসে দাঁড়ায় হৃদয়। লক্ষ-লক্ষ লোক ছুটি আর রোদে বেরিয়ে পড়েছে। কোথায় যাচ্ছে তা ভেবে পাওয়া শক্ত। মোটামুটি সকলেরই কোনও-না-কোনও গন্তব্য রয়েছে যা হৃদয়ের নেই। চারদিকে এত অচেনা মানুষের মধ্যে আজকাল বেশ একটু অস্বস্তি বোধ করে সে। কেন যেন তার ইনস্টিংকট তাকে সবসময়ে সাবধান করে দেয়, চারদিক সম্পর্কে সজাগ থেকো। এরা বেশিরভাগই খুনে, বদমাশ, চোর পকেটমার দাঙ্গাবাজ ঝগড়ুটে। তোমাকে একটু বেচাল দেখলেই পকেট ফাঁক করবে, ঝগড়া বাধাবে, অপমান করবে, মেরে বসবে বা মেরেই ফেলবে।

ফাঁকা অলস গতির ট্যাকসি ঘুরে বেড়াচ্ছে দেখে কিছু না ভেবেই হাত তোলে হৃদয় এবং উঠে পড়ে। আজকাল তার বাইরে সম্পর্কে ভীতি জন্মেছে আগে যা ছিল না। সে সবচেয়ে নিরাপদ বোধ করে নিজের সামনের বারান্দায়। যদি তার কোনও গন্তব্য থাকে তবে তা ওই ভাড়াটে বাড়ির বারান্দাটুকুই। বাদবাকি শহর, দেশ বা রাষ্ট্র তার কাছে এক দূরের অচেনা রাজ্য। ট্যাকসি চৌরঙ্গির দিকে যাচ্ছে, পিছু হেলে বসে হৃদয় নিস্তেজ চোখে বাইরের দিকে চেয়ে থাকে। তার সুখদুঃখের বোধ ডুবে গেছে একেবারে। কী সুখ কী দুঃখ বলতে পারে না। এত অনাত্মীয় হয়ে গেছে তার আত্মীয়স্বজন যে তার ভয় হয়, এদের মধ্যে কেউ মরে গেলে সে তেমন কোনও শোক করবে না। ভেবে মাঝে-মাঝে সে একটু অবাক হয়। নিজের মনকেই জিগ্যেস করে, যদি এখন মনীশ বা অনীশের কিছু হয় তবে

তোমার রিঅ্যাকশন কেমন হবে? যদি কাজলের কিছু হয়, তাহলে? ইনস্টিংকট তাকে বলে, কিছু হলে তোমাকে বাপু জোর করে থিয়েটারি কান্না কাঁদতে হবে।

কামুর আউটসাইডার বইখানা পড়েছে হৃদয়, অ্যালিয়েশনের কথাও তার অজানা নয়। সে কি ওইসবেরই শিকার? হৃদয়ের ইনস্টিংকট সঙ্গে-সঙ্গে বলে ওঠে—না হে, তা নয়। আসলে তোমার সন্নিসী হওয়ারই কথা ছিল যে! তা হতে পারোনি বলে তোমার মনটা তোমাকে ফেলে জঙ্গলে চলে গেল। এখন তুমি আর তোমার মন ভাই-ভাই ঠাঁই-ঠাঁই।

মানিব্যাগটা বুকে বড্ড চাপ দিচ্ছে। দম চেপে ধরছে। অস্ফুট একটু শব্দ করে হৃদয়। ট্যাকসিওলা বাঙালি ছোকরাটি একবার ফিরে চায়। বলে—কিছু বলছেন?

হৃদয় মাথা নাড়ে। হ্যাঁ, সে কিছু বলছে, বহুদিন আমাকে বড় অনাদর করেছো তোমরা। ঠিকমতো লক্ষ করোনি আমার রক্তচাপ, হৃদযন্ত্র বা ফুসফুস ঠিকঠাক কাজ করেছে কি না। জানতে চাওনি কতখানি ফ্যাকাশে হয়ে গেছে আমার হৃদয়।

হৃদয় মানিব্যাগটাকে পকেটসুদ্ধ খামচে ধরে বুক থেকে আলগা করে রাখে। তারপর ট্যাকসির মুখ ঘোরাতে বলে। কোথাও যাওয়ার নেই শুধু ওই নিয়তি বারান্দাটা ছাড়া।

বাড়ি ফিরে আসতে-আসতে প্রচণ্ড রাগ হচ্ছিল হৃদয়ের। কেন এই বাড়ি ছাড়া তার আর কোনও গন্তব্য থাকবে না? কেন আর কোথাও তার যাওয়ার নেই। কেন এত কম মানুষকে চেনে সে?

মানিব্যাগটা আলগা করে ধরে রেখেও বুকের বাঁ-ধারের অস্বস্তিটা গেল না। দমচাপা একটা ভাব। রসা রোডে নিজের গলির মোড়ে ট্যাকসিটা ঠিক যেখানে ধরে ছিল সেখানেই আবার ছেড়ে দিল সে। কী অর্থহীন এই যাওয়া আর ফিরে আসা!

বেলার রোদ খাড়া হয়ে পড়েছে। জ্বলে যাচ্ছে শরীর, ঝলসে যাচ্ছে চোখ। হৃদয় ধীর পায়ে হেঁটে গলিতে ঢুকল। আস্তে দোতলায় সিঁড়ি ভেঙে উঠতে লাগল। ওপরে খুব হইচই শোনা যাচ্ছে। এবার পুজোয় কাজলের একটা আধুনিক গানের একসটেন্ডেডপ্লে রেকর্ড বেরিয়েছে। স্টিরিওতে সেই রেকর্ডটা বাজছে এখন। বহুবার শোনা হৃদয়ের। কেউ বাড়িতে এলেই বাজানো হয়। জঘন্য গান। প্রায় অশ্লীল দেহ ইঙ্গিতে ভরা ভালোবাসার কথা আর তার সঙ্গে ঝিনচাক মিউজিক।

দোতলার বারান্দায় উঠতে খুবই কষ্ট হল হৃদয়ের। মানিব্যাগটা বের করে ঝুল পকেটে রেখেছে, তাও বাঁ-দিকের বুকে চাপটা যায়নি। এখন সেই চাপ-ভাবের সঙ্গে সামান্য পিন ফোটানোর ব্যথাও। সিঁড়ির রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে হাঁ করে দম নিচ্ছিল হৃদয়। বুঝতে পারছে তার মুখ সাদা, গায়ে কলকল করে ঘাম নামছে।

ললিতা ডাইনিং হলের পরদা সরিয়ে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল। দেখে থমকে দাঁড়ায়। দু-পা এগিয়ে এসে বলে—কী হয়েছে?

হৃদয় কখনও এ মেয়েটার চোখে চোখ রাখতে পারে না। মনে পাপ। চোখ সরিয়ে নিয়ে খুব অভিমানের গলায় বলে—কিছু না!

এ অভিমানের দাম দেয় কে? হৃদয় হাঁফ ধরা বুক হাতে চেপে ঘরের দিকে এগোয়। বুঝতে পারে, শব্দগুলো আবছা হয়ে আসছে চোখে, বুকে ফুরিয়ে আসছে বাতাস। স্ট্রোক কি?

ভাবতেই মনটা অদ্ভুত ফুরফুরে হয়ে গেল আনন্দে। দীর্ঘকাল সামনের বারান্দায় বসে সে কি এই স্ট্রোকেরই অপেক্ষা করেনি? ইনস্টিংকট বলত—আসবে হে আসবে একদিন। সে এসে সব যন্ত্রণা ধুয়ে মুছে নিয়ে যাবে।

কার কথা বলত তার ইনস্টিংকট তা তখন বুঝতে পারত না সে। আজ মনে হল, এই অদ্ভুত অসুখের কথাই বলত।

হৃদয় ভেবেছিল, খুব নাটকীয়ভাবে সে ঘরের দরজায় লাট খেয়ে পড়ে যাবে। কিন্তু পড়ল না। হাত পা কাঁপছিল থরথর করে, বুকে অসম্ভব ধড়ধড়ানি আর হুলের ব্যথা, গায়ে ফোয়ারার মতো ঘাম। তবু পড়ল না। চেতনা রয়েছে এখনও, খাড়া থাকতে পারছে। পরদাটা সরিয়ে ড্রইং কাম ডাইনিং স্পেসে ঢুকল সে।

দরজার মুখে ললিতা এসে পিছন থেকে দুটো কাঁধ ধরে বলে—শরীরটা তো আপনার ভালো নেই। বউদিকে ডাকব?

বিরক্তি গলায় হৃদয় বলে—না, কাউকে ডাকতে হবে না।

ললিতা বোকা নয়। সব জানে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক। তাই মৃদু স্বরে বলে—আচ্ছা চলুন আমি বারান্দায় পৌঁছে দিই আপনাকে!

খুব যত্নে ইজিচেয়ারে তাকে স্থাপন করে ললিতা। টুল থেকে জিনিসপত্র নামিয়ে সেটা সামনে রেখে পা দুটো টান করে মেলে দেয় টুলের ওপর। মৃদুস্বরে বলে—চোখ বুঝে একটু বিশ্রাম করুন।

মুখে বড় ঘাম জমেছিল হৃদয়ের। ললিতা কিছু খুঁজে না পেয়ে তাড়াতাড়িতে নিজের শাড়ির আঁচলে যত্নে ঘামটুকু মুছে দিল। বলল—পাখা আনছি। চোখ বুজে ঘুমোন তো।

আলো মুছে যাচ্ছিল, ক্লান্তিতে এক অতল খাদে গড়িয়ে যাচ্ছে শরীর। তবু চোখ খুলে চেয়ে থাকে হৃদয়। হাঁ করে চেয়ে থাকে ললিতার দিকে। একটুও কাম বোধ করে না সে। সব ভুলে হঠাৎ 'মা' বলে ডেকে উঠতে ইচ্ছে করে।

ঝিনচাক মিউজিকের সঙ্গে কটু সুরের গান বেজে যাচ্ছে স্টিরিওতে, সঙ্গে বাচ্চা-বুড়োর গলায় হাঃ-হাঃ হোঃ-হোঃ। কিন্তু এই সামনের বারান্দায় এই শরৎকালের উজ্জ্বল দুপুরে ভারী পুরোনো দিনের এক আলো এসে পড়ল। হৃদয়ের ইনস্টিংকট বলল, মরবে না এ যাত্রায়।

ঘণ্টাধ্বনি

সাঁঝবেলাতে গোয়ালঘরে ধুনো দিতে গিয়ে কালিদাসী শুনতে পেল, রামমন্দিরে খুব তেজালো কাঁসি বাজছে। কাঁইনানা, কাঁইনানা।

গুন্টু দুপুর থেকে বাড়ি নেই। আলায় বালায় সারাদিন ঘোরে। মাথাগরম ছেলে। যখন তখন হাফ-পেন্টুল খুলে পুকুরে ঝাঁপায়। চৌপর দিন জলে দাপাদাপি করে। কবে জলের ঠাকুর টেনে নেয় ছেলেটাকে! তবে ভরসা এই, গুন্টুর প্রাণে ভক্তি আছে। সন্ধে হলেই রামমন্দিরে গিয়ে বুড়ো বাজনদার আফিংখোর গোবিন্দর হাত থেকে কাঁসি কেড়ে নিয়ে নেচে-নেচে বাজায়। ওই বাজাচ্ছে এখন। কাঁইনানা, কাঁইনানা।

কেলে গরুটার নাম শান্তি। ভারী নেই-আঁকড়া। কালিদাসীকে পেয়ে গলা এগিয়ে দিল। ভাবখানা—একটু চুলকে দাও। তা দেয় কালীদাসী। খানিকক্ষণ তুলতুলে কম্বলের মতো গলায় আঙুলের কাতুকুতু দিতে থাকে। অন্য গরু শিপ্রা ফোঁসফোঁস করতে থাকে। শিং নাড়া দেয়; কালিদাসী বলে—রোসো মা তোমাকেও দিচ্ছি। এ মুখপুড়ীর আর কিছুতেই আরাম ফুরোয় না।

মন্দিরে আরতি হচ্ছে। চক্কোত্তিমশাইয়ের এই সময়ে প্রায়দিনই ভাব হত। ভাব হলে হাত-পা টানা দিয়ে চিত হয়ে পড়ে মুখে গাঁজলা তুলে নানা কথা বলত। সে সব কথা স্বয়ং ভগবানের। একবার কালীদাসীকে বলেছিল—ও কালী, ভুরের পায়েস খাব, এনে দিবি?

তা ভুরে গুড় দিয়েছিল কালীদাসী। একটু আধটু নয়, আধ মণেরও বেশি হবে। তাই দিয়ে সেবার বিরাট পায়েস ভোগ লাগানো হল মন্দিরে।

চক্কোত্তিমশাই এখন বয়সে পঙ্গু হয়ে টিনের চারচালায় দাওয়ায় চৌকি পেতে বসে থাকে দিন রাত। তামাক খায়। সেজ ছেলে মনোরঞ্জন এখন মন্দিরের সেবাইত।

কালিদাসীর এখন আর যাওয়ার সময় হয় না। প্রায়ই ভাবে একদিন গিয়ে বসে আরতি দেখবে।

ধোঁয়ায় ধোঁয়াক্কার গোয়ালঘরে কালীদাসীর ভালো করে ঠাহর হয় না কিছু। টেমি হাতে এগিয়ে গিয়ে খড়ের গাদা গোছ করতে হাত বাড়িয়েই মধ্যের আঙুলে কাঁকড়াবিছের হুল খেয়ে উঃহুঃ করে ওঠে।

ত্রিশ বছর আগে যখন প্রথম কাঁকড়াবিছের হুল খেয়েছিল কালিদাসী তখন যন্ত্রণার চোটে সে কী দাপাদাপি! হাসপাতাল পর্যন্ত যেতে হয়েছিল! পুরো চব্বিশ ঘণ্টা সে বিষ-ব্যথা থানা গেড়ে ছিল ডান পায়ের বুড়ো আঙুলে।

তারপর মাসটাক যেতে-না-যেতে ফের একদিন হুল দিল। আবার দাপাদাপি। আবার হাসপাতাল। কিন্তু কাঁকড়াবিছেরা কালিদাসীকে সেই থেকে কেমন যে পেয়ে বসল। কাছে পেলেই হুল দেয়। এই ত্রিশ বছর ধরে মাসকে দু-তিনবার দিচ্ছে। অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে এখন, তেমন লাগে না।

কালিদাসী টেমি রেখে খানিক কাঁচা গোবর বাঁ-হাতের মাঝের আঙুলটায় বসাল ঠিক যেমন গোলাপগাছের ডগায় লোকে গোবরের ঢিবলি দেয়।

কালিদাসীর শরীরটা কাঁকড়াবিছের বিষে ভরে গেছে। এখন বিষে বিষক্ষয় হয়ে যায়।

আশ্চর্য এই বাচ্চা দেওয়ার সময়ে মেনি বিড়ালটা গোয়ালঘরে এসে ওই খড়ের গাদায় বাসা বাঁধে। ফুলি কুকুরটা তো ফি-বছর খড়ের মাচার নীচে গর্ত করে চার-পাঁচটা ছানা বিয়োয়। গরু দুটো সম্বচ্ছর এই ঘরে রাত কাটায়। এগুলোকে কোনওদিন হুল দেয়নি পোড়ারমুখোরা। মানুষের ওপর যত ওদের রাগ। আর মানুষের মধ্যে আবার সবচেয়ে ঘেন্নার হল ওদের কালিদাসী হতভাগী।

আঙুলে-গোবরে করে টেমি হাতে কালিদাসী গোয়ালঘর থেকে বেরিয়ে এসে কাঠের কপাটটা টেনে দিতে-দিতে আপনমনে বকবক করছিল—ঝ্যাটাখেকো, কেলেঘেন্না, খালভরাগুলো কোথাকার! কালিদাসীর কাছে বড় জো পেয়েছিস।

নীচের তলার নতুন ভাড়াটে হেম ঘোষ, নতুন বিয়ে করেই মা-বাপ-ভাই ছেড়ে আলাদা বাসা করে উঠে এসেছে। তার বউ রেবা নাকি বড়ঘরের মেয়ে, কাজকর্ম করতে পারবে না। শ্বশুরবাড়িতে শুয়ে বসে থাকত বলে শাশুড়ির সঙ্গে ঝগড়া বেধে পড়ল। হেম ঘোষ বউয়ের পক্ষে। বাড়ি ছেড়ে উঠে এল। চাকরি তার তেমন কিছু নয়। দাশনগরে এক তালা তৈরির কারখানায় চাবির খাঁজ কাটে। ত্রিশ টাকার ঘর ভাড়াও দু-মাস বাকি ফেলেছে। তবু

বউয়ের সুবিধের জন্য সবসময়ে কাজ করার বাচ্চা ঝি বহাল করেছে, তার ওপর ঠিকে কাজের লোক তো আছেই।

দাওয়ায় বসে লুঙ্গি পরে হেম বিড়ি খাচ্ছিল। কালিদাসীর বকবকানি শুনে বলল—কী হল দিদিমা? কাঁকড়াবিছে কামড়াল বুঝি?

কালিদাসী বলল—তা কামড়াবে না কেন বাবা? কালিদাসী যে ভালোমানুষের মেয়ে হয়ে শতেক পাপ করেছে।

হেম ঘোষ বিড়িটা ফেলে একটু তটস্থ হয়ে বলে—এ তো বড় মুশকিলের কথা হল দিদিমা! এ-বাড়িতে বড্ড দেখছি কাঁকড়াবিছের উৎপাত! রেবাকে যদি কামড়ায় তো রক্ষে নেই।

কালিদাসী মনে-মনে বলে—বউকে তাজমহলে নিয়ে গিয়ে রাখো গে যাও। দেখালে বটে তোমরা বাপ! আজকালকার রত্তি মেয়েরা কী করে যে গোটাগুটি পুরুষ মানুষগুলোকে হজম করে বসে থাকে!

ওপরের বারান্দায় উঠে আসতে-আসতে কালিদাসী ফের মন্দিরের শব্দ শোনে। গুন্টু কাঁসি বাজাচ্ছে। কাঁইনানা, কাঁইনানা।

টেমি ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে দেয় কালিদাসী। বুড়ো বয়সের ভুল। মন্দার মা বারান্দায় বসে উনুন সাজাচ্ছে, এক্ষুনি দেশলাই চাইবে। টেমিটা না নেবালে, দেশলাইয়ের কাঠি বাঁচত। ছাদে গিয়ে উনুন ধরাতে মন্দার মা না হোক চার-পাঁচটা কাঠি নষ্ট করবে।

এসবই কালিদাসীর জ্বালা। সংসারে আছে এক উড়নচণ্ডী ছেলে, আর মেয়ের ঘরের নাতি ওই গুন্টু। তবু সংসারের হাজার চিন্তায় কালিদাসীর ডুবজল।

দুই

কানাই মাস্টারের আজ সারাদিন বড় হতভম্ব লাগছে।

এমনিতে কানাই বড় নিরীহ লোক। তিন বছর হল তার দশ বছর বয়সি ছেলেটা এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে শয্যাশায়ী প্রায়। শরীরের সবক'টা হাড়ের জোড়ে বিষযন্ত্রণা। হাঁটু, কনুই, কবজি সব ফুলে আছে। শরীরটা শুকিয়ে যাচ্ছে। হাসপাতালের ডাক্তাররা ঠারেঠোরো বলেছে, ভালো হওয়ার রোগ নয়।

কানাই মাস্টারের একটাই ছেলে, আর মেয়ে দুটো। তার নিজের বয়স বেশি নয়, চল্লিশ-টল্লিশ হবে। কিন্তু এ বয়সেই বড় বুড়োটে মেরে গেছে কানাই। ছেলের চিন্তা উদয়াস্ত ভিতরটা কুরে খায়। তার ওপর ক'টা টিউশনি করে রসকষ আরও মরে যাচ্ছে ক্রমে।

আজ হল কী, ইস্কুলের আট ক্লাসে থার্ড পিরিয়ডে ক্লাস নিচ্ছে। মদন নামে ধেড়ে ছেলে আছে একটা। তার গলায় আবার কালো তাগায় বাঁধা রুপোর তক্তি। রাঙামুলো চেহারা। কোনওকালে পড়াশুনোর ধার মাড়ায় না। পড়া জিগ্যেস করলে শুভদৃষ্টির সময় নববধূ যেমন চোখ নামায় তেমনি নতচোখে চেয়ে থাকে মেঝের দিকে। তার বাপ বড় কারবারি, তাই মাসকাবারে ইস্কুলের বেতন কখনও বাকি পড়ে না। সেই কারণে কেউ বড় একটা ঘাঁটায়ও না মদনকে। আছ মদন, থাকো মদন, গোছের ভাব করে সবাই তাকে এড়িয়ে যায়। প্রতি ক্লাসে তিন-চার বছর করে থাকলে মদনের বাবদ ইস্কুলের একটা স্থায়ী আয় তো বহাল রইল। এমনিতে ইস্কুলের ছেলেদের মধ্যে শতকরা ষাট সত্তরজনই ডিফলটার। কারও সাত-আট মাসের বেতন বাকি পড়ে আছে। ধমক চমক করলে গারজিয়ানরা এসে হেডস্যারের হাতে পায়ে ধরে। সেই সব গারজিয়ানরাও 'দিন আনি, দিন খাই' গোছের। কেউ বিড়ি বাঁধে, কারও তেলেভাজার দোকান, একজন গামছা ফিরি করে ময়দানে। এইরকম সব। তাদের মধ্যে মদনের বাবা হচ্ছে নৈবেদ্যর কলা।

মদনা ক্লাস এইটে পড়লেও তো আর ছেলেমানুষ নয়। বয়সের ডাক দিয়েছে। শরীর জাম্বুবানের মতো বড়সড়ো।

বয়সের দোষই হবে। রোজই ইস্কুলের সামনের রাস্তা দিয়ে বীণাপাণি ইস্কুলের মেয়েরা যায়। ইস্কুলের বড় ক্লাসের ধেড়ে ছেলেরা এই সময়টুকুতে রাস্তার মোড়ে, সামনের বারান্দায়, পাশের মাঠে জমে থাকে। কেউ দেখিয়ে-দেখিয়ে সিগারেট টানে, কেউ সাইকেলে করে বোঁ চক্কর মারে। যার যা আছে সব দেখায় মেয়েদের। হাসি-টাসি তো আছেই। ছেলেদের এইসব বোকামি দেখে মেয়েদের কেউ-কেউ হাসিতে ঢলাঢলি করে যায়, কেউ গম্ভীর মুখে দৌড়-হেঁটে পালায়, দু-একজন 'জুতো মারব, লাথি মারব' গোছের কথা বলে শাসিয়েও গেছে। নিত্যিকার ঘটনা, কারও গায়ে লাগে না। আজ হল কী, থার্ড পিরিয়ডে যখন কানাই ক্লাস নিচ্ছে তখন টুকটুক করে একটা ফুটফুটে বছরদশেকের মেয়ে সোজা সরল পায়ে ক্লাসের দরজায় এসে দাঁড়িয়ে পাখির কণ্ঠে বলল, মাস্টারমশাই!

কানাই অবাক। মেয়েটার পরনে ইস্কুলের সাদা ইউনিফর্ম, হাঁটু পর্যন্ত বাহারি মোজা। মুখচোখ ভারী তিরতিরে সুন্দর।

কানাই মাস্টার মুগ্ধ হয়ে বলল, এসো মা। কী হয়েছে বলো তো?

মেয়েটা ক্লাসে ঢুকে একটা ভাঁজকরা কাগজ কানাইয়ের সামনের টেবিলে রেখে বলল, মাস্টারমশাই একটা দুষ্টু ছেলে আমি ইস্কুলে যাওয়ার সময় আমার হাতে এটা দিয়ে বলল, এটা বাড়ি নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে পোড়ো। কীসব বাজে কথা লেখা আছে দেখুন। ওই ছেলেটা। বলে মেয়েটি মদনকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়—

কানাই চিঠিটা খুলে দেখে তাতে লেখা—প্রীয়তম রোজী আমি তোমাকে ভালোবাসে আমার মোনের কথা তুমি কী বুঝতে পারো না? কিস জানিবে। তোমার প্রীয় মদন।

চিঠির ওপর শ্রীকালী লিখতেও ভুল হয়নি।

কানাই দুটো কারণে চটে গিয়েছিল। এক তো মেয়েদের চিঠি দেওয়া সাঙ্ঘাতিক বেয়াদবি। তার ওপর এইটুকু একটা চিঠিতে এতগুলো বানান ভুল!

—তুমি এসো মা, আমি দেখছি। এই বলে কানাই মাস্টার রোজিকে বিদায় করে মদনকে ডাকল। যখন ডাকল তখনই একটা বেসামাল রাগ পেটের ভিতর থেকে উঠে আসছিল তার। সেই রাগে হাত থরথর করে কাঁপে, মাথাটা ঘোলা লাগে, দাঁতে-দাঁতে বাতাস পেষাই হয়।

মদন কাছে আসতেই বিনা প্রশ্নে প্রথমে চুলের মুঠি ধরে মাথাটা নামিয়ে ঠক করে টেবিলে ঠুকে দিল কানাই। সেই সঙ্গে পিঠে যত জোরে সম্ভব এক কিল। বোঝা গেল মদনের চেহারাটা বড়সড়ো হলেও গাটা নরম। কিলটা নরম চর্বির থাকে এমন পড়ল যেন জলে কিল মারবার মতো মনে হল।

মদন এমনিতে ঠান্ডা ছেলে, সাত চড়ে রা কাড়ে না। আজও কাড়ল না। তাইতেই কানাইয়ের মাথাটা আরও বিগড়ে গেল। হারামজাদা, গিদ্ধড়, পাজি, বদমাশ, নরাধম ঠিক নামতার মতো মুখে বলে যাচ্ছে কানাই আর মারছে। সে কী মার! মারের চোটে একবার গিয়ে দেয়ালে পড়ল, একবার ব্ল্যাকবোর্ডে ফার্স্ট বেঞ্চের ডেস্কের কোণায় লেগে কপালটা ফেটে রক্ত ঝরতে লাগল। সমস্ত ক্লাস পাথরের মতো নিশ্চল। শুধু সামনের ফাঁকা জায়গাটায় বেধড়ক ঠ্যাঙানি চলেছে তো চলেইছে। ডাস্টারটা দিয়েও কানাই মাস্টার মদনের চোয়াল, মাথা কান ফাটিয়ে দিয়েছিল আজ।

এরকম মার বড় একটা দেখা যায়নি স্মরণকালে। আর কানাই মাস্টার নিজের ছেলের অসুখ হওয়ার পর থেকেই মারধর করা ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু আজকের খ্যাপা মার দেখে আশপাশের ক্লাস ফেলে মাস্টারমশাইরা ছুটে এসে দরজার কাছে ভিড় করে ফেললেন। কিন্তু কেউ কিছু বলতে বা করতে ভরসা পাচ্ছিলেন না। শেষপর্যন্ত হেডস্যার এসে মাঝখানে পড়ে সেই আসুরিক ব্যাপার থামালেন। মদন তখন রক্তমাখা মুখে, ফাটা ঠোঁটে,

ফোলা গাল, ছেঁড়া চুল আর তোবড়ানো জামাকাপড়ে পাগলের মতো চেঁচাচ্ছে—স্যার, আমাকে মেরে ফেলুন স্যার! আমাকে মেরে ফেলুন স্যার! জুতো মারুন স্যার, আমি আজই সুইসাইড করব স্যার।

মদন এত কথা কখনও বলে না। মার খেয়ে আজ তার মাথা বিগড়ে গিয়েছিল। মার খাওয়ার পরও তার চেঁচানি আর থামে না। কেবল কাঁদে আর আরও মারতে বলে, সুইসাইড করবে বলে চেঁচায়। নিজের ক্লাস থেকে ছুটে বেরিয়ে সে সারা ইস্কুলময় দৌড়োদৌড়ি করে চেঁচিয়ে কাঁদতে লাগল।

কানাই মাস্টারের কুপিত বায়ু যখন ঠান্ডা হল তখন সে মদনের আচরণ দেখে ভয়ে হতভম্ব হয়ে গেল। ছেলেটার হল কী?

টিচার্স রুমে কানাই মাস্টারকে সবাই ধরে এনে পাখার তলায় বসিয়েছে। ইস্কুলের সামনে পাবলিকের ভিড় জমে গেছে। এই অবস্থায় মদন দৌড়ে গিয়ে মাস্টারমশাইদের পায়ের ওপর গড়িয়ে পড়ে বলছে, লাথি মারুন স্যার, জুতো মারুন স্যার। আবার উঠে গিয়ে আর একজনের পায়ে পড়ে ওরকম বলে।

হেডমাস্টারমশাই এসে কানাই মাস্টারের কানে-কানে বললেন,—ছেলেটার ব্রেনটা বোধহয় ড্যামেজ হয়েছে। আপনি আর স্পটে থাকবেন না, বাড়ি চলে যান।

শুনে কানাইয়ের শরীর হিম হয়ে এল। আর বুকের কী ধড়ফড়ানি! শশী বেয়ারা রিকশা ডেকে দিল। কানাই স্কুল থেকে বাড়ি ফিরেই শয্যা নিয়ে রইল। সারাদিন ভাবছে—এ আমার আজ কী হয়েছিল? এ আমি করলাম কী?

বিকেলের দিকে একবার উঠে এসে নিজের ছেলের বিছানায় বসল কানাই। কৃশ করুণ মুখ তুলে ছেলেটা চাইল বাবার দিকে। একটু হাসল। সে হাসি কান্নার ওপরকার সরের মতো। বড় সহ্যশক্তি ছেলেটার। কত সহ্য করছে! কানাই ভাবে, ওর ব্যথাগুলো কেন আমার হয় না?

ভাবতে-ভাবতে বিছের হুলের মতো মদনের কথা মনে পড়ে। বড় যন্ত্রণা হয় বুকের মধ্যে। এত পাপ কি ভগবান সইবেন? মদনের যদি ভালোমন্দ কিছু হয় তো তার কর্মফল কানাইতেও অর্সাবে। যদি সেই পাপ ছেলেটার ওপর এসে পড়ে?

বাইরে কে ডাকছে। কানাইয়ের বউ দিনরাত কেঁদেকেটে মাথা খুঁড়ে আজকাল বড় রোগা হয়ে গেছে। চেনা যায় না! সে এসে বলল, ইস্কুলের ছেলেরা এসেছে।

বুক কেঁপে গেল। তবু নিজেকে শক্ত করে উঠে এল কানাই।

বড় ক্লাসের কয়েকটা ছেলে গম্ভীরমুখে বাইরে দাঁড়িয়ে। একজন মাতব্বর গোছের ছেলে বলল, স্যার মদনকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

—হাসপাতাল! বলে কানাই হাঁ।

অন্য একটা ফচকে ছেলে বলল, আপনি ঘাবড়াবেন না স্যার। কয়েকটা স্টিচ পড়েছে মাত্র। আর কিছু নয়।

ছেলেরা চলে গেলেও হতভম্ব ভাবটা যায়নি কানাই মাস্টারের। ঘর থেকে কয়েকদিন না বেরোনোই ভালো। ছেলেগুলো নিশ্চয়ই খেপে আছে। কে কোথা থেকে আধলা ছুড়বে হয়তো। না হলে ধরে ঠ্যাঙালেই বা কী করার আছে! সবচেয়ে চিত্তির হয় যদি মদনের বাবা পুলিশের কাছে যায়। যায়নি কি আর! গেছে। পুলিশও বোধহয় এতক্ষণে রওনা হওয়ার জন্য কোমরের কষি বাঁধতে লেগেছে। রক্তপাতে ফৌজদারি হয় সবাই জানে।

ছেলের মা এসে বলল, বাজারে যাও। তেল মশলা কিছু নেই।

শ্বাস ছেড়ে কানাই ওঠে। সন্ধের মুখে রামমন্দিরে আরতির ঘণ্টা বাজছে। সঙ্গে ঠনঠন কাঁসির আওয়াজ রোজ ভালো লাগে না। আজ লাগল। ঘণ্টা ডাকছে।

কানাই বেরিয়ে পড়ে। চোখে জল আসছে। বুকটা কেমন করে। কোনওকালে মন্দিরে যায় না কানাই মাস্টার। আজ ভাবল একবার যাবে। বুড়ো চক্কোত্তিমশাইয়ের সঙ্গে একবার দেখা করে আসবে। সবাই বলে লোকটা খুব বড় মানুষ। এককালে তাঁর ভর হত। জিগ্যেস করবে—আমার পাপ কি ছেলেতে অর্সাবে ঠাকুর?

তিন

রেবার গানের মাস্টারমশাই এসেছে। লোকটা ছোকরা, তার ওপর গান শেখায়। এসব লোক বড় বিপজ্জনক হয়।

তাই প্রথম-প্রথম গানের মাস্টার এলেই হেম গিয়ে ঘরে মোড়া পেতে বসে সব লক্ষ করত। গানের আড়ালে আবডালে দুজনের কোন হেলন-দোলন নজরে পড়ে কি না।

একদিন রেবা ধমক দিল মাস্টারমশাই চলে যাওয়ার পর। বলল, সুরের কিছু বোঝো না, তবু সামনে গিয়ে অমন হাঁ করে বসে থাকো কেন বলো তো? তুমি সামনে থাকলে আমার গাইতে বড় লজ্জা করে। আর কখনও ওরকম করবে না বলে দিচ্ছি।

কপাল এমনই যে হেমের বউ রেবা বেশ সুন্দরীই। সাদাটে রং, লম্বাটে গড়ন, মুখখানা মন্দ নয়, তার ওপর চোখ দু-খানা ভারী মিঠে। এমন করে তাকায় যেন সবসময় বড় অবাক হয়ে আছে। এইরকম বউ যার থাকে তার বড় জ্বালা।

হেমের আজকাল বারবার ডাইসে হাত পড়ে যায়। লোহার ছেঁকাও বিয়ের পর থেকে বড্ড বেশি খাচ্ছে হেম। কারখানায় কাজের সময়ে অন্যমনস্ক থাকলে আরও কত বিপদ হতে পারে। রেবার মতো সুন্দরী বউ জুটবে এমন ভরসা তার ছিল না কখনও, তবু কোন পুরুষ না বিয়ের আগে সুন্দরী বউয়ের কথা ভাবে। হেমও ভাবত। কিন্তু এ জ্বালা জানলে বিয়েতে বসবার আগে আর একবার ঠান্ডা মাথায় ভেবে দেখত সে।

বিয়ের পর একদিন হাওড়ার খুরুট রোডের কাছে সিনেমা দেখতে গেছে। টিকিট কাটবার পর শো শুরু হতে দেরি আছে দেখে হেম রেবাকে নিয়ে লেমোনেড খেতে গেল। রেবা লেমোনেড দিয়ে দুটো মাথা ধরার বড়ি খেল। রেবার বড়ি খাওয়ার দৃশ্যটা হাঁ করে দেখছিল হেম। দেখতে গিয়ে এত মজে গিয়েছিল যে সে নিজেও রেবার মতো ঘাড় উঁচু করে হাঁ করে বড়ি গেলার মতো ভাব করে ফেলেছিল নিজের অজান্তে। তারপর যখন রেবা লেমোনেডের ঝাঁঝে মুখচোখ কোঁচকালো তখন তাই দেখে হেমেরও কোঁচকালো। আর এইসব হওয়ার সময়ে দোকানের চাওড়া আয়নায় হেম হঠাৎ দেখতে পায় তিন-চারটে বখা ছেলে রাস্তার ওপাশে দাঁড়িয়ে রেবার দিকে চেয়ে নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি বলাবলি করছে।

ভ্রূ কুঁচকে খানিক চেয়ে থাকে সে। মাথা বিগড়ে গেল। সে গুন্ডা নয়, কিন্তু তখন মনে হয়েছিল, হলে ভালো হত। তার বউয়ের দিকে না হয় লোকে তাকাবে—এ কেমন কথা?

হলে ঢুকবার পর গন্ডগোলটা পাকাল। সেই তিনটে ছোঁড়া একেবারে পিছনের সিটে। হেম ছবি দেখবে কী, বারবার ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনে দেখছে। নিউজরিল শেষ হয়ে ইন্টারভ্যালের আলো জ্বলবার সময়ে দেখল এক ছোকরা রেবার সিটের পিছনে হাত রেখেছে। আর যাবে কোথায়!

—কীরকম ভদ্রলোক হে তুমি? ভদ্রমহিলার একেবারে ঘাড়ের ওপর হাত রেখেছ? এই বলে খেঁকিয়ে উঠেছিল সে।

ছেলেগুলো আচমকা ধমক খেয়ে প্রথমটায় ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল। তারপরই তেড়ে ফুঁড়ে উঠে তারাও তড়পাতে থাকে—কে মেয়েছেলের ঘাড়ে হাত রেখেছে? আপনি তুমি-তুমি করে বলছেন কেন? অত ছুঁচিবাই থাকলে মেয়েছেলে সিন্দুকে ভরে রেখে আসবেন। লেডিজ সিটে গিয়ে বসবেন এবার থেকে।

হেম হাতফাত চালিয়ে দিত ঠিক। রেবাই তাকে সামলায়। পরে বাড়ি ফেরার সময় বলেছিল —ওরা কিছু তো করেনি, তুমি রেগে গেলে কেন?

রাগ যে কেন হয় হেমের, তা কারও বোঝার নয়। এই জীবনটা এইরকম জ্বলে পুড়ে যাবে।

ছোকরা গানের মাস্টার ঘরে সন্ধের আলো জ্বালাবার মুখটাতেই এসে হাজির। রেবা প্রায় দুপুর-দুপুর বেলা থেকে খুব সেজে বসে আছে। কোলে খোলা গানের খাতা নিয়ে বিছানায় আসন পিঁড়ি হয়ে বসে তখন থেকে 'তৃষ্ণাতুরের কেউ জল চায় কেউ বা সিরাজি মাগে' লাইনটায় সুর লাগাচ্ছে। হেমকে দেখেও দেখছে না।

হেম ঘোষের গলায় এক সময়ে সুর ছিল। না ঠিক গানের গলা নয়! তবে সিনেমা বা রেডিওর গান গুনগুন করতে-করতে প্রায় সুরটা এনে ফেলত।

আচ্ছা, এমন হতে পারে না কি যে, হেম খুব গোপনে কোনও বড় ওস্তাদের কাছে গিয়ে গান শিখে খুব বড় গাইয়ে হয়ে গেল একদিন। রেবা টেরও পেল না এত কাণ্ড। তারপর কোনওদিন হয়তো রেবার মাস্টার গান শেখাতে এসে সুর তুলতে গলদঘর্ম হচ্ছে, এমন সময়ে সাদামাটা চাবির কারিগর হেম ঘোষ হঠাৎ সবাইকে চমকে দিয়ে ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে নিখুঁত সুরে গানটা গেয়ে দিল! রেবা তখন যা অবাক হয়ে তাকাবে না। সেই দিনই মাস্টারকে অহঙ্কারের সঙ্গে বলে দেবে —আর আপনাকে দরকার হবে না প্রভাসদা। তারপর হেমের সঙ্গে যখন একা হবে রেবা তখন দু-হাতে গলা জড়িয়ে ধরে হেমের কালো মোটা ঠোঁটে চুমু খেয়ে বলবে—তোমার ভিতর কত জাদু আছে বলো তো! তখন হেম খুব হাসবে। খুব হাসবে। একেবারে হেঃ হেঃ করে পেট ভরে হেসে নেমে একচোট।

দাওয়ার বসে খানিকক্ষণ এইসব ভাবল সে। ঘর থেকে গান আসছে, গোয়াল থেকে মশা আর শুকনো গোবরের গন্ধ। কাঁকড়াবিছের চিন্তাটাও বড্ড পেয়ে বসেছে হেমকে। চক্কোত্তিমশাই অনেক ওষুধ জানেন। দিনেকালে কত শক্ত রোগ ভালো করেছেন বলে শোনা যায়। একবার চক্কোত্তিমশাইয়ের কাছে গিয়ে কাঁকড়াবিছে কামড়ালে কী ওষুধ দিলে আরাম হয় তা ফাঁকমতো জেনে আসবে হেম। রেবার যা সুখের শরীর, একবার বিষবিচ্ছুর কামড় খেলে ফুলের মতো শরীরটা নীলবর্ণ হয়ে নেতিয়ে পড়বে না? ভাবতেই গা শিউরে ওঠে।

'...কেউ বা সিরাজি মাগে—এ এ' গানের মাস্টারের ভরাট গলার সঙ্গে ডুয়েটে রেবার কোকিলস্বর জড়ামড়ি করছে। সইতে পারে না হেম ঘোষ। বিড়িটা নিবে গিয়েছিল, আর

ধরাতে ইচ্ছে হল না। ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। বেরোবে।

হেমের পরনে লুঙ্গি আর গেঞ্জি। গেঞ্জির ওপর জামাটা চড়িয়ে নিলে হত। কিন্তু এসময়টায় ঘরে ঢুকতে সাহস হয় না। রেবা রেগে যাবে ঘরে ঢুকলে।

উঠোনে পাঁচিল দিয়ে ঘেরা, পাঁচিলের গায়ে বেরোনোর দরজা। ঠিক দরজার চৌকাঠে মুখোমুখি কালিদাসীর ছেলে অভয়পদর সঙ্গে দেখা। অভয়পদর হাতে এক ঠোঙা ঝালমুড়ি। ঝালের চোটে শিস টানছিল। হেম ঘোষকে দেখে ঠোঙাটা এগিয়ে ধরল। হেম হাত পাতলে ঠোঙা উপুড় করে দেয় অভয়। তলানি মুড়িতে যত কুঁড়ো মিশে আছে। তাই মুখে ফেলে হেম ঘোষ বলে—খবর কী?

—আর খবর! অভয়পদ বলে—আজও মোহনবাগানের একটা পয়েন্ট গেল।

হেম ঘোষ খেলার মাঠের খবর রাখে না। তবু অভয়পদকে তোয়াজ করবার জন্য বলল, এঃ হেঃ! একটা পয়েন্ট চলে গেল?

অভয়পদর বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। হাওড়ার বিখ্যাত মাতব্বর জ্ঞান সরকারের শাগরেদ। জ্ঞানদা ওর মাথাটা খেয়ে রেখেছে। ঘুমে জাগরণে সবসময়ে ওর মুখে জ্ঞানদা আর মোহনবাগানের কথা। কবে জ্ঞানদা ডেকে অভয়পদর সঙ্গে গোপন পরামর্শ করেছে, কবে যেন বলেছে—অভয়, আমার বাড়িতে একটা বাচ্চা চাকর ঠিক করে দিস তো, কবে হয়তো জ্ঞানদার গাড়িতে উঠে বড়বাজারের লোহাপট্টিতে গেছে, এসবই অভয়পদর বলবার মতো কথা। আজকাল অভয়পদকে দেখলেই লোকে সটকাবার তাল করে। কাঁহাতক জ্ঞানদার বৃত্তান্ত শোনা যায়!

হেম ঘোষের সেই ভয়। তবে কিনা অভয়পদর আর কোনও দোষ নেই। বরং জ্ঞানদার শাগরেদি করে সে চিরকুমার রয়ে গেছে, মেয়েমানুষকে খুব ভক্তিশ্রদ্ধা করে, লোকের বেবিফুড জোগাড় করে দেয়, ইলেকট্রিক বিল জমা দিয়ে আসে পাঁচজনের। মড়া পোড়াতে যায়। বাড়ি ভাড়ার টাকা তুলে, দুধ আর ঘুঁটে বেচে মা কালিদাসী সংসারটাকে কষ্টেসৃষ্টে টেনে নেয়। নিষ্কর্মা অভয়পদ তাই বড় সুখে আছে।

অভয়পদ বলল—আজ একটা মিটিং আছে জ্ঞানদার বাড়িতে, বুঝলে? চা-টা খেয়েই বেরোব।

—খুব ভালো। বলে হেম বেরিয়ে আসছিল।

মানুষ যে কেন খামোকা মিটিং করে মরে আজও হেম বোঝে না। যত সব ফালতু কারবার। দশটা মাথা এক হয়ে যত সব গুজুর-গুজুর, ফুসুর-ফুসুর।

সিঁড়ির মুখ থেকে অভয়পদ ফিরে এসে বলল—ও হেম, শোনো।

হেম ভয়ে সিঁটিয়ে যায়। মিটিং-এর কথা না ফেঁদে বসে। ওসব কথায় বড্ড মাথা বিগড়ে যায় তার।

অভয়পদ গলার স্বর নামিয়ে বলে—তোমার বউ কি সিগারেট-টিগারেট টানে নাকি! রাতে ওপরের বারান্দা থেকে যেন দেখলুম উঠোনে রেবা সিগারেটে টান মারতে-মারতে পায়চারি করছে।

কী কেলেঙ্কারী! হেমের ভিতরটা যেন লজ্জায় গর্তের মতো হয়ে যায়। কাল তখন অনেক রাতে তারা স্বামী-স্ত্রী জ্যোছনা দেখতে উঠোনের দিকে দাওয়ায় এসে বসেছিল একটু। এমনিতে হেম ঘোষ সিগারেট খায় না, রেবার চাপাচাপিতে ইদানীং খেতে হচ্ছে। কাল রাতেও খাচ্ছিল। সদ্য ধরানো সিগারেটটায় দু-টান দিতে না দিতেই রেবা হাত থেকে কেড়ে নিয়ে বলল—আমি খাব।

হেম অবাক। দেখে, রেবা দিব্যি ফসফস টান মারছে। কাশিটাশি নেই, চোখে জলও এল না ধোঁয়ায়। বলল—আগে খেতেটেতে নাকি?

—কত! বাবার প্যাকেট থেকে চুরি করে অনেক খেয়েছি। বেশ লাগে।

বলে রেবা সিগারেট টানতে-টানতে উঠোনে ঘুরে বেড়াতে লাগল। সেসময়ে বাড়ির কারও জেগে থাকবার কথা নয়। তারাও কিছু টের পায়নি। রামচন্দ্র হে! অভয়পদ দেখে ফেলেছে তবে!

হেম ঘোষ হেসে আমতা-আমতা করে বলে—ওই শখ করে দুটো টান দিয়েছিল আর কী! তারপর কেশে-টেশে ফেলে দেয়।

অভয়পদ আদর্শবাদী লোক। মুখটা কেমনধারা করে বলল—দেশটা যে একেবারে সাহেব হয়ে গেল হে হেম! ভারতবর্ষের কত সম্পদ ছিল!

কথাটা ভালো বুঝল না হেম। অভয়পদও বুঝিয়ে বলল না। চলে গেল।

রেবাকে সিগারেট খেতে অভয় দেখেছে, লজ্জা শুধু সে জন্যই নয়। হেম ঘোষ আর-একটা কথা ভেবে থমকে দাঁড়িয়ে জিভ কাটল। কী কেলেঙ্কারী! কাল জ্যোছনায় তাদের দুজনেরই বড় রস উস্কেছিল। নিরিবিলি, নিশুতি জ্যোছনায় পরীর মতো বউটাকে দেখে খুব দু-চারটে দেহতত্ত্বের কথা হেসে-হেসে বলে ফেলেছিল হেম। রেবাও দু-চারটে ভালো টিপ্পনি ঝেড়েছিল। দোষের কথা নয়। স্বামী-স্ত্রী একা হলে এরকম কত কথা হয়! কিন্তু সেসবই যে শুনে ফেলেছে অভয়পদ! কী লজ্জা! কী লজ্জা!

এই জিভ কাটা অবস্থায় হেম ঘোষ যখন দাঁড়িয়ে ঠিক তখনই এক জোড়া মাঝবয়সি স্বামী-স্ত্রী ভুঁইফোঁড়ের মতো তার সামনে কোত্থেকে হাজির হয়ে আচমকা বলল—আচ্ছা মশাই, গুন্টু কি বাড়িতে আছে?

আর-এক দফা লজ্জা পেয়ে হেম বলে—না, সে মন্দিরে কাঁসি বাজাতে গেছে।

চার

গুন্টু যখন কাঁসি বাজায় তখন সে নিজেই শব্দ হয়ে যায়। ব্যাপারটা কীরকম হয়, কাঁসি বাজাতে-বাজাতে শব্দটা আস্তে-আস্তে বড় হতে থাকে। কাঁইনানা-কাঁইনানা হয়ে বাজতে-বাজতে কানে তালা ধরে আসে, শরীর ঝিমঝিম করে। তারপর শব্দটা যেন তার চারধারে লাফাতে থাকে। লাফিয়ে-লাফিয়ে বহুদূর চলে যায়। আবার ফিরে আসে। তারপরই সে পরিষ্কার টের পায় শব্দটা আকাশ বাতাস সব হাঁ করে গিলে ফেলল। প্রকাণ্ড হয়ে গেল। দুনিয়াভর হয়ে গেল। আকাশভর হয়ে গেল। তারপর আর গুন্টু নিজেকে টের পায় না। বড় মজা হয় তখন। গুন্টু শব্দ হয়ে যায়।

মাস দুই আগে গুন্টু চৌধুরীদের প্রকাণ্ড বাগানে পেয়ারা চুরি করতে ঢুকেছিল দুপুরবেলা। কোথাও কিছু না, হঠাৎ একটা শিরীষগাছে এক হনুমানকে দেখতে পেল সে, বুকে বাচ্চা নিয়ে বসে আছে।

যে-কোনও কিছুকে লক্ষ করে ঢিল ছোড়া গুন্টুর স্বভাব। বে-খেয়ালে কত সময় কত মারাত্মক জায়গায় ঢিল ছুড়েছে সে। চলন্ত গাড়ির হেডলাইট ফাটিয়েছে একবার, রাস্তার আলো ভেঙেছে কতবার, জ্ঞান সরকারের বাইরের ঘরের দেয়ালঘড়িটা রাস্তা থেকে ঢিল ছুড়ে ভেঙেছিল।

সেই স্বভাববশে হনুমানটার দিকেও খামোকা একটা মুঠোভর ঢিল কুড়িয়ে ছুড়ে মেরেছিল। হনুমানটার তেমন লাগেনি তাতে। কিন্তু হঠাৎ খেপে গিয়ে সেটা হড়হড় করে গাছ থেকে নেমে এসে তাড়া করল গুন্টুকে। গুন্টু দৌড়-দৌড়। জংলা বাগানটার মাঝ বরাবর পুরোনো পুকুর, তাতে সবুজ শ্যাওলা থিকথিক করছে, বড়-বড় মাছ। অন্যদিকে পথ না পেয়ে গুন্টু সেই পুকুরে ঝাঁপ খায়।

গুন্টু সাঁতরায় ভালোই। কিন্তু ত্যাঁদড় হনুমানটার জ্বালায় কিছুতেই আর জল ছেড়ে উঠতে পারে না। যেদিক দিয়ে উঠতে যায় সেদিকেই সেটা গিয়ে হুপহুপ করে হাঁক ছাড়ে।

সেই হাঁক-ডাকে আরও কয়েকটা হনুমান কোত্থেকে এসে জুটল। অথৈ জলের মধ্যে গুন্টুকে সারাক্ষণ হাত পা নেড়ে ভেসে থাকতে হয়েছিল। ফলে পচা আঁশটে গন্ধ, শ্যাওলার লতা বারবার পায়ে হাতে জড়াচ্ছে, বড়-বড় জাহাজের মতো মাছ মাঝে-মাঝে গায়ে ধাক্কা দিয়ে ঘষটে যাচ্ছে। কয়েকবার লেজের ঝাপটা খেলো। এক হাত তফাত দিয়ে সাঁতরে চলে গেল একটা জলঢোঁড়া। পায়ের বুড়ো আঙুল বাড়িয়ে ডুব দিয়ে বহুবার থই খুঁজে পেল না গুন্টু। তার কচি বুকে দম বেশি ছিল না তো। তাই এক সময়ে হঠাৎ চোখের সামনে সূর্য নিবু-নিবু হয়ে গেল, বুকে বাতাসের টান, হাতে পায়ে খিল। সে তখন বিড়বিড় করে বলেছিল—আমি যে রোজ সন্ধেয় তোমার মন্দিরে আরতির সময়ে কাঁসি বাজাই!

তারপরই হঠাৎ যেন এক পাতালপুরীর হাত এসে গুন্টুকে টেনে নিল জলের তলায়।

সেইখানে রামচন্দ্রের সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা। মরলে তো সবাই তাঁর দেখা পায়। গুন্টু গিয়ে দেখে আরেব্বাস! সেখানে পেল্লায় চৌকি পেতে বুড়ো চক্কোত্তিমশাই বসে তামাক খাচ্ছেন। তাকে দেখে বলে উঠলেন—গুন্টু রাজার গালে হাত! গুন্টু রাজার গালে হাত! গুন্টু রাজার গালে হাত।

তা গালে হাত দেওয়ারই দাখিল। যা অবাক হয়েছিল। তবু গুন্টু চক্কোত্তিমশাইকে অচিন জায়গায় পেয়ে ভারী খুশি। প্রণাম করে ফের ভালো করে তামাক সেজে দিল। চক্কোত্তিমশাই বললেন—তা শব্দ হওয়া ভালো। দুনিয়াটা হলই তো শব্দ থেকে। যেখানে সেখানে ভালো করে যদি শুনিস তো দেখবি, দুনিয়ায় সব শব্দ। তুইও শব্দ, আমিও শব্দ। মনে করিয়ে দিস, তোকে ভালো দিন দেখে একটা শব্দ দেব'খন। সে এমন শব্দ যে কাঁসির শব্দ তার কাছে কোথায় লাগে। এখন যা।

ডোবার আধঘণ্টা পর গুন্টু ফের ভেসে উঠেছিল। পেটে জল, মুখে গাঁজলা, চোখের মণি ওলটানো, জ্ঞান নেই, মৃত্যুক্ষীণ নাড়ি চলছে না। তাই দেখে হনুমানগুলো এমন হাল্লাচিল্লা ফেলে দিয়েছিল যে চৌধুরীবাগানের বুড়ো মালি এসে পড়েছিল দুপুরের ঘুম ভেঙে। সেই তোলে গুন্টুকে। পেটের জল বার করে সেঁক তাপ দেয়। ডাক্তার-বদ্যি করতে হয়নি, হাসপাতালেও যেতে হয়নি। কেউ তেমন টেরও পায়নি ঘটনা।

বেঁচে গিয়ে তেমন অবাক হয়নি গুন্টু। কেমন করে যেন মনে হয়—মরলেই হল আর কী! চক্কোমত্তিমশাই সব জায়গায় পাহারা দিচ্ছে না! যেখানেই যাও গিয়ে দেখবে ঠিক বুড়ো মানুষ আপদবিপদের দোর আগলে চৌকি পেতে বসে তামাক খাচ্ছে নিশ্চিন্তে।

রাম মন্দিরে আরতির সময় এখনও বেজায় ভিড় হয়। নতুন ঠাকুরমশাই আরতিও করেন ভালো, তবে কিনা চক্কোত্তিমশাইয়ের আরতি যারা দেখেছে তাদের চোখে অন্য কিছু

আর লাগে না। তবু অভ্যাসবশে মানুষ এসে দাঁড়ায় খানিক।

এখান থেকে চারচালাটা বেশি দূর নয়। নাটমন্দিরের পর একটা মাঠ তারপর একটা কাঁচা রাস্তা, সেটা পেরিয়েই বাগানের বাঁশের বেড়ার গায়ে কাঠের ফটক। কয়েকটা ফুল গাছের ঝোপ, জোনাকি পোকার আলো, একটু অন্ধকার। খোলা দাওয়ায় একটা চৌকি পাতা, সাদা বিছানা, মেঝেয় চটি জোড়া নিখুঁতভাবে রাখা, একপাশে গড়গড়া। বিছানায় চাক্কোত্তিমশাই দুটো বালিশে ঠেলান দিয়ে বসে থাকেন। গুড়ুক-গুড়ুক তামাক খাওয়ার শব্দ হয়।

আউন্তি যাউন্তি মানুষজন দু-দণ্ড দাঁড়ায় এসে সামনে। বলে—চক্কোত্তিমশাই, মন্দিরের পুজোয় আর যে যান না!

বুড়ো মানুষটা একগাল হেসে বলেন—রামকৃষ্ণদেব বলতেন, মেয়েরা ততদিন এই পুতুল খেলে যতদিন বে না হয়। বিয়ে করে আসল ঘরসংসার পেলে আর পুতুল খেলে কে রে?

লোকে একটুআধটু বোঝে না যে তা নয়।

গুন্টু বোঝে। আরতির পর গুন্টুর অনেকক্ষণ সাড় থাকে না। মগজে তখন কেবল ঘণ্টার শব্দ, কেবল কাঁসির আওয়াজ।

একদিন বলে ফেলেছিল গুন্টু—আরতির পর আমি এক অন্যরকম ঘণ্টার শব্দ শুনি। সে আওয়াজ মন্দিরের নয়, অন্য জায়গা থেকে আসে।

চক্কোত্তিমশাই সাবধান করে দিয়ে বলেছিলেন—খুব মনপ্রাণ দিয়ে শুনবি। কাউকে বলিস না।

গুন্টুর মায়ের কথা মনে নেই। সে মায়ের পেট থেকে পড়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তার মা মারা যায়। সেই থেকে সে দিদিমার কাছে। তার বাবা আবার বিয়ে করেছে। মাঝে-মাঝে ঝাড়গ্রাম থেকে বাবা তাকে দেখতে আসে। ভারী নিরীহ, ভীতু মানুষ, দ্বিতীয় পক্ষের দাপটে অস্থির। দ্বিতীয় পক্ষ আসতেও দেয় না বড় একটা। কিন্তু বাবা এসে গুন্টুকে দেখে ভারী খুশি হয়। এক গাল হাসে, বড় চোখে হাঁ করে এমনভাবে দেখে যেমন লোভী লোক খাবারের দোকানের দিকে চায়।

বাবা একদিন জিগ্যেস করেছিল—বলো তো বাবা, তোমার কে কে আছে?

গুন্টু ভেবেচিন্তে বলেছিল—দিদিমা, মামা আর চক্কোত্তিমশাই।

বাবা অবাক হয় বলে—চক্কোত্তি আবার কে?

—সে আছে।

বাবা শ্বাস ফেলে বলল—আর আমি?

গুন্টু তখন লজ্জা পেয়ে বলে—হ্যাঁ বাবা, তুমিও। আর সৎমা।

—ছিঃ বাবা, সৎমা বলতে নেই। লোকে খারাপ ভাববে। শুধু মা। আরও বলি বাবা, তোমার কিন্তু আর দুটি বোন আছে। তারা তোমাকে ভারী দেখতে চায়। তোমার মাও বলে, এবার গুন্টুকে নিয়ে এসো।

গুন্টুর যে যেতে অনিচ্ছে তা নয়। কিন্তু দিদিমা ছাড়তে চায় না। কথা উঠলে বলে, আঁতুড় থেকে মানুষ করছি, ওর নাড়ি আমি ছাড়া আর তো কেউ চিনবে না। অন্যের হাতে নষ্ট হয়ে যাবে।

কিন্তু মুশকিল হল, গুন্টু শুনেছে, তার সৎমায়ের দুটি মাত্র মেয়ে, আর নাকি ছেলেপুলে হবে না। কিন্তু সৎমায়ের খুব ছেলের শখ। তাই এখন প্রায়ই গুন্টুর বাবাকে বলে, সতীনপোকে নিয়ে এসো, তাকে নিজের ছেলে করে নেব।

তাই বাবা আজকাল খুব ঘন-ঘন আসে। গুন্টুও জানে, একদিন তাকে হয়তো ঝাড়গ্রামে চলে যেতে হবে। সৎমাকে সে দেখেনি। তবে 'মা' বলে কাউকে ডাকতে খুব ইচ্ছে করে তার। আবার এ জায়গা ছেড়ে, দিদিমা মামা আর চক্কোত্তিমশাইকে ছেড়ে চলে যেতে ইচ্ছেও করে না। গুন্টুর আজকাল তাই মনটা দু-ভাগ হয়ে গেছে।

মামা প্রায়ই গুন্টুকে বলে—তোকে যা একটা লিডার তৈরি করব না গুন্টু, দেখে নিস। একটু বড় হ, তখন জ্ঞানদার কাছে নিয়ে গিয়ে এখন ট্রেনিং দেওয়াব। জ্ঞানদার হাতে কত লিডার তৈরি হয়েছে।

গুন্টুর লিডার হতে খুব ইচ্ছে।

আরতির শেষে আজ বড় একা-একা লাগছিল গুন্টুর। কাঁসি বাজানোর সময় আজ তিনধা নাচন নেচেছে। এখন তাম্রপাত্র নিয়ে নাটমণ্ডপের ধারে বসে হাজারটা হাতের পাতায় তামার কুশি দিয়ে চরণামৃত দিচ্ছে। কত হাত! হাতগুলোতে ভয় লোভ হিংসে মাখানো। এক আধটা হাত ভারী ঠান্ডা। দেখে-দেখে আজকাল বুঝতে পারে সে।

একটা সাদা কাঁপা-কাঁপা হাত থেকে খানিক চরণামৃত চলকে পড়ে গেল। মুখের দিকে তাকানোর সময় নেই গুন্টুর। কিন্তু সে ঠিক টের পায় এ হাতটা হল কানাই মাস্টারের।

কানাই স্যারের প্রাণে আজ বড় কষ্ট।

একটা ছ্যাকা খাওয়া, কড়াপড়া বিদঘুটে হাত দেখে পরিষ্কার বুঝতে পারল গুন্টু, এ হল হেম ঘোষ। হেম ঘোষের হাতটা কাকে যেন খুন করতে চায়।

একবার চক্কোত্তিমশাই একটা কচি বেলগাছ দেখিয়ে গুন্টুকে জিগ্যেস করেছিলেন—বল তো কত পাতা আছে গাছটার।

ভেবেচিন্তে গুন্টু বলে—হাজার দুই হবে।

—দেখ তো গুণে।

সে বড় কষ্ট গেছে। এক মানুষ সমান উঁচু গাছটার নীচে টুল পেতে তার ওপর দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে পাতা গুণতে হল। দাঁড়াল চার হাজারের ওপর। তবু একটা আন্দাজ হল।

সেই থেকে চক্কোত্তিমশাই এরকম হরেক জিনিস আন্দাজ করতে শেখান গুন্টুকে। করতে করতে গুন্টুর আন্দাজ ভারী চমৎকার হয়েছে। খুব ঝুপসি গাছ হলেও তা দেখে টকাস করে বলে দিতে পারে তাতে পাতা কত। জানে, গুনে দেখলে ঠিক মিলে যাবে।

চক্কেত্তিমশাই শিখিয়েছেন, রোজ রাতে শোওয়ার আগে বিছানায় বসে সারা দিনের কথা ভাববি। সকাল থেকে কী করলি, কী খেলি, সব হুবহু মনে করা চাই। এ না করে ঘুমোবি না।

তাই করত রোজ গুন্টু। ছ'মাস পর তার বেশ তড়তড়ে মন হল। টক করে সব মনে পড়ে যেতে থাকে। তখন চক্কোত্তিমশাই শেখালেন, এবার রোজকার কথা, আর তার সঙ্গে আগের দিন, আগের-আগের দিন এইভাবে মনে করবি। করতে-করতে দেখবি একদিন তোর আর-জন্মের কথা মনে পড়ে যাবে।

—তাতে কী হয় চক্কোত্তিমশাই?

—তাহলে আর মানুষ মরে না। দেহ ছাড়ে, কিন্তু মরে না।

গুন্টুর দিকে আর-একটা হাত এগিয়ে আসে। হাতে শাঁখা, তাতে সিঁদুরের দাগ। গুন্টু যেন এ হাত চেনে। কুশি তুলেও গুন্টু থেমে থাকে। এ হাত কি চরণামৃত চায়? না এ হাত একটা ছেলে চায়। এ হাতের বড় আকুলিবিকুলি।

হাতটা ওই অত হাতের ভিড়ের ভিতর থেকে একটু ওপরে উঠে এসে গুন্টুর থুতনি ধরে মুখখানা ওপরে তুলল। আর তখন নাটমন্দিরের জোর আলোয় একজোড়া জল টলটলে চোখ দেখতে পায় গুন্টু। ঘোমটার নীচে ফরসা মুখ। ঠোঁটে একটা কান্নায় ভেজা

হাসি। পিছনেই বাবা দাঁড়িয়ে। ভারী তটস্থভাবে বাবা মহিলাটির কাঁধে হাত দিয়ে বলল—এখন না। ও এখন ব্যস্ত। বাড়িতে যাক ভালো করে দেখো।

চোখ বুজে মহিলাটি বলে—এ যে দেবতার মতো ছেলে। আমার সতীন বড় ভাগ্যবতী ছিল।

গুন্টু ভারী লজ্জা পায়। তাড়াতাড়ি হাতে হাতে চরণামৃত ঢেলে দিতে থাকে সে। মাথা নীচু। কারও মুখের দিকে তাকানোর সময় নেই।

পাঁচ

রেবা ঝুঁকে গানের খাতা দেখছিল। গানের মাস্টার প্রভাস খানিকক্ষণ তবলায় আড় চৌতাল তুলবার চেষ্টা করে এইমাত্র একটা সিগারেট ধরাল। নতমুখী রেবার দিকে চেয়ে রইল খানিক। বেশ দেখতে মেয়েটা। মাঝে-মাঝে এমন করে তাকায় যে ভিতরটা কেঁপে ওঠে।

প্রভাস অনেকদিন ধরেই বুঝবার চেষ্টা করছে, রেবার হাবভাবে কোনও ইঙ্গিত আছে কি না। মাঝে-মাঝে যেন মনে হয়, আছে। আবার কখনও মনে হয়, না, নেই।

আছে কি নেই সেটা বুঝবার জন্যও একটা কিছু করা দরকার। ধসা কানা হয়ে বসে থেকে কোনওদিনই তা বোঝা যাবে না।

ভাবতে-ভাবতে প্রভাস একবার বাঁয়ার একটা টুম শব্দ তুলল। রেবা তাকাল না। বাঁ-হাতখানা হারমোনিয়ামের ওপর দিয়ে এসে ঝুলছে। কী চমৎকার আঙুল! এই মেয়ের বর কিনা হেম ঘোষ! কাকের মুখে কমলালেবু।

প্রভাস আন্দাজ করে, হেম ঘোষের বউ হয়ে রেবা নিশ্চয়ই খুব সুখী নয়। তাহলে রেবা প্রভাসকে একেবারে হ্যাটা করবে না।

ভেবেচিন্তে প্রভাস আজ সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলল। একটা কিছু হোক। হয়ে যাক।

গানের সময়ে আজকাল ঘরের লোকজন তাড়িয়ে দরজা দিয়ে জানলার পরদা টেনেটুনে দিয়ে বসে রেবা। সেটাও কি একটা ইঙ্গিত নয়? কোন বোকা এসব ইঙ্গিত ধরতে না পারে?

খুব সাহস হল প্রভাসের। আত্মবিশ্বাস জেগে উঠল।

একটু ঝুঁকে প্রভাস হঠাৎ রেবার ঝুলন্ত হাতখানা খপাত করে চেপে ধরে ডেকে উঠল —রেবা!

জানলার পরদার ওপাশে অভয়পদ একটা অনেকক্ষণ ধরে চেপে রাখা শ্বাস ছেড়ে বেশ জোরে বলে উঠল—আগেই বলেছি কিনা মা, যে মেয়ে সিগারেট খায়, তার চরিত্র ভালো হতে পারে না! এসে দেখে যাও এখন স্বচক্ষে।

ঘরের ভিতরে প্রভাস তখন ছিটকে নেমে পড়েছে চৌকি থেকে। টর্চ জ্বেলে তাড়াহুড়ো করে চটি খুঁজছে। মনের ভুল। ঘাবড়ে গিয়ে ভুলে গেছে যে, চটি দরজার বাইরে ছেড়ে আসে রোজ।

রেবা সাদা মুখে প্রভাসের দিকে চেয়ে বলল—কী করলেন বলুন তো প্রভাসদা! এখন এ বাড়িতে কি আর থাকা যাবে! কত কষ্টে বাপের বাড়ির কাছে এই বাসা খুঁজে বের করেছি। এখন যদি ছাড়তে হয় তবে ও ঠিক আবার ওদের সংসারে নিয়ে গিয়ে তুলবে।

প্রভাস দরজার কপাট হাতড়ে ছিটকিনি খুঁজছে তাড়াতাড়ি।

রেবা পিছনে এসে দাঁড়িয়ে বলতে লাগল—এ বাসায় কত সস্তায় ছিলাম জানেন! এ অঞ্চলে পঁচিশ টাকায় ঘর আর পাওয়া যাবে? বাড়িউলি মানুষটা কত ভালো ছিল। ছিঃ-ছিঃ, এ আপনি কী করলেন বলুন তো!

প্রভাস ছিটকিনি খুলে চটি খোঁজার জন্য আর ঝামেলা করল না। দুই লাফে উঠোন পেরিয়ে খালি পায়ে রাস্তায় নেমেই একটা রিকশায় উঠে পড়ল। বলল—জোরে চালাও ভাই।

রেবা দরজার কাছ বরাবর গিয়ে সজল চোখে তাকিয়ে থাকল একটু। তারপর কেঁদে ফেলল। ইস, অভয়দা দেখে ফেলেছে। এখন ঠিক বাড়ি-ছাড়া করবে তাদের।

উঠোনের ওপাশের অন্ধকার থেকে কালিদাসীর গলা আসছিল—তোরই বা উঁকি মারতে যাওয়ার কী দরকার! ওসব লোক ওরকমই হয় বাবু। তুই নিজের কাজে যা!

—যাচ্ছি।

—গুন্টুকে ডেকে দিস তো। দুপুর থেকে ছেলের টিকি নেই।

রেবার খুব বলতে ইচ্ছে করছিল—মাসিমা, আমাদের বাসা ছাড়তে বলবেন না। আমি গানের মাস্টারকে ছাড়িয়ে দেব।

কিন্তু তা আর বলা হল না। সিঁড়িতে শব্দ করে কালিদাসী উঠে গেল।

গুম হয়ে বসে রইল রেবা। এ বাড়িতে যে কত সুবিধে! খুব সস্তায় কালিদাসীর কাছ থেকে ঘুঁটে কেনে রেবা। আড়াই টাকা সের দরে খাঁটি গরুর দুধ কেনে।

প্রভাসের জন্য সব গেল।

ছয়

নাটমন্দিরের নীচে নেমে এসে কানাই মাস্টার হাজার জোড়া জুতোর মধ্যে নিজের জুতোজোড়া খুঁজে পাচ্ছিল না। জায়গাটা একটু অন্ধকার মতোও বটে।

হেম ঘোষ নেমে এসে বলল, কী খুঁজছেন মাস্টারমশাই, জুতো? বলে ফস করে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে ধরল।

কানাই জুতো খুঁজে পেয়ে হেম ঘোষকে বলল, যাবেন নাকি বাজারের দিকে?

একা চলাফেরা করতে আজ কানাইয়ের ঠিক সাহস হচ্ছে না। মারাটা বড় খারাপ হয়েছে মদনকে। একবার যাবে চক্কোত্তিমশাইয়ের কাছে, ফাঁকমতো।

হেম ঘোষ উদাস গলায় বলে—সকালেই বাজার করেছি। তা আমার আর কাজ কী, চলুন বরং বাজার থেকে ঘুরেই আসি একটু। বাজার জায়গাটা ভালো।

হেমের মনে একটা পোকা কামড়াচ্ছে তখন থেকে। একা ঘরে রেবা আর গানের মাস্টার। চোখে-চোখে কথা হচ্ছে না তো! কিংবা হারমোনিয়ামের রিডে একজনের আঙুলে অন্যজনের আঙুল ছোঁয়া লাগে যদি! এর চেয়ে নিজেদের সংসারে বেশ ছিল। দশ জোড়া পাহারা দেওয়ার চোখ ছিল সেখানে। কাঁকড়াবিছের কথাও ভাবে হেম ঘোষ। ওষুধটা চক্কোত্তিমশাইয়ের কাছ থেকে জেনে নিতে হবে।

মনের কথা মনে রেখে দুজনে অন্য সব কথা বলতে-বলতে বাজারপানে যেতে থাকে।

সাত

কালিদাসী ডাক শুনে বারান্দায় এসে দেখে উঠোনে জামাই দাঁড়িয়ে। সঙ্গে বউ আর দুটো মেয়ে।

কালিদাসী শ্বাস ছাড়ে। জামাই আসবে জানাই ছিল। গুন্টুকে বুঝি এবার নিয়ে যায়।

—এসো। বলে নীরস গলায় ডাকে কালিদাসী।

ওরা উঠে আসে।

জামাই প্রণাম করতে করতেই বলে—গুন্টুকে নিয়ে যেতে এলাম মা। অনেকদিন হয়ে গেল। আপনারও কষ্ট বুড়ো বয়সে।

কালিদাসী মন্দার মাকে মিষ্টি আনতে পাঠায়। তারপর গম্ভীরমুখে এসে সামনে বসে। বলে—যার ধন সে তো নেবেই। ঠেকাবো কোন আইনে। এই বুঝি মেয়ে দুটি? বেশ মিষ্টি হয়েছে দেখতে। আর এ আমার নতুন মেয়েটিও বেশ।

এসবই মুখের ভদ্রতা। বুকটা ভিতরে-ভিতরে জ্বলে যায়। কাঁকড়াবিছে কোন ফাঁকে পাঁজর কেটে বুকের ভিতর সেঁধিয়েছে। এ হুলের বড় জ্বালা।

খানিকক্ষণ বসে গল্পগাছা করে ওরা চলে গেল। কাল সকালে গুন্টুকে নিতে আসবে।

কালিদাসী একটা চাদর গায়ে নীচে নেমে এসে ডাকল—রেবা। ও রেবা!

রেবা শুয়ে ছিল বিছানায়। ডাক শুনে হুড়মুড় করে উঠে পড়ল। এই বুঝি বাড়ি ছাড়বার কথা বলতে এসেছে!

কিন্তু না। কালিদাসী বলল—আমাকে একবার চক্কোত্তিমশাইয়ের কাছে যেতে হবে। মন্দার মা বাড়ি গেল, তা তুমি যদি একটু সঙ্গে চলো মা। আমার তো চোখে ভালো ঠাহর হয় না রাতবিরেতে।

—যাচ্ছি মাসিমা। বলে রেবা তক্ষুনি চটি পায়ে বেরিয়ে এল। রাস্তায় এসে অবশ্য জিভ কাটল রেবা। চটিজোড়া তার নয়, প্রভাসের। অন্ধকারে তাড়াহুড়োয় বুঝতে পারেনি। এখন আর কিছু করার নেই।

রেবা বলল, মাসিমা, আমার কী দোষ বলুন। লোকটা যে ওরকম তা কি জানতাম!

কালিদাসীর বুকভরা তখন গুন্টুর চিন্তা। বলল, সে জানি বাছা। আজকালকার লোক বড় ভালো নয়। সাবধানে থাকবে।

রেবা কালিদাসীকে ধরে খুব যত্নে কাঁচা ড্রেনটা পার করাল। মনে-মনে বলল, চক্কোত্তিমশাই, দ্যাখো বুড়ি যেন আমাদের না তাড়ায়।

আট

গুন্টুকে নিয়ে রেলগাড়ি হাওড়া ছেড়েছে অনেকক্ষণ। জানলার ধারে বসে সে এখন বাইরে গ্রাম আর খেত দেখছে। গা ঘেঁষে ছোট বোন দুটি বসে। মা একটু তফাত থেকে মাঝে-মাঝে মুগ্ধচোখে তার মুখের দিকে চাইছে। আর বার-বার জিগ্যেস করছে, খিদে পেয়েছে বাবা তোমার? কিছু দিই? সন্দেশ আছে, রসগোল্লা, লুচি। কত এনেছি দ্যাখো! বাবা একবার কানে-কানে জিগ্যেস করেছিল—মাকে তোর পছন্দ হয়েছে তো গুন্টু?

গুন্টু ঘাড় নাড়ল। বেশ মা। বোন দুটিও বড় ভালো। এরকম মা বোন তার ছিল না তো এতদিন! দিদিমা বড় কেঁদেছে ভুঁয়ে পড়ে। মামা স্টেশন পর্যন্ত শুকনো মুখে এসে গাড়িতে তুলে দিয়ে গেছে। চক্কোত্তিমশাইয়ের সঙ্গে দেখা করে আসেনি। মনটা বড় খারাপ লাগে। আবার ভাবে, নতুন একটা জায়গায় যাচ্ছে, সেখানে না জানি কত ফুর্তি হবে! কত খেলা!

নয়

দিন ফুরোয়। সাঁঝের আঁধার ঘনিয়ে আসে। মন্দিরে ঘণ্টা বাজছে। কানাই মাস্টার টিউশনিতে বেরোল। হেম আজ গেল রেবাকে নিয়ে সিনেমায়। অভয়পদ পরোটা খেয়ে পুজো কমিটির মিটিং-এ যাওয়ার সময় বলে গেল—মা, যাই। কালিদাসী শুনতে পেল না, সে তখন গোয়ালঘরে গরু দুটোর সঙ্গে রাজ্যের কথা ফেঁদে বসেছে।

দিনটা গেল, যেমন যায়।

উকিলের চিঠি

ও মিছরি, তোর নামে একটা উকিলের চিঠি এসেছে দেখগে যা। এই বলে মিছরির দাদা ঋতীশ টিয়ার ঝাঁক তাড়াতে খেতের মধ্যে নেমে গেল।

গোসাবা থেকে দুই নৌকো বোঝাই লোক এসেছে অসময়ে। লাট এলাকার ভিতর বাগে কোনও বিষয়কর্মে যাবে সব। এই অবেলায় তাদের জন্য খিচুড়ি চাপাতে বড় কাঠের উনুনটা ধরাতে বসেছিল মিছরি। কেঁপে উঠল। তার ভরন্ত যৌবন বয়স। মনটা সবসময়ে অন্য ধারে থাকে, শরীরটা এই এখানে। আজকাল শরীরটা ভার লাগে তার। মনে হয়, ডানা নেই মানুষের।

উকিলের চিঠি শুনে যে উনুন ফেলে দৌড়বে তার জো নেই। বাবা গুলিপাকানো চোখে দেখছে উঠোনের মাঝখানে চাটাইতে বসে। বড় অতিথিপরায়ণ লোক। মানুষজন এলে তার হাঁকডাকের সীমা থাকে না। তা ছাড়া দাদু, ঠাকুমা, মা, কাকা-জ্যাঠারা সব রয়েছে চারধারে। তাদের চোখ ভিতর বার সব দেখতে পায়। উটকো লোকেদের মধ্যে কিছু বিপ্রবর্ণের লোক রয়েছে, তারা অন্যদের হাতে খাবে না। সে একটা বাঁচোয়া, রান্নাটা করতে হবে না তাদের। চাল-ডাল ওরাই ধুয়ে নিচ্ছে পুকুরে। বাঁকে করে দু-বালতি জল নিয়ে গেছে কামলারা। উনুনটা ধাঁধিয়ে উঠতেই মিছরি সরে গিয়ে আমগাছতলায় দাঁড়াল।

কালও বড্ড ঝড়জল গেছে। ওই দক্ষিণধার থেকে ফৌজের মতো ঘোড়াসওয়ার ঝড় আসে মাঠ কাঁপিয়ে। মেঘ দৌড়োয়, ডিমের মতো বড়-বড় ফোঁটা চটাসফটাস ফাটে চারধারে। আজ সকালে দশ ঝুড়ি পাকা জাম, গুটিদশেক কচি তাল কুড়িয়ে আনা হয়েছে খেত থেকে। ঘরের চালের খড় জায়গায়-জায়গায় ওলট-পালট। মাটির দেয়াল জল টেনে ডোস হয়ে আছে, এখন চড়া রোদে শুকোচ্ছে সব। আমতলায় দাঁড়িয়ে মিছরি দেখে, ঋতীশ দাদা টিয়ার ঝাঁক উড়িয়ে দিল। ট্যাঁট্যাঁ ডাক ছেড়ে সবুজ পাখিরা উড়ে যাচ্ছে নদীর দিকে। মনে হয়, মানুষের ডানা নেই।

যারা এসেছে তারা সব কেমনধারা লোক যেন! রোগা-রোগা ভীতু-ভীতু চেহারা, পেটে সব খোঁদল-খোঁদল উপোসী ভাব। জুল-জুল করে চারধারে চায় আর লজ্জায় আপনা থেকেই চোখ নামিয়ে নেয়। তাদের মধ্যে একজন আধবুড়ো লোক এসে উনুনটায় দুটো মোটা কাঠ ঢুকিয়ে দিল, ফুলঝুরির মতো ছিটকে পড়ল আগুনের ফুলকি। একটা কাঠ টেনে আধপোড়া একটা বিড়ি ধরিয়ে নিল লোকটা। এই গরমেও গায়ের ঘেমো তেলচিটে গেঞ্জিটা খুলছে না, বুকের পাঁজর দেখা যাবে বলে বোধহয় লজ্জা পাচ্ছে। তাকে দেখে হাসি পেল মিছরির।

সেই লোকটা চারধারে চেয়ে মিছরিকে দেখে কয়েক কদম বোকা পায়ে হেঁটে এসে বলল—আনাজপাতি কিছু পাওয়া যায় না?

খেত ভরতি আনাজ। অভাব কীসের? মিছরি বলল—এক্ষুনি এসে পড়বে। খেতে লোক নেমে গেছে আনাজ আনতে।

—একটু হলুদ লাগবে আর কয়েকটা শুকনো লঙ্কা। যদি হয় তো ফোড়নের জন্য একটু জিরে আর মেথি।

যদি হয়! যদি আবার হবে কী! খিচুড়ি রাঁধতে এসব তো লাগেই সে কি আর গেরস্তরা জানে না! মা সব কাঠের বারকোশে সাজিয়ে রেখেছে।

লোকটার দিকে চেয়ে মিছরি বলল—সব দেওয়া হচ্ছে। ডাল চালটা ধুয়ে আসুক।

লোকটা আকাশের দিকে একবার তাকাল। খুব সংকোচের গলায় বলল—বেলা হয়েছে।

সে কথার মধ্যে একটা খিদের গন্ধ লুকিয়ে আছে। শত চেষ্টা করেও লোকটা খিদের ভাবটা লুকোতে পারছে না। গেঞ্জিতে ঢাকা হলেও ওর পাঁজরা দেখা যায়। কারা এরা? কোত্থেকে এল, কোথাই বা যাচ্ছে? ছোটবোন চিনি যদিও মিছরির পিঠোপিঠি নয় তবু বোনে-বোনে ঠাট্টা ইয়ার্কির সম্পর্ক। ফ্রকপরা চিনি তিনটে ব্যাঙ লাফ দিয়ে মশলার বারকোশ নিয়ে এসে ঠক করে উনুনের সামনে রেখে ঝুপসি চুল কপাল থেকে সরিয়ে চেঁচিয়ে উঠল—এই যে মশলা দিয়ে গেলাম কিন্তু। দেখো সব নইলে চড়াই খেয়ে যাবে।

রোগা লোকটা তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে বারকোশটা নীচু হয়ে দেখল।

বলল—উরেব্বাস, গরমমশলা ইস্তক। বাঃ, বাঃ, এ না হলে গেরস্ত!

চিনি দুটো নাচুনি পাক খেয়ে মিছরির ধারে এসে জিভ ভ্যাঙাল, বলল—যা দিদি, তোর নামে উকিলের চিঠি এসেছে। বড্ড মোকদ্দমায় পড়ে গেছিস ভাই। চিঠিটা ভিজিয়ে একটু জল খাস শোওয়ার সময়, মিষ্টি লাগবে।

বলে নীচু ডালের একটা পাকা আম দুবার লাফ দিয়ে পেড়ে ফেলল চিনি। শিঙে দিয়ে চুষতে-চুষতে যেদিকে মন চায় চলে গেল।

উকিলের চিঠি বলে সবাই খ্যাপায়। আর মোকদ্দমাও বটে। এমন মোকদ্দমায় কেউ কখনও পড়েনি বুঝি।

ধীর পায়ে লাজুক মুখে মিছরি ঘরে আসে। এমনিতে কোনও লাজলজ্জার বালাই নেই। বাপের বাড়িতে হেসে খেলে সময় যায়। কিন্তু ওই চিঠি যেদিন আসে সেদিন যত লজ্জা। বরের চিঠিই যেন বর হয়ে আসে।

মিছরির বর উকিল।

ছোটকাকা প্রায় সমানবয়সি। দাদা ঋতীশের চেয়েও ছ-মাসের ছোট। আগে তাকে নাম ধরেই 'শ্যামা' বলে ডাকত মিছরি, নিজের বিয়ের সময় থেকে 'ছোটকাকা' বলে ডাকে।

ছোটকাকা মিছরির নাকের ডগায় দুবার নীলচে খামখানা নাচিয়ে ফের সরিয়ে নিয়ে বলল—রোজ যে আমার কাপড় কাচতে খিটখিট করিস, আর করবি?

অন্য সময় হলে মিছরি বলত—করব, যাও যা খুশি করো গে।

এখন তা বলল না। একটু হেসে বলল— কাপড় কাচতে খিটখিট করব কেন, তোমার নস্যির রুমাল বাবু ও কাচতে বড় ঘেন্না হয়।

—ইঃ ঘেন্না! যা তাহলে, চিঠি খুলে পড়ে সবাইকে শোনাব।

—আচ্ছা, আচ্ছা, কাচব।

—আর কী কী করবি সব বল এই বেলা। বউদি রান্না করে মরে, তুই একেবারে এগোস না, পাড়া বেড়াস। আর হবে সেরকম?

—না।

—দুপুরে আমার নাক ডাকলে আর চিমটি কাটবি?

—মাইরি না।

—মনে থাকে যেন! বলে ছোটকাকা চিঠিটা শুঁকে বলল—এঃ, আবার সুগন্ধী মাখিয়েছে!

বলে কাকা চিঠিটা ফেলে দিল সামনে। পাখির মতো উড়ে চিঠিটা তুলে নিয়ে মিছরি এক দৌড়ে বাগানে।

কত কষ্ট করে এতদূর মানুষ আসে, চিঠি আসে। রেলগাড়িতে ক্যানিং তারপর লঞ্চে গোসাবা, তারপর নৌকোয় বিজয়নগরের ঘাট, তারপর হাঁটাপথ। কত দূর যে! কত যে ভীষণ দূর!

খামের ওপর একধারে বেগনে কালিতে রবার স্ট্যাম্প মারা। কালি জেবড়ে গেছে, তবু পড়া যায়—ফ্রম বসন্ত মিদ্দার, বিএএলএল-বি, অ্যাডভোকেট। আর বাংলায় মিছরির নাম-ঠিকানা লেখা অন্য ধারে। রবার স্ট্যাম্পের জায়গায় বুঝি এক ফোঁটা গোলাপগন্ধী আতর ফেলেছিল, সুবাস বুক ভরে নিয়ে বড় যত্নে, যেন ব্যথা না লাগে এমনভাবে খামের মুখ ছিঁড়ল মিছরি। এ সময়টায় তাড়াতাড়ি করতে নেই। অনেক সময় নিয়ে, নরম হাতে, নরম চোখে সব করতে হয়। মা ডাকছে—ও মিছরি, আনাজ তুলতে বেলা গেল। লোকগুলোকে তাড়া দে, বিপিনটা কি আবার গ্যাঁজা টানতে বসে নাকি দ্যাখ।

বড় বিরক্তি। লোকগুলোর সত্যি খিদে পেয়েছে। আকাশমুখো চেয়ে উঠোনে হাভাতের মতো বসে আছে সব। তাদের মধ্যে যারা একটু মাতব্বর তারা বাবুর সঙ্গে এক চাটাইতে বসে কথাবার্তা বলছে। রান্নার লোকটা বিশাল কড়া চাপিয়ে আধ সেরটাক তেল ঢেলে দিল।

মিছরি খেতে নেমে গিয়ে কুহুস্বরে ডাক দিল—বিপিনদা, তোমার হল? রান্না যে চেপে গেছে। অড়হর গাছের একটা সারির ওপাশ থেকে বিপিন বলে—বিশটা মদ্দ খাবে, কম তো লাগবে না। হুট বলতে হয়ে যায় নাকি! যাচ্ছি, বলো গে হয়ে এল।

মিছরি চিঠিটা খোলে। নীল, রুলটানা প্যাডের কাগজ। কাগজের ওপর আবার বসন্ত মিদ্দার এবং তার ওকালতির কথা ছাপানো আছে। নিজের নাম ছাপা দেখতে লোকটা বড় ভালোবাসে।

হুট করে চিঠি পড়তে নেই। একটু থামো, চারদিক দেখো, খানিক অন্যমনে ভাবো, তারপর একটু-একটু করে পড়ো, গেঁয়ো মানুষ যেমন করে বিস্কুট খায়, যত্নে ছোট্ট-ছোট্ট কামড়ে।

চিঠি হাতে তাই মিছরি একটু দাঁড়িয়ে থাকে। সামনের মাঠে একটা ছোট্ট ডোবায় কে একজন কাদামাখা পা ধুতে নেমেছিল। জলে নাড়া পড়তেই কিলবিলিয়ে একশো জোঁক বেরিয়ে আসে। মিছরি দেখতে পায়, লোকটা মাঠে বসে পায়ের ঝোঁক ছাড়াচ্ছে। খেতের উঁচু মাটির দেওয়ালের ওপর কোনও কায়দায় একটা গরু উঠে পড়েছে কে জানে। এইবার বাগানের মধ্যে হড়াস করে নেমে আসবে।

নামুক গে। কত খাবে। বাগান ভরতি সবজি আর সবজি। অঢেল, অফুরন্ত। বিশ বিঘের খেত। খাক।

উকিল লিখেছে—হৃদয়াভ্যন্তরস্থিতেষু প্রাণপ্রতিমা আমার...। মাইরি, পারেও লোকটা শক্ত কথা লিখতে। লিখবে না! কত লেখাপড়া করেছে।

হুহু করে বুক চুপসে একটা শ্বাস বেরিয়ে যায় মিছরির। লোকটা কত লেখাপড়া করেছে তবু রোজগার নেই কপালে! এ কেমন লক্ষ্মীছাড়া কপাল তাদের।

উকিল লিখেছে—ঘুমিয়া জাগিয়া কত যে তোমাকে খুঁজি। একটু থমকে যায় মিছরি। কথাটা কী! ঘুমিয়া? ঘুমিয়া মানে তো কিছু হয় না। বোধহয় তাড়াহুড়োয় ঘুমাইয়া লিখতে গিয়ে অমনটা হয়েছে। হোকগে, ওসব তো কত হয় ভুল মানুষের। ধরতে আছে?

ছ্যাক করে ফোড়ন পড়ল তেলে। হিং ভাজার গন্ধ। রান্নার লোকটা বুঝি কাকে বলল—এর মধ্যে একটু ঘি হলে আর কথা ছিল না।

জ্যাঠা বোধ হয় সান্ত্বনা দিয়ে বলল—হবে-হবে। তা মিছরি, পাথরবাটিতে একটু ঘি দিয়ে যা দিকিনি!

মিছরি আর মিছরি! ও ছাড়া বুঝি কারও মুখে কথা নেই! মিছরি নড়ল না! চিঠি থেকে চোখ তুলে উদাসভাবে আকাশ দেখল। আবার একটা টিয়ার ঝাঁক আসছে গাঙ পেরিয়ে। আসুক।

ছোটকাকার এক বন্ধু ছিল, ত্র্যম্বক। মিছরির বিয়ের আগে খুব আসত এ-বাড়িতে। বিয়ের পর আর আসে না। কেন বলো তো! মিছরি উদাস চেয়ে থাকে। কোনওদিন মনের কথা কিছু বলেনি তাকে ত্র্যম্বক। কিন্তু খুব ঘন-ঘন তার নাম ধরে ডাকত। সিগারেট ধরাতে দশবার আগুন চাইত।

কেন যে মনে পড়ল!

উকিল লিখেছে—ত্রিশ টাকার মধ্যে কলিকাতায় ঘর পাওয়া যায় না। অনেক খুঁজিয়াছি। মাঝে-মাঝে ভাবি, বনগাঁ চলিয়া যাইব। সেখানে প্র্যাকটিসের সুবিধা হইতে পারে। বাসাও সস্তা।

তাই যদি যেতে হয় তো যাও। আমি আর পারি না। বিয়ের পর এক বছর চার মাস হল ঠিক-ঠিক। আর কি পারা যায়, বলো উকিলবাবু। তোমার পাষাণ হৃদয়, তার ওপর পুরুষমানুষ, লাফঝাঁপ করে তোমাদের সময় কেটে যায়। আর আমি মেয়েমানুষ, লঙ্কাগাছে

জল ঢেলে কি বেলা কাটে আমার, বলো? চোখের নোনা জলে নোনাগাঙে জোয়ার ফেলে দিই রোজ। উকিলবাবু, পায়ে পড়ি....

খিচুড়িতে আলু, কুমড়ো, ঢ্যাঁড়স, ঝিঙে, পটল সব ঢেলে দিয়ে রোগা বামুনটা আম গাছের তলায় জিরেন নিচ্ছে। গলায় ময়লা মোটা পৈতেটা বেড়িয়ে গেঞ্জির ওপর ঝুলে আছে। বড্ড রোগা, ঘামে ভিজে গেছে তবু গেঞ্জি খোলেনি পাঁজর দেখা যাওয়ার লজ্জায়। বিড়ি ধরিয়ে ছোট কাকাকে বলল—বউ আর ছেলেপিলেদের সোনারপুর ইস্টিশানে বসিয়ে রেখে আমরা বেরিয়ে পড়েছি। তারা সব ক'দিন ভিক্ষে-সিক্ষে করে খাবে। ঠিক করেছি, বাছার যেখানে পাব জমি দখল করে ঘর তুলে ফেলব আর চাষ ফেলে দেব। মশাই, কোনওখানে একটু ঠাঁই পেলাম না আমরা। বাঁচতে তো হবে না কি!

ছোটকাকা বলে, কতদূর যাবেন? ওদিকে তো সুন্দরবনের রিজার্ভ ফরেস্ট আর নোনা জমি। বাঘেরও ভয় খুব। লোকটা বিড়ি টেনে হতাশ গলায় বলে, আসতে-আসতে এতদূর এসে পড়েছি আর-একটু যেতেই হবে। বাঘেরও খিদে, আমাদেরও খিদে, দুজনাকেই বেঁচে থাকতে হবে তো!

উকিলবাবু আর কী লেখে? লেখে—সোনামণি, আমার তিনকূলে কেহ নাই, নইলে তোমাকে বাপের বাড়ি পড়িয়া থাকিতে হইত না। যাহা হউক, লিখি যে আর কয়দিন ধৈর্য ধরো। কোথাও- না-কোথাও কিছু-না-কিছু হইবেই। ওকালতিতে পসার জমিতে সময় লাগে।

বুঝি তো উকিলবাবু, বুঝি। তোমার যেদিন পসার হবে ততদিন আমি থাকব তো বেঁচে! যদি মরে যাই, তবে তোমার লক্ষ্মীমন্ত ঘরে আর কোনও-না-কোনও পেতনী এসে আমার জায়গায় ডেঁড়েমুশে সংসার করবে। বালা বাজিয়ে হাওয়া খাবে, মাছের মুড়ো চিবোবে, গাল ভরতি পান খেয়ে রুপোর বাটায় পিক ফেলবে। ততদিন কি বাঁচব উকিলবাবু?

বিপিন কলাপাতা কেটে উঠোনে ফেলছে। ঠেলাঠেলি পড়ে গেছে দলটার মধ্যে। ঝপাঝপ পাতা টেনে বসে পড়ল সব। বাঁ-হাতে সকলের পাঁচ-ছ'টা কাঁচালঙ্কা, পাতে একথাবা নুন। খিচুড়ি এখনও নামেনি। সবাই কাঁচা লঙ্কা কামড়াচ্ছে নুন মেখে। ঝালে শিস দিচ্ছে।

উকিলবাবু কী লেখে আর? লেখে—বন্ধুর বাসায় আর কতদিন থাকা যায়? ভালো দেখায় না। ধারও অনেক হইয়া গেল। লজ্জার মাথা খাইয়া লিখি, কিছু টাকা যদি পারো...

গরম খিচুড়ি মুখে দিয়ে একটা বাচ্চা ছেলে চেঁচিয়ে ওঠে জিভের যন্ত্রণায়। একজন বুড়ো বলে—আস্তে খা। ফুঁইয়ে-ফুঁইয়ে ঠান্ডা করে নে।

—উঃ, যা রেঁধেছ না হরিচরণ, লাট বাড়ির বাস ছেড়েছে।

মিছরি আমতলায় দাঁড়িয়ে থাকে। বেলা হেলে গেছে। গাছতলায় আর ছায়া নেই। রোদের বড় তেজ।

দলের মাতব্বর জিগ্যেস করে মিছরির বাবাকে—ওদিকে কি কোনও আশা নেই মশাই? অ্যাঁ! এত কষ্ট করে এতদূর এলাম।

মিছরি ঘরে চলে আসে। চোখ জ্বালা করছে। বুকটায় বড় কষ্ট।

পড়ন্ত বেলায় মিছরি তার উকিলকে চিঠি লিখতে বসে—আশা হারাইও না। পৃথিবীতে অনেক জায়গা আছে...।
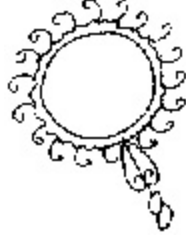
মশা

রক্ত খেয়ে মশাটা টুপটুপে হয়ে আছে। ধামা পেটটা নিয়ে মশারির দেওয়ালে বসে আছে ওই। এইবেলা টিপে দিলে ফচাক করে খানিক কাঁচা রক্ত ছিটকে গলে যাবে শালা।

নফরচন্দ্র জীবনে মশা মেরেছে অনেক, আর মানুষ মেরেছে একটা। মানুষটার কথা এখন আর মনে পড়ে না। অল্প বয়স ছিল তখন। সময়ের তফাতে ভুল পড়ে গেছে। তবে মশাদের কথা যদি কেউ শুনতে চায়, তবে ঢের কথা শোনাতে পারে নফরচন্দ্র। একটা জীবন মশা মেরেই তো গেল। তার বউ চারু পর্যন্ত মরবার আগে তার কোনও গুণের কথা না বলুক এটা জোর গলায় বলে গেছে—পারোও বাপু তুমি মশা মারতে।

তা পারে নফরচন্দ্র। যত মশা তত মারার আনন্দ।

লোমের মতো সরু হাত-পা ওলা মশাটা কী পরিমাণ রক্ত টেনেছে দেখ! পেটটা একটা ধানের মতো বড় দেখাচ্ছে। ওই হাতে পায়ে আর ফিনফিনে পাখনায় এত বড় পেটটা নিয়ে ওড়াউড়ি করবে কেমন করে? বড় তাজ্জব লাগে নফরচন্দ্রের। শালারা নিজেদের শরীরের চেয়ে ঢের বেশি ওজনের রক্ত খায়। আখেরের খাওয়া। দু-হাতের পাতা দু-দিকে চড়ের মতো তুলে নফরচন্দ্র আস্তে করে মশাটার দিকে এগোয়। ভরাপেটে মশার চালাকি খাটে না। টলতে-টলতে একটু-আধটু নড়েচড়ে ঠিকই, কিন্তু বেশি দূরের দৌড় নয়। নফর জানে।

ঘরের আলোটা কিছু কমজোরি। নাকি বয়সে চোখের দৃষ্টিতেই ভাঁটা পড়েছে? কিছু একটা হবে। চোখের সামনে বিন্দু-বিন্দু কী সব ভেসে বেড়ায় আজকাল নোংরার মতো। সেই বিন্দুগুলোকেও প্রথম-প্রথম মশা বলে ভুল করত সে।

দু-হাতে ফটাস করে তালি বাজাল। কিন্তু রক্ত ছিটকালো না। মশাটা সটকেছে।

নফরচন্দ্র নিজের হাতের দিকে চায়। আঙুলের জোড়ে-জোড়ে গিঁট পড়ার মতো ভাব। বুড়ো চামড়ায় কুঁচি পড়েছে। বিনা কারণে আঙুলগুলো ত্যাড়াব্যাঁকা হয়ে যাচ্ছে ইদানীং। এসবই কি হওয়ার কথা ছিল?

বিছানায় হাঁটু গেড়ে বসে নফর ময়লা মশারির চারদিকে তাকিয়ে রক্তচোষাটাকে খোঁজে। আছে খুব কাছেপিঠেই, বেশি ওড়াউড়ি করার মতো ক্ষমতা নেই। এক্ষুনি বসবে কোথাও। কিন্তু চড়টা ফসকাল—সেটাই ভাবনার কথা। এতকাল মশা মারতে কদাচিৎ ফসকেছে নফর।

বাড়ি নিঝুম হয়ে গেছে খানিক আগে। নফর টের পেয়েছে, তার ছেলে গণেশ আজ খেয়ে উঠে আঁচাতে অনেক সময় নিল। একবার যেন বউয়ের কাছে খড়কেও চেয়েছিল। কিন্তু খড়কে দিয়ে দাঁত পরিষ্কার করার মতো খাওয়া-দাওয়া তো ছিল না আজ! নফরকে সন্ধের মুখে গণেশের বউ মুলো দিয়ে রান্না মটরের ডাল, বাসি বাঁধাকপির ঘন্ট, আর ট্যাংরার চচ্চড়ি খাইয়ে দিয়েছে। সে খাওয়ায় খড়কে লাগে না। নফরের আজকাল সন্দেহ হয়, তাকে ফাঁকি দিয়ে গণেশ আর গণেশের বউ গোপনে দু-চারটে বাড়তি পদ খায়। নফরচন্দ্র খেয়ে আসার পর বেশ খানিক বাদে একটা মাংস রান্নার বাস খুব মাত করেছিল পাড়া। নফর ভেবেছিল রায়েদের বাড়ি রান্না হচ্ছে। তা নয় তবে।

গণেশের বউ চন্দ্রিমা বেশ মোটাসোটা আহ্লাদী চেহারার মেয়ে। রকমসকম খানিকটা পোষা বেড়ালের মতো। দাঁত নখ লুকিয়ে রেখে চোখ বুজে ন্যাকা-ন্যাকা ভাব করে বটে, তবে দরকারের সময় লুকোনো অস্ত্র বের করে আনে।

তা মোটা গিন্নি খায় ভালো। সারাদিনই খাচ্ছে। কচর-মচর খানিক চানাচুর চিবোলো, টাউ- টাউ করে বাটিভর তেঁতুল-পান্তা মারল, দুধের সরটা আঙুলে আলতো তুলে মুখে ফেলে দিল, এক কোষ আচার চাটল হয়তো। তার ওপর হোটেল রেস্টুরেন্টে গিয়ে গণেশের ট্যাঁক ফাঁক করা তো আছেই। আজকাল নফরকে ফাঁকি দিয়ে বাড়তি পদ খাওয়া শুরু হয়েছে।

নফরচন্দ্র মশাটা আর খুঁজে পেল না। ভরাভরতি পেট নিয়ে শালা যাবে আর কোথায়! কিন্তু নফরের তেমন ইচ্ছেও করল না বেশি খুঁজতে। সেই কোন সন্ধেবেলা চাট্টি লেইভাত খেয়েছিল, এখন খিদের চোটে পেটের মধ্যে হাঁড়ি-কলসি ভাঙছে। রায়বাড়ির মুরগি রাত-বিরেতে বেলা ভুল করে ডেকে ওঠে। আজও ডাকছে ওই।

নফরচন্দ্রের ঘুম আসে না। ঘুম এলেই আজকাল একটা ফালতু লোক এসে বড় ঝামেলা করে। সেই কবে কোন ছোকরা বয়সে রাগের মাথায় কী করে ফেলেছিল তারই

জের টানতে মেলা ঝামেলা বাধায় এসে লোকটা।

নফরের তেমন দোষ ছিল না। তখন দেশের গাঁ কালীগঞ্জে থাকত। অকালের বছর। চারদিকে চোর ছ্যাঁচড়ার বড় উৎপাত। লক্ষ্মীঠাকুরুণের মতো এক মা ছিল নফরের, রোগাভোগা খিদে-পাওয়া মানুষ দোরগোড়ায় এলে প্রায় সময়েই পাত পেড়ে খাওয়াতো। এক দুপুরে তেমনি পেট টান করে খেয়ে একটা মাঝবয়েসি লোক যাওয়ার সময় একটা কাঁসার বাটি আর দুটো ধুতি মেরে চলে গেল। ঘটনার হপ্তাখানেক বাদে কালীগঞ্জের খাল ধরে নৌকো বেয়ে নফর যখন মাছ ধরতে বড় গাঙের দিকে যাচ্ছিল তখনই শ্মশানের ঘাটে লোকটাকে বসে থাকতে দেখে। পাশে পুঁটুলি। চোরটাকে দেখে নফর বেদিশা হয়ে নৌকো ভিড়িয়ে লগির একখানা ঘা লাগিয়েছিল জোর। লোকটা হাত তুলল না, চেঁচাল না, ঘা খেয়ে যেন বড় ঘুম পেয়েছে এমন ভাব করে শুয়ে পড়ল। কেউ সাক্ষী ছিল না। নফর নৌকোয় কেটে পড়ল তৎক্ষণাৎ। পরদিন হাটে-বাজারে কিছু কথাবার্তা শুনল লোকের মুখে। শ্মশানের ঘাটে একটা লোক মরে পড়ে আছে। তা কে আর একটা মড়া নিয়ে মাথা ঘামায়। তখন কত মরছে চারদিকে!

ভেবে দেখলে, খুনের জন্যে তো মারতে যায়নি নফর। চোরের সাজা দিতে গিয়েছিল। কত মাথা ফাটাফাটি করেও লোকে বেঁচে থাকে। কিন্তু সেই কমজোরি লোকটার যে ফুলের ঘায়ে মূর্ছা যাওয়ার অবস্থা তা কে জানত! নফরের মন-মেজাজ কয়েকদিন বিগড়ে রইল ঠিকই, কিন্তু নিজেকে তেমন দোষ দিতে পারল না।

বহুকাল হয়ে গেছে। চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছর আগেকার বৃত্তান্ত। লোকটাকে ভালো মনেও নেই তার। মাথাটা ন্যাড়া ছিল, সেটা বেশ মনে পড়ে। গলায় একটা রুদ্রাক্ষের মালা ছিল মনে হয়। খালি গা ছিল, পরনে একটা হাকুচ ময়লা কাপড়। একদম ফালতু লোক। দুনিয়াতে ওরকম দু-চারটে লোক না থাকলে কেউ টেরও পাবে না। পায়ওনি। লোকটার জন্য থানা পুলিশ হয়নি, কান্নাকাটি হয়নি।

কিন্তু মুশকিল হল এখন মাঝে-মাঝে লোকটা এসে নফরচন্দ্রকে ঘুম থেকে তুলে বলে —ন্যাড়া মাথা বলেই বড্ড লেগেছিল হে।

নফর বিরক্ত হয়ে বলে—তাহলে পাগড়ি পরে থাকলেই পারতে।

লোকটা বলে—হুঁ: তখন জামা জোটে না তো পাগড়ি। তা তুমি লগি চালাবে জানলে পাগড়িই পরতাম। ন্যাড়া মাথাটায় বড্ড লেগেছিল হে।

—ন্যাড়া হয়েছিলে কেন মরতে?

—সে আর এক কেচ্ছা। মজিলপুরে এক মুদির দোকান থেকে এক থাবা বাতাসা চুরি করেছিলাম বলে তারা মাথা কামিয়ে দিলে, ঘোলের বড্ড দাম বলে ঘোল ঢালেনি। কিন্তু কোমরে দড়ি বেঁধে গাঁয়ে ঘুরিয়েছিল।

নফরচন্দ্র বলে—তাহলে তোমারই দোষ বলো।

—তা ছাড়া আর কার? আমার মাথায় খুব ঝুপসি চুল ছিল তখন। মাথাটা একটা বোঝার মতো দ্যাখাত। তার ওপর লগির ঘা পড়লে বোধহয় তেমন লাগত না। ন্যাড়া মাথা বলে লেগেছিল। না খেয়ে-খেয়ে তখন শরীরটা তো মরেই আসছিল। ব্যথাটা সইল না।

—আমার তবে দোষ কী বলো।

—দূর ছাই, তোমার দোষ কে দিচ্ছে? এতকাল পরে সেসব তুচ্ছ কথা ঘাঁটাঘাঁটি করতে আসি বলে ভাবো না কি? তুমি না মারলেও মরণ আমার লেখাই ছিল। আমি তা বুঝতে পেরে কাজ এগিয়ে রাখতে শ্মশানের ধারে গিয়ে বসে থাকতাম।

—তাহলে আমাকে দোষী করছ না তো! ঠিক করে বলো বাপু ন্যায্য কথা।

—আরে না। তবে বলি বাপু, তোমার কাছে আমার কিছু পাওনা হয়। সেই যে মেরেছিলে তারও তো একটা দেনা আছে।

—দেনা! বলে আঁতকে ওঠে নফর। বলে—এর মধ্যে আবার দেনা-পাওনার কথা ওঠে কোত্থেকে?

—ওঠে। যখনই আমাকে মারলে তুমি তখনই তোমার সঙ্গে আমার একটা সম্পর্ক হল তো।

—সে আবার কীরকম?

লোকটি মিটি-মিটি হেসে বলে—হয়। সে এমন সম্পর্ক যে এক জন্মে আর কাটান-ছাড়ান নেই। সেই সম্পর্কের জোরেই তোমার কাছে আমার কিছু পাওনা হয়।

—পাওনা হলেই বা দিই কোত্থেকে। সংসারের অবস্থা তো দেখছ। ওই গণেশটা আমার একমাত্র অন্ধের নড়ি। কোথায় যেন যন্ত্র চালায়। আয় ভালোই, কিন্তু বুড়ো বাপকে দেয় কী? সব ওই মোটা গিন্নির শরীরের আহ্লাদে খরচ হচ্ছে। তার ওপর মাগি আবার বাঁজা। একটা নাতকুড় হলেও আমার একটা সুখ ছিল। সেও হল না। সংসারের সব আদর মোটা গিন্নি নিজের দিকে টেনে নিচ্ছে।

লোকটা বলে—সে আমি শুনব কেন বলো! আমার পাওনা আমাকে মিটিয়ে দেবে, তবে অন্য কথা।

বলে লোকটা চলে যায়।

জেগে গিয়ে নফরচন্দ্র মশার পুন-ন-ন শুনতে পেয়ে উঠে বসে। কোথা দিয়ে যে মশারির মধ্যে ঢোকে শালারা। মশা মারবার জন্য বাতি জ্বালতে গিয়ে নফরের ভুল ভাঙে। ও হরি! এ যে বেহান হয়ে গেল! কাক ডাকতে লেগেছে।

ছেলের সঙ্গে এই ভোররাতেই একবার চোখের দেখা হয়। গণেশ বারান্দায় ঘুরে-ঘুরে দাঁতন করে এ সময়টায়। চোখাচোখি হলেও কোনও কথা হয় না। কথার আছেটা কী? গণেশ তার সব কথা বরাবর মাকে বলে এসেছে। এখন বউকে বলে বোধহয়। বাপের সঙ্গে কোনওদিনই তেমন বাক্যালাপ করে না। আজও ভোর রাতে বারান্দায় দেখা হল। কলঘর থেকে ঘুরে এসে নফর বলল —আমার মশারিটা বড্ড ছিঁড়ে গেছে। একটা কিনে দিবি?

—দেব'খন। এ মাসটা জোড়াতাড়া দিয়ে চালিয়ে নাও।

গণেশ ছেলে খারাপ না। বউটা খচ্চড়।

না কি বউটাও খারাপ না, সে নিজেই খচ্চড়! কোনটা যে কী তা বলা মুশকিল। গণেশের মা চারু বরাবর বলে এসেছে, নফরচন্দ্রের মতো এমন শয়তান নাকি দুটো হয় না। কথাটা উড়িয়ে দেওয়ার মতো নয়। ভেবে দেখবার মতো কথা।

আহ্লাদী বউ যখন উঠে হালুয়ার কড়াই বসিয়েছে তখন গণেশের স্নান সারা। ভাজা সুজিতে জল পড়ল ছ্যাঁকাৎ করে। রায়বাড়ির মুরগি ডাকছে। চড়াই পাখির ডানার শব্দ কানের পাশ দিয়ে সড়াৎ করে চলে যায়। গণেশ রামপ্রসাদি গাইতে-গাইতে খেতে চাইল। মোটা গিন্নি বলল—দিচ্ছি।

নফরকেও দেবে। তবে সে একটুখানি। বাসি রুটি গণেশ ছ'খানা খায়, মোটা গিন্নি ক'খানা তা নফর জানে না। তবে তার ভাগ্যে দুখানা। চাইলে বলে—আর তো নেই!

ডাক্তারেরও নাকি বারণ আছে। কিন্তু নফর তার শরীরের গতিক কিছু বোঝে না। বেশ আছে। তবে কাল রাতে একটা পেটমোটা মশা তার হাত ফসকে পালিয়েছে, সেটা ভাববার কথা।

বউ মরে বড় জ্বালাতন হয়েছে। চারু মুখ করত বটে, কিন্তু সে কাছে থাকতে নফরের হাতে মশা ফসকাত না। আর ন্যাড়ামাথার সেই পাওনাদারটাও কাছে ঘেঁষেনি কোনওদিন।

সূর্যটা তার ন্যাড়ামাথা নিয়ে ভুস করে উঠে পড়ল ওই। গণেশ বেরিয়ে গেলে মোটা গিন্নি আবার গিয়ে বিছানা নেবে। ঝি আসে অনেক বেলায়। বড় ফাঁকা লাগে নফরের। গণেশের যদি একটা ছানা হত।

মশারি চালি করে বিছানা গুটিয়ে বসে থাকে নফর। দুটো রুটি গরম হালুয়ার সঙ্গে পেটের মধ্যে বেড়াতে গেছে। গণেশ কাজে বেরোল। মোটা গিন্নি একটা মস্ত হাই তুলে বিছানা নিল পাশের ঘরে।

পুবের জানালা দিয়ে একটা বেঁটে দেয়াল দেখা যায়। দেয়ালের ওপর তারকাঁটার তিনটে লাইন। তার ফাঁকে একটা ন্যাড়ামাথার মতো সূয্যি ঠাকুর। পাখি ডাকে।

চারু খুব জপ করত এসময়। জপের মালা রেলগাড়ির চাকার মতো বনবন করে ঘুরে যেত। সংসারের কাজকর্ম শুরু করবার আগে বরাদ্দ জপ এগিয়ে রাখত যতটা পারে। নফরের সে-সবও নেই। খামোখা বসে অং বং জপের চেয়ে অন্য কথা ভাবলে কাজ হয়।

এক সময় চাষবাষ করত, পরের দিকে একটা দোকানে আধাআধি বখরায় ব্যাবসা করত। সে খোঁড়া ব্যাবসাতে রোজ দু-পাঁচ টাকা আয় হত। অধৈর্য হয়ে একদিন দোকানের কিছু মাল সরিয়ে কেটে পড়ল। আবার হয়তো অন্য কারবারে হাত দিল একদিন। জীবনটা ফেরেববাজিতে গেছে। গণেশ কম বয়সে যেই চাকরিতে ঢুকল অমনি নফরচন্দ্র হাত ধুয়ে ঘরে থিতু হল। আর কাজ কারবারে যায়নি। গেলে আজ দুটো পয়সা নাড়াচাড়া করতে পারত। তার বদলে নফরের অন্য সব ব্যাপারে মাথা খুলতে লাগল বেশি। চমৎকার মশা মারত, বাগান করত, কয়লা ভাঙত, পান সাজত। বসে থাকলে কত বাতিক হয় মানুষের।

মোটা গিন্নি ঘুমোলে নফর চুপিচুপি উঠে রান্নাঘরে আসে। ঝি এখনও আসেনি। গত রাতের এটোকাঁটা পড়ে আছে। উঁকিঝুঁকি দিয়ে নফর দেখে মাংসের হাড়টাড় পড়ে আছে ডাঁই হয়ে। কম গেলেনি দুজনে। হাড়গোড়ের পরিমাণ দেখলে তাজ্জব মানতে হয়। একটা লুচির টুকরোও দেখা যাচ্ছে। তবে কাল রাতে লুচিও ভেজেছিল।

শ্বাস ফেলে নফর ঘরে আসে, ঘর পেরিয়ে একদম সদরের বাইরে গিয়ে দাঁড়ায়। উদোম পৃথিবী চারদিকে ছড়ানো। একবার ইচ্ছে হয়, যায় চলে যেদিকে দু-চোখ যায়। লুচি-মাংসের ব্যাপারটা আজ বড় দাগা দিয়েছে তাকে। কিছুদূর খামোখা ঘোরঘুরি করে ফিরে আসে নফর। বিবাগি হয়ে যেতে এ বয়সে বড় ভয় করে। কাল রাতে একটা মশা ফসকে গেল। ন্যাড়ামাথার লোকটা রোজ আসছে আজকাল।

ঘরে ফিরে এসে নফর মোটা গিন্নির বকুনি খেল একচোট। আহ্লাদী বউ বলল—কী আক্কেল আপনার বলুন তো, সদর দরজা হাট-খোলা রেখে বেড়াতে বেরিয়েছেন, কে না

কে ঢুকে যে সব ফরসা করে নিয়ে যেত। এক ডাঁই কাঁসার বাসন পড়ে আছে, আরও কত দামি জিনিস। এই তো সেদিন চুরি গেল এক কাঁড়ি।

বড় দুঃখ হল নফরের। সে নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেই বুঝি ভালো ছিল।

চারু মরে যাওয়ার পর পরই নফর একটা বিয়ের প্রস্তাব পেয়েছিল। খড়কাটা কলের মালিক হরেকৃষ্ণ পালের একটা হাবাগোবা বোন আছে। তার বয়স অনেক। হাঁ করে চেয়ে থাকে, মুখ থেকে অবিরল নাল ঝরে। ওরিয়েন্ট সেলুনের নরহরি নফরের চুল ছাঁটতে-ছাঁটতে একদিন বলেছিল—নফরবাবু শ'পাঁচেক টাকা জোগাড় করতে পারেন তো বিয়েটা লাগিয়ে দিতে পারি।

হাবাগোবা যাই হোক একটা বউ তো হত। টাকাটাই বখেরা বাধালে। তা-ও চেষ্টা করেছিল। ঘরের কিছু জিনিসপত্র হাতছিপ্পু করে বাজারে বিক্রি করে কিছু পয়সা পেল। মোটা গিন্নির সোনার জিনিস কিছু হাতাতে পারলে হত। কিন্তু সে আর হয়নি, ঘরের জিনিস কিছু খোয়া যাওয়াতে চন্দ্রিমা এমন হই-হুল্লোড় বাধালে যে নফর আর কিছু সরাতে সাহস করল না। তার ওপর কানাঘুষোয় তার বিয়ের ব্যাপারটাও গণেশের কানে এসে পৌঁছেছিল। কী লজ্জা! আজকাল পাড়ার ছেলেরা তাকে রাস্তায় দেখলে উলু দেয়।

তবে সেই চুরি করে বিক্রির কিছু টাকা এখনো নফরের তোষকের তলায় লুকোনো আছে। সবসুদ্ধ গোটা ত্রিশ। মাঝে-মাঝে লুকিয়ে টাকাগুলো ছুঁয়ে আরাম পায় নফর। পৃথিবীতে মানুষ আপন না টাকা আপন তা এখনও সে স্থির করতে পারে না।

আজও সন্ধে পার করেই মোটা গিন্নি তাকে বসিয়ে দিল। এটা আদর নয়, এ হচ্ছে সাবধান হওয়া। নফর খেয়ে বিছানা নিলেই ভালোমন্দ রাঁধবে। খাবে দুজনে।

নফর কিছু বলল না। সেই ভাত আজ আর মুখে রুচছিল না তেমন। প্রাণটা লুচি-লুচি করে, মাংস-মাংস করে। তবু ভাতের দলা কোঁৎ-কোঁৎ করে চালান দিয়ে ঘরে এসে জাগতে বসে নফর। আজ জেগে থেকে কাণ্ডটা দেখবে।

দেখল। পাড়া মাত করে আজ সরষে ইলিশ রান্না হচ্ছে। গণেশ একটা চ্যাঙাড়ি হাতে ঘরে ফিরল আজ। পেটের ভিতরটায় খিদের সেঁতলান দিয়ে মুখে জল এসে গেলে নফরের। একটু রাত করে ওরা বসেছে। ভারী হাসি-ঠাট্টা হচ্ছে দুজনে। নফরের মশারির মধ্যে পনপন করে মশা ঢুকছে।

ওরা শুতে চলে গেল। নফর শুয়ে জেগে রইল একা। মশা কামড়াচ্ছে। কামড়াক। ন্যাড়া মাথার লোকটাও মশারির মধ্যে সেঁধিয়ে এসে বলে—এলাম বুঝলে! দেনা-পাওনার কথাটা মিটিয়ে নিই।

তোষকের যে ধারে টাকাটা আছে সে ধারাটায় একটু চেপে শুয়ে নফর বলে—রোজ তোমার এক কথা।

—বড় অনাদর করেছিলে যে। মেরে ফেললে।

—সে অত ধরলে হয় না।

—ধরছে কে? ধরলে তোমার ফাঁসি হয়।

—তবে?

—বলছি কী, যে জায়গায় মেরেছিলে সে জায়গায় একটু হাত বুলিয়ে দাও। এখনও জায়গাটা ব্যথা করে বড়।

—সত্যি?

—মাইরি। সে শরীরের ব্যথা নয়, অনাদরের ব্যথা। দেবে নাকি একটু হাত বুলিয়ে?

নফরের চোখে জল আসে। উঠে বসে বলে—দেখি।

মাথাটা এগিয়ে লোকটা দেখিয়ে দেয়—এইখানে।

—দেখেছি। ফুলে আছে। বড্ড লেগেছিল, না?

—তা লেগেছিল। তবে তোমার আর দোষ কী?

—দাঁড়াও, হাত বুলিয়ে দিই। বলে নফর হাত বোলাতে থাকে ফোলা জায়গাটায়। নাঃ, এভাবে মারা ঠিক হয়নি।

—আঃ। ব্যথাটা সেরে যাচ্ছে হে নফর। লোকটা বলে।

নফর তার কানে-কানে বলল—লুকোনো ত্রিশটা টাকা আছে আমার। কাল চলো দুজনে দোকানে বসে খুব লুচি মাংস খাই। খাবে?

—খুব খাব। লোকটা বলে।

শুনে নফরচন্দ্র অনেকদিন বাদে পাশ ফিরে আজ নিশ্চিন্তে ঘুমোল।

বাঘ

এইখান দিয়ে একটু আগে একটা বাঘ .হঁটে গেছে। নরম মাটিতে এখনও টাটকা পায়ের দাগ। বাতাস শুঁকলে একটু বোঁটকা গন্ধও। বাঘটা শুধু যে বেড়াতে বেরিয়েছিল, এমন নয়। ফেরার পথে বাজারও করে নিয়ে গেছে। অর্থাৎ বুড়ো হরিচরণের একটা বাছুরও নিয়ে গেছে মাঠ থেকে। তাই কাদা মাটিতে বড়-বড় রক্তের চাপ পড়ে আছে। জেলির মতো জমে গেছে। হ্যাট মাথায় কয়েকজন হাফ প্যান্টপরা শিকারি ঘুরে বেড়াচ্ছে ঝোপে ঝাড়ে। বিটাররা নদীর ধারের জঙ্গলের ওপাশ থেকে টিন, ঘণ্টা আর যা পেয়েছে সব বাজাতে-বাজাতে আসছে। একজন পাইপ মুখে শিকারি বন্দুকটা ধাঁ করে মাঝখানটায় ভেঙে কার্তুজ পরীক্ষা করে নিল, তারপর ফড়াক করে আবার সোজা করল বন্দুক। সবাই তৈরি।

বাঘটা সেবার বেরোয়নি। কিন্তু বহুকাল আগের দেখা এই দৃশ্যটা আজও ভুলতে পারে না জোনাকিকুমার।

বাঘটা বেরোয়নি বলে কি আজও এইরকম অপেক্ষা করছে সে?

মাঝদুপুরে আজ বৃষ্টি নামল। তারপরই হঠাৎ থেমে গেল। আবার নামল, আবার থেমে গেল। বৃষ্টির সঙ্গে-সঙ্গে তাল রেখে জোনাকিকুমারও এক-একবার এক-একটা বাড়ির সদরে বা লবিতে উঠে দাঁড়িয়েছে। এবং এইভাবে সে ময়দানের কাছে একটা আঠারো তলা অফিস বিল্ডিংয়ে পৌঁছেছে সীতানাথের সঙ্গে দেখা করবে বলে। দেখা হল না। সীতানাথ তেরোতলায় বসে। শুনল সে আজ ফুটবল খেলা দেখতে গেছে। জোনাকি একটু হতাশ আর নিঃসঙ্গ বোধ করে। সীতানাথকে পেলে কদমের মেস-এ গিয়ে তাস পেটানো যেত। হল না। কিন্তু তেরোতলা থেকে একঝলক ময়দান দেখে সে বড় অবাক হয়ে গেল।

এ-বাড়িতে সীতানাথের অফিস সদ্য উঠে এসেছে, এই প্রথম সীতানাথের অফিসে এসেছে জোনাকি। তেরোতলা থেকে ময়দান সে আর কখনও দেখেনি। কী আশ্চর্য সবুজ! বিশ্বাস হয় না। কলকাতা নয়, ঠিক বিলেত বলে মনে হয়। ভিকটোরিয়া মেমোরিয়ালটা পর্যন্ত চেনা বলে মনে হয় না। নীচে চৌরঙ্গির রাস্তা, টিকিওলা ট্রাম যাচ্ছে, ভোঁতা ডবলডেকার গাড়ি—সবই অদ্ভুত সুন্দর দেখায়। ছিমছাম এক ইউরোপের শহর যেন। ময়দান এত সুন্দর জানা ছিল না তো!

জোনাকি আবার লিফটে নেমে এল। আগাগোড়া বাড়িটা এয়ারকন্ডিশন করা, ভেজা গায়ে শীত করছিল। বেরোবার মুখে দেখল, ফের বৃষ্টি নেমেছে। নামুক। জোনাকির কোথাও যাওয়ার নেই। এ ব্যাপারটা সে আজকাল মাঝে-মাঝে টের পায়। কোথাও যাওয়ার নেই। এত কম লোকের সঙ্গে তার চেনাশোনা।

বছর দুই আগে তার একজন সুন্দরী প্রেমিকা ছিল, তিতির। দু-বছর আগে তিতিরের কাছে যাওয়ার ছিল। তখন ভোরে ঘুম ভাঙতেই মনে হত—তিতির। অফিস ছুটি হলেও মনে হত—তিতির। ছুটির দিন কাছে এলেই মন বলত—তিতির। তখন যাওয়ার জায়গা ছিল। দু-বছর আগে তিতিরের বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর থেকেই জোনাকির জীবনের একটা অধ্যায় শেষ হয়ে গেছে।

খুব মনোযোগ দিয়ে কর্তব্যনিষ্ঠ বৃষ্টি পড়ছে। গাছপালা, মানুষজন, চাষ-আবাদ সবই দেখতে হয় বৃষ্টিকেই। শেষ বর্ষায় সে তাই বকেয়া কাজ মিটিয়ে দিচ্ছে। সবাই দাঁড়িয়ে অফিসের মুখটায়। তার মধ্যে জোনাকিও। তার কোনও জায়গার কথা মনে পড়ছে না, বৃষ্টির পর যেখানে গিয়ে খানিকক্ষণ সময় কাটানো যায়। তাই সে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে। বিটাররা বাজনা বাজাচ্ছে, শিকারিরা বন্দুক হাতে তৈরি। বাঘটা কি বেরোবে?

তা জীবনে মাঝে-মাঝে বাঘ বেরোয়। জোনাকিরও বেরিয়েছিল। যে মফসসল শহরে সে বাঘ দেখতে শহরতলি ছাড়িয়ে নদীর ধারের গাঁয়ে গিয়েছিল, সেই শহরের একটা ইস্কুল থেকে সে স্কুল ফাইনালে দশম স্থান অধিকার করে। পড়াশুনোয় অবশ্য বারবরই ভালো ছিল সে, ফার্স্ট হত ক্লাসে। পরীক্ষাও ভালোই দিয়েছিল। কিন্তু তা বলে দশম? নিজেই সে বড় আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল এবং সেই ঘটনার পর সবাই জোনাকির দিকে তাকাল ভালো করে। দারুণ জিনিস আছে তো ছেলেটার মধ্যে।

আর সেইটেই ছিল জোনাকির অস্বস্তির কারণ। তার ভিতরে যে তেমন কিছু নেই এটা সে হাড়ে-হাড়ে টের পেত। মুশকিল হল, একবার দশম হয়ে গেলে পরে আর রেজাল্ট খারাপ করা যায় না, লোকে হাসবে! তাই জোনাকি খুব খেটে আইএস-সি দিল। ফার্স্ট ডিভিশনটাও হল না। তারপর থেকে সে হাঁফ ছেড়ে সাদামাটা হয়ে গেল। বিএস-সিতে

পিওর ম্যাথমেটিকসে সেকেন্ড ক্লাস অনার্স পেল, এমএস-সি পড়ল না। চাকরি পেয়ে করতে লাগল।

সেই টেনথ হওয়ার কথা ভাবলে আজকাল ভারী লজ্জা করে। কেন যে সে টেনথ হতে গেল! ওই একবার টেনথ হওয়ার ফলে সবাই পরবর্তী জোনাকিকে দেখে দুঃখ করে। বলে —তোমার ব্রিলিয়ান্ট ক্যারিয়ার হওয়ার কথা ছিল হে জোনাকি, এ তুমি কী হলে? এরকম দুঃখ মাঝে-মাঝে জোনাকিরও হয়।

কেউ-কেউ বলে সায়েন্স না পড়ে আর্টস পড়লেই জোনাকি ভালো করত। কিন্তু তা জোনাকির মনে হয় না। সে তো সেই আইএস-সি পড়ার সময় থেকেই বিস্তর খোঁজখবর রাখত। ই ইজ ইকুয়াল টু এমসি স্কোয়ার, আইনস্টাইনের সেই বিখ্যাত ইকুয়েশন পর্যন্ত জানা ছিল তার। এনার্জি ইজ ইকুয়াল টু মাস টাইমস দি স্পিড অফ লাইট স্কোয়ারড। ক'জন জানত তা? বিএস-সি বই থেকে সে অঙ্ক কষত ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসে। তবু পারা গেল না। আসলে বোধহয় জীবনে ওই একটাই ভুল করেছিল সে, স্কুল ফাইনালে দশম হয়ে। সেটা না হলে আজ কারও দুঃখ থাকত না। তার নিজেরও না।

যে চোখ বাঁধা ম্যাজিসিয়ান এতক্ষণ এলোপাতাড়ি তীর ছুড়ছিল মাটিতে, সে এবার তার খেলা থামিয়েছে। বৃষ্টি ধরল। না ধরলেও ক্ষতি ছিল না। জোনাকির কোথাও যাওয়ার নেই।

বেরোবার মুখে একজন বয়স্ক লোক পাশাপাশি হেঁটে আসছিল। বলল—এরকম বৃষ্টির কোনও মানে হয়? বলুন তো?

জোনাকির মনে হয় মুখটা চেনা-চেনা। সে বলল—আজ্ঞে হ্যাঁ।

লোকটা তার দিকে চেয়ে একটা চেনা-হাসি দিয়ে বলে—সীতানাথকে খুঁজতে এসেছিলেন? ওর ভীষণ ফুটবলের নেশা।

জোনাকি তৎক্ষণাৎ বুঝতে পেরে বলে—আপনি কি ওর অফিসে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। দেখেছেন আমাকে, মনে নেই বোধহয়। কিন্তু আপনাকে আমি চিনি, সীতানাথের কাছে মাঝে-মাঝে পুরোনো অফিসে আসতেন। তখন থেকেই চিনি। আপনি তো জোনাকি সেনগুপ্ত স্কুল ফাইনালে—

—আজ্ঞে হ্যাঁ। জোনাকি তাড়াতাড়ি বলে লোকটাকে কথা শেষ করতে দেয় না।

—সীতানাথকে তো পেলেন না, এখন কোনদিকে যাবেন?

—ভাবছি। বলে জোনাকি।

—ভাবাভাবির আর কী? চলুন আমার বাসায় চলুন।

জোনাকি অবাক, বলে—আপনার বাসায়? লোকটা অমায়িক হেসে বলে—বেশিদূর নয়। বেকবাগান। আমার ছেলেমেয়েরা কখনও স্ট্যান্ড করা ছাত্র দেখেনি। আপনাকে দেখলে খুব ইমপেটাস পাবে। চলুন না, সবাই খুব খুশি হব আমরা।

হঠাৎ জোনাকি রাজি হয়ে গেল, বলল—চলুন।

দুই

তিতিরের মাথায় নানারকম রান্নার পোকা ঘুরে বেড়ায়। যেমন আজ সন্ধেবেলা তিতির একটা অদ্ভুত রান্না করল, ডিমের সঙ্গে বেগুন দিয়ে ওমলেট। তার নাম দিল—ডিমবেগ। পাতলা করে কাটা বেগুনের চাক ফেটানো ডিমে ভিজিয়ে ডোবা তেলে ভাজা। মন্দ নয় খেতে, একটা চেখে দেখল তিতির। তেলটা বড্ড বেশি লাগে।

ভেবে একটু ভ্রূ কোঁচকায় তিতির। বেশি তেলের ব্যাপারটা তাকে খোঁচা দেয়। বাস্তবিক, এই তেল-টেল নিয়ে ভাবতে তার একদম ভালো লাগে না। ভাবার অবশ্য দরকার নেই। তার সংসারে অভাবের ছিটেফোঁটাও নেই, বরং সবই অঢেল আছে। আসছেও। কিন্তু তবু বেশি তেল লাগার ব্যাপারটা তাকে তার বাপের বাড়ির কথা মনে করিয়ে দেয়। সেখানে এখনও তার আত্মীয়রা তেল, চাল ইত্যাদির ব্যাপারে বড় সতর্ক। সেই মানসিকতা আজও একটু রয়ে গেছে তিতিরের।

ফেটানো ডিম আর বেগুনের চাক সরিয়ে রেখে রান্না করার লোক চিত্তর দিকে তিতির তাকাল। সে রান্না করছে বলে চিত্ত এতক্ষণ সরে দাঁড়িয়ে অন্য কাজ সেরে নিচ্ছিল।

তিতির বলল—খাওয়ার সময় ওগুলো ভেজে দিও।

চিত্ত ঘাড় নাড়ে। তিতির চলে আসে।

কী বিশাল এই ফ্ল্যাটবাড়িটা! হাঁটলে যেন জায়গা ফুরোয় না। এক লাখের কাছাকাছি দাম পড়ল ফ্ল্যাটটার। তার ওপরে মেইনটেনেন্স চার্জও অনেক পড়ে যায় প্রতি মাসে। এসব নিয়ে ভাবার কিছু নেই। তবু হঠাৎ হঠাৎ মনে হয়—কতগুলো টাকা!

এ-দেওয়াল ও-দেওয়াল জুড়ে জানলা। খুলে দিলে ঘরটা বারান্দা হয়ে যায়। সাত তলার ওপর থেকে নীচের দিকে তাকায় তিতির। এত ওপরে থেকে অভ্যাস নেই তো। মাথা ঘোরে। জানলাগুলোয় কেন যে ছাই গ্রিল দেয়নি ওরা! অমিতও অবশ্য গ্রিল লাগাতে রাজি নয়, বলে—গ্রিল দিলে খাঁচার মতো হয়ে যাবে। কিন্তু তিতিরের ভয় করে। আকাশটা যেন হাত বাড়িয়ে রয়েছে। একতলা পর্যন্ত বিশাল শূন্যের ব্যবধান যেন ক্রমাগত জানলা দিয়ে তাকে ডাকে—এসো, লাফিয়ে পড়ো।

তিতির সরে আসে। লাফিয়ে পড়ার কোনও কারণ নেই। তার জীবনে কোনও দুঃখ আছে?

অমিত দ্বিতীয়বার আমেরিকা থেকে ফেরার সময়ে একটা মস্ত টেলিভিশন সেট নিয়ে এসেছে। সামনের ঘরে সেটা রাখা, ওপরে পুতুল, ফুলদানি। এখনও অবশ্য টেলিভিশনের পরদা অন্ধকার। কলকাতায় টি-ভি চালু হলে তারা দেখবে সেই আশায় আগে থেকে এনে রেখেছে অমিত। বিদেশ থেকে আনা কত কী তাদের ঘরে!

তিতিরের মুখখানা ছিল সুন্দর। বয়সকালে শরীরটা দেখনসই হয়েছিল। তার জোরেই না অসম্ভব ভালো পাত্র জুটে গেল তার! তিতির আয়না দেখল না, কিন্তু টি-ভি সেটের সামনে একটা গদির হেলানো চেয়ারে বসে নিজের মুখখানার কথা, সৌন্দর্যের কথা ভাবতে লাগল।

দু-বছর হয়ে গেল, অমিত এখনও ছেলেপুলে চাইছে না। কিন্তু পুরুষমানুষের ছেলেপুলের ঝোঁক থাকেই। কবে বলবে—তিতির এবার ছেলে দাও।

যতদিন তা না চায় অমিত, ততদিন তিতির বেশ আছে।

না, খুব ভালো অবশ্য নেইও তিতির। ওই যে শিকহীন গ্রিলহীন মস্ত জানলাগুলি, ও গুলোকেই ভীষণ ভয় তার। দিনের বেলায় রোদভরা আকাশ, রাতে আকাশভরা জ্যোৎস্না বা অন্ধকার, নক্ষত্ররাশি, হাওয়া সব কেমন হুহু করে ঢুকে পড়ে ঘরের মধ্যে! ঘরটা যেন বাহির হয়ে যায়! একা থাকে তিতির। ওপরের ফ্ল্যাটে বা পাশের ফ্ল্যাটে কোনও শব্দই হয় না, কারও গলার স্বর কানে আসে না, নীচের রাস্তাটাও নির্জন—সেখান থেকে এত ওপরে কোনও শব্দ উঠে আসে না। আর এই গভীর নিস্তব্ধতায় ওই খোলা জানলা দিয়ে হাতির মতো ঢুকে আসে বাইরেটা। ভীষণ হুহু করে ঘরদোর। হাতিটা তার শুঁড় দিয়ে সব উলটেপালটে দেখে, এঘর ওঘর খুঁজে বেড়ায়, বলে—খুব সুখী তুমি তিতির।

সুখীই তিতির। শুধু ওই খোলা জানলাগুলোই তাকে দুঃখ দেয়। আগে ছেলেপুলে হোক, তখন অমিতকে বলবে গ্রিল দিতে। ছোট খোকা হামাগুড়ি দেবে, হাঁটতে শিখবে,

ডিং মেরে জানলা দিয়ে বাইরে উঁকি দেবে—মাগো তখন যদি পড়ে যায়? খোকার জন্য তখন ঠিকই গ্রিল দিতে রাজি হবে অমিত। কিন্তু এসব বাড়িতে গ্রিল দেওয়ার নিয়ম আছে কি না কে জানে! হয়তো কোম্পানি থেকে বলে দেবে যে, গ্রিল-ট্রিল চলবে না, তাতে বাড়ির সৌন্দর্য থাকে না। তখন ওই বাইরের হাতিটা চিড়িয়াখানার হাতির মতো জানলার ওপাশে আটকে থেকে শুঁড় দুলিয়ে বলবে—খুব সুখী তুমি তিতির!

তিতির উত্তর দেবে—হ্যাঁ হাতিভাই, আমি খুব সুখী। তুমি মাঝে-মাঝে এসে আমাকে দেখে যেও।

বাপের বাড়ি থেকে কেউ আসে না। না আসাই স্বাভাবিক। ওরা আসতে ভয় পায়। সংকোচ বোধ করে। বড্ড বড়লোকের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে যে তিতিরের। সবসুদ্ধ তিন বোন তারা। তিতির ছোট। বড় দুই দিদির ভালোই বিয়ে হয়েছিল, কিন্তু তারা এখন সূর্যের পাশে মাটির পিদিম হয়ে গেছে।

এসব ভাবতে বুকে একটু দুঃখ আর একটু সুখ, দুটি ঢেউ ভাঙে।

টুং করে কলিং বেল-এ পিয়ানোর একটা রিডের শব্দ ওঠে। রোজ এরকম শব্দ। দরজায় একটা কাচের চৌখুপি আছে। সেইটি দিয়ে দরজা খোলার আগে দেখে নেয় তিতির। হ্যাঁ, অমিত।

অমিত ঘরে আসে। আগে আগে দরজার কাছেই সর্বাঙ্গ দিয়ে চেপে ধরত তিতিরকে, মুখের সর্বত্র চুমু খেয়ে নিত। আজকাল খায় না। অত কী? রোজ তো খাচ্ছেই অন্য সময়ে।

অমিত ঘরে ঢুকে বলে—আজও?

তিতির চমকে বলে—কী?

—তুমি ম্লানমুখী।

তিতির লজ্জা পেয়ে বলে—না। জানো, আমি না ওই জানলাগুলোর কথা ভাবছিলাম। বড্ড ভীষণ ফাঁকা।

—ওঃ! আমি ভাবি, বুঝি তিতির তার কোনও পুরোনো প্রেমিকের কথা ভাবছে।

তিতির রাগ করে বলে—ভাবছি তো! সে এসে ওই জানলা দিয়ে ডাকে। একদিন ঠিক ঝাঁপ দেব।

অমিত একটু বেঁটে, কালো, একটু মোটাও। ইদানীং মেদ কমানোর জন্য স্লিমিং কোর্স নিচ্ছে। অফিসের পর সেখানে যায়। আলু মিষ্টি খায় না।। কত খাবার বানায় তিতির। ও খায় না। কেবল একটুআধটু ড্রিঙ্ক করে। ওর বেহিসেবি হলে চলে না। কত কাজ ওর!

—আজ একটা নতুন খাবার করলাম মাথা খাটিয়ে।

—কী?

—ডিমবেগ। খেতে বসে দেখবে, আগে বলব না, কী দিয়ে তৈরি হয়েছে।

অমিত হেসে বলে—তোমার সেই নিরামিষ ডিমের কারিটা যেন কী দিয়ে করেছিলে?

—কেন, খারাপ হয়েছিল? ডিমের বাইরের সাদাটা করেছিলাম ছানা দিয়ে, আর ডালসেদ্ধ দিয়ে কুসুম।

—বেশ হয়েছিল। তবে কিনা ওসব বেশি খেলে আমার আবার না ফ্যাট বাড়ে।

—তা বলে না খেয়ে শরীর দুর্বল করে ফেলবে নাকি? ওসব চলবে না। ঘরভরতি এত খাবার, খায় কে বলো তো?

তিন

ভদ্রলোকের নাম শচীন দাশগুপ্ত। ছেলেমেয়েদের সামনে জোনাকিকে দাঁড় করিয়ে তিনি বললেন—এই ইনি স্কুল ফাইনালে—

জোনাকি লজ্জা পায় আজও। বাঘটা একবার বেরিয়েছিল, তারপর আর তাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি।

জোনাকিকে শচীনবাবু তাঁর ঘরের সবচেয়ে ভালো চেয়ারে বসালেন, এমনভাবে বসালেন যাতে মুখে ভালোভাবে আলো পড়ে। তাঁর চার-পাঁচজন ধেড়ে-ধেড়ে ছেলেমেয়ে হাঁ করে দেখছিল, গিন্নিও এলেন। এক বুড়ো আত্মীয় কেউ এসেছেন, তিনি বাক্যহারা। স্ট্যান্ড করা ছেলে। ইয়ার্কি নয়।

কেবল জোনাকিই জানে—এটা কত বড় ইয়ার্কি। তবু খারাপ লাগে না। শচীনবাবুর বড় মেয়েটি যুবতী। সে বেশ চেয়ে থাকতে জানে। জোনাকির খারাপ লাগছিল না।

বুড়ো আত্মীয়টি জিগ্যেস করেন—কী করেন?

—চাকরি।

—আ হা, চাকরি করেন কেন? ব্রিলিয়ান্ট ছেলেরা এডুকেশন লাইনে থাকলে ছাত্ররা কত কী শিখতে পারে! বড় চাকরির লোভে কত ভালো ছেলে নিজেকে নষ্ট করে, দেশও বঞ্চিত হয়।

—আমি বড় চাকরি করি না। সামান্য কেরানি।

—সে কী? বলে শচীনবাবুর আত্মীয় চেয়ে থাকেন।

শচীনবাবু একটু মলম লাগানের চেষ্টা করে বলেন—তাতে কী? উনি টেনথ হয়েছিলেন সেটা কি তা বলে মুছে গেছে? বোর্ডের খাতায় তো আর নামটা মুছে ফেলেনি। যাকে বলে দশজনের একজন।

—তা বটে। বলে আত্মীয়টি নিজেকেই সান্ত্বনা দিলেন বোধহয়।

জোনাকির লজ্জা করছিল। পরিষ্কার বুঝতে পারল, শচীনবাবুর মেজো ছেলে তার মায়ের কাছে পয়সা নিয়ে দোকানে গেল খাবার আনতে। শচীনবাবুর বড় মেয়ে জোনাকিকে একটুও অপছন্দ করছে না। কেবল আত্মীয়টি উঠে বললেন—চলি। রাত হল। কেউ তাকে থাকতে বলল না।

কথাবার্তা তেমন কিছু হল না। কী করে হবে, এদের সঙ্গে যে মোটেই পরিচয় নেই। তা ছাড়া টেনথ হওয়া ছেলে। মুখ ফসকে বেশি কথা বলা ভালোও দেখাবে না। মিষ্টি খেয়ে উঠে পড়ল জোনাকি।

শচীনবাবু আর তাঁর স্ত্রী বললেন—আবার আসবেন। খুব ভালো লাগল।

শচীনবাবুর বড় মেয়ে নিমি আলাদা করে বলল—আসবেন কিন্তু। আগে খবর দেবেন, আমার বন্ধুরাও আসবে দেখতে।

জোনাকির বড় লজ্জা করছিল। বাঘটা মোটে একবার—

বেরিয়ে এসে জোনাকি দেখল, এখনও মোটেই রাত হয়নি। বাড়ি গিয়ে কিছু করার নেই। বাবা সাত সকালে খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। মা বড়মেয়ের বাচ্চার জন্য কাঁথা সেলাই করছে। সাঁঝ-ঘুমোনী ছোট বোনটা বিবিধ-ভারতী চালিয়ে শুয়ে আছে। বড্ড ছোট বাসা।

ওই বাসায় তিতিরকে মানাত না। তার চেয়ে বরং শচীনবাবুর বড় মেয়েকে বেশ মানায়। ভাবতেই হঠাৎ চমকে ওঠে জোনাকি। তাই তো! শচীনবাবুরা দাশগুপ্ত না! পালটি ঘর। তবে কি শচীনবাবু ভেবে-চিন্তে প্ল্যান মাফিক জোনাকিকে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর

বাড়িতে? আশ্চর্য নয়। হয়তো অফিসের গেট-এ তাকে দেখেই শচীনবাবুর মাথায় কল্পনাটা খেলে থাকবে। কেরানি হোক আর যা-ই হোক, এক সময়ের টেনথ হওয়া ছেলে তো!

ভাবতেও জোনাকির লজ্জা করছিল। এ হয় না। ওই টেনথ হওয়ার জন্যই এক সময়ে তিতিরও তাকে পছন্দ করেছিল। পরে, ভুল বুঝতে পারে। বাঘটা একবারই—

খুব একটা সুন্দর রাস্তা দিয়ে এখন হাঁটছে জোনাকি। এসব রাস্তায় তো বড় একটা আসা হয় না। চারদিকে বিশাল-বিশাল নির্জন সব অ্যাপার্টমেন্ট হাউস উঠেছে, আরও কিছু বাড়ির কঙ্কাল দাঁড়িয়ে আছে। হুশ করে একটা দুটো মোটরগাড়ি চলে যায়। আর কোনও শব্দ নেই। কারা থাকে এখানে? শিকারি, না বাঘ?

বৃষ্টি এল। উপায় কী, জোনাকি দৌড়ে গিয়ে একটা অ্যাপার্টমেন্টের দরজায় উঠে পড়ল। আসলে দরজাও ঠিক নয়, মস্ত গ্যারেজ ঘরের ফাঁকা জায়গা। দারোয়ান বসে বৃষ্টি দেখছে আর খইনির থুতু ফেলছে। তার দিকে ভ্রূক্ষেপও করল না। জোনাকি দাঁড়িয়ে অজস্র ঝিকিয়ে ওঠা অস্ত্রের মতো বৃষ্টির ধার দেখে। কিছু করার নেই। তবে অপেক্ষা করতে তার মন্দ লাগে না। কোথাও তো যাওয়ার নেই। সেই দু-বছর আগে, যখন তিতির ছিল, তখন যাওয়ার জায়গা ছিল। তিতিরই তো একটা জায়গা। কত সুন্দর সব দৃশ্য ছিল তিতিরের নানা ভঙ্গির মধ্যে লুকিয়ে।

সেই ভীতু বাঘটা কেন কোনওদিনই বেরিয়ে এল না? কেন গভীর জঙ্গলের মধ্যে মুখ লুকিয়ে বসে রইল চুপ করে? ওইভাবেই লুকিয়ে বসে রইল চুপ করে? ওইভাবেই লুকিয়ে থেকে সে কি মরে গিয়েছিল একদিন? কেন গর্জন করে বেরিয়ে আসেনি? সত্য বটে শিকারিরা ছিল, তাদের হাতে ছিল কার্তুজ-ভরা রাইফেল। কিন্তু এও তো সত্য যে ছিল অবারিত মাঠ, বিশাল পৃথিবীর মুক্তিও। সে উত্তাল গতিতে বেরিয়ে ছুটে চলে যেতে পারত, সেই মুক্তির দিকে। শিকারির গুলি কি সব বাঘের গায়ে লাগে। লাগলেই বা কী, তবু তো বুঝতে পারত, তার মৃত্যুও কারও-কারও প্রয়োজন! তাই অত শিকারির আনাগোনা, অত সর্তক দৃষ্টি অত ক্যানেস্তারা পেটানো। কত গুরুত্ব তার!

একটা গাড়ি কেমন চমৎকার সবুজ। কী বিশাল তার চ্যাপটা আর সবুজ দেহখানি। গাড়িটা গ্যারেজে ঢুকল। একজন লোক নেমে চলে গেল লিফটের দিকে। ফিরেও তাকাল না। হতে পারত জোনাকিও ওরকম। যদি কেবলমাত্র দশম হওয়াটুকু বজায় রাখতে পারত সে। কেন পারেনি, তা আর একবার ভাববার চেষ্টা করল সে। ভেবে দেখল, পারেনি বলেই পারেনি। বড্ড বেশি সচেতন হয়ে গিয়েছিল নিজের সম্পর্কে। মফসসলের স্কুলে এক গরিবের ছেলের অতটা হওয়ার কথা নয় তো! বড্ড বেশি পড়ত, তাতেই মাথা গুলিয়ে গিয়ছিল বোধহয়। কিংবা কী যে হয়েছিল এতদিন পর তা আর মনে পড়ে না।

যদি হত তবে জোনাকিকুমার আজ এরকম একটা মস্ত ফ্ল্যাট বাড়িতে থাকতে পারত, গাড়ি চালাত। তার বউ হত তিতির বা ওরকমই কেউ। খুব সুন্দর। এই বৃষ্টি বাদলার পৃথিবীতে কেবলই পথ ছেড়ে উঠে এসে পরের দরজায় দাঁড়িয়ে অসহায়ভাবে বৃষ্টি দেখতে হত না। বেশ সুখেই থাকত এক সফল জোনাকিকুমার। নিমির মতো হাঘরে মেয়েরা তাদের তুচ্ছ ঘর-সংসারে তাকে ডাক দেওয়ার সাহসই পেত না।

এত বৃষ্টি! ঝড়ের হাওয়ার সমুদ্র থেকে উঠে আসে মেঘ। পরতে-পরতে আকাশ ঢেকে দিচ্ছে। রাস্তায় প্রতিহত জলকণা উঠে চারদিক ঝাপসা করে দেয়। চেনা পথ ধুয়ে যায় বৃষ্টিতে, ঘরে ফেরার দিকচিহ্ন উড়িয়ে নিয়ে যায় ঝড়। আজও মনে হয়, এই দুর্যোগেও কোথাও যাওয়ার নেই জোনাকির। এই তো বেশ দাঁড়িয়ে আছে। কেটে যাচ্ছে আসলে খানিকটা সময়। জোনাকির সময়ের অভাব নেই। সে যদি সফল জোনাকি হত তো থাকত। কত ব্যস্ততা, কত টেলিফোন, কত নানাজনের ডাক। সেসব নেই জোনাকির। মস্ত বাড়ির তলায় নীচু গ্যারাজ ঘরে এই কেমন ছোট্টটি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

অনেকক্ষণ ধরে বৃষ্টি পড়ছে। অনেকগুলো গাড়ি চলে এল গ্যারেজ ঘরে। কত গাড়ি! দারোয়ান উঠে আলো নেভাচ্ছে। এরপর দরজা বন্ধ করবে। তার আগে হয়তো বা চলে যেতে বলবে জোনাকিকে। সে বড় অপমান। এ-বাড়িতে তার ঘর নেই ঠিকই, কিন্তু তা বলে কোনও জায়গা থেকে কেউ চলে যেতে বললে আজও অপমান বোধ করে সে।

জোনাকি তাই বৃষ্টিতেই নেমে এল। কী প্রবল ধারা। গায়ে ছ্যাক করে শীতের ছোঁয়া লাগল প্রথমে। তার ফাঁকা মাথায় বৃষ্টির ফোঁটা ডুগডুগ করে বেড়ে উঠল। লক্ষ আঙুল দিয়ে বৃষ্টি তাকে চিহ্নিত করে বলতে থাকে—ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ!

কোথাও যাওয়ার নেই। তবু যাওয়া থেকেই যায় মানুষের। কেন যে যায়! থেমে পড়লেই তো হয় মাঝপথে! কেন কেবল যেতেই হবে?

রাস্তায় লোকজন নেই। একা জোনাকি হেঁটে চলেছে। চোখ অন্ধ ও শ্রবন বধির করে দিয়ে অনন্ত বৃষ্টিপাত হয়ে যেতে থাকে। পোশাক চুপসে যায়। কাঁপুনি উঠে আসে শরীরে। ভিজে-ভিজে হাঁটে জোনাকি। চারদিকে মেঘ ডাকছে। একটা বজ্রপাতের শব্দ হয়। জোনাকি একবার বলে—জানো না তো, তুচ্ছ হয়ে যাওয়ার মধ্যে কীরকম আনন্দ আছে!

কাকে বলে কে জানে!

চার

—ওগো শোনো, কী ভীষণ ঝড় উঠল। তিতির ভয়ের গলায় বলে।

তাকে বুকে টেনে নিয়ে অমিত বলে—ঝড়! তাতে কী? এ-বাড়িতে কোনও ভয় নেই তো তিতির!

—বড্ড হাওয়ার শব্দ হচ্ছে যে!

—এত ওপরে একটু বেশি হাওয়া তো লাগবেই। কিছু ভয় নেই। আমার তো ইচ্ছে করে এই ঝড়ের মধ্যে বৃষ্টি মাথায় করে বেরিয়ে পড়ি। খোলা হাওয়া বৃষ্টির জল আমাকে ধুয়ে মুছে দিক।

—আহা।

—সত্যিই। খুব ইচ্ছে করে। কিন্তু তুমি তো যেতে দেবে না।

—দেব না-ই তো!

—জানি। বড্ড রুটিন হয়ে গেছে জীবনটা।

—রুটিন না হলে চলে? তোমার কত কাজ! তিতির ওকে একটু আদর করে বলে।

একটু ড্রিঙ্ক করেছিল অমিত। বেশিক্ষণ জেগে থাকতে পারল না। ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু তিতিরের আর ঘুম আসে না। সে উঠে এয়ারকুলার বন্ধ করে দিল। ঠান্ডা লাগছে।

একটু ধূসর পরদায় জানলাগুলো ঢাকা। পরদা নড়ছে না। কিন্তু বাইরে হুঙ্কার দিয়ে ফিরছে ঝোড়ো বাতাস। কাচের গায়ে বৃষ্টির ফোঁটা এসে অবিরল টোকা দেয় গোপন প্রেমিকের মতো। তিতিরকে ডাকে।

উঠতেই হয় তিতিরকে। একটা বাজ পড়ল কোথায়। বাড়িটা তার অজস্র কাচের শার্সি নিয়ে ঝনঝন করে কেঁপে উঠল। ঘুম আসবে না। এরকম ঝড়বৃষ্টির রাতেই ভালো ঘুম আসে লোকের, কিন্তু তার আসবে না।

তিতির পরদাটি সরিয়ে দেখে, কলকল করে জলস্রোত নেমে যাচ্ছে শার্সি বেয়ে। নীচে একটা ডাইনির শহর—যত না তার আলো তত বেশি ভূতুড়ে অন্ধকার। বাড়ি-ঘর সব যেন নুয়ে গেছে, গাছপালা হয়ে গেছে কাল্পনিক গাছের ছবির মতো, আলোগুলো বৃষ্টিতে দিপদিপ করে। এত উঁচু থেকে সবই মনে হয় বড্ড দূরের। মাঝখানে শূন্য। আর এই গভীর রাত্রে শার্সি ভেদ করে সেই শূন্যটা ঘরের মধ্যে চলে আসতে থাকে।

বাতি জ্বেলে টিভি সেটটার মুখোমুখি বসে এসে তিতির। হাই তোলে। অমিতের জন্য একটা সোয়েটার বুনছিল, সেইটে নিয়ে বসে।

হাতিটা ভেজা গায়ে সামনে দাঁড়ানো, বলে—খুব সুখে আছ তুমি তিতির।

—হ্যাঁ হাতিভাই। কেবল ওই জানলার গরাদ লাগানো বাকি। সেটা হয়ে গেলে আর কী চাই!

—সেটা লাগাতে খুব বেশি দেরি কোরো না তিতির। কী জানি, কবে তোমাকে আমি চুরি করে নিয়ে যাই জানলা দিয়ে।

—ও কথা বোলো না হাতিভাই। আমি তো কোনও পাপ করিনি যে মরব। বরং এত সুখে থেকেও আমি কখনও আর দশজনের কথা ভুলি না। গত রবিবারে আমরা আমাদের ক্লাবের পক্ষ থেকে ব্লাড ব্যাংকে রক্ত দিয়ে এলাম। শিরাতে ছুঁচ ফুটিয়ে কত রক্ত বের করে নিল বলো তো! অনাথ আতুরদের জন্য যে ফান্ড খোলা হয়েছে তাতে আমরা প্রতি মাসে অনেক টাকা দিই, মাঝে-মাঝে কালেকশনে বেরোই। মূক-বধিরদের জন্য অন্ধদের জন্য, আমরা সব সময়েই ব্যথিত। যা পারি, যতখানি পারি করি। সুখী বলেই স্বার্থপর ভেবো না আমাদের।

হাই উঠছে। ঘুমে ঢুলে আসছে চোখ। তবু ঘুমোতে গেলেই কী একটা হয়। এই ঝড় জলের রাতটা তার দুর্যোগ নিয়ে কেবলই ঢুকে আসে ফ্ল্যাটে। কেন যে এত বড় জানলা করেছে এ-বাড়িতে। কোনও মানে হয় না। আকাশ ঢুকে পড়ে, বাতাস ঢুকে পড়ে। শূন্যতাও বেড়াতে আসে নির্লজ্জ প্রতিবেশীর মতো, এসে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে তিতিরের সুখ-দুঃখের খতিয়ান নিয়ে যায়, বিশ্রী। অমিত কিছুতেই তিতিরের একটা কথা শুনতে চায় না। ও কি বোঝে না যে জানলায় একটা প্রতিরোধ দরকার! ভীষণ দরকার!

টিভি-র পরদাটা ঢালু, তার আলোহীন কাচে কোনও ছবি দেখা যায় না। কবে যে কলকাতায় টিভি চালু হবে! শোনা যাচ্ছে, ওয়ার্ল্ড টেবিল টেনিস দেখাবে এবার। তাহলে কিছুদিনের জন্য বাঁচা যায়। স্নেহভরে একবার চমৎকার সেটটার দিকে চেয়ে থাকে তিতির।

হাতিটা এখনও যায়নি বুঝি! তিতিরকে ডেকে বলল—বলো তো সুখ কাকে বলে!

—সুখ! বলে তিতির ভ্রূ কুঁচকে একটু ভাবে। বলে—কী জানি বাবা! তোমার সব শক্ত-শক্ত প্রশ্ন। তবে মনে হয়, যার কখনও পুরোনো দিনের কথা মনে পড়ে না, যে কখনও অতীত নিয়ে ভাবে না, অনুতপ্ত বা দুঃখিত হয় না, যে কেবল প্রতিটি বয়ে যাওয়া মুহূর্তকে অনুভব করে —সেই সুখী।

উঠে ফের বাতি নিভিয়ে দেয় তিতির। বাইরে যে আজ কী প্রলয়কাণ্ড হচ্ছে! মাগো, গরিব-দুঃখীদের বড় কষ্ট।

—তোমার কিছু মনে পড়ে না তিতির?

হাতিটা তবে এখনও যায়নি! তিতির ভ্রূ কুঁচকে বলে—ওঃ! হ্যাঁ চেষ্টা করলে আবছা সব মনে পড়ে। মনে পড়লে ভীষণ হাসি পায়।

—কীরকম?

—এই ধরো না, আমি একটা ছেলের সঙ্গে প্রেম করতাম। সে স্কুল ফাইনালে টেনথ হয়েছিল। তারপর আর কিছু হয়নি। মনে পড়ে খুব একটা প্রেম হয়েছিল। ভারী মজার নাম ছিল তার জোনাকি!

অন্ধকার হাতড়ে-হাতড়ে শোওয়ার ঘরের দিকে চলেছে তিতির। আর একা-একা খুব হাসছে। এত হাসি পায়। জোনাকি! কী নাম বাবা।

শোওয়ার ঘরে এসে একটু চমকে যায় তিতির। পরদাটা সরানো। মস্ত জানলা কে অমন আদুড় করে দিল? বাইরে একটা ধূসর পাগলা ঝড়। মুহুর্মুহু কাচের শার্সিতে করাঘাত করছে এসে এক মহাশূন্য। বাতাস আকাশ। শার্সি জুড়ে এক বিশাল পরদার টেলিভিশনে দেখানো হচ্ছে এক মহাজগতের মহাপ্রলয়।

শিউরে ওঠে তিতির। ও মা! জানলার একটা ধারের ছোট্ট একটা পাল্লা কে কখন খুলে দিল। বৃষ্টির প্রবল ছাঁট আসছে, বাতাস ঘুর্ণির মতো পরদাটাকে ওড়াচ্ছে কোণের দিকটায়। তিতির জানলার কাছে দৌড়ে গেল। কিন্তু পাল্লার কাছে পৌঁছোতে পারল না। সেই আদিম পাগল ঝড়টা তাকে ধাক্কা দিয়ে বলল—সরে যাও, সরে যাও, আমি তোমার ঘর তল্লাশি করতে এসেছি।

তিতির ভয় পেয়ে সরে আসে।

বিছানায় একটা হালকা চাদর গায়ে চাপা দিয়ে শুতে গিয়েই ফের ভীষণ চমকে ওঠে। অমিত কোথায় গেল?

—ওগো! বলে ভয়ার্ত তিতির উঠে বসে। কোনও উত্তর আসে না।

বাইরে হোহো করে হেসে ওঠে বাতাস। আকাশ বাঘের মতো ডেকে ওঠে শিকার খুঁজে পেয়ে।

—কোথায় গেলে তুমি?

অন্ধের মতো তিতির উঠে অন্ধকার ঘরে ঘুরতে থাকে। ঘরের একধারটা ভিজে যাচ্ছে বৃষ্টিতে, বাতাসে। ওই রন্ধ্রপথে বারবার বাহির চলে আসে ঘরের মধ্যে। ঘরটাকে উড়িয়ে

নিয়ে যায় বাইরে। আব্রু নষ্ট করে। অমিতকেও কি নিয়ে গেল?

ককিয়ে কেঁদে ওঠে তিতির। ও একটু আগেই বলেছিল, ঝড়বৃষ্টির মধ্যে ওর চলে যেতে ভালো লাগে। তিতির ভীষণ চিৎকার করে বলে—এত তাড়াতাড়ি আমার সব কেড়ে নিও না। ওগো, কে তুমি বারবার আসো ঘরের মধ্যে? দয়া করো।

মস্ত ঘরের এককোণে একটু ছোট্ট দেশলাই কাঠির তিনকোণা আগুন জ্বলে ওঠে। অমিত বলে—তিতির, আমিও তোমাকে খুঁজছি। এয়ারকুলারটা বন্ধ করে দিয়েছ, দমবন্ধ লাগছিল, তাই একটা পাল্লা খুলে দিয়ে বসে আছি।

—ডাকোনি তো! তিতির চোখ মুখে, কান্না গিলে হেসে ফেলে।

অমিত চুপ করে থাকে। তারপর বলে—সবসময়ে ডাকতে নেই তিতির। মানুষের মাঝে-মাঝে একদম একা হওয়া দরকার। আমিও দেখো না, একা বসে ঝড় দেখছি কখন থেকে!

তিতির কাছে গিয়ে বলে—কেন গো?

—ওঃ তিতির। কী প্রকাণ্ড এই আকাশ, কী বিরাট শূন্যতা চারদিকে। আর কী ভয়ংকর শক্তিমান ঝড়। এ-সব দেখলে নিজেকে তুচ্ছ লাগে বড়। মাঝে-মাঝে, নিজেকে তুচ্ছ ভাবতে কী যে আনন্দ হয়!

একটা দুটো বেড়াল

চুষিদের বাড়িতে কোনও বেড়াল ছিল না। তবে বেড়ালদের আনাগোনা ছিল। সেসব চোর আর ছোঁচা বেড়ালদের কথা আর বলবার নয়। যতবার মেরে তাড়াও—লজ্জা নেই—আবার আসবে। দেওয়ালে বাইবে। জানালায় উঁকিঝুঁকি দেবে। মিহি সুরে ভারী বিনয়ী ডাক ডাকবে। এমনকী শীতের লেপকাঁথা রোদে দিলে তাতে গিয়ে গোল্লা পাকিয়ে শুয়ে রোদ পোয়াবে। খড়ম, ঝ্যাঁটা, ঠাঙার বাড়ি কী খায়নি তারা? ফাঁক পেলে মাছ নিয়ে গেছে, দুধে মুখ দিয়েছে, নোংরা পায়ের ছাপ ফেলে গেছে বিছানার সাদা চাদরে।

বেড়ালের আরও নোংরা কাণ্ডমাণ্ড আছে। সেসবের জন্য হয় রামু জমাদারকে ডাকতে হয়, নয়তো আলাদা পয়সা দিলে পান্তি ঝি পরিষ্কার করে দেয়।

একটা ভারী বদ হুলো বেড়াল আছে সে কারও তোয়াক্কা করে না। কুঁদো চেহারা, কপাল আর পিঠে খাবলা-খাবলা লোম উঠে গেছে অন্য সব বেড়ালদের সঙ্গে কামড়াকামড়ি করে। হুলোটার চলন খুব ধীর-স্থির, তাড়া করলে দৌড়ে পালায় না, ধীরেসুস্থে অনিচ্ছের সঙ্গে যেন দয়া করে সরে যায়।

চুষির কাকা বিয়ে করবার পর বাড়ির পিছনের বারান্দাটায় দেয়াল তুলে একধারে একটা ঘর হল, বাকিটা হয়ে গেল দরদালান। চুষিদের তাতে খুব আনন্দ। চুষি আর কুসি দুই বোন মিলে তাড়াতাড়ি দরদালানের একধারে পুতুলের ঘর সাজাল। কিন্তু সত্যি বলতে কী পুতুল খেলার বয়স এখন আর চুষির নেই। কুসি ছোট, সে-ই পুতুল খেলে। মাঝে-মাঝে চুষির যখন পড়তে ভালো লাগে না, কিংবা যখন ছুটির দুপুরটা খাঁখাঁ করে, কিংবা মেঘ-বাদলার দিনে ছোট হতে ইচ্ছে যায় তখন গিয়ে কুসির পুতুলঘরে ভাগ বসায়।

শীতের রাত সন্ধে পার করেই সেদিন নিশুত হয়েছে। মফসসল গঞ্জের রাস্তাঘাট নির্জন। কুয়াশা জড়ানো ঘুম-ভাবে চারদিক ঝিমোচ্ছে। বাড়ির দরজা জানালা সব শীতের

ভয়ে আঁট করে বন্ধ! ঠিক সেই সময়ে হঠাৎ দরদালানে হুড়ুম-দুড়ুম শব্দ। রান্না সারা। পুরুষরা বাড়ি ফেরেনি বলে তখনও খাওয়া হয়নি। মা বসে ময়দার চষি পাকাচ্ছিল। পান্তি মেঝেয় পড়ে ঘুম।

মা পান্তিকে ডেকে বলল—দ্যাখ তো। ঘুমচোখে উঠে পান্তি দেখতে গেল। পড়া ফেলে চুষিও। চুষির পিঠোপিঠি ভাই কানু এক হাতে খেলনা পিস্তল, অন্য হাতে দরজার আলগা বাটামটা নিয়ে সবার আগে গিয়ে দরজা খুলে চেঁচাল—কোই হ্যায়?

সবাই জানে এই ভরসন্ধেয় চোর আসে না। তবু তা বলে ভয়টা তো থাকেই।

পান্তি হারিকেন তুলে আলো ফেলতেই চুষি বলল—এঃ মাঃ দেখেছ!

কাণ্ড কাকে বলে! রাংতা এনে কত কষ্টে আজ পুতুলের বিয়ের বাসর সাজিয়েছে! রঙিন কাগজের শিকলি, পিচবোর্ড দিয়ে খাট, বর বউ সত্যিকারের ফুলছাড়ানো বিছানায় শুয়ে। সেই সাজানো বাসর ছয় ছত্রখান করে গুন্ডা হুলোটা দরদালানের বন্ধ জানালার তাকে উঠে বসে আছে।

কানু চেঁচিয়ে বলল—এ হচ্ছে কে এন সিংয়ের কাজ।

কে এন সিংটা যে কে তা আজও ভালো করে কেউ জানে না। তবু—কানু বলে—কে এন সিং হল ভিলেন।

কেউ কিছু গোলমেলে কাণ্ড করলেই কানু চেঁচাবে—এ হল কে এন সিং। একবার বাবাকেও কে এন সিং বলে ফেলেছিল কানু। কারণ, কপিখেত তৈরি করার সময় ভুল করে মায়ের লাগানো একটা দোলনচাঁপা গাছ উপড়ে ফেলে দেয়। মা রাগারাগি করাতে বাবা বলেছিল—ফুলগাছ-টুলগাছ কোন কাজে লাগে! যত সব মেয়েলি ব্যাপার। বাগান হচ্ছে নরম মনের জন্য। খেত হল শক্ত মনের জিনিস। এই ব্যাখ্যাটা কেউ তেমন মানতে পারেনি। কানু বলে উঠেছিল—কে এন সিং।

বাবা জিগ্যেস করল—কে এন সিং কে?

একজন রাজস্থানী বীর।

—রাজস্থানী বীর? বাবা ভ্রূ কুঁচকে বলল—রাজস্থান না রাজপুতানা? রাজস্থানে আবার বীর হয় নাকি, সব তো শুনি ব্যাবসা করে।

কানু মরিয়া হয়ে বলে রাজস্থানী।

বাবা আর কিছু বলেনি। ইতিহাস তো আর তেমন মনে নেই।

তা হুলোটা কানুর সেই কে এন সিংই বটে। দুধ নয় যে হাঁড়ি ওলটাবি, মাছ নয় যে খাবলা দিবি, পুতুলের ঘরটা তবে ভাঙতে গেলি কোন আক্কেলে? পুতুল খেলার তুই বুঝিস কী রে পাজি?

কানু বাটামটা ধরে একলাফে এগিয়ে গিয়ে চেঁচাতে লাগল—কাম অন কে এন সিং, তুমহারা ইজ্জৎ আজ বহুৎ খতরে মে হ্যায়। আজ তুমহারা টেংরি টুটেগা বিল্লি কা বচ্চে।

চুষি দৌড়ে গিয়ে পুতুলের ঘরের সামনে বসে বড়-বড় চোখে চেয়ে দেখল সব। কান্না পায়! কত কষ্টে সাজিয়েছে। কুসিটা সাঁঝবেলায় ঘুমিয়েছে ভাগ্যিস। কাল সকালে অবস্থা দেখে কাঁদতে বসবে। কানুর হিন্দি শুনে চুষি ধমক দিয়ে বলল—তোমার হিন্দি ছবি দেখা বের করছি কানু। আজই বাবাকে বলব।

—কাম অন কে এন সিং। বলে কানু বাটামটা যেই জানলার তাকে হুলোটার দিকে বাড়িয়েছে অমনি শুরু হল হুলুস্থুল কাণ্ড। এমনিতে হুলোটা ভয় পায় না, কিন্তু এবারটায় যেন মরিয়া হয়ে এক লাফে নেমে কানুকে এক ধাক্কা দিয়েই দরদালানের দরজায় গিয়ে পড়ল। 'ফুঁ-অ অ' করে একটা হতাশার শ্বাস ছাড়ল হুলো। দরজা বন্ধ। কানু লাঠি ঠুকতে-ঠুকতে তাকে তাড়া করল ফের, বলল—বিল্লি কা বচ্চে, তুম নে ইনসান নহি, স্রিফ বিল্লি কি এক নানহে মুন্নে বচ্চে হো। তুমহারা জিন্দগি মে এক গহেরা দাগ দিখাই যাতি হ্যায়।

হুলোটা তাড়া খেয়ে ফের ছুটে আসে রান্নাঘরের বন্ধ দরজায় আছাড় খেতে। হারিকেন তুলে ধরে পান্তিও তাকে হুড়ো দিতে থাকে—যাঃ গ্যাদড়া মুখপোড়া দূর হ।

কিন্তু হুলোটা যাবেই বা কোথা দিয়ে! যাওয়ার কোনও পথ নেই! চুষিও তখন রাগে রি-রি করা গায়ে উঠে গিয়ে বাবার ছাতাটা হাতে করে নিয়ে এল।

মা ভিতর থেকে ডেকে বলল—দেখিস, ভয় পেয়ে যেন আঁচড়ে কামড়ে না দেয়। মায়েরা জানে অনেক। বাস্তবিক হুলোটা যা ভয় পেয়েছিল সে-রাতে।

তিনজন যখন তিন দিক থেকে তাকে ঘিরে ফেলেছে, তখন বারান্দার কোণে দেয়ালের সঙ্গে সেঁটে বসেছে সেটা। দাঁত বার করে ঘ্যাও-ঘ্যাও করে আওয়াজ ছাড়ছে। ল্যাজটা আস্তে-আস্তে ঢেউ দিচ্ছে। কানু লাঠি বাড়াতেই সেটাকে একটা থাবা দিল জোর। চোখ জ্বলে উঠল হুলোটার।

চুষি বুঝতে পেরেছিল, কামড়াবে। কানু বোঝেনি। সে আর-এক দফা বীরত্ব দেখাতে যেই লাঠি উঠিয়েছে অমনি দেখা গেল হুলোটা বাঘের মতো লাফিয়ে উঠল কানুর গায়ে। একটা থাবা তো দিলই, পায়ের বুড়ো আঙুলে দাঁতও বসিয়ে দিল। কী আক্রোশ তার!

সেই নিয়ে ডাক্তার বদ্যি। মা শুধু এসে বলেছিল—দ্যাখো কাণ্ড, জানলার একটা পাল্লা খুলে দিবি তো! নইলে ও পালাবে কোথা দিয়ে? এই বলে মা জানালা খুলে দিতেই হুলো একলাফে পালাল। বাড়ির পারিবারিক ডাক্তার গুণেন ধরের সঙ্গে বাবার বনিবনা হয় না। কানুকে দেখতে এসে ডাক্তার ধর বললেন—অ্যান্টি টিটেনাস দিতে হবে।

বাবা বললেন,—বেড়াল কামড়ালে অ্যান্টি টিটেনাস কেন? আয়োডিন দাও।

—আয়োডিনও দাও। সঙ্গে এটিএস।

বাবা বললেন—ঘোড়া কামড়ালে এটিএস দেয়। বেড়াল কামড়ালে নয়।

ধর কটমট করে তাকিয়ে বললেন—তবে আমি যাচ্ছি—যা খুশি করো।

রাগ করে ডাক্তার ধর চলেই যাচ্ছিলেন, ঠাকুমা এসে তাঁর গায়ে মাথার হাত বুলিয়ে বাবা, বাছা বলে ঠান্ডা করে। বাবা শুধু বললেন—বেড়াল যে এত ডেঞ্জারাস হয় জানতাম না।

হুলোর জন্য এত সব কাণ্ড।

একদিন সকালের দিকে পুবের বারান্দায় রোদে বাবা দাড়ি কামাতে বসেছে। কামানোর জন্য গরম জল আনতে গেছে চুষি। কিন্তু রান্নাঘরের উনুনে তখন ভাত ফুটছে। এসময় হাঁড়ি নামালে ভাত প্যাচপ্যাচে হয়ে যায় বলে মা হাঁড়ি নামাতে রাজি নয়। গরমজলের তাই দেরি হচ্ছে। অধৈর্য হয়ে বাবা বলল—ধুত্তোর, আজ দাড়িই কামাবো না। এই বলে ক্ষুর সাবান আয়না নিয়ে উঠতে যাচ্ছিল। ঠিক সেই সময়ে কপিখেতের দিক থেকে ফোঁস-ফোঁস শব্দ এল।

তারপরই বাবার চিৎকার—দেখে যাও সব, দেখে যাও কী ডেঞ্জারাস কাণ্ড হচ্ছে এখানে।

সবাই ছুটে এসে দেখে একটা হাতদেড়েক লম্বা দাঁড়াস সাপের সঙ্গে নিরীহের মতো লালচে রঙের বেড়ালটার লড়াই লেগেছে কপিখেতে। ভারী মজার লড়াই। সাপটা এক একবার বেড়ালটার বুকে পেটে প্যাঁচ মেরে কান কামড়ে ঝুলে থাকে। বেড়ালটা তখন ভেজা বেড়ালের মতো বসে থাকে চুপচাপ। সাপটা অনেকক্ষণ ওরকম থেকে—কাঁহাতক আর বেড়ালের কান কামড়ে থাকা যায়—এই ভেবে প্যাঁচ খুলে নিজের কাজে রওনা হয়। তক্ষুনি বেড়ালটা ভেজাভাব ঝেড়ে ফেলে লাফিয়ে গিয়ে সামনের দুই থাবায় সাপটাকে ধরে টেনে আনে। তারপর সেটাকে ফেলে কাতুকুতু দেয়, গলার নলীতে কামড়ে ধরে আঁচড়ে

দেয়। সাপটা মহা হাঙ্গামায় পড়ে ওলটপালট খায়, তারপর ফের প্যাঁচ মেরে ধরে। সেই খেলা দেখতে বাইরের লোকও জমে গেল বেড়ার ধারে।

বেড়ার বাইরের লোকজনের মধ্যে চুষি হঠাৎ বাবুদাকে দেখতে পেল। আজকাল কী যে হয়েছে তার! বাবুদাকে দেখলেই কেমন যেন বুকটা ঝাঁৎ করে ওঠে। সারা শরীরে একটা তানপুরার তার পিড়িং করে বাজে। বাবুদা বেশ দেখতে। তার দিকে তাকায় প্রায়ই। চুষি তাকাতে লজ্জা পায়। যদিও ইচ্ছে করে।

কিন্তু সেদিন বেড়াল-সাপের লড়াইয়ের সময় মজাই হল একটা। সবাই যখন লড়াই দেখছে তখন চুষির নজরে পড়ল, বাবুদা একদৃষ্টে তার দিকে চেয়ে আছে। গায়ে কাঁটা দিল চুষির। শিহরণ যাকে বলে। ভারী লজ্জা-লজ্জা করতে লাগল। যতবার চোখ সরিয়ে নেয় ততবারই চোখটা গিয়ে বাবুদার চোখে আটকে যায়। এরকম কয়েকবার হতে-হতে চুষি আর চোখ সরানোর হাঙ্গামায় গেল না। চেয়েই রইল।

বাগানে তখন কপিখেতের ভেজা মাটিতে সাপটাকে নখে করে চিরে ফেলেছে বেড়ালটা।

এই ঘটনার পর বাবা পড়ল মহা সমস্যায়। বলতে লাগল—আমি জানতাম বেজি আর ময়ূরই সাপের সঙ্গে লড়াই করে। কিন্তু বেড়ালের ব্যাপারটাও বেশ ডেঞ্জারাস দেখছি।

বাবার বন্ধু সুভদ্র তার উত্তরে বলে—তুমি দুনিয়ার জানোটা কী হে? চিরকাল হম্বিতম্বি করে এলে, শিখলে না কিছুই। বেড়ালের ব্যাপারটা আমি আগে থেকেই জানতাম।

—চালাকি কোরো না সুভদ্র। জানলে এতদিন বলোনি কেন?

—বাঃ সব জানার কথাই এসে তোমাকে বলতে হবে নাকি?

এইভাবে ঝগড়া লাগল। তা বাবার সঙ্গে সকলেরই ঝগড়া লাগে। রোজ।

কিন্তু বাবা বলতে লাগল—বেড়াল তো বেশ উপকারী প্রাণী দেখছি।

শুনে কে যেন বলল—খুবই উপকারী। ইঁদুর মারে।

শুনে বাবা বলল—ইঁদুর? ইঁদুর কোনও প্রবলেমই নয়। প্রবলেম হল সাপ।

এই নিয়ে তার সঙ্গে বাবার একটা মনকষাকষি হয়ে গেল। বাবা কিছুতেই স্বীকার করল না যে, সাপ বিপজ্জনক প্রাণী হলেও গৃহস্থের ঘরে ঢুকে উৎপাত করে না, যতটা করে ইঁদুর।

শীতের দুপুরে যখন রোদে কাঁসাপেতলের রং ধরে তখন সেই রোদের ওম-এ বসে চারজন লুডো খেলে। ঠাকুমা, মা, চুষি আর পান্তি, কখনও কানু। কাকিমা ছেলে হতে বাপের বাড়ি গেছে, নইলে সেও খেলে। দাদু মারা যাওয়ার পরপরই ঠাকুমা আমিষ, পাড়ওলা শাড়ি আর পান-খাওয়া ছেড়ে দিয়েছিল। তারপর একরাতে স্বপ্ন দেখল, দাদু এসে ঠাকুমার বাঁ-হাতের ওপর ঠ্যাং ঝুলিয়ে বসে বলছে—তুমি যে পান খাও না তাতে আমার বড় কষ্ট হয়। আর কিছু না হোক পানটা অন্তত খেও। সেই থেকে ঠাকুমা আবার পান খাওয়া ধরল।

মুখে রসস্থ পান থাকলে লুডো খেলবার বড় অসুবিধে। মুখ নীচু করলেই কোন ফাঁকে পানের পিক ফুচুক করে বেরিয়ে যায়। ঠাকুমার আবার সামনের দিকে দুটো দাঁত না থাকায় পানের রসে বাঁধ দেওয়ারও উপায় নেই।

ছক্কা চেলে ঠাকুমা তাই ঊর্ধ্বপানে মুখ তুলে জিগ্যেস করে—কটো?

কানু বা মা বা চুষি চাল দেখে দেয়। ঘর গুনে গুটিও চেলে দেয়। ঠাকুমা ঘাড় কাত করে দেখে। কানু ঠাকুমার গুটি চাললে ঘর চুরি করবেই। মহা চোট্টা।

সেদিন ছুটির দিনের দুপুরে যখন খেলা জমে উঠেছে তখন পান্তি এসে খবর দিল, কাকার ঘরে চৌকির তলায় এক বেড়ালনী মুখে করে-করে তার আঁতুড়েছানা এনে রাখছে।

—তাড়াও! তাড়াও! বলে চুষি লাফিয়ে উঠেছিল।

পাশের ঘর থেকে বাবা উঠে এসে প্লাস পাওয়ার চশমাটা খুলে হাতে নিয়ে বলল—কোথায় বেড়ালছানা দেখি?

সবাই গিয়ে দেখে। বেড়ালের বাচ্চাগুলো দেখতে কিন্তু বেশ। একেবারে পাউডার পাফ-এর মতো। একটার পেটের তলা দিয়ে আর একটা মুখ বের করে আছে। একটা অন্যটার গা বাইছে। আর মিহি স্বরে 'মিউমিউ' করে যাচ্ছে অনবরত। ধাড়ি বেড়ালটা বাচ্চা রেখে পালিয়েছে কোথাও। লোকজন সরে গেলে আসবে।

বাবা ঘোষণা করল—বাচ্চাগুলোর খিদে পেয়েছে। ওদের একটু দুধ এনে দে তো চুষি।

মা বলল—দুধ কি ওরা চেটে খেতে পারে? খামোখা দেওয়া!

—আহা, দিয়েই দেখ না। খিদে পেলে বাঘে ধান খায় শুনেছি!

দেওয়া হল। কুসির খেলাঘরের একটা ছোট্ট বাটিতে করে। সে বাটির দিকে ফিরেও তাকাল না বাচ্চাগুলো। বরং একটার গায়ে ধাক্কা লেগে বাটি উলটে দুধটুকু পড়ে গেল। পরে ধাড়িটা এসে সে দুধ চেটে খায়।

সবচেয়ে বেশি উৎসাহ দেখা গেল বাবার আর কুসির। রোজ সকালে ঘুম থেকে উঠে বাবা চা আর কুসি দুধ খেয়েই গিয়ে কাকার ঘরের চৌকির সামনে উবু হয়ে বসে বেড়ালছানা দেখে। রাতে শোওয়ার আগেও বাবা গিয়ে টর্চ ফেলে দেখে আসে। পান্তিকে বলে—একটা ন্যাকড়া-ট্যাকড়া কয়েক ভাঁজ করে ঢেকে দিস ওগুলোকে। শীতে কষ্ট পায়।

মা বলে—হুঁ: বেড়ালরা কত যেন কোট প্যান্ট পরে ঘুরে বেড়ায় শীতকালে!

—আঃ হাঃ, তোমার কেবল সব বিষয়ে ফোড়ন কাটা।

মা-বাবার রোজই লেগে যায়। তাতে অবশ্য মা রোজই দুই-তিন গোলে জেতে। ঝগড়ার শেষে মা প্রমাণ করে ছাড়ল যে, জীবজন্তুদের শীত লাগার কথা নয়। বাবা স্বীকার করল না বটে, তবে বেড়ালছানা চাপা দেওয়ার জন্য আর চাপাচাপিও করল না। মা কিন্তু শোওয়ার আগে একটা ঝুড়িতে চট পেতে নিয়ে গিয়ে ধাড়িসুদ্ধ ছানাগুলোর জন্য চমৎকার বাসা করে দিল।

শুখা বাতাস আর রোদের তাপ কমে চারদিককার শীতভাব শুষে নিতে লাগল। কুয়োর জল অনেক নীচে নেমে গেছে। শিমুলগাছে ফুল এল। বাবুদা ডাকঘরে কেরানির চাকরি পেয়ে বাইরে চলে যাওয়ার আগে একদিন এসে মা-বাবাকে প্রণাম করে গেল। আগে কখনও এরকম প্রণাম-ট্রনাম করেনি।

বাবুদা চলে গেলে কী হয় এখন কিন্তু চুষি ঠিক টের পায় তার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকবার লোকের অভাব নেই। চুষির বুকের ভিতরে হৃৎপিণ্ড ঝলকে-ঝলকে ফোয়ারার মতো রক্তস্রোত বইয়ে দেয়। শরীর জুড়ে সেই রক্ত ঝরনার মতো ঝরে পড়ে। দিনরাত নিজের শরীরে এক অন্তর্গত ঝরনার শব্দ শোনে সে।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে গালের একটা ব্রণ টিপল চুষি। টিপতে নেই, তাহলে বাড়ে। তবু গালে একটা টুসটুসে ব্রণ দেখতে পেলে সেটার ভাত বের না করেই বা থাকে কী করে মানুষ?

ব্রণটা গেলে দিয়ে জায়গাটায় একটু ক্রিম ঘষে দিল সে। মুখখানা বারবার ঘুরিয়ে দেখল। একটু নাচের ভঙ্গি করল। আজকাল অনেক কিছু টের পায় চুষি। শরীর, মন মানুষের চোখ।

কখনও কলঘরে গিয়ে নিজেকে খুঁজে দেখে চুষি। দেখে স্তম্ভিত হয়ে যায়। এ কী! এ মা! সে যে কচি মেয়েটা ছিল এতদিন! বড় হয়ে গেল?

মাঝে-মাঝে রোদে হাওয়ায় ভেসে যেতে-যেতে খুব হোঃ হোঃ হাসতে ইচ্ছে করে তার।

আবার এক একদিন এমন হয়, কুয়োতলা ছাড়িয়ে পিছনের লাউমাচার ছায়ায় বসে দুপুরবেলার নির্জনে বিভোর হয়ে কাঁদে। বেড়ালছানাগুলো আজকাল দরদালানে আসে, ঘরে আসে। ঠাকুমা প্রথম-প্রথম তাড়া দিত—যাঃ, যাঃ, এক্ষুনি সব ছুঁয়ে-ছেনে দেবে।

কিছুদিন বাদে ঠাকুমা আর তাড়া দেয় না। বেড়ালরা দালানে ঘোরে। ঘরে খেলা করে। ফুটফুটে ছানাগুলোকে এ ও সে কোলে নিয়ে খানিক আদর করে ছেড়ে দেয়, লুডোর ছক পেতে দিলে বেড়ালছানারা দিব্বি পা দিয়ে ছকটা উলটেপালটে খেলা করে।

কুসিও খেলে। সে আজকাল খুব বউ সাজতে ভালোবাসে। বাবা ছোট ডুরে শাড়ি কিনে দিয়েছে। চুষি তাকে শাড়ি পরিয়ে বউ সাজায়। কুসি পুতুল-ছেলে কোলে করে একদম মায়ের ভাষায় আদর করে শাসন করে। পাকা মেয়ে।

বাবা দেখে বলে—ওঃ বাবা, মেয়ের বিয়ের কথা ভাবলেই বুক কেমন করে।

মা বলে—তা বিয়ের খরচের কথা ভাবলে ওরকম অনেকের হয়! মেয়ের বিয়েতে খরচ তো করতেই হবে।

বাবা বিরক্ত হয়ে বলে—সবসময় টাকার কথা ভেবে কথা বলি নাকি। মেয়ের বিয়ে দিতে মনের কষ্টও তো আছে।

—তুমি কি সে ভেবে বলেছ!

আবার মাতে বাবাতে লেগে যায়। মা জেতে। বাবা হেরে গিয়ে রেগে কুয়ো থেকে দশ বিশ বালতি জল তুলে ফেলে।

তুলোর আঁশ বাতাসে উড়ে যায়। উঠোনের রোদে সাদা আর সাদা-কালো বেড়ালছানারা এখন গম্ভীরভাবে বসে থাকে থুপ হয়ে। তুলোর আঁশ দেখলে লাফিয়ে-লাফিয়ে ধরার চেষ্টা করে। ঘর দোরে আসে, বিছানায় ওঠে। ধাড়িটা আর বাচ্চাগুলোর কাছে তেমন ঘেঁষে না, পাড়াবেড়ায় চৌপর দিন।

কাকিমা বাচ্চা কোলে করে ফিরে এল একদিন। বাড়িময় ছুটোছুটি পড়ে গেল। আদর আর কাড়াকাড়িতে বাচ্চাটা ভ্যাঁ করে কেঁদে ওঠে। তার পর চুপ করে যায়। তারপর এর কোলে তার কোলে ঝাঁপ খেয়ে যেতে শিখে যায়।

বাবা বলে—মানুষের বাচ্চার চেয়ে বেড়ালের বাচ্চারা অনেক বেশি সাবালক। তারা খুব তাড়াতাড়ি সেলফ-ডিপেন্ডেন্ট হয়।

ধর ডাক্তার বলে—সাবালক হয়, কিন্তু বেড়াল বাচ্চারা কোনওদিনই মানুষ হয় না কথাটা মনে রেখো।

—বোকার মতো কথা বোলো না। বেড়াল মানুষ হতে যাবে কেন?

তা সে যাই হোক। কথাটা হল, চুষিদের বাড়িতে আগে কোনও বেড়াল ছিল না। এখন বেড়াল হয়েছে।

বনমালীর বিষয়

এইখানে বনমালী বাগান করেছে। বাগানের মাঝখানটিতে তার লাল ইটের বাড়ি। বলতে কী, যৌবনকালটা তো সুখে কাটায়নি বনমালী। বড় কষ্ট গেছে। সে সময়ে সে ঘর ছেড়ে কাপড়ের গাঁট নিয়ে রাস্তায় বেরিয়েছিল। মহাজন ধারে কাপড় দিত, নইলে সে ব্যাবসাও শুরু করতে পারত না। ক্রমে ফিরি করতে-করতেই তার শ্যামবাজারের পাঁচমাথার মোড়ের কাছে দোকানটা হয়ে গেল। সারাটা জীবন সে দেখেছে, মানুষের লজ্জা ঢাকার জন্য বস্ত্রের বড় প্রয়োজন। বস্ত্র ছাড়া উপায় নেই।

বনমালী সেই মানুষের লজ্জা ঢাকার বস্ত্রের ব্যাবসায় এখন সুখে আছে। এই যে বাগান, এই যে লাল ইটের বাড়ি এ-ও হচ্ছে মানুষের বস্ত্র। এসব দিয়ে মানুষ লজ্জা ঢাকে। বনমালী তার সারাটা যৌবনকালের দীনতার লজ্জা ঢেকেছে। বাগানে হরেক ফুল, কত নার্শারি ঘুরে-ঘুরে বীজ আনে সে, কত জায়গা থেকে নিয়ে আসে গাছের চারা, লাগায়।

সামনে ফুলের বাগান, পিছনে ফলের। সামনে যেমন ফোটে গোলাপ, বেল, শেফালি, পপী, কিংবা চন্দ্রমল্লিকা, কাঠচাঁপা, তেমনি পেছন দিকে রয়েছে মর্তমান কলার ঝাড়, কেরালার নারকেল গাছ, আম, লিচু পেয়ারা, সুপুরি, কাঁঠালের গাছ। শীতকালে পালং বুনে দেয়, বাঁধা আর ফুলকপি, আলু মুলো বেগুন লঙ্কা সব গাছ লাগায়। অবসর সময়ে ছুটির দিনে সারাদিন বাগানে ঘুরে-ঘুরে গাছ দেখে সে। ভারী একটা বিস্ময় তার বুকে থমকে থাকে। এই যে গাছ হয়, ফুল ফোটে, ফল ফলে—এটাই একটা অবাক কাণ্ড। কী করে এক মাটি, এক সার থেকে এত রকমের রং আর রস তৈরি হয় তা সে বুঝেই পায় না। মাটির ভিতরে বোধহয় তাহলে সবই লুকিয়ে থাকে। এই ফুল ফোটা, ফল হওয়ার সব গুপ্ত রহস্য!

ফিরি করার সময়ে সে যেত কত বাড়িতে। বিচিত্র সব বাড়ি, বিচিত্র সব মানুষ থাকে তাতে। বনমালী বেরোত দুপুরের দিকে, যখন বাড়ির কর্তারা থাকেন বাইরে। গিন্নিরা ফিরিওলার কাছ থেকে জিনিস রাখে—এটা কর্তাদের পছন্দ নয় কখনও। মেয়েরা ঠকেই। দশ টাকার জিনিস কমিয়ে সাত টাকায় রাখে, তবু দেখা যায় দু-টাকা ঠকে গেছে। কর্তারা তাই ফিরিওয়ালা বাড়িতে এলে ভারী বিরক্ত হন, গিন্নিদের ধমকটমক করেন। বনমালী তাই দুপুরে বেরোত। ধার বাকিতে জিনিস দিত, ভারী মিষ্টি ছিল তার ব্যবহার। ডবলের বেশি দাম হেঁকে রাখত, যাতে কমিয়ে কমিয়েও গিন্নিরা তল না পায়। বনমালীর জিৎ হত বরাবর। এখন তার শ্যামবাজারের দোকানে 'ফিক্সড প্রাইস' লেখা কয়েকটা প্লাস্টিকের ছোট বোর্ড ঝোলে। এখন সে আর কষ্ট করে দর কষাকষির মুখে ফেনা তোলা ব্যাবসাতে নেই। তা সেই ফিরিওলা বনমালী যখন বাড়ি-বাড়ি যেত তখন সে মানুষের বাড়ির ভিত দেখত, জানলা দরজা দেখত, গ্রিল দেখত, আসবাব দেখত। তার মন বলত—যদি কোনওদিন হয়, ভগবান সুদিন দেন তো এরকম বাড়ি করব। সামনে বারান্দা থাকবে, তাতে পদ্ম আর রাজহাঁসের নকশাওলা গ্রিল, ঘরে-ঘরে বাথরুম থাকবে, ছাদে থাকবে ঠাকুরঘর...এরকম নানা কথা ভাবত, ভেবে রাখত বনমালী। ঘরে টিউবলাইট, রেডিও, রেফ্রিজারেটার, গ্রামোফোন, সবই থাকবে। আর থাকবে বউ। সুন্দরী লক্ষ্মীমন্ত।

সবই হয়েছে বনমালীর। ভগবানের ইচ্ছা। বাগান হয়েছে, হয়েছে লাল ইটের দেড়তলা ছিমছাম সুন্দর বাড়িখানা। সামনে পদ্ম আর হাঁসের নকশাওয়ালা গ্রিল। গ্রীষ্মের রাতে স্নান করে এসে যখন বারান্দার ইজিচেয়ারে বসে সে তখনই বেল আর গোলাপের গন্ধ আসে, আরও নানা গন্ধ। সবচেয়ে ভালো লাগে মাটির ভিজে স্নিগ্ধ গন্ধটি। একই মাটি থেকে কোন ম্যাজিকওয়ালা যে এতরকম রং আর রস তৈরি করছে! বনমালীর বিস্ময় এখানেই শেষ হয় না। বসে-বসে সে চারদিক দেখে। তার বিষয়-সম্পত্তির ওপর যখন আবহমান কালের চাঁদের আলো পড়ে, তখন তার মনে হয়, তার এক জীবনের দারিদ্র্যের লজ্জা কেমন সুন্দর বাগানের ফুলের গন্ধে, বাড়িটার ছিমছাম সৌন্দর্যে ঢাকা পড়ে গেছে। বিষয় হচ্ছে মানুষের আত্মার সবচেয়ে বড় বস্ত্র। কী করে এই দুলর্ভ বস্ত্রটি পেয়েছে! এইটে ভেবেই তার বিস্ময় আর শেষ হতে চায় না। সে চুপ করে বসে থাকে। মুখটি হাঁ হয়ে যায়, চোখে পলক পড়ে না। এইভাবে অনেকক্ষণ কেটে গেলে তার বউ এসে ডাক দেয়—বলি ভূতে পেয়েছে না কি! ভাবছ কী হাঁ করে!

বনমালী চমকে উঠে তার বউয়ের দিকে চায়। বিস্ময় তার শেষ হয় না সত্যিই। এই যে রমণীটি—এ হচ্ছে তার সেই মহাজনের মেয়ে। খেটেখুটে বনমালী উন্নতি করল দেখে সে ভারী খুশি হয়েছিল। একদিন তাকে ডেকে বলল—দেখ বনমালী, ছেলের মতো তোমাকে দেখেছি এতদিন। দেখলাম, তুমি বাহাদুর বটে। তোমার মতো ছেলেকে ছাড়তে

ইচ্ছে করে না। আমার ইচ্ছে, তোমাকে বেঁধে রাখি। আমার পয়সার অভাব নেই, বড় তিনটে মেয়েকে সোনা জহরৎ আর টাকায় মুড়ে ভালো ঘর-বরে বিয়ে দিয়েছি। কিন্তু ভালো ঘর-বর বলতে লোকে বোঝে টাকাওলা বনেদি বংশ। বনেদি বংশে মেয়ে দিয়ে সুখ পাইনি। জামাইরা সব পৈতৃক টাকায় খায়দায় বাঁশি বাজায়, ঘুড়ি আর পায়রা নিয়ে আছে। পরিশ্রমী, লড়িয়ে মানুষ নয়। ভাবছি শেষ মেয়েটাকে আর ওসব অপদার্থের গলায় ঝোলাব না। তোমার এখন উঠতি সময়, এখনও দাঁড়াওনি। তবু তোমাকেই দেবো, যদি রাজি থাকো।

বনমালী রাজি হয়ে গেল। মেয়েটিকে সে দেখেছিল। সুন্দরীই বলা যায়। রংটা চাপার দিকে, মুখখানা গোলগাল। কিন্তু সব মিলিয়ে চটকদার। ঘন ভ্রূ, টানা চোখ, গালে টোল। সেই মেয়েটিই এখন তার বউ। বনমালীর এও এক বিস্ময়।

মহাজনের মেয়ে। ওর বাপের না হোক দশ-বারো লাখ টাকার কারবার। যৌবনকালে ওর বড়বাজারের দোকানের সামনের হাতায় ঠান্ডায় বসে থাকত বনমালী। সারা দিনটা কলকাতায় দৌড়ঝাঁপ। পৃথিবীটা তখন ভারী পিছল জায়গা বলে মনে হত। কোথাও দাঁড়ানো যাচ্ছে না। দাঁড়ানোর চেষ্টা করতে গেলেই পা হড়কায়। প্রাণপণে তখন পৃথিবীতে লেগে থাকার চেষ্টা এক নাগাড়ে চালিয়ে যাচ্ছে বনমালী। বাপ রিফিউজি কলোনিতে দু-খানা ঘর তুলতেই মাজা ভেঙে বসে পড়েছে। তার আটটি ছেলেপুলে, বনমালী বড়। তাকে ডেকে বলেছে—রাস্তা দেখ।

তা সারাদিন রাস্তাই দেখত বনমালী। কত রাস্তা, কত অলি-গলি, কী বিচিত্র কায়দায় কলকাতা শহর কেটে-কেটে রাস্তা বানিয়েছে মানুষেরা। তখন বনমালীর বিশ্বাস ছিল, কলকাতা শহরে আগে তৈরি হয়েছে বাড়িঘর, দোকানপাট। তারপর সেই জমাট বাড়িঘর আর দোকানপাটের ফাঁক-ফোঁকর দিয়ে মানুষেরা শাবল গাঁইতি চালিয়ে এইসব অলিগলি তৈরি করেছে। রাস্তা ঘাটগুলো তাই এমন গোলমেলে।

সারাদিন রাস্তা দেখে-দেখে বনমালী ক্লান্ত হয়ে এ-বাড়ির রক, সে বাড়ির বারান্দায় বসত। লোকে অচেনা লোক বিশ্বাস করে না। হুড়ো দিত। বনমালী আবার উঠে রাস্তায় হাঁটত। ক্রমে সে দেখেছিল রোদ উঠল, গ্রীষ্মকালে সবচেয়ে ছায়ার জায়গা হচ্ছে বড়বাজার। সেখানে কাটারার ঘিঞ্জিতে কোনওকালে দিনমণির আলো পড়েনি। দুপুরের দিকটায় তাই বনমালীর বাঁধা আস্তানা ছিল বড়বাজার। সেখানে ব্যাপারি খদ্দেরের ভিড়ে দিব্যি গা-ঢাকা দিয়ে থাকা যেত। হুড়ো যে কেউ দিত না তা নয়। তবু বেশিরভাগ ব্যাপারিই গা করত না। তার মহাজন, হবু শ্বশুরের দোকান ঘরটার সামনে একধাপ

সিঁড়িতে বসে থাকত সে। দেখত, দোকান-ঘরে টিউবলাইট জ্বলে, পাখা ঘোরে, খদ্দেরের ভিড় গায়ে-গায়ে, টাকার গাদি লেগে যায় ক্যাশবাক্সে।

মহাজন একদিন এক বড় খদ্দেরকে খাতির করতে গিয়ে বনমালীকে ডেকে বলে—যাও তো খোকা, লাটুর দোকানে তিন কাপ চা বলে এসো তো। বোলো দুখীরামবাবুর চা, তাহলে বেশি দুধ-চিনি দিয়ে দেবে।

সেই হল বনমালীর পয়লা দড়ি, যা দিয়ে নিজেকে সে পিচ্ছিল পৃথিবীর সঙ্গে আজও আটকে রেখেছে। চা বলে এল বনমালী। পরদিন সিগারেট এনে দিল। ক্রমে-ক্রমে মহাজন তাকে দিয়ে আরও ফাইফরমাস করাতে লাগল। যত করায় তত করে বনমালী টুঁ শব্দটিও না করে, ফলের আশা না রেখে। 'কী করো খোকা? কোথায় থাকো?'—এরকম দু-একটা প্রশ্নও তাকে মহাজন কখনও-কখনও করেছে।

মহাজনের দোকানে দু-একবার কাপড়ের গাঁট বাঁধল সে। দু-এক জায়গায় মাল পৌঁছে দিয়ে এল। ওইভাবেই একদিন মহাজনের মনের মধ্যে সে সেঁধিয়ে গেল। আর মনের মধ্যে একবার সেঁধোতে পারলে আর ভয় নেই। মানুষের মনই হচ্ছে মানুষের ঠিক বাসা। সে দোকানে ঢুকল বিশ টাকা মাইনের কর্মচারী হয়ে। কয়েকদিন পর মহাজনকে ঘাড় চুলকে বলল—কয়েকখানা বাছাই কাপড় ধারে দিন। মহাজন দিল। গোপনে কাপড় বেচে এল সে, টাকা শোধ করল। এইভাবে তার ব্যাবসার শুরু। ক্রমে-ক্রমে বেশি কাপড়, আরও বেশি কাপড় নিতে-নিতে সে একদিন আলাদা হয়ে ফিরিওলা হয়ে গেল। মহাজন দুখীরাম আপত্তি করেনি। কেবল চোখটা সে খোলা রেখেছিল।

সেই মহাজনকে বরাবর গৃহদেবতার পরের আসনটাই দিয়ে রেখেছিল সে। তার বাড়ির জামাইও যে হওয়া যায় এমনটা তার কখনও মনে হয়নি।

সে রাজি হয়ে গেল। মহাজন দশ হাজার টাকা নগদ দিয়ে সে এক এলাহি বিয়ে দিল তাদের। লোক খাওয়াল হাজার দুই। সেই ম্যারাপ, আলো ফুল লোকজন, উপহার সবই স্বপ্নের মতো মনে হয়। বিয়ের পরও কয়েকদিন সে তার বউয়ের অঙ্গস্পর্শ করতে ভয় পেত। কেমন যেন মনে হত—আরেব্বাস, এ তো মহাজনের মেয়ে!

বলতে কী, বনমালীর আজও তা মনে হয়।

বাগানে জ্যোৎস্না পড়লে কী ফুল ফুটল হাঁ করে দৃশ্যটা দেখে বনমালী। তা সেই মহাজনের মেয়ে যখন এসে তাড়া দেয় তখন বনমালী হঠাৎ মুখ তুলে তার বউকে ঠিক বউ বলে বিশ্বাস করতে পারে না। বিস্তর রাম-চিমটির দাগ বনমালীর শরীরে আজও আছে। স্বপ্ন দেখছে মনে করে নিজেকে জাগানোর জন্য বিস্তর চিমটি কেটেছে।

তা এখন বনমালীর মনে হয়, স্বপ্ন ব্যাপারটা ভারী গোলমেলে। গত কয়েকবছর ধরে সে একনাগাড়েই বোধহয় স্বপ্ন দেখে যাচ্ছে। স্বপ্নের মধ্যেই করছে বসত। সে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে—যদি স্বপ্নেই রেখেছ তো শেষ দিনতক আর ঘুমটা ভাঙিও না বাবা।

বনমালী বাহারি বাগান করেছে এইখানে। নানা রঙে রঙিন বাগানের মাঝখানটিতে তার বাড়ি। কলকাতা থেকে জায়গাটা দূরে নয়। কিন্তু কলকাতার বাইরে, বালী মাকালতলা। বাঁশঝাড় আছে, পুকুর আছে, পুরোনো বাড়ির ধ্বংসাবশেষ আছে, রাতে শেয়াল ডাকে, জ্যোৎস্না উঠল টের পাওয়া যায়। কলকাতা আর ভালো লাগে না বনমালীর। বিয়ের পরও বছর সাত-আট তার কলকাতার নবীন পাল লেনের পুরোনো ভাড়াটে বাসায় কেটেছে। তার বউ—আসলে যে মহাজনের মেয়ে—সে-ই তাগাদা দিত। বলত 'বাড়ি করো, বাড়ি না করলে পৃথিবীতে ঠিক শেকড় গাড়ে না মানুষ। তুমি যে বড়লোক, প্রতিষ্ঠাবান, তার প্রথম প্রমাণই হচ্ছে দিনের শেষে তুমি অন্যের বাসায় না ফিরে ফিরছ নিজের বাড়িতে। ভাড়াটে বাড়ির দেয়ালে একটা পেরেক ঠুকলেও বাড়িওয়ালা দৌড়ে আসে। এ আর ভালো লাগে না।'

চৌপর দিন ঘুরে, দালালের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে, বিস্তর দেখেশুনে মহাজনের মেয়ের পছন্দমতো বালীর মাকালতলায় জমি নিল বনমালী। গ্রামও নয় শহরও নয়। ইলেকট্রিক আছে, দোকানপাট আছে। বাড়ি থেকে টানা তার শ্যামবাজারের দোকানে পৌঁছতে বড়জোর পঁয়তাল্লিশ কি পঞ্চাশ মিনিট লাগে।

তার বউ অতসীকে সে বাড়ির মধ্যে প্রতিষ্ঠা করে নিশ্চিন্ত হল। এখন সকালবেলা গৃহদেবতাকে ভূলুণ্ঠিত প্রণাম করে নিজের বাড়ি থেকেই বেরোয় বনমালী।

পৌনে সাতটার ট্রেন ধরে। পৌনে আটটার মধ্যে ধূপধুনো দিয়ে দোকান খুলে ফেলে। বাচ্চা একটা চাকর আছে, সে চা এনে দেয়। বাড়ি থেকে যখন বেরোয় তখন প্রায় দিনই চা খেয়ে আসা হয় না। মহাজনের মেয়ের বেলা পর্যন্ত ঘুমোনোর অভ্যাস। সকালে উঠলে সারাদিন মেজাজ ঠিক থাকে না। ঠাকুর আছে, বাচ্চা একটা কাজের মেয়েও আছে বটে, কিন্তু বনমালী কাউকে খাটায় না। এক গ্লাস ইসবগুলের ভুসি খেয়ে প্রাতঃকৃত্য সেরে চলে আসে। সকালের প্রথম চা-টি খায় দোকানে বসে।

দোকানখানা তার নিজের। একার। কোনও অংশীদার নেই। শ্যামবাজারের পাঁচমাথার মোড়ের কাছে এই দোকানঘরখানা যদি বনমালী এখন ছেড়ে দেয় তবে লাখ দেড়েক সেলামি লেগে যাবে। বনমালী হাজার দশেক দিয়ে নিয়েছিল দশ বছর আগে।

ঘরখানা বড়ই, একনম্বর সেগুন দিয়ে তৈরি তার বিশাল-বিশাল আলমারি, শো-কেস, কাউন্টার। কাউন্টারের গায়ে ইদানীং সানমাইকা লাগিয়ে আরও বাহার খুলেছে। দোকানটা চার ভাগে ভাগ করা। এক কাউন্টারে তাঁত ও সিল্ক, অন্যটাতে মিলের সুতি, সিল্ক, টেরিলিন, একটাতে রেডিমেড, আর সবশেষে হোসিয়ারি। শীতকালে পশমি জিনিস, শাল-মলিদা, সোয়েটার, সুটের কাপড়। লাখ টাকার মাল মজুত রয়েছে দোকানে। কাচের ওপাশে হরেক রঙের বাহার। বনমালীর জীবনে রঙের অভাব নেই। বাড়িতেও রং, দোকানেও রং।

দোকানের ঠিক মাঝখানটিতে একটি কংক্রিটের থাম। ঘরটার ভারসাম্য রাখার জন্যেই তৈরি। চৌকো থামখানা বিশ্রী দেখায়, তাই বনমালী ভালো পালিশ কাঠে থামখানা আগাপাশতলা ঢেকে চারধারে চারটে সরু, লম্বা আয়না লাগিয়েছে। থাম ঘিরে গোল একখানা কাউন্টার। থামের একপাশে পেতলের রেলিংওলা ক্যাশের খোপে বসে বনমালী, অন্য ধারটায় প্যাকিং আর ডেলিভারি।

সাতসকালে ধোঁয়া ওঠা পুরো এক গ্লাস সুগন্ধি চা সামনে রেখে বনমালী হাই তোলে। আর চারদিকে চায়, আলাদিনের গল্পের সেই দৈত্য, নাকি মহাভারতের সেই দানব ময়—কার যে কীর্তি তা ঠিক বুঝতে পারে না।

লোকে বলাবলি করে, বনমালী বড় উন্নতি করেছে।

উন্নতি! তা অবশ্য বনমালী অস্বীকার করে না। উন্নতি বইকী! কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা আছে একটা। উন্নতির চেয়েও বেশি হচ্ছে একটা বিস্ময়বোধের জন্মলাভ, এ দোকান যে তারই, সে-ই যে মালিক, এর যে আর কোনও মহাজন নেই সেটা তার ঠিকমতো বিশ্বাস হতে চায় না। এ দোকান সে কি নিজে করেছে! এ কি তারই! তার বর্ণহীন জীবনে এত রঙের বাহার কবে খোলতাই হল!

কারবার দাঁড়িয়ে গেলে আপনিই চলে, তার জন্য হালদারি শিকদারির আর দরকার হয় না। একবার কারবারটা বেঁধে ফেলতে পারলেই হল। পেতলের রেলিং ঘেরা ক্যাশ কাউন্টারে বসে পাখির পালকে কানে সুড়সুড়ি দিতে-দিতে আরামে আধবোজা চোখে বনমালী দেখে, তার কারবার চলছে। চোখ পুরোপুরি বুজে থাকলেও চলবে। কাপড় মাপা হবে, কাটা হবে, প্যাকিং হবে, ক্যাশে এসে দাঁড়াবে লোকজন, বনমালী টাকা গুনে-গেঁথে তুলবে, ইনকাম ট্যাক্স, পুলিশ, কর্পোরেশন সব বন্দেবস্ত মতো চলবে। মাঝে-মাঝে দুপুরের দিকে বড়বাজারে মাল তুলতে যাবে বনমালী, কিংবা রেল-ইয়ার্ডে মাল ছাড়াতে। কিছু কষ্ট নেই সেইসব নড়াচড়ায়। টাকার ছবিতে বড় বাহার। সব সয়। বড় ছেলেটা দশে পা দিল। মেরেকেটে আঠারো হলেই কারবার বোঝাবে। ততদিন বেঁচে থাকলেই হল। বড়

ছেলেটা একটু বুঝে গেলেই আর চিন্তা নেই। শুধু সেটুকুর জন্য, কয়েক বছর সময়ের জন্যে একটু দুশ্চিন্তা তার। মোটা ইন্সিওরেন্স করে রেখেছে নিজের আর বউয়ের, দোকানও ইন্সিওর করা, তবু ভয় একটু থেকেই যায় সেটাকে ইন্সিওর করা চলে না। আর আট-দশ বছর সে কি বাঁচবে না? বাঁচবে, এখনও সে পোক্ত আছে বেশ। মাত্র পঁয়তাল্লিশ কি ছেচল্লিশ বছর, ঠিকমতো বাঁচলে আরও বহুদিন তার বাঁচার কথা।

বিকেলের দিকে সত্যচরণ আসে। গাঁটরি বওয়ার আমলে তার সঙ্গে ভাব হয়েছিল। দিনের শুরুতে ঠিক করে নিত কে কোন রাস্তায় ফিরি করবে। সেই থেকে বন্ধুত্ব। সত্যচরণ তেমন কিছু করতে পারল না। রিফিউজি কাটারায় দোকান দিয়েছে একটা। চলে না তেমন। স্টকও রাখতে পারে না। শরীরটাই সত্যচরণের জুতের নয়। রোগা-ভোগা, তার ওপর নেশা-ভাঙ, একটু মেয়েমানুষের দোষও ছিল, গায়ে পারা উঠে যাচ্ছেতাই ভুগেছিল একবার। জমানো টাকা সব তাতেই গলে গেল। শেষমেষ রিফিউজি কাটারায় দোকান ছাড়া আর উন্নতি করতে পারল না সে। ছেলেরা বড় হয়েছে, তাদের মধ্যে বড়টি দোকান দেখে, সত্যচরণ আসে বনমালীর দোকানে। দরজার কাছে টুলখানায় বসে থাকে। ছ'টা বাজলে বনমালী ক্যাশে সবচেয়ে বুড়ো আর বিশ্বাসী কর্মচারী সুধীরবাবুকে বসিয়ে বেরিয়ে আসে।

দুই বন্ধুতে তেমন কোনও কথা হয় না, বনমালী একটা সস্তার নেশা শিখেছিল। মোদক। হেমদা কবিরাজের দোকানে এক সময়ে যেত বাবার জন্য স্বর্ণ-সিঁন্দুর কি চ্যবনপ্রাশ আনতে। সেই থেকে মদনানন্দ মোদকের বিজ্ঞাপনটা খুব টানত। হেমদার পর বরদা কবিরাজের আমলে সাহস করে কথাটা পেড়েছিল সে—মোদক একটু খেলে বোধহয় প্রফুল্ল থাকা যায়, কী বলেন বরদাবাবু?

খুব হেসেছিলেন বরদা, বললেন—লজ্জার কী? প্রফুল্ল থাকলেই হয়।

সেই থেকে সে বাঁধা খদ্দের! নেশা কে নেশা, গন্ধ বেরোয় না, মাতলামি নেই, কেবল একটা বুঁদ হয়ে যাওয়া আনন্দের ভাব আছে।

সেবার যখন সত্যচরণ লিভারের বারোটা বাজিয়ে ক'দিন প্রাণান্তকর ন্যাবায় ভুগে উঠল তখন তার বউ তাকে দিয়ে মা কালীর পা স্পর্শ করিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নেয় যে মদ খাবে না। মদ ছেড়ে ভারী মুশকিলে পড়ে গেল সে। বনমালী তখন তাকে মোদক ধরায়। বরদা কবিরাজের দোকানে এখন দৈনিক যাতায়াত, কবিরাজও বন্ধু হয়ে গেছে। পয়সার বেশ সাশ্রয়। কেবল সত্যচরণ খুঁতখুঁত করে বলে—মাইরি বরদাবাবু, শুনেছি মৃতসঞ্জীবনীতে নাকি এইট্টি পারসেন্ট অ্যালকোহল আছে।

—আরও কম। বরদা কবিরাজ চেয়ারে কেতরে বসে হাঁটু দুটো তুলে নাড়তে-নাড়তে বলে।

—তোমরা কি আর সেই অ্যালকোহল দাও নাকি! বলে সত্যচরণ হাই তোলে।

—তবে কী দিই?

—কাঁচা ধেনো। একটা বোতল দিও তো, চেখে দেখব।

বনমালী কনুইয়ের গুঁতো দিয়ে বলে—যা নিয়ে আছ তাই নিয়ে থাকো। একটারই বশ হও।

সত্যচরণ রোগে ভুগে খেঁকি হয়ে গেছে, সহজেই খ্যাঁক করে ওঠে। বলে—সেইজন্যই তো তোমার টাকা ছাড়া আর কিছু হল না! তুমি ওই একটি জিনিসের বশ।

—আর কী হবে শুনি! বনমালী দাপটে বলে।

সত্যচরণ তখন কথা খুঁজে পায় না। বিড়বিড় করে।

নেশা জমে এলে বনমালী মিটিমিটি হাসে—টাকা হলে সংসারী মানুষের আর কী হওয়ার থাকে! অ্যাঁ! আমি ভেবে তো পাই না। কী বলেন বরদাবাবু?

বরদার বাপকেলে ব্যাবসা এখন ঝুল। পুরোনো আমলের ঘরভাড়া কম বলে দোকান টিকে আছে। যুদ্ধের বাজারে লাখোপতি হওয়ার জন্য বরদা বিস্তর পাথর কুচির ব্যাবসা করতে গিয়ে ঘোল খায়, নইলে এতদিনে সে দোকান তুলে দিত। এখন দোকানের কলে ইঁদুরের মতো আটকে পড়ে গিয়ে খাবি খায়। মোদকের খদ্দেররাই বাঁচিয়ে রেখেছে সালসাটালসা, সুধা কিংবা পাঁচন চলে না। বরদা কবিরাজ তাই ফলাও মোদক বানায়। খদ্দের প্রায় বাঁধা। বনমালীর কথা শুনে একটু ছটাকে হাসি হেসে বলে—তাই তো। টাকাই হচ্ছে সংসারের সুতো, যেমন ইচ্ছে মালা গাঁথা যায়।

সত্যচরণ সেটা মানতে চায় না। বলে—বনমালী, তোমার সত্য উপলব্ধিই তো হল না। এই যে পৃথিবীতে জন্মেছ, এর ক'টা জায়গা দেখলে তুমি? ক'টা মানুষের সঙ্গে ভাব ভালোবাসা হল? জীবনের একশো মজা আছে তার কটা মজার স্বাদ পেয়েছ? মদ খেলে না, মেয়েমানুষের কাছে গেলে না, কাশী হরিদ্বার বৃন্দাবন কি লন্ডন নিউইয়র্ক গেলে না—ধুস ওটা কি জীবন? তুমি হচ্ছ গিয়ে সাদা দেওয়াল, ছবি ছক্কর নেই, রং নেই, দূর-দূর...সাঁঝের বেলা মোদক চেটে ভাম হয়ে বসে থাকো, এর বেশি তোমার আর কিছু হল না।

ততক্ষণে নেশা জমে আসে। চোখে লাল নীল নানারকম রং দেখে বনমালী। দেখে কলকাতার রাস্তাঘাটে কেমন সব বাহারি রং, কেমন আলো, কেমন মিঠে বাতাস বইছে! এসময়ে তার মনের ওপর একরকম মাখনের প্রলেপ পড়ে যায়। কোনও কথাতেই রাগ হয় না, বরং ভালোবাসতে ইচ্ছে করে। সত্যচরণের কথা শুনে তাই সে মৃদু হাসে। দুলে-দুলে হাসে। তারপর বলে—বিশ্বরূপ দেখতে ত্রিভুবন ঘুরতে হয় না; আমি আমার দোকানে বসেই দেখি।

—আমার ইয়ে। বলে সত্যচরণ। তারপর মৃদু হেসে বলে—আর এক বিশ্বরূপ তোমার পরিবারের রূপে। তোমার মতো মাদি পুরুষ দেখিনি হে! অত ন্যাওটা হয়ো না বনমালী, একটু নিজের সংসারের বাইরের দুনিয়াটাকেও দ্যাখো!

বনমালী ঝিমুনোর মধ্যেই বলে—যারা বাউণ্ডুলে তাদের ঘরে জায়গা হয় না, পরিবার বের করে দেয় বাড়ি থেকে। তখন তাদের অগত্যা বিশ্বরূপ দেখতে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াতে হয়। সত্যচরণ, সাফল্যের মধ্যে যে বিশ্বরূপ আছে তা তোমার দেখার কপাল নেই।

তর্ক হয়, ঝগড়াঝাঁটি হয়। তারপর একটা টানা রিকশায় উঠে দুজনে ফিরে আসে। বনমালী ফিরে ক্যাশ মেলায়। সত্যচরণ হেঁটে বাড়ি ফেরে। যতটুকু বনমালীর রিকশায় আসা যায় ততটুকুই লাভ, তারপরের রাস্তাটুকু তার নিজের।

বনমালী জানে সত্যচরণ তাকে গাল পাড়তে-পাড়তে বিড়বিড় করে বকতে-বকতে বাড়ি ফেরে। তা হোক। বনমালীর রাগ হয় না। সত্যচরণের সঙ্গে তার অবস্থার তফাতটুকুই প্রমাণ করে যে বনমালীর উপলব্ধি সত্য। সত্যচরণেরটা হচ্ছে গিয়ে প্রলাপ। তার রাগ করার দরকার হয় না।

ন'টা সাতের ট্রেনটা রোজ পায় না বনমালী। তার পরের ট্রেন ন'টা পঞ্চান্নোয়। লম্বা সময়। হাওড়া স্টেশনের মুখে বারোমাস কয়েকটা ছোকরা কাটামুন্ডুর মতো ঝুঁটি ধরে কানফুল নাকফুলের মতো ছোট ফুলকপির আঁটি বিক্রি করে। হাতে সময় থাকলে অসময়ের কপি সওদা করে বনমালি, স্টেশনের বাইরের দোকান থেকে মহাজনের মেয়ের জন্য ফল কেনে। মর্তমান কলাটা আবার মহাজনের মেয়ের বড় পছন্দ। ছেলেপুলের জন্য খেজুর কি আমসত্ব লিচু বা আম—সময়ের ফলপাকুড় কেনে। সওদা করেও সময় থাকে। তখন প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে অন্যমনে নানা কথা ভাবে। বেশিরভাগই বাকি বকোয়া, মন্দা বাজার, সোনার দর, আয়কর, জমি ইত্যাদির কথা। কখনও-সখনও সত্যচরণের বিশ্বরূপের কথাও ভেবে ফেলে। সত্যটা পাগল। একটা জীবন ফুক্কুড়ি করে কাটিয়ে দিল।

ট্রেনে পনেরো মিনিট বালী স্টেশন, তারপর মিনিটছয়েকের হাঁটাপথ। বাগানের ফটকে পা দিতেই অন্য জগতে চলে আসে বনমালী। ছবির মতো বাড়িখানা তার, চারদিকের ফুলবাগিচায় ডুবে আছে। নানা ঘরে নানা আলো, দরজায় পাতলা রঙিন লেস-এর পরদা ওড়ে। লাল, সবুজ, নীল, হলুদ সব টিউবলাইট জ্বলে ঘরে-ঘরে। ধূপগন্ধ পাওয়া যায়। রেডিয়োর শব্দ আসে। ভালো রান্নার গন্ধ।

বাগানের ফটক থেকেই বনমালীর দ্বন্দ্বের শুরু হয়। এই বাড়ি কি তার! এই বাগান, ওই আলো, ঘরে-ঘরে সব দামি আসবাব, এ সব কি তার! মনে কিছুতেই বিশ্বাসটা আসে না। ঘেমো শরীর, সারাদিনের পরিশ্রম, চিন্তা সব মিলিয়ে বনমালীর ভিতরটা শুকিয়ে থাকে। ভিতরে-ভিতরে সে জানে পৃথিবীতে খুব সাধারণভাবে বেঁচে থাকাটাও কত কষ্টকর! কী পরিশ্রমটাই গেছে এক জীবনে! তাই বোধহয় এত আলো, মহার্ঘ জিনিসপত্র, বাগান, এসব দেখে তার ভিতরটা কেমন চমকে ওঠে। এখানে রিফিউজি কলোনিতে তাদের পরিবার আলাদা পড়ে আছে। মা-ভাই-বোন। সম্পর্ক না থাকার মধ্যেই। বনমালী মাস-মাস এক-দু-শো ধরে দেয়, ভাইরা খেটে খায়, একটা বোনের বিয়ে বাকি। সে বাড়িতে গিয়ে পা দিলে দুর্ভাগ্যজনক অতীতটা যেন হুড়মুড় করে মাথায় ভেঙে পড়ে। সব মনে পড়ে যায়! সেই দুর্ভাগ্যের দিন তো খুব বেশি দূরে ফেলে আসেনি সে, তাই মনে পড়ে। এইসব বাড়িঘর, আলো, বাগান আবিশ্বাস্য লাগে।

মহাজনের মেয়েকে খুশি করা সহজ কথা নয়। টাকার খেলা সে মেয়ে দেখেছে বিস্তর। তাই বনমালীর অবস্থা ফিরলেও সে এখনও পুরোপুরি খুশি নয়, বাড়িঘর সে-ই সাজায়, ঘরে-ঘরে নানা রঙের আলো জ্বালে, ছেলেমেয়েদের নিত্যনতুন পোশাক পরায়, নিজেও সাজে খুব। তাকে খুশি রাখার জন্যই পরিবারের সঙ্গে আর একত্র হল না বনমালী, বাড়ির লোকেরা তার কুৎসা গায় সেইজন্যে। বলে—মেড়া, কামাখ্যার যোগিনীদের বশ-করা পুরুষমানুষ—আরও কত কী! এত করেও মহাজনের মেয়ের মন পাওয়া গেছে কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। বাড়িতে ফিরে বরাবর তার নিজেকে অতিথি-অতিথি মনে হয়, ভয়ে-ভয়ে অস্বস্তিতে আলগা-আলগা থাকে সে। পরিষ্কার গেঞ্জি পরে, দামি লুঙ্গি, চুল আঁচড়ায়, পায়ে মোষের-নাক চটি, রোজ দাড়ি কামাতে হয়—বিস্তর ঝামেলা। হাঁটুর ওপর লুঙ্গি তুলে, বিড়ি ফুঁকে, বিছানায় গড়ানোর গার্হস্থ্য আয়েস তার কপালে নেই। মহাজনের মেয়ে সব টিপটপ চায়। ছেলেমেয়েদের যে টেনেহিঁচড়ে বুকে নিয়ে হামলে আদর করে চিড়বিড়ে ভালোবাসা মেটাবে তারও উপায় নেই। ছেলেমেয়েরা মায়ের শাসনে আলগা থাকে, গায়ে-গায়ে মাখামাখি বারণ। মাঝে-মাঝে জ্যোৎস্না উঠলে, কি ফুলের গন্ধ ছুটলে, কি অকারণ পুলকে মাঝে-মাঝে ইচ্ছে করে, বউকে বুকে চেপে ধরে লন্ডভন্ড করে দেয় পোশাক, গাল কামড়ে ধরে আলগা দাঁতে, ঝামরে দেয় বাঁধা চুল। কিন্তু তা করতে গিয়ে থমকে যায়।

সেই পুরোনো গণ্ডগোল। বউকে বউ মনে হয় না, মনে হয়—এ তো মহাজনের মেয়ে! ভারী একটা ভয়-ভক্তির ভাব এসে পড়ে তখন।

মোদকটা অনেকক্ষণ ধরে শরীরের ভিতরে খেলা করে। রিমঝিমে একটা আনন্দের ভাব। দেহ নিশপিশ করে। সুন্দর বাগানের ভিতর দিয়ে বারান্দা পর্যন্ত কংক্রিটে বাঁধানো চওড়া রাস্তা পার হতে-হতে সে দেখে, বারান্দায় মহাজনের মেয়ে দাঁড়িয়ে। গায়ে একটা নেট-এর ফুলহাতা ব্লাউজ, বুকে পেটে অনেকখানি খোলা জায়গা। এ ছাঁটের ব্লাউজ বনমালীর দোকানেও রাখা হয় না। মহাজনের মেয়ের পোশাক নিউমার্কেট থেকে আসে। পরনের মিহিন খদ্দরের ছাপা শাড়িটা পর্যন্ত বনমালীর দোকানের নয়।

—বাঃ-বাঃ! বনমালী খুশি হয়ে বলে—দিব্যি কাটটা তো ব্লাউজের! স্টক করব নাকি!

—তোমার তো কেবল স্টকের চিন্তা। একটা জিনিস চোখে পড়েছে যখন, তখন তার সৌন্দর্যটা দ্যাখো, তা না স্টক।

লজ্জা পায় বনমালী। হেঁহেঁ করে হেসে বলে—চোখে লাগল বলেই তো বললাম।

বউ গম্ভীর হয়ে বলে—বাড়িতে এসে যখন দোকানদারি পোশাকটা ছাড়বে, তখন দোকানদারি স্বভাবটাও ছেড়ে ফেলবে। আমার বাবা বাড়িতে মেজাজি জমিদারের মতো থাকতেন।

বনমালী যে একদিন ফিরিওলা ছিল তা বোধহয় অতসী ভুলতে পারে না। দোষ নেই। নিজের অবস্থাকে আজও তো নিজেই সঠিক বিশ্বাস করতে পারে না বনমালী!

স্বপ্ন! সবই স্বপ্ন। মার্বেল মাজা বাথরুমে হাতমুখ ধুয়ে ওডিকোলোন আর দামি পাউডারের গুঁড়ো গায়ে মেখে কিছুক্ষণ বারান্দায় বসে বনমালী। বাগানে জ্যোৎস্না পড়ে, ফুলের গন্ধ আসে। নিজের গা থেকে প্রসাধনের গন্ধ ছড়ায়। পাশেই হেলানো চেয়ারে বসে থাকা অতসীর গয়নার টুং-টুং শোনা যায়। স্বপ্ন ছাড়া আর কী!

টেবিলে বসে রাতের খাবার খায় সে। মোদকের নেশার রেশটা তখনও থাকে। খাবারের স্বাদ ভারী ভালো লাগে। ছেলেমেয়েরা সব ইংরেজি স্কুলে পড়ে। অতসীর কড়া নিয়ম, বাড়িতেও ভাইবোনেরা পারতপক্ষে ইংরেজিতে কথা বলবে। খাওয়ার টেবিলের এধারে-ওধারে ছেলেমেয়েরা পরস্পরের দিকে ইংরেজি কথা ছুড়ে দেয়, লুফে নেয়, বাবার দিকে চেয়ে হাসে। বনমালী ভালো বোঝে না, কিন্তু ভারী একটা সুখ হয়। সেও হাসে। এ যেন কোনও-না-কোনও বড়লোকের সাহেবি কেতার খাওয়ার ঘরে তার মতো উটকো এক লোকের নিমন্ত্রণ, অস্বস্তিটা মোদকটাকে ধাক্কা মারে, নেশাটা ফিকে হয়ে আসে প্রায়। তবু হাসে বনমালী, সুখও হয়।

সত্যচরণ মাঝে-মাঝে দুহাতের বুড়ো আঙুল অশ্লীল ভঙ্গিতে নেড়ে তাকে দেখিয়ে বলে —এত যে করলে হে, কিছুই তোমার নয়। যখন পটল প্লাক করার সময় হবে তখন বুঝবে কী গু-খোরের কাজই করেছ একটা জীবন। নিজেকেই জানলে না বনমালী।

ফক্কড়। সত্যচরণের কথা ভাবতেই তার ওই শব্দটাই কেবল মনে আসে। রাতে ভালো ঘুম হয় না বনমালীর। চারদিক নিশুত হয়ে গেলে সারা বাড়ি জুড়ে কে যেন, কারা যেন কেবলই খুটখাট শব্দ করে। উদ্বেগ। মহাজনের মেয়ে তার ছেলেমেয়েদের নিয়ে এক খাটে ঘুমোয়। বনমালীর ঘর আলাদা, বিছানাও, তবু পাছে মহাজনের মেয়ের ঘুম ভাঙে সেই ভয়ে বনমালী বাতি জ্বালে না। টর্চ জ্বেলে-জ্বেলে সারা বাড়ি ঘুরে বেড়ায়। দরজা-জানলা ঠেলে দেখে, গ্রিলের দরজার তালা নেড়ে দেখে। আবার শোয়, ঝিমুনি আসে। আবার শব্দ পেয়ে ওঠে।

জ্যোৎস্না ফুটেছে খুব। অন্ধকারে ভূতের মতো ঘর থেকে ঘরে ঘুরতে-ঘুরতে বনমালী তার বিষয়-সম্পত্তি দেখতে পায়। দেখে বাগানের জ্যোৎস্না। সুখ তাকে খামচে ধরে। সুখ তাকে যন্ত্রণা দেয়। সত্যচরণ বলে—একটা জীবন পরের ঘরেই বাস করল বনমালী, সেটা টেরই পেল না। ফক্কড়, কে কার ঘরে বাস করে দেখে যা হারামজাদা। চিরকাল মদ-মেয়েমানুষের পিছনে উচ্ছন্নে গেলি! থু!

বেঁটে একটা ডেশান্ড কুকুর আছে অতসীর। কর্মের নয়। কেবল হাত-পা চাটে, আর পায়ে-পায়ে ঘোরে। মাঝে-মাঝে ভুক-ভুক করে নরম আদুরে আওয়াজ ছাড়ে। বনমালীর সঙ্গে প্রায় রাতেই সেটাও ইঁদুরের মতো বেঁটে-বেঁটে পায়ে তুরতুর করে ঘোরে।

ছাদের সিঁড়িঘরের দরজা দেখে পিছু ফিরতেই সে কুকুরটার লেজ মাড়িয়ে দিল। বলল —আঃ হাঃ, ব্যথা পাসনি তো! কুকুরটা আদুরে আওয়াজ ছাড়ে। গ্রিলের গেট-এ একটা শব্দ হয়। কে যেন দরজা নাড়ে।

বনমালী টর্চ জ্বেলে নেমে আসে। কুকুরটা দৌড়ে গিয়ে ভয় পেয়ে ফিরে আসে। পায়ের চারধারে ঘোরে। বনমালী গাল দেয়—ব্যাটা নিষ্কর্মা।

সদরটা খুলে বারান্দায় পা দিতেই ভীষণ চমকে যায় বনমালী। কোলকুঁজো এক মানুষ, গ্রিলের ওধারে ছায়ার মতো দাঁড়িয়ে।

চিলের মতো চিৎকার করে সে—কে?

ছায়াটা ফিসফিস করে বলে—দাদা, আমি গো, আমি হরিপদ।

বনমালী ভারী অবাক হয়,—হরিপদ? এত রাতে তুই কোত্থেকে?

—একবার বাড়ি চলো, মার অবস্থা খুব খারাপ।

—মা? বনমালী যেন কিছুক্ষণ বুঝতে পারে না। বাগবাজারের দোকান কি মাকালতলার বাড়ি জুড়ে তার যে জীবন তাতে মা তো নেই!

—অবস্থা কেমন বললি?

—ভালো নয়। অক্সিজেন দেওয়া হচ্ছে। রাত বোধহয় কাটবে না।

বনমালী চাবি এনে দরজা খোলে। চোরের মতো সাবধানে ঢোকে হরিপদ। এইসব বাড়িঘর দেখে তাদের অভ্যাস নেই, দাদা-বউদি নিপ্পর! বলে—কুকুর সামলাও।

—কামড়াবে না, ঘরে আয়। শব্দ সাড়া করিস না, তোর বউদির আবার পাতলা ঘুম।

অন্ধকারেই মাথা নাড়ে হরিপদ—না, না, সেসব আমরা জানি।

ঘরে এসে দুই ভাই অন্ধকারে মুখোমুখি বসে। বাতি জ্বালে না বনমালী, মহাজনের মেয়ের ঘুম বড় পাতলা।

—কী হয়েছে?

হরিপদ মাথা নীচু করে বলে—কী আর হবে। বুড়ো হয়েছে! বয়সটাই তো রোগ। যেবার বাবা ফেঁপে-ফুলে মরে গেল, সেই থেকে মা আর মা নেই। তুমি তো অতশত খবর রাখো না। মার বড় টান ছিল তোমার ওপর।

ফিসফিস করে বনমালী জিগ্যেস করে—কীরকম টান?

হরিপদ বলে—দেরি কোরো না দাদা, যদি যেতে চাও তো চলো, সাড়ে বারোটায় শেষ ট্রেন। যদি তুমি না যাও, আমাকে ফিরতেই হবে।

বনমালী তবু ওঠে না, একটু চুপ করে থেকে বলে—যাচ্ছি। টানের কথাটা কী যেন বলছিলি!

—মার খুব টান ছিল তোমার ওপর। প্রায়দিনই তালের বড়াটা, নারকোলের নাড়ুটা বানিয়ে কৌটোয় ভরে আমাদের সঙ্গে দিয়ে দিত তোমাকে দেওয়ার জন্য।

—তোরা কখনও দিসনি তো!

—দেব কী! বউদি রাগারাগি করবে হয়তো, আর সেসব কি এখন আর তোমরা খাও! ভালো-ভালো খাবার তোমাদের। আমরা তাই সেসব নিজেরাই লুকিয়ে খেয়ে ফেলতাম।

তবু মা মরে-মরে তৈরি করত। কতদিন তোমাকে দেখতে চেয়েছে! গত তিন-চার মাস একটানা মা তোমাকে দেখেনি। দাদা, ওঠো। বেশি সময় নেই।

—উঠি। বলে একটা শ্বাস ছাড়ে বনমালী।

—উঃ দাদা, কী পেল্লায় বাড়িখানা বানিয়েছ, কী বাগান!

বনমালী ধমক দেয়—আস্তে। তোর বউদি উঠে পড়বে। শব্দ করিস না।

হরিপদ মিইয়ে যায়। ফিসফিস করে বলে—প্রত্যয় হয় না।

—কী?

—এসব যে তোমার!

—আমারও হয় না। বলে বনমালী অন্ধকারেই কাপড় বদলাতে-বদলাতে বলে—হরিপদ—

—উঁ।

—তোর বউদি জেগে যাবে, এইটাই ভয়। নইলে—

—নইলে কী?

বনমালী আবার একটা শ্বাস ছেড়ে বলে—নইলে আমি একটু কাঁদতুম। আমার বড় কাঁদতে ইচ্ছে করছে রে।

লড়াই

পালান আমাদের খেতে কাজ করে।

সে ভালো লোক কি মন্দ লোক তা বোঝা খুব মুশকিল। তবে সে জানে খুব ভালো মাঞ্জা দিতে, মাছের এক নম্বর চার তৈরি করতে, কাঠ-মিস্ত্রির কাজও তার বেশ জানা, আর পারে গভীর ভাঙা গলায় গেঁয়ো গান গাইতে।

পালান গাছের নারকেল চুরি করে বেচে দিয়ে আসে। নিশুতরাতে পুকুরে জাল ফেলে মাছ তুলে নিয়ে যায়, খেতের ফসল চুরি করে। কিন্তু ধরা পড়লেই দোষ স্বীকার করে পায়ে ধরে ক্ষমা চায়। অনেক কাজের কাজী বলে আর তার হাসিটি বড় নির্দোষ আর সরল বলে দাদু তাকে তাড়ায় না।

আমাদের দিশি কুকুরটার নাম ঘেউ। ভারী তেজি কুকুর। মেজকাকা যখন বিয়ে করে কাকিমাকে ঘরে আনলেন—বেশিদিনের কথা নয়—তখন কাকিমার বড়লোক বাপের বাড়ি থেকে যেমন হাজাররকমের দামি জিনিস দিয়েছিল তেমনি আবার দুটো প্রাণীও দিয়েছিল সঙ্গে। এক প্রাণী হল এক যুবতী ঝি, তার নাম অধরা, অন্য প্রাণীটি হল ঘেউ।

ঘেউয়ের রং সাদা, চেহারা বিশাল আর চোখ রক্তবর্ণ। সে আসবার পর থেকে এ বাড়িতে বাইরের লোক আসা প্রায় বন্ধ। ঘেউ ডাকে কম কিন্তু কামড়ায় বেশি। সে আসার পর থেকে এ বাড়িতে অন্য বাড়ির ছেলেরা আসে না, অন্যের কুকুর-গরু আসা বন্ধ। হাঁস-মুরগি পর্যন্ত ভয়ে গা-ঢাকা দিয়েছে।

মেজকাকিমা বড় সুন্দরী। হাঁটু পর্যন্ত এক ঢাল চুল, দুধে-আলতায় গায়ের রং, রূপকথার রাজকন্যের মতো চেহারা। তিনি আস্তে হাঁটেন, কম কথা বলেন, দুটো বড়-বড় চোখে মাঝে-মাঝে অবাক হয়ে চারধার দেখেন। জেঠিমা, মা, বড়কাকিমা যখন উদয়াস্ত সংসারের কাজ করছেন তখন মেজকাকিমা শুয়ে বসে বই পড়ে সময় কাটান। তাঁর ছাড়া

কাপড় অধরা কেচে মেলে দেয়, চুল আঁচড়ে দেয়, আলতা পরিয়ে দেয়। সবাই গোপনে বলে, নতুন বউ কারও বশ মানবে না।

তা হোক, তবু মেজকাকিমাকে আমাদের বড় পছন্দ। তাঁর কাছে জিনিস কেনার পয়সা চাইলেই পাই। শিশুদের তিনি বড় ভালোবাসেন। প্রায়ই মিষ্টি কিনে এনে আমাদের খাওয়ান।

আমার দাদুর অনেক পয়সা। লোকে তাকে বিরাট ধনী বলে জানে। কিন্তু বড়লোকদের মতো চালচলন দাদুর নয়। যেটুকু সময় ওকালতি করেন সেটুকু বাদ দিলে অন্য সময়ে তার হেঁটো ধুতি, খালি গা—আর হাতে হয় দা নয়তো কোদাল কিংবা বেড়া বাঁধবার বাঁখারির গোছা। দাদু কখনও বিশ্রাম করতে ভালোবাসেন না। বলেন, বিশ্রাম এক ধরনের মৃত্যু। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চার ঘণ্টা ঘুমোবে। বাকি সময়টায় কাজ করবে।

পালান আর ঘেউ দাদুর ছায়া হয়ে ঘোরে। বাড়িতে ধোপা বা নাপিত এলে ঘেউ তাদের তাড়া করবেই। তখন দাদু বা পালান তাকে ধমক দিলে তবেই ক্ষান্ত হয়। অন্য কারও ধমককে সে গ্রাহ্য করে না, এমনকী মেজকাকিমা বা অধরার ধমককেও নয়। তাই মেজকাকিমা একদিন রাগ করে অধরাকে বললেন বাপের বাড়িতে থাকতে ঘেউ আমার কত বাধ্য ছিল। এখন বেয়াড়া হয়েছে। অধরা, ওকে এখন থেকে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখবি।

মেজকাকা কাকিমাকে বড় ভয় পেতেন। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কথা বলতে গেলে প্রায়ই চোখে-চোখে তাকাতে পারতেন না। কাকিমা তাঁকে শেকল কেনার কথা বলতে কাকা খুব মজবুত বিলেতি শেকল কিনে এনে দিলেন। ঘেউ বাঁধা পড়ল।

দাদু এসব টেরও পাননি। পরদিন বাগানে গিয়ে গাছপালার পরিচর্যার সময়ে একটু অবাক হয়ে চারপাশ দেখে বললেন, কুকরটা কই রে?

পালান বলে, বাঁধা আছে দেখেছি।

—বাঁধা? কে বাঁধল?

—ওই, খোঁচড় ঝি-টাই বোধহয়।

দাদু ডাকলেন, ঘেউ! কোথায় রে তুই?

মেজকাকার ঘরের পেছনের বারান্দা থেকে এখন ঘেউয়ের করুণ আর্তনাদ আর শিকলের ঠুনঠুন শব্দ ভেসে এল। আর কী ভীষণ যে দাপাদাপি করতে লাগল সে। মেজকাকিমা কঠিন স্বরে ঘেউকে বললেন, বেত খাবে এরপর।

ঘেউ চুপ করল।

দাদু একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন।

আমরা আলায়-বালায় ঘুরি, অতশত খেয়াল করি না। তবু টের পেলাম, বাড়ির হাওয়ায় একটা থমথমে ভূতুড়ে ভাব।

সেবার পুজোর কিছু আগে মেজকাকিমার বাপের বাড়ি থেকে তত্ব এল। সে তত্ব দেখে লোকে তাজ্জব। বিশাল-বিশাল পেতলের পরাতে থরে-বিথরে সাজানো সব জিনিস। খাবারদাবার, কাপড়চোপড়, গয়নাগাঁটি পর্যন্ত। কম করে পনেরোজন লোক বয়ে এনেছে, সঙ্গে আবার বল্লমধারী পাঁচজন পাইক।

সে-তত্ব দেখতে বিস্তর লোক জমা হয়েছিল। ঘেউ বাঁধা আছে বলে লোকে তখন আসতে সাহস পায়।

জীবজন্তু বা পোকামাকড় মারা দাদু খুব অপছন্দ করতেন। এমনকী সাপ পর্যন্ত মারা নিষেধ ছিল। আমাদের বাড়িতে বহুকাল ধরে একজোড়া গোখরো ঘুরে বেড়ায়। বাস্তুসাপ বলে তাদের আমরা খুব একটা ভয় পেতাম না। তারা যেখানে সেখানে বিড়ে পাকিয়ে পড়ে থাকে। কখনও রোদ পোহায়, হাততালি দিলে চলে যায় ধীরেসুস্থে।

এই সাপ দুটোকে ভয় পেতেন কাকিমা। মাঝে-মাঝে রাগারাগি করে বলতেন, সাপকে কোনও বিশ্বাস আছে? এক্ষুনি এদের মেরে ফেলা দরকার।

তাঁর সে-কথায় কেউ কান দেয়নি। এমনকী মেজকাকাও না। সবাই বিশ্বাস করত, সাপ দুটো এ-বাড়ির পরম মঙ্গল করছে।

মেজকাকিমার বাপের বাড়ির তত্ব এসেছিল ঠিক দুপুরবেলায়, পুরুষমানুষ কেউ তখন বাড়িতে নেই। তত্ববাহক লোকদের খাওয়ার ব্যবস্থা করতে বাড়ির মেয়েরা মহা ব্যস্ত।

সেই সময়ে মেজকাকিমা পাইকদের ডেকে বললেন, দুটো গোখরো সাপ আছে এ-বাড়িতে। একটু আগেও উঠোনের পশ্চিম ধারে তুলসীঝাড়ের তলাকার গর্তে ঢুকতে দেখেছি ওদের। ও দুটোকে খুঁজে বের করে মেরে ফেলো।

পাইকরা মহা বাধ্যের লোক। সঙ্গে-সঙ্গে লাঠিসোঁটা আর বল্লম বাগিয়ে উঠে পড়ল।

এক পাইক তুলসিঝাড়ের তলাকার গর্তে শাবল চালিয়ে মুখ বড় করে ফেলল। ভিতর থেকে ফোঁস-ফোঁসানির শব্দ আসছিল। ঠিক সেই সময়ে দৃশ্যটা দেখে বারান্দা থেকে ঘেউ

বুকফাটা চিৎকার করে দাপাদাপি শুরু করল। তার দুই চোখ লাল, মুখ দিয়ে ফেনা গড়াচ্ছে, শিকলটা প্রায় সে ছেঁড়ে আর কি!

মেজকাকিমা একটা লম্বা বেত নিয়ে এসে সপাটে কয়েক ঘা বসালেন ঘেউয়ের পিঠে। ঘেউ সে মার গ্রাহ্য করল না। উলটে শিকল প্রায় ছিঁড়ে মেজকাকিমাকে কামড়াতে গেল।

পুকুরে নেমে পানা পরিস্কার করছিল পালান। ঘেউয়ের চিৎকারে কী যেন বুঝতে পেরে উঠে এসে উঠোনে দাঁড়াল। বিশাল কালো চেহারা তার, কালো কাঁধে তখনও সবুজ কচুরিপানা লেগে আছে।

অবাক হয়ে সে তুলসিঝাড়ের কাছে পাইকদের কাণ্ড দেখে হঠাৎ দু-হাত তুলে ধেয়ে আসতে-আসতে বলল, সর্বনাশ। সর্বনাশ!

মেজকাকিমা তখন রাগে আগুন। পাইকদের চেঁচিয়ে বললেন, এ লোকটা মহা চোর। এটাকে ঠান্ডা করো তো। তারপর ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বের করে দাও বাড়ি থেকে।

পালান একবার ঘুরে তাকাল মেজকাকিমার দিকে। মনে হল, এক রাগী দৈত্য তাকিয়ে আছে সুন্দরী রাজকন্যার দিকে।

পরমুহূর্তেই পালান লকড়ির ঘরে গিয়ে একটা প্রকাণ্ড লাঠি হাতে বেরিয়ে লাফিয়ে উঠোনে নামল।

ততক্ষণে অবশ্য পাইকরা একটা গোখরো সাপকে বল্লমে বিঁধে মেরে ফেলেছে। উঠোনে সাপটাকে শুইয়ে তারা অবাক হয়ে সাপটার বিশাল দৈর্ঘ্য দেখছিল। দুজন পাইক ওদিকে শাবল আর বল্লমের খোঁচায় দ্বিতীয় সাপটাকেও জখম করে ফেলেছে।

এ সময়ে পালানের লাঠি তাদের একজনের কাঁধে পড়তেই লোকটা 'বাপ' বলে উঠোনে গড়িয়ে পড়ে। অন্য পাইকরা মুহূর্তের মধ্যে সজাগ হয়ে যে যার অস্ত্র হাতে নেয়।

তারপরই উঠোন জুড়ে এক বিশাল লড়াই বেধে যায়। একদিকে পালান একা, অন্যদিকে পাঁচজন পাইক সমেত পনেরোজন জোয়ান।

আমাদের মধ্যে সবচেয়ে ভীতু মেয়ে কমললতা গিয়ে হঠাৎ খুব সাহস করে ঘেউয়ের গলার বকলস থেকে শেকলের হুকটা খুলে দিল। ঘেউয়ের সাদা শরীরটা আলোর ঝলকানির মতো উঠোনে ছুটে গেল।

সারা পাড়া জুড়ে বিশাল হাঙ্গামার গোলমাল ছড়িয়ে পড়ল। ভিড়ে ভিড়াক্কার। আমরা ছোটরা সেই ভিড়ের পিছনে পড়ে কিছুই দেখতে পেলাম না। শুধু বিকট গালাগাল আর

চেঁচানি শুনতে পাচ্ছিলাম।

সব লড়াই-ই একসময়ে থামে। এটাও থামল। দেখি, ভিড়ের ভেতর চ্যাংদোলা করে পালানকে ডাক্তারখানায় নিয়ে যাচ্ছে কিছু পাড়ার লোক। তার পেটে বুকে বল্লমের ফুটো, মাথা রক্তের টুপি পরে আছে। ঘেউ মাটিতে পড়ে করুণ আর্তনাদ করছিল। অনেক চেষ্টাতেও সে কোমর আলগা করে দাঁড়াতে পারছিল না।

মানুষ কীভাবে যুদ্ধে জিতবে তার কোনও নিয়ম নেই। অনেক সময়ে মানুষ যুদ্ধে জিতেও হারে, আবার কখনও হেরেও জিতে যায়।

এই ঘটনার দু মাস বাদে দেখা যেত, পালান আবার খেতের কাজে নেমেছে। তবে আগের মতো অতটা দৌড়ঝাঁপ গাছবাওয়া পারে না। ধীরেসুস্থে টুকটুক করে কাজ করে বেড়ায়, দাদুর সঙ্গে ছায়া হয়ে লেগে থাকে।

ঘেউও আগের মতো নেই। তার একটা ঠ্যাং সবসময় উঁচু হয়ে থাকে। তিন ঠ্যাঙে সে নেংচে-নেংচে ঘোরে দাদুর সঙ্গে।

দাদু নির্বিকার। সেই হেঁটো ধুতি, খালি গা আর হাতে সবসময়ে গৃহকর্মের নানা সরঞ্জাম।

মেজকাকিমা তখন ঘোমটা টেনে খুব লজ্জা-বউয়ের মতো নানা কাজকর্ম করে বেড়ায়। জেঠিমা, মা, কাকিমাদের সঙ্গে একসঙ্গেই খায়, গল্প করে, হাসেও।

এখন অধরার বড় কাজ বেড়েছে। সামনে অগ্রহায়ণে পালানের সঙ্গে তার বিয়ে, পালানকে সেই জন্য দাদু একটু জমি দিয়েছেন ঘর বাঁধতে, তাতে অবসর সময়ে ঝুড়ি দিয়ে মাটি ফেলতে হয় অধরাকে। ভিত করে তারপর বাঁশবাঁখারি টিন দিয়ে ঘর উঠবে। বড় খাটুনি। মেজকাকিমা তাকে যখন-তখন ডাকলে সে একটু বিরক্ত হয়ে বলে, বাবা-রে-বাবা, সবসময়ে তোমাদের কাজে মাথা দিলেই চলবে! আমার নিজের বুঝি কাজ নেই?

ক্রিকেট

হরিবোল বুড়ো এসে ওই বসে আছে শিমুল গাছের তলায়। নিষ্পত্র গাছ, তার ছায়া নেই। গাছের কঙ্কালসার হাতগুলি রোদের দিকে বাড়ানো, ঠিক কাঙাল ভিখিরির হাতের মতো। শীতের শেষে যখন বসন্ত আসবে তখন তার হাত ভরে দেবে ফুলে। কে তার হাত ফুলে ভরে দেয় তা বোঝা যায় না। কিন্তু কেউ দেয়।

হরিবোল বুড়ো একা বসে আছে। ভারী অস্বস্তি তার। পাড়ার ছেলেগুলো এইবেলায় ধারে কাছে ডাংগুলি খেলে, সেগুলো আজ বেপাত্তা। কোথা গেল সব সোনার চাঁদ হাড়হাভাতেগুলো? গাছের ছায়া নেই, রোদ মুখে পড়েছে। তা এ রোদ বড় মিঠে, শীতের রোদ তো, কুসুম গরম।

পেয়াদা বগলাচরণ রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল, হাঁক পেড়ে বলে,—কে, হরিবোল খুড়ো নাকি? মাগতে বেরিয়েছ?

—বসে আছি বাবা। কিছু অন্যায় হয়নি তো?

—না, কী আর অন্যায় হবে! তবে বলি, ছোঁড়াগুলো যে হরিবোল বললেই তেড়ে মারতে যাও সেটা ঠিক হচ্ছে না। কবে কোনটাকে জখমে করবে, অমনি থানায় গিয়ে এত্তেলা করবে।

—আজ সারাদিন উপোস আছি বাবা, অত কথা ভিতরে সেঁধোচ্ছে না।

—উপোস আছ! বগলাচরণ দু-পা এগিয়ে কোমরে হাত রেখে বলে—সেটা কীরকম? গতকালই তো অধর ভটচার্যের শ্রাদ্ধে সিধে পেলে।

হরিবোল বুড়ো উদাস হয়ে বলে—ভাই, আমি সারাদিন খাইনি, আজ কেউ হরি বলেনি। তুমি একবার হরিবোল-হরিবোল বলো, তবেই আমার পেট পুরে যাবে, এই ভিক্ষা

চাই।

—বটে! তবে এই বললুম, হরিবোল-হরিবোল।

হাসতে-হাসতে বগলাচরণ বিষয়কর্মে যায়।

উড়োজাহাজের জানালা দিয়ে ইভান ওয়েলচ খুব নিরাসক্তভাবে তাকিয়ে আছে বাইরের দিকে। বোয়িং জেট বিমানটি আকাশ ছিঁড়ে ফেলছে শব্দে-শব্দে। কিন্তু ভিতরে কিছুই টের পাওয়া যায় না। অতি ক্ষীণ একটু থরথরানি, অতি মৃদু একটু গোঙানির আওয়াজ।

একটু আগেই কালো কফি খেয়েছে ইভান, একটু হুইস্কি মিশিয়ে। তবু বড় ক্লান্তি লাগে। টোকিও থেকে সিঙ্গাপুর, দূরপ্রাচ্য, তারপর আবার ভারতের বম্বে শহর ছুঁয়ে মধ্যপ্রাচ্য হয়ে ইউরোপের দিকে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের মস্ত প্রতিনিধি ইভানকে সারা পৃথিবী দৌড়ে বেড়াতে হয়। গোটা এক সপ্তাহেও তার বিশ্রাম নেই। আজ নিউইয়র্ক তো কাল হংকং, দু-দিন বাদে মেলবোর্ন, তারপর বেইরুট কি বার্লিন। বড় ক্লান্ত। বোয়িং-এর গতিকে বড্ড কম বলে মনে হয় ইভানের। কনকর্ড বিমান চালু হলে আরও অনেক বেশি গতিতে উড়ে যাওয়া যাবে। তখন ইভান হয়তো আর একটু সময় পাবে বিশ্রামের। তার বয়স পঞ্চান্নর কাছাকাছি। খুবই শক্ত সমর্থ চেহারা। মাথায় প্রচণ্ড সব চিন্তা। সারা পৃথিবীর যাবতীয় সমস্যা যেন তার মাথার কম্পিউটারে অনবরত ভরে দেওয়া হচ্ছে। পাশে বসা সেক্রেটারিকে ডিকটেশন দিচ্ছিল ইভান। একটু বাদেই মেসেজটা বম্বে থেকে টেলেক্স করতে হবে। জরুরি। তবু ইভান হঠাৎ থেমে গেল। জানলা দিয়ে দেখতে পেল, এক ধূসরতার ভিতরে সূর্যাস্ত ঘটছে। আকাশে খণ্ড মেঘ, নীচে একটা মাঠ। বিমান কিছু নীচু হয়ে যাচ্ছে। এক পলকের জন্য ইভানের মনে হল, বহু নীচে লম্বা কয়েকটা গাছের ফাঁক দিয়ে ছোট্ট আয়নার মতো জল চকচক করে উঠল। অতখানি মাঠ অত সহজে এক চিলতে পলকে পার হয়ে গেল তার বিমান। পশ্চিমের দিকে সূর্য ডুবছিল, কিন্তু বিমানটি যেহেতু পশ্চিমেই যাচ্ছে সেইহেতু সূর্যাস্ত ঘটল না। বরং বিমানের উন্মাদ গতি সূর্যকে কয়েক ইঞ্চি ঊর্ধ্বাকাশে তুলে আনল যেন। ঝকঝকিয়ে উঠল রোদ। ইভানের জীবনে নিশ্চিত সূর্যোদয় বা সূর্যাস্ত কমই ঘটে। জাপানে একবার সূর্যোদয় দেখে সে আবার সিঙ্গাপুরে দ্বিতীয়বার সূর্যোদয় দেখছে একই দিনে। তার ওমেগা হাতঘড়ি সপ্তাহে সাতবার আন্তর্জাতিক সময়সীমা পার হয়।

খুব ক্লান্ত লাগছিল ইভানের। তার জীবনে বড় অতৃপ্তি। সে যেমনটা চেয়েছিল জীবনটা ঠিক তেমনই হয়েছে। কী আশ্চর্য, সে যা চায় তাই মুহূর্তের মধ্যে পেয়ে যায়। মেয়েমানুষ,

টাকা, সম্মান, উচ্চপদ, কিছুই বাকি থাকে না। কে যেন তার জন্য পৃথিবীময় এক ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার খুলে দিয়েছে। তার স্বাস্থ্যও অফুরন্ত। সেই কারণেই কি এত অতৃপ্তি?

ইভান ভাবল, এবার একদিন সে উপোস থেকে দেখবে। আর, সাতদিন মেয়েমানুষকে ছোঁবে না। আর, গ্রামের দিকে গিয়ে অনেকক্ষণ ঘাসের ওপর হেঁটে-হেঁটে পোকামাকড় আর ফড়িং দেখবে। পাখির শিসের নকল করবে।

ইভান একটা শ্বাস ফেলে বলল—দেন ডেথ!

সেক্রেটারি এ কথাটাও ভুল করে টুকে নিয়ে চমকে বলল—ইয়েস মিস্টার ওয়েলচ? হোয়াট অ্যাবাউট ডেথ?

ইভান সেক্রেটারির ভুল বুঝতে পেরে ভীষণ হেসে ফেলল। এত হাসল যে তার চোখে জল এসে গেল। হাসতে-হাসতে কাশি এল। কাশতে-কাশতে রক্তাক্ত হয়ে গেল মুখ। পাঁচ ডলার দামের রুমাল মুখ চেপে সে বেদম হচ্ছিল। হোসটেস ছুটে এল।

ইভান হাত তুলে তাদের নিবৃত্ত করে নাক ঝাড়ল জোরে। সামলে নিয়ে সেক্রেটারিকে বলল—আই জাস্ট থট অ্যালাউড।

ইভান মনশ্চক্ষে একটু আগে দেখা ধূসর মাঠটাকে আবার যেন দেখতে পেল। মাঠটা দেখেই কি হঠাৎ মৃত্যুর কথা মনে এল তার।

সেক্রেটারি ডেথ কথাটা কেটে দিল।

ন'পাড়ার অবস্থা ভালো নয়। ধানভাসি বান এসেছিল এবার। দশ দিন ঠায় জল দাঁড়িয়ে রইল মাঠে আহাম্মকের মতো। ধান পচে গোবর। ছোট্ট জায়গার ছোট্ট মানুষ সব, কে তাদের খবর রাখে।

হাতে মাথায় পোঁটলা পুঁটলি নিয়ে একটা পরিবার উদোম মাঠটা পেরোচ্ছে পিঁপড়ের মতো। গোটা দুই দুরকম বয়সি বউ, ছ'রকম বয়সের ছ'টা ছেলেমেয়ে, তিনটে এক বয়সি বুড়ি, একটা বুড়ো, তিনটে মরদ।

শঙ্খচূড় সাপের খোলস সজনের ডালে লটকে আছে। বানের সময় ওই অত উঁচুতে উঠেছিল সাপটা। একটা ছেলে ঢেলা মারল। পাতলা কাগজের মতো খোলসটা হাওয়ায় উড়ছে ফুরফুর করে। ঢেলাটা লাগল বটে, খোলসটা পড়ল না। ঢেলাটা বুরুশ করে চলে গেল।

এক বউয়ের দশমেসে পেট। সে বলল—আস্তে চলো।

তার বর থেমে একটু মুখ ঘুরিয়ে দেখে নেয়। বলল—বাবুদের রেলগাড়ি কি তোর মতো চাষানির জন্য বসে থাকবে নাকি।

—না থাকল। এখানে পড়ে থাকব কোথাও। তোমরা যাও।

—অত ঢিসকোতে-ঢিসকোতে হাঁটিস না। কদমের আর-একটু জোর কর।

বউটা বলে—পারব না।

—পোঁটলাটা আমার হাতে দে।

—তোমার তো আরও পুঁটলি আছে, নেবে কোথায়। হাত দুটো বই তো নয়।

—পারব।

মরদটার তেমন জোরবল নেই, কাঁকলাশের মতো চেহারা। তবু কোত্থেকে যেন তিন নম্বর আর একটা হাত বের করে পোঁটলাটা নিয়ে নিল। গলাটা চেপে বলল—পেটের বোঝাটা ব ঠিকমতো।

অপরূপ এক বিকেলবেলা চারধারে। কোদালে মেঘের চাপগুলো চুন হলুদ রং মেখে পশ্চিমের আকাশে ছয়লাপ হয়ে আছে। রূপকথার রাঙা আলোয় চারধারে স্বপ্নের মতো জগৎ। শিশুরা এই সৌন্দর্যের মধ্যে চেঁচিয়ে কথা বলে। বড়রা গম্ভীর, চুপ। রোদে পোড়া গাছপালার বন্য গন্ধ আসছে। এ সময়ে একটা বিশাল উড়োজাহাজ ঝুম করে মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল। সবাই হাঁ করে দেখে একটু। কারা যায় ওইসব কলের পাখি করে?

পেটে খিদে মরে গিয়ে একটা গোঁতলানি এল গর্ভবতী বউটির। বুক চেপে সে মাঠের মধ্যে বসে পড়ে। তার পেট থেকে ওয়াক তুলে কেবল জল বেরিয়ে আসে।

এখানে কিছু তালগাছের জড়াজড়ি। তার মাঝখানে ছোট্ট একটু পুকুর। জল শুকিয়ে অনেকখানি কাদাজমি বেরিয়ে আছে দাঁতের মাড়ির মতো। মাঝখানে ছোট্ট একটু জলের চাকতি। বউয়ের বরটা কাদামাটির ওপর দিয়ে পা টিপে-টিপে নামছিল। চারধারে পাখিরা ক্যাচাল করছে। পোকামাকড়ের শব্দ। নিথর জলের কাছে এসে লোকটি ঘটি ডোবানোর আগে স্থির জলে নিজের ভূতুড়ে মুখের ছায়া দেখল। এ মুখ একটা মুখ মাত্র। মানুষের মুখ বলে বোঝা যায় ঠাহর করলে। ঘটিটা ডোবাতেই হিজিবিজি হয়ে শতখান হয়ে গেল মুখখানা। লোকটা বলল—যা শেষ হয়ে যা!

মেলবোর্নের ক্রিকেট মাঠে এখন রাত্রি। অনেকক্ষণ আগে দিনের খেলা শেষ হয়ে গেছে। শূন্য স্টেডিয়াম, অন্ধকার মাঠ, কেউ কোথাও নেই। শুধু একজন তরুণ কোনও

ফাঁকে এসে মাঠে ঢুকেছে। প্যাভিলিয়ানের গেটের কাছে দাঁড়িয়ে সে অস্থির হাতে একটা সিগারেট ধরাল। আকাশে তারা ঝিকমিক করছে। মৃদু বাতাস।

ছেলেটা মাঠের সীমানার ধারে, সামনে পা ছড়িয়ে বসল। তার চোখে জল। জীবনের প্রথম টেস্টম্যাচ খেলতে নেমেছিল সে। প্রথম ইনিংসে শূন্য রানে আউট হয়ে যায়। ড্রেসিংরুমে ফিরে এলে ক্যাপ্টেন পিঠ চাপড়ে বলেছিল—বব, ঘাবড়াবার কিছু নেই। সেকেন্ড ইনিংসে সেঞ্চুরি করবে।

দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নেমেছিল আজ লাঞ্চ-এর পর। তার প্রেমিকা জ্যানেট স্ট্যান্ডে বসে খেলা দেখছে। দেখছে মা বাবা বন্ধুরা। নতুন টেস্ট খেলোয়াড়ের জন্ম দেখছে লক্ষ দর্শক, স্টেডিয়ামে বা টিভি-তে।

তার খেলা দেখে সকলেই বলত—এ হবে দ্বিতীয় ব্র্যাডম্যান।

ছেলেটিরও তাই বিশ্বাস ছিল। জীবনের প্রথম টেস্ট ম্যাচে খেলতে নেমে সে ভেবেছিল, আর পিছু ফিরে তাকানোর কিছু নেই।

দ্বিতীয় ইনিংস সে শুরুও করেছিল ভালো। প্রথম চার ওভারে তিনটে চার আর দুটো এক রান। বেশ ভালো শুরু। আধঘণ্টা সে ক্রিজে চমৎকার অবস্থান করছিল। তারপরই একটা বল এল লেগ স্ট্যাম্পের ওপর। মনে হয়েছিল সহজ বল, সুইপ করলে স্কোয়ার লেগ দিয়ে সীমানা পার হবে। করেওছিল সুইপ। কিন্তু ভূতুড়ে বলটা হঠাৎ পিচ থেকে ওপরে না উঠে মাথা নীচু করে মিডলস্ট্যাম্পের দিকে সরে এল। আর তখন স্ট্যাম্প আড়াল করে রয়েছে তার পা। পায়ে বলটা লাগতেই চারদিকে আনন্দে লাফিয়ে ওঠে বিপক্ষের খেলোয়াড়—হাও! আম্পায়ার বিনা দ্বিধায় আঙুল তোলে। ছেলেটি আম্পায়ারের দিকে তাকায়ওনি। সে জানত আউট হয়ে গেছে সে। যখন প্যাভিলিয়নের দিকে ফিরে আসছিল তখন কেউ হা-হুতাশ করেনি, হাততালিও দেয়নি। শুধু একটা চ্যাংড়া ছেলে একদলা চুইংগাম ছুড়ে মেরেছিল তাকে, সেটা এসে তার বুকে আটকে যায়।

ড্রেসিংরুমে দু-একজন তাকে স্তোক দিয়েছিল। ছেলেটি কিছুই শুনতে পায়নি। ড্রেসিংরুমের দরজায় দাঁড়িয়ে তরুণী জ্যানেট কাঁদছিল। ছেলেটির বাবা একবার ঘরে এসে তার পিঠে হাত রেখে নীরবে বসে থেকে গেল কিছুক্ষণ। গভীর রাতে হোটেল থেকে চুপিচুপি চলে এসেছে ছেলেটি, মেলবোর্নের অন্ধকার ক্রিকেট মাঠে বসে আছে।

আকাশে একটা তারা খসল।

সিগারেট শেষ হয়ে গেল।

এই মাঠে কাল তারা অবশ্যই হেরে যাবে। হাতে মোট দুটো উইকেট আছে, তুলতেই হবে আরও দুশো রান, ছেলেটির ওপর নির্ভর ছিল দলের। সে পারেনি।

ছেলেটা দেখল, অন্ধকার স্টেডিয়ামে লক্ষ-লক্ষ ভূত বসে তাকে দেখছে আর খুব হাসছে। তারা তাদের দীর্ঘ হাত নেড়ে তাকে বাহবা দিচ্ছে।

ছেলেটা মাথা নীচু করে বসে রইল। চোখে জলের ধারা। মনে হল, তার আজকের দুঃখ আর কোনওদিনই ঘুচবে না। এইখানেই তার জীবন শেষ হয়ে গেল।

*

উড়োজাহাজ বম্বেতে নামল। ইভান দেখল, এখনও সমুদ্রের ওপর অন্ধকার আকাশে বুঝি সূর্যের খুব ক্ষীণ একটা রেশ রয়ে গেছে। কিংবা মনের ভুল।

এখানে কয়েকঘণ্টা বিশ্রাম। ইভান প্লেন থেকে নামতে না নামতেই প্রোটোকল শুরু হয়ে যায়। লোকজন ঘিরে ধরে তাকে। অনবরত ক্যামেরার ফ্ল্যাশে চমকাচ্ছে। সিকিউরিটি দু-পাশ থেকে তাকে চেপে ধরে। অনবরত তাকে শেকহ্যান্ড করতে হয়। অনেক লোকের সঙ্গে যান্ত্রিকভাবে পরিচিত হতে থাকে সে।

ভি আই পি লাউঞ্জে সাংবাদিকরা ঘিরে ধরে তাকে। অনর্গল ইজরায়েল, আরব দেশ, মধ্যপ্রাচ্য, দূরপ্রাচ্য, চিন আর ইউরোপ সম্পর্কিত প্রশ্ন করা হতে থাকে তাকে।

ইভান রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রতিনিধি, বিশ্বশান্তির অন্যতম দূত। সব উত্তরই তার জানা আছে। সে যন্ত্রের মতো উত্তর দিতে থাকে। তার দক্ষ সেক্রেটারি পাশেই বশংবদ বসে থেকে অবিরল তাকে নানা পরিসংখ্যান বলে দিতে থাকে।

নানা কথার মধ্যে ইভান কেবল বলে—আমরা শান্তি চাই, আমরা ক্ষুধার নিবৃত্তি চাই, আমরা চাই অভাবমোচন, স্বাধীনতা। আমরা মানুষকে সবরকম অভাব থেকে মুক্তি দিতে বদ্ধপরিকর।

বলতে-বলতে ক্লান্ত ইভান টের পায়, সে কতবার জীবনে এইসব কথা বলছে। আজও বলছে। কিন্তু আজ তার ভিতরটা যেন এক জনশূন্য হলঘরের মতো ফাঁকা। সে যখন মুখে 'শান্তি, শান্তি' বলছে তখন তার ভিতরের হলঘর থেকে প্রতিধ্বনি বলছে—'মৃত্যু, মৃত্যু।'

কেন বলছে? ইভান খুবই অবসাদ বোধ করে। তার কোনও অভাব নেই, ব্যক্তিগত কিছুই আর চাওয়ার নেই, সেই জন্যই কি অবসাদ? ইভান মুখে চমৎকার সব উত্তর দিয়ে

যাচ্ছে আর তখন তার মন তাকে বলছে—বাস্টার্ড, ইউ বাস্টার্ড, ইউ হ্যাভ ডান এনাফ টু মেক হেল। নাউ ডাই। প্লিজ।

ইভান ভাবে, সে এবার একদিন কি দু-দিন উপোস করে থেকে দেখবে ক্ষুধা কাকে বলে। সে সাতদিন মেয়েমানুষের শরীর ছোঁবে না। সে একদিন দূর কোনও দরিদ্র দেশের গ্রামের পথে-পথে হেঁটে বেড়াবে যেমন হাঁটত মিশনারিরা। সেই প্লেন থেকে দেখা ধূসর মাঠটায় সে কোনওদিন যেতে পারবে কি?

শেষবেলায় ওয়াক তুলে সেই যে বমি করছিল বউটি তারপরই তার গর্ভযন্ত্রণা শুরু হয়েছিল।

সূর্য ডুবে গেল নিঝুম হিম নেমে এল চারধারে। এতক্ষণ তারা দীর্ঘ পথ হেঁটেছে রোদে, তাই শীত গায়ে লাগেনি। কিন্তু এখন বউটিকে ঘিরে যখন তারা উদাস মাঠের মাঝখানে বসে আছে, তখন গভীর শীতে সবাই ঠকঠক করে কাঁপে। পেটে প্রকাণ্ড অন্ধকার খিদে, দেহে তুচ্ছ আবরণ। বউটা গর্ভযন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে।

মাঠ পেরিয়ে একটা পাগল লোক এল এ সময়ে। তাদের কাছে এসে বলল—বাবারা, সারাদিন খাওয়া জোটে না আমার। তোমরা একবার হরিবোল-হরিবোল বলো, আমার পেট পুরে যাবে। এই ভিক্ষা চাই।

অবোধ লোকগুলি তার দিকে চেয়ে থাকে কেবল। তারা ভাষা ভুলে গেছে। কথা আসে না মুখে।

শুধু তাদের দলের সবচেয়ে প্রবীণ লোকটি বলে—আমরা বড় কাঙাল। কিছু নাই। হরির নাম নিতে পারি, আর কিছু চেয়ো না।

—তাই বলো বাবা। তারপর চলো, দুনিয়াটা দখল করি।

সবাই হাসল। দুঃখে, শোকে।

*

মেলবোর্নের ছোকরা ক্রিকেট খেলোয়াড়টি ঘাসের ওপর শুয়েছিল। জ্যানেট তাকে আর ভালোবাসবে কি? টেস্ট খেলতে আর কখনও তাকে ডাকা হবে কি? সে নিজেও কি আত্মবিশ্বাস ফিরে পাবে?

শুয়ে থেকে সে টের পায় অন্ধকার স্টেডিয়াম থেকে ভূতেরা নেমে আসছে। তাদের দীর্ঘ কালো শরীর বাতাসে দোল খায়। বাতাসে লতিয়ে লতিয়ে তারা চলে। অন্ধকারে হাজার-হাজার ভূত এসে তাকে ঘিরে দাঁড়াল। তারা তার কানে-কানে বলল—চলো, খেলবে।

চোখের জল মুছে ছেলেটি ওঠে। ভূতেরা তাকে প্যাড পরায়, গ্লাভস পরায়, হাতে ব্যাট ধরিয়ে দেয়। তারপর মহানন্দে হাততালি দেয় তারা।

ছেলেটি পিচের ওপর এসে স্ট্যানস নেয়। অন্ধকারে দেখা যায় আম্পায়ারের বদলে কেবল টুপি আর সাদা কোট দাঁড়িয়ে আছে। একটা ভূত এশিয়ার দিকে হাত বাড়িয়ে একটা নরমুণ্ড ছিঁড়ে আনে, তারপর দৌড়ে এসে বল করার ভঙ্গিতে ছুড়ে দেয় তার দিকে। ছেলেটা চমৎকার একটা কাট মারে, মুণ্ডুটা ছিটকে যায় মহাকাশে। মহারোল ওঠে চারধারে, হর্ষধ্বনি শোনা যায়। আবার আফ্রিকার দিকে হাত বাড়িয়ে একটা নরমুণ্ড ছিঁড়ে নিয়ে আর একজন দৌড়ে আসে।

এই রকমভাবে খেলা চলে আর চলে। এ খেলা আর শেষ হতে চায় না। যেন অনন্তকাল ধরে এই শেষহীন খেলা চলবেই। সে কোনওদিন আউট হবে না।

ছেলেটির আর দুঃখ থাকে না।

অনেক রাতে একটা গোয়ালঘরের মেঝের খড়ের ওপর গর্ভবতী বউটি এক নির্জীব শিশু ছেলেকে প্রসব করছে। জন্মের পর ছেলেরা কাঁদে, এ শিশুটিও কাঁদল। কিন্তু উপোসী মার শুষ্ক গর্ভ থেকে সে সামান্যই জীবনীশক্তি আনতে পেরেছে, তাই তার অতিক্ষীণ কান্নার আওয়াজ তার মাও শুনতে পেল না।

সে মুমূর্ষু কণ্ঠে জিগ্যেস করে—ও দিদি, বেঁচে আছে তো!

বাইরে বিপুল অন্ধকার। পুরুষেরা বাইরে বসে আছে হাঁ করে। আজ তাদের রেলগাড়ি করে শহরে যাওয়া হল না। কবে হবে কে জানে! আর একটা পেট বাড়ল।

অনেকদিন আগে এরকমই মাঠের মধ্যে গোয়ালঘরে, শীত-রাতে কে যেন জন্মেছিলেন, হরিবোল বুড়ো শুনেছে। তিনি কোনও সন্ত পুরুষ, ঈশ্বরের সন্তান।

আকাশে একটা তারা খসল। হরিবোল বুড়ো আস্তে-আস্তে গোয়ালঘর প্রদক্ষিণ করতে থাকে। পায়ের নীচে ঘাস, আশেপাশে গাছগাছালির ডালপালা গায়ে লাগে। হরিবোল বুড়ো গাছগাছালি আর ঘাসদের উদ্দেশ করে বার বার বলে—আহা, লাগল বাবা? ব্যথা পেলে?

ঘুম ভেঙে গেল বাবারা সব। একবার হরিবোল হরিবোল হরিবোল বলো সব, কাঙালের খোকাটার পেট ভরে যাক। খোকাটা একটু কাঁদুক।

খানাতল্লাশ

আসুন ইনস্পেকটর, আসুন!

বলতে কী, একটা জীবন আমি আপনার জন্যই অপেক্ষা করেছি। আপনি আসবেন, খানাতল্লাশিতে লন্ডভন্ড করে দিয়ে যাবেন আমার সযত্নে সাজানো সংসার, আপনি এবং আপনার সেপাইদের বুটের আওয়াজে চমকে উঠবে আমার শিশু ছেলের ঘুম, আমার বউ আর বোন কোণে লুকিয়ে কাঁপবে থরথর করে, আমার বুড়ো মা বাপ ইষ্টনাম জপ করবে, আমার ভাই অকারণ গ্রেফতারের ভয়ে পিছনের দরজা দিয়ে পালাবে। দৃশ্যটা আমি দেখতে চেয়েছিলাম। জানিই তো ইনস্পেক্টর একদিন আসবেনই তাঁর দলবল নিয়ে। বড় উৎকণ্ঠা ছিল, বড় ভয়। এই স্থায়ী ভয় থেকে পরিত্রাণ করতে আজ আপনি এলেন। যতদূর সম্ভব লন্ডভন্ড করে দিয়ে যান আমার সংসার। এরপর আমি নিশ্চিন্ত হতে পারব। সুখীও।

আপনি লম্বা লোক, মাথাটা একটু নীচু করে আসুন। আমরা কেউ লম্বা নই বলে দরজাটা খুব উঁচু করে তৈরি করা হয়নি। জানেনই তো আমরা সব সাধারণ মানুষ, বেঁটেখাটো, আমাদের বড় দরজার দরকার হয় না।

এক মিনিট ইনস্পেকটর, আমার আগফা ক্লিক ক্যামেরায় আপনার একটা ছবি তুলে নিই!

না? নিয়ম নেই? তাহলে থাক। ক্যামেরাটা নিন, নিয়ে দেখুন, এর ভিতরে লুকোনো বোমা পিস্তল বা বিস্ফোরক নেই। ক্যামেরাই। তবে ফিলম আছে কিনা বলতে পারব না। ক্যামেরাটা 'আমার' বলে উল্লেখ করলাম, না? আসলে তা নয়। এটা আমার এক মাসতুতো বোনের। সে খুব বড়লোকের বউ ছিল। কিন্তু স্বামীর সঙ্গে বনিবনা ছিল না। তার স্বামীর আবার অন্য মেয়েছেলে ছিল। বিয়ের পর থেকেই আমার সেই বোন দুঃখী। বড় কান্নাকাটি করত। সেই বোনই একবার নিমন্ত্রণে এ-বাড়িতে এসে ক্যামেরাটা ফেলে

যায় অন্যমনস্কতাবশত। সেই রাতে ফিরে গিয়েই টিক-কুড়ি খেয়ে আত্মহত্যা করে। ক্যামেরাটা কেউ ফেরত নিতে আসেনি, আমরাও দিইনি। রয়ে গেছে। দিশি জিনিস, ভালো করে এর ট্রেডমার্কটা পরীক্ষা করতে পারেন। অন্তত এটা চোরাই আমদানি নয়।

আঃ, কী বিশাল চেহারা আপনার! আপনি যে রাজকর্মচারী তা চেহারা দেখলেই বোঝা যায়। ঠিক এরকমটাই আমি আশা করছিলাম। এরকম না হলে কি ইনস্পেকটরকে মানায়? আপনি যেমন লম্বা, তেমনি বিশাল আপনার কাঁধ, কী অসাধারণ আপনার দুটি দীর্ঘ ও সবল হাত। কী গম্ভীর আপনার পদক্ষেপ! আর কী অদ্ভুত তীব্রতা আপনার চোখে!

হ্যাঁ, ইনস্পেকটর, এটাকেই বলতে পারেন আমাদের বাইরের ঘর। আপনি তো নিশ্চয়ই খবর রাখেন যে এটা আমার নিজের বাড়ি নয়? আজ্ঞে হ্যাঁ। ভাড়া। একশো ত্রিশ টাকা, আর ইলেকট্রিক।

না, না, আপনি ভুল বুঝেছেন। আমরা খুব লম্বা নই বলে দরজাটা উঁচু করে তৈরি করা হয়নি—এ কথার দ্বারা আমি কিন্তু এমন ইঙ্গিত করিনি যে বাড়িটা আমার বা আমাদের তৈরি। তা নয়। এখানে আমরা অর্থে আমরা সবাই। আমরা সবাই আজকাল বেঁটে মানুষ। যেমন আমি, তেমনি এ-বাড়ির মালিক, তেমনি সব বাড়ির সবাই। ঢুকবার বা বেরোবার জন্য খুব বড় দরজার দরকার হয় না আমাদের। আপনার মতো দীর্ঘকায় অতিথিও তো বড় একটা আসে না আমাদের বাড়িতে।

হ্যাঁ, এটাই বাইরের ঘর। তবু বলি, মাত্র দু-খানা ঘর বলে এ-ঘরটাকে আমরা এক্সক্লুসিভ করতে পারিনি। একাধারে ওই যে চৌকি দেখছেন, ওখানে আমার বাবা আর মা শোয়। মেঝেতে আমার বোন। না, ভাই শোওয়ার জায়গা পায় না। সে রাত্রিবেলা এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে থাকে। ভিতরের ঘরটায় আমরা স্বামী স্ত্রী, একটা ছোট্ট ছেলে। তবু এই ঘরটাই আমাদের বাইরের ঘর, কেউ এলে ওই যে সব তুচ্ছ চেয়ার দেখছেন ওগুলোয় বসে, গল্প-টল্প করে। এটাকে ড্রইংরুম বলা কি অপরাধ ইনস্পেকটর?

ফুলদানির মধ্যে কী খুঁজছেন ইনস্পেকটর? ফুলগুলো? হাহা। না, ওসব ফুল আমি রোজ কিনি না। কী করে কিনি বলুন? হ্যাঁ, এখনও টাটকা তাজা ও সৌরভে ভরপুর ওই রজনীগন্ধা দেখে মোটেই ভাববেন না যে আমার রোজ ফুল কেনার পয়সা জোটে। বাড়তি পয়সা আমার মোটেই নেই। চুপিচুপি বলি ইনস্পেকটর, গতকাল আমাদের বিবাহবার্ষিকী গেছে। না না, ওসব বিবাহ বার্ষিকী-টার্ষিকী পালন করা আমাদের হয় না। কাউকে নিমন্ত্রণ করিনি, ফালতু উপহার কিনে পয়সাও নষ্ট করিনি, কেবল মায়াবশে স্মৃতিবিভ্রমে, ভাবপ্রবণতার দরুন একডজন ফুল কিনেছি। হে মহান ইনস্পেকটর, ক্ষমা করুন আমার

এই হৃদয়দৌর্বল্য। না, সত্যিই আমাকে এসব মানায় না। ফুল দিয়ে কী হয়? কিচ্ছু না, কিচ্ছু না। এ ফুল কেবল আমাদের বোকামির প্রতীক।

কিছু পেলেন ফুলদানির ভেতরে? না? আমিও জানতাম, কিছুই পাবেন না। ফুলগুলো ফেলে দিয়েছেন ছুড়ে। জল ঢেলে ফেলেছেন মেঝেয়, শূন্য ফুলদানিটা আছড়ে ফেলার জন্য হাত উদ্যত করেছেন, হে বৃহৎ, আপনাকেই এসব মানায়। চমৎকার। ফেলে দিন, লন্ডভন্ড করুন। আমি দেখি।

ওই কৌটোটা? না ইনস্পেকটর, ওর মধ্যে কালো অন্ধকারে যা লুকোনো আছে তা নয় বুলেট বা বারুদ। ও হচ্ছে আমার মায়ের নামজপের মালা। দোহাই ইনস্পেকটর। বেডকভারটা তুলবেন না। ওর নীচে ছেঁড়া চাদর, তেলচিটে বালিশ।

তুললেন? হায় ঈশ্বর, আমি বরং দেওয়ালের দিকে মুখ ঘুরিয়ে থাকি। কী লজ্জা! ইনস্পেকটর, আপনি কি চাদর তুলে তোশকটাও দেখবেন? হায়। তবে আর লজ্জার কিছুই বাকি থাকবে না। কী করে তবে গোপন করব, ওই প্রায় চল্লিশ বছরের পুরোনো তোশকটাকে? ওর তুলোগুলো চাপ বেঁধে খাপে-খাপে স্তূপ হয়ে আছে, ছেঁড়া টিকিনের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসছে তুলো, ওর সারা দেহে চন্দ্রদেহের মতো খানাখন্দ।

না মহান, আমি কাঁদছি না। তবে আপনি বড় নিষ্ঠুর। কেন দেখলেন ওসব?

ওই বাক্সটা? হাহা। না, ওটা নয় বেঁটে বন্দুক বা লম্বা পিস্তল। হাসির কথা, আমার বাবা একসময়ে বেহালা বাজাতেন। আপনি কি কখনও বেহালার বাক্স দেখেননি? না, আমরা কেউ বেহালা বাজাতে জানি না। ওটা এমনি পড়ে আছে। দেখুন, ভালো করে দেখে নিন।

ফরেন মেড? আজ্ঞে হ্যাঁ, তা বটে। তবে ওটাও সেই পঞ্চাশ বছর আগে ব্রিটিশ আমলে কেনা। তখনকার দিনে ওসব শৌখিন জিনিস বিদেশ থেকেই আসত। আজ্ঞে হ্যাঁ, ওই ক্ষুরটাও। বাবা ওটা দিয়ে দাড়ি কামান। অন্য কোনও কাজে লাগে না, বিশ্বাস করুন। না, এসব চোরাই চালানের নয়, স্মাগলিঙেরও নয়।

কালো টাকা?

হে বৃহৎ, হে প্রকাণ্ড, টেবিলের টানায় রাখা ওই সাঁইত্রিশ টাকা ষাট পয়সার কথা জিগ্যেস করছেন তো? না ধর্মাবতার, ওটা কালো টাকা নয়, বরং ভীষণরকমের সাদা টাকা। এত সাদা যে ওকে রক্তহীন ফ্যাকাসে টাকাও বলা যায়। মাসের আরও ছ'দিন বাকি মহাত্মন, ও টাকার আয়ু আর কতক্ষণ? সেই অন্তিম মুহূর্তের ভয়ে ওরা ফ্যাকাসে হয়ে আছে দেখছেন না?

ঘট? আজ্ঞে হ্যাঁ, ওর মধ্যে আমার স্ত্রী খুচরো পয়সা জমান। ভাঙুন ইনস্পেকটর, ভাঙুন। আমার স্ত্রী কোনওদিন আমাকে তার মাটির ঘট ছুঁতে দেয় না। কিন্তু আপনার সঙ্গে তো চালাকি চলবে না। হে সর্বশক্তিমান, আপনি ঘটটা ভেঙে দেখুন তো কত জমিয়েছে আমার বউ।

না, না, আপনাকে কষ্ট করে ওই দুই-তিন নয়া পয়সার খুচরো গুনতে হবে না। আন্দাজ করছি দু-তিন টাকার বেশি নেই। তা এই দু-তিন টাকার মধ্যে একটা কালো টাকার ছায়া আছে। এটা প্রায় চুরির টাকা। ওটা আপনি বাজেয়াপ্ত করতে পারেন।

এই নিন লোহার আলমারির চাবি। হাহা মশাই, আলমারিটা আমার কি না জিগ্যেস করছেন? না মহান, এই একটিমাত্র সত্যিকারের দামি জিনিস যা আমি বিয়েতে পেয়েছিলাম। এই স্টিলের আলমারি দিতে নারাজ হয়েছিলেন আমার গরিব শ্বশুর, তার ফলে আমার বিয়ে ভেঙে যায় আর কী! হাহা। না, অবশেষে তিনি আলমারি দিতে রাজি হয়েছিলেন, বিয়েটাও হয়েছিল শেষ পর্যন্ত।

এই আমার আর আমার স্ত্রীর ঘর। কী দেখছেন শ্রদ্ধাস্পদ? প্লিজ, প্লিজ, ওই বাঁশের চ্যাঙারিটা দেখবেন না। দোহাই আপনার, আমাদের মতো সামান্য মানুষেরও কিছু গুপ্ত জিনিস থাকে। বিপজ্জনক নয় মহাত্মন, লজ্জাজনক। পায়ে পড়ি, দেখবেন না।

লজ্জা ইনস্পেকটর, কী লজ্জা! ওই বাঁশের চ্যাঙারির মধ্যে থাকে কনট্রাসেপটিভ। শ্রদ্ধাস্পদ, আমি আর আমার স্ত্রী যে উপগত হই—এটা কি লজ্জাজনক নয়? সবাই জানে, তবু কী লজ্জার! কেন দেখলেন ইনস্পেকটর? কেন দেখলেন? লজ্জায় আমি যে চোখ তুলতে পারছি না। ক্ষমা করুন মহাত্মন, আমাদের এই গোপনীয়তাটুকুর জন্য। আপনি তো ঈশ্বরের সমতুল, আমরা মানুষ মাত্র। জানি, আপনি এটুকু ক্ষমা করবেন। গরিবের অপরাধ।

আসছি ইপস্পেকটর, এক মিনিট। না, না আমি স্ত্রীর সঙ্গে কোনও ষড়যন্ত্র করছি না। আমি তাকে বলছি, সে আপনার জন্য একটু চা করুক। করার দরকার নেই? যেমন আপনার আদেশ।

আলমারিতে সোনা পেয়েছেন ইনস্পেকটর? আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনার অনুমান যথার্থ, ওগুলো সোনার গয়নাই বটে। মোট পাঁচ ভরি। হার, দুল, আংটি, বোতাম মিলে মোট পাঁচ ভরি। এ ছাড়া আরও কয়েক ভরি আছে মায়ের বাক্সে, সেসব মায়ের গয়না। আমাদের বাড়িতে মোট প্রায় দশ ভরি সোনার জিনিস আছে। হ্যাঁ ইনস্পেকটর, আমি অপরাধী। জানি মহাত্মন, ভারতবর্ষের শতকরা সত্তর ভাগ লোকেরই ঘরে দশ ভরি সোনা নেই।

আমি সেই দুর্লভ শতকরা ত্রিশজনের একজন, যার ঘরে দশ ভরি—হ্যাঁ, মহাত্মন—দশ ভরি সোনা আছে। বাজেয়াপ্ত করবেন ইনস্পেকটর? না? ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ।

আমার স্ত্রীকে দেখছেন ইনস্পেকটর? দেখুন, দেখুন। ওকে বহুকাল কেউ দেখে না। চেহারা এমনিতেও দেখনসই ছিল না, এখন আরও ভেঙে গেছে। না, বয়স খুব বেশি নয়। তবু ওইরকম। খুব সাদামাটা, রোগাভোগা। রাস্তায় বেরোলে কেউ তেমন লক্ষ করে না। বহুকাল পরে আপনিই এক পরপুরুষ যিনি ওকে লক্ষ করেছেন। ও বড় ভয় পেয়েছে, কাঁপছে। এমনিতে খুব কুঁদুলি, আমার সঙ্গে ভীষণ ঝগড়া করে। কিন্তু আপনার সঙ্গে তো চালাকি নয়। আপনি যে মহান, শক্তিমান, ভয়ঙ্কর। আপনার সামনে আমরা আমাদের অস্তিত্ব কার্পেটের মতো পেতে দিয়েছি ধূলায়।

ইনস্পেকটর, সাবধান! আমার এক বছর বয়সের ছেলের ঘুম ভেঙেছে। ওই প্রচণ্ড হামা দিয়ে আসছে আপনার দিকে। কী সাহস! আপনার ভয়ংকর স্তম্ভের মতো জানু ধরে ওই ও উঠে দাঁড়াল। ইনস্পেকটর, ও যে আপনার কোমরের খাপে ভরা রিভলভারের দিকে হাত বাড়াচ্ছে! ক্ষমা করুন, ইনস্পেকটর, ক্ষমা করুন। এ সাহস ওকে মানায় না। ন্যালা-ভোলা ছেলে। ক্ষমা করুন।

করেছেন? বাঁচা গেল।

না শ্রদ্ধাস্পদ, ওই চিঠির বান্ডিলটা কোনও গুপ্ত কাগজপত্র নয়। তবে গোপনীয় বটে। বাচ্চা হতে আমার স্ত্রী কিছুকাল বাপের বাড়ি গিয়েছিল। তখন লিখেছিল। দেখবেন? হাহা। দেখুন, আপনার কাছে লজ্জা কী? না দাদা, না। চিঠিতে যা লেখা আছে তা হল আবেগের কথা, বিশ্বাসের কথা, কিন্তু সত্যিই কি তাই? যেমন ধরুন এই লাইনটা—তোমাকেই যেন জন্ম-জন্মান্তরে স্বামী পাই—এ কথাটা কি সত্যি হতে পারে? পাগল! আমি তো ভেবেই পাই না, আমার মতো এক সাদামাটা অসফল লোককে আমার স্ত্রী বারবার করে স্বামী হিসেবে চাইবে! এ তো যুক্তিতে আসে না শ্রদ্ধাস্পদ! ও সবই বানানো কথা। বলতে হয় বলে বলা, লিখবার রেওয়াজ আছে বলে লেখা। তবে, আমি মাঝে-মাঝে বের করে পড়ি। বেশ লাগে। মনে হয়, সত্যিই বুঝি!

হ্যাঁ, এই যুবতী মেয়েটাই আমার বোন। না, সুন্দরী নয়। কোত্থেকে সুন্দরী হবে? সুন্দরের ঘরেই সুন্দর জন্মায়। আমরা অতি সাধারণ। তাই ও সুন্দরী নয় বটে। তবে যুবতী। ইচ্ছে হলে আপনি একটু তাকিয়ে থাকুন ওর দিকে। ও ধন্য হোক।

কিছু কি পেলেন শ্রদ্ধাস্পদ? আপনার ভ্রূ কোঁচকানো, মুখশ্রী গম্ভীর এবং চিন্তান্বিত। কিন্তু কী পেলেন মহান? ওই তো ভাঙা ঘটের মাটির চাড়া ছড়িয়ে আছে খুচরো পয়সার

সঙ্গে। ওই পড়ে আছে ফুল, জল আর ফুলদানি। বিছানা ওলটানো বলে, বাক্স আলমারি খোলা বলে আমাদের সব ঢেকে রাখা ছেঁড়া আর ময়লা বেরিয়ে পড়েছে। প্রকট হয়েছে আমাদের তুচ্ছতা। তবু বলুন, কী পেলেন অবশেষে? কোন জিনিস বাজেয়াপ্ত করবেন ইনস্পেকটর?

আমার বুড়ো মা-বাবার ঘোলা চোখের মধ্যে তাকিয়ে কী খুঁজছেন আপনি? কী আছে ওখানে? কী খুঁজছেন আমার স্ত্রী আর বোনের চোখে? ওরা ভীষণ ভয় পেয়ে যাচ্ছে যে? আমার ছেলের চোখেই বা কী আছে শ্রদ্ধাস্পদ? আমার চোখেও? বলুন, ইনস্পেকটর। বলুন!

আপনি ঘন শ্বাস ফেলে আপন মনে বললেন—পেয়েছি। শুনে আমার বুকের ভিতরটা কুয়োর মতো ফাঁকা হয়ে গেল। দোহাই, আমাকে আর রহস্যের মধ্যে রাখবেন না।

পেয়েছেন? ও হরি, ও তো সকলেরই থাকে শ্রদ্ধাস্পদ! আপনি পেয়েছেন আমাদের চোখের মধ্যে লুকিয়ে রাখা স্বপ্ন, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ভালোবাসা ও বিশ্বস্ততা। শ্রদ্ধাস্পদ, আমাদের যে আর কিছুই নেই। এসবই অবশ্য অবান্তর, বাজে জিনিস। এসব তো বাজেয়াপ্ত করার উপযুক্তও নয়।

ইনস্পেকটর, ইনস্পেকটর, হে শ্রদ্ধাস্পদ, সর্বশক্তিমান আমাদের এটুকু কেড়ে নেবেন না। আমাদের আর সব নিয়ে যান, বাজেয়াপ্ত করুন। আমাদের ভিখারির পোশাকে বের করে দিন রাস্তায়। দোহাই, আপনার পায়ে পড়ি, আমাদের ওটুকু বাজেয়াপ্ত করবেন না। ইনস্পেকটর, ইনস্পেকটর...

ভেলা

বিশশো পঁচাত্তর সালের ফেব্রুয়ারি মাসের এক সকালে আচমকা কোকিলের ডাক শোনা গেল।

ধরিত্রী তার দুশো তলার ওপরকার ফ্ল্যাটের ঘরদোর পরিষ্কার করছিল। তার হাতে একটা টর্চের মতো ছোট যন্ত্র। সুইচ টিপলে যন্ত্র থেকে একটা অত্যন্ত ফিকে বেগুনি প্রায় অদৃশ্য রশ্মি বেরিয়ে আসে। সেই রশ্মি চারদিকে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে ফেললেই ঘর পরিষ্কার হয়ে যায়, জীবাণু থাকে না। ঘর জীবাণুমুক্ত করার পর দেওয়ালে একটা সুইচ টিপল ধরিত্রী। কোনও শব্দ হল না, কিন্তু ছাদের গায়ে লাগানো মৌচাকের মতো একটা যন্ত্র জীবন্ত হয়ে উঠল ঠিকই। দুশো তলার ওপরে বদ্ধ ফ্ল্যাটে কোনও ধুলো বালি নেই। তবু ওই যন্ত্রটা তার প্রবল বায়বীয় প্রশ্বাসে ঘরের যাবতীয় সূক্ষ্ম ধুলো ময়লা টেনে নিতে লাগল।

এইসব ঘরের কাজ শেষ করে ধরিত্রী তাদের খাওয়ার ঘরে এল। খাওয়ার ঘরের উত্তরদিকে দুটো দরজা। একটা দরজা ধরিত্রী হাত দিয়ে ছোঁয়ামাত্র সরে গেল দেওয়ালের মধ্যে। ওপাশে অবিরল একটা কনভেয়ার বেল্ট বয়ে যাচ্ছে। খুব ধীর তার গতি। তার ওপর থরে-থরে খাবার সাজানো। যা খুশি তুলে নেওয়া যায়। একরাশ ডিম চলে গেল, এক ঢিবি মাখন, কিছু আপেল—একটার পর একটা। ধরিত্রী খুব বিরক্তির সঙ্গে চেয়ে রইল। অন্তহীন খাবার বয়ে যাচ্ছে, কিন্তু কোনওটাই তার ছুঁতে ইচ্ছে করল না। দরজাটা বন্ধ করে সে দ্বিতীয় দরজাটা খুলল। দরজার ওপাশে অগাধ শূন্যতা, দুশো তলার ওপর থেকে নীচে পর্যন্ত একটা ভারী বাতাস থম ধরে আছে। ধরিত্রী একটু ঝুঁকে চারদিকে তাকাল। জলে যেমন নৌকো ভাসে তেমনি বাতাসে ইতস্তত কিছু ভেলা ভেসে বেড়াচ্ছে। সেই বাতাসী ভেলার একটা খুব কাছ দিয়েই ভেসে যাচ্ছিল, তাতে এক বুড়ো হালের মতো

একটা যন্ত্রের হাতল ধরে বসে আছে। লোকটা একবার ধরিত্রীর দিকে উদাস চোখে তাকাল। ধরিত্রী তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে।

লোকটা হাতলটায় সামান্য চাপ দিতেই ভেলাটা মুখ ঘুরিয়ে ভেসে এল ধরিত্রীর দিকে। ব্যাটারিচালিত ভেলাটায় কোনও শব্দ নেই। নিঃশব্দে স্থির হয়ে হালকা ধাতুর তৈরি সাদা গোল লাইফ বেল্টের মতো দেখতে যানটি দরজার গায়ে লেগে রইল।

বুড়ো লোকটা কথা বলল না, ধরিত্রীর দিকে চেয়ে একটু হাসল মাত্র। খুব নিরাবেগ হাসি।

ধরিত্রী বলল—আমার কিছু ফুল দরকার। আসল ফুল।

লোকটা মাথা নাড়ল। তারপর একটু ভারী গলায় বলল—কোন ঋতুর ফুল?

ধরিত্রী একটু ভ্রূ কুঁচকে বলল—এটা তো বসন্তকাল।

লোকটা মাথা নাড়ল—হ্যাঁ।

—তাহলে বসন্তের ফুল। কিন্তু আসল ফুল, সিন্থেটিক নয়।

লোকটা হাসল। মাথা নাড়ল। বলল—আমি আসল ফুল জানি। আমি তো উনিশশো পঁচাত্তরের লোক।

ধরিত্রী সামান্য কৌতূহলের সঙ্গে বলল—তাই নাকি! তাহলে তো বেশ পুরোনো হয়েছেন।

—হ্যাঁ। লোকটা মাথা নেড়ে বলে—আমার চারবার মৃত্যু হয়েছে। আমার হৃদযন্ত্র, চোখ, ফুসফুস আর লিভার সব ট্রান্সপ্ল্যান্ট করা। মেডিক্যাল বোর্ড থেকে নোটিশ দিয়েছে, আমার ব্রেনটাও এবার ট্রান্সপ্ল্যান্ট করতে হবে। যদি সেটা করতে হয় তবে আমার সব শৈশবস্মৃতি চলে যাবে। আশি নব্বই বছর আগেকার কোনও কিছুই মনে থাকবে না। এমনকী আমার আত্মপরিচয় পর্যন্ত পালটে যাবে। আমি নতুন মানুষ হয়ে যাব।

ধরিত্রী একটু দুঃখিত হল। লোকটা ভাবপ্রবণ, তাই পুরোনো কথা সব ধরে রাখতে চায়। বলল—উপায় কী বলুন।

লোকটা মাথা নাড়ল, বলল—না, উপায় নেই। কিন্তু তখন আর আসল ফুল কাকে বলে তা বুঝতেই পারব না হয়তো। এক ঘণ্টার মধ্যেই ফুল পেয়ে যাবেন।

লোকটা হাতলটা বুকের কাছে ধরে চাপ দিল। ভেলাটা উল্কার মতো ছিটকে বাতাসে মিলিয়ে গেল। ধরিত্রী ঝুঁকে লোকটার গতিপথ লক্ষ করতে গিয়ে টাল সামলাতে পারল

না। দরজায় কোনও চৌকাঠ বা হাতল নেই যে ধরবে। ভারসাম্য হারিয়ে পিছলে দরজার বাইরে শূন্যতায় পড়ে গেল। কিন্তু ভয়ের কিছু ছিল না। এখানে ভারী কৃত্রিম বাতাসে আর কমিয়ে রাখা মাধ্যাকর্ষণে কেউ খুব জোরে পড়ে না। ধরিত্রীও পড়ল না। মাত্র আর ফ্ল্যাট থেকে দুতলা পর্যন্ত নীচে ধীরে-ধীরে পড়ে গিয়েছিল সে। একটা বাতাসী ভেলা ছুটে এসে তাকে কোলে তুলে নিল। এ-ভেলায় একজন যুবক রয়েছে। সে একটু হেসে বলল—কী হয়েছিল?

ধরিত্রী হেসে বলল—হঠাৎ।

যুবকটি মাথা নাড়ল। বুঝেছে।

ভেলাগুলো চমৎকার লাইফ বেল্টের মতো দেখতে হলেও মাঝখানটা ফাঁকা নয়, সেখানে একটা বাটির মতো আধার লাগানো। আর চমৎকার নরম কুশনের তৈরি বসবার জায়গা। ধরিত্রী বসল। ভেলাটা ধীরে-ধীরে তার ফ্ল্যাটের দরজায় তুলে দিল তাকে। আর তখনই ধরিত্রী কোকিলের ডাক শুনতে পেল। একটা দুটো কোকিল ডাকছে। ধরিত্রী আকাশের দিকে তাকাল। সূর্য দেখা যাচ্ছে, আকাশের নীল প্রতিভাত। কিন্তু সবই দেখা যাচ্ছে একটা অতি স্বচ্ছ ফাইবার গ্লাসের ডোম-এর ভিতর দিয়ে। শহরের সিকি মাইল উঁচুতে ফাইবার গ্লাসের ঢাকনিটা রয়েছে। তাই বাইরের আবহাওয়া কিছুতেই বোঝা যায় না। ঝড় বৃষ্টি টের পাওয়া যায় না। অবশ্য তবু চাঁদ সূর্য তারা দেখা যায়। সবই পরিস্রুত হয়ে আসে। কোনও ক্ষতিকারক মহাজাগতিক রশ্মি এখানে প্রবেশ করতে পারে না, কোনও চৌম্বক ঝড় অলক্ষে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে না। সব বড় শহরই ওই ফাইবার গ্লাসের ঢাকনি দিয়ে ঢাকা।

তবু শীত বসন্ত সবই টের পাওয়া যায়। একটা পরোক্ষ আবহনিয়ন্ত্রক যন্ত্র দিয়ে শহরের আবহাওয়া যথাসাধ্য প্রাকৃতিক রাখা হয়। এমনকী বর্ষায় কখনও-কখনও বৃষ্টিপাতও করানো হয়ে থাকে।

কোকিলের ডাক শুনে একটু অন্যমনস্ক হয়েছিল ধরিত্রী। ভেলা থেকে নামতে গিয়েও একটু থমকে রইল সে। একটা কোকিল উড়ে এসে ভেলার ওপর বসেছে। ধরিত্রী হাত বাড়ালেই ছুঁতে পারে। কোকিলটা মুখ তুলে তাকে বধির করে দিয়ে ডাকতে লাগল। ধরিত্রী পাখিটার দিকে চেয়ে হাসে। পলিথিন আর কৃত্রিম পশম দিয়ে তৈরি এই সব পাখির পেটে যন্ত্র, বুকে ব্যাটারি, মুখে খুদে স্পিকার বসানো। রিমোট কন্ট্রোল বা পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের সাহায্যে এইসব পাখিকে ওড়ানো হয়, ডাকানো হয়। কারণ অধিকাংশ পাখির প্রজাতিই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। তবু মানুষকে প্রাকৃতিক স্পর্শ থেকে বঞ্চিত না রাখার জন্যই এইসব ব্যবস্থা। নীচের দিকে তাকালে দেখা যায় চমৎকার রাস্তাঘাটের পাশে গাছের

সারি। পার্কে সবুজ ঘাস। ওখানে যে কিছু আসল গাছ নেই তা নয়। কিন্তু মাধ্যাকর্ষণ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য শহরের যে ভিত তৈরি করতে হয়েছে তাতে গাছ জন্মানো দুষ্কর। তাই শতকরা নব্বই ভাগ গাছই কৃত্রিম। রবার পলিথিন বা ফাইবার গ্লাসের তৈরি। ঘাসও কৃত্রিম। তবু এক যান্ত্রিক কৌশলে ওইসব কৃত্রিম গাছে চমৎকার সব কৃত্রিম মরশুমি ফুল হয়। ফল ফলে। হুবহু আসলের মতো। সেইসব ফুল গন্ধময়, ফল সুস্বাদু। শহরে বসন্তকাল এল।

ভেলা ছেড়ে ধরিত্রী উঠে এল ঘরে। দরজা বন্ধ করে চলে এল শোওয়ার ঘর পার হয়ে তাদের বসবার ঘরে। সেখানে চল্লিশ বছর বয়স্ক বিপুল নামে ব্যক্তিটি বসে আছে। তার মাথায় একটা হেডফোনের মতো যন্ত্র লাগানো, সেটা ডান কানের ওপরে মাথায় আলতোভাবে স্পর্শ করে থাকে। যন্ত্রটার আসল নাম ইনফর্মেশন পিন, সংক্ষেপে ইন পিন। খবরের কাগজ পড়ে বা রেডিও শুনে সময় নষ্ট করার দরকার নেই। চোখ এবং কানকে অন্য কাজে রেখেও নিঃশব্দে এবং বিনা আয়াসে, প্রায় অজান্তে মস্তিষ্কের কোষে সব খবর জমা হয়ে যায়। ইন পিন হচ্ছে ইন্দ্রিয়মুক্তির যন্ত্র। চোখ কানকে মুক্ত রেখেই সব জানা যায়।

ধরিত্রীকে দেখে বিপুল যন্ত্রটা খুলে রাখল।

ধরিত্রী মৃদু গলায় বলল—আমি কিছু আসল ফুল আনতে ভেলা পাঠিয়েছি।

বিপুল কিছু অন্যমনস্ক ছিল, বলল—আসল ফুল! কেন?

—বাঃ, আজ যে পনেরোই ফেব্রুয়ারি। আজ যে আমাদের—

এইটুকু বলল ধরিত্রী, আর বলল না। বিপুল বুঝল। ভ্রূ কুঁচকে একটু চেয়ে রইল ধরিত্রীর দিকে। তার চোখে মুখে সবসময়ে একটা নিস্তব্ধ উত্তেজিত ভাব। বিপুল ক্ষণকাল চুপ করে থেকে বলে—ধরিত্রী ভেলাওলাকে বলোনি তো যে আজ আমাদের বিবাহবার্ষিকী!

ভয়ার্ত ধরিত্রী বলল—না-না। তাই কি বলতে পারি! তারপর ধরিত্রী একটু চুপ করে থেকে বলে—অবশ্য লোকটা আসল ফুল চাই শুনে একটু অবাক হয়েছিল। কিন্তু ভয় নেই, এ লোকটার উনিশশো পঁচাত্তর সালে জন্ম। শরীরে অনেকগুলো ট্রান্সপ্ল্যান্টেশন। এ লোকটা সন্দেহ করলেও ক্ষতিকর কিছু বলে বেড়াবে না। ও তো মানুষের বিয়ে দেখেছে এককালে। ওর মা-বাবারও বিয়ে হয়েছিল। হয়তো ওর নিজেরও।

বিপুল উত্তর দিল না। উঠে জানলার কাছে এল। জানলা প্রায় সবসময়েই খোলা থাকে। একটা দূরবিন তুলে বিপুল নীচেটা দেখতে লাগল। পার্কে কিছু নগ্ন নারী-পুরুষ এখানে সেখানে বসে আছে। কাছেই বাচ্চারা খেলছে। একটি রমণী কেবলমাত্র একজোড়া

স্কেটিং জুতোর মতো জুতো পায়ে চলে যাচ্ছে। ফুটপাথ চলন্ত। রমণীটি তবু সেই চলন্ত ফুটপাথের ওপর দিয়ে আরও জোরে যাচ্ছে। জুতো জোড়া ইলেকট্রনিক শক্তিতে চলে। রমণীটি হাসছে, চিৎকার করে পথচারীদের কী যেন বলছে। কী বলছে তা অবশ্য বিপুল জানে। ও বলছে—শরীর নেবে? শরীর! পার্কের কাছে এক প্রৌঢ় সেই রমণীটিকে ধরে পার্কের মধ্যে নিয়ে গেল। বিপুল দূরবিন রেখে ঘরের মধ্যে সরে এল।

উনিশশো নিরানব্বই সালে এই যৌন-বিপ্লবের শুরু। প্রাচীনপন্থীরা এই মুক্তমিলনে বাধা দিতে চেয়েছিল। প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে চলেছিল লড়াই। বিবাহের সঙ্গে বিবাহহীনতার। তারপর একখানা রাষ্ট্রযন্ত্র বিশশো ঊনপঞ্চাশ সালে বিবাহ নিষিদ্ধ করলেন। পবিত্র যৌন-বিপ্লব স্বীকৃতি পেল ইতিহাসে। শুধু তাই নয়, নরনারীর দীর্ঘকালীন একসঙ্গে বসবাসও কার্যত নিষিদ্ধ। কোনওখানে নর বা নারীর মধ্যে দখলদারি প্রবৃত্তি দেখলে তাকে শাস্তিদানের আওতায় আনারও চেষ্টা চলছে।

বিপুল বলল—আমরা দশ বছর একসঙ্গে আছি, না ধরিত্রী?

—হ্যাঁ।

বিপুল একটা ছোট্ট বোতাম টিপল। বসবার ঘরে আর শোওয়ার ঘরের মাঝখানের অস্বচ্ছ কাচের পাতলা দেওয়ালটা নিঃশব্দে মিলিয়ে গেল মেঝের মধ্যে। ফলে দুই ঘর মিলে একটা বিশাল হলঘরের সৃষ্টি হল। বিপুল পায়চারি করতে লাগল। একবার থেমে বসবার ঘরের দেওয়ালে একটা চৌখুপির মধ্যে বসানো ট্যাপ থেকে এক পাত্র গরম সবুজ চা ভরে নিল পেয়ালায়। খানিকটা খেল, বাকিটা মেঝেয় ফেলে দিল। ধরিত্রী প্রশ্বাস যন্ত্রটা চালু করে দিতেই মেঝের তরলটুকু মিলিয়ে গেল। পায়চারি করতে-করতে বিপুল বলে—তুমি যখন খাওয়ার ঘরে গিয়েছিলে তখন এনকোয়ারি কমিশন থেকে একটা ফোন এসেছিল। ওরা জানতে চাইছে, আমার এই ফ্ল্যাটে একজন মহিলা দশ বছর যাবত বাস করছে কেন? এটা প্রচণ্ড বেআইনি। উপরন্তু ওরা যে পবিত্র যৌন-বিপ্লবের মাধ্যমে যৌনমুক্তি এনেছে সে আদর্শ এর ফলে ব্যাহত হচ্ছে। ওদের নির্দেশ, আমরা যেন অবিলম্বে ভিন্ন হয়ে যাই।

ধরিত্রীর মুখ বিষণ্ণ হয়ে গেল। সে বলল—তুমি ওদের বলোনি তো যে তুমি যৌন-বিপ্লবকে যৌন দাঙ্গা বলে আড়ালে বলে বেড়াও।

বিপুল ভ্রূ কুঁচকে বলে—না। তবে ওরা হয়তো কিছু গন্ধ পেয়েছে। ওরা আরও লক্ষ করেছে যে, তুমি আর আমি সব সময়ে জামা-কাপড় পরে বেরোই। ওরা এটাকেও ভালো চোখে দেখছে না। সম্ভবত ওরা শিগগিরই আসবে আমাদের প্রকৃত সম্পর্ক জানতে।

ধরিত্রী চুপ করে রইল।

জানলায় টোকা পড়তেই দুজনে ভয়ংকর চমকে ওঠে। তাকায়। খোলা জানলার বাইরে সাদা গোল ভেলাটা ভাসছে। এক বোঝা রজনীগন্ধা বুকে করে সেই বুড়ো লোকটা দাঁড়িয়ে হাসছে। ওরা তাকাতেই লোকটা ভেলা থেকে জানলায় পা রেখে ঘরের মধ্যে নেমে এল। ধরিত্রীর হাতে ফুলের গোছা দিয়ে বলল—আসল ফুল।

ধরিত্রী ফুলগুলো বুকে চেপে রইল। তারপর উন্মুখ হয়ে তাকিয়ে থাকল বিপুলের দিকে। বিপুল চিন্তিতভাবে ফুলগুলো দেখছিল।

বুড়ো দুজনের দিকে পর্যায়ক্রমে তাকিয়ে দেখছিল। হঠাৎ একটু হেসে বলল—কোনও বিপদ?

বিপুল মাথা নেড়ে বলল—আমরা দশ বছর একসঙ্গে আছি। তাই এনকোয়ারি কমিশন আসবে।

—খুব খারাপ।

বলে বুড়ো চিন্তিতভাবে মাথা চুলকোলো। তারপর বিপুল আর ধরিত্রীর ঘরদোর ঘুরে ফিরে দেখল একটু। কোনও খাটপালঙ্ক নেই। চেয়ার টেবিল বা আসবাবও নেই বললেই হয়। দেওয়ালের গায়ে-গায়ে কিছু বোতাম ছাড়া কোনও যন্ত্রপাতি দেখা যায় না। অবশ্য বোতাম টিপলেই প্যানেলের ভিতর থেকে সবরকম যন্ত্রপাতি বেরিয়ে আসে। আসবাবপত্রও। বসবার ঘরের এককোণে কিছু কৃত্রিম ফুল সাজিয়ে রাখা। সে ফুল বাসি হয় না, তাতে চিরস্থায়ী গন্ধ। এমনকী সেই ফুলের আশেপাশে খুদে ব্যাটারিচালিত গোটাকয়েক মৌমাছি আর একটা ফরমায়েশি সাদা প্রজাপতি অনবরত ঘুরে বেড়াচ্ছে। এগুলো ফুলের সঙ্গেই পাওয়া যায়। ওইসব কলের কীটপতঙ্গের আয়ু দীর্ঘ। ব্যাটারি ফুরোলে আবার চার্জ করে নেওয়া যায়। বুড়ো এইসব দেখছিল। হঠাৎ বলল—আমি জানি আপনারা স্বামী-স্ত্রী।

বিপুল বলল—চুপ। বোলো না।

ধরিত্রী খুব জোরে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল—বলবেই তো। আমি তোমার স্ত্রী, তুমি আমার স্বামী। দশ বছর আগে আমাদের বিয়ে হয়েছিল। আজ আমাদের বিবাহবার্ষিকী।

বাইরে একটা কোকিল ডাকল। যন্ত্রের কোকিল। বুড়ো দুজনের দিকে তাকাল। তারপর দুজনের মাঝখানের শূন্যতার দিকে চেয়ে বলল—আমার মাথাটা একশো বছরের

পুরোনো। খুব ধোঁয়াটে। তবু বলি দশ বছর আগে বিয়ে বেআইনি ছিল। মন্ত্র নেই, পুরুত নেই, রেজিস্ট্রার নেই, তবে আপনাদের বিয়ে হয়েছিল কীভাবে?

—হয়নি। বিপুল বলে।

—হয়েছিল। ধরিত্রী চেঁচিয়ে বলল—আমরা ফুলের মালাবদল করেছিলাম, আর তুমি কয়েকটা সংস্কৃত মন্ত্র বলেছিলে, যেগুলোর অর্থ আমি বুঝিনি। কিন্তু তবু সেটা বিয়েই।

—ধরিত্রী।

বিতর্ক শুনে বুড়ো মাথা চুলকোয়। বিড়বিড় করে বলে—আমার হৃদযন্ত্র নতুন, ফুসফুস নতুন, কিন্তু মাথাটা পুরোনো। বড্ড ধোঁয়াটে। কিছু বুঝতে পারছি না। তবে এভাবেও বিয়ে হতে পারে। আগে হত।

—এখন হয় না! বিপুল বলল।

ধরিত্রী কথা বলতে পারল না। কিন্তু ফুলগুলি বুকে চেপে চেয়ে রইল। বিপুল তার দিকে চেয়ে বলল—ধরিত্রী, আমাদের কিছুই লুকিয়ে রাখা যাবে না। তার চেয়ে তুমি চলে যাও।

বুড়ো মাথা চুলকোচ্ছিল। বিড়বিড় করে বলল—আরও হয়তো পঁচিশ বছর এরা আমাকে বাঁচিয়ে রাখবে। বারবার শরীরের যন্ত্র বদলে দেবে। আমি সব ভুলে যাব। অন্য মানুষ, ফের অন্য মানুষ হয়ে বেঁচে থাকতে হবে। ভীষণ মুশকিল।

বুড়োর কথা কেউ শুনছিল না। বিপুল চেয়ে আছে ধরিত্রীর দিকে, ধরিত্রী বিপুলের দিকে।

জানলার বাইরে একটা লাল রঙের ভেলা এসে থেমেছে। ভেলার গায়ে লেখা—অনুসন্ধান। ভেলা থেকে চারজন লোক জানলা টপকে ভিতরে এল। এনকোয়ারি কমিশন।

বুড়ো সেই চারজনকে দেখে সরে এল জানলার কাছে। একটু কষ্টে নিজের ছোট সাদা ভেলাটায় চড়ে বসল। তারপর ভেসে যেতে লাগল। মাথাটা বড্ড ধোঁয়াটে। অনেক কালের কথা জমে পাথর হয়ে আছে। শিগগির এই মাথাটা তার থাকবে না। একদম অন্যরকম হয়ে যাবে। বুড়ো ভাবল—আমাকে কোথাও চলে যেতেই হবে। এরা আমাকে কেবলই বাঁচিয়ে রাখবে। যতদিন এদের খুশি। কিন্তু মরাটাও যে ভয়ংকর দরকার তা এরা কবে বুঝবে?

সেই রাতে বুড়ো একটা চমৎকার স্বপ্ন দেখল। তার বাবা রাস্তা সমান করার রোলার চালাত। ঘট-ঘটাং করে প্রচণ্ড শব্দে সেই রোলারটা পুরোনো পৃথিবীর রাস্তাঘাট সমান করত। বুড়ো দেখল, সেই রোলারটায় সে আবার চড়েছে। প্রচণ্ড শব্দে সে রোলারটা চলছে। সামনে শূন্য প্রান্তর, মাঝখানে অফুরান মুক্তির মতো রাস্তা। পিছনে তাড়া করে আসছে বাতাসী ভেলা, রকেট, সন্ধানী আলো, মৃত্যুরশ্মি। বুড়ো ডাকল—বাবা! রোলার চালাতে-চালাতে বাবা একবার পিছু ফিরে চেয়ে বললেন—ভয় নেই! আমরা ওদের ছাড়িয়ে যাব।

বুড়ো একটু হাসল, তারপর নিশ্চিন্তে চোখ বুজল।

চিড়িয়াখানা

—ইঃ বাবা .র। এই শালো মানুষ খায়। গেঁয়ো যুবকটি বলল।

—গতরখানা দেখেছিস? তার প্রৌঢ় কাকার চোখ পটপটাং হয়ে খুলে আছে।

নথ-নাড়া বউটা কথা বলছে না। বাক্যহারা হয়ে গেছে। কুঁচো-কাঁচাদের মধ্যে একটা ছেলে ঘুষি পাকিয়ে লাফাচ্ছে—আয় বাঘ, লড়বি? এক ঘুষিতে মুখ ভেঙে দেব।

খাঁচার শিক-এর ওপাশে ভারী চকিত পায়ে অবিশ্রান্ত পায়চারি করছে বিশাল রাজকীয় বাঘ। বিরক্ত, রাগত, ক্ষুধার্ত এবং খানিকটা বুঝি উদাসীনও। রোজ কত মরণশীল মানুষ দেখতে আসে তাকে।

বাঘ। বাঘ। মানুষের সমাজে সবচেয়ে বেশি নামডাকের জানোয়ার। বাঘের নাম করলেই যেন একটা 'গাঁক' শব্দ শুনতে পায় মানুষ।

গেঁয়ো মানুষের দঙ্গলটা বাঘের খাঁচার সামনে অনেকক্ষণ কাটায়। খুব ভোরে তারা গাঁ ছেড়ে বেরিয়েছে। পাঁচ মাইল হেঁটে এসে গোসাবার লঞ্চ ধরেছে সকালে। ক্যানিং থেকে ট্রেনে বালিগঞ্জে। সেকেন্ড ক্লাস ট্রামে চেপে কালীঘাট। সেখানে এর-ওর কোমর ধরে মানুষের রেলগাড়ি হয়ে সার দিয়ে মন্দিরে ঢুকে পুজো দিয়েছে। কপালে সিঁদুর, হাতে শালপাতার ঠোঙায় প্রসাদ নিয়ে বেরিয়ে এসে খুব জিলিপি আর কচুরি দিয়ে উপোসভঙ্গ করেছে সবাই। তারপর চলো চিড়িয়াখানা।

যুবকটিই দলের পাণ্ডা। সে আরও বারদুই গেছে চিড়িয়াখানায়। তার পিছু-পিছু একত্রিশ নম্বর ট্রাম ধরে দঙ্গলটা এসেছে চিড়িয়াখানার মজা দেখতে। ফের রেলগাড়ি হয়ে সার দিয়ে টিকিট কেটে ঘোরানো গেট-এ ঠেক-ঠোক্কর খেয়ে ঢুকেছে ভিতরে।

গায়ে লম্বা-লম্বা কালো দাগওয়ালা ঘোড়ার মতো জন্তু দেখে মেজবউঠান বলল,—এ বাঘ বুঝি?

—দূর। ও হল জেব্রা।

—সে কীরকম জন্তু গো।

যুবকটি দেখেশুনে বলে—ওই বিলিতি গাধা আর কি।

মেজবউঠান বুঝতে পারে। বিলেতে সব কিছুই আলাদা রকমের তো! বিলিতি আমড়া, বিলিতি বেগুন।

ঈগলের খাঁচার সামনে দলটা দাঁড়ায় বটে সময় নষ্ট করে না।

নথ-নাড়া বউটা বলে—ওঃ, বাজপাখি আবার খাঁচায় রাখবার কী? এ আমরা কত দেখিছি।

যুবকটি একটু দোটানায় পড়ে বলে—এ সেই বাজপাখি নয়।

মেজবউঠান জিগ্যেস করে—বিলিতি নাকি? ওমা, এ যে শেয়ালও রেখেছে দেখছি খাঁচায় পুরে।

কাকি বলে উঠল—মরণ! ও পতু, বেজি দেখছিস কি হাঁ করে দাঁড়িয়ে। পতু নামে বাচ্চা ছেলেটা ছুটে এসে বলল—ও ঠামা, বেজির ইংরেজি কি ম্যাংগোজ? দ্যাখো লেখা আছে। ম্যাংগো তো আম।

যুবকটি সংশোধন করে বলল—ম্যাংগো নয়, মনগুজ।

শজারু বা বনমোরগ দেখে দঙ্গলটা তেমন অবাক হল না। কাকি বলেই ফেলল—এসব কী দেখাতে আনলি, ও কালীপদ?

নথ-নাড়া বউ বলে ওঠে—এসবই নাকি বিলেতের।

—বলছে?

যুবকটি মিইয়ে যায়। চাপা গলায় বলে—গাঁইয়া বলে লোকে টের পাবে। চুপ করো, লোকে তাকাচ্ছে।

পতুর দিদি দশ বছরের ফুলঝুরি হঠাৎ হাতে তালি দিয়ে বলে ওঠে—হরিণ! হরিণ!

চিড়িয়াখানার ফটকের মুখ থেকে প্রত্যেকে এক ঠোঙা করে ভেজানো ছোলা কিনে এনেছে জীবজন্তুকে খাওয়াবে বলে। ফুলঝুরি তার খানিকটা নিয়ে হরিণের চত্বরে ছুড়ে

দিল। হরিণেরা গা করল না।

এমু দেখে সবাই একটু থতমত।

—এ কি পাখি নাকি? মেজবউঠান জিগ্যেস করে।

—পাখিই। যুবকটি বলে।

—উড়তে পারে? পাখনা তো দেখছি না।

যুবকটি বলে—পারে বোধহয়।

—বাবা, অত বড় গতর নিয়ে ওড়া কি চাট্টিখানি কথা? কী পাখি রে?

নথ-নাড়া বউ চিমটি কাটে—বিলিতি। যুবকটি সবাইকে তাড়া দেয়—চলো, চলো, এখনও ঢের দেখার আছে।

চাইনিজ সিলভার ফিসলেট দেখে ফুলঝুরির ছোট বোন বলে ওঠে—ও ঠামা, দ্যাখো, এ পাখিটার পুরুতমশাইয়ের মতো টিকি আছে গো!

লামা, ক্যাসোয়ারি, স্বর্ণমৃগ দেখে-দেখে রিন্টু রং-এর খাঁচার সামনে আসতেই ফুলঝুরির বোন রুপোঝুরি বলে—দিদি, একটা আতপ চাল আতপ চাল গন্ধ পাচ্ছিস?

—ঠিক রে। ফুলঝুরি শ্বাস টেনে বলে।

—আতপ চালের গন্ধ।

সান গ্লাস চোখে এক শহুরে সুন্দরী তার ইংরেজি বলা ছেলে আর পাইপটানা স্বামীর সঙ্গে দাঁড়িয়েছিল। এই কথা শুনে হঠাৎ লিপস্টিক চিরে একটু হাসে।

ফুলঝুরি কাকিমার কানে-কানে বলে—শাড়িটা দেখেছ? সোনারপুরের কমলাদি এরকম একটা কিনেছে না? নথ-নাড়া বউ বলে—যাঃ, সেটা তো চাঁদেরি। এটা জর্জেট।

একটা দেড় হাত লম্বা ঠোঁটওয়ালা পাখি ঘেরা জায়গা থেকে লোভীর মতো মুখ বের করে বারবার হাঁ করছে। সেই হাঁয়ের মধ্যে পতু ছোলা ছুড়ে দিচ্ছিল ভয়ে-ভয়ে। কপাৎ করে পাখিটা ঠোঁট বন্ধ করে। সবক'টা ছোলা ভিতরে যায় না।

একটু বয়সের একটা মেয়ে এতক্ষণ একটাও কথা বলেনি। কালীঘাটে সে একটা রঙিন মোড়া কিনতে চেয়ে বায়না করায় কাকির হাতে থাপ্পড় খেয়েছে। এতক্ষণ অনেকবার আঁচলে চোখ মুছতে হয়েছে তাকে। সামনে অঘ্রাণে তার বিয়ে, এত বড় মেয়েকে সবার সামনে মারা?

এবার সে হঠাৎ বলে ওঠে—এই পতু আমার ছোলার ঠোঙাটা নিলি যে বড়? তোরটা কই?

ফুলঝুরি বলে ওঠে—ও টিয়াদি, এতক্ষণ লুকিয়ে-লুকিয়ে পতু নিজের ঠোঙার ছোলা খাচ্ছিল। আমি দেখেছি।

—কী রাক্ষস বাবা। কাকি বলে ওঠে, পেট নামবে দেখিস।

মেজবউঠান যুবকটিকে বলে—ও ঠাকুরপো, এ-পাখিও কি বিলিতি?

কালীপদ এবার ঠেকে শিখেছে। বলে—না-না। ডিশি। সজনেখালির জলায় কত আসে।

—ওড়ে?

—তা ওড়ে।

—তবে এখান থেকেই বা উড়ে যাচ্চে না কেন? ওপরে তো ঢাকা চাপা কিছু নেই।

কালীপদ ডানদিকে ঘুরে হাঁটতে-হাঁটতে বলে—দেরি হয়ে যাচ্ছে।

গয়াল, সারস, নীলগাই। একে-একে দেখে যেতে থাকে তারা। দুপুরের রোদে তেমন তেজ নেই। শীত আসছে। চিড়িয়াখানায় ঘন সবুজে আস্তরণ পড়েছে। জলের গন্ধ। ছুটিয়াল মানুষজনের মন্থর চলাফেরা।

—দ্যাখো, হরিণের জঙ্গল। রুপোঝুরি বলে। সে বরাবরই অদ্ভুত সব কথা বলে।

পতু আইসক্রিমওলার কাছে খানিক দাঁড়িয়ে রইল।

ডানধারের বিশাল ঘেরা জায়গায় অতিকায় কচ্ছপটা হাঁটছে। এত বড় যে কচ্ছপ বলে বিশ্বাস হয় না।

বাঁ-ধারে জলের কল দেখে সবাই আঁজলা ভরে পেটপুরে জল খেল। কুঁচো-কাঁচারা জল ছোড়াছুড়ি করল খানিক।

—হাতির পিঠে চড়বে নাকি? কালীপদ আস্তে করে জিগ্যেস করে।

নথ-নাড়া বউটা বলে—ও বাবা!

মেজবউঠান শুনতে পেয়ে হেসে বলে—চড় না। কালীপদ ধরে থাকবে'খন।

—মরণ!

ফুলঝুরি পাঁচটা পয়সা আর ছোলা ছুড়ল হাতির দিকে। হাতি ছোলা কুড়িয়ে শুঁড় দিয়ে নিখুঁত খেয়ে নিল, পয়সা তুলে পাশে বসা মাহুতের দিকে ছুড়ে দিল।

ছোটদের আলাদা একটা চিড়িয়াখানা দেখে ঢুকবে-কি-ঢুকবে না ভাবতে-ভাবতে অবশেষে ঢুকে পড়ারই সিদ্ধান্ত হল। কলকাতায় ফের কবে আসা হবে ঠিক তো নেই। মাথাপিছু পঁচিশ পয়সার টিকিট কাটতে হয় এখানে। গন্ডারকে এত কাছ থেকে দেখে সবাই অবাক মানে। পতু বাঁদরটা তো শিকের ভেতরে থেকে হাত বাড়িয়ে ছুঁয়েও দিল একটু। কাকি বলে—এর চামড়াতেই ঢাল হয়?

এটা বেশ সাজানো জায়গা। ছোট একটা খালের মতো আছে। তার ওপর খেলাঘরের সাঁকো। একটা ছোট দুর্গ। চারধারে খুদে-খুদে সব প্রাণীর খাঁচা। হরেক খরগোশ, বাচ্চা হরিণ, মেছো কুমির, মাদা ইঁদুর।

সবচেয়ে অবাক লাগে ইঁদুরের মতো দেখতে হরিণ দেখে। কী ছোট, কী সুন্দর!

আর লজ্জাবতী বানর? না, তার কথা জীবনেও ভুলবে না যে একবার দেখেছে। দেড় বিঘৎ-এর ছোট্ট একটু বানরটা তার একার খাঁচায় হাঁটু আর হাতের মধ্যে মুখ লুকিয়ে বসে আছে। শরীরটা গোল হয়ে আছে। যত তাকে ডাকো, ভ্যাঙাও, ঢিল মারো, সে মুখ তুলবে না। টিয়ার বুকটা দুঃখে ভরে গেল। জীবজন্তুর কত কষ্ট থাকে। সবুজ কচ্ছপ আর বাচ্চা কুমির বাস করছে এক জায়গায়। একটা কচ্ছপ কুমিরের গা বেয়ে উঠে গেল দিব্যি। আড়াল থেকে কথা-বলা ময়না ডাকছে মুহুর্মুহু। সে ডাকে বুক ঝনঝন করে বেজে ওঠে। কী মিষ্টি ডাক!

শীতের স্পর্শ-লাগা বেলা পড়ন্ত হয়ে আসছে। চলো, চলো। আরও কত দেখার বাকি।

—সাপ দেখবে না?

—না বাবা, বড় গা ঘিনঘিন করে।

—সাপ আর দেখবার কী আছে? গাঁয়ে তো কত দেখছি।

—তবে চলো ওই বাঘ দেখি, তারপর লম্বা সাঁকো পেরিয়ে যাব জলের ওধারে।

—কী আছে ওখানে?

—জলের মধ্যে একটা দ্বীপ। তাতে হাজারো পাখি রাত কাটাতে আসে। কলকাতার পাখিদের গ্র্যান্ড হোটেল হল ওই দ্বীপ।

বাতাস কাঁপিয়ে বাঘ ডেকে ওঠে। ওংঘ-অ! ওংঘ-অ!

পতু প্রথমটায় সাপটে ধরেছিল ফুলঝুরিকে। তারপর ছেড়ে দিয়ে হিহি করে হাসতে থাকে।

—যা ভীতু না তুই! ফুলঝুরি বলে।

—বাঘ! বাঘ! বাঘ বলে রুপোঝুরি লাফাতে থাকে।

কালীপদ বলে সুন্দরবনে কত আছে।

—তুমি দেখেছ কখনও? নথ-নাড়া বউ খোঁটা দেয়।

—সুন্দরবনের বাঘ জীবনে একবারই দেখে মানুষ। যখন দেখে তখন আর ফেরে না। বউ মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বলে—দেখে তবে কাজ নেই।

—এবার মাঘ মাসে যাব দেখতে।

—যাওয়াচ্ছি।

অস্থির পায়চারি করছে সিংহ। তার বিশ্রাম নেই, ক্লান্তি নেই। চোখে কিছু হতাশার রাগ। হলদে মুলোর মতো দাঁত বের করে মুখোমুখি বাঘ একবার ডাকল। ত্রিভুবন কেঁপে ওঠে।

এই না হলে বাঘ!

সবুজ জলের ওপর দিয়ে লম্বা সাঁকো পার হয়ে যায় সবাই। জলের ধারে একটা বাঁধানো বসবার জায়গা। বড্ড সুন্দর। জলের মাঝখানে উঁচু মতো ছোট একটা দ্বীপ। গাছগাছালিতে ভরা। তাতে হাজার-হাজার পাখি এসে পড়ছে। স্থির জলে যমজ ছায়া ফেলে ময়ূরপঙ্খীর মতো ভেসে যায় সাদা আর কালো রাজহাঁস।

সন্ধের মুখে খাওয়ার সময়। ভালুকটা গপাগপ ডালভাত খাচ্ছিল তার খাঁচায় বসে। বড় খিদে।

সিংহ দেখবে না? কিংবা সিংঘ্র? সাদা বাঘ?

দেখব, দেখব।

ওমা! এর বাবা বুঝি বাঘ আর মা সিংহী? আর এর বুঝি বাপ সিংহ, আর মা বাঘিনী? বাবা রে, দুজনের তেজ কেমন এক হয়েছে দ্যাখো। খাঁচায় আঙুল ঢুকিয়ে দেখবে নাকি একটু চাটে না কামড়ায়?

—ও পতু, সরে আয় দস্যি ছেলে।

সান গ্লাস পরা সেই সুন্দরী আর তার স্বামী আর ছেলে গাছতলায় বেঞ্চে বসে ফ্লাস্ক থেকে চা ঢেলে খাচ্ছে। ছেলের হাতে একটা কেক। পতু চেয়ে থেকে একটা ঢোক গেলে।

ফুলঝুরি আর টিয়ার জানোয়ার দেখতে আর ভালো লাগছে না। তারা আশপাশের মেয়ে-বউদের শাড়ি আর সাজ দেখে। গা টেপাটেপি করে হাসে।

নথ-নাড়া বউ বলে—আর পারি না। একটু বসলে হয়।

কালীপদ বলে—আজ তো আর গাঁয়ে ফেরা হবে না। সোনারপুরে কমলাদের বাড়িই থাকতে হবে। কিন্তু সে-ও একটু আগে যাওয়া দরকার। এতগুলো লোকের জন্য আয়োজন।

নথ-নাড়া বউ আস্তে-আস্তে বলে—তোমাতে আমাতে একবার আলাদা করে আসব, বুঝলে! কেমন জোড়ায়-জোড়ায় কতজনা ঘুরে বেড়াচ্ছে দ্যাখো তো!

—কাকা, বাদামভাজা কিনবে? পতু বলে।

সবাই সব ভুলে যায় ম্যাকাও পাখির খাঁচার সামনে এসে। পয়সা সার্থক। চোখ সার্থক। কষ্ট সার্থক।

—এত সুন্দর রামধনুর মতো পাখিও ছিল দুনিয়ায়? ও কালীপদ, এ কি রং করা পাখি?

—না, কাকি, এইরকমই হয়।

ম্যাকাও ঝুল খাচ্ছে খাঁচার গায়ে। কর্কশ স্বরে ডাকছে। খাঁচা কেটে বেরিয়ে যাওয়ার কত নিষ্ফল প্রয়াস তাদের।

—আহা, রে, ওদের কেন ছেড়ে দেয় না?

—ছেড়ে দিলে কি দেখতে পেতে?

বেলা গড়িয়ে যায়। রৌদ্রতপ্ত ঘাসে, নিবিড় গাছপালায় বনের গন্ধ ঘনিয়ে ওঠে। তাপ মরে আসে। ঘাসে-ভেজা শরীরে শীত-বাতাস এসে লাগে। ফেরার সময় হল।

মানুষ ফিরে যায়। তারপর কয়েকটা দিন হয়তো কলকাতার বুকে আশ্চর্য বনভূমির কথা মনে পড়ে। কাজের মধ্যে হঠাৎ-হঠাৎ বাঘের ডাক শোনে। রাতের ঘুমে ম্যাকাও পাখির সৌন্দর্য রঙের ফোয়ারা খুলে দেয় চোখে।

শুক্লপক্ষ

রাজা চলেছেন ভিখারির ছদ্মবেশে। ভিখারির চীরবাস পরনে, গায়ে মাখা ভুসোকালি, সর্বাঙ্গে ক্ষতচিহ্ন, একটি চোখ কানা, একটি পা খোঁড়া। তাঁর ছদ্মবেশে কোনও ত্রুটি নেই। হাতে ভিক্ষাপাত্র, শুধু তাঁর চীরবাসের অন্তরালে একটি গোপন কোমরবন্ধে লুক্কায়িত রয়েছে একটি চর্মপেটিকা। তাতে মহামূল্যবান মণিমাণিক্য, স্বর্ণখচিত রাজকীয় পাঞ্জা, এ সম্পদ যে লাভ করবে সে একদিনেই রাজ্যের শ্রেষ্ঠ ধনীদের অন্যতম হয়ে যাবে।

প্রতি মাসের শুক্লপক্ষে রাজা ছদ্মবেশে বহির্গত হন। প্রতি শুক্লপক্ষে রাজ্যের একজন ভাগ্যবান রাজানুগ্রহে ধনিত্ব লাভ করে আর লাভ করে রাজার অজেয় শক্তিধর পাঞ্জা, যার প্রভাবে সে রাজ্যের সর্বত্র মাননীয়, গণনীয় হয়ে ওঠে। তার কর্মের কোনও দোষ ধরা হয় না। তার ক্ষমতা রাজার তুল্যই হয়ে ওঠে প্রায়। সামান্য পার্থক্য মাত্র। সবাই জানে, অপেক্ষা করে, কিন্তু সেই ভাগ্যবানদের পরিচয় কেউ পায় না।

নাগরিক এবং প্রজাকুলে নানা শ্রেণির ব্যক্তি রয়েছেন। পূজনীয় ব্রাহ্মণেরা, শ্রদ্ধেয় ক্ষত্রিয়, মহাভাগ বৈশ্যকুল, নমস্য শূদ্রেরা। রয়েছেন কৃষিজীবী, বণিক, করণিক, শিক্ষাদাতাগণ, সৈনিক, শান্তিরক্ষী, শ্রমজীবী, প্রণম্যা বারবনিতারাও। এঁরা যে-কেউ রাজানুগ্রহ লাভের অধিকারী, যেমন কোনও ভিখারি কাঙাল, তেমনি আবার হয়তো ধনীদেরই কেউ।

শুক্লপক্ষে প্রতি রাত্রে প্রতিটি গৃহের সম্মুখে একটি করে দীপ জ্বলে। মানুষেরা নিত্যকর্ম বা গৃহকর্মের মধ্যেও অন্যমনস্ক থাকে। রাজকীয় পদধ্বনির জন্য সজাগ থাকে তাদের শ্রবণ, প্রাতঃকালে সকলেই দুয়ার উন্মোচন করে সাগ্রহে দেখে, তাদের অলিন্দে সিঁড়িতে বা অন্য কোথাও রাজা তাঁর চর্মপেটিকা উপঢৌকন রেখে গেছেন কি না। শুক্লপক্ষে প্রত্যেকেই রাজার চিন্তা করে। রাজার জন্য অপেক্ষা করে।

*

শুক্লপক্ষ শুরু হয়েছে।

নগরের একপ্রান্তে একটি ক্ষুদ্র বিপণি, নানা জাতীয় খাদ্যশস্য, মশলা বিক্রি করে বিক্রেতা। লোকটি অসাধু, ওজন চুরি করে, মূল্য বেশি নেয়, কটু কণ্ঠে দরাদরি করে।

কিন্তু শুক্লপক্ষে তার অন্য চেহারা। সে জানে, রাজা হয়তো এই পথ দিয়ে যাবেন। তিনি বিনীত, ভদ্র, সাধু ও নিরপেক্ষ ব্যক্তিকেই পছন্দ করেন। রাজা পছন্দ করেন শুভ্র পরিধেয়, পরিচ্ছন্ন, পরিবেশ, সংযত আচরণ। পছন্দ করেন আত্মমর্যাদাসম্পন্ন, বংশগৌরবে গরীয়ান, বর্ণভিত্তিক বৃত্তি-আশ্রয়ী প্রজাকে। লোকটি তাই শুক্লপক্ষে ভিন্ন মানুষ হয়ে যায়।

প্রতিপদের সন্ধ্যায় এক আগন্তুক বিপণিতে প্রবেশ করল। লোকটি সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ায়। বহুবছর ধরে সে রাজার অপেক্ষা করছে। এই কি রাজা? রাজাকে সে দেখেনি। রাজা কোন বেশে আসবে তাও সে জানে না। তাই উগ্র সম্ভ্রমের সঙ্গে সে বলল,—আদেশ করুন ভদ্র, আপনার সন্তোষ ছাড়া আমার উদ্বৃত্ত কিছুই থাকবে না।

আগন্তুকের চেহারাটি রাজকীয় বটে। শালপ্রাংশু মহাভুজ, বৃষস্কন্ধ, তীক্ষ্ণ নাসা এবং তীব্র চোখ। ঈগল পক্ষীর একটা আভাস তার সর্বাঙ্গে। পরিধানে সূক্ষ্ম পশমি বস্ত্র, হাতে বলয় ও মূল্যবান অঙ্গুরীয়।

আগন্তুক ব্যবসায়ীর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন—আমার কিছু শুষ্ক দ্রাক্ষা ও যবচূর্ণ প্রয়োজন।

বিক্রেতাটি দ্রব্য ওজন করে বিনীতভাবে পেটিকায় পূর্ণ করে দিল।

আগন্তুক দ্রব্যের পরিমাণ দেখে সবিস্ময়ে বললেন—কী আশ্চর্য! গতকাল আমার ভৃত্য এই বিপণি থেকে সমমূল্যের একই দ্রব্য নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তা পরিমাণে এর দুই-তৃতীয়াংশ হবে। আমি বিদেশি পর্যটক, এ-দেশের মূল্যমান জানি না।

বিক্রেতাটি নানাবিধ বিনয়ের শব্দ করে বলল—ভৃত্যরা সবসময়ে বিশ্বাসভাজন হয় না।

আগন্তুক চিন্তান্বিত মুখে বললেন—আমার ভৃত্*্যটি পুরাতন, এবং এতকাল বিশ্বাসভাজনই ছিল। এখন তার মতিভ্রম হয়ে থাকতে পারে।

এই বলে তিনি ব্যবসায়ীকে সাধুবাদ দিয়ে প্রস্থান করলেন। দ্রব্যপূর্ণ পেটিকাটি বহন করতে তাঁর কষ্ট হচ্ছিল। ভৃত্যটি অসুস্থ হয়ে পড়ে আছে, সুতরাং তাঁকে নিজে আসতে হয়েছে। বহনকার্যে তাঁর পটুত্ব কম।

রাস্তায় পদাপর্ণ করেই তাঁর কিছু স্মৃতিভ্রম হয়ে থাকবে। সম্মুখে অনেকগুলি পথ পরস্পরকে ভেদ করে গেছে। তিনি দিক নির্ণয় করতে পারছিলেন না। জনৈক পথিককে সবিনয়ে প্রশ্ন করলেন—আমি নগরের উত্তর ভাগে যাব, আমাকে সহজ পথটি দেখিয়ে দিন।

পথিক সবিস্ময়ে তাঁর মুখ নিরীক্ষণ করে সবিনয়ে বলল—ভদ্র, আপনার বোঝাটি আমার হাতে দিন। চলুন, আপনাকে পৌঁছে দিচ্ছি।

সঙ্গে-সঙ্গে অপরাপর কয়েকজন পথিক সাগ্রহে এগিয়ে এসেছিল। সকলেই আগন্তুককে অযাচিত সাহায্য করতে উন্মুখ। তাঁদের পরোপকারস্পৃহা দেখে আগন্তুক বিস্মিত হলেন। গত রাত্রিতে তিনি সদ্য এ-নগরে পদার্পণ করেছেন। এখনও সম্যক পরিচয় পাননি। যেটুকু পেলেন তাতে বিমুগ্ধ হলেন। অচেনা পথিক যদি আত্মীয়েরও অধিক যত্নে অন্যের ভার বহন করে, যদি পথ প্রদর্শন করে দেয় তবে এ-নগরী অবশ্যই স্বর্গতুল্য।

সুঠাম রাজপথগুলি সম্পূর্ণ কলঙ্কমুক্ত। কোথাও কোনও আবর্জনা চোখে পড়ে না। তৈলসিক্তবৎ রাজপথের পাশেই হরিৎ তৃণক্ষেত্র, ছায়াময় বনস্পতির সারিবদ্ধ সৌন্দর্য। সূর্যোদয়ের বহুপূর্বেই পথমার্জনাকারীরা তাদের কর্মে তৎপর হয়েছে। রাজপথে প্রথমে সম্মার্জনীতে ধূলিমুক্ত করে তৎপরে চন্দনচূর্ণমিশ্রিত জলে নিষিক্ত হচ্ছে। কর্মীরা গান গাইছেন। তাঁদের মন হর্ষোৎফুল্ল। হয়তো রাজা এই পথে, এই সময়ে যাবেন।

এক বাতুল ভাগ্যান্বেষী কর্মসন্ধানে এসে আশ্রয়লাভে নিশ্চেষ্ট হয়ে বৃক্ষতলে নিদ্রিত। অন্য সময় হলে তার ভাগ্যে সম্মার্জনীর আঘাত লাভ হতে পারত, কারণ এ-রাজ্যে পথবাস নিষিদ্ধ। কিন্তু আজ একজন পুরকর্মী তাকে দেখতে পেয়ে কাছে গিয়ে অবনত হয়ে বিনয়বচনে বললেন—মহদাশয়, এ বৃক্ষচ্ছায়া আপনার নিরাপত্তার পক্ষে প্রশস্ত নয়। ভদ্র, এই দীনের কুটীরে চলুন। আমার স্ত্রী আপনাকে পাদ্যার্ঘ্য দিয়ে বরণ করবেন। আমরা অতিথি ও দেবতায় পার্থক্য করি না।

এই বলে পুরকর্মী পথিকের মুখশ্রীর দিকে অপলক চেয়ে রইলেন। তাঁর হৃদয়ে অমরাবতীর ঘণ্টা বাজতে লাগল। রাজা! এই কী রাজা!

পথিক এই আতিথেয়তায় মূক হয়ে আবেগে অশ্রু বিসর্জন করে বললেন—এই ভাগ্যহীনের জীবনে এমন সমাদর আর ঘটেনি। আপনার মঙ্গল হোক।

সেদিন ভাগ্যান্বেষীর ভাগ্যে পূর্ণ আহার জুটল। তিনি বিশ্রামের জন্য শয্যা পেলেন। সে রাত্রে তাঁর দেহে পক্ষীকুলের পুরীষ বর্ষিত হল না। শুক্লপক্ষের তৃতীয়া তিথিতে নগরের

দক্ষিণভাগে এক গৃহস্থের ঘরে এক শিক্ষানবিশ চোর সিঁধ কাটছিল। অন্য সময় হলে সে অবশ্যই কৃতার্থ হত। কিন্তু এই শুক্লপক্ষে গৃহস্থরা রাজার অপেক্ষায় উৎকর্ণ থাকে। তাদের নিদ্রা অত্যন্ত ভঙ্গুর, মায়ামৃগের মতো তা ক্ষণে-ক্ষণে পালায়।

গৃহস্থ উঠলেন। চোরটি তখন সদ্য গৃহে প্রবেশ করেছে। গৃহস্থের একেবারে সম্মুখে পড়ে গেল। ভয়ে সে তটস্থ। গৃহস্থেরও সেই অবস্থা। করজোড়ে বললেন—আপনার যাঞ্চা কী?

চোর সভয়ে বলিল—আমি পরস্বাপহারক। আমাকে দয়া করে লঘু শাস্তির বিধান করুন। আমি অপরাধ স্বীকার করছি এবং আত্মসমর্পণ করছি।

গৃহস্থ মৃদু হাসলেন। রাজা কোন বেশে আসবেন তা তো কেউ জানে না। চতুর রাজা কত পরীক্ষা করেন মানুষকে, কতভাবে কাছে আসেন। তিনি স্নিগ্ধ বচনে বললেন—ঈশ্বরের করুণায় আমার তৈজসপত্র ও সম্পদ আপনার তুলনায় বেশি। আপনার সঙ্গে ঐশ্বর্য ভাগ করে নিয়ে সমবন্টন ও সমভোগের আনন্দ লাভ করতে দিন। কোনও মানুষই তার বৃত্তির জন্য পতিত হয় না, যদি সে অভাবগ্রস্ত ও নিরুপায় হয়। আপনি আশ্বস্ত হোন, আমি চৌরোদ্ধরণিক ও শান্তিরক্ষীর হাতে আপনাকে সমর্পণ করব না। বরং এতকাল যে আমি আমার পরিবেশ সম্পর্কে উদাসীনতাবশত আমার সম্পদ একা ভোগ করেছি সেজন্য আমি লজ্জিত। আপনার অবস্থার জন্য আমিই দায়ী।

এই বলে গৃহস্থ চোরকে আলিঙ্গন করলেন। সদ্য নিদ্রোত্থিত তাঁর স্ত্রী-পুত্র কন্যারা এই স্বর্গীয় দৃশ্য দেখে স্ত্রীলোকেরা উলুধ্বনি ও পুরুষরা করতালি দিল।

স্ত্রৈণ ও কাপুরুষ ব্যক্তিকে রাজা পছন্দ করেন না। তা বলে রাজ্যে স্ত্রৈণ ও কাপুরুষ ব্যক্তির অভাব নেই। প্রায় সকলেই তাই।

রাজার রাজস্ব বিভাগের কর্মী এক দুর্বলচিত্ত লোকের মুখরা স্ত্রী ছিল। শুক্লপক্ষের প্রতিপদ থেকেই স্ত্রীর কণ্ঠস্বর নিম্নমুখী হয়েছে। গৃহে শান্তি বিরাজমান। হতক্লান্ত লোকটি দিনশেষে, কর্মাবসানে গৃহে প্রত্যাবর্তনের চিন্তায় বিভীষিকা দেখত।

এখন সে অনায়াসে, অকুতোভয় গৃহে প্রত্যাগমন করে।

রাজা মুখরা স্ত্রীলোক পছন্দ করেন না। রাজা পছন্দ করেন পতিভক্তিপরায়ণা, গৃহস্থলক্ষ্মী।

লোকটি গৃহে প্রত্যাগমন করলে অপরাপর দিনের মতো দজ্জাল স্ত্রী অভাব অভিযোগের কথা তোলে না। বরং গৃহ-মার্জনা করে, সাংসারিক কর্তব্যগুলি সমাধান করে, সূর্যাস্তকালে স্নানান্তে দক্ষিণের দ্বারদেশে বসে সযত্নে দেহের পরিচর্যা করে, যাতে স্বামী দেখে খুশি হন। গুণ্ঠনে লজ্জাবতী হয়ে কপাটের আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকেন উৎসুক নেত্রে। বধূটি জানে, এখন শুক্লপক্ষ। রাজার চোখ ঘুরে বেড়াচ্ছে সর্বত্র।

লোকটিও জানে। অপরাপর দিন গৃহে প্রত্যাগমনের পরই লোকটি কূপ থেকে জল উত্তোলন করে, শিশুকে কোলে করে থামায়, স্ত্রীর অপারগতাহেতু পড়ে থাকা গৃহকর্ম করে দেয়, এমনকী স্ত্রীর ললাট-বেদনার উপশম কল্পে সেবা করে।

লোকটি চতুর্থী তিথিতে ঘরে ফিরে এল। স্ত্রী জল উত্তোলন করে রেখেছেন, সে হস্তাপদ প্রক্ষালন করল। তার চলায় ফেরায় পুরুষোচিত্ত গাম্ভীর্য ও উপেক্ষা। গৃহকর্মের কিছু শিথিলতা প্রত্যক্ষ করে স্ত্রীকে সংক্ষিপ্ত উপদেশ দিল। স্ত্রী স্বামীর সম্মুখে আসন পরিগ্রহ করলেন না। দণ্ডায়মান থেকে সমস্ত বিনীত বদনে শুনলেন, এবং অপরাধ স্বীকার করলেন।

স্বামীর লঘু আহার্যের ব্যবস্থা করে স্ত্রী তাঁর বিশ্রামের ব্যাঘাত যাতে না হয় সেইজন্য পুত্রকন্যাদের গৃহান্তরে নিয়ে গেলেন। অপরাপর দিন তিনি যেমন পুত্র-কন্যাদের কাছে তাদের পিতার চরিত্রের নানাবিধ দুর্বলতার কথা বলেন, আজ তা মোটেই করলেন না। বরং বলতে লাগলেন—তোমাদের পিতা এক মহৎ পুরুষ। তাঁর চরিত্রের দীনভাব, অক্রোধী স্বভাব, সেবাপরায়ণতা ও ত্যাগ দৃষ্টান্তস্বরূপ। তিনি সহনশীলতায় পর্বততুল্য। তোমরা তোমাদের জীবনে তাঁর অনুসরণ করো। তিনি আমার দেবতা, তোমাদেরও তিনি ধ্যেয় হোন।

এইসব কথা তিনি আবেগের সঙ্গে বললেন। বলতে-বলতে চোখে জল এসে গেল। রাজার সহস্র শ্রবণ উৎকর্ণ রয়েছে চারদিকে! তিনি কি শুনছেন?

কর গ্রহণের জন্য নাগরিক ও জানপদবর্গের কাছে ঘুরে বেড়াচ্ছে করবিভাগের রাজকর্মচারীরা। তারা সকলের কাছে গিয়ে বলছে—কর মানে হাত। করগ্রহণ মানে হাতে হাত মিলানো। আপনারা উন্মুক্ত হৃদয়ে সহযোগিতার হাতখানি প্রসারিত করুন। প্রদান ও গ্রহণে আমাদের হৃদয়ের বিনিময় হোক। বন্ধুত্ব, সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্ব উজ্জ্বল হোক।

চাষি, নাগরিক ও ব্যবসায়ী সবাই করপ্রদানে উন্মুখ। রাজকর্মচারীরা গলদঘর্ম হচ্ছেন, তবু হাসিমুখে তাঁরা কাজ করে যাচ্ছেন। বিতর্ক নেই, কটুভাষণ নেই, হিসাবের গোলমাল

নেই, করপ্রদানকারীরা উচ্চৈস্বরে বলছেন—রাজাকে যা দেওয়া যায় তার দশগুণ ফিরে আসে। আমার যে বাহু কর দেয় সহস্র বাহু এসে সেই বাহুর শক্তি বৃদ্ধি করে।

সবাই জানে, রাজা দেখছেন, রাজা শুনছেন।

শান্তিরক্ষীরা ঘুরছেন সর্বত্র। তাঁদের চোখে ঠমক, বা মুখে কটুকাটব্য নেই, তাঁরা অপরাধীকে অন্বেষণ করার চেয়ে অপরাধের অন্বেষণেই বেশি তৎপর। অপরাধ সংঘটনের আগেই তা নিবারণ করছেন। উদ্যোগী হত্যাকারীর হাত হত্যার আগেই তাঁদের হস্তে ধরা পড়ছে। লুণ্ঠনকারীরা লুণ্ঠনের সুযোগ পাচ্ছে না। প্রতি অর্ধপ্রহরে শান্তিরক্ষীর শকট সর্বত্র পরিভ্রমণ করছে। নিরলস সজাগ সতর্ক।

বহিরাগত বণিকেরা রাজকর্মচারীদের করণে উপস্থিত হচ্ছেন কর্মময় দিবাভাগে। একজন বললেন—আমার এ-রাজ্যে ব্যাবসায়ের আজ্ঞাপত্রটি এখনও স্বাক্ষরের অপেক্ষায় আছে। সময় মূল্যবান। এই বলে উনি কোষ থেকে মুদ্রার পেটিকা বের করেন উৎকোচ প্রদানের জন্য।

সংশ্লিষ্ট রাজকর্মচারী সভয়ে চেয়ে থাকেন। রাজা নয় তো! এই হয়তো রাজা!

তিনি হাত বাড়িয়ে উৎকোচ প্রদানরত হাতখানি চেপে ধরে বলেন—শ্রদ্ধাভাজন, আপনার সেবার জন্যই আমি বেতনাদি লাভ করি। তাতেই আমার চলে যায়। অতিরিক্ত কিছুই ভালো নয়। আপনার আজ্ঞাপত্রটি অবিলম্বে স্বাক্ষর করে দেওয়া হচ্ছে।

অকুতোভয়ে সালঙ্কারা যুবতীরা, কামিনীকুল চলেছে রাজপথে। পুরুষেরা তাঁদের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করছে না, কেবলমাত্র পদপ্রান্ত ছুঁয়ে যাচ্ছে তাদের শ্রদ্ধাসিক্ত দৃষ্টি। তাঁদের আভরণ বা দেহসৌন্দর্যকে অনুসরণ করছে না কোনও লোভী বা কামুকের দৃষ্টি। যুবকেরা সসম্মানে পথ ছেড়ে দিচ্ছে। শুক্লপক্ষে কোনও যুবকই কোনও যুবতীকে বিবাহের প্রস্তাব দেয় না। রাজা বলেন, পুরুষদের বিবাহ-প্রস্তাব পৌরুষের পক্ষে হানিকর। পুরুষদের থাকবে কর্মতৎপরতা, মঙ্গলমুখী সুরত। সে কেন নারীচিন্তা করবে?

এমনকী স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দেহমিলনও শুক্লপক্ষে নিয়ন্ত্রিত হয়। স্ত্রীর আগ্রহ ও প্রস্তাব ব্যতিরেকে কোনও পুরুষই স্ত্রীর সঙ্গে উপগমন করেন না। স্ত্রীর সম্মতি ব্যতিরেকে দেহমিলন বলাৎকারের তুল্য অপরাধ।

বারবনিতাদের পল্লিতে স্নিগ্ধ দীপ জ্বলছে। দরজার পাশে মঙ্গলঘট। পত্রে পুষ্পে শোভিত দ্বারদেশ।

আমোদপ্রিয় নাগরিক এসে উপস্থিত হলেন একটি গৃহে।

সুসজ্জিত পতিতাটি ভূমিতে লুটিয়ে প্রণাম করলেন। করজোড়ে বললেন—প্রভু, আমি প্রকৃত নারী নই, নারীত্বের ছায়ামাত্র। হৃদয় ও প্রেম ছাড়া নারীর আর কোনও সম্পদ নেই। গৃহ ও সংসার ছাড়া তার কোনও আশ্রয়ও থাকে না। আমি ব্যতিক্রমদুষ্টা, শাশ্বত নারীত্বের আমি কেউ নই। আমি শরীরী মাত্র, রোগ সংক্রমণের ভয়দুষ্টা। আমি কেবল সাময়িক কামহরণ করতে পারি, কিন্তু পুরুষকে তৃপ্ত করতে পারি না। আতিথ্য গ্রহণের আগে আমাকে আশীর্বাদ করুন যেন আমি এই পঙ্কিলতা থেকে উদ্ধারপ্রাপ্তা হই।

নাগরিক বিস্মিত হন, বলেন—ভদ্রে, ভূমিকার কী প্রয়োজন? আমরা কেউ কারও কাছে বদ্ধ নই। আমি নিজেও প্রবৃত্তি-আক্রান্ত, ক্লান্ত ও পিপাসু। আমাকে আশ্রয় দাও। তুমিও প্রার্থনা করো, যেন আমি প্রকৃতিজাত দুষ্ট আচরণ থেকে মুক্ত হই। পুরুষের প্রধান পৌরুষ সংযমে ও আত্মশাসনে। আমিও ব্যতিক্রমদুষ্ট, অসহায়। তোমার গৃহের ধূলার স্পর্শ আমার ললাটে মঙ্গলচিহ্নস্বরূপ লেপন করো।

রাজা শুনছেন। রাজা দেখছেন।

আজ পূর্ণিমা।

শূন্য সভাকক্ষে দীপ নির্বাপিত। চারজন প্রস্তরীভূত নীরব দৌবারিক চারটি দ্বার প্রহরা দিচ্ছে। নিস্তব্ধতা।

রাজা সিংহাসনে বসে আছেন। সামনে প্রসারিত তাঁর ক্লান্ত পা, দুটি হাত দুদিক থেকে উঠে এসে গম্বুজের মতো ভার রক্ষা করছে তাঁর চিবুকের। অন্ধকারে তাঁর মুখ দেখা যাচ্ছে না। কেবল ঈগলচঞ্চুর মতো তাঁর দীর্ঘ নাসার সামান্য আভাস পাওয়া যায়। কপিশ চোখ দুখানিতে জ্যোৎস্নার প্রতিবিম্ব। আর তাঁর মুকুট থেকে একটি মাণিক্যের দ্যুতি মাঝে-মাঝে প্রতিভাত হচ্ছে।

রাজা একা। রাজা নীরব।

সভাগৃহের অলিন্দের স্তম্ভগুলির পরিসর দিয়ে জ্যোৎস্নার দুগ্ধধারা ভেসে আসছে। আজ শুক্লপক্ষের শেষ।

রাজা বসে রইলেন। চিন্তান্বিত। ব্যথিত। উদ্বিগ্ন। নগরীর কোলাহল তাঁর কানে আসছে। কাল থেকে তিনি নগর বা জনপদ পরিভ্রমণ করবেন না। কাল থেকে পক্ষকাল কৃষ্ণপক্ষ।

গভীর একটি শ্বাসমোচন করলেন তিনি।

সভাকক্ষে সারি-সারি শূন্য আসনগুলির মধ্যে হঠাৎ একটি বিশীর্ণ ছায়া নড়ে উঠল। চন্দ্রালোকের আভায় দেখা গেল একটি মানুষ যেন এইমাত্র প্রেতলোক থেকে শরীর-গ্রহণ করল। দীর্ঘ পদক্ষেপে এগিয়ে আসতে লাগল রাজার দিকে।

রাজা বিস্মিত বা চমকিত হলেন না। তাঁর কপিশ চোখ কেবল স্থির চোখে ছিল। ওষ্ঠে একটু দয়ালু হাস্য।

রাজা নিজের অঙ্গুরীয় নিরীক্ষণ করতে-করতে বললেন—তুমি কে?

লোকটি অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলল—মহারাজ, আমিই সেই ভাগ্যবান যার ভাগ্য এই শুক্লপক্ষে আবর্তিত হয়েছে।

রাজা গম্ভীরকণ্ঠে বললেন—দ্বারে দৌবারিক, প্রাসাদ সুরক্ষিত, এখানে প্রবেশ করলে কী উপায়ে?

অশ্রুমার্জনা করে লোকটি হাসল। বলল—সর্বজ্ঞানই আপনার অধীন। আপনি সবই জানেন। হে দয়াল রাজা, আমি একদা নরহত্যা, নারীধর্ষণ, পরস্বাপহরণ সবই করেছি। নগরীর যে-কোনও সুরক্ষিত গৃহে গোপনে প্রবেশ করা আমার কাছে অতি সহজ।

রাজার মুকুটের সেই মাণিক্যের দ্যুতি লোকটির চোখে এসে পড়ল। রাজা বললেন—তারপর?

—রাজাদেশে আমার দীর্ঘ মেয়াদের কারাদণ্ড হয়।

—তুমি কি অনুতপ্ত? তোমার প্রায়শ্চিত্ত কি সম্পূর্ণ?

লোকটি তার বিশীর্ণ মুখ তুলে বলল—রাজা আমি তার কি জানি। যখন বিচারের জন্য আপনার সম্মুখে আনীত হয়েছিলাম তখনই আপনাকে প্রথম দেখি। ওইরূপ সুঠাম সুন্দর তনু, ওই রাজকীয় গাম্ভীর্য ও করুণাঘন মুখশ্রী, কপিশ চোখের স্নেহ ও তীব্রতা আমাকে বাকরুদ্ধ করে দেয়। আমি বিহ্বল হয়ে পড়ি। সেই বিহ্বলতা এমনই ছিল যে আমার দণ্ড কতখানি কঠোর তা পর্যন্ত আমি অনুভব করতে পারিনি। তারপর দীর্ঘ কারাবাস। কারাগারে আমাকে কঠোর অনুশাসনে চলতে হত, ছিল অসম্ভব কায়িক শ্রম, নিদ্রা বা আহার যথেষ্ট ছিল না। শুনেছি, প্রতি শুক্লপক্ষে রাজা বহির্গত হন, অনুসন্ধান করে উপযুক্ত ব্যক্তিকে তাঁর উপঢৌকন দিয়ে যান। সেই উপঢৌকনের সঙ্গে থাকে রাজকীয় পাঞ্জা, যার প্রভাবে যে-কেউ রাজার প্রায় সমকক্ষ হয়ে ওঠে। প্রতি শুক্লপক্ষে লক্ষ-লক্ষ প্রজার মতো আমিও প্রতীক্ষা করতাম রাজকীয় পদধ্বনির। যদি রাজা আসেন, যদি তাঁর দয়া হয় তবে আমি মুক্তিলাভ করব, ঐশ্বর্যশালী হব। প্রতীক্ষায় এবং বিরহে দিন কাটে। শ্রম বড় কষ্টকর

হয়ে ওঠে, কারাবাস অনন্ত বলে মনে হয়। স্ত্রী-পুত্রদের ভবিষ্যৎ জানি না। কারাবাসে কোনও প্রমাদ নেই, স্নেহ নেই, আত্মমর্যাদা নেই। কিন্তু আমার একটি চিন্তা সর্বদা ছিল। রাজার চিন্তা, রাজকর্মে, নিদ্রায়, জাগরণে, সর্বদাই মন বলত, রাজা আসবেন। রাজা উপহার দেবেন, মুক্তি দেবেন। ক্রমে এই চিন্তায় আমি এক অসহনীয় সুখ লাভ করতে থাকি। মাঝে-মাঝে অভিমান হত, রাজা আসে না কেন? এই অভিমান থেকে একদা আমার প্রলোভন বিদায় নিল। আমি প্রতিদিন শয়নকালে ও শয্যাত্যাগের সময়ে প্রার্থনা করতাম—রাজা, আমি উপঢৌকন চাই না, মুক্তিও নয়। মহারাজ, মানুষ এ-রাজ্যে শুক্লপক্ষে সদাচার করে, কৃষ্ণপক্ষে যথেচ্ছাচার। কারণ কৃষ্ণপক্ষে আপনি রাজাবরোধে থাকেন, বহির্গত হন না। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে বিপরীত হয়। আপনার প্রতি আমার পিপাসা এত বেড়ে ওঠে যে শুক্লপক্ষের প্রতীক্ষা শেষ হলে কৃষ্ণপক্ষব্যাপী আমি আরও ব্যাকুল হয়ে আপনার অনুধাবন করতাম। আপনার প্রদত্ত ঐশ্বর্য নয়, আপনাকেই আমার প্রয়োজন। আর কিছু চাই না। আমার কারাবাস আরও দীর্ঘতর হোক বা আমাকে মৃত্যুদণ্ডই দেওয়া হোক, আমি কেবল আপনার মুখশ্রী তার বিনিময়ে একবার মাত্র প্রত্যক্ষ করতে চাইতাম! এইভাবে আমার কারাবাসের সময় উত্তীর্ণ হয়ে যায়। চতুদর্শী তিথিতে, শুক্লপক্ষে, গতকাল আমি মুক্তিলাভ করি। ইতিমধ্যে আমার স্ত্রী গতপ্রাণা হয়েছেন, পুত্রকন্যারা ইতোভ্রষ্টস্ততোঃনষ্ট হয়েছে, কারও উদ্দেশ জানি না। একাকী রাজপথে চলেছি, মন কেবল বলছে—রাজা! রাজা! শুক্লপক্ষের চতুর্দশী, রাজা ছদ্মবেশে পথে বিচরণ করছেন। তাই আমি পথচারীদের দিকে তাকাই, পরিচর্যা করি। সকলের মুখেই আমার রাজার আদল দেখতে পাই। তবু বুকভরা হাহাকার—রাজা! দেখা দাও। রাত্রিবাসের স্থান ছিল না। এক বৃক্ষতলে শয়ান ছিলাম। আজ ব্রাহ্ম-সময়ে ঘুম ভেঙে দেখি আমার বুকের ওপর আপনার সেই পেটিকা। তাতে রাজার ঐশ্বর্য, রাজকীয় পাঞ্জা।

এই বলে লোকটি তার কোমর থেকে লুক্কায়িত পেটিকাটি বের করে কৃতাঞ্জলিপুটে রাজার সামনে ধরে রইল। বলল—আপনার পেটিকা। গ্রহণ করুন মহারাজ।

রাজা মৃদুহাস্যে বললেন—তুমি গ্রহণ করবে না?

লোকটির মুখ অশ্রুতে ভেসে যাচ্ছিল। বলল—আপনার পবিত্র পাঞ্জা আমি বক্ষদেশে সংলগ্ন রেখেছি, কারণ তাতে আপনার হাতের ছাপ আছে। আর, আপনার যা কিছু ঐশ্বর্য আছে তা সবই আমি পেয়েছি। রাজদর্শনের বিধি অনুসারে এটুকু আমার রাজদর্শনের প্রণামীস্বরূপ আপনি গ্রহণ করুন।

রাজা উচ্চহাস্য করলেন। দৌবারিকরা ছুটে এল। রাজা হস্তোত্তোলন করে তাদের নিবারণ করলেন। তারপর সিংহাসন থেকে দু-হাত প্রসারিত করলেন রাজা। বললেন—

বৎস দাও। কিন্তু আমাকে স্পর্শ করো না। তোমার প্রেম এতই তীব্র যে আমাকে স্পর্শ করলেই তুমি লয় পাবে।

লোকটি দিল। রাজা গ্রহণ করে বললেন—প্রতি শুক্লপক্ষের পূর্ণতিথিতে এই পেটিকাটি আমিই লাভ করি বৎস।

হাওয়া বন্দুক

দিন যায়। থাকে কথা।

মণিকার দিন যায়। কিন্তু কীভাবে যায় কেউ কি তা জানে? তার সুখের ধারণাও খুব বড় নয় দুঃখের ধারণাও নয় বড়। ছোট সুখ, ছোট দুঃখে দিন তার কেটে যেত। বুকের মধ্যে প্রজাপতির মতো উড়ন্ত একটুখানি সুখ, বা ছোট্ট কাঁটার মতো একটু দুঃখ—এ তো থাকবেই। নইলে বেঁচে যে আছে তা বুঝবে কেমন করে মণিকা! কিন্তু সুখ-দুঃখের সেই ছোট ধারণা ভেঙে, দুয়ার খুলে বিশাল পুরুষের মতো অচেনা দুঃখ যখন সামনে এসে দাঁড়ায়, যখন লুটেরার মতো দাবি করে সর্বস্ব, তখন সেই দুঃখ আকাশ বা সমুদ্রের মতো ভুবন-ব্যাপ্ত বিশালতার ধারণা নিয়ে আসে। মণিকার দুর্বল মাথায় তা যেন ধরে না।

গড়ের মাঠে শীতের মেলায় তারা হেঁটেছিল দুজনে। তখন টুকুন ছিল না। সঞ্জয়ের সঙ্গে তখনও তার বিয়ে হয়নি। চুরি-করা দুর্লভ বিকেলে তারা ওইরকম বেরোতে পারত। সঞ্জয় অফিস থেকে বেরিয়ে আসত, মণিকা পালাত কলেজ থেকে। একদিন তেমনি তারা গিয়েছিল শীতের মেলায়। মেলায় ছিল রঙিন আলো, সজ্জিত মানুষের ভিড়—নাগরদোলা, লক্ষ্যভেদের দোকান। ছিল ধুলো, শীতের বাতাস আর ছিল রোমহর্ষ। বিষণ্ণতা কোথাও ছিল না।

লক্ষ্যভেদের দোকানে চক্রাকারে সাজানো বেলুন, ঝুলন্ত খেলনা, বল, দোকানি ডাকছে —

—প্রতি শট পাঁচ পয়সা, আসুন, হাতের টিপ দেখে নিন।

সঞ্জয় দাঁড়ায়।

—মণিকা, হাতের টিপ দেখি?

মণিকা—কী হবে ছাই! হাতের টিপ দেখে!

—দেখিই না, যদি অর্জুনের মতো লক্ষ্যভেদ করতে পারি।

—তাহলে কী হবে?

অর্জুন লক্ষ্যভেদ করে কী যেন পেয়েছিল!

—দ্রৌপদী।

—আমিও পাব মণিকাকে।

—পেয়ে তো গেছই। সবাই জানে আমাদের বিয়ে হবে।

সঞ্জয় একটা শ্বাস ফেলে বলে, মণিকা তোমাকে বড় সহজে পেয়ে গেছি আমি। ঠিক। ডুয়েল লড়তে হয়নি, যুদ্ধ করতে হয়নি, মা-বাবা বাধা দেয়নি। কিন্তু এত সহজে কিছু কি পাওয়া ভালো? মণিকা ভ্রূ কুঁচকে বলে, ভালো নয়, তবে তুমি কি চাও তোমার-আমার মধ্যে বাধাবিঘ্ন আসুক?

—না-না, তা নয়।

—তবে কি তুমি আমাকে মোটেই চাও না আমি সহজলভ্যা বলে?

—তাও নয়। তোমাকে চাই। কিছু এত সহজে নয়। সহজে কিছু পেলে মনে হয় পাওয়াটা সম্পূর্ণ হচ্ছে না। জয়ের আনন্দই আলাদা।

মণিকা হাসল। বলল—তবে বরং আমি কিছুদিনের জন্য অন্য পুরুষের প্রেমে পড়ে যাই! কিংবা চলে যাই দু-বছরের জন্য দিল্লির মাসির বাড়িতে, বিএ পরীক্ষাটা না হয় ওখানেই দেব। নইলে চলো, ঘুমের ওষুধ খেয়ে পড়ে থাকি। তুমি অনেক ঝামেলা-টামেলা করে আমাকে ফের বাঁচিয়ে তোলো। তাতে বেশ দুর্লভ হয়ে উঠি আমি।

সঞ্জয় মৃদু হেসে বলে—না, না, অতটা করার কিছু নেই। বরং ওই টারগেটের দোকানে চলো। একটা বেলুন দেখিয়ে দাও। আমি ফাটাব।

—ফাটালে কী হবে?

—তোমাকে জয় করা হবে।

—না পারলে?

—জয় করা হবে না।

—তাহলে আমাদের বিয়েও হবে না?

সঞ্জয় মাথা নেড়ে বলল—না।

—বাবা, তাহলে আমি ওর মধ্যে নেই। আমি সবকিছু সহজে পেতে ভালোবাসি।

সঞ্জয় তার হাতখানা ধরল। বলল—মণিকা।

—উঁ।

—ওই যে মাঝখানের হলুদ রঙের বেলুনটা, ওটাকে ফাটাব। তিন চান্সে।

—যদি না পারো?

—না পারলে—

কথা শেষ করে না সঞ্জয়?

—না পারলে?

—বিয়ে হবে না।

মণিকা খুব গম্ভীর হয়ে বলল, শোনো।

—কী?

—তুমি ইয়ার্কি করছ?

—না।

—সিরিয়াস।

—ভীষণ!

মণিকা শ্বাস ছেড়ে বলে,—তুমি ভীষণ জেদি। পুরুষমানুষের জেদ থাকা ভালো, কিন্তু যার ওপর আমাদের মরণ-বাঁচন তা নিয়ে তোমার খেলা কেন?

সঞ্জয় কাতর স্বরে বলে,—মণিকা, আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন থেকেই তোমার-আমার ভাব। পাশাপাশি বাড়িতে বড় হয়েছি। বড় হতে-হতেই জেনে গেছি তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে। কত সহজ ব্যাপারটা বলো তো! কোনও রহস্য নেই, রোমাঞ্চ নেই; প্রতিযোগিতা নেই। এ কেমন পাওয়া। আজকের দিনটাই একটু ক্ষণের জন্য এসো একটু দুর্লভ হই। কিছুক্ষণ অনিশ্চয়তা খেলা করুক আমাদের সম্পর্কের মধ্যে।

মণিকার বড় অভিমান হয়েছিল মনে-মনে। সে কি বাজিকরের দোকানের জিনিসের মতো হয়ে গেছে? সে কি লটারির পুরস্কার? তাদের এতদিনকার সম্পর্ক একটা হলুদ বেলুনের আয়ুর ওপর নির্ভর করবে অবশেষে? ছোট্ট একটু দুঃখ কাঁটার মতো ফুটল বুকে। ছোট্ট কাঁটা, কিন্তু তার মুখে বড় বিষ, বড় জ্বালা। মণিকার চোখভরে জলও কি আসেনি? এসেছিল। মুখ ফিরিয়ে সে সেই জলটুকু মুছে ছিল গোপনে। বলল—শোনো, আমি লটারির প্রাইজ নই। আমি তোমাকে পেতে চেয়েছি সমস্ত অন্তর দিয়ে। তোমাকে যে ভালোবাসি সে আমার পুজো। আমি কেন নিজেকে অত হালকা হতে দেব? তুমি চলো, ওই দোকানে যেও না। ও খেলা ভালো নয়।

কিন্তু সঞ্জয় বড় জেদি, ওই জেদই তাকে পুরুষ করেছে! ও জেদই মণিকাকে মুগ্ধ করেছে কত বার। সঞ্জয় মাথা নাড়াল। মুখে হাসি নিয়ে বলল—শোনো মণিকা, বেলুনটা আমি ঠিক ফাটাব।

—এসব নিয়ে খেলা কোরো না। চলে এসো।

—না, প্লিজ, তিনেট চান্স দাও।

মণিকা একটা শ্বাস ফেলল। তারপর আস্তে করে বলল, কিন্তু মনে রেখো, যদি না পারো এ-বিয়ে হবে না।

—আমিও তো তাই বলছি!

মণিকার ঠোঁট কেঁপে ওঠে। গলা ধরে যায় আবেগে। সঞ্জয়ের কাছে তার অস্তিত্ব কি এতই পলকা। যদি ও না পারে তবে সে ওর কাছে মিথ্যে হয়ে যাবে! এই সামান্য খেলায় সারা জীবনের এত বড় একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে নেবে তারা? মণিকা ইচ্ছে করলে সঞ্জয়কে টেনে আনতে পারত জোর করে, কিংবা কেঁদে-কেটে বায়না করে নিবৃত্ত করতে পারত, যেমন সে অন্য সময় করে। কিন্তু ওই সর্বনাশা মুহূর্তে হঠাৎ এক অহংকার-অভিমান-জেদ চেপে ধরল মণিকাকেও। তার জলভরা চোখ থেকে বিদ্যুৎ বর্ষিত হল। কান্নাটা চেপে রেখে সে বলল—বেশ।

দোকানি বন্দুক ভরে এগিয়ে দিল। সঞ্জয় বন্দুক তুলে একবার মণিকার দিকে তাকিয়ে একটু হাসল। বলল—মাঝখানের ওই হলুদ বেলুনটা। বুঝলে লক্ষ করো।

—করছি। গম্ভীরভাবে বলে মণিকা।

সঞ্জয় কাঁধ পর্যন্ত বন্দুক তোলে। নিবিষ্ট মনে লক্ষ স্থির করতে থাকে। মণিকার একবার ইচ্ছে হয়, বন্দুকটা ওর হাত থেকে টেনে নিয়ে পালিয়ে যায়। সে তৃষিত চোখে

চেয়ে দেখছিল, সঞ্জয়ের দীর্ঘকায়, সুন্দর দেহটি। ধারাল মুখ। অবিন্যস্ত চুল নেমে এসেছে কপালে। ওই পুরুষ, আবাল্য পরিচিত মানুষটি একটু ভুলের জন্য চিরদিনের মতো হারিয়ে যাবে জীবন থেকে! এ কী ছেলেমানুষি!

ট্রিগার টিপল সঞ্জয়। শব্দটা ছড়াক করে মণিকার বুকে এসে ধাক্কা মারল। নড়িয়ে দিল তার দুর্বল হৃৎপিণ্ড। দেওয়াল ঘড়ির দোলকের মতো বুকে দুলতে থাকে। সঞ্জয় পারেনি। হ্যাঁ এবং না—এর ভিতরে, আলো আর অন্ধকারের ভিতরে, সুখ ও দুঃখের ভিতরে টিক-টিক-টিক-টিক করে যাওয়া-আসা করে তার বুকের দেওয়াল ঘড়ির পেণ্ডুলাম। সে শুধু ফিসফিস করে বলে—আর মাত্র দুটো চান্স। দেখো, সাবধান।

সঞ্জয়ের মুখের হাসি মুছে গেছে। ভ্রূ কোঁচকানো। সে আবার বন্দুক নেয় দোকানির কাছ থেকে। তোলে। অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ স্থির করে। কিন্তু মণিকা লক্ষ করে, ওর হাত কাঁপছে! বড় মায়া হয় মণিকার। সে বুঝল, এবারেও সঞ্জয় পারবে না, দু-চোখ ভরে আবার জল এল তার। ভাঙা কাচের ভিতর দিয়ে দেখলে যেমন অদ্ভুত দেখায় চারধারকে, তেমনি চোখের জলের ভিতর দিয়ে সে দেখতে পেল, রঙিন আলোর সুন্দর মেলাটি যেন ভেঙেচুরে ধ্বংসস্তূপ হয়ে যাচ্ছে আস্তে- আস্তে। প্রতিবিম্বই বলে দিচ্ছে, এ-পৃথিবীর সুখ ভঙ্গুর, জীবন কত অনিশ্চিত।

সঞ্জয়ের হাওয়া-বন্দুকের শব্দ এবারও কাঁপিয়ে দিল মণিকাকে। সেইসঙ্গে যেন কেঁপে উঠল পৃথিবী, ভেঙে পড়ার আগে আর্তনাদ করে উঠল সমস্ত ভুবন। দ্রুত দোল খেতে লাগল বুকের দোলকটি, যেন বা খসে পড়ার আগে সে তার শেষ দোলায় দুলছে। এবারও লাগেনি।

সঞ্জয়ের মুখে রক্ত এসে জমা হয়েছে। ফেটে পড়ছে ভয়ঙ্কর মুখখানা। দুটো চোখ জ্বলজ্বল করে উত্তেজনায়। তার ঠোঁট সাদা। দোকানি আবার বন্দুক ভরে এগিয়ে দেয়। নির্লিপ্ত গলায় বলে—এবার মারুন। ঠিক লাগবে।

—লাগবে? সঞ্জয় প্রশ্ন করে।

দোকানদার তো ভেতরের কথা কিছু জানে না। সে তাই ভালো মানুষের মতো বলে—আসলে মনটা স্থির করাই হচ্ছে সত্যিকারের টিপ। চোখ আর হাত তো মনের গোলাম। মনটাকে স্থির করুন, ঠিক লাগবে।

সঞ্জয় বন্দুকটা শেষবারের মতো হাতে নিল। তারপর মণিকার দিকে ফিরে চাপা গলায় ডাকল, মণিকা।

—উঁ!

—যদি না লাগে, তবে?

মণিকা শ্বাস ফেলে বলে, তুমি তো জানোই।

সঞ্জয় মাথা নেড়ে বলে—জানি, ঠিক। তাই একটা কথা বলেনি যদি না লাগে তবে আমাদের সম্পর্ক কবে থেকে শেষ হবে।

মণিকা ধীর গলায় বলল, আজ। এখন থেকে।

—আমরা একসঙ্গে ফিরব না?

—না।

—তুমি একা ফিরবে?

—হুঁ।

—আজ থেকে অন্য মানুষ হয়ে যাবে? আমার মণিকা আর থাকবে না তুমি?

—তুমিই তো ঠিক করেছ সেটা।

সঞ্জয় ম্লান একটু হেসে বলল, হ্যাঁ। তারপর একটা শ্বাস ফেলে বলল—মণিকা, এবারও যদি না লাগে তবে আমাদের সম্পর্ক তো শেষ হয়ে যাবে। তবু তোমাকে বলিনি, আমি তোমাকে খুব, খুব, খুব ভালোবাসতাম। আর কখনও কাউকে এত ভালোবাসতে পারব না।

মণিকা রুমাল তুলে দাঁতে কামড়ে ধরল, তবু কি পারে দমকা কান্নাটাকে আটকাতে। কোনওক্রমে কেবল অসহায় একখানা হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, শোনো।

—কী?

—শেষ চান্সটা থাক। মেরো না।

—কেন?

—আমি তোমাকে ভালোবাসি।

—আমিও।

—তবে ওটা থাক। সারাজীবনের জন্য বাকি থাক।

—হেরে যাব মণিকা? পালাব?

—তাতে কী? কেউ তো জানবে না।

সঞ্জয় দ্বিধায় পড়ল কি? বন্দুকটা রাখল, একটা সিগারেট ধরাল। ভ্রূ কোঁচকালো, চোয়ালের পেশি দ্রুত ওঠানামা করল। সিগারেটটা গভীরভাবে টানল সে। ধোঁয়া ছেড়ে সেই ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে মণিকার অস্পষ্ট মুখের দিকে চেয়ে রইল একটুক্ষণ। তারপর বলল, কেউ জানবে না? কিন্তু তুমি তো জানবে?

—কী জানব?

—আমি যে পালালাম।

—আমি ভুলে যাব।

সঞ্জয় মৃদু হাসে। মাথা নাড়ে।—তা হয় না। আমাকে বুকের মধ্যে নিয়েও তুমি মনে-মনে ঠিকই জানবে যে এ-লোকটা কাপুরুষ। এ-লোকটা শেষবার বন্দুক চালাতে ভয় পেয়েছিল। মণিকার চোখের জল গড়িয়ে নামল। দোকানদার অবাক হয়ে দেখছিল তাকে। সামান্য বেলুন-ফাটানো টারগেটের খেলায় কান্নাকাটির কী আছে তা তো তার জানা ছিল না। রঙিন আলোর মেলায় আনন্দিত মানুষজন কেউই জানত না, মেলার মাঝখানে কী এক সর্বনাশা ঘটনা কত নিঃশব্দে ঘটে যাচ্ছে! সঞ্জয় ধীরে বন্দুকটা তুলে নেয়। মণিকা মুখ ফিরিয়ে নিল অন্যদিকে।

হাওয়া বন্দুকটা ধীরে-ধীরে কাঁধের কাছে তুলে নিচ্ছিল সঞ্জয়। দিন যায়, কথা থাকে। দোকানদার বলেছিল—হাত আর চোখ হচ্ছে মনের গোলাম। মন স্থির থাকলে লক্ষ্যভেদ হয়।

মণিকা ভাবে—তবে কি মনই স্থির ছিল না সঞ্জয়ের? মণিকার প্রতি তবে কি স্থির ছিল না সঞ্জয়ের মন। তাহলে কেন বন্দুকের খেলায় ওই হেলাফেলা উদাসীনতা? মণিকা দাঁতে রুমাল ছিঁড়ে ফেলল টানে। দু-হাত প্রাণপণে মুঠো করে তার চারধারে ভেঙে পড়ার আগের মুহূর্তের পৃথিবীকে দেখে নিল। নিষ্ঠুর, এবার চালাও ওই খেলনা-বন্দুক। ভেঙে পড়ুক মণিকার জগৎ-সংসার। সেই ভগ্নস্তূপের ওপর দিয়ে হেঁটে আজ একা ঘরে ফিরে যাবে মণিকা।

চক্রাকারে সাজানো হরেক রঙের বেলুন। ঠিক মাঝখানে হলুদ বেলুনটা। ফাটবে, না কি ফাটবে না? সঞ্জয় অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ করে। নলের ওপর দিয়ে চেয়ে থাকে বেলুনটার দিকে। পৃথিবী সুতোয় দুলছে। ছিঁড়বে। এক্ষুনি ছিড়বে।

হাওয়া-বন্দুকের শব্দ শেষবারের মতো বেজে উঠল। সঞ্জয়ের লিত হাত থেকে বন্দুকটা খসে যায়। মণিকা শিউরে ওঠে। ফিরে তাকায়।

চক্রের মাঝখানে হলুদ বেলুনটা নেই। ফেটে গেছে। নরম রবার ঝুলে আছে ন্যাকড়ার মতো। দোকানদার বলল, বাঃ, এই তো পেরেছেন!

তারা দুজনে কেউই বিশ্বাস করেনি প্রথমে যে বেলুনটা সত্যিই ফেটেছে। বুঝতে সময় লাগে।

বিহ্বল গলায় সঞ্জয় ডাকে—মণিকা।

—উঁ!

—লেগেছে।

—যাঃ।

—সত্যিই। দ্যাখো।

মণিকা কাঁদে। তারপর চোখের জল মুছে হাসে। মেলাটা কেমন রঙিন আলোয় ভরা। সজ্জিত মানুষেরা কেমন হেঁটে যাচ্ছে চারদিক। অবিরল ঘুরে যাচ্ছে নাগরদোলা। বেলুনটা ফেটেছে—সেই আনন্দ সংবাদ নিয়ে শীতের বাতাস চলে যায় দিগ্বিদিকে। চারধারকে ডেকে যেন সেই বাতাস বলতে থাকে—আনন্দিত হও, সুন্দর হও, সব ঠিক আছে।

তবু দিন যায়। কথা থাকে। বিয়ের পর চার বছর কেটে গেছে। তারা দুজন এখন তিনজন হয়েছে। টুকুন তিন বছরে পা দিল। সেই মেলায় পা দিল। সেই মেলায় হাওয়া-বন্দুকের খেলা তাদের কি মনে পড়ে? পড়ে হয়তো, কিন্তু কেউ মুখে বলে না। সঞ্জয় সিগারেট খেত খুব। মণিকা কোনওদিন আটকাতে পারেনি। রাতবিরেতে উঠে কাশত। মণিকা ঘুম ভেঙে উঠে উদ্বেগের গলায় বলত—ইস। কী কাশি হয়েছে তোমার। মাগো!

সঞ্জয় কাশতে-কাশতে বলে—স্মোকারস কাফ। ও কিছু নয়, বলেই আবার সিগারেট ধরাত।

—আবার সিগারেট ধরালে?

—সিগারেটের ধোঁয়া না লাগলে এ-কাশি কমবে না। সিগারেট থেকেই এই কাশি হয়। সিগারেট খেলেই আবার কমে যায়।

—বিছানায় বসে খাচ্ছ, ঠিক একদিন মশারিতে আগুন লাগবে।

সঞ্জয় উদাস স্বরে বলে—লাগুক না।

—লাগুক না? দাঁড়াও দেখাচ্ছি। শিগগির সিগারেট নেভাও।

সঞ্জয় হাসতে থাকে, সিগারেট সরিয়ে নিয়ে বলে—আগুন লাগলে কী হবে মণিকা! সংসারটা পুড়ে যাবে। এই তো? পৃথিবীতে কিছুই তো চিরস্থায়ী নয়। যাক না পুড়ে।

মণিকা শ্বাস ফেলে বলে—তুমি বড় পাষাণ, বুঝলে! বড় পাষাণ!

সঞ্জয় উত্তর দেয়—তুমি তো জানোই।

মুখে যাই বলুক মণিকা, মনে-মনে জানে, একটুও নিষ্ঠুর নয় সঞ্জয়, একটু পাষাণ নয়। বরং বেশি মায়ার ভরা সঞ্জয়ের মন। তবু তারা সুখীই ছিল। সংসারে নানা সুখ-দুঃখ ছায়া ফেলে যায়। ছোট-ছোট সুখ, ছোট-ছোট দুঃখ। সে সুখ-দুঃখ কোনও সংসারে নেই। সঞ্জয় মোটামুটি ভালো একটা চাকরি করে। তিন বছরের টুকুন সকাল আটটায় তার নার্সারি স্কুলে যায়। সারাদিন সংসারের গোছগাছ নিয়ে থাকে মণিকা। সে জানে তার স্বামী সঞ্জয় একটু উদাসীন তা হোক, তবু স্ত্রৈণ পুরুষের চেয়ে অনেক ভালো।

সংসারের হাজার কাজের মধ্যে যখন অবসর পায় মণিকা, তখন দক্ষিণের জানালার ধারে আলোয় এসে বসে। টুকুনের জামার ছেঁড়া বোতাম সেলাই করে। বাপের বাড়িতে চিঠি লিখে, রেডিও বাজিয়ে কখনও বা নিজেই গান গায় গুনগুন করে। সেইসব অন্যমনস্কতার সময়ে কখনও-কখনও হঠাৎ মনে পড়ে দৃশ্যটা। চারধারে সেই রঙিন ভয়ঙ্কর খেলাটা বেশ জেগে ওঠে। দূরাগত চিৎকার শুনতে পায়, এক দোকানদার ডেকে বলছে প্রতি শট পাঁচ পয়সা, আসুন হাতের টিপ দেখুন।

আর তখন, মণিকা যেন সত্যিই দেখতে পায়, সামনে চক্রাকারে সাজানো হরেক রঙের বেলুনের ঠিক মাঝখানে হলুদ বেলুনটি। সঞ্জয় হাওয়া-বন্দুক তুলে দাঁড়িয়ে আছে। চারধারে মুমূর্ষু পৃথিবী ভেঙে পড়ার আগে কেঁপে উঠছে, মণিকার বুকে দেওয়াল ঘড়ির দোলক ধাক্কা দেয়, পড়তে থাকে।

রাতে আজকাল সঞ্জয় বড় বেশি কাশে। কাশতে-কাশতে দম আটকে আসে তার। মণিকা ওঠে জলের গ্লাস এগিয়ে দিয়ে বলে—জল খাও তো!

—দাও।

—কাল তুমি ডাক্তারের কাছে যেও।

—দূর-দূর! ডাক্তাররা একটা-না-একটা রোগ বের করেই, রোগ না থাকলেও। এ-কাশি কিছু না। সিগারেটের প্যাকেটটা দাও তো টেবিল থেকে হাত বাড়িয়ে।

—খেও না, পায়ে পড়ি।

—আঃ, দাও না। সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়া কমবে না।

—রোজ তোমার এক কথা। তুমি আগে ডাক্তার দেখাও তো!

—ডাক্তাররা কিছু জানে না।

—তুমি খুব জানো।

—আমি ঠিক জানি। বরং একটা ওষুধ কিনে আনব।

মণিকা বিছানায় বসে সঞ্জয়ের চওড়া রোমশ বুকের ওপর হাত রাখে স্নেহে, এই পুরুষটিকে সে খুব চিনে গেছে। ভারী একগুঁয়ে, জেদি। তবু ভেতরে-ভেতরে মেয়েদের মতোই নরম।

বুকে হাত বুলিয়ে দিতে-দিতে মণিকা বলে—নিজের ওপর তোমার একটুও নজর নেই। সারাদিন চা আর সিগারেটের ওপরে আছ। এ তো ভালো নয়, বুঝলে? কাল থেকে সকালে আর দু-কাপ চা দেব না, দ্বিতীয় বারে, চায়ের বদলে দুধ দেব।

—ধুস।

ওসব বললে চলবে না। খেতে হবে, আর অফিস থেকে তাড়াতাড়ি ফিরবে। সারাটা দিন তো বাসাতেই থাকো না। ঠিক যেন পেয়িং গেস্ট।

—সারাক্ষণ ঘরে থাকা যায়?

—তাহলে আমি কী করে থাকি?

—মেয়েরা পারে, সংসারে তাদের জান পোঁতা হয়ে থাকে।

—তাই নাকি! আর, তোমার জান কোথায় পোঁতা আছে শুনি। নতুন করে কারও প্রেমে পড়োনি তো?

সঞ্জয় হাসে, ইচ্ছে তো করে একটা হারেম বানিয়ে ফেলি কিন্তু এ-বয়সে কে আর ফিরে তাকাবে বলো।

ফিরে তাকাবার লোকের অভাব নেই। সেদিন মনুর বিয়েতে ওর যে একদল কলেজের বন্ধু এসেছিল তাদের মধ্যে একজন শ্যামলা মতো মেয়ে হাঁ করে তোমাকে খুব দেখছিল।

—যাঃ! তোমার যত বানানো কথা।

—সত্যি বলছি, মাইরি।

—আমার গা ছুঁয়ে বলছ তো।

—ও বাবা! বলে মণিকা হাত টেনে নেয়।

—কী হল! হাতটা সরিয়ে নিলে কেন?

—তোমাকে ছুঁয়ে দিলাম যে।

সঞ্জয় হাসে, গা ছুঁয়ে বলতে সাহস হচ্ছে না, তার মানে মিথ্যে কথা বলছ।

—না গো, সত্যিই মেয়েটা দেখছিল।

—তবে গা ছুঁয়ে বলো।

—না-না। তোমাকে ছুঁয়ে আমি কখনও দিব্যি গালি না।

সঞ্জয় বলল—তাহলে বলি, তুমি যে বড় দর্জির দোকানে ব্লাউজ বানাতে দাও, সেখানকার সুন্দর মতো সেলসম্যানটি তোমার দিকে যেভাবে তাকিয়ে থাকে—

—যাঃ, বলবে না, নোংরা কথা। বলে মণিকা।

আর সেদিন পাড়ার ছেলেরা যে চাঁদা চাইতে এসেছিল তাদের মধ্যে একজন কেন তোমার কাছে জল খেয়ে গেল জানো?

—এই, এই, এমন মারব না; কেবল বানাচ্ছে, চুপ করো। ওসব শুনলেও পাপ।

তারা দুজনেই খুব হাসতে থাকে। কারণ তারা জানে ওসব কথা সত্যি নয়, কিংবা হলেও তাদের কিছু যায় আসে না। তাদের ভালোবাসা গভীর, গভীর।

সকালে টুকুন দুলে-দুলে পড়ছে—ব্যা ব্যা ব্ল্যাক শিপ, হ্যাভ ইউ এনি উল? ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার, থ্রি ব্যাগস ফুল।

মণিকা রান্নাঘরে ঝিকে বকছে—রোজ তোমার আসতে বেলা হয়ে যায়। এঁটো বাসনপত্র পড়ে আছে, ঝাঁটপাট হয়নি, সাতটা বেজে গেল, টুকুনের স্কুলের বাস আসবে এক্ষুনি, কখন কী হবে বলো তো?

ঝি উত্তর দেয়, কী করব বউদি, বড় বাড়িতে বেশি মাইনে দেয়, তারা সহজে ছাড়তে চায় না। কেবল এটা করে যাও, ওটা করে যাও। তোমার বাড়ি সেরে আবার এক্ষুনি ও-বাড়ি দৌড়তে হবে।

—বেশি মাইনে যখন, তখন ও-বাড়ির কাজই ধরে রাখো, আমারটা ছেড়ে দাও। আমি অন্য লোক দেখে নিই, পইপই করে বলি আমার ছেলের সকালে ইস্কুল, কর্তারও অফিস

ন'টায় একটু তাড়াতাড়ি এসো। তুমি কেবল বড়লোকের বাড়ির বেশি মাইনের কাজ দেখাও।

[বাথরুম থেকে ক্রমান্বয়ে কাশির শব্দ আসে]

টুকুন এক নাগাড়ে ব্যা ব্যা ব্ল্যাক শিপ পড়ে যাচ্ছে। মণিকা ডাক দিয়ে বলে, টুকুন কেবল ওই কবিতাটা পড়লেই হবে। একটু অঙ্ক বইটা দেখে নাও। কাল অঙ্কে ব্যাড পেয়েছ।

মণিকা—বাথরুম থেকে ক্ষীণ গলায় সঞ্জয় ডাকে।

মণিকা উত্তর দেয়, কী বলছ?

—একটু শুনে যাও।

—দাঁড়াও, আমার হাত জোড়া, ডালে সম্বর দিচ্ছি।

—এসো না।

—উঃ, আমি যেতে পারব না। টুকুনের টিফিন বাক্স গোছানো হয়নি, জলের বোতলে জল ভরা হয়নি। এক্ষুনি বাস এসে পড়বে।

সঞ্জয় চুপ করে থাকে, তারপর আবার শোনা যায়, তার কাশির শব্দ। দম বন্ধকরা সেই কাশি; তার পরই ওয়াক তুলে বমি করার শব্দ হয়।

—ওমা! কী হল! বলে মণিকা উঠে বাথরুমের বন্ধ দরজায় এসে ধাক্কা দেয়—এই কী হয়েছে? এই—ভিতর থেকে উত্তর আসে না, কেবল বেসিনে জল পড়ে যাওয়ার শব্দ হতে থাকে।

দরজায় ধাক্কা দেয় মণিকা। এই, দরজাটা খোলো না। কী হয়েছে তোমার? বমি করছ কেন?

সঞ্জয় উত্তর দেয় না।

মণিকা দরজায় ক্রমাগত ধাক্কা দেয়—এই, কী হয়েছে? ওগো, দরজাটা খোলো না।

মণিকা চিৎকার করে ডাকে সুধা, এই সুধা—

সুধা দৌড়ে আসে—কী হল গো বউদি?

—দ্যাখো, তোমার দাদাবাবু দরজা খুলছে না। কী জানি কী হল, অজ্ঞান-টজ্ঞান হয়ে গেল নাকি?

শরীর খারাপ ছিল?

—হ্যাঁ, তুমি শিগগির বাড়িওয়ালাকে খবর দাও।

কিন্তু খবর দেওয়ার দরকার হয় না। ছিটকিনি খোলার শব্দ হয়, দরজা খুলে দেয় সঞ্জয়। তার দিকে তাকিয়ে মণিকা বিমূঢ় হয়ে যায়। অত বড় মানুষটাকে কেমন দুর্বল দেখাচ্ছে। ঠোঁট সাদা, মুখে রক্তাভা, চোখের দৃষ্টি খানিকটা ঘোলাটে। একটা হাত বাড়িয়ে সঞ্জয় বলে—ধরো আমাকে।

মণিকা দু-হাতে জড়িয়ে ধরে তার মানুষটাকে। কী মস্ত শরীর, মাত্র বত্রিশ বৎসর বয়সের যুবক স্বামীটি তার কী হল, কী হতে পারে মানুষটার?

—কী হয়েছে তোমার ওগো?

—কী জানি, কাশি এল খুব, কাশতে-কাশতে বমি হয়ে গেল। আমাকে একটু শুইয়ে দাও।

...বাইরে বাসের হর্ন বাজে। টুকুন দৌড়ে আসে। মা, বাস এসে গেছে। টিফিন বাক্স আর জলের বোতল দাও।

—দিচ্ছি, দিচ্ছি বাবা।

টুকুন বাবাকে জিগ্যেস করে—কী হয়েছে বাবা?

—কিছু না।

—শুয়ে আছ কেন? আজ তোমার ছুটি?

সঞ্জয় শ্বাস ফেলে বলে—ছুটি! না ছুটি নয়। তবে বোধহয় এবার ছুটি হয়ে যাবে।

—কেন বাবা?

—মাঝে-মাঝে মানুষের ছুটি হয়ে যায় বিনা কারণে। বলে সঞ্জয় হাসে। বলে, তোমাকে খ্যাপালাম। কিছু হয়নি। তুমি ইস্কুলে যাও।

—যাই বাবা, টাটা।

—টাটা!

বাইরে বাসের শব্দ হয়।

মণিকা গম্ভীরস্বরে ঘরে আসে। হাতে দুধের কাপ। চামচে দিয়ে ভাসন্ত পিঁপড়ে তুলছে। কাপটা এগিয়ে দিয়ে বলে—দুধটা খেয়ে নাও।

—খেতে ইচ্ছে করছে না। এখনও বমির ভাবটা আছে। খেলে বমি হয়ে যাবে।

—আমি ডাক্তারকে খবর দিয়েছি।

সঞ্জয় একটা শ্বাস ফেলে বলে, সিগারেটের প্যাকেটটা দাও।

—না, আর সিগারেট নয়।

—দাও না, মুখটা টক-টক লাগছে। সিগারেট খেলে বমির ভাবটা কমবে।

মণিকা বলল, না, এত বাড়াবাড়ি আমি করতে দেব না।

ওঃ, বলে সঞ্জয় হতাশভাবে চেয়ে থাকে।

—শোনো, তুমি টুকুনকে কী বলছিলে?

—কী বলব?

—কিছু বলনি? আমি পাশের ঘর থেকে সব শুনেছি।

সঞ্জয় একটু হাসে—কী শুনেছ?

—ওইটুকু ছেলেকে ওইসব কথা বলতে তোমার মায়া হল না?

—ওকি বুঝেছে নাকি?

—না-ই বা বুঝল? তুমি বললে কেন? ছুটি মানে কী তা কি আমি বুঝি না?

—কি মানে বলো তো?

—বলব না। তুমিও জানো, আমিও জানি।

—মণিকা সিগারেট দাও।

—না।

—তাহলে আবার কাশি শুরু হবে।

—হোক, সিগারেট কিছুতেই দেব না। আগে বলো কেন বলেছিলে ওই কথা।

—এমনিই।

মণিকা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। বহুদিনের হারিয়ে যাওয়া একটা দৃশ্য মনে পড়ে। মেলার দোকানে মণিকাকে বাজি রেখে হাওয়া-বন্দুক লক্ষ্যভেদের খেলা খেলছে সঞ্জয়। জীবনে মণিকা কোনওদিনই ঘটনাটা ভুলতে পারবে কি? পারবে না। মনে কেবলই সংশয় খোঁচা দেয়। যাকে ভালোবাসে মানুষ তাকে কী করে এক মুহূর্তের খেয়াল-খুশিতে হারজিতের খেলায় নামিয়ে আনতে পারে? তবে কি সঞ্জয় কোনওদিনই তেমন করে ভালোবাসেনি তাকে? সেই জন্যই কি এই সাজানো সুন্দর সুখের সংসার ছেড়ে চলে যাওয়ার বড় সাধ হয়েছে তার? ও টুকুনকে কেন বলল মাঝে-মাঝে মানুষের ছুটি হয় বিনা কারণে। ওই ছুটির জন্য বড় সাধ সঞ্জয়ের?

মণিকা বিছানার একধারে বসল। স্বামীর মাথাটা টেনে নিল বুকের ধার ঘেঁষে। চুল এলোমেলো করে দিতে-দিতে বলল, অমন কথা বলতে নেই, কখন স্বস্তির মুখে কথা পড়ে যায়। আর কখনও বোলো না।

—আচ্ছা।

—আমাকে ছুঁয়ে বলো, বলবে না।

সঞ্জয় হাসল, বলল, সিগারেট দাও না মণিকা।

—না।

বাইরে বাড়িওয়ালার ছেলের ডাক শোনা যায়—বউদি।

মণিকা বলে—বোধহয় পল্টু ডাক্তারবাবুকে নিয়ে এল।

মণিকা বলল—আসছি পল্টু। মণিকা গিয়ে দরজা খোলে। ডাক্তারবাবু ঘরে আসেন।

—কী হয়েছে? ডাক্তারবাবু জিগ্যেস করেন।

সঞ্জয়ের কাশির দমকাটা আবার আসে। দাঁতে দাঁত চেপে বলে—কিছু না। স্মোকারস কাফ।

—দেখি, আপনি ভালো করে শুন তো।

ডাক্তার সঞ্জয়কে মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করতে থাকেন। মণিকাকে একটা টর্চ আনতে বলেন, টর্চ দিয়ে গলাটা দেখেন ভালো করে। গলার বাইরের দিকে কয়েকটা জায়গা একটু ফুলে আছে। সেগুলো হাত দিয়ে টিপে-টিপে দেখে জিগ্যেস করেন—এগুলো কতদিন হল হয়েছে?

—কি জানি! সঞ্জয় উত্তর দেয়।

ডাক্তারবাবুর মুখটা ক্রমে গম্ভীর হয়ে আসে। একটা প্রেসক্রিপশন লিখে দিয়ে ওঠেন। মণিকা তাঁর সঙ্গে-সঙ্গে বাইরের ঘরে আসে।

—ডাক্তারবাবু।

—বলুন।

—কীরকম দেখলেন?

—তেমন কিছু বুঝতে পারছি না। ওষুধগুলো দিন। দেখা যাক।

হঠাৎ এক অনিশ্চয়তা, এক ভয় চেপে ধরে মণিকার বুক। ভগবান, ডাক্তার কেন বুঝতে পারছে না?

কয়েকদিন কেটে যায়। ওষুধে তেমন কোনও কাজ হয় না। কাশিটা যেমনকে তেমন থেকে যায় সঞ্জয়ের। কিছু খেতে পারে না, ওয়াক তুলে বমি করে ফেলে। শরীরটা জীর্ণ দেখায়। মস্ত চুল ভরতি মাথাটা বালিশে ফেলে রেখে পায়ের দিকের জানালাটা দিয়ে উদাসভাবে বাইরের দিকে চেয়ে থাকে। কেবল চেয়ে থাকে।

মণিকা ডাকে—শুনছ?

—উঁ।

—একটু হাঁটাচলা করো। শুয়ে থাকো বলেই তোমার খিদে পায় না।

—একটা সিগারেট দেবে মণিকা?

—না।

—পাষাণ, তুমি পাষাণ!

মণিকার চোখে জল আসে, বলে—কোনওদিন তো বারণ করিনি জোর করে। অসুখ হল কেন বলো। ভালো হও তারপর খেও।

—যদি ভালো না হই?

—ফের ওই কথা? তুমি বলেছিলে না যে আর বলবে না।

সঞ্জয় শ্বাস ফেলে, চুপ করে থাকে। ডাক্তার মাঝে-মাঝে এসে তাকে দেখে যায়। একদিন চিন্তিতমুখে ডাক্তার মণিকাকে আড়ালে ডেকে বলে—গলার ঘা-টা একটু অন্যরকম মনে হচ্ছে। বরং ডাক্তার বসুকে একবার দেখান।

—আপনার কী মনে হয়।

—কিছু বলা মুশকিল। দীর্ঘস্থায়ী কোনও ঘা দেখলে অন্যরকম একটা সন্দেহ হওয়া অস্বাভাবিক নয়। হয়তো তেমন কিছুই নয়। তবু দেখালে নিশ্চিত হওয়া যায়।

ডাক্তারবাবু চলে গেলে মণিকা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ডাক্তারের কথার অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝতে তার দেরি হয় না। ডাক্তাররা সহজে নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করে না, সুতরাং—

সুতরাং মণিকা বুঝতে পারে, এতকাল ছোট সুখ, ছোট দুঃখের সঙ্গেই ছিল তার ভাব-ভালোবাসা। এখন হঠাৎ সদর দুয়ার গেছে যে খুলে, অচেনা, বিশাল পুরুষের মতো এক বড় দুঃখ এসে দাঁড়িয়েছে দরজায়। লুবিয়ার মতো, মণিকার ছোট মাথা তা বইতে পারে না। এ যে আকাশ পর্যন্ত ব্যাপ্ত, এ যেন সমুদ্রের মতো সীমাহীন, এ দুঃখ দাবি করে সর্বস্ব। সমগ্র ভুবন কেড়ে নেয়।

দুপুরে স্কুল থেকে ফিরে এসেছে টুকুন। ভাত খেয়ে আলাদা বিছানায় ঘুমুচ্ছে। বড় ঘাম হয় ছেলেটার। একটা মাত্র পাতলা জামা গায়ে, তবু জলধারায় ভেসে যাচ্ছে গলা বুক। কপালে মুক্তবিন্দু, মণিকা নীচু হয়ে টুকুনের মুখ দেখে। সবাই বলে ওর শরীরের গঠন আর চোখ দুখানা সঞ্জয়ের মতো। নিবিড় পিপাসায় দেখে মুখখানি, মণিকা ফিসফিস করে ডাকে।

—টুকুন।

টুকুন উত্তর দেয় না।

—ওঠ টুকুন।

টুকুন উত্তর দেয় না।

—ওরে টুকুন বেলা গেল। ওঠ।

টুকুনের উত্তর নেই। নিঃসাড়ে ঘুমোয় সে। নিশ্চিন্তে।

টুকুন ওঠ রে, আয় দুজনে মিলে একটু কাঁদি। ডাক্তার বাসুর চেম্বারে ফোন করল মণিকা, পোস্ট অফিসে গিয়ে।

—ডক্টর বাসুর সঙ্গে কথা বলতে চাই।

—উনি দিল্লিতে আছেন।

—কবে ফিরবেন?

—কনফারেন্সে গেছেন। কাল কি পরশু ফেরার কথা।

—আমার যে ভীষণ দরকার।

—কী দরকার বলুন।

—দয়া করে বলবেন, ডাক্তারবাবু কীসের স্পেশালিস্ট।

ও-পাশে লোকটা বোধহয় একটু হাসল, বলল ঃ ক্যান্সার।

—আমি কাল আবার ফোন করব। কোন সময়ে আসার কথা?

—সকালের ফ্লাইটে। তবে কিছু বলা যায় না, হয়তো আটকেও যেতে পারেন।

মণিকা সন্তর্পণে ফোনটি রেখে দেয়। বাসায় ফিয়ে দেখে সঞ্জয় শুয়ে আছে। উত্তর শিয়রে মাথা, পায়ের কাছে দক্ষিণের জানালা। শেষবেলার একটু রাঙা আলো এসে পড়ে আছে পাশে। সঞ্জয় চেয়ে আছে দক্ষিণের জানালা দিয়ে। অবিরল চেয়ে থাকে আজকাল। কথা বড় একটা বলে না। টুকুনকে আদর করে না, মণিকাকেও না।

শেষ চান্স-এ হলুদ বেলুনটা না ফাটলে কোথায় থাকত মণিকা আর কোথায়ই বা সঞ্জয়। মণিকা সঞ্জয়ের দিকে চেয়ে থাকে। পিপাসায় তারা ঠোঁট নড়ে, তার দু-চোখ জলে ভেসে যায়। অচেনা পুরুষের মতো বড় দুঃখ এসে দাঁড়িয়েছে দুয়ার খুলে। হাতে তার হাওয়া বন্দুক, হলুদ বেলুনের মতো ঝুলে আছে। মণিকার হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ হবে, ভেঙে যাবে বুক।

মণিকা শব্দ করে কেঁদে উঠে। অবাক হয়ে সঞ্জয় চোখ ঘোরায়।

—কী হয়েছে?

—পাষাণ, তুমি পাষাণ।

সঞ্জয় বুঝতে পেরে মাথা নাড়ে, শ্বাস ফেলে বলে—কেঁদো না, আমাকে বরং এখন থেকে একটা করে সিগারেট দিও রোজ।

মণিকা হঠাৎ মুখ তুলে বলে—সিগারেট আর সিগারেট! সংসারে সিগারেট ছাড়া তোমার আর কিছু চাওয়ার নেই?

না—মাথা নাড়ল সঞ্জয়।

—পাষাণ, তুমি পাষাণ।

মণিকা কাঁদে, সঞ্জয় চুপ করে দক্ষিণের জানালা দিয়ে চেয়ে দেখে, টুকুন পাশের ঘরে ঘুমোয়।

অনেক কষ্টে ডাক্তার বাসুর সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে পারে মণিকা। সঞ্জয়কে নিয়ে একদিন হাজির হয় ছায়াচ্ছন্ন চেম্বারটায়। বাসু প্রবীণ ডাক্তার, বিচক্ষণ অভিজ্ঞ দুটি চোখ তুলে বললেন—কী হয়েছে? দেখি! বলে সঞ্জয়কে চেয়ারে বসালেন। আলো জ্বালালেন কয়েকটা, ঝুঁকে ওর মুখ দেখতে লাগলেন, ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে থাকে মণিকা, হাওয়া-বন্দুক তুলেছে এক পাষাণ, দেওয়াল ঘড়ি পেন্ডুলামের মতো দোল খাচ্ছে, বুকের ভিতরটা এক হলুদ বেলুন দাঁতে চিবিয়ে আজও রুমাল ছিঁড়ল মণিকা।

ডাক্তার বাসু সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললেন—কিছু হয়নি।

—মানে? সঞ্জয় প্রশ্ন করে।

—যা সন্দেহ করে এসেছেন আমার কাছে, তা নয়। আজকাল সকলেরই এক ক্যান্সারের বাতিক, স্মোক করেন?

—করতাম।

—টনসিলটা পাকা। ফ্যারিঞ্জাইটিস আছে, সব মিলিয়ে একটা আলসার তৈরি হয়েছে, ওষুধ লিখে দিচ্ছি। সেরে যাবে।

ডাক্তারবাবু ওষুধ লিখে দিলেন।

সেরেও গেল সঞ্জয়।

একদিন বলল, শোনো মণিকা।

—কী?

মনে আছে একবার মেলায় তোমাকে বাজি রেখে হাওয়া-বন্দুকের খেলা খেলেছিলাম?

—মনে আছে।

—সেজন্যে আমাকে ক্ষমা করো।

মণিকা হাসে—তুমি কী ভাবো, শেষ চান্সে বেলুনটা না ফাটালে আমি তোমাকে ছেড়ে চলে যেতাম?

—যেতে না?

—পাগল।

—কী করতে?

—আমি বন্দুকটা নিয়ে বেলুনটা ফাটাতাম। না পারলে সেফটিপিন ফুটিয়ে আসতাম বেলুনটায়!

—তুমি ডাকাত, বলে সঞ্জয় হাসে।

অলক্ষ্যে হাওয়া-বন্দুক নামিয়ে পরাজিত এক অচেনা পুরুষ ফিরে যায়। তার লক্ষ্যভেদ হল না। বিদীর্ণ হয়নি মণিকার হৃদয়। সব ঠিক আছে। কোনওদিন আবার সেই বন্দুকবাজ ফিরে আসবে। লক্ষ্যভেদ করার চেষ্টা করবে বারবার, একদিন লক্ষ্যভেদ করবেও সে। ততদিন পর্যন্ত পৃথিবীর এই রঙিন মেলায় আনন্দিত বাতাস বহে যাক এই কথা বলে—ঠিক আছে, সব ঠিক আছে।

খবরের কাগজ

বলা হয় ট্রেন দুর্ঘটনার তদন্ত হবে। হয়। বলা হয়, বিমান দুর্ঘটনার তদন্ত হবে। হয়। হয়েও শেষপর্যন্ত অবশ্য লাভ হয় না। শুধু জানা যায়, হয় যান্ত্রিক গোলযোগ নয়তো কারও অসাবধানতায় দুর্ঘটনা হয়েছিল। তাতে একটা মরা মানুষও বাঁচে না, একটা কাটা ঠ্যাং-ও জোড়া লাগে না। তবে মৃতের আত্মীয়স্বজনরা কেউ-কেউ হয়তো ফাঁকতালে ক্ষতিপূরণবাবদ কিছু টাকা পেয়ে যায়।

যেমন পেয়েছিল গৌরী।

বন্যা কেন হল? ঝড় কেন এল? ক্যানসারের ওষুধ কবে বেরোবে? মহামারি কেন? আগুন কী করে লাগল? ছাদ কেন খসে পড়ল? ভূমিকম্প কেন ঘটছে? খুন হল কেন? এইসব ভাবতে- ভাবতে প্রত্যেকদিন শ্যামাচরণ একটু-একটু বড় হয়ে যাচ্ছে। সকাল থেকে খবরের কাগজ তার বগলে। যখনই ফাঁক পায় তখনই খুলে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে পড়ে।

নদীর ধারে বটতলায় সুশীতল গন্ধবণিক দোকান দিয়েছে। সেখানে গিয়ে বসলে নতুন ছাঁচবেড়ার গন্ধ নাকে আসে। মিষ্টি গন্ধটি। নদীর পাড়ে গায়ে-গায়ে বাঁশ পুঁতে মাটি ফেলে কাঁচা বাঁধ দেওয়া হয়েছে। কাঠের পাটাতনের ঘাটে নৌকো এসে লাগে। বড় নৌকো, ছোট নৌকো। মাল্লারা নৌকো ঘাটে বেঁধে উঠে আসে। মানুষজন মাল খালাস করে। আবার বোঝাইও হয়। ছোট নৌকোয় দূর গ্রামগঞ্জের যাত্রীরা গিয়ে ওঠে। কারও মাথায় খোলা ছাত। নদীর জলের আঁশটে গন্ধ আসে। হুহু বাতাসও।

সুশীতলের দোকানে বসে খবরের কাগজটা ভালো করে পড়া যায় না। বাতাসের চোটে বড়- বড় পাতা ওলটপালট খায়। তা ছাড়া আছে কিছু বেহায়া লোক, খবরের কাগজ

দেখলেই যারা হাত বাড়িয়ে বলে—কাগজটা একটু দেবেন, দেখব?

খবরের কাগজে শ্যামাচরণ যে কী খোঁজে তা সে নিজেও ভালো করে জানে না। কিন্তু প্রতিদিন আগাপাস্তালা কাগজটা সে যখন খুঁটিয়ে পড়ে তখন তার মনটা যেন কিছু একটা খোঁজে।

গন্ধবণিকের দোকানে সাত গাঁয়ের লোক আসে। তাদের কেউ বা শ্যামাচরণের চেনা, কেউ আধচেনা, কেউ একেবারেই অচেনা। গঞ্জের বাজারে সকলের ট্যাঁকের টিঁকি বাঁধা। আলু সুপুরি ধান পাট যা-যা আছে সব নৌকো বোঝাই করে নিয়ে আসে। ঘাটে খুব জটলা হয়। তারপর মানুষজন একটু দম নিয়ে ঘাটের দোকানে-দোকানে গিয়ে বসে, চা খায়, গল্পসল্প করে, কাজ-কারবারের খবর আদান-প্রদান হয়।

ঘাটের ধারে বসে থাকতে শ্যামাচরণের বেশ লাগে। এই বসে থাকতে-থাকতেই কত লোকের সঙ্গে চেনা-জানা হয়ে যায়, কত নতুন-নতুন খবর শোনে, অচেনা জায়গার বিবরণ পেয়ে যায়, নতুন সব চরিত্রকে জানা হয়। গন্ধবণিকের পো খাতিরও করে খুব। শ্যামাচরণ যে একসময়ে জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ছিল তা বেশ মনে রেখেছে সুশীতল।

তবে সেসব কথা শ্যামাচরণ নিজেই ভুলে যায়। তার জীবনটা হল বসতি উঠে যাওয়া গাঁয়ের মতো। সেখানে এককালে অনেক লোক গমগম করে বাস করত, এখন সব বাস-বসত তুলে নিয়ে গেছে। ফাঁকা।

গৌরী হল শ্যামাচরণের বড় মেয়ে। প্রথম পক্ষের। আরও দুটো ছেলেমেয়ে আছে তার। তারা দ্বিতীয় পক্ষের। রেবন্ত হল তার একমাত্র ছেলে, ফরাসডাঙা কলেজের লেকচারার। ছেলে সেখানে বউ নিয়ে থাকে, কালেভদ্রে আসে, মাসান্তে পঁচাত্তরটা টাকা পাঠিয়ে খালাস। ছোট মেয়ে পার্বতী তার স্বামীর সঙ্গে নবাবগঞ্জে থাকে। চিঠিটাও লেখে না।

বড় মেয়ে গৌরীরই যা একটু টান ছিল বাপের ওপর বরাবর। সে শ্বশুরবাড়ি থেকে যখন-তখন চলে আসত বাপকে দেখতে। বরকে লুকিয়ে টাকা পাঠাত বাবাকে। তিন সন্তানের মধ্যে গৌরীর ওপরে শ্যামাচরণের টান ছিল সবচেয়ে বেশি।

গৌরীর বর সোমনাথ ছিল পুলিশের এএসআই। ছেলে হিসেবে ভালোই। অতি সুপুরুষ, সাহসী, সৎ। প্রাণে দয়ামায়া ছিল, ভক্তি ছিল। খড়গপুর লাইনে এক রাত্রে গাড়ি লাইন ছেড়ে মাঠে নেমে গেল। ছ'খানা বগি উলটে বিশজন মানুষ দলা পাকিয়ে একশা। সেই দলা পাকানো মানুষের মধ্যে একজন ছিল সোমনাথ।

কিন্তু সোমনাথই কি? শ্যামাচরণের এই সন্দেহটা আজও যায়নি। সে ট্রেনে সোমনাথ ছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু তার লাশ শেষপর্যন্ত কেউ সনাক্ত করতে পারেনি। একটা ভাঙাচোরা থ্যাঁতলানো লাশ তাদের হাতে সৎকারের জন্য তুলে দেওয়া হয়েছিল বটে কিন্তু সেই লাশটার নাকের বাঁ-পাশে কোনও আঁচিল ছিল না। অথচ সোমনাথ হলে আঁচিলটা থাকার কথা।

গৌরীকে কথাটা ভেঙে কোনওদিনই বলেনি শ্যামাচরণ। বলে দিলে গৌরী হয়তো খুব আশায় আবার বুক বাঁধবে। আসলে সে লাশটা না হোক, সেই দুর্ঘটনায় দলা পাকানো অন্য লাশগুলোর মধ্যে একটা-না-একটা সোমনাথের হবেই। কারণ, বেঁচে থাকলে সে নিশ্চয়ই ফিরে আসত এতদিন। মরেই গেছে, তাই তার আঁচিলটার কথা শ্যামাচরণ তোলেনি।

গৌরী কিছু টাকা পেয়ে গেল। থোক কয়েক হাজার টাকা। সেই টাকা পেয়ে সোজা বাপের বাড়িতে উঠল এসে। সেই বছরই শ্যামাচরণের চাকরির একসটেনশন শেষ হয়ে গেল। নদীর ধারে এই বড় গঞ্জে চাকরির শেষ পাঁচ-ছ'বছর কেটেছে, তাই এখানেই ছোট মতো একটা বাড়ি সস্তায় পেয়ে কিনে ফেলেছিল সে। শেষ জীবনটা নির্ঝঞ্ঝাটে কাটাবে ইচ্ছে ছিল। কিন্তু ঠিক শ্যামাচরণের অবসরের জীবন শুরুর মুখে পাহাড় প্রমাণ ঝঞ্ঝাট বুকে করে গৌরী এল।

শ্যামাচরণের স্ত্রী গৌরীকে খুব ভালো চোখে দ্যাখে না। দুই ছেলে-মেয়ে নিয়ে গৌরী বাপের ঘাড়ে ভর করেছে। দেখে শ্যামাচরণের স্ত্রী ক্ষমা বড় মনমরা হয়ে গেল। সেই থেকে সংসারে শান্তি নেই। সৎমাকে ভয় খাওয়ার মেয়ে তো আর গৌরী নয়। সে পাঁচ কথা শোনাতে জানে। ক্ষমারও গলায় তেজ আছে।

তাই শ্যামাচরণ শোক ভুলে এখন বাড়ির বাইরেই থাকে বেশি। বাড়িতে যেটুকু সময় থাকে নাতি-নাতনি নিয়ে কেটে যায়। আর জীবনের বড় সময়টা কাটে কী যেন একটা খুঁজে।

আজকাল অশান্তির ভার তার পরিপূর্ণ হয়েছে। গৌরীর বয়স বেশি নয়। পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বড়জোর। চেহারাটা এখনও ঢলঢলে। এক নজরে তেইশ-চব্বিশের বেশি মনে হয় না। একে বয়সটা খুব নিরাপদ নয়, তার ওপরে সৎমায়ের সঙ্গে ঝগড়া। দুইয়ে মিলিয়ে মেয়েটা মধ্যে একটা খারাপ রোগ চেপেছে। রাজ্যের ছেলে-ছোকরাকে টলায়। তাদের মধ্যে একজন আছে কাদাপাড়ার ভূষির পাইকার বিনয় হালদারের মেজছেলে। ডান হাতে ঘড়ি বেঁধে মোটরবাইক হাঁকিয়ে যখন-তখন আসে, গৌরীর সঙ্গে হিহি হোহো আড্ডা মারে, ক্যারিয়ারে চাপিয়ে নিয়ে যায় এধার-ওধার। গঞ্জে ঢিঢি।

শ্যামাচরণ আজকাল নিজের সঙ্গেই কথা বলে বেশি, যখন কথা বলার আর লোক পায় না। বুড়ো মানুষের কথা শোনবার জন্য কে-ই বা কাজ-কারবার ফেলে বসে থাকবে?

গঞ্জের ঘাটটা সেদিক দিয়ে বড় ভালো। নদীতে স্রোত আছে, জীবনটাও এখানে বেশ বয়ে যায়। কিছু গড়ায় না, থেমে থাকে না।

গোবিন্দনগর থেকে বেগুনের চাষি মফিজুল মাল গস্ত করতে এসেছে। চা খেতে-খেতে বলল—এবার একদম জল হল না। পোকায়-পোকায় সাড়ে সর্বনাশ।

সাড়ে সর্বনাশ কথাটা মফিজুলের নিজের। সর্বনাশের ওপর আরও কিছু বোঝায়।

সে জলের জন্য নয়। তুমিও যেমন, বাসন্তীর মাস্টারমশাই হরিপদ বলে—এ হল কেমিক্যাল সারের গুণ। যত সার তত পোকার উৎপাত। আবার পোকা মারতে ওষুধ কেনো। এসব হচ্ছে বড় ব্যাবসাদারের কৌশল বুঝলে! সার দিয়ে পোকা জন্মাচ্ছে, আর সেই পোকা মারতে বিষও কেনা করাচ্ছে। দুমুখো লাভ!

মফিজুল শ্যামাচরণের দিকে চেয়ে আছে—হাকিম সাহেব, কী বলেন?

শ্যামাচরণ কী আর বলবে? জগৎ-সংসারের খবর এখন আর সে তেমন রাখে না। যে যা বলে তাই হক কথা বলে মনে হয়। এমনকী আজকাল ভূতের গল্প শুনে 'হুঁ' দেয়, মনটা ওই একরকম ধারা হয়ে গেছে। সেই লাশটার মুখে আঁচিল ছিল না—একথাটা আজকাল বড় মনে পড়ে।

শ্যামাচরণ বসে চাষি সঙ্গীদের কথা শোনে, দু-চারটে কথা নিজেও বলে। বাদবাকি সময় খবরের কাগজ দেখে। তার বড় মনে হয়, কাগজে কি একটা খবর যেন বেরোবার কথা। মনে মনে সে কতকাল ধরে সেই খবরটার জন্য অপেক্ষা করছে। খবরটা বেরোচ্ছে না।

গন্ধবণিকের দোকান থেকে ভরদুপুরে ফিরছিল শ্যামাচরণ। চৌপথীতে কদমতলায় একপাল কেষ্ট দাঁড়িয়ে ফষ্টিনষ্টি করছে। তারা শ্যামাচরণকে দেখে গলা খাঁকারি দেয়। একটা বদমাশ ছেলে আওয়াজ দিল—গঙ্গারামকে পাত্র পেলে?

বিনয় হালদারের ছেলের নাম গঙ্গাপ্রসাদ। শ্যামাচরণ মাথাটা নামিয়ে জায়গাটা পার হয়ে যায়।

বাজারের মুখে বুড়ো নীলমণি দাসের সঙ্গে দেখা। নীলমণি লোকটা খুব আদর্শবাদী, স্বদেশি করত, একবার এমএলএ-ও হয়েছিল, শ্যামাচরণ হাকিম থাকবার সময় থেকে ভাব।

নীলমণি দাঁড়িয়ে পড়ে বলল—শ্যামা যে! কোন দিকে?

—বাড়িই যাই।

—সে যাবে। বাড়ি পালাবে না, কথা আছে।

শ্যামাচরণ কথা শুনতে উৎসাহ পায় না আজকাল। ভালো কথা তো কেউ বলে না। তাই নিরাসক্ত গলায় বলে—কীসের কথা?

নীলমণি গলা নামিয়ে বলে—আজও ওদের দেখলাম। ভটভটিয়ায় জোড়া বেঁধে কুঠিঘাটের দিকে যাচ্ছে। এই একটু আগে। ওদের যে কারও পরোয়া নেই দেখায়।

ওরা বলতে কারা তা শ্যামাচরণ জানে। তাই উদাসভাবে নীল আকাশের দিকে চেয়ে বলে—তা তো দেখছই। আমার আর কী করার আছে বলো? চাও তো বলো, গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়ি একদিন।

—আরে রাম রাম। তুমি ঝুলবে কেন? কিন্তু বিহিতের কথা ভাবছ কিছু?

—আমার মাথায় আজকাল কিছু আসে না।

—আমি বিয়ের কথাও ভেবে দেখেছি বুঝলে? কিন্তু তোমার মেয়ে তো বয়সেও ছোঁড়াটার চেয়ে বড়। তা ছাড়া হালদারমশাই তো খেপে আগুন হয়ে আছেই।

শ্যামাচরণ শ্বাস ফেলে বলে—সবই অদৃষ্ট। অকালে জামাইটা যে কেন—

বলেই শ্যামাচরণ ফের চমকে ওঠে। মনে পড়ে, লাশের মুখে সেই আঁচিলটা ছিল না। কথাটা আজও বলা হয়নি গৌরীকে। না বলাটা ঠিক হচ্ছে না।

কবে মরে-টরে যাবে শ্যামাচরণ, একটা সত্য কথা তার সঙ্গেই হাপিস হয়ে যাবে তাহলে। বাড়িমুখো হাঁটতে থাকে। বগলে ভাঁজ-করা খবরের কাগজটা, বেশ কি একটা বলি-বলি করে। কিন্তু কোনওদিনই বলে না, দুপুরে খাওয়ার পর আজ আবার খবরের কাগজটা তন্নতন্ন করে খুঁজবে শ্যামাচরণ। খবরটা থাকার কথা।

বাড়ি ফিরে স্নান খাওয়া সারতে বেলা চলে গেল। মেয়েটা এখন বাড়ি ফেরেনি। নাতি-নাতনি দুটো স্কুল থেকে আসবে এখন। বিছানায় শুয়ে এপাশ-ওপাশ করে শ্যামাচরণ। বউ ক্ষমা এঁটোকাঁটা সেরে এসে বিছানার একপাশে বসে বলে—আর তো মুখ দেখানো যাচ্ছে না।

ক্ষমার বয়স হয়েছে, সাধ-আহ্লাদ বড় একটা করেনি জীবনে। সংসারে জান বেটে দিচ্ছে বিয়ের পর থেকে। আজকাল শ্যামাচরণের বড় মায়া হয়।

ঘড়ি দেখে শ্যামাচরণ উঠে বসে বলে—হরিদ্বারে যাবে?

—যাহোক কোথাও চলো চলে যাই। তোমার আদরের মেয়ে সুখে থাক।

—কে দেখবে ওকে?

—আহা! দেখার ভাবনা? কাঁড়ি-কাঁড়ি টাকা আছে ওর। জামাই মরে গিয়েও তো কত টাকা হাতে এসেছে।

—তা বটে! বলেই ফের লাশের ভাঙাচোরা বিকৃত মুখ মনে পড়ে। আঁচিলটা ছিল না সেই মুখে। তবে কি—?

অনেক রাতে গৌরী পাশ ফিরতে গিয়ে জেগে ওঠে। কে যেন চাপাস্বরে ডাকল।

—কে?

শ্যামাচরণ জানালার বাইরে জ্যোৎস্নায় দাঁড়িয়ে। চাপা গলায় বলল—আমি তোর বাবা। শোন।

—বাবা! অবাক হয়ে বিছানা ছেড়ে গৌরী উঠে আসে, ওমা, তুমি বাইরে কেন? কী হয়েছে?

শ্যামাচরণের মুখচোখ জ্যোৎস্নায় অন্যরকম দেখায়। চোখের বসা কোল বাটির মতো, তাতে টুপটুপে ভরা অন্ধকার। চোখের তারা থেকে জ্যোৎস্নার প্রতিবিম্ব ঝিকমিক করে।

শ্যামাচরণ বলে—তার মুখে সেই আঁচিলটা ছিল না।

—কে? কার কথা বলছ?

শ্যামাচরণ বলে, বহুকাল ধরে চেপে রাখা গোপন কথাটা বুক থেকে বেরিয়ে যায়।

গৌরী জানলার শিকটা চেপে ধরে। তারপর আস্তে-আস্তে পাথর হয়ে যায়।

পরদিন শ্যামাচরণ আবার গন্ধবণিকের দোকানে গিয়ে বসে। বিশাল নদীর ওপর ফুরফুর করে নীল আকাশ। নৌকো আসে, নৌকো যায়। ব্যাপারীদের হট্টরোল ওঠে চারধারে।

শ্যামাচরণ খবরের কাগজ খুলে তন্নতন্ন করে খবরটা খোঁজে। পায় না। ব্যাপারীরা এসে গল্প রাঙিয়ে তোলে। হাওয়া দেয়। চায়ের গন্ধের সঙ্গে নদীর আঁশটে গন্ধ গুলিয়ে ওঠে।

*

আজ সারাদিন গৌরী বেরোয়নি। কারও সঙ্গে দেখা করেনি। কথা বলেনি। সারাদিন শুধু ঘরে শুয়ে কেঁদেছে।

দুপুরে বাড়ি ফিরে শ্যামাচরণ একই খবর পেল। গৌরী নিজের ঘরে শুয়ে কাঁদছে।

শ্যামাচরণ কাউকে কিছু বলল না। ক্ষমা প্রশ্ন করে হাঁপিয়ে যায়।

খেয়ে উঠে শ্যামাচরণ খবরের কাগজটা গৌরীর ঘরের জানালা গলিয়ে ভিতরে ফেলে দিয়ে চাপা গলায় বলে—সব খবর তো কাগজেই থাকে। রোজ দেখিস তো।

গৌরী প্রথমে কথা বলে না। কিন্তু অনেকক্ষণ বাদে উঠে চোখ মুছে খবরের কাগজটা পড়তে থাকে। কেন পড়ে তা বুঝতে পারে না। জগতটা সম্পর্কে আবার তার ভীষণ আগ্রহ জেগেছে।

শ্যামাচরণ বিকেলে ঘুম থেকে উঠে ক্ষমাকে বলে—কাল থেকে একটা ইংরেজি খবরের কাগজও দিতে বোলো তো কাগজের ছেলেটাকে। কত খবর থাকে। একটা কাগজে সব পাওয়া যায় না।

তৃতীয় পক্ষ

একদম আনকোরা, টাটকা, নতুন বউকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছিল কনিষ্ক গুপ্ত। বউয়ের নাম শম্পা। শম্পার সঙ্গে বিয়ের আগে কখনও দেখা হয়নি গুপ্তর। প্রেম-ট্রেমের প্রশ্নই ওঠে না, এমনকী বিয়ের আগে শম্পাকে চোখেও দেখেনি। একটা ফটোগ্রাফ অবশ্য পাঠিয়েছিল ওরা কিন্তু সেটাও স্পর্শ করেনি।

বিয়ের আগে গুপ্তর একটা প্রেম কেঁচে যায়। সে বিয়ে করতে চেয়েছিল মলি নামে এক স্কুল-শিক্ষিকাকে। মলি দেখতে-শুনতে যাই হোক, স্বভাব যেমন ধারাই হয়ে যাক না কেন, গুপ্ত তাকে ভালোবাসত। মলিরও গুপ্তর প্রতি ভালোবাসার অভাব দেখা যায়নি কখনও।

কিন্তু ঠিক মাসছয়েক আগে এক বিকেলে ভিক্টোরিয়ার বাগানে বসে মলি গুপ্তকে একটা সদ্য চেনা চৌকস ছেলের বিবরণ দিয়েছিল, ছেলেটা নাকি দুর্দান্ত স্মার্ট, আইএএস দিয়েছে এবং নির্ভুল ইংরেজি গড়গড় করে বলতে পারে। গুপ্ত এর কোনওটাই পারে না। সে একটা কলেজের দর্শনের অধ্যাপক, কিন্তু অধ্যাপনায় তার একদম সুনাম নেই। বরং ছাত্ররা তার ক্লাস কামাই করে, একবার তার বিরুদ্ধে জয়েন্ট পিটিশনও দিয়েছিল অধ্যক্ষের কাছে।

তাই মলির মুখে এক অচেনা ছেলের চৌকসের বিবরণ শুনে সে একটু নার্ভাস হয়ে যায়। প্রেমের ক্ষেত্রে কোনওরকম প্রতিদ্বন্দ্বিতা তার পছন্দ নয়। কারণ বরাবর গুপ্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হেরে গেছে।

ইস্কুলের নীচু ক্লাসে পড়ার সময়ে একবার সে ইস্কুল-স্পোর্টসে নাম দেয়। একশো মিটার দৌড়ে শুরুতে সে বেশ এগিয়ে গিয়েছিল, অন্তত সেকেন্ড প্রাইজটা পেতই। হঠাৎ নিজের এই আশু সাফল্য টের পেল সে। বুঝল, সে সেকেন্ড হতে চলেছে। দৌড় শেষে

ফিতেটাও খুব কাছে এগিয়ে এসেছে। কিন্তু যেই ব্যাপারটা সে টের পেল অমনি তার দুই হাঁটুর একটা হঠাৎ কেন যে আর একটাকে খটাং করে ধাক্কা মারল কে জানে! সেখানেই শেষ নয়। শোধ নিতে অন্য হাঁটুটাও এ হাঁটুকে দিল গুতিয়ে। কনিষ্ক গুপ্ত ফিতে ছুঁতে পারল না, দৌড় শেষের কয়েক গজ দূরে নিজের দুই হাঁটুর হাঙ্গামায় জড়িয়ে বস্তার মতো পড়ে গড়াগড়ি খেল।

আর-একবার আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় চোদ্দোশো সাল আবৃত্তি করার সময়ে সে এত চমৎকারভাবে কবিতাটির অন্তর্নিহিত ব্যথা ও বেদনাকে কণ্ঠস্বরে প্রক্ষেপ করেছিল সে নিজেই বুঝেছিল, প্রতিযোগিতায় তার ধারেকাছে কেউ আসতে পারবে না। শ্রোতারাও শুনছিল মন্ত্রমুগ্ধের মতো। কবিতার শেষ কয়েকটা লাইনে এসে কনিষ্ক যখন পরিষ্কার বুঝতে পারছে এক সেট রবীন্দ্র-রচনাবলীর প্রথম পুরস্কারটি তার হাতের নাগালে তখনই হঠাৎ কোথা থেকে এক ভূতুড়ে বিভ্রম এসে তার মাথার ভিতরে জল ঘোলা করে দেয়। শেষ দুটি লাইন একদম মনে পড়ল না। বারকয়েক তোতলাল সে। তারপর নমস্কার করে লজ্জায় রাঙা মুখ নিয়ে উৎসাহের আড়ালে চলে এল। একটা সান্ত্বনা পুরস্কার পেয়েছিল সেবার।

বড় হওয়ার পর একবার বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে রেসের মাঠে গিয়েছিল কনিষ্ক। রেসের কিছুই তার জানা নেই, মহা আনাড়ি যাকে বলে। সে তাই ঠিক করল সবক'টা রেসের দু-নম্বর ঘোড়ার ওপর একটা করে বাজি খেলবে।

প্রথম তিনটে রেসে খেললও দু-নম্বর ঘোড়ায়। তিনটেতেই দু-নম্বর ঘোড়া হেরে গেল। তখন এক বন্ধু বলল কি আনাড়ির মতো পয়সা নষ্ট করেছিস? দেখেশুনে বাছাই ঘোড়ার ওপর খেল!

একটু দ্বিধায় পড়ে গেল কনিষ্ক। তখন প্রায় পনেরো টাকার মতো লস চলছে। এই দ্বিধাই তার কাল হল। পরের চারটে রেসে সে বাছাই ফেবারিট ঘোড়াগুলোর ওপর বাজি ধরতে লাগল। সবক'টাতেই হার। কিন্তু শেষ চারটে রেসে প্রতিবার জিতল দু-নম্বর ঘোড়া।

প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রতিযোগিতাকে তাই বড় ভয় পায় কনিষ্ক গুপ্ত। মলির মুখে সেই অচেনা পুরুষটির প্রশংসা শুনে সে মনে-মনে খুব অস্বস্তি বোধ করতে থাকে। এতকাল মলিকে নিয়ে তার কোনও ভাবনা ছিল না। খুব সহজ ছিল সম্পর্ক।

ব্যাপারটা ভালো করে বোঝাবার জন্য সে পরদিন নিজে থেকেই সেই ছেলেটির প্রসঙ্গ তুলে বলল—মলি, কাল তুমি সুব্রত নামে ছেলেটির কথা বলছিলে তার কথা শুনতে আমার

বেশ লাগছিল। কেমন দেখতে বলো তো?

মেয়েরা গন্ধ পায়। মলি একবার সচকিত হয়ে কনিষ্কের দিকে তাকাল। আর মলির সেই সচকিত ভাবটুকু দেখে কনিষ্কও বেশ সচকিত হয়ে ওঠে। মানুষের দুর্বল গোপনীয় কোনও বিষয়ে স্পর্শ হলে মানুষ ওইরকম চমকে ওঠে। কেমন করে। কিন্তু মলির সে ভাবটা বেশিক্ষণ রইল না। আসলে সুব্রতর চালচলনে সে এত বেশি মুগ্ধ হয়েছে যে-সে কথা কাউকে না বলেই বা সে থাকে কী করে?

মলি বলল—দেখতে? ধরো ছ'ফুট লম্বা, ছিপছিপে, রং একটু কালো হলেও মুখখানা ভীষণ চালাক। এত সুন্দর হাসে!

কনিষ্ক নিজে পাঁচ ফুট পাঁচ। রোগা, ফ্যাকাশে এবং ভাবুক ধরনের চেহারা। সে আবার ভীষণ অন্যমনস্কও। প্রায় সময়েই এক কথার আর-এক উত্তর দেয়। মনে-মনে নিজের পাশে সুব্রতকে কল্পনা করে সে ঘুমিয়ে গেল।

মলির সঙ্গে সেই থেকে সম্পর্কটা আর স্বাভাবিক রইল না। মাঝখানে এক অচেনা সুব্রত এসে পরদা ফেলে দিল।

পরের এক মাস কনিষ্ক নানা জ্বলুনিতে জ্বলে গেল মনে-মনে। মলি তখন প্রায় সময়েই সুব্রতর সঙ্গে প্রোগ্রাম করে। তবে সে একথা বলত—দ্যাখো, হিংসে কোরো না যেন। কোনও পুরুষই তোমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয় আমার কাছে।

কিন্তু কনিষ্ক সে কথা মানে কী করে? সে যে অনবরত হীনমন্যতায় ভুগছে।

তাই একদিন সে তার পরিষ্কার গোটা-গোটা হস্তাক্ষরে চিঠি লিখে মলিকে জানিয়ে দিল —আমাদের আর বেশিদূর এগোনো ঠিক নয় মলি। এখানেই দাঁড়ি টেনে দেওয়া উচিত।

চিঠি লিখে সে দু-মাসের ছুটি নিয়ে বাইরে গেল বেড়াতে। এতদিনে বাড়ির লোকেরা তার বিয়ে ঠিক করল। মাত্র পনেরো দিন আগে সে সম্পূর্ণ অদেখা, অচেনা, অজানা শম্পাকে বিয়ে করেছে। বলতে কি, শম্পার সঙ্গে তার প্রথম দেখা শুভ দৃষ্টির সময়ে। ভালো করে তাকায়নি কনিষ্ক। তার মনে তখন এক বিদ্রোহ ভাব। সমস্ত পৃথিবীর প্রতি বিতৃষ্ণা, বিরাগ, ভয়।

গত পনেরো দিন সে যে শম্পার সঙ্গে খুব ভালো করে মিশেছে তা বলা যায় না। কথাবার্তা হয়েছে, পাশাপাশি এক বিছানায় শুয়েছে, প্রাণপণে ভালো ব্যবহার করার চেষ্টা করেছে মেয়েটির প্রতি। কিন্তু তা বলে তার মনে হতাশা ও সন্দেহের ভাবটি যায়নি। কেবলই মনে হয়, পৃথিবীর সর্বত্র তার চেয়ে বহুগুণে যোগ্যতর লোকেরা ছড়িয়ে আছে। সে

একটা হেরো লোক। নিজের সম্পর্কে এইসব জরুরি চিন্তা তাকে এত বেশি ব্যস্ত রেখেছিল যে তার কাম তিরোহিত হয়, আগ্রহ কমে যেতে থাকে, শম্পা দেখতে কেমন তাও সে বিচার করে দেখেনি।

কনিষ্কর মা আজ সকালে তাকে ডেকে বললেন—খোকা, বউমা, কেন লুকিয়ে-লুকিয়ে কাঁদে রে? তোর কি বউ পছন্দ হয়নি?

কনিষ্ক মুশকিলে পড়ে বলে, তা নয়। আমি তো ভালো ব্যবহারই করি।

—শুধু ভালো ব্যবহারেই কি সব মিটে যায় বাবা? পুরোনো কথা ভুলে এবার নতুন করে সব শুরু করে দাও। যাকে ঘরে এনেছ তার দিকটা এবার দ্যাখো। বউ তো ক্রীতাদাসী নয়, তার মনের দিকে নজর দিতে হবে।

—কী করব মা? আমার হইচই ভালো লাগে না।

—হইচই করতে হবে না, আজ বিকেলে বউমাকে নিয়ে বেড়াতে যা। দ্বিরাগমন সেরে আসবার পর দুজন মিলে তো কোথাও গেলি না দেখলাম।

অনেক ভেবেচিন্তে প্রস্তাবটা গ্রহণ করল কনিষ্ক। আসলে মলি বা সুব্রতর কথা ভাবার কোনও মানেই হয় না। কেন না এই নতুন অবস্থায় সে আর পুরোনো সম্পর্কের মধ্যে ফিরে যেতে পারে না।

সিনেমা দেখার কথা ছিল, কিন্তু টিকিটি পাওয়া যায়নি। তাই নিছক ঘুরে বেড়ানোর জন্যই দুজনে বেরিয়েছে। কথা আছে, আজ রাতে বড় কোনও রেস্টুরেন্টে দুজনে রাতের খাওয়া সেরে একেবারে বাড়ি ফিরবে।

কনিষ্ক ট্যাক্সি নিয়েছিল। টালিগঞ্জ ছাড়িয়ে খানিক দূর আসতেই শম্পা বলল, শোনো, ট্যাক্সিটা এবার ছেড়ে দাও।

—কেন?

—ট্যাক্সি করে আমাদের মতো লোক বেড়াতে যায় না। মধ্যবিত্তরা প্রয়োজনে ট্যাক্সি নেয়। বেরানোর জন্য ট্যাক্সি ভালো নয়।

—তবে কীসে যাবে? ট্রামে বাসে যা ভিড়!

—হোক। তবু ভিড় ভালো। কত মানুষ দেখা যায়।

কনিষ্ক নড়েচড়ে বলে, তুমি কি ভিড় পছন্দ করো? আমি করি না।

—ভিড় নয়, তবে মানুষ পছন্দ করি। ট্যাক্সির ভিতরে নিঝুম হয়ে বসে থাকাটা ভারী একঘেয়ে। কিছু দেখা যায় না, শোনা যায় না।

কনিষ্ক রাসবিহারীর মোড়ে ট্যাক্সি ছেড়ে দিল।

হাঁটতে-হাঁটতে শম্পা বলল, তোমাকে কিছু জিগ্যেস করতে শাশুড়ি মা আমাকে বারণ করেছেন। কিন্তু আমার একটা কথা খুব জানতে ইচ্ছে করে।

—কী?

—তুমি এত অহংকারী কেন?

—আমি অহংকারী?

—নয়?

কনিষ্ক অবাক হয়ে বলে—মোটেই নয় শম্পা। বরং আমি ঠিক উলটোটাই সব সময়ে ভাবি। আমার মনে হয়, আমি বড় অপদার্থ পুরুষ।

—সে কী! কেন?

—আমি তো তেমন স্মার্ট নই। লম্বা চওড়া নই। আমার ভিতরে হাজার রকমের ডেফিসিয়েন্সি।

শম্পা খুব খিলিখিলিয়ে হাসে। বলে—তাই নাকি! তাহলে তো তোমাকে বিয়ে করাটা মস্ত ভুল হল!

—হলই তো।

—শোনো। ভাবতে গেলে, আমারও হাজারটা ডেফিসিয়েন্সি। নিজের দোষ কোলে করে বসে থাকলে তো জীবনটাই তেতো হয়ে গেল।

শীতকালের বেলা। ক্রিসমাসের ছুটি চলছে। হাজারটা লোক বেরিয়ে পড়েছে রাস্তায়। অপরাহ্নের কোমল কবোষ্ণ রোদে আর ছায়ায় অপরূপ হয়ে আছে পথঘাট।

এই আলোয় আজ কনিষ্ক শম্পার মুখশ্রী খুব অকপট চোখে দেখল। তুলনা করে নম্বর দিলে মলি আর শম্পা প্রায় সমান-সমান নম্বর পাবে। শম্পার তুলনায় মলি কিছু লম্বা ছিল, কিন্তু সেই রকম আবার মলির চেয়ে শম্পা ফরসা। মলির শরীরে কিছু বাড়তি মেদ ছিল বলে পেটে ভাঁজ পড়ত। শম্পার সেসব নেই। মলির মুখখানা ছিল গোল ধরনের। শম্পার

মুখ লম্বাটে, লাবণ্য শম্পারই বেশি কারণ সে বয়সে মলির চেয়ে কম করে পাঁচ বছরের ছোট। বিএ পরীক্ষা দিয়েই তার বিয়ে হয়েছে।

কনিষ্কর কথাটা ভালো লাগল। নিজের দোষ কোলে করে বসে থাকাটা কাজের কথা নয়।

সে বলে, আমাকে তোমার কেমন লাগে?

—আগে বলো, আমাকে তোমার কেমন?

—শোনো শম্পা, তোমাকে কেমন লাগে তা আমি এখনও ভেবেই দেখিনি।

আচমকা শম্পা বলে—মলিকে তোমার কেমন লাগত?

কনিষ্ক থমকে যায়। অনেকক্ষণ বাদে বলে, তুমি জানলে কী করে?

—তোমার মা বলেছেন।

—মা?

—মা সব বলে দিয়েছেন আমাকে। আরও বলেছেন, আমি যেন এসব তোমাকে জিগ্যেস না করি।

শ্বাস ফেলে কনিষ্ক বলে, জিগ্যেস করে ভালোই করেছ। মলিকে আমার ভালোই লাগত। শুধু শেষদিকে—

শম্পার মুখখানা ভার হয়ে গেল। কনিষ্কর মুখচোখও লাল দেখাচ্ছে। সে বড় অস্বস্তি বোধ করে বলে, এসব কথা কী ভালো?

শম্পা বলে—ভালো নয়। কিন্তু আমাদের দুজনের সম্পর্কের মধ্যে যদি তৃতীয় কোনও লোক নাক গলায় তবে সেই তৃতীয় লোকটাকে জেনে রাখা দরকার।

অবাক হয়ে কনিষ্ক বলে—তুমি তো ভীষণ বুদ্ধিমতী। এত গুছিয়ে কথা বলো কী করে? মাথায় আসে?

শম্পার ভার মুখ হালকা হয়ে গেল। হেসে বলে—যাঃ।

—সত্যি বলছি, তুমি খুব ভালো কথা বলতে পারো। আমি পারি না।

শম্পা বলে, বাপের বাড়িতে আমাকে সবাই কটকটি বলে ডাকত। আমি নাকি ভীষণ কটকট করে কথা বলি।

হাঁটতে-হাঁটতে ওরা দেশপ্রিয় পার্ক বরাবর এসে গেল। গলার স্কার্ফটি ভালো করে জড়িয়ে শম্পা বলে—একটু চা খেতে পারলে বেশ হত। আজ যা শীত।

কাছেই একটা রেস্টুরেন্ট। কিন্তু আজ ছুটির দিন সেখানে বেশ ভিড়। বসার জায়গা নেই।

কনিষ্ক বলে—আর একটু হাঁটি চলো। পোস্ট অফিস ছাড়িয়ে একটু এগোলে বোধহয় গাছতলায় একটা দেশওয়ালি চায়ের দোকান পাওয়া যাবে।

তাই হল। গাছতলার দোকানদার দু-ভাঁড় চা বড় যত্নে এগিয়ে দেয়। শম্পা আর কনিষ্ক দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ভাঁড়ে চুমুক দেয়।

কনিষ্ক বলে—কেমন?

—বেশ গো।

কনিষ্ক খুশি হয়ে পয়সা মিটিয়ে দেয়। বলে—খিদে পেয়েছে নাকি? কিছু খাবে?

—কে খাওয়াবে? আমার তো পোড়া কপাল, কেউ পছন্দ করে না।

কনিষ্ক হেসে বলে—কটকটি, এবার কিন্তু কথা ফেইল করলে।

—কেন?

—যে চা খাওয়াল সেই খাবার খাওয়াতে পারে। আর কে খাওয়াবে?

—মলির সঙ্গে তোমার ঝগড়া হল কেন? হঠাৎ শম্পা প্রশ্ন করে।

—ঝগড়া! না, ঝগড়া হয়নি তো। ও একটা ছেলের খুব প্রশংসা করত। সেটা আমার সহ্য হত না।

—ওমা! তাই নাকি? এসব তো মা আমাকে বলেনি!

—মা জানবে কী করে? কনিষ্ক গুপ্ত বলে—মা শুধু জানত, মলির সঙ্গে আমার ভাব।

—এখন তুমি মলির কথা খুব ভাবো না? ভাবো, আমার মতো একটা বিচ্ছিরি মেয়ের সঙ্গে কেমন হট করে বিয়ে হয়ে গেল। সারাটা জীবন কেমন ব্যর্থতায় কাটবে।

কনিষ্ক খুব হতাশার ভাব করে বলে, কতগুলো ভাবনা আছে যা তাড়ানো যায় না। বিরহ ভোলা যায়, কিন্তু অপমান কি সহজে ভোলে মানুষ? কিংবা ঈর্ষা? হীনমন্যতা?

শম্পা মুখখানা করুণ করে বলে, আমাকে একটা কথা বলতে দেবে? ধরো আজ তোমার কাছে আমার খুব একটা দাম নেই। তুমি ভালোবাসতে পারছ না আমাকে। অথচ আমি তোমার কাছে কত সহজলভ্য। কিন্তু দ্যাখো, সুজন নামে একটা ছেলে আছে। তার কাছে শম্পাই হল আকাশ-পাতাল জোড়া চিন্তা। শম্পার জন্য কী জানি সে হয়তো আত্মহত্যার কথা ভাবে। পৃথিবীতে শম্পা ছাড়া বেঁচে থাকা কত কষ্টের সে জানে একমাত্র সুজন। তুমি তো কখনও জানবে না, বুঝবে না। পৃথিবীটা ঠিক এরকম নিষ্ঠুর।

চোয়াল কঠিন করে কনিষ্ক বলে, সুজন কে?

—সে একটা ছেলে। আমাকে ভালোবাসত। কোনওদিন তাকে পাত্তা দিইনি। কিন্তু আজ অনাদরের মাঝখানে থেকে তার কথা খুব মনে হয়।

কনিষ্ক স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে থাকে।

সেই রাতে শম্পা আর কনিষ্কর ভালোবাসার মাঝখানে অনেকবার মলি এসে হানা দিল, এল সুজনও। দুজনে এসে এক অদৃশ্য প্রজাপতির দুটি ডানার মতো কাঁপতে লাগল। তাতে বড় সুন্দর হল কনিষ্ক ও শম্পার ভালোবাসার নিরালা ঘরটি।
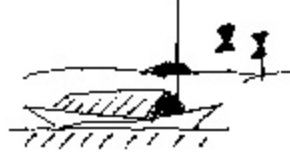
কথা

তোমাকে আমার অনেক কথা বলার আছে টুপু।

এ কথা প্রায়ই টুপুকে বলার জন্য যায় কুশল। বলা হয় না। কী করে হবে? টুপু যে বড্ড ব্যস্ত।

কুশল কলকাতায় এসেছে চার বছর। একটা বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং শেখানোর স্কুল থেকে সে লেদ মেশিনের কাজ শিখেছিল। তার বেশি আর কী করার ছিল তার? গাঁয়ে তার বাবা মারা গেছে, কিন্তু চাষবাসের জমি আর অল্প-অল্প কিছু জীবনবিমার টাকা পেয়েছিল। তাও ভাগীদার অনেক। বিধবা মা আছে, এক দাদা আর-এক ভাই আছে, ছোট একটা বোনও। দাদা চাষবাসও দ্যাখে, সেই থেকেই সংসার চলে। কুশল কলকাতায় এসেছিল ভাগ্যের অন্বেষণে। তেমন কিছু হয়নি তার। তবে মাথাটা পরিষ্কার বলে সে মেশিনের কাজ খুব তাড়াতাড়ি শিখে নেয়। কিন্তু কাজ পাবে কোথায়? মূলধনও নেই যে ব্যাবসা করবে। সেই ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলের মালিক সুধীর ভদ্র তখন তাকে ডেকে বলে— তোমার তো বেশ পাকা মাথা, কাজ না পেলে আমার এখানেই শেখাতে লেগে যাও বাপু, হাতখরচ পাবে, থাকার জায়গাও দেব।

এক অনিচ্ছুক মামাবাড়িতে প্রায় জোর করে থাকত কুশল। তারা তাড়াতে পারলে বাঁচে। কিন্তু কুশল বড় মিষ্টভাষী আর সৎ চরিত্রের বলে একেবারে ঘাড় ধাক্কা দিতে পারছিল না। কিন্তু কুশলের বড় লজ্জা করত। থাকার জায়গা পেয়ে সে এবার উঠে এল হ্যারিসন রোডের স্কুলের বাড়িতেই।

তো এই হচ্ছে কুশলের অবস্থা। একশো টাকার কাছাকাছি তার রোজগার। থাকার জায়গার ভাড়া লাগে না, নিজে রেঁধে খায়। কষ্টে তার চলে যায়। তবে কুশল সবসময়েই জীবনের আলোকিত দিকগুলোই দেখতে পায়। যেন জগৎ সংসারকে দুভাগ করে একটা সৌভাগ্যের আলো আর দুর্ভাগ্যের অন্ধকার পাশাপাশি রয়েছে। অন্ধকারে যারা আছে তারা

আলোর দিকে চলে যাওয়ার চেষ্টা করে, আবার আলো থেকে অন্ধকারেও কাউকে-কাউকে চলে আসতে হয়। কুশল তাই কখনও হাল ছাড়ে না। কিছু হবে, কিছু একটা হবে। হবেই।

তাই এই অন্ধকারের জীবনে ফুলগন্ধের মতো, জ্যোৎস্নার মতো একটাই আনন্দ আছে। সে হল টুপু।

তাদের গাঁয়ের পুরুতবাড়ির মেয়ে ছিল। বড় সুন্দর দেখতে। কত ছোট্ট ছিল। টুপু এখন কলকাতায় এসে খুব অন্যরকম হয়ে গেছে। খুব অল্প আয়াসেই টুপু তার দুর্ভাগ্য জয় করে আলোর দিকে চলে গেছে। সিনেমার অভিনেত্রী হিসেবে তার খুব নামডাক। তার অনেক ভক্ত, অনেক চাহিদা।

কুশলের তাতে কিছু যায় আসে না। সে মাঝে-মাঝে টুপুদের হিন্দুস্থান রোডের বাড়িতে যায়। টুপুর মা আছে, বাবা আছে, একটা ভাইও আছে। তারা এখন সব বড়লোকের মতো থাকে। ছোট্ট বাগান ঘেরা তিনতলা বাড়ি, গেটে দারোয়ান, শিকলে বাঁধা কুকুর, হুট বলতে ঢোকা যায় না।

তবু কুশল ঠিকই ঢোকে। আর আটকায় না। ওরা যে তাকে অনাদর করে তা নয়, উপেক্ষাও করে না। আবার খুব একটা আদর অ্যাপায়নও নেই।

যেমন ওর বাবা বলে—ওঃ কুশল! কী খবর?

মা বলে—কী বাবা, কেমন! খবর সব ভালো?

তার পরই আর তেমন কথা-টথা হয় না।

কুশল দেখতে খুব সুন্দর নয়, আবার খারাপও নয়। সিনেমার নায়ক হিসেবে তাকে মানায় না ঠিকই, কিন্তু রাস্তায় ঘাটে দু-চারজন তার দিকে তাকিয়ে দেখে। মেশিন চালিয়ে তার চেহারা মেদহীন এবং পোক্ত। মুখশ্রীতে বুদ্ধি এবং অসম্ভব ভালোমানুষির ছাপ আছে। সুধীরবাবু টাকাপয়সার বিষয়ে চোখ বুজে তাকে বিশ্বাস করেন।

টুপুর সঙ্গে খুব কমই দেখা হয়। বেশিরভাগ সময়েই তাকে বাইরে থাকতে হয়, নয়তো বাড়িতে ঘুমোয়, নয়তো বন্ধুবান্ধব নিয়ে হইচই করে। তবু দেখা হলে সে-ই সবচেয়ে আন্তরিক ব্যবহার করে। বলে—কুশলদা, আজ বাড়িতে খেয়ে যেও। তোমার দাদা কী করছে এখন? মা কেমন আছে? পুন্তিকে অনেককাল দেখি না। তার তো বিয়ের বয়স হল।

পুন্তি কুশলের ছোটবোনের নাম। এসব টুপুর মুখে শুনতে বড় ভালো লাগে।

কুশল বড় লাজুক। টুপুর সুন্দর মুখখানার দিকে ভালো করে চাইতে পারে না। মাথা নত করে বলে—আমরা বড় গরিব হয়ে গেছি টুপু।

টুপু বলে—আহা, কী কথা। গরিব হওয়া কি অপরাধ নাকি! এই বলে সান্ত্বনা দেয় টুপু। কখনও বলে—তোমার যদি টাকার দরকার হয় তো নিও কুশলদা, লজ্জা কোরো না।

—না, না, টাকার দরকার নয় টুপু। এই মাঝে-মাঝে তোমাদের দেখে যাই শুধু। বেশ লাগে।

—দেখে যেও। আমাদেরও ভালো লাগে। তুমি যেন কী করো কুশলদা?

—একটা ইঞ্জিনিয়ারিং কনসার্নে ইনস্ট্রাকটর।

—ও বাবা, সে তো ভালো চাকরি! বলে টুপু ভ্রূ তোলে।

মিথ্যে কথা বা ফাঁপানো কথা কুশলের মুখে আসে না। তাই সে টুপুর ভুল ধারণা ভাঙার জন্য তাড়াতাড়ি বলে—না, না, সে খুব ছোট্ট একটা কারিগরি স্কুল, আর ইনস্ট্রাকটর বলতে—

কিন্তু অত কথা শোনার সময় টুপুর প্রায়ই হয় না। হয়তো চাকর এসে খবর দেয় যে গাড়ি তৈরি হয়ে অপেক্ষা করছে। কিংবা ছুকরি একটা সেক্রেটারি এসে কোনও অ্যাপয়েন্টমেন্টের কথা মনে করিয়ে দেয়।

আসল কথাটাই বলা হয় না।

অবশ্য কথাটা যে কী তা আজও ভালো জানে না কুশল। কেবল তার মন বলে—তোমার সঙ্গে আমার যে অনেক কথা ছিল টুপু।

দুই

একবছর আর তেমন অবসর পেল না কুশল। সুধীরবাবুর স্কুল থেকে একটা পুরোনো মেশিন কিস্তিবন্দিতে কিনে নিয়েছিল সে। হাওড়ায় একটা ছোট্ট ঘর ভাড়া করে ব্যাবসা শুরু করেছিল। লাভা-লাভের দিকে তাকায়নি, ভূতের মতো খেটে সে সুধীরবাবুর টাকা শোধ করে দিল সময়ের আগেই। আরও একটা মেশিন কিনল। আরও একটা।

ব্যাবসা শুরু করলে বহু মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ হয়ে যায়। সেইরকম এক যোগাযোগে সে এক কালোয়ারের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে। কিছু টাকা লাগায় তার লোহার

কারবারে, বেশ কিছু লাভ পেয়ে যায়। একবছরের মধ্যে তার গা থেকে হাঘরের ভাবটা ঝরে গেল।

টুপুর বাড়িতে একদিন মিষ্টি-টিষ্টি নিয়ে দেখা করতে গেল।

টুপুর বাবা ইতিমধ্যে মারা গেছেন। তার মা খুব বিষণ্ণ মুখে একটু খবরাখবর নিলেন।

বললেন—বাবা, আর তো দেখি খোঁজ নাও না!

—সময় পাই না পিসি। বড্ড কাজ। অভাব দূর করার চেষ্টা বড় মারাত্মক, হাড়মজ্জা শুষে নেয়।

—সে তো জানি বাবা। তবু বলি, অভাবই ভালো। প্রাচুর্য মানুষকে বড় অমানুষ করে দেয়।

কথাটার মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত ছিল। কিন্তু পরিষ্কার বুঝল না কুশল।

—সুখে থেকো, সৎ থেকো। এই বলেন টুপুর মা।

টুপুর সঙ্গে দেখা হল না। সে ঘুমোচ্ছে। ভীষণ ক্লান্ত।

সেই কথাটা আজও টুপুকে বলা হয়নি। কী কথা তা অবশ্য সে নিজেও জানে না। হয়তো সে বলতে চায়—তুমি খুব সুন্দর টুপু। কিংবা—আমি তোমাকে ভালোবাসি টুপু।

বলেই বা কী হবে? এসব তো কত লোকেই টুপুকে বলে। তবু বলতে ইচ্ছে করে কুশলের।

লোহার ব্যাবসা খুব ভালো লাগছিল না তার। একেই অংশীদারি তার পছন্দ নয়, তার ওপর আয় এক জায়গায় উঠে আটকে যায়। তাই সে মূলধন তুলে নিয়ে লিলুয়ায় নিজের মতো ছোট্ট ঢালাইয়ের কাজ শুরু করল। লোহার বড় টানাটানি বাজারে। মাল দিয়ে কুলিয়ে উঠতে পারে না। টাকাও আসে। তবু ঠিক খুশি হতে পারে না সে। একটা কাটিং মেশিন নিলামে কিনল। পাঁচ রকম ব্যাবসার কাজে টাকা ঢালতে লাগল। বড় ভাই চাষবাস নিয়ে রইল বটে, কিন্তু ছোট ভাইটাকে আনিয়ে নেয় কুশল। দুই ভাই মিলে সাংঘাতিক খাটে।

টুপুর বাড়িতে যেতে সেদিন দেখা হয়ে গেল।

—আরে কুশলদা, কেমন আছ? তোমাকে খুব অন্যরকম দেখাচ্ছে।

—না-না। দাড়ি কামিয়েছি তো, তাই।

—তার চেয়ে কিছু বেশি। বলে টুপু হাসে—তোমার উন্নতি হচ্ছে বোধহয়। চেহারায় ছাপ পড়েছে।

কুশল বলে—তোমার চেহারা একটু খারাপ দেখছি টুপু। কী হয়েছে?

—কী হবে? বড্ড ডায়েটিং করতে হয়। খাটুনিও তো খুব!

—আজকাল তোমার ছবি বড় একটা দেখি না তো।

—হচ্ছে। অনেক হচ্ছে। এই বলে টুপু খুব অস্থিরতা আর চঞ্চলতার সঙ্গে একটা সিগারেট ধরায়।

ভীষণ অবাক হয় কুশল। চেয়ে থাকে।

—কিছু মনে কোরো না কুশলদা। নার্ভের জন্য খাই। আমার নার্ভ বড্ড সেনসিটিভ, ধোঁয়ায় একটু শান্ত থাকে।

—বেশি খেও না। দমের ক্ষতি হয়। খুব ভালো আর শান্ত গলায় কুশল বলে।

—বেশি না। মাঝে-মাঝে খাই, নেশা-টেশা নেই।

আসলে নেশাই। কুশল সেটা টের পায়।

টুপুর মা দেখা হতে অনেকক্ষণ অন্য কথা বলে তারপর বলেন—বাবা, পেটের মেয়ে, পণ্ডিত বংশের সন্তান, বলতে নেই টুপু আজকাল মদও খায়। ভীষণ মাতলামি করে। কাউকে বোলো না।

অনেকক্ষণ ভেবেচিন্তে কুশল বলে—পিসি, খায় তো খাক। তুমি বেশি ঝগড়া-টগড়া কোরো না এ নিয়ে। ওর কাজের স্ট্রেন তো হয়, তাই খায়। ওকে রেস্টোরেটিভ বলে, মদ-খাওয়া নয়।

—তুমি বাবা, সব কিছুর ভালো দ্যাখো। আমি দেখি না। ছেলেটাও সিনেমার লাইনে ঢুকবে-ঢুকবে করছে। বারণ করি, শোনে না।

কুশল আবার ভেবে বলে—টুপুর বুঝি আর তেমন চাহিদা হচ্ছে না পিসি? আজকাল ওকে নিয়ে ছবি হয় না তো।

—হয় না তো কী করবে! জীবনে ওঠা-পড়া আছেই। আমি বলি, এবার ভালো আর সৎ দেখে পাত্র খুঁজে বিয়ে করে ফেলুক। সিনেমার নটী সাজা ঢের হল। ওদের বামুন-পণ্ডিতের বংশের রক্তে কি ওসব সয়!

ভাবতে-ভাবতে কুশল চলে আসে।

স্কুলে থাকতে কবিতা পড়েছিল, সন্ন্যাসী উপগুপ্তর সঙ্গে বাসবদত্তার প্রেম হয়েছিল বুঝি! তো টুপুর সঙ্গে একদিন কি তার সেরকমই হবে?

হতেও পারে।

তিন বছরের মাথায় কুশল দেখল, তার অনেক টাকা। শুধু হয়েছে নয় আসছেও।

ঢালাইয়ের কারখানার জায়গা বদল হয়েছে। ছোট্ট কিন্তু বেশ ভালো একটা ফাউন্ড্রি খুলে ফেলেছে দুই ভাই। দেশের বাড়ি মস্তবড় করে করেছে। পুকুর কাটা হয়েছে। চাষের জমিও কিনেছে অনেক। দাদা সেসব দেখাশোনা করছে। কাজের সুবিধের জন্য একটা গাড়ি কিনে ফেলেছে কুশল।

সেই গাড়িতে একদিন গেল টুপুর বাড়ি।

টুপু সব দেখে বলল—কুশলদা, তুমি সত্যিই উন্নতি করেছ।

—আরে না, না। কোম্পানির গাড়ি।

—ওই হল। কোম্পানি তো তোমারই।

কুশল লজ্জা পায়। বড়লোকি দেখাতে সে তো আসে না। সে আসে টুপুকে একটা কথা বলবে বলে।

আজও বলা হয়নি।

তিন

টুপু একজন প্রডিউসারকে বিয়ে করল, কুশল খবর পায় এক পত্রিকায়।

গিয়ে দেখে মা খুব খুশি নয়।

বললেন—দোজবরে বাবা, আগের বউকে বিদেয় করেছে। তা টুপুকেই কি রাখবে। বড় ভয় করে। বড়লোকি বিয়ে আমার একদম পছন্দ নয়। বিয়ে ওরা করে না। আসল বিয়ে হয় মধ্যবিত্ত পরিবারে।

পিসি বলেছিল অদ্ভুত।

ওরা হানিমুন করতে জাপান না কোথায় গিয়েছিল। ঠিক তিন মাস বাদে ফিরে এসেই টুপু তার বরকে ডিভোর্স করে।

খবর পেয়ে ছুটে গেল কুশল।

—কী হল টুপু? বিয়ে ভেঙে দিলে?

—দিলাম। ওর হৃদয় নেই।

—আগে জানতে না?

—জানতাম। তবু ঢুকে দেখলাম আছে কি না।

—ঢুকতে গেলে কেন টুপু? শরীরটা খামোখা এঁটো করলে।

মুখ ফসকা কথা। কুশল জিভ কাটল।

কিন্তু টুপু রাগ করল না। খুব অন্যমনস্ক হয়ে বলল—ঠিক বলেছ। এঁটো হয়ে এলাম। তবে অনেক টাকা পেয়েছি।

কুশল বলল—ভালো। টাকাগুলো রেখো। অসময়ে টাকা মানুষকে খুব দেখে।

টুপু এই প্রথম কাঁদল কুশলের সামনে।

বলল—টাকা আর নাম আমাকে ছেড়ে যাচ্ছে কুশলদা। তুমি তো উন্নতি করেছ, আমি যদি কখনও রাস্তার ভিখিরি হয়ে যাই তো কিছু ভিক্ষে দিও।

—ছিঃ টুপু, ওকথা বোলো না। টাকা রেখো। আর দরকার হলে নিও আমার কাছ থেকে। লজ্জা কোরো না।

—বড় লজ্জা কুশলদা। বড় লজ্জা।

আলোর পৃথিবী এগিয়ে আসছে।

কুশল বুঝতে পারে, সে নিজে সৌভাগ্যের আলোর চৌকাঠে পা রেখেছে, কিন্তু টুপুর সঙ্গে সেখানে দেখা হওয়ার নয়। কারণ টুপু আলোর জগৎ থেকে নির্বাসিত হয়ে চলে আসছে দুর্ভাগ্যের অন্ধকার জগতে, সে-ও সেই যাত্রাপথে অন্ধকারের চৌকাঠে পা রেখেছে, ঠিক এই সীমানায় তাদের প্রথম পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকা।

আজও বলতে পারল না কুশল। কিন্তু মন বলল—তোমার সঙ্গে আমার যে একটা খুব গোপন কথা আছে টুপু।

আজকাল কুশলের সময় বড় কম। কলকাতার ব্রাবোর্ন রোডে তার নতুন শোরুম আর সেলস অফিস চালু হল। তার ওপর আবার জাপানি একটা কোম্পানির সঙ্গে কোলাবরেশনে চাষের যন্ত্র-লাঙল তৈরি করবে বলে সে গেল জাপান। ওই পথে দূর-প্রাচ্যের সব দেশ দেখে এল। কারখানা খোলার জায়গা পেল কলকাতার কাছেই। বড্ড পরিশ্রম গেল ক'দিন। বয়সও তো প্রায় সাঁইত্রিশ-আটত্রিশ হয়ে গেল। এখন শরীর না হোক মনটা বড় ক্লান্ত হয়ে পড়ে। মা বিয়ের তাগাদা দেয়। কুশল রাজি হয় না। ছোট বোনের বিয়ে দিল বড়লোকের বাড়িতে। সেই বিয়েটা আসলে একটা অলিখিত চুক্তি। আত্মীয়তার সূত্রে যাদের পেল তারা সমাজের ওপরতলার ভালো সব যোগাযোগের মধ্যমণি। এইসব বুদ্ধি এখন মাথায় খুব খেলে কুশলের।

কিন্তু তবু ক্লান্তি তো ছাড়ে না। যোধপুরের প্রকাণ্ড বাড়িতে ফিরে যখন কখনও অবসর কাটায় তখন বড় একা আর ক্লান্ত লাগে। মেয়েলি স্পর্শ জীবনে বড় দরকার। মেয়েরা হল পুরুষের বিশ্রাম, একটু সৌন্দর্য, আশ্রয়।

কিন্তু বিয়ে করবে কী করে কুশল? সেই কথাটা যে আজও টুপুকে বলা হয়নি। তাই সে ছোট ভাইয়ের বিয়ে দিয়ে দিল। অনেকদিন ধরেই এক সরকারি হর্তাকর্তা তাঁর মেয়েকে কুশলের ঘরে দেওয়ার জন্য অস্থির। কুশল তাঁকে তাই বিমুখ করল না। নিজে বিয়ে না করে ভাইয়ের সঙ্গে বিয়ে দিল।

আজও বড় লাজুক কুশল, এখনও যতদূর সম্ভব সৎ ও সচ্চরিত্র। এখনও তার চেহারায় তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও অসম্ভব ভালোমানুষির ছাপ রয়ে গেছে।

খুব সকালবেলায় একদিন একটা পুরোনো গাড়িতে টুপু এসে তার বাড়ির সামনে নামল। খুবই কুণ্ঠিত আর লজ্জিত ভঙ্গিতে এল ভিতরে।

বলল—তুমি কী ভীষণ বড়লোক হয়ে গেছ! কী করে হলে?

লজ্জিত কুশল বলে—শোনো টুপু, ওসব কথা বোলো না। মেয়েরা টাকাপয়সার কথা বললে আমার ভালো লাগে না।

টুপু শ্বাস ফেলে বলে—আমার খবর জানো?

—জানি টুপু, তুমি আজকাল একদম কন্ট্রাক্ট পাচ্ছ না। খবর নিয়ে জেনেছি, তুমি অনেক টাকা চাও বলে কেউ তোমাকে ছবিতে নেয় না! তার ওপর তুমি শুটিংয়েও যাও না ঠিকমতো।

টুপু শ্বাস ফেলে বলে—আরও আছে। আমি নাকি নতুন নায়কদের মাথা চিবিয়ে খাচ্ছি। প্রায়ই নাকি ইউনিট থেকে তাদের কাউকে নিয়ে ইচ্ছেমতো চলে যাই ফূর্তি করতে। এসব শোনোনি?

—শুনেছি।

—বোগাস এর কিছুই সত্যি নয় কুশলদা। এখন আমি ঘর থেকে মোটেই বেরোই না। অন্ধকারে বসে-বসে কাঁদি।

—কেন কাঁদো টুপু। তোমার দুঃখ কী?

—বোঝো না? মানুষ যখন গুরুত্ব হারায়, যখন নিজের ধর্ম থেকে, ভিত থেকে নড়ে যায় তখন যে দুঃখ তার তুলনা নেই।

—বাজে কথা টুপু। তুমি গরিব বামুনের মেয়ে। তোমার ধর্ম বলো, ভিত বলো, গুরুত্ব বলো, তার কিছুই তো তুমি পাওনি। যা পেয়েছিলে, যে অর্থ যশ ও গুরুত্ব, তা তোমার পাওনা জিনিস ছিল না। একটু ভেবে দ্যাখো।

—তবে কী আমার পাওনা ছিল?

কুশল ভেবে বলে—বোধহয় ভালোবাসার মানুষের জন্য কষ্ট করার তৃপ্তিই মানুষের সবচেয়ে বড় পাওনা।

—ও বাবা, তুমি খুব কথা শিখেছ আজকাল। শিখবেই, বড়লোক হয়েছ তো। বড়লোকদের সব কথা বলবার অধিকার আছে।

কুশল যন্ত্রণায় কাতর স্বরে বলে—না টুপু। আমাকে বড়লোক বোলো না। আমি চেষ্টা করেছি মাত্র। চেষ্টাই মানুষের জীবন। বিষয়ের পরিবর্তনে মনের পরিবর্তন কি সবার হয়?

—আমি অত বুঝি না কুশলদা। আমি বলতে এসেছি আমি একটা ছবি প্রডিউস করব। টাকা দাও। শেষবার একটা চেষ্টা করে দেখি।

—দেব। কুশল বিনা দ্বিধায় বলে।

চার

উপগুপ্ত আর বাসবদত্তার কবিতাটার শেষে যা ছিল, তাই বুঝি ঘনিয়ে আসে। ছবিটা একদম চলল না। কুশল জানত, তাই টাকাটাকে খরচের খাতায় ধরে রেখেছিল।

প্রেস শো-তে তার পাশেই বসে ছিল টুপু। বলল—চলবে না, না গো কুশলদা?

কুশল খুব দুঃখিত মনে মৃদুস্বরে বলে—বোধহয় না।

—কেন কুশলদা? আমি তো আমার সর্বস্ব দিয়ে অভিনয় করেছি, গল্পটাও ভালো ছিল। সবই চেষ্টা করেছি।

কুশল তেমনি মৃদুস্বরে বলে—টুপু, কেন এত করলে? এর চেয়ে অনেক কম কষ্টে সুখী হওয়া যেত জীবনে।

বাড়ি বিক্রি করে দিয়ে টুপু একটা অ্যাপার্টমেন্টে থাকে এখন। একা-একা। মা আর ভাই আলাদা থাকে। তাদের সঙ্গে বনিবনা হয় না টুপুর।

তার সেই অ্যাপার্টমেন্টে বিরাট পার্টি দিয়েছে টুপু তার জন্মদিনে। কুশলকেও নিমন্ত্রণ করেছে। কুশল সময় পায় না, তবু সময় করে গেল পার্টিতে।

গিয়ে দেখে, ফ্ল্যাটটা একদম ফাঁকা। রাশি-রাশি খাবার সাজানো টেবিলে, ঘরদোরে প্রচুর আলো, সাজগোজ। তবু কেউ নেই। এমনকী একটা বুড়ি ঝি ছাড়া অন্য কাজের লোকও কেউ নেই। টুপু একটা সাদা খোলের তাঁতের শাড়ি পরে এলোচুলে জানলার ধারে বই পড়ছে। মুখটা ম্লান, কিন্তু প্রসাধনহীন বলে তার সেই কৈশোরের কমনীয়তাটুকু ফুটে আছে।

কুশল অবাক হয়ে বলে—কী হল, লোকজন সব কই?

টুপু বই বন্ধ করে হেসে উঠে আসে, বলে—লোকজন! তারা আবার কারা? কাউকে বলিনি তো? শুধু তোমাকে।

—তাহলে এত আয়োজন দেখছি কেন?

টুপু অনেকক্ষণ চেয়ে থাকে কুশলের মুখের দিকে। তারপর খুব গভীর একটা শ্বাস ফেলে বলে—শোনো, আমি জীবনে দেদার পার্টি দিয়েছি। পার্টির শেষে যখন সবাই চলে যায়, তখন এঁটো বাসন, শূন্য মদের বোতল, ভাঙা কাচ, দলিত ফল সব পড়ে থাকে। ঘরটা বীভৎস লাগে। মনে হয় পরিত্যক্ত, ভূতুড়ে। তাই আজ কাউকে বলিনি।

—আমাকে যে বললে!

—তুমি! ওঃ, তোমার কথা আলাদা। আজ আমরা দুজনে পার্টি করব। আর আমাদের চারিদিকে শূন্য চেয়ার, ফাঁকা ঘর, আর নির্জনতা থাকবে। কুশলদা, তোমার একার জন্যই আজ পঞ্চাশজনের আয়োজন। তুমি সব এঁটো করে, নষ্ট করে যাও। আমি দেখি।

—পাগল। কুশল বলে।

—আমি পুরুষকে লজ্জা পেতে বহুকাল ভুলে গেছি। কিন্তু জানো আবার আমার খুব ইচ্ছে করে লজ্জা করতে। আমাকে একটু লজ্জা দাও কুশলদা।

—পাগল! কুশল হেভরে বলে।

—শোনো, তুমি ভাবছ আমি মদ খেয়েছি। না গো, এই দ্যাখো, শুঁকে দ্যাখো মুখ। বহুদিন হল ছেড়ে দিয়েছি। এই বলে ছোট্ট সুন্দর মুখখানা হাঁ করে কাছে এগিয়ে আনে টুপু।

কুশল ওর মুখের বাতাস শুঁকল। কী সুন্দর গন্ধ! ওইভাবেই দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ মোহাচ্ছন্ন হয়ে।

টুপু শ্বাস ফেলে মুখ সরিয়ে নিয়ে বলল—আজ আমার জন্মদিন কুশলদা। তুমি আমাকে কী দেবে?

সোনার একটা গয়না এনেছে কুশল! কিন্তু সেটা বের করল না। একটু ভাবল। তারপর বলল—টুপু, বহুকাল হয় তোমাকে একটা কথা বলার চেষ্ট করেছি। আজ তোমাকে সেই কথাটা বলি বরং। সেইটেই জন্মদিনের উপহার বলে নিও।

—কথা! বলে টুপু হাঁ করে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ বলে—এতদিন বলোনি কেন?

—সময় হয়নি। কথারও সময় আছে টুপু।

টুপু হেসে মাথা নীচু করে লজ্জায়। তারপর অল্প একটু শ্বাসকষ্টের সঙ্গে বলে—আজ বুঝি সময় হয়েছে?

—হ্যাঁ। খুব দেরি হয়ে যাওয়ার আগেই এবার বলি। টুপু...

টুপু দু-হাতে কান চেপে ধরে চেঁচিয়ে ওঠে—পায়ে পড়ি, বোলো না, বোলো না তো! বললেই ফুরিয়ে যাবে।

—বলব না? কুশল অবাক।

টুপু স্নিগ্ধ চোখে চেয়ে হাসল। বলল—সারা জীবন ধরে ওই কথাটা একটু-একটু করে বোলো। কথা দিয়ে নয়, অন্যরকম ভাবে।

পুনশ্চ

বিজু বলল—আমি যাচ্ছি না।

সুচেতা বিজুর থুতনিতে আঙুল ছুঁইয়ে ঠোঁটে ঠেকিয়ে চুক করে শব্দ করে বলল—এসো। দেরি কোরো না। টিফিন খেয়ো। জলের বোতল নিয়েছ তো ভরে।

বিজু বিরক্ত হয়ে বলে—আজ ম্যাচ আছে। বোতল-টোতল কেন একগাদা দিলে? কত বই, টিফিন বাক্স! রোজ স্কুলে যাওয়ার সময় আমি গাধার মতো মোট বয়ে নিয়ে যাই।

—দূর পাগল! সবই কাজে লাগে। কিচ্ছু ফেলনা নয়।

—একদিন সব হারিয়ে আসব দেখো।

ছেলের লম্বাটে ছিমছাম চেহারা, সতেজ মুখের দিকে চেয়ে সুচেতা কয়েক পলক মুগ্ধ থাকে। এই তার রক্তের ডেলা, তার আপন সৃষ্টি, তার গাছের মহার্ঘ ফল। ফের ভাবে, নজর লাগল বুঝি।

তাই বিজুর বাঁ-হাত টেনে নিয়ে দাঁতে একটু কামড়ে গায়ে থুঃথুঃ করে বলে—সাবধানে যাবে। খেলতে গিয়ে ব্যথা পেয়ো না।

বিজু পিঠে ব্যাগ নেয়, কাঁধে বোতল ঝোলায়। তারপর বুটের শব্দ তুলে সতেজ পায়ে বেরিয়ে যায়।

সারাদিন হাওয়া বয় তিনতলার ঘরদোরে। খুব হাওয়া। টুকটাক কাজ আর সুচেতনার শেষ হতে চায় না। কোলের মেয়েটা জ্বালায় বড়। হাম হয়েছে। সারা বাড়ি হামা টেনে বেড়াচ্ছে। মেঝেয় পেচ্ছাপ করে সেই জলে থাপুর-থুপুর করে দুই হাতে।

—এই রে! দেখেছ! বলে উনুন থেকে কড়া নামিয়ে রেখে সুচেতা ছুটে যায়। হামে যদি ঠান্ডা লাগে তবে বিপদ। অরুন্ধতীর ছেলেটা হাম বসে মরতে চলেছিল।

মেয়েকে কোলে নিয়ে আঁচলে তার হাত-পা মোছায়, জাঙিয়া পালটে দেয়। পেচ্ছাপের জায়গাটা মোছে। মেয়েকে খেলা দিয়ে আবার গিয়ে চাপড়ঘন্টের কড়া চাপায়।

এইভাবেই যৌবন শেষ হয়ে আসে বুঝি। এই তিনতলার ঘরে সংসারে আবদ্ধ জীবন। বেড়ানো, খেলানো নেই, কলেজ জীবনের আড্ডা নেই, রোমাঞ্চ নেই।

শমীক সন্ধে পার করে এল।

—সুচেতা তাকে চা দিয়ে কাছে বসে বলল—কী ভেবেছ বলো তো?

—কী ভাবলাম? শমীকের ভীতু গলায় জবাব।

—এইভাবে আমাকে নিঙড়ে শেষ করবে? এর চেয়ে যে ঝি-গিরি অনেক সম্মানের। খাটাচ্ছ, কিন্তু শখ-আহ্লাদও পূর্ণ করবে তো। স্বার্থপর কেন বলো তো?

৩

বিজু ফার্স্ট ডিভিশনে পাস করে কলেজে ভরতি হল। মেয়ে চন্দনা সিক্স থেকে ফার্স্ট হচ্ছে। ভালো নাচে, গায়।

এক-আধদিন আজকাল শমীক বলে—বড্ড টায়ার্ড লাগে।

—কেন?

—কী জানি। লো প্রেসারটা তো আছেই।

—আমারও মাথা ঘোরে। হজম হয় না।

শমীক বলে—চলো তো দুজনেই ডাক্তারের কাছে যাই আজ।

পাড়ার চেনা ডাক্তার দুজনকেই দেখে বলেন—তেমন কিছু নয়। মিসেস চ্যাটার্জিকে নিয়ে একটু ঘুরে-টুরে আসুন কোথাও।

সুচেতা বলে—ওঁকে ভালো করে দেখুন।

—দেখেছি।

—কী?

—কিছু নয়। চল্লিশের পর শরীরে ক্ষয় শুরু হয়। এসব একটু-আধটু অসুবিধে এখন থেকে হবে। একটু এক্সারসাইজ দরকার।

সুচেতা ভাবল চল্লিশের ওপর? এই সেদিনও তার বরটি মাত্র চব্বিশের ছিল যে! হিসেবে অবশ্য তাই হয়। সে নিজেও আটত্রিশ ছুঁল।

৪

বরপক্ষ চন্দনাকে একবারে পছন্দ করল।

ছেলের বাবা বললেন—দেনা-পাওনার কথা ওঠে না। যা দেওয়ার মেয়েকে দেবেন। ছেলের কিছু চাই না, শুধু লক্ষ্মীমন্ত বউ চাই।

শমীক অলক্ষে সুচেতার দিকে তাকায়। সুচেতার মুখেচোখে মেয়ের জন্য অহংকার। শমীক অতটা খুশি নয়। মেয়ে তার প্রাণ। মেয়ের বিয়ে হলে থাকবে কী করে?

রাত্রিবেলা শুয়ে জনান্তিকে সুচেতাকে বলল—তুমি তো বিয়ের নামে টগবগ করছ। আমি থাকব কী করে?

—আমিও তো মা।

—আমার বুকের মধ্যে কষ্ট হচ্ছে।

—টাকার কথা ভাবছ?

—সে ভাবনাও আছে। কিন্তু চন্দিকে ছেড়ে থাকা।

—ভেবো না। সয়ে যাবে।

—মেয়েরা বড় নিষ্ঠুর।

—মেয়েরা নয়, তোমরাই। আমাকে যখন আমার বাপ-মা'র কাছ থেকে ছিনিয়ে এনেছিলে তখন এত মায়া কোথায় ছিল?

শমীক চুপ করে থাকে। অনেকক্ষণ বাদে বলে—কিন্তু চন্দির কথা আলাদা।

—সকলের কাছেই নিজের মেয়ে আলাদা।

—তুমি হার্টলেস।

—জানোই তো।

শমীক ঘুমোল। কিন্তু সুচেতা জেগে রইল। একবার উঠে গিয়ে পাশের ঘরে ঘুমন্ত মেয়েটাকে দেখে এল। মাঝরাতে নীরবে চোখের জল ফেলল কিছুক্ষণ। বিজু বিদেশে। মেয়েও চলল শ্বশুরঘর।

৫

বাথরুম থেকে ঘরে আসতে পারছিল না শমীক। কী দূর হয়ে গেছে ঘর! কত দূর! তার গলার স্বর পৌঁছোয় না ঘরে সুচেতার কাছে। তবু সে প্রাণপণে ডাকে—সুচেতা! ডাকটা ফোটে না। অস্ফুট গোঙানির শব্দ হয়।

শেষ রাতে সুচেতা টের পেল, শমীক বিছানায় নেই। অনেকক্ষণ নেই। চমকে ওঠে বুক। বয়সটা ভালো নয় তো! উঠে সে স্বামীকে খোঁজে।

বাথরুমে যখন খুঁজে পায় তখন শমীকের জ্ঞান নেই। গোঁ-গোঁ শব্দ করছে। হাত পায়ে খিঁচুনি।

ডাক্তার বলল—মাইলড স্ট্রোক। এরপর থেকে কিন্তু খুব সাবধান।

খবর পেয়ে দুর্গাপুর থেকে কর্মব্যস্ত বিজু এল। মুখ থমথমে, গম্ভীর।

চন্দনা এল তার তিন বছর দু-মাসের দুই বাচ্চাকে নিয়ে। বাবার শিয়রে বসে রইল ভাইবোনে। সুচেতা নাতি-নাতনি সামলাতে লাগল।

শমীক বলল—তোরা অমন ভেঙে পড়িস না। আমি এখন ভালো আছি।

চন্দনা কাঁদতে থাকে। বিজু ছুটি বাড়ানোর দরখাস্ত পাঠায়।

শমীক সেরে ওঠে।

যাওয়ার আগে বিজু একদিন আড়ালে মাকে বলে—সবসময় তো বিয়ে-বিয়ে করে মাথা খারাপ করে দিচ্ছ। ভালো পাত্রী পেয়েছ তো বলো করে ফেলি।

—তিন-তিনটে হাতে রেখেছি। এবারই দেখে পাকা কথা দিয়ে যা।

বিজু খুব লাজুক স্বরে বলল—আর-একটা দেখা তো আছে, বলো তো তোমাদের দেখিয়ে দিই।

—ওমা! তাই বলি—বলে সুচেতার গালে হাত।

৬

বিরক্ত হয়ে শমীক বলল—সবই কি আর মনের মতো হয়? মানিয়ে নিতে হবে।

সুচেতা বলে—তুমি পুরুষমানুষ, আত্মভোলা শিবের জাত। মানিয়ে নিতে পারো। মেয়েরা পারে না।

শমীক মৃদু হেসে বলে—পারো না কেন? মেয়েরা বড় জেলাস, কারও সঙ্গে কারও বনে না। ছেলের বউ তো শাশুড়ির চিরকালের শত্রু।

—না মশাই, আমি আমার শাশুড়ির শত্রু ছিলাম না। তুমি কি ভাবো তোমার ছেলে যে বউটি ঘরে এনেছে সে আমার নখের যুগ্যি?

—তা বলছি না।

—তাই বলছ। জানো না বলেই বলছ। অত দেমাক কীসের ওর? গায়ের রংটা একটু কটা আর এম-এ পাস—যোগ্যতা তো এটুকুই। এম-এ পাস নই বলে আমরাও কম যাই নাকি?

—ওই তো জেলাসির কথা। তোমাকে কম কে বলছে?

—অনেকে হয়তো ভাবে। তুমিও বউকে আশকারা দাও, বউকে কিছু বললে ছেলেরও মুখ ভার। না বাপু, দুর্গাপুরে আর নয়। কলকাতা চলো। ছেলের সংসারে ঢের হয়েছে।

৭

জামাই রবীনের পাতে আরও একটু মুরগি দিয়ে সুচেতা হাসিমাখা মুখে বলে—বলছেই না যখন—

রবীন মুখ তুলল না। চিন্তিতভাবে চুপ করে রইল।

চন্দনা টেবিলের অন্য ধার থেকে বলে—বলবে কী করে? একা ওই-ই তো সংসারের সব খরচ চালায়। ভাইরা কিছু দেয় নাকি? যাও বা দেয় শাশুড়ি তা ব্যাংকে জমা করেন। বড় ছেলেই চক্ষুশূল।

শমীক এসব কথা পছন্দ করে না। সে প্রাচীনপন্থী মুখখানা বিভীষণ করে খাচ্ছিল। অর্ধেক খেয়ে উঠে গেল কিছু না বলে।

সুচেতা লক্ষ করে ব্যাপারটা। তবু মেয়ের স্বার্থ তাকে তো দেখতেই হবে। সে মৃদুস্বরে বলে—সংসারের শান্তি চাইলে কিছু অপ্রিয় কাজও করতে হয়। আমি বলি কি, একটা আলাদা বাসা করে চলে এসো তোমরা। আমার কাছাকাছি চলে এসো, ছেলেমেয়ে আমিও দেখতে পারব'খন।

রবীন জবাব দেয় না। কিন্তু কথাটা ভাবে।

চন্দনা বলে—আমিও তো কবে থেকে তাই ভাবছি। ও কেবল বাপ মায়ের কর্তব্যের নামে থাকতে চায়।

সুচেতা বলল—কর্তব্য দূরে থেকেও করা যায়! বরং বেশিই করা যায়। থোক টাকা দেবে মাসে-মাসে।

রবীন একবার চন্দনার দিকে রাগ-চোখে চায়। কিছু বাদে সে-ও প্রায় ভরা পাত ফেলে ওঠে।

রাতে শমীক সুচেতাকে বলে—এসব প্রশ্রয় দিচ্ছ! পরে ভুগবে।

—আহা, কী কথা! জামাই তার সব রোজগার সংসারে ঢালছে, মেয়েটার ভবিষ্যৎ নেই? দুটো পয়সা রাখতে পারছে না।

শমীক রাগ করে পাশ ফিরে শোয়।

মস্ত প্রোমোশন পেয়ে বিজু বদলি হয়েছে। কলকাতায়। বউ হাসনু আর দুই ছেলেমেয়ে হইহই করে এসে হাজির হল একদিন।

সুচেতার আনন্দ ধরে না। শমীকের গম্ভীর মুখে খুশির বেলুন ফাটল।

সুচেতা বলল—বলতে নেই বউমা, তোমার শরীরটা একটু সেরেছে। বিয়ের সময় যা রোগা ছিলে!

—দুর্গাপুরের জল ভালো মা।

—কলকাতায় এলে তো। এবার বুঝবে।

—তা হোক মা, দুর্গাপুরে লাইফ নেই। এখানে কত লোকজন, আলো। ওখানে যেন মৃত্যুপুরী। কতদিন থেকে আসব-আসব করছি।

খুব সাবধানে সুচেতা জিগ্যেস করে—এ-বাড়িতেই থাকবে তো! নাকি—?

হাসনু মাথা নত করে বলে—ওকে তো অফিস থেকে আলাদা ফ্ল্যাট দেবে।

সুচেতা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। হাসনু বলে—ওর অবশ্য আপনাদের কাছেই থাকার ইচ্ছে।

—শুধু ওর ইচ্ছেয় তো হওয়ার নয় মা, তোমারও ইচ্ছে থাকা চাই।

হাসনু জবাব দেয় না।

৯

পরদার আড়াল থেকে সুচেতা শুনল, হাসনু বিজুকে বলছে—অফিসের ফ্ল্যাটের কী হল?

—নিচ্ছি না। এই তো বেশ আছি। মা-বাবার কাছে। ছেলে-মেয়ে দুটো দাদু-ঠানু বলতে অস্থির।

বাইরে থেকে তো ভালোই লাগছে। এদিকে যে বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা। চন্দনা আর রবীন কাছেই ফ্ল্যাট নিয়েছে, রোজ আসে।

—তাতে কী?

—কী আবার। মায়ে মেয়েতে দিনরাত গুজগুজ ফুসফুস। কী বলে কে জানে! বিয়ের পর মেয়েদের বাপের বাড়ির সঙ্গে অত মাখামাখি কেন থাকবে? ওর বরটাও ম্যাদাটে

মার্কা। শ্বশুরবাড়ি বলতে অজ্ঞান।

—বাদ দাও।

—কেন বাদ দেব? অশান্তির শুরু এইভাবেই হয়। আমি কিছুতেই এখানে থাকব না। তুমি ফ্ল্যাটে চলো। মাসে-মাসে বরং থোক টাকা দিও।

—মা-বাবা যে বড্ড একলা হয়ে পড়বেন।

—সে ভাবতে হবে না। মেয়ে কাছে এসে উঠেছে। একলা কীসের? বরাবরই দেখেছি মার টান তোমার চেয়ে চন্দনার ওপর বেশি। আমার ছেলেমেয়েদের চাইতে চন্দনার ছেলেমেয়েরা এ-বাড়িতে ঢের বেশি আদর পায়।

—যাঃ, ও তোমার মনের ভুল।

—আমি খুকি নই। তুমি স্নেহে অন্ধ বলে দেখতে পাও না। নইলে ব্যাপারটা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার।

আড়ালে সুচেতা চোখের জল মোছে। ওরা থাকবে না।

১০

জয় বলল—আমি যাচ্ছি মা।

হাসনু জয়ের মাথাটা দু-হাতে ধরে একটু আদর করে বলল—এসো গিয়ে। টিফিন খেয়ো কিন্তু। ওয়াটার বটলটা ভুলে যেও না।

জয় বিরক্ত হয়ে বলে—নিয়েছি নিয়েছি।

হাসনু ছেলের লম্বাটে ছিপছিপে চেহারাটা একটু দূর থেকে দেখে। মুখখানায় বুদ্ধির ঝিকিমিকি। দেখে মুগ্ধ হয়ে যায়। তারপর হঠাৎ খেয়াল হয়, ওরকমভাবে দেখতে নেই। আজকাল সে এসব সংস্কার মানে। ছেলের চোখের আড়ালে সে একটু হাতজোড় করে ঠাকুরের কাছে মনে-মনে প্রার্থনা করে—ভালো রেখো।

বিজু অফিসে, জয় স্কুলে। মেয়েটা এক মনে ছবি আঁকে। আবোল-তাবোল ছবি। জ্বর থেকে সদ্য উঠেছে।

হাসনু মেয়েকে বলে—ধিয়া, দুধ খেলি না?

—না। বমি পায়।

সারাদিন হাসনুর কাজের শেষ নেই। কিছুই তাকে নিজের হাতে করতে হয় না। আয়া, চাকর, রাঁধুনি আছে। তবু সবদিকে চোখ রাখতে হয়। সারা বাড়ি ছুটতে হয়।

সন্ধে পার করে বিজু এল। হাসনু তার মুখোমুখি বসে বলে—কী ভেবেছ? বলো তো!

—এরকম ডাল সন্ধে কাটানো যায়? এর চেয়ে ঝি-গিরি ভালো ছিল। তোমার সংসার দেখছি, আমারও তো কিছু সাধ আহ্লাদ তোমাকে দেখতে হবে!
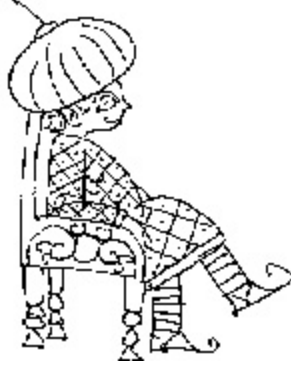
ইে.

দেশলাইয়ের কাঠির অর্ধেক ভেঙে দাঁত খুঁচিয়েছিল কখন। বিড়ি ধরাতে গিয়ে সাঁটুলাল দেখে খোলের মধ্যে সেই শিবরাত্রির সলতে আধখানা বারুদমুখো কাঠি দেমাক দেখিয়ে পড়ে আছে।

আজ চৈত্রের হাওয়া ছেড়েছে খুব। কাল বৃষ্টি গেছে ক'ফোঁটা, কিন্তু আজই তেজাল রোদ আর খড়নাড়ার মতো শুকনো হাওয়া দিচ্ছে দ্যাখো। হাওয়ার থাবায় এক ঝটকায় কাঠির মিনমিনে আগুন নিবে যাবে। যদি তাই যায় তো আরও চার পো পথ বিন-বিড়িতে হাঁটো। তারপর হাজারির দোকানের আগুনেদড়িতে বিড়ি ধরিয়ে নেওয়া যায়। কিন্তু অতক্ষণে বিড়ি ছাড়া হাঁটা যায়! মুখে থুথু আসবে, বুক আঁকুপাঁকু করবে, কী নেই-কী নেই মনে হবে।

সাঁটুলাল দেশলাইয়ের বাক্সটা নাড়ে। ভিতরে টুকাটুক শব্দ করে আধখানা কাঠি দেমাকভরে নড়ে চড়ে। কাঠিটার মতলব বুঝতে পারে না সাঁটু। শালা কি বিড়ি ধরানোর ঠিক মুখে নিবে গিয়ে তাকে জব্দ করবে?

তার জীবনে পাপের অভাব নেই। ফর্দ করতে গেলে শেষ হওয়ার নয়। বেশি কথা কি, এই দেশলাইটাই তো গত পরশু বাবুদের উঠোনে পড়ে থাকতে দেখে হাতিয়ে নেয়। ঝি উনুন ধরাতে এসে ফেলে গিয়েছিল ভুলে। পরে এসে দেশলাই খুঁজে না পেয়ে বাপান্ত করছিল। তা সে সাঁটুর উদ্দেশেই বলা, নাম ধরে না বললেও, শুনে সাঁটু ভেবেছিল—নাঃ, কাল থেকে ভালো হয়ে যাব।

সাঁটু দেশলাইটা হাতে নিয়ে মাঠের মধ্যিখানে ঢিবিটার ওপর বসে থাকে। দাঁতে আটকানো বিড়ি। ধরায়নি। সাঁটু ভাবে, বাবুদের বাড়ির ঝি সরস্বতীর কি উচিত হয়েছে সাঁটুকে অমন বাপ-মা তুলে গাল দেওয়াটা? ছেলের মাথা খেতেও বলেছে। যত যাই হোক সরস্বতী তো সাঁটুরই বউ! আজ না হয় সে পয়সাওয়ালা লোকের সঙ্গে বিয়ে বসেছে। তা সুখচন্দ্রের পয়সাই বা এমনকী। আটাকল খুলে ধরাকে সরা দেখছে। তারও আগের পক্ষের বউয়ের হ্যাপা সামলাতে হয়। সরস্বতী ভাবে সুখচন্দ্র তাকে চিরকাল মাথায় নিয়ে নাচবে। ফুঃ! লাথি দিল বলে। বেশি দিন নয়।

ছেলের মাথা খেতে বলা সরস্বতীর ঠিক হয়নি। ছেলে তো সাঁটুর একার নয়, তারও। কিন্তু রেগে গেলে সরস্বতীর আর সেসব খেয়াল থাকে না। রেগে গেলে সরস্বতী একেবারে দিগবসনা।

ঢিবির ওপর কয়েক জায়গায় ঘাস পুড়ে টাক পড়েছে। এখানে সেখানে আংরা পড়ে আছে, ছাই উড়ছে অল্পস্বল্প। ডাকাতে সাধুটা ক'দিন আগেও এখানে থানা গেড়ে ছিল।

আজকাল সাঁটুলালের খুব ইচ্ছে হয় কারও কাছে গিয়ে মনের দুঃখের কথা সব উজাড় করে বলে। তার দুঃখ ঝুড়িভরা। সাধুর খোঁজ পেয়ে একদিন সন্ধেবেলা চলেও এসেছিল সাঁটুলাল। সাধুটা নাকি ভীষণ তেজালো, শূল চিমটে কিংবা ধুনি থেকে জ্বলন্ত কাঠ নিয়ে লোককে তাড়া করে। তা তেজালো সাধুই সবার পছন্দ। সাঁটুরও।

সন্ধেবেলা সাঁটু ঢিবিতে উঠে দেখল নেংটি-পরা জটাধারী ভয়ঙ্কর সাধু বসে-বসে খাচ্ছে। কাছেপিঠে কেউ নেই, কেবল বেলপুকুরের মতিলাল একধারে চোরের মতো খোলা ছাতা সমুখে ধরে বসে আছে। তামাকের কারবারে মতিলাল গতবার খুব মার খেয়েছে। সেই থেকে লটারির টিকিট কেনে, হাতে গুচ্ছের কবজ আর সাধুর খোঁজ পেলেই সেখানে গিয়ে খুঁটি গাড়ে।

সাঁটুলালকে দেখে মতিলাল হাতের ইশারায় ডেকে বলল,—এখন কথাটথা বোলো না, বাবার ভোগ হচ্ছে। আর খুব সাবধান, বাবা কিন্তু হাতের কাছে যা পায় ছুড়ে মারে। আমার ছাতার আড়ালে সরে এসো বরং।

মতিলালের ছাতার আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে বসে সাঁটুলাল সাধুর খাওয়া দেখে চোখের পাতা ফেলতে পারে না। ভালো ঠাহর হচ্ছিল না অল্প আলোয়, তবু মনে হচ্ছিল যেন কীসের একটা বড়সড় ঠ্যাং চিবোচ্ছে।

মতিলাল ঠেলা দিয়ে বলল—দেখছ কি! নিজের চোখে যা দেখলাম প্রত্যয় হয় না।

সাঁটু মতির কাছ ঘেঁষে বলল—কী দেখলে?

মতিলাল ফিসফিস করে বলে—সবটা দেখিনি। সন্ধের মুখে-মুখে এসে হাজির হয়ে দেখি বাবার সামনে একটা আধজ্যান্ত শেয়াল পড়ে আছে, মুখ দিয়ে ভকভক করে রক্ত বেরোচ্ছে, তখনও পাঁজর ওঠানামা করছিল। ধুনি জ্বেলে সেই আধজ্যান্ত পশুকে আগুনে ভরে দিল মাইরি, কালীর দিব্যি। তারপর ওই দ্যাখো, কেমন তার করে খাচ্ছে।

সাঁটু শুয়োরের মাংস পর্যন্ত খেয়েছে, কিন্তু শেয়াল পর্যন্ত যেতে পারেনি। শুনে আর-একটু মতিলালের কাছে ঘেঁষে বসল। মতিলাল কানে-কানে বলল—স্বয়ং পিশাচসিদ্ধ মহাদেব। বুঝেছ? এমন মহাপুরুষের সঙ্গ পাওয়া কত জন্মের ভাগ্যি।

শেয়াল খেয়ে সাধু ঘাসে হাত পুঁছে মাটির ওপর শুয়ে পড়ল লম্বা হয়ে। মতিলাল খুব সন্তর্পণে উঠে গিয়ে সাধুর পা দাবাতে লেগে যায়।

সাধুর শেয়াল খাওয়া দেখে সাঁটুর গা বিরোচ্ছিল। মতি হাতের ইশারায় ডাকলে সে হামাগুড়ি দিয়ে খানিকটা কাছে গিয়ে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে ধানাইপানাই বলতে শুরু করল—বাবা, আমি বড় পাপী। তা বাবা, দুঃখী লোকেরা পাপ না করেই বাঁচে কীসে বলো! তাই ভাবছি বাবা, তুমি যদি আশীর্বাদ করো তো কাল থেকে ভালো হয়ে যাব।

সাধু চিত হয়ে শুয়েছিল, কথা শুনে মুখটা ফিরিয়ে একবার তাকাল শুধু। ভারী ছুঁচলো নজরটা। সাঁটুর তো ছুঁচ ফোটানোর মতো যন্ত্রণা হয়েছিল।

সাধু কিন্তু গাল দিল না, একটু হেসে বলল—শালা নিমকহারাম পাঁচটা টাকা আর একটা জবাফুল নিয়ে আসিস কাল। এখন যা।

সাঁটু চারদিকে চেয়ে শেয়ালের নাড়িভুঁড়ি, ছাল আর পোড়া মাথাটা দেখে 'ওয়াক' তুলে সেই যে চলে এসেছিল আর যায়নি। যাবেই বা কোন মুখে? জবাফুলের জোগাড় ছিল, কিন্তু পাঁচটা টাকা?

সাধু চোত সংক্রান্তির স্নানে যাবে বলে তল্পি গুটিয়েছে, কিন্তু ঢিবির ওপরকার মাটিতে দাদের মতো পোড়া দাগ রয়ে গেছে। বাতাসে একটা পচাটে গন্ধও। শেয়াল খেলে লোকে পাগল হয় বলে শুনেছে সাঁটুলাল।

অর্ধেক কাঠিটা দেশলাইয়ের খোলের বারুদে ঠুকবে কি ঠুকবে না তা খানিক ভাবে সাঁটু। এ বাতাসে ধরবে না মনে হয়।

ঢিবি বেয়ে সাঁটুলাল নেমে আসে খানিক। এবার বাতাসে একটু আড়াল পড়েছে। 'জয় মা কালী' বলে সাঁটু কাঠিটা ঠুকে দিল খোলে। বিড়বিড়িয়ে উঠল আগুন। গেলঃ গেলঃ হুই রেঃ সাঁটু বিড়ি হাতের খাপের মধ্যে গুঁজে প্রাণপণে টানে।

জয় মা! ধরেছে। নিবেই গিয়েছিল আগুনটা, শুধু কাঠিটা লালচে হয়েছিল বলে ধরল।

ভারী খুশি মনে ঢিবির ওপর বসে সাঁটুলাল দূরের দিকে চেয়ে থাকে! বিড়িটা শেষ হয়ে এলে এটা থেকেই আর-একটা বিড়ি ধরিয়ে নিয়ে হাঁটা দেবে।

পাপ-তাপগুলো সবই যেমন-কে-তেমন থেকে গেল তার। কাউকে বলা হল না। মতিলালের পাপ-তাপ বোধহয় সাধু টেনে নিয়ে গেছে। সাঁটুলাল বিড়ি টানতে-টানতে ভাবল—নাঃ শালা, কাল থেকে ভালো হয়ে যাব।

বড় রাস্তা দিয়ে একটা বাস আসতে দেখে সাঁটু তাড়াতাড়ি উঠে হাঁটা ধরে।

হাত তুলতে বাসটা থেমেও গেল। কিন্তু কনডাক্টর নিত্যচরণ মুখ চেনে। উঠতে যেতেই হাত দিয়ে দরজাটা আটক করে বলল—উঠছ যে, পয়সা আছে তো?

—আছে-আছে।

দোনামনা করে নিত্যচরণ দরজা ছাড়ল বটে কিন্তু নাহক অপমান করে বলল—সিটে বোসো না, মেঝেয় বোসো।

তাতে সুবিধেই সাঁটুলালের। মেঝেয় বসলে তেমন নজরে পড়বে না। পয়সা মাপও হয়ে যেতে পারে। তা ছাড়া সিটে জায়গাও নেই। সে বসেই ট্যাঁক থেকে একটা বিড়ি বার করে নিত্যচরণের দিকে বাড়িয়ে দিল। যদি নেয় তো ভালো, না নিলে খুব দিক করবে।

তা নিত্যচরণ নিল। নেওয়ারই কথা। নিত্যচরণের দ্বিতীয়পক্ষ উলুবেড়ে থেকে চিঠি দিয়েছে আজ। বাসের দরজায় দাঁড়িয়ে অত হাওয়ার মধ্যেও কী করে কোন কায়দায় যেন নিত্যচরণ বিড়িটা ধরিয়ে ফেলল। তারপর বুকপকেট থেকে ন্যাতানো পোস্টকার্ডটা বের করে জড়ানো অক্ষরের লেখা পড়তে থাকে একমনে। তার মুখে রাগ, বিরক্তি, বৈরাগ্য আর হাসি ফুটে উঠতে থাকে। চামেলি লিখেছে—শ্রীচরণে শতকোটি প্রণাম। তারপর লিখি যে, সুপারি সব পাড়া হইয়াছে। কিন্তু মুকুন্দ ঠাকুরপো এবং ভাশুরঠাকুর হিসাব দেয় নাই। এত ক'টা মোটে দিয়াছে। তুমি বৈশাখে এসে হিসাব চেও। আমাকে দিনরাত্রি কথা শুনায়। কেন আমি কি কেউ না। সতীনপো পর্যন্ত বলে তিন্নির মা, মা ডাকে না। কথা আরও কত আছে। বলে দুই বউতে সমান ভাগ। ভাগ বড়। আমার ভাগের খড় শ্যামলালকে বিক্রি করিয়াছি। পাঁচ টাকা এখনও বাকি আছে। তোমার টাকা পাইনি। কী করে সংসার চলে বলো? তিন্নির আমাশা হওয়ায় কত খরচ হয়েছে সে খবর কেই বা রাখে। আমার কে আছে। হাটবারে মুকুন্দ ঠাকুরপোকে পাউডার আনিতে পয়সা দিয়াছিলাম। সে কী দোষের বলো। ঠাকুরপো আনে নাই পয়সা আমার হাতেও দেয় নাই, তিন্নির হাতে ফেরত দিয়া বলিয়াছে অত বিবি সাজতে হবে না পাঁচজনে কুকথা বলে। সতীন চরিত্রের দোষের কথা

বলে বেড়ায়। মা কালীর নামে দিব্যি কেটে লিখি যে সে কথা কেউ বলিতে পারিবে না। পোস্টকার্ডে আর জায়গা নেই। প্রাণনাথ রাখো শ্রীচরণে! চরণাশ্রিতা চামেলি।

শেষ লাইনটা 'রাবণ বধ' যাত্রা থেকে নেওয়া। নিত্যচরণ শ্বাস ফেলে পোস্টকার্ডটা আবার পকেটে ঢোকায়। বিড়ি নিবে গেছে। আবার ধরিয়ে নিল নিত্যচরণ।

সাঁটুলাল নিত্যচরণের মুখের ভাব দেখছিল একমনে। মোটে মাইলখানেক রাস্তা। দেখি না দেখি না বলে কাটিয়ে দেবে। চিঠিটা আর-একটু যদি লম্বা হত! লোকে যে কেন লম্বা-লম্বা চিঠি লেখে না তা বোঝে না সাঁটুলাল।

নিত্যচরণ অবশ্য পয়সা আদায় করল না শেষপর্যন্ত। নামবার সময় শুধু বলল—এই চারশো বিশ, বাস কি জল দিয়ে চালাই আমরা? তেল কিনতে পয়সা লাগে না!

বাস তেলে চলে না জলে চলে তা জেনে সাঁটুর হবেটা কী? সে নিজে যে কীসে চলে সেইটাই এক ধাঁধা। চলেও গেল এই বছর পঞ্চাশেক বয়স পর্যন্ত।

পথটা খুব পার হওয়া গেছে। চোত মাসের রোদে এ-পথটুকু কমতি হল সে একটা উপরি লাভ।

সুখচন্দ্রের সঙ্গে আগে-আগে কথা বলত না সাঁটুলাল। এখন বলে। ভেবে দেখেছে, সুখচন্দ্রের দোষ কী? সরস্বতীকে তো সে নিজে এসে ভাগায়নি। সরস্বতী নিজে থেকেই ভেগে গেল। বরং অন্য কারও চেয়ে সুখচন্দ্রের সঙ্গে আছে সে বরং ভালো। লোকটা কাউকে বড় একটা দুঃখ দেয় না। ফুর্তিবাজ লোক। যা আয় করে তা খেয়ে পরে ওড়ায়। বাজারের সেরা জিনিসটা আনবে। মরশুমের আমটা কাঁঠালটা বেশি দাম দিয়ে হলেও কিনবে, ঘরে তার রেডিও পর্যন্ত আছে। আগের পক্ষে বাঁজা বউ শেফালিকেও খারাপ রাখেনি। নিজের বাড়ি শেফালিকে ছেড়ে দিয়ে অন্য পাড়ায় সরস্বতীর জন্য আলাদা ঘর তুলেছে। দুই বাড়িতেই যাতায়াত।

অনেক ভেবেচিন্তে সাঁটুলাল দেখেছে, ব্যাপারটা খারাপ হয়নি। প্রথম প্রথম তার অভিমান হত বটে। কিন্তু এও তো ঠিক যে তিন-তিনটে বাচ্চা সমেত সরস্বতী তার ঘাড়ে গন্ধমাদনের মতো চেপেছিল এতদিন। এই যে সে গত রাতে খাড়ুবেড়েতে যাত্রা শুনতে গিয়ে রাত ভোর করে তারপর বেলাভর ঘুমিয়ে নাড়ুগোপালের মতো হেলতে-দুলতে তিন প্রহর পার করে ফিরছে, সরস্বতী থাকলে হতে পারত এমনটা? মাগি গিয়ে এখন তার ঝাড়া হাত-পা। ওদিকে ছেলেপুলেগুলো দু-বেলা খেতে পায়, পরতে পায়। সরস্বতীর চেহারা আদতে কেমন তা সাঁটুলালের সঙ্গে বিয়ে হওয়ার পাঁচ-সাত বছর পর থেকে কেউ

বুঝতে পারত না। এখন সরস্বতী পুরোনো খোলস ছেড়ে নতুন চামড়া নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। হাতপায়ের গোছ হয়েছে খুব। গায়ে রস হয়েছে। চোখে ঝলক খেলে। বেশ আছে।

গোঁজ মুখ করে ঘুরে বেড়াত সাঁটুলাল, একদিন সুখচন্দ্র ডেকে বলল—সাঁটুভায়া, ভগবান আমার মধ্যেও আছে, তোমার মধ্যেও আছে। তুমি আমি কি আলাদা? সরস্বতী এসে জুটল, ফেলি কী করে বলো?

এমনি দু-চার কথা হতে-হতে সাঁটুলাল ভাব করে ফেলল। তবে সরস্বতীর পুরোনো সব রাগ যায়নি। সুখচন্দ্র যতই মিতালি করুক সরস্বতী এখনও দেখলে মুখ ফিরিয়ে নেয় আর আকাশ-বাতাসকে শুনিয়ে তার কেচ্ছা গায়।

গাওয়ার মতো কেচ্ছা কিছু কম নেই সাঁটুলালের। তার সারাটা জীবন চুরি ছ্যাঁচড়ামি আর ছিনতাইয়ের কাণ্ডে ভরা। সেসব পুরোনো কথা। গত সপ্তাহে পালপাড়ার কদমতলায় সাঁটু নিজের মেয়ে কুন্তিকে গঙ্গা-যমুনা খেলতে দেখে মায়ায় পড়ে দাঁড়িয়ে গেল। শত হলেও সন্তান। মেয়েটাও খানিক খেলা করে বাপের কাছে এল দৌড়ে। একগাল মিষ্টি হেসে ডাকল—বাবা! বুক জুড়িয়ে যায়। মেয়েটার খালি গা, পরনে শুধু একটা বাহারি রঙচঙে ইজের।

সাঁটুর চোখটাই পাপে ভরা। যেখানে যত লোভানি আছে সেখানে তার পাপ নজর পড়বেই কি পড়বে। মেয়েটাকে দেখতে গিয়ে প্রথমেই তার নজর পড়ল মেয়ের কোমরের কাছে ইজেরের কষি এক জায়গায় একটু উলটো ভাঁজ হয়ে আছে। আর সেই ভাঁজে স্পষ্ট একটা আধুলি আর কয়েকটা খুচরো পয়সার চেহারা মালুম হচ্ছে।

মেয়েকে জড়িয়ে ধরে খানিক আদর করছিল সাঁটু। তারপর মেয়ে ফের গঙ্গা-যমুনার কোটে ফিরে গেল, সাঁটু গেল বাজারে বাবুর জন্যে সিগারেট আনতে। আর যেতে-যেতেই টের পেল, কখন যেন তার হাতে একটা আধুলি দুটো দশ পয়সা আর-একটা পাঁচ পয়সা চলে এসেছে। মাইরি! মা কালীর দিব্যি! সে টেরও পায়নি কখন আপনা থেকে পয়সাগুলো এসে গেল। একেবারে আপনা থেকে।

এসে যখন গেলই তখন তাকে ভগবানের দেওয়া পয়সা মনে করে সাঁটুলাল তৎক্ষণাৎ নগদানগদি তাড়ি খেয়ে ফিরল। বাবুর বাড়ির ফটকে তৈরি হয়েই দাঁড়িয়েছিল সরস্বতী আর তার গা ঘেঁষে কুন্তি। আর যাবে কোথায়! প্রথমে মেয়েটাই দেখতে পেয়ে চেঁচাল—মা! মা! ওই যে আসছে। সঙ্গে-সঙ্গে সরস্বতী ঠিক কলেরগানের পুরোনো বয়ান ছেড়ে যেতে লাগল—বাপের ঠিক নেই, নষ্ট মাগির পুত, কেলেকুত্তার পায়খানা। ডোমে ঠ্যাঙে দড়ি বেঁধে তোকে টেনে ভাগাড়ে ফেলবে। নিব্বংশের ব্যাটা, মেয়েকে পয়সা দিয়ে ডাল আনতে

পাঠিয়েছি—আর মেয়েরও বলিহারি বাবা—কোন আক্কেলে তুই ওই গরুচোরের ব্যাটাকে সোহাগ দেখাতে গেলি! গেল তো ঘাটের মড়ার আক্কেল দ্যাখ! মেয়ের ইজেরের কষি থেকে পয়সা মেরে দিল। বলি ও ঢ্যামনা, পয়সার জন্য তুই না পারিস কী বল দেখি!

বলত আরও। বাবুর বউ বেরিয়ে এসে চোখা গলায় বলল—দ্যাখ সরস্বতী, ছোটলোকের মতো চেঁচাবে তো দূর হয়ে যাও। সাঁটু, তুমিও এক্ষুনি বিদেয় হও। একটা চোর, আর-একটার মুখ আস্তাকুঁড়। আমার বাচ্চাটা এসব শুনে আর দেখে শিখবে। যাও, যাও।

সরস্বতী অবশ্য বাবুর বউকে ভয় খায় না। উলটে তেজ দেখায়। কিন্তু সেদিন আর বাড়াবাড়ি করেনি। শুধু শাসিয়ে রেখেছিল আটাচক্কির বিশেকে দিয়ে মার খাওয়াবে। সেদিনই সন্ধের মুখে বিশে সাঁটুকে ধরে দোকানঘরের পেছনে আবডালে টেনে নিয়ে দিলও ঘা কতক। আরও দিত, সুখচন্দ্র সাড়াশব্দে এসে পড়ে বলল—যাক গে, বারো আনা তো মোটে পয়সা! কিন্তু সুখচন্দ্র মাপ করে তো সরস্বতী করে না। সে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে বলল—মুখ দিয়ে রক্ত বেরোবার পর ছাড়া পাবে। সাঁটুলাল সরস্বতীর পা ধরতে উবু হয়ে বলে বলল—কাল থেকে হবে না।

সাঁটুলাল নিজেকে আজও জিগ্যেস করে—পয়সাটা কি সত্যিই মেরেছিল সাঁটু। সাঁটু শিউরে উঠে বলে—মাইরি না। মা কালীর পা ছুঁয়ে বলতে পারি। শালার পয়সাগুলোই ফক্কড়, বুঝলে! আমাকে জব্দ করতে কোন ফাঁকে সুট করে চলে এল হাতে।

এইসব দুঃখের কথা সাঁটুলাল কাউকে বলতে চায়। উজাড় করে বলবে সব। কিন্তু সাধুটা সটকেছে। আছেই বা কে?

গতকাল সাঁঝের মুখে বাবুর বউ নদীয়াল মাছ কিনতে পয়সা দিয়ে পইপই করে বলেছিল—দেখো সাঁটু, পয়সার হিসেব দিও। সরে পোড়ো না।

সাঁটুলাল মনে-মনে দিব্যি কেটেছিল—আর নয়। এবার মানুষ হতে হবে। পাঁচজনের কাছে দেখানোর মতো মুখ চাই।

পয়সাটা ফেরত দিত সাঁটু যদি নিজে সে ফিরত। হল কি গ্রহের ফের। বাজারে গিয়ে দেখল নদীয়াল মাছ ওঠেনি। কয়েকটা ন্যাটাং চ্যাং মাছ উঠেছে যা বাবুরা খায় না। পয়সা নিয়ে ফিরেই আসছিল। তেমনি সময়টায় হরগোবিন্দ খবর দিল খাড়ুবেড়েয় যাত্রা হচ্ছে। যাবে নাকি সাঁটুলাল? আগুপিছু ভাবনা সাঁটুলালের কোনও কালেই ছিল না। চাঁদনি রাত ছিল। ফুরফুরে হাওয়া দিচ্ছিল। বাবুর বাড়িমুখো হতে আর ইচ্ছে হল না তার। মনে-মনে ভাবল—আজকের রাতটাই শেষ পাপ-তাপ করে নিই। কাল থেকে মাইরি—কাল থেকে

ভালো হয়ে যাবে একেবারে। এই ভেবে তাড়ি খেয়ে নিল প্রাণভরে। তারপর খাড়ুবেড়ের রাস্তা ধরল।

আজ তাই ফিরতে একটু লজ্জা-লজ্জা করছে তার। সরাসরি গিয়ে ঢুকে পড়লে বাবুর বউ বড় চেঁচামেচি করবে।

সাঁটুলাল তাই বাজারের দিকে আটাচক্কির দোকানে গিয়ে উঠে বলল—কী খবর হে সুখচন্দ্র? ভালো তো?

সুখচন্দ্র বেশ মানুষ। মুখে একটা নির্বিকার ভাব। ঝড় হোক, ভূমিকম্প হোক সুখচন্দ্রের মুখে কোনও শুকনো ভাব নেই। বলল—ভালো আর কই? কাল থেকে নাকি তুমি হাওয়া। বাবুর বাড়িতে খুব চেঁচামেচি হচ্ছে, যাও।

—যাচ্ছি। বলে সাঁটুলাল বেঞ্চিতে বসে পড়ে। বিশে চাক্কি চালাচ্ছিল। আটা উড়ছে ধুলোর মতো চারদিকে। হুড়ো দিয়ে বলল—যাও যাও। কাজের সময় বসতে হবে না।

সাঁটুলাল দাঁত খেঁচিয়ে বলে—তুমি কে হে। যার দোকান সে কিচ্ছু বলে না তোমার অত ফোপরদালালি কীসের?

লেগে যেত। কিন্তু এ সময়ে সাঁটুর ছেলে বিষ্ণু রাস্তা থেকে উঠে এসে সুখচন্দ্রকে বলল —বাবা, মা বলে দিল ফেরার সময় আনাজ নিয়ে যেতে।

সাঁটু প্রাণভরে দেখছিল। তার ছেলে। হ্যাঁ তারই ছেলে। সুখচন্দ্রকে 'বাবা' ডাকছে! আহা ডাকুক। ওর ''বাবা'' ডাকার মতো লোক চাই তো। সে নিজে তো আর মানুষ নয়।

ছেলে বেরোল তো পিছু-পিছু সাঁটুলালও বেরোয়। ছেলে কয়েক কদম হেঁটেই পিছু ফিরে বলে—তুমি আসছ কেন?

সাঁটু একটু রেগে বলে—কেন, তোর বাবার রাস্তা?

—তুমি অন্য বাগে যাও। নইলে মাকে বলে দেব।

—কী বলবি?

—তুমি কুন্তির পয়সা চুরি করেছিলে না? মনে নেই?

—ওঃ চুরি! গঙ্গা-যমুনা খেলতে গিয়ে ছুঁড়ি কোথায় পয়সা হারিয়ে আমার ঘাড়ে চাপান দিলে।

—সে যাই হোক, তুমি কাছে আসবে না আমাদের।

—বাপকে কি ভুলে গেলি বুঝি?

ছেলে চলে গেল।

পালপাড়ার পুকুরধারে শেফালি ধরল তাকে। গা ধুয়ে ঘরে ফিরছে। দেখতে পেয়ে বলে—তোমার সঙ্গে কথা আছে।

শেফালি মোটা মানুষ। শরীর ঢিলেঢালা হয়ে গেছে। ঘামাচিতে গা কাঁথার মতো হয়ে আছে। গোলপানা থোম্বা মুখখানা দেখলে কাতলা মাছের মাথার মতো মনে পড়ে। দাঁতে নস্যি দেওয়ার নেশা আছে। একগাল হেসে বলল—খবর শুনেছ নাকি? তোমার যে আবার ছেলে হবে।

ছেলে কি বাতাসে হয়! সাঁটু অবাক হয়ে বলে—আমার ছেলে হবে কী গো!

—ওই হল! তোমার বউয়ের।

সাঁটু লজ্জা লজ্জা মুখ করে বলে—কী যে বলো বউঠান!

—বলছি বাপু, শুনে রাখো! তবে এও বলি, সরস্বতীর পেটেরটা যদি তোমার ছেলে না হয় তবে সে তোমাদের সুখবাবুর ছেলেও নয়।

সরস্বতীর ছেলে হবে শুনে সাঁটুলাল খুশিই হল। আহা! হোক, হোক। ছেলেপুলে বড় ভালোবাসে সরস্বতী। ছেলেপুলে নিয়ে সব ভুলে থাকে।

খুশি মনে সাঁটুলাল বলল—ভালো, ভালো।

ভালো কী! অ্যাঁ! ভালোটা কী দেখলে? পাঁচজনে যাই বলুক, আমি তো সুখবাবুর মুরোদ জানি। ছেলের জন্ম দেওয়ার ক্ষমতা সে মেনিমুখোর নেই। থাকলে আমার বাঁজা বদনাম ঘুচত। তুমি বুঝি ভেবেছ সুখবাবুর ক্ষমতায় কাণ্ডটা হচ্ছে? আচ্ছা দিনকানা লোক তোমরা। এ সুখবাবুর কাজ নয় গো। সাঁট আছে।

—কীসের সাঁট?

থোম্বা মুখে ঢলাঢলি হাসি খেলিয়ে শেফালি বলে—দেখেও দ্যাখো না নাকি? বিশে যে তোমাকে সেদিন খুব ঠেঙাল সে কেন জানো? বিশেকে যে দীনবন্ধুবাবু তার কারবারে বেশি মাইনেয় লাগাতে চেয়েছিল তাতে বিশে গেল না কেন জানো? সে যে এখানে বিশ টাকা মাইনে আর দুবেলা খোরাকি পেয়ে আঠার মতো কেন লেগে আছে জানো? বোঝো না? বিশে আর সরস্বতীর ভাবসাব দেখেও বোঝো না? চোখ-কান খোলা রেখে চলবে। তাহলে আর পাঁচজনের কাছে শুনে বুঝতে হবে না। যাও, বাড়ি গিয়ে ঠান্ডা মাথায় ভাব।

ভাবাভাবির কী আছে তা সাঁটুলাল বোঝে না। দিনের মতো পরিষ্কার ব্যাপার। তবে কিনা সাঁটু এসব নিয়ে মাথা ঘামায় না। আসল ব্যাপার হল, সরস্বতীর আবার ছেলে হচ্ছে।

বাড়ি ঢুকতেই আগে বাবুর সঙ্গে দেখা। বাগানের রাস্তায় শোয়ানো চেয়ার পেতে বসে বই পড়ছে। কেবল বই পড়ে। শোনা যায় কলেজের খুব নামকরা মাস্টার। মেলা বিদ্যা জানে। যদিও ধান আর চিটের তফাত বুঝতে পারে না। তা সে যা হোক, বেশি বোঝেন না বলেই ভালো। বুঝলে বড় মুশকিল।

বাবু মুখ তুলে দেখে বললেন—সাঁটুলাল যে! কোথায় গিয়েছিলে?

—এই আজ্ঞে। কাল থেকে আর হবে না।

—সে জানি। কিন্তু বাড়ির সবাই ভাবছিল খুব।

—আর হবে না।

বাবু রোগা-রোগা লোক, বেশি কথা বলে না। শুধু গম্ভীর হয়ে বলল—বিশ্বাসী লোক পাওয়া বড় মুশকিল দেখছি।

ভিতর বাড়িটা থমথম করছে। বউদি এই সবে দুপুরের ঘুম থেকে উঠল। মুখ-টুখ ফুলে রাবণের মা। তার ওপর এলোকেশী ঠোঁটে শুকনো রক্তের মতো পানের রস। গলায় কপালে ঘাম। আঁচল কুড়োতে-কুড়োতে কুয়োতলায় যাচ্ছিল, ভিতরের বারান্দায় তাকে দেখে থমকে গিয়ে বলল—তুমি কার হুকুমে বাড়িতে ঢুকেছ? বেরোও এক্ষুনি।

সাঁটুলাল টপ করে কান ধরে ফেলে বলল—কাল থেকে আর হবে না।

ঘুম থেকে উঠলে মানুষের তখন-তখন আর তেমন তেজ থাকে না। বউদিরও রাজ্যের আলিস্যি। হাই তুলে বলল—পয়সাটা ফেরত দেবে তো?

—মাইনে থেকে কাটান দিয়ে দিব বরং।

—চায়ের জল চড়াও গে যাও। বলে বউদি কুয়োর দিকে গেল।

চায়ের জল চড়ানোর কথা সাঁটুলালের নয়। সে বাইরের কাজের লোক। জল তোলে, গরুর দেখাশোনা করে, দুধ দোয়ায়, বাগান করে, কাপড় কাচে আর ফাই-ফরমাশ খাটে। ঘরের কাজ সরস্বতীর ওপর। রান্না বাসন মাজা, ঘর ঝাঁটানো বা মোছা। তাই চায়ের জল করার কথায় অবাক মানে সাঁটুলাল।

কাজ তেমন জানা নেই। তবু পায়ে-পায়ে রান্নাঘরের দিকে এগোল। রান্নাঘরের দরজা জুড়ে মেঝেয় আঁচল পেতে সরস্বতী শোওয়া। অঘোরে ঘুমোচ্ছে।

আহা, ঘুমোক। আবার মা হবে। এ সময়টায় শরীর এলিয়ে যায়। সরস্বতীর হাঁ মুখের কাছে মাছি উড়ছে, বসছে। হাত নেড়ে তাড়াল সাঁটুলাল।

তারপর খুব সাবধানে সরস্বতীকে ডিঙিয়ে রান্নাঘরে ঢোকে সে। কেরোসিনের স্টোভকে জুত করতে পারছিল না। খুটুরমুটুর করে নাড়ছিল। শব্দ পেয়ে সরস্বতী পাশ ফিরে রক্তচোখে চেয়ে বলল—ও কী! রান্নাঘরে ধুলোপায়ে ঢুকেছ যে বড়! বাইরের জামাকাপড় নিয়ে ছিষ্টি ছুঁচ্ছো! তুমি কি মানুষ? সাতবাসি হেগো মোতা কাপড়। তার ওপর কোথায় কোন আস্তাকুঁড়ে রাত কাটিয়েছ! বেরোও!

সাঁটুলাল সরস্বতীর মুখপানে চেয়ে খুব হাসে। বেশ লাগছে দেখতে। মা হওয়ার চেহারাই আলাদা।

সরস্বতী উঠে বসতে-বসতে বলল—চৌকাঠ পেরোলে কেমন করে বলো তো। আমাকে ডিঙোলে নাকি?

—তা কী করব!

—কী করব মানে? জলজ্যান্ত মানুষকে ডিঙোতে হয়?

সাঁটুলাল খুব গম্ভীর মুখ করে বলল—পোয়াতি মানুষ যেখানে সেখানে শুয়ে থাকো কেন? এ সময়টায় অসাবধান হওয়া ভালো না।

কে জানে কেন, এ কথায় সরস্বতীর মুখে বন্ধন পড়ে গেল। আর একটাও কথা না বলে উঠে চলে গেল বোধহয় কুয়োতলায়। একটু বাদে ভেজা মুখচোখ নিয়ে ফিরে এসে বলল—সরো, আমি চা করছি।

সাঁটুলাল সরল বটে, কিন্তু গেল না। দরজার চৌকাঠ ধরে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে চেয়ে রইল সরস্বতীর দিকে। সরস্বতী টের পাচ্ছে তবু চোখ তুলে তাকাচ্ছে না।

সরস্বতী তাকাচ্ছে না বলে যে সাঁটুকে খাতির দেখাচ্ছে তা নয়। আসলে এই পোড়ামুখখানা দেখাতে তার ইচ্ছেই করে না।

স্টোভের সলতে কমে গিয়েছিল। টিনের চোঙাগুলো খুলে সরস্বতী সলতে টেনে বড় করে দেশলাই জ্বেলে সলতে ধরাল। কেটলি চাপিয়ে কেরোসিনের হাত ধুতে গেল উঠোনবাগে। দেশলাইটা পড়ে রইল মেঝেয়।

সাঁটুলালের দেশলাই ফুরিয়েছে। সেই আধখানা কাঠি দিয়ে কখন একটা বিড়ি খেয়েছে। ভাবাভাবির বড় ঝামেলা। দেশলাইটা তুলে নিয়ে সাঁটু সরে পড়ল। রাজ্যের কাজ পড়ে আছে। জল তুলতে হবে, গরুর জাবনা দিতে হবে, গোয়ালে ধোঁয়া। তার আগে আবডালে কোথাও বসে ভরপেট বিড়ি খাবে এখন।

তেঁতুলের ঠান্ডা ছায়ায় বসে সাঁটুলাল পশ্চিম আকাশে রঙের বাহার দেখছিল। বিড়ি খেলে মাথাটা খুলে যায়। সব ভালো লাগে কিছুক্ষণ। তাড়ি খেলে আরও খোলে। গাঁজা খেলে তো স্বর্গরাজ্য হয়ে যায় দুনিয়াটা।

বিড়িটা যখন শেষ হয়ে এসেছে তখন বাবুর ছ'বছরের মেয়ে বাবলি এসে পিছন থেকে গলা জড়িয়ে ধরল—সাঁটুদা, তুমি পয়সা চুরি করে পালিয়েছিলে?

সাঁটু একগাল হেসে বলে—না। মাইরি না।

—আমি জানি। তুমি পয়সা চুরি করে কাল চলে গিয়েছিলে। কান ধরো।

সাঁটু কান ধরে জিভ কেটে বলে, ছিছি। বড় অন্যায় হয়ে গেছে। কাল থেকে আর বলব না।

রোজ নতুন-নতুন সব ব্যাপার শিখেছে বাবলি। আজকাল ইস্কুলে যায়। ইস্কুল থেকে কত কী শিখে আসে। যেমন এখন বাবলি একটা শুকনো গাছের ডাল কুড়িয়ে এনে বলে—হাত পাত। সাঁটু হাত পাতে। বাবলি দুর্বল হাতে গাছের ডালটা দিয়ে সাঁটুর হাতে মারে। বলে, আর করবে?

—না গো।

—নীলডাউন হও।

সাঁটু নীলডাউন হয়।

আর কী করবে ভেবে না পেয়ে বাবলি—আচ্ছা, হয়েছে। মেরেছি তো! শাস্তি দিয়েছি তো! এসো, এবার আদর করি।

বলে কাছে এসে বাবলি সাঁটুর মাথাটা নিজের কাঁধে চেপে ধরে চুলে হাত বুলিয়ে বলে—ষাট, ষাট, ষাট। লেগেছে সাঁটুদা?

বড় যন্ত্রণা হল সাঁটুর বুকটার মধ্যে। এক পুকুর জল উঠে আসতে চায় চোখে। মাথা নেড়ে বলে—না, না, লাগেনি। আমি চোর খুকুমণি, তাই আমার ছেলেপুলেরাও আমাকে ঘেন্না পায়। তুমি রোজ মেরো আমাকে। বুঝলে?

—এমন শাস্তি দেব তোমাকে রোজ সাঁটুদা, দেখবে ভয় পেয়ো না, আবার ষাট করে দেব।

ভিতর বাড়িতে দেশলাই নিয়ে ফের চেঁচামেচি হচ্ছে। হোক। সব দিকে কান দিলে হয় না। সাঁটুলালের অনেক কাজ। তাই উঠে গোয়ালঘরের দিকে গেল।

সন্ধের পর বাগানের রাস্তা থেকে বাবুর শোয়ানো চেয়ার আর জল বা চা রাখবার ছোট টুল তুলতে গিয়ে সাঁটুলাল সিগারেটের প্যাকেটটা পেয়ে গেল। তাতে দু-দুটো আস্ত সিগারেট। সাঁটু খুব অভিমানভরে ভাবল, নিলে লোকে বলবে চোর। কিন্তু এই যে হাতের নাগালে দুটো সিগারেট তার ভাগ্যে পড়ে আছে, এর মধ্যে কি ভগবানেরও ইচ্ছে নেই?

সাঁটু সিগারেটের প্যাকেটটা কামিনীঝোপের মধ্যে গুঁজে রেখে দিল। রাতে ভাত খাওয়ার পর জমবে ভালো।

রাতের কাজ সেরে সরস্বতী বিদেয় নিয়েছে। বিকেলে দেশলাই নিয়ে আজ আর বেশি চেঁচায়নি। মুখোমুখি দেখা হতে তেমন চোখে চোখে তাকায়ওনি লাল চোখ করে। বাবু আর বউদিও আজ তাড়াতাড়ি খেয়ে শুতে গেল।

বাইরের বারান্দায় শতরঞ্চি আর একটা কাঁথা পেতে শুয়ে সিগারেট টানছিল সাঁটুলাল। ঠিক সে সময়ে অন্ধকার ফুঁড়ে সরস্বতী উঠে এসে বলল—আমি পোয়াতি—এ কথা কে বলল তোমায়?

সাঁটু শুয়ে-শুয়েই ঠ্যাং নাচাতে-নাচাতে বলে—আমার সঙ্গে থাকতে তিনবার হয়েছিলে, লক্ষণ সব চিনি কি না। বলবে আবার কে?

সরস্বতী উবু হয়ে বসে বলে—মিছে বলো না। শেফালি কুচ্ছো গেয়ে বেড়াচ্ছে। তার কাছেই শুনেছ। আচ্ছা পাজি মেয়েছেলে যা হোক। নিজের হবে না, অন্যের হলে শতেক দোষ খুঁজবে। এসব কথা জানাজানি হলে সুখকর্তা আর রাখবে ভেবেছ?

সাঁটুলাল মাথা চুলকোয়।

সরস্বতী আস্তে করে বলল—শোনো, তুমি সুখচন্দ্রকে বুঝিয়ে বলবে যে, তোমার সঙ্গে যখন থাকতুম তখনও আমার চরিত্রের দোষ ছিল না, এখনও নেই। বুঝলে? তোমার মুখের কথার দাম হবে। নইলে সুখচন্দ্র আজ রাতে ওই মাগির কাছে থাকতে গেছে, রাতভর এমন বিষ ঢালবে কানে যে, পুরুষটা বিগড়োবে। কালই গিয়ে সুখচন্দ্রের সঙ্গে বসে নানা কথার মধ্যে এক ফাঁকে কথাটা তুলো।

উদাসভাবে সাঁটুলাল বলে—তুলব'খন।

—তুলো! তুমি লোক খারাপ নয় আমি জানি। দুটো টাকা রাখো। বলে আঁচলের গেরো খুলে ভাঁজ-করা টাকা বের করতে যায় সরস্বতী।

ভারী লজ্জা পায় সাঁটুলাল। বলে—আরে থাক, থাক। ওসব রাখো।

—নাও। বিড়িটিড়ি খেও। মাসে দশ টাকা মাইনে পাও, তাতে কী হয়। রাখো এটা। আমি সদর ভেজিয়ে রেখে চলে এসেছি। তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে।

—হ্যাঁ, যাও। চারিদিকে ভারী চোর-ছ্যাঁচোড়।

—সে জানি। বলে সরস্বতী আঁধারে মিলিয়ে যায়।

সাঁটুলাল দু-নম্বর সিগারেটটা ধরিয়ে ফেলল। সরস্বতী বলে গেল, সে নাকি ভালো লোক। সত্যিই কি আর বলেছে! মন রাখা কথা। কিন্তু যদি সত্যিই তাকে ভালো লোক বলে জানত সবাই।

হাতের সিগারেটটার দিকে চেয়ে রইল সাঁটুলাল। ভারী রাগ হল নিজের ওপর। আচমকা সিগারেটটা প্রায় আস্ত অবস্থায় ছুড়ে ফেলে দিয়ে নিজের দু-গালে ঠাসঠাস করে কয়েকটা চড় দেয়।

রাগ তাতে কমে না। নিজের ঘাড় ধরে নিজেকে তোলে সে। তারপর নিজেকে নিয়ে ফটকের বার করে দিয়ে বলে—যা হারামজাদা আহাম্মক ছ্যাঁচড়া চোট্টা কোথাকার! ফের যদি আসিস তো জুতিয়ে মুখ ছিঁড়ে দেব।

এই বলে হাত ঝেড়ে সাঁটুলাল ফিরে আসে। কালই গিয়ে সুখচন্দ্রকে বুঝিয়ে আসবে যে, সরস্বতী বড় সতী মেয়ে। তার গর্ভে সুখচন্দ্রেরই ছেলে। আর টাকা দুটোও ফেরত দেবে সরস্বতীকে। সে ঘুষ-টুষ খাবে না আর। পুরোনো সাঁটুলাল বিদেয় নিয়েছে।

খুব আনন্দে খানিক ডগমগ হয়ে বসে রইল সাঁটুলাল। মনটা ভারী বড়সড়ো হয়ে গেছে। বুকে যেন হাওয়া-বাতাস খেলছে। প্রাণ জুড়িয়ে গেল।

কামিনীঝোপের নীচে পড়ে থাকা সিগারেটটা ধোঁয়াচ্ছে। এখনও অনেকটা রয়েছে। খামোকা পয়সা নষ্ট।

সাঁটুলাল গিয়ে সিগারেটটা তুলে আনল ফের। বসে-বসে মনের সুখে টানতে লাগল। দেশলাইটা নেড়ে দেখল অনেক কাঠি রয়েছে। বাঁ-ট্যাঁকে সরস্বতীর দেওয়া টাকাটা।

সাঁটুলাল ভাবল—এই শেষ পাপ-তাপ বাবা। কাল থেকে ভালো হয়ে যাচ্ছি।

সূত্রসন্ধান

ছেলেবেলা থেকেই—অর্থাৎ যখন আমার বয়স ছয় কি সাত—তখন থেকেই আমার ভিতরে একরকমের অদ্ভুত অনুভূতি মাঝে-মাঝে দেখা দিত। এই অনুভূতি কীরকম তা স্পষ্ট করে বোঝানো খুব শক্ত। তবে একথা বলা যায় যে, অনুভূতিটা এক ধরনের অবাস্তবতার। একা-একা থাকলে হঠাৎ কখনও চারদিকে চেয়ে মনে হত—আমার চারদিকে যা রয়েছে—গাছপালা কিংবা ঘরের দেওয়াল, আসবাব, কিংবা মানুষ—এরা সবাই অবাস্তব, মিথ্যে। এসব জিনিসপত্র, গাছপালা এরা কোনওটাই সত্য নয়। এরকম ভাবতে-ভাবতে হঠাৎ মাথা গুলিয়ে উঠত। ওই চিন্তা মুহূর্তের মধ্যে প্রবল আকার ধারণ করত, মনে হত—এই পৃথিবীতে যা আমি চোখের সামনে দেখছি তা সবই এক অদ্ভুত উদ্ভট অবাস্তব ব্যাপার, এসবের সঙ্গে আমার কোনও যোগাযোগ নেই। আমি এই পৃথিবীর কেউ না। এই প্রত্যক্ষ বস্তুগুলি, এই আলো-অন্ধকার এই প্রিয়জন—এসবই যেন আমার চারদিকের এক মিথ্যে, অলীক আবরণ মাত্র। ভাবতে ভাবতেই আমার শরীর যেন ঊর্ধ্বদিকে উঠতে থাকত, গা শিউরোত। আমার মনে হত এক ভীষণ যন্ত্রণায় আমার মাথা ফেটে যাচ্ছে। আমার মন কিছুতেই এই চিন্তা তখন আর করতে চাইত না, কিন্তু চিন্তা তখন আমাকে ছাড়তও না। বেশ কয়েকটা ঝাঁকুনি দিত আমাকে। কিছুক্ষণ আমি আমার মধ্যে থাকতাম না। এই অনুভূতি আমার শরীরে এবং মনে এত প্রকট এবং প্রবলভাবে দেখা দিত যে, আমার বিশ্বাস ছিল এটা আমার অসুখ। সাংঘাতিক ধরনের কোনও অসুখ।

অস্বীকার করা যায় না, এটা একরকমের অসুখই। অবাস্তবতার এই অনুভূতির দার্শনিক ব্যাখ্যা থাকতে পারে। পরবর্তীকালে কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের জীবনী পড়তে গিয়ে দেখেছি, তাঁরও অনেকটা এ ধরনের অনুভূতি হত। তিনি তখন দেওয়ালে বা মাটিতে হাত চেপে ধরতেন, শরীরে ব্যথা দিতেন, এবং আস্তে-আস্তে সেই শারীরিক বেদনা তাঁর মানসিক ক্লেশকে উপশমিত করত। এ মুষ্টিযোগ আমার জানা ছিল না। তবে ওই অনুভূতি

টের পেলেই আমি জলে ডোবা মানুষের মতো প্রাণপণে মনের ওপরে ভেসে থাকতে চাইতাম। বাস্তবিক ওই সময়ের অভিজ্ঞতা ছিল, যেন আমি এক অথৈ অনন্ত জলে ডুবে যাচ্ছি।

বছরে এরকম হত দুবার কি তিনবার। প্রথম-প্রথম অনেকদিন আনতে চেষ্টা করতাম। সময়ে ছেলেমানুষি বুদ্ধিবশত আমি ইচ্ছে করেই ওই অনুভূতিটা আনতে চেষ্টা করতাম। ভাবতাম—আচ্ছা, আমার যদি এখন ওরকম হয় তবে কী হবে। এই ভেবে আমি চারদিকে চেয়ে গাছপালা, কী দেওয়াল, কী আসবাব ইত্যাদিকে অবাস্তব, অলীক ভাবতে চেষ্টা করতাম। আশ্চর্য এই যে, চেষ্টা করার সঙ্গে-সঙ্গে আমার গায়ের রোম দাঁড়িয়ে যেত, আমার শরীর হালকা হয়ে যেন ওপরে উঠে যেতে থাকত এবং মনের ভিতরে এক অথৈ কূলকিনারাহীন কালো জল আমাকে গভীরে আকর্ষণ করত। এরকম ভাবে স্থায়ী হত বড়জোর এক-আধ মিনিট। কিন্তু ওই এক-আধ মিনিট সময়েই আমার যন্ত্রণা এবং ভয় চূড়ান্ত জায়গায় উঠে যেত। চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে করত। আবার ঘাম দিয়ে বোধটা প্রশমিত হত। আস্তে-আস্তে স্বাভাবিকতা ফিরে পেতাম। শরীর এবং মন ক্লান্ত লাগত।

বয়স বাড়ে। খেলাধুলো, বন্ধুবান্ধব, জ্ঞান, অভিজ্ঞতা সবই নিয়মানুসারে বেড়ে যায়। বাইরের ব্যস্ততা যখন নিজের মনকে আচ্ছাদন দিয়ে রাখে তখন মন দিয়ে খেলা আপনিই কমে যায়। একটু বয়স বাড়লে আমারও ওই খেলা কমে গিয়েছিল। কমলেও কিন্তু ছাড়েনি। বছরে এক আধবার হতই। বড় ভয় পেতাম। মাকে গিয়ে বলতাম,—মা, আমার মাঝে-মাঝে কীরকম যেন সব মনে হয়।

মা জিগ্যেস করত—কীরকম?

ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারতাম না। মা-ও বুঝতে পারত না, কিন্তু ভয় পেত। বলত—ওসব ভাবিস কেন! না ভাবলেই হয়।

আমি নিজের ইচ্ছায় যে সবসময়ে ভাবতাম তা নয়। আমার আজও মনে আছে যে আমি ইচ্ছে না করলেও কে যেন জোর করে আমার ভিতরে ইচ্ছেটাকে তৈরি করে দিত। ভাবতে চাইছি না, তবু আমার ভিতরকার এক অবাধ্য দুরন্ত লোক যেন জোর করে আমাকে ভাবিয়ে তুলছে।

আমার বাবার ছিল রেলের চাকরি। ফলে এক জায়গায় বেশিদিন থাকা আমাদের হত না। নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াতে হত। সেইসব জায়গায় সর্বত্র তখন লোকালয় ছিল না। কোনও টিলার ওপরে বা নির্জন জায়গায় বাবা কোয়ার্টার বা বাংলো পেতেন। আমাদের পরিবারে লোকসংখ্যাও ছিল সামান্য। দিদি, আমি, ছোট বোন, ভাই তখনও হয়নি।

সেইসব নির্জন জায়গায় আমার বন্ধু জুটত কমই। যা-ও জুটত তারা ছিল কুলিকামিন বা বাবুর্চি বেয়ারার ছেলেরা। তারা আমার সঙ্গী হয়ে উঠত, বন্ধু হতে পারত না। ফলে মনের দিক থেকে একাকিত্ব কখনও ঘুচত না। পৃথিবীতে বন্ধুর মতো জিনিস খুব কমই আছে। যার সৎ বন্ধু থাকে তার অনেক মনের অসুখ ভালো হয়ে যায়। সেই বয়সে বন্ধুভাগ্য আমার ছিলই না। ফলে ওই মানসিক একাকিত্ব আমার ওই অসুখটাকে বাড়িয়েই তুলত। কিছু করার ছিল না। গুরুজনদের বুঝিয়ে বলতে পারতাম না বলে সেই যন্ত্রণা একা সহ্য করতে হত।

ক্রমে বড় হয়ে উঠতে-উঠতে আত্মসচেতনতা বাড়তে লাগল। খেলাধুলো করি, স্কুলে যাই, দুষ্টুমি করে বেড়াই। বাইরে থেকে দেখে স্বাভাবিক অন্য ছেলেদের মতোই লাগে আমাকে। কিন্তু ভিতরে-ভিতরে আমার বিশিষ্ট এক 'আমি' তৈরি হতে থাকে। সব মানুষেরই যেমন হয়। উল্লেখের বিষয় এই যে, আমার ছেলেবেলাতেই যে 'আমি' তৈরি হয়েছিল তার বৈশিষ্ট্য ছিল বিষণ্নতা, অন্যমনস্কতা, চিন্তাশীলতা একাকিত্ববোধ, নিঃসঙ্গতা। এই ধরনের ছেলেরা সাধারণত বই পড়তে ভালোবাসে। খেলাধুলো বা আমোদপ্রমোদ, লোকসঙ্গে, ভিড়ে তেমন আনন্দ পায় না। বই পড়তে-পড়তে বলগাহীন কল্পনাকে ছেড়ে দেওয়া, অবাধ চিন্তার রাজ্যে প্রিয় নির্বাসন—এর চেয়ে স্বাদু আমার কিছুই ছিল না। কাজেই অনিবার্যভাবে বাস্তবতাবোধ, কর্মপ্রিয়তা বা কোনও কাজে পটুত্ব কমে যেতে লাগল। কল্পনাবিলাসীর ভাগ্য যেরকম হয়ে থাকে। চিন্তার রাজ্যে যে রাজা উজির, বাস্তবক্ষেত্রে সে প্রায় অপদার্থ।

খেলাধুলোয় আমার খানিকটা দখল ছিল। বলে শট মারতে ভালোই পারতাম, ক্রিকেটে ব্যাট চালানো আনাড়ির মতো ছিল না, হাইজ্যাম্প-লংজাম্প বা দৌড়ে পটুত্ব না থাক, অভ্যাস ছিল। অনুষ্ঠান বা সাংস্কৃতিক সম্মেলনে কবিতা আবৃত্তি করতাম। কিন্তু সেগুলো ছিল আমার মনের উপরিভাগের ব্যাপার। মনের গভীরতর স্তরেও বাইরের এসব দৌড়লাফ আবৃত্তি তরঙ্গ তুলত। সেখানে ছিল এক অনপনেয় স্পর্শকাতরতা, আত্মচিন্তা, অভিমান। বাইরের জীবনের যত অকৃত্রিম রাগ ক্ষোভ সব সেখানে গিয়ে বাসা বাঁধত। এবং সমস্ত আঘাতই সেখানে বারংবার কল্পনার রাজ্যের দরজার পাল্লা উন্মোচিত করে দিত। বাইরের জগতের ব্যর্থ 'আমি' সেই কল্পনার জগতে আশ্রয় পেতাম। কল্পনার জগতে বহু মানুষেরই বিচরণ—তবে তার তারতম্য আছে। নিজেকে নিয়ে যার যত চিন্তা, অস্বস্তি, আত্মমগ্নতা তার বাস্তববুদ্ধি তত কম, আঘাত সহ্য করার শক্তি সামান্যই, আত্মনির্ভরশীলতা প্রায় শূন্য। আমারই সেই বিপদ দেখা দিতে লাগল। আমি আরও বেশি করে বই আর বইয়ের মধ্যে ডুবে যেতে লাগলাম। হাতে যখন বই থাকত না তখন মনে কল্পনা থাকত।

যে অনুভূতির কথা বলছিলাম তার বীজ সম্ভবত নিহিত ছিল এখানেই। চারিদিকের পৃথিবী এবং ঘটনাপ্রবাহে অবগাহন না করলে মনটা কেবলই শিকড়হীন গাছের মতো নিজের চারধারে পাক খেয়ে শুকিয়ে কুঁকড়ে যায়। বাস্তবতার জ্ঞানবর্জিত মন হচ্ছে আত্মভুক। নিজের মজ্জা-মাংস-রক্ত ছাড়া সে আর খাদ্য-পানীয় পাবে কোথায়? ফলে আর দেহের পুষ্টি এবং লাবণ্যসঞ্চার হচ্ছিল না। অল্পবয়সেই আমার মুখেচোখে বিষণ্ণতা ভর করতে লাগল।

মাঝে-মাঝে কাজে-অকাজে বাল্যকালের সেই অনুভূতি দেখা দেয়। সেই অনুভূতির বিস্ময়বোধ আমাকে ভীত, চঞ্চল করে তোলে। সমাধান পাই না। বাল্যকাল চলে গিয়ে কৈশোর আসছে—টের পাচ্ছি। দেহটি যষ্টির মতো সরল সোজা ওপরে উঠে যাচ্ছে, রোগা হাড়সার দেহ, অন্যমনস্ক, চিন্তাশীল, রুগ্ন এক কিশোর। বই পড়তে ভালোবাসে, কিন্তু পড়ার বইতে তার অনীহা। অর্থাৎ যা কিছু কাজের কাজ তার কোনওটাতেই আগ্রহ নেই।

মনে আছে আলিপুরদুয়ারে এক স্পোর্টসে নাম দিয়েছি। অঙ্ক রেস। দর্শকদের মধ্যে আমার মা-বাবা ছোট দুটি ভাইবোন আর দিদিও রয়েছে। তাদের জন্যই বড় লজ্জা করছিল আমার। দৌড় শুরু হল। কুণ্ঠা জড়ানো পায়ে দৌড়ে গিয়ে কাগজের ওপর লেখা তাঁকে উপুড় হয়ে পড়লাম। যোগ শেষ করে সবার আগে উঠেছি, দৌড়ে যাচ্ছি। নিশ্চিত ফার্স্ট, কেউ ঠেকাতে পারবে না। হঠাৎ মনে হল, কাগজে নাম লেখা হয়নি। নাম লেখা না হলে বিচারকর্তা বুঝবে কী করে যে অঙ্কটা আমিই করেছি! ভেবে দাঁড়িয়ে পড়লাম। ফিরে যাব? নামটা লিখে নিয়ে আসব? ভাবতে-ভাবতেই আর-একটা ছেলে উঠে দৌড়ে এল। দেখতে পেলাম আমার প্রথম স্থান হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। অথচ কাগজে নামও লেখা হয়নি। এই কয়েক মুহূর্তের দ্বিধা-সঙ্কোচের সুযোগে ছেলেটা আমাকে পিছনে ফেলে দৌড়ে গিয়ে তার কাগজ জমা দিল। তখন বোকার মতো অগত্যা আমিও গিয়ে নামহীন কাগজ জমা দিলাম। অঙ্ক রেসের নিয়ম অনুযায়ী অঙ্ক ভুল হলে ফার্স্ট হবে না। অঙ্ক ঠিক হওয়া চাই। অত প্রতিযোগীর মধ্যে আমরা যে প্রথম দুজন, তাদেরই অঙ্ক ঠিক হয়েছিল। ফার্স্ট হল সেই ছেলেটা, আমি সেকেন্ড। পরে জানতে পারলাম যে, সেই ছেলেটাও কাগজে নাম লেখেনি। কিন্তু তার বাস্তববুদ্ধি প্রখর বলে সে নাম লেখার কথা ভাবেওনি। আমি ভাবতে গিয়ে তার অনেক আগে অঙ্ক শেষ করেও পিছিয়ে পড়েছি। সেদিনই বুঝতে পারি, আমার সবচেয়ে বড় শত্রু হচ্ছে দ্বিধা। সেই অঙ্ক-রেসের শেষে মা খুব হতাশ হয়ে বলেছিলেন—সবার আগে তুই উঠেছিস দেখে ভাবলাম যাক রুনু এবার ফার্স্ট হবে। ওমা মাঝরাস্তায় দেখি ক্যাবলার মতো দাঁড়িয়ে আছিস হাঁ করে। কী অত ভাবছিলি? বলে রাখা ভালো যে সেই রেসে সেকেন্ড প্রাইজ ছিল না।

পরবর্তীকালে বহুবার দেখেছি সবার আগে উঠেও দৌড় শেষ করতে পারছি না। পৃথিবীতে সঠিক জায়গায় নিজেকে নিয়োগ করতে হলে খানিকটা আবেগহীন দ্বিধাশূন্য নিষ্ঠুরতা দরকার। জানা দরকার বাস্তব কলাকৌশল। নিজের ভুলত্রুটি নিয়ে মাথা ঘামানোর চেয়ে সর্বদা নিজেকে এগিয়ে রাখার চেষ্টাই ভালো। কিন্তু তা তো হল না।

বাঙালি ছেলেদের যে ভাবপ্রবণতার কথা শোনা যায় তা মিথ্যে নয়। আমার ভিতরে এই ভাবপ্রবণতার বাড়াবাড়ি বরাবর ছিল। সহজ আবেগে উদ্বেলিত হই, সহজ দুঃখে কাতর হয়ে পড়ি। চোখের সামনে পুজোবাড়ির বলি দেখে ভয়ঙ্কর মন খারাপ হয়। মনের এই ন্যাতানো স্বভাব থাকলে বড় হওয়ার পথে নানারকম বাধাবিপত্তির সৃষ্টি হয়। ভাবাবেগ জিনিসটা খারাপ নয়, অনেক আঘাত থেকে মানুষকে রক্ষা করে। কিন্তু ভাবাবেগের নিজস্ব কিছু আঘাত আছে তা থেকে আত্মরক্ষা করা খুব দুরূহ।

ছেলেবেলা থেকেই আমি রোগা। হিলহিলে শরীর, বারোমাস পেটের অসুখ, ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড—একটা-না-একটা কিছু লেগেই থাকত। বাড়িতে রেলের ডাক্তারদের আনাগোনার বিরাম ছিল না। যখন বড় হয়েছি তখনও সেইসব ছেলেবেলায় আমার চিকিৎসা যাঁরা করেছিলেন সেইসব ডাক্তারদের সঙ্গে দেখা হলে তাঁরা বলতেন—কেমন আছিস রে?

—ভালো।

—খুব ভুগিয়েছিলি ছেলেবেলায়।

মা-বাবার আমাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা ছিল খুব। আমার দশবছর বয়স পর্যন্ত আমি ছিলাম মা-বাবার একমাত্র ছেলে। আমার দু-বছরের বড় দিদি, আটবছরের ছোট বোন, কাজেই দশবছর বয়স পর্যন্ত বাড়ির সবটুকু আদর আমি নিংড়ে নিতাম। বড় মাছ, দুধের সরটুকু, ভালো জামা-কাপড়—সবই পেতাম। সেই একমাত্র ছেলে কীরকম হবে না হবে—বাঁচবে কি বাঁচবে না—এই নিয়ে মা-বাবার ছিল নিরন্তর ধুকপুকুনি। বাবা অনেক সাধু-সন্ন্যাসীকে বাসায় আনতেন, মা-ও জ্যোতিষ বা পশ্চিমা সাধু দেখলে ডেকে আনতেন। দাতাবাবা, আমেরিকাপ্রবাসী রামকৃষ্ণ মঠের সন্ন্যাসী, ভিখিরি সাধু কত এসেছে গেছে। তাদের অনেকে আমার হাত বা কোষ্ঠী বিচার করে বলেছে—এর সন্ন্যাসের দিকে টান। এক কোনও সুন্দর মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেবেন। নেপালের রাজজ্যোতিষী পরিচয় দিয়ে এক কালা জ্যোতিষ আসতেন আমাদের বাড়িতে। আমাকে দেখে বলেছিলেন—এই ছেলে মাঘ মাসে মারা যাবে।

বাবা ভীষণ ঘাবড়ে বললেন—কিন্তু আমি তো কোনও পাপ করিনি।

জ্যোতিষ মাথা নেড়ে বললেন—তবু মরবেই।

—উপায়?

—উপায় আর কী? মাদুলি। বাবা আর আমি দুজনেই দুটো মাদুলি ধারণ করলাম। আমি মরলাম না।

যা বলছিলাম, আমার দশবছর বয়সের সময়ে আমার ছোট ভাই হয়। তাতে অবশ্য আমার আদর কমেনি। রোগেভোগা ছেলে বলেই বোধহয় বরাবর সমান তালে আদর পেয়ে এসেছি। আজও পাই। আমার রোগও হত এক-একটা মারাত্মক। মাল জংশনে সেবার হল সেরিব্রাল ম্যালেরিয়া। ঘোর জ্বরের মধ্যে দেখেছি দুধারে উঁচু পাহাড়। দুই পাহাড়ের গায়ে হেলান দিয়ে দড়ি দোলনার মতো টাঙানো হয়েছে। সেই দড়িতে আমি বসে আছি। নীচে গভীর—গভীর এক খাদ। সেই খাদে পাহাড়ি নদী বয়ে যাচ্ছে। একটু দূরে একইরকম আর-একটা দোলনা। সেই দোলনা থেকে আমাদেরই পরিচিত এক ভদ্রলোক বন্দুক হাতে আমার দিকে গুলি ছুড়ছেন। গুলি গায়ে লাগছে না। দোলনাটা দুলছে। আমি দু-হাতে দোলনার দড়ি ধরে চেঁচাচ্ছি ভয়ে। এ তো স্বপ্নের দৃশ্য। ওদিকে বাস্তবে আমার জ্বর তখন একশো ছয়ের ওপর। মাথায় তীব্র রক্তস্রোত জমা হচ্ছে। যে-কোনও মুহূর্তে মৃত্যু হতে পারে। মাল জংশন তখন ছোট জঙ্গলে জায়গা। ডাক্তার বদ্যি ওষুধ কিছু পাওয়া দুষ্কর। রেলের ডাক্তার বক্কর খান সুচিকিৎসক নন। তাঁর ওপর কারও ভরসা নেই। ভাগ্যক্রমে বাবা বাসায় ছিলেন। বক্কর খানকে সময় মতোই খবর দেওয়া হল। তিনি যখন এসে পৌঁছলেন তখন আমার খিঁচুনি উঠে গেছে। বক্কর খান অন্য রোগের চিকিৎসা জানুন বা না জানুন, ম্যালেরিয়াটা খুব ভালো চিনতেন। আবার অবস্থা দেখেই কোন ধরনের ম্যালেরিয়া তা বুঝতে পেরেই চিকিৎসা শুরু করেন। আমি মৃত্যুর কয়েকঘণ্টা দূরত্ব থেকে ফিরে আসি।

এইরকম রোগে ভুগে-ভুগে আমার শরীর যেমন নষ্ট হয়েছিল, তেমনই নষ্ট হয়েছিল আমার মন। মনের জোর কাকে বলে তা জানতামই না। অল্পে ভয় পাওয়া, হাল ছেড়ে দেওয়া, আত্মবিশ্বাসের অভাব—আমি এগুলোই মেনে নিয়েছিলাম। কিন্তু এসব নিয়ে বেঁচে থাকা যায় না। বাস্তবে অপদার্থ বলেই বোধহয় মনটা দিন-দিন অবাস্তব কল্পনাপ্রবণ হয়ে উঠেছিল। আমার বাস্তবের অপদার্থতা কল্পনা দিয়ে পুষিয়ে নিতে চেষ্টা করতাম। কল্পনার রাজত্বে আমি ছিলাম বীর, সাহসী, আত্মবিশ্বাসে ভরপুর এক মানুষ। কল্পনায় বাস করার, বিপদ হচ্ছে এই, কল্পনার বাইরের এই বাস্তবজীবনে সামান্যতম দুঃখ বেদনা অপমান সহ্য করার মতো, ব্যর্থতা মেনে নেওয়ার মতো জোর অবশিষ্ট থাকে না। কল্পনাপ্রবণ মানুষ

তাই দিশেহারা হয়ে যায় সামান্য বিপদ বা দুঃখে। কিছু ঘটলেই তার মনে ঝড় ওঠে এবং দীর্ঘকাল সেই ঝড়ের প্রতিক্রিয়া থেকে যায়।

স্কুলে পড়ার সময়ে আমাকে ঘর ছেড়ে অচেনা ছেলেদের মধ্যে যেতে হল। সেখানে এল মানিয়ে নেওয়ার প্রশ্ন। হুল্লোড়বাজ ছেলেরা খ্যাপায়, পিছনে লাগে, অশ্লীল কথা বলে, ঝগড়া করে, গাল দেয়। মাস্টারমশাইরা নিষ্ঠুর। মারকুটে, স্নেহহীন এই পরিবেশে মন অসুস্থ হয়ে পড়ে। স্কুলে যাওয়ার নামে গায়ে জ্বর আসে। টিফিনে চাকর খাবার নিয়ে যায় দেখে ছেলেরা খ্যাপায়। আমার খেতে লজ্জা করে। স্কুলে যাওয়ার পথে রেলগাড়ির শান্টিং দেখে সময় নষ্ট করি। দেরি হয়ে যায়, বাড়িতে ফিরে এসে মাকে বলি—স্কুল বসে গেছে। ঢুকতে দিল না।

ঢুকতে দিচ্ছে না, আমাকে ঢুকতে দিচ্ছে না। প্রচণ্ড এক প্রতিযোগিতার জগতে আমি ঢুকতে পারছি না। ঢুকতে না পাওয়ার সেই প্রথম বোধ। ঠিকই টের পেয়েছিলাম, প্রতিদ্বন্দ্বীময় এক অদ্ভুত রূঢ় জীবন সামনে পড়ে রয়েছে।

আমার জীবন এইভাবে শুরু হয়েছিল, ভয়ে, বিষণ্ণতায়, অনিশ্চয়তার সঙ্গে।

ক্রমে অবশ্য পৃথিবীকে সয়ে নিচ্ছিলাম। কিন্তু জানতাম, সম্মুখস্থ যুদ্ধে আমার নিশ্চিত হার, হারতে-হারতেই বেঁচে থাকতে হবে, পৃথিবীতে আমার অস্তিত্বের কোনও গভীরতা থাকবে না।

যখন আমরা আমিনগাঁওতে থাকি তখন আমাদের বাসাটি ছিল ঠিক ব্রহ্মপুত্রের ধারে একটা টিলার ওপরে। খাড়া টিলা, তার নীচে ব্রহ্মপুত্র বাঁক নিয়েছে। ওপাশে নীলপর্বত, দুই পাহাড়ের মাঝখানে ব্রহ্মপুত্র সফেন গর্জন করে বয়ে চলে। ফেনশীর্ষে জলরাশি গম্ভীর ক্রোধের ধ্বনি বর্ষাকালে দুই পাহাড়ের মাঝখানের শূন্যতায় প্রতিধ্বনি তোলে ভয়াবহ। ফেরি যখন পেরোয় তখন তীর ঘেঁষে অনেকটা সাবধানে উজিয়ে স্রোত ধরে ভাঁটিয়ে গিয়ে ওপারের জেটিতে লাগে। নৌকো চলে খুব কম, বেচাল হলেই নৌকো ওলটায়। আমার বয়স সে সময়ে বছরে তেরো, সেই বয়স যখন মা-বাবার ওপর বন্ধু বা প্রিয়জনের ওপর নানা তুচ্ছ কারণে রাগ বা অভিমান বুকের পাঁজরা ভেঙে উঠে আসতে চায়। মাকে খুব ভালোবাসতাম। সেই ভালোবাসার মধ্যে আবার নির্দয় প্রতিশোধের চিন্তাও থাকত। মার ওপর রাগ করে একদিন দিগবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে দৌড়ে টিলা থেকে নামলাম। ইচ্ছে বাড়ি ছেড়ে পালাব, খুব দূরে কোথাও চলে যাব। অনেকবার এমন ইচ্ছে হয়েছে, কিন্তু সাহস হয়নি। রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরে সন্ধে পেরোলেই ঠিক বাড়ি ফিরে গেছি। বরাবর, কিন্তু এবারের রাগটা একটু চড়া, কী করছি ভেবে দেখিনি।

সকালের ফেরি ছেড়ে গেছে। বর্ষার ভয়াবহ নদী মাতালের মতো টলতে-টলতে যাচ্ছে। তার জলের দোলা দেখে প্রাণ গম্ভীর হয়ে যায়। তীরে কয়েকটা নৌকো বাঁধা। সকালের স্টিমার ধরতে না পারা কিছু লোক ওপারে পাণ্ডুতে যাবে বলে জড়ো হয়েছে। আমি তাদের দলে ভিড়ে গেলাম। কোথায় যেতে চাই এখনও তা স্পষ্ট নয়, যাব, চলে যাব চিরদিনের মতো এইটুকুই জানি। হয়তো সন্ন্যাসী হয়ে যাব, হয়তো হব মস্ত মানুষ। কে জানে আমার বুকে থমথমে অভিমান আছে, আছে প্রতিশোধস্পৃহা। আর কিছু নেই, তবু ওইটুকু তখনকার মতো যথেষ্ট।

আমাদের টিলাটা বেড় দিয়ে নৌকো চলল প্রথমে উজানে। অনেকটা দূর গিয়ে স্রোতে গা ছেড়ে পেছিয়ে আসবে। আসতে-আসতে স্রোতকে ফাঁকি দিয়ে ওপারের ঘাটে বাঁধবে। বিপজ্জনক কৌশল। সাঁতার জানি, কিন্তু আত্মবিশ্বাস নেই, নদীর স্রোত ক্ষুরধার, একধারে বসে জল দেখছি। স্রোতের বেগ নৌকোয় ঝাঁকি দেয়, গুড়্গুড় করে কাঁপায়। নৌকো ওঠে, নৌকো পড়ে। মানুষজন ছবির মতো স্থির বসে, মন চঞ্চল। মাঝিরা ঘেমে যাচ্ছে উজানে নৌকো নিতে। তাদের দাঁতে দাঁত, টান-টান দড়ির মতো হাত-পায়ে ছিঁড়ে আসা ভাব।

অনেকদূর উজানে গেলাম, টিলার ছায়ায়-ছায়ায়, তখনও আমাদের বাড়িটা দেখা যাচ্ছে না। নৌকো যখন স্রোতের মুখ ছাড়ল তখন একটানে ঘুরপাক খেয়ে মাঝদরিয়ায় চলে গেছি। মাঝি হাঁকছে—সামাল! জল নৌকোর কানার সমান। অন্যধার উঁচু হয়ে আছে। পৃথিবীটা সে-সময়ে বাঁকা হয়ে ঝুলে আছে। আকাশ বুকের ওপর। সেই সময়ে দিকের জ্ঞান ছিল না। বেভুল নৌকোটা যে কোনদিকে যাচ্ছে বোঝাবার চেষ্টাও করিনি। নৌকোর কানা আঁকড়ে প্রাণপণে জীবনের সঙ্গে, আয়ুর সঙ্গে লেগে আছি। সাঁতার জানি, কিন্তু আমার কোনও জ্ঞানই যে সম্পূর্ণ নয়। অভিমান ভেসে যায়, ভয়ে চেঁচিয়ে ডাকি 'মা'।

ঠিক সেই সময়েই হঠাৎ অলৌকিকভাবে মাকে দেখতে পাই। নীল আকাশের গায়ে একটা টিলার কালচে সবুজ মাথা জেগে ওঠে বাতিঘরের মতো, আমাদের বাসাটার লাল টিনের চাল দেখা যায়। বারান্দায় বাঁশের জাফরি। তার সামনে সিঁড়ির উঁচু ধাপটায় মা দাঁড়িয়ে আছে। সকলের রোদ পড়েছে চোখে। মা হাতের পাতায় চোখ আড়াল করে নিবিষ্ট মনে চেয়ে আছে নদীর দিকে। বিশাল এক অথৈ পৃথিবী তার সামনে। সেই সীমাহীন পৃথিবীর কোন দিকে গেল তার অভিমানী ছেলে! মা নিবিষ্টভাবে, আকুলভাবে দেখছিল, বুক থেকে আটকে থাকা শ্বাসের একটা পাখি বেরিয়ে গেল। নৌকো সোজা হয়ে চলতে থাকে। অভিমান ভুলে গভীর তৃষ্ণায় মার মূর্তিটার দিকে চেয়ে থাকি। দূর থেকে দূরে ক্রমে ছোট হয়ে আসে মূর্তিটা। কিন্তু স্থির থাকে, বাতিঘরের মতো।

সেবার নিরুদ্দেশে যাওয়া হল না। ব্রহ্মপুত্র পেরিয়ে কামাখ্যা পাহাড়ে উঠে দুপুরের আগেই ফিরে এলাম।

বাসার বাইরে যে পার্থিব সংসার সেইটাই ছিল ভয়ের। সংসারের ভিতরে আমি মা-বাবার আদুরে ছেলে, ভাইবোনের প্রিয় সহোদর কিন্তু বাইরের পৃথিবীতে আমি কেউ না। একবার এক বুড়ো চিনে-বাদামওয়ালার কাছে একটা অচল সিকি গছানোর চেষ্টা করেছিলাম ছেলেমানুষি বুদ্ধিবশত। মনে হয়েছিল, লোকটা বোধহয় চোখে ভালো দেখে না। বাদাম নিয়ে সিকিটা দিতেই সে সেটা হাতড়ে দেখল, তারপর আমার হাত চেপে ধরে সে কী চিৎকার—এ-ব্যাটা চোট্টা আমাকে সাট্টা পয়সা দিতে এসেছে। পুলিশ...পুলিশ! বাজারের এক ভিড় লোক ছুটে এল। অচেনা পৃথিবীর বিরুদ্ধতা দেখে এমন ভয় পেয়ে দিশেহারা হয়েছিলাম সেদিন! আর একবার বন্ধুদের সঙ্গে হাটে গেছি। হাট থেকে চুরি করা ছিল বন্ধুদের একটা খেলা। আমি করতাম না, ভয় করত। সেবারই প্রথম সাহস করে একটা টিনের বাঁশি নিয়ে দোকান থেকে বেশ কিছু দূর চলে গেছি, হঠাৎ সেই লোকটা এসে আমার হাত ধরল, একটিও কথা না বলে পকেট থেকে বাঁশিটা বের করে নিয়ে চলে গেল। কেউ কিছু বুঝল না, কিন্তু আমি সেই লোকটার ওই আচরণের বিরুদ্ধে একটি কথাও বলতে পারিনি। লজ্জায় ভিড় ভেঙে পালিয়ে গিয়েছিলাম। তারপর একা-একা সেই ঘটনার কথা ভেবে কতবার এবং আজও গা শিউরে ওঠে লজ্জায়, আধোঘুমে চমকে উঠি। হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার সময়ে কাটিহারের খালাসিটোলার রাস্তায় একজন মুসলমান ছেলে আমাকে অকারণে গাল দিয়ে একটা চড় মেরেছিল। সে জানত না তার ওই চড়টা আমার আত্মার গায়েতে দীর্ঘকাল তার হাতের ছাপ রেখে দেবে। ভুলতে পারি না, কিছুতেই সেই চূড়ান্ত গাল আর চড়টি ভুলতে পারি না। সংসারে স্নেহচ্ছায়ায় বাইরে নিষ্ঠুর ও উদাসীন এই পৃথিবীটি রয়েছে। অচেনা মানুষের হৃদয়হীনতা রয়েছে, তাদের আক্রমণ আক্রোশ, নিষ্ঠুরতা আমি কী করে ঠেকাব!

এই মানসিকতা থেকেই একটা অসুস্থ বৈরাগ্য জন্ম নিয়েছিল আমার শক্তিহীনতা, অনুজ্জ্বল মন, লড়াইয়ের আগেই পরাজয়ের মনোভাব আমাকে ক্রমশ সমাজ-সংসারের বাইরের দিকে ঠেলে দিচ্ছিল। যেখানে প্রতিদ্বন্দ্বীতা নেই, অচেনা মানুষ নেই, অপমান নেই, যেখানে আমি তৃপ্ত একাকী সেই নির্জনতার দিকে টান পড়তে থাকে। এই বৈরাগ্য শক্তিমানের সন্ন্যাস নয়, দুর্বলের পলায়ন।

একবার এই সুখী বাড়িতে গেছি মা-বাবা-ভাই-বোনদের সঙ্গে। বড়লোকের বাড়ি, বিলিতি আসবাব, বৈঠকখানায় মদের বার, ছেলেমেয়েদের মুখে ইংরেজি। তারা আমাদের খুবই সমাদর করেছিল। সে বয়সে আমি ছিলাম ভীষণ রোগা। সেই রুগ্নতা বোধহয় সেই

বাড়ির কর্তার খারাপ লেগেছিল। একটা ছেলে এত রোগা হবে কেন? তিনি তাঁর স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েদের সামনে বারবার জিগ্যেস করেছিলেন, তুমি কি খাও না? ছোট না? খেলো না? তুমি অত রোগা কেন? সে ভারী অস্বস্তিকর একটা অবস্থা। আমার রুগ্নতা এমনিতেই আমার মা-বাবার দুশ্চিন্তার কারণ ছিল, তার ওপর ওই সব প্রশ্ন মা-বাবারও ভালো লাগছিল না। প্রশ্ন করার ভঙ্গিটা ছিল অন্য ধরনের। তাতে সমবেদনা নেই, অনুকম্পাও না। বরং চাপা একটু ঘেন্না আর শ্লেষ ছিল। সে কেবল আমিই টের পাচ্ছিলাম। সূচীমুখ যন্ত্রণা। নানা কথার মাঝখানে ঘুরে ফিরে তিনি আমাকে অপমান করতে লাগলেন। জিগ্যেস করলেন স্ট্রেট লাইনের ডেফিনেশন কী। পড়া ছিল, কিন্তু ঘাবড়ে যাওয়ায় সে মুহূর্তে মনে পড়েনি। বলতে পারলাম না দেখে তিনি সপরিবারে হাসলেন। আমি ঘামছি। আমার ভাইবোনেরা তখন সে বাড়ির ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কলের গান বাজাচ্ছে, ছবির বই দেখতে-দেখতে অবাক হয়ে যাচ্ছে, কুকুরকে বল ছুড়ে দিয়ে খেলছে, আর আমি মায়ের কাছ ঘেঁষে কাঠ হয়ে বসে নিজের অপদার্থতার কথা ভাবছি। মনে হচ্ছিল, সমাজ সংসারে আমার জন্য নয়। পালাও পালাও। এরা সবাই তোমার শত্রু, প্রতিদ্বন্দ্বী, তোমার প্রতি এরা সবাই দয়াহীন। সংসারের বাইরে কোনও নির্জনতায় চলে যাও, সন্ন্যাসী-বৈরাগী হয়ে যাও। বেঁচে থাকা মানেই প্রতি মুহূর্তে বৃশ্চিক দংশন, সূচীমুখ যন্ত্রণা, বেঁচে থাকা মানে আত্মায় মলিন হাতের ছাপ। সুতো ছেঁড়ো, পালাও।

অর্গান্ডির মতো পাতলা নেটের পরদা উড়ছে বাতাসে। কলের গান বাজছে, কী সুন্দর ঠান্ডা ঘর, নরম সোফা কৌচ, মহার্ঘ আসবাব, তবু এই পরিবেশে মানুষ কত নিষ্ঠুর ও হীন হতে পারে।

মা সবচেয়ে বেশি আমার ব্যথা বোঝে। চিরকাল মায়েদের এই ক্ষমতা। মা আমাকে একটু ঠেলে দিয়ে চাপা গলায় বলল, বাইরের বাগানটা তো সুন্দর, একটু ঘুরে-টুরে আয় না।

বেঁচে গেলাম।

সেই সুন্দর বাগানে প্রজাপতির খেলা দেখছি, আর মনে-মনে নিজের জন্য লজ্জা হচ্ছে। কোথায় পালাব? কেমন করে? সংসারের বাইরে যাওয়া ছাড়া আমার যে উপায় নেই!

ভদ্রলোকের দশ বছর বয়সের মেম চেহারার মেয়েটি ছুটে আসে। ভয়ে ত্রস্ত হয়ে তার দিকে চাই। সে কাছে চলে আসে বাতাসের মতো সাবলীল, কী সুন্দর জোরালো চেহারা তার, কী সদগন্ধ তার গায়ে। চোখে বিদ্যুৎ। নতুন অপমানের জন্য মনে-মনে প্রস্তুত হতে থাকি। অপমান বা নিষ্ঠুরতা ছাড়া আমি বাইরের লোকজনের কাছ থেকে আর কিছুই আশা করতে পারি না যে!

সে বোধহয় তার ইস্কুলে নিঃসঙ্কোচে ব্যবহার করতে শিক্ষা পেয়েছিল। এসে আমার হাতখানি ধরে বলল—চলো, ওই কোণে আমার পড়ার ঘর, সেখানে বসি। তোমার গলার স্বর খুব সুন্দর, নিশ্চয় তুমি খুব ভালো কবিতা পড়তে পারো!

সে তার পড়ার ঘরে নিয়ে গেল আমাকে, কত বই তাদের! সে একটা ডিভানে আমার পাশে বসে রবি ঠাকুরের কবিতার বই খুলে বলল—একদম বাংলা পড়তে পারি না স্কুলে। ইংরিজি স্কুল তো, শেখায় না, অথচ কবিতা পড়তে আমি যে কী ভালোবাসি!

জড়তা কাটাতে সময় লেগেছিল, তবু ওই একটা বিষয় আমি পারতাম। ভাব ও অর্থ অনুসারী কবিতা পাঠ। পড়লাম। তার চোখে মুগ্ধতা দেখা দিল, তারপর করুণতর কবিতাগুলি পড়ার সময়ে অশ্রু। একটা বেলা কেটে গেল তার সঙ্গে।

—তুমি আমাকে শেখাবে? উঃ কী যে পড়ো তুমি, শুনতে-শুনতে যেন ভূতে পায়!

সংসারের বাইরে আর যাওয়া হয়নি। সুতো আজও ছিঁড়ি, কিন্তু কে যেন নতুন সুতোয় নতুন বঁড়শি অলক্ষে গিলিয়ে দেয়।
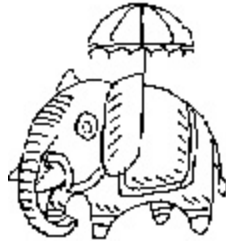
পুরোনো চিঠি

নিশুতরাতে এসেছিল এক ডাকপিয়োন। দরজা খুলে দেখি ব্যাগ ভরতি চিঠি, হাত ভরতি চিঠির ভারে কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বুড়ো-সুড়ো লোকটা। জ্যোৎস্নায় ভেজা তার দাড়ি, চাঁদের গুঁড়ো লেগে আছে তার উড়োখুড়ো পিঙ্গল চুলে, জ্যোৎস্নার রস টলটল করছে তার চোখভরে। উজাড় করে সে চিঠি ঢেলে দিল আমার দুই আঁজলায়। হাত উপচে চিঠির-পর-চিঠি গড়িয়ে পড়ল মেঝেয়, সিঁড়িতে, ছিটকে পড়ল সিঁড়ির নীচেকার ঘাসে। ব্যস্ত হয়ে চিঠিগুলো কুড়িয়ে নিতে থাকি। খুলে পড়তে গিয়ে দেখি, এ সবই পুরোনো সব চিঠি, আদালতের সপিনা, জীবনবিমার প্রিমিয়ারের নোটিশ, বিয়ের আগেকার প্রেমপত্র। সুসংবাদ-দুঃসংবাদে ভরা এসব চিঠি তো আমি কবেই পেয়েছি, তবে কোথা থেকে আবার ঘুরে এল এগুলো? শুনতে পেলাম বুড়ো পিয়োনটা পাড়ার দরজায় দরজায় নিশুতরাতে কড়া নেড়ে ফিরছে, বিলি করছে পুরোনো সব চিঠি, দলিল, নোটিশ।

ঘুম ভেঙে উঠে বসলাম বিছানায়। স্বপ্ন। শিয়রের জানালা দিয়ে একটু শেষরাতের জ্যোৎস্না এসে পড়েছে আমার ঘুমন্ত মেয়ে আর বউয়ের মুখে। একটু চেয়ে থাকলাম মুখ দুটোর দিকে।

মায়ের বুক ঘেঁষে কেমন নিবিড়ভাবে শুয়ে আছে মেয়েটা। জেগে উঠে আবার স্বপ্নে দেখা পিয়োনটার কথা মনে পড়ল। চিঠির ভারে নুয়ে পড়া বুড়ো বিড়বিড় করে আপন মনে কথা বলছে, আর বিলি করছে তামাদি সব কাগজ, ভুলে যাওয়া সব পুরোনো চিঠি। স্বপ্নটার মানে কী?

নিঃসাড়ে বিছানা ছেড়ে উঠে আসি। জানলার গরাদের ফাঁক দিয়ে দেখি, আকাশে স্টিমারের আলোর মতো এক গোল চাঁদ। নির্জন জ্যোৎস্নায় চোরের মতো পা ফেলে হেঁটে

যাচ্ছে বাতাস, জানালায় উঁকি দেয় লোভী বেড়ালের চোখ। রাস্তায় চৌকিদার লাঠি ঠুকে-ঠুকে হাঁটছে।

বুকের বাঁ-ধারে একটু ব্যথা টের পাই। মনটা বিষণ্ণ। জল খেলাম, একটা আস্ত সিগারেট শেষ করলাম, তবু আর শুতে ইচ্ছে করল না। মনের মধ্যে একটু ভয়-ভয় ভাব। ঘড়ি দেখলাম। তিনটে। রাত ফুরোতে ঢের দেরি। অন্ধকারে একা ভূতের মতো বসে রইলাম। রাতটা অস্বস্তির সঙ্গে কেটে গেল।

সকালে মেয়েকে নিয়ে বেড়াতে বেরোই। আমার পাঁচ বছরের মেয়ে মুন্নি কুকুর দেখে, বেড়াল দেখে, পাখি দেখে, থেমে-থেমে হাঁটে। আমি মাঝে-মাঝে এগিয়ে যাই, সে পিছনে পড়ে থাকে। তারপর দৌড়ে এসে আমাকে আবার ধরে। এত সকালে রাস্তায় লোক চলাচল থাকে না। ভারী নির্জন রাস্তা। ভোরের গন্ধটি কেমন সতেজ, আলোটি কেমন ছায়াময়। হাঁটতে-হাঁটতে আমরা কথা বলি।

মুন্নি বলে—আমার হাত ছেড়ে দাও বাবা, আমি তো একাই হাঁটতে পারি।

—ঠিক তো। বলে আমি হাত ছেড়ে দিই তার।

মুন্নি হাসে—তবে কেন আমার হাত ধরে থাকো রোজ? আমি কি হারিয়ে যাই?

—না-না। আমি তাড়াতাড়ি বলি,—'তুমি তো হারাও না, আমিই হারিয়ে যাই মা, সেই ভয়ে হাত ধরে থাকি।'

—তুমি কি ছোট্ট?

বলি—হুঁ।

—আমার চেয়েও ছোট্ট।

—তোমার চেয়েও।

—কাল থেকে তো আমি ইস্কুলে যাব, তখন কার সঙ্গে তুমি বেড়াবে?

একটু চমকে উঠি। ঠিক। মুন্নি কাল থেকে প্রথমে ইস্কুলে যাবে। কাল থেকে আমি কার সঙ্গে হাঁটব?

ম্লান হেসে বলি—একাই বেড়াব মা।

—যদি হারিয়ে যাও?

'হারিয়ে যাব?' হঠাৎ আমাকে ঘিরে এক স্তব্ধতা নেমে আসে। নিজেকেই প্রশ্ন করি 'হারিয়ে যাব?'

মুন্নি পিছিয়ে পড়ে। তার জুতোয় কাঁকর ঢুকেছে। জুতো খুলে কাঁকরটা বের করছে সে। আমি একটু এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াই। পিছু ফিরে দেখি, শূন্য রাস্তার মাঝখানে আমার শিশু মেয়ে একা। ঝাঁকড়া চুল মুখের ওপর ফেলে উবু হয়ে জুতো পরিষ্কার করছে। দৃশ্যটা থেকে চোখ ফেরাতে পারি না।

নিশুতরাতে এসেছিল এক ডাকপিয়োন। আমার সারাজীবনের সব স্মৃতি ফিরিয়ে দিয়ে গেছে। বোধহয় আমার আর কোনও চিঠি আসবে না। আমি যেন ঠিক মোহনার কাছে পৌঁছনো এক নদী, যার স্রোতের আর কোনও ঢল নেই। সামনে মহাসমুদ্র।

আমি মুন্নির জন্য অপেক্ষা করি। কিন্তু আমার দিকে তার আর মনোযোগ নেই। সে কাককে ঢিল ছুড়ছে। আমি একটু হাসি, তারপর এগিয়ে যেতে থাকি। মুন্নি একা আসতে পারবে। আমি যখন থাকব না, তখনও তো মুন্নিকে একাই হাঁটতে হবে।

হরীতকী

আজ এই পূর্ণিমা রাতে টিউশনি সেরে ফেরার পথে গিরিজা টের পেলেন, তাঁকে কানাওয়ালা ধরেছে।

বাঘা যতীন পার্কের পাশ দিয়ে গুটিগুটি হেঁটে জ্যোৎস্না দেখতে-দেখতে দিব্যি আসছিলেন। শরৎকালের ফুরফুরে হাওয়া দিচ্ছে, শীত-শীত লাগছিল। কোনও বাড়ির বাগান থেকে শিউলি ফুলের গন্ধও ভেসে আসে, সেইসঙ্গে একটা ডাল ফোড়নের গন্ধওয়ালা জায়গাও পার হয়ে এলেন। খিদেটা চাগাড় দিয়ে উঠল। আবুর মা ওবেলা একটা ফুল মার্ক পাওয়া মোচাঘণ্ট রেঁধে রেখেছে, এবেলাও সেটা দেবে, সেইসঙ্গে ঘানির তেল আর কাঁচা লঙ্কা দিয়ে ডালসেদ্ধ—ভেবে একটু তাড়াহুড়ো করে হাঁটছেন। বাঘা যতীন পার্ক পেরিয়ে দু-নম্বর ডাবগ্রামের রাস্তা পেরিয়ে আদিগন্ত জ্যোৎস্নায় এক নম্বর ডাবগ্রামের রাস্তায় নেমে পড়তেই টের পেলেন, রাস্তা চিনতে পারছেন না। জ্যোৎস্নারাতে মফসসলের রাস্তায় ইলেকট্রিক আলো থাকে না। তা না থাকুক, ফটফটে রাস্তাঘাট সবই দেখা যাচ্ছে। আমগাছ, জামগাছ চেনা যাচ্ছে। কিন্তু কানাওয়ালা ধরলে আর কিছু উপায় থাকে না। দশবার নিজের বাড়ির সদর দিয়ে হেঁটে গেলেও বাড়ি চেনা যায় না।

ছেলেবেলা থেকেই এই কানাওয়ালা ভূতটা প্রায়ই ধরে এসে গিরিজাকে। একা জুতমতো পেলেই সাঁপুটে ধরে, খুব নাকাল করে ছেড়ে দেয়। তার ওপর গিরিজার বয়স এই তিয়াত্তর পেরোল, এ বয়সে অনেক কিছুই ভোঁতা মেরে যায়। মাথার মধ্যে সব সময়ে একটা ধন্ধ ভাব।

ডাবগ্রামের এক মাথায় সরকারি গুদাম। পিপে যদি আড়াআড়ি করে আধখানা মাটিতে পোঁতা যায় তবে যেমন দেখতে হয় গুদামের চেহারা অবিকল সেরকম। লম্বা-লম্বা ঘর,

টিনের ছাউনি গোল হয়ে নেমে এসেছে। সারি-সারি চল্লিশ পঞ্চাশটা গুদামঘরের ভিতরে রাস্তাটা ধাঁধা মেরে গেল। কাছেপিঠে লোকজনও দেখা যাচ্ছে না। রাত্রি বাজে দশটা। চারদিক ঝিম মেরে গেছে। গিরিজা এদিক-সেদিক ঘুরলেন। খুব খিদে পেয়েছে। রাস্তা পাচ্ছেন না। গত পনেরো বছর এইসব রাস্তায় ঘুরলেন। তবু পাচ্ছেন না। ছেলেবেলা থেকেই শুনে এসেছেন, কানাওয়ালা এক কানাভূত যাকে ধরে তাকে চেনা রাস্তায় ঘুরপাক খাওয়ায় আর আবড়ালে বসে হিহি করে হাসে। ভূতেদের যা স্বভাব। যৌবনকালে গিরিজা যখন বিজ্ঞান পড়তেন তখন বয়োধর্মে আর ভূত-ভগবান মানতেন না। এই বুড়ো বয়সে আবার সেই শিশুবেলার ভয়ভীতি ফিরে এসেছে। এখন ভূতও আছে, ভগবানও আছে। গিরিজাপতি তাই কানাওয়ালাকে তাড়ানোর জন্য ডাকেন—রাম-রাম! জয় সচ্চিদানন্দ রঘুপতি রামচন্দ্র। রাম হে, হরি হে—

কোথায় কী? রাস্তা-ঘাট সব গুলিয়ে গেছে। প্রচণ্ড জ্যোৎস্না প্রায় রোদ্দুরের মতো উজ্জ্বল। রাস্তায় নুড়ি-পাথরটার পর্যন্ত ছায়া পড়েছে। গুদামঘরগুলোর টিনের ছাউনিতে খটখটাং করে শব্দ হয় মাঝে-মাঝে। সে ভূতের ঢিল নয়। তিনি জানেন, সারাদিনে তেতে থাকা টিন রাতের ঠান্ডায় একটু-একটু করে সংকুচিত হয়ে আসে, তাই এ শব্দ। জেনেও কিন্তু মন মানে না, চমকে উঠে ভাবেন —ভূতের ঢিল নয়তো বাবা। অ্যাঁ!

যে বাড়িতে টিউশনি করেন সে-বাড়ির কর্তা ভবেশ রায় নিজেকে বুড়োমানুষ ভাবেন। বয়স কিছু না, মোটে বাষট্টি। বিরাট অবস্থা। গোটাদুই চা বাগানের মেজর শেয়ার, গোটাছয়েক লরি, বিধান মার্কেটে ফ্যান্সি দোকান। সুখী মানুষ। প্রায়ই এসে মেয়ের পড়ার ঘরে বসে গিরিজার সঙ্গে আড্ডা দেন। কিন্তু গিরিজার সঙ্গে ভবেশের মতের মিল হয় না। ভবেশ বলেন—বুড়ো বয়সে খাওয়া কমানো উচিত। তাই ভবেশ রায় নিজেও কম খান। একটা মধুপর্কের বাটির মাপের এক বাটি ভাত একবেলা, সকাল-বিকেল এক চিমটি করে ছানা, রাতে গোনা দু-খানা রুটি। এই খেয়েই নাকি খুব শক্ত আছেন ভবেশ। গিরিজার সেটা ভাবতেই কষ্ট হয়। অত কম খেয়ে বাঁচে নাকি লোকে? তাঁর নিজের তো অনন্ত খিদে। একগোছা রুটি আর জলের গেলাস দিয়ে বসিয়ে দিলে এই বয়সে নির্দন্ত মুখে টাউটাউ করে শুধু মাড়িতে চিবিয়ে খেয়ে ফেলেন পলকের মধ্যে।

তবে কি গরিবেরই খিদে পায় বেশি?

আজ রাতে ভাত হবে। শালবাড়ির দিকে বিঘে চারেক জমি আছে, বর্গায় চাষ করে। সেখান থেকে পরশুদিনই আধমণ চাল দিয়ে গেছে ভালোমানুষ বর্গাদার। ক'দিন রাতের খাওয়াটা বেশ হচ্ছে। ফোটা ভাতের গন্ধ পাচ্ছেন যেন গিরিজা! কিন্তু কোথায় ভাত। কেবল অকাজের জ্যোৎস্না চারদিকে।

দুই

আবুর কাজ বলতে দুটো, কালী সাধনা আর বকবক।

কালী সাধনা অবশ্য তার নিজের খেয়ালখুশি মতোই করে। ঘরের এক জায়গার দেওয়াল নোনায় খেয়েছে। সেই দাগধরা জায়গাটার দিকে চেয়ে সারাদিন একটু কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে সে রামপ্রসাদী থেকে যাবতীয় শ্যামাসঙ্গীত সম্পূর্ণ বেসুরে গায়। সাধনার শেষ দিকটায় কালী নামটা আর পুরো উচ্চারণও করতে পারে না, কেবল বলে—কাঃ, কা কা, কাঃ কা কা—। সে স্নান করে না, স্নানের বদলে সে রোজ সকাল-বিকেল আধ কলসি করে জল খায়। সেটা নাকি অন্তস্নান। দেহের সব ময়লা ওই জলের ঠেলায় ঘামের সঙ্গে বেরিয়ে যায়। তখন গামছা দিয়ে গা মুছলেই স্নান হয়ে গেল। মাথার চুল জটা হয়ে পেছন দিকে মৌচাকের মতো ঝুলে থাকে। ওদিকে কপালের ওপর দিকটায় টাক পড়ে যাচ্ছে। উকুনের চুলকনিতেও নখের ডগায় চুল উঠে আসে। তা টাকই পড়ুক, আর জটাই ঝুলুক, আবুকে সুন্দর দেখবার কেউ নেই। বউ তার সঙ্গে থাকে না। বিয়ের পর বারো বছর কষ্টেসৃষ্টে ছিল, তারপর বাপের বাড়ির চলে গেছে। কোথায় একটা চাকরি-বাকরি করে। মাস পয়লা আবার আবুর কাছ থেকেও কিছু আদায় করে নিয়ে যায়। আবু পেশকারী করে। সাধুসন্ত মানুষ বলে তার রোজগার বেশি নয়।

ইদানীং তাকে হরীতকীতে পেয়েছে। কেরোসিনওয়ালা রামু বাড়ি-বাড়ি ঘুরে সাইকেলওয়ালা গাড়িতে কেরোসিন বেচে। রামু বলে তার বয়স নাকি নব্বই। ইয়া স্বাস্থ্য, যুবকদের চেয়েও বেশি শক্তি।

আবুর আবার সকলের সঙ্গেই ভাব। সারাদিন বকবক করতে হলে লোক বাছাবাছি চলে না। প্রতিদিনই সে কিছু না কিছু অপরিচিত লোককে আপন করে ফেলে। রামুর সঙ্গে তার ভাব অবশ্য দীর্ঘকালের।

দিনসাতেক আগে রামু তাকে কয়েকটা অদ্ভুত জিনিস খেতে দিয়েছিল, কচিকচি হরীতকী, বালিতে ভাজা। ভারী ভালো খেতে। ভাজা হরীতকী খেয়ে আবু মোহিত হয়ে গেল। রামু বলে—হারা খেয়ে এই নব্বই বরিষ উমরে আমার এত তাকত।

কোনও জ্ঞানই ফ্যালনা নয়। সেই থেকে আবু হরীতকীর পিছনে লেগেছে। গত সাতদিন মানুষ হরীতকীর জীবন-যৌবন-দায়িনী ক্ষমতার কথা শুনতে-শুনতে পাগল হয়ে গেল। তবু আবুর ক্লান্তি নেই। বিধান মার্কেট আর পুরোনো বাজার ঘুরে সে ইতিমধ্যে প্রায়

তিন কিলো হরীতকী এনে ফেলেছে। জামার দু-পকেট ভরতি হরীতকী নিয়ে ঘোরে, যাকে তাকে ধরে-ধরে খাওয়ায়। নিজে সবসময় মুখে হরীতকী নিয়ে ঘুরছে।

সন্ধেবেলা সে মানিকরামের ডাক্তারখানায় উঠে বসে পড়ল। ডাক্তারখানায় রুগি-টুগি আসে না। মানিকরামের ঢের পৈতৃক পয়সা আছে, আর ব্রিজ খেলার নেশা। পসার নেই। নিতান্ত দায়ে না পড়লে কেউ তাকে ডাকে না, বলে—ও তো তাস খেলতে-খেলতে ডাক্তারি ভুলে গেছে। তবু ডাক্তারখানা আছে নামকোবাস্তে। সন্ধের পর সেখানে ব্রিজের আড্ডা বসে, কিছু উটকো লোক সময় কাটাতে আসে, গল্পগাছা হয়। আবু ডাক্তারখানায় ঢুকতেই কিছু লোক খবরের কাগজের পাতা ভাগ করে ডুব দিল, একজন অন্যধারে উঠে গেল। চোরের দায়ে ধরা পড়ল বেকার কম্পাউন্ডার সাধন। সে টোকা দিয়ে মশা মেরে টেবিলের ওপর জড়ো করছিল। রোজ সেঞ্চুরি করে। আজও তিরাশিটা হয়েছে এ পর্যন্ত। আর সতেরোটা বাকি। টেবিলের ওপর মরা মশার একটা ছোট স্তূপ তৈরি হয়েছে। চুরাশি নম্বর মশাটা পান করে কানের কাছ থেকে উড়ে এসে থুতনিতে ধাক্কা খেয়ে বসি-বসি করছে। সাধন খুব সাবধানে অনড় হয়ে লক্ষ রাখছিল। এমন সময়ে আবু উঠে এসে ঝপ করে বসেই বলতে শুরু করল—হুত্তুকির যা কাণ্ড দেখলাম সাত দিনে, বলার নয়।

মশাটা বসল না। উড়ে অন্যধারে চলে গেল। বিরক্ত হয়ে সাধন বলে—বেশি খেও না আবুদা।

আবু অবাক হয়ে বলে—বেশি খাব না?

—না। পরে বিপদে পড়বে।

আবু রেগে গিয়ে বলে—হত্তুকির তুই জানিসটা কী শুনি! মুনিঋষিরা একটা করে পাকা হত্তুকি খেয়ে কতকাল বাঁচত জানিস?

—মুনিঋষির কথা বাদ নাও। তারা না হয় একটা করে খেত, তুমি কিন্তু দশ-বারোটা করে চালাচ্ছ। শেষে বিপদে পড়ে যাবে।

—যা জানিস না তা নিয়ে কথা বলবি না। বিরক্ত হয়ে আবু বলে।

—দাসীর কথা বাসি হলে কাজে লাগবে। সাধন চুরাশি নম্বর মশাটিকে গোড়ালির হাড়ের ওপর খতম করে টেবিলের ওপর রাখল। আর ষোলোটা। আবুর দিকে চেয়ে বলল —বেশি হত্তুকি খেলে শুক্রতারল্য হয়।

হ্যাঁ-হ্যাঁ করে হেসে ওঠে আবু। মূর্খ বলে কী? তা ছাড়া হরীতকীতে ওরকম কিছু হতে পারে, এ ভাবাই যায় না।

আবু বলে—বুঝলে বাবা, হরীতকী হল অমৃত। এ রেগুলার খেলে একশো-দুশো বছর বেঁচে থাকাটা কোনও কথাই নয়। বাঁচতে-বাঁচতে ঘেন্না ধরে যাবে। তখন মরার জন্য আনচান করে উঠবে, কিন্তু মরা কি সহজ?

ডাক্তারখানা থেকে নেমে রাস্তায় সে মুদি খগেনকে পেয়ে গেল। খগেন তার রাখা মেয়েমানুষের বাড়ি যাচ্ছে। অনেকটা পথ তাকে সঙ্গ পেয়ে ভারী আহ্লাদ আবুর। হরীতকীর যাবতীয় গুণের কথা কি বলে শেষ করা যায়! এত সস্তা, হাতের কাছের জিনিস লোকে তবু গ্রাহ্য করে না। মূর্খ সাধনচন্দ্র কী যেসব বললে, হ্যাঃ! এক হপ্তা খেয়ে আবুর নিজের পুরোনো অম্বলের অসুখ নেই। অম্বলের চাকা পেটময় বেড়াত, গলে তরল হয়ে গেছে। চোখে ছানির ভাব ছিল, কেটে গেছে। বাহান্ন বছর বয়সে এখন হঠাৎ শক্তির জোয়ার এসেছে গতরে।

হঠাৎ আবু খগেনকে বলল—দাঁড়াও।

খগেন দাঁড়ায়। রাস্তার পাশে প্রচুর বড়-বড় চাঁই পাথর পড়ে আছে, রাস্তা মেরামতের কাজে লাগবে। তারই একটা মাঝারি চাঁই তুলে নিয়ে আবু রাস্তার পাশে মাঠটায় যতদূর সম্ভব ছুড়ে দিলে, বলল—দেখলে? গত সাতদিনে কতটা ক্ষমতা বেড়েছে!

খগেন শ্বাস ফেলে বলে—দেখছি।

তার দেরি হয়ে যাচ্ছিল। মাঠের ভিতর দিয়ে শর্টকাট করতে নেমে গেল খগেন। একা-একা কালীর গান করতে-করতে আবু সরকারি গুদামের জঙ্গলে ঢুকে পড়ে।

তিন

এই বয়সে খিদেটা ম্যালেরিয়া জ্বরের মতো। হুড়মুড় করে উঠে পড়ে কাঁপুনি তুলে দেয়। এ বয়সে সব বেগই বড় তড়িঘড়ি আসে। সামলানো যায় না। মলমূত্র ত্যাগে একটু দেরি করেছ কী সব কাপড়ে-চোপড়ে হয়ে যাবে। খিদেও তাই। উঠল বাই তো কটক যাই।

গিরিজার চোখে জল আসে। পেটটা ডেকে-ডেকে কত কথা বলছে ভিখিরির মতো। সোজা হয়ে দাঁড়ানো যাচ্ছে না। কোলকুঁজো হয়ে কোনওক্রমে সেটাকে সামালও দেওয়া যাচ্ছে না! রাস্তাঘাট সব জ্যোৎস্নায় ডুবিয়ে মায়াবী রং করে রেখেছে। তিনটে রাস্তায় তিনবার যাওয়ার চেষ্টা করে গিরিজা একই জায়গায় ঘুরে এলেন। কানাওয়ালা ধরলে

এরকমই হওয়ার কথা। চেনা রাস্তায় দশবার ঘুরলেও দিকভ্রম হবে, নিজের বাসার সদর দিয়ে গেলেও চেনা যাবে না। বয়স তিয়াত্তর, এই বয়সেই ভূতেরা এসে ধরে।

—জয় রাম, জয় রাম। জয় রঘুপতি। গিরিজা বিড়বিড় করতে থাকেন।

ঠঙাৎ করে একটা শব্দ হয়। টিনের চালে কে একটা মস্ত ঢিল মারল। এ টিনের শব্দ বলে ভুল হওয়ার নয়। বাস্তবিক ঢিল। টিনের চাল থেকে ছিটকে সামনের রাস্তায় পড়ে ব্যাঙবাজির খাপড়ার মতো লাফিয়ে গিয়ে ঘাস-জঙ্গলে পড়ল। স্পষ্ট দেখা। চোখে এখনও বেশ দেখেন গিরিজা। ঢিলটা পড়তেই তারস্বরে রাম নাম করতে-করতে একটা গুদামঘরের দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পড়েন। বেহায়া ভূত। বুড়ো মানুষকে নিয়ে এ কী কাণ্ড বাবা! সব জায়গাতেই বুড়ো-ধুড়ো দেখলে সকলের রসের ভাঁড়ে তুফান জাগে। রাস্তাঘাটে চ্যাংড়ারা কত পেছুতে লাগে, বাজারের দোকানিরা 'দাদু দাদু' বলে রঙ্গ করে, তো ভূতও বাকি থাকে কেন?

এখন হিম পড়ে বলে ছাতাটা নিয়েই বেরোন। রাতের বেলা টিউশনি সেরে ছাতামাথায় ফিরে আসেন তো লোকে পেছুতে লাগে, বৃষ্টি-বাদলা বা রোদ না হলে ছাতার মর্ম ওরা বুঝবে কি! বুড়ো হোক, আগে সব ব্যাটা বুড়ো হোক, তখন বুঝবে। ছাতাটা ফেলে এসেছেন ছাত্রীর বাড়িতে।

আর-একটা ঢিল গদাম করে পড়ল কাছে-পিঠেই, কোনও গুদামের চালে। ঢিল নয়, এখন আধলা কিংবা থান ইট ছুড়ছে। একটা-দুটো চৌকিদার এখানে ঘোরাফেরা করে রোজ। তাদেরও কাউকে দেখা যাচ্ছে না। জ্যোৎস্না রাতে বোধহয় আহ্লাদ হয়েছে খুব ব্যাটাদের, ছিলিমে দম দিয়ে, নয়তো সিদ্ধি চড়িয়ে কি দিশির চাপান দিয়ে পড়ে আছে। সরকারি গোয়ালে আর কী ধোঁয়া দেবে!

আছেন শুধু রামচন্দ্র। হৃদিস্থিতেন। কিন্তু তবু বুকটা বড় কাঁপছে। খিদেটা পেটের মধ্যে খেঁকি কুকুরের মতো ঘেউ-ঘেউ করে ধমকাচ্ছে তাঁকে।

ছাতাটা হাতে থাকলে একটু সাহস পেতেন। ভূতপ্রেত যাই হোক, ছাতা লাঠি কিছু হাতে থাকলে যেন একটু জোর-বল পাওয়া যায়। ওরা অবশ্য ছাতা কাল ফেরত দেবে। তবু—

তাঁর ছেলে আবুটা মানুষ নয়। বউ বিপদ বুঝে ছেলেপুলে নিয়ে পিটটান দিয়েছে। সারাদিন মাথামুণ্ডু করে বেড়ায়। যৌবন বয়সে মিলিটারিতে গিয়েছিল মণিপুর ফ্রন্টে। সেখান থেকে ফিরে ওকে কালীতে পেল। ঘুমের মধ্যে 'বুবি ট্রাপ বুবি ট্রাপ' বলে চেঁচিয়ে উঠত। তারপর নানা ঘাটের জল খেয়ে এখন পেশকার। ছেলেবেলা থেকেই শুনে এসেছেন

পেশকারি সোনার চাকরি। পেশকারের মা বেনারসি পরে পায়খানায় যায়, তেল দিয়ে আঁচায়। কোথায় কী? আবু মাস মাইনের অর্ধেক তার খাণ্ডার বউয়ের হাতে তুলে দিয়ে আসে। সেই বউ মাইনের তারিখে কোর্টের দরজায় মোতায়েন থাকে। উপরিও পায় না কিংবা নেয় না। অপদার্থ ভ্যাগাবন্ড।

ভাববেন, তার জো কি! ভূতটার আজ রস উছলে পড়ছে। দমাদম ঢিল মারছে ইদিক-সিদিক। ছাতাটা থাকলে কতকটা রক্ষে হত। কখন কোনটা মাথায় এসে পড়ে! রাম-রাম। যৌবন বয়সে ভূতকে মানেন কী বলে আজ সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে দুটো কান ধরে বললেন—ঘাট হয়েছে বাবা। আর অমন করব না। তোমাদের গড় করি। ভালো করে নিজের কান মললেন, কাঁদলেনও একটু। বলেন—রাস্তাটা চিনিয়ে দাও বাবাসকল, জ্যোৎস্না একটু ঘুরিয়ে ফেল, চোখ ধাঁধিয়ে যায় বাবা। খিদের টানে শরীর হজম হয়ে যাচ্ছে। ওই বুঝি চৌকিদারের হুঁশ হল এতক্ষণে!

—কোন হ্যায় রে? বলে অশ্রাব্য খিস্তি দিল একটা। তারপর লাঠি ঠুকবার আওয়াজ। কে যেন চেঁচিয়ে বলল—উও ভাগ রহা। এ রামরিখ ভাই, পাকড়ো—

খুব চেল্লাচেল্লি আর দৌড়োদৌড়ি লেগে গেল। আশপাশেই হচ্ছে। গুদামঘরগুলোর জন্য দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু খুব একটা গোলমাল পাকিয়ে উঠল। ভারী-ভারী জুতোর শব্দ হচ্ছে রাস্তায়। ধুপধাপ মাটি চমকাচ্ছে।

একটু নিশ্চিন্ত হন গিরিজা। লোকজন দেখলে ভূত তফাত যায়।

কিন্তু রাস্তা বেভুল-করা কানাওয়ালা যে এখনও ছাড়েনি। কোন দিকটায় যাবেন ঠিক ঠাহর পাচ্ছেন না। তবু গুটিগুটি রওনা দিলেন। দেখা যাক।

বাপ রে! কালো মতন কি একটা ধেয়ে এল! জ্যোৎস্নার মধ্যে একটা করাল চেহারা। আকাশের দিকে হাত তোলা, চুল উড়ছে, আর হাহা অট্টহাসি।

কেঁদে কঁকিয়ে উঠে বসে পড়েন গিরিজা, অস্ফুট গলায় বলতে থাকেন—রাম রাম রাম রাম—

ভূতটা থমকে দাঁড়ায়। বলে—কে রে, রাম নাম করিস?

গিরিজা সভয়ে বলেন—বুড়োমানুষ বাবা, মাপ করে দাও।

—কালীর নাম কর, কালীর নাম কর। কালীর নামে জগৎ উদ্ধার...আরে বাবা নাকি?

গিরিজা শ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ান। ছাতাটা ফেলে এসেছেন বলে খুব দুঃখ হচ্ছে। হাতে থাকলে দামড়াটাকে ঘা কতক দিতেন।

ভয়ংকর রেগে গিয়ে বললেন—তুই কোত্থেকে—অ্যাঁ?

আবু ঝপ করে বাপের হাতটা চেপে ধরে বলে—দৌড়োও। চৌকিদাররা টের পেয়ে গেছে।

—কী টের পেয়েছে।

—পরে বলছি। দৌড়োতে না পারো জোর কদমে হাঁটো। নাহক এসে হামলা করবে।

—কিছু করেছিস নাকি?

বাপের হাতে ধরে গুদাম ঘরের ছায়ায়-ছায়ায় গা-ঢাকা দিয়ে জোর হাঁটে আবু। বাবাকে প্রায় হিঁচহেড় নিয়ে যায়। হাসতে-হাসতে বলে—আরে না। কয়েকটা ঢিল ছুড়ছিলাম।

গিরিজা অবাক হয়ে বলেন—ঢিল ছুড়েছিলি? আজ কি নষ্টচন্দ্র?

—আরে না। বলে খুব হাসে আবু।

—তবে কি শেয়াল?

—আরে না। শালারা হত্তুকির গুণ মানতে চায় না। গত সাতদিন ধরে খেয়ে আমি বুঝতে পেরেছি হত্তুকির মতো জিনিস হয় না। যৌবন ফিরে আসে। দেখবে? গুদাম পার হয়ে মাঠের মধ্যেকার পথ পেয়ে গেছে তারা। আবু একটা মস্ত ঢেলা কোত্থেকে কুড়িয়ে নিয়ে আচমকা চাঁদের দিকে ছুড়ল। সেটা খানিক উঠেই ধপ করে পড়ল।

—দেখলে? আবু জিগ্যেস করে।

—হুঁ।

—হ্যাঁ-হ্যাঁ। খুব ক্ষমতা বেড়ে যায়। চৌকিদার শালারা ধরতে পারত নাকি আমাকে? এমন দৌড় দিয়েছিলাম না? কী যে দম পাই এখন বাবা, মনে হয় এক নাগাড়ে দশ-বিশ ক্রোশ দৌড়োতে পারি। হত্তুকিতে সব হয়।

গিরিজা নিশ্চিন্তে হাঁটছেন। পাগল হোক, ছাগল হোক, তবু তো ছেলে! ঠিক সময়টায় গিয়ে ওই ভূতুড়ে গোলকধাঁধা থেকে হাত ধরে টেনে এনেছে। ভগবান এখনও আছেন। রাম নামের জোর কীরে বাবা! ক'বার করতে-না-করতেই বাতাস ফুঁড়ে ছেলে বেরিয়ে এসে কুড়িয়ে নিল। নইলে বেঘোরে মারা পড়তেন নির্ঘাত।

আবু বলে—বুঝলে বাবা!

—হুঁ।

—যুদ্ধের সময়ে মণিপুর ফ্রন্টে আমাদের একরকম বড়ি দিত। খেলে খিদে নষ্ট হয়ে যেত, শরীরটা মুহূর্তের মধ্যে চাঙা হয়ে উঠত। চারদিকে বুবি ট্রাপ, বুবি মানে জানো তো। বুবি মানে বোমা। মাটিতে মাইন, ওপরে বোমা। সে-সময়ে একটু ঝিমুনি এল কি খিদেয় অস্থির হলে তো গেলে। ওই বড়ি খেলে সব কেটে যেত। মাইলের-পর-মাইল জঙ্গল ভেঙে বোঝা টেনে হাঁটতাম। বুঝলে বাবা, বহুকাল বাদে হত্তুকিতে আবার সেরকম জোর পাচ্ছি। দেখবে? একটু দৌড়ে দেখাব?

—না-না, থাক। গিরিজা ভয় খেয়ে বলেন। কানাওয়ালাটা আশেপাশেই ঘুরঘুর করছে। ছেলে তফাত হলেই ধরবে। তিনি অস্ফুট গলায় বলেন—রাম রাম।

আবু বিরক্ত হয়ে বলে—কালী-কালী বলো। কালী নাম আর হত্তুকি। দেড়শো-দুশো বছর হেসে-খেলে—

বাড়ি এখনও দূর আছে। খিদেটা এমন কামড়ে বেড়াচ্ছে পেটের মধ্যে। মোচার ঘণ্ট আর ডালসেদ্ধ নিয়ে এক ভুর ভাত খাবেন আজ গিরিজা। ব্যাটারা বলে বুড়ো বয়েসে কম খেতে হয়। ইঃ! কম খাবে!

আবু হাত বাড়িয়ে একটা হত্তুকি দিয়ে বলে—খাও বাবা। সাংঘাতিক জিনিস।

খিদেটা বড্ড কষ্ট দিচ্ছে। হত্তুকিটা আস্ত মুখে ফেলে মাড়ি দিয়ে চিবোতে থাকেন গিরিজা। সাঁৎ-সাঁৎ করে হত্তুকিটা পিছলে যাচ্ছে মাড়ি থেকে। রস বেরোচ্ছে না তবু চেষ্টা করতে থাকেন গিরিজা। চেষ্টাই তো জীবন।

ঘরের পথ

আমার বাবা গিয়েছিল বিদেশে, রোজগার করতে। মা গিয়েছিল পাহাড়ে পাতা কুড়োতে। কেউই আর ফিরল না।

আমাদের বাড়িটা ছিল মাটির। তাতে ফাটল ধরেছিল। যখন বাতাস বইত তখন সেই ফাটলের মুখে শিস দেওয়ার মতো শব্দ হত। যেন বাইরে থেকে কেউ ডাকছে। কখনও-কখনও রাত্রিবেলা সেই শব্দে ভয় পেয়ে আমি মাকে জড়িয়ে ধরতাম, মা আমাকে। মাটির দাওয়ায় কিংবা দেওয়ালে অশ্বত্থ গাছের চারা দেখলেই মা আমাকে সেটি কেটে ফেলতে বলত। অশ্বত্থ চারা কাটতে-কাটতে আমার অভ্যেস দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। অবসর পেলেই আমি দা হাতে অশ্বত্থ চারা খুঁজে বেড়াতাম।

ঘরের চালে ভালো খড় ছিল না। বর্ষাকালে জল পড়লে আমাদের ভিজতে হত। সারা ঘর যখন জলে থইথই করত তখন মা আমাকে আধখানা আঁচলের আড়ালে রেখে আমাদের আগের দিনের সুখের গল্প বলত। আমাকে আঁচল দিয়ে ঢাকা ছিল মার স্বভাব। শীতে কিংবা বর্ষায় কিংবা ঝড়ে আমি মার আঁচলের আড়ালে চাপা থাকতাম। আমার বাবার একটা বুড়ো ঘোড়া ছিল। ঘোড়াটা কোনও কাজ করত না। আমি ঘাস কেটে এনে ওকে খাওয়াতাম। ঘোড়াটাকে বাবা খুব ভালোবাসত। আমি বাবাকে দেখিনি। যখন আমি ছোট ছিলাম, তখন বাবা গিয়েছিল বিদেশে, রোজগার করতে। তারপর আর ফেরেনি। আমি বাবার ঘোড়াকে ভালোবাসতাম। ওর গায়ের গন্ধে আমার বাবার কথা মনে পড়ত।

বাবা ফিরল না দেখে মা পাহাড়ে কাঠ-পাতা কুড়োতে যেত। আমাদের গাঁয়ের গরিব মানুষেরা সবাই কাঠ কুড়োত। মা তাদের সঙ্গে খুব ভোরে চলে যেত। ফিরত সন্ধেবেলায়, কখনও-কখনও রাত্রি হত। যাওয়ার সময় মা বলত, সারাদিনে ঘর পাহারা দিও। ঘোড়াটাকে ঘাসজল দিও। সন্ধেবেলায় শুকনো পাতা জড়ো করে বাইরে একটা আগুন

জ্বেলে তার পাশে বসে থেকো। পাহাড় থেকে আগুনটি দেখতে পেলেই আমি বুঝব তুমি ভালো আছ, ঘরে আছ। তা হলেই আমার ভাবনা থাকবে না।

আমি সারাদিন ঘরে থাকতাম। ঘোড়াটাকে ঘাসজল দিতাম। আর সন্ধে হলেই শুকনো পাতা জড়ো করে বাইরে একটি মস্ত আগুন জ্বালতাম। আগুনের পাশে বসে দেখতাম দূরে বহু দূরে নীল পাহাড় দৈত্যের মতো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। আমার বাঁদিকে মস্ত মাঠের ওপাশে, সূর্য ডুবে যাওয়ার পর পাহাড়টি মেঘ আর কুয়াশার মতো আবছা হয়ে যেত। তবু পাহাড়টি আমার চোখ থেকে কখনও হারিয়ে যায়নি। ছবির মতো পাহাড়টা আমার চোখের ওপর স্থির থাকত। আগুন জ্বলতে-জ্বলতে নিবে আসত। পাহাড়টিকে আমার বড় ভয়। ওই পাহাড় পেরিয়ে আমার বাবা চলে গিয়েছিল। আর ফেরেনি। মা কখন ফিরবে ভাবতে-ভাবতে আমি কখনও-কখনও ঘুমিয়ে পড়ে মা ফিরে আসার স্বপ্ন দেখতাম।

কখনও-কখনও মা আমাকে বাবার গল্প বলত। ওই পাহাড়ের ওপাশে অনেক নদী-নালা খাল-বিল পেরিয়ে বাবা বিদেশে গেছে। সেখানে যেতে হলে ক'টা নদী ক'টা পাহাড় পার হতে হয় মা জানে না। মা শুধু জানে, একদিন বাবা অনেক রোজগার করে ফিরে আসবে। তখন আমি নতুন জামা জুতো পরে একটা বাচ্চা ঘোড়ায় চড়ে বাবার বুড়ো ঘোড়াটার পাশে-পাশে টগবগিয়ে কোথাও চলে যাব।

মা কখনও-কখনও পাহাড়টাকে অভিশাপ দিত, ওটা গোটা পৃথিবীটাকে আড়াল করে বসে আছে বলে। আবার কাঠ-পাতা কুড়োতে ওই পাহাড়েই যেত।

একদিন মা আর ফিরল না। অনেকক্ষণ জ্বলে-জ্বলে আগুনটা নিবল। দূরের নীচে পাহাড় মেঘ আর কুয়াশার মতো আবছা হল। মা আর ফিরল না।

ভোর হতেই আমি মার খোঁজে বেরোলাম।

যারা কাঠ কুড়োতে গিয়েছিল তারা সবাই ফিরেছে, শুধু আমার মা বাদে। তাদের মধ্যে একজন বলল, তোর মা গেছে সুখের খোঁজে। পাহাড়ের ওপারে। তুই ছিলি গলার কাঁটা, তাই তোকে ফেলে গেছে।

আমার বিশ্বাস হল না। ওরা হাসল প্রাণ খুলে। আমার পিঠে চওড়া হাতের চাপড় মেরে বলল, 'তার জন্য ভাবনা কী, তুইও তো জোয়ান মরদ হয়ে উঠবি দু-দিন বাদে। খেটে খেতে পারবি না? চিরকাল কি মায়ের আঁচল চাপা থাকে কেউ, না কি আমাদের তাই করলে চলে?'

মা আমাকে ফাঁকি দিয়ে কোথাও লুকিয়ে আছে ভেবে সারা গাঁ পাতি-পাতি করে খুঁজলাম। ওরা বলল, 'খুঁজে কী করবি! তার চেয়ে পাহাড়ে চল। পাতা কুড়োবি।'

আমি পাহাড়ে গেলাম। কিন্তু কাঠ-পাতা কুড়োতে মন গেল না।

ওরা বলল, 'তোর মা গেছে সুখের খোঁজে। পাহাড়ের ওপারে। আয়, কাঠ কুড়োবি।'

আমি জেনেছিলাম যে আমি আছি বলেই মার সুখ। সুখ মানেই দুঃখের সঙ্গে লড়াই করার শক্তি। আমি আছি বলেই মার সেই শক্তি আছে। অনেক বড় হয়ে জেনেছিলাম যে আমিই মার দুঃখ, আমি ছিলাম বলেই মা সুখের খোঁজে চলে যেতে পারছিল না। দুঃখ মানেই সুখের পথ আগলে যে দাঁড়ায়।

আমার বাবা গেল পাহাড়ের ওপারে, আমার মা-ও আর ফিরল না। রইল শুধু ঘোড়াটা। সেই ঘোড়াটাও বুড়ো হয়েছে। কাজকর্ম করতে পারে না। কখনও মাঠে চরতে যায়, বেশিরভাগ সময়েই ঘরে বসে ঝিমোয়। আমি ঘাস কেটে এনে খাওয়াই, জল দিই। যেমন বাপ বুড়ো হলে ছেলে তার কাজকর্ম করে। মাঝে-মাঝে ওর প্রকাণ্ড বুড়ো মাথাটি আমার কাঁধে নামিয়ে রাখত। তখন ওর ঘন, গাঢ় দীর্ঘ নিশ্বাসের শব্দ শোনা যেত। সে নিশ্বাসে ওর গায়ের চামড়া থরথর করে কাঁপত। ওর মুখে, চোয়ালে, ঘাড়ে শিরাগুলো থাকত ফুলে, ওর ভাঙাচোরা মুখটা ছিল গাছের কাণ্ডের মতো এবড়োখেবড়ো। ওর প্রকাণ্ড ঘাড়টা দু-হাতে জড়িয়ে থেকে আমার মনে হত যেন বহুদিনের পুরোনো একটা বটগাছ শাখাপ্রশাখা মেলে আমায় আশ্রয় দিয়েছে।

একদিন ঘোড়াটিকে দেখে গাঁওবুড়ো বলল, 'ঘোড়াতে চেপে তোর বাপ বিয়ে করতে গিয়েছিল। ঘোড়াটি তোর বাপের মতন। ওকে যত্ন-আত্তি-করিস!'

ঘোড়াটিকে নিয়ে ছিলাম মেতে। বাদবাকি সময়টা কাটত চুপচাপ দাওয়ায় বসে। সারাদিন বাতাস আমাদের ফাঁকা বাড়িটায় শিস দিয়ে খেলা করত। দেখতাম, গুড়মি শাকের জঙ্গলে চড়াই নেচে বেড়াচ্ছে, ধনে পাতার গন্ধে বাতাস ভারী, সরসর করে গাছের শুকনো পাতায় বাতাস বইছে। কুয়োর পারের ছোট্ট একটু গর্তে জমে থাকা জলে শালিক চান করছে জল ছিটিয়ে। ও চলে গেলে জলের কয়েকটা সরু রেখা থাকত মাটিতে, কয়েকটা পালক বাতাসে। আমার চকচকে দা'টাতে মরচে পড়ল। সারা বাড়িটায় অশ্বত্থ চারা উঠল গজিয়ে।

দিন কাটে। সন্ধে হলে পাতা জড়ো করে আগুন জ্বেলে চুপ করে শুয়ে থাকি। আগুনটা মরে এলে তার নরম আঁচ অনেকটা মার শরীরের তাপের মতো মনে হয়। তাই কখনও ঘুম আসে শরীর অবশ করে দিয়ে।

যে দাই আমার নাড়ি কেটেছিল সে এসে একদিন বলল, 'এমনি করে কি না খেয়ে মরবি? তার চেয়ে আমার কাছে চল। আমার তো ছেলে নেই, একটা মাত্র মেয়ে। দুজনে বেশ থাকবি।'

'উহু। আমি রাতে স্বপ্ন দেখি বাবা ফিরে আসছে।'

'হ্যাঁ যেমন তোর মা মুখপুড়ী ফিরল। তা খাস কী?'

'শাকপাতা যখন যা হয়।'

বুড়ি গজগজ করে আমাকে বকতে-বকতে চলে গেল।

তারপর থেকে দাইমার মেয়ে চন্দ্রা আমার জন্য ভাত আনত রোজ। ভাতের থালাটা মাটিতে রেখে বেড়ালের মতো খাপ পেতে আমার দিকে চেয়ে থাকত চন্দ্রা, যেন শহরের মানুষ দেখছে।

একদিন আমি বললাম, 'কী দেখছিস? কী দেখিস রোজ?'

ও বলল, তোকে। তুই একটা বুড়ো জানোয়ারের সঙ্গে থাকিস কেন?'

'ওকে আমি আমার বাপের মতো ভালোবাসি।'

ও খিলখিল করে হাসল। তারপর আমার চোখের দিকে চেয়ে ভয় পেয়ে থামল। বলল, 'ভালোবাসার আর লোক পেলি না। ওটা চড়ে তুই কোন দেশ জয় করতে যাবি?'

আমি ভাবলাম, যাব, একদিন যাব। পুবদিকে যাব—যে দিকে সূর্য ওঠে। একদিন আমি রাজা হয়ে ফিরব, দেখিস। আমি বললাম, 'জানি না রে।'

ও হাত তুলে আমাকে আমার ঘর দেখাল। বলল, 'ওই দেখ গাছের শেকড়গুলো সাপের মতো দেওয়ালের মাটিতে গর্ত খুঁড়ছে। তোর চারপাশের দেওয়াল আর বেশিদিন থাকবে না; ধসে পড়বে! সময় থাকতে শত্তুরগুলোকে মুড়িয়ে কাট!'

আমি ঠাট্টা করে বললাম, 'ওরা আমার মায়ের মতো। কেটে ফেললে বাইরে থেকে ডালপালা দেখা যায় না, কিন্তু মনের মধ্যে ওদের শেকড় থাকে।'

শুনে ও রাগ করে চলে গেল। বলে গেল, 'তোর মরণ এসেছে ঘনিয়ে। একদিন তুই দেওয়ালচাপা হয়ে মরবি।'

আমি ভাবলাম, শেকড়গুলো গর্ত খুড়বে, আরও গভীর হবে। মনের দেওয়ালে চিড় ধরবে, ফাটল হবে। তারপর একদিন চৌচির হয়ে ভাঙবে। সেদিন আমি আমার বুড়ো

ঘোড়ায় চেপে পুবদিকে রওনা দেব। গাঁয়ের লোকেরা দেখবে আমার লাঠির আগায় বাঁধা পুটলিটা আস্তে-আস্তে দূর থেকে দূরে পাকা ধানের খেতের আড়ালে মিলিয়ে গেল। ওরা জানবে, আমি ফিরে আসব একদিন। রাজা হয়ে।

একদিন চন্দ্রা আমার ভাত নিয়ে এল না। ফাগনলালের ঘরের পাশ দিয়ে মৌরিখেতের কিনারায় কিনারায় যে পথটা ধরে চন্দ্রা আসে, সেদিকে চেয়ে সারা দুপুর কাটল। চন্দ্রা এল না। তারপর দিনও না। চন্দ্রা এল না দেখে আমি উঠে খুঁজে-পেতে আমার পুরোনো মরচে ধরা দা'টা বের করে পাথরে শান দিতে বসলাম।

সারাটা দুপুর পাথরে মুখ ঘষে দা'টা ঝকঝক করে হেসে উঠল, ওর গায়ে আগুন ছুটল। দা'য়ে শান দিয়ে-দিয়ে আমার হাতপায়ের মাংসগুলো ফুলে উঠল, শিরায়-শিরায় গরম রক্ত ছুটল টগবগিয়ে। কেমন যেন খুশি লাগল। নেশা পেল।

ভেবেছিলাম সূর্য ডোবার আগেই অশ্বত্থের চারাগুলো কেটে ফেলব। এমন সময় চন্দ্রা এল হাতে ভাতের থালা নিয়ে। রোজ যেমন আসত।

আমি বললাম, 'এতদিন আসিসনি কেন?'

ও গম্ভীর হয়ে বলে, 'একটা বাঘ রোজ আমার পথ আগলে থাক। বলে, কোথায় যাচ্ছিস? থালা নামিয়ে রাখ সামনে আর বসে-বসে আমার লেজে হাত বুলিয়ে দে। নইলে তোকে যমের বাড়ি পাঠাব। রোজ এমনি করে বাঘটা তোর ভাত খেয়ে ফেলে।'

আমি বললাম, জানি। এ গল্প আমি মার কাছে শুনেছি। এক বুড়ি রোজ তার ছেলের কাছে খাবার নিয়ে যেত, আর পথ আগলে থাকত বাঘ।'

'হ্যাঁ, শুনেছিস। তাতে কী? এমন বুঝি হয় না?'

আমি ভেবেছিলাম, বড় হয়ে আমি বাঘটাকে মেরে ফেলব, খিদেকে বাঁচিয়ে রাখতে নেই, তেষ্টাকে বাঁচিয়ে রাখতে নেই। পথ আগলে যেই থাকবে তাকে সাফ করে দাও।

চন্দ্রা খিলখিল করে হাসল মুখ আঁচল দিয়ে। বলল, 'তুই বাঘটাকে মারবি, না ওর লেজে হাত বুলিয়ে দিবি?'

আমি বললাম, 'জানি না।'

ও বলল, 'মা দেখছিল, তুই খিদের জ্বালায় আমাদের বাড়ি যাস কি না। মা তোকে যাচাই করছিল। তারপর হাল ছেড়ে দিয়ে মা বলেছে তুই মানুষ নয়। তোর বাপটা ছিল

একটি গোঁয়ার, তাই একমুখো চলে গেছে। ঘরের পথ ফিরে চিনল না। তুইও যাবি, যাবি। কাঁদতে-কাঁদতে মা ভাত বেড়ে দিল।'

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে, অনেক ভেবে চন্দ্রা বলল, 'কিন্তু আমি জানি তুই যাবি না।'

এই বলে ও চলে গেল। আমি আমার দা'টা হাতে নিলাম। এক-এক কোপে অশ্বত্থের মোটা-মোটা ডালগুলো খসে পড়তে লাগল। আমার শরীর গরম হল, ছলাৎ-ছল করে রক্ত বইল শিরায়- শিরায়। আমি আপন মনে হাসতে লাগলাম। শীতকালে আমাদের বুড়ো ঘোড়াটার গা থেকে ধোঁয়ার মতো একটা ভাপ বেরোত। সেই ভাপে ওর রক্তমাংস আর ঘামের গন্ধ পাওয়া যেত। নিজের শরীর থেকে আমি তেমনি এক গন্ধ পেলাম। মদের যেমন স্বাদ নেই, এ-গন্ধেরও তেমন ভালোমন্দ নেই। এ শুধু আমাকে মাতাল করে। আমি আপন মনে হাসলাম। যেন আমার নেশা হল। আমার ইচ্ছে নিজের শরীরটাকে জড়িয়ে ধরে আদর করি। মাটির দাওয়ায় আমি শরীরটাকে গড়িয়ে দিলাম। আমার শরীরের ঘাম মাটির সঙ্গে মিশল। শীতের শেষে বসন্তের গোড়ার দিকে আমার কাছে এক বাঁশিওয়ালা এল। তখন বাতাসে টান লেগেছে। শুকনো পাতাগুলো টুপটাপ করে ঝরে-ঝরে শেষ হয়েছে। খেতে মটর শাকে পাক ধরল। যারা শুকনো কাঠ-পাতা কুড়োতে যেত তাদের দিন গেল।

এমনি একদিন শেষ দুপুরে অনেক দূর থেকে বাঁশিওয়ালা এসে আমার দাওয়ায় বসল। তার গায়ে একশো রঙের একশো তালি দেওয়া একটা জোব্বা, মাথায় একটা মস্ত পাগড়ি। সেই পাগড়িটা তার কপালটিকে ঢেকে ফেলেছে। রোগা দুটো পা রাঙা ধুলোয় মাখা। আমি কখনও এই বাঁশিওয়ালাকে দেখিনি।

সে বলল, 'আমি বাঁশি বিক্রি করিনি। বাঁশির সুর বিক্রি করি।' এই বলে সে তার বাঁশিতে একটা অদ্ভুত সুর বাজাল।

আমি বললাম, বাঁশিতে তুমি কী সুর বাজালে? আমি তার কতক বুঝলাম, কতক বুঝলাম না।'

বাঁশিওয়ালা তার ঘন ভ্রূর নীচে গভীর গর্তের মতো চোখ দুটো দিয়ে আমায় দেখল। বলল 'এ সুর আমি কোথাও শিখিনি বাবা, কেউ আমাকে শেখায়নি। আমার কোনও গুরু নেই। আমি হাটে মাঠে ঘাটে যা শুনি তাই বাজিয়ে বেড়াই। কখনও নোঙর করা নৌকোয় জলের ঢেউ লাগবার সুর, কখনও শীতের শুকনো পাতায় বাতাস লাগবার সুর।'

সে আবার তার বাঁশিতে ফুঁ দিল। শেষে শীতের শুকনো বাতাসে বাঁশির টান লাগল। কয়েকটা সুর তীরের মতো আকাশে ছড়িয়ে মিলিয়ে গেল। আমার চোখের সামনে দুপুরটা মাতালের মতো টলতে লাগল। যেন অনেক দূর পথ! আমাদের এই মৌরি খেত ডিঙিয়ে ধানের আবাদের পাশ দিয়ে পাহাড় পেরিয়ে চলেছে—চলেছে—চলেছে। কত গঞ্জ, কত ব্যাপারীর আস্তানা, কত বন্দর, ঘাট মাঠ পেরিয়ে যাওয়া দেশ। বাঁশির সুর সেই দূর-দূরান্তের আভাস মাত্র নিয়ে কোকিলের অস্পষ্ট ডাকের মতো নরম, বিষণ্ণ হয়ে ফিরে ফিরে আসছে। সেই পথ ধরে, অনেক আলো, অনেক অন্ধকার মাড়িয়ে মাড়িয়ে কে যেন আসছে—আসছে—আসছে।

বড় ক্লান্ত পথ! বড় দীর্ঘ পথ! আমি চোখ বুজে ভাবলাম, সে আমার বাবা। কত দিন গেল, কত রাত গেল। ঘোড়াটি বুড়ো হল। বাবা আর ফিরল না।

বাঁশিওয়ালা সুর পালটে নতুন সুর ধরল। কখন আমার চোখ ছাপিয়ে কান্না এসেছে। এ কেমন সুর যা দিনের আলোকে অন্ধকার করে দেয়।

আমি কাঁদতে-কাঁদতে বললাম, এর মানে কী? আমাকে বুঝিয়ে দাও।'

বাঁশিওয়ালা থামল না।

যেন এতদিন মাঠটা ছিল রোদে পোড়া, ফাটা-ফাটা। একদিন পাহাড়ে মেঘ জমল। বৃষ্টি নামল। অঝোর ধারে বৃষ্টি। মাটির কোষে-কোষে জল ঢুকল। বীজধান ফুলে উঠল। বুক ফাটিয়ে শিষ বার করল আকাশে।

বাঁশিওয়ালা থামল। বলল, 'এর অর্থ যেমন করে কুঁড়ি থেকে ফুল হয় আস্তে-আস্তে, তোমার চোখের আড়ালে অন্ধকারে যেমন করে আস্তে-আস্তে পাপড়িগুলো মেলে দেয়, যেমন করে শুকনো পাতা ঝরে পড়ে আবার নতুন পাতায় ছেয়ে যায় গাছ—তেমনি করে তোমার দেহেও একটা ঋতু আসে আর-একটা যায়।'

এই বলে বাঁশিওয়ালা আবার তার বাঁশিতে সুর দিল। যেন বলল, বুড়ো ঘোড়াটার জন্য দুঃখ কোরো না। এক-একটি ঋতু যায়, আর-একটি আসে। দুঃখকে সহ্য করো। খেতে আগুন লাগলে ফসল ভালো হয়।

আমি কাঁদতে-কাঁদতে বললাম, 'এ সুর তুমি কোথায় পেলে?'

সে দাঁড়িয়ে উঠে হাসল।

আমি বললাম, 'আমাকে এ সুর শিখিয়ে দাও। আমি তোমার মতো জোব্বা পরে বাঁশি বাজিয়ে বেড়াব।'

বাঁশিওয়ালা ফিরে বলল, 'তুমি আমাকে অবাক করলে বাবা, এ জোব্বা কি তোমাকে মানায়! আমি যেখানে যেমন পেয়েছি তেমন কুড়িয়ে ঘুরিয়ে এই কাপড়ের টুকরোগুলো জুড়ে সেলাই করে জোব্বা বানিয়েছি। যারা সুখে আছে এ জোব্বা তারা সাধ করে পরে না। আমার মনে রং নেই, তাই বাইরে এত রঙের বাহার।'

বাঁশিওয়ালা চলতে লাগল, আমি দেখলাম শীতের ঘন রোদে রোগা দুটো পায়ে রাঙা ধুলো মেখে সে আস্তে-আস্তে আমাদের পাড়া ছাড়িয়ে চলে যাচ্ছে। কেউ তাকে ফিরিয়ে আনার জন্য ডাকছে না। শেষ শীতের গরম দুপুরে সেই অদ্ভুত বাঁশিওয়ালা আর তার সুর দূর থেকে দূরান্তরে মিলিয়ে গেল।

আমি কাঁদতে কাঁদতে ভাবলাম, এ সুর তুমি কোথায় পেলে বাঁশিওয়ালা। আমার সারাটা দিন যেন টালমাটাল-টালমাটাল। যেন আমি বিনি মদের বোতল। যেন আমি এক পাগল বাঁশিওয়ালা। শিরা ছিঁড়ে সুর তৈরি করে—সে সুরে আমি সারাদিন গাই। কাঁদি। কেন বাঁশিওয়ালা আমাকে দিল সারাদিন বাজাবার এই বাঁশি? আমি যে একে তাড়াতে পারি না। এ যে আগুনে দিলে পোড়ে না, ঝড়ে ওড়ে না। পোষা কবুতরের মতো নড়ে-চড়ে ঘুরে বেড়ায়। উড়ে যায় না।

উঁচু-নীচু পথ। পাথর ছড়ানো। চড়াই-উতরাই ভেঙে বাঁশিওয়ালা চলেছে। শুকনো হাওয়ায় তার চামড়া ফেটেছে, পাথরে তার পা ফেটেছে। তবু তার চলবার শেষ নেই। সে পুব থেকে পশ্চিমে গেল। যেদিকে সূর্য ওঠে সেদিক থেকে যেদিকে সূর্য ডোবে সেদিকে গেল, যে পথে আমার বাবা গেছে তার বুড়ো ঘোড়া রেখে, যেদিকে মা গেছে আগুনের পাশে তার ছেলেকে বসিয়ে রেখে।

বুড়ো ঘোড়াটার জন্য দুঃখ কোরো না। খেতে আগুন দিলে ফসল ভালো হয়। মাটির কোষে-কোষে বৃষ্টির জল ঢুকবে, বীজধান কেঁচোর মতো ফুলবে, বুক ফাটিয়ে শিষ বের করবে আকাশে। আমি জানি বাঁশিওয়ালা আর ফিরবে না। কোনওদিন না। দাওয়ায় শুয়ে কাঁদতে-কাঁদতে কখন আমার দিন গেল।

একদিন সকালে ঘোড়াটাকে দেখে মনে হল আমার চোখকে ফাঁকি দিয়ে আমার সামনেই বুড়ো ঘোড়াটা কখন যেন আরও একটু বুড়ো হয়ে গেছে। ওর গায়ে হেলান দিয়ে আমি আমার মাকে ভাবলাম। কিন্তু মার মুখ আমার মনে এল না। রোদ লেগে ঘাসের বুক থেকে শিশির যেমন ভাপ হয়ে মিলিয়ে যায়, তেমনি করে মার মুখটা হারিয়ে গেছে। শাড়ির আঁচল, পাহাড়ের দিকে চেয়ে থাকা শান্ত ছায়ায় ডাকা দিঘির মতো সেই চোখ আমি আগের জন্মে দেখেছিলাম।

গাঁওবুড়ো আমায় দেখে চোখ কুঁচকে বলল, 'তুই যে রীতিমতো পুরুষমানুষ হয়ে উঠলি! কখন এত ঢ্যাঙা হয়ে উঠলি, বেড়ে উঠলি আমাদের চোখের সামনে, টেরও পেলাম না।'

আমি লজ্জা পেলাম।

গাঁওবুড়ো বলল, 'তোর গড়নপেটন হয়েছে তোর বাবার মতন, চোখ দুটো পেয়েছিস মার। তা এবার তো জোয়ান হলি, কাজকর্মে লেগে যা। বসে থাকিস না। দিনগুলো চলে যেতে দিস না। বুড়ো ঘোড়াটাকে দানাপানি দিস, ঘর সামলে রাখিস।'

আমি ভাবলাম গাঁওবুড়োকে বাঁশিওয়ালার কথা বলব।

আমার চোখের দিকে চেয়ে গাঁওবুড়ো হাসল, 'জানি রে, জানি, তোর কাছে এক বাঁশিওয়ালা এসেছিল। সে মাত্র একবারই আসে। মাত্র একবার।' গাঁওবুড়ো তার নড়বড়ে মাথাটা দোলাল, 'তাই তো বলছি দিনগুলো চলে যেতে দিস না। বসে থাকিস না। ঘোড়াটাকে দানাপানি দিস। ঘরদোর সামলে রাখিস।'

চন্দ্রা এসে বলল, 'তুই নাকি পয়সা দিয়ে বাঁশির সুর কিনেছিস?'

আমি বলি, 'হু।'

চন্দ্রা আমার কাছে এসে বসল, 'পাখি কিনেছিস, আর খাঁচা কিনিসনি? সুর কিনেছিস আর বাঁশি কিনিসনি? তবে তোর ঘরে রইল কী, তোর নিজের বলতে থাকল কী? কিনতে হয় এমন জিনিস কিনবি যা হাত দিয়ে ধরাছোঁয়া যায়, চোখ দিয়ে দেখা যায়, যাকে ধরে ছুঁয়ে দেখে মনের সুখ, ভালো না লাগলে যাকে বেচে দিয়ে আবার পয়সা পাওয়া যায়।'

এই বলে ও হাসল। বলল, 'আমি আর কতকাল তোর জন্য ভাত বয়ে আনব? তোরই তো ভাত দেওয়ার বয়স হল। তুই কাজকর্ম করবি, না সারাদিন দাওয়ায় বসে হাঁ করে আকাশ গিলবি?'

আমি বললাম, 'জানি না।'

'গাঁওবুড়ো বলছিল ঘরে মেয়ে না দিলে জোয়ানগুলো কাজকর্মে মন দেয় না।'

এই বলে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে ও চলে গেল। আমি অনেকক্ষণ ধরে দেখলাম ওর বাসন্তী রঙের ডুরে শাড়ির আঁচল বাতাসে উড়তে-উড়তে ফাগনলালের দাওয়া পেরিয়ে মৌরিখেতের পাশ দিয়ে ওর শরীরের গন্ধ ছড়াতে-ছড়াতে চলে গেল। খুব পাতলা বুটিদার একটা মেঘ রোদের মুখের ওপর দিয়ে সরে গেল। সেই ছায়াটা একটু সময়ের জন্য ওর

মুখের ওপর থাকল। বাতাস ওর চারদিকে একটু খেলা করল। ওর চারপাশে উড়ে বেড়াতে লাগল কয়েকটা মৌমাছি।

আমি বাঁশির সুর কিনেছি বলে গাঁয়ের বুড়োরা আমার নিন্দে করল। দুঃখ করে বলল, আমার ঘরে কিছুই থাকবে না। যেমন করে আমার বাবা থাকল না, মা থাকল না। গাঁয়ের জোয়ান মরদরা এসে আমায় পিঠ চাপড়ে গেল! এই তো চাই। বাঁশির সুর কিনবি, পাখির ডিম কিনবি। যেমন করে পারিস উড়িয়ে দিবি রোজগারের টাকা। আমরা জোয়ান মরদ, আমাদের রোজগারের ভাবনা কী? দেখছিস না বুড়োগুলোর দশা, দু-আঙুলের ফাঁক দিয়ে পুরো আয়ুটা খরচ হয়ে গেল। ওরা আমাদের বেহিসেবি বলে। কিন্তু সামনের শীতে ওরা যখন মরবে তখন তো আমরাই থাকব। এই শুনে বুড়ো ঘোড়াটার কাছে গেলাম। ও আমার কাঁধে ওর প্রকাণ্ড মাথাটা রাখল।

কখন আমার শরীর দীঘল হয়েছে, হাত-পা কোমর হয়েছে সরু, আমার চামড়ায় টান লেগেছে, রুক্ষ হয়েছে মুখ তা আমি নিজেই জানি না। কিন্তু ও যেন টের পেল। আমার কাঁধে মুখ ঘষে শরীর কাঁপিয়ে ওর খুশি জানাল। ওর গাছের কাণ্ডের মতো এবড়ো-খেবড়ো মুখে আমার গাল রাখলাম। রেশমের মতো কেশর আমার হাতে খেলা করল। আমি বললাম, 'বুড়ো, তুই আমার বাপ। কোনও ভাবনা করিস না, আমি তোকে দেখব।'

এই শুনে পাঁজর কাঁপিয়ে ও নিশ্বাস ছাড়ল। ঘোড়াটা বুড়ো হয়েছে বলে দুঃখ কোরো না। ও বুড়ো হচ্ছে তার মানে তুমি বড় হয়েছ। কবে শীত আসবে তার জন্য দুঃখ করে দিনগুলোকে চলে যেতে দিয়ো না। মনে রেখো, দু-আঙুলের ফাঁক দিয়ে স্রোতের জল বয়ে যায়। আটকানো যায় না। সামনের শীতে ঘোড়াটা যদি মরে, তুমি থাকবে।

'বুড়ো, তুই আমার বাপ।' আমি বললাম, 'কোনও ভাবনা করিস না বুড়ো, আমি তোকে দেখব।'

ঘোড়াটা পুরোনো ঠান্ডা শরীর দিয়ে আমার শরীর থেকে তাপ নিল। আমি দু-হাতে ওর গলাটা জড়িয়ে চোখ বুজে রইলাম। যেন আমি পুরোনো প্রকাণ্ড একটা বটগাছের আশ্রয়ে আছি।

চন্দ্রা এসে বলল, 'সারাদিন ঘরে বসে কী বকিস একা-একা?'

আমি শান্তভাবে ওর দিকে তাকালাম। ওর শরীর ঘামে ভিজে তেল-তেল করছে। দু-চোখে মিটিমিটি আলো। এ কেমন আলো? আমি কোনওদিন এমন আলো দেখিনি। ওর শরীর থেকে কেমন একটা মাতাল-মাতাল গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে বাতাসে। আমি ভাবলাম

বোধহয় কোনও ফুলের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে বাতাসে। এ কেমন ফুল? জানি না। কেমন তার রং? জানি না।

ও আমার হাত টেনে বলল, 'চল, তোকে আজ একটা নতুন জিনিস দেখাব।'

'কী জিনিস?'

ও ঘন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল, 'সে একটা রাজার বাড়ি। খুব অদ্ভুত।'

'কোথায় সেটা?'

ও হাসল, 'আছে আছে। তোর খুব কাছেই আছে। অথচ তুই দেখিসনি।'

চন্দ্রা ওর বুকের কাপড় সরিয়ে নিল। তারপর কাপড়টা ওকে একা রেখে মাটির ওপর ছড়িয়ে পড়ল। চোখে হাত চেপে ও বলল, 'এ এমন রাজা যে দখল নেয় না, দখল ছাড়েও না। আমি সারাদিন সব কাজ ফেলে তার বাড়ি পাহারা দেব কেন?'

ওর বেলেমাটির মতো শরীরের দিকে চেয়ে আমি ভয় পেলাম।

চোখে হাত চেপে ও কাঁদছিল, 'আমার সারা দিনের কাজ পড়ে থাকে। আনমনে আমার বেলা বয়ে যায়। তোর বাঁশিওয়ালা কি তোকে একথা বলেনি?'

সেই অচেনা ফুলের গন্ধ বাতাসে ভাসছে। এ কেমন ফুল জানি না। কেমন তার গন্ধ জানি না। আমার বুক ফেটে কান্না এল। আমি ভেবেছিলাম, যে বাঘটি রোজ পথ আগলে থাকে, বড় হয়ে তাকে মেরে ফেলব। কিন্তু ক'টা বাঘকে মারব আমি? গাঁওবুড়ো বলেছিল, ঘরদোর সামলে রাখিস। গাঁয়ের বুড়োরা বলেছিল বাঁশির সুর কিনিস না।

চন্দ্রা দু-হাতে আমার মাথাটা টেনে নিল। বলল, 'আমি তোকে কতক বুঝি কতক বুঝি না!'

ওর বুক, ছিঁড়ে-নেওয়া ফুলের বোঁটার মতো আমার কপালে, চোখের পাতায় নরম হয়ে লেগে-লেগে মুছে গেল।

ও বলল, 'একদিন তুই পাহাড়ে যাবি কাঠ কুড়োতে। সেদিন আমি তোর ঘর পাহারা দেব। পাতা জড়ো করে আগুন জ্বালব বাইরে, যেন তুই পাহাড় থেকে দেখতে পাস।'

বাঁশিওয়ালা তার প্রথম সুরে বলেছিল, ঘর বলতে তোর কোনও কিছুই নেই। কোনওদিন ছিল না। বৃথাই তুই সারা বিকেল আগুন জ্বেলে পাহাড়ের দিকে চেয়ে রইলি। যারা পাহাড়ের ওপারে গেছে তারা আর ফিরবে না। আমি কাঁদতে লাগলাম।

চন্দ্রা কেঁদে-কেঁদে বলল, 'তুই যদি আমাকে ছেড়ে না যাস, আমিও যাব না। আমরা ঘর বাঁধব।'

ওর চোখের জলে আমার মাথা ভিজল। আমি ভয় পেয়ে ওকে জড়িয়ে ধরলাম। ও আমাকে ওর বুকের মধ্যে জড়িয়ে নিল। চুমু খেল আমার ঠোঁটে। জন্মের পর আমরা যেমন ছিলাম তেমনি হয়ে শুয়ে রইলাম।

বসন্তকাল প্রায় শেষ হয়ে এল। আমার বুড়ো ঘোড়াটা আরও বুড়ো হয়েছে। কুটকুট করে সারাদিন ঘাস খায়, কখনও ঝিমোয়।

বাতাসে গরম হলকা ছুটল। বুড়োরা বলল, 'এইবার আকাল এল। ঘাট শুকোবে, মাঠ ফাটবে। সেই বর্ষা যতদিন না আসছে।'

কাছাকাছি মাঠের ঘাসগুলো হলদে হয়ে এল। তাই আমি একদিন বুড়ো ঘোড়াটাকে দূরের মাঠে নিয়ে ছেড়ে দিলাম। সন্ধেবেলা ও নিজেই খুটখুট করে ঘরে ফিরতে লাগল। কিন্তু একদিন ও ফিরল না। সারা সন্ধে আমি দাওয়ায় বসে রইলাম পথের দিকে চেয়ে। দূরের পাহাড় ঝাপসা হয়ে এল। ও এল না। আকাশে মস্ত বড় চাঁদ উঠল। জ্যোৎস্নায় বান ডাকল দিগন্ত জুড়ে। কিন্তু পেটের নীচে নিজের বাঁকাচোরা বুড়ো ছায়াটা নিয়ে টুকটুক করে ও ফিরল না। অনেক ভেবে আমি হাতে দড়ির ফাঁস নিলাম। তারপর পথে নামলাম। মনে মনে বললাম : যখন আমি ছোট ছিলাম তখন কেউ আমাকে ফাঁকি দিয়ে চলে গেছে। কিন্তু বুড়ো, তোকে আমি চলে যেতে দেব না। আমি তোকে শেষ-পর্যন্ত খুঁজে দেখব। চলতে-চলতে আমি ধানখেত ছাড়িয়ে, মরা মটর শাকের পাশ দিয়ে, বুড়ো বটের তলায় মহাবীরের থান পেরিয়ে গেলাম। তারপর দিগন্ত জোড়া মাঠ। মাঠে বান ডাকা সমুদ্রের মতো টলমল করছে জ্যোৎস্না। কিন্তু তার কোথাও আমার বুড়োর ছায়া নেই।

আমি পাগলের মতো সারা মাঠ বুড়োকে খুঁজতে লাগলাম। আমার ভাঙা গলার ডাক আমাকে ঘিরেই ঘুরতে লাগল। আমি দাঁতে দাঁত চেপে বললাম, 'বুড়ো, আমি তোকে শেষপর্যন্ত খুঁজে দেখব।'

আমি মাঠ পেরিয়ে বনের মধ্যে ঢুকলাম। আমার চারধারে ঘন গাছ। আলো আর ছায়ার মধ্যে আমি হাঁটতে লাগলাম। তারপর আমি ভয় পেলাম। আমার মনে হল কেউ যেন আছে। কাছেই—পাশেই। মৃত শুকনো পাতাগুলোতে শব্দ হল। মনে হল, যেন কোনও আত্মা আমার পিছু নিয়েছে। আমার গায়ে কাঁটা দিল। যেন সেই আত্মা আমার হাত ধরল, তারপর আমাকে চেনা পথ ভুলিয়ে নিয়ে চলল কোথাও। আমি ভাঙা গলায় বুড়োকে ডাকতে লাগলাম। বন পার হয়ে আমি একটা জলার ধারে এলাম। তাকিয়ে দেখলাম,

আমি এর আগে কখনও এখানে আসিনি। এত জ্যোৎস্না আমি কোনওদিন দেখিনি। জলাটা মস্ত বড়। তার ওপাশে বুড়ো দাঁড়িয়ে আছে। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ও যেন কিছু দেখছে। আমি ডাকলাম, 'বুড়ো, বুড়ো!'

ও শুনল না। তেমনি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আমি আস্তে-আস্তে ওর কাছে গেলাম, ওর গায়ে হাত দিয়ে ডাকলাম, 'বুড়ো, তোকে আমি পেয়েছি।'

ও ঘাড় ফিরিয়ে আমাকে দেখাল। তারপর ভয় পেয়ে ও সরে গেল। আমি বুঝলাম, ও আমাকে চিনতে পারল না। আমি ওর কাছে এগিয়ে যেতে লাগলাম। ও চিৎকার করে আমার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে ছুটতে লাগল। ওর ছায়াটা এবড়ো-খেবড়ো মাঠের ওপর টাল খেতে লাগল। আমি ওর পিছনে ছুটলাম। প্রাণপণে ওকে ডাকলাম। সেই ভীষণ ভয়ঙ্কর জ্যোৎস্নার মধ্যেও বুড়ো আমাকে চিনতে পারল না। আমি দড়ির ফাঁসটা মুঠো করে ধরলাম। তারপর শেষবারের মতো ওকে ডাকলাম। ও শুনল না। কাকে যেন ও দেখতে পেয়েছে। কে যেন ওকে নিয়ে যাচ্ছে।

আমি ফাঁসটা ছুড়ে দিলাম। ও দাঁড়িয়ে পড়ল। আমার হাতধরা দড়িটা থরথর করে কাঁপল। আমি বুঝলাম ফাঁসটা ওর গলায় পড়েছে।

আমি বললাম, 'বুড়ো আমি তোকে চলে যেতে দেব না। দেব না।'

আমি কাছে এগোতেই বুড়ো চিৎকার করে ছুটতে চাইল। ফাঁসের দড়িটা কাঁপতে লাগল থরথর করে।

বুড়ো দড়িটা ছিঁড়ে চলে যেতে চাইল। আমি দড়িটা ছাড়লাম না। বললাম, 'বুড়ো, আমি শেষপর্যন্ত লড়াই দেব।'

বুড়ো শুনল না। ছেড়ে যেতে চাইল। আমি ধরে রইলাম।

কিন্তু বুড়োকে একসময়ে থামতে হল। চারটে পা ছড়িয়ে দিয়ে দাঁড়াল বুড়ো। কাঁপতে-কাঁপতে মাটিতে পড়ল।

কাছে গিয়ে দেখলাম ফাঁসটা ওর গলায় আটকে গেছে। ও দম নিতে পারছে না। আমি কপালের ঘাম মুছে বললাম, 'বুড়ো, তোকে আমি যেতে দেব না। আমি শেষপর্যন্ত লড়াই দিয়েছি।

এই বলে আমি ওর গলার ফাঁসটা খুলতে চাইলাম। কিন্তু ফাঁসটা খুলল না। নীচু হয়ে দেখলাম দড়ির গায়ে ছোট্ট একটা গিঁটে ফাঁসটা আটকে গেছে, গভীর হয়ে বসেছে বুড়োর গলায়।

আমি প্রাণপণে চেষ্টা করলাম। কপালে বিনবিনে ঘাম ফুটল। কিন্তু ফাঁসটা নড়ল না। বুড়ো ছটফট করতে লাগল। আমি দড়িতে দাঁত দিলাম। দড়িটা লোহার মতো বসেছে। আমার গলার রগ ফুলল, রক্তে ভরে গেল সারাটা মুখ। বুড়ো আমার দিকে চেয়ে আস্তে-আস্তে স্থির হয়ে এল। আমি ওর মুখের কাছে মুখ চিৎকার করে বললাম, 'বুড়ো, আমি ফাঁসটা খুলব, খুলব।'

বুড়ো আমার দিকে তাকাল। আমার গা থেকে পিতৃহত্যার সমস্ত পাপ মুছে নিতে চাইল। তারপর সেই ভয়ঙ্কর জ্যোৎস্নার ভেতর ওর দুটো চোখ ঘোলা হয়ে গেল। আমি বললাম, 'বুড়ো, এই ফাঁসটা দিয়ে আমি তোকে ধরতে চেয়েছিলাম।'

আমি দড়িটা ছেড়ে দিয়ে গাঁয়ের পথ ধরলাম। ভাবলাম—আমার হাত দিয়ে কে তোকে মেরেছে আমি তা জানি না। জানি না।

আমার বাবা গিয়েছিল বিদেশে রোজগার করতে। আমার মা গিয়েছিল পাহাড়ে পাতা কুড়োতে। আমাদের ঘোড়াটা গিয়েছিল জলার ধারে, ঘাস খেতে। কেউই আর ফিরল না।

গাঁওবুড়ো একদিন সবাইকে ডেকে বলল, 'শোনো তোমাদের এক গল্প বলি। গাছের তলায় ধুনি জ্বেলে একটা সাধু বসে থাকত। তাকে মস্ত বড় সাধু ভেবে গৃহস্থরা তার চারধারে হাতজোড় করে থাকত। একদিন একটা লোক এসে বলল, সাধুবাবা, আমার ইচ্ছে তোমাকে কিছু খাওয়াই। সাধু রাজি হল। লোকটি কিছু রুটি কিনে আনাল। তারপর আবার বলল, সাধুবাবা, তুমি এই শুকনো রুটি কী করে খাবে? তোমার লোটাটা দাও, দুধ নিয়ে আসি। সাধু খুশি হয়ে লোটা দিল। লোটা নিয়ে লোকটা সেই যে চলে গেল আর ফিরল না।'

সবাই বলল, 'তারপর?'

গাঁওবুড়ো বলল, তারপর লোটার শোকে সাধুর মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে সে কী কান্না। সবাইকে ডেকে-ডেকে বলল, 'দেখ-দেখ, চোট্টার কাণ্ড দেখ, আমাকে এক পোড়া রুটি খাইয়ে আমার রুপোর লোটাটা নিয়ে ভেগেছে।'

সবাই বলল, 'তারপর?'

গাঁওবুড়ো হাসল, 'যার লোটা চুরি যায় সে বোকা। কিন্তু সেই লোটার শোকে যে গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদে সে আরও বোকা।'

এই বলে শীত আসবার আগেই গাঁওবুড়ো মরে গেল। গাঁয়ের বুড়োরা জমায়েত হয়ে বলল, 'জন্মের পর মৃত্যু, তারপর আবার জন্ম। ঠিক যেমন ঢেউয়ের-পর-ঢেউ। চলতে-

চলতে পড়ে যাওয়া, আবার ওঠা। কে যেন আমাদের নিয়ে দিনরাত এই খেলা খেলছে। এ খেলার শেষ নেই।'

শীত আসছে শুনে বুড়োরা ভয় পেল। বলল, 'এবার ঘর ছাড়তে হবে।'

কেউ বলল, 'ঘর আর কোথায়! ওই তো নড়বড়ে পাতার ছাউনি, রোদ মানে না, জল মানে না!'

বুড়ো ঘোড়ার মতো খুটখুট করে শীত এল। তারপর বুড়োদের কাঁধে মাথা রেখে তাদের দেহ থেকে তাপ শুষে নিতে লাগল। বুড়োরা পাতা জড়ো করে আগুন জ্বালল। গোল হয়ে ঘিরে বসল। তারপর প্রাণপণে বলতে লাগল, 'কে যেন জন্মের পর স্রোতে ভাসিয়েছিল। তাই চেয়ে দেখলাম মাথার ওপর ছাদ নেই, চারিদিকের দেওয়াল নেই।'

কেউ বলল, 'অনেকের সঙ্গে মিলেমিশে পথ চলছিলাম কোনও ভিন-গাঁয়ের সীমানা ডিঙিয়ে। তারপর অন্ধকার হল যারা ছিল সাথের সাথী তাদের মুখ দেখা যায় না, পাশে কে চলছে জানা যায় না। অন্ধকারকে গাল পাড়ি, কিন্তু ঠাহর করে দেখলে এ অন্ধকারও সুন্দর।'

কেউ বলল, 'যাব আর কোথায়, সেই ফিরে আসতেই হয়। অণু অণু হয়ে আমি বাতাসে মাটিতে মিশব। কিন্তু দ্যাখো, তারপর একদিন পাহাড়ে মেঘ জমবে, বৃষ্টি আসবে, বাতাস ভিজবে, মাটির কোষে-কোষে ঢুকবে জল। তখন আমি ফুল হয়ে ফুটব, নদীর জল হয়ে বয়ে যাব, বাতাস হয়ে খেলব, মেঘ হয়ে ভাসব।' এইসব শুনে গাঁয়ের জোয়ানগুলো হাসল।

তাই আমি চন্দ্রাকে নিয়ে ঘর বাঁধলাম।

আমার মা বলেছিল, 'বাইরে একটি আগুন জ্বেলে রেখো। পাহাড় থেকে আমি যেন দেখতে পাই তুমি ঘরে আছ, তুমি ভালো আছ। ঘর সামলে রেখো, কোথাও যেয়ো না।'

দাইমা বলেছিল : আমার কাছে চল। আমার ছেলে নেই, তোকে ছেলের মতো পালব।

বাঁশিওয়ালা বলেছিল : বৃষ্টির জল লেগে বীজধান ফলবে। বুক ফাটিয়ে শিষ বের করবে আকাশে। বড় ঘোড়াটার জন্য দুঃখ কোরো না। একটা ঋতু আসে আর একটা যায়।

গাঁওবুড়ো বলেছিল : ঘরদোর সামলে রাখিস। বুড়ো ঘোড়াটাকে দানাপানি দিস। বসে থাকিস না, দিনগুলো চলে যেতে দিস না। মনে রাখিস বাঁশিওয়ালা মাত্র একবার আসে।

আমি বলেছিলাম : বুড়ো, তুই আমার বাপ। ভাবনা করিস না, আমি তোকে দেখব।

আমি আগুন জ্বেলেছিলাম। ঘর আগলে ছিলাম। তবু কেন যে আমার বাবা গেল বিদেশে, রোজগার করতে! আমার মা গেল পাহাড়ে, পাতা কুড়োতে। আমার ঘোড়াটা গেল জলার ধারে, ঘাস খেতে।

প্রিয় মধুবন

মাথা অনেক শূন্য লাগছে আজকাল। অনেক বেশি শূন্য। যেন একখানা খোলামেলা ফাঁকা ঘর। মাঝে-মাঝে শুধু একটি কি দুটি শালিক কি চড়ুইয়ের আনাগোনা। এরকম ভালো। এরকম থাকা ভালো। আমি জানি।

কালকেও আমার কাছে একখানা বেনামি চিঠি এসেছে। তাতে লেখা 'বিপ্লবের পথ কেবলই গার্হস্থ্যের দিকে বেঁকে যায়! বনের সন্ন্যাসী ফিরে আসে ঘরে!' লাল কালিতে লেখা চিঠি। নাম সই নেই, তবু আমি হাতের লেখা চিনি। লিখেছে কুণাল মিত্র। আমার বন্ধু। এখনও বোধহয় ফেরারি। প্রায় দশ বছর তার খোঁজ জানি না।

আমাদের ডাকঘরগুলির কাজে বড় হেলাফেলা। চিঠির ওপর ঠিকঠাক মোহরের ছাপ পড়েনি। আমি কাল সারাদিন আতস কাচ নিয়ে চেষ্টা করে দেখলাম। না, কোথা থেকে যে চিঠিটা ডাকে দেওয়া হয়েছে তা পড়াই গেল না। জানি যেখান থেকেই দেওয়া হোক ডাকে, কুণাল আর সেখানে নেই। সে সরে গেছে অন্য জায়গায়। রমতা যোগীর মতো ফিরছে কুণাল, কোথা থেকে কোথায় যে চলে যাচ্ছে! তবু বড় ইচ্ছে করছিল কুণাল কোথায় আছে তা জানতে।

কাল বিকেলের দিকে আলো কমে এলে আমি আতস কাচ নামিয়ে রাখলাম। মাথা ধরে গিয়েছিল সারাদিন আতস কাচের ব্যবহারে। তাই চোখ ঢেকে বসেছিলাম অনেকক্ষণ! ভুল হয়েছিল। সে তো ঠিক চোখ-ঢাকা নয়! টের পেলাম দুটি হাতের আঙুলের ফাঁকে-ফাঁকে গড়িয়ে নামছে চোখের জল।

বিপ্লবের পথ কেবলই গার্হস্থ্যের দিকে বেঁচে যায়! বনের সন্ন্যাসী ফিরে আসে ঘরে! এ আমারই কথা। কুণাল কেবল কথাটা ফিরিয়ে দিয়েছে। যেন ওর কথার আড়ালে উঁকি মারছে তার সকৌতুক দয়াহীন মুখ—রাস্তা তুমিই দেখিয়েছিলে, ঘর থেকে বের করে

এনেছিলে তুমিই। তারপর সরে গেছ কোথায়! এখন কার এঁটো চেটে বেড়াচ্ছ মধুবন? তোমার ঘেন্না করে না?

চমৎকার এইসব শব্দভেদী বাণ কুণালের। মেঘের আড়াল থেকে লড়াই। প্রতিদিন পালটে যাচ্ছে তার ঠিকানা। আর আমি মধুবন—আমি বাঁধা পড়েছি স্থায়ী ঠিকানায়। কুণাল হয়ে গেছে ছায়া কিংবা মায়া। আমি এখন কোথায় পাব তাকে? এ চিঠির তাই জবাব দেওয়ার দায় নেই।

কাল সন্ধেবেলায় আমি ঘরের আলো জ্বালিনি। কুণালের চিঠিটা হাতে নিয়ে চুপ করে বসেছিলাম। আমার বুকের মধ্যে টিকটিকির বাসা। ঘর ছাড়ার কথা মনে হলেই সে ডাক দেয় টিকটিক টিকটিক। যেয়ো না। যাব না তা আমি জানি। তবু চোখের জলে আমার দু-হাতের আঙুল ভিজে গিয়েছিল। নিজের জন্য নয়, আমি কুণালের জন্য কেঁদেছিলাম। তারপর ফাঁকা একখানা ঘরের মতোই শূন্য হয়ে গেল মাথা। মাঝে-মাঝে একটি দুটি শালিক কি চড়ুইয়ের মতো ভাবনা ও স্মৃতি আনাগোনা করে গেল।

অনেকক্ষণ আমার বাইরের কোনও জ্ঞান ছিল না। তারপর আমার বউ সোনা আমাকে ডাকল, 'রাজা, একটু এ-ঘরে এসো।'

গিয়ে দেখি সে কাপড় পালটাচ্ছে। বলল, 'দেখো, আমি তোমাকে সারাদিন একটুও জ্বালাইনি। তবু এখখন জিজ্ঞাসা করছি ও চিঠিটা কার? সারাদিন তুমি ওটা নিয়ে বসে আছ?' আমি চিঠিটা এনে তার হাতে দিলাম।

ও দেখল। তারপর অবহেলায় চিঠিটা টেবিলের ওপর ফেলে গিয়ে বলল, 'দ্যাখো কী বিচ্ছিরি ব্লাউজ পরেছি। পিছন দিকে বোতাম ঘর। কিছুতেই আটকাতে পারছি না, তুমি একটু বোতাম এঁটে দাও না।'

তখন সোনার সাজ আমি লক্ষ করলাম। কনুই পর্যন্ত হাতাওয়ালা একটা ব্লাউজ পরেছে সে, গলায় আর হাতে পাতলা লেস-এর ফ্রিল দেওয়া। ব্লাউজটা আরও কয়েকদিন ধরে পরতে দেখেছি। কোনওদিনই বোতাম এঁটে দেওয়ার জন্য আমার ডাক পড়েনি। তাই মৃদু হেসে আমি ওর পিঠের দিকে বোতাম আর হুকগুলো লাগিয়ে দিলাম।

ও আস্তে করে বলল, 'ইস, কী ঠান্ডা হাত!'

'ঠান্ডা!' আমি অবাক হয়ে বললাম, 'কই!' বলে হাত দুটো ওর গালে রাখলাম।

মাথা ঝাঁকিয়ে সোনা বলল, 'না সে ঠান্ডা নয়! নিস্পৃহতার কথা বলছিলাম।'

চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি। সোনা ধীরে-ধীরে আঁচল তুলে দিচ্ছিল শরীরে। হঠাৎ মুখ এগিয়ে বলল, 'আদর!'

তক্ষুনি কুণালের চিঠিটার কথা একদম ভুল হয়ে গেল।

সোনার ব্লাউজের বোতাম আর হুকগুলো আর-একবার লাগিয়ে দিতে হল আমাকে। তারপর সোনা টেবিলের ওপর থেকে চিঠিটা তুলে নিয়ে বলল, 'লাল কালিতে লেখা এই দেড় লাইনের চিঠিটা নিয়ে এখন আমরা কী করব? বাঁধিয়ে রাখব?'

হেসে বললাম, 'ঠাট্টাটা আমাকেই লাগল, সোনা। চিঠির ও কথাগুলো একদিন আমিই বলতাম। বহুদিন পর অনেক খুঁজে-খুঁজে আমার কাছে ফিরে এসেছে আমারই কথা।'

ও ভ্রূ কুঁচকে চিঠিটার দিকে চেয়ে থেকে বলল, 'এটা কি তোমাকে ভয় দেখানোর জন্য?'

'না, না!' আমি মাথা নেড়ে হেসে উঠি, 'ওটা এমনিই, ঠাট্টার ছলেই আমার কথা আমাকে ফিরিয়ে দেওয়া।'

সামান্য দ্বিধা করে সোনা বলল, চিঠিটার নাম-সই নেই। তবু তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে তুমি একে জানো। কে?'

একটু ভেবে বললাম, 'ও বোধহয় আমারই এক সত্তা। অতীত থেকে লিখে পাঠাচ্ছে।'

'কবিতা!' সোনা হেসে ফেলল, 'এ কবিতা হয়ে গেল, রাজা।' হাসি থামিয়ে আস্তে-আস্তে বলল, 'আমি তো তোমার কাছে শুনেছিলাম যে আমি তোমার এক সত্তা। তোমার এরকম আর ক'টা সত্তা আছে, রাজা?'

হিংসুক। সোনা ভীষণ হিংসুক। ঘরে ওর রাজতন্ত্র। আমি ওর রাজা। ওকে এখন কিছুতেই বোঝানো যায় না যে একদিন আমি কুণালের ছিলাম প্রিয় মধুবন।

না, কুণালের প্রিয় মধুবন হওয়ার জন্য আর-একবার পিছু-হাঁটার কোনও ইচ্ছেই নেই আমার। এখন আমি বেশ আছি। ফাঁকা, খোলামেলা শান্ত একটি ঘরের মতো শূন্য মাথা। মাঝে-মাঝে এক-আধটা শালিক কি চড়ুইয়ের আনাগোনা। এক-আধটা ভাবনা, এক-আধখানা স্মৃতি। তার চেয়ে বেশি কী দরকার। এখন আমার আলো বাতাস ভালো লাগে, ছুটির দিন ভালো লাগে, অবসর আমার বড় প্রিয়। আমার প্রিয় সেলাই-কলের আওয়াজ, আমার শিশুছেলের কান্না, আলমারিতে সাজিয়ে রাখা পুতুল কিংবা ফুলদানিতে ফুল। আর বুকের মধ্যে সেই টিকটিকির ডাক। যেয়ো না। যেয়ো না।

তবু মাঝে-মাঝে যখন ভিড়ের মধ্যে রাস্তায় চলি তখন হঠাৎ বড় দিশেহারা লাগে। কিংবা যখন মাঝরাতে হঠাৎ কখনও ঘুম ভেঙে যায় তখন লক্ষ করে দেখি পাথর হয়ে জমে আছে আমার অনেক আক্ষেপ। আয়নায় নিজের মুখ দেখে কখনও চমকে উঠি। মনে কয়েকটা কথা বৃষ্টির ফোঁটার মতো কোনও অলীক শূন্য থেকে এসে পড়ে। তুমি যে এসেছিলে কেউ তা জানলই না। হায়, মধুবন!

সত্য বটে এ সবই আবেগের কথা। নইলে আমার মনে স্পষ্ট কোনও আক্ষেপ নেই। না আছে পিছু-হাঁটার টান। খুব একটা স্মৃতিচারণও নেই আমার। মাঝে-মাঝে সোনা যখন আমাদের ছেলেটাকে নিয়ে কোথাও বেড়াতে যায়, বা বাপের বাড়িতে থেকে আসে একটি দুটি দিন, তখন কখনও-সখনও সন্ধেবেলায় বা রাত্রে আমি ঘরের আলো নিবিয়ে দিয়ে চুপচাপ বসে থাকি। একটি-দুটি কথা অন্ধকারে মশা ওড়ার শব্দের মতো অন্ধকারে গুনগুন করে যায়। আমি তৎক্ষণাৎ আমার বাচ্চা ছেলেটার কান্নার শব্দ মনে-মনে ডেকে আনি, সোনার গলার স্বরের জন্য নিস্তব্ধতার কাছে কান পেতে রাখি। আস্তে-আস্তে সব আবার ঠিক হয়ে যায়। যদি কখনও হঠাৎ মনে হয় যে এরকম শান্ত জীবন হওয়ার কথা ছিল না আমার, আরও দূরতর, ভিন্ন অনিশ্চয় এক জীবন আমার হতে পারত, তখন সঙ্গে-সঙ্গে আমি হাতের কাছে যা পাই—হয়তো ওষুধের শিশি, ফাউন্টেন পেন কিংবা অন্য কিছু না পেলে হাতের আংটির পাথরের দিকে চেয়ে থেকে আস্তে-আস্তে মনকে একটা বিন্দুতে নিয়ে আসি। অতীত এবং ভবিষ্যৎ থেকে ফিরিয়ে নিই আমার মুখ। আস্তে-আস্তে বলি, এরকমই ভালো। এরকম থাকাই আমাদের ভালো। তখন মাথা অনেক শূন্য লাগে। অনেক বেশি শূন্য। যেন একখানা খোলামেলা ফাঁকা ঘর।

অনেকদিন আগে কুণালের সঙ্গে আমার জীবন শেষ হওয়ার কিছু পরে ওইরকম লাল কালিতে লেখা বেনামি আর-একখানা চিঠি এসেছিল আমার সঠিক ঠিকানায়। তাতে লেখা 'জীবনে সৎ হওয়াই সব হওয়া নয়! আদর্শই সব! আদর্শ না থাকলে পুরোপুরি সৎ হওয়াও যায় না!' প্রতিটি বাক্যের পর একটি করে বিস্ময়ের চিহ্ন। আসলে ওগুলো সকথিত জিজ্ঞাসা। ছুঁচের মুখের মতো ওই চিহ্নগুলো আমাকে বিঁধেছিল। আমারই বলা কথা আমাকে ফিরিয়ে দেওয়া। সেই তার প্রথম বেনামা চিঠি। তারপর আমার বিয়ের কিছু পরে আরও একখানা। এইরকম : 'বৃষ্টি হলেই মিছিল ভেঙে যাবে! দৌড়ে গিয়ে দাঁড়াতে হবে গাছতলায়। মাথা বাঁচাতে।' কি জানি সে গাছতলায় বলতে এ ক্ষেত্রে ছাদনাতলায় বুঝিয়েছিল কি না। চিঠিটা আমি সোনাকে দেখাইনি। শুধু মনে-মনে বুঝতে পেরেছিলাম, সে আমার সব খবর রাখে, হদিস রাখে সঠিক ঠিকানার। সে আমাকে ভোলেনি। সামান্য ভয় আমাকে পেয়ে বসেছিল। কী জানি, আমি তাকে আরও তো কত কী শিখিয়েছিলাম। সে যদি সব মনে রেখে থাকে। তারপর ক্রমে বুঝতে পেরেছিলাম যে তা নয়। এ তার

আমাকে নিয়ে খেলা। আসলে পুরোনো পুতুলের মতো ভেঙে সে আমাকে ছুড়ে ফেলে দিয়েছে তার জীবন থেকে। মাঝে-মাঝে সে কেবল দূর থেকে আমাকে ওইভাবে স্পর্শ করে দেখতে চায় আমি কতটা চমকে উঠি।

বলতেই হয় খেলাটা চমৎকার শিখেছে কুণাল। সে খেলতে জানে। গতকাল আমি সামান্য অন্যরকম হয়ে গেলাম। আজ সকালে তাই আমার মুখের দিকে ঘুমচোখে চেয়ে সোনা প্রথম প্রশ্ন করল, 'আজও তুমি ওই ভূতুড়ে চিঠিটার কথা ভাবছ।' চমকে উঠলাম। বস্তুত তা নয়। চিঠিটার কথা আমি ভাবছিলাম না, কুণালের কথাও না।

হেসে বললাম, 'দূর।'

সোনা হাসল না। অনেকক্ষণ চুপচাপ করে ছেলের কাঁথা বিছানা গুটিয়ে রাখল, মশারি চালি করল, তারপর এক সময়ে হঠাৎ আমার দিকে ফিরে বলল, 'কেন ভোরে উঠে জানলার কাছে বসে আছ। এত সকালে ওঠা বুঝি তোমার অভ্যাস।'

সে কথা ঠিক। ভোরে ওঠা আমার অভ্যাস নয়। কেন যে আজ অত ভোরে ঘুম ভেঙে গেল কে জানে। তারপর আর ঘুম আসছিল না। শীতকাল, তবু লেপের ওম ছেড়ে উঠে গায়ে গরম চাদর জড়িয়ে এসে আমি জানালার ধারে বসলাম। খুব কুয়াশা ছিল, জানালার নীচের রাস্তাটাকে মনে হচ্ছিল আবছায়ায় নিঃশব্দে নদী বয়ে যাচ্ছে। আর দূরের কলকাতা খুব উঁচু গাছের অরণ্যের মতো জমে আছে হিমে। সিগারেট ধরাতেই একটি-দুটি পুরোনো কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল। আমি প্রাণপণে সেগুলো ঠেকানোর চেষ্টা করছিলাম। ঠেকানো গেল না। খুব ভোরে একদিন এক আশ্রমের ঋত্বিককে দেখেছিলাম ডান হাতখানি ওপরে তুলে চোখ বুজে আহ্বানী উচ্চারণ করতে 'তমসার পার অচ্ছেদ্যবর্ণ মহান পুরুষ, ইষ্টপ্রতীকে আবির্ভূত, যদবিদা চরণে তদুপসানাতেই ব্রতী হই। জাগ্রত হও, আগমন করো। আমরা যেন একেই অভিগমন করি...।' গান নয়, শুধু টেনে-টেনে উচ্চারণ করে যাওয়া। কবেকার কথা। তবু গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। আমরা যেন একেই অভিগমন করি। ভোরের শান্ত প্রকৃতির দিকে চেয়ে আমার মনে হয়েছিল—হায়, মধুবন! হায়, কুণাল!

আমি আমার আংটির মদরঙের গোমেদ পাথরটার দিকে চেয়ে রইলাম অনেকক্ষণ। আবছা অন্ধকারেও পাথরটা চিকমিক করছিল। আমি আস্তে-আস্তে আংটির গোমেদ পাথরটায় আমার মনকে স্থির করার চেষ্টা করছিলাম। তখন হঠাৎ—খোলা জানলা দিয়ে যেমন ঘরের মধ্যে আসে পোকামাকড়—তেমনি হঠাৎ অনেকদিন আগে শোনা কয়েকটা শব্দ বিদ্যুৎবেগে আমার মধ্যে খেলা করে গেল। প্রথমে আমি কিছুক্ষণ ভেবেই পেলাম না এই শব্দগুলি কী, কিংবা কোথা থেকে এল চেনা শব্দ। বড় চেনা। কয়েকটি মুহূর্তের পর মনে পড়ে গেল, এ আমার বীজমন্ত্র নাম, কৈশোরে শেখা। এতকাল বীজমন্ত্রের শব্দগুলি

নিয়ে মনে-মনে খেলা করতে-করতে সেই কৈশোরের ধ্যান অভ্যাস করার কথা মনে পড়েছিল। একটা সাদা-কালো চক্রের ছবির দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকতাম। তারপর চোখ বুজতেই সেই চক্রটা অমনি চলে আসত দুই ভ্রূর মাঝখানে, নাসিকার মূলে যাকে বলা হয় আজ্ঞাচক্র। অনেক শিখেছিলাম আমি। পইতের পর আমাকে শিখতে হয়েছিল পূজো পাঠ আহ্নিক। দণ্ডী ঘরে কয়েকটা কষ্টের দিন কেটেছিল, যার মধ্যে চুরি করে খেয়েছিলাম রসগোল্লা। মনে পড়ে এক শীতের খুব ভোরে দণ্ডী ভাসাতে যাচ্ছি ব্রহ্মপুত্রে, সঙ্গে জ্ঞাতিভাই তারাপ্রসাদ। হাফপ্যান্ট পরা তারাপ্রসাদ নদীর উঁচু পাড়ে দাঁড়িয়ে হাই তুলছিল। আমি তার দিকে একবার ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে ঢালু বেয়ে জলের কাছে নেমে গেলাম। আমার পায়ে লেগে একটা মাটির ঢেলা আস্তে গড়িয়ে গিয়ে টুপ করে জলে ডুবে গেল। বিবর্ণ মেটে রঙের জলে ভেসে যাচ্ছিল আমার গেরুয়া ঝোলা আর লাঠি। এক কোমর জলে দাঁড়িয়ে আমি দেখলাম মাথার ওপর ফিকে নীল আকাশ, আর চারদিকেই মাটির নরম রং। কোথাও এতটুকু আবেগ বা অস্থিরতা নেই। সব শান্ত ও উদাসীন, আর বাতাসে মিশে থাকা সামান্য কুয়াশার মৃদু নীল আভা। জলে আমাকে ঘিরে ছোট-ছোট ঢেউ ভাঙার শব্দ। খুব সামান্য স্রোতে ধীরে-ধীরে দুলে-দুলে ভেসে যাচ্ছে গেরুয়া ঝোলা সুদ্ধ আমার দণ্ডী। খুব দূরে তখনও নয়। বড় অদ্ভুত দেখাচ্ছিল তাকে। যেন ডুবন্ত এক সন্ন্যাসীর গায়ের কাপড় ভেসে যাচ্ছে জলে। মনে হয়েছিল আর দু-এক পা দূরেই রয়েছে জন্ম-মৃত্যু ও জীবনরহস্যের সমাধান। আর মাত্র দু-এক পা দূরে। আমার চারিদিকে বিবর্ণ মাটি রঙের জলস্থল বৈরাগীর হাতের মতো ভিক্ষা চাইছে আমাকে। তার ইচ্ছে হয়েছিল আমার ওই দণ্ডী যতদূর ভেসে যায়, নদীর পাড় ধরে আমি ততদূর হেঁটে যাই। ফিরে গিয়ে কী লাভ? অনেকক্ষণ বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে জলে দাঁড়িয়ে ছিলাম বলে তারাপ্রসাদ আমাকে জোর করে তুলে এনেছিল। তার পরও বহুদিন আমার সেই ঘোর কাটেনি।

সেই কথা মনে পড়তেই আমি প্রাণপণে অন্যমনস্ক হওয়ার চেষ্টা করছিলাম আজ ভোরে। বীজমন্ত্রের যে শব্দগুলি মনে এসেছিল আমি সেগুলো নিয়ে খেলা করছিলাম। আর আমার আংটির গোমেদ পাথরটায় স্থির করার চেষ্টা করছিলাম আমার সমস্ত অনুভূতি। বহুদিন বাদে কৈশোরের সেই ধ্যান করার ইচ্ছে পেয়ে বসেছিল আমাকে।

কুণাল জানে না তার চেয়ে আমি অনেক বেশি ফেরারি।

অফিসে বেরোনোর সময়ে সোনা মনে করিয়ে দিল, 'আজ আমাদের বিয়ের বার্ষিকী। মনে থাকে যেন।'

মনে ছিল না। চার বছর হয়ে গেল। এখন আমার ছত্রিশ, আর সোনা বোধহয় আঠাশ পেরিয়ে এল। ঘাড় ফিরিয়ে সিঁড়ির তলা থেকে সোনাকে একটু দেখলাম, আমার দিকেই চেয়ে আছে। হাসলাম। ও হাসল। পরস্পরকে বোঝার চেনা পুরোনো হাসি। রাস্তার রোদে পা দিতেই সরগরম কলকাতার উত্তপ্ত ভিড়ের মধ্যে মন হালকা হয়ে যাচ্ছিল। একটা বেনামি চিঠির জন্য কাল আমার অফিস কামাই একথা ভাবতেই আমার খারাপ লাগছিল।

মিডলটন স্ট্রিটে আমার অফিস। দরজায় পা দিতেই টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল বুড়ো দারোয়ান, রিসেপশন কাউন্টারের চঞ্চল মেয়েটি মৃদু হেসে নড করল, 'মর্নিং স্যার' বলে, জুনিয়ার একটি অফিসার হলের আর-একদিকে চলে গেল। আমি লিফট নিলাম না। অনেকদিন পর একটু হালকা লাগছে আজ। আমি জুতোর শব্দ তুলে লাফিয়ে লাফিয়ে দীর্ঘ সিঁড়ি পেরিয়ে উঠে এলাম আমার চারতলার অফিসে। টাইপিস্টের ঘর থেকে অবিরাম টাইপ মেশিনের শব্দ ভেসে আসছে। আমার ছোট অফিস ঘরটার বাইরে অপেক্ষা করছে আমার ছোকরা চটপটে স্টেনোগ্রাফার। আমি তার দিকে চেয়ে একটু হেসে ঢুকে গেলাম ঘরে। শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ঠান্ডা নিস্তব্ধ ছোট্ট ঘরটা আমার। সবুজ কাচে ঢাকা টেবিল, গভীর গদিওয়ালা চেয়ার আর পিছনে প্রকাণ্ড কাচের জানালা। দূরে ময়দানের চেনা দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। কোট খুলে হ্যাঙারে ঝুলিয়ে দিয়ে আমি কাচের শার্সি খুলে দিলাম। হুহু করে ঠান্ডা বাতাস বয়ে এল। পাতা-পোড়ানো ধোঁয়ার মৃদু গন্ধ। উদাস রোদ হাওয়া আর মৃদু ধোঁয়ার গন্ধ আমি আমার অন্তরে গ্রহণ করে নিচ্ছিলাম। বেশ নিশ্চিন্ত জীবন আমার। একটি-দুটি ছোটখাটো অভাববোধ এবং কখনও-সখনও সামান্য একটু একঘেয়েমি ছাড়া কোনও গোলমাল নেই। আমি সুখী। একটি ছোট শ্বাস ছেড়ে আমি চেয়ারে ফিরে এলাম।

দুপুরে হঠাৎ এল সোনার টেলিফোন। তার গলার স্বর শুনে চমকে উঠে বললাম, 'কী হয়েছে।'

'কই! কিছু না!' বলে ও হাসল, 'তোমাকে উল আনার কথা বলেছিলাম, রাজা! মনে আছে? মনে করিয়ে দিলাম। তোমার কোটের ডানদিকের পকেটে নমুনা দিয়ে দিয়েছি। চার আউন্স এনো।'

'দূর! আমি পারব না। আবার অফিসের পর দোকানে ছোটাছুটি। তা ছাড়া উলের রং মেলানো বড় ঝামেলা।'

'পারবে।' বলে হাসল, 'তুমি না পারলে চলবে কী করে? তুমি ছাড়া আমার কে আছে আর?'

মৃদু হাসলাম। আমাকে পটাতে সোনা ওস্তাদ।

একটু চুপ করে থেকে বলল, 'আজ বিকেলের কথা মনে আছে তো?' বলেই আবার হাসি, 'বলো তো আজ কী?'

'আজ?' আমি একটু ভাবনার ভান করে বললাম, 'আজ তো খোকনের জন্মদিন!'

'বদমাশ!'

'তাই না!'

'ঠিক আছে। তাই। শুধু সময়ে এসো।'

তারপর একটু চুপচাপ। টের পেলাম ও ফোন তখনও ছাড়েনি। আমিও ছাড়তে দ্বিধা করছিলাম। তখন হঠাৎ ও বলল, 'রাজা, আমার ফোন পেয়ে তুমি চমকে উঠলে কেন?'

সামান্য গোলমালে পড়ে বললাম, 'কই!'

'ভয় পেয়েছিলে?'

'কীসের ভয়!'

ও হাসে—'কীসের ভয় তার আমি কী জানি! বউ-ছেলে চুরি যাওয়ার ভয় হতে পারে, ঘরে আগুন লাগার ভয় হতে পারে। কত ভয় আছে মানুষের!'

'বদমাশ' বলে আমি ফোন রেখে দিলাম।

সত্য যে আমি ভয় পেয়েছিলাম। সোনা যেভাবে বলল সেভাবে নয়। তবে অনেকটা ওরকমই অস্পষ্ট একটা ভয়।

বিকেলে আমি অনেক ঘুরে-ঘুরে ওর ফরমাশি উল কিনলাম, আর আজকের দিন উপলক্ষ্যে ওর জন্য কিনলাম কালো জমির ওপর হলুদ আর সুরকি রঙের এমব্রয়ডারি করা একটা কার্ডিগান, কিছু ফুল, গোটা দুই বাংলা উপন্যাস। বইয়ের দোকান থেকে বেরিয়ে এসে রাস্তা পা দিয়েছি, সে সময়ে—কোথাও কিছু ছিল না—তবু হঠাৎ মনে হল যদি এই অবস্থায় কোনওদিন কুণাল আমাকে দেখে! কে জানে বাইরের এত অচেনা লোকজনের মধ্যে গা-ঢাকা দিয়ে আমাকে লক্ষ করছে কি না! সে দেখছে তার প্রিয় মধুবনকে। পরনে স্যুট মধুবনের, উলের প্যাকেট, কাগজে মোড়া বউয়ের কার্ডিগান, হাতে ফুল আর উপন্যাস। কি জানি কেমন অস্বস্তি এল মনে, রজনীগন্ধার ডাঁটিতে অকারণে বোকার মতো আমার মুখ আড়াল করলাম।

পরমুহূর্তেই হেসে স্বাভাবিক হয়ে গেলাম আমি। তবু অস্বীকার করার উপায় নেই যে কয়েক পলকের জন্য আমার দুর্বলতা এসেছিল।

সন্ধেবেলায় আমাদের অনুষ্ঠান জমল খুব। আমার অনেককালের বন্ধু অতীশ এসেছিল তার বউকে নিয়ে, আরও দু-একজন বন্ধুবান্ধব আর আত্মীয়স্বজন।

যখন সবাই চলে যাচ্ছে তখন সিঁড়ির গোড়ায় সতীশ আমাকে আলাদা ডেকে নিল, 'তোর সঙ্গে কথা আছে।'

আড়ালে নিয়ে গিয়ে সে প্রশ্ন করল,'কী ব্যাপার রে? শুনলাম তোর কাছে বেনামা একটা চিঠি এসেছে?'

মাথা নাড়লাম—হ্যাঁ। বললাম, 'কে বলল?'

'তোর বউ।' ও হাসল, 'ও খুব ভয় পেয়ে গেছে। বলছিল কাল থেকে তুই নাকি কেমন অন্যরকম হয়ে গেছিস। কেঁদেছিস।'

হাসলাম, 'দূর।'

অতীশ নীচু গলায় প্রশ্ন করল, 'কে লিখেছে?'

বললাম, কুণাল। কুণাল মিত্র।'

'ও!' বলে ভাবল অতীশ, 'বছরচারেক আগে সে আর-একবার তোকে চিঠি দিয়েছিল না?'

'হ্যাঁ। আমার বিয়ের ঠিক পরেই।'

'এবার কী লিখেছে সে?'

আমি বললাম, 'অনেকদিন আগে আমি তাকে শিখিয়েছিলাম : সাবধান! বিপ্লবের পথ কিন্তু কেবলই গার্হস্থ্যের দিকে বেঁকে যায়! বনের সন্ন্যাসীও ফিরে আসে ঘরে! সেই কথাই সে ফেরত পাঠিয়েছে আমাকে।'

হাসল অতীশ, 'তোকে টিজ করছে, না?'

আমি মাথা নেড়ে জানালাম—হ্যাঁ।

ধীরে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলল অতীশ, 'ওর বেশি আর কিছুই কুণালের করার নেই।'

আমি চেয়ে রইলাম অতীশের মুখের দিকে।

অতীশ ম্লান হাসল, 'মধুবন, আমি কুণালের খবর রাখি। বছরখানেক আগে তার খবর পেয়েছিলাম। হাওড়া জেলার মফসসলে একটা কারখানায় সে চাকরি করছে। দুঃখে কষ্টে আছে। আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। আমি তাকে তোর কাছে আসতে বলেছিলাম। তুই বড়

চাকরি করিস। সে মাথা নেড়ে জানাল আসবে না। বলেছিল, আমার খবর মধুবনকে দেবেন না। আমি কথা দিয়েছিলাম। আজ কথা ভাঙতে হল মধুবন, নইলে হয়তো তোর শান্তি থাকত না।'

একটু চুপ করে থেকে অতীশ আবার বলল, 'ভাবিস না মধুবন। এইসব ছোটখাটো চমক সৃষ্টি করা ছাড়া ওর জীবনে তো আর কিছু এখন করার নেই। ওরও ছেলেপুলে নিয়ে বড় সংসার, তোর খোঁজখবর রাখার সময় তেমন নেই। তবু মাঝে-মাঝে ওইসব চিঠি পাঠায়, পাঠিয়ে মজা পায়।'

কুণালকে প্রায় হাওয়ায় মিলিয়ে দিয়ে অতীশ চলে গেল। আমি নিঃশব্দে ঘরে ফিরে এলাম। দেখি ছেলেকে ঘুম পাড়িয়ে সোনা ড্রেসিং টেবিলের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। আমার দিকে ফিরে একঝলক হেসে বলল, 'কী গো কুণাল মিত্রের বন্ধু, ভূতপূর্ব বিপ্লবী? এবার একটু হেসে কথা কও।'

হাসলাম। বুঝলাম অতীশ চিঠিটা আন্দাজ করে সোনাকে সব বলে গেছে। তবু কী করে আমি সোনাকে বোঝাব যে আমি এখনও সুখী নই।

কুণাল কতদূর বিপ্লবী ছিল, সঠিক ফেরারি ছিল কি না তা নিয়ে আমার একটুও মাথাব্যথা নেই। আমি স্বেচ্ছায় সরে এসেছি অনেক দূরে। এখন নিশ্চিন্ত জীবন আমার। তবু মাঝে-মাঝে একজন ফেরারির কথা ভাবতে আমার ভালো লাগে। রাজনীতির জন্য নয়, বিপ্লবের জন্যও নয়, এসব কোনও কিছুর জন্যই এখন আর আমার একটুও ব্যস্ততা নেই। এখন আমার প্রিয়—সেলাইকলের আওয়াজ, আমার শিশু ছেলের কান্না, আলমারিতে সাজিয়ে রাখা পুতুল কিংবা ফুলদানিতে ফুল। কেবল মাঝে-মাঝে এসবের ফাঁকে-ফাঁকে একটু বিমনা হয়ে ভাবতে ভালো লাগে আমারই এক সত্তা পালিয়ে ফিরছে মাঠে জঙ্গলে, খেতে খামারে, পাহাড়ে পর্বতে। কুণালের কথা শুনে তাই আমি একটু খুশি হইনি, অবাকও নয়। আমি তো জানতাম বিপ্লবের পথ গার্হস্থ্যের দিকে বেঁকে যায়! বনের সন্ন্যাসী ফিরে আসে ঘরে! আমি তো তা জানতাম!

রাতে শুয়ে আমার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে সোনা বলল, 'কষ্ট পাচ্ছ?'

চমকে উঠি বলি, 'কই! কীসের কষ্ট?'

'আমি জানি। পাচ্ছ।'

'কেন?'

'কী জানি!' বলে একটু চুপ করে থেকে বলল, বোধহয় তোমার মাঝে-মাঝে সন্ন্যাসী হতে ইচ্ছা করে, না? এমন উদ্দেশ্যহীন নিস্তেজ জীবন তোমার ভালো লাগে না। আমি জানি।'

'দূর।' বলে জোরে হেসে উঠলাম। তবু সোনার মুখ সামান্য বিবর্ণ দেখাচ্ছিল।

'বড় ভয় করে গো।' ঘুমের আগে আমার আদরে তলিয়ে যেতে-যেতে সোনা বলল। অমনি আমার বুকের মধ্যে টিকটিক টিকটিক। যেয়ো না। যেয়ো না।

নিঃসাড়ে ঘুমের ভান করে অনেকক্ষণ পড়ে থেকে আমি গভীর রাতে উঠে লেখার টেবিলে ছোট বাতিটি জ্বেলে বসলাম। কুণালকে একটা চিঠি লেখা দরকার। চেনা কুণালকে নয়। এ আর-এক কুণালকে, যাকে আমি চিনি না।

সারারাত ধরে আমি লিখলাম আমার চিঠি সিগারেটের পর সিগারেট জ্বেলে। তারপর টেবিলের ওপরেই মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম আমি। ভোরবেলা সোনা আমাকে ডেকে তুলল। তার চোখে-মুখে ভয়, ঠোঁট কাঁপছে কান্নায়, 'কী করছিলে তুমি রাজা? সারারাত...সারারাত ধরে।'

আমি সুন্দর করে হাসলাম। তারপর ইঙ্গিতে দেখিয়ে দিলাম চিঠিটা। ও প্রথমে বুঝতেই পারল না।

বললাম, 'সারারাত ধরে আমি এ চিঠিটা লিখেছি সোনা। বেনামি একটা চিঠি।'

'ওমা!' ও অবাক হয়ে বলল, 'এ তো মাত্র একটা লাইন!'

আমার কাঁধের ওপর দিয়ে ঝুঁকে পড়ে ও শব্দ করে চিঠিটা পড়ল, 'ওরে কুণাল, বনের সন্ন্যাসীর চেয়ে ঘরের সন্ন্যাসীই পাগল বেশি!'

আ. র্য প্রদীপ

অনিকেত চাকরি করে একটা আধা-বিদেশি ফার্মে, কেটেকুটে নিয়ে মাসে বেতন পায় সাতশো ছাব্বিশ টাকা। তার মধ্যে বাড়ি ভাড়াতে যায় একশো আশি, দুধ পঞ্চান্ন, ঝি পনেরো। খবরের কাগজ, ইলেকট্রিসিটি, ছেলের ইস্কুলের মাইনে এসব বাদ-সাদ গিয়ে হাতে যা থাকে তা দিয়ে বেঁচে থাকা যায়। তার বউ ঝুমুর আবার একটু বড়লোকের মেয়ে। খুব বড়লোক নয়, তবে কলকাতায় বাড়ি আছে, ওর এক দাদা গাড়িও কিনেছে। ঝুমুর তাই একটু নাক-উঁচু। প্রায়ই বলে—গ্যাসের উনুন কেনো। কিস্তিবন্দিতে একটা ফ্রিজ কেনা যায় না? বাইরের ঘরটায় ভাড়ার টেবিল ফ্যান রেখে মাসে-মাসে টাকা গচ্চা যাচ্ছে, একটা পাখা কিনলেই তো হয়।

ঝুমুর এসব বলে-বলে অনিকেত রাগ করে না। বরঞ্চ তার মনের মধ্যেও ওসব ইচ্ছে হয়। নিজস্ব পাখা, গ্যাসের উনুন, ফ্রিজ এসব আজকাল মধ্যবিত্ত ঘরেও দেখা যায়। তার বন্ধুদেরও অনেকের আছে। একটা তিনশো টাকার ইনক্রিমেন্ট যদি দৈবক্রমে পেয়ে যেত তাহলে বেশ হত। কিন্তু সে আশা নেই। বরং এবছর নাকি বোনাসও কমে যাবে। মনটা নিশপিশ করে। বড্ড গরিবিয়ানামতে তারা থাকে। অনেকদিন ধরে ভালো জামা-প্যান্টও করায় না সে। কত নতুন ধরনের প্যান্ট-জামার কাপড় বেরিয়েছে গত এক বছর ধরে।

পুরোনো বাড়ি ছেড়ে মাসচারেক হল অনিকেত নতুন বাড়িতে এসেছে বন্ডেল গেটে। নতুন বাড়ি বলতে কিন্তু বাড়িটা নতুন নয়। বরং বেশ পুরোনো বাড়ি। দেড়খানা একতলার ঘরের জন্য একশো আশি টাকা গুনতে হয়। এর আগে শেয়ালদার কাছে ছিল, দুখানা ঘরের ভাড়া একশো দশ। কিন্তু ছেলেটাকে সাউথের ভালো স্কুলে ভরতি করার পর থেকেই ঝুমুর সাউথে আসার জন্য অস্থির। তাই আরও সত্তর টাকা মাসিক গুনাগার দিয়ে চলে আসতে হয়েছে দক্ষিণে। ছেলের ইস্কুলটাই এখন বড় কথা।

বাড়িটা ভালো লাগে না অনিকেতের। বড্ড অন্ধকার। একটা ঘর নীচের তলায়, আর আধখানা ঘর পেয়েছে গ্যারেজের ওপর। গ্যারেজের ওপরকার ঘরটা বড়ই ছিল, বাড়িওয়ালা দেওয়াল তলে সেটাকে দু-টুকরো করে বাকি আধখানা ঘরে তার অনেক পুরোনো জিনিসপত্তর ডাঁই করে রেখেছে। তবু এই ঘরটায় কিছু আলোবাতাস আসে। অনিকেত এটাকেই তার বসার ঘর করেছে, যদিও তার বাসায় লোকজন বড় আসে না। অনিকেতও কাউকে ডাকে না। লোকজন এলে ভদ্রতা-টদ্রতা করতে ঝুমুর বড় খুশি হয় না। বউয়ের খুশিটাই তো এখন বড় কথা।

অনিকেত খুব ভাবতে ভালোবাসে। বলতে কি ভাবাটাই হচ্ছে তার সবচেয়ে প্রিয় নেশা। একটা সিনেমা দেখল, কি একটা বই পড়ল, অমনি সিনেমা বা বইয়ের গল্পের সুতো ধরে কত কী চিন্তা তার মাথায় মায়াজাল ছড়িয়ে দেয়। আর সেসব চিন্তার মধ্যে প্রধান হয়ে দাঁড়ায় একটা চিন্তা—আমার যদি অনেক টাকা থাকত!

অফিস থেকে ফিরে এসে প্রায় সময়েই সে একটু রাতের দিকে এই আধখানা ঘরটায় এসে বসে সিগারেট খায় আর ভাবে। ছুটির দুপুরে এখানেই এসে মেঝেয় পড়ে ঘুমোয়।

গ্রীষ্মকাল পড়ে গেছে। রবিবার। বেলা করে খেয়ে অনিকেত চুপচাপ চলে এল দেড়তলার ঘরখানায়। একাবোকা শুয়ে থাকল মেঝেয় শতরঞ্জি পেতে। একটা সিগারেট শেষ হয়েছে, আর-একটা ধরাবে কি না ভাবতে-ভাবতে ঘুমের আমেজ চলে এল। ঘুম আসার এই সময়টা বড় ভালো লাগে অনিকেতের। বাস্তবের সঙ্গে স্বপ্ন কেমন গুলিয়ে যায়। এসব ব্যাপারগুলো আছে বলেই মানুষের বেঁচে থাকাটা একরকম সওয়া যায়।

ঘুমঘোরে অনিকেত আবোল-তাবোল আধোচেতনায় অনেক হিজিবিজি দেখছিল। এ সময়ে একটা ঠুনঠুন শব্দে চটকা ভাঙল তার। পাশ ফিরে দেখল, একটা ধেড়ে ইঁদুর একটা বেশ বড়সড় প্রদীপের মতো কী একটা জিনিস টেনে এনেছে মেঝেয়। প্রদীপটা তাদের নয়, অনিকেত জানে। বোধহয়, বাড়িওয়ালার গুদামঘরটা থেকেই এনেছে। ''যাঃ, যাঃ'' বলে তাড়া দিতেই ইঁদুরটা প্রদীপ ফেলে পালিয়ে গেল।

অনিকেতের কাছ থেকে খুব দূরেও নয় প্রদীপটা। সে হাত বাড়িয়েই নাগাল পেল। হাতে তুলে নিয়ে দেখল, বেশ ভারী। 'সলিড মেটাল! সোনা-টোনা নয়তো!' বলে হাতলওয়ালা মস্ত প্রদীপটা একটু নাড়াচড়া করল সে। প্রদীপটার গায়ে ময়লা পড়েছে বহুদিনের। এটা যে দীর্ঘকালের ব্যবহার হয়নি তা দেখলেই বোঝা যায়। কিন্তু জিনিসটা সুন্দর। এখনও বেচে দিলে পাঁচ-দশ টাকা পাওয়া যাবে। অবশ্য বেচবার কথা এমনিই ভাবল সে। বেচবার প্রশ্নও ওঠে না। অন্যের জিনিস। কিছুক্ষণ প্রদীপটা হাতে নিয়ে শুয়ে রইল সে। হঠাৎ মাথায় ভাবনা এল—আচ্ছা, এটা যদি সেই আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ

হত। যদি এটাতে হাতে ঘষলেই এখন একটা দৈত্য এসে দাঁড়ায় আর বলে—কি চাও বলো, এক্ষুনি এনে দিচ্ছি!

ভাবনা-চিন্তারও একটা শক্তি আছে। অনিকেত উঠে বসল। যদি সত্যিই এরকম কিছু হয়। যদিও বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এসে এসব বিশ্বাস কোনও কাজের নয়, তবু যদি হত! অ্যাঁ! যদি হত?

প্রদীপটা হাতে নিয়ে আঙুলে একটা ঘষা দেয় সে। একা ঘরেও তার হাসি পাচ্ছিল, আর বোকা-বোকা লাগছিল নিজেকে। জানে তো এসব সত্য নয়। এরকম হয় না তবু সে কয়েকবার প্রদীপটার ভিতর দিকে ডান হাতের বুড়ো আঙুল জোরে বারকয়েক ঘষা দিল।

না, কিছুই ঘটল না। কিন্তু হঠাৎ ভেজানো দরজাটার কড়া খুটখুট করে আস্তে নড়ে উঠল।

ঝুমুর এল নাকি চা নিয়ে? চট করে হাতের ঘড়িটা দেখে নিল অনিকেত। না, ঝুমুর এত তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে ওঠে না। মোটে দুটো পঁচিশ।

—কে?

উত্তর নেই।

অনিকেত প্রদীপটা রেখে গিয়ে দরজা খুলে অবাক। খুব লম্বাচওড়া আর খুব দামি পোশাকপরা একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে। অন্তত ছ'ফুট তিন-চার ইঞ্চি লম্বা তো হবেই। বিশাল কাঁধ, প্রকাণ্ড বুক, ইয়া চওড়া হাতের কবজি। বিদেশি সিনথেটিক কাপড়ের সাদা স্যুটপরা গলায় টাই, মৃদু একটা ইনটিমেট সেন্টের গন্ধ ছড়াচ্ছে লোকটার গা থেকে। বোধহয় বকসিং বা কুস্তি করে। কিন্তু খুব ফরসা আর সুপুরুষ, মুখে মৃদু বিনীত একটু হাসি।

অনিকেতকে দেখেই দু-হাত জড়ো করে বলল—আমাকে চিনবেন না। আমি প্রদীপের দৈত্য।

অনিকেত বলল—প্রদীপ দত্ত? প্রদীপ দত্ত! আপনার সঙ্গে কোথাও কী পরিচয়—?

লোকটা মাথা নেড়ে বলল—প্রদীপ দত্ত নয়। প্রদীপের দৈত্য! আপনি এক্ষুনি ওই প্রদীপটা ঘষেছিলেন, তাই না?

স্তম্ভিত অনিকেত মাথা নাড়ল—আজ্ঞে হ্যাঁ।

লোকটা বলল—তাই আসতে হল। বলুন, এখন আপনার জন্য কী করতে পারি?

যদিও অনিকেত বিশ্বাস করতে পারছিল না, লোকটাকে, তবু বলল—ভিতরে আসুন।

প্রকাণ্ড এবং সুপুরুষ লোকটা মাথা নীচু করে ঘরে এল। চারিদিকে চেয়ে বলল—ঘরটা—ভীষণ ছোটো আর স্টাফি, এই ঘরে থাকেন কী করে?

—অভ্যেস। তা ছাড়া পাচ্ছিই বা কোথায়?

লোকটা অনিকেতের সোফা সেটে পা ছড়িয়ে বসল, কিন্তু মুখে সেই অতিবিনীত হাসি আর হাবভাবে নম্রতা ছড়িয়ে আছে।

অনিকেত মুখোমুখি বসল, তার সস্তা সিগারেটের প্যাকেটটা লোকটার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল—আমরা গল্পে পড়েছি, আশ্চর্য প্রদীপ ঘষলে তার ভিতর থেকে ধোঁয়ার মতো বিশাল চেহারার দৈত্য বেরিয়ে আসত। এই বড়-বড় দাঁত, তালগাছের মতো উঁচু চেহারা!

লোকটা সিগারেট দেখে হাতজোড় করে বলল—ওটা পারব না মিস্টার বোস। এখন থেকে আপনি আমার বস। বসের সামনে ধূমপান করাটা বেয়াদবি।

অনিকেত খুশিই হল। প্যাকেটে গোনাগুনতি ছ'টা সিগারেট আছে, আজ আর কিনবার কথা নয়। একটা ফালতু খরচ হয়ে গেলে অসুবিধে হত। সকালে চায়ের পরের সিগারেটটায় টান পড়ত।

লোকটা বলল, হ্যাঁ, যে কথা জিগ্যেস করছিলেন। চেহারার কথা তো! সেই ধোঁয়ার মতো ধড় নিয়ে দেখা দিলে, আপনিও খুশি হতেন না, পাঁচজনে চেঁচামেচিও করত। তা ছাড়া ইভোলিউশন বা বিবর্তন বলেও তো একটা কথা আছে। তাই যে-যুগের যেমন দরকার, তেমনি হয়েই আমাকে আসতে হয়। ক্লায়েন্টরা ঘাবড়ে গেলে বা হার্টফেল করলে ফায়দা কী? বলে লোকটা হাঁ করে দাঁতগুলো দেখিয়ে বললেন—এই দুপাশে দুটো মস্ত দাঁত ছিল, সব ছোট করে ফেলেছি স্ক্রেপ করিয়ে। এ যুগে ওসব প্রি-হিস্টোরিক দাঁত কি চলে?

অনিকেতের নিজের এখন সিগারেট খাওয়ার কথা নয়। একটু আগেই খেয়েছে। হিসেব করে না চললে!

লোকটা হেসে বলল—তাই আপনি প্রদীপ ঘষামাত্র আমি প্রদীপ থেকে বেরিয়ে আসিনি, বরং আপনাকে ঘাবড়ে যেতে না দিয়ে খুব ভদ্রভাবে দরজায় নক করেছি।

অনিকেতের বুকটা কাঁপছিল। উত্তেজনায় সিগারেটটা ধরিয়েই বুঝল বেহিসেবি খরচ হয়ে যাচ্ছে। আবার তৎক্ষণাৎ মনে হল—এ লোকটা যদি প্রদীপের দৈত্যই হয়ে থাকে তবে এর কাছে অনায়াসেই তো এক প্যাকেট সিগারেট চাওয়া যায়! একটু ভেবে অনিকেত খুব লাজুক স্বরে বলল—এক প্যাকেট সিগারেট যে এখন কাকে দিয়ে আনাই।

—জাস্ট এ মিনিট। লোকটা টপ করে উঠে দাঁড়িয়ে প্যান্টের পকেট থেকে এক প্যাকেট পাঁচশো পঞ্চান্নর কিং সাইজ কুড়িটার প্যাকেট আর-একটা খুদে গ্যাসলাইটার বের করে সেন্টার টেবিলে রেখে বলল—আমি এটা আগেই আন্দাজ করেছিলাম। ইউ মে নিড এ লট অব সিগারেটস। বলুন, এখন আর কী করতে পারি!

খুবই অবিশ্বাসভরে সিগারেটের প্যাকেট আর লাইটারটা দেখল অনিকেত। তার বুক কাঁপছে, অসম্ভব নার্ভাস লাগছে, ভয় করছে। তবু লোকটার বিনয় আর ভদ্রতা দেখে তার একটু সাহসও হচ্ছিল আস্তে-আস্তে। সে বলল—আমি যা চাই সব দিতে পারবেন?

লোকটা অল্প মাথা নেড়ে বলল—নিশ্চয়ই। যে-কোনও বস্তুগত জিনিসই আমি আপনাকে দিতে পারি। কিন্তু যদি আপনার মন খারাপ লাগে কখনও, বা যদি গানের গলা না থাকা সত্ত্বেও কখনও আপনার সঠিক সুরে গান গাইতে ইচ্ছে করে তাহলে সেসব ক্ষেত্রে আমার কিছু করার নেই। কিন্তু মন ভালো রাখার জন্য আমি আপনাকে সিনেমার টিকিট, সুন্দরী মেয়ে বা ভালো মদ সাপ্লাই দিতে পারি, গানের জন্য তানপুরা, হারমোনিয়ান বা ভালো ওস্তাদ এনে দিতে পারি।

—যদি অসুখ হয়?

—তার জন্য ডাক্তার বা ওষুধ এনে দেওয়ার ভার আমার, কিন্তু অসুখ সারানোর দায়িত্ব নেওয়া সম্ভব নয়। বস্তুগত সব জিনিসই আপনি আমার কাছ থেকে পাবেন, বাট নাথিং অ্যাবস্ট্রাক্ট অর ম্যাজিকাল।

অনিকেত মাথা নেড়ে বলে—বুঝেছি।

লোকটা মিষ্টি হেসে বলল—এ যুগের সঙ্গে আমার ক্ষমতাকেও সীমাবদ্ধ রাখতে হয়েছে।

অনিকেত শ্বাস ফেলে বলল—তাতেই হবে।

লোকটা নিশ্চিন্ত হয়ে বলল—ধন্যবাদ। এবার বলুন—

অনিকেতের চাইতে লজ্জা করছিল। একটা লোক তাকে মাগনা মাগনা জিনিসপত্র দেবে ভাবতে কেমন লাগে। তাই সে সরাসরি কিছু চাইতে পারল না। গলা খাঁকারি দিয়ে বলল—আমার নাম অনিকেত! এ নামের মানে আপনি কি জানেন?

লোকটা হেসে বলল—আলবত! অনিকেত মানে যার নিকেত বা নিকেতন অর্থাৎ বাড়ি নেই। মানে গৃহহীন।

অনিকেত মৃদু লাজুক হেসে বলে—আমি সার্থকনামা। আমার বাড়ি নেই।

—ইট উইল বি অ্যারেঞ্জেড। বলে লোকটা মাথা নেড়ে পকেট থেকে একটা চমৎকার নোটবই আর ডটপেন বের করে বলল—বলুন, কীরকম বাড়ি আপনার দরকার? রিকোয়ারমেন্টগুলো একটু ডিটেলে বলবেন।

অনিকেত ভীষণ সংকোচের সঙ্গে বলে—ছোটখাটো একটা বাড়ি হলেই হবে। যেমন হোক।

—সঙ্কোচ করবেন না মিষ্টার বোস। আমি আপনার যে-কোনও হুকুম তামিল করতে বাধ্য। ডোন্ট বি শাই।

অনিকেত একটু ভেবে বলল—দোতলা। পাঁচ-ছ'খানা ঘর। ভালো বাথরুম-টাথরুম! দক্ষিণে বারান্দা। যদি একটু বাগান—? বলে থামল।

—হুঁ-হুঁ বলুন। ঘরগুলো কত বাই কত?

—মাঝারি। খুব বড় বা ছোট নয়।

—বুঝেছি। ফার্নিচারের কথা কিছু বলবেন?

—ফার্নিচার? হ্যাঁ, ফার্নিচার। ধরুন, ডানলোপিলোর সব চেয়ার, সোফা, বার্মা টিক-এর খাট। মানে, সব মর্ডান জিনিস আর কি! আপনি যেমন ভালো বুঝবেন তেমন! আর আমার স্ত্রী একটা ফ্রিজের কথা প্রায়ই বলেন, আর গ্যাস উনুন।

লোকটা নোটবই বন্ধ করে বলল,—বাড়িটা কোন এরিয়ায় হলে আপনার পছন্দ?

—ধরুন, নিউ আলিপুর! না, না, সেখানে বড় নির্জন জায়গা, চাকরেরা দুপুরে বাড়ির গিন্নিকে খুন করে পালানোর কেস কাগজে পড়েছি। তার চেয়ে যোধপুর পার্ক ভালো।

লোকটা মাথা নাড়ল, বলল—ইট উইল বি অ্যারেঞ্জড। ভাববেন না। কাল বেলা এগারোটায় আমি আপনার অফিসে ফোন করব। ততক্ষণে একটা কিছু ব্যবস্থা হবে। আমি আসি তাহলে। বলে লোকটা উঠল।

অনিকেত তাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে-দিতে বলল—আচ্ছা, আমি আপনাকে কী বলে ডাকব বলুন তো?

লোকটা একটুও না ভেবে হেসে বলল—ইজি। আপনি যে নামে আমাকে প্রথম ডেকেছিলেন সেই নামে ডাকবেন। প্রদীপ দত্ত।

লোকটা চলে গেল। হঠাৎ অনিকেতের মনে হল—কী বোকা আমি! টেলিভিশনের কথাটা বলে দিলাম না! ভেবে পরমুহূর্তেই সে হাসল। ভাবল, দূর! লোকটাকে তো আবার এক্ষুনি ডাকতে পারি। কিন্তু এক্ষুনি আবার ডাকতে লজ্জা করল বলে ডাকল না। কাল তো দেখা হবেই।

প্রদীপটা খুব সাবধানে কাগজে মুড়ে ঘরের বুক-শেলফে একটা ডিকসনারিকে সরিয়ে গুঁজে রাখল। তার কেবলই মনে হচ্ছিল, এটা স্বপ্ন। কিন্তু পাঁচশো পঞ্চান্ন নম্বরের প্যাকেট আর লাইটার এখনও পড়ে আছে টেবিলে। সে খুব মেজাজে একটা সিগারেট ধরাল। তারপর ভাবল—এরকম হা-ভাতের মতো আমি এতকাল বেঁচে ছিলাম কী করে?

না আচাঁলে বিশ্বাস নেই। সে ঝুমুরকে কিছু বলল না। কাঁপা বুক আর উত্তেজনা নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। খেতে পারল না, ঘুমও হল না ভালো করে। আজ তার বারবার মনে হচ্ছিল, ঝুমুর দেখতে নিতান্তই সাদামাটা। এত সাধারণ মেয়ে নিয়ে ঘর করায় কোনও মজা নেই।

পরদিন ঠিক বেলা এগারোটায় ফোন এল। প্রদীপ দত্ত বলল—মিস্টার বোস একটা ট্যাক্সি নিয়ে এক্ষুনি চলে আসুন। আমি আপনার জন্য গড়িয়াহাটের পুব দিকের ফুটপাথে বাসস্টপে অপেক্ষা করছি। অফিস থেকে হাফ ছুটি নিন, আর ট্যাক্সি ফেয়ার আমিই দেব।

তাই হল। যথাস্থানে প্রদীপ দত্ত অপেক্ষা করছিল, ট্যাক্সিতে অনিকেতের পাশে মৃদুতে উঠে বসে অতি সুগন্ধী রুমালে ঘাড় মুখ মুছতে বলল—খুব ভালো বাড়ি পেয়েছি, আপনার যদি পছন্দ হয় তো এ সপ্তাহেই নেগোশিয়েশন হয়ে যাবে।

অনিকেত ভ্রূ তুলে বলল—বাড়িটা কি রাতারাতি তৈরি করলেন?

প্রদীপ দত্ত হেসে ফেলে বলল—আরে না, না। মিস্টার বোস, আগের দিনে যেমন হত তেমন কি আজকালও হবে? ফাঁকা জায়গারও তো ওনার আছে। তা ছাড়া রাতারাতি বাড়ি উঠলে সবাই এসে চেপে ধরবে আপনাকে। কর্পোরেশন, ট্যাক্স, সি ই এস সি, কে নয়? এখন যা হবে সব থ্রু প্রপার নেগোশিয়েশন। আপনাকে আমি তো বিপদে ফেলতে পারি না।

ট্যাক্সি যেখানে এসে থামল সেটা যোধপুর পার্কের চমৎকার একটা চওড়া রাস্তা। বাড়ি দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। সামনে অনেকখানি লন, ফুলের বেড়। অকল্পনীয় সুন্দর নকশার টালি বসানো মেঝে। নীচের তলায় ছ'খানা ঘর, দোতলায় চারখানা। তিনতলায় দুই ঘরের স্টাডি, রুফ গার্ডেন।

প্রদীপ দত্ত বলল—সদ্য তৈরি হয়েছে বাড়িটা। এখনও কেউ থাকেনি। বাড়ির মালিক শেয়ার মার্কেটে জোর মার খেয়ে বাড়ি বিক্রি করতে চাইছে।

একটু লজ্জার সঙ্গে অনিকেত বলে—কত?

—ছ'লাখ। ও নিয়ে আপনি ভাববেন না। দ্যাটস মাই হেডেক।

তবু সঙ্কোচ বোধ করে অনিকেত। টি ভি সেটটার কথা বলতে লজ্জা করে।

কিন্তু প্রদীপ দত্ত যেন তার মনের কথা টের পেয়েই বলল—টি ভি সেট বা মোটরগাড়ির কথা আপনার রিকোয়ারমেন্টসে ছিল না, কিন্তু সেসব অ্যারেঞ্জ করা হয়েছে। এখন আপনার একটা প্রেজেন্টেবল সোর্স অব ইনকাম আর ট্যাক্স রিটার্নগুলো দেখাতে হবে। সে সমস্ত নিয়ে অবশ্য আপনাকে ভাবতে হবে না। লিভ এভরিথিং অন মি। আপনি বরং মিসেসকে নিয়ে এসে বাড়িটা দেখিয়ে দিন।

ঝুমুর! ঝুমুরের কথা অনিকেত ভুলেই গিয়েছিল। এখন অবশ্য ঝুমুরের কথা ভাবতেও তার ভালো লাগছিল না। ইদানীং ঝুমুর বড্ড মোটা হয়ে গেছে। ভীষণ রাগীও। তা ছাড়া ঝুমুরের মধ্যে রহস্যও নেই আর।

অনিচ্ছার সঙ্গে অনিকেত বলল—আচ্ছা।

প্রদীপ দত্ত তার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ হাসল, বলল—আর যদি আপনি ইন্টারেস্টেড হন তবে ডিভোর্সের মামলা লড়ার জন্য ভালো উকিলের অ্যারেঞ্জমেন্ট করা যেতে পারে। হাই অ্যালিমনি দিলে মিসেসও খুব ঝামেলা করবেন না। যদি রাজি থাকেন তো সেসব আমিই নেগোশিয়েট করতে পারি।

একটু লাল হল অনিকেত। বুকটা নানা আশা-আকাঙ্ক্ষায় গুরগুর করে পাখির ডাক ডাকছে। মাথা নীচু করে সে বলল—তা নয়। ঝুমুরও থাক। ছেলেটাকে ছেড়ে থাকতে পারি না। তবে অন্য মেয়ে—

প্রদীপ দত্ত হঠাৎ গলা নীচু করে বলল—কীরকম মেয়েছেলে চান?

অনিকেত রুমালে মুখ ঢেকে, লাল হয়ে অনেক কষ্টে তার গোপন ইচ্ছের কথা অস্ফুটে বলল—টিনএজার। সুন্দর লাইভলি।

—ওকে।

সাতদিনের মধ্যেই জীবন পালটে গেল অনিকেতের।

ঝুমুর বাড়ি দেখে এত অবাক যে ভালো করে কথা পর্যন্ত বলতে পারছে না। টুইন গ্যারাজে দু-দুটো দামি গাড়ি, ঘরে-ঘরে ভাবা যায় না এমন সব জিনিস চাকর, ঝি, মালি, সফারে বাড়ি গিজগিজ। পাঁচ-সাতটা ঘর এয়ারকন্ডিশন করা। এসব কি আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপের কাণ্ড নাকি?

কয়েকবারই জিগ্যেস করেছে অনিকেতকে—এসব কী গো? কী করে হল?

—হয়েছে থ্রু প্রপার নেগোশিয়েশনস। অনিকেত বলে—সব ট্যাক্স পেইড। চিন্তার কিছু নেই।

এর বেশি কিছু বলে না অনিকেত।

একদিন প্রদীপ দত্ত ফোন করল—মিস্টার বোস, একটু দেরি হয়ে গেল কিছু মনে করবেন না। আপনার রিকোয়ারমেন্টস অনুযায়ী একটি টিনএজার গার্ল পাওয়া গেছে। না, না, চিন্তার কিছু নেই, এসব ব্যাপারের জন্য ক্যামাক স্ট্রিটে একটা ফার্নিশড অ্যাপার্টমেন্ট আপনার নামে কেনা হয়েছে। আজ সন্ধেবেলা চলে আসুন। দিস অ্যাপার্টমেন্ট উইল বি ইওর প্লেজার স্পট। আপনার সফার ঠিকানা জানে।

শুনে অবধি অসম্ভব নার্ভাস লাগছিল অনিকেতের। হৃৎপিণ্ড এত জোরে ধাক্কা দিচ্ছে পাঁজরে যে সেই শব্দ নিজের কানে শুনতে পাচ্ছিল সে!

তবু গেল। তীব্র উত্তেজনা। এতদিনে সে জীবনকে উপভোগ করতে পারছে। এই তো জীবন।

সফার এক আটতলা বাড়ির সামনে নিয়ে এল অনিকেতকে। লিফটে সাততলায় উঠে কলিং বেল টিপতেই দরজা খুলে বিনীত হাসিমুখে প্রদীপ দত্ত বলল—এভরিথিং সেট। আসুন স্যার।

অ্যাপার্টমেন্টটা তার নিজের বাড়ির তুলনায় তেমন কিছু নয়। তবু এটাও চূড়ান্ত শৌখিন জায়গা। ঘরজোড়া কার্পেট, সোফা সেট, দুর্দান্ত সব আসবাব। ফ্রিজ, টি ভি সবই আছে। আর আছে ছোট্ট একটা বার, তাতে অন্তত পঞ্চাশ-ষাট রকমের বিলিতি মদ।

অসামান্য সুন্দরী মেয়েটি বসেছিল একদম ভিতরের দিকে একটা ঘরে। দরজার গা-তালায় চাবি ঢুকিয়ে প্রদীপ দত্ত দরজা খুলতে-খুলতে বলল—মেয়েটা অ্যাগ্রেসিভ, ওয়াচ ইয়োর স্টেপস।

শুনে একটু চমকে যায় অনিকেত।

ঘরে ঢুকে সে আর একবার চমকায়। ঘরে একটা ডিভান, একটা ড্রেসিং টেবিল, দুটো ছোট টুল আর-একটা হোয়াট নট ছাড়া বেশি কিছু নেই। এক গোছা রজনীগন্ধা ভাঙা ফুলদানি সহ মেঝেয় ছিটিয়ে পড়ে আছে, জলে ভিজে শপশপ করছে কার্পেটমোড়া মেঝে। ড্রেসিং টেবিলের আয়না চুরমার, টুলগুলোয় পায়া ভাঙা; ডিভানে কালো পাতলা একটা হাউস কোট পরে মেয়েটি বসে আছে। এত সুন্দর মেয়ে অনিকেত জীবনে দেখেনি। যেমন ক্ষীণকটি, তেমনি উন্নত বুক। মুখ কে যেন ছেনি দিয়ে লক্ষ বছর ধরে কেটে তৈরি করেছে। গায়ের রং গোলাপি আলোয় ভরে দিয়েছে ঘর। তার চুল এলোমেলো, দুটো চোখ বাঘিনীর মতো জ্বলছে। অনিকেতের দিকে একবার রক্তজল করা চোখে তাকাল।

তারপর উঠে চকিত পায়ে দৌড়ে এল দরজার দিকে। অনিকেত যেখানে দাঁড়িয়ে ঠিক সেই দিকে। অনিকেত কিছু বুঝবারও সময় পেল না, মেয়েটা প্রচণ্ড নখে হঠাৎ চিরে ফেলতে লাগল তার মুখ। অনিকেত চিৎকার করে উঠল—প্রদীপ দত্ত! প্রদীপ দত্ত!

বন্ধ দরজা খুলে প্রদীপ দত্ত শান্ত পায়ে ঘরে আসে। একটা হাতে মেয়েটাকে তুলে নেয় অনায়াসে। ডিভানে প্রায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে অনিকেতকে বলে—আমি ঠিক রিকোয়ারমেন্টস মতো বাছাই করে মেয়েটিকে তুলে এনেছি। কিন্তু আপনার প্রতি ওকে অ্যাট্রাকটেড করে তোলার কোনও উপায় আমার নেই। দ্যাট ইজ ইওর বিজনেস মিস্টার বোস। ট্রাই এগেন।

বলে চলে যায় প্রদীপ দত্ত।

অনিকেতের গাল ছিঁড়ে রক্ত পড়ছে, আগুনের মতো জ্বালা করছে মুখ। মেয়েটা উপুড় হয়ে ডিভানে পড়ে কাঁদছে।

অনিকেতের মাথায় আগুন জ্বলে গেল। হঠাৎ চিতাবাঘের মতো গিয়ে লাফিয়ে পড়ল ডিভানে।

প্রায় আধঘণ্টা গেল ধস্তাধস্তিতে। অনিকেত মেয়েটাকে কিছুতেই বাগে আনতে পারে না। মেয়েটার দু-খানা লম্বা হাত, হাতে নখ, দু-খানা পায়ে হরিণের গতি, অসম্ভব দম—এসবই বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বারদুই ধরতে পেরেছিল সে মেয়েটিকে, কিন্তু কিছু করার আগেই ছিটকে বেরিয়ে গেল মেয়েটি। অনিকেত তীব্র পিপাসায় ছটফট করে। এমন তীব্র নারীদেহের তৃষ্ণা সে আগে কখনও টের পায়নি। কিন্তু তার বয়স প্রায় চল্লিশ, শরীর আগের মতো সতেজ নেই, দম কমে এসেছে। সে তাই হাঁফায় জিভ বের করা কুকুরের মতো।

তারপর প্রদীপ দত্ত আসে।

—সরি মিস্টার বোস।

অনিকেত মুখ তুলে তাকায়। তার একটু লজ্জা করে। সে একটু মাথা নেড়ে জানাল, সে পারেনি।

প্রদীপ দত্ত একবার 'হুঁ' বলে একটু ভাবে। তারপর হঠাৎ কোথা থেকে একটা ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জে ওষুধ জাতীয় কিছু নিয়ে আসে। মেয়েটিকে সে অনায়াসে ধরে ফেলে এক হাতে, তারপর ঝাঁকুনি দিয়ে ডিভানে শুইয়ে হাঁটু দিয়ে চেপে ধরে তার পিঠ, তারপর ইঞ্জেকশনের নির্দয় ছুঁচে তার হাতে ওষুধ ঢুকিয়ে দিয়ে অনিকেতকে বলে—এবার যা খুশি করুন।

মেয়েটি আর বাধা দেয় না, নিষ্ক্রিয় পুতুলের মতো শুয়ে থাকে এক ঘোর আচ্ছন্নতায়। অনিকেত তার এতকালের অতৃপ্ত কামনা-বাসনা নিয়ে মেয়েটিকে গ্রহণ করার সময়ে টের পায়, মেয়েটি সম্পূর্ণ কুমারী ছিল।

অনিকেত নির্জীব হয়ে যখন উঠে এল তখন প্রদীপ দত্ত ঘরে আসে। একটু হেসে বলে — ওকে?

অনিকেত অনেক রাত পর্যন্ত মদ খেল বসে। বারংবার মেয়েটির শরীর আক্রমণ করল গিয়ে। কোনওবারই তৃপ্ত হল না। আরও আগুন জ্বলে ওঠে শরীরে। ভোর রাতে সে প্রদীপ দত্তকে ডেকে বলল—আরও মেয়ে। প্রতিদিন নতুন।

প্রদীপ দত্ত মাথা ঝাঁকিয়ে বলে—ব্যবস্থা হবে মিস্টার বোস।

অনেক কাল থেকে চেপে রাখা বহু ইচ্ছে অনিকেতের চিন্তায় নানা রঙের বর্ণালি সৃষ্টি করত। প্রতিদিন চাকরিতে যাওয়ার সময়ে মনে হত—হায় রে, যদি ছুটি পেতাম অনন্ত! বড়লোকদের পাড়ায় চমৎকার সব বাড়ি দেখলে মনে হত—এরকম বাড়ি যদি আমার হত! সুন্দরী মেয়ে দেখলে ভাবত—এ যদি হত আমার প্রেমিকা! এরকম ইচ্ছে আর ইচ্ছে।

প্রায় সব ইচ্ছাই পূর্ণ হল অনিকেতের। ছুটি, বাড়ি, আর সুন্দরী মেয়েরা। অবশ্য মেয়েরা যে সবাই তার প্রেমিকা হয়েছে তা নয়। কিন্তু ক্রমে-ক্রমে বশীভূত হয়েছে। কলকাতায় অন্তত দশ-বারোখানা অ্যাপার্টমেন্ট কেনা হয়েছে অনিকেতের নামে। সেরা সুন্দরীরা সেখানে থাকে। যোধপুর পার্কের বাড়িতে বড় একটা যাওয়া হয় না অনিকেতের। এইসব অ্যাপার্টমেন্টেই তার দিন কাটে। প্রদীপ দত্ত ছায়ার মতো তার সঙ্গে আছে, কোনও গোলমাল হলেই এসে হাজির হয়।

অনিকেত এখন কয়েকটা মস্ত-মস্ত প্ল্যান্টের মালিক, বিরাট ব্যাবসা তার। অবশ্য সেসব তাকে দেখতে হয় না, প্রদীপ দত্তই সব দেখাশোনা করে। এখন সে দেশের একজন অগ্রগণ্য লোক। অনেকগুলো সংস্থার সভাপতি, চেয়ারম্যান। বিপুল প্রতিপত্তি তার। খবরের

কাগজে তার নাম ওঠে। অনিকেত কয়েকবারই ঘুরে এল লন্ডন, নিউইয়র্ক, প্যারিস, টোকিও। গেল হাওয়াই দ্বীপে ফুর্তি করতে, মোনাকোতে গিয়ে জুয়া খেলল, প্যারিসে মহিলা প্রেমে রইল ডুবে। জীবনটা কানায়-কানায় ভরে উঠেছে, তার কোনও অভাব নেই। কেবল মনে হয়, তাকে যদি ঈশ্বর আরও একটু কামের ক্ষমতা দিতেন, আরও ক্ষুধা-তৃষ্ণা দিতেন তাহলে বড় ভালো হত। পৃথিবী ভরতি সুন্দরী মেয়ে, কত মহার্ঘ সুস্বাদু খাবার, কত চমৎকার পানীয়। কিন্তু একটিমাত্র শরীরে কত ভোগ করা যাবে?

খুব ভোরবেলায় অনিকেতকে উঠতে হয়। খাটো প্যান্ট আর গেঞ্জি, শীতকাল হলে পুলওভার পরে গাড়ি করে ময়দানে যায়। ময়দানে অনেকক্ষণ দৌড়োয় সে। ঠিক দৌড় নয়, প্রদীপ দত্ত বলে, জগিং। দৌড়তে হয় আস্তে-আস্তে, অনেকক্ষণ ধরে। সঙ্গে সবসময়ে প্রদীপ দত্ত থাকে। দৌড়ে ফিরে এলে ব্যায়াম শিক্ষক আসে, তারপর যোগব্যায়ামের শিক্ষক। ব্রেকফাস্ট। প্রদীপ দত্ত এই সময়ে অনেক কাগজপত্রে সই করায়। দশটা বাজতে-না-বাজতেই লোকজন আসে, কনফারেন্স থাকে, আসে খোশামুদরা। প্ল্যান্টে যেতে হয় মাঝে-মাঝে। টেলিফোনে কথা বলতে হয়। বিকেলে ক্লাব রেস্টুরেন্ট কখনও বা মিটিং থাকে। সন্ধের পর থাকে মেয়েরা, ড্রিংকস, কখনও বা বন্ধুবান্ধব জাতীয় কিছু লোকের সঙ্গে থাকে পার্টি। অবশ্য এসব ফেলে রেখে অনিকেত যে-কোনও সময়ে দেশভ্রমণেও বেরিয়ে পড়তে পারে। ভারতের সব বড় শহর, স্বাস্থ্যনিবাস বা সুন্দর জায়গায় তার বাড়ি আছে। বাড়ি আছে লন্ডন, নিউইয়র্ক বা টোকিওতেও। কোথাও কোনও অভাব রাখেনি প্রদীপের দৈত্য ওরফে প্রদীপ দত্ত। নিরাপদ এবং নিশ্চিন্ত তার আরাম। যেদিন তার কথা বলতে ইচ্ছে করে না বা কাজ করতে ইচ্ছে করে না সেদিন প্রদীপ দত্তই সব সামলায়, কোথাও আটকায় না।

মাসে চারবার তার শরীরের চেক আপ হয়। ডাক্তাররা রক্তচাপ মাপে, চোখ-দাঁত দেখে, কান-নাক পরীক্ষা করে, রক্তে চিনির পরিমাণ মাপে, ই সি জি হয়, এক্স-রে হয়। কোথাও একটু খুঁত পেলেই সঙ্গে-সঙ্গে মেরামত করা হচ্ছে, অনিকেতের জীবন বড় নিশ্চিন্ত।

খুব ভোরে অনিকেত দৌড়াচ্ছে মাঠে। শীতকাল। একটা ভারী কুয়াশা চারদিকে ভূতুড়ে করে রেখেছে। সূর্য উঠতে অনেক দেরি। চারদিক আবছায়ার ঘোর। গায়ে যথেষ্ট মোটা একটা পুলওভার, কান-মুখ মাফলারে ঢাকা, পায়ে দৌড়ের জুতো। বেশ লাগছিল অনিকেতের। একটু হাঁফ ধরে আসছিল বটে, কিন্তু সে গতরাতের হ্যাংওভারও হতে পারে।

প্রদীপ দত্ত দৌড় বজায় রেখেই বলল—একচল্লিশ বছর তিন মাস তেরো দিন। আজকের দিনটা নিয়ে।

অনিকেত একটু থমকে গিয়ে বলে—চল্লিশ হয়ে গেল এর মধ্যে! কত বললে? একচল্লিশ? এই তো সেদিন আটত্রিশ ছিলাম।

প্রদীপ দত্ত হেসে বলে—ইয়েস স্যার, ম্যাট্রিক সার্টিফিকেটে এখনও আপনার চল্লিশ হয়নি। কিন্তু আসল বয়স—

দৌড় থামিয়ে অনিকেত কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে হাঁফাতে-হাঁফাতে বলে—একচল্লিশ ইজ টু মাচ।

—কিছু করার নেই মিস্টার বোস। প্রদীপ দত্ত হতাশভাবে বলে।

আজকাল অনিকেতের মাঝে-মাঝে রাগ হয় প্রদীপ দত্তর ওপর। এখন ওকে সে 'তুমি' করে বলে, ধমকায়। ওর কাছে আজকাল কিছু চাইতে আর লজ্জা বোধ করে না অনিকেত। মাঝে-মাঝে এমনও ভাবে সে—লোকটা কোনও কাজের নয়। সব দিচ্ছে তবু কোথায় ফাঁকি রাখছে যেন!

অনিকেত বলল—প্রদীপ দত্ত, তোমার বয়স কত?

প্রশ্ন শুনে প্রদীপ দত্ত একটু ভ্যাবাচাকা খেয়ে বলে—আমার বয়স? সে অনেক। আমি ভারচুয়ালি এজলেস।

—তবু বলো।

প্রদীপ দত্ত একটু হেসে বলে—আমি এই পৃথিবীর সমান বয়সি।

—মিথ্যে কথা প্রদীপ দত্ত।

—মাপ করবেন স্যার, আমার জন্ম কবে হয়েছিল আমার তা জানা নেই।

—তোমার কখনও অসুখ করে না? বুড়ো হওয়ার ভয় ধরে না তোমাকে? মৃত্যুচিন্তা হয় না?

প্রদীপ দত্ত বলল—না।

অনিকেত একটা শ্বাস ছাড়ে। তারপর শ্লথ গতিতে আবার দৌড়োয় সে। পিছনে নিঃশব্দ ছায়ার মতো প্রদীপ দত্ত। দৌড়োতে-দৌড়োতে অনিকেত হঠাৎ বলে—প্রদীপ দত্ত, আমি হাঁফিয়ে পড়ছি কেন? খুব বেশি দৌড়োইনি আজ, তবু কেন আমার হাঁফ ধরছে?

—একটু বিশ্রাম করুন, ঠিক হয়ে যাবে।

—তুমি হাঁফাওনি?

প্রদীপ দত্ত ম্লান একটু হেসে বলে—না। হাঁফিয়ে পড়লে আমার চলে না।

নিজের মার্সিডিস বেনজ গাড়িতে ময়দান থেকে ফিরবার সময়েও অনিকেত বারবার জিগ্যেস করল—আমি আজ হাঁফিয়ে পড়লাম কেন বলো তো?

প্রদীপ দত্ত গম্ভীর বিনয়ের সঙ্গে বলে—কিছু না। ঠিক হয়ে যাবে।

—কল দি ডক্টরস।

ডাক্তাররা এল। আগাপাশতলা পরীক্ষা করল তাকে। না, কিছু হয়নি, হার্ট ঠিক আছে, প্রেসার স্বাভাবিক, রক্তে চিনি নেই, লাংস ভালো।

—তবে? প্রশ্ন করে অনিকেত।

প্রদীপ দত্ত তার কানে-কানে আস্তে করে বলে—বয়স! চল্লিশের পর একটু ডিজিনেস আসে। কিছু না। এ-বয়সের যে-কোনও লোকের চেয়ে আপনার হেলথ অনেক ভালো।

অবহেলার সঙ্গে একবার প্রদীপ দত্তকে দেখে নিয়ে অনিকেত বলে—দেখো, হেলথ যেন আর গড়বড় না করে।

—চেষ্টা করব স্যার। সব রকম ট্রিটমেন্টের ব্যবস্থা হবে।

অনিকেত একটু গম্ভীর হয়ে গেল। আজ কোনও কাজ করল না অনিকেত। কেবল ছাদের বাগানে ঘুরে-ঘুরে অজস্র বিরল ফুলের সৌন্দর্য দেখল। তারপর এক সময়ে উত্তেজিত হয়ে ডাকাল—প্রদীপ দত্ত! প্রদীপ দত্ত!

প্রদীপ দত্ত দৌড়ে উঠে আসে ছাদে।

অনিকেত একটা বসরাই গোলাপ গাছে শুকনো ফুল দেখিয়ে বলে—এটা কী? এটা এখানে কেন? জানো না আমি মরা ফুল দেখতে পারি না!

—দুঃখিত মিস্টার বোস। এক্ষুনি তুলে ফেলে দিচ্ছি।

প্রদীপ দত্ত ফুলটা তুলতে যাচ্ছিল অনিকেত বাধা দিয়ে বলল—থাক, থাক। তুলো না।

কী কারণে যেন প্রদীপ দত্ত একটু হাসল।

অনিকেত ঘরে ফিরে আয়নায় নিজেকে দেখতে-দেখতে আপন মনে বলল—একচল্লিশ! একচল্লিশ!

আয়নায় ছায়া ফেলে প্রদীপ দত্ত কাছে এসে বলল—এমন কিছু নয় স্যার, চল্লিশে যৌবন শুরু।

অনিকেত একটু হেসে বলে—ইফ ফর্টি কামস, ক্যান ফিফটি বি ফার বিহাইন্ড?

কী কারণে যেন প্রদীপ দত্ত আবার একটু হাসল।

কে আমাকে ভালোবাসে?—হঠাৎ এই প্রশ্ন মাঝরাতে চাবুকের মতো তার সমস্ত শরীরের চমকে দিল। ঘুম ভেঙে উঠে বসে অনিকেত। প্রশ্নটাকে অসম্ভব জরুরি বলে মনে হয়। যে মেয়েটি তার বিছানায় শুয়ে আছে সে-ই প্রথম দিন খিমচে দিয়েছিল তার গালে। এখন ভীষণ বাধ্য হয়ে গেছে।

অনিকেত ডাকল—মিলি, মিলি!

সঙ্গে-সঙ্গে উঠে বসল মিলি। গায়ের আবরণ সরাতে-সরাতে কটাক্ষ করে হাসল একটু।

অনিকেত মেয়েটির দিকে চেয়ে থাকে। ও কি ভালোবাসে আমাকে?

অনিকেত বলল—মিলি, তুমি একটু গান গাইবে?

—নিশ্চয়ই। কী গান গাইতে হবে?

—যা খুশি। আনন্দের গান গাও, প্রেমের গান।

—মিলি গাইতে লাগল।

অনিকেত মাথা নেড়ে বলে—না, গান নয়। এসো, দুজনে নাচি।

দুজনে নাচল। নাচতে-নাচতে ক্লান্ত হয়ে পড়ল।

—হচ্ছে না। অনিকেত বলে।

—কী?

—কিছু নয়। মিলি, আমাকে একটু জড়িয়ে ধরে থাকো, তোমার শ্বাসে আমার শ্বাস মিশে যাক, আমি তোমাকে কিছুক্ষণ অনুভব করি।

মিলি আশ্লেষে জড়িয়ে ধরল তাকে। নিঝুম হয়ে খানিকক্ষণ অনুভব করে অনিকেত। মিলিকে সে যা করতে বলে তাই করে সে। নইলে প্রদীপ দত্ত আসবে, ভয়ঙ্কর শাস্তি দেবে মিলিকে। অনিকেত মিলির বুকের হৃৎস্পন্দন শুনল। জোরে চলছে হৃৎপিণ্ড। এর হৃৎপিণ্ড ভয়ের বাস, লোভের আস্তানা।

ঘোর রাতে গাড়ি বের করতে হুকুম দিলেন অনিকেত। প্রদীপ দত্তকে ডাকতে হয় না, সে আপনিই নিঃশব্দে সঙ্গ নেয়। বিভিন্ন পোষা মেয়েমানুষের কাছে ঘুরে বেড়ায় অনিকেত, নিজের বউ আর ছেলের কাছেও যায়। কিন্তু কোথাও যেন কোনও নিশ্চয়তা পায় না। সবাই বাধ্য, বিনীত, ভদ্র, হুকুমমাত্র যাকে দিয়ে যা খুশি করাতে পারে অনিকেত। তবু কেমন এক অনিশ্চয়তা। এই গভীর রাতে সে সকলের কাছে গিয়ে-গিয়ে ঘুম ভাঙাল। কেউ বিরক্ত হল না, বরং তটস্থ হল, আপ্যায়ন করল, ভালোবাসা প্রকাশ করল। এমনকী ঝুমুরও।

—আশ্চর্য! অনিকেত গাড়িতে ফিরে আসবার সময়ে বলল।

একটু যেন লজ্জিত হয়ে প্রদীপ দত্ত বলে—আপনি যেমন চেয়েছিলেন ঠিক তেমনই সব অ্যারেঞ্জমেন্ট করা আছে মিস্টার বোস। আপনি কোনও ত্রুটি পাচ্ছেন না তো?

—পাচ্ছি প্রদীপ দত্ত। আমি একটা মানুষকেও অর্জন করতে পারিনি।

—কেউ বেয়াদবি করেনি তো স্যার? প্রদীপ দত্ত উদ্বিগ্ন হয়ে বলে।

—না। আর সেইটেই তো বেয়াদপি। এরা কেউ বেয়াদবি করছে না, রাগ করছে না আমার ওপর, অভিমান করছে না, অবাধ্য হচ্ছে না। যে আমাকে ভালোবাসবে সে তো কখনও-কখনও একটু অবাধ্য হবে, অভিমানটান করবে প্রদীপ দত্ত? তাই না?

প্রদীপ দত্ত গম্ভীর হয়ে বলে—ওসব অ্যাবস্ট্র্যাক্ট জিনিস মিস্টার বোস। আমার এক্তিয়ারের বাইরে।

তুমি কোনও কাজের নও। অনিকেত রেগে গিয়ে বলে।

প্রদীপ দত্ত একটু গুম হয়ে থেকে বলে—ঠিক আছে স্যার, আপনি যেমন চাইছেন ওরা এবার থেকে ঠিক সেরকমই বিহেভ করবে। আপনার রিকোয়্যারমেন্টগুলো বলুন, আমি টুকে রাখছি—বলে প্রদীপ দত্ত তার নোটবই বের করে গাড়ির ড্যাশ বোর্ডের আলোয় লিখতে-লিখতে আপন মনে বলে—রাগ, অভিমান, মাঝে-মাঝে একটুআধটু নন-অ্যাগ্রেসিভ অবাধ্যতা—আর কি বলবেন স্যার?

অনিকেত হাত বাড়িয়ে নোটবইটা কেড়ে নিয়ে বলে—চুপ করো। আমি কিছু চাইছি না। আমি এখন একটু একা থাকতে চাই। আমার যদি কোনও ফাঁকা অ্যাপার্টমেন্ট থাকে তো সেখানে আমাকে নিয়ে চলো।

—আছে স্যার। একটা দশতলা অ্যাপার্টমেন্ট হাউস আপনার অর্ডার মতো কেনা হয়েছিল, তাতে কোনও ভাড়াটে নেই। আপনার আদেশ মতো বাড়িটার চল্লিশটা ফার্নিশড ফ্ল্যাট ফাঁকা পড়ে আছে।

দশতলার ফাঁকা কিন্তু চমৎকার সাজানো অ্যাপার্টমেন্ট স্বয়ংক্রিয় লিফটে উঠে এল অনিকেত। ক্লান্তভাবে একটা কৌচে বসে রইল নিঝুম হয়ে।

কেউ কোথাও নেই, শুধু কপাটের আড়ালে উৎকর্ণ হয়ে অপেক্ষা করছে প্রদীপ দত্ত।

—প্রদীপ দত্ত! অনিকেত ডাকে।

—বলুন স্যার। নিঃশব্দে সুপুরুষ দৈত্য ঘরে এসে দাঁড়ায়।

—ভগবান বলে কে একজন আছে না? আমি তার সঙ্গে আধ ঘণ্টার ইন্টারভিউ চাই। অ্যারেঞ্জ করো।

প্রদীপ দৈত্য ভ্রূ কুঁচকে চিন্তা করে বলে—অ্যাবস্ট্র্যাকশন। আমার এরিয়া নয় মিস্টার বোস। তবে—এই বলে প্রদীপ দত্ত পকেট থেকে একটা ট্যাবলেটের স্ট্রিপ বের করে বলে —একটা ট্যাবলেট খেয়ে নিন, নিজেকেই ভগবান বলে মনে হবে। সত্যি কথা বলতে কি আপনার ক্ষমতা ঈশ্বরের চেয়ে খুব কম নয়।

ট্যাবলেটটা হাতে নিয়ে চেয়ে থাকে অনিকেত, বলে—আর যখন এর নেশা কেটে যাবে, তখন?

—দেয়ার উইল বি মোর ট্যাবলেটস।

ট্যাবলেটটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে অনিকেত বলে—প্রদীপ দত্ত, তুমি অপদার্থ। তুমি আমার বয়স হওয়া ঠেকাতে পারোনি, তুমি এমন একটাও মানুষ বা মেয়েমানুষ জোগাড় করতে পারোনি যে আমাকে সত্যিকারের ভালোবাসে, তুমি ভগবানের সঙ্গে মাত্র আধ ঘণ্টার একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট অ্যারেঞ্জ করতে পারোনি। নিজের কান ধরে দাঁড়াও প্রদীপ দত্ত।

প্রদীপ দত্ত দু-হাতে নিজের কান ধরে বিনীতভাবে দাঁড়িয়ে রইল।

অনিকেত বলল—মানুষের সব চাহিদাই কেন তুমি পূরণ করতে পারো না? তোমার জানা উচিত এত ভোগ্য সামগ্রী উপভোগ করতে হলে মানুষের অনেক আয়ু চাই, অনেক

ভালোবাসা চাই, ফর সিকিউরিটি তার একজন ভগবানও দরকার। তুমি যে সব দিতে পারোনি। কান ধরে ওঠবোস কর প্রদীপ দত্ত।

প্রদীপ দত্ত ওঠবোস করতে লাগল। করতেই লাগল। হাঁফিয়ে গেল না, ঘামল না, কোনও কষ্টের শব্দ করল না। ওর অনন্ত ওঠবোস দেখতে-দেখতে ক্লান্ত হয়ে অনিকেত বলল—তোমার ক্লান্তি নেই? বিশ্রাম নেই?

—না।

—মৃত্যু?

—তাও নেই।

হাহা করে হাসল, অনিকেত, বলল—মিথ্যেবাদী। ঠিক আছে, ওই জানলা দিয়ে লাফিয়ে পড়ো প্রদীপ দত্ত। আমি তোমার শেষ দেখতে চাই।

প্রদীপ দত্ত স্মার্ট পদক্ষেপে গিয়ে জানলার পাল্লা খুলে বিনা ভূমিকায় লাফ দিল নীচে। জানলার কাছে গিয়ে অনিকেত উঁকি মেরে দেখল ফুটপাথে পড়ে আছে প্রদীপ দত্ত।

হাহা করে হাসল অনিকেত। ঘরের মধ্যে ফিরে এসে হুইস্কি নিয়ে বসল। সামান্য নেশা হল তার। একটু ভুলভাল হচ্ছিল। সেই বিভ্রমেই হঠাৎ ডাকল—প্রদীপ দত্ত! তারপর নিজের মনেই বলল—না, না, ও তো মরে গেছে।

কিন্তু নিঃশব্দে, প্রদীপ দত্ত ঘরে এসে বিনীত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে বলল—ইয়েস মিস্টার বোস।

তুমি মরোনি? অনিকেত অবাক।

প্রদীপ দত্ত মৃদু হেসে বলে—আই অ্যাম আনপেরিশেবল স্যার। ডেথলেস।

ক্লান্ত অনিকেত বলল—আজ আমার বয়স কত হল বলো তো?

প্রদীপ দত্ত বলল—একচল্লিশ বছর চার মাস দুদিন। আজকের দিনটা নিয়ে।

চমকে উঠে অনিকেত বলে—এই তো সেদিন বললে তিন মাস তেরো দিন। এর মধ্যে আরও উনিশ দিন বেড়ে গেল?

—উনিশটা দিন এর মধ্যে কেটে গেছে মিস্টার বোস।

—তোমার কাটেনি? তোমার বাড়েনি উনিশ দিনের বয়স?

—না। আমি অনন্ত আয়ু। এজলেস।

—তবে আমার কেন বাড়বে প্রদীপ দত্ত?

—প্রকৃতির নিয়ম স্যার।

আচমকা হুইস্কির গ্লাসটা ছুড়ে মারে অনিকেত। প্রদীপ দত্তর মুখে গিয়ে সেটা ফটাস করে ভাঙে। কাচ ছড়িয়ে পড়ে চারধারে। একটুও কাটে না বা লাগে না ওর, রক্তপাত হয় না। প্রদীপ দত্ত নীচু হয়ে কাচের টুকরোগুলো কুড়িয়ে নিতে থাকে।

বিপজ্জনক নীচু স্বরে অনিকেত বলে—স্কাউন্ড্রেল! ইউ স্কাউন্ড্রেল! বলে তড়িতে উঠে গিয়ে টেবিল থেকে কাগজকাটা একটা ছুরি তুলে নেয়। তারপর চকিতে এগিয়ে গিয়ে বারংবার প্রদীপ দত্তর পিঠে, বুকে পেটে ছুরিটা বসিয়ে দিতে থাকে।

বিনীতভাবে প্রদীপ দত্ত অপেক্ষা করে। অনিকেত ক্লান্ত হয়ে গেলে প্রদীপ দত্ত ছুরিটা নিয়ে টেবিলে রেখে দেয় ফের। নরম স্বরে বলে—একটু ঘুমিয়ে থাকুন। টেক এভরিথিং ইজি।

ক্লান্ত অনিকেত বলে—চলে যাও, প্রদীপ দত্ত, চিরদিনের মতো চলে যাও। আমি আর তোমাকে চাই না।

প্রদীপ দত্ত কেমন যেন একটু হাসে। অত্যন্ত ভদ্র গলায় বলে—গুড নাইট স্যার, টিল ইউ কল মি এগেন।

—আই ওনট কল ইউ বাস্টার্ড। গো অ্যাওয়ে। ডাই।

কিন্তু পরদিনই ঘুম ভেঙে অনিকেত ডাকে—প্রদীপ দত্ত! প্রদীপ দত্ত!

প্রদীপ দত্ত সামনে আসে। খুব যত্নে তাকে বিছানা থেকে তোলে। বাথরুমে পৌঁছে দেয়। বলে সব ঠিক আছে স্যার।

বাথরুমের শার্সি দিয়ে অনিকেত দেখতে পায় নীচে একটা রেইন ট্রি থেকে হলুদ পাতা ঝরে যাচ্ছে। দৃশ্যটা সহ্য হয় না তার। একটা নতুন টুথপেস্টের টিউব আয়নার সামনে থেকে তুলে নেয় অনিকেত। নতুন টিউব, পেস্টে ভরা। অনিকেত কিছু না ভেবেই টিউবটা টিপে ধরে। সাপের মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে পেস্ট বেরোতে থাকে। সারা বাথরুমের মেঝে জুড়ে অনিকেত পেস্ট ছড়ায়। পেস্ট দিয়েই সে মেঝেয় লেখে—আমি চাই অনন্ত আয়ু, আমি চাই অনন্ত ভালোবাসা, হায়—পেস্ট ফুরিয়ে যায় এখানে। টিউবটা ছুড়ে ফেলে দেয় অনিকেত। চিৎকার করে ডাকে প্রদীপ দত্ত, কেন টিউবের পেস্ট ফুরোবে? আমি এমন টিউব চাই যার পেস্ট কখনও ফুরোবে না। যাও, নিয়ে এসো।

প্রদীপ দত্ত অনেকগুলো জায়ান্ট সাইজ টিউব এনে দেয়, কিন্তু সেগুলো আর ফিরেও দেখে না অনিকেত। সে বলে—প্রদীপ দত্ত তুমি কবে আমাকে ছেড়ে যাবে?

—আমি ছেড়ে যেতে পারি না মিস্টার বোস। আমাকে আপনার মৃত্যু পর্যন্ত থাকতে হবে।

—আমার মৃত্যু কবে হবে প্রদীপ দত্ত।

—যথাসময়ে। অপেক্ষা করুন।

—কিন্তু আমি তোমাকে সহ্য করতে পারছি না। কোনও নশ্বর মানুষ সহ্য করতে পারে এক মৃত্যুহীন মানুষকে? বলো প্রদীপ দত্ত, পারে কেউ?

—দুঃখিত মিস্টার বোস। কিন্তু আমি তো আপনাকে খুশি করার প্রাণপণ চেষ্টা করছি।

অনিকেত খুব ক্লান্তস্বরে বলল—আমার আর কিছু চাওয়ার নেই। তুমি আমাকে আর খুশি করতে পারো না। আমাকে অনন্ত আয়ু দাও প্রদীপ দত্ত, অনন্ত কাম দাও, অনন্ত ক্ষুধা আর তৃষ্ণা দাও! একটা নশ্বর শরীর আর-এক জীবনের আয়ু নিয়ে কী করে পৃথিবীতে ভোগ করা যাবে প্রদীপ দত্ত! দয়া করো।

চিন্তিত প্রদীপ দত্ত মৃদুস্বরে বলে—অ্যাবস্ট্র্যাক্ট মিস্টার বোস, আমি দুঃখিত।

—তবে এই মুহূর্তে আমাকে মৃত্যু দাও প্রদীপ দত্ত। আমি মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করতে পারব না। যাও, আমার জন্য যন্ত্রণাহীন মৃত্যুর ব্যবস্থা করো।

প্রদীপ দত্ত কেমন একরকম হাসে। বলে—মৃত্যু? মৃত্যুও অ্যাবস্ট্র্যাক্ট মিস্টার বোস। আমি তা দিতে পারি না। যথাসময়ে তা ঘটবে। আপনাকে অপেক্ষা করতেই হবে।

হতাশায় ভরে যায় অনিকেত। বলে—তবে যা দিয়েছ তা সব ফিরিয়ে নাও প্রদীপ দত্ত।

—লাভ কী? আপনি ইচ্ছে করলেই আবার সব ফিরে পাবেন।

—প্রদীপটা যদি নষ্ট করে ফেলি প্রদীপ দত্ত?

—ওটা নষ্ট হওয়ার নয়। প্রদীপটা আনপেরিশেবল, শক রেজিস্ট্যান্ট, করোশন প্রুভড, ফায়ার রেজিস্ট্যান্ট, অ্যান্ড গ্যারান্টিড ফর ইটারনিটি।

—যদি কাউকে দিয়ে দিই?

প্রদীপ দত্ত একটু হেসে বলে—লাভ নেই মিস্টার বোস। তখন প্রদীপটার জন্য শোকে আপনি পাগল হয়ে যাবেন। যতক্ষণ এটা আপনার কাছে আছে ততক্ষণ আপনি বুঝতে

পারছেন না প্রদীপকে আপনার কী ভীষণ দরকার!

ঠিক। খুবই ঠিক কথা। অনিকেত বুঝল। বুঝে একটু শিউরে উঠল ভয়ে, অনিশ্চতায়। বলল—না, না, কাউকে দেব না।

—সেটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। বলে কেমন একটু হাসল প্রদীপ দত্ত।

হাসিটা চেয়ে দেখল অনিকেত। তারপর হঠাৎ সে-ও ঠিক ওইরকম একটু হাসল। খুব বুঝদারের হাসি। হাসতে-হাসতে কখন হঠাৎ চোখে জল এসে গেল তার।

প্রদীপের দৈত্য বিনীতভাবে দাঁড়িয়ে রইল সামনে। পরবর্তী আদেশের অপেক্ষায়।

আমি সুমন

আমি জানি ভিনি আমাকে ভালোবাসে। ভালোবাসে বলেই ভিনি বারবার আমার কাছে ধরা পড়ে যায়; নাকি ইচ্ছে করেই ধরা দেয় কে জানে। তার সঙ্গে প্রথম দ্যাখা সেই শিশুবয়সে। তখন ও ফ্রক পরে, লালচে আভার এক ঢল চুল আর ঠোঁটের ওপরে বাঁ-ধারে একটা আঁচিল, খুব ফরসা রং—ব্যস, আর কিছু মনে নেই।

প্রথম দিন, পনেরো-ষোলো বছর পর প্রথম দিন ভিনি আমার দিকে তাকালই না। কিংবা তাকিয়ে এক পলকেই সব দেখে এবং জেনে নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে ভালোমানুষ সেজে গেল নিজের মার সামনে, কে জানে। বসল খাটের ওপর জানালার দিকে মুখ ফিরিয়ে আমার কাছ থেকে অনেক দূরে।

সুমন, এই হচ্ছে ভিনি। ওর মা বললেন, তাঁর চোখেমুখে অহঙ্কার ঝলমল করছিল, আরও অনেক নিঃশব্দ কথা ছিল তাঁর মুখে যা তিনি বললেন না, আমি বুঝে নিলুম—দ্যাখো তো আমার ভিনি কী সুন্দর হয়েছে। দ্যাখো ওর আঙুল, ওর চুল, ওর মুখের ছাঁদ, কথা বলে দ্যাখো কী সুন্দর মিষ্টি ওর গলার স্বর, রাজপুত্রের যুগ্যি আমার ভিনি।

এইসব কথা ভিনির মায়ের মুখে লেখা ছিল কিংবা বলা ছিল। আমি বুঝে নিলুম। সঙ্গে-সঙ্গে মনে-মনে নিজের জন্য লজ্জা হচ্ছিল আমার। আমি তেমন কিছু হলুম না কেন। ভিনির বয়স হয়েছে বিয়ের, তবু কোনওদিন ওর অভিভাবকেরা আমার কথা ভাববে না—আমি বুঝে গেলুম প্রথমদিনের প্রথম কয়েক মিনিটেই। মনে-মনে বললুম—পালা সুমন, মনে-মনে যোগী ঋষি হয়ে যা। ছেলেবেলায় তুই যে সুন্দর ছিলি একথা অনেকেই ভুলে

গেছে। এখন কাঠুরের মতো চেহারা তোর, গুন্ডাদের মতো ছোট করে ছাঁটা চুল, মুখের ভাব চোর-চোর, কাঠ হয়ে বসে আছিস।

কতদিন দেখা নেই! ভিনির মা বলে—কী করে আমাদের ঠিকানা পেলে?

সেটা আমার গুপ্ত কথা। তাই বললুম না, হেসে এড়িয়ে গেলুম। বুঝলুম ভিনি যে আমাকে তিনটে চিঠি লিখেছিল পরপর তার কথা ওর বাড়ির কেউ জানে না। তার প্রতিটিতেই লেখা ছিল —একবার আসবেন। আপনাকে বড় দরকার আমার। আমারও প্রশ্ন —আমার ঠিকানা ভিনি পেল কোথায়!

দরকারটা আমি বুঝতে পারছিলুম না, কেন না ভিনি জানালার বাইরে মুখ ঘুরিয়ে ছিল। অথচ পনেরো-ষোলো বছর পর দেখা, তারও আগে দরকারের চিঠি দেওয়া!

চা খেয়ে আমি উঠে পড়লুম—চলি।

আবার আসবে তো? ভিনির মা বলল—আমরা আর তিন-চার মাস কলকাতায় আছি। উনি রিটায়ার করলেন, হেতমপুরে ওঁদের দেশেই আমাদের বাড়ি তৈরি হচ্ছে, দু-তিনটে ঘরের ছাদ বাকি, ছাদ হলেই আমরা চলে যাব। এর মধ্যেই এসো আবার। মা-বাবা কেমন? বলে হাসলেন—কতদিন ওঁদের দেখি না।

হ্যাঁ আসব বলেই বেরিয়ে আসছিলুম, মনে-মনে তাগাদা দিচ্ছিলুম নিজেকে—পালা সুমন, ভিতুর ডিম, আর আসিস না কখনও।

সিঁড়িতে পা যখন দিয়েছি তখনই গলার স্বর শুনলুম—আমি অহঙ্কারী নই।

একঝলক ফিরে দেখলুম—পিছনে সেই লালচে চুলের ঢল আধো আলোতেও ঝলমল করছে মুখ। পাশে ওর মা দাঁড়িয়ে। তবু সঙ্কোচ নেই, কেবল ওর মায়ের মুখে একটু শুকনো ভাব আর জোর করা হাসি।

পালালুম।

দুই

এতকাল আমি শান্তিতে ছিলুম। ছোট্ট একটা ঘর আমার। ছায়াময়, একটু গলির ভিতরের নির্জনে। সারাদিন প্রায়ই কথা না বলে কাটানো যেত। লোকে আমার নাম জানে না, খুব

কম লোকেই আমাকে চেনে। আমি নিজের কাছেই নিজের সুমন। ভালোবাসার, আদরের সুমন।

বাড়িওলার বউ বলল—আপনার কাছে একজন এসেছিল।

—কে? অন্যমনস্ক আমি সিঁড়ি ভাঙতে-ভাঙতে ঘাড় না ফিরিয়ে জিগ্যেস করলুম।

—সুন্দরমতো একজন।

চমকে মুখ ঘুরিয়ে দেখি বাড়িওলার বউয়ের মুখে একটু সবজান্তা হাসি। ওঁর অনেক বয়স তবু হাসিটা সুন্দর দেখাল—মায়ের মতো হাসি।

দুটো সিঁড়িতে দু-পা রেখে দাঁড়িয়ে রইলুম।

—খুব সুন্দর। বাড়িওলার বউ বলল—কে?

বুঝতে পারছিলুম। তবু জিজ্ঞাসা করতে ভয় করছিল—ছেলে না মেয়ে।

—ভাবসাব দেখে মনে হল আবার আসবে। বাড়িওলার বউ বলল—আমাদের ঘরে বসিয়ে রেখেছিলুম অনেকক্ষণ। চা করে খাইয়ে দিয়েছি। কথাবার্তা বেশি হয়নি, ভয় নেই।

ঘরে ঢুকে আলো জ্বাললুম। অন্ধকারকে ডেকে বললুম,—ধরা পড়ে গেছ।

রাতে শুতে গিয়ে কষ্টটা টের পেলুম। বুকে পেটে কিংবা কোথায় যে একটা বিশ্রী ব্যথা ছোট্ট একটা মাছের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। ঘুম আসছিল না। কেবল ভয় আর ভয়। কিছু একটা ঘটবে আমি টের পাচ্ছিলুম।

আমি এইরকম।

খুব বড় একটা বাড়িতে অনেক অপোগণ্ড ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আমার ছেলেবেলা কেটেছিল। তারা সব আমার জ্যেঠতুতো খুড়তুতো পিসতুতো ভাইবোন—অনাদরে রুক্ষ চেহারা তাদের, ঝাকড়-মাকড় চুল, গায়ে তেলচিট ময়লা, ঝগড়াটে, হিংসুটে। প্রকাণ্ড ঘরের মেঝেয় ঢালাও এজমালি বিছানায় শুতে যাওয়ার সময় তাদের জায়গা নিয়ে ঝগড়া হত। বাড়িটাকে বড় বললুম। কিন্তু হিসেবে ধরলে বাড়িটার এলাকাই ছিল বড়, বড় উঠোন ভিতরে, বাইরে বড় কচ্ছপের পিঠের মতো ঢালু একটা মাঠ। ভিতর বাড়িতে বড় উঠোন ঘিরে কয়েকখানা ঘর—যাদের নাম ছিল পুব পশ্চিম উত্তর বা দক্ষিণের ঘর। এক উত্তরের ঘর ছাড়া আর কোনও ঘরেরই পাকা ভিত ছিল না। আমাদের বাড়িটা যে লক্ষ্মীছাড়া ছিল,

কিংবা আমাদের যে খুব অভাব ছিল তা নয়। বরং উলটোটাই আমাদের অনেক ছিল। শুধু আশ্রিত আত্মীয়স্বজন আর যৌথ থাকার চেষ্টায় যে ভিড় বেড়েছিল তাইতেই বাড়িটার মধ্যে সব সময়ে ছিল একটা দিশেহারা ভাব। অনেক ছেলেমেয়ে ছিলুম আমরা, যাদের কেউ-কেউ পরে অনেক বড় কিছু হয়েছে। কিন্তু অতগুলোর মধ্যে কখন কোনটার হাত-পা কাটল, কোনটা পড়ে মরল, কোনটা পুকুরে ডুবল এই চিন্তায় একটা 'গেল গেল' ভাব সবসময়ে আমাদের বাড়িটায় টের পাওয়া যেত। আমার দাদুর কোনও ঢিলেমি ছিল না—তিনি সবসময়ে কৌটোর মুখ ভালো করে আটকাতেন, দরজার হুড়কো দিতেন ঠিকমতো, আর সন্ধেবেলা আমাদের গুনে-গুনে ঘরে তুলতেন। মা-বাবার কাছে শোওয়ার নিয়ম ছিল না, আমরা উত্তরের ঘরের মেঝেয় শুতুম একসঙ্গে, দাদু থাকতেন চৌকিতে, বিড়বিড় করে বীজমন্ত্র বলতেন দাদু-ঠাকুমার সঙ্গে, ছোটখাটো বচসা হত, আর ঘুম ভেঙে রাতে মাঝে-মাঝে শুনতুম দাদুর গুড়ুক-গুড়ুক তামাক খাওয়ার শব্দ।

আমাদের পরিবারে নাম রাখার একটা রীতি ছিল। আমার আগের ভাইদের নাম রাখা হয়েছিল অনিমেষ, হৃষীকেশ, পরমেশ, অজিতেশ, সমরেশ ইত্যাদি। সব মিলিয়ে প্রায় উনিশজনের ওরকম নাম রাখা হয়েছিল। আমার বেলায় আর নাম পাওয়া যাচ্ছিল না। শোনা যায় অনেক ভাবনা-চিন্তার পর আমার বড়দা রায় দিয়েছিলেন—মাত্র দুটি নাম বাকি আছে আর। সুটকেস আর সন্দেশ। কোনটা পছন্দ বেছে নাও। আমার ধর্মবিশ্বাসী মেজোকাকা আমার নাম দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন ধর্মেশ। সেটা বাতিল করে দাদু আমার নাম রাখলেন সুমনেশ। ভালো মনের অধিকারী। কেউ মুখে কিছু বলেনি কিন্তু অনেকেরই পছন্দ ছিল না নামটা, আমার মায়েরও না। তাই কালক্রমে আমি শুধু সুমন হয়ে উঠেছিলাম।

আমি সুমন। ভালো মনের অধিকারী।

ওই বাড়িতে খুব বেশি বড় হয়ে উঠবার আগেই আমরা বাড়ি ছেড়েছিলুম। আমার বাবা চাকরি নিয়ে চলে গেলেন বিহারে। প্রকাণ্ড বাগানঘেরা বাংলোবাড়িতে এসে আমার সেই পাঁচ-সাত বছর বয়সে প্রথম হঠাৎ মনে হয়েছিল—আমার জীবন খুব একার হবে, না হঠাৎ নয়। সেই বাড়িতে প্রথম সকালবেলায় আমি বাড়িটা ঘুরে ফিরে দেখতে ছুটে বেরিয়েছিলুম। একা। সামনে পপি ফুলের বাগান, তারপর ছোট মসৃণ লন, তারপর আগাছা আর রাঙচিতার বেড়া। আমি দৌড়োতে গিয়ে থমকে গেলুম—যত যাই ততই একা। কেবল একা। শিমুলগাছ থেকে হঠাৎ হুহু করে কেঁদে উঠল একটা কোকিল। ওরকম ডাক আমি আর কোনওদিন শুনলুম না। হাজার বছরে কোকিল বোধহয় ওরকম একবার ডাকে। আমি কি অনেক কোকিলের ডাক শুনিনি। তবু আমাদের দেশের এজমালি

বাড়িতে অনেক অপোগণ্ড ছেলেমেয়ের ভিড়ে কখনও আমি কোকিলের ডাক শুনেছিলুম বলে মনে পড়ে না। একা ভোরের ভেজা বাগানে দাঁড়িয়ে আমি প্রথম একটি কোকিলকে ডাকতে এবং কাঁদতে শুনলুম। সেই মুহূর্তেই একা একটি কোকিল আর তার ডাকের সঙ্গে আমার মিলমিশ হয়ে গেল। মনে হল আমার জীবন খুব একার হবে। সেই ভোরবেলাটির কথা আজও আমার খুব মনে পড়ে। ওইরকম একটি কোকিলের ডাক কিংবা আরও তুচ্ছ একটি দুটি ঘটনা থেকে আমরা আবার নতুন করে আমাদের যাত্রা শুরু করি। করি না! আমার এতদিনের বিশ্বাস ছিল—আমার জীবন খুব একার হবে।

আমি আমার বাবাকে সাদা জিনের প্যান্ট পরে ক্রিকেট টেনিস খেলতে দেখেছি। তবু বাবার ছিল সাধু-সন্ন্যাসী-জ্যোতিষ আর তুকতাকের বাতিক। খুব লম্বা সুন্দর সাদা চেহারার এক ভদ্রলোক, যার পরনে গেরুয়া আলখাল্লা আর চোখে সোনার ফ্রেমের চশমা, আমাকে দেখে বলেছিলেন—এ-ছেলের স্বাভাবিক ছবি আঁকার হাত আছে। এর মন একটু দার্শনিক। বলে তিনি চুপ থেকেছিলেন।

বাবা প্রশ্ন করলেন—আর?

উনি হেসে বললেন—একটু দেখে রাখবেন এ-ঘর ছেড়ে পালাতে পারে। সন্ন্যাসের দিকে খুব টান।

—আর? বাবার ভ্রূ কুঁচকে উঠল। দরজার আড়ালে মা ছিল। হঠাৎ তার হাতের চুড়ির ঝনাৎ শব্দ হয়েছিল। আমি বুঝেছিলুম, আমি সেই বয়সেই বুঝেছিলুম, লোকটা ভুল কথা বলছে না।

উনি একটু ভেবে বললেন, ওকে খুব সবুজের মধ্যে রাখবেন। ওর পোশাক যেন হয় সবুজ, ওর খাবারের মধ্যে বেশিরভাগ যেন হয় সবুজ রঙের, ওর চিন্তায় সবুজের প্রভাব যেন বেশি থাকে দেখবেন।

তার পরদিনই রং সাবান কিনে এনে মা আমার সমস্ত পোশাক সবুজ করে তুলেছিল। রাশি-রাশি শাকপাতা অনিচ্ছায় খেতে হত আমাকে। লুডো খেলতে বসেছি, মা ছুটে এসে বলত—সুমন-বাবা, তুই সবুজ ঘর নে। বাড়িতে পোষা বুলবুলি ছিল, তার পাশে এল একটা টিয়াপাখি। জন্মদিনে এক বাক্স জলরং কিনে দিয়ে মা বলল—কেবল গাছপালার ছবি আঁকবি।

তবু আমার জানা ছিল যে, আমার জীবন খুব একার হবে। সবুজ রঙের ভিতরেও একটি উদাসীন মমতা আছে। আমার মা কিংবা বাবা তা ধরতে পারেনি।

তিন

আমার চোখে চোখ রেখে শান্ত একটু হেসে ভিনি বলল—তারপর?

কী?

—তোমার চোখ দেখলেই মনে হয় কোথাও একটু বিপদের আভাস দেখলে তুমি হরিণের মতো ছুটে পালাবে। সুমন লক্ষ্মীসোনা, আমাকে ভয় পেও না। তোমার জন্য আমি অনেক কষ্ট করেছি।

আমি হাসলুম। কী জানি!

আমি সুমন। ভালো মনের অধিকারী। তবু আমি জানি ভিনির জন্য আমাকে কেউ ভাববেই না। ছেলেবেলা থেকেই ভিনি এরকম কথা শুনেছে তার মা কিংবা আত্মীয়দের কাছে—সুন্দর ভিনি, তোমার জন্য এনে দেব সোনার রাজপুত্তুর।

কিন্তু আমি কেবল সুমন। কেবলমাত্র সুমন। নিজের কাছে আমি নিজে বড় প্রিয়। আমি বরং পালিয়ে যাব, লুকিয়ে থাকব, পা টিপে হাঁটব, লোকালয়ে যাব না, তবু কেউ যেন কোনও কিছুর জন্য আমার অনাদর না করে, অপমান যেন না করে আমায়। বরং বলি—তোমাদের সুন্দর ভিনিকে নিয়ে যাও! আমি কিছুই চাই না। আমি আমার বড় আদরের সুমন, বড় ভালোবাসার। আমার সামনে আমার সুমনকে অনাদর করো না, বাতিল করে ফেলে দিও না। বরং নিয়ে যাও তোমাদের সুন্দর ভিনিকে।

ভিনি আমার খুব কাছে এসে বলল—সুমন মনে নেই তোমার বাবার সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে তোমাদের বাড়িতে একদিন আর এক রাত ছিলুম আমি। সন্ধেবেলা মায়ের কথা মনে পড়তে আমি খুব কেঁদেছিলুম। তুমি খেলার মাঠ থেকে ফিরে এসে আমার কান্না দেখে খুব খেপিয়েছিলে। মনে নেই? তখন তোমার দু'হাত তুলে নাচ, নকল কান্না আর মুখের কাছে মুখ এনে চোখ বড় করে তাকানো দেখে কান্না ভুলে আমি খুব হেসেছিলুম?

মনে নেই। হেসে বললুম—খেপিয়েছিলুম বলে আজও আমার ওপর রাগ পুষে রাখোনি তো ভিনি?

ও চোখ বুজে সোজা হয়ে বসে রইল, তারপর বলল—আমার গা দ্যাখো।

দেখলুম গায়ে কাঁটা দিয়েছে।

ও চোখ বুজেই সামান্য হাসল, বলল—সেদিনের কথা মনে হলে আমার সমস্ত শরীর দিয়ে শিহরণ বয়ে যায়। ওরকম সুখ আমি আর কখনও পেলুম না।

শুনে একটু লজ্জা পেলুম। কখনও মানে ভিনি আজকের কথাও বলছে কি? কে জানে মনে সন্দেহ এল, আমাকে কিশোর বয়সে যতটা ভালো লেগেছিল ভিনির ততটা আজও লাগে কি না। কিংবা হয়তো আজও ভিনি সেই কৈশোরের ভালোবাসাই বহন করে চলেছে। কি জানি।

ভিনির দুই চোখ নিঃশব্দে কথা বলছিল—আমি তোমাকে ভালোবাসি সুমন। আমি তোমাকে ভালোবাসি।

ভিনি খুব সুন্দর। বড় ভালোবাসে। আমার বুকের ভিতর লাফিয়ে উঠল একটি বল। চোখে অকারণ জল আসছিল। মনে-মনে বললুম—ভিনি সত্যি? তিন সত্যি? দিব্যি? আমার গা ছুঁয়ে বলো। দ্যাখো ভিনি আমি কিছুই না। আমি কেবলমাত্র সুমন। তাও এ নাম জানে মাত্র কয়েকজন লোক। তুমি এই নাম বুকে করে রেখেছিলে এতকাল? কেন গো? তিনটি চিঠি দিয়ে তুমি ডেকেছিলে আমায়—কি সত্যি? সত্যি বটে তোমার খেলামাটির রান্নাঘরে মাঝে-মাঝে আমার নিমন্ত্রণ ছিল, পাথরকুঁচি পাতার লুচি আর কাদামাটির তরকারি আমি জিভ আর ঠোঁটের কৌশলে চকচক শব্দ করে নকল খাওয়া খেয়েছি, সত্য বটে, তোমাকে আমি দেখিয়েছিলুম দু-হাত তুলে বাঁদরনাচ কিংবা চোখের পাতা উলটে ভয় দেখানোর খেলা। কিন্তু তারপর ক্রমে আমি তোমাকে ভুলেও গিয়েছিলুম। পনেরো-ষোলো বছর পরের এই তোমাকে আমি চিনিই না। ভিনি, মা-কালীর দিব্যি, সত্যি বলো। তিন সত্যি? আমার পা ছুঁয়ে বলো!

ভিনি চলে গেলে রাতে আমার ঘুম এল না। আমার শরীরের ভিতরে একটিমাত্র যন্ত্রণার মাছ একা খেলা করে ফিরছে। কখনও পেটে, কখনও বুকে, কখনও মাথায়। ঠিক কোথায় যে তা বুঝতে পারি না। ওই মাছ আমার সমস্ত শরীরে এবং চেতনায় একটিমাত্র কথাকে ছড়িয়ে দিচ্ছে—সুমন, তোমার জীবন বড় একার হবে।

আমি জানি। আমি তা জানি। অন্ধকারে আমি আপনমনে মাথা নাড়লুম। তারপর চুপিচুপি আমার বালিশের কাছে বলে রাখলুম একটি নাম। ভিনি। ভিনি। ভিনি।

ছেলেবেলায় চেনা কিশোরীদের মুখগুলি আর মনে পড়ে না। কত নাম ভুলে গেছি। তবু মিতু নামে একটি মেয়ের সঙ্গে যে একটি-দুটি দুপুর আমি কাটিয়েছিলুম আমার কৈশোরে, তা মৃত্যু পর্যন্ত মনে থাকবে। আধো-অন্ধকার ছাদের সিঁড়িতে আমরা পাশাপাশি বসেছিলাম এক দুপুরে। ছাদের ওপর ঝড়ের মতো হাওয়ায় মড়মড় করে নুয়ে পড়ছে

এরিয়ালের বাঁশ, কলতলায় এঁটো বাসনের ওপর কাকদের হুড়োহুড়ি, নীচের ঘরে শীতলপাটিতে শুয়ে ভাতঘুমে মা, আর তখন আমার বুক কেঁপে উঠছিল, আমরা কথা বলছিলুম না, মিতু খুব আস্তে-আস্তে আমার আরও কাছ ঘেঁষে আসছিল। অনেক কাছে চলে এল মিতু, তার মুখ আমার মুখকে ছোঁয়-ছোঁয়। আমি সরে-সরে গিয়ে রেলিঙের সঙ্গে সেঁটে গেছি, আমার বুক কাঁপছে বুকের ভিতরে আমার সেই গলার স্বর—পালা সুমন, রেলিং টপকে দেওয়াল ডিঙিয়ে পালিয়ে যা, অনেক দূরে চলে যা। আমি টের পেয়েছিলুম তখন দেওয়াল কেঁপে উঠেছিল, কথা বলে উঠেছিল সিঁড়ি, মার-মার শব্দে ছুটে আসছিল ছাদের বাতাস। মিতু টেরও পায়নি। মিতু বলেছিল—তোর মুখে কেমন ভাত খাওয়ার গন্ধ! রোজ খাওয়ার পর লুকিয়ে পান খাবি, কিংবা মৌরি, তারপর ফিক করে হেসে সে বলল—আমার মুখে একটা লবঙ্গ আছে, খাবি? দাঁত টিপে সে লবঙ্গর একটি কণা আমাকে দেখাল, বলল—নে, তোর দাঁত দিয়ে কেটে নে। নে না! বলে সে আমাকে টেনে নিল। সেই সময়ে, সেই নিতান্ত কৈশোরেও আমার মনে হয়েছিল আমি এক চারা গাছ, মিতু শিকড়সুদ্ধ আমাকে উপড়ে ফেলল।

আমাদের একটা ছোট্ট পুরোনো জিনিসপত্র রাখার জন্য ঘর ছিল। সেই ঘরে ছিল সবুজ রঙের একটা তোরঙ্গ। আমি আর মিতু সেই তোরঙ্গ এক দুপুরে খুলেছিলুম। তাতে ছিল বান্ডিল-বান্ডিল পুরোনো চিঠি—সেগুলো সবই আমার বাবার লেখা মাকে, কিংবা মার লেখা বাবাকে। আমি আর মিতু হেসেছিলুম। সবজান্তা হাসি। কিন্তু মা-বাবার ওপর অকারণে আমার বড় রাগ হয়েছিল। ইচ্ছে হয়েছিল আমি ওদের আর ভালোবাসব না। মিতু বলল,—তুই আমাকে চিঠি লিখবি? লেখ না। বানান ভুল করিস না, আর চিঠির ওপর ঠাকুর-দেবতার নাম লিখিস না। লিখবি তো? আমি বিকেলে এসে নিয়ে যাব। তারপর তোকেও দেব চিঠি।

সেই ঘটনার পর থেকে অনেক দিন আমি আমার বাবা-মার ওপর খুশি ছিলুম না। আমি বাগানে ঘুরে গাছেদের জিগ্যেস করতুম, আমি ঘরের দেওয়ালকে জিগ্যেস করতুম, রাতে স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে বুকজোড়া অন্ধকারকে জিগ্যেস করতুম, কেন আমি তাদের আর ভালোবাসব না?

মনে-মনে আমি নিজেকে ডেকে বলেছিলুম—সুমন তুই কখনও বিয়ে করিস না।

আমাদের বাড়িতে প্রায়ই জ্যোতিষেরা আসত। তাদের মধ্যে একজন একবার বাবাকে বলেছিল—সুমনের বউ যেন খুব সুন্দর হয়। কখনও কুচ্ছিত কিংবা চলনসই মেয়ের সঙ্গে ওর বিয়ে দেবেন না। সইতে পারবে না।

সেই জ্যোতিষ কী বলতে চেয়েছিল তা বুঝতে পেরে আমার সমস্ত শরীর শিউরে উঠেছিল। বুঝতে পেরেছিলুম আমার ভিতরে অন্যকে ভালোবাসার ক্ষমতা কত কম! শিশুর মতো রঙিন খেলনা দিয়ে ভুলিয়ে না রাখলে আমি সহজেই সব কিছুকে অবহেলা করব।

চার

মাঘ মাসের এক গোধূলি লগ্নে ভিনির সঙ্গে আমার বিয়ে হয়ে গেল।

সমারোহ কিছুই হল না। খুব আলো জ্বলল না, বাজনা বাজল না। প্রায় স্তব্ধতার ভিতরে আমি মন্ত্রোচ্চারণ করলুম।

বাসরঘরেও আমরা ছিলুম একা। ভিনি চুপিচুপি আমাকে বলল—বাব্বাঃ, বাঁচা গেল।

কেন? আমি জিগ্যেস করলুম।

ভিনি পরম নিশ্চিন্তে চোখ বুজে বলল—কী জানি ভয় হচ্ছিল শুভদৃষ্টির সময়ে হয়তো দেখব অন্য লোক। তাহলে আমি ঠিক অজ্ঞান হয়ে পিঁড়ি থেকে পড়ে যেতুম।

হাসলুম—এত ভয়।

চোখ বুজে ভিনি একটা হাত বাড়িয়ে আমার বুকে রাখল, বলল—মন, তোমার বুকের ভিতরে পালিয়ে যাওয়ার দুরদুর শব্দ। বলেই হাসল ভিনি, তেমনি চোখ বুজে থেকে বলল—সেই কবে থেকে তোমাকে ভালোবেসে আসছি মন, ভয় ছিল যদি পালিয়ে যাও! জানো না তো তোমার জন্য মা-বাবার সঙ্গে কত ঝগড়া করলুম আমি।

আমার মাথার ভিতরে গুনগুন করে ঘুরে বেড়াতে লাগল ভিনির ওই কথাটুকু—কী জানি, ভয় হচ্ছিল শুভদৃষ্টির সময়ে হয়তো দেখব অন্য লোক।

আমি আস্তে-আস্তে ভিনিকে বললুম—ভিনি একটা কথা বলি?

—হুঁ।

—ছেলেবেলায় আমার মাকে কখন ভালো লাগল জানো? যখন রান্নাবান্না আর কাজ করতে-করতে মার চুল এলোমেলো হয়ে যেত, মুখে জ্যাবজ্যাব করত ঘাম, সিঁদুর গলে নেমে আসত নাকের ওপর, যখন মার আটপৌরে শাড়িতে হলুদের দাগ, তখন মাকে আমি সবচেয়ে ভালোবাসতুম। আর মা যখন সাজগোজ করত, গায়ে পরত ফরসা জামাকাপড়, তখন মাকে বড় গম্ভীর আর রাগী দেখাত যেন ছুঁতে গেলেই বকে দেবে। কিংবা মা যখন

দুঃখ পেত, চুপ করে বসে থাকত, অথবা হয়তো কোনও কারণে কাঁদত তখনই মা আমার সবচেয়ে প্রিয় ছিল, আমি কেবল মার আশেপাশে ঘুরঘুর করতুম। কেন বলো তো?

—কেন।

—আসলে একটু কষ্ট, একটু দুঃখের মধ্যেই মানুষকে দেখতে বোধহয় আমার ভালো লাগে।

—পাগল। বলে ভিনি হাসল।

আমি একটু চুপ করে থেকে বললুম—আমার বাবাকে আমি সবচেয়ে বেশি কবে ভালোবেসেছিলুম জানো?

—কবে?

—মফসসলে রেল কলোনির এক ক্রিকেট-ম্যাচে একটি লোক ছাব্বিশ রান করে আউট হয়ে গেল। বুড়ো স্কোরারের পাশে মাঠের ঘাসে বসে আমি দেখলুম সাদা পোশাক করা লম্বা চেহারার যুবকটি ক্রিজ ছেড়ে বেরিয়ে আসছে, মাথা অল্প নোয়ানো, হাতের ব্যাটটা শূন্যে একবার আধপাক ঘুরে গেল হতাশায়, মাথার টুপিটা খুলে নিয়ে ম্লান হাসি মুখে বাবা প্রকাণ্ড মাঠটা আস্তে-আস্তে পার হয়ে প্যাভিলিয়নের তাঁবুর দিকে চলে যাচ্ছিল। সে জানত না যে সেই সময়ে মাঠের দর্শকদের মধ্যে যে সবচেয়ে বেশি দুঃখ পাচ্ছিল তার জন্য, সে আমি। বাবা আউট হয়ে গেল বলে না, আসলে বাবার ওই হেঁটে ফিরে আসা, আধপাক ঘুরে যাওয়া ব্যাটটার হতাশা আর মুখের হাসিটুকুর জন্য আমি কেঁদেছিলুম। তারপর থেকে বাবাকে যে আমি কি ভীষণ, ভীষণ ভালোবাসি ভিনি। এখনও যে বাবাকে ভালোবাসি তার কারণ বোধহয় ওই মুহূর্তটি, বাবার আউট হয়ে ফিরে আসার ওই মুহূর্তটি। বাবা বলে ভাবতেই ওই দৃশ্য আজও আমার চোখের সামনে স্পষ্ট ফুটে ওঠে। কেন বলো তো?

—কেন?

আমি অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বললুম—আসলে দু-একটিই ভালোবাসার মুহূর্ত থাকে আমাদের। না? বলেই হাসলুম—ছেলেবেলার তুমি মাত্র একবারই ভালোবেসেছিল আমায়।

শুনে ভিনি অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল—আমি জানি তুমি আমাকে তেমন ভালোবাসো না মন। তেমন মুহূর্ত তোমার কখনও আসেনি।

শুনে বড় চমকে উঠলুম। হেসে বললুম—পাগলি।

ও চুপ করে আমার চোখের দিকে চেয়ে বলল—তাকে কিছু আসে যায় না। আমি তো তোমাকে ভালোবাসি।

আমি হেসে গলা নামিয়ে বললুম—ভিনি তোমার গায়ে জন্মদাগটা কোথায়?

অবাক হয়ে ভিনি বলল—কেন?

বললুম—তোমার গায়ের খোলা দাগটা খুঁজে পাইনি।

একটু চুপ করে থেকে ভিনি হঠাৎ লাল হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিল—এঃ মাগো, বিচ্ছু কোথাকার...তোমার...তোমারটা কোথায়?

তারপর অনেক রাতে ভিনি আমাকে তার জন্মদাগ দেখতে দিয়েছিল।

তিন বছরে আমাদের দুটি ছেলেমেয়ে হল। আর আমরা অল্প একটু বুড়ো হয়ে গেলুম।

মাঝে-মাঝে আমি ভিনিকে বলি—ভিনি, আমার মন ভালো নেই।

—কেন?

—কি জানি।

—শরীর খারাপ নয়তো? বলতে-বলতে সে এসে আমার কপালে তার গাল ছোঁয়ায়, বুকে হাত দিয়ে দেখে গা গরম কি না।

—না, শরীর খারাপ নয়। আমি বলি।

—রাতে দুঃস্বপ্ন দেখেছিলে?

—না।

—তবে কী?

—কি জানি! আমি বলি—মন ভালো নেই।

ভিনি হাসে—পাগল কোথাকার।

—আমার বড় একা লাগছে ভিনি।

ভিনি চমকে উঠে—কেন আমরা তো আছি।

আমি শূন্য চোখে চেয়ে থাকি। কথার অর্থ বুঝবার চেষ্টা করি। পকেট হাতড়ে খুঁজি সিগারেট আর দেশলাই।

গত আশ্বিনে আমি আমার চৌত্রিশের জন্মদিন পার হয়ে এলুম। আমি জানি আমি খুব দীর্ঘজীবী হব—আমার কুষ্ঠিতে সেই কথা লেখা আছে। ত্রিশের ঘরে বসে আমি তাই সামনের দীর্ঘ জীবনের দিকে চেয়ে অলস ও ধীরস্থির হয়ে আছি। বিছানায় শুয়ে হাত বাড়ালেই যেমন টেবিলের ওপর সিগারেটের প্যাকেট, দেশলাই, জলের গ্লাস কিংবা ঘড়ি ছোঁয়া যায়, মৃত্যু আমার কাছে ততটা সহজে ছোঁয়ার নয়। মাঝে-মাঝে জ্যোৎস্না রাতে আমার জানালা খুলে চুপ করে বসে থাকি। হালকা বিশুদ্ধ চাঁদের আলো আমার কোলে পড়ে থাকে। ক্রমে-ক্রমে আমার রক্তের মধ্যে ডানা নেড়ে জেগে ওঠে একটি মাছ—ছোট্ট আঙুলের মতো একটি মাছ—শরীর ও চেতনা জুড়ে তার অবিরল খেলা শুরু হয়। আমার চেতনার মধ্যে জেগে ওঠে একটি বোধ, আমারই ভিতর থেকে কে যেন বড় মৃদু এবং মায়ার স্বরে ডেকে দেয়, 'সুমন, আমার সুমন।' অকারণে চোখের জল ভেসে যায়। আস্তে-আস্তে জানলার চৌকাঠের ওপর মাথা নামিয়ে রাখি। মায়ের হাতের মতো মৃদু বাতাস আমার মাথা থেকে পিঠ পর্যন্ত স্পর্শ করে যায়। তখন মনে পড়ে—সুমন, তোমার জীবন খুব একার হবে।

ট্যাংকি সাফ

ট্যাংকি সাফ করতে ষাট টাকা চেয়েছিল মাগন। চল্লিশ টাকায় রফা হয়েছে।

তো মাগন, সেপটিক ট্যাংকির লোহার চাক্কি কোদাল মেরে খুলে বুরবকের মতো চেয়ে রইল। আই বাপ! হাউস ফুল!

হাউস ফুল না হলে ট্যাংকি সাফ করায় কোন আহাম্মক? কিন্তু মুশকিল হল, মাগনের আজ কোনও পার্টনার নেই। কাল হোলি গেছে, আজ রবিবার, মরদরা আজও সব চলাচল জমি ধরে নিয়ে পড়ে আছ। এ বাত ঠিক যে মুর্দার কানে-কানে টাকার কথা বললে মুর্দাও গা ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়ে। কিন্তু মাতালরা তো মুর্দা নয়। আর তাদের উঠিয়েও কোনও লাভ নেই। টাকার লোভে কেউ হয়তো গার্দা সাফ করতে এসে ট্যাংকির মধ্যে পড়ে গজব হয়ে যাবে।

প্রথম ট্যাংকিতে ময়লা, দু-নম্বরে জল, তিন নম্বরেও জল। তিন নম্বরে পয়লা বালতি মেরে গান্ধা জল তুলে ড্রেনে ঝপাং করে ফেলে মাগন আপনমনে বলে—আই বাপ! হাউস ফুল! চালিশ টাকার তো স্রিফ পাসিনা চলে যাবে। ফিন ভিটামিন-উটামিন দিবে কৌন?

বারান্দা থেকে দত্তবাবু দেখছেন, হেঁকে বলছেন—কী বলছিস রে ব্যাটা?

মাগন ঝপাং করে দুসরা বালতি মেরে মুখ তুলে এক গাল হেসে বলে—একটা বাংলা সাবুনের দাম দিবেন তো বড়বাবু? আর চায় পিনেকো পয়সা! আউর হোলির বখশিশ।

—ব্যাটা নাতজামাই এলেন।

—এমন সাফ করে দিব না। একদম বেডরুম।

—বকবক করিস না, হাত চালা। বেলা ভর তোর কাজ দেখতে দাঁড়িয়ে থাকবে কে?

তিন নম্বর বালতি মেরে মাগন বলে—গিয়ে আরাম করুন না, কুছ দেখতে হবে না। কাম পুরা করে পয়সা লিব।

দত্তবাবু স্টেটসম্যানটা খুলে পড়তে গিয়ে দেখলেন প্লাস পাওয়ারের চশমাটা চোখে নেই। চেঁচিয়ে বললেন,—মুনমুন, আমার পড়ার চশমাটা দিয়ে যা তো।

বলে কাগজের বড় হেডিংগুলো দেখতে লাগলেন। মন দিতে পারলেন না। চল্লিশ টাকার কাজ হচ্ছে সামনে! দু-ঘণ্টা বড়জোর তিন ঘণ্টা কাজ করে ব্যাটা চল্লিশ চাক্তি ঝাঁক দিয়ে নিয়ে যাবে। রোজ একটা করে সেপটিক ট্যাংক যদি সাফ করে তবে মাসে কত রোজগার হয়?

ভাবতে গিয়ে ফোঁস করে একটা শ্বাস বেরিয়ে গেল। বারোশো টাকা।

দত্তবাবু খুব জোর হেঁকে বললেন—জোরসে চালা! জোরসে!

ট্যাংকির ভিতরে বকবক করছে জল। গহীন গান্ধা জল। ঝপাঝপ বালতি মারে মাগন আর বলে—চালাচ্ছে বাবা। বহুৎ গান্ধা বাবা, বহুৎ কাদো। চালিশ রুপিয়া স্রিফ পাসিনা মে গিয়া বাবা। ভিটামিন দিবে কৌন?

২

মুনমুন সাজছে। সময় নেই।

ক'দিন আগেও চুলের গুছির গোড়ায় একটা গার্ডার বেঁধে বেরিয়ে পড়তে পারত। আজকাল আর তার জো নেই। যাদবপুরের জল এত খারাপ যে গত দু-বছরই চুল উঠে গিয়ে এই ক'টা হয়ে গেছে। এখন মাথায় হাত বোলালেও চুল উঠে আসে, একবার চিরুনি চালিয়ে আনলে উঠে আসা চুলের গোছা দিয়ে দড়ি পাকানো যায়। এখন বব করেছে। তবু চুলের পিছনে খাটতে কম হয় না। শুধু চুল? গায়ের রং মেটে হয়ে গেল। যে দেখে সে-ই বলে—ইস। কী কালো হয়ে গেছিস! কতবার বলেছে বাবাকে, এবার যাদবপুর ছাড়ো। আর নয়, এরপর মাথায় টাক পড়বে, গায়ের রং হয়ে যাবে টেলিফোনের মতো। পাত্রপক্ষ দেখতে এলে ভুল করে বলে উঠবে, হ্যালো!

সময় নেই। শুধু শাড়িটা পরা বাকি।

—ব্লাউজের হুকগুলো লাগিয়ে দিবি লক্ষ্মীটি? বলতে-বলতে গিয়ে সে হুস করে চুনুর সামনে পিছু হয়ে উবু হয়ে বসে পড়ে।

চুনুর মুখ দেখে তার মন বোঝা যায় না। দীর্ঘদিন ধরে সে এইটে অভ্যেস করেছে। মুখে একটা ভালোমানুষি, আর বড়-বড় চোখে ভাসানো দৃষ্টিতে সে চায় সব সময়ে। দিদিকে আসতে দেখেই চুনু একটা কাগজ লুকিয়ে ফেলল ফ্রকের ঘেরের নীচে।

—একক সংগীত তোর ভালো লাগে? বাব্বা! আড়াই ঘণ্টা ধরে একক গলার গান শুনতে-শুনতে মাথা ধরে যায় না?—ইস, হুকগুলো সব চেপটে গেছে। লন্ড্রিতে দিয়েছিলি বুঝি ব্লাউজটা? আছড়ে কেচেছে, হুকের মাথাগুলো সব বসে গেছে।

মুনমুন অধৈর্য্য হয়ে বলে—তাড়াতাড়ি কর না।

—করছি তো! হুকগুলো ঘুরে ঢুকছে না যে! একটা সেফটিফিন দে, খুঁটে তুলি।

মুনমুনের নতুন প্রেমিক এসে দাঁড়িয়ে থাকবে রবীন্দ্রসদনে। মুনমুন খুব ভালো জানে এও বেশিদিন টিকবে না। শেষপর্যন্ত কে যে পাবে তাকে তা কী এখনই বলা যায়। সতেরো বছর বয়সে কী করে বলবে, আসল লোকটা কে! এখনও কত জন লোক আছে, কত রোমাঞ্চ আছে, কত রহস্য ও ঘটনা! তবু এখনকার মতো এই প্রেমিকটিকেও সে উপেক্ষা করতে পারে না।

সব সময়েই একটু দেরি করে যাওয়া ভালো। তা বলে বেশি দেরিও নয়। তাতে উৎকণ্ঠার বদলে বিরক্তি এসে যায়। মুনমুনের একটা হিসেব আছে। সে হিসেব মতো একটু বেশিই দেরি হয়ে যাচ্ছে।

সে এক ঝটকায় সরে এসে বলে—ছাড় তো! তোর কম্ম নয়।

বলে সে নিজে-নিজে ড্রেসিং টেবিলের দিকে পিছু ফিরে হাত পিছনে ঘুরিয়ে টপাটপ হুক লাগিয়ে ফেলে, বলে—কোথায় হুক চেপটে গেছে! আমার হাতে লাগল কী করে? মারব থাপ্পড়—

চুনু ভাসা চোখে চেয়ে থাকে ভালোমানুষের মতো। যেন জানে না, হুক ঠিক ছিল। বলল—সুচিত্রার গান রোজ তো শুনছিস বাবা, রেডিয়োয়, গ্রামোফোনে, মাইকে। আর কত? ডাল-ভাত হয়ে গেছে।

—সুচিত্রা কখনও ডাল-ভাত হয়ে যায় না। আর হলেই কী? তুই রোজ ভাত খাস না? খারাপ লাগে? ভাত না পেলে তো কুরুক্ষেত্র করিস!

হঠাৎ কুঁকড়ে গিয়ে চুনু ফ্রক তুলে নাক চেপে ধরে রুদ্ধস্বরে বলে—এঃ মা! কী গন্ধ আসছে।

প্রচণ্ড সেন্ট মেখেছে মুনমুন। প্রথমে সে পায়নি, এখন পেল গন্ধটা। একটা 'ওয়াক' তুলে দৌড়ে গিয়ে বারান্দার দরজাটা বন্ধ করে এসে 'উঁ:উঁ:' করে নাকে আঁচল চাপা দিয়ে বলল—সেপটিক ট্যাংক খুলেছে। শিগগির জানলা বন্ধ কর।

৩

—একটা দড়ি দিবেন বড়বাবু? আব পানি নীচা হয়ে গেল, বালতিতে দড়ি লাগাতে হবে।

—ওঃ, দড়ির কথা আগে বলবি তো! দাঁড়া দেখি আছে কি না।

মাগন একগাল হেসে বলে—বারো আনা পয়সা দিন তো লিয়ে আসি।

—পয়সা দিলে পাওয়া যায় সে জানি! চালাকি করিস না। দেখছি দাঁড়া।

দত্তবাবু চেঁচালেন—কোথায় গেলে গো? এ ব্যাটা দড়ি চাইছে। আছে নাকি?

লীলাময়ী রান্নাঘরে নেই। খুঁজতে গিয়ে দত্তবাবু দেখেন, ফাঁকা রান্নাঘরে উনুনের ওপর ডাল ফুটছে! ডালের ফেনা উথলে উনুনের গায়ে পড়ে পড়ে ছ্যাঁক-ক-ছ্যাঁক-ক শব্দ উঠছে।

দত্তবাবু ফিরে দাঁড়াতেই অন্যায়ের দৃশ্যটি দেখতে পেলেন।

দত্তবাবু তাঁর শ্বশুরমশাইকে 'বাবা' ডাকেন না বলে লীলাময়ীর বড় অভিমান। কিন্তু এ-লোককে 'বাবা' ডাকা যায়? দত্তবাবু দেখতে পেলেন, ভিতরে দু-ঘরের মাঝখানকার প্যাসেজে তাঁর রোগা খুনখুনে বুড়ো শ্বশুরমশাই খুব গোপনে একটা গামছায় নাক ঝাড়ছেন।

শ্বশুরমশাইয়ের ভয়ে দত্তবাবু তাঁর পরিষ্কার গামছাখানা সবসময়ে লুকিয়ে রাখেন। কারণ শ্বশুরমশাইয়ের নিজের দু-খানা গামছা থাকা সত্ত্বেও সে গামছায় তিনি নাক ঝাড়েন না বা পায়ের তলা মোছেন না। ও দুটো কাজের জন্য তিনি সব সময়েই অন্যের গামছা চুরি করেন। এখনও করছেন। আরও আছে। নিজের হাওয়াই চপ্পল থাকা সত্ত্বেও পায়খানা যাওয়ার সময় শ্বশুরমশাই লুকিয়ে জামাইয়ের হাওয়াই দুটো পায়ে দিয়ে যান।

কার না রাগ হয়? কিন্তু মুখোমুখি চোটপাট করে কিছু বলাও যায় না। কুটুম মানুষ।

দত্তবাবু প্যাসেজটার মধ্যে এগিয়ে গিয়ে বললেন—গামছাটা আপনি পেলেন কোথায়?

'বাবা' ডাকেন না বলে যে শ্বশুরমশাই দত্তবাবুকে কম খাতির করেন তা নয়। বরং বেশিই করেন। বাবা ডাকেন না বলেই খাতির করেন। খাতিরের চেয়েও বেশি। ভয় পান।

বুড়োমানুষ ভয়ে হাঁ করে আছেন। আড়ষ্ট হাতে জামাইয়ের গামছা সামলে নিয়ে বললেন—এইখানেই ছিল। সরিয়ে রাখছি। দেখো, তোমার গামছায় যেন কেউ হাত না দেয়। কাউকে হাত দিতে দেবে না। আমিও সবাইকে বারণ করি, অধীরের গামছায় তোমরা কেউ...

দত্তবাবু মুখটা কুঁচকে সরে এলেন। গামছাটা আজ আর-একবার কাচিয়ে নিতে হবে। সরে আসতে-আসতেই শুনতে পেলেন, 'হ্যাক' করে থুতু ফেলার শব্দ। পিছনে আর তাকালেন না। তাকালে আর সারাদিন জল খাওয়া হবে না। প্যাসেজেই জলের কুঁজো রাখা। শ্বশুরমশাই সারাদিন বাড়ির সর্বত্র থুতু ফেলছেন। সর্বত্র।

লীলাময়ী নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছেন বাইরের ঘরের দরজার পাশে। একটু গোপনীয়তার ভঙ্গি মাখানো তাঁর শরীর।

গোপনীয়তা বাহুল্যমাত্র। বাইরের ঘর থেকে যে আসছে তা শোনবার জন্য কান পাততে হয় না।

৪

যতটা সুভদ্রাকে ততটা আর কোনও মেয়েমানুষকে ঘেন্না করে না অধীপ। গুয়ের পোকাও কী ওর চেয়ে ভালো নয়?

সুভদ্রা খাটে বসে আছে, সামনের দিকে জোড়া পা ছড়ানো, পিছনে হাতের ভর। মুখ সাদা, চোখ জ্বলছে। বলল—ন্যাকা—জানো না?

—তুমি বলতে পারলে? কোনও ভদ্রলোকের মেয়ে বলতে পারে ওকথা?

—নিজেরা কী? লোকে শুনলে থুতু দিয়ে যাবে গায়ে। ভদ্রলোকের মেয়ে! আমি ভদ্রলোকের মেয়ে না তো কী, তোমার মতো ইতরের বাচ্চা?

মেয়েমানুষকে মারা ভালো নয় অধীপ জানে। কিন্তু এই মুহূর্তে বুঝতে পারে, মার—মারের মতো এমন নিরাময় আর কিছুতেই নেই। মারাই বোধহয় সবচেয়ে শান্তি। এক পা এগিয়ে সে শরীরে রিমঝিম রাগের নাচ শেষ কয়েক মুহূর্তের জন্য সহ্য করে প্রায় রুদ্ধস্বরে বলল—এই বজ্জাত মাগি! মুখ ঘষে দেব দেওয়ালে!

দাও না দাও! বলে চোখের পলকে উঠে আসে সুভদ্রা। একদম কাছে এসে চিতিয়ে দাঁড়িয়ে বলে—ছোটলোকের ইতরের গর্ভে যার জন্ম তার কাছে কী আশা করব? মারো!

অধীপ কথা বলতে পারে না। কাঁপে। স্ট্রোক হয়ে যাবে! পাগল হয়ে যাবে! ডিভোর্স...

সুভদ্রা ধকধক করতে-করতে বলে—ন্যাকা! জানো না, তোমার শরীরে কীসের রক্ত! গুষ্টিসুদ্ধ বদমাইশ তোমরা, জানো না? তোমার ওই আদরের লেংড়ি বোন চুনু কেন আমাকে বিয়ের পরদিনই বলেছিল—এই বউদি, তুমি কেন আমার দাদার সঙ্গে শোবে!

অধীপের এ কথাটা মাথায় ঢোকে কিন্তু সুভদ্রাই কথাটা বলতে—এটা যেন বিশ্বাস হয় না। তার সমস্ত বিশ্বাসের ভূমি থেকে কে যেন তাকে তুলে ছুড়ে দেয় অন্য একটা হীন আর ক্লিব জগতে। সে কাঁপতে-কাঁপতে কসাইয়ের গলায় বলে—কেন বলেছিল?

সুভদ্রা সে-কথার সরাসরি জবাব না দিয়ে দিগবসনা আক্রোশে প্রায় নেচে উঠে বলে—সহ্য হবে কেন? আদরের দাদার সঙ্গে অন্য কেউ শোয় তাতে বুক জ্বলে যাবে না? ছিঃছিঃ! তোমরা লোকসমাজে মুখ দেখাও কী করে?

অধীপ হঠাৎ পাথরের মতো শান্ত হয়ে গেল! খুন করার আগে যেমন মানুষ কখনও-কখনও হয়। একটু বাদেই সুভদ্রা তার হাতে খুন হবে, সুতরাং সে নিশ্চিন্ত সিদ্ধান্তের পর ঠান্ডা গলাতেই বলল—তুমি নর্দমার পোকা।

—তা তো বলবেই। নিজেরাই কি না। শ্বশুর আমাকে ভালোবাসে বলে তোমার মা বলেনি, শ্বশুর বলেই কী, পুরুষ তো। যুবতী বউয়ের সঙ্গে অত মাখামাখি কীসের? তুমিও বলোনি, সুভ, তুমি বাবার সঙ্গে অত মেলামেশা কোরো না। বলোনি?

বলেছে। ঠিক কথা, মায়ের কাছে শুনে কারও এক সময়ে বিশ্বাস হয়েছিল, বাবার সঙ্গে সুভদ্রার অত স্নেহের সম্পর্কের মধ্যে কিছু একটা অসঙ্গতি আছে। বলেছে। কিন্তু মানুষের কি ভুল হয় না!

সুভদ্রা ঝোড়ো দ্রুতবেগে বলে—সন্দেহ করোনি নিজের বাবাকে? অমন মাতৃভক্তির কপালে ঝাঁটা। ডাইনি মুখে পোকা পড়ে মরবে, পচে গলে মরবে।

ঠিক এই সময়ে দুর্গন্ধটা আসে। বহু দিনকার জমানো মল, ময়লা, জলের প্রচণ্ড গ্যাস। ঘরটার বাতাস পলকে বিষিয়ে ওঠে। কিন্তু তারা দুজন গন্ধটাকে টেরই পায় না; কিংবা পেয়েও উপেক্ষা করতে পারে। কিংবা হয়তো তারা ঠিক এই মুহূর্তে দুর্গন্ধটাকে উপভোগই করে।

আশ্চর্যের বিষয়, অধীপ হাসল। অবশ্য এটা হাসি নয়। খুন করার আগে অভ্যস্ত খুনি কখনও-সখনও এরকমই হাসে হয়তো।

তার পরেই সে চড়টা মারল। সুভদ্রা যে পাঁচ মাসের পোয়াতি তা মনে রইল না। লক্ষও করল না যে তার দু-বছরের ছেলে দৃশ্যটা দেখছে।

৫

—চালা! জোরসে চালা জলদি।

—হচ্ছে বাবা, হচ্ছে। পাম্প তো নেহি যে ভটভট করে গাদা খিঁচে লিবে!

দু-নম্বর ট্যাংকিতে ঘপ করে বালতি মারে মাগন। হাউস ফুল।

দত্তবাবু চেঁচিয়ে বলেন—এই ব্যাটা ময়লা ফেলার গর্ত করবি না?

—হ্যাঁ-হ্যাঁ, গোর্তো হোবে, গোর্তো ভি হোবে। এক বোতল শরাবের দাম দিবেন তো বড়বাবু?

—নালিতে ময়লা ফেলবি তো পয়সা কাটব। নালি আটকালে বাড়িওয়ালা পাঁচ কথা শোনাবে। খুব সাবধান।

—কোই চিন্তা নাই বড়বাবু। কাম পুরা করে পয়সা লিব।

প্লাস পাওয়ারের চশমাটা পরেও স্টেটসম্যানের খবরগুলো দেখতে পান না দত্তবাবু। পুরোটাই আবছা, অস্পষ্ট, হিজিবিজি এবং অর্থহীন। তবু মুখের সামনে কাগজটা ধরে রাখেন। মুখোশের মতো।

মুনমুনকে চিঠি দিয়েছিল বাড়িওয়ালার ছেলে মিলন। সেই চিঠি বাড়িওয়ালা রসিকবাবুর হাতে পৌঁছে দিয়েছিলেন দত্তবাবু। সেই থেকে গণ্ডগোলের শুরু। রসিকবাবুর স্ত্রী ওপরতলা থেকে পরিষ্কার শুনিয়ে দিলেন—এ হতেই পারে না। নষ্ট মেয়েটার পাল্লায় পড়ে মিলুও গোল্লায় যাচ্ছে। তুলে দাও।

দত্তবাবুর কিছু বলার দরকার হয়নি, লীলাময়ী নীচতলা থেকে গুষ্টি উদ্ধার করলেন ওঁদের। কয়েকদিন দত্তবাবু বুকের প্যালপিটিশনে কষ্ট পেলেন খুব। তাঁর খুব ইচ্ছে করে, যে বাড়িওয়ালার যুবক ছেলে নেই তার বাড়িতে উঠে যান। কিন্তু ইচ্ছে তো আর পক্ষিরাজ নয়।

এক বছর আগেকার সেই ঘটনা থেকেই অশান্তি চলছে। রান্না করতে-করতে মাঝখানে কলের জল বন্ধ হয়ে যায়। আঁচাতে গিয়ে বেসিনে জল পাওয়া যায় না। লীলাময়ী নীচে

থেকে দাপিয়ে চেঁচান। আর দত্তবাবুর ঝি বাসন মেজে কলতলায় ছাই ফেলে এলে ওপর থেকেও দাপানো আর চেঁচানোর শব্দ হয়।

শ্বশুরমশাই বকের মতো পা ফেলে বাথরুমে যাচ্ছেন জল ঘাঁটতে। এ-বাড়ির জলকষ্টের মূলে এই লোকটার অবদান বড় কম নেই। সারাদিন জল ঘাঁটছে লোকটা। হাঁপানি আছে। সর্দির ধাত আছে। সারারাতের কাশি আছে। আর সেইসঙ্গে জল ঘাঁটাও আছে। জল ঘাঁটুক, তাতে দত্তবাবুর আপত্তি নেই। তিনি শুধু শ্বশুরমশাইয়ের পায়ের চপ্পলটা লক্ষ করলেন। দত্তবাবুর চপ্পলের স্ট্র্যাপ নীল রঙের, শ্বশুরেরটা খয়েরি।

খয়েরি দেখে দত্তবাবু নিশ্চিন্ত হয়ে আবার স্টেটসম্যানের মুখোশ পরলেন, পরার দরকার ছিল। কারণ, লীলাময়ী আসছেন।

এসে একটা মুখ ছেঁড়া খাম দত্তবাবুর হাতে দিয়ে বললেন—এই সেই চিঠি?

—কীসের চিঠি?

—বউমার বাক্স থেকে বোধহয় চুনু নিয়েছিল।

—কেন?

—অন্যায় করেছে নিয়েছে। হয়তো লোভ সামলাতে পারেনি। এই নিয়েই অধীপের সঙ্গে ওই ঝগড়া।

দত্তবাবু চিঠিটা হাতে নিয়ে বললেন—কবেকার চিঠি?

—বিয়ের আগে অধীপ বউমাকে যেসব চিঠি লিখত তারই একটা। কী দরকার ছিল পুরোনো চিঠি জমিয়ে বুকে করে রাখবার? পুড়িয়ে ফেলা যেত না! ঘরে বয়েসের ননদরা, কোলের ছেলেও বড় হচ্ছে...

—তুমি চিঠিটা পড়েছ?

খুব দৃঢ় গলায় নয়। ঝংকার দিয়ে লীলাময়ী বললেন—পড়ব কেন?

—পড়োনি?

—ওপর-ওপর দেখেছি একটু। কী এমন কথা যার জন্য মাগির আঁতে ঘা পড়ল।...ওঃ, এই দুর্গন্ধের মধ্যে বসে আছ কী করে? তুমি মানুষ না কি?

দত্তবাবু বললেন—পড়ে ভালো করোনি।

—কেন? ভালো না করারই কী? তুমিও দ্যাখো না। বলে লীলাময়ী খাম থেকে চিঠিটা খুলে নিয়ে দত্তবাবুর হাতে দিয়ে বলে—পড়েই দ্যাখো।

—বউমা কী করছে?

—কাঁদছে, ঘরে দরজা দিয়ে।

—তুমি যাও।

লীলাময়ী চলে গেলে দত্তবাবু চিঠিটা খোলেন।...অশ্লীল, খুবই অশ্লীল চিঠিটা।

মন থেকে আজ কেমন জোর পাচ্ছেন না। মনের জোরের জন্য খানিকটা নৈতিকতা দরকার। হ্যাঁ, মর‍্যালিটি তা কি তাঁর আছে?

লীলাময়ী দুর্গন্ধের কথা বলে গেলেন। কিন্তু তিনি দুর্গন্ধ পাচ্ছিলেন না।

৬

ডাক্তারকে খবর দেওয়া ছিল। সদর থেকে তাঁর হাঁক শোনা গেল এইমাত্র—কই বউমা কোথায়?

বাইরের বারান্দাটাই এখন বসার ঘর। অধীপের বিয়ের পরই বাইরের ঘরটার দরকার হল। তখন বারান্দাটা প্লাইউড দিয়ে ঘিরে সোফা সেট পাততে হল।

লীলাময়ী প্রমাদ গুনলেন। বউমাকে দেখতে এসেছে। সর্বনাশ! তার বাঁ-গালে অধীপের পাঁচ আঙুলের দাগ ফুটে আছে এখনও, তার ওপর নাগাড়ে কাঁদছে। বাইরের লোকের সামনে বেরোবে না কিছুতেই। যদিও বা বেরোয় তো ডাক্তার সবই লক্ষ করবে।

উঠে গিয়ে তিনি ঘোমটা টেনে বললেন—বসুন।

—বেশি বসবার উপায় নেই। চেম্বারে রুগি বসে আছে।

লীলাময়ী নিঃশব্দে গিয়ে দরজায় সামান্য শব্দ করে চাপা গলায় ডাকেন—বউমা! বউমা! ডাক্তারবাবু এসেছেন, দরজা খুলে দাও। ঠিকঠাক হয়ে নাও।

সুভদ্রা পাঁচ মাসের পোয়াতি। বড় ছেলে দুই পেরিয়েছে। সে হতে বড় কষ্ট গিয়েছিল। অধীপ তাই ঘনঘন ডাক্তার ডেকে চেক আপ করায়। কিন্তু অধীপটা রাগারাগি করে বেরিয়ে গেছে। অবস্থাটা সামাল দেবেন কীভাবে তা ভাবতে-ভাবতে লীলাময়ী গিয়ে চায়ের

জল চাপান। চৌধুরি পারিবারিক ডাক্তার, তাঁর কাছে তেমন লজ্জা নেই। তবু তো লজ্জা! আজকালকার বউয়েরাও ভারী নির্লজ্জ। কথায়-কথায় পরপুরুষ ডাক্তারদের কাছে নিজেদের খুলে দেয়। ডাক্তাররা গোপন জায়গায় হাত দেয়, টিপ দিয়ে দেখে, অসভ্য সব প্রশ্ন করে। মাগো! লীলাময়ী মরে গেলেও পারবেন না। তাঁকে কয়েকবার লেডি ডাক্তাররা দেখেছিল। তাতেই কী লজ্জা!

শচীলাল ডাক্তারের গন্ধ পেয়েছেন। থুথু ফেলার জন্য তাঁর একটা টিনের কৌটো আছে। সেইটে গিয়ে গোপনে বেসিনে ধুচ্ছিলেন। জল ঘাঁটছেন টের পেলে মেয়ে আজকাল বড় বকে।

ডাক্তারের সাড়া পেয়ে তাড়াতাড়ি কৌটো রেখে বাইরের বারান্দায় এসে বসেই বললেন —বুঝলেন ডাক্তারবাবু, গত দু-বছর যাবৎ আমার পেটের কোনও গোলমাল নেই।

চৌধুরি হেসে বলেন—বাঃ খুব ভালো।

—যা খাই সব হজম হয়। ইটের মতো শক্ত পায়খানা। আপনি আমাকে রোজ সকালে দুটো করে মুরগির ডিম খাওয়ার ব্যবস্থা দিয়ে যান।

—সে আমি বুঝব খন। শ্বাসের কষ্টটা কেমন আছে?

—এটাই যা একটু কষ্ট দেয়, আর সব ভালো।

লীলাময়ী চা নিয়ে এসে বাবাকে দেখে বড়-বড় চোখে তাকিয়ে বলেন—তোমার আবার কী?

শচীলাল একগাল হেসে চৌধুরিকে বলেন—বুঝলেন ডাক্তারবাবু লীলা ভাবে আমি পেট খারাপের কথা লুকোই। কাল তাই প্যানের ওপর পায়খানা করে ডেকে দেখালাম। বল না লীলা ডাক্তারবাবুকে কেমন পায়খানা!

চৌধুরি বলেন—আচ্ছা, দেখা যাবে।

লীলাময়ীর মুখ ফেটে পড়ছে রাগে, চাপা গলায় শচীলালকে বলেন—এখন ঘরে যাও তো!

—চা করলি?

—তুমি এখন খাবে না চা। স্নান করো গে। একেবারে ভাত দেব।

—চালকুমড়ো পাতার পুর করবি না?

লীলাময়ীর হাত-পা নিশপিশ করে। গোপনে আবার এসে, বউমার ঘরের দরজা নাড়া দেন—শুনছ বউমা!

ঘরে ছেলেটা কাঁদছে অনেকক্ষণ ধরে। বাপ-মায়ের রুদ্রমূর্তি দেখেই শুরু করেছিল। তারপর থেকে ভ্যাবাচ্ছেই।

সুভদ্রার কান্না থেমেছে। গম্ভীর গলায় বলল—ডাক্তার বিদেয় করে দিন গে। আমি দেখাব না। আর বিরক্ত করবেন না আমাকে।

ভারী অসহায় বোধ করেন লীলাময়ী। কী করবেন? চৌধুরি এসেছেই যখন, রুগি দেখুক আর না দেখুক, ভিজিটের টাকাটা দিতেই হয়। কিন্তু অধীপ ভিজিটের টাকা রেখে যায়নি।

৭

—ইসি ট্যাংকিমে আর কুছু নাই বড়বাবু।

—নেই মানে? ইয়ার্কি পেয়েছিস? ডান্ডা মার, মার ডান্ডা। দেখি কতখানি আছে।

মাগন বলে—হাঁ-হাঁ দেখে লিন।

ডান্ডা মারতেই সেটা ভচাক করে দু-হাত পুরু ময়লায় ডেবে গেল।

—ওই তো। এখনও অর্ধেক রয়ে গেছে। চালাকি করার আর জায়গা পাস না? চল্লিশ টাকা কি এমনি-এমনি দেব?

ডান্ডা তুলে ময়লার দাগ দেখিয়ে মাগন বলে—বাস এইটুকু তো সব ট্যাংকিতে থাকে। ট্যাংকি কি কখনও পুরা সাফা হয় বড়বাবু? কুছু তো থেকেই যায়। ই তো স্রিফ বালু আছে।

—বকবক না করে কাজ কর তো।

—হাঁ-হাঁ কাম তো করছে বড়বাবু।

দু-নম্বর ট্যাংকিতে জলের নীচে ময়লা এখনও থকথক করছে। শক্ত মাল। বালতি মারলে ডোবে না। পা গর্তে ঢুকিয়ে চেপে বালতি ডোবায় মাগন। বলে—বহোত পরেসান বাবা। একটা পুরানা জামা দিবেন তো বড়বাবু? ট্যাংকি বেডরুম বানিয়ে দিব।

লীলাময়ী আসছেন টের পেয়েই দত্তবাবু স্টেটসম্যানের মুখোশটা পরে নিলেন।

কিন্তু লীলাময়ী এলেনই। নাকে চাপা আঁচলের ফাঁক দিয়ে বললেন—চৌধুরি এসেছে। বউমা ডাক্তার দেখাবে না বলছে। কিন্তু ভিজিটটা তো দিতে হয়। অধীপ টাকা রেখে যায়নি।

বিরক্ত দত্তবাবু বলেন—আমার ব্যাগ থেকে নিয়ে দাও গে। অধীপ এলে চেয়ে রেখো।

—চাইব, কিন্তু সে দেবে কেন? তার বউকে তো আর দেখেনি।

—সেই তো ডেকেছে, আমরা তো কল দিইনি। রেসপনসিবিলিটি তার।

লীলাময়ী নাকটা ছেড়ে একটু দম নিতে গিয়েই দুর্গন্ধে শিউরে উঠে 'হ্যাক' শব্দ করে আবার নাকে চাপা দিয়ে বলেন—বলছি কী, ভিজিট যখন দিচ্ছিই তখন আর মাগনা ছাড়ি কেন। প্রেসারটা দেখিয়ে নিই। বাবার বুকটাও পরীক্ষা করুক। তুমিও তো পরশুদিন মাথা ঘোরার কথা বলছিলে, দেখিয়ে নেবে নাকি?

ঠিক এই সময়ে ওপর থেকে রসিকবাবুর স্ত্রী চেঁচিয়ে উঠে বলেন—এই জমাদার! নর্দমায় ময়লা ফেলছ যে বড়? নালি আটকে যাচ্ছে না? মাগন মুখ তুলে বলেন—নালি টেনে দিব মা। কাম পুরা করে পয়সা লিব।

—কেন, গর্ত করতে কী হয়? বলা হয়নি তোমাকে গর্ত খুঁড়তে? টাকা মাগনা আসে?

—হাঁ-হাঁ, গাড্ডা কী হোবে।

রসিকবাবুর স্ত্রী বেশ চেঁচিয়ে বলতে থাকেন—ছ'মাস আগে ট্যাংক পরিস্কার করানো হয়েছে, এর মধ্যেই যে কী করে ভরে যায় তা তো বুঝি না।

কথাটা গায়ে না মাখলেও হয়। কিন্তু লীলাময়ী মাখলেন।

—শুনলে?

দত্তবাবু স্টেটসম্যানের মুখোশ পরে ফেলেন। লীলাময়ী মুখটা সিলিং-এর দিকে তুলে কয়েক রাউন্ড গুলি ছোঁড়েন—ময়লা কি শুধু আমাদের একার? ওপরতলায় বুঝি সব দেবতারা থাকেন, তাঁরা কেউ হাগেন মোতেন না? আর জমাদারের টাকার অর্ধেক তো আমাদেরও দিতে হবে। মাগনা কাজ হচ্ছে নাকি?

রসিকবাবুর স্ত্রী নাগাড়ে চালিয়ে যাচ্ছেন। সব কথা বোঝা যায় না। শুধু স্পষ্ট করে শুনিয়ে বললেন—ওই তো ছেলে ধরতে বিবি বেরিয়ে গেলেন। আর দোষ হল কি না আমার মিলনের! গুষ্টিসুদ্ধি তেড়ে এসেছিলেন ঝগড়া করতে। বলি, মেয়ে কোথায় যায়,

কার সঙ্গে কীরকম ঢলাঢলি তার খবর রাখছে কে? সে বেলা তো চোখে তুলসীপাতা এঁটে থাকা হয়।

লীলাময়ী এখন আর দুর্গন্ধটা পাচ্ছেন না। নাকের কাপড় কখন খসে গেছে। বড়-বড় চোখে লীলাময়ী স্বামীর দিকে তাকান। মুখে কথা নেই।

দত্তবাবু এমন মুখের ভাবখানা করেন, যেন তাঁর মেয়ে বা তাঁর পরিবার নিয়ে কথা হচ্ছে না। এ যেন অন্য কারও কথা। প্রচণ্ড জিদবশত তিনি কাগজে দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণ দাঙ্গার খবর পড়তে থাকেন। একবর্ণও বুঝতে পারেন না।

একবার ভাবলেন ডাক্তার চৌধুরিকে প্রেসারটা দেখিয়ে নেবেন।

৮

চুনুর একটা পা শুকনো কাঠি। একটা হাতও কমজোরি। বড় কষ্ট তার হাঁটাচলার। যে তাকে দেখে সে-ই দুঃখ পায়।

আর অন্যের এই দুঃখবোধটা খুব ভালো কাজে লাগাতে শিখে গেছে চুনু।

জানলার কাছে একটা সাইকেল থেমে আছে। সাইকেলের ওপর শিবাজী।

—ডলিকে আমি নিজের চোখে দেখেছি পাম্প ছাড়তে। চুনু খুব ভালো মানুষের মতো বলে।

—কিন্তু আমার পিছনের চাকাটায় তো লিক বেরোল।

—লিক? তবে ঠিক সেফটিপিন ফুটিয়ে দিয়েছিল। তুমি তখন মান্তুদের বাড়িতে ক্যারাম খেলছ। খেলছিলে না?

—ক্যারাম?

—মিথ্যে কথা বোলো না।

শিবাজী হেসে বললে—খেলছিলাম! তুমি ডলিকে বলেছ?

—না, মাইরি, কালীর দিব্যি।

—তবে বললে কে? ডলি জানল কী করে?

—বলব সত্যি কথা একটা? কিছু মনে করবে না তো?

—বলো না।

—মান্তু। ঠিক মান্তুই বলেছে। মান্তু আজকাল ইউনিভার্সিটির ঝিলে গিয়ে কার সঙ্গে বসে থাকে জানো? তপন।

—সেই বদমাশটা? গেলবারও আমাদের হাতে মার খেয়েছিল?...এই তোমার বাবা!

বলেই শিবাজী জানলার নীচে ডুব দেয়। পরক্ষণেই তার সাইকেলের ঘণ্টি দূরের রাস্তার দমকলের মতো ঘনঘন রি-রি-রিং রি-রি-রিং বাজতে থাকে।

চুনু আস্তে-আস্তে ঘাড় ঘুড়িয়ে তাকায়। তার মুখে কোনও অপরাধবোধ নেই। বউদির চিঠি চুরির জন্য মা তাকে বকেনি। আসলে বকতে সাহস পায়নি। বাবাও পাবে না।

দত্তবাবুও জানেন চুনুকে শাসন করার ক্ষমতা তাঁর নেই। কাউকেই শাসন করার ক্ষমতা নেই। এ-বাড়ির কেউই তাঁর কথা শোনে না।

—এ চিঠিটা চুরি করেছিস?

ঠান্ডা গলায় চুনু বলে—বেশ করেছি। একশো বার করব।

এই মেয়ের জন্যই দত্তবাবু আর লীলাময়ী গত পাঁচ বছর এক বিছানায় শুতে পারেননি। চুনু তখন থেকেই তার মাকে প্রায়ই বলত—লজ্জা করে না তোমরা বুড়ো বয়সে একসঙ্গে শোও? কেন শোবে?

কী লজ্জা! সেই লজ্জায় লীলাময়ী দত্তবাবুকে বলেছিলেন—মেয়ে যখন চায় না তখন থাক না হয়।

দত্তবাবু গম্ভীর হয়েছিলেন। কিছু বলেননি। লীলাময়ীই আবার নিজে থেকে বলেন—ও তো জানে ওর সাধ আহ্লাদ মিটবে না! তাই বোধহয় হিংসে।

হবে। কিন্তু সেই আক্রোশটা দত্তবাবুর যায়নি এখনও। দাঁতে দাঁত পিষে বললেন—কী বললি?

তাঁর চেহারাটা কেমন দেখাল কে জানে! হয়তো খুবই ভয়ঙ্কর! দত্তবাবু ধীরে-ধীরে এগিয়ে গেলেন।

ভয় পায় না, তবে এখন পেল। পিছনে হাত নিয়ে জানলার গ্রিল চেপে ধরে তবু ত্যাড়া ঘাড়ে, চুনু বললে—গায়ে হাত দেবে না বলে দিচ্ছি! ইঃ তেজ দেখাতে এলেন! মুরোদ জানা

আছে। কই, বউদিকে তো চোখ রাঙাতে পারো না, যখন মাকে যা তা বলে মুখের ওপর! তোমার উইকনেস জানি। বেশি তেজ দেখাতে এলে সবাইকে চেঁচিয়ে বলব।

দত্তবাবু অবশ হয়ে যান। ঘেমে যান। মুহূর্তের মধ্যে। মারবেন বলে হাত তুলেও ছিলেন। সেই হাত সজোরে নেমে ঝুলে পড়ল ফাঁসির মড়ার মতো।

আস্তে-আস্তে ফিরে এসে স্টেটসম্যানের মুখোশ পরলেন।

এই সেদিন অধীপ যখন বিয়ে করবে বলে মাকে গিয়ে ধরেছিল সেদিন লীলাময়ীর কাছে সব শুনে কী রাগটাই না করেছিলেন তিনি। ছেলে তখন সদ্য চাকরিতে ঢুকেছে। ঢুকেই বিয়ে। পার্মানেন্ট হ। মাইনে একটু ভদ্রগোছের হোক। নইলে তো হ্যাপা সামলাতে হবে বাপকেই।

কিন্তু দত্তবাবুর ইচ্ছেয় কিছু তো হয় না এ-বাড়িতে। যার যা ইচ্ছে তাই করে। অধীপেরও বিয়ে হল।

নতুন বউকে দেখে ভারী মুগ্ধ হয়ে গেলেন দত্তবাবু। বহুকাল এমন মিষ্টি মুখ দেখেননি। বউভাতের পরদিনই মাথাখানা বুকে টেনে বলেছিলেন—এখন তুমিই সংসারের কর্ত্রী।

আত্মবিস্মৃত হয়ে গিয়েছিলেন। কথাটা বলা ঠিক হয়নি। সেই থেকে সংসারে অশান্তির সূত্রপাত।

মনের মধ্যে পাপ আছে কি?

কে জানে বাবা! কে জানে! তবে পাপের চেয়েও লজ্জা অনেক বেশি।

শ্বশুরমশাই কী একটা পেছনে লুকিয়ে নিয়ে চুপিসাড়ে বাথরুমের দিকে যাচ্ছেন!

উঁকি মারলেন দত্তবাবু। দেখলেন, তাঁর নীল স্ট্র্যাপের হাওয়াই চপ্পল।

৯

লীলাময়ী দুটো প্রেসারের বড়ি একসঙ্গে খেলেন। বেড়েছে।

একটা ছিটকিনি খোলার আওয়াজ পেয়েছিলেন যেন একটু আগে। মনের ভুলও হতে পারে। তবে কান খাড়া রাখছেন।

শচীলাল স্নান সেরে এসে নিজেই আসন পেতে জল থালা আর নুন নিয়ে বসে পড়েছেন ভিতরের বারান্দায়। ডাকছেন—লীলা, দিবি নাকি?

ঠিক এই মুহূর্তে লীলাময়ীর রাগ হল না। ক'দিন আগেও শচীলাল জামাইয়ের সঙ্গে ছাড়া খেতেন না। ভদ্রতাবোধ বরাবরই প্রবল। ইদানীং এইসব হচ্ছে। লীলাময়ী বললেন—বসে থাকো একটু। যাচ্ছি।

শচীলাল বসে থাকেন। দুর্গন্ধ পাচ্ছেন ঠিকই। গা করছেন না। বড় মেয়ে হিরন্ময়ী বলেছে, নিয়ে যাবে শিগগিরই। হিরন্ময়ীর অবস্থা ভালো, দু-বেলা মাছ হয়, মাঝে-মাঝেই পোলাও। কতকাল পোলাও খান না শচীলাল!

লীলাময়ী টের পান, সুভদ্রা দরজা খুলল। প্যাসেজ দিয়ে নাতিটার পায়ের আওয়াজ ধেয়ে আসছে, কচিগলার ডাক এল—ঠানু। ও ঠানু আমরা যাচ্ছি।

সুভদ্রা গর্জায়—এই! খবরদার যাবি না। গলা টিপে মেরে ফেলব তাহলে।

ছেলেটা ফিরে যায়। একটু কাঁদে কি? লীলাময়ী উঁকি মেরে দেখেন প্যাসেজ দিয়ে বাথরুমের দিকে গেল সুভদ্রা। ছেলের নড়া শক্ত হাতে ধরা। সাজগোজ সব হয়ে গেছে। যাওয়ার জায়গা বলতে বাপের বাড়ি। তা যাক। বাড়িটা জুড়োবে!

—লীলা দিবি? শচীলাল ডাকেন।

এবারে রাগেন লীলাময়ী! চাপা গর্জনে বলে—বড়দিরও আক্কেল দেখছি! কবে থেকে বাবাকে নিয়ে যাওয়ার কথা। সব যে যার স্বার্থ দেখছে। এই বুড়োর হ্যাপা যত আমাকেই সামলাতে হবে বরাবর? শরীর আমার বারো মাস খারাপ থাকে! স্বার্থপর, সব স্বার্থপর।

দ্রুত পায়ে বারান্দায় গিয়ে তিনি শচীলালের সামনে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে বলেন—কেন তোমার গুণধর ছেলে বাবাকে নিয়ে ক'দিন রাখতে পারে না? নাকি তাতে বউয়ের মাথা ধরার ব্যামো বাড়বে।

১০

উঠোন কোমর পর্যন্ত গর্ত খুঁড়ে ফেলেছে মাগন। ঘামে জবজব করছে। পায়ে কাচের টুকরো ফুটেছে একটা। সেটা নখে টেনে তুলে ফেলল। কাটা জায়গাটা হাত দিয়ে ঘষে রক্ত লেপটে দিল।

—কী রে, দিন কাবার করবি নাকি?

—হচ্ছে বাবা, হচ্ছে। মাগন গর্ত থেকে উঠে এসে এক নম্বর ট্যাংকিতে বালতি নামিয়ে বলে—আভি দেখে লিন, সব সাফা।

রসিকবাবুর স্ত্রী ওপর থেকে এবং দত্তবাবু নীচে থেকে একসঙ্গে চেঁচিয়ে ওঠেন—অনেক ময়লা রয়েছে এখনও!

মাগন হাসে। বলে—ময়লা তো আছে মালিক, কিন্তু উ তো সব শুখা মাল আছে। মালটা শক্তো হয়ে গেছে বড়বাবু, উঠবে নাহি।

—নাম ব্যাটা ট্যাংকে, নেমে কোদাল মেরে চেঁছে তোল। টাকা কি গাছে ফলে?

—হাঁ-হাঁ বাত তো ঠিক আছে বড়বাবু। লেকিন পাঁচ রুপেয়া বকশিশ দিয়ে দিবেন। চালিশ টাকার তো পাসিনা চলিয়ে যাচ্ছে। ভিটামিন দিবে কৌন?

মাগন ট্যাংকে নামে। গার্দা সব পাথরের মতো বসে গেছে। থকথক করছে পোকা, জল। বহোত গন্ধা।

কোদালে ময়লা চাঁচতে-চাঁচতে মাগন আপনমনে বলে—কাম পুরা করে পয়সা লিব মালিক। বহোত গার্দা বাবা, বহোত গন্ধা। সব গাঁদা সাফ থোড়াই হোবে বাবা। গার্দা কুছ জরুর থেকে যাবে মালিক! সব গার্দা কখনও সাফা হয় না।

দৈত্যের বাগানে শিশু

যৌবনকালটা লালুর কেটেছে মামদোবাজিতে। মামদোভূতের ধড় আছে, মুড়ো নেই। লালুরও ছিল না। ধড় ছিল। সেটা দশাসই। ছেলেবেলা থেকেই তার চেহারাখানা বিশাল, দু-খানা বিপুল কাঁধের মধ্যে তার মুণ্ডুটা নিতান্তই ছোট দেখতে। মুখখানা ভালো নয়, কিন্তু সেই মুখে খুব সরলতা ছিল। ছিল নিষ্ঠুরতাও। মাথায় বুদ্ধি ছিল না। পনেরো-ষোলো বছর বয়সেও ক্লাস এইট-এর ছাত্র সে, তখন মদ খেতে শিখেছিল, খেলত জুয়া। পাড়ার লোক সেই বয়সের লালুকে অল্প-সল্প ভয় করতে শুরু করেছিল।

বাজারের মধ্যে স্টোভ সারাইয়ের দোকান করত হীরেন। রাতে দোকানের ঝাঁপ ফেলে ভিতরে জুয়ার বোর্ড বসাত। লালু ছিল সেই বোর্ডের মেম্বার। পাড়ার এবং এলাকার বিখ্যাত গুন্ডা ছিল ননী। ননীর মাকে ছিল দেখার মতো। সে ট্যাক্সিওয়ালাদের লুঠ করত, পার্ক স্ট্রিট, এসপ্লানেডের বিখ্যাত বার থেকে মাতালদের ভুলিয়েভালিয়ে নিয়ে যেত ময়দানে—পরনের অন্তর্বাস ছাড়া সব কেড়ে নিত, পকেটমারদের কাছ থেকে নিত কমিশন। ননী জীবনে টাকাটা খুব চিনেছিল। মাঝেমধ্যে সে হীরেনের দোকানের জুয়ার বোর্ডটা লুঠ করত। খুব টাকার দরকার হলেই এটা করত সে। হীরেনরা বরাবর ননীগুন্ডাকে দেখলেই বোর্ড ছেড়ে দিত।

একদিন লালু থাকতে না পেরে বলল—রোজ-রোজ বোর্ডটা ভেঙে দিয়ে যাও ননীদা, আমরা ঝুটঝামেলা কিছু করি না—কিন্তু কাজটা কি পুরুষের মতো হচ্ছে?

ননী একপলক তাকে দেখে বলল—শরীর বানিয়েছিস, না রে শালা? কিন্তু তুই খারাপ হয়ে যাবি লালু।

লালু ভয় খেয়ে বলল—কিন্তু আমরা তো তোমাকে কিছু বলি না কখনও। খেলাটা ভেঙে গেলে রোজ-রোজ ভালো লাগে না, তাই—

ননী কেবল ঠান্ডা গলায় আবার বলল—তুই খারাপ হয়ে যাবি লালু। বিলা হয়ে যাবি—

টাকাপয়সা তুলে নিয়ে নদী হাত বাড়িয়ে লালুর কাঁধের জামাটা ধরে বলল—আয়।

ননী ডাকলে বেশিরভাগ লোকই প্রতিরোধের কথা ভুলে সম্মোহিতের মতো তার সঙ্গে যায়। অতবড় শরীর নিয়ে লালুও তার অর্ধেক মাপের ননীর সঙ্গে উঠল।

বাজারের পিছন দিকে একটা চাতাল, মফসসলের মেয়ে আর শিশুরা এখানে আনাজ নিয়ে বসে। রাতে জায়গাটা ভারী নির্জন, শুনশান। অদূরে একটা পশ্চিমাদের ঝোপড়া আছে, তাতে ঝাঁকামুটে মজুরদের বাস। কিন্তু তারাও নির্জনতারই অংশবিশেষ। ননীকে দেখলে তারা পাথর হয়ে যায়।

খুব জ্যোৎস্না সেদিন। সেই জ্যোৎস্নায় চাতালে এনে লালুকে দাঁড় করিয়ে ননী ঠান্ডা গলায় বলল—যদি বিশ্বাস থাকে তো ভগবানের নাম নে শুয়োরের বাচ্চা।

এতক্ষণ পর্যন্ত সব ঠিকই ছিল। ননী বেড়াল ইঁদুরের খেলাটা ঠিকই খেলতে পারত। ভয়ে নেংটি ইঁদুরের মতোই কাঁপছিল লালু। কিন্তু ননী ভুল করল গালটা দিয়ে।

লালুর বাপ নিরীহ মানুষ ছিলেন। কাজ করতেন সরকারি অফিসে। কেরানি। ছোটখাটো মানুষ। ছেলে-বউয়ের ওপর কোনও কর্তৃত্ব ছিল না। লালু যখন বড় হতে-হতে বিশাল চেহারা বিশিষ্ট হয়ে উঠল, ছেলের বাড় দেখে তিনি খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তাঁর ছেলে এরকম বিরাট আকৃতির হয় কী করে তা তিনি খুব ভাবতেন। মাঝেমধ্যে স্ত্রীকে তাঁর সন্দেহ হত। তিনি বলতেন, এ-ছেলে আমার না নিশ্চয়ই।

লালুর মা ভারী অবাক হয়ে বলতেন—'তবে কার?'

আমতা-আমতা করে লালুর বাবা বলতেন—হাসপাতালে অদল-বদল হয়নি তো। মনে হয় আমার বাচ্চা নিয়ে অন্য কেউ তার বিকট ছেলেটা পাচার করে গেছে।

এরকম অলক্ষুণে কথা শুনে লালুর মা ভীষণ চেঁচামেচি শুরু করতেন। পাড়ায় জানাজানি হত। লোকে হাসত। পাড়ার বউ-ঝিরা তাদের দুপুরের কূটকচালির আসরে লালুর মায়ের চরিত্র বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ প্রকাশ করত—ওটুকু মানুষের ওরকম দানবের মতো ছেলে হয় কখনও?

সেসব কথা লালুরও কানে আসত। সে স্পষ্টই বুঝতে পারত যে তার বাপ তাকে একটুও পছন্দ করে না। উপরন্তু তার জন্ম এবং পিতৃপরিচয় বিষয়ে নানা লোকের নানা সন্দেহ। কিন্তু কেন যেন নিজের বাপ এবং মার প্রতি লালুর একটা পাগলাটে ভালোবাসা ছিল। সে তার রোগা খিটখিটে সন্দেহপ্রবণ বাপকে ভালোবাসত খুব। মাঝেমধ্যে বাবা

অফিস থেকে ফিরলে সে গিয়ে সন্ধেবেলা তার দানবীয় হাতে বাপের গা হাত-পা টিপে দিতে-দিতে বলত...আমি তোমার ছেলে, না বাবা?

বাপ সতর্ক হয়ে ক্ষীণ গলায় বলত—আরও ভালো হ লালু। তোকে দেখে যে ভয় লাগে আমার।

—ভয় কী বাবা। আমি ঠিক আছি।

লালুর বাবা ক্ষীণ গলায় বলতেন—অত জোরে দাবাস না—লাগে। চরিত্রটা একটু ঠিক রাখিস। বেড়ে উঠলেই হল না, বাড়ের সঙ্গে আবার সংযম চাই।

লালু সেসব বুঝত না। তার শরীর সব সময়ে ছটফট করে—সে করবে কী? কাজেই সে বাবার কথায় আমল দিত না, কিন্তু লোকটাকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসত।

কাজেই জ্যোৎস্না রাতে বাজারের পিছনের নির্জন চাতালে যখন তকে মারবার আগে 'শুয়োরের বাচ্চা' বলে গাল দিল ননী তখনই একটা মারাত্মক ভুল করল। ওই গালাগালে হঠাৎ নিজের নিরীহ ছোটখাটো বাবার চেহারাটা লালুর মনে পড়ল। পলকে গরম হয়ে গেল গা। সরে গেল সমস্ত জড়তা। সে ঘুরে তার হোঁৎকা হাতে বুলেটের মতো একখানা ঘুষি ঝাড়ল ননীর মুখে।

তৈরি থাকলে এসব ঘুষি ননী সহজেই এড়াতে পারে। কিন্তু লালু সম্পর্কে সতর্ক হওয়ার কোনও কারণ ছিল না। হোঁৎকাটা ভয়ে কাঁপছে দেখে নিশ্চিন্ত মনে ননী একতরফা মারের জন্য তৈরি হচ্ছিল। আচমকা ঘুষিটা লাগল সেই সময়ে। একটা কোলবালিশের মতো চাতালে পড়ে গেল ননী।

'বাপ তুলে গালাগাল! অ্যাঁ! বাপ তুলে?' বিড়বিড় করে বলতে-বলতে লালু ননীর লাশ টেনে তুলল এক হাতে, অন্য হাত মোটরগাড়ির পিস্টনের মতো চালাতে লাগল। কোঁক-কোঁক করে কয়েকটা শব্দ করল ননী, তারপর চুপ হয়ে গেল। কিন্তু লালুর রাগ তখনও শেষ হয়নি। সে দু-হাতে ননীর গলা টিপে ধরে বলছে তখনও—'আর বলবি? আর বলবি কখনও?'

লালু তখনও জানত না, তার হাতের চাপে ননীর গলার মেরুদণ্ডের দুটো হাড় ভেঙে গেছে, জিভ বেরিয়ে ঝুলছে, এবং অনেকক্ষণ ননী শ্বাস নিচ্ছে না।

বাজারের বন্ধ দোকানঘরের আড়াল আবডাল থেকে দৃশ্যটা দেখে হীরেন আর তার দলবল এসে জ্যান্ত লালু আর ননীকে আলাদা করল। হীরেনরা খুব খুশি। কিন্তু লালুর

বিপদ বুঝে বলল—তুই পালা। বাড়িতে গিয়ে শুয়ে থাক, কোথাও বেরোসনি। আবডাল দিয়ে বাড়িতে ঢুকবি, পাড়ার লোকে যেন দেখতে না পায়।

লালুর ভয় ঢুকল আবার। নেংটি ইঁদুরের মতো পালাল সে। ঘরে শুয়ে শুনল, পুলিশভ্যান আসছে যাচ্ছে। একটু রাতে বাজারের দিকটায় ননীর দলবল হুজ্জত শুরু করল। ঘরে শুয়ে কাঁপতে লাগল লালু।

কিন্তু ননী মরেই গেছে। কোনও ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য সে আর ফিরবে না। তার দলবলও খুব একটা ছিল না। দু-চারদিন হামলা হল, খোঁজাখুঁজিও হল, কিন্তু লালুর গায়ে হাত পড়ল না। বাজারের হীরেন আর তার দলবল লালুকে আড়াল দিল কিছুটা। জুয়ার বোর্ডটা নিরাপদ করেছে লালু, কাজেই তার জন্য কিছু করতেই হয়।

লালু আবার রাস্তায় বেরোয়, হীরেনের আড্ডায় গিয়ে বসে, চোলাই খায়। তখন তার বিশ বছর বয়স।

পটাকে দেখে এখন আর বুঝবার উপায়ও নেই যে সে এক সময়ে কে বা কী ছিল। কিন্তু লোকে তখনও বলে—পটা মাস্তানের মতো অমন ওস্তাদ আর হয় না। কিন্তু কোন এক লীলাময়ীর কাছে ঘা খেয়ে পটা সব ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়ে যায় কিছুদিন। লাইনের ওপারে ছোট্ট কালী মন্দির বানিয়ে রক্তবর্ণ পোশাক পরে পটা কিছুদিন খুব সাধনভজন করে। সামাজিক দুষ্কর্ম সবই ছেড়ে দেয়। পটার দাপটে যারা ম্লান হয়েছিল এতদিন—এই ফাঁকে তারা উন্নতি করে ফেলল। পটা কালী সাধনা করতে-করতে আড়চোখে দেখল সবই। কালীর মুখের ওপর লীলারানির মুখটা মাঝে-মাঝে ফুটে ওঠে। পটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে চুপ করে থাকে। মনটা খুব ছটফট করলে মাঠ থেকে যার তার পাঁঠা ধরে এনে বলি দেয়। এইরকমভাবেই জীবনটা কাটিয়ে দিচ্ছিল পটা। এখন বয়স হয়ে গেছে। কালীমন্দিরটা নিয়েই পড়ে আছে সে। তবু একটা চোখ তার সব সময়েই খোলা, পাড়ার দিকে নজর রাখে। কোন মাস্তান উঠছে, কেই বা পড়তির দিকে। এটা তার অভ্যাস, ছাড়তে পারে না।

ননী মরে গেলে সে একদিন লাইন পেরিয়ে পাড়ায় ঢুকল।

লালুর আত্মবিশ্বাস এখন অনেক বেড়ে গেছে। তার শরীরটা হোঁৎকা হলেও যে কাজের তা সে বুঝতে পারে আজকাল। মারপিট হুজ্জোত লাগলে সে সবার আগে যায়! লোকে তাকে রাস্তা ছেড়ে দেয়।

মোড়ের মাথায় পটা ধরল লালুকে।

—শোন।

লালু একটা চোখ কুঁচকে পটাকে দেখে। খুব একটা আমল দিতে চায় না। কিন্তু পটার রক্তবর্ণ পোশাক, উড়োউড়ো চুলদাড়ি, রোগা শুকনো চেহারার মধ্যে এখনও একটা কিছু আছে যাকে ঠিক উপেক্ষা করা চলে না। তাই লালু পটাকে আমল দেবে না করেও কাছে গিয়ে বলল—কিছু বলছ পটাদা?

—বলছি। গায়ে অত মাংস কেন তোর? ভারী শরীর নিয়ে কিছু করা যায় না—বুঝলি?

ব্যঙ্গের হাসি হাসে লালু, বলে—করা যায় না কী করে বুঝেছ?

পটা আধখোলা চোখে একটু চেয়ে থেকে বলে—ননীকে সাফ করেছিস বলে বলছিস। ননী তৈরি থাকলে তোর মতো চারজনকে জমি নেওয়াতো। আলপটকা মেরেছিস। তা সব সময়ে কি সেরকম হবে?

বলে রোগা হাতখানা বাড়িয়ে পটা বলল—এই হাতখানা ধরে দেখ, বুঝতে পারবি।

লালু আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে তার প্রকাণ্ড হাতখানা বাড়াল। পটা তার রোগা আঙুল দিয়ে লালুর পাঞ্জাটা ধরে আলতো চাপে মোচড় দিল একটু। ব্যথায় থরথর করে কেঁপে উঠল লালু। হাতখানা বুঝি কবজি থেকে ভেঙেই যায়।

—আহা, ছাড়ো ছাড়ো—

পটা মৃদু হাসে। ছেড়ে দিয়ে বলে—তাই বলছিলাম কি গায়ের মাংস আর একটু ঝরিয়ে দে। কারণ, নিজের মাংস নিজের শত্রু। লাইনের ওপারে মায়ের মন্দির আছে আমার জানিস তো! সেখানে বিকেল-বিকেল চলে আসবি। তোকে তৈরি করে দেব।

প্রচণ্ড বিস্ময়ে রোগা শুকনো চেহারার পটাকে কয়েক পলক দ্যাখে লালু। সে দেবী দত্তর আখড়ায় বিস্তর মাটি মেখেছে। যন্ত্রপাতি নেড়ে তৈরি রেখেছে শরীর, তবু এই রোগা দুর্বল পটার হাতের ক্ষমতার কাছে সে ছেলেমানুষ। ওস্তাদ একেই বলে!

পটা হাসল, আবার লালুর মুখ দেখে বলল—ননী চিরকালের গোঁয়ার, তার ওপর পয়সার লালচ। ওসব লালচ থাকলে মানুষ অন্ধ। নইলে তোর মতো আনাড়ির হাতে যায়?

লালু বুঝল যে সে এখনও আনাড়ি। মাস্তানির বিষয়টি এখনও বিস্তর শিখবার আছে। তাই সে বিকেল-বিকেল লাইন পেরিয়ে পটার মায়ের মন্দিরে যেতে লাগল।

প্রথম-প্রথম কয়েকদিন পটা কেবল নিজের ডানহাতটা মুঠো করে বাড়িয়ে দিয়ে বলত —মুঠো খোল।

পটার হাতে সেই মুঠো খুলতে সারা বিকেল প্রাণপণ চেষ্টা করে ঘেমে যেত লালু। পারত না। বলত—কী দিয়ে তৈরি গো তোমার হাত পটাদা?

পটা হাসে, বলে—আজ যা, কাল আবার আসিস।

লালু সেলাম করে ফিরত। কিন্তু যাতায়াত বজায় রাখল সে। পটা শেখাত। বলত—এসব কাউকে শেখাইনি বড় একটা। এখন বুড়ো হয়ে যাচ্ছি, আমার সঙ্গেই সব চলে যাবে, তাই ভাবছি, তোকে দিয়ে যাই। কিন্তু দেখিস বাপু, লালচ বেশি করবি না, কখনও কোনও মেয়েমানুষের কেস নিবি না, গুরুকে মনে রাখবি।

লালু মাথা নাড়ে।

তারপর একদিন লালু মায়ের বাড়িতে পুজো দিয়ে বেরিয়ে এল। ভারী খুশি সে।

বিশাল শরীর এবং যথেষ্ট হিংস্রতা নিয়ে লালু ঘুরে বেড়াতে লাগল। শরীরের মাংস অনেকটা ঝরে গিয়ে, শরীরটা হালকা লাগে এখন। চলন্ত মালগাড়ির গা বাইতে পারে, টপকাতে পারে উঁচু দেওয়াল। সবচেয়ে বড় কথা আর টপ করে ভয় পায় না আগের মতো। পটা তাকে শিখিয়েছে, যখন হাঁটবি চলবি তখন চোখের মণি নড়বে ঠিক যেন দেওয়াল ঘড়ির পেন্ডুলাম। হাঁ করে এক দিকে চেয়ে হাঁটবি না। চারদিকে নজরে রাখবি। তাই রাখে লালু। দু-খানা চোখ টকটক করে ডাইনে বাঁয়ে নড়ে তার, সবদিক নজর রাখে। এখন তার জীবন বিপজ্জনক।

ওয়াগন-ভাঙা হিসেবে লালু বেশ নাম করল। হাইওয়েতে মাঝে-মাঝে লরি বা মোটরগাড়িও থামায় সে। পাড়ার বেশিরভাগ দোকানদার তাকে খাজনা দেয়। রোজগারপাতি মন্দ না।

কিন্তু বিপদও আছে। ওয়াগন-ভাঙাদের পুরোনো দলটার সঙ্গে বিস্তর বোমাবাজি চলল কিছুদিন। পুরোনো দলটা ভেঙে যাচ্ছিল, লালুর দলটা তৈরি হচ্ছিল। বোঝা যাচ্ছিল, দিনকালে লালুর দলটাই দাঁড়িয়ে যাবে। কিন্তু বিনা হুজ্জতে নয়।

ঠিক দুপুরবেলা লালু পেটোপাড়ার ভিতর দিয়ে আসছিল। সেই সময়ে হঠাৎ সে দেখল কে যেন সুইচ টিপে সূর্যটা নিবিয়ে দিল। এমনকী সুইচ টেপার ফুটুস একটু আওয়াজ শুনতে পেল সে। অন্ধকারে মুখ থুবড়ে পড়ল রাস্তায়। তার গলায় সোনার চেনে বাঁধা বাঘনখ বেয়ে রক্ত পড়ছিল টপটপ।

হাসপাতালে তাকে দেখতে এল পটা। মাথায় বিরাট ব্যান্ডেজ নিয়ে পড়ে আছে লালু। গুলিটা বের করেছে ডাক্তারেরা, কিন্তু তবু মাঝে-মাঝেই মাথাটা অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে।

সেই আলো আঁধারির ভিতরে সে পটাকে দেখে ক্ষীণ গলায় প্রশ্ন করল—পটাদা আমি মাইরি শেষ হয়ে গেলুম।

পটা গম্ভীর মুখে বলে—তোর একটা জিনিস নেই লালু। ওস্তাদ হতে গেলে সে জিনিসটা চাই-ই।

—কী সেটা।

—আর একটা ইন্দ্রিয়। আমি আগেই জানতাম, তোর সেটা নেই।

—সেটা কীরকম জিনিস?

পটা একটু ভেবে উত্তর দিল—কীরকম যেন ঠিক বোঝানো যায় না। চোখ কান ছাড়া আর একটা জিনিস। আমার মাথায় ঠিক রুমালের মতো একটা জিনিস আছে। সেটা সব সময়ে এদিক-ওদিক ঝাপটা মারছে। আমার চোখের আড়ালে কোথায় কি হচ্ছে না হচ্ছে তা ঝাপটা মেরে জানিয়ে দিচ্ছে আমাকে। কোন রাস্তা ঠান্ডা কোন রাস্তা গরম তা রাস্তা দেখেই আমি ধরতে পারি। মানুষের চোখের দিকে চেয়েই বুঝতে পারি যে কোন লাইনের লোক। তোর মুশকিল হচ্ছে তুই তা পারিস না। তোর শরীর আছে, কায়দাও জানিস, কিন্তু ও জিনিস তোর নেই।

ভারী হতাশ হল লালু। বলল, তা এখন আমি করব কী?

পটা বলল—তোর জখমটা ভালো নয়। মাথার চোট সারাজীবন জ্বালায়। নিজের হাতে তৈরি করেছি তোকে, এখন ভালো মন্দ কিছু হলে বুকে লাগবে বড়। তার চেয়ে তুই লাইন ছেড়ে দে।

লালুর মাথা আবার অন্ধকার হয়ে গেল এই কথা শুনে।

বুড়োবয়সে লালুর বাবা-মায়ের একটি মেয়ে হয়েছিল। তার তখন পাঁচ বছর বয়স। লালু তার এই রোগা টিঙটিঙে বোনটিকে ভালো করে লক্ষও করেনি কোনওদিন। হাসপাতালে থেকে ফিরে যখন কিছুদিন ঘরেই শুয়ে বসে থাকতে হল তাকে, ছোট বোনটি তার কাছে ঘুরঘুর করত। তার বিছানার কাছে বসে গুটি খেলত, পুতুলের সংসার বসত খুলে। কখনও বা রান্নাবাটি খেলায় লালুকে নেমন্তন্ন করত। এইভাবেই মায়া জন্মায়। লালু ঘরবন্দি বলেই আরও বেশি মায়াটা জন্মায়। তখনও মাঝে-মাঝে মাথা অন্ধকার হয়ে যায়, একটা দিক ফাঁকা ফাঁকা লাগে সব সময়ে। শরীরটা কাঁপে, নিজের জন্য ভারী একটা দুঃখ হয় তার। তখন সব ভুলবার জন্য বোনের সঙ্গে রাজ্যের খেলনা নিয়ে বসে লালু। আস্তে-আস্তে নিজের কথা ভুলে যায়। নিজেকে শিশুর মতোই লাগে তার।

তার দলটা দাঁড়িয়েই গেল। ওয়াগান-ভাঙার এমন ওস্তাদ দল বড় একটা আসেনি। দলের ছেলেরা এসে লালুর হিস্যার অংশ বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে যায়, কিন্তু তারাও বুঝতে পারে, লালু শেষ হয়ে গেছে। বোনের সঙ্গে সারাদিন খেলে-খেলে তার মুখ-চোখেও একটা শিশুর মতো হাবভাব। তারা বুঝতে পারে, লালু আর লাইনে নামতে পারবে না।

সেটা লালুও বোঝে। বুঝে একদিন সে তার হিস্যার টাকা ফিরিয়ে দিয়ে বলল—আমি বসে গেছি রে। ও টাকা ছুঁতে আমার লজ্জা করে। তোরা ভাগজোখ করে নে।

তারা খুব একটা আপত্তি করল না। টাকা ফেরত নিল।

লালু একটা শ্বাস ফেলে বোনের সঙ্গে খেলায় ডুবে গেল আবার। সে এখন এক পায়ে লাফিয়ে এক্কাদোক্কা খেলতে পারে। হাত চিৎ-উপুড় করে গুটি খেলতে পারে, পুতুলকে পরাতে পারে কাপড়।

কিন্তু সেইসঙ্গে রোজগারও বন্ধ। সরকারি অফিসের টাকায় বাবা সংসার চালিয়ে নিচ্ছিল কোনওরকম। কিন্তু রিটায়ারমেন্টের সময় এসে গেল। লালুকে এখন আর তেমন ভয় করে না কেউ, বাবাও না। একদিন বাবা ডেকে বলল—লালু, তোমার মতিগতি ভালো হয়েছে, খুব সুখের ব্যাপার। কিন্তু রোজগারপাতির বুদ্ধি কই! শুধু ভালোমানুষিতে চলবে না।

লালু বুঝল। কিন্তু সে লেখাপড়া শেখেনি। পটা ওস্তাদের কাছে যা সে শিখেছে তা আর কাজে লাগাবার মতো ক্ষমতা তার নেই। তবু সে বোনের সঙ্গে খেলা ছেড়ে একটু-আধটু বেরোতে লাগল।

প্রথমেই গেল স্টেশনের গায়ে তাদের চায়ের দোকানটায়। দলের ছেলেরা এখানেই বসে।

সন্ধেবেলা। কয়েকজন বসে আছে। তাদের মধ্যে দুজন—নীলু আর শানু লালুর চেনা—বাকি ক'জন নতুন। নীলু আর শানু খাতির করে তাকে বসাল। নতুনরা তাকে গ্রাহ্য করল না। এক-দুইবার দেখে চোখ ফিরিয়ে নিল।

লালু নীলুকে বলল—আমার কিছু টাকার দরকার নীলু, দোকান করব।

নীলু মন দিয়ে শুনে ভেবে বলল—ধার না হিস্যা?

লালু মাথা নাড়ে—ওসব না। কাজে নামব।

নীলু আবার ভাবে। অনেক ভেবে বলে—দল ঠিক আগের মতো নেই লালুদা। পুলিশেরও হুজ্জত খুব। নতুন ছেলেরা এসেছে—তারা কাউকে বিশ্বাস করে না। তুমি নামতে চাও ভালো, আমি সবাইর সঙ্গে একটু কথা বলে নিই। কাল একবার এসো।

লালু গেল পরদিনও। নতুন ছেলেরা তার হোঁতকা শরীরটা চেয়ে দেখল মাত্র। নীলু গম্ভীরমুখে আড়ালে ডেকে বলল—তোমাকে নেবো। কথা হয়েছে। কিন্তু এখন দল বেড়ে গেছে অনেক, আমাদের হিস্যা বেশি থাকে না। পুলিসকে কত দিতে হয় তা তো তুমি জানোই। আর-একটা কথা, এখান থেকে ক্যাপিট্যাল বাগিয়ে সরে পড়বে তা হবে না। এলে থাকতে হবে। ভেবেচিন্তে এসো।

কথাটা লালু ভাবল অনেক। ওয়াগন-ভাঙা কিছু শক্ত কাজ না। গাড়ি জায়গা মতো দাঁড়ায়, পুলিশও বন্দোবস্ত মতো তফাতে থাকে। কেবল বন্ধ ওয়াগন খুলে মাল বের করা। কিন্তু ওই যে দল ওই দলটাই সাংঘাতিক। বহুকাল সে আর দল করেনি, এখন বুঝে চলা কী সম্ভব! একটু এদিক-ওদিক হলে লাশ পড়ে যাবে। পটাটা কী একটা ইন্দ্রিয়র কথা বলত, যেটা তার নেই। সেটা নেই ঠিকই। তাই একটু-আধটু ভয় করে লালুর! গলায় সোনার চেনে বাঁধা বাঘনখটা মুখে পুরে, সে ভ্রূ কুঁচকে ভাবে। ভাবলেও কিছু সমাধান পায় না। মাথার ভিতরটায় একধারে এখনও জমাট অন্ধকার। সব সমস্যা গিয়ে সেইখানে সেঁধোয়। ভারি অস্থির লাগে তার।

তবু নামে লালু। দু-দিন তাকে কোনও কাজ দেওয়া হল না। দলের সঙ্গে থাকল কেবল। তিন-চারদিন পর গাড়ি থামতে দরজা খুলে অভ্যাস মতো উঠে গেল লালু। পা দিল গমের বস্তায়। হাতে হাতলওয়ালা সরু হুক। তার পিছনে উঠল তিনচারজন নতুন ছেলে।

ওয়াগানের ভিতর অন্ধকার। যার হাতে টর্চ সে কেন যেন টর্চটা জ্বালল না। অন্ধকারেই বিপুল একটা বস্তা টেনে তুলল লালু। পাকসাট মেরে দরজার কাছে ফেলল। নীচে থেকে কারও বস্তাটা ধরার কথা। লালু বস্তাটা ঝুলিয়ে ধরে রইল, নীচে থেকে কেউ তা ধরল না। কিছু বুঝবার আগেই ওয়াগানের ভিতরের অন্ধকার থেকে হুক-এর সরু অংশটা কে যেন সজোরে বসাল তার কাঁধে। ব্যথায় চেঁচিয়ে উঠল সে, হাতের বস্তাটা পড়ল প্রথমে, তার ওপর পড়ল সে, পিছন থেকে একটা লাথি খেয়ে টাল সামলাতে না পেরে। ভারী শরীর তার, উঁচু ওয়াগন থেকে পড়ে বুদ্ধিভ্রংশ হয়ে সে কাঁধ চেপে বোকার মতো চেয়ে রইল কেবল। টলটলে রক্তে ভেসে যাচ্ছিল তার হাত। ওয়াগনের ভিতর থেকে একটা তীব্র টর্চের আলো এসে পড়ল তার মুখে। একটা গলার স্বর বলল—আমরা নতুন লোক পছন্দ করি না লালু। কেটে পড়ো।

লালু সেই টর্চের আলোর দিকে চেয়ে বলল—কিন্তু নীলু যে বলেছিল।

—নীলুও যাবে। তুমি পুরোনো লোক, দলটা তোমার হাতেই তৈরি—আমরা জানি। তাই তোমাকে জান-এ মারলাম না। পুরোনো লোক আমরা পছন্দ করি না। কেটে পড়ো।

লালু তার অন্ধকার মাথা দিয়েও ব্যাপারটা বুঝল। উঠে দাঁড়িয়ে বলল—কিন্তু আমার হিস্যা?

—যে গমের বস্তাটা নামিয়েছ ওটা নিয়ে যাও।

বস্তাটা অবশ্য নিল না লালু। কিন্তু ফিরে গেল। আস্তে-আস্তে ইয়ার্ড পার হল, টপকাল রেলের লোহার বেড়া। অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে ফিরে এল বাড়িতে।

পরদিন আবার শিশুর মতো মুখ নিয়ে ঘুম থেকে উঠল সে। খেলতে শুরু করল ছোট বোনের সঙ্গে।

দিনসাতেক বাদে খবর পেল, রেলে কাটা পড়ে নীলু মারা গেছে। শুনে একটু শিউরে উঠল সে। ছোট বোন মিলু পাড়ার রাজ্যের ছেলেমেয়ে জুটিয়ে আনে, তাদের নিয়ে সারাদিন খেলে লালু। নীলু মারা যাওয়ার খবর পেয়ে সে সেইদিন তাদের নিয়ে বাড়ির উঠোনের করবী গাছের নীচে বনভোজন করল। বাচ্চাদের হুল্লোড়ে ডুবে রইল সারাদিন।

কিন্তু এভাবে চলে না।

দত্তদের গাড়িটা গতবছর বেচে দিয়েছে। গ্যারাজটা খালি পড়ে আছে। লালুর খুব ইচ্ছে ওখানে একটা দোকান দেয়। মনোহারি দোকান। সামান্য কিছু থোক টাকা হলে চলে যায়।

সে বাবার কাছে টাকাটা চাইল প্রথমে।

বাবা অবাক হয়ে বললেন—আমার প্রভিডেন্ড ফান্ডের টাকা ভাঙব? তোমার কি মাথা খারাপ! বুড়ো বয়সে আমাদের খাওয়াবে কে? তার ওপর তোমার বোনের বিয়ের জন্যও কিছু রাখতে হবে। কেরানির প্রভিডেন্ড ফান্ড তো বাপু রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নয়। সামান্য দশ-পনেরো হাজার টাকা—

লালু বুঝল। বাবাকে সে এখনও ভালোবাসে। যাদের সে ভালোবাসে তাদের বিপন্ন মুখ দেখতে তার ভালো লাগে না।

একদিন সন্ধে পেরিয়ে শানু এসে হাজির। চুপিচুপি ডেকে নিয়ে বলল—লালুদা, কী করি বলো তো?

—কেন, কী হয়েছে?

—শোনোনি নীলু সাফ হয়েছে।

—শুনেছি।

—নতুন ছেলেরা আমাদের আর চাইছে না। নীলুকে রড মেরে লাইনে ফেলে রেখে সরেছে। আমি পালিয়ে আছি।

লালু একটু ভাবল। বলল—শানু, আয় তোতে আমাতে একটা মনোহারি দোকান দিই।

শানু হাসল—তিন পয়সায় মাল কিনে পাঁচ পয়সায় বেচে দু-পয়সা লাভ? দূর, ওসব কি আমাদের পোষায়! অন্য কিছু বলো।

লালু কী বলবে ভেবে পেল না। কিন্তু সে দেখতে পাচ্ছিল, শানুর মাথার চুলে পাক ধরেছে, জুলপি বেশ সাদা। যখন দাঁড়ায় তখন একটু কুঁজো দেখায় ওকে। শানুর বয়স বেশি, লালুর চেয়ে অনেক বড়, লালু ওস্তাদ ছিল বলে তাকে দাদা বলে ডাকে।

লালু মাথা নেড়ে বলল—লাইন আমার নয়। কিছু টাকা পেলে আমি দোকান দেব।

শানু বলে—টাকা পাচ্ছ কোথায়?

এই প্রশ্নটার উত্তর সহজে দিতে পারে না লালু। ভাবে।

শানু বলে—তুমি এখনও ওস্তাদ আছ। চলো, কিছু ক্যাপিটাল জোগাড় করি। পেলে আমিও ব্যাবসাতে নামব, অর্ডার সাপ্লাইয়ের।

বলতে-বলতে শানু তার কোমর থেকে একটা রিভলভার বার করে দেখিয়ে একটু চোখ টিপল।

রিভলভার বিস্তর দেখেছে লালু, নেড়েছেও অনেক। তবু এখন দেখে তার বুক কেঁপে উঠল। বলল—রেখে দে। মিলুটা দেখলে ভয় পাবে।

চোখের পলকে যন্ত্রটা লুকিয়ে শানু বলল—একটা কি দুটো কেস করব তার বেশি না। বিশ্বাস কর, ক্যাপিটাল হলেই কেটে পড়ব।

একটা শ্বাস ফেলে লালু বলল—তাই চল তবে।

নাগরমল ওয়াগান ভাঙিয়েদের পুরোনো খদ্দের। তার গদিতে রাতবিরেতে মাল পৌঁছোয়। সকাল হতে-না-হতে বড় বাজারে তার পাইকারি আড়তে চলে আসে মাল। নগদ কারবার। স্টেশনের কাছাকাছি তাই তার একটা গদি আছে। সারাদিন ফাঁকা গদিতে একটা বাচ্চা ছেলে বসে মাছি তাড়ায়। ব্যাবসা শুরু হয় রাতে। অনেক রাত পর্যন্ত গদিতে

আলো জ্বলে, ভিতরে নাড়াচড়া করে লোকজন। বাইরে অন্ধকারে বাতি নিবিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে দু-তিনটে লরি। ওয়াগন ভাঙিয়েদের দলে আছে বলে নাগরমলের তেমন ভয়ডর নেই। বাঁধা রেট-এর ব্যাবসা, টাকাপয়সা নিয়েও বড় একটা গোলমাল হয় না। আটটা-সাড়ে আটটা নাগাদ গদিতে ক্যাশ পৌঁছে যায়। ক্যাশের জন্য দারোয়ানও থাকে না। এগারোটা-বারোটার মধ্যে টাকা হাত বদল হয়ে যায়।

লালু আর শানু এক রাত্রে হানা দিল গদিতে। শানুর হাতে রিভলভার, লালুর হাতে রড। দুজনেই মুখে কালি মেখেছে, রুমালে বেঁধেছে মুখ। এতকাল পরে এইসব হুজ্জত করতে লালুর খুব ভয় করছিল বলে একটা দিশি মদের পাঁইট ভেঙে খেয়েছে দুজন।

নাগরমল একদম তৈরি ছিল না। লরির ড্রাইভাররা এ সময়টা কাছে পিঠে থাকে না, লরি ভিড়িয়ে মাল টানতে খাল ধারে যায়। গদিতে নাগরমল নিজে আর দুজন নিরীহ কর্মচারী। এসময়ে ঝাঁপ ঠেলে দুজন ঢুকল। নাগরমল দৃশ্য দেখে হাঁ করে রইল।

রিভলভারটা নেড়ে শানু ক্যাশবাক্সটা দেখাল শুধু মুখে কিছু বলল না। নাগরমল হাঁ করে বাতাস গিলে ফেলল। তারপর লালুর বুকের সোনার চেনে বাঁধা বাঘনখটা দেখল সে। লালুর বিশাল চেহারাটার সঙ্গে বাঘনখটা মিলিয়ে দেখতেই কয়েক বছর আগেকার লালুকে মনে পড়ে গেল তার। বলল—আরে রাম-রাম লালুবাবু, কী খবর? এসব কী হচ্ছে? যাত্রাপার্টি নাকি।

লালুর বুকটা বড় চমকে ওঠে। চিনে ফেলেছে নাগরমল। এখন আর উপায় কী? হয় এখন তিনটে লাশ ফেলে যেতে হয় নইলে নাগরমলের সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত আসা যায়।

এক সময়ে নাগরমলকে লক্ষ টাকার মাল দিয়েছে লালু। সেটা নাগরমল ভোলেনি।

বলল—কিছু ক্যাশকড়ি দরকার থাকে বলুন না? আপনার সঙ্গে তো অনেক বিজনেস করেছি। এসব ছিনতাই কি ভালো লালুবাবু? আপনার নামে পাড়া কাঁপত এক সময়ে—

তিনটে লাশ ফেলার জন্য ট্রিগারে হাত রেখেছিল শানু। কিন্তু বয়সকালে নানা চিন্তা ভাবনা এসে যায়। বেপরোয়া হওয়া যায় না কিছুতেই। তারা দুজনেই ঘরপোড়া গরু।

লালু হতাশ হয়ে বলল—কিছু ছাড়ো নাগরমল, ব্যাবসা করব।

—কত?

—দু-হাজার করে দুজন।

—নাগরমল ভাবতে লাগল।

—ভেবো না। সময় নেই। শানু বলল।

নাগরমল শ্বাস ফেলে বলল—কাল দেব। বাড়িতে বসে পেয়ে যাবেন। আজকের ক্যাশ গোনা আছে।

—না দিলে কিন্তু—

নাগরমল হাসে—আপনার সঙ্গে বেইমানী? আমার প্রাণের ভয় নেই?

পরদিন নাগরমল নিজেই টাকাটা পৌঁছে দিল। বলল—কাল আমার ড্রাইভার, ক্লিনার আর কর্মচারীরা দেখেছে আপনাদের। তারাই বলেছে ওয়াগন ব্রেকারদের। খুব হইহই হচ্ছে ওদের মধ্যে। একটু দেখবেন দাদা—ওরা ভালো না। নীলুবাবু মরল, শানুবাবু পালাল; আমাকেও ব্যাবসা গুটোতে হবে।

লালু বুঝল। নাগরমল ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক হচ্ছে। আর যেন লালু হানা না দেয়।

লালু টাকা নিয়ে বলল—এটা ধার হিসেবে নিলাম নাগরমল। শোধ দেব ব্যাবসা করে।

নাগরমল মুখের একটা ভঙ্গি করে বলল—যা বোঝেন। আপনার সঙ্গে তো অনেক বিজনেস করেছি! আপনি ভালো লোক।

দু-হাজার নিয়ে শানু কাটল। বাকি দুই হাজারে দত্তদের গ্যারাজটা ভাড়া নিয়ে মনোহারি দোকান খুলল লালু। দোকানে তার লজেন্স, বিস্কুট, চানাচুর, বেলুন আর খেলনাই বেশি। পাড়ার বাচ্চারাই তার প্রধান খদ্দের।

লাভালাভের হিসেব রাখতে পারে না লালু। বেচে যায়। পাড়ার লোকে যাতায়াতের পথে লালুর দোকান দেখে থমকে দাঁড়ায়—দোকান দিলে নাকি হে?

এক গাল হাসে লালু—দিলাম। আমাকে একটু দেখবেন, কাকা।

বেবি ফুড কোথাও পাই না, এনে দেবে নাকি। ব্ল্যাকের দামই না হয় দেব।

—দেখব।

লালু এইরকমভাবে ব্যাবসা শুরু করল। মাল বেশি রাখে না, কিন্তু দুষ্প্রাপ্য জিনিস ঠিক এনে দেয়। ব্ল্যাকের দাম নেয়। খুব আস্তে-আস্তে সে টাকাপয়সার হিসাব বুঝতে শুরু করল। এখন বাচ্চারা দশ পয়সার চানাচুর চাইলে ঠোঙা ভরতি করে দেয় না। ছোট মাপের ঠোঙা বের করে। ফাউ দেয় না। পয়সা গোনে। মাসের শেষে স্টক মেলায়। পাড়ার মধ্যে পান-সিগারেটের একটা মাত্র দোকান, তার মালিক মদনা, কিন্তু মদনার ব্যবহার ভালো না, একটা মাত্র দোকান বলে দোকানটা চলে ভালো। দেখেশুনে লালু সিগারেটের

একটা কাউন্টার খুলল, মুদির দোকানের সওদা রাখল কিছু কিছু, অনেক কষ্টে বের করল বেবি ফুডের লাইসেন্স। ফলে দত্তদের গ্যারাজ ঘরে তার দোকানটা হুহু করে চলতে থাকে। মাসে শ-তিনেক টাকা আয়।

মিলু এখন ইস্কুলে যায়। বাবা রিটায়ার করে বসে আছেন। বাইরের দিকের বারান্দায় পাতা ইজিচেয়ারে বসে সারাদিন খবরের কাগজটা উলটেপালটে পড়েন। মায়ের চোখে ছানি আসছে। তবু মা সারাদিন ঘরের কাজ নিয়ে ব্যস্ত। লালু মাঝে-মাঝে বলে,—মা, তোমাকে একজন রান্নার লোক দেখে দিই।

মা হাসে, বলে—রান্নার জন্যে পাকা লোক চাই। স্বঘর, ভিন্ন গোত্রের একটা মেয়ে। এনে দে দেখি।

লালু বড় লজ্জা পায়। গলার বাঘনখটা মুখে পুরে ভাবে।

পাড়ার গিন্নিবান্নিরা আগে লালুর দোকানে আসত না। তারা সভয়ে বলত—বাব্বাঃ, লালু গুন্ডার দোকান? ওখানে মেয়েমানুষ যায় কখনও? কিন্তু ধীরে-ধীরে তাদের মত পালটায়। এখন পাড়ার বউ-ঝিরা আসে, আসে প্রৌঢ়ারা। লালু সবাইকে দিদি, মা, মাসি বলে ডেকে খুব খাতির করে।

সবচেয়ে বেশি ঝামেলা চাটুজ্জে খুড়িকে নিয়ে। লালুকে তার আফিং এনে দিতে হয়। আফিং নিতে এসে চাটুজ্জে খুড়ি পাড়া জানান দিয়ে চেঁচামেচি শুরু করে—বিয়ে করছিস না কেন? তোর বাপ-দাদা বিয়ে করেছে, সংসারসুদ্ধু লোক করছে, তুই করবি না কেন? ত্রিশ বছর বয়স হল না তোর! এরপর কি পাকা চুলে টোপর পরবি? বিয়ে না করলে বুড়ো বয়সে পাগলামিতে ধরে, জানিস না?

—বিয়ে করব খুড়িমা, সময় পাচ্ছি কোথায়? একটু স্থিতু হয়েনি।

—হ্যাঁ, ঢেউ সরে গেলে ডুব দিবি। বয়সকালটা মামদোবাজিতে কাটালি, এখন বুদ্ধিশুদ্ধি একটু হয়েছে—এইবারে কোথায় পাকাপাকি বন্দোবস্ত করে বসবি তা নয়, কেবল উড়বার মতলব। বউ না থাকলে মামদোদের খপ্পরে পড়বি কবে।

ভারী বিব্রত হয়ে সে তাড়াতাড়ি বলে—করব শিগগিরই করে ফেলব বিয়ে। আর ক'টা বছর—মিলুটার একটা বিয়ে দিয়েনি—

—ও মা, ও তো গুয়ের গ্যাংলা মেয়ে—ওর বিয়ে হতে-হতে তোর বয়স বসে থাকবে? পুলিপিঠের ন্যাজ বেরুবার আশায় বসে থাক। তবে—

কিন্তু সময় বাস্তবিক বসে থাকে না। মিলু স্কুল ডিঙিয়ে কলেজে ঢুকল, দেখতে-না-দেখতে ধাঁ করে বড় হয়ে গেল। চোখে চশমা, শাড়ি পরা মিলু দোকানের সামনে দিয়ে কলেজে যায়। বিক্রিবাটার ব্যস্ততার মধ্যেও চোখ তুলে লালু এক-এক সময়ে দেখে মিলুকে। লালুর বোনটা ফরসা আর ছিপছিপে হয়েছে। চেহারায় অমিল, কিন্তু বড় ভাব দুজনে। দাদার ওই বিশাল শরীরটা যে খাটাখাটনিতে রোগা হয়ে যাচ্ছে তা একমাত্র মিলুই লক্ষ্য করে। গম্ভীর মুখে শাসন করে দাদাকে।

লালু ভাবে—এইবার মিলুর একটা বিয়ে দিতে হবে।

দুই

পাঁচবছর পর।

এখন একা ঘরে লালুর বাস। শরীরটা তেমনি আছে তার। কেবল পেটে চর্বি জমেছে একটু, মাথার চুল কয়েকটা পেকেছে। ছত্রিশে পা দিল সে। চোখে চশমা। মিলুর বিয়ের পরপরই। প্রথমে বাবা গেল এক সকালে। সামনের বারান্দায় বসে ইজিচেয়ারে খবরের কাগজ মুখে ঘুমিয়ে পড়েছিল, আর উঠল না। দু-বছর পর মা। ফাঁকা ঘরে একা থাকে লালু। ভালো লাগে না। দিন কেটে যায়।

লালু এখন পাড়ার ভালো লোক। লোকে বাকিতে জিনিস পায়, প্রশংসা করে। দোকানটা বিলেত বাকি পড়ে ঝাঁঝরা হয়ে আসছে। লালুর তাতে কিছু যায় আসে না। সে একা। চলে যাবে।

বিকেলের ডাকে মিলুর একটা চিঠি পেল লালু। তাতে লেখা—একবার এসো। খুব জরুরি দরকার।

বুকটা কেঁপে উঠল। মিলু বিয়েটা ভালো করেনি। নিজের পছন্দমতো বর বেছেছিল। ছেলেটা চোখা, চালু। কিন্তু মিলুর সঙ্গে মানায় না। গোত্র কিংবা ঘর ঠিকই ছিল তবু ছেলেটা বড় বেশি চালু। বহু মেয়েকে বাঁদর নাচ নাচিয়েছে। বিলাসকে তাই পছন্দ হয় না লালুর। কিন্তু মিলুর বর বলে সমীহ করে চলে। সবসময়ে তার বুকের ভিতর খাঁখাঁ করে—মিলুকে নিয়ে থাকবে তো বিলাস? অন্য দিকে ঝুঁকবে না তো?

দোকানের সামনে একটা টুল পেতে শানু বসে থাকে আজকাল। পঞ্চাশ প্রায় ছুঁল সে। তার অর্ডার সাপ্লাইয়ের ব্যাবসাটা জমেনি। জোড়াতাড়া দিয়ে চালিয়ে নিচ্ছে। বয়সের জন্য

নয় চিন্তার ভারেই কুঁজো হয়ে গেছে একটু। বয়সের তুলনায় বেশ বুড়ো দেখায়। লালুর সঙ্গে বসে দুরন্ত যৌবনকালের নানা গল্প করে। মাঝে-মাঝে বলে—এসব ঝিমোনো ব্যাবসা কি আমাদের লাইন? চল লালুদা আর-একবার হুজ্জত বাধাই, লুটেপুটে আনি। শেষজীবনটা সুখে কাটিয়ে দিই চলো। আমাদের আমলে এমন সোনার দিন আর আসেনি।

লালু হাসে। চুপ করে থাকে।

চিঠি যেদিন পেল সেদিনও শানু বসে আছে বাইরের টুলে। চিঠিটা ভাঁজ করে বুকপকেটে রেখে লালু উঠল, শানুকে বলল—দোকানটা একটু দেখিস শানু, আমি ঘুরে আসছি।

—চললে কোথায়?

—মিলুটা চিঠি দিয়েছে, কী আবার গোলমাল ওদের।

শানু উদাস গলায় বলে—ওসব ছেড়ে দাও, লালুদা, যে যার মতো চলুক। সংসারের কোনও জ্ঞানই তো তোমার নেই।

—তা ঠিক। কিন্তু শানু সারা পৃথিবীতে ওই আমার একটা আপনজন।

শানু ভাবে। ভেবে বলে—সেটা সত্যি। ঠিক আছে। যাও।

বাইরের ঘরে উদাস শুকনো মুখে মিলু বসে আছে। তার হাঁটুর কাছে দু-বছরের বাচ্চা মেয়ে জুলেখা। লালুকে দেখে হরিণীর মতো সচকিত তাকাল মিলু।

—কী হয়েছে মিলু।

মিলু ঠোঁটে আঙুল ছুইয়ে সতর্ক করে দিল, ইঙ্গিতে শোওয়ার ঘর দেখিয়ে বলল—ও আছে।

হাত ধরে বারান্দায় নিয়ে এল লালুকে। পায়ে-পায়ে ঘুরছে ছোট্ট জুলেখা। তাকে কোলে নিয়ে গায়ের শিশুগন্ধ বুক ভরে নেয় লালু। তার শৈশব ফিরে আসতে থাকে।

—কী হয়েছে?

—সেই একই ব্যাপার। আমাকে ওর পছন্দ নয়। পরশু রাতে মেরেছে।

—মেরেছে?

—হ্যাঁ। এই প্রথম। কিন্তু এখন মারটা চলবে। হাত এসে গেছে।

রাগে বোবা হয়ে গেল লালু, কষ্টে বলল—মিলু তোকে কেউ কখনও মারেনি।

মিলুর ঠোঁট কাঁপতে থাকে। চোখ ভরে জলে আসে।

—খুব লেগেছিল?

মিলু মাথা নাড়ে। লেগেছিল।

—ও কী চায়?

—কী জানি। বলে মিলু কাঁদতে থাকে।

—ও, তোকে চায় না।

—না।

—তবে আমার কাছে চল মিলু। বেশ থাকব ভাইবোনে।

—না। মাথা নাড়ে মিলু।

—তবে কী করবি?

—সেজন্যই তো তোমাকে ডেকেছি। কী করব বলো?

লালু, একটা শ্বাস ছাড়ে। বলে—ওর সঙ্গে একটু কথা বলি।

জুলেখাকে নামিয়ে দিয়ে লালু ঘরে আসে।

বিলাস বিছানায় শুয়ে আছে। ভারী ক্লান্ত আর রোগা দেখাচ্ছে তাকে। বিমর্ষ মুখ।

—বিলাস।

—উঁ!

—কী হয়েছে?

—বিলাস চোখে চায়। আস্তে করে বলে—ওকে জিজ্ঞাসা করুন।

—করেছি। তুমি ওকে মেরেছ। কেন?

বিলাস ঠোঁট উলটে বলে—ইচ্ছে।

—কেন মারবে? ওকে কেউ কখনও মারেনি।

—আমি মেরেছি। আমার ইচ্ছে। কার বাবার কী?

লালু ধমকায়। সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপে।

—তার মানে?

বিলাস উঠে বসে, একটা সিগারেট ধরায়। তারপর আস্তে-আস্তে বলে, শোধ নেবেন? নিন না! কিন্তু বলে রাখছি, ও আবার মার খাবে।

—না খাবে না।

—খাবে। কোনও শুয়োরের বাচ্চা ঠেকাতে পারবে না—

পলকে সব ভুল হয়ে যায়। ছত্রিশ বছর বয়স, চোখের চশমা—সব ভুল হয়ে যায়। পনেরো-ষোলো বছর আগেকার এক জ্যোৎস্নায় আলোকিত নির্জন চাতাল মনে পড়ে কেবল। আর শরীরের মধ্যে ঝড় ওঠে বহুকাল বাদে।

প্রকাণ্ড হাতখানা বাড়িয়ে বিলাসকে শূন্যে তুলে নেয় লালু। অন্য হাত আঘাতের জন্য উদ্যত।

মিলু ছুটে আসে, চিৎকার করে বলে—দাদা, মেরো না। মরে যাবে।

হকচকিয়ে যায় লালু। ঠিক তো! এইভাবে একদিন ননী গিয়েছিল তার হাতে। তারপরও পটা ওস্তাদের কাছে শেখা মার। কাজটা ঠিক হবে না। শিশুর মতো দু-হাতে ধরে বিলাসকে আবার মেঝের ওপর ছেড়ে দেয় লালু।

কিন্তু বিলাস ছাড়ে না। পয়সা জমানোর একটা মাটির ঘট রাখা আছে তাকে। বিলাস প্রথমে পাগলের মতো সেইটে ছুড়ে মারে।

ভারী ঘটটা মাথায় লেগে চৌচির হয়ে ভেঙে যায়। লালুর সমস্ত শরীর বেয়ে পয়সার ধারা নেমে ঘরময় ছড়ানো থাকে। ক্ষীণ একটা রক্তের ধারা সেই সঙ্গে। বিলাস ছুড়ে মারে জুলেখার খেলনা, কালির দোয়াত, পেপারওয়েট। তাতে খুশি হয় না। দু-হাতে ঘুষি মারে লালুর মুখে, পেটে মারে লাথি। বিলাসের বাবার একটা ভারী বাঁধানো ফটোগ্রাফ ছিল দেওয়ালে। রাগে পাগল হয়ে সেইটে টেনে আনে সে। কানা দিয়ে উপর্যুপরি মারতে থাকে মাথায় মুখে। কাচ ভেঙে ঢুকে যায় লালুর চামড়ায়।

লালু ধীরে-ধীরে মেঝেতে বসে। তারপর দেওয়ালে হেলান দিয়ে চোখ বোজে। একটাও মার ঠেকাবার চেষ্টা করে না। জুলেখা চিৎকার করে কাঁদতে থাকে, মিলু চিৎকার করে দুজনের মাঝখানে এসে পড়ে, বিলাস তাকে হাতের ঝাপটায় সরিয়ে দিয়ে পাগলের মতো আবার আক্রমণ করে লালুকে।

তারপর এক সময়ে সে থামে। চারদিকে চেয়ে দেখে। তার চোখে আতঙ্ক দেখা যায়। সে লালুর রক্তাভ বীভৎস নিস্পন্দ দেহখানা দেখে। হঠাৎ সংবিৎ পেয়ে কেঁপে ওঠে। দৌড়ে আলনা থেকে প্যান্ট টেনে নিয়ে পরে, গায়ে শার্ট চাপায়, খুব তাড়াতাড়ি ঘর ছেড়ে, বেরিয়ে পড়ে সে।

সদর দরজার কাছে গিয়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে ভিতরের ঘরের দিকে চেয়ে বলে—মিলু, মিলু আমাকে ক্ষমা কোরো—লক্ষ্মী সোনা আমার—

দাদাকে দু-হাতে জাপটে বসেছিল মিলু। পাথর হয়ে। তবু বিলাসের কথা তার কানে গেল। হরিণীর মতো সচকিত হয়ে উঠল সে। বিলাস—বিলাস কি তবে ভালোবাসে তাকে? এখনও? চকিতে বিদ্যুৎস্পর্শে উঠে দাঁড়ায় সে। ছুটে আসে দরজায়।

বিলাস সিঁড়ি দিয়ে কত দ্রুত নেমে যাচ্ছে। পালাচ্ছে।

শোনো, শোনো। ডাকে মিলু।

বিলাস তার ভয়ার্ত সুন্দর মুখখানা ঘুরিয়ে থমকে দাঁড়ায়।

দরজার চৌকাঠে হাত রেখে মিলু কাঁপতে থাকে, কাঁদে অস্ফুট গলায় বলে—তুমি কি এখনও আমাকে ভালোবাসো?

বিলাস দু-ধাপ সিঁড়ি উঠে আসে বলে,—বাসি মিলু, চিরকাল বেসেছি। তুমি বোঝো না?

মিলু আস্তে করে বলে—তোমায় ভয় নেই, দাদা মরেনি। তুমি তাড়াতাড়ি ফিরো।

বিলাস অবিশ্বাসের চোখে খানিকক্ষণ চেয়ে থাকে। তারপর মাথা নাড়ে। ধীরে-ধীরে সিঁড়ি ভেঙে নেমে যায়।

ভাঙা কাচ আকীর্ণ মেঝের ওপর শিশু জুলেখা দাঁড়িয়ে। তার চোখে জল, সে কাঁদছে। এক-পা এক-পা করে এগোচ্ছে লালুর দিকে।

ভাঙা, রক্তাক্ত মুখ তুলে লালু জুলেখাকে দেখল।

—আঃ জুলেখা, চারদিকে কাচ মা, তোমার পা কেটে যাবে।

সে ফিসফিস করে বলল।

জুলেখা তবু ভাঙা কাচ মাড়িয়ে এক-পা এক-পা করে আসছে।

চোখের রক্ত মুছে নেয় লালু। তারপর দু-হাত বাড়িয়ে কোলে নেয় জুলেখাকে। শিশুগন্ধে তার বুক ভরে যায়।

—আঃ জুলেখা আমার তেমন লাগেনি মা। আমি ঘোড়া হই, তুমি আমার পিঠে চাপো।

লালু শিশু হয়ে থাকে। লালু শিশু হয়ে যায়। ভাঙা মুখ, রক্তাক্ত শরীর, মাথার ভিতরে এক আংশিক অন্ধকার—তবু নিজেকে নিরভিমান লাগে তার। রাগদ্বেষহীন প্রকাণ্ড শিশুর মতো সে জুলেখাকে ভোলাতে থাকে। জুলেখাকে পিঠে নিয়ে আকীর্ণ কাচ খণ্ড পয়সা রক্তের ফোঁটার ওপর সে হামা দিয়ে ফেরে সারা ঘর। মুখে তার অনাবিল হাসি।

দরজায় দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা হাঁ করে দেখে মিলু।

লুলু

লুলুই হে.   সবকিছুর মূলে।

লুলু আসলে কে বা তার গুরুত্বই বা কী তা আমার কাছে অস্পষ্ট। তবে যতবারই দেশে কোনও-না-কোনও ঘটনা ঘটে তখনই আমাকে লুলুর কাছে আসতে হয়, তার সাক্ষাৎকার নিতে। এ যাবৎ তার কত যে সাক্ষাৎকার নিয়েছি তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু তবু লুলু আমাকে আদপেই মনে রাখেনি। দেখা হলে সম্পূর্ণ নতুন করে পরিচয় দিতে হয় এবং পুরোনো পরিচয়ের কোনও স্মৃতির ঝলকানিও লুলুর ভাবসাবে কখনও ফুটে ওঠে না। এটাই যাকে বলে আপশোশ কি বাত।

১৯৪৭ সালের ষোলোই আগস্ট আমি লুলুর সাক্ষাৎকার নিতে আসি, মনে আছে। তখন লুলুর চেম্বার শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ছিল না, তবে সে তখনও এখনকার মতোই ব্যস্ত মানুষ ছিল। দেখা করার জন্য আমাকে ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করতে হয়। ঘরে ঢুকে কিন্তু লুলুকে একটুও ব্যস্ত দেখিনি। টেবিলের ওপর পা তুলে সে বসেছিল। চেয়ারটা পিছন দিকে হেলে দুটো পায়ার ওপর বিপজ্জনকভাবে ভারসাম্য রক্ষা করছে কোনওক্রমে। লুলু মৃদু হেসে বলল—বি কুইক।

—এই স্বাধীনতা, এই চূড়ান্ত জয়, এই দেশ বিভাগ এবং এই...এই...আবেগে আমার গলা বসে গেল।

লুলু মাথা নেড়ে বলল—হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই স্বাধীনতা, এই দেশ বিভাগ আর যা কিছু সবই খুব চমৎকার। অতি চমৎকার। এই জয়...তবে আমার একটা ভয় হচ্ছে যে, যেসব ইংরেজ এদেশে মারা গেছে তাদের ভূতগুলো চলে যাচ্ছে না। সেগুলোকে যদি না তাড়ানো যায় তবে পাকে প্রকারে ইংরেজও থাকছে। এবং ইংরেজিয়ানাও। এখন আমাদের উচিত হবে ভারতের অতীতের ভূতদের ইংরেজ ভূতের বিরুদ্ধে লাগানো।

লুলু যে সামান্য মাতাল অবস্থায় ছিল তা তখন আমি টের পাই।

গান্ধি হত্যার পর আমি লুলুর কাছে গিয়ে আবার ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করার পর চেম্বারে ঢুকে দেখি লুলু অবিকল সেইভাবেই বসে আছে।

বলি—এই বিশ্বাসঘাতকতা, এই হত্যা...

লুলু মাথা নেড়ে বলল—জঘন্য। আসলে একজনকে খুন করার মধ্যে কী যে আছে আমার মাথায় আসে না। লাভ কী? আমার তো ভাবতেই জ্বর আসে? খুনের পর ধরা পড়তে হবে, দিনের- পর-দিন স্নায়ু-ছেঁড়া মামলা চলবে। তারপর ফাঁসি...ওঃ। তার চেয়ে ভালো ব্যবস্থা আছে। ধরুন, কাউকে মারার ইচ্ছে হলে আমি তার একটা মূর্তি তৈরি করে সেটার ওপর গুলি চালালাম, ইচ্ছে মতো তারপর লোকটাকে চিঠি লিখে জানিয়ে দিলাম যে, অমুক দিন অমুক সময়ে তোমাকে আমি মেরে ফেলেছি। ব্যস, লোকটাও তা জানার পর একদম মৃতের মতো হয়ে যাবে। অর্থাৎ সব কাজকর্ম অ্যাকটিভিটি বন্ধ করে দেবে। হত্যাটা হবে প্রতীকী এবং তাতে হিংস্রতাও থাকবে না। চিন যুদ্ধের সময় ফের পত্রিকার তরফ থেকে লুলুর কাছে যাই।

—এই যুদ্ধ সম্পর্কে...

লুলু অবিকল একইভাবে চেয়ারে দোল খেতে-খেতে বলে—হোপলেস। যুদ্ধ টুদ্ধের কোনও মানেই হয় না। বিশেষ করে চিনেদের সঙ্গে। আমার মনে হয়, এসব ডিসপিউট মেটানোর জন্য অন্য ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।

সাগ্রহে বলি—কীরকম?

—ধরুন, চিনের সঙ্গে ভারতের একটা হকি ম্যাচের ব্যবস্থা হল। যদি ভারত জেতে তাহলে তার কথাই থাকবে। হকিতে আপত্তি থাকলে চিন পিংপংয়েও ভারতকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে। যাই হোক, আমার কথা হচ্ছে, স্পোর্টসের যুদ্ধটা সেরে নেওয়া ভালো। সিরিয়াসলি মারপিটটা নিছক ছেলেমানুষি। আমি জানি চিন বলছে যে, তিব্বত তাদের। আমার প্রথম বিয়ের আগে আমার বউও বলত সে নাকি আমার, একান্তই আমার। তারপর আরও চারবার বিয়ে করতে হয়েছে আমাকে এবং এখন আবার আমি দারাহীন, কিন্তু প্রথম বউয়ের মতো সব বউই আমাকে ওই একই কথা বলছে, এবং ওই একই কথা হয়তো এখনও তারা তাদের নতুন নতুন প্রেমিক বা স্বামীর কাছে বলছে। এসবের কোনও মানে নেই। দুনিয়াতে কেউ বা কিছু কারও বা কিছুর নয়।

সেদিনই আমি লুলুকে বলি—আপনার চেম্বারটা এয়ারকন্ডিশনড করান না কেন? আর ওই বিপজ্জনক চেয়ারের বদলে আপনি তো অনায়াসে একটা রিভলভিং চেয়ারের ব্যবস্থা

করতে পারেন।

এরপরও পাকিস্তান যুদ্ধ, ভিয়েতনাম, কংগ্রেসে ভাগ, নকশাল আন্দোলন, যুক্তফ্রন্ট ইত্যাদি বিষয়ে আমাকে লুলুর লাক্ষাৎকার নিতে হয়। কিন্তু সেগুলোর কথা থাক। ইমারজেন্সির পর যখন আমি লুলুর কাছে যাই তার বেশ কিছুদিন আগে তার চেম্বার শীতাতপনিয়ন্ত্রিত হয়েছে এবং সে একটা রিভলভিং চেয়ারে বসে দোল খাচ্ছে। একটু মাতাল।

বললাম—ইমারজেন্সি সম্পর্কে কিছু বলবেন?

লুলু টেবিলে মৃদু চাপড় দিয়ে বলে—আলবাত!

—কী?

—দেয়ার ইজ অ্যান ইমারজেন্সি। খুবই জরুরি ব্যাপার। খুবই আর্জেন্ট। অনেকক্ষণ ধরেই এটা আমি ফিল করেছি। চলুন যাওয়া যাক।

—কোথায়?

—জরুরি কাজে। খুবই জরুরি।

এই বলে লুলু উঠে পড়ে। আমার হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে নামিয়ে আনে রাস্তায়, গাড়িতে ওঠায় এবং একটা মদের দোকানে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে বলে—এ ব্যাপারটা খুবই জরুরি।

—কিন্তু আমি জরুরি অবস্থা জারি প্রসঙ্গে...

লুলু আধো চোখ আমাকে দেখল। খুবই তাচ্ছিল্যের দৃষ্টি। দুপেগ করে হুইস্কির হুকুম দিয়ে আমার দিকে চেয়ে বলল—আপনি নতুন জার্নালিসম করছেন, তাই না?

—না। আমি দীর্ঘকাল ধরে...ইন ফ্যাক্ট আমি আপনার ইন্টারভিউই তো বহুবার...

লুলু মাথা চেপে ধরে একটা কাতর শব্দ করল। তারপর বলল—তাহলে আপনি একটি গর্দভ রিপোর্টার।

—কেন? আমি ফুঁসে উঠে বলি। পরমুহূর্তেই আমার মনে পড়ে যায় যে, লুলু অত্যন্ত ইমপর্টান্ট লোক। দেশের অন্যতম প্রধান নায়ক। সব কিছুর মূলেই লুলু। তাই আমি আবার বিনীত হয়ে বলি—হতেও পারে।

লুলু বলে—অত্যন্ত জরুরি।

—কী?

—এই জরুরি অবস্থা। অন্তত সাতাশ বছর আগে এটা জারি করা উচিত ছিল।

কেন?

লুলু তার হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিয়ে বলে—ফর ওয়ান থিং। গত সপ্তাহে আমার দিল্লি যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু শেষ মুহূর্তে যাওয়া বাতিল করতে হয়। আমি ট্রেনের রিজার্ভেশন ক্যানসেল করার জন্য রেল অফিসে ফোন করি। ফোনের রিং হতেই ওপাশে কে যেন রিসিভার তুলে বলল নমস্কার। আমি রং নাম্বার ভেবে ফোন ছেড়ে দিই। কিন্তু তারপর আরও তিন-তিনবার সেই আশ্চর্য ঘটনা। রেল অফিস টেলিফোনের জবাব দিচ্ছে, এবং জবাব দেওয়ার আগে নমস্কারও জানাচ্ছে। জাস্ট থিংক অফ ইট। গত সাতাশ বছর ধরে আমি রেল অফিসে ফোন করে আসছি, কখনও এরকম ঘটনা ঘটেনি।

আমি খুব মন দিয়ে নোটবইতে কথাগুলি লিখছিলাম। লুলু নোটবইটা সরিয়ে নিয়ে বলল—ওহে ইডিয়ট রিপোর্টার, ইমারজেন্সির মর্ম কবে বুঝবে? তোমার হুইস্কির গ্লাসে এক্ষুনি একটা দারুণ ইমারজেন্সি দেখা যাচ্ছে। বরফ গলে গরম হয়ে যাচ্ছে হুইস্কি। আগে ওটা খাও, তারপর লিখবে।

লুলু খুবই ইম্পর্টট্যান্ট। তার অবাধ্যতা চলে না। হুইস্কি খেতে-খেতে আমি বলি—কিন্তু রেল অফিস থেকে টেলিফোনে নমস্কার জানানোটাই তো বড় কথা নয় মিস্টার লুলু। এতে দরিদ্র ভারতবাসীর কী লাভ হবে। ভারতবর্ষের বহু কোটি লোক টেলিফোন জীবনে একবারও ব্যবহার করেনি বা তারা রেল অফিসেও কোনওদিন টেলিফোন করবে না।

লুলু গম্ভীরভাবে বলে—সরকারের বর্তমান নীতিই হচ্ছে ভারতবর্ষের প্রত্যন্ত গ্রামে গঞ্জে জনসাধারণের হাতের কাছে, নাগালের মধ্যে টেলিফোন পৌঁছে দেওয়া। প্রত্যেক টেলিফোনের সঙ্গে নোটিশ দেওয়া থাকবে : নমস্কারের জন্য রেল বা সরকারি অফিসে টেলিফোন করুন।

আমি উদ্বিগ্ন হয়ে বলি—কিন্তু টেলিফোন করার জন্য তো পয়সাও দিতে হবে মিস্টার লুলু।

—তা হবে। তবে নমস্কারটা ফ্রি পাওয়া যাবে।

কোলের ওপর নোটবই রেখে লুলুর চোখকে ফাঁকি দিকে মন্তব্যটা লিখে নিয়ে আমি বলি—নাগরিক অধিকার সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন উঠেছে এবং বাক স্বাধীনতা।

লুলু আরও দু-পেগ টেনে নিয়ে দু-পেগের প্রথম কিস্তিতে চুমুক দিয়ে বলে—মানবিক অধিকার ভারী সুন্দর কথা, কিন্তু মানে হয় না। অন্তত সতেরোটা ডিকশনারি খুঁজেও অর্থ বের করতে পারিনি।

আমি লুলুর ভুল শুধরে বলি—মানবিক নয়, নাগরিক।

—ওঃ! বলে লুলু হেসে বলে—তাই বলুন। নাগরিক অধিকার! আমি মানবিক ভেবে এমন ঘাবড়ে গিয়েছিলাম! আসলে মানুষ এবং নাগরিক কথা দুটোই আলাদা, অর্থও দুরকম। নাগরিক মানেই কিন্তু মানুষ নয়। এ কথাটা মনে রাখলে আর কোনও গোলমাল থাকে না।

আমি একটু গোলমাল পড়ে গিয়ে জিগ্যেস করি—নাগরিক এবং মানুষ কি আলাদা শ্রেণি?

—আলবাত! লুলু প্রায় চেঁচিয়ে বলে ওঠে। চোঁ করে হুইস্কি টেনে নিয়ে আবার খুব নীচু গলায় বলে—আসলে কোনওটারই মানে হয় না।

আমি কিন্তু-কিন্তু করে বলি—কিন্তু...

—মূর্খ সাংবাদিক, আপনি অকারণ সময় নষ্ট করছেন। চারদিকে এখন জরুরি অবস্থা। আমাদের প্রয়োজনগুলিও অত্যন্ত জরুরি। সময় নেই। আয়ু বয়ে যাচ্ছে, একদম সময় নেই। দেরি করলে যৌবন ফিরে যাবে, বসন্ত শেষ হবে। উঠে পড়ুন।

লুলুর গুরুত্ব অপরিসীম। তাই আমি তার আদেশে উঠে পড়লাম।

গাড়ি করে লুলু আমাকে এক বিশাল ম্যানসনে নিয়ে গেল। এত বড় একটা বাড়ি কলকাতার মহার্ঘ প্রায় বিঘে দুই জমিতে কী করে জমিয়ে বসেছে তা ভাববার কথা।

স্বয়ংক্রিয় লিফটে ওপরে উঠতে-উঠতে লুলু আমার দিকে চেয়ে মহা বদমাশের মতো মুচকি হেসে বলে—এ-বাড়িতে আমার প্রায় আধ ডজন প্রেমিকা থাকে।

বলে লুলু আমার মুখের ভাব লক্ষ করতে লাগল। আমি যতদূর সম্ভব মুখখানা ভাবলেশহীন রাখার চেষ্টা করতে-করতে বললাম—থাকতেই পারে। খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার।

লুলু হাসল না। খুব গম্ভীর মুখে ভ্রূকুটি করে বলল—থাকতেই পারে কেন? আর স্বাভাবিক ব্যাপারই বা কী করে হল?

মুশকিলে পড়ে বললাম—বিজ্ঞান বলে পুরুষরা বাই নেচার বহুগামী।

লুলু—তাহলে আইন করে একাধিক বিয়ে বন্ধ করা হল কেন? যদি জানোই যে, পুরুষরা বহুগামী তবে তাদের সেই গমনপথে গর্ত খোঁড়ার মানে কী? পচা রিপোর্টার, অনেক লোক যদি বউ থাকা সত্ত্বেও আর পাঁচটা মেয়ের সঙ্গে শোয় তবে তোমরা তেমন গা করো না। বোধহয় তোমরা নিজেরাও শোও। কিন্তু একজন ভদ্রলোক যদি দ্বিতীয়বার বিয়ে করে তবে সেটা তোমাদের কাছে খবর হয়ে দাঁড়ায়, বুদ্ধু সাংবাদিক, তুমি কি জানো তোমরা কতটা ইররাশনাল?

আমি একটু রেগে গিয়ে বলি, কোনও মেয়ের সঙ্গে শুই না। ইন ফ্যাক্ট আমি এখনও সুযোগই পাইনি। আমার আছে সোশ্যাল স্ট্যান্ডিং, সামাজিক সম্মানবোধ এবং নিজের স্ত্রী সম্পর্কে ব্যক্তিগত ভয়—সেই কারণে ইচ্ছে থাকলেও আমি চরিত্রহীন হতে পারছি না।

লুলু খুবই স্নেহের সঙ্গে আমার দিকে চেয়ে 'তুমি' থেকে আবার আপনিতে ফিরে গিয়ে বলে—রিপোর্টার মহোদয়, এবার বুঝতে পারছেন তো আপনার মতো একটি ছাগলের পক্ষে নাগরিক স্বাধীনতা কত অর্থহীন একটি শব্দ! এমনকী দেশ জুড়ে যেসব নাগরিক রয়েছে তারাও অধিকাংশই মানুষ নয়, আপনারই মতো ছাগল! নিজের স্ত্রী ছাড়া অন্য মহিলার সঙ্গে শোওয়ার ইচ্ছে ও স্বাধীনতাকে তারা স্বেচ্ছায় বিসর্জন দিয়েছেন। সুতরাং নাগরিক স্বাধীনতা নিয়ে আপনারা কী করবেন?

কত তলায় লিফট থেমেছে তা আমি লক্ষ করিনি। দোর খুলে লুলু বেরোল। সঙ্গে আমিও। খুব ঝকঝকে করিডোর দিয়ে লুলুর পিছু-পিছু হাঁটতে-হাঁটতে আমি বললাম কিন্তু বাকস্বাধীনতা? মিস্টার লুলু, স্বাধীনতার ব্যাপারটা নিয়েও কি আপনি ভাবছেন না?

লুলু সে-কথার জবাব না দিয়ে পিতলের পাতে নম্বর লেখা একটা দরজায় কলিংবেল টিপল। দরজা খুলে বছর পঁয়ত্রিশের এক অসাধারণ সুন্দরী দরজার ফ্রেমে দাঁড়িয়ে লুলুকে দেখতে-দেখতে তার মুখ ভাবালু এবং মোহাচ্ছন্ন হয়ে গেল। চোখ আলোয় ভরে উঠল, ঠোঁট টসটস করতে লাগল, সমস্ত শরীর প্রত্যাশায় ভারসাম্য হারিয়ে টলোমলো করছিল। লুলু দু-হাতে তাকে শরীরের মধ্যে টেনে নেয়, চুম্বন করে এবং বলে—

যা বলে তা অবশ্য লেখা যায় না। চূড়ান্ত ভালোবাসার অসভ্যতম কথা সব। আমি চোখ নামিয়ে নিই এবং না শোনার ভান করতে থাকি।

লুলু সশব্দে তার দশম চুম্বন শেষ করে আমার দিকে ঘাড় ঘুড়িয়ে চোখ টিপে বলে—গেঁতো রিপোর্টার, নোট নিচ্ছ না যে বড়? আমি যা বলছি এবং যা করছি এসব কি ইম্পর্টান্ট নয়? না কি তুমি আমাকে ঠিক গুরুত্ব দিতে চাইছ না?

আমি অনিচ্ছুক আঙুলে ডটপেন বাগিয়ে ধরি কিন্তু লিখতে হাত সরে না।

লুলু বলল—স্কাউন্ড্রেল ছোটলোক ইডিয়ট!

লুলুর গুরুত্বের কথা ভেবে আমি চুপ করে থাকি। এমনকী একটু হাসবারও চেষ্টা করি।

লুলু ঘরে ঢোকে এবং ইশারায় আমাকেও ঢুকতে বলে। আমি ঘরে ঢুকলে লুলু দরজা বন্ধ করে দিয়ে আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলে—এবার বলো। আমি অভয় দিচ্ছি, তোমার কোনও ক্ষতি করব না।

আমি মুশকিলে পড়ে বলি—কী বলব?

লুলু অবাক হয়ে বলে—তোমার কিছু বলতে ইচ্ছে করছে না?

—না তো!

ধূর্ত! খল! মিথ্যেবাদী! আমাকে তোমার কিছুই বলতে ইচ্ছে করছে না?

ভয় পেয়ে বলি—না। কিছুই না।

লুলু এবার হাহা করে হেসে বলে—তোমার সামনেই একটা নষ্ট মেয়েকে চুমু খেলাম; অসভ্য কথা বললাম, তোমাকে না হোক গালাগাল দিলাম, অথচ তোমার কোনও রি-অ্যাকশন হচ্ছে না? এটা কি বিশ্বাসযোগ্য মহাত্মা রিপোর্টার? বরং তোমার এখন আমাকে খিস্তি করতে ইচ্ছে করছে, লাথি মারতে ইচ্ছে করছে। বলো, করছে না? কিন্তু হায়, তোমার সেই বাকস্বাধীনতা তুমি কখনওই কাজে লাগবে না। শোনো কাপুরুষ, আমার যদি কখনও কাউকে শুয়োরের বাচ্চা বা বেজন্মা বলতে ইচ্ছে করে তবে আমি বলি, তুমি কেন পারো না বলতে?

আমি গম্ভীর হয়ে বলি—ভদ্রতাবোধে বাধে।

লুলু হাহা করে হেসে ওঠে বলে—তাহলে বাক স্বাধীনতা দিয়ে তুমি কী করবে ভিতু সাংবাদিক? যখন যা মনে আসবে তা যদি বলে ফেলতে পারো তবে তোমার বাক স্বাধীনতা আছে, যদি না পারো তো নেই।

বিরক্ত হয়ে আমি বললাম—গালাগাল দেওয়ার অধিকারই তো একমাত্র বাকস্বাধীনতা নয় মিস্টার লুলু। পলিটিক্যাল ইডিওলজি নিয়ে যে মতবিরোধ, সরকারের কাজকর্ম সম্পর্কে যে বিরুদ্ধ সমালোচনা তাই যদি না করা যায়...

লুলু আমাকে একদম পাত্তা না দিয়ে তার ভাঁটানো যৌবনের সুন্দরী প্রেমিকার দিকে এক পা এগোল। ঘরের মাঝখান থেকে তার প্রেমিকাও লিত চরণে এগিয়ে আসে এক

পা। তাদের দুজনেরই মুখচোখে আনন্দের মোহ, তীব্র কাম ও বিহ্বলতা তবু সে অবস্থাতেও লুলু আমার দিকে জ্বলন্ত একটা দৃষ্টিক্ষেপ করে চাপা স্বরে বলে—নোট নাও বুদ্ধু, সব কিছু নোট করে নাও। প্রত্যেকটা স্টেপ লক্ষ করো। সঙ্গম শেষে আমি আমার প্রেমিকাকে খুন করব। খুব লক্ষ কোরো ব্যাপারটা...

আমি চোখ বুজে ফেলি এবং কানে আঙুল দিই। এবং ওই অবস্থাতেই সোফায় বসে আমি ঘুমিয়েও পড়ি। কিছুক্ষণ বাদে লুলুই আমাকে ঝাঁকুনি দিয়ে জাগায়। আমি চোখ মেলতেই লুলু বিরক্তির গলায় বলে—ড্যাম ইনএফিসিয়েন্ট!

লুলুর পদমর্যাদার কথা মনে রেখে আমি বলি—আজ্ঞে।

একটা আলমারির সামনে দাঁড়িয়ে কাচে ছায়া দেখে টাইয়ের নট ঠিক করতে-করতে লুলু বলে—রিপোর্টার, লাভ-হেট রিলেশন বলে কী একটা কথা আজকাল চালু হয়েছে না? অর্থাৎ আমরা যখন আমাদের প্রিয় বা প্রেমাস্পদকে একই সঙ্গে ভালোবাসি এবং ঘৃণা করি? আমরাও ঠিক সেই অবস্থা। আমি আমার চোদ্দোজন প্রেমিকাকে কেন ঘৃণা করি এবং ভালোবাসি বলো তো? এর আগে আমি আমার চোদ্দোজন প্রেমিকাকে খুন করেছি।

বাস্তবিকই লুলুর প্রেমিকাকে ঘরে দেখা যাচ্ছিল না। উপরন্তু সেন্টার টেবিলের ওপর লুলুর সাইলেন্সার লাগানো রিভলভার পড়ে আছে। ঘরের বাতাসে বারুদের কটু গন্ধ। আমি বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো চমকে সোজা হয়ে বসি এবং বলি—মিস্টার লুলু, আপনি তাহলে সত্যিই আপনার প্রেমিকাকে খুন করেছেন? সর্বনাশ।

লুলু অবাক হয়ে বলে—খুন করার কথাই ছিল যে!

উত্তেজনায় আমার শরীর কাঁপতে থাকে, আমি চিৎকার করে বলি—বাড়াবাড়ির একটা সীমা আছে মিস্টার লুলু। আমি এক্ষুনি পুলিশের কাছে যাচ্ছি। আপনি যত বড় মাতব্বরই হোন, এর জন্য আমি আপনাকে ফাঁসিতে ঝোলাবে।

মহান লুলু বোধহয় এই প্রথম একটু ভয় পেল। তার চোখে-মুখে দ্বিধা ফুটে উঠেছে। একটু চাপা ধমকের স্বরে সে বলে—চুপ করো মূর্খ! আশেপাশে কেউ শুনে ফেলবে।

আমি চেঁচিয়েই বলি—কিন্তু এটা যে খুন মিস্টার লুলু! আমি এটা চেপে রাখতে পারি না।

লুলু ব্যথিত মুখে চেয়ে বলে—বোকা, ব্যাপারটা ভালো করে ভেবে দ্যাখো। পুলিশের কাছে যাওয়ার চেয়ে অনেক বেশি ভালো কাজ হবে না যাওয়া। এ ব্যাপারটা চেপে রাখার জন্য তোমাকে আমি অনেক টাকা দেব। অনেক টাকা, যত টাকা—তোমার দশ বছরের

বেতনের চেয়েও বেশি। উপরন্তু পুলিশের কাছে গেলে মামলা-মোকদ্দমা এবং তজ্জনিত নানা ঝামেলায় তোমাকে জড়িয়ে পড়তে হবে। আর-একটা কথা—বলে লুলু তার রিভলভারটা তুলে নিয়ে আমার দিকে তাক করে বলে—ইচ্ছে করলে টাকার বদলে অন্য উপায়েও আমি তোমার মুখ বন্ধ করে দিতে পারি।

লুলু হাসল। আমার শরীরে ঘাম দিল। শ্বাস ছেড়ে আমি বললাম—কত টাকা?

—দু-লাখ।

লুলু রিভলভার পকেটে পুরে নিয়ে আলমারি খুলল। কয়েকটা নোটের বান্ডিল আমার দিকে ছুড়ে দিয়ে বলল—এই টাকা দিয়ে একদিন আমি জিনিকে কিনে নিয়েছিলাম। এই টাকার হুকুমেই জিনি তার অন্য সব প্রেমিককে ভাগিয়ে দিয়েছিল। আজ সেই টাকায় তোমাকে কিনছি রিপোর্টার। কে জানে এই টাকাতেই কখনও আর-একজনকে কিনতে হবে কি না।

আমি টাকার বান্ডিলগুলো ছুঁয়ে থেকে একটু শিউরে উঠি। বলি—আপনি আমাকে ওয়ার্নিং দিচ্ছেন না তো মিস্টার লুলু?

লুলু গম্ভীর হয়ে বলে—না। কিন্তু এ ধরনের রোজগারে কিছু রিস্ক যেসব সময়েই থাকে, তা আপনাকে মনে করিয়ে দিলাম।

আমি গম্ভীর হয়ে বলি—আমাকে ভয় দেখাবেন না মিস্টার লুলু, আমার হার্ট খুব ভালো নয়।

লুলু কাঁধ ঝাঁকিয়ে পুরো প্রসঙ্গটি অবহেলায় ঝেড়ে ফেলে বলে—আপনি নাগরিক অধিকার ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা সম্পর্কে কী যেন জানতে চাইছিলেন?

পাশেরই ঘরেই হয়তো জিনির মৃতদেহ পড়ে আছে। পরিস্থিতিটা খুবই অস্বাভাবিক। তবু নিজের কর্তব্যে অবিচল থেকে আমি নোটবই বের করি এবং আগ্রহের গলায় বলি—দয়া করে বলুন।

কিন্তু পরমুহূর্তেই আনমনা হয়ে যায় লুলু। টাইয়ের ল্যাজে আদর করে হাত বোলাতে-বোলাতে উলটোদিকের সোফায় বসে আপনমনে বলতে থাকে—ভালোবেসে দেখিয়াছি মেয়ে-মানুষেরে, ঘৃণা করে দেখিয়াছি মেয়ে মানুষেরে, অবহেলা করে দেখিয়াছি মেয়ে-মানুষেরে...

—মানে? আমি কিছু অবাক হই।

লুলু হাই তুলে বলে—লিখে নাও, আমরা চাই ভালোবাসার বা সঙ্গমের স্বাধীনতা, ঘৃণা করার স্বাধীনতা, খুন করার স্বাধীনতা।

মিস্টার লুলু! আমি মহান লুলুকে তার মন্তব্য সম্পর্কে সাবধান করার জন্য একটু ধমকের সুরে বলি।

লুলু আমার দিকে অবাক চোখে চেয়ে বলে—তুমিও কি তাই-ই চাও না রিপোর্টার? ভেবে দ্যাখো, খুব ভালো করে ভেবে দ্যাখো, একজন অ্যাভারেজ ভারতবাসী—সে চাকুরে, বেকার বা পলিটিক্যাল ওয়ার্কার যাই হোক—তার মোটামুটি চাহিদাটা কী? সে কীসের স্বাধীনতা চায়? কীসের অধিকার তার কাম্য? ভেবে দ্যাখো রিপোর্টার, ব্যক্তিগত জীবনে তুমিও চাও ভালোবাসা বা আনন্দের স্বাধীনতা। এরপর সামাজিক জীবনের কথা ভেবে দ্যাখো। দেখবে প্রতিনিয়ত রোজ-রোজ রাস্তায়, ঘাটে, অফিসে দফতরে যত লোকের সঙ্গে তুমি মুখোমুখি হচ্ছো, তাদের প্রায় অধিকাংশকেই তুমি ঘৃণা করো কি না। করো, তার কারণ তাদের অধিকাংশের আচার ব্যবহার, কথা, ইডিওলজির সঙ্গে তোমার চিন্তা বা বিশ্বাসের অমিল, তোমার স্ত্রী বা প্রেমিকা—যাদের কাছ থেকে তুমি যতটা চাও, তার অর্ধেকও পাও না তাদের কাউকে তুমি জেনুইনলি খুন করতে চাও কি না। এবং সেই হননেচ্ছাকে প্রতিদিন তুমি ভদ্রতাবোধ, শিষ্টাচার, মায়া-মমতা ইত্যাদি দিয়ে চাপা দিয়ে রাখছ কি না। ধরো, যদি আজ একটা আইন করে বলা হয়, কেউ খুন করলে তার ফাঁসি বা জেল হবে না, কোনও শাস্তিই দেওয়া হবে না তাকে, তাহলে তোমার কি মনে হয় না যে আইন পাশ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে সারা দেশে লক্ষ-লক্ষ লাশ পড়ে যাবে?

—আমি জানি না মিস্টার লুলু।

—জানো জানো, স্বীকার করো না। বুদ্ধু রিপোর্টার, আমরা আসলে এই স্বাধীনতাগুলি চাই। লিখে নাও।

আমি ঘামতে-ঘামতে লিখতে থাকি।

লুলু উঠে দাঁড়ায় এবং ব্যস্ত পায়ে বেরিয়ে যায়। আমি লিখতে গিয়ে দেরি করে ফেলি। কোনওক্রমে লুলুর শেষ কথাগুলি টুকে নিয়ে যখন ধাঁ করে উঠে দাঁড়াই, তখনই হঠাৎ সামনে দেখি জিনির ভূত দরজায় পিঠ দিয়ে দাঁড়ানো। মুখে লোল হাসি এবং বিলোল মুগ্ধতা।

ভয় পেয়ে আমি আবার সোফায় বসে পড়ে আড়াই লাখ টাকায় গর্ভবতী আমার ব্রিফকেস চেপে ধরি বুকে। জিনি এসে আমার পাশে বসে। আমাকে ছোঁয় এবং বলে—আই অ্যাম ফর সেল।

—তুমি মরোনি জিনি? আমি বলি।

—মরেছি হাজার মরণে। জিনি বলে এবং হাসে।

আমি বুঝতে পারি যে, আড়াই লাখ টাকা আমি রোজগার করতে পারিনি। বুঝে দীর্ঘশ্বাস ফেলি। কিছুদিন আগে রাইটার্স বিল্ডিংসে আমি একজন মন্ত্রীর ব্রিফিং নিতে যাই। মন্ত্রীর সঙ্গেই যখন করিডোরে বেরিয়ে আসি, তখন বাইরেটা ঘন মেঘে কালো, তুমুল বৃষ্টি দেখতে থাকি। উনি তখন বলছিলেন, ন্যাশনাল ইনস্ট্রুমেন্টের ফাংশনে দেওয়া ওঁর বক্তৃতাটা আমি কাগজে সবটুকু দেব কি না। আমি ওঁকে আশ্বাস দিচ্ছিলাম। আর তখন হঠাৎ সেই বর্ষা সমাগমের সৌন্দর্য দেখে আনন্দিত মন্ত্রী গুনগুন করে গেয়ে ওঠেন—আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে...। ঋতু বিচার করলে খুবই ভুল গান। কিন্তু তবু সেই অতুলন বৃষ্টির দৃশ্য দেখে তাঁর হৃদয় যে নেচেছিল, তা তো অস্বীকার করার উপায় নেই। কিছুক্ষণ উনি তো কাগজে ওঁর স্টেটমেন্টের কতটা ছাপা হবে, সেই দুশ্চিন্তা ভুলেছিলেন।

বলতে কি আমিও এই প্রবল সংকটের সময়ে গুনগুন করে গেয়ে ফেললাম—আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে...

জিনি এগিয়ে আসে। মুখে-চোখে বিহ্বল আসঙ্গলিপ্সা, সম্মোহিত লিত বিভঙ্গ। আমিও কী রকম হয়ে যেতে থাকলাম।

কয়েক মাসের মধ্যেই জিনি তার আড়াই লাখ টাকা আমার কাছ থেকে বের করে নিল।

কংগ্রেসের বিপুল পরাজয় ও জনতা পার্টির ক্ষমতায় আসার পর আমি আবার লুলুর কাছে যাই। দেখি, মহান লুলু আগের মতোই তার চেয়ারে বসে, টেবিলের ওপর পা।

বলি—মিস্টার লুলু।

—আপনি বোধহয় কোনও রিপোর্টার।

—আজ্ঞে। আমাকে চিনতে পারছেন না তো! এক সময়ে আপনি আমাকে খুবই স্নেহ করতেন।

লুলু নির্বিকারভাবে বলে—এখনও করি, কিন্তু তার মানে এ নয় যে চিনি।

তার অর্থ?

—ধরুন, ভারতবর্ষের কোনও মহান নেতা কোটি-কোটি দেশবাসীকে প্রাণাধিক ভালোবাসেন। দিনরাত তাদেরই মঙ্গল চিন্তা করছেন। কিন্তু তার মানে এ নয় যে কোটি-

কোটি ভারতবাসীর প্রত্যেককে তাঁর চিনতে হবে। এও নয় যে, একজন দুজন দশজন বা দশহাজার জন ভারতবাসী না খেয়ে থাকলে, ভিক্ষে করলে, চুরি জোচ্চুরি রাহাজানি করলে, বন্যার কবলে পড়লে বা মরলে তাঁকে বুক চাপড়াতে হবে। এমনকী সারা দেশের মানুষের প্রত্যেককে একবার করে কুশল প্রশ্ন করতে হলেও তাঁর এক জীবনের আয়ুতে কুলোবে না। সুতরাং স্নেহ বা ভালোবাসার সঙ্গে চেনা-পরিচয়ের কোনও সম্পর্ক নেই। সুতরাং আমি সবাইকে ভালোবাসি, কিন্তু নেসেসারিলি সবাইকে চিনি না।

আমি বিনীতভাবে বলি—বিখ্যাত ও মহানদের ক্ষেত্রে এটা খুবই সত্য কথা।

লুলু হাত নেড়ে প্রসঙ্গটা উড়িয়ে দিয়ে বলে—সে যাক গে। আপনি কি কংগ্রেসের পতন এবং জনতার অভ্যুদয় সম্পর্কে জানতে চান?

—হ্যাঁ, এই পতন অভ্যুদয়ের কথা যদি বলেন।

লুলু উদাস গলায় বলে—জরুরি অবস্থা জারি করাটা খুই খারাপ হয়েছিল, আর তার ফলেই কংগ্রেসের পতন।

—কিন্তু মহান লুলু আপনিই বলেছিলেন আরও সাতাশ বছর আগেই জারি করা উচিত ছিল, কিন্তু তার মানে এ নয় যে, আরও সাতাশ বছর আগে জরুরি অবস্থা জারি করলে আজ আর তার জারি করার প্রয়োজনই থাকত না।

—শ্রদ্ধেয় লুলু, জরুরি অবস্থায় যেসব বাড়াবাড়ি ঘটেছে সে সম্পর্কে আপনার মত কী?

খুবই বাড়াবাড়ি ঘটেছিল। রেল অফিস থেকে নমস্কার জানানোটা তার মধ্যে অন্যতম বাড়াবাড়ি।

—লুলু, আপনার কি মনে হয় না এখন রাষ্ট্রের ক্ষমতা বদলের ফলে নাগরিকদের জীবনে নিরাপত্তা ও অধিকার ফিরে এল? মনে হয় না কি জনগণের ইচ্ছাই এর ফলে জয়ী হয়েছে। এ কী জনগণের এবং গণতন্ত্রের জয় নয়?

—নিশ্চয়ই। তবে একথাও ঠিক যে, এই দেশে বরাবরই, এমনকী জরুরি অবস্থার সময়েও জনগণেরই শাসন বলবৎ ছিল। এই শাসক জনগণ হচ্ছে তারাই যাদের রাজ্য বা কেন্দ্রের কোনও মন্ত্রী, কোনও রাজ্যপাল বা স্বয়ং রাষ্ট্রপতি ভালোবাসেন, কিন্তু চেনেন না। তাঁরা জনগণের অস্তিত্বর কথা জানেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এরা কারা সে সম্পর্কে ভালো ধারণা তাঁদের নেই। এই জনগণেরই একজন এক রিকশাওয়ালা বৃষ্টির দিনে সাউথ এন্ড পার্কের এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে আমাকে পৌঁছে দেওয়ার সময় পাঁচ টাকা নিয়েছিল। আমি তাকে জরুরি অবস্থার কথা বলতে সে খুব কর্তৃত্বের গলায় বলেছিল—

তাতে কী? একইরকমভাবে হাওড়া স্টেশনের এক কুলিও আমার কাছ থেকে পাঁচ টাকা আদায় করে। প্রিয় সাংবাদিক, আপনি মহান পুলিশের কথা ভাবুন, আপনি পবিত্র আদালতের কর্তব্যপরায়ণ কর্মচারীদের কথা ভাবুন, আপনি ছোট এবং বড় ব্যবসায়ীদের কথা ভাবুন, দোকানদারদের মুখশ্রী কি আপনার মনে পড়ে না? আপনি যেকোনও বৃত্তিতে নিযুক্ত মানুষদের কথা ভেবে দেখুন। বেকার ছেলেছোকরাদের কথা ভাবুন। এরা সবাই সেই মহান জনগণ। রাষ্ট্রের নামে এঁরাই বরাবর দেশ শাসন করে আসছেন। এদেশে পুলিশ যখন কোনও চোর, ঘুষখোর বা খুনিকে ধরে, তখন আপনার হাসি পায় জানি। কারণ, পুলিশ যাকে ধরে তার সঙ্গে পুলিশের নিজের কোনও পার্থক্য নেই। তবু মনে রাখবেন ওটুকু পুলিশ বেশি জনগণের ন্যায্য শাসন। আদালতে যখন আপনাকে হয়রানি থেকে বাঁচার জন্য গুনোগার দিতে হয় তখন সেটাও জনগণের জন্য জনগণের দ্বারা জনগণের শাসন বলেই মনে করবেন। দোকানদাররা ভেজাল মাল দিলে, দামে বা ওজনে ঠকালে সেটাও তা জনগণেরই লাভ। পাড়ার ছোকরারা পুজো বা পলিটিকসের নাম করে চাঁদা তুলে যখন মাল খায়, তখন সেটা বেকার জনগণের জন্য জনগণের দেয় বেকার ভাতা বলেই ধরা উচিত নয় কি?

আমি উত্তেজিত হলে বলি—মিস্টার লুলু, আপনি প্রসঙ্গান্তরে চলে যাচ্ছেন।

লুলু মাথা নেড়ে বলে—না প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় সাংবাদিক। আমি বলতে চাইছি, এদেশে জনগণের অধিকার ও গণতন্ত্র কখনও ক্ষুণ্ণ হয়নি। বরাবরই ছিল, এখনও আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। জনগণ এক বৃহৎ ও মহান শক্তি। এই শক্তি জনগণের মধ্যেই পারস্পরিক ক্রিয়া করে। রামকে শ্যাম মারে, শ্যাম যদুকে ঠকায়, যদু মধুর কাছ থেকে চাঁদা তোলে এবং মধু রামকে ঘুষ দিয়ে কাজ আদায় করে নেয়। আর এইভাবেই জনগণের বিপুল শক্তি তার ভারসাম্য রক্ষা করছে। আর এভাবেই চলবে। আমার মনে হয়, আমাদের দেশে আর গভর্নমেন্টের কোনও প্রয়োজনই নেই। আমরা স্টেটলেস সোসাইটির কল্পনাকে সার্থক করে তুলেছি।

আমি চোখ কপালে তুলে বলি—বলেন কি মহান লুলু! সরকার না থাকলে যে ভয়ঙ্কর কাণ্ড হবে।

লুলু মাথা নেড়ে বলে—শোনো মুর্খ, সরকার তুলে দেওয়ার কথা বলি না। নট্ট কোম্পানি বা বহুরূপীর নাটকে দলের মতো বা ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের মতো জনজীবনে উত্তেজনাময় এন্টারটেনমেন্টের জন্য সরকারও থাকবে। একটা রাজনৈতিক দলের সঙ্গে অন্য একটা রাজনৈতিক দলের তরজা বা কবির লড়াই চলবে, ভোটযুদ্ধ হবে, সংসদে আজকের মতোই যাত্রার আসর বসবে। সেখানে জনগণের মঙ্গলের জন্য আইন

পাস হবে, অর্থ বরাদ্দ হবে, ধাঁধা প্রশ্নোত্তরের আসর বসবে। কিন্তু সেগুলির সঙ্গে জনগণের নিজস্ব শাসন ব্যবস্থার কোনও হেরফের হবে না।

আমি ভীষণ উত্তেজিতভাবে বলি—মিস্টার লুলু, আপনি এসব কী বলছেন এ যে সরকারের অসম্মান।

লুলু উঠে দাঁড়ায় এবং জানলার কাছে গিয়ে বাইরে তাকিয়ে বলে—সাংবাদিক, এসো দ্যাখো এসে বাইরে কী সুন্দর দৃশ্য।

আমি মহান লুলুর আদেশে জানলার কাছে যাই।

মুহূর্তে দুর্দান্ত লুলু আমাকে পাঁজাকোলে তুলে গরাদহীন জানলা দিয়ে বাইরে ফেলে দেয়। আমি বিকট একটা চিৎকার করে চোখ বুজে ফেলি।

কিন্তু পড়লাম না। লুলু আমার একটা হাত ধরে রেখেছে। একমাত্র লুলুর হাতটিই আমার অবলম্বন, পায়ের তলায় পাঁচতলার শূন্যতা। আমি ঊর্ধ্বমুখ হয়ে কাতর স্বরে বলি—হে মহান লুলু, হে দয়ালু লুলু, আমাকে তুলুন।

লুলু আমাকে ধরেই থাকে। ঠিক যেমন দেখেছিলাম 'টু ক্যাচ এ থিফ' ছবিতে। ক্যারি গ্র্যান্ট বাড়ির ছাদ থেকে একটা চোর মেয়েকে ঝুলিয়ে রেখে যেভাবে স্বীকারোক্তি আদায় করেছিল, ঠিক সেইভাবেই লুলু বলল—বলো প্রিয় সাংবাদিক, দিল্লির বা রাজ্যের সরকার এখন তোমার জন্য কী করছে! তুমি যদি এখন মরে যাও তাহলে সরকার কতটা ধাক্কা খাবে? কিংবা তুমি মরে গেলে কি না সেই সংবাদ কি প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতির কাছে কোনওদিন পৌঁছোবে? তুমি যে আছ তাই তাঁরা জানবেন না।

ঝুলতে-ঝুলতে আমি লুলুর কথার সত্যতা খানিকটা বুঝতে পারি। বলি—মহান আপনার কথা অতি সত্য।

—মূর্খ সাংবাদিক, সরকার-সরকার বলে দিনরাত তোমরা চেঁচিয়ে বেড়াচ্ছ কিন্তু কোনওদিন বুঝলে না সরকার নয়, তুমি বেঁচে আছ নিজেরই দায়িত্বে। তুমিই তোমার বেঁচে থাকা বা মরে যাওয়ার জন্য দায়ী। তুমি কবে বুঝবে সরকার নয়, তোমার পাশেপাশের সামনের ও পিছনের জনগণই তোমাকে দেখছে, দয়া করছে, ঘৃণা করছে, খুন করছে আবার ভালোও বাসছে। মূর্খ, আমি সেই জনগণের এক প্রতিনিধি হয়ে তোমাকে আজ জিগ্যেস করি, বলো, তুমি এদেশে রাষ্ট্রমুক্ত সমাজের কথা মানো কি না!

আমি নীচের প্রকাণ্ড শূন্যতার দিকে চেয়ে আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠি—মানি।

—বলো গণতন্ত্রের জয়।

—গণতন্ত্রের জয়।

—বলো তুমিই সেই জনগণ।

—আমিই সেই জনগণ।

এরপর মহান লুলু আমাকে টেনে তোলে। তারপর ব্যক্তি স্বাধীনতা, নাগরিক অধিকার ও গণতন্ত্রের অর্থ বুঝতে আমার আর দেরি হয়নি।

ওষুধ

উকিলবাবু এখনও আসেননি। মক্কেলরা বসে-বসে মশা মারছে।

দুর্গাপদ খুবই ধৈর্যশীল লোক। সে জানে, বড় অফিসার, বড় ডাক্তার, বড় উকিল ধরলে ধৈর্য রাখতে হয়। যে যত বড় সে তত ঘোরাবে।

দুর্গাপদ রাস্তা পেরিয়ে উলটোদিকের পানের দোকানে গিয়ে লেমনেড চাইল। তেষ্টা পেয়ে রয়েছে অনেকক্ষণ। উকিলবাবুর বাড়ির চাকরের কাছে জল চাইলে দিত নিশ্চয়ই, কিন্তু চাইতে কেমন ভয়-ভয় আর লজ্জা-লজ্জা করছিল তার।

দোকানদার বুড়ো মানুষ। তার দোকানটাও তেমনি কিছু বড় দোকান নয়। ছোট-মোটো, গরিবগুর্বোর দোকান। বিড়ি চাও আছে, পিলাপাতি কালাপাতি চমনবাহার মোহিনী জরদা দেওয়া পান পাবে, ক্যাপস্টান গোল্ড ফ্লেক চাও তাও মজুদ, কম দামি কোল্ড ড্রিংকস রাখতে হয় বলে তাও রাখা, কিন্তু বেশি বায়নাক্কা হলে অন্য দোকান দেখতে হবে।

বুড়ো তার লাল বাক্স খুলে বরফে ঠান্ডা বোতল অনেক বেছে গুছে একটা বের করে হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলে—এরকম ঠান্ডা হলে চলবে?

অন্যমনস্ক দুর্গাপদ বলে—হুঁ:।

লজেনচুসের গন্ধওয়ালা ঠান্ডা, মিস্টি ঝাঁজালো জলটা খেতে গিয়ে বুকের জামা ভিজে গেল দুর্গাপদর। কাগজের নল দিয়ে টেনে সে এসব খেতে পারে না। চুরুক-চুরুক খাওয়া তার পছন্দ নয়। ঘঁৎঘঁৎ করে না গিললে তৃপ্তিটা পায় না।

জলটা খেতে-খেতে চেয়ে আছে উলটো দিকের বাড়িটার দিকে। না উকিলবাবু এখনও আসেননি।

কতকগুলো ব্যাপার আছে যা কেবল উকিল ডাক্তার বা অফিসাররাই জানে, আর কেউ জানে না। মুশকিলটা সেখানেই। তার ওপর দুর্গাপদ কস্মিনকালে মামলা মোকদ্দমা বা কোর্টকাছারি করেনি। উকিলবাবু আগের দিনই সাফ বলে দিয়েছে—কেউ বিয়ে ভাঙতে চাইলে আটকানো কি যায়? কিছুদিন ঝুলিয়ে রাখতে পারি বড় জোর। আর চাও তো, বেশ ভালো মাসোহারার ব্যবস্থাও করে দিতে পারি। সে এমন ব্যবস্থা যাতে বাছাধনকে দ্বিতীয়বার বিয়ে বসতে খুব ভেবেচিন্তে বসতে হবে।

কিন্তু দুর্গাপদ তার জামাইকে খুব একটা অপছন্দ করে না। লোকটা নরম সরম ভদ্র, বিনয়ী, খরচে ধরনের। বরং তার মেয়ে লক্ষ্মীই ট্যাটন। বিয়ের আগে পাড়া জ্বালিয়েছে। বিয়ের পর বছর দুই যেতে-না-যেতে বাপের বাড়িতে এসে খাদিমা হয়ে বসেছে। জামাই নিতে আসেনি। জামাইয়ের বদলে দিনকুড়ি আগে জামাইয়ের পক্ষের এক উকিলের চিঠি এসেছে। জামাই ডিভোর্সের মামলা আনছে।

তার মেয়ে লক্ষ্মীর তাতে কোনও ভাব বৈলক্ষণ নেই। রেজিস্ট্রি করা খামটা খুলে চিঠিটা তেরছা নজরে পড়ে বারান্দায় ফেলে রেখে পা ছড়িয়ে উকুন বাছতে বসল সরু চিরুনি দিয়ে। বাতাসে উড়ে-উড়ে ঘুড়ির মতো লাট খেয়ে চিঠিটা করুণ মুখে এসে উঠোনে দুর্গাপদর পায়ের পাতায় লেগে রইল। দুর্গাপদ উঠোনে বসে একটা ভাঙা মিটসেফের ডালায় কবজা লাগাচ্ছিল। ইংরিজিতে লেখা চিঠিটা বুঝতে একটু দেরি হল বটে, কিন্তু অবশেষে বুঝল এবং মাথাটা তখনই একটা পাক মারল জোর।

জামাইবাবাজি যে লোক খুব খারাপ নয় তা জানে বলেই দুর্গাপদ কটমট করে তাকাল মেয়ের দিকে। কিন্তু এসব তাকানো-টাকানোয় ইদানীং আর কাজ হয় না। কোনওদিন হতও না।

—বলি ব্যাপারটা কী, শুনছিস? হুঙ্কার দিল দুর্গাপদ।

লক্ষ্মী সূক্ষ্ম চিরুনিতে উঠে আসা চুলের গোছা আলোয় তুলে উকুন খুঁজতে-খুঁজতে নির্বিকার গলায় বলে—দেখলে তো, আবার জিগ্যেস করছ কেন?

দুর্গাপদ বুঝল পুরুষকারে কাজ হবে না। গলা নরম করে বলল—স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া হয় সে তো দিন রাত্তিরের মতো সত্য। তা বলে উকিলের চিঠি কেন? তেমন কী হল তোদের?

লক্ষ্মীর মা ঘরেই ছিল। বরাবরের কুঁদুলি মেয়েছেলে। সেখান থেকেই গলা তুলে জিগ্যেস করল—কে উকিলের চিঠি দিল আবার?

—নবীন। হাল ছেড়ে দুর্গাপদ বলে।

—জামাই?

—তবে আর কে নবীন আছে?

লক্ষ্মীর মা কিছু মোটাসোটা। ফরসা গোলগাল প্রতিমার মতো চেহারা। বড়-বড় চোখে রক্ত হিম করা দৃষ্টিতে চাইতে পারে। দুর্গাপদর প্রাণ এই চোখের সামনে ভারী ধড়ফড় করে ওঠে।

ইংরেজি জানে না, তবু উঠোনে নেমে এসে চিঠিখানা হাতে নিয়ে একটু ঠান্ডা চোখে চেয়ে রইল সেটার দিকে। তারপর দুর্গাপদকে জিগ্যেস করল ডিভোর্স করবে নাকি?

—তাই তো লিখেছে।

—করলেই হল। আইন নেই?

—ডিভোর্সের কথা তো আইনেই আছে।

—তোমার কথা। ডিভোর্স হল বেআইনি ব্যাপার। কেউ ডিভোর্স করেছে জানতে পারলে পুলিশ ধরে নিয়ে যায়। জেল হয়।

লক্ষ্মীর মা তার বাপের বাড়ি থেকে যা-যা শিখে এসেছে তার ওপরে আজ পর্যন্ত কেউ তাকে কিছু শেখাতে পারেনি। অনেক ঠেকে দুর্গাপদ আর সে চেষ্টা করে না। তবু বলল—জেল দাওগে না। কে আটকাচ্ছে পুলিশে যেতে।

লক্ষ্মীর মা বড়-বড় চোখ করে তাকিয়ে কঠিন স্বরে বলল—আমি যাব পুলিশের কাছে? তবে তুমি পুরুষমানুষ আছ কী করতে?

এ নিয়ে যখন লক্ষ্মীর মার সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক চলছিল তখন লক্ষ্মী ম্যাটিনি শোয়ে যাবে বলে রান্নাঘরে গিয়ে পান্তা খেতে বসল।

লক্ষ্মীর মায়ের বাঁজা নাম ঘুচিয়ে ওই লক্ষ্মীই জন্মেছিল, আর ছেলেপুলে হয়নি। একমাত্র সন্তান বলে আশকারা পেয়েছিল ঠিকই, কিন্তু সে দুর্গাপদর কাছে যতটা তার চেয়ে ঢের বেশি তার মায়ের কাছ থেকে। সারাদিন মায়ে-মেয়ের গলাগলি ভাব, গুজগুজ ফুসফুস। দুটো মেয়েছেলে একজোট, অন্যধারে দুর্গাপদ এক পুরুষ। কীই বা করবে? চোখের সামনেই মেয়েটা বখে গেল।

লক্ষ্মী সিনেমায় বেরিয়ে যাওয়ার পর লক্ষ্মীর মা দুর্গাপদকে বলল—জামাই খারাপ নয়, কিন্তু ওর বাড়ির লোকেরা হাড়জ্বালানী। সবক'টাকে কোমরে দড়ি বেঁধে সদরে চালান

দিয়ে আসবে। যাও। এ কী কথা! দেশে আইন নেই। কোর্ট-কাছারি নেই? পুলিশ জেলখানা নেই? ডিভোর্স করলেই হল?

এসব ক্ষেত্রে পুলিশের কাছে গিয়ে লাভ নেই তা দুর্গাপদ জানে। কিন্তু কোথায় যেতে হয় তা তারও মাথায় আসে না। সে তেমন লেখাপড়া জানে না, খুব ভদ্রসমাজের লোকও সে নয়। তবে ইলেকট্রিক মিস্তিরি হিসেবে গয়েশপুর থেকে কাঁচরাপাড়া অবধি তার ফলাও প্র্যাকটিস। বলতে কি উকিল, ডাক্তার, অফিসারদের মতোই তার গাহেককেও ঘুরে-ঘুরে আসতে হয়। বলতে নেই তার টাকা অঢেল। সে সাইকেলখানা নিয়ে ভরদুপুরে বেরিয়ে পড়ল।

বুদ্ধি দেওয়ার লোকের অভাব দুনিয়ায় নেই। একজন দুঁদে এক উকিলের ঠিকানা মায় একটা হাতচিঠিও দিয়ে দিল। তাতে লাভ হল কি না দুর্গাপদ জানে না। প্রথমদিন জামাইয়ের উকিলের দেওয়া চিঠিটা পড়ে দুঁদে উকিল মোট মিনিটদশেক তার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে পঁচিশটা টাকা নিল। কিন্তু তবু কোনও ভরসা দিতে পারল না।

দুর্গাপদ আজও এসেছে। বুকের মধ্যে সারাক্ষণ ঢিবঢিব, মুখ শুকনো গলা জুড়ে অষ্টপ্রহর এক তেষ্টা। মেয়েটা ঘাড়ে এসে পড়লে সমাজে মুখ দেখানো যাবে না। আর হারামজাদী শুধু যে ঘাড়ে এসে পড়বে তা তো নয়, ঘাড়ে বসে চুল ওপড়াবে। পাড়ায় ঢিঢি ফেলে দেবে দু-দিনেই। স্বভাব জানে তো দুর্গাপদ। গতকাল সে লক্ষ্মীকে খুব সোহাগ দেখিয়ে বলেছিল—মা গো, শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে বনিবনা করে থাকো গে যাও। আমি সঙ্গে যাব, বুঝিয়ে-সুঝিয়ে সব ঠিকঠাক করে দিয়ে আসব। থাকতে যদি পারো তো মাসে তিনশো টাকা করে হাত-খরচ পাঠাব তোমায়।

শুনে লক্ষ্মীর কী হাসি! পা ছড়িয়ে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে এল চুলে বসেছিল। হাসির চোটে সেই চুলে মুখ বুক ঢাকা পড়ল। বলল—মাসোহারার লোভ দেখাচ্ছ? তুমি মরলে সর্বস্ব তো এমনিতেই আমি পাব।

মূর্তি দেখে দুর্গাপদ ভারী মুষড়ে পড়েছিল। লক্ষ্মীর মা বলল—পুরুষমানুষ বোকা হয় সে তো জানা কথা। কিন্তু তোমার মতো এমন হাঁদারাম আর মেনিমুখো তো জন্মেও দেখিনি। লক্ষ্মী শ্বশুরবাড়ি যাবে কেন, ওর সম্মান নেই? জামাইদের দেমাকের দিন শেষ হয়ে গেছে। তারা পায়ে ধরে নিতে এলেও যাবে না? এ-বাড়িতে বাকি জীবন বসে-বসে খাবে। মেয়ে কি ফ্যালনা?

উকিলবাবুর গাড়ি এসে থামল। তাড়াহুড়োয় দুর্গাপদ লেমনেডের দাম দিতে ভুলে গিয়ে রাস্তা পেরোতে যাচ্ছিল। পিছন থেকে 'ও দাদা দাম দিয়ে গেলেন না' শুনে লজ্জা পেয়ে

ফিরে এসে দাম মেটাতে গেলে বুড়ো দোকানদার মোলায়েম গলায় বলল—উকিলবাবুর এখন দেরি হবে। হাত পা ধোবেন, জলটল খাবেন, পাক্কা এক ঘণ্টা, রোজ দেখছি। আপনার নাম লেখানো আছে তো?

দুর্গাপদ মাথা নেড়ে বলল—জনাআস্টেকের পর।

—তাহলে আরও দেড়ঘণ্টা ধরে নিন।

—বড় উকিল ধরে বড্ড মুশকিল হল দেখছি।

—আসানও হবে। উনি হারা মামলায় জিতিয়ে দেন। কত খুনিকে খালাস করেছেন।

দুর্গাপদ বলল—কিন্তু আমারটা কিছু হল না।

—আপনার মুশকিলটা কী?

—সে আছে অনেক ঝামেলার ব্যাপার। জামাই ডিভোর্স চাইছে।

—অ। বলে বুড়ো মুখে কুলুপ আঁটল।

দুর্গাপদ লেমনেডের দাম দিয়ে রাস্তা পেরিয়ে এসে উকিলবাবুর বাইরের ঘরে আরও জনাত্রিশেক লোকের মধ্যে ঠাসাঠাসি হয়ে বসে থাকে। আড়াই ঘণ্টা বসতে হবে। ঘরটা বিড়ি আর সিগারেটের ধোঁয়ায়-ধোঁয়াক্কার। শোনা গেল, উকিলবাবু এখনও চেম্বারে আসেননি। জল খাচ্ছেন বোধহয়। গুটি-গুটি আরও মক্কেল আসছে।

ঝাড়া তিন ঘণ্টা। হাঁটু ব্যথা হল, মাজা ধরে গেল, হাই উঠতে লাগল ঘনঘন। তারপর ডাক এল। ব্যস্ত বড় উকিলবাবু মক্কেলদের এক-দুইবার দেখে মনে রাখতে পারেন না, তাই ফের পুরোনো পরিচয় এবং বখেরার কথা বুঝিয়ে বলতে হল। সব বুঝে উকিলবাবু হাসি-হাসি মুখ করে বললেন—ভাঙন রুখতে চাইছেন তো? কিন্তু কী দিয়ে রুখবেন? আজ হোক কাল হোক এ ভাঙবেই। আমরা ভাবের কথা বুঝি না, কেবল আইন বুঝি। কে কাকে ভালোবাসে বা বাসে না, তার বিয়ে ভাঙা ভালো নয় বা কার ভালো এসব হল নীতির কথা, ভাবের কথা। আইন তার তোয়াক্কা করে না। বলেন তো লড়তে পারি। কিন্তু খামোকা।

ফের পঁচিশটা টাকা গুণে দিয়ে দুর্গাপদ উঠে পড়ল।

দুই

খেয়ে উঠে নবীন বারান্দায় দাঁড়িয়ে ঘটির জলে আঁচাচ্ছিল। এমন সময় দেখল, উঠোনে জ্যোৎস্না পড়েছে। এই হেমন্তকালের জ্যোৎস্নার রকম-সকমই আলাদা। একটু দুধের সরের মতো কুয়াশায় মাখামাখি চাঁদখানা ভারী আহ্লাদী চেহারা নিয়ে হাসছে। বাতাসে চোরা শীত। উঠোনে বসে থাকা ঘেয়ো কুকুরটা এঁটো খেতে-খেতে ভ্যাক-ভ্যাক করে ডেকে উঠল।

নবীন কাঁধের গামছায় মুখ মুছতে-মুছতে শুনল মা তাকে ডেকে বলছে—ও নবীন, গায়ে একটা গেঞ্জি দে। এ সময়কার ঠান্ডা ভালো না।

আঁচাতে গিয়ে চারদিককার দৃশ্য দেখে জগৎ সংসার বেবাক ভুলে চেয়ে রইল নবীনচন্দ্র। ঘটিতে আঙুলের টোকা মেরে মৃদুস্বরে একটু গানও গেয়ে ফেলল সে—না মারো না মারো পিচকারি...

ঘেরা উঠোনের যে-ধারটায় দেওয়ালের গায়ে দরজাটা রয়েছে তার পাশেই মায়ের আদরের দু-দুটো মানকচুর ঝোপ আশকারা পেয়ে মানুষপ্রমাণ প্রকাণ্ড হয়ে উঠেছে। এক-একখানা পাতা ডবল সাইজের কুলোকেও হার মানায়। কুকুরটা ভ্যাক-ভ্যাক করে সেদিকেই বারবার ছুটে গিয়ে ফের লেজ নামিয়ে চলে আসছে। নবীনের মুখের দিকে চেয়ে কী যেন বোঝারও চেষ্টা করল ভ্যাক-ভ্যাক করে।

নবীন গান থামিয়ে বলে—কে?

কচুপাতার আড়ালে কপাটের গায়ে লেগে থাকা ছায়ামূর্তি বলে উঠল—আমি হে নবীন। কথা ছিল। আঁচাচ্ছিলে বলে ডাকিনি, বিষম খেতে পারো তো।

অক্ষয় উকিলের হয়ে এসেছে। আজকাল বড় আলতুফালতু কথা বলে। মানে হয় না।

নবীন উঠোন পেরিয়ে বাইরের ঘরে গিয়ে বাতি জ্বেলে বলে—আসুন।

বিবর্ণ একটা শাল জড়ানো বুড়োটে লোকটা খুব আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে চেয়ারে বসে ঠ্যাং তুলে ফেলল। বলল—ডিভোর্সের মামলা বড় সোজা নয় হে।

নবীন ভ্রূ কুঁচকে বলল—ও-পক্ষ কোনও জবাব দিয়েছে?

—জবাব এত টপ করে দেবে? অত সোজা নাকি? যা সব আর্গুমেন্ট দিয়েছি তার জবাব ভেবে বের করে মুসাবিদা করতে দুঁদে উকিলের কালঘাম ছুটে যাবে। তবে এও ঠিক কথা ডিভোর্স জিনিসটা অত সহজ নয়।

নবীন গম্ভীর মুখে বলে—শক্তটাই বা কী? রোজ কাঁড়ি-কাঁড়ি ডিভোর্স হচ্ছে দেখছি।

—আরে না। সরকার ডিভোর্স জিনিসটা পছন্দ করে না। আইনের অনেক ফ্যাঁকড়া আছে। যা হোক সে নিয়ে আমি ভাবব, তুমি নিশ্চিন্তে থাকো। খরচাপাতি কিছু দেবে না কি আজ?

—খরচা আবার কী? নবীন অবাক হয়ে বলে—এখনও মোকদ্দমা শুরুই হয়নি।

—আছে, আছে। মোকদ্দমা শুরু হয়নি বলে কি আর উকিলের বসে থাকলে চলে? আইনের পাহাড় প্রমাণ বই ঘাঁটতে হচ্ছে না? এই যে মাঝে-মাঝে এসে খবর দিচ্ছি এর জন্যও তো কিছু পাওনা হয় বাপু। মহেশ উকিলের সঙ্গে বাজারদর নিয়ে কথা বলতে গেলে পর্যন্ত ফিজ চায়।

নবীন বেজার হল। তবে বলল—ঠিক আছে, কাল সকালে কারখানায় যাওয়ার সময় দুটো টাকা দিয়ে আসব'খন। মোকদ্দমাটা বুঝছেন কেমন?

অক্ষয় শালটা খুলে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে হাওয়া খেতে-খেতে বলে সোজা নয়। তোমার বউ বাগড়া দিতে পারে। তারও অনেক পয়েন্ট আছে। সবচেয়ে মুশকিল হল মাসোহারা নিয়ে।

নবীন খেঁকিয়ে উঠে বলে—মাসোহারাই যদি দেব তবে আর উকিলকে খাওয়াচ্ছি কেন?

সান্ত্বনা দিয়ে উকিল বলে—সেই নিয়েই তো ভাবছি। ওরা কী-কী পয়েন্ট দেবে। আর আমাদেরই বা কী-কী পয়েন্ট সেসব গুছিয়ে ভাবতে হচ্ছে। তোমার বউ যদি বলে যে শ্বশুরবাড়িতে তার ওপর খুব অত্যাচার হত?

অত্যাচার আবার কী? মা খুড়ি একটু ফিচফিচ করত, তা অমন সব মা খুড়িই করে। ভারী বেয়াড়া মেয়েছেলে, কাউকে গ্রাহ্য করত না। উলটে মুখ করত, বিনা পারমিশনে সিনেমায় যেত, যেসব বাড়ির সঙ্গে আমাদের ঝগড়া সেইসব বাড়িতে গিয়ে আমাদের নিন্দে করে আসত।

—মারধর করা হয়নি তো?

—কস্মিনকালেও না। বরং ও-ই উলটে আমার হাত খিমচে দিয়েছিল। একবার কামড়েও দেয়। আমি দু-একটা সটকান মেরেছি হয়তো। তাকে মারধর বলে না।

—চরিত্রদোষ ছিল কী? থাকলে একটু সুবিধে হয়। ডিভোর্সের বদলে অ্যানালমেন্ট পেয়ে যাবে, মাসোহারা দিতে হবে না।

—ছিল কি আর না? তবে সেসব খোঁজখবর আর কে নিয়েছে!

অক্ষয় উকিল উঠতে-উঠতে বলে—কোন পয়েন্ট টিকবে কোনটা টিকবে না বলা শক্ত। ভাবতে হবে। তুমি বরং কাল চারটে টাকাই দিয়ে যেও।

জ্বলন্ত চোখে নবীন চেয়ে ছিল। অক্ষয় উকিলের আসল রোজগার হল জামিন দেওয়া। সস্তা হয় বলে নবীন ধরেছে, কিন্তু এখন ভারী সন্দেহ হচ্ছে তার যে লোকটা এজলাসে দাঁড়িয়ে সব গুলিয়ে না ফেলে।

জ্যোৎস্নাটা আর তেমন ভালো বলে মনে হল না নবীনের। গলায় গানও এল না। নিজের বিবাহিত জীবনের ভুল-ভ্রান্তিগুলো মনে হয়ে খুব আপশোশ হচ্ছে। ঢ্যামনা মেয়েছেলেটাকে সে চিরকালটা প্রশ্রয় দিয়েছে। উচিত ছিল ধরে আগাপাশতলা ধোলাই দেওয়া। তাহলে হাতের সুখের একটা স্মৃতি থাকত। এখন দাঁত কিড়মিড় করে মরা ছাড়া গতি নেই। আদালতে তো বড়জোর বিয়ে ভেঙে দেবে, তার বেশি কিছু করবে না। আইনে মারধরের নিয়ম নেই, কিন্তু থাকা উচিত ছিল।

কাউকে কিছু না বলে লক্ষ্মী সটকে পড়েছিল। প্রথমে সবাই ধরে নিয়েছিল, অন্য কারও সঙ্গে ভেগেছে। পথে খবর এল, তা নয়। বাপের বাড়িতে গিয়ে উঠেছে। তাতে খানিকটা স্বস্তি বোধ করেছিল নবীন। মুখটা বাঁচল। কিন্তু সেই থেকে তার লোহা-পেটানো হাত-পা নিশপিশ করে।

সকালে কারখানা যাওয়ার পথে অক্ষয় উকিলের চেম্বারে উঁকি দেয় নবীন। চেম্বারের অবস্থা শোচনীয়। ওপরে টিনের চালওলা পাকা ঘরের চুন বালি গত বর্ষার স্যাঁতস্যাঁতে ভাব কাটিয়ে উঠতে পারেনি, ঝুরঝুর করে সব ঝরে পড়ে যাচ্ছে। উকিলের নিজস্ব চেয়ারের গদি ফেড়ে গিয়ে ছোবড়া বেরিয়ে পড়েছে। তিন আলমারি বইতে উই লেগেছে, আলমারির গায়ে উইপোকার আঁকাবাঁকা মেটে সুড়ঙ্গ। বই অবশ্য নকল, মক্কেলদের শ্রদ্ধা জাগানোর জন্য সাজিয়ে রাখা বেশিরভাগ বই-ই ডামি। ওপরে মলাট, ভিতরটা ফোঁপরা। মক্কেলহীন ঘরে বসে অক্ষয় উকিল গত কালের শালটা গায়ে দিয়ে নাতিকে অঙ্ক কষাচ্ছে। চারটে টাকা পেয়ে গম্ভীর মুখে বলল—এ মামলা তুমি জিতেই গেছ ধরে নাও।

নবীন নিশ্চিন্ত হল না।

তিন

শীতের বেলা তাড়াতাড়ি পড়ে আসে। ওভারটাইম খেটে বেরোতে-বেরোতে সাঁঝের আঁধার ঘনিয়ে এসেছে।

কারখানা ছাড়িয়ে বাজারের পথে পা দিতেই মোড়ের মাথায় শুকনো মুখে তার শ্বশুর দুর্গাপদকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে একটু থমকাল নবীন। কথা বলা উচিত কি না ভাবছে। লোকটা তেমন খারাপ নয়।

নবীনকে বলতে হল না, দুর্গাপদই শুকনো মুখে একটু হাসি ফোটাবার চেষ্টা করে এগিয়ে এল—সব ভালো তো?

নবীন বে-খেয়ালে প্রণাম করে ফেলে। বলে—মন্দ কী?

দুর্গাপদ শুকনো ঠোঁট জিভে চেটে বলে—এদিকে একটু বিষয় কাজে এসেছিলাম, ভাবলাম দেখা করে যাই।

নবীনও ভদ্রতা করে জিগ্যেস করে—ওদিকে সব ভালো?

দুর্গাপদ হতাশ মুখে বলে—ভালো আর কই? তুমি উকিলের চিঠি দিয়েছ। আমি অতশত ইংরিজি বুঝি না, তবে পড়ে মনে হল, ডিভোর্স-টিভোর্স কিছু একটা কথা আছে।

নবীন বিনীতভাবেই বলল—তাই লেখার কথা। ঠিকমতো লিখেছে কি না কে জানে? আইনের ইংরিজির অনেক ঘোরপ্যাঁচ।

দুর্গাপদ বলে—শুধু ইংরেজি কি, উকিলের মুখের কথাও ভালো বোঝা যায় না। দু-বারে কড়কড়ে পঞ্চাশটা টাকা দিলাম দুটো মুখের কথা শোনার জন্য। ডিভোর্স ঠেকানোর নাকি উপায় নেই, বলছে উকিল। আমরা তবু ঠেকাতেই চাই।

নবীন গম্ভীর হয়ে বলে—আমার উকিল বলছে ডিভোর্স পাওয়া নাকি খুব শক্ত। সরকার নাকি ডিভোর্স পছন্দ করে না।

—কারো কথাই বোঝা যাচ্ছে না। ওদিকে লক্ষ্মীর মা বলছে, ডিভোর্স নাকি বে-আইনি। পুলিশ খবর পেলে জেল দেবে।

নবীন হাসল।

দুর্গাপদ করুণ চোখে চেয়ে বলল—হাসছ বাবা? লক্ষ্মীর মা যে কীভাবে আমার জীবনটা ঝাঁঝরা করে দিল তা যদি জানতে।

লোহা-পেটানো শরীরটা গরম হয়ে গেল নবীনের মেনিমুখো শ্বশুরের কথা শুনে। ঝাঁকি দিয়ে বলল—স্ট্রং হতে পারেন না? মেয়েছেলেকে দরকার হলে চুলের মুঠি ধরে কিলোতে

হয়।

এ-কথায় দুর্গাপদও গরম হয়ে বলল—বেশি বলো না বাবাজীবন। তুমি নিজে পেরেছ? পারলে উকিলের শামলার তলায় গিয়ে ঢুকতে না!

এ-কথায় নবীন স্তম্ভিত হয়ে গেল।

চার

সিনেমা থেকে বেরিয়ে লক্ষ্মীর খুব উদাস লাগছিল। দুনিয়ায় সে কাউকে গ্রাহ্য করে না, শুধু এই উদাস ভাবটাকে করে। এই যে কিছু ভালো লাগে না উদাস লাগে, এই দুনিয়ার সঙ্গে নিজেকে ভারী আলাদা মনে হয়, এই যে সিনেমা দেখেও মন ভালো হতে চায় না এই তার রোগ। ভিতরে নাড়াচাড়া নেই, নিথর, ভ্যাতভ্যাতে পান্তার মতো জল-ঢ্যাপসা একটা মন নেতিয়ে পড়ে আছে।

সিনেমা হলের বাইরে দাঁড়িয়ে উদাস চোখে চেয়ে থাকে লক্ষ্মী। কোথায় যাবে তা যেন মনে পড়তে চায় না।

লক্ষ্মী একটা রিকশা নিল। স্টেশনে এসে উদাসভাবেই নৈহাটির ট্রেনে উঠে বসল। নিজের কোনও কাজের জন্য কখনও কাউকে সে কৈফিয়ত দেয় না।

উঠোনে ঢুকতেই নেড়ি কুকুরটা ভ্যাক-ভ্যাক করে তেড়ে এসে লেজ নেড়ে ফুঁইফুঁই করে গা শোঁকে। কচুপাতা একটু গলা বাড়িয়ে গায়ে একটা ঝাপটা দেয়।

প্রথমটা কেউ টের পায়নি। কয়েক মুহূর্ত পরেই সারা বাড়িতে একটা চাপা শোরগোল পড়ে গেল।

লক্ষই করল না লক্ষ্মী। উদাস পায়ে নিজের ঘরে গিয়ে উঠল। বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে রাস্তার ধকলটা সামলাতে বড়-বড় শ্বাস টানতে লাগল।

কতক্ষণ কেটেছে কে জানে! লক্ষ্মীর হয়তো একটু ঘুমই পেয়ে থাকবে। হঠাৎ ঘরে একটা বোমা ফাটল দড়াম করে। কানের কাছে একটা বিকট গলা বলে উঠল—উকিলের শামলার তলায় ঢুকেছি? কেন আমার হাত নেই?

বলতে-না-বলতেই চুলের গোছায় বিভীষণ এক হ্যাঁচকা টানে লক্ষ্মী খাড়া হয়ে স্তম্ভিত শরীরে দাঁড়িয়ে রইল। গালে ঠাস করে একটা চড় পড়ল দু-নম্বর বোমার মতো। মেঝেয়

পড়তে-না-পড়তেই নড়া ধরে কে যেন ফের দাঁড় করায়।

বিকট গলাটা বলে ওঠে—কার পরোয়া করি? কোন উকিলের ইয়েতে তেল মাখাতে যাবে এই শর্মা? এই তো আইন আমার হাতে? বলি, পেয়েছ দুর্গাপদ দাস?

বলতে-না-বলতেই আর-একটা তত জোর নয় থাপ্পড় পড়ল গালে।

লক্ষ্মীর গালে হাত। ছেলেবেলা থেকে এত বড়টি হল কেউ মারেনি তাকে। এই প্রথম। কিন্তু কী আশ্চর্য দ্যাখো! মনের ম্যাদামারা ভাবটা কেমন কেটে যাচ্ছে। টগবগ করছে রক্ত। আর তো মনে হচ্ছে না পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্ক নেই। নেই মানে? ভীষণভাবে সম্পর্ক আছে। ভয়ঙ্কর নিবিড় সম্পর্ক সে!

মেঝেয় বসে লক্ষ্মী কাঁদতে লাগল হাঁটুতে মুখ গুঁজে। কিন্তু সে কাঁদতে হয় বলে কাঁদা। মনে-মনে কী যে আনন্দে ভেসে যাচ্ছে সে!

দরজার একটু তফাত থেকে উঁকি মেরে দৃশ্যটা দেখে দুর্গাপদ হাঁ। বজ্জাত মেয়ে বটে। এত নাকাল করিয়ে নিজে এসেছে।

একমাত্র সন্তান মার খাচ্ছে বলে একটু কষ্টও হল দুর্গাপদর। কিন্তু লোভীর মতো জুলজুলে চোখে সে দেখলও দৃশ্যটা। ঠিক এরকমই দরকার কিছু লক্ষ্মীর মায়ের। দুর্গাপদ পেরে ওঠেনি। কিন্তু বহুদিনকার সেই পাকা ফোঁড়ার যন্ত্রণার মতো ব্যথাটা আজ যেন কেটে গিয়ে টনটনানি কমে গেল অনেক।

পরিশ্রান্ত নবীন ঘরে শিকল তুলে বেরিয়ে এলে পর দুর্গাপদ গিয়ে তার কাঁধে হাত রেখে হাসি হাসি মুখে বলল—এই না হলে পুরুষ।

রাত্রিবেলা লক্ষ্মী নিজের হাতে পরিবেশন করে খাওয়াচ্ছিল বাবাকে। মার খেয়ে মুখ চোখ কিছু ফুলেছে। কিন্তু সেটা নয়, দুর্গাপদ লক্ষ করল লক্ষ্মীর চোখ দু-খানায় আর সেই পাগুলে চাউনি নেই। বেশ জমজম করছে মুখ-চোখ।

লক্ষ্মী বলল—বাবা, রাতটা থেকে যাও না কেন?

নবীনও সায় দিল—রাত হয়েছে, যাওয়ার দরকারটা কি?

দুর্গাপদ মাথা নেড়ে ম্লান মুখে বলে—ও বাবা, তোর মা-কুরুক্ষেত্র করবে তা হলে। চিনিস তো!

দুর্গাপদ জানে সকলের দ্বারা সব হয় না। নিয়তি কেন বাধ্যতে।

বন্দুকবাজ

পল্টনের একটাই গুণ ছিল। সে খুব ভালো বন্দুকবাজ। বন্দুক বলতে আসল জিনিস নয় হাওয়া-বন্দুক। চিড়িয়া, বাঘ এমনকী ইঁদুর মারার যন্ত্রও সেটা নয়। তবে অল্প পাল্লায় চাঁদমারি করা যায় বেশ, আর পল্টনের হাওয়া-বন্দুকটা ছিল ভালো। তার জমিদার দাদু জার্মানি থেকে আনিয়ে দিয়েছিলেন।

জীবনটাকে প্রথম খাট্টা বানিয়ে ছাড়ল ইস্কুলের মাস্টাররা, আর বাবা। দিনরাত কেবল পড়-পড়। শেষমেষ 'পড়-পড়' শব্দটা তার কানে আরশোলার মতো ফড়ফড় কর বেড়াত, মাথার মধ্যে ফরর, ফরর করত।

বন্দুকবাজ ছিল তখন থেকেই।

দাদুর জমিদারি বাবা বিফলে দিল! তারপর থেকে শুখা ভদ্রলোক তারা। নিমপাতা দিয়ে ভাত খায়।

বাবা কেবল হুড়ো দেয় তখন—মানুষ হ। দাঁড়া। নইলে মরবি।

পল্টন জানে, বাবা এখন ছেলের মধ্যে তাগদ চায়। বাপ নিজে সুপুত্র ছিল না। তবে খারাপ দোষও কিছু নেই। চটপট বড়লোক হতে গিয়ে ফটাফট টাকা বেরিয়ে গেল। জমি গেল। বাড়িটা রইল শুধু। তা সে বাড়িরও ছুরত কিছু নেই। রংচটা দাদের দাগ সর্বাঙ্গে।

পল্টনের মাথায় পড়া ঢোকে না বাপের হুড়ো খেয়ে বই হরবখত ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ করত বটে, কিন্তু মা সরস্বতীর পায়ের ছাপ পড়ত না মাথার ঘিলুতে। তবে বন্দুকের নিশানা ছিল ওয়া : ওয়া। বিশ হাত দূর থেকে উলটো করে ধরা পেনসিলের শিস উড়িয়ে দিত একবারে। টান করে সুতো বাঁধা, পল্টন বিশ হাত দূর থেকে ছররা মেরে ছিঁড়ে দেবে। কোনও কাজে লাগে না গুণটা। কিন্তু আছে। অচল সিকি যেমন পকেটে পড়ে থাকে।

তার পথে বরাবরই নানান মাপের গাড্ডা। কখনও ছোট কখনও বড়। ক্লাস নাইনে সে প্রেমে পড়ল গার্লস স্কুলের পপির সঙ্গে। পপি পড়েনি। পড়াটা পল্টনের একতরফা। না পড়ে উপায়ই বা কী? হুবহু মেমসাহেবের মতো দেখতে পপি, তেমনি সাজগোজ তার, আর রাজহাঁসের মতো অহংকারী সে। পুরো গঞ্জের যুবজন ঢেউ খেয়ে গেল।

পপি কখনও বিনা ঘটনায় রাস্তায় হাঁটতে পারত না। রোজ কিছু-না-কিছু ঘটবেই। এক ছোকরা স্রেফ হিরো বনতে গিয়ে বাগী সিপাহির মতো দোতলার ছাদ থেকে লাফিয়ে পপির চোখ টানতে গিয়েছিল। দুটো ঠ্যাং বরবাদ।

আর একজন স্রেফ পপির জন্য গালর্স স্কুলের পুকুরে তেত্রিশ ঘণ্টা সাঁতরাল। নিউমোনিয়া হয়ে সে যায়-যায়।

আর-একজন কেবল পপির দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য আর-একজন প্রতিদ্বন্দ্বির পেটে ছুরি চালিয়ে দিল। একজন জেল, অন্যজন হাসপাতালে গেল।

অনেকে গান শিখতে লাগল, ফুটবল খেলতে লাগল, ছবি আঁকতে লাগল, গল্প বা কবিতা লিখতে লাগল সব পপির জন্য।

পপি কী ভালোবাসে? কী পছন্দ করে তা তো কারও জানা ছিল না।

পল্টনের আর কিছু নেই, বন্দুক আছে। এক বাজিকর বাজি দেখিয়ে মাতা মেরির আশীর্বাদ পেয়েছিল। গল্পটা জানত পল্টন। বাজিতে যদি হয় তো বন্দুক হবে না কেন? পল্টন গিয়ে ডালিমের সেলুনে চুল ছাঁটল সেদিন, সবচেয়ে ভালো হাফপ্যান্ট আর শার্টটা পরল। আর জুতোও পরল, যা সে কদাচিৎ পরে।

আমতলার রাস্তা দিয়ে পপি ইস্কুলে যাচ্ছে। সঙ্গে হরেক কিসিমের ফুরফুরে মেয়ে। সব ডগমগ। আর আড়াল আবড়ালে, আগে পিছে ছোকরারা নানা কায়দা করে চোখ টানার চেষ্টা করছে।

পল্টন ঠিক করল, দেখাবে। পপির বাঁ-বুকের ওপরে সাঁটা ইস্কুলের মেটাল ব্যাজ। বেশ ছোট ব্যাজ। পল্টন আমগাছের আড়াল থেকে বন্দুক তাক করল। বেশ শক্ত কাজ। প্রথম, পপি চলছে। দ্বিতীয়, তার চারদিকে বিস্তর চেলি চামুণ্ডী। কিন্তু বন্দুকবাজ পল্টন তো আর কাঁচা হাতের লোক নয়। সে ব্যাজটাকে ভালো মতো নিরিখ করে ঘোড়া টিপে দিল। ব্যাজটাকে টিপে দিয়ে লোহার গুলি লাফিয়ে উঠে পপির পা ছুঁল ভয়ে। কিন্তু ফসকায়নি।

কিন্তু পপির চোখের সামনে রুস্তম বলবার সাধ যারা এতকাল ধরে পুষছে তারা ছাড়বে কেন?

পপির লাগেনি, অলৌকিক হাতের টিপ পল্টনের। টিনের ব্যাজটা টোল খেয়ে গেছে। কিন্তু তখন কে শোনে তার কথা।

ভুলটা কোথায় হয়েছে বুঝবার আগেই তার মাথা থেকে সিকি চুল খামচে তুলে নিল ছোকরারা, পেট ফাটানো লাথি চালাল। নাক থ্যাবড়া করে দিল ঘুষিতে। তিনটে দাঁত নড়বড়।

প্রথমে ভয় খেলেও মার দেখে খুব হেসেছিল পপি আর তার বান্ধবীরা।

বন্দুকটা সেই গোলমালেও বেঁচে গিয়েছিল। সেটার ওপর কেউ যেন কে জানে আক্রোশ দেখায়নি।

মারে শেষ হল না। ইস্কুলে খবর হল। পরদিনই তার বাবার কাছে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট গেল ইস্কুল থেকে। ব্যথা বেদনার শরীরের ওপর বাবা আর-এক দফা চালাল। সেই রাতেই বন্দুক ঘাড়ে রাস্তা মাপল পল্টন। একটু খুঁড়িয়ে, ককিয়ে, মাঝে-মাঝে চোখের জল ফেলে।

ভোর হল শহরতলিতে। লেভেল ক্রসিং-এ একটা ফাঁকা গুমটি ঘর পেয়ে শুয়ে গিয়েছিল পল্টন। ভোর হল প্রচণ্ড খিদেয় পিপাসায়। ভোর হল ভয়ে।

কিন্তু ভোর তো হল!

পল্টন ভারী শহরে ঢুকে চারদিকে দেখে। বাবার সঙ্গে বহুবার এসেছে, তখন খারাপ লাগেনি। এখন মনে হল, ই বাবা, এখানে আবার না জানি কী হবে! কিন্তু ডরপোকের ইজ্জত নেই। সঙ্গে বন্দুক তো আছে এখনও। প্রথমে পল্টন তার আংটি বেচল। তারপর খেল পেট ভরে।

বাজারের কাছে বন্দুক হাতে ঘোরাঘুরি করার সময় বহু লোক তাকে ফিরে-ফিরে দেখতে থাকে। কয়েকটা বাচ্চা ছেলে পিছু নেয়। একটা ছেলের হাতে আধ খাওয়া জিলিপি। পল্টন তাকে বলল, জিলিপিটা ধরে দাঁড়া।

ছেলেটা দাঁড়ায়। বিশ হাত দূর থেকে পল্টন বন্দুক মারে, জিলিপি পড়ে যায়।

ছেলেটা কেঁদে ওঠে বটে, কিন্তু বহু লোক তাকে শাবাশ দিতে থাকে।

তো পল্টনের পয়লা কাম সাফা, এ কাজটা হল সবচেয়ে শক্ত কাজ। ঢোকা। ঢুকে পড়া। পল্টন পয়লা গুলিতেই শহরে ঢোকার রাস্তা করে নিল।

সে জোগাড় করল আলপিন, ছুরি, টমেটো, আলু, সুতো আর যত সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম জিনিস আছে। ছুরির মাথায় টমেটো গেঁথে, সুতো ঝুলিয়ে, আলপিনের ডগা লক্ষ করে সে দমাদম বন্দুক মারে। একটা তাস দাড় করিয়ে যে-কোন ফোঁটায় গুলি লাগায় দশ-বিশ হাত দূর থেকে। গুলি ফসকায় না। মোমবাতির শিখা নিভিয়ে দেয়, উড়ন্ত মার্বেল ছটকে দেয়।

দিনে দেড়-দু-টাকা রোজগার দাঁড়াল। কোই পরোয়া নেই। একটা চালের আড়তে পাহারা দেওয়ার কাজ পেল, সেইখানেই মাথা গোঁজার জায়গা আর দু-বেলা খাওয়া। সারাদিন শহরের এখানে সেখানে বন্দুকবাজি। তবে ভুলেও সে আর মেয়েদের দিকে তাকায় না। ওপড়ানো জায়গায় ফের চুল গজাতে অনেক সময় লেগেছে।

তো বন্দুক আর পল্টন আছে। আর কী চাই?

আড়তের মালিক চেন্টুবাবুর আসলি বন্দুক আছে। দুটো নল দিয়ে আগুনে সিসে ছটকায়। চেন্টু বলে—চালাবি?

উদাস স্বরে পল্টন বলে—ও বড় ভারী জিনিস।

দূর ব্যাটা। অভ্যাস কর।

পল্টন আসল বন্দুকের খদ্দের নয়। সে কোনওদিন পাখি মারেনি, বাঘ মারেনি, বেড়াল পর্যন্ত নয়। জীবজন্তু মারতে বড় কষ্ট হয়। আসল বন্দুকে তার তবে কাজ কী?

কিছুদিন যায়। হাওয়া-বন্দুকের খেল শহরে পুরোনো হয়ে গেছে। নতুন আর কিছু না দেখালে লোকে তাকাবে কেন?

খুব ভাবে পল্টন। সে চিৎ হয়ে, উপুড় হয়ে, হেঁটমুন্ডু হয়ে বহু লক্ষ্যভেদ দেখিয়েছে। কিন্তু তাও তো সব দেখা হয়ে গেছে মানুষের। আর কী বাকি আছে? রাতের বেলা হাওয়া-বন্দুক কোলে নিয়ে পল্টন জেগে বসে আড়ত পাহারা দেয় আর ভাবে। ভাবতে-ভাবতে একদিন চেন্টুবাবুকে বলল—বন্দুক ছাড়া আর তো কিছু জানি না। তা বললেন যখন তো দিন আপনার মারণ কল। চালাই।

পারবি তো?

প্র্যাকটিস তো করি!

চেন্টুবাবু বন্দুক দিলেন। বললেন—গুলির বড় দাম। সাবধান, বেশি খরচ করিসনি।

খুবই ভারী বন্দুক, হাওয়া-বন্দুকের পাঁচগুণ। চেন্টুবাবু তাকে নিয়ে এক ছুটির দিনে শহরের বাইরে গেলেন বন্দুক শেখাতে।

সারাদিন দমাদম চাঁদমারি হল। দিনের শেষে চেন্টুবাবু হাঁপাতে-হাঁপাতে বললেন—তুই শালা একলব্যের বংশ।

মিথ্যেও নয়। আসলি চিজ পয়লা দিন ধরেই পল্টন খেল দেখিয়েছে। পিসবোর্ডে আঁকা গোল টার্গেটের ঠিক মাঝখানে একটা-পর-একটা গুলি পাম্প করে দিয়েছে; এদিক-ওদিক হয়নি চেন্টুবাবু শূন্যে ঢিল ছুড়েছেন, আর পল্টন সেই ঢিল ছাতু করেছে। তারপর নারকোল পেড়েছে বন্দুকে, বটের ফল পেড়েছে, সর্বশেষে একটা ওল্টানো কাচের গ্লাসের ওপর রাখা একটা কমলালেবু ছ্যাঁদা করেছে, গ্লাসটার চোট হয়নি।

শহরে শখের শিকারি কিছু কম নেই। পল্টনের বন্দুকের হাত সবাই জেনে গেল। সেই থেকে সে শিকারি পার্টির সঙ্গী। ছুটির দিনে কেউ-না-কেউ এসে বলবেই, চল রে পল্টন।

পল্টন যায়। নিজের হাতে জীবজন্তু সে মারে না। তবে বন্দুক বয়। গুলি ভরে দেয়। সঙ্গে থাকে। কথা কম বলে সে। কেউ চাইলে বন্দুকের নানা ভেলকি দেখায়। চলন্ত জিপগাড়ি থেকে টার্গেট মারে, ঘোড়ার পিঠ থেকে পিছন ফিরে লক্ষ্যভেদ করে, হেঁটমুণ্ডু হয়ে নিশানায় গুলি চালায়।

বিশ্বাসবাবু বললেন—তা পাখি মারিস না কেন?

কষ্ট হয় বাবু। পাখির তো বন্দুক নেই। সে উঠে কী চালাবে?

ব্যাটা ফিলজফার!

পল্টন জানে মারাটা উভয় পক্ষেই হওয়াটা হক্কের। এক তরফা ভালো নয়। পাখি বন্দুক চালালে সে-ও উলটে চালাতে পারত।

চৌধুরি সাহেব বললেন—কিন্তু বাঘ?

—বাঘেরও বন্দুক নেই। তা ছাড়া সে তো আমার ঘরে গিয়ে হামলা করেনি। বরং তার জায়গায় এসে আমিই ঝামেলা চালাচ্ছি।

—তোর কপালে কষ্ট আছে।

সে জানে পল্টন। কপালে কষ্ট তার নেই তো কার আছে!

অফিসারদের ক্লাবে পল্টন চাকরি পেয়েছে। টেনিস বল কুড়িয়ে দেয়, ঘাস ছাঁটে, গলফের ব্যাগ নিয়ে যায়, মদ ঢেলে দেয়।

একদিন খেয়ালবশে গলফ স্টিক চালিয়ে বহু দূরের গর্তে বল ফেলল।

মিত্র সাহেব বিয়ারের জাগ হাতে রঙিন ছাতার তলায় বসেছিলেন। দেখে বললেন—হোল ইন ওয়ান! আবার মারো তো!

আবার মরে পল্টন এবং এবারও গর্তে বল ফেলে।

সেই থেকে পল্টন একনম্বর গলফ খেলোয়াড়। সেই থেকে সে বিলিয়ার্ডেও সবচেয়ে চৌখস। পল্টন ছাড়া সাহেবদের চলে না। পল্টন ছাড়া ক্লাব অচল।

কাছাকাছি বউ বা প্রেমিকা থাকলে কোনও সাহেবই পল্টনের সঙ্গে বড় একটা বিলিয়ার্ড বা গলফ খেলে না।

গুহ সাহেব নতুন এসেছেন। সুন্দরী স্ত্রী।

[গল্পের নিয়মে গুহ সাহেবের স্ত্রী হতে পারত সেই পপি। জীবন তো অনেক সময় গল্পের মতোই হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, গুহ সাহেবের স্ত্রী পপি নয়। অন্য একজন।]

পল্টন বিলিয়ার্ড টেবিলে একা-একা বল চালাচালি করছিল। সাহেবরা কেউ আসেনি তখনও।

গুহ সাহেব হাত গুটিয়ে বললেন, হয়ে যাক এক হাত।

হল। হেরে ভূত হয়ে গেলেন গুহ। পল্টন গা লাগিয়েও খেলল না।

পরদিন গলফে সে গুহ সাহেবকে একদম বুরবক বানিয়ে ছাড়ল।

কিন্তু গুহ সাহেব বুরবক হতে পছন্দ করেন না। তিনি বিদেশে বিস্তর গলফ আর বিলিয়ার্ড খেলেছেন। কম্পিটিশানে শুটিং করেছেন। তাই ক্রমে-ক্রমে তাঁর পল্টনের সঙ্গে একটা অদেখা শত্রুতা গড়ে উঠতে থাকে।

শীতকালে জলায় বাঘ আসে। সেবারও এল। সাহেবরা বন্দুক কাঁধে বাঘ মারতে চললেন। সঙ্গে পল্টন।

জঙ্গল বিটিং হচ্ছে। জঙ্গলের বাইরে দু-সার বন্দুক তৈরি।

পল্টন দূরে একটা গাছতলা বেছে ছায়ায় বসে আছে। বসতে-বসতে ঢুলুনি এল। শুয়ে গেল সেইখানেই।

বাঘটা বেরোল বিদ্যুৎশিখার মতো। তারপর ঢেউ হয়ে ছুটতে লাগল খোলা মাঠ দিয়ে, আগুনের মতো উজ্জ্বল শরীরে।

মোট দশখানা বন্দুক গর্জে উঠল দুই সারি থেকে। তার পরেও গর্জাতে লাগল। ধোঁয়ায় ধোয়াক্কার, বারুদের গন্ধে বুক ছিঁড়ে যায়।

বাঘটা ঝাঁঝরা হয়ে পড়ে গেল ধানের খেতে। তার রক্তে মাটি উর্বর হতে লাগল। পল্টন শুয়ে ছিল টিলার মতো উঁচু জায়গায়। গাছতলায়। সবই ঠিক আছে তার শুধু তোলা হাঁটুর মাঝখানে একটা ছ্যাঁদা। তীর বেগে রক্ত বেরোচ্ছে।

যখন সবাই ঘিরে ধরল তাকে সে কাতর স্বরে বলল, শাবাশ। লেগেছে ঠিক। ঠিক লেগেছে। শাবাশ সাহেব।

কাকে বলল কেউ বুঝতে পারল না। তবে মাসখানেক বাদে গুহ সাহেবের স্ত্রী তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে ডিভোর্সের মামলা আনলেন আদালতে।

জমা খরচ

কী বুঝছ মুখুজ্জে? চল্লিশ পেরিয়ে জীবনের এক-আধটা হিসেব কষে ফেলা উচিত ছিল তোমার। একদিন ছুটি-টুটি দেখে বরং একটা খাতা নিয়ে বসে যাও। একদিকে লেখো জমা, অন্য ধারে খরচ। ওই যেমন অ্যাকাউন্ট্যান্টরা ডেবিট-ক্রেডিট লেখে আর কি?

জমার ঘরে প্রথমেই লেখো, জন্ম। ওটা প্লাস পয়েন্ট। একটা আর্নিং তো বটেই। কিন্তু আয়ুটাকে জমার ঘরে রেখো না। জন্মের পর থেকে আয়ু আর জমা হয় না। ওটা খরচ বলে ধরো।

ব্যালানস শিটটার দিকে একবার তাকাও, ভালো দেখাচ্ছে না? জমা, জন্ম। খরচ, আয়ু।

জন্মের পর একরোখা বহুদূরে চলে এসেছ। টর্চের আলোটা একটু পিছন দিকে ঘুরিয়ে ফেলবে নাকি? মগজের ব্যাটারি এখন আর তেমন জোরালো নয় হে। আলো একটু টিমটিমে। তবু দেখা যায়। একটা সাইকেল দেখতে পাচ্ছ, মাটির দাওয়ায় ঠেস দিয়ে দাঁড় করানো? একটা লেবু গাছ! আর ওই মস্ত সেই নদী! শীতের দুধসাদা চর জেগে ওঠে বুকে, ভরা বর্ষায় রেলগাড়ির মতো বয়ে যায়!

এসব কোনও খাতেই লিখো না মুখুজ্জে। ওগুলো না জমা, না খরচ। ওই সেই বাঘের মতো রাগী লোকটা সন্ধ্যায় আবছায়ায় পুবমুখো মস্ত ডেক চেয়ারে বসে আছে বারান্দায়! চেনো তো! আর কারও বশ মানেনি, কখনও, কেবল তোমার কাছে মেনেছিল। তোমার ইস্কুলের হাতের লেখা পর্যন্ত চুপি-চুপি লিখে দিত, ভুলে গেছ? কোন খাতে ধরবে তোমার দাদুকে?

জমার ঘরে ধরলে? ভুল করলে না তো? একটু ভেবে দ্যাখো। বরং কেটে দাও। কোনও খাতেই ধোরো না।

ময়ূরটার কথা লিখবে নাকি? সত্যি বটে, গোলোকপুরের জমিদার বাড়ির মস্ত উঠোনে পাম গাছের নীচে ওকে তুমি বহুবার পেখম ধরে থাকতে দেখেছ। চালচিত্রের মতো রঙিন বিস্ময়। কিন্তু বলো, বিস্ময় আমাদের কোনও কাজে লাগে? আমাদের মূলধন জমার খাতে সৌন্দর্যের কোনও ভূমিকাই নেই।

বরং জমার খাতে ধরতে পারো তোমার জেঠিমার হাতে ডাল ফোড়নোর গন্ধটাকে। ওই অসম্ভব সুন্দর ডাল দিয়ে থাবাথাবি করে কতজন ভাইবোন মিলে এক থালায় ভাত মেখে খেতে।

আর বর্ষায় মুকুন্দর ঘানিঘরের পিছনে যে কদমফুল ফুটত! যদি খুব ইচ্ছে হয়, তবে ওটাকেও জমার ঘরেই ধরতে পারো। তবে আমি বলি ফুলটুল জীবনে খুব একটা কাজে লাগে না। কদম ফুল অবশ্য লেগেছিল। পাপড়ি ছিঁড়ে গোল মুণ্ডুটা দিয়ে তোমরা ফুটবল খেলতে শিখল।

প্রথম এরোপ্লেন দেখার কথা মনে পড়ে? টর্চটা ভালো করে ফেলো। দেখতে পাবে। ওই যে কলকাতার মনোহরপুকুরের সেই দোতলার ঘর? দেশের বাড়ি, নদী, লেবু বন, দাদু সবকিছু থেকে ছিনিয়ে আনা হয়েছিল তোমাকে। সারাদিন মন খারাপ। পৃথিবী জুড়ে তখন বিশাল এক যুদ্ধ চলছে। এরোপ্লেনের আওয়াজ পেলেই ঘর থেকে দৌড়ে বেরিয়ে আসতে তুমি। মাথাটা উঁচুতে তুলতে। তুলতে-তুলতে মাথা লটকে যেত পিঠের সঙ্গে। এরোপ্লেন যেত ঝাঁক বেঁধে। তার মধ্যে একটা এরোপ্লেন দলছুট হয়ে একটা ডিগবাজি খেয়ে নিয়ে আবার উড়ে গেল।

তোমার শৈশব মাখামাখি হয়ে আছে রেলগাড়ি আর এরোপ্লেনে। তোমার ভিতরে জঙ্গল, পাহাড়, নদী, কুয়াশা, চা-বাগান ঢুকে পড়েছিল কবে! আজও তুমি তাই নিজের চারদিকটা স্পষ্ট করে দেখতে পাও না। মাঝে-মাঝে ঝুম হয়ে বসে থাকো। তোমার মাথার মধ্যে রেললাইন দিয়ে গাড়ি বহু দূরে চলে যায়, আকাশ পেরোয় বিষণ্ণ এরোপ্লেনের শব্দ, অবিরল নদী বইতে থাকে। তোমার সময় যায় বৃথা। মুখুজ্জে, এগুলো তোমার খরচের দিকে ধরে রাখো।

সেই কোকিলের ডাকের কথা তুমি বহুবার শুনিয়েছ লোককে। কাটিহারের সেই ভোরবেলা, শীতশেষের কুয়াশা মাখা আবছায়ায় শিমূল বা মাদার গাছের মগডাল থেকে একটা কোকিল ডেকে উঠেছিল। সেই ডাকে অকস্মাৎ ভেঙে পড়ল শৈশবের নির্মোক। তুমি জেগে উঠলে। সত্যি নাকি মুখুজ্জে? ঠিক এরকম হয়েছিল?

সেই কোকিলের ডাকের কথা তুমি একদিন বড় হয়ে বলেছিলে তোমার ভালোবাসার যুবতীটিকে।

সে বলল, যাঃ।

সত্যি। তুমি বুঝবে না বুলু। এরকমই হয়েছিল।

কোকিলের ডাক আমি তো কত শুনেছি। কোনওদিন আমার সেরকম হয়নি তো।

আঃ, কোকিলের ডাকটাই তো আর বড় কথা নয়।

তবে?

সে যে সেই বিশেষ মুহূর্তে ডেকে উঠল সেইটেই বড় কথা।

বিশেষ মুহূর্তটা কীসের?

শিশু বয়সের অবচেতনার ঘরবাড়ি ভেঙে পড়ল যে।

যাঃ, বানানো কথা।

মুখুজ্জে, আজও তুমি ঠিক করতে পারোনি, কোকিলটাকে কোন খাতে ধরবে। কিন্তু কোনও- না-কোনও খাতে ধরতেই হবে যে, ওটা যে তোমার জীবনকে দুটো ভাগে ভাগ করে দিয়েছিল।

ধরো, জমার খাতেই ধরো।

কোকিলের ডাকের পরেই এল মঞ্জু। মঞ্জুই তো? ঠিক বলছি না! মঞ্জুর মতো সুন্দর মেয়ে সেই বয়সে তুমি আর দ্যাখোনি। বব চুল, ফরসা, টুকটুকে, মেম ছাঁটের ফ্রক। এর কথাও তুমি বহুবার বলেছ।

মঞ্জুর সঙ্গে কথা বলতে লজ্জা পেতে। মঞ্জুও তোমাকে পাত্তা দিত না। কিন্তু সেই বয়সের টান কি সহজে ছাড়ে। ওদের বাড়ির আনাচকানাচ দিয়ে ঘুরতে, গুলতে পাখি মারবার চেষ্টা করতে, বড় গাছে উঠে যেতে। দেখানোর মতো এইসব বীরত্বই সম্বল ছিল তোমার।

তারপর একদিন নিজেদের বাগানে খেলতে-খেলতে মঞ্জু একদিন ফটকের কাছে ছুটে এসে ডাক দিল, রতু! এই রতু!

তুমি পালাচ্ছিলে ডাক শুনে। মঞ্জু ছাড়েনি তবু। ফটক খুলে পাথরকুচির রাস্তায় কচি পায়ের শব্দ তুলে দৌড়ে এসে হাত ধরল। বড়-বড় চোখে চেয়ে রইল মুখের দিকে, অবাক

হয়ে।

এত ডাকছি, শুনতে পাওনি?

ডাকছিলে? ও, তাহলে শুনতে পাইনি।

ঠিক শুনেছ। দুষ্টু কোথাকার। ভারী ডাঁট তো তোমার।

তুমি কথা বলতেই পারোনি।

মঞ্জু হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল তোমাকে, ওদের বাগানে। পরির মতো মেয়েরা খেলছে ওদের বাগানে, গাছে চড়ছে, হাসছে, চেঁচাচ্ছে। চোরের মতো দাঁড়িয়ে ছিলে তুমি।

মঞ্জু দৌড়ে একটা পেয়ারা এনে তোমার আড়ষ্ট হাতে গুঁজে দিয়ে বলল, খাও রতু।

খাবো?

তবে পেয়ারা দিয়ে কী করে লোকে? খায়ই তো!

কী যে সুগন্ধ মাখানো ছিল পেয়ারাটার গায়ে, আজও মনে আছে তোমার। হয়তো পাউডার বা স্নোয়ের গন্ধ, হয়তো তা মঞ্জুরই গন্ধ।

পেয়ারাটাকে কোন খাতে ধরবে মুখুজ্জে!

ইস্কুলে চোরের মার খেতে তুমি রোজ। মার খেতে খালাসিপট্টিতে, মেছোবাজারে, বাবুপাড়ায়। দুষ্টু ছিলে, দাঙ্গাবাজ ছিলে, তাই মার খেতে-খেতে বড় হলে। সবচেয়ে বেশি লেগেছিল একদিন। ইস্কুল থেকে ফেরার সময়ে খালাসিপট্টিতে একটা লোক হঠাৎ অকারণে কোথা থেকে সুমুখে এসে তোমার পথ আটকাল।

তুমি পাশ কাটাতে চেষ্টা করছিলে।

লোকটা হঠাৎ বলল 'শুয়ারকা বাচ্চা', তারপর বিনা কারণে তোমার কান ধরে গালে একটা চড় কষিয়ে দিল। সেই চড়টা আজও জমা আছে। কিছুতেই ভোলোনি। শোধ নেওয়া হয়নি। তুমি শোধ নিতে ভালোবাসো না কিন্তু আজও ভাবো, এই চড়টার শোধবোধ হওয়া দরকার। চড়টাকে কোন খাতে ধরবে মুখুজ্জে?

বড় একটা শ্বাস ফেললে। ফেল। তোমার অনেক নিশ্বাস জমা হয়ে আছে।

বেশ গুছিয়ে বসেছ। প্রথম যৌবনের ততটা টানাটানির সংসার আর নেই। দু-বেলা দুটো ভালোমন্দ খাও। ঘরে দু-চারটে দামি জিনিসপত্রও নেই কি? আর ছেলে, মেয়ে, বউ।

বউ সেই মঞ্জু নয়, বুলুও নয়। এ অন্য একজন, যাকে তুমি আজও চেনোনি।

বউ বলে, তুমি অপদার্থ, ভীতু। বদমাশ। কখনও বলে, তোমাকে ভালোবাসি।

এইসব কথাগুলো হিসেবে ফেলে দ্যাখো তো, কোনটা জমা, কোনটা খরচ।

পারছ না মুখুজ্জে, গুলিয়ে যাচ্ছে।

ওই যে একটা চিঠি এল তোমার নামে সেদিন। কী সুন্দর এক অচেনা মেয়ের চিঠি।

পড়ো মুখুজ্জে। লিখেছে : আপনার একটুখানি বেঁচে থাকা আমার কাছে অনেকখানি। প্রণাম করলাম।

কোন খাতে চিঠিটাকে ধরছ? জমা! হাসালে!

বড্ড জট পাকিয়ে যাচ্ছে হিসেব নিকেশ মুখুজ্জে। মেয়ে এসে গলা জড়িয়ে বলছে, বাবি, তোমাকে আমি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি। অবোলা ছোট্ট ছেলেটা তোমাকে দেখলেই দুহাত তুলে ঝাঁপিয়ে আসে।

এগুলো জমার খাতে ধরবে না!

সুখ আর দুঃখগুলোকে আলাদা করে-করে আঁটি বেঁধে রেখেছ, কিন্তু কোন খাতে যাবে তা ধরোনি। সব সুখই তো আর জমা নয়। সব দুঃখই যেমন নয় খরচ।

কাঁদছ মুখুজ্জে! কাঁদ। এই মধ্য বা শেষ যৌবনে একটু-আধটু কাঁদতেই হয় মানুষকে। হিসেবের সবে শুরু কি না।

ক্রীড়াভূমি

নিজের ভিতরই আছে এক অলৌকিক। কখনও-কখনও তাকে টের পাওয়া যায়। স্পষ্ট নয় — কেন না একমাত্র ধর্মের পথেই সেই অলৌকিক স্পষ্ট ও ঈশ্বরের সমতুল হয়। তুমি স্বধর্মে কখনও স্থির থাকো না—সুতরাং তুমি কখনও-কখনও একপলকের জন্য মাত্র সেই অলৌকিককে প্রত্যক্ষ করে বিপদগ্রস্ত হও।

তাই তুমি একবার স্বপ্নে এক জনহীন প্রান্তরে দাঁড়িয়ে এক নীল অতি সুন্দর বর্ণের উড়ন্ত সিংহকে তোমার নিকটবর্তীহতে দেখে ভয় পেয়েছিলে। অথচ ভয়ের কারণ ছিল না, কেন না সেই সিংহের নীল কেশর, নীল চোখ ও নীল নখ সবকিছুই হিংস্রতাশূন্য ছিল; এবং সেই নীলবর্ণ সিংহের বাসস্থান ছিল না বলে সে অতি নম্রভাবে তোমার সম্মুখের ভূমি স্পর্শ করে তোমার কাছে একটি বাসস্থানের সন্ধান জানতে চায়, কেন না তুমি এই পৃথিবীর আইনসম্মত বসবাসকারী। তুমি নিজেও জানো না কেন তুমি তাকে উপর্যুপরি গুলি করেছিলে; কেন? সেই গুলির শব্দ শুনে এবং আহত ও ক্রুদ্ধ সেই সিংহ তার ক্ষতস্থান কামড়ে ধরে তোমার দিকেই ফিরে তাকালে তোমার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। কিন্তু ঘুম থেকে জাগরণের ভিতরে চলে আসবার সময় যখন তুমি এক অতি সূক্ষ্ম বাধাকে অতিক্রম করছিলে তখন তোমার এক অংশ জাগ্রত ছিল, অন্য অংশকে ভয়ে আর্তনাদ করতে শুনেছিল। স্বকণ্ঠের সেই অলৌকিক স্বপ্নাবিষ্ট আর্তনাদ এখনও তোমার পাপবোধকে তাড়িত করে—তুমি গুলি করেছিলে কেন? যদি স্বপ্নে আবার দেখা হয়, যদি কয়েকটি চিহ্নের দ্বারা সেই সিংহ তোমাকে আবার শনাক্ত করে? কিংবা যেন আর একবারও ভিন্ন এক স্বপ্নে তুমি তোমার বন্ধু অতীশকে খুন করেছিলে বলে জাগ্রতবস্থায়ও বহুদিন তুমি বিমর্ষ ছিলে কেন? তোমার প্রশ্ন এই যে, স্বপ্নেও কেন তুমি হত্যাকারী?

কিংবা কয়েক বছর আগে এই শীতকালে টেরিটিবাজারের কাছে তুমি যে মোটর দুর্ঘটনায় পড়েছিলে তার কথা ধরা যাক। সেদিন বিকেলের পার্টিতে তুমি সামান্য হুইস্কি

খেয়েছিলে, কিন্তু মাতাল হওনি; সেদিনকার পার্টিতে তুমি অনেকক্ষণ বিদেশি নাচ নেচেছিলে, কিন্তু তুমি ক্লান্ত ছিলে না। এমনকী নাচের সময় যে মহিলা সারাক্ষণ তোমার বক্ষলগ্ন ছিল তার মুখও তোমার ঠিক মনে পড়েনি। ঠিক কী হয়েছিল তা আজও তোমার জানা নেই। শুধু এইটুকু মনে আছে যে, তখন অনেক রাত, ফেরার পথে টেরিটিবাজারের কাছে রাস্তা ফাঁকা ছিল, গাড়িতেও তুমি ছিলে একা। তুমি জোরে চালিয়ে দিলে তোমার গাড়ি। তোমার পুরোনো আমলের পৈতৃক মোটরগাড়িতে ভয়ঙ্কর লঝঝড় শব্দ হচ্ছিল বলে তুমি মাঝে-মাঝে গালাগাল দিচ্ছিলে, মাঝে-মাঝে তুমি তোমার প্রিয় ফরাসি গান 'ও-লা-লা ও-লা-লা' গাইছিলে, অথচ গিয়ার স্টিয়ারিং ক্লাচ ও অ্যাক্সিলেটারের ওপর তোমার হাত পাগুলি নির্ভুল কাজ করে যাচ্ছিল। বিপদের কোনও সম্ভাবনা ছিল না—কেন না তোমার গাড়িটির গান নেই, অন্যমনস্কতা নেই। তার ধর্ম এই যে, সে শুধু তোমার সঙ্গে যুক্ত হয়, তোমার ইন্দ্রিয়গুলির মধ্যে প্রবেশ করে এবং তার স্বধর্মে তোমাকে টেনে নিয়ে যায়। তোমার গাড়িটির আত্মা নেই, পাপ-পুণ্য নেই, তবু তুমি এই মোটরগাড়িটিকে ভালোবাসো, যেমন, মানুষ তার গৃহপালিতগুলিকে ভালোবাসে, অথচ তোমার গাড়িটি কি প্রতিদানশীল? কী হয়, যদি তুমি গাড়ির যন্ত্র-সংলগ্ন তোমার হাত-পা তুলে নাও, চোখ বন্ধ করো? এই অলৌকিক চিন্তা হঠাৎ মনে এলে তুমি আপন মনে তোমার হাত-পা কিছুক্ষণের জন্যে তুলে নেওয়ার চেষ্টা করে দেখলে ধর্মান্ধ এই মোটরগাড়ি তোমার ইন্দ্রিয়গুলিকে অধিকার করে আছে, তার কাছে তুমি তুচ্ছ ও অন্তঃসারশূন্য। কিংবা হয়তো তুমি স্বভাবত আত্মরক্ষাকারী, সেইজন্য মোটরগাড়ির সঙ্গে তোমার সম্পর্ক অমোঘ। হতাশ হয়ে তুমি আবার কিছুক্ষণ ফরাসি গান গেয়েছিলে এবং পরমুহূর্তেই এক অন্যমনস্কতা তোমাকে পেয়ে বসেছিল। অকারণে তোমার মনোরম, ছেলেবেলায় দেখা তোমার প্রিয় কিশোরীদের মুখগুলি তোমার মনে পড়েছিল। সেই মুখগুলি তোমার আজও প্রিয়, কেন না ফের দেখা হয়নি। তোমার ছেলেবেলায় কবে যেন তোমার একটা মার্বেল হারিয়েছিল, আজও সেই মার্বেলটার কথা মনে রয়ে গেছে, কেননা এখনও মাঝে-মাঝে স্বপ্নে সেই মার্বেলটা তুমি হঠাৎ কুড়িয়ে পাও। সেই মার্বেল তোমার মাথার ভিতরে শব্দহীন গড়িয়ে গেল। তুমি হঠাৎ লক্ষ করেছিলে কবেকার স্বপ্নে দেখা এক নীল সিংহ তোমার মাথার ভিতরে আজও বাসা বেঁধে আছে। অন্যমনস্কভাবে তোমার খেয়াল হয়েছিল যে, তুমি যে, 'ও-লা-লা ও-লা-লা' গানটি গাইছিলে, তোমার সেই প্রিয় ফরাসি গানটির সুর ছিল সেইসব গ্রামীণ মানুষগুলির সুরের মতো, যারা গো-চারণক্ষেত্রে ও বীজক্ষেত্রে ও নৌবাহনের সময় এরকম গান গায় এবং আত্মপ্রকাশহীন নিজেকে প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত করে। এইখানে তুমি কিছুক্ষণের জন্য মোটরগাড়ির সঙ্গে, তোমার গানের বিষণ্ণ গ্রামীণ সুরে আবিষ্ট থেকে যখন এক গভীর নিরাসক্তি তোমাকে পেয়ে বসেছিল তখন—ঠিক কী হয়েছিল তোমার মনে নেই। তুমি তোমার জাগ্রত অংশকে ফাঁকি দিয়ে স্বপ্নে পতনশীল মানুষের মতো হঠাৎ যন্ত্র-সংলগ্ন

তোমার হাত-পা টেনে নিয়েছিল। তোমার মোটরগাড়ি টাল খেয়ে গেল; পলকের মধ্যেই বিপদ বুঝতে পেরে তুমি সোজা হয়ে বসে গিয়ার স্টিয়ারিং ক্লাচ ও অ্যাক্সিলেটার চেপে ধরতে গিয়ে দেখলে ভয়ঙ্কর স্মৃতিভ্রংশ ঘটে গেছে, তুমি কোনওটারই ব্যবহার জানো না। ইতিমধ্যে চোরাগলি, অন্ধকার, তীব্র বাঁক দেওয়ালের খাড়াই তোমার দিকেই ধাবমান দেখে তুমি চিৎকার করে উঠেছিলে। আবার ঠিক সময়ে ব্রেক চেপে ধরেছিলে তুমিই। তোমার মোটরগাড়ি ভীষণ লাফিয়ে উঠে থামল। কিন্তু স্টিয়ারিংয়ের সঙ্গে দারুণ সংঘর্ষে তোমার পাঁজরার একটা হাড় মট করে ভেঙে গেলে তুমি তীব্র যন্ত্রণায় ঢলে পড়ে অস্ফুট গাল দিলে 'ইডিয়ট'।

কিংবা আর-একদিন, যেদিন তোমার ছিমছাম শূন্য বাড়িতে অনেকদিন পর মনোরমা এসেছিল। সন্ধে হয়ে গেলে তুমি আলো জ্বালানি, আধো অন্ধকারেই সুবিধে ছিল তোমার। মনোরমা অনেকক্ষণ গ্রামোফোন বাজাল তারপর 'ধ্যুৎ ভালো লাগছে না', বলে উঠে গিয়ে পিয়ানোর কাছে বসল জানালার দিকে পিঠ রেখে। যদিও সে পিয়ানো বাজাতে জানত না, তবু ওই জায়গাটা ছিল তার প্রিয়, কেন না ওখান থেকে পুরো ঘরটার দিকে না তাকিয়েও তোমাকে দেখা যায়। তুমি তোমার হেলানো চেয়ারে পড়েছিলে মনোরমার মুখোমুখি। মনোরমা সারাক্ষণ দেখছিল তোমাকে—চোখ না খুলেও তুমি টের পাচ্ছিলে। তুমি কেন তাকে ডেকে পাঠিয়েছ তা জানবার কৌতূহল থাকলেও সে কোনও প্রশ্ন না করেই তা জানতে চাইছিল। তুমি কী করে তোমার সেদিনকার হৃদয়হীন কথাবার্তা শুরু করবে তা ভেবে পাচ্ছিলে না। কেন না কথাগুলো বলা হয়ে গেলে মনোরমা চলে যাবে—এই যাওয়াটা তার পক্ষে কত অপমানকর তা ভেবে মনে-মনে বড় কষ্ট পাচ্ছিলে তুমি। তুমি একপলক চোখ খুলে দেখলে সে অন্যমনস্ক দৃষ্টিতে আলমারিতে সাজানো খেলাধুলোয় পাওয়া তোমার ট্রফিগুলো দেখছে। পরমুহূর্তেই উঠে গেল সে, ছায়ার মতো তাকে বইয়ের র‍্যাকের কাছে, টেলিফোনের কাছে, ড্রেসিং টেবিলের কাছে পরপর দেখা গেল, আবছা গলা শোনা গেল তার 'তুমি কি ভীষণ চরিত্রহীন সুমন!' তুমি ভেবে পেলে না—ও কি করছে। কিন্তু সুযোগ বুঝে তুমি বলতে শুরু করেছিলে 'শোনো মনোরমা—।' মনোরমার ছায়াকে আবার পিয়ানোর কাছে দেখা গেল, তুমি আবার বললে 'শোনো মনোরমা।' পরমুহূর্তে মাথা নীচু করল মনোরমা, তার ডানহাত কোলের ওপর থেকে শাড়ির আঁচল তুলে নিলে তুমি অতর্কিতে বুঝতে পেরেছিলে মনোরমা কাঁদছে। তুমি তাড়াতাড়ি উঠতে যাচ্ছিলে, তুমি কিছু বলবার চেষ্টা করেছিলে, কিন্তু তার আগেই কান্নার ঝোঁকে ভর রাখতে গিয়ে মনোরমা বাঁ হাত বাড়িয়ে পিয়ানোর এলোমেলো রিডগুলো ছুঁয়ে গেলে তুমি তড়িদাহতের মতো স্থির হয়ে গেলে। ধীর গম্ভীর স্বরে সেই পিয়ানো তোমাকে চুপ করতে বলল। তুমি আর-একবার উঠবার চেষ্টা করলে। পিয়ানো গর্জন করে উঠল। যেন মনোরমার কাছে যাওয়ার চেষ্টা

করলে ডালা-খোলা প্রকাণ্ড সেই অন্ধকার পিয়ানো তোমার ওপর লাফিয়ে পড়বে। তুমি আবার মনোরমার স্বর শুনতে পেলে 'সুমন, তুমি চরিত্রহীন—।' লিতকণ্ঠে তুমি আবার মনোরমার নাম ধরে ডাকলে, ঠিক সেই সময়ে উঠে দাঁড়াতে গিয়ে মনোরমা ভারসাম্য রক্ষার জন্য আবার পিয়ানোর রিডে হাত রেখেছিল, তার অশিক্ষিত অপটু হাতে পিয়ানো তীব্রভাবে বেজে উঠলে ঘরের সবকিছু প্রাণ পেয়ে গেল। অর্থহীন শ্বেতপাথরের টেবিল, টেলিফোন, বইয়ের র‍্যাক, ওয়ার্ডরোব—এ সবকিছুই তোমার ওপর লাফিয়ে পড়বে—এরকম মনে হল। তীব্র ও অলৌকিক ভয় থেকে তুমি দেখলে—এ ঘরের সবকিছুই মনোরমার; তোমার ট্রফিগুলি, হেলানো চেয়ার, গ্রামোফোন, চেস্ট অফ ড্রয়ার্স-এ সবকিছুই মনোরমার, তুমি আগন্তুক মাত্র। মুহূর্তেই হাঁটু গেড়ে এই কথা বলবার অলৌকিক ইচ্ছে হয়েছিল তোমার যে 'ক্ষমা করো!' তুমি নড়তে পারলে না। মনোরমা তড়িৎগতিতে তার ব্যাগ কুড়িয়ে নিল, তুমি তার আধভাঙা কথা শুনতে পেলে 'আমি সব জানি, কিন্তু তুমি কখনও বোলো না সুমন, বোলো না—' পরমুহূর্তেই দরজার কাছে তার দ্রুত অপসৃয়মান অবয়ব একপলকের জন্য দেখা গেল কি গেল না! ইচ্ছে হয়েছিল সিঁড়ি পর্যন্ত দৌড়ে গিয়ে তাকে ধরা, কিন্তু তখনও ধর্মরক্ষাকারী সেই পিয়ানোর স্বর বাঘের মতো মনোরমাকে পাহারা দিচ্ছিল, ঘরের সবকিছুই ছিল—তখনও মনোরমার, তখন সজীব ছিল তোমার ট্রফিগুলি, টেলিফোন, বইয়ের র‍্যাক ও হেলানো চেয়ার। কিছুক্ষণ ঠিক কী হয়ে গেল তুমি তা বুঝলে না। এরপর তুমি অনেকদিন পিয়ানোর কাছে বসেছ, কখনও ধীরে কখনও দ্রুতবেগে তোমার শিক্ষিত সপটু আঙুলে রিড চেপে দেখেছ—পিয়ানোর ভিতরে অলৌকিক কিছু নেই। কিন্তু কোথাও ছিল সেই ঘরে, অন্ধকারে, তোমার স্পর্শকাতরতার ভিতরে পিয়ানোর সেই অচেনা 'নোট'—মনোরমা না জেনে কয়েক মুহূর্তের জন্য সেইখানে তার হাত রেখেছিল।

ছেলেবেলায় তুমি যেসব খেলা খেলেছিলে তার মধ্যে একটা খেলা তোমার মায়ের সঙ্গে। অথচ নিতান্ত বালক বয়সেই তুমি তোমার মাকে শেষবার দেখেছিলে। খুব দীর্ঘ চুল ছিল তাঁর—এটুকু ছাড়া আর কিছুই তোমার মনে নেই। তোমার মাকে যারা দেখেছিলে তারা বলত তুমি মাতৃমুখী ছেলে—ভাগ্যবান। যে দু-একটি ছবি ছিল তোমার মায়ের তা থেকে চেহারা ভালো বোঝা যায় না, শুধু বোঝা যায়—তোমার মতোই তীব্র চিবুক ছিল, একটু চাপা গাল আর একটু উঁচু কিন্তু খুব সুন্দর নাক ছিল তাঁর। কিশোর বয়সের সমস্ত লক্ষণ শরীরে ফুটে উঠলে একদিন কৌতূহলবশত তুমি শাড়ি পরেছিলে, তোমার মায়ের কিশোরী বয়সের ছবিতে যেমন ছিল তেমনি দু-চোখে কাজল এবং কপালের ভ্রূ সঙ্গমে কাজলের টিপ পরেছিলে তুমি, তারপর আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তুমি তোমার প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে চোরাহাসি হেসে আপন মনে প্রশ্ন করেছিলে, 'এ রকম ছিল আমার মা?'

আয়নায় অচেনা এক কিশোরীর মুখ তোমার দিকে চেয়ে গোপন ও রহস্যময় কোনও কারণে হেসে উঠেছিল। বড্ড তির্যক ও বিচিত্র ছিল তার দুই চোখ। এ তো তুমি নও! তুমি ভয় পেয়েছিলে। 'আমি কি সুমন?' তুমি এই প্রশ্ন করেছিলে, কেন না সেই কিশোরী প্রতিবিম্বের তীব্র ও রহস্যময় টান গোপন স্রোতের মতো তোমাকে সম্ভবত বীজরূপে আর-একবার তার গর্ভস্থ অন্ধকারের দিকে আকর্ষণ করেছিল। মনে পড়ে তুমি একবার দু-হাত বাড়িয়ে আয়নার ফ্রেমটা ধরবার চেষ্টা করেছিলে, পরমুহূর্তেই তুমি আর ছিলে না। ঠিক কী হয়েছিল তোমার তা জানা নেই, শুধু সন্দেহ হয় কিছুক্ষণের জন্য সেই ঘরে একা এক কিশোরীই ছিল তার প্রতিবিম্বের দিকে চেয়ে, তুমি তার কোথাও ছিলে না। অনেকক্ষণ পর যখন তুমি সচেতন হয়েছিলে তখনও তোমার মনে 'আমি কি সুমন?' এই প্রশ্ন আবছাভাবে খেলা করে গিয়েছিল। মনে পড়ে ক্রমে ভয় ভেঙে গিয়েছিল এবং তুমি তোমার কিশোর বয়সে তোমার কিশোরী মায়ের সঙ্গে আরও কয়েকবার এই খেলা খেলেছিলে। কথার মাঝখানে, খেলার মাঝখানে, ঘুমের মাঝখানে অতর্কিতে সচেতন হয়ে তুমি মাঝে-মাঝে নিজের ভিতরে এক রহস্যময় নারীত্বকে লক্ষ করে 'আমি কি সুমন?' এই প্রশ্ন করে মনে-মনে চমকে উঠেছ। কালক্রমে যদিও তোমার শরীর মুষ্টিযোদ্ধাদের মতো পুরুষ ও সুগঠিত হয়েছে তবু তোমার মুখে কোথাও এখনও সেই এক কিশোরীসুলভ রহস্যময় নম্রতা রয়ে গেছে, একপলক আয়নায় তাকালেই তুমি তা ধরতে পারো। এখনও যখন তুমি নানা কাজে থাকো, যখন সিঁড়ি ভেঙে ওঠো, কিংবা সিঁড়ি ভেঙে নামো, যখন দরজা খুলতে হাত বাড়াও, কিংবা কেউ 'সুমন' বলে ডাকলে পিছন ফিরে সাড়া দাও, বিদেশি নাচের আসরে যখন অচেনা মহিলাকে হালকা আলিঙ্গনে বদ্ধ করো তখন মাঝে-মাঝে কাকে মুহূর্তের গভীর অন্যমনস্কতা থেকে নিজের ভিতরে হঠাৎ এক অলৌকিক 'আমি কি সুমন?' এই প্রশ্ন শুনে বিস্মিত হয়েছ।

তোমাদের পরিবারে ছিল চোখের অসুখ। তোমার বাবার একটু বয়েস হয়ে গেলে তাঁরও দৃষ্টিশক্তি খুব কমে এসেছিল। খুব ভারী ঘোলাটে কাচের চশমা ছিল তাঁর, তবু ঘড়ি দেখবার জন্য, চিঠি পড়বার জন্য সবসময় তাঁকে একটা আতসকাচ ব্যবহার করতে হত। যখন চোখ দিয়ে দেখবার ক্ষমতা আরও ক্ষীণ হয়ে আসছিল তখন সবকিছু দেখবার আগ্রহ ক্রমশ বেড়েছিল তাঁর। তুমি তাঁকে কখনও দেখেছ সিঁড়ির ফাটলের কাছে বসে আতসকাচ দিয়ে পিঁপড়ের চলাফেরা লক্ষ করছেন, কখনও আতসকাচের ভেতর দিয়ে পিয়ানোর ওপর জমে ওঠা ধুলোর আস্তরণের দিকে অকারণে চেয়ে আছেন। কতদিন তুমি দেখেছ তোমার বাবা বাড়ির দক্ষিণ কোণে ভিতের কাছে তাঁর আতসকাচটি নিয়ে বসে আছেন, তাঁর ধারণা ছিল দক্ষিণ কোণ থেকেই বাড়িটা ভাঙতে শুরু করবে, কেন না ওই কোণ থেকেই বাড়িটার ভিত গাঁথা শুরু হয়েছিল। তোমাকে কাছে ডেকে কখনও-কখনও তিনি বলেছেন,

'তুমি কি খুব বেশি আয়ু চাও? খুব বেশি দৃষ্টিশক্তি চাও? সুমন, তুমি কখনও খুব বেশি চেয়ো না।' মাঝে-মাঝে তিনি তোমাকে ঠাকুরমার গল্প বলেছেন। বাড়িতে কারও দৃষ্টিশক্তি ভালো ছিল না, দাদু অন্ধ, জ্যাঠামশাই অন্ধ হয়ে যাচ্ছেন, তখন সকলের চোখের দেখা তোমার ঠাকুমা একলা দেখতেন। এত বেশি প্রখর হয়েছিল তাঁর চোখ যে তোমাদের মস্ত বাগান থেকে একটু ফুল কেউ তুলে নিলে তিনি টের পেতেন, তোমার প্রায় অন্ধ পিসিমার খেলনার বাক্স থেকে পুঁতির মালা চুরি গেলে তিনি ধরে ফেলতেন। এইভাবে সবকিছুর ওপর তাঁর ভয়ঙ্কর মায়ার সৃষ্টি হয়েছিল বলে মরবার সময় তাঁর প্রাণ বেরোতে অনেকক্ষণ সময় লেগেছিল, আর শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার পরও দেখা গিয়েছিল তাঁর চোখ খোলা রয়েছে। এইভাবে তোমার বাবা তোমাকে প্রায়ই কাছে ডাকতেন, তোমার গলার শব্দ শুনতে চাইতেন। তুমি তোমার বাবার ভিতরে খুব আনন্দ কিংবা খুব বিষাদ কখনও দ্যাখোনি। খুব কাছের কিংবা খুব দূরের বলেও তাঁকে তোমার কখনও বোধ হয়নি। শুধু তাঁর রহস্যহীন পরিষ্কার মুখ-চোখ দেখে তোমার প্রায়ই তাঁকে বড় দূর ভ্রমণকারী বলে মনে হত। তখন তোমার যৌবন আরম্ভের সময়ে তুমি একদিন তোমার প্রথম নীতিবিগর্হিত যৌন স্বপ্নটি দেখেছিলে, আর-একদিন তুমি অলি নামে মেয়েটিকে প্রথম চুম্বন করেছিলে। সেই সময় তুমি প্রায়ই বড় অন্যমনস্ক ও অস্থির ছিলে। এমনই একদিন যখন তুমি তোমার বাবার ঘরের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিলে তখন তিনি চোখ কুঁচকে তোমাকে দেখবার চেষ্টা করে জিগ্যেস করলেন, 'তুমি কি সুমন?' তুমি সাড়া দিলে তিনি বললেন, 'একবার আমার কাছে এসো।' তুমি কাছে গেলে বললেন, 'হাঁটু গেড়ে আমার সামনে বোসো।' তুমি তোমার বাবার হাঁটুর ওপর হাত রেখে বসলে, তিনি তাঁর আতসকাচটি তুলে নিয়ে 'দেখি সুমন তোমার মুখখানি' এই বলে তোমার মুখের ওপর আতসকাচটি ধরলে, তুমি কাচের ভিতরে তাঁর মস্ত বড় গভীর চোখগুলি দেখেছিলে। তোমার মনে হয়েছিল বহু দূর বিস্তৃত রয়েছে সেই চোখ, এবং তোমার এই বোধ এসেছিল যে সেই চোখের ভিড়ে ধূসর মাঠ, পর্বতশৃঙ্গ, সমুদ্র ও আকাশ রয়েছে—একটু ম্লান—কিন্তু এই চোখ তাঁর যিনি কাছের ও দূরের সব কিছু দেখতে পান, যিনি আলো ও অন্ধকারে সমভাবে দেখেন, যিনি ঈশ্বর, এবং তোমার স্রষ্টা। তাঁর ডান হাতখানা তোমার মাথার ওপর স্থির হয়েছিল। খানিকক্ষণ তোমার শরীরে বিদ্যুৎ খেলে গেল, কেন না তোমার বোধ হয়েছিল তিনি তোমার ধর্মহীন ক্রিয়াকাণ্ডগুলি, তোমার সামঞ্জস্য শূন্য বোধ ও প্রবৃত্তিগুলোকে প্রত্যক্ষ করছেন। তিনি একবার বিড়বিড় করে বললেন, 'চোখ বড় মায়ার সৃষ্টি করে।' তারপর তিনি তাঁর হাত ও আতসকাচ সরিয়ে নিলেন। সেই দিনই দুপুরবেলা তোমার বাবা তাঁর আতসকাচটি নিয়ে নিঃশব্দে ছাদে উঠে গিয়েছিলেন এবং শেষবারের মতো আতসকাচ দিয়ে সূর্যকে প্রত্যক্ষ করবার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর দুটো চোখই পুড়ে গিয়েছিল। তাই তারপর থেকে তুমি সবচেয়ে বেশি লক্ষ করেছ মানুষের চোখ। প্রথমে তুমি নিজের চোখ দিয়ে শুরু করেছিলে। জল খেতে

গিয়ে তুমি কতদিন গ্লাসের জলে নিজের চোখের ছায়া দেখে চোখ ফেরাতে পারোনি। কতদিন তুমি ইচ্ছে করে চোখ বুজে রাস্তা দিয়ে বহু দূর পর্যন্ত হেঁটে গেছ। বড় রোমাঞ্চকর ও অস্বাভাবিক ছিল তোমার তোমাকে নিয়ে সেই খেলা। কিন্তু ক্রমে-ক্রমে তুমি অন্ধের মতো হাঁটতে শিখেছিলে, তুমি চোখ বুজে দিকনির্ণয় করবার কৌশল আয়ত্ত করেছিলে, এবং অন্ধের যেমন হয় তেমনই তোমার অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলি প্রখর ও স্বর্শকাতর হয়ে উঠেছিল। এইভাবে অনেকদূর অগ্রসর হয়ে তুমি ভেবেছিলে এখন তুমি তোমার অন্ধকার দিনগুলির জন্য প্রস্তুত।

তুমি অনেকদিন তোমার বন্ধুদের চোখ বুজে হেঁটে যাওয়া ও দিকনির্ণয় করার কৌশল দেখিয়ে বিস্মিত করেছ। যারা তোমার এই কৌশল দেখেছিল তাদের মধ্যে একমাত্র অতীশ তোমাকে মাঝে-মাঝে বলেছিল যে এই খেলা ভালো নয়। কারণ জিগ্যেস করলে সে সঠিক উত্তর দিতে পারত না, শুধু বলত 'দ্যাখো তুমি—এ ভালো নয়।' অতীশ ছিল শান্ত ও নিঃশব্দ প্রকৃতির এবং প্রথম চেনা হওয়ার পর থেকেই তুমি মাঝে-মাঝে লক্ষ করেছিলে যে তার মুদ্রদোষের মতো একটি স্বভাব রয়েছে। কম কথা বলত অতীশ এবং কখনও-কখনও কথা বলতে-বলতে হঠাৎ থেমে যেত সে। যেন কথা ভুলে গিয়ে 'কী বলছিলাম বলো তো? কেন বলছিলাম?' এই প্রশ্ন করে বোকার মতো চেয়ে থাকত। তুমি অনেকদিন কথার খেই ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছ কিন্তু অতীশের ধাঁধা কাটত না, সে প্রশ্ন করতে থাকত 'কেন বলছিলাম? কেন বলছিলাম? কেন?' তারপর আর সে প্রশ্নও তার থাকত না এবং সে কিছুক্ষণ প্রাণপণে কোনও কথা বলবার চেষ্টা করত, পারত না। অবশেষে সে তার স্বাভাবিকতা ফিরে পেলে বহুদিন লজ্জাবশত উঠে চলে গেছে। অথচ তুমি ক্রমশ বুঝতে পেরেছিলে তোমাদের কুড়ি-একুশ বছর বয়সের সব বন্ধুদের মধ্যে অতীশ ছিল সবচেয়ে জ্ঞানী ও অনুভূতিপ্রবণ। মাঝে-মাঝে তুমি তার এই স্বভাবটি সম্পর্কে প্রশ্ন করেছ, সে সঠিক উত্তর না দিয়ে হেসে বলত 'ওটা আমার মনের তোতলামি।' কিন্তু কতদিন তোমার মনে হয়েছে—বহুজনের মধ্যেও অতীশ তোমাকে লক্ষ করছে অতি নিবিষ্টভাবে, যেন গোপনে সে তোমাকে কোনও কথা বলতে চায়। খেলাধুলো করত না অতীশ, কিন্তু তুমি যখন খেলতে নেমে ফুটবলের পিছনে ছুটছ তখনও টের পেয়েছে মাঠের সীমানায় বাইরে ভিড় থেকে অতীশ তোমাকে লক্ষ করছে। যখন তুমি চোখ বুজে পিয়ানোর সঙ্গে গান গাইছ, তখনও টের পেয়েছ অতীশ আর সকলের মতো গান না শুনে তোমাকে লক্ষ করছে। কিন্তু কারণ জিগ্যেস করলে হেসে এড়িয়ে যেত, বলত 'তুমি বড্ড বেশি স্পোর্টসম্যান সুমন। বোধহয় তুমি সব কিছু নিয়ে খেলতে পারো।' তুমি উঁচু গলায় হেসে উঠে বলেছ 'ইয়াঃ!' খেলা শেষ হয়ে গেলে তুমি আর অতীশ ফাঁকা খেলার মাঠে পাশাপাশি শুয়ে ছিলে, অতীশ বলছিল খেলা শেষ হয়ে গেলে খেলার মাঠ আমার ভালো লাগে।' তুমি

চোখ বুজে ছিলে, উত্তর দিলে না। অতীশ আচমকা কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে উঠে বলল 'সুমন, আমার একটা খেলার কথা তোমায় বলতে পারি, কারণ তোমার একটা খেলার সঙ্গে আমার খেলাটার বোধহয় মিল আছে।' তুমি চোখ বুঝে সতর্ক গলায় প্রশ্ন করলে 'কী সেটা?' অতীশ হাসল 'বলছি। আগে বলো তো কত ছেলেবেলার কথা তোমার মনে আছে!' তুমি হালকা গলায় বললে, 'এই ধরো চার-পাঁচ বছর বয়সের কথা কিছু-কিছু মনে আছে।' অস্থির গলা শোনা গেল অতীশের, 'না, অত নয়। ও তো অনেকেরই মনে থাকে, আরও ছেলেবেলার কথা মনে নেই?' উৎসুক হয়ে তুমি একটু ভেবে দেখলে 'খুব মনে নেই, তবে আমার একটা নীল রঙের টি-পটের কথা মনে পড়ে, মার হাতে দেখেছিলাম— যখন আমার তিন-সাড়ে-তিন বছর বয়স।' অতীশের ব্যগ্র গলা শোনা গেল 'আর কিছু, আরও ছেলেবেলার?' তুমি অবাক হয়ে আধ-বসার মতো উঠে অতীশের আবছা মুখের দিকে চেয়ে দেখলে, তোমার মনে হয়েছিল অতীশ এতকাল যা বলতে চেয়েছিল আজ তা বলতে চায়। তোমার ভয় হচ্ছিল অতীশ তার পুরোনো অভ্যাসবশে চুপ করে না যায়। তুমি শান্ত গলায় বললে, 'বোধহয় একবার জ্বরের ঘোরে আমি একটা থার্মোমিটার ভেঙে ফেলেছিলাম, তখন আমার বয়স বোধহয় আড়াই কি তিন, আবছা মনে পড়ে, আমি থার্মোমিটার ছুড়ে ফেলছি, কিন্তু এটা আমার কল্পনাও হতে পারে।' 'হতে পারে।' অতীশ সঙ্গে-সঙ্গে উত্তর দিল 'কিন্তু এরকম মনে করবার চেষ্টা করে দ্যাখো আরও ছেলেবেলার কথা তোমার মনে পড়ে কি না।' তুমি অনেকক্ষণ ভেবেছিলে, তুমি কিছুটা অস্বস্তিবোধ করে বলেছিলে 'না। কিন্তু আর কী মনে পড়বে। দু-একটা ঘটনার কথা পুরোনো ছবির মতো মনে থেকে যায়। ব্যস।' অতীশ অস্পষ্ট গলায় বলল 'দু-একটা ঘটনার কথা নয়, সবকিছু একের-পর-এক স্পষ্ট মনে করার কথা বলছি যা তুমি আর কারও কাছ থেকে শোনোনি, যা কল্পনারও নয়।' তুমি হেসে উঠেছিলে 'পাগল! তুমি কি পারো আরও ছেলেবেলার কথা মনে করতে?' অতীশ হাসল না, ধীর স্বাভাবিক গলায় বলল 'অনেক, যতদূর যাওয়া যায়।' তুমি হাসছিলে 'তার মানে এক-দেড় বছর, ছ'মাস না জন্মমুহূর্ত পর্যন্ত?' অন্ধকারে জ্বল-জ্বল করে উঠল অতীশের চোখ 'ঠিক জন্মমুহূর্তটিও মনে পড়তে পারে।' বলেই সম্ভবত লজ্জায় সে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে হাতে তুলে বলে উঠল 'সুমন, ওই দেখ ওরিয়ন।' সে কথা ঘোরাচ্ছে বুঝতে পেরে সেদিকে তুমি কান দিলে না। 'ঠিক আছে' তুমি বলেছিলে 'কীরকম ছিল তোমার জন্মমুহূর্ত?' অতীশ মুখ লুকিয়ে খুব আস্তে-আস্তে বলল 'অন্যরকম, আমাদের রোজকার জীবনের মতো নয়।' তুমি নিজেও জানো না কেন অতীশের স্বর শুনে তোমার রোমকূপে কাঁটা দিয়েছিল। অতীশ হাসল 'মনে করতে-করতে ফিরে যাওয়া যায়। তুমিও চেষ্টা করে দেখতে পারো।' তুমি বিশ্বাস করোনি, বলেছিলে, 'কী করে সম্ভব?' অতীশ হাসছিল 'ঠিক জানি না, আগে আমি এটা খেলতাম কিন্তু এখন আর আমি ইচ্ছে করে খেলি না, খেলাটাই শুরু হয়ে যায়।

তখনই চেনা-পরিচয় মুছে যায়, কথা ভুল হয়ে যায়, আমি ফিরে যেতে থাকি।' খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে তুমি হঠাৎ উঁচু গলায় হেসে উঠলে অতীশ বড় লজ্জা পেয়েছিল। তুমি বিশ্বাস করোনি, কিন্তু তারপর গোপনে তুমি মাঝে-মাঝে অতীশের খেলাটা খেলতে চেষ্টা করেছিলে—কিছুই তোমার মনে পড়েনি। ঠিক স্মৃতিচারণের খেলা নয়। একটু ভিন্ন ও রহস্যময়—ঠিক অতীশের মতো করে সেই খেলা তুমি খেলতে পারোনি। তুমি একা-একা আপন মনে 'ইয়াঃ' বলে হেসে উঠেছ। কিন্তু একদিন রোজকার মতোই তুমি খুব ভোরে উঠে খেলার মাঠে গিয়েছিলে। একা-একা আবছা অন্ধকারে তুমি আস্তে গড়িয়ে দিলে তোমার ফুটবল তারপর ছুটতে শুরু করলে। প্রথমে আস্তে-আস্তে তারপর তোমার গতি বাড়ছিল। মাঠের সীমানা ধরে তুমি তোমার বলটির পিছনে ছুটছিলে মাঠকে সবসময় বাঁ-দিকে রেখে চক্রাকারে। সাধারণত তুমি চারবার মাঠটিকে ঘুরে এলে ভোর হয়ে যায়। তুমি তিনবার ঘুরে এসে চারের পাক শুরু করেছিলে, তোমার মাংসপেশিগুলি সতেজ ও রক্তস্রোত দ্রুত হয়ে উঠেছিল, ভোরের দম নিয়ে তোমার ফুসফুস পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছিল—এইভাবে চারের পাক শেষ হয়ে গেল। কিন্তু ভোর হল না। তোমার খেয়াল ছিল না—বলটা তোমার পায়ের টোকা খেয়ে গড়িয়ে যাচ্ছিল—তুমি অভ্যাস মতো ছুটছিলে। কিন্তু এক সময়ে তুমি বুঝতে পেরেছিলে তোমার পায়ে বলটা আর নেই—কোথায় গড়িয়ে গেছে। থেমে তোমার খেয়াল হল তুমি অন্তত সাতবার মাঠটাকে ঘুরে এসেছ অথচ ভোর হয়নি। তুমি বলটা খুঁজবার জন্যে মাঠের দিকে তাকালে, সেখানে গাঢ় অন্ধকার জমে আছে, তুমি আকাশের দিকে তাকালে—সেখানে গাঢ় অন্ধকার জমে আছে। মাঠ না, আকাশ না, সূর্য ও নক্ষত্র কিছুই তুমি দেখতে পেলে না। তুমি পা বাড়িয়ে দেখলে, তুমি হাত চোখের সামনে এনে দেখলে—কিছুই দেখা যায় না। তোমার শরীরে বিদ্যুৎ খেলে গেল। তুমি যত্নে শেখা তোমার ইন্দ্রিয়গুলির স্পর্শকাতরতার কথা ভুলে গিয়েছিলে, চোখ বুজে দিকনির্ণয় করবার কৌশলের কথাও তোমার মনে হল না। মনে আছে তুমি আস্তে-আস্তে হাঁটু গেড়ে বসেছিলে, তোমার দুটি হাত কোলের ওপর জড়ো করা, গাল বেয়ে চোখের জল পড়ছে. নিতান্ত তুচ্ছ কারণেই তুমি কাঁদছিলে—কখনও অলি নামে যে মেয়েটিকে তুমি প্রথম চুমু খেয়েছিলে তার জন্য, কখনও বাড়ি ফিরে যাওয়ার পথটির জন্য, মাঠ সূর্য ও নক্ষত্রগুলির জন্য। তুমি চোখ চেয়ে দেখেছ অনেক, তুমি চোখ বুজেও দেখেছ অনেক, আর একধরনের দেখা তোমাকে খেলাচ্ছলে শিখিয়েছিল অতীশ—তুমি অনুভব করলে সেই খেলা তোমার ভিতরেই গোপনে ছিল একদিন। তোমার ইচ্ছা ও প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সেই খেলায় অতি দ্রুত পশ্চাৎগামী রেলগাড়ির মতো তুমি ফিরে যাচ্ছিলে। ক্রমশ আলো ও অন্ধকার লুপ্ত হয়ে যাচ্ছিল—ক্রমে চেষ্টারহিত তুমি বুঝেছিলে চোখের মতোই তোমার অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলি একে-একে নিভে গেল। তুমি আর কিছুই স্পর্শ করো না, কিছুই প্রত্যক্ষ করো না, কিছুই শ্রবণ করো না, তুমি খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করো না, তোমার আনন্দ ও বিষাদ কিছুই নেই

—সেইখানে খুব ভোর আকাশের নীচে তোমার প্রিয় মাঠের ওপর তোমার বীজটি পড়ে আছে যার সঙ্গে 'আমি' এই বোধটুকু মাত্র ধর্মের মতো সংলগ্ন আছে, আর কিছুই নেই। 'আমি' এই বোধটুকু মায়ার মতো তোমার ইন্দ্রিয়গুলিকে সৃষ্টি করেছিল—অলৌকিক এই শিল্প-নির্মাণ। এ তোমারই। তুমি প্রাণপণে এই বোধ ভেদ করতে চাইছিলে, চিৎকার করে উঠতে চাইছিলে, দৌড়াতে চাইছিলে—পারলে না। কয়েকটি অলীক মুহূর্তের পর কে যেন আবার খেলাচ্ছলে তোমার কোলের কাছে বলটি ঠেলে দিলে তুমি দু-হাতে তুলে নিলে তোমার বল, বুকের মধ্যে চেপে ধরে তাকিয়ে দেখলে—সবুজ বিস্তৃত মাঠ, সূর্য উঠছে। তুমি নড়লে না, তুমি তেমনই বসে রইলে—এতদিন তোমার যা দেখা হয়নি সব কিছুর জন্য অবিরল চোখের জলে তোমার বুক ভেসে যাচ্ছিল। তুমি চোখ মেলে সেই অন্ধকার আর কখনও দেখনি।

এরপর দীর্ঘকাল কেটে গেলে একবার বিদেশে থাকতে তুমি জেনেছিলে অতীশ সন্ন্যাস নিয়ে ঘর ছেড়ে গেছে, এই কারণে যে, সে বিয়ে করবার পর নিতান্ত সন্দেহবশত তার বউ মল্লিকার কৌমার্য হরণ করতে পারেনি বলে মল্লিকা তাকে ত্যাগ করে গিয়েছিল। তারপর অতীশের কথা তোমার আর মনে ছিল না। কিন্তু যখন তুমি বিদেশে প্রবাসে অচেনা রাস্তায় ও মাঠে হেঁটেছে, যখন কোনও নদীর ধারে দাঁড়িয়ে নিসর্গ প্রত্যক্ষ করেছ, যখন সমুদ্র পাড়ি দিয়েছ তখন শৈশব বাল্য ও কৈশোরের কোনও-কোনও ছবি মনে ভেসে উঠলে তোমার অতীশের সেই খেলাটার কথা মনে পড়েছে। তুমি একা-একা আপন মনে 'ইয়াঃ' বলে হেসে উঠেছ। এইভাবে তুমি তোমার ঊনত্রিশের জন্মদিন পার হয়ে গেলে একদিন এক পার্টিতে তোমার পরিচিতদের মধ্যে একজন তোমার হাতটা চেপে ধরেই ছেড়ে দিয়ে বলেছিল 'সুমন, তোমার গায়ের জোর কমে যাচ্ছে।' তুমি চমকে উঠেছিলে, কেন না তুমি বাস্তবিক অনুভব করেছিলে তোমার জোর অনেক কমে এসেছে। তুমি আগেকার মতো আর ফুটবল নিয়ে দৌড়োও না। খেলাধুলো তুমি প্রায় ছেড়ে দিয়েছ। সেই স্পর্শকাতরতাও তোমার আর নেই। তুমি অনুভব করো তুমি কখনও বির্ধমী, কখনও তুমি ধর্মদ্রোহী—তাই তোমার মধ্যস্থ অলৌকিক এখন তোমার ভিতরে মাঝে-মাঝে ত্রাসের সঞ্চার করে। আর তোমার যা আছে তোমার ধর্মহীন ক্রিয়াকাণ্ড, বোধ ও প্রবৃত্তি—এ সবই তোমার কাছে তুচ্ছ। আপাদমস্তক তুমি তোমার কাছেই গুরুত্বহীন ও সামঞ্জস্যশূন্য। সুতরাং বিপদে কে তোমাকে রক্ষা করে, একাকিত্বে কে তোমাকে সঙ্গ দেয়? আবার তোমার বিশ্বাস এই যে তুমি স্পষ্টতই এক ধারাবাহিকতার সূত্রে গ্রথিত আছ—তুমি প্রাকৃত। তুমি অনেকের দ্বারা রক্ষিত, তুমিই আবার অনেকের রক্ষাকারী। প্রয়োজনশূন্য তুমি নও—তুমি সম্পর্কযুক্ত মানুষ—ধারাবাহিক—তুমিও দূরবর্তী ক্রীড়াভূমির দিকে একজন মশালবাহী—তোমার এ বিশ্বাস গথিক গম্বুজের মতো দৃঢ়মূল। সুতরাং অলৌকিক তোমার

কাছে নীতিবিগর্হিত অনুপ্রবেশকারী, যেহেতু তুমি আয়নায় প্রায়ই নিজের মুখ প্রতিবিম্বিত দেখেছ, তুমি দোকানে ক্রয়কারী যুবতীদের দেখেছ, তুমি গাছে-গাছে বয়সের ফসল প্রত্যক্ষ করেছ, তুমি ফসলের ক্ষেত্রবর্ষণ, বীজবপন জলসেচন ও পক্য শস্যকে কার্যকারণ সূত্রে গ্রথিত করেছ। তোমার ইন্দ্রিয়গুলি সতেজ ও কর্মক্ষম, তুমি বাহ্যকাম ও ব্যবহারগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারো, তুমি স্বভাবে আছ, তবে কেন এই অলৌকিক?

সুখের দিন

মহারাজ, আমাদের সেইসব সুখের দিন কোথায় গেল?

তখন আকাশে কাঠচাঁপা ফুলের মতো চাঁদ উঠত। জ্যোৎস্নারাতে ছিল আমাদের নদীর ধারে সাদা বালির ওপর চড়ুইভাতি। আকাশ তখন কত নিভৃতে নেমে আসত! ঝাড়বাতির মতো থোপা থোপা হয়ে আলো দিত গ্রহ-নক্ষত্র।

সে কি তুমি মহারাজ, যে রোজ আমাদের ঘুম ভাঙার আগে খুব ভোরে হরেকরকম রঙের বালতি হাতে ঘুরে-ঘুরে রং করে দিয়ে যেতে গাছপালা, মাঠ, নদী আর আকাশ? সে কি তুমি মহারাজ যে প্রতিদিন আমাদের অন্ন আর জল আরও সুস্বাদে ভরে দিয়ে যেতে?

ঘুম থেকে উঠে প্রতিদিন টের পেতুম, তুমি এসেছিলে। প্রতিদিন দু-হাত ভরে পেতুম নতুন একখানা জগৎ। তখন রোজ ছিল আমাদের জন্মদিন।

কড়াইশুঁটি ছাড়াতে বসলেই ঠাকুরমার মনে পড়ত গত জন্মের কথা। কে না জানে কড়াইশুঁটির খোলের মধ্যেই থাকে আমাদের সব পূর্বজন্মের কাহিনি। সবুজ মুক্তোদানার মতো সেই কড়াইশুঁটি ভরে থাকত গল্পে-গল্পে। কাচের বাটি উপচে পড়ত মুক্তোদানায়। কী সুন্দর যে দেখাত। কী বলব তোমাকে তার চেয়েও সুন্দর ছিল আমাদের কোল কুঁজো ঠাকুমার ভাঙাচোরা মুখখানা। সত্য-সত্য, তিন সত্য মহারাজ, তখন কারও মরণ ছিল না। যে জন্মাত পৃথিবীতে তারই ছিল অমরত্বের বর।

কোথায় গেল সেইসব সুখের দিন?

তখন ফুলের ছিল ফুটবার নেশা, ফলের ছিল ফলবার আকুলতা। আমাদের বাগান তাই ছিল ভরভরন্ত। ফল ফুল উপচে পড়ত বেড়া ডিঙিয়ে। সারাদিন পতঙ্গের শব্দ হত বাগানে, পাখি ডাকত। পিপুল গাছের তলায় ছিল মস্ত এক পাথরের আসন। সেইখানে মাঝে-মাঝে জন্মান্তর থেকে মানুষেরা আসতেন।

একদিন ভোরবেলা আমাদের সাদা খরগোশ গিয়েছিল বাগানে, ফিরল সবুজ হয়ে। আমরা দৌড়ে বাগানে গিয়ে দেখি পাথরের আসনে বসে আছেন আমাদের প্রবৃদ্ধ এক প্রপিতামহ। পৃথিবীর ধুলোখেলা শেষ করে তিনি চলে গেছেন কবে! আমাদের দেখে বড় মায়াভরে চেয়ে রইলেন, বললেন—কিছু চাইবে?

তখন কী-ই বা চাওয়ার ছিল মহারাজ? তখন প্রতিদিন আমাদের ছোট পাত্র উপচে পড়ে আনন্দে। আর কী চাইব? আমরা বললুম—আমাদের সব কিছু নতুন রঙে রঙিন করে দাও। মস্ত সাদা দাড়িতে হাত বুলিয়ে তিনি বললেন—যত গতি বেশি, সাদা সেখানে বেশি, যেখানে যত গতির অভাব সেখানে তত রং, এমনি করে সেভেন কলারস। দেখ ভাই, মন যত উচ্চস্তরে ওঠে, তত সব জ্যোর্তিময় দেখা যায়। গাছটা দেখলে সেও আলোর গাছ। যত মন স্থূল শরীরের দিকে থাকে, তত স্থূল হয়, তত কুচুটে হয়। মন যত বস্তু ভাবে তত কম্পন কমে যায়।

ভারী শক্ত কথা, তবু আমরা একটু-একটু বুঝলুম। পাথরের আসনে ঘিরে ঝুপঝুপ করে বসে পড়ে বললুম—তবে গল্প বলো।

তেমন গল্প আর কখনও শুনিনি আমরা। সে হল আকাশ-নদীর গল্প। সে নদী সমুদ্রের মতো বিশাল; তার প্রবাহ অন্তহীন। তা আকাশের এক অনন্ত থেকে আর-এক অনন্তের দিকে চলে গেছে। সাদা দাড়িতে হাত বোলাতে-বোলাতে তিনি বলেন—একদিন দেখতে পাবে সেই উজ্জ্বল নদী। খুব কাছে, তবু অত সহজ নয় তার কাছে যাওয়া।

মহারাজ আমাদের ঘরের কাছেই ছিল পৃথিবীর ছোট নদী। তার তীরে সাদা ধপধপে বালিয়াড়ি। ছিল বালিয়াড়িতে জ্যোৎস্না রাতের চড়ুইভাতি। নদী কেমন তা আমরা জানি। তবু সেদিন আকাশ-নদীর গল্প শুনে আমাদের জীবনে অল্প একটু দুঃখ এল।

আমাদের সাদা খরগোশ হয়ে গিয়েছিল সবুজ। আমরা রং বড় ভালোবাসতুম। সেদিন বুঝলুম রংই সব নয়। আসল হচ্ছে কম্পন, আসল হল গতি। সুখের চেয়ে অনেক বড় হল জ্ঞান।

কে আমাদের পোষা ময়নাকে শিখিয়েছিল—বেলা যায়! বেলা যায়! ময়না দিনরাত আমাদের ডাকত—ওঠো, ওঠো ভোর হল। বেলা যায়। বলতে-বলতে দাঁড় বেয়ে সে সার্কাসের খেলুড়ির মতো ঘুরপাক খেত, হেঁটমুণ্ডু হয়ে ঝুলত। মুক্তি চাইত কি মহারাজ?

আমরা বিশ্বাস করতুম, আমাদের মৃত্যু নেই, জরা নেই, আমাদের বেলা কখনও যায় না। একভাবে বা অন্যভাবে সবাই চিরকাল বেঁচেবর্তে থাকে।

তখন কী পুরু সর পড়ত দুধে! পোলের ওপর দিয়ে নূপুর বাজিয়ে যেত বহু দূরগামী রেলগাড়ি। কাঁথায় ছিল আশ্চর্য ওম। বৃষ্টি থামলেই রামধনু উঠত। তখন ন্যাংটো হতে আমাদের কোনও লজ্জা ছিল না।

কোথায় গেল সেইসব সুখের দিন মহারাজ?

আমাদের পথে কোনও দোকান ছিল না, আমরা কখনও ফেরিওয়ালাও দেখিনি। কীভাবে কেনাকাটা করতে হয় তা শেখায়নি কেউ। পয়সা কোন কাজে লাগে কে-ই বা ভেবেছিল তখন?

পাঠশালার পাশেই ছিল হরিণের চারণভূমি। রোজকার ঘাস খেয়ে বনের হরিণরা ফিরে যেত বনে। সে কি তুমি মহারাজ, রোজ রাতে এসে গোপনে যে মাঠের ফুরোনো ঘাস আবার পূরণ করে দিয়ে যেতে? রোজ বেলা শেষে দেখতুম, ন্যাড়া মাঠে ঘাসের গোড়াগুলো ছাঁটা চুলের মতো হয়ে গেছে হরিণের দাঁতে। পরদিন পাঠশালায় আসবার পথে দেখি, কচি দূর্বাঘাসে দুধেল হয়ে আছে মাঠ। তুমি করতে মহারাজ? না কি তখনকার মাটিই ছিল ওইরকম উর্বর?

বুনো হরিণদের কখনও ভয় পেতে দেখিনি। কিন্তু একদিন এল ফাঁদ নিয়ে বাইরের মানুষ। মুহূর্তে কী করে টের পেয়ে পালপাল হরিণ মায়ামৃগের মতো মিলিয়ে গেল।

হরিণ ধরুয়াদের ধৈর্য বটে! দিনের-পর-দিন তারা সেইসব মায়াহরিণ ধরতে আসে, ফাঁদ পাতে। রোজ শূন্যহাতে ফিরে যায়। তারপর একদিন তারা আমাদের বলল—ধরে দাও। হরিণ প্রতি এক মোহর।

মহারাজ, আমাদের এই প্রথম পাপ। আমরা প্রত্যেকেই পেয়েছিলাম একটা দুটো করে মোহর। আর সেই রাতে কে বলো তো মহারাজ, আকাশকে উড়িয়ে নিয়ে গেল ওই অত উঁচুতে? আর তো কই কাঁঠচাপার মতো দেখাল না চাঁদকে! হাতের নাগালে ছিল ঝাড়বাতির মতো নক্ষত্ররা। তারা সেদিন থেকে হয়ে গেল ভিনদেশের দেওয়ালির আলো না কি জোনাকি পোকা। সেই রাতেই দেখলুম, চাঁদের বুক জুড়ে বসে আছে একটা পেটমোটা মাকড়সা। বহু দূর পর্যন্ত ছড়ানো তার জাল।

মোহর পকেটে নিয়ে পরদিন পাঠশালায় গিয়ে দেখি, এক বাদামওয়ালা ফটকের ধারে বসে আছে। পরদিন এল চিনির মঠ আর বুড়ির মাথার পাকাচুল বেচতে আরও দুজন। আমাদের পথে- পথে দোকানের সারি গজিয়ে উঠল। মোহর খরচ হয়ে গেল। পকেটে এল আরও মোহরের লোভ।

সুখের দিন কি গেল মহারাজ? না কি তখনও নয়?

তখনও ভোরবেলা তুমি ঠিক রং দিয়ে যেতে চারধারে। প্রতিদিন আমাদের জন্মদিন ছিল। তুমি ভরে দিতে অন্নজলে সুস্বাদু। তখনও ন্যাংটো হতে লজ্জা ছিল না।

কবে যেন একদিন আমাদের সঙ্গী খেলুড়ি এক মেয়ে নদী থেকে উঠে এল স্নান সেরে। ক্ষমা করো মহারাজ, বিদ্যুৎ খেলেছিল দেহে।

সুখের দিনে তুমি কেড়ে নাওনি কিছু। সব ভরে দিতে। প্রতিদিন ছিল তোমার অক্লান্ত ক্ষতিপূরণ। কিন্তু সেই থেকে নিলে।

নদীর ধারে ছিল কাশবন, সাদা মেঘ, নীলকাশ। ঋতু আসে যায়। ছবির-পর-ছবি আঁকা হয়। একদিন শরীর ভরে মেঘ করল, বাজ ডাকল মুহুর্মুহু। কাশবনে কিশোরীর চুম্বনের স্বাদ বিষের বাটির মতো তুমিই কি এগিয়ে দাওনি মহারাজ? দিয়েছিলে। আর সেই সঙ্গে কেড়ে নিলে আমার অন্নজলের সেই অফুরান স্বাদ আর ঘ্রাণ। মহারাজ ভোরবেলা চারধার রং করতে রোজ ভুলে যেতে তুমি। উঠে দেখতুম নতুন রোদে পুরোনো পৃথিবীই আলো হয়ে আছে। কেন ন্যাংটো হতে লজ্জা এল? কেন আর দূরগামী ট্রেন রেলপোলে নূপুরের মতো বাজত না মহারাজ?

একদিন তাই আমরা শীতের শীর্ণ নদী হেঁটে পেরিয়ে গেলুম। বনের ভিতর দিয়ে শান্ত পথ গেছে এঁকে-বেঁকে বহু দূরে। আমরা চলতে লাগলুম।

স্বচ্ছ সরোবর, উপবন, তারপর তোমার রাজবাড়ি। দেউড়িতে কেউ পথ আটকাল না, যেতে দিল। সাতমহলা বাড়ির ভিতর দিয়ে হেঁটে-হেঁটে যাই। বিস্ময়ভরে দেখি, তোমার ঐশ্বর্য থরেথরে সাজানো। ছোট একটা বাগানে তুমি হাঁটু গেড়ে আদর করছিলে হরিণকে। তোমাকে ঘিরে কত গাছপালা। কত পাখির ডাক, কত পতঙ্গের ওড়াউড়ি।

আমাদের দিকে তাকিয়ে তুমি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে উঠে এলে। ভৃঙ্গারের জলে হাত ধুতে-ধুতে তুমি বলেছিলে—এরকমই হয়।

সুখের দিন ছিল মহারাজ। কোথায় গেল?

তুমি বড় স্নেহে কাছে এলে। প্রত্যেকের চোখে তুমি রেখেছিলে তোমার গভীর দু-খানি চোখ। প্রত্যেকের প্রতি আলাদা ভালোবাসা তোমার। বিমুগ্ধ চোখে দেখি তোমাকে। দেখা ফুরায় না। বাক্যহারা আমরা।

তুমি মাথা নুইয়ে বললে—আমার কিছু করার ছিল না।

আমরা বললুম, ফিরিয়ে দাও।

তোমার কণ্ঠস্বর কোমল হয়ে এল। দু-চোখে মৃদু পিদিমের মতো স্নিগ্ধ আলো। তুমি বললে, চারণের মাঠে হরিণেরা ফিরবে না। অত সুন্দর আর রইল না জ্যোৎস্না। মাটির উর্বরতা কিছু কমে যাবে। তবু জেনো, আমি আমি তোমাদেরই আছি।

আমরা বললুম, ফিরিয়ে দাও।

তুমি মাথা নাড়লে। হাত তুলে মৃদু মুদ্রার একটি ইঙ্গিতে মিলিয়ে গেলে তুমি। মিলিয়ে গেল সেই প্রাসাদ, উপবন, সরোবর।

সেই থেকে সুখের দিন গেল মহারাজ। এখন তোমার সঙ্গে আমাদের এক আকাশনদীর তফাত।

মহারাজ, আমাদের সেই সব সুখের দিন কোথায় গেল?

গর্ভনগরের কথা

লিফটের দরজার কাছে এক বুড়ো মানুষ দাঁড়িয়ে আছেন। একা। লিফটের দরজা খোলাই রয়েছে। ওপরে যাওয়ার যাত্রী আজকাল আর নেই। কিন্তু সীমন্তককে যেতেই হবে। ওপরেই তার কাজ।

আজ সকাল থেকে সীমন্তক খুশিই রয়েছে। খুশি হওয়া খুব বিচিত্র নয়। কারণ আজ সকালের রেশনেই সে পেয়েছে আধঝুড়ি পালং শাক আর দু-মুঠো কড়াইশুঁটি। কী সবুজ! কী সবুজ! কৃত্রিম খাবার আর ভিটামিন আর ধাতব ট্যাবলেট খেয়ে-খেয়ে জিভ অসাড়। বহুকাল পরে সে আজ সবজে টাটকা তরকারি খেল। কড়াইশুঁটির খোসাগুলোও সে ফেলে দেয়নি, পালং শাকের শেকড়টুকুও।

খোশমেজাজে লিফটে উঠবার মুখে সে বৃদ্ধের করুণ চাউনি দেখে হাসিমুখে জিগ্যেস করল—ওপরে যাবেন নাকি?

—নেবেন?

সীমন্তক মাথা নাড়ল—আসুন।

বুড়োকে চেনে সীমন্তক। প্রায়ই এখানে সেখানে দেখা হয়। বয়স বোধহয় দুশো পঁচাত্তর বছর। আসলে এইসব বুড়ো মানুষেরা হল প্রদর্শনীর বস্তু। মানুষের বিজ্ঞান কতদূর কী করতে পারে এ হচ্ছে তারই এক উদাহরণ। যে কজন এরকম প্রবৃদ্ধ হয়েছেন। তাঁদের বেশিরভাগেরই অভ্যন্তরীণ যন্ত্রপাতির অনেক অদল-বদল ঘটে গেছে। কারও বুকে অন্যের হৃদযন্ত্র, কারও ফুসফুস কৃত্রিম, কারও পাকস্থলী কেটে বাদ দিয়ে কৃত্রিম পাকযন্ত্র বসানো হয়েছে, কারও ট্রান্সপ্লান্ট হয়েছে মস্তিষ্ক। আর এইভাবেই এঁদের বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে। তবে বেশিরভাগেরই স্মৃতি ধূসর, বোধ বা বুদ্ধি খুবই ক্ষীণ, আচরণ অনির্দিষ্ট। সীমন্তক এঁদের এড়িয়েই চলে। কিন্তু আজ সে বড় খোশমেজাজে আছে, তাই বৃদ্ধকে উপেক্ষা করল না।

বুড়ো লোকটি লিফটে উঠে চারদিকে সভয়ে চেয়ে দেখছেন। মস্ত এক ঘরের মতো এই লিফটে নানা রকম অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি লাগানো। বিশেষজ্ঞ ছাড়া এই লিফট চালানো কারও পক্ষেই সম্ভব নয়।

সীমন্তক বিশেষজ্ঞ। সে নানারকম চাবি টিপে, হাতল ঘুরিয়ে লিফট চালু করে এবং গুনগুন করে গান গাইতে থাকে। এক সময়ে আনমনে বলে ওপরে তো বরফ ছাড়া আর কিছু নেই, তবু কী দেখতে যান বলুন তো!

বৃদ্ধ খুবই কাঁচুমাচু হয়ে বললেন—কিছু না। মাটির নীচে থাকতে ভালো লাগে না তো, তাই।

—মাটির নীচটা কি খারাপ?

—আকাশ দেখা যায় না তো।

—ওপরেও কি আকাশ দেখা যায়?

—তা নয়। তবে ওই আর কি। কিছুটা ফাঁকা তো দেখা যায়।

সীমন্তক এসব ভাবপ্রবণতার মানে বোঝে না। পৃথিবীর ওপরে এক সময়ে জনবসতি ছিল এ তো জানা কথা। কিন্তু মাটির নীচের জনবসতি তার চেয়ে এক বিন্দু খারাপ কি? সীমন্তক অবশ্য জন্মেছেই মাটির নীচে; তাই তার কাছে আকাশ বা ফাঁকা জায়গা দেখার কোনও আকর্ষণ নেই।

লিফট উঠতে-উঠতে মাঝে-মাঝে বিভিন্ন চেক পোস্টে থামছে। পৃথিবীর ওপরে প্রতি মুহূর্তে পুরু হয়ে উঠেছে বরফের আস্তরণ। তাই প্রতি মুহূর্তের খবর লিফটের যাত্রাপথে সংগ্রহ করে নিতে হয়। পৃথিবীর মাটির মাত্র একশো থেকে দেড়শো ফুট নীচে এখানকার জনবসতি। কিন্তু মাটির ওপর আরও দুশো তিনশো-চারশো বা তারও বেশি ফুট বরফ জমে আছে। শূন্যের বহু-বহু ডিগ্রি নীচে নেমে গেছে তাপাঙ্ক—যা অ্যালকোহল ব্যারোমিটারেও মাপা সম্ভব নয়। মৃত, সাদা অবিরল তুষার ঝটিকায় আক্রান্ত বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে তবু সংযোগ রাখতে হয় গর্ভনগরগুলোর। কারণ সংগ্রহ করতে হয় শ্বাসের জন্য প্রয়োজনীয় বাতাস জল বিদ্যুৎ। বহুদূর মহাকাশে পৃথিবীর চারদিককার বিমর্ষ প্রায়ান্ধকার তুষারমণ্ডলের বাইরে পরিক্রমারত রয়েছে মানুষের সৃষ্ট অসংখ্য কৃত্রিম উপগ্রহ—সেগুলোর সঙ্গেও অব্যাহত রাখতে হয় যোগাযোগ। তাই পৃথিবীর উপরিভাগে মানুষ বরফ ভেদ করে তৈরি করেছে বহু সংখ্যক বুদ্বুদ। নামে বুদ্বুদ, দেখতেও তাই। এস্কিমোদের ঘর ইগলু যেমন দেখতে ছিল অবিকল সেই রকম। তবে বরফ দিয়ে তৈরি নয়, এগুলো তৈরি হয়েছে মানুষের সৃষ্ট সবচেয়ে ঘাতসহ তাপসহ অসম্ভব শক্তিশালী

পলিথিন দিয়ে। বুদ্বুদগুলো প্রতিদিনই বরফে ঢাকা পড়ে যায়। প্রতিদিনই সেগুলোকে ঠেলে আরও উঁচুতে তুলে দিতে হয় নীচে থেকে চাপ দিয়ে।

এইরকম একটি বুদ্বুদেই কাজ করতে হয় সীমন্তককে। প্রতিদিন সে বুদ্বুদে বসে মৃত তুষার যুগের সাদা পৃথিবীর দৃশ্য দেখে। প্রতিদিন তাকে মাটির ওপর প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে উপরিভাগের বরফের চাপের হিসেব নিতে হয়, ভূকম্পন তুষারস্তরের ঘর্ষণজনিত দুর্বিপাক ও আবহাওয়ার প্রতি মুহূর্তের মতিগতির দিকে নজর রাখতে হয়। কোনওদিন যদি বরফের চাপে, গর্ভনগরের ছাদ ধসে যায় তবে মানুষের সর্বনাশ। তুষার যুগের শৈত্য সহ্য করা যে কোনও প্রাণীরই সাধ্যাতীত। একটা দীর্ঘ শ্যাফটের ভিতর দিয়ে লিফট ধীরগতিতে উঠছে। সর্বশেষ চেক পোস্টে থাকে সীমন্তক। দরজা খোলে। সামনে ছোট্ট একটা ইস্পাতের তৈরি ঘরে নানা যন্ত্রপাতির মধ্যে একটি হাসিখুশি ছেলে বসে আছে। সে মাথা নেড়ে বলল—আমাদের বাবলাটায় হয়তো কাজ বন্ধ করে দেওয়া হবে। বড্ড বেশি বরফ পড়েছে দু-দিন। আর বেশি ঠেলে তোলা যাবে না।

সীমন্তক ভ্রূ কুঁচকে ফিরে আসে। চেক পোস্ট থেকে ছেলেটি তাকে সবুজ বাতি দেখায়।

বুড়ো লোকটি এতক্ষণ কোনও কথা বলেননি। একটি টুলের ওপর চুপ করে বসে আছেন।

শেষ পর্যায়ে লিফট খুব ধীরে-ধীরে চলে। এখানে শ্যাফট বা লিফটের সুড়ঙ্গ পথটি টেলিস্কোপিক। অর্থাৎ সে ইচ্ছে করলে জিরাফের মতো গলা লম্বা করতে পারে। তবে সে ক্ষমতাও সীমাবদ্ধ। শেষ পর্যায়ে পুরোটাই গভীর কঠিন বরফের ভিতর দিয়ে যাওয়া। লিফেটের ভিতরটা অবশ্য সম্পূর্ণভাবে আবহাওয়া নিয়ন্ত্রিত। তবু গর্ভনগরের তুলনায় এখানে যেন একটু শীত বেশি, নীরবতা বেশি।

লিফট থামলে সীমন্তক দরজা খোলে।

বিশাল আয়তনের ঘরখানা সাদা আলোয় ভরে আছে।

গর্ভনগরের জীবনে সকাল বিকাল বা রাত্রিবেলা কিছু নেই। সেখানে সব সময়ে কৃত্রিম আলোর জগৎ, সূর্যোদয় সূর্যাস্ত, পূর্ণিমা বা অমাবস্যা নেই, তারাভরা আকাশের দিকে তাকানোর উপায় নেই।

সাদা আলোয় ভরা বুদ্বুদের ভিতরে পা রেখেই নাক কুঁচকে যায় সীমন্তকের। প্রাকৃতিক আলো তার সহ্য হয় না। জন্মাবধি সে বড় হয়েছে কৃত্রিম আলোর মধ্যে।

আজ মেঘলা আকাশ ভেদ করে ক্ষীণ সূর্যরশ্মি দেখা দিয়েছে। চারদিককার লক্ষ কোটি বরফের স্ফটিকে সেই আলো চতুর্গুণ তেজে প্রতিবিম্বিত হচ্ছে। বাইরের দিকে চোখ রাখা দুষ্কর।

সীমন্তক কর্মরত আর-একজন লোককে ছুটি দিয়ে যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজে বসে গেল। মহাকাশে অনেকগুলো মস্ত-মস্ত উপগ্রহ আছে, যাদের বলা হয় স্বর্গনগর। কোনও-কোনওটার দৈর্ঘ্য এক মাইল দেড় মাইল। পাশবালিশের মতো চেহারার এইসব উপগ্রহের ব্যাসও কয়েক হাজার ফুটের মতো। কয়েক সহস্র লোক স্থায়ীভাবে এগুলিতে বসবাস করছে। সেখানে কৃত্রিম উপায়ে চাষবাস, চিকিৎসা, মেরামতের কাজ সবই হয়। সন্তান জন্মায়, বড় হয়। সীমন্তকের কাজ এইসব কৃত্রিম উপগ্রহের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা। কাজ করতে-করতে সীমন্তক বুড়ো লোকটির কথা একদম ভুলে গিয়েছিল। হঠাৎ নজরে পড়ল, বুদ্বুদের সুদূর একটি কোণে স্বচ্ছ দেওয়ালে শরীর সিঁটিয়ে দিয়ে বৃদ্ধ বাইরের দিকে নিথরভাবে চেয়ে আছেন।

মহাকাশ থেকে নতুন কোনও খবর নেই। শুধু জানা গেল ওপর থেকে তারা পৃথিবীর দিকে অবিরল নজর রেখে চলেছে। দক্ষিণ মেরুর দিকে গত কয়েকদিন তুষারপাত খুবই কম হয়েছে।

সীমন্তক খোশ-মেজাজে উঠে বুড়ো লোকটির কাছাকাছি এসে বলল—কী দেখছেন?

বৃদ্ধ তাঁর বলিরেখাবহুল মুখখানা ফিরিয়ে তাকালেন। কিন্তু সীমন্তককে যেন চিনতে পারলেন না। বিড়বিড় করে বললেন—সূর্য উঠেছে!

সীমন্তক হাসল। সূর্যের প্রতি তার নিজের কোনও দুর্বলতা নেই। বলল—মাঝে-মাঝে ওঠে। কিন্তু ওদিকে অত চেয়ে থাকবেন না। চোখের ক্ষতি হতে পারে।

বৃদ্ধ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন—চোখের ক্ষতি আর কী হবে! আমার পুরোনো চোখ উপড়ে ফেলা হয়েছে সেই কবে! এটা হচ্ছে চতুর্থ চোখ। আবার না হয় পালটাব। একটু দেখতে দাও।

এরা কী দেখে, কী মজাই না পায় তা সীমন্তক ভেবেও পায় না। তাচ্ছিল্যের স্বরে বলল—দেখুন না। তবে দেখার তো কিছু নেই। শুধু সাদা বরফ।

লোকটা আবার বাইরের দিক মুখ ফিরিয়ে বিড়বিড় করে বলল—সূর্য উঠেছে! বাইরে সূর্য উঠেছে। ওদের খবর দেবে না?

একটু ঝুঁকে সীমন্তক জিগ্যেস করে—কাকে খবর দেব?

ওই যারা নীচে রয়েছে। খবর দাও। তারপর চলো আমরা রোদ্দুরে যাই।

সীমন্তক দীর্ঘশ্বাস ফেলে। বুড়োটার মগজ বদলের সময় এসেছে। বাইরে গিয়ে স্বাভাবিক বাতাসের একটি শ্বাসও বুক ভরে নিলে সঙ্গে-সঙ্গে ফুসফুস জমে পাথর হয়ে যাবে। এক মুহূর্তের মধ্যে জমে কাঠ হয়ে যাবে শরীর। তাই বাইরে যাওয়ার দরকার হলে সম্পূর্ণ বায়ু-নিরোধক এবং শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত একরকমের পোশাক পরে যেতে হয়।

বুড়ো লোকটি উন্মুখ হয়ে সীমন্তকের দিকে চেয়ে বলল—আমি যখন খুব ছোট তখন মাটির ওপর সবুজ গাছপালা দেখেছি। তারপর হৈম হাওয়া আর তুষার আসতে লাগল। তখন পাতালে গর্ভনগর তৈরির কাজ করতেন আমার বাবা। যখন আমরা নীচে চলে গেলাম তখন খুব কেঁদেছিলাম আমি। বাবা আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন—পৃথিবী আবার কয়েক বছরের মধ্যেই সবুজ হবে।

সীমন্তক এই বৃদ্ধের দুঃখকে সঠিক বোঝে না, তবু কিছু সমবেদনা বোধ করে সে বলে—পৃথিবী খুব শিগগির সবুজ হবে না।

—কেন?

সীমন্তক ম্লান হেসে বলে—যত বরফ জমে আছে পৃথিবীর ওপর তা গলতে বহু বছর লেগে যাবে। তারপর বরফ গলে নেমে আসবে মহা প্লাবন। ওপরের সমস্ত ভৌগোলিক সীমারেখা মুছে যাবে সেই প্লাবনে। জল সরতে লাগবে আরও বহু বহু বছর। সবুজ আসবে তারও বহু পরে।

—অরণ্য তৈরি হবে না, গাছে-গাছে পাখি ডাকবে না, ফুলে-ফুলে পতঙ্গের ওড়ার শব্দ শুনব না কেউ কোনওদিন? আমাদের সকালের সূর্যোদয়, বিকেলের বিষণ্ণতা, রাত্রির নিস্তব্ধতা বলে কিছু থাকবে না ততদিন?

বুড়ো মানুষরা শিশুর মতোই। সীমন্তক তাই ছেলে-ভুলানো স্বরে বলে—চিন্তা কী? আমাদের গর্ভনগরের পক্ষী নিবাসে যথেষ্ট পাখি রয়েছে, আমরা রাসায়নিক পদ্ধতিতে মাটির নীচে অরণ্য না হোক যথেষ্ট গাছপালা তৈরি করেছি, পতঙ্গেরও অভাব নেই আমাদের কীট প্রজনন ক্ষেত্রে।

বিস্বাদে ভরে গেল বৃদ্ধের চাহনি। মাথা নত করে বলল—তোমরা কেন লেজার রশ্মি এবং বিস্ফোরণের সাহায্যে সব বরফ গলিয়ে ফেলছ না?

—লাভ কী? শূন্যের বহু নীচে নেমে গেছে তাপাঙ্ক। বরফ গলে যাওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যেই আবার তা জমাট বাঁধবে।

—কেন কৃত্রিম সূর্য সৃষ্টি করছ না?

সীমন্তক বৃদ্ধের পিঠে হাত রেখে বলে—আমরা সে চেষ্টাও করছি। কিন্তু কৃত্রিম সূর্যেরও সাধ্য নেই পৃথিবীর স্বাভাবিক তাপ ফিরিয়ে আনার।

বৃদ্ধ কথা বললেন না। বাইরের স্তিমিত সূর্যরশ্মির দিকে চেয়ে রইলেন। ঝোড়ো হাওয়ায় গুঁড়ো বরফ বালির মতো উড়ে যাচ্ছে। তৈরি হচ্ছে বরফের স্তম্ভ, খিলান, গম্বুজ, আবার আপনা থেকেই ভেঙে যাচ্ছে সব।

বেতার যন্ত্র মহাকাশের বার্তা আসছে। সীমন্তক তার টেবিলে ফিরে গেল এবং বৃদ্ধের কথা তার আর মনে রইল না। বার্তা আসছে, মহাকাশ থেকে পর্যবেক্ষণে ধরা পড়েছে দক্ষিণ মেরুতে একটি জায়গায় সামান্য কিছু বরফ গলে ছোট্ট একটু জলাশয় তৈরি হয়েছে। খবরটা অবিশ্বাস্য। সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য। তবু সীমন্তক গর্ভনগরের বিশেষজ্ঞদের কাছে খবরটা পাঠিয়ে দিল। দীর্ঘ টানেলে যুক্ত পৃথিবীর গর্ভনগরের বিশেষজ্ঞরা কয়েক মিনিটেই দক্ষিণ মেরুতে পৌঁছোতে পারবেন।

যখন সীমন্তক তার অত্যন্ত জরুরি বার্তাটি যথাস্থানে পৌঁছে দিতে ব্যস্ত তখন সেই বৃদ্ধ মানুষটি প্রাণপণে নিজেকে স্বচ্ছ কঠিন দেওয়ালে চেপে ধরে নিবিড় নিষ্পলক দৃষ্টিতে বাইরে চেয়েছিলেন। হঠাৎ তার দৃষ্টির বিভ্রম ঘটল।

তিনি দেখতে পেলেন অফুরান তুষার-স্তূপের একঘেয়ে সাদা রঙের ভিতর থেকে হঠাৎ ছোট্ট রামধনু রঙা গিরগিটির মতো একটি প্রাণী বরফের স্তর ভেদ করে মাথা তুলল। কী একটু দেখল চারদিকে। বিঘতখানেকের বেশি বড় নয়। তারপরই আবার টুক করে সরে গেল গর্তের মধ্যে। অবিশ্বাস্য! সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য! নিশ্চয়ই চোখের ভুল। বুড়ো লোকটি বিড়বিড় করে বলতে থাকেন—রোদ্দুর! গিরগিটি! রোদ্দুর! গিরগিটি! তবে কি অরণ্যও জেগেছে? সবুজ। পাখি?

বৃদ্ধ লোকটি চারদিকে চেয়ে দেখেন বুদ্বুদের ভিতরে কয়েকজন মানুষ তাদের যন্ত্রপাতির মধ্যে মগ্ন হয়ে রয়েছে, কেউ তাঁকে দেখছে না।

বৃদ্ধ চুপিসারে বুদ্বুদের দক্ষিণ প্রান্তে একটি সুড়ঙ্গের দরজায় এসে দাঁড়ালেন। একদম শক্ত করে আঁটা ভারী এই ধাতব দরজা। কিন্তু বৃদ্ধ দরজা খোলার কৌশল জানেন। মাথার ওপরকার একটি হুইল ঘুরিয়ে তিনি দরজা ফাঁক করলেন এবং টুক করে নেমে পড়লেন সুড়ঙ্গে। পথ অল্পই। পথের শেষে আর-একটি ঢাকনি। সুড়ঙ্গের মধ্যে গরম হাওয়া বওয়ানো হচ্ছে তবু এখানে দুর্দান্ত শীতের আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু বৃদ্ধ শীতকে গ্রাহ্য করেন না। বিড়বিড় করে বলতে থাকেন—ওরা জানে না বাইরে রোদ উঠেছে। বরফ

গলছে। গিরগিটি দেখা দিয়েছে। ওরা জানে না বরফের নীচে ঘাস জন্মেছে...বলতে-বলতে তিনি বাইরের দরজা খুলে এক লাফে বেরিয়ে এলেন বাইরের সাদা মৃত হৈম পৃথিবীতে।

একবারের বেশি শ্বাস টানতে হল না তাঁকে। পরমুহূর্তেই জমে কাঠ হয়ে পড়ে গেল তার শরীর।

ব্যাপারটা টের পেতে সীমন্তকের দেরি হয়নি। টি ভি চ্যানেলেই সে দৃশ্যটা দেখেছে। বাইরে যাওয়ার পোশাকটুকু পরে নিতেই যেটুকু সময় নিয়েছে, পরমুহূর্তেই সে বাইরে এসে বৃদ্ধের কাঠের মতো শক্ত শরীরটা বয়ে আনল ভিতরে। শরীরে প্রাণের চিহ্ন নেই।

একটা কাচের বাক্সে বৃদ্ধের শরীরটা শুইয়ে দিল সে। সুইচ টিপল। বৃদ্ধকে বাঁচিয়ে তোলাটা তেমন কঠিন হবে না। এই বাক্সের মধ্যে ক্রমশ এক হিটার শরীরটাকে গরম করে তুলবে, বুক মালিশ করবে, শ্বাস-প্রশ্বাস চালু রাখবে। বাকি কাজটুকু করবেন গর্ভনগরের মহান চিকিৎসকবৃন্দ। সীমন্তক অবাক হয়ে দেখল। বৃদ্ধের মৃত মুখে একটু নির্মল আনন্দের হাসিও তার শরীরের মতোই জমে বরফ হয়ে আছে।

সীমন্তক কাচের বাক্সে শোয়ানো বৃদ্ধের মুখের দিকে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ, তারপর আপন মনেই বলল—কেন বুড়োবাবা তোমরা একটু রোদ্দুরে দেখে অমন পাগলাপারা হয়ে ওঠো?

বৃদ্ধের শরীর আস্তে-আস্তে গরম হচ্ছে, প্রাণের চিহ্ন ফিরে আসছে। সীমন্তক জানে বুড়ো লোকটি বেঁচে উঠবে। তবে হয়তো এবার সত্যিই বুড়োর মগজ বদলে ফেলবেন ডাক্তাররা। কিছু কিছু অঙ্গপ্রত্যঙ্গও বদলাতে হবে।

সীমন্তক দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে উঠল—বেঁচে উঠবে বটে বুড়োবাবা, তবে হয়তো আর কোনওদিন রোদ্দুর দেখে আনন্দে হেসে উঠবে না।

কিন্তু যতক্ষণ না মগজ বদল হচ্ছে, যতক্ষণ না মৃত্যুর ছায়া সরে যাচ্ছে শরীর থেকে ততক্ষণ বৃদ্ধ এক অমলিন রোদ্দুর গিরগিটি, অরণ্য ও সবুজের স্মৃতির মধ্যে ডুবে থেকে হাসতে থাকেন।
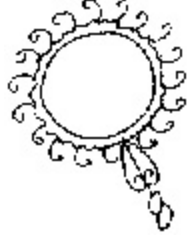
স. ূর্ণতা

ঠিক পুরুষের মতো গলায় একজন বয়স্কা নার্স চেঁচিয়ে ডাকছিল।

—অমিতাভ গাঙ্গুলি কে? অমিতাভ গাঙ্গুলি?

বাবার মুখ নোয়ানো। হাতের ওপর থুতনি রেখে বোধহয় চোখ বুজে আছে। ডান গালে স্টিকিং প্লাস্টারে সাঁটা তুলোর ঢিবি। ডাক শুনে মুখ তুলে শমীকের দিকে তাকাল। শমীক উঠে দু-পা এগিয়ে থতমত গলায় বলে—এই যে এখানে।

নার্স হাতের কাগজটার দিকে চোখ রেখেই বলে—ক্যানসার। থার্ড স্টেজ। কিছু করার নেই।

—তাহলে? শমীক প্রশ্ন করে।

উত্তর অবশ্য পায় না। নার্স পরের নাম ধরে ডাকছে—নওলকিশোর ওঝা—

বাবা ওঠে।

—কী বলল?

শমীক যথার্থ বুদ্ধিমানের মতো বলে—কত ভুলভাল বলে ওরা! এর রোগ ওর ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়।

—থার্ড স্টেজ না কী যেন বলছিল! বাবা ধীরে-ধীরে বলে।

—রোগটা প্রাইমারি স্টেজে আছে আর কি। ওষুধ পড়লেই সারবে।

হাসপাতালের বাইরে এসে শমীক বলে—ট্যাক্সি নেব বাবা?

—ট্যাক্সি কেন আবার? তিন নম্বরে উঠে শেয়ালদা চলে যাব।

শেয়ালদার হোটেলে ফিরে বাবা তার প্যান্ট ক্রিজ ঠিক করে রেখে যত্নে ভাঁজ করল। হ্যাঙারে টাঙাল জামা। লুঙ্গি পরতে-পরতে বলল—থার্ড স্টেজ মানে কি প্রাইমারি স্টেজ?

—হ্যাঁ।

—তবে যে বলছিলি, ওরা ভুলভাল বলছিল।

শমীক অত বুদ্ধি রাখে না। তা ছাড়া, তার নিজেরও বুকের ভিতরে একটা কী যেন উথলে পড়ছে। তিনটে বোন বিয়ের বাকি। দুই ভাই ইস্কুলে পড়ে। তার নিজের বি. এ. পাশ করতে এখনও এক বছর। যদি আদৌ পাশ করে। এবং এই অবস্থায় বাবাজি বোধহয় চললেন।

দুই গাল রবারের মতো টেনে হাসল শমীক। বলল—না না। থার্ড স্টেজই বলেছে। তার মানে—

বাবা বিশ্বাস করেছে। কোঁচকানো কপাল হঠাৎ পরিষ্কার হয়ে গেল। বিছানায় পা তুলে আসনপিঁড়ি হয়ে বসে বলল—যদি প্রাইমারি স্টেজই হয় তবে হোটেলের টাকা গুনে এখানে থাকি কেন? আমাদের চা বাগানে ফিরে যাই চল। দরকার মতো জলপাইগুলি কি কুচবিহারে গিয়ে চিকিৎসা করালেই হবে।

—ডাক্তারকে বলে নিই।

—কালই বলো। আমি বরং শিয়ালদায় আজই খোঁজ নিই যদি পরশুর রিজার্ভেশন পাওয়া যায়।

—তাড়াহুড়োর কী আছে! এসেছি যখন ট্রিটমেন্টটা করিয়েই যাব। কলকাতার মতো ব্যবস্থা কি মফসসলে হবে?

বাবা ডান গালের তুলোটা একটু চেপে ধরল। শমীক জানে, তুলোয় ঢাকা আছে একটি ঘা। ঘায়ের ভিতর দিয়ে পচন। ক্রমশ গালের মাংস খসে খসে পড়বে। প্রথম ব্যাপারটা সন্দেহ করেছিল একজন ডেন্টিস্ট। বাবার কষের অকেজো দাঁতটা উপড়ে ফেলে শমীককে আড়ালে ডেকে বলল—দাঁতটা তুলে বোধহয় ভালো করলাম না। দেয়ার ইজ সাম পিকিউলিয়ার সোর। একবার কলকাতায় নিয়ে গিয়ে বড় ডাক্তার দেখাবেন।

শমীক জিগ্যেস করল—কেন?

—সন্দেহ হচ্ছে ক্যানসার।

—জলপাইগুড়ির বড় ডাক্তারও সেই একই কথা বলে—কলকাতায় নিয়ে যান। না হলে সিওর হওয়া যাবে না।

গাঙ্গুটিয়া চা-বাগান থেকে শমীক তার বাবাকে নিয়ে কলকাতায় এসেছে। নিশ্চিত হওয়ার জন্য।

আজ নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। থার্ড স্টেজ মানে প্রাইমারি স্টেজ নয়। শমীক জানে। বাবা জানে না।

পরদিন বাবাকে হোটেলে রেখে একা হাসপাতালে গেল শমীক। বহু কষ্টে দেখা করল ডাক্তারের সঙ্গে। ডাক্তার সব শুনে হাসলেন।

—হাসপাতালে রেখে লাভ কী? সারাবার হলে নিশ্চয়ই রাখবার চেষ্টা করতাম। যে কয়দিন বাঁচেন আপনার বাবাকে আপনাদের কাছেই রাখুন। যা খেতে চান দিন, যা যা করতে চান সব করতে বলুন। মেক হিম হ্যাপি। হাসপাতালের লোনলিনেস আর ড্রাজারিতে শেষ কটা দিন কেন কষ্টের মধ্যে ফেলে রাখবেন? আমাদের কিছু করার নেই।

—আপনি সিওর যে এটা ক্যানসার?

ডাক্তার হাসলেন—ইচ্ছে করলে আপনি আর কাউকে কনসাল্ট করতে পারেন। ডক্টর মিত্রকে দেখান, আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি। অবশ্য দেখানোটা সান্ত্বনামাত্র।

রাতে খাওয়ার সময় বাবা অনুযোগ করতে থাকে—এরা একেই বিচ্ছিরি খাবার দিচ্ছে, তাও তুই মাছটা ফেলে রাখছিস। ভাত তো কিছুই খেলি না। এখানে এসে সাতদিনে কত রোগা হয়ে গেছিস। ভালো করে খা।

—বাবা, কাল একজন স্পেশিয়ালিস্টের কাছে যাব।

—কেন?

—ডক্টর মিত্রের খুব নাম। দেখি কী হয়।

—প্রাইমারি স্টেজ যখন, অত ব্যস্ত হওয়ার কী আছে?

—দেখানো ভালো।

—অসুখটা ওরা কী বলছে? নালি ঘা তো?

—তাই।

—ঘাবড়াচ্ছিস কেন?

বাবা তার গলা ভাত আর ঝোল দিয়ে চটকানো কাথের বাটিতে চুমুক দিয়ে বলে—কী খারাপ রান্না এদের। কিচ্ছু গেলা যায় না। তোর মা যে সেদ্ধ ঝোল রাঁধে তারও কেমন ভালো স্বাদ।

বাবা শমীকের দিকে চেয়ে থাকে। তারপর আস্তে-আস্তে করে বলে—কাল তোকে রামদুলাল স্ট্রিটের সেই দোকানটায় নিয়ে যাব। কখনও তো খাসনি, দেখিস কেমন ভালো সন্দেশ করে ওরা! আমরা ছাত্রজীবনে দল বেঁধে গিয়ে খেয়ে আসতাম।

গতকাল নার্সটা চেঁচিয়ে বলেছিল 'ক্যানসার'। বাবা কি সেটা শুনতে পায়নি? বায়োপসি কেন করানো হল, তাও কি বাবা জানে না? না কি সব জেনে বুঝে বাবাও অভিনয় করে যাচ্ছে।

পরদিন সন্ধেবেলা ডক্টর মিত্রর বিশাল বাইরের ঘরে বাপ-ব্যাটায় বসে আছে। ডাক্তার টেনিস খেলতে গেছেন। আসবেন। শ্লিপে নাম লিখে বেয়ারার কাছে দিয়ে বসে অপেক্ষা করছে আরও দশ বারোজন লোক। বত্রিশ টাকা ফি দিতে পারে এমন কয়েকজন। শমীক বাইরে একবার সিগারেট খেতে বেরিয়েছিল। কী সুন্দর বাড়ি। সিনেমায় এ রকম দেখা যায়। সামনে লন, গাড়িবারান্দা, লবি। পেতলের ভাসে সব অদ্ভুত গাছ। লনের ঘাস এদেশের ঘাসই নয়। সিগারেট ধরিয়ে চারদিকটা দেখছিল। সফলতা একেই বলে। কত লোক কত বেশি সুখে আছে।

গায়ের ঘাম তখনও মরেনি, অল্পবয়সি সুন্দর চেহারার এবং হাস্যমুখ ডাক্তারটি চটপট পায়ে রুগির ঘরে ঢুকে ভিতর দিকে চেম্বারে চলে যেতে-যেতে একবার রুগিদের দিকে চেয়ে মিষ্টি করে হেসে গেলেন। হাসিতে বরাভয় এবং আত্মবিশ্বাস। শমীকের বুকটা ভরে ওঠে। বাবাকে সে ঠিক জায়গাটিতে নিয়ে এসেছে। এ তো আর হাসপাতালের বাজারি ব্যাপার নয়। এখানে ঠিকমতো পরীক্ষা হবে, বিচক্ষণ ডাক্তার ঘা পরীক্ষা করেই হেসে উঠে বলবেন—আরে দূর! এ তো সেপটিক কেস।

ব্যাপারটা ঠিক সেরকম হল না! ডাক্তারের চিঠিটা পড়ে ডাক্তার মিত্র বাবাকে পরীক্ষা করলেন। বায়োপসির রির্পোর্টটাও দেখলেন। মুখে হাসিটা ছিলই, আত্মবিশ্বাসও ছিল। বাবাকে বললেন—বয়স কত?

—পঞ্চান্ন।

—ছেলেমেয়ে?

—তিন ছেলে, তিন মেয়ে। মেয়েটি বড়।

ডাক্তার শমীকের দিকে তাকিয়ে হাসলেন—কী করেন?

—পড়ি। বি. এ.।

—আর্টস! আমারও খুব ঝোঁক ছিল আর্টস পড়ার। আমার বাবা প্রায় জোর করে ডাক্তারি পড়িয়েছিলেন।

এই সব কথা বললেন ডাক্তার। একটা ছোট্ট চিঠি লিখে দিলেন হাসপাতালের ডাক্তারকে! বললেন—এটা ডক্টর সেনকে দেবেন। প্রেসক্রিপশন যা আছে তাই চলবে।

—কিছু করার নেই? খুব আস্তে, প্রায় ডাক্তারের কানে-কানে বলে শমীক।

ডাক্তার হাসলেন।

রাস্তায় একটা ল্যাম্পপোস্টের তলায় চিঠিটা খুলে দেখল শমীক। লেখা—ডিয়ার ডাঃ সেন, দি কেস ইজ হোপলেস। প্লিজ হেলপ দিস ম্যান। মিত্র।

বাবা শমীকের কাঁধের ওপর দিয়ে চিঠিটা দেখছিল—কী লিখে দিল রে? হোপলেস! হোপলেস ব্যাপারটা কী?

চিঠিটা ভাঁজ করে রেখে শমীক বলে—হোপলেস নয়। লিখেছে হেলপলেস। কলকাতায় আমরা তো কিছু জানি না, তাই লিখেছে। অসহায়।

—ও। বাবা একটু গম্ভীর হয়ে বলে—বত্রিশ টাকা নিল, কোনও প্রেসক্রিপশন দিল না?

—ওই ওষুধই চলবে।

—আর বেশি ছোটাছুটি করিস না। হাসপাতাল, ডাক্তার, এত কিছু করছিস কেন?

—অসুখ-বিসুখে এ সব একটু করতেই হয়।

—আমার আর ভালো লাগছে না। যা হওয়ার হবে, চল বাগানে ফিরে যাই।

শমীক মাথা নেড়ে বলে—তাই হবে।

বাবা উজ্জ্বল মুখে বলে—ঠিক তো?

—কাল রিজার্ভেশনের চেষ্টা করব।

বাসরাস্তায় এসে বাবা বলে—এখন কোথায় যাবি?

—কোথায় আর যাব! হোটেলেই ফিরে যাই চল।

বাবা একটু হাসে। বলে—কাছেই গড়িয়াহাটা। চল একটু দোকানপসার ঘুরে যাই। সস্তায়-গণ্ডায় যদি পাই তো সকলের জন্য একটু জামাকাপড় নিয়ে যাব। পুজোর তো দেরি নেই। কলকাতায় একটু সস্তা হয়।

—এখন থাক বাবা। অনেক টাকা খরচ হয়ে গেল!

—তোর জন্যই তো। খামোকা আজ বত্রিশটি টাকা দিলি।

—ভালো ডাক্তারকে দেখালে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

—চল, দোকানটোকান একটু দেখে যাই। গড়িয়াহাটের কাপড়ের দোকানের খুব নাম শুনি।

শমীক অগত্যা রাজি হয়। বাপ-ব্যাটায় হাঁটে গড়িয়াহাটার দিকে। বাবা গালের তুলোটা হাতের তেলোয় একটু চেপে ধরে রেখে বলে—কলকাতায় এসে তো কেবল আমাকে নিয়েই হুড়যুদ্ধ করছিস। কাল বেরিয়ে একটু একা-একা ঘুরবি, সিনেমা থিয়েটার দেখবি। তোদের বয়সে কি কেবল রোগের চিন্তা ভালো লাগে! কাল বেরোস।

শমীক উত্তর দিল না।

পরদিন সকালে উঠে বাবা বলল—কলকাতায় যা শব্দ! রাতে ভালো ঘুম হয় না! বাগানে থাকতে থাকতে এমন অভ্যাস হয়ে গেছে যে নিশুতি নিঝুম না হলে চলে না। তার ওপর আবার ছারপোকা।

শমীক জামাকাপড় পরছিল। একবার রেলের বুকিং অফিসে যাবে।

বাবা শ্বাস ফেলে বলল—ঘায়ের ব্যথাটাও হচ্ছিল।

—বিশ্রাম নাও।

—একা ঘরে কি ভালো লাগবে?

—তবে কী করবে?

—একটু বেরোব ভাবছি। কলকাতা তো আর আমার অচেনা জায়গা নয়।

—শরীর খারাপ, একা বেরোনো কি ঠিক হবে?

বাবা মাথা নেড়ে খুব তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলে—শরীর কিছু খারাপ নয়। বেশ তো আছি। কাছেই যাব, সীতারাম ঘোষ স্ট্রিটে। খগেন ওখানে থাকত।

—খগেনকাকা! তোমার বন্ধু তো!

ছেলের চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে বাবা বলে—হ্যাঁ। এখনও আছে কি না কে জানে! বিশ বছর খবর জানি না। বেঁচেই নেই হয়তো। আমাদের তো এখন সব যাওয়ার বয়স। একে একে সব রওনা হয়ে পড়ব।

শমীক বলল—খগেনকাকার ওখানে যাবেই যদি তাহলে তৈরি হয়ে নাও। আমি তোমাকে পৌঁছে দিয়ে যাব।

বাবা একটু অবাক হয়ে বলে—তুই সঙ্গে যাবি?

—না হলে তুমি একা এই ভিড়ে যেতে পারবে নাকি?

বাবা একটু ইতস্তত করে বলে—চল।

মনে-মনে হাসে শমীক। খগেনকাকা বাবার কেমন বন্ধু তা সে জানে না। শুধু এইটুকু জানে, বাবা যৌবনবয়সে একটি মেয়েকে এস্রাজ শেখাত! সেই মেয়েটির প্রতি এক প্রগাঢ় দুর্বলতা জন্মেছিল। কিন্তু বাবা তাকে বিয়ে করতে পারেনি! বিয়ে করেছিল খগেনকাকা। সে ছিল বড়লোকের ছেলে। এ ঘটনা বাবা মাকে গল্প করেছিল। মায়ের কাছে তারা শুনেছে। খগেন নামটা শুনেই পূর্বাপর মনে পড়ে গেল।

সীতারাম ঘোষ স্ট্রিটে বাড়িটা খুঁজে পেতে অসুবিধে হল না। বিশাল বাড়ি! সিঁড়িতে এবং দেওয়ালের নীচের দিকে এখনও মার্বেল পাথর দেখা যায়। মস্ত দরজা হাঁ করে আছে। তবে বাড়ির শ্রী দেখলেই বোঝা যায় অবস্থা পড়তির দিকে। রং চটে গেছে, জানালা দরজার পাল্লা জীর্ণ, ভিতরের চিৎকার চেঁচামেচিতে বোঝা যায় যে দু-চারঘর ভাড়াটেও বসেছে।

একজন চাকর গোছের লোক তাদের ওপরে নিয়ে গেল। চিকফেলা বারান্দা, ডানদিকে ঘুরে দরদালান। দরদালানের প্রথম ঘরটায় তাদের বসিয়ে বলল—বাবু এ সময়টায় থাকেন না। গিন্নিমাকে খবর দিচ্ছি।

বাবা একটু ইতস্তত করে বলে—খগেন বেরিয়ে গেছে?

—আজ্ঞে।

—তাহলে গিন্নিমাকেই বলো, অমিতাভ গাঙ্গুলি এসেছে। এক সময়ে তোমার গিন্নিমাকে আমি বাজনা শেখাতাম। বললে হয়তো চিনতে পারবে।

বলেই বাবা শমীকের দিকে চেয়ে হাসে। কুণ্ঠার সঙ্গে বলে—ছাত্রী ছিল।

শমীক সব জানে। তবু ভালোমানুষের মতো বলে—তাই নাকি।

বাবা শ্বাস ফেলে বলে—কতকালের কথা সব। খগেনটা সুদখোর ছিল। সুদেরই কারবার ওদের। কালোয়ারি ব্যাবসাও আছে বটে, তবে টাকা খাটানোটাই ছিল আসল।

এ ঘরটা বেশ বড়। পুরোনো আমলের বড় মেহগিনি টেবিল, আবলুশ কাঠের কালো চেস্ট অফ ড্রয়ার্স। সূক্ষ্ম সব ফুল লতাপাতা আর ময়ূরের কাজ করা বর্মা সেগুনের চেয়ার! চেস্ট অফ ড্রয়ার্সের ওপরে একটা ঢাকনা দেওয়া বাদ্যযন্ত্র রয়েছে। দেখলেই বোঝা যায় যে এটা এস্রাজ। পাশে একটা তবলা আর পেতলের ডুগি, গদি মোড়া হয়ে বিড়ের ওপর ঘুমোচ্ছে। বাবা এখনও গাঙ্গুটিয়ায় সন্ধের পর মাঝে-মাঝে এস্রাজ নিয়ে বসে। শমীক তবলা ঠোকে।

বাবা হঠাৎ আপন মনে মাথা নেড়ে বলল—চিনতে পারবে না বোধহয়!

—কে চিনতে পারবে না?

—কমলা। কতকালের কথা! বলে বাবা অপ্রতিভ মুখখানা ফিরিয়ে নেয়।

গালের তুলোটা হাতের তেলোয় চেপে ধরে। বলে—চেহারাও পালটে গেছে।

নীচের তলার ভাড়াটেদের গলার শব্দ হচ্ছে। কিন্তু ওপর তলাটা নিস্তব্ধ। সম্ভবত এ বাড়িতে লোকজন বেশি নেই। একটা ধূপধুনোর গন্ধ আসছিল। একবার একটু পুজোর ঘণ্টা নাড়ার শব্দ এল। বাপ-ব্যাটায় বসে থাকে মুখোমুখি। শমীক বাবার দিকে তাকায় তো বাবা চোখ সরিয়ে নিয়ে দেওয়ালের অস্পষ্ট পুরোনো অয়েলপেইন্টিং দেখতে থাকে। হঠাৎ আপনমনে বলে—নেই-নেই করেও এখনও অনেক আছে। এ বাড়িটার ভ্যালুয়েশনই পাঁচ-সাত লাখ টাকা হবে। অথচ সুদের কারবারির নাকি ভালো হয় না। এরা তবে এত ভালো আছে কী করে?

শমীক একটু হতাশ হয়। পুরোনো প্রেমিকার বাড়িতে বসে আবার এ কীরকম বিষয়ী কথাবার্তা। একটু পরেই সে আসবে, কাঁপা বুক, স্মৃতি আর অধৈর্য নিয়ে বসে থাকার কথা এখন। তেষ্টা পাবে, কথা হারিয়ে যাবে, দৃষ্টি চঞ্চল হবে। এ সময়ে বাড়ির ভ্যালুয়েশনের কথা মনে আসবে কী করে?

বাবা শমীকের দিকে তাকিয়ে বলে—তোর দেরি হয়ে যাচ্ছে না?

হোক দেরি। শমীক দৃশ্যটা দেখতে চায়। বাবা যদি কণামাত্র খুশি হয়, যদি প্রেমিকাকে দেখে একটুমাত্র জীবনীশক্তি আহরণ করতে পারে, তবে শমীকের বুক ভরে যাবে। সে মুখে বলে—না। দেরি হচ্ছে না।

—রিজার্ভেশন যদি না পাস!

—পাব না ধরেই নিয়েছি। গাড়িতে যা ভিড়। না পেলে ব্ল্যাকে নেব।

—আবার গুচ্ছের টাকা নষ্ট। কাল কাপড়জামায় অনেক বেরিয়ে গেছে।

শমীক হাসল। আবার বিষয়ী কথা। মুখে বলে—সে তো তোমার জন্যই। অত কিনতে কে বলেছিল?

বাবা অপ্রতিভ হাসে। শমীক দরজার দিকে পাশ ফিরে বসেছিল, বাবার দিকে চেয়ে। বাবার দরজার দিকে মুখ। হঠাৎ দেখল, বাবার মুখটা পালটে গেল। শরীরটায় একটু শিহরণ কি!

শমীক তাকিয়ে মহিলাকে দেখতে পায়। মাথায় অল্প ঘোমটা, ফরসা, সুগোল ভারী চেহারা, মুখখানা প্রতিমার মতো সুশ্রী। তার নিজের মায়ের মতোই বয়স হবে, তবে ইনি অনেক সুখী। মুখে একটু হাসি।

বাবা উঠে দাঁড়ায়। মহিলা এগিয়ে এসে পা ছুঁয়ে প্রণাম করেন।

—চিনতে পেরেছ? বাবা জিগ্যেস করে।

—ওমা! চিনব না? এই ছেলে বুঝি।

—বড়জন!

—বসুন।

বাবা হাসে। মহিলাও বসেন একটু দূরে চেয়ারে। সাবধান গলায় বলেন—কবে আসা হল? গালে ওটা কী?

বাবা গালের তুলোয় হাত চেপে বলে—এর জন্যই আসা। একটা ঘায়ের মতো! ডাক্তার বলেছে, ভয়ের কিছু নয়।

—ঘা!

—দাঁত তুলে সেপটিক হয়ে গিয়েছিল।

—ও।

—তোমরা সব কেমন আছ? বহুকাল খবর বার্তা পাই না।

মহিলা হাসেন। বলেন—আপনি সেই চা বাগানে এখনও আছেন?

—হ্যাঁ। ওখানেই জীবন শেষ করে ফেললাম।

মহিলা একটা শ্বাস ফেললেন—জানি সবই।

বাবা একটা গলা খাঁকারি দেয়। বলে—খগেনের কেমন চলছে?

—ওই একরকম।

বাবা হেসে বলে—খুব বাবু মানুষ ছিল। সেই কোঁচানো ধুতি, গিলে করা পাঞ্জাবি, আর বত্রিশজোড়া জুতো এখনও চালাচ্ছে? চুলে কলপ-টলপ দেয় না?

মহিলা মুখে আঁচল তুলে হাসি ঢাকেন। মৃদুস্বরে বলেন—কলপের দরকার হয় না। টাক পড়ে গেছে।

—পড়ারই কথা। বলে বাবা গম্ভীর হয়ে যায়। এস্রাজটা ইঙ্গিতে দেখিয়ে বলে—এখনও বাজাও?

মহিলা মাথাটা নুইয়ে দেন। মাথা নাড়েন। না, বাজান না।

বাবা চুপ করে দেওয়ালের দিকে চেয়ে থাকে। হলঘর থেকে দেওয়াল ঘড়ির শব্দ আসে। চাকর মিষ্টির প্লেট রেখে যায়। গেলাসে জল। চা।

বাবা প্লেটের দিকে চেয়ে বলে—চিবোতে পারি না।

—কষ্ট হয়?

—হুঁ। আমার পথ্য লিকুইড।

—শরবত করে দিই?

—না।

মহিলা তবু উঠে যান। বোধহয় শরবতের ফরমাশ দিয়ে এসে আবার বসেন। ঘোমটা খসে গেছে। এখনও কী গহীন কালো চুলের রাশি!

—খগেনকে বোলো, আমি এসেছিলাম। কাল বা পরশু ফিরে যাব।

মহিলা চুপ করে থাকেন। শমীক একটা-দুটো মিষ্টি খায়। চা শেষ করে। তারপর উঠে বলে—বাবা, আমি আসি?

—যাবে? বাবা তটস্থ হয়ে বলে—আমিই বা বসে থাকি কেন? খগেন যখন নেই!

মহিলা ঘোমটা আবার মাথায় তুলে শমীককে বলেন—তুমি এখন কোথায় যাবে বাবা?

—একটু কাজ ছিল।

—আমি ওঁকে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করব। উনি একটু থাকুন এখানে, কেমন?

বাবা অপ্রতিভ হয়। শমীক এটাই চাইছিল। তার সামনে জমবে না ওদের। তার পালানো দরকার এখন। সে মহিলাকে একটা প্রণাম করে বলে—আচ্ছা। বাবার কোনও তাড়া নেই। সারাদিন তো একা।

মহিলা হাসলেন। বললেন—আমারও তাই। একা।

বলেই সামলে গেলেন। হেসে বললেন—ছেলেপুলে নেই তো।

খুব ধীরে শমীক দরদালানে বেরিয়ে আসে। বারান্দা পার হয়। সিঁড়ির মুখে চলে আসে। আর সেইখানে নিস্তব্ধ সিঁড়ির মুখে চুপ করে একটু দাঁড়িয়ে থাকে। কীসের জন্য যেন উন্মুখ ও উৎকর্ণ হয়ে থাকে। আর হঠাৎ শুনতে পায়, মৃদু একটা সুরের কেঁপে ওঠা। এস্রাজ বেজে উঠল।

নিশ্চিন্তে শমীক সিঁড়ি ভেঙে নামতে থাকে।

দুপুরে যখন খেতে হোটেলে ফিরেছিল শমীক তখনও বাবা ফেরেনি। শমীক তাই বেরিয়ে পড়ল। মন ভালো ছিল না। এলোপাথাড়ি ঘুরল কেবল। বাবাজি চললেন। গাছের মতো, স্তম্ভের মতো বাবাজি আর থাকবেন না। তিনটে বোনের বিয়ে বাকি, ভাইরা এখনও নাবালক। কিন্তু সে সমস্যার চেয়ে বড় হচ্ছে শোক। সংসারের অপরিত্যাজ্য, অবিভাজ্য একজন থাকবে না। লোকটা তার প্রেমিকার বাড়িতে সকালে এস্রাজ বাজাতে বসেছিল। জানে না একটা কালো হাত নালি ঘা বেয়ে নেমে যাচ্ছে তার বুকের সুরের উৎসের দিকে। প্রাণঘড়ির কল টিপে বন্ধ করে দেবে। নার্সটা চেঁচিয়ে বলেছিল—ক্যানসার, থার্ড স্টেজ। কিছু করার নেই। সে কথা বাবা কি শোনেনি! কিংবা ডাক্তার মিত্রের লেখা চিঠিখানায় 'হোপলেস' শব্দটাও কি দেখেনি। নিশ্চিতভাবে! বড় অবাক লাগে। লোকটা নিশ্চিন্ত মনে এস্রাজ বাজাচ্ছিল আজ সকালেও।

ফিরতে সন্ধে হয়ে গেল। এসে দেখল, বাবা খুব নিবিষ্ট মনে সুটকেস গোছাচ্ছে! তাকে দেখে আনন্দিত স্বরে বলে—আয়। কোথায় ছিলি!

—ঘুরছিলাম। তুমি দুপুরে ফেরোনি?

—না। ছাড়ে নাকি! দুপুরে খাওয়াল। ঝোলভাত মেখে নরম করে দিল, ঘোল-টোল, শরবৎ, ফলের রস, কত কী!

শমীক হাসে। বলে—ভালো।

বাবার মুখে একটা রক্তাভা। একটু বুঝি হালকা পলকা তার মন। একটা হাওয়া এসে মনের ওপরকার সব ধুলো উড়িয়ে নিয়ে গেছে। বলল—একটা রাগ শেখাচ্ছিলাম সেই কবে! পুরোটা তখনও তুলতে পারেনি, হঠাৎ বিয়ে হয়ে গেল। আর শেখা হয়নি। আজ সারাদিন সেটা শিখিয়ে দিয়ে এলাম।

—ও।

—অসম্পূর্ণ একটা কাজ সম্পূর্ণ হল।

—খগেনকাকার সঙ্গে দেখা হয়নি?

বাবা একটু গম্ভীর হয়ে বলে—না। সে নাকি অনেক রাতে ফেরে। আমি আর বসলাম না। রাত হয়ে যাচ্ছিল।

—রিজার্ভেশন পেয়েছি বাবা। কালকের।

—পেয়েছ। বাঃ নিশ্চিন্ত! বলে বাবা খুব খুশি হয়। বলে—

সব দিক দিয়েই ভালো হল। কী বলিস!

—হ্যাঁ বাবা।

বাবা খুব একরকম উজ্জ্বল হাসে। বিছানার ওপর ছড়ানো নতুন কেনা শাড়ি, প্যান্ট আর পাটের কাপড়, টুকটাক নানান জিনিসের দিকে মমতাভরে তাকিয়ে থাকে বাবা। বলে —জিনিসগুলো খারাপ কিনিনি, না রে? সবাই খুশি হবে।

শমীক একটু দুষ্টুমি করে বলে—কিন্তু অত দামি জিনিস কিনেছ! অত দামি জামাকাপড় তো আমরা কখনও পরি না।

—তা হোক, তা হোক। বাবা খুশির গলায় বলে—আমার তো এটাই শেষ পুজোর বাজার। এবারটায় না হয় দামিই দিলাম।

বড় চমকে যায় শমীক। একদৃষ্টে বাবার দিকে চেয়ে থাকে। তবে কি বাবা জানে! জেনেও বাবা স্বাভাবিক আছে? এত আনন্দ। অত খুশির মেজাজ। শমীক মনে-মনে বলে, তবে কি জানে বাবা?

বাবা তার দিকে চোখ তুলে চায়। বলে—একটা অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ হল, বুঝলে। কমলাকে রাগটা শিখিয়ে এলাম। মনটা বহুকাল ধরে ভার হয়ে ছিল।

বাবা চুপ করে হাসিমুখে ছেলের দিকে চেয়ে থাকে। শমীক পরিষ্কার বুঝতে পারে, বাবার চোখ নিঃশব্দে তার প্রশ্নের জবাব দিল—জানি হে জানি!

দেখা হবে

নকশি কাঁথার মতো বিচিত্র এক পৃথিবী ছিল আমাদের শৈশবে। এখনও পায়ের তলায় পৃথিবীর মাটি, চারিদিকে গাছপালা, মাথার ওপর আকাশ। বুক ভরে শ্বাস টেনে দেখি। না, শীতের সকালে কুয়াশায় ভেজা বাগান থেকে যে রহস্যময় বন্য গন্ধটি পাওয়া যেত তা আর পাওয়া যায় না। আমাদের সাঁওতাল মালি বিকেলের দিকে পাতা পুড়িয়ে আগুন জ্বালত। সেই গন্ধ কতবার আমাকে ভিন্ন এক জন্মের স্মৃতির দিকে টেনে নিয়ে গেছে। আর মনে আছে মায়ের গায়ের ঘ্রাণ। সে গন্ধে ঘুমের ভেতরেও টের পেতাম, মা অনেক রাতে বিছানায় এল। মা'র দিকে পাশ ফিরে শুতাম ঠিক। তখন নতুন ক্লাসে উঠে নতুন বই পেতাম ফি বছর। কী সুঘ্রাণ ছিল সেই নতুন বইয়ের পাতায়। মনে পড়ে বর্ষার কদম ফুল কুড়িয়ে এনে বল খেলা। হাতে পায়ে কদমের রেণু লেগে থাকত বুঝি। কী ছিল! কী থাকে মানুষের শৈশবে! বিকেলের আলো মরে এল যেই অমনি পৃথিবীটা চলে যেত ভূতেদের হাতে। এক ঘর থেকে অন্য ঘরে যাওয়া ছিল ভারী শক্ত। বিশাল বাড়িতে কয়েকটি প্রাণী আমরা গায়ে-গায়ে ঘেঁষে থাকতাম। ভোরের আলোটি ফুটতে-না-ফুটতে ঘুম ভেঙে লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নেমে ছুটতাম বাইরে। বাইরেটাই ছিল বিস্ময়ের। সূর্য উঠছে, আকাশটা নীল, গাছপালা সবুজ। সব ঠিক আগের দিনের মতোই। তবু অবাক হয়ে দেখতাম, মনে হত, গতকাল ঠিক এরকম দেখিনি তো! সেই আনন্দিত ছেলেবেলায় একটা দুঃখের ঘটনা ঘটে গেল। আমার ছোটকাকা মৃত্যুশয্যায়। মাত্র দেড় বছর আগে কাকিমা এসেছেন ঘরে। একটি ফুটফুটে মেয়েও হয়েছে। সে তখন হাত পা নেড়ে উপুড় হয়, কত আহ্লাদের শব্দ করে। তবু বউ মেয়ে রেখে ছোটকাকার মরণ ঘনিয়ে এল। বিকেলে শ্বাস উঠে গেছে। দাদু তখন বাইরের বারান্দায় বসে আছেন। বাঁ-হাতে ধরা তামাকের নল, কল্কেতে আগুন নিবে গেছে কখন। সন্ধের পর জ্যোৎস্না উঠেছে সেদিন। দাদু সেই

জ্যোৎস্নায় পা মেলে বসে আছেন। ভিতর বাড়িতে কান্নার শব্দ উঠেছে। বাবা আর জ্যাঠামশাইরা এসে দাদুকে ডাকলেন।

—আসুন, প্রিয়নাথকে একবার দেখবেন না?

দাদু খড়মের শব্দ তুলে ভিতর বাড়িতে এলেন। তার মুখখানা একটু ভার দেখাচ্ছিল, আর কিছু নয়। ছোটকাকা তখন বড়-বড় চোখে চারিদিকে তাকাচ্ছেন। কাকে যেন খুঁজছেন। কী যেন খুঁজে পাচ্ছেন না। বারবার বলছেন—তোমরা সব চুপ করে আছ কেন? কিছু বলো, আমাকে কিছু বলো।

জ্যাঠামশাই নীচু হয়ে বললেন—কী শুনতে চাও প্রিয়নাথ?

ছোটকাকা ক্লান্ত, বিরক্ত হয়ে বললেন—আমি কী জানি। একটা ভালো কথা, একটা সুন্দর কথা কিছু আমাকে বলো, আমার কষ্ট ভুলিয়ে দাও। আমি কেন এই বয়সে সবাইকে ছেড়ে যাচ্ছি—আমার মেয়ে রইল, বউ রইল—আমার এই কষ্টের সময় কেউ কোনও সুখের কথা বলতে পারো না!

বড় কঠিন সেই পরীক্ষা। কেউ কিছু বলতে পারে না। সবাই কেবল মরণোন্মুখ মানুষটার মুখের দিকে চেয়ে থাকে, কথা খুঁজে পায় না। কিন্তু প্রত্যেকেরই ঠোঁট কাঁপে।

একজন অতি কষ্টে বলল—তুমি ভালো হয়ে যাবে প্রিয়নাথ।

শুনে ছোটকাকা ধমকে বললেন—যাও যাও—।

আর একজন বলল—তোমার মেয়ে বউকে আমরা দেখব, ভয় নেই।

শুনে ছোটকাকা মুখ বিকৃত করে বললেন—আঃ, তা তো জানিই, অন্যকিছু বলো।

কেউ কথা খুঁজে পাচ্ছিল না।

সেই সময়ে দাদু ঘরে এলেন। স্বাভাবিক ধীর পায়ে এসে বসলেন ছোটকাকার বিছানার পাশে। ছোটকাকা মুখ ফিরিয়ে তাঁকে দেখে বললেন—বাবা, সারাজীবন আপনি কোনও ভালো কথা বলেননি, কেবল শাসন করেছেন। এবার বলুন।

সবাই নিস্তব্ধ। সেই নিস্তব্ধতায় একটা পাহাড়প্রমাণ ঢেউ অদৃশ্য থেকে এগিয়ে আসছে। ছোটকাকাকে জীবনের তীরভূমি থেকে অথই অন্ধকারের এক সমুদ্রের দিকে নিয়ে যাবে বলে ঢেউটা আসছে, আসছে। আর সময় নেই। ছোটকাকার জিভটা এলিয়ে পড়েছে, বারবার চোখ বন্ধ হয়ে আসছে, মুখ প্রবল ব্যথায় বিকৃত!

দাদু একটু ঝুঁকে শান্তস্বরে বললেন—প্রিয়নাথ, আবার দেখা হবে।

কী ছিল সেই কথায়! কিছুই না। অতিথি অভ্যাগত বিদায় দেওয়ার সময় মানুষ যেমন বলে, তেমনি সাধারণভাবে বলা। তবু সেই কথা শুনে মৃত্যুপথযাত্রী ছোটকাকার মুখ হঠাৎ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে গেল। তিনি শান্তভাবে চোখ বুজলেন। ঘুমিয়ে পড়লেন।

এসব অনেকদিন আগের কথা। নকশিকাঁথার মতো বিচিত্র সুন্দর শৈশবের পৃথিবী কোথায় হারিয়ে গেছে। সেই সুন্দর গন্ধগুলো আর পাই না, তেমন ভোর আর আসে না। মায়ের গায়ের সুঘ্রাণের জন্য প্রাণ আনচান করে! পৃথিবী বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে ক্রমে! বুড়ো গাছের মতো শুকিয়ে যাচ্ছে আমার ডালপালা। খসে যাচ্ছে পাতা। মহাকালের অন্তঃস্থলে তৈরি হচ্ছে একটি ঢেউ। একদিন সে এই পৃথিবীর তীরভূমি থেকে আমাকে নিয়ে যাবে।

বুকের মধ্যে শৈশবের একটি কথা তীরের মতো বিঁধে থরথর করে কাঁপছে আজও। সেই অমোঘ ঢেউটিকে যখনই প্রত্যক্ষ করি, মনে-মনে তখনই ওই কথাটি বুকের মধ্যে কেঁপে ওঠে। শৈশবের সব ঘ্রাণ, শব্দ ও স্পর্শ ফিরিয়ে আনে। মায়ের গায়ের ঘ্রাণ পেয়ে যেমন ছেলেবেলায় পাশ ফিরতাম তেমনি আবার পৃথিবীর দিকে পাশ ফিরে শুই। মনে হয়, দেখা হবে। আবার আমাদের দেখা হবে।

ভাগের অংশ

ছাইদানিতে একটা বিড়ির টুকরো দেখে দীপ্তিময় তার বউ রমাকে ডেকে জিগ্যেস করল— 'কে এসেছিল বলো তো! বিড়ি খায় এমন লোক কে!'

রমা বলল, 'তোমার ফুলকাকা। তুমি অফিসে যাওয়ার একটু পরেই এসেছিল, বলে গেছে আবার আসবে কয়েকদিন পর।'

'ফুলকাকা!' ভ্রূ কুঁচকে ফুলপ্যান্টের বোতাম খুলতে-খুলতে দীপ্তিময় বলল, 'কই, ফুলকাকা বলে কেউ ছিল এমন তো মনে পড়ছে না! কেমন লোক?'

রমা একটু মুশকিলে পড়ল, ইতস্তত করে বলে, 'বলল তো আমি দীপুর ফুলকাকা' তোমার ওরকম কাউকে মনে পড়ছে না?'

মাথা নাড়ে দীপ্তিময়, 'ফুলকাকা বলে কেউ ছিলই না। লোকটাকে কেমন দেখলে?'

'রোগা, বুড়ো, গরিব। মনে রাখার মতো চেহারা নয়, রাস্তার ভিড়ে আবার দেখলে চিনতেই পারব না।'

'আশ্চর্য! কিছু নিয়ে টিয়ে যায়নি তো! লোকটা চলে যাওয়ার পর ঘরটর ভালো করে দেখেছ?'

রমা বলে, 'বাইরের ঘরে নিয়ে যাওয়ার মতো জিনিস আর কিই বা আছে! মিনিট কুড়ি ছিল মাত্র, তাও ওই ঘরেই। বলল বউমা চা খাওয়াও।'

'খাওয়ালে?'

'খাওয়াব না কেন! চা আর বিস্কুট দিলাম।'

'আর কিছু চাইল না?'

'চাইল আট আনা পয়সা।'

'দিলে?'

'দিলাম। গরিব মানুষ। বলল—রাস্তাখরচ নেই, হালতু থেকে এই উত্তরপাড়া পর্যন্ত এসেছে তোমার খোঁজ করতে। দিয়ে দিলাম আট আনা।'

দীপ্তিময় সামান্য অন্যমনস্ক থাকল, তারপর বলল, 'সাবধানে থেকো। আমাদের চারপাশে অনেক ফুলকাকা। অচেনা লোককে হুট করে ঘরে ঢুকতে দিও না।'

রমাকে লোকটা ঠকিয়ে গেছে এমনটা রমার মনে হচ্ছিল না। সে বলল, 'দ্যাখো লোকটা যে তোমার আত্মীয় নয় তা বোঝার কোনও উপায় ছিল না। সে তোমাদের বাড়ির অনেকের নাম জানে, চেনে। সেজভাশুরের সঙ্গে এক কলেজে পড়েছে, তখন তোমাদের ঢাকার বাড়িতেও গেছে অনেকবার। বলল তোমাকে ছোট্ট দেখেছিল। নানা কথার মধ্যে এও বলল যে তোমার কোমরে একটা ফোঁড়া অপারেশন হয়েছিল ছেলেবেলায়। সে সময়ে উনিই তোমাকে কোলে করেছিলেন, আর পুঁজে-রক্তে তার জামাকাপড় ভরে গিয়েছিল।'

ঘরে পরার পায়জামাটা কোমর পর্যন্ত টেনে দড়ি আটকাতে গিয়ে দীপ্তিময়ের হাত থেমে রইল, বলল, 'আশ্চর্য! তবে কি আমারই ভুল হচ্ছে! ঢাকায় আমি জন্মের পর তেরো-চোদ্দো বছর কাটিয়েছি, কাজেই সব ভুলে যাওয়ার কথা নয় রমা। কিন্তু ফুলকাকা যে কে কিছুতেই মনে পড়ছে না তো! সেই ফোঁড়াকাটার দাগ দ্যাখো না, এখনও কোমরে আছে।'

'আমি তো জানি।' রমা বলল।

'লোকটা ঠিকই বলেছে। অথচ আমার তো মনে পড়ছে না ওরকম কাউকে।'

রমা এবারে হাসল, 'আমি খুব বোকাসোকা ভালোমানুষ তো নই। কাজেই যাকে তাকে বিশ্বাস করি না। এ লোকটা ঠিক জোচ্চর হতে পারে, তবে তোমাদের চেনে ঠিকই। বলে গেছে আবার আসবে, যদি আসে তবে হয়তো সামনাসামনি দেখলে তুমি চিনতে পারবে।'

'এসেছিল কেন?'

'ঠিক বুঝলাম না। হাবভাব দেখে মনে হল কোনও মুশকিলে পড়েছে। হয়তো তোমার কাছে কিছু সাহায্য চাইতে পারে। আমার কাছে আট আনার বেশি চায়নি।'

দীপ্তিময় আবার ভ্রূ কোঁচকালো। সাহায্য করতে-করতে জীবন গেল। পথে ঘাটে অফিসে ঘরে সব জায়গায় কেবল হাত-পাতা মানুষ। ভালো লাগে না!

'তোমার আছে বলেই মানুষ চায়!'

কথাটা বলেই রমা একটু হাসল। দীপ্তিময় তার শ্যামলা মিষ্টি চেহারার বউটির দিকে তাকিয়ে একটু কিছু বলবে বলে ঠিক করেছিল, তখনই রমা 'তোমার চা-টা নিয়ে আসি' বলে চলে গেল।

তখন ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে বসল দীপ্তিময়। রোজই বসে। তারপর চা খেয়ে হাতমুখ ধোয়, তারপর আবার চা খাবার খায়। বসে দীপ্তিময় রমার কথাটাই একটু-একটু ভাবল। তোমার আছে বলেই মানুষ চায়। অর্থাৎ রমা—তার বউ লক্ষ করছে যে তার অনেক আছে। ভেবে একটু শ্বাস ছাড়ে সে। আছে যে সেটা মিথ্যে নয়। আবার খুব বলার মতোও কিছু না। যা আছে তার সবটুকু কি সে উপার্জন করেনি? হাড়ভাঙা খাটুনি, একরোখা ধৈর্য। অধ্যবসায়—এসবের মূল্যেই সে যা কিছু অর্জন করেছে তাও সেটা খুব বেশি কিছু না। তবে একথা ঠিক যে, সে একটু তাড়াতাড়ি টাকা করেছে, যেটা পারেনি তার অন্য বন্ধুরা। আত্মীয়েরাও গরিব রয়ে গেছে। অথচ মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর বয়সেই সে উত্তরপাড়ায় একটি সুন্দর বাড়ির মালিক। কলকাতার ওপরে কিছু জমি কিনল কয়েকদিন আগে রমার নামে, নতুন একটা বিমাও করেছে সে। আরও অনেক কিছু করার স্থির একটা লক্ষও আছে তার। সময়ে সব হবে সে জানে। এসব নিশ্চয়ই রমারও স্বস্তির কারণ! তবে কেন রমা লক্ষ করেছে যে তার অনেক আছে!

দীপ্তিময় সহজে রাগে না, উত্তেজিত হয় না। তার স্বভাব ঠান্ডা, সে ধৈর্যশীল। তাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঘোর যৌবনেও মান-অভিমানের খেলা খুব কম হয়েছে। কম হয়েছে দীপ্তিময়ের জন্যই। কেননা সুখে থাকা, আর সাফল্যের ব্যাপারটা নিয়েই তার সব ভাবনাচিন্তা। অনেক সময়েই রমার সূক্ষ্ম ভাবপ্রবণতাগুলো সে এড়িয়ে গেছে। আজও এড়াতে পারত। কিন্তু ফুলকাকা পরিচয় দিয়ে যে লোকটা আজ এসেছিল, তার বর্ণনা দিতে গিয়ে রমা বড় সহৃদয় হয়ে পড়েছিল। লোকটা নির্লজ্জের মতো চেয়ে চা খেয়েছে, পয়সা নিয়ে গেছে, তবু তার প্রতি একটু রাগ নেই কেন রমার?

তাই রমা চায়ে চামচ নাড়াতে-নাড়াতে যখন ঘরে ঢুকল তখন রমার দিকে স্থির চোখে চেয়ে রইল দীপ্তিময়। রমার মুখ নির্লিপ্ত, চায়ের কাপে মনোযোগী চোখ, সংসারের নানা কাজের চিন্তায় সে অন্যমনস্ক। চা দিয়ে চলে যাওয়ার সময়ে রমাকে সে ডাকল, 'শুনে যাও একটা কথা।'

'কী!' বলে রমা চৌকাঠ থেকে ফিরে তাকায়!

'তুমি কি কমিউনিস্ট?'

একটু থতমত খেয়ে রমা হেসে ফেলল। 'ও কি কথা! কেন গো?'

দীপ্তিময় একটু সামলে গেল, বলল, 'না! এমনিই, তুমি কাজে যাও।'

'আচ্ছা মানুষ! আমি কমিউনিস্ট হতে যাব কেন! ওসব কি আমি বুঝি?'

'ঠিক কথা! বড়লোকের বউয়ের ওসব হতে নেই।' বলে দীপ্তিময় হাসে। সরল অকপট হাসি।

রমা দরজায় দাঁড়িয়ে একটু ইতস্তত করে, তারপর হঠাৎ বলে, 'বাড়ির মঙ্গলের জন্য মানুষকে দিতে থুতে হয়। নইলে শাপ লাগে।'

রমা একথা বলেই চলে গেল।

দীপ্তিময় জানে রমা বুদ্ধিমতী। হয়তো রমা তার প্রশ্নটার নিহিত উদ্দেশ্য আন্দাজ করে নিয়েছে। চায়ে চুমুক দেওয়ার আগে চোখের সামনে কাপটা একটুক্ষণ ধরল দীপ্তিময়, ঠিক মাঝখানে ছোট্ট এক বিন্দু ফেনাকে ঘিরে একটু ঘূর্ণি। এক কণা সর ভাসছে। অন্যমনে দীপ্তিময় চেয়ে থাকে।

পরদিনটা ছুটি।

দীপ্তিময় তার সাত বছরের মেয়ে বুবুন আর ছয় বছরের ছেলে পিন্টুকে নিয়ে সকাল থেকেই বাগানের কাজে লাগল। প্রায় দশ কাঠা জমি নিয়ে বাড়ির ঘের। সবটাই পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। পাঁচিলের ধার ঘেঁষে ঋজু ঋজু নারিকেল আর সুপুরির চারা, চারটে আম, দুটো কাঁঠাল, একটা নিম দুটো পেয়ারার গাছ। তা ছাড়াও ছুটকো গাছ অনেক, আর আছে সুন্দর সবজির খেত। শীতকাল বলে মুলো, পালং, মটরশাক, কপি আর লাউয়ের মাচার চারপাশে উজ্জ্বল সবুজ আলো হয়ে আছে। এসব দেখাশোনা করার জন্য দুজন লোক আছে। তারা দীপ্তিময়ের বাগান দেখে, দুটো গরুর দেখাশোনা করে, গোয়াল পরিষ্কার রাখে। দীপ্তিময়রা বাগানের সবজি খায় বারোমাস, ঘরের গরুর দুধ খায়। এর জন্য দীপ্তিময়ের বড় তৃপ্তি।

বুবুন আর পিন্টু ইচ্ছেমতো চারাগাছ লাগাল খানিকক্ষণ, এখানে ওখানে মাটি খুঁড়ল, জল দিল, তারপর দুজনে চোর-চোর খেলতে গাছপালার মধ্যে চলে গেল কোথায়। দীপ্তিময় তার দুজন মাইনে করা লোকের সঙ্গে দেখল ঘুরে-ঘুরে। দেখল গোয়ালঘরের চালের ওপর

এই শীতে লকলকিয়ে উঠেছে সতেজ লাউডগা। সবুজ পদ্মফুলের মতো পাতাগুলো উত্তুরে হাওয়ায় দোল খাচ্ছে। দীপ্তিময় দেখল বড় বেশি বাড়ন হয়েছে গাছটার, ফলন ভালো হবে না। দা হাতে দীপ্তিময় ডগা কাটবার জন্য চালের ওপর উঠল। তারপর মুগ্ধ হয়ে চেয়ে রইল তার দশ কাঠা জমিওয়ালা সুন্দর বাড়িটার দিকে। দক্ষিণমুখো বাড়ি তার, সামনের বারান্দা লোহার গ্রিল দিয়ে ঘেরা, বড় জানালাওলা চারখানা মাঝারি ঘর, দোতলা হবে বলে ছাদের ওপর উঁচু হয়ে আছে লোহার শিকের গুচ্ছ। একদিন দোতলা হবে—যখন তার সংসারে লোক বাড়বে। অবশ্য আপাতত লোক বাড়বার সম্ভাবনা নেই, দুটো বাচ্চা আর রমা, আর বুড়ি বিধবা মা। রমা আর ছেলেমেয়ে চায় না। দোতলাটা এখনও অনিশ্চিত। বয়স যখন বাড়বে তখন ওখানে দুটো ঘর করবে দীপ্তিময়। আর থাকবে অনেকখানি খোলা জায়গা। ইজিচেয়ারে শুয়ে দীপ্তিময় অনেকদূরে চেয়ে থাকবে। দীপ্তিময় বাগানের দিকে চোখ ফেরাল। গাছগাছালিতে কেমন নিবিড় ছায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে তার বাগান, পাখিপাখালির ডাক শোনা যায়, আর পোকা ওড়ার শব্দ। নিমগাছের উঁচু ডালে চাক গড়ছে মৌমাছি। গোয়াল ঘরের চালে সতেজ লাউডগা আর পাতার মধ্যে বসে দীপ্তিময় এক রহস্যময় আনন্দকে টের পেল। বাইরের দিকে দেওয়ালের পাশ ঘেঁষেই রাস্তা। সেদিকে চোখ ফেরালে দেখা যায় লোকজন হেঁটে যাচ্ছে, মানুষজনের চোখের আড়ালে দেওয়ালঘেরা তার সুন্দর বাড়ি আর বাগান। বড় তৃপ্তি। বাইরের পৃথিবী থেকে সে আলাদা করে নিয়েছে নিজের ছোট্ট একটু আলাদা পৃথিবী। এ সবই তার। তার নিজের। ওই বাড়ি, ওই গাছগাছালি, ওই পাখি কিংবা মৌমাছি এরা সবাই তার আপন, নিজস্ব। দেওয়ালের ওপাশে মানুষেরা হেঁটে যাচ্ছে। ওরা বাইরের মানুষ, দূরের। দীপ্তিময় চেয়ে-চেয়ে দেখল অনেকক্ষণ। তারপর পিন্টু ছুটে এসে নীচে থেকে দু-হাত বাড়িয়ে চিৎকার করে বলল, 'বাবা, আমি চালে উঠবও-ও। আমাকে তুলে নাও।' দীপ্তিময় হেসে ডগাপাতা কেটে তার দিকে ছুড়ে দিয়ে বলল, 'মায়ের কাছে রান্নাঘরে নিয়ে যাও। মাকে বলো বাবা বলেছে মুগের ডাল ছড়িয়ে রান্না করতে।'

কাঁঠাল গাছের তলায় পরিষ্কার জায়গায় একখানা চেয়ার পাতা। তার ওপর খবরের কাগজ। দীপ্তিময় বসে কাগজ খুলল। কিন্তু পড়ল না। চেয়ে রইল। বাড়িখানা আর একটু বড় হলে একটা পুকুর কাটত দীপ্তিময়, মাছ ছেড়ে দিত। আরও গোটা দুই ছেলেমেয়ে হলে বাড়িটা আরও একটু জমজমে হত। কত কিছু চিন্তা যে মাথার মধ্যে সারাদিন আসে যায়! দীপ্তিময় স্বপ্ন দেখে। কলতলার পাশে বাঁধানো গোলচত্বরে থালায় বড়ি শুকোতে দিয়ে ঘর রোদে জবুথুবু হয়ে মা বসে আছে। সাদা ঘোমটায় মুখ ঢাকা। মায়ের সঙ্গে আজকাল আর ভালো করে দেখাসাক্ষাৎ হয়ই না, কথাবার্তাও হয় খুবই কম। বয়সের সঙ্গে-সঙ্গে মার স্মৃতিভ্রংশ হয়েছে অনেক, কথাবার্তারও তাল থাকে না। মাকে দেখছিল দীপ্তিময়। সারা

শরীর সাদা থানে ঢাকা। মুখ দেখা যায় না। হঠাৎ তার খেয়াল হল মাকে একবার জিগ্যেস করলে হয় ফুলকাকা নামে কাউকে মা চিনত কিনা। যদিও দীপ্তিময় জানে যে মা চিনবেন না। তার বড় দাদা মঙ্গলময় কাঁচড়াপাড়ায় থাকে, মাঝে-মাঝে এসে দেখা করে যায়, মা তাকেও প্রথমটায় ভালো চিনতে পারে না। এমন সুন্দর সাজানো বাড়ি তার, কিন্তু মা বাড়ির কোনকিছুই ভালো করে দেখে না। ভ্যাবলা চোখে চেয়ে থাকে।

বুবুন এসে চা দিয়ে গেল। দীপ্তিময় চা খেতে-খেতে ভাবল, ফুলকাকা যদি তাদের পরিবারের চেনা কেউই হবে তবে সে এসে মায়ের খোঁজ করেনি কেন? তাদের দেশের লোকেরা এটাই পুরোনো স্বভাব, সকলের খোঁজ নেওয়া, চেনাজানা আত্মীয়দের খুঁজে বের করা। লোকটা মার খোঁজ নেয়নি, নিলে রমা তাকে বলত। তার মানে খোঁজখবর সে পছন্দ করে না। রমা হয়তো ভাবে যে, সে অসম্ভব হিসেবি, লোভী কিংবা কৃপণ। কিন্তু দীপ্তিময় জানে যে, সে অদয়ালুও নয়। সে সাধ্যমতো ভিক্ষে দেয়, লোকে বিপদে-আপদে পড়লে দেখে, অনেক চেনাজানা লোক এবং ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা আত্মীয়দের খোঁজখবর নেয়। কিন্তু সে কখনও ঠকে যেতে চায় না। রমাকে বাইরের জগতের সঙ্গে লড়াই করতে হয় না বলেই বোধহয় এসব সে ঠিক বোঝে না।

দুপুরে খেয়ে একটু ঘুমিয়েছিল দীপ্তিময়। বুবুন এসে ডাকল, 'বাবা ওঠো তোমাকে একজন ডাকছে।' দীপ্তিময় জেগে দেখল বেলা পড়ে এসেছে। প্রায় অন্ধকার হয়ে এল। দুপুরে ঘুমোলে শরীর ভালো লাগে না। তারও শরীর অবশ লাগছিল। উঠে চোখে-মুখে জল দিল দীপ্তিময়। রমা উঠোনের তার থেকে জামা-কাপড় তুলছে। তাকে বলল দীপ্তিময়, 'চা করো। বাইরে লোক এসেছে।'

বাইরের ঘরে এসে দেখল আলো জ্বালানো হয়নি। পশ্চিমের খোলা জানলা দিয়ে চমৎকার অদ্ভুত লাল একটা আলো এসে ঘরে পড়েছে। ঘরখানা যেন জ্বলছে সে আলোয়। দরজার দিকে পিঠ করে কুঁজো হয়ে বসে আছে, একজন লোক, তার ঘাড়ে চাদর হাতে লাঠি। মুখোমুখি হতেই দীপ্তিময় দেখল লোকটার চোখে ঘরের আলোর আভা পড়েছে। রাঙা দেখাচ্ছে দুখানা খুদে চোখ। ভাঙা চোয়ালে সদ্য দাড়ি কামানোর চকচকে ভাব, অযত্নের গোঁফ শুঁয়োপোকার মতো দেখাচ্ছে। পাতলা নাকখানা একটু বাঁকা, মাথায় অনেক কাঁচাপাকা চুল। সেই চুল ঘাড় পর্যন্ত লম্বা। গায়ে সাদা শার্ট, পরনে ধুতি। লোকটার বয়স পঞ্চাশ আর ষাটের মাঝামাঝি। মুখে দারিদ্র্য আর দুশ্চিন্তার ছাপ। কিন্তু তাকানোর ভঙ্গিতে কোনও বিনয় বা দীনতা নেই। দীপ্তিময়কে দেখে সোজা হয়ে বসল— 'তুমি দীপু, না?'

দীপ্তিময় বলল, 'হ্যাঁ, আমি দীপ্তিময়।'

দীপ্তিময় লক্ষ করল লোকটার হঠাৎ সোজা হয়ে বসার মধ্যে একটা তেজের ভঙ্গি আছে। এককালে লোকটি খুবই দাম্ভিক আর দাপুটে ছিল। এখন হয়তো সংসারের নানা ধাক্কায় খানিকটা দুর্বল হয়ে গেছে।

লোকটি হেসে বলল—'আমাকে তোমার মনে নেই। একসময়ে তোমাদের ঢাকার বাড়িতে আমি যেতাম। তোমরা আমাকে ফুলকাকা বলে ডাকতে।'

একটু অবাক হল দীপ্তিময়। ফুলকাকা বলতে যে মাগুনে চেহারার একটা লোককে ভেবে রেখেছিল সে, এ ঠিক তেমন নয়। যদিও রোগা, বুড়ো এবং চেহারা আর পোশাকে বেশ গরিব, তবু রমার বর্ণনার সঙ্গে অনেকটা তফাত তার চোখে পড়ল। তফাতটা কী বা কেমন তা সে পরিষ্কার বুঝতে পারল না। তবু আছে। লোকটাকে ভালো করে দেখার জন্য সে বাতি জ্বেলে দিল। মুখোমুখি বসল। তারপর বলল, 'রমা—আমার স্ত্রী বলছিল। কিন্তু আমার ঠিক মনে পড়ছে না।'

'আমার নাম হরেন গাঙ্গুলি। তোমার জ্যাঠতুতো দাদা রতনের সঙ্গে আমি জগন্নাথ কলেজে কিছুদিন পড়েছি। তখন স্বদেশি যুগ, তাই আমার বেশিদূর পড়া হয়নি।'

লোকটা গাঙ্গুলি—অর্থাৎ ব্রাহ্মণ জেনে দীপ্তিময় একবার ভাবল, উঠে একটা প্রণাম করবে কিনা। তারপর দ্বিধায় পড়ে বসেই রইল। লোকটাকে সত্যিই তার মনে নেই। সে বলল, 'সেজদা আমার চেয়ে অনেক বড় ছিলেন। প্রায় বাইশ বছরের বড়।'

লোকটা মাথা নাড়ল—'অন্য সম্পর্কে আমি তোমার কাকা।' তোমরা আজকালকার ছেলে, সেসব গোলমেলে সম্পর্ক ঠিক বুঝবে না। তা ছাড়া ও সম্পর্কের আর কোনও জোর নেই। আমাদের অনেক আপন পর হয়ে গেছে।'

দীপ্তিময়ের মনে হল লোকটা সত্যিই বড় দুঃখিত হয়ে পড়ছে সম্পর্কের দুর্বলতার কথা ভেবে। সে বিরক্ত বোধ করছিল একটু। পুরোনো আমলের কথা, সম্পর্কের কথা একবার শুরু হলে সহজে থামতে চায় না। সে সহজ স্পষ্টভাবে বোঝে যে, এ লোকটার সঙ্গে তার কোনও সম্পর্কই সত্যিকারের নেই, কেবলমাত্র একই সমাজে বসবাসকারী ছাড়া। আত্মীয়তার জটিলতা এবং তার প্রয়োজন দীপ্তিময় কখনও বোঝে না। সে ধীরে ধীরে বলল—'আমার কিছুই অবশ্য জানা নেই। মনেই নেই।'

লোকটা মাথা নাড়ল—ঠিকই তো। গতকাল রাঙা বউদিকে প্রণাম করে যাব, কথা বলে যাব ইচ্ছে ছিল। কিন্তু বউমা বলল, উনি কাউকেই এখন চিনতে পারেন না। কথা বললে বিব্রত হন। তাই আমি আর তাঁর সঙ্গে দেখা করিনি। উনি সুস্থ থাকলে ঠিক চিনতে পারতেন।'

দীপ্তিময় এবার হাসল—'না চিনলেই বা কি? আপনি যা বলছেন তা তো আর মিথ্যে নয়।'

দীপ্তিময়ের কথাটুকুর মধ্যে একটা কিছু ছিল যাতে লোকটা একটু চুপ করে রইল! তারপর আস্তে-আস্তে বলল,—'না, মিথ্যে নয়। আজকাল অবশ্য অনেকে নকল পরিচয় দিয়ে ঘুরে বেড়ায়।'

দীপ্তিময় এ কথার উত্তর দিল না। চেয়ে রইল। লোকটা হঠাৎ ময়লা একটা রুমাল বের করে মুখটা মুছল, চোখের কোণে একটু চেপে রাখল রুমালটা, তারপর সরিয়ে নিল। তার চোখের নীচের জায়গাটা ফোলা-ফোলা। মুখে অনেক ভাঁজ আর দাগ। লোকটা হাসল একটু—'তোমাকে আমি অনেক কোলে নিয়েছি। তুমি ছেলেবেলায় দেখতে বড় সুন্দর ছিলে। মেয়েদের মতো এক- গা গয়না পরিয়ে রাখা হত তোমাকে।'

সেই কবেকার দীপ্তিময়কে মনে করতে গিয়ে লোকটা অন্যমনস্ক রইল একটু। তারপর অন্যমনে বলল, 'তখন তোমাদের টিকাটুলির বাসায় মাঝে-মাঝে যেতাম। তারপর স্বদেশি করার জন্য জেলে চলে যেতে হল। আমার ওপর অনেক অত্যাচার হয়েছে।' বলেই সে হাসল, 'আমিও, অবশ্য লোকের ওপর কম অত্যাচার করিনি।'

দীপ্তিময়ের একটা সিগারেট খেতে ইচ্ছে করছিল। হরেন গাঙ্গুলির সামনে সেটা খাওয়া ঠিক হবে কিনা বুঝতে পারছিল না। যদিও একে সমীহ করার সত্যিই কোনও মানে হয় না। নিতান্তই তুচ্ছ লোকটা। অসফল। তাছাড়া সম্পর্কেও যে তেমন কিছু নয় তা বোঝা যাচ্ছে। তবু সে সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই বের করে হাতের মধ্যে নাড়াচাড়া করল। লোকটা সেদিকে চেয়েও দেখল না।

দীপ্তিময় হঠাৎ জিগ্যেস করল, 'আমার ঠিকানা কোথায় পেলেন?'

লোকটি—হরেন গাঙ্গুলি একটু লাজুক হাসল, 'তোমার ঠিকানা পাওয়া তো শক্ত কিছু নয়। কলকাতায় অনেকে চেনে, যাদবপুরে তোমার মেজপিসিমা থাকেন, আমি তাঁর কাছে মাঝে-মাঝে যাই। তিনি প্রথম তোমার খোঁজ দেন। তারপর তোমার অফিসেও একদিন গিয়েছিলাম। তোমার দেখা পাইনি। তারপর ভাবলাম অফিসের চেয়ে বাসায় দেখা করাটাই ভালো; অফিসে তো তোমার কথা বলার বা শোনার সময় হবে না!'

'কথাটা কী?' দীপ্তিময় মৃদু গলায় জিগ্যেস করল। ছোট্ট প্রশ্ন, কিন্তু তাতেই ঘরে একটা স্তব্ধতা তৈরি হয়ে গেল। লোকটা চোখ নিচু করে রইল একটুক্ষণ।

দু'হাতে ধরা লাঠিটার কাছ বরাবর মাথা নেমে এল। দু-হাতে চায়ের কাপ নিয়ে ঘরে ঢুকল রমা, মাথায় বড় ঘোমটা, পিছনে বুবুন, তার হাতে বিস্কুটের প্লেট, লোকটা মাথা

নুইয়ে ছিল, তার সামনে চায়ের কাপ রেখে রমা একবার দীপ্তিময়ের দিকে চাইল। তারপর লোকটাকে বলল, ফুলকাকা, আপনার চা। সোজা হয়ে বসল হরেন গাঙ্গুলি—'এই যে বউমা, আজই চলে এলাম। ছুটির দিন। নইলে তো দীপুকে পাওয়া যেত না।'

'বেশ করেছেন।'

লোকটা হাসল, 'ওর আমাকে মনে নেই। থাকার কথাও নয়। সম্পর্ক তো তেমন কিছু ছিল না, যারা চিনত আমাকে তারা তো সব কে কোথায় ছড়িয়ে রয়েছে।'

অপ্রাসঙ্গিক কথা, দীপ্তিময় বিরক্ত হল, চোখের ইঙ্গিত করে রমাকে চলে যেতে বলল!

রমা হেসে বলল, 'আপনারা কথা বলুন। আমি আসি।'

রমা চলে গেলে হরেন গাঙ্গুলি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সোজা হয়ে বসল, দীপ্তিময়ের দিকে সোজা তাকিয়ে বলল, 'আমার বড় অভাব চলছে দীপু। এই বুড়ো বয়সে আমি দুবেলা খেতে পাই না।'

দীপ্তিময় সোজা লোকটার চোখের দিকে তাকিয়ে রইল। দেশজোড়া খিদের গল্প। দীপ্তিময় অনেক শুনেছে। তাই তার কোনও ভাবান্তর হল না, সে সহজ চোখেই চেয়ে রইল।

হরেন গাঙ্গুলি আবার বলল, 'বেশি বয়সে বিয়ে করেছিলাম। আমার দুটো ছেলে নাবালক, মেয়ের বয়স ষোলো। রোজগার বলতে গেলে কিছুই করি না। সংসারে অচল। অত সব তোমার শুনে কাজ নেই। তোমার ভালোও লাগবে না। আমি তোমার কাছে কিছু ভিক্ষে চাইতে এসেছি।'

সিগারেট ধরাতে দীপ্তিময়ের আর কোনও বাধা রইল না। এখন আর লোকটাকে শ্রদ্ধা না করলেও চলে। কেননা লোকটা ভিক্ষে চাইছে। দীপ্তিময় সিগারেটটা টেবিলে ঠুকে জ্বালিয়ে নিল, লোকটা চেয়ে রইল।

দীপ্তিময় বলল, 'আপনি কী করেন?'

'একটা দোকান ছিল হালতুতে। মালপত্র কিনতে পারি না বলে সেটা প্রায় উঠে যাচ্ছে। সস্তা জিনিসপত্র বেচি। চলে না। এসব করার তো কোনও অভ্যাস নেই।'

দীপ্তিময় হঠাৎ বলল, 'আমার খোঁজ না পেলে কী করতেন?'

লোকটা চুপ করে কিছুক্ষণ তার কথার অর্থ বুঝবার চেষ্টা করল। তারপর বলল, 'ভগবান তোমার খোঁজ দিয়েছেন। যোগাযোগের ওপরেই তো পৃথিবী চলছে।'

দীপ্তিময় হাসে। 'আমারও কিন্তু এক সময়ে অভাব ছিল। সেসব দিনে আমি কারও কাছে, কোনও আত্মীয়ের কাছে গিয়ে ভিক্ষে করিনি। আমি যা করেছি সব নিজের পরিশ্রমে।'

লোকটা তাড়াতাড়ি বলল, 'তা তো বটেই।' তারপর একটু ফাঁক দিয়ে বলল, 'তবে তোমার বয়স সহায় ছিল, আর ছিল ভাগ্য।'

দীপ্তিময় হেসে বলল, 'দেশের কাজ করেছেন, কিন্তু নিজের কথা ভাবেননি? দেশ কি পরিবার ছাড়া?'

হরেন গাঙ্গুলি ম্লান হাসে, 'ঠিক কথা। দেশের কাজ যে খুব একটা করতে পেরেছি তা নয়। কেবল অনেকদিন জেল খেটেছি, মার খেয়েছি। তবে সেসবের মধ্যেও একটা কিছু করেছি বোধ হয়। আমরা নিজের জন্য কম ভাবতাম।'

'কিন্তু এখন তো ভাবতে হচ্ছে। আপনি ভাগ্যের কথা বললেন, আমি কিন্তু ভাগ্য বলতে পরিশ্রম বুঝি।'

'ঠিক।' হরেন গাঙ্গুলি বুঝদারের মতো মাথা নাড়ে, 'নিজের ভাগ্য বলতে আমরা কিছু বুঝতাম না, দেশের ভাগ্য ফিরলে সকলের সঙ্গে আমারও ফিরবে। দীপু, আমরা ছেলেবেলায় যৌথ পরিবার দেখেছি, সেসব পরিবারে সকলে বড়লোক ছিল না, কিন্তু সকলেই খাবার আর আশ্রয়ের ভাগ পেত। অনেক হীনতা মন-কষাকষি বিবাদও ছিল অবশ্য। তবু আমাদের শিক্ষা ওখান থেকেই। আমরা খুব দূর আত্মীয়তাও মেনে চলতাম। আমরা খাবার ভাগ করে খেতে শিখেছিলাম।'

মনে-মনে রেগে গেল দীপ্তিময়। নিজের পরিবারে বয়স্ক মানুষদের স্বার্থপরতা আর কুটিলতা সে অনেক দেখেছে। সে জানে এদের মহত্ব নামমাত্র। তবু সে মুখে রাগ দেখাল না, তর্কও করল না, কেবল বলল—'তারপর?'

'স্বদেশি যখন করেছি তখনও ওইরকমই মনে হত। নিজের জন্য কিছু নয়। সকলের জন্য সব কিছু।'

'তার ফলে কিছু হয়েছে?'

'না', মাথা নাড়ে হরেন গাঙ্গুলি 'কিছু হয়নি। স্বার্থপরতা আরও বেড়ে গেছে। তবু কিন্তু আমার দাবি থেকে যায়।'

'কীসের দাবি।'

'দেশের জন্য আমি করেছিলাম, দেশও আমার জন্য কিছু করুক।'

দীপ্তিময় হাসে—'তবে দেশই করুক।'

ব্যঙ্গটা হজম করে গেল হরেন গাঙ্গুলি, বলল, 'তুমিও দেশেরই একজন।' বলেই তাড়াতাড়ি হেসে সামলে নিল, 'এসব ছেলেমানুষি কথা। তুমি কথা তুললে বলে এসে গেল। আমি প্রাক্তন দেশসেবী হিসেবে তো তোমার কাছে আসিনি। আত্মীয়তার জোরেও না। ছেলেবেলায় তোমাকে কোলেপিঠে করেছিলাম, এখন বুড়ো বয়সে আমি গরিব অসহায়, তুমি যদি দয়া করো সেই আশায় এসেছি।'

ভ্রূ কুঁচকে চায়ে চুমুক দিল দীপ্তিময়। দেখল লোকটা চা বিস্কুট এখনও ছোঁয়নি। সে বলল—'চা-টা খান। ঠান্ডা হয়ে গেল।'

চায়ের কাপ তুলে নিল হরেন গাঙ্গুলি, বলল আমি এভাবে এসেছি বলে তুমি বোধ হয় খুশি হওনি, তাই না?'

দীপ্তিময় চুপ করে থাকে। তারপর এক সময়ে বলে—'আপনি অনেক দূর থেকে এসেছেন, আপনাকে আমি কিছু ভিক্ষে দেব। তবে...'

কথা শেষ করার আগেই হরেন গাঙ্গুলি দ্রুত চায়ের কাপটা রেখে সোজা হয়ে বসে দীপ্তিময়ের দিকে কঠিন চোখে তাকাল, 'ভিক্ষে দেবে?'

দীপ্তিময় অবাক হয়ে বলল—'আপনিই তো তা চাইলেন।'

'আমি ভিক্ষে চাইব ঠিকই। আমার দিক থেকে ওটা ভিক্ষেই। কিন্তু তুমি ভিক্ষে হিসেবে দেবে কেন?'

উত্তরটার অর্থ ভালো বুঝল না দীপ্তিময়, কিন্তু যথেষ্ট রেগে গেল, 'একে ভিক্ষে ছাড়া কী বলে?'

ঘরে আর শেষবেলার লাল আলো ছিল না। তবু দীপ্তিময় দেখল লোকটার চোখে অস্তসূর্যের লাল আভা। চোয়াল শক্ত হয়ে এসেছে লোকটার, তবু শান্ত গলায় বলল, 'ভগবান তোমাকে অনেক দিয়েছেন। জীবনে তুমি স্বার্থত্যাগ কমই করেছ, কেবল নিজের জন্যই তুমি উপার্জন করেছ, হয়তো তার সবটাই সৎ উপায়ে নয়। তোমার কাছ থেকে আর একটু বিনয় এবং শ্রদ্ধা আশা করেছিলাম। দরিদ্র দেশে তুমি সুখে আছ কিন্তু তোমার সেজন্য কোনও লজ্জা নেই কেন! আমি ভিক্ষে চাইলাম বলে তুমি ভিক্ষেই দেবে?'

প্রথমটায় স্তম্ভিত হয়ে গেল দীপ্তিময়। লোকটার চেহারা, আচরণ খুব সামান্য একটু পালটে গেছে, কিন্তু তাতেই তার শরীরে আগুন ধরে গেল। সে চিৎকার করে লাফিয়ে উঠল, 'গেট আউট! গেট আউট!'

হরেন গাঙ্গুলি কুটিল একটু হেসে উঠে দাঁড়াল, 'যদি কখনও লোকে তোমার বুকে ছোরা ধরে যথাসর্বস্ব চায়, তখন এই মেজাজ দেখিও বাপু।'

হরেন গাঙ্গুলি আর ফিরে তাকাল না। মাথা উঁচু রেখে বেরিয়ে গেল।

দীপ্তিময় ব্যাপারটাকে মন থেকে ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করল অনেকক্ষণ। পারল না। একটা উটকো লোক, ভিখিরি, বাড়ি বয়ে এসে তাকে যা খুশি বলে গেছে—এ চিন্তা তার সুখ নষ্ট করে দিচ্ছিল। রমাকে ডেকে সে সাবধান করে দিল, 'আমি না থাকলে কোনও অচেনা লোককে ঘরে ঢুকতে দেবে না।' বলার দরকার ছিল না, রমা বুঝেই নিয়েছিল। সে কিছু জিগ্যেস করল না দীপ্তিময়কে। কেবল ঘাড় নাড়ল।

রাতে মা যখন ভিতরের হলঘরের এক কোণে বসে খই দুধ খাচ্ছে, তখন দীপ্তিময়ের কী খেয়াল হল, মাকে গিয়ে জিগ্যেস করল—'মা, হরেন গাঙ্গুলি বলে কাউকে চিনতে?'

ঘোমটার ভিতর থেকে মা বোকা চোখে তাকাল, বলল—'কে?'

'হরেন গাঙ্গুলি। স্বদেশি করত, ঢাকায়।'

খানিকক্ষণ চেয়ে রইল মা, তারপর হঠাৎ বলল 'নাটকা? হরেন তো আমাদের সনাতন পণ্ডিতের ছেলে নাটকা।'

নাটকা শুনে দীপ্তিময় একটু চমকে গেল।

মা ঘাড় নাড়ে, 'নাটকা ছিল ডাকাত। স্বদেশি ডাকাত। বোমা বন্দুক নিয়ে ঘুরে বেড়াত। খুব গুন্ডা ছিল। রতনের সঙ্গে পড়ত। খুন করে জেলে যায়। বেরিয়ে আবার ডাকাতি করত।'

'লোকটা ভালো ছিল না, না?'

'এমনিতে ভালো। তবে রাগলে খুব ভয়ঙ্কর! ওর বাবাও ছিল ওইরকম। সনাতন পণ্ডিতকেও কারা যেন খুন করেছিল বিক্রমপুরের এক গ্রামে। নাটকার তখন সতেরো-আঠারো বছর বয়স।...তারপর কী যেন হয়েছিল! কী যেন...মা সামান্যক্ষণের জন্য আবার অন্যমনস্ক হয়ে তারপর বলল—'ব্রাহ্মণ, হ্যাঁ ব্রাহ্মণ ছিল তারা।'

'কারা?'

'যারা সনাতন পণ্ডিতকে খুন করেছিল। ওদেরই যজমান।'

'নাটকা কী করল?'

'রামদা দিয়ে দুজনকে কেটেছিল মাঠের মধ্যে আর একজনকে টাকা দিয়ে। পুলিশ ওকে ধরতে পারত না।'

আর জানার দরকার ছিল না দীপ্তিময়ের। নাটকার গল্প সে অনেক শুনেছে। ছেলেবেলায় নাটকা একসময়ে তার বীর ছিল। জ্ঞান হওয়ার পর সে লোকটাকে চোখে দেখেনি। গল্প শুনত যে সেই বিখ্যাত নাটকার কোলে উঠেছে অনেকবার।

মনটা একটু দমে গেল দীপ্তিময়ের। লোকটা বলছে যোগাযোগের ওপরেই পৃথিবী চলছে। যোগাযোগটা খুবই অদ্ভুত।

লোকটা পরোক্ষভাবে তাকে দায়ী করে গেল। যে দীপ্তিময় সারাজীবন নিজের জন্যই যা কিছু করেছে। একা বাঁচতে চাইছে, ইত্যাদি।

দুরকম চিন্তা দীপ্তিময়কে আচ্ছন্ন করে রইল।

বড় হঠাৎ ঘটে গেল ব্যাপারটা। এরকমটা না হলেই ভালো ছিল যেন। তবু সে ভেবে দেখে লোকটাকে অপমান করে ভালোই করেছে। সেই বিখ্যাত ডাকাত নাটকা তো আর নেই। লোকটা এখন ভিখিরি। হয়তো বার বার তার কাছে উমেদার হয়ে আসত। হাত পেতে সাহায্য নিত, আর গরিবের দাম্ভিকতা থেকে মনে মনে তাকে অভিশাপ দিয়ে যেত। এই অভিমানটুকু হয়তো লোকটার কাজে লাগবে। হয়তো এই বুড়ো বয়সে পাপী লোকটা নিজের জন্য ভিক্ষে ছাড়া আরও কিছু করবে এবার।

রাতে পাশে শুয়ে রমা বলল, 'আমার কেমন ভয়-ভয় করছে গো!'

'ভয় কীসের!'

'ওরকম বিশ্রী একটা লোক! বুড়ো হোক, যাই হোক এককালে ডাকাত ছিল—সে লোকটার সঙ্গে তোমার ঝগড়া হয়ে গেল...'

'দূর! ওসব কিছু না। লোকটা এখন ভিখিরি।' বলে পাশ ফিরে রমাকে জড়িয়ে ধরল দীপ্তিময়। চুমু খেয়ে বলল, 'গাড়িটা বোধহয় সামনের মাসেই পেয়ে যাব।' পেলে সবাই মিলে খুব লম্বা একটা ট্যুর দেব, বুঝলে!'

অফিসের কাজ শেষ করতে প্রায়ই রাত হয়ে যায় দীপ্তিময়ের। যখন বেরোয় তখন প্রায়ই দেখা যায় সাতটা বেজে গেছে। ডালহৌসি থেকে ট্যাক্সি নিয়ে সে, হাওড়ায় আসে। ট্রেনে আসে উত্তরপাড়া।

একদিন অফিসের কাজ শেষ করে ঘড়ি দেখল দীপ্তিময়। দেখল রাত সাড়ে সাতটা। মাথা অল্প ধরে আছে। জলতেষ্টা পেয়েছে, সিগারেট খাওয়া হয়নি অনেকক্ষণ। মাথা ভরতি হাজার চিন্তা। ঘর থেকে করিডোরে বেরিয়ে এসে সে দেখল চারদিক ফাঁকা। অন্য সব সারি সারি অফিসগুলোর দরজায় তালা। শূন্য করিডোর। সে দারোয়ানকে ডাক দিয়ে অফিসের দরজা বন্ধ করতে বলল। তারপর সিঁড়ি বেয়ে চারতলা থেকে নামতে লাগল।

অনেক উঁচু থেকেই সে একতলা আর দোতলার মাঝামাঝি যেখানে সিঁড়িটা বাঁক নিয়েছে, সেখানে সিঁড়ির রেলিঙে হেলান দিয়ে র‍্যাপার গায়ে একটা লোক দাঁড়িয়ে। মাথা মুখ ঢাকা, তলায় ময়লা ধুতি দেখা যাচ্ছে। বোধহয় ভিখিরি।

আস্তে-আস্তে নামছিল দীপ্তিময়। গত সপ্তাহে তার রক্তের চাপ বেড়েছিল। এই অল্প বয়সেই এতটা হওয়ার কথা নয়। ডাক্তার তার খাওয়া-দাওয়ার চার্ট তৈরি করে দিয়ে গেছে। পরিশ্রম কম করতে বলে গেছে। দীপ্তিময় একটু হাসে। তার হাওড়ায় লোহার কারখানার স্ট্রাইক চলছে, সাপ্লাইয়ের ব্যাবসাতেও একটু মন্দা, তিন-চারটে সরকারি কন্ট্রাক্টের জন্যও তাকে ঘুরতে হচ্ছে খুব। বিশ্রামের উপায় নেই। সে আস্তে-আস্তে সিঁড়ি বেয়ে নামে, মাথাটা একটু ঘোরে। সে রেলিঙে হাত রেখে নামতে থাকে। দূর থেকে অন্যমনে দেখে একতলা আর দোতলার মাঝখানে সিঁড়িতে হেলান দিয়ে কালো র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে। মাঝে-মাঝে দীপ্তিময়ের মনে হয় এত লোভ বুঝি ভালো নয়। সে যথেষ্ট রোজগার করেছে, এবার অন্যদের জন্য ব্যাবসা ছেড়ে দেওয়া যাক, একটু বেড়িয়ে আসা যাক বাইরে কোথাও, মানুষের সঙ্গে আরও একটু মেশা যাক। তারপরই মনে পড়ে কলকাতায় কেনা জমিটার ওপর চমৎকার একটা ফ্ল্যাটবাড়ি তুলতে হবে। প্রতি ফ্ল্যাটের ভাড়া হবে ছশো থেকে হাজার। কিংবা এমনি আরও চিন্তা। তখনই সব ছেড়ে দেওয়ার নামে বুক কেঁপে ওঠে। না, যথেষ্ট হয়নি, একেবারেই যথেষ্ট হয়নি। আরও অনেক কিছু করার আছে... নামতে-নামতে সে দেখতে পায় ভিখিরির মতো লোকটা একতলা আর দোতলার মাঝখানে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে আছে। সে নামতে থাকে। তিনতলা থেকে দোতলায় নেমে আসে। থেমে একটা সিগারেট ধরায়... সামনের মাসের প্রথম দিকেই গাড়িটা পাওয়া যাবে। বিদেশি গাড়ি, চল্লিশ হাজার দাম পড়ল। লম্বা একটা ট্যুর দিতে হবে এবার। চলে যাবে দেওঘর, রাঁচি, হাজারিবাগ, পরেশনাথ। সঙ্গে থাকবে রমা, পিন্টু আর বুবুন। বাড়িতে থাকার জন্য কাউকে এনে রাখতে হবে...সে সিঁড়ি ভাঙতে

থাকে। তিন-চার ধাপ ওপর থেকে সে দেখে লোকটা রেলিঙে হেলান দিয়ে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে আছে। কালো র‍্যাপারে তার মাথা মুখ শরীর ঢাকা, নীচে ময়লা ধুতি, আর পায়ে লাল রঙের কেডস দেখা যাচ্ছে। এই এজমালি অফিস-বাড়িটায় সারাদিন উমেদার, ফড়ে দালালদের যাতায়াত, আর ভিখিরি। দীপ্তিময় চত্বরে নেমে অন্যমনে লোকটাকে পেরিয়ে গেল। তার গাড়িটার কথাই ভাবছিল সে। চমৎকার আকাশি নীল রং...

'দীপ্তিময়!' গম্ভীর গলায় কাছ থেকে কে যেন ডাকল।

চমকে ঘুরে দাঁড়াল দীপ্তিময়, কালো র‍্যাপার মোড়া সেই লোকটা। ঘোমটার মধ্যে তার মুখ। ভালো বোঝা যায় না। অস্পষ্টভাবে দেখা যায় লোকটা অনেকদিন দাড়ি কামায়নি। তার বুকের মধ্যে ধক করে ওঠে। যদিও আবছা, ঢাকা মুখখানা ভালো বোঝা যায় না, তবু মনে হয় এ মুখ সে যেন কবে কোন বাল্যে বা কৈশোরে বহুবার দেখেছিল। স্পষ্ট মনে নেই। তবু মনে পড়ে।

সামান্যক্ষণের জন্য দুজনেই স্থির রইল। তারপর শীর্ণ বাঁ হাতখানা তার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে লোকটা এগিয়ে এল। বাড়ানো হাতখানার দিকে অর্থহীন অবুঝ চোখে চেয়ে ছিল দীপ্তিময়, হঠাৎ দেখল চাদরের তলা থেকে বিদ্যুৎ গতিতে বেরিয়ে এল লোকটার ডানহাত। খুবই অবাক হল দীপ্তিময়। সে বড়-বড় চোখ করে দেখতে পেল লোকটা তার পেটের মধ্যে একটা ছোট্ট সুন্দর ঝকঝকে ছোরা ঢুকিয়ে দিল।

'আঃক' বলে দীপ্তিময় হেঁচকি তোলার মতো একটা শব্দ করল। পরমুহূর্তেই সে 'এটা কী? এটা কেন?' বলে চিৎকার করতে চাইল—পারল না, বোবার শব্দের মতো সে কয়েকটা অর্থহীন শব্দ করল। দেখতে পেল ছোরার হাতলখানা তার পেটের ওপর উঁচু হয়ে আছে।...প্রথমে দেওয়ালে হেলান দেওয়ার চেষ্টা করল দীপ্তিময়...ভয়ঙ্কর বমির ভাব টের পেল...পেটের ওজন...খুব ওজন...দেওয়ালে হেলানো তার শরীর আস্তে-আস্তে গড়িয়ে পড়ল সিঁড়িতে। শূন্য চোখে দেখল কোথাও সেই কালো চাদরে ঢাকা লোকটা নেই। চলে গেছে।...যেন হঠাৎ নিজের শব্দ করার ক্ষমতা সে ফিরে পেল, চিৎকার করল 'রমা-আ, মা-আ...।' দেখল লোক ছুটে আসছে ওপর থেকে, নীচে থেকে। পায়ের শব্দ...ভয়ে সে চোখ বোজে। ছোরার হাতলখানা উঁচু হয়ে আছে...সে টের পায় তাকে তোলা হচ্ছে...বোধহয় একটা গাড়িতে...লোকজন চেঁচাচ্ছে...পেটের ওপর একটা ভার... একটা ওজন...নোনতা স্বাদের বমি উঠে আসছে মুখে...তার পরেই দীপ্তিময় দেখে বাগান আলো করে সবুজ রং...তার নিজের বাড়ি...। যদিও অর্থহীন তবু তার এলোমেলোভাবে মনে হয় সে পৃথিবী থেকে আলাদা করে তার জমি নিয়ে নিচ্ছে তুলে, দিচ্ছে ঘেরা পাঁচিল...পাঁচিলের ওপাশে এক অচেনা জগৎ...চালের ওপর বসে দেখতে পায় বাইরের অচেনা অনাত্মীয় মানুষেরা

হেঁটে যাচ্ছে...ওরা তার কেউ নয়...হিংসেয় মানুষের বুকে পাথর কেটে যাচ্ছে—দীপ্তিময় কেন সুখে থাকবে? দীপ্তিময় চিৎকার করে বলতে চায় কেন আমি সুখে থাকব না?...মনে পড়ে সে কারও জন্য কিছু করেনি। নিজের ঘর তৈরি করেছে কেবল...জগৎ বড় পর হয়ে আছে...অচেনা হয়ে আছে মানুষ...অনাত্মীয়...যোগাযোগ নেই...যোগাযোগ নেই...কেবল রমা, কেবল বুবুন, পিন্টু...আর সে নিজে...আমি, আমি আর আমি...

আস্তে-আস্তে দীপ্তিময় ঘুমিয়ে পড়তে থাকে...কে যেন তাকে মারল...কেন মারল?...বস্তুত কিছুই তো আর সে নিজের মতো নিতে পারল না...না ঘর, বাড়ি, বাগান...গাড়িতে চড়া হল না একবারও...ঘেরা পাঁচিলের ঘেরা পোক্ত বাড়ি তবু নিরাপদ নয়...চারদিক থেকে সাপের মতো অভিশাপ এসে বিষ ঢেলে দিয়ে যাচ্ছে...না নিরাপদ নয়...সে রমাকে সাবধান করে দেয়—সাবধান, রমা, খুব সাবধান, সদর খুলো না, কাউকে ঢুকতে দিও না...বলে আর দেখে পাঁচিল টপকে চোর ঢুকেছে...সদর ভাঙছে ডাকাত...বলছে ভাগ করে খেতে হয়। তুমি অনেক কেড়ে খেয়েছ...হাল ছেড়ে দেয় দীপ্তিময়।...দেখে তার সেই নীল সুন্দর গাড়িখানা লম্বা ট্যুরে পাড়ি দিচ্ছে। জানালায় তার মুখ তাকেই বিদায় জানাচ্ছে। দীপ্তিময় চেয়ে থাকে...

হাওয়া বদলের চিঠি

বুধুয়াকে তোমার মনে আছে কিনা জানি না। মনে না থাকার কথা নয়, বছরখানেক আগে সে আমাদের কলকাতার বাসায় চাকরি করত। গোলগাল গাল, গোপাল গোপাল চেহারা, মাত্র দু-মাস চাকরি করেছিল আমাদের বাসায়, শেষে, মায়ের জন্য মন কেমন করছে বলে কেঁদে-কেটে চলে গেল। যে দু-মাস ছিল তাইতেই বড় ভালো লেগেছিল বুধুয়াকে, তুমি ওকে অকর্মা মনে করতে বটে, কিন্তু আমি ওকে পুষ্যি নিতেও রাজি ছিলুম। তুমি ভুলে গেছ কি? কাল হঠাৎ সেই বুধুয়া এসে হাজির। এখানে দেওঘরের কাছাকাছিই যে ওর বাড়ি তা আমার মনেও ছিল না, হঠাৎ দেখে চিনতেও পারিনি, এখন ওর বাড়ের বয়স— তাই মাথায় একটু লম্বা হয়েছে, একটু রোগাও, শুধু মুখের মিষ্টি হাসিটুকু এখনও কি করে যেন শুদ্ধ রেখেছে। আমি যে এসেছি তা জানত না, একদিন বিকেলে যখন বেড়াচ্ছিলুম তখন নাকি দেখেছে আমাকে। তখন ভয়ে এসে কথা বলেনি; খোঁজখবর নিয়ে তবে বাসায় এসেছে। বুদ্ধি দ্যাখো, একেবারে শুধুহাতে আসেনি, বৈদ্যনাথের পূজা দিয়ে প্রসাদি প্যাঁড়া এনেছে কিছু আর শালপাতার ঠোঙায় এনেছে ওর মায়ের হাতের তৈরি করা করমচার আচার। জিগ্যেস করলুম, প্যাঁড়া আনলি যদি তবে প্রসাদি আনলি কেন? অনেকক্ষণ লাজুক মুখে হেসে মাথা নীচু করে যা বলল তার অর্থ দাঁড়ায় যে, এমনি আনলে যদি আমি না নিতে চাই সেই ভয়ে প্রসাদ করে এনেছে—প্রসাদ তো আর ফিরিয়ে দিতে পারব না। কেমন মাথা খেলিয়েছে দেখেছ? শমীক আর খুকু কেমন আছে জানতে চাইল। যখন জিগ্যেস করল দেওঘরে কেন এসেছি, তখন একটু মুশকিলে পড়লুম—কী জবাব দিই! তখন ও নিজেই বলল, যে আমার চাকর হরিয়ার কাছে নাকি শুনেছে যে আমার অসুখ। আমি ওকে বোঝালুম যে সে তেমন কিছু নয়, একদিন অফিস যেতে গিয়ে মাথা ঘুরে পড়ে

গিয়েছিলুম রাস্তায়, তাই দেখেশুনে ডাক্তার বলেছে একটু ঘুরে আসতে, ও চুপ করে শুনল তারপর ব্যথিত মুখে বসে রইল। তখন আমিই ওকে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে নানা কথা জিগ্যেস করলুম। সিনেমা হলের কাছে পান-সিগারেটের দোকান দিয়েছে—দোকান ভালো চলে, আর শহরের একটু দূরেই ওর গ্রাম—সেখানে খেতি-গৃহস্থি দেখাশোনা করে ওর মা আর ভাই। খুব লাজুক মুখে জানাল যে, কলকাতায় আমাদের বাসায় থাকবার সময় সে বলেছিল বিয়ে করেনি—সেটা মিথ্যে কথা। বিয়ে করেছে দশ বছর বয়সে, এখন পনেরো—কিন্তু এখনও গাওনা হয়নি। আরও নানা কথা বলল, বারান্দায় মেঝের ওপর আমার পায়ের কাছটিতে বসে, আমি ইজিচেয়ারে আধশোয়া হয়ে খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছিলুম। অধিকাংশই ওর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা, বারবার বলল বুড়ো হলে ও কোনও আশ্রমটাশ্রমে গিয়ে থাকবে, সংসারে নাকি ওর খুব একটা স্পৃহা নেই। ওর চেহারার মধ্যে এমন একটা সরল সত্যনিষ্ঠার ছাপ আছে যে কথাগুলোকে হেসে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তুমি সঙ্গে আসোনি কেন সেকথাও জিগ্যেস করল, আরও বলল, আমার কোনও কাজকর্ম করে দেওয়ার থাকলে ও করে দেবে। এ সময়ে বাজার করে হরিয়া ফিরে এলে, তখন আমাকে ছেড়ে দুজনে দেশওয়ালি ভাষায় নিজেদের মধ্যে খানিক গল্প করল। যাওয়ার সময় বলে গেল যে ওর গ্রামে একজন গুণী লোক আছে যে ঝাড়ফুঁক করে, টোটকা ওষুধ দেয়। অনেকের রোগ সে নাকি সারিয়েছে। যদি আমার আপত্তি না থাকে তবে সে একবার সেই গুণীকে ডেকে এনে দেখাবে।

আমি হেসে বললুম—আনিস লোকটাকে আলাপ করে দেখব। রোগ কিছু নেই, তবু এখানে এসে নতুন ধরনের লোকের সঙ্গে আলাপ করতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু বুধুয়ার বোধহয় ধারণা আমার অসুখটা শক্ত ধরনের তাই সে যাওয়ার সময় মাথা ঝাঁকিয়ে বারবার ভরসা দিয়ে বলে গেল যে অনেক শক্ত রোগ সেই গুণী সারিয়েছে।

বুধুয়া চলে গেলে অনেকক্ষণ একা-একা বসে ভাবলুম। বুধুয়ার ধারণা যে ভুল তা মনে হচ্ছিল না। কখনও বলিনি তোমাকে, যেদিন অফিসে যেতে গিয়ে বাসের মধ্যে মাথা ঘুরে পড়ে গেলুম সেদিনটায় প্রথমে মনে হয়েছিল নিশ্চিত এটা করোনারি অ্যাটাক। জ্ঞান ফিরে এলে মনে হয়েছিল আমি হয়তো তিন-চারদিন বা আরও বেশি দিন অজ্ঞান হয়েছিলুম। ক্রমে বুঝতে পারলুম যে এটা ব্লাডপ্রেসার, এবং মাত্র ঘণ্টা দেড়েক আমি অজ্ঞান অবস্থায় ছিলুম তখন আমার ভয় কেটে যাওয়া উচিত ছিল। ডাক্তারও অভয় দিচ্ছিল—আমার বয়স মাত্র তেতাল্লিশ, স্বাস্থ্য ভালো—ভয় কী? এখনও একটা জীবন সামনে পড়ে আছে। কিন্তু কেন জানি না ওর পর থেকেই মনের মধ্যে একটা ভয় ঢুকে গেল। আগে তো কখনও এরকম ঘটনা ঘটেনি—রাস্তায়, ট্রামে-বাসে সব লোক দিব্যি চলাফেরা করছে, মাঝখান

থেকে হঠাৎ আমিই অজ্ঞান হয়ে গেলাম কেন? এইসব ভেবে-ভেবে কয়েকদিন নিজেকে খুব দুর্বল আর অসহায় মনে হতে লাগল। এতকাল কখনও খুব গুরুত্ব দিয়ে বয়স হয়ে যাওয়ার কথা ভাবিনি, মরার কথা ভাবিনি। এবার ভাবতে লাগলুম। ভেবে দেখলুম দুটোর কোনওটাকেই তো আমি এড়াতে পারব না। কলকাতায় হাঁপ ধরে গেল। মনে হল বহুকাল কলকাতার বাইরে যাইনি, এতদিন একজায়গায় থেকে মনটা নিস্তেজ, আর নানা বাজে ভাবনার বাসা হয়ে উঠেছে। তাই তোমাকে একদিন বলেছিলাম—চলো বাইরে কোথাও থেকে দু-চারদিন বেড়িয়ে আসি। তুমি অবাক হয়ে বললে—ও মা! ভূতের মুখে রামনাম! এতদিন তো উলটো গেয়েছ। শুনে একটু অপ্রস্তুত হয়েছিলুম। বাস্তবিক অফিসে আমার ছুটি জমে-জমে পচে গেল, বেড়িয়ে আসা দূরের কথা, একদিন ছুটি নিয়ে বসে থাকতেও ইচ্ছে হয়নি। বেড়াতেই বা কোথায় যাব! কিন্তু কলকাতা কয়েকদিনেই অসহ্য হয়ে গেল। দু-একদিন শমীক আর খুকুকে স্কুল থেকে ছুটি নিয়ে গেলুম—ওরাও বাবার কাণ্ডকারখানা দেখে অবাক। কিন্তু এভাবেও আমার বিষণ্ণতা কাটল না। মনে হল দূরে কোথাও যাওয়া একান্ত দরকার, আর যেতে হবে একলা। একলা হলেই নিজের মনটাকে সুবিধে মতো পাওয়া যাবে, তখন দেখা যাবে তার কোথায় কোন কাঁটাটা বিঁধে আছে। শুধু তোমাকে নিয়ে আসা যায় না, তাহলে শমীক আর খুকুকে কে দেখবে? ওদের নিয়ে এলে আবার স্কুল কামাই হয়। একা আসতে প্রথমটায় খারাপ লাগছিল, এখানে এসে কয়েকদিন ভীষণ মনখারাপ লাগল—আগের চিঠিতে সেসব জানাইনি। এমনকী তিনদিন পর একদিন ফিরে যাওয়ার জন্য সব বাঁধাছাঁদা করে ট্রেনে পর্যন্ত উঠে পড়েছিলুম। মধুপুরে ট্রেন থামতে মনে হল বড্ড নাটকীয় হয়ে যাচ্ছে ব্যাপারটা—তা ছাড়া সন্দেহ হল কলকাতায় গেলেই সেই বিশ্রী ভাবনাগুলো আবার ঘাড়ে চেপে বসবে। মধুপুরেই নেমে পড়া গেল, কিন্তু দেওঘরেও ফিরতে ইচ্ছে হল; ওখানে না থেকে হরিয়াকে দেওঘরে ফেরত পাঠিয়ে আমি বেরিয়ে পড়লুম। সাতদিন ধরে নানা জায়গায় ঘুরে বেরিয়েছি। কোনও লক্ষ স্থির ছিল না, সহযাত্রীদের কাছে যে জায়গার নাম শুনেছি সে জায়গারই টিকিট কেটেছি পরদিন। ভালো করে খাওয়া হয়নি, শোয়া হয়নি, গালে দাড়ি বেড়ে গেছে, শরীর পথের ধকলে দুর্বল তবু ওই সাতদিনে মনের জড়তা কেটে গেল, তাজা লাগল নিজেকে, দেওঘর ফিরেছি দিন চারেক হল। এখন আর খারাপ লাগছিল না। তোমাদের কথা খুব একটা মনে পড়ছিল না।

শুধু বুধুয়া এসে মনটা খারাপ করে দিয়ে গেল। সেই যে ওকে কবে একটু ভালোবেসেছিলুম, ও আসায় সেই ভালোবাসার জায়গায় আবার হাত পড়ে গেল। কাল থেকে আবার তোমাদের কথা তাই ভীষণ মনে পড়ছে। বুধুয়া না এলে এটা হত না। বুধুয়ার সঙ্গে এ ব্যাপারটার সম্পর্ক হয়তো তুমি ঠিক বুঝতে পারছ না। আমিও পারছি না, কেবল মনে হচ্ছে—কী রকম অস্পষ্ট একটা যোগাযোগ হয়েছিল।

আজ তোমাকে কোনও চিঠি লিখবার কথা ছিল না। এই তো তিনদিন হয় তোমাকে চিঠি লিখেছি, এখনও জবাব দাওনি, কিংবা হয়তো তোমার চিঠিও এখন মাঝপথে। তবু লিখতে বসেছি, মনে হচ্ছে তোমাকে কী একটা বিষয় যেন জানাবার আছে, যা রহস্যময় যা অস্পষ্ট। ভয় পেও না—এ তেমন কিছু নয়। আজ বিকেল থেকে মনটা ডানা মেলেছে, উড়ছে, কোনও ঠাঁই ছুঁতে চাইছে না। বিকেলে আকাশ ঘনঘোর করে এল, বেড়াতে গিয়েছিলুম মেঘ দেখে বৃষ্টি আসবার আগেই ঘরে ফিরে এলুম, তারপর ইজিচেয়ারে রোজকার মতো না বসে দরজার চৌকাঠের পাশটিতে বসে রইলুম চুপ করে। বৃষ্টি এল। ঘন মেঘের স্নিগ্ধ ছায়া পড়েছে চারধারে, বর্ষার ব্যাং ডাকছে, ঝরঝর জলের শব্দ হয়ে যেতে লাগল। আর কোনও শব্দ নেই। সামনে বাগানে ফুলগাছগুলো, পাতাবাহারের গাছগুলো অঝোর জলধারায় ভিজে যাচ্ছিল। আমার ছোট্ট বাগানটায় গভীর ভালোবাসার খেলা চলছিল। দেখতে-দেখতে কেমন করে যেন বাগানের গাছপালা, ফুল, লতা-পাতার মতো আমিও আকণ্ঠ পান করছিলুম সেই বৃষ্টির জীবনীশক্তি। মন ভরে যাচ্ছিল। ঠিক হয়তো বোঝাতে পারব না, কিন্তু সেই অবিরাম জলধারার দিকে চেয়ে থেকে মনে হচ্ছিল আমার হয়তো উদ্ভিদের মতোই শাখা, কাণ্ড বা শিকড় গোছের কোনও গোপন প্রত্যঙ্গ আছে যা দিয়ে আমি বৃষ্টি থেকে সেই জীবনীশক্তি আহরণ করেছিলুম। ক্রমে রাত হয়ে এলে যখন আর কিছুই দেখা যাচ্ছিল না তখন ঘরে এসে এইমাত্র বসলুম ছোট বাতিটি জ্বালিয়ে তোমাকে চিঠি লিখব বলে।

এখনও জলের ঝরে পড়বার শব্দ, ব্যাঙের অবিরাম ডাক শুনতে পাচ্ছি। তুমি হয়তো ঠিক বুঝতে চাইবে না, কিন্তু এখানে আসবার পর যত বার রাত্রিতে বৃষ্টির শব্দ শুনেছি আমি, ততবার মনে হয়েছে যে আমার একটা পূর্বজন্ম ছিল। কিছুতেই বিশ্বাস হতে চায় না যে, এজন্মেই আমার শুরু ও শেষ। রহস্যের কথা যে বলেছিলুম তা এই। বোধহয় এইসব অনুভূতির কোনও মূল্যও নেই। না থাক, তবু আমার কাছে আজ বৃষ্টি যে প্রিয়, ঘাস, ফুল, মাটি যে প্রিয়, তার কারণ হয়ে থাক এই রহস্যময় অনুভূতিগুলি। আমি কখনও এ রহস্যের অবসান চাইব না।

দ্যাখো, বৃষ্টি এসেছে বলেই আমার বাগানের গাছগুলোর ওরকম আনন্দ, তারা বাহু মেলে শিকড় ছেঁড়া কাঁপনে কাঁপছে। এই যে ব্যাঙের ডাক, জলের শব্দ শুনছি তাতেও কেমন এক আনন্দের সুর লেগেছে। মনে হয় আবহমান কাল থেকে আমাদের এই বৃক্ষলতাগুল্ম, ওই আপাততুচ্ছ ব্যাঙগুলো এই বৃষ্টিকে পৃথিবীতে ডেকে আনছে। তাই বৃষ্টির ভিতরে কেমন একটা ভালোবাসার গন্ধ হয়েছে। এ না হলে ও হয় না, ও না হলে এ হয় না, ভেবে দেখলে, আমরা সবাই যেন এরকম একটা টানক্ষেত্রের মধ্যে রয়েছি।

লিখতে-লিখতে মনে হচ্ছে চিঠিটার সুর কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গেল। এভাবে কেউ বউকে চিঠি লেখে? কী করে জানব। বারবার তুমি আমার হাতের কাছেই ছিলে, চিঠি লেখবার দরকার হয়নি তো কখনও। মনে হচ্ছে চিঠির শেষে ঘর-সংসারের কথা কিছু লেখা দরকার। তুমি কেমন আছ আমাকে ছেড়ে তা জানতে ইচ্ছে করছে। শমীক আর খুকু বরাবর আমাকে একটু গম্ভীর বলে জানে, বড় একটা কাছে ঘেঁষে না। ভাবছি এবার ফিরে গিয়ে ওদের সঙ্গে একটু বেশি করে মিশব। কী বলো?

তোমার একজোড়া চিঠি পেলুম আজ। দ্বিতীয়টা এক্সপ্রেসে এসে প্রথমটাকে ধরেছে। বুঝতে পারছি আমার চিঠি পেয়ে একটু অস্থির হয়েছ। আরও বোঝা যাচ্ছে যে আমার শরীরের জন্য তোমার উৎকণ্ঠা তেমন নেই, যতটা আমার মানসিক অবস্থার জন্য আছে। সন্দেহ হচ্ছে কি যে আমার মাথায় কেমন যেন একটু...? সন্দেহ মাঝে-মাঝে আমারও হয়। এতকাল সেই বাসে মাথা ঘুরে পড়ে যাওয়ার আগে পর্যন্ত আমার কাছে সবটাই ছিল একটা খেলার মাঠের মতো—যেখানে দাঁড়িয়ে আমি স্পষ্ট দিনের আলোয় আমার প্রতিপক্ষ সব খেলোয়াড়কেই দেখতে পাচ্ছি, সহযোগীদেরও চিনে নিচ্ছি। কিন্তু জ্ঞান ফিরে আসবার পর থেকে দেখছি দিনের আলোয় সেই মাঠ যতটা স্পষ্ট মনে হয়েছিল এখন আর ততটা নয়। সেই মাঠে যেন এক নিস্তেজ শেষবেলার আলো পড়েছে, বহুদূর—প্রায় সীমারেখাহীন হয়ে বিস্তৃত হয়েছে সেই মাঠ, দূরে-দূরে অস্পষ্ট চেহারা নিয়ে কারা যেন দাঁড়িয়ে আছে—তাদের চেনা যাচ্ছে না। সব কেমন যেন পালটে গেল।

তুমি ঠাট্টার ছলে প্রশ্ন করেছ আমি কবি হয়ে যাচ্ছি কিনা। তুমি তো গোঁড়া ঈশ্বরবিশ্বাসী, তুমি কি বিশ্বাস করো না যে, ঈশ্বর সবকিছুর এবং এমনকী নিজেরও সৃষ্টিকর্তা? তাঁর চেয়ে বেশি কল্পনাপ্রবণ প্রকাশক্ষমতা আর কার থাকতে পারে, তাঁর চেয়ে বড় কবি কে? আর যেহেতু তাঁর সেই আনন্দময় কবিসত্তা থেকে আমাদের আত্মার সৃষ্টি হয়েছে বলে আমাদের জনমত রয়েছে, সেই হেতু আমাদের সকলেরই কিছু পরিমাণে কবি হওয়া বাধ্যতামূলক। কোন মানুষ, কোন বৃক্ষ, কোন পশু কবি নয়? আমার মাঝে-মাঝে মনে হয় কী জানো? আমি যে ইজিচেয়ারে শুয়ে নানা কথা ভাবলুম আমার সেইসব চিন্তাভাবনার ঢেউ ইজিচেয়ারটা ধরে রেখেছিল—ঠিক টেপরেকর্ডারের মতো। অন্য কেউ যখন এসে সেই ইজিচেয়ারে বসবে তখন ইজিচেয়ারটা সেই ঢেউগুলি বিকিরণ করবে তার বোধ ও বুদ্ধির ভিতর। চমকে উঠো না। ইজিচেয়ারটাকে ওরকম ভাবতে যদি অস্বস্তি হয় তবে সে জায়গায় বাতাস, মাটি, জল কিংবা শূন্যতা ভেবে নিতে পারো। যেমন এই ধরনের কোনও মাধ্যমের ভিতর দিয়ে যদি আমার গভীর ও গোপন ভাবনা-চিন্তা ও বোধ অন্যের ভিতরে সঞ্চারিত হত। যদি আমাদের আবেগ অনুভূতিগুলি এভাবে ভাষায় প্রকাশ

করতে না হত আমরা কাউকে কবি বলতুম না, বুঝতুম যে এক ভয়ঙ্কর, উন্মত্ত ও দুর্বার কল্পনাশক্তি থেকে আমাদের সব কিছুর সৃষ্টি হয়েছে বলে আমরা সকলেই কিছু কিছু কবি। কাল রাত্রেও অনিদ্রা পেয়ে বসেছিল, মাঝে-মাঝে ওইটাই বড় যন্ত্রণা দেয়। কেমন পিপাসা, ভয়, উৎকণ্ঠার এক সংমিশ্রণে শুয়ে ছিলুম গভীর রাত অবধি। তখন বৃষ্টি থেমে জ্যোৎস্না ফুটেছে। বাইরে শুনলুম কুকুর কাঁদছে চাঁদের দিকে চেয়ে থেকে। শিউরে উঠে একবার হরিয়াকে ডাকতে গেলুম, কিন্তু ডাকা হল না। চোখ বুজে আমি শুনতে পেলুম কুকুরের সেই কান্নার সাথে ডানা ঝাপটানোর প্রাণপণ শব্দ উঠছে। অনেকক্ষণ চোখ বুজে রইলুম—বোধ হল সবটাই মনের ভুল—কেউ কাঁদছে না, কেউই উড়ে যেতে চাইছে না। তারপর ক্রমে আস্তে-আস্তে বুঝতে পারছিলুম অকারণ চোখের জলে চোখ ভরে আসছে। যেন আমি আর ঘরে নেই, নিশিরাতের পরী আমাকে উড়িয়ে এনেছে, শুইয়ে দিয়ে গেছে শিশিরে ভেজা মাঠের ওপর ম্লান জ্যোৎস্নার ভিতরে। চোখ চেয়ে দেখব দুটো সাদা হাঁস মলিন জ্যোৎস্নাকে গায়ে মেখে নিয়ে উড়ে যাচ্ছে পৃথিবীর সীমারেখা ছেড়ে দূর-নক্ষত্রমণ্ডলীর দিকে, কিংবা আরও দূরে, যার কোনও সীমারেখা নেই এমন সমুদ্রের সন্ধানে তারা চলেছে—আর কখনও ফিরে আসবে না। হাঁসের ঘর ভেঙে রক্তমাখা মুখে, গায়ের পালক ঝেড়ে কুকুরটা তাই এসেছে মাঠে দূরতম সেইসব হাঁসের সন্ধানে, তারপর চাঁদ ও শূন্যতা দেখে কাঁদছে। আমার চোখের ওপর গভীর স্বপ্নের সেই খেলা চলল অনেকক্ষণ।

জানি এ চিঠি পেলে তুমি হয়তো আরও অস্থির হয়ে পড়বে। কিন্তু আর তোমার মতো বিশ্বস্ত কেউ নেই যাকে এসব লেখা যায়। সবকিছুই ভাগ করে নেওয়ার কথা ছিল আমাদের, তাই আমিও চাই আমার অস্থিরতার এইটুকু তোমার ভিতরে সঞ্চারিত হোক।

আজ সকালে চিঠিটা শেষ করিনি, ভেবেছিলাম বিকেলে করব। তাই করছি। আজ বিকেলে বুধুয়া এসেছিল তার সেই গুণীকে নিয়ে। গুণীকে যেমন কল্পনা করেছিলুম তেমন নয়, অর্থাৎ তার একহাতে ঝাঁটা অন্যহাতে সর্ষেপোড়া নেই এবং চোখ রক্তবর্ণও নয়। নিরীহ ভালোমানুষের মতো চেহারা, কথাবার্তায় মনে হয় বেশ কিছুটা লেখাপড়া শিখেছে। বয়সও তার অল্প, বোধহয় তিরিশ। 'আপনি' বা 'তুমি' কোনটা বলব তা নিয়ে একটু গোলে পড়লুম, শেষে 'আপনি'ই বলতে লাগলুম। সে একসময়ে অনেকক্ষণ আমার দিকে চেয়ে থেকে বলল—আপনার অসুখটা তো মনের।

বললুম, কী করে বুঝলেন?

হেসে বলল—বোঝা যায়। আপনার চোখ সে কথাই বলছে। তারপর আবার খানিক চেয়ে থেকে বলল—আপনার ছেলেমেয়ে দুটি এবং আপনার স্ত্রী আপনাকে খুবই

ভালোবাসে, কিন্তু আমার মনে হয় তারা আপনার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পারে না।

বোঝো কাণ্ড! তোমরা তো নিশ্চিন্তে আছ, কিন্তু এদিকে তোমাদের মনের কথা ফাঁস হয়ে যাচ্ছে। একটু চমকে উঠেছিলুম, তবু হাসিমুখে জিগ্যেস করি—আমার দুই ছেলেমেয়ে আর একটি স্ত্রী কী করে বুঝলেন? মন্ত্রবলে নাকি?

আবার হাসল—না, বুধুয়া বলছিল আমাকে।

মনে মনেই হো-হো করে হাসলাম। এরা কি তোমাকে বন্ধ্যা মনে করে? বুধুয়া চলে আসার পরও তো এক বছর কেটে গেছে, এর মধ্যে যদি আর একটি হত সে কি হিসাবের বাইরে থাকত। নাঃ, পৃথিবীতে হঠযোগ, মন্ত্র-তন্ত্র এসব কিছুই নেই দেখছি। না থাকলে তো আমারই মুশকিল, কেননা আমাকে অবিলম্বে এই ধরনের একটা আশ্রয় পেতেই হবে, নইলে সেই পুরোনো ভাবনা, চিন্তাগুলো আবার এসে জাপটে ধরবে।

গুণী বলল—বুধুয়া আপনার কথা সবই বলেছে আমাকে। ও আপনাকে খুব ভালোবাসে। বুধুয়া লজ্জায় মুখ লুকোল, আমি একটু হাসলুম, কিছু বললুম না। গুণী খানিকক্ষণ আবার চেয়ে থেকে শান্ত গলায় বলল—মনের যে অশান্তি রয়েছে তা সাধারণত কামনাবাসনা থেকে আসে। আপনি বড় বেশি চান।

মিথ্যে বলব না, এসব পুরোনো কথায় একটু বিরক্ত হয়েছিলুম। বললুম—কামনা-বাসনা ছাড়া মানুষ হয় না।

সে তেমনি শান্ত গলায় বলল—কিন্তু আপনি চান আরও বেশি। আপনি সুখের চেয়েও বেশি কিছু চান, সে হল শক্তি শান্তি সন্তোষ। এটাই পাওয়া সবচেয়ে কঠিন, এ চাওয়াই সবচেয়ে বড় চাওয়া।

তাচ্ছিল্যের হাসি হাসলুম।

সে বলল—আপনি ঈশ্বরে মন দিন। তাঁর দয়া পেলে সব ঠিক হয়ে যাবে। তিনি দয়া করেন।

হেসে বলি—ঈশ্বরের দয়াকে বিশ্বাস কী করে করব? ঈশ্বরে বিশ্বাস নেই যে!

সে কিছুক্ষণ ভেবে বলল—আপনার প্রিয়জন আছেন জানি, কিন্তু আপনি তাঁদের কতটা ভালোবাসেন? তাঁদের জন্য প্রাণ দিতে পারেন?

একটু হকচকিয়ে গিয়ে থমকে একটু ভেবে বললুম—বোধহয় পারি। তোমাদের তিনজনের মুখ ভেবে নিয়ে 'পারি' বলতে ভালোই লাগছিল—যেন সত্যিই পারি।

লোকটা একবার একটু ধোঁয়াটেভাবে বলল—ভালো করে ভেবে দেখবেন। যদি সত্যিই পারেন, এবং ভালোবাসার জন্যেই পারেন তবে আপনি সব অশান্তি কাটিয়ে উঠবেন!

এরপর ওরা চলে গেল। সাইকোথেরাপির এই গ্রাম্য চেষ্টা দেখে খুব হাসলুম নিজেই।

এবার চিঠি শেষ করি। খুকুকে বোলো ওর কাঁচা হাতের লেখা চিঠিটা পেয়েছি। কিন্তু ওর ভাষাটাও তোমার বলে মনে হল, সে লিখেছে 'বাপি, তুমি অত ভেবো না।' তুমি ওদের কিছু বোলো না, দোহাই, ওরা যা চায় তাই লিখুক। আমি ওদের মনটাকে স্পষ্ট ধরতে চাই।

ধারোয়া নদীর ধার তুমি তো দ্যাখোনি! কী সুন্দর! উপত্যকার মতো বহুদূর পর্যন্ত ঢালু হয়ে নেমে গেছে। মাটি শুকনো, গেরুয়া রঙের। কোথাও মাটি রক্তের মতো লাল। মস্ত পাথরের চাঁই মাটিতে গাঁথা। বিকেলের দিকটায় অসহ্য নির্জনতা। হাঁটছি তো হাঁটছিই। শেষবেলার আলোয় আমার মস্ত ছায়াটা কত দীর্ঘ হয়ে হারিয়ে যাচ্ছে। ছায়াটার পিছু পিছু হাঁটছিলাম। যদি আমার ছায়াটার কোনও ইচ্ছাশক্তি থেকে থাকে, যদি থাকে নিজস্ব সত্তা তো নিয়ে যাক আমায় যেখানে তার খুশি। এও এক খেলা। ছায়াটা সব বন্ধুরতা অবলীলায় পার হয়। মস্ত পাথরের চাঙড়, গর্ত, গাছপালা কিছুই তাকে বাধা দিতে পারে না। শরীরী পক্ষে তো তা সম্ভব নয়। শরীরটা যে মস্ত বাধা।

এলোপাথারি হাঁটতে-হাঁটতে হাঁফ ধরে গেল। নদীর ধার পর্যন্ত পৌঁছোতে সন্ধে লেগে গেল প্রায়। নদীর ধারে চুপটি করে বসে রইলাম। একটুখানি আলো আর বাকি আছে মাত্র। খুব একটুখানি। চারধারের গাছপালা, মাঠ, নদীর জল তৃষ্ণার্তের মতো সেই শেষ আলোটুকু শুষে নিচ্ছে। দেখতে-দেখতে পৃথিবীকে বড্ড অনিত্য বলে মনে হয়। দিনটা যে গেল, এইভাবে রোজ যায়। থাকে না তো। একটা স্থির সূর্য যদি কেউ আকাশে লাগিয়ে রাখত, তবে কি আমাদের দিন যেত না? বয়স বাড়ত না। যেমন ছিলাম সবাই, তেমনি চিরকাল থেকে যেতাম! ওই যে গতিময় ধারোয়ার জল বয়ে যাচ্ছে, ওর মধ্যেও সেই অনিত্যতার কথা। বয়ে যাচ্ছে। আজ যে এক কোষ জল বয়ে গেল, সে গেল চিরকালের মতোই। ধারোয়া বেয়ে সে আর কোনওদিনই যাবে না এক গতিপথে।

মনটা খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু অস্থিরতা ছিল না। প্রকাণ্ড আকাশের তলায়। ধারোয়ার মস্ত উপত্যকায় বসে থেকে একরকমের মহৎ বিষণ্ণতা টের পাচ্ছিলাম। চলে যাওয়াটাই অমোঘ।

নদীর ধার ধরে একটা লোক উঠে এল। ঝোপে ঝাড়ে কী যেন খুঁজছে। কোনও বুনো লতাপাতা হবে। তার গায়ে একটা হাফহাতা পাঞ্জাবি, পরনে ধুতি, বেশ তেজস্বী চেহারা।

দেহাতিই হবে।

সেই ভেবে লোকটাকে ডেকে বললুম—ক্যায়া ঢুঁড় রহে হৈ জী?

লোকটা একপলক তাকিয়ে একটু হাসল। কাছে এসে বলল—আপনাকে দেখেছি এখানে কয়েকদিন। বাঙালি তো?

বললুম—আজ্ঞে। আপনি এখানেই থাকেন?

—বহুদিন হয়ে গেল। ছেচল্লিশ সালের পর থেকেই।

বসল। অনেকক্ষণ দু-পক্ষের পরিচয় হল। বেশ লোকটা। পঞ্চাশের ওপর বয়স, কিন্তু সেটা উনি না বললে কিছুতেই বুঝতে পারতুম না, একদম ছেলেমানুষি চেহারা। চাউনিতে এখনও বেশ একটা জীবনীশক্তি। কথায় কথায় বললেন—বয়েস কমানোর ওষুধ জানি না। সারাদিন খাটি, ঘুরি, ঘুমোই মাত্র চারঘণ্টা। আহার, নিরামিষ ডালভাত স্বপাকে।

লোকটা ধার্মিক। তাঁর ইষ্টদেবের আশ্রমে থাকেন। তাঁর কাজে জীবন উৎসর্গ করেছেন। একসময়ে মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন, নিজের গাড়িটাড়ি ছিল, লম্বা বেতন পেতেন। সব ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছেন, কোনও ক্ষোভ নেই।

জিগ্যেস করলুম—ঘর সংসারের কথা ভাবেন না? চলে কীসে?

উনি বললেন—সংসারের সবাই তো এখানেই, ভাবব কেন? ভাবছ তুমি চলবে কীসে, ভাববার তুমি কে? ভাববার যিনি, ভাবছেন তিনি, ভাবো তুমি তাঁকে। এই ছোট্ট ছড়াটা বলে হাসলেন।

রাত হয়ে গিয়েছিল, উনি অন্ধকার রাস্তায় আমাকে বাসা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে গেলেন, আমি ডেকে একটু বসালাম। উনি চা খান না, অন্যের বাড়িতে আহার্য গ্রহণ করেন না। কী দিয়ে আপ্যায়ন করি! ভারী কাঠখোট্টা খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে, এ লোকটা।

যাওয়ার আগে লোকটা হঠাৎ বলল—কোনও অসুবিধে নেই তো?

—না, না। বেশ আছি।

লোকটা চারদিক ঘুরে-ঘুরে ঘরদোর দেখল। বলল—আপনি মশাই ঘোরতর স্ত্রৈণ লোক তো, স্ত্রীকে ছেড়ে একা এখানে এসেছেন কেন?

প্রশ্নটা চেপে গিয়ে বললাম—কী করে বুঝলেন যে আমি স্ত্রৈণ?

—ঘরদোরের অবস্থা দেখে, ছাড়া জামাকাপড় গুছিয়ে রাখার অভ্যাস নেই, বিছানায় ঢাকনা দেননি, গেঞ্জি কাচা নয়। লক্ষণ দেখলে চেনা যায়। বোধহয় আপনি একটু ভাবুক মানুষও। বলে তিনি চকচকে চোখে আমার দিকে চেয়ে রইলেন। আবার ছড়া বললেন—অর্জনে পটু, সাশ্রয়ী কাজে, সুন্দরে সমাপন, এই দেখেই বুঝবি রে তার যোগ্যতা কেমন।

বেশ লাগল লোকটাকে, এখানে আমার পর থেকে কেমন একটি দুটি সহজ দার্শনিকের সঙ্গে আলাপ হচ্ছে। শিখছি। কলকাতায় এরকম মানুষ বড় একটা পাই না।

আমার পালে মৃত্যুর হাওয়া লেগেছে। তরতর করে ভাঁটিয়ে যাচ্ছে নৌকা। কাল বিকেলে একটা মৃত্যু দেখলুম।

আমার উঠোনের ধারে একটু বারান্দা আছে। তার কোলে একটা তারাফুলের মরা ঝোপ। একটা মাকড়সা জাল ফেঁদে বসে থাকে, রোজ দেখি। পোকামাকড় পড়লেই জাল নড়ে ওঠে। মাকড়সাটা জালের কাঁপুনি টের পায়। তারপর নির্ভুল লম্বা-লম্বা আটটা পায়ে দুলে-দুলে হেঁটে এসে পোকা ধরে। বিকেলে ওই বারান্দায় বসে মাকড়সার জালটা দেখছিলুম। হরিয়া একবাটি মুড়ি তেল দিয়ে মেখে দিয়ে গেছে, বসে খাচ্ছি। হঠাৎ ভাবলুম, মাকড়সাটাকে নিয়ে একটু খেলা করি। একটা মুড়ির দানা তার জালে ছুড়ে দিলুম, মুড়িটা আঠালো জালে পড়ে আটকে গেল। কাঁপুনি টের পেল মাকড়সা। একটু চুপ করে থেকে লম্বা পায়ে ধীরে হেঁটে এল। শুঁকল, দেখল। তারপর একটা লাথি মেরে মুড়ির দানাটা ফেলে দিল জাল থেকে। আবার ফিরে গেল জালের মাঝখানটিতে, ধৈর্য ধরে রইল জেলেদের মতো। আবার মুড়ি ছুড়ে মারলুম। আবার উঠে এল। দেখল, শুঁকল, লাথি মেরে মুড়ি ফেলে দিয়ে জালটাকে পরিষ্কার করে চলে গেল। বার বার এই কাণ্ড। বেশ খেলাটা। মাকড়সারা যে মুড়ি টুড়ি খায় না তা বুঝতে পারলুম কাল, খায় না কেন বলো তো?

সে যাকগে, অনেকক্ষণ ধরে মাকড়সার জালে মুড়ি ছুড়বার খেলা খেলে ক্লান্ত লাগছিল। হঠাৎ ইচ্ছে হল দেখি, রক্তমাংসের গন্ধ পেলে খায় কিনা। উঠোনের একধারে বিশাল হিংস্র চেহারার পিঁপড়ে দেখেছি। তাদের মস্ত মাথা, মিশমিশে কালো। তখনও দু-একটা ঘোরাফেরা করছিল উঠোনে। রান্নাঘর থেকে চিমটে এনে তাদের একটাকে ধরে জালে ছেড়ে দিলুম। মুড়ি খাওয়া শেষ হয়ে গেছে, বেড়াতে যাব, তাই আর ফলাফলের অপেক্ষা করিনি। ফিরে এসে দেখি মস্ত পিঁপড়েটা জালের কেন্দ্রে মাকড়সাটার খুব কাছেই মরে আটকে আছে। শরীরটা অর্ধেক খাওয়া।

মনটা সেই থেকে খারাপ। কেবলই ভাবছি, এ পাপ আমাকে কি স্পর্শ করবে?

পালে মৃত্যুর হাওয়া লেগেছে, নৌকো ভাঁটিয়ে যাচ্ছে। উজানেরও হাওয়া আছে, বাইলে উজানেও যাওয়া যায়। আমি পারছি না। এবার চিঠিতে লিখেছ আমাকে ফিরে যেতে। ভুলে যাও কেন যে আমি হাওয়া বদল করতে এসেছি। এখনও হাওয়া বদল শেষ হয়নি তো। মৃত্যুর হাওয়ার বদলে জীবনের হাওয়া লাগুক।

আজ ঘুম পাচ্ছে। এ চিঠিটা আবার কাল শেষ করব।

ঘুম থেকে উঠেই দেখি, কী সুন্দর ভোরের আলোটি। দিন আসছে, তারই আবাহনে আকাশ-মর্ত জুড়ে কী মহা আয়োজন! আকাশে মেঘ ছিল না, ধুলো-ধোঁয়া ছিল না, গাছগাছালি শান্ত, বাতাস মৃদু। রাতে একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছিলাম। আমি যেন পিঁপড়েদের জগতে চলে যাচ্ছি। লক্ষ পিঁপড়ে আমাকে বহন করে নিয়ে যাচ্ছে। স্বপ্ন? কিন্তু ভোরে ঘুম ভাঙল কুটুস একটা কামড়ে। উঠে দেখলুম। পিঁপড়ে নয়, বড্ড ছারপোকা।

বেশ লাগছিল ভোরটা। কী বলব, এত সুন্দর দৃশ্যটা একা দেখছি। মনটা খাঁ-খাঁ করছে। কাকে যেন ডেকে দেখালে ভালো হত। আমরা একা কিছু উপভোগ করতে পারি না। ভালো লাগে না। বেঁচে থাকতে গেলে একজন প্রিয় মানুষ চাই। সে কি তুমি? বুঝতে পারি না। কিন্তু কাউকে বড্ড দরকার এক-বুক কথা জমে আছে।

মাকড়সার ক্ষুধা কী ভয়ঙ্কর! আজ দেখি, আধ-খাওয়া পিঁপড়েটার দেহাবশেষ নেই। মনটা বড় অস্থির লাগছে, কী করলুম! এই নিষ্ঠুরতা কি আমাকে মানায়!

দুপুরে জানালার পাশে জারুল গাছের ছায়া কোলে করে বসে আছি। কী একা, কী গভীর চারদিক। মনে হচ্ছে, আমার কে আছে! আমার কে আছে!

কোল জুড়ে জারুলের ছায়া, জীবনে যা কিছু জড়ো করেছি দু-হাতে, সবই আঁকড়ে ধরে আছি, সেসব কি ছায়ার মতো?

অথচ পৃথিবী কী গভীর। কত কোটি বছরের জীবনযাপনের সব চিহ্ন নিয়ে বয়ে যাচ্ছে। বাতাসে তার প্রাচীনতার ঘ্রাণ। সব প্রাচীন সময়, সব প্রাচীন বাতাস আজও রয়ে গেছে। আমার চারধারে। এসব থেকেই জন্মেছি, এসবেই লয় পাবো। কোলে জারুলের ছায়া পড়ে, আলো দোলে। কিছুই ক্ষণিক নয়। সবকিছুই জন্মেছিল পৃথিবীর সঙ্গে।

জলে চোখ ভেসে গেল। স্মৃতিভ্রংশের মতো বসে থাকি। কোথা থেকেই বা এসেছি। ফিরে যাবই বা কোথায়!

সেই হাফহাতা পাঞ্জাবি পরা মানুষটা আসবে। উৎকণ্ঠায় অপেক্ষা করছি। আমরা দুজনে উপত্যকা পেরিয়ে যাব। ওদিকে একটা ঘাসজমি, তারপর গাছগাছালি। যাব। ফিরব কি? কে জানে?

ভেবো না। পৃথিবীতে কেউই খুব জরুরি নয়। যে যতই জরুরি ভাবুক নিজেকে, বা প্রিয়জনকে, তবু দেখো, তাকে ছাড়াও চলে যায়। কিছু অসুবিধে নেই। ছুটি দেবে? একবার দেখি হাওয়াটা পালটাতে পারি কিনা!
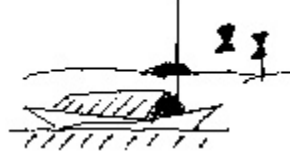
অপেক্ষা

মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে জানলার চৌকাঠে। দু-হাতে ধরে আছে জানলার শিক, শিকের ফাঁকে মুখ গলানো। তার বাবা ফিরতে দেরি করছে। বাবা ফিরলে তারা সবাই দোকানে যাবে। আজ ফ্রক কেনা হবে পুজোর। কিন্তু বাবা ফিরছে না।

পাঁচ বছরের মেয়ে, সব কথা কইতে পারে। হঠাৎ মুখটা ঘুরিয়ে চেঁচিয়ে জিগ্যেস করল —ক'টা বাজে মা?

মেয়ের মা সেলাই মেশিন থেকে মুখ তুলে ঘড়ি দেখে। সাতটা, মানুষটা এত দেরি কখনও করে না। বড্ড মেয়ে ন্যাওটা। বউ ন্যাওটা মানুষ, অফিসের পর আড্ডা-টাড্ডা দেয় না বড় একটা। দিলেও আগে ভাগে বলে যায় ফিরতে দেরি হবে। সরকারি অফিস, তাই ছুটি-টুটির ধার ধারে না, অফিসের ভিড় ভাঙার আগেই অফিস থেকে বেরিয়ে পড়ে। তার ওপর আজ পুজোর কেনাকাটা করতে যাওয়ার কথা। দেরি হওয়ার কারণ নেই। তবু সাতটা বেজে গেল, মানুষটা আসছে না।

মেয়ের মার বয়স মোটে ছাব্বিশ, ছয় বছর হল বিয়ে হয়েছে। দেখতে শুনতে আজও বেশ ভালো। পাতলা দিঘল গড়নের যুবতী, এখনও কত সাধ-আহ্লাদ। মেয়ের বাবারও বয়স ত্রিশের মধ্যেই। ভালো স্বাস্থ্য, সাবধানী, সংসারী এবং সঞ্চয়ী পুরুষ। সংসার সুখেরই!

তারা দু-বেলা ভাত খায় এই আকালের দিনেও। তবু কেন সাতটা বেজে গেল! সময়ের চোরা স্রোত কেন বয়ে গেল হু-হু করে?

মেয়ের মা সারাদিন সেলাই করছে। মেয়ের বাবার বড় শখ হয়েছে ফতুয়া পরবে। পরশু চার গজ পাতলা লংক্লথ কিনে এনেছে। দুটো ফতুয়া সেলাই করতে-করতে চোখ ঝাপসা, মাথা টিপ টিপ, মেশিনটা সরিয়ে রাখে বউ মানুষটা। মন ভালো লাগে না। দুশ্চিন্তা হচ্ছে বড়। সাতটার মধ্যে না আসার কথা নয়।

মেয়ে আজকাল ইস্কুলে যায়। তাই মেয়ের মা সারাদিন একাভোগা। কী করে, কী করে, কী করে! ঘুরে ফিরে ঘর সাজায়। বিছানার কভার পালটায়, জানলার পরদা পালটায়, সেলাই করে। উল বোনে, একশোবার ঘরের আসবাব এধার থেকে ওধার করে।

আজও সারাদিন সাজিয়েছে, তারা আর বেশিদিন এই ফ্ল্যাটে থাকবে না। গড়িয়ার দিকে একটু জমি কেনা হয়েছে। বিল্ডিং মেটেরিয়ালের জন্য দরখাস্ত করা হয়েছে। বাড়ি উঠলে তারা নিজেদের বাড়িতে উঠে যাবে। কথা আছে, বাড়ি হলে সামনে শখের বাগান করবে বউটি, স্টিলের আলমারি করবে, ভগবান আর একটু সুদিন করলে গ্যাসের উনুন আর একটি সস্তার রেফ্রিজারেটারও হবে তাদের। মেয়ের বাবার শখ টেপ রেকর্ডারের, আর ডাইনিং টেবিলের। তাও হয়ে যাবে। সাশ্রয় করে চললে সবই পাওয়া যায়। কিন্তু সাতটা বাজে। সময় বয়ে যাচ্ছে।

মেয়ের মা রান্নাঘরে আসে। দুশ্চিন্তা আর দুশ্চিন্তা। দেরির একটাই মানে হয়। কিন্তু মানেটা ভাবতে চায় না বউ মানুষটি। সে ঢাকনা খুলে দেখে রুটিগুলো শক্ত হয়ে গেল কিনা। সে এলে আবার একটু গরম করে ঘি মাখিয়ে কচুর ডালনার সঙ্গে দেবে। চায়ের জলটা কি বসাবে এখুনি? হাতে কেটলি নিয়ে ভাবে বউটি। জনতা স্টোভের সলতে উসকে দিয়ে দেশলাই ধরাতে গিয়েও কী ভেবে রেখে দেয়। জল বেশি ফুটলে চায়ের স্বাদ হয় না। এসেই তো পড়বে, এক্ষুনি, তখন চাপাবে।

মেয়ে আবার চেঁচায়—কটা বাজল মা?

বুকটা ধ্বক করে ওঠে। ঘড়ি না দেখেই বউটি উত্তর দেয়—কটা আর! এই তো সাড়ে ছটা।

মিথ্যে কথা, প্রকৃত হিসেবে, সাতটা পেরিয়ে গেছে।

সিঁড়িতে জুতোর শব্দ। বউটি নিশ্চিন্ত হয়ে দরজা খুলল।

না। সে নয়। ওপর তলায় লোক সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল।

—বাবা আসছে না কেন? মেয়ের প্রশ্ন।

—এল বলে। তুই বেণীটা বেঁধে নে না ততক্ষণে।

—বাবা আসুক।

—আচ্ছা বাপ ন্যাওটা মেয়ে যা হোক!

—কেন আসছে না বাবা?

—রাস্তাঘাট আটকে আছে বুঝি। আজকাল বাসে-ট্রামে বুঝি সহজে ওঠা যায়!

—রোজ তো আসে।

—আজও আসবে।

বিশ্বাস। বিশ্বাসের জোরেই বউটি হাত-মুখ ধুয়ে এসে পরিপাটি করে চুল বাঁধল। সিঁদুরটা একটু বেশিই ঢালল সিঁথিতে। ইদানীং বাজে সিঁদুরে চুল উঠে যায় আর মাথা চুলকোয় বলে সিঁদুরটা কমই লাগাত। আজ কম দিল না। একটু ফাউন্ডেশন ক্রিম ঘষল মুখে। লিপস্টিক বোলাল। সূক্ষ্ম কাজলও টানল একটু। ঘড়ির দিকে চাইল না।

সকালের রাঁধা তরিতরকারি জ্বাল না দিলে নষ্ট হয়ে যাবে। তাই যখন স্টোভ জ্বেলে জ্বাল দিতে বসল তখনই সে টের পেল, গায়ে পায়ে একটা কাঁপুনি আর শীত। শরীর বশে থাকছে না। ভয়? না কি পেটে একটা শত্তুর এল?

কিন্তু রাত থেমে থাকল না। গড়াতে লাগল সময়। একসময়ে বউটির ইচ্ছে হল উঠে গিয়ে ঘড়িটাকে আছাড় মেরে বন্ধ করে দিয়ে আসে। কারণ আটটাও বেজে গেল? মানুষটা ফেরেনি।

লুকিয়ে আছে কোথাও? ভয় দেখাচ্ছে না তো?

জানলায় দাঁড়িয়ে থেকে থেকে ক্লান্ত হয়েছে শিশুটি। তার খিদে পেয়েছে, তেষ্টা পেয়েছে। বউটি পাশের ফ্ল্যাটে গিয়ে একবার ঘুরে এল। ও ফ্ল্যাটের কর্তা ফিরেছে। ও বাড়ির বউ শুনে-টুনে বলে—রাত তো বেশি হয়নি, সাড়ে আটটা। আর একটু দেখুন, তারপর না হয় আমার কর্তাকে খোঁজ নিতে পাঠাব। শুনলুম, কারা মিছিল-টিছিল বের করছে, রাস্তা খুব জ্যাম।

আশ্বাস পেয়ে বউটি ফিরে আসে। কিন্তু ঘরে এসে শান্ত বা স্থির থাকতে পারে না। কেবলই ছটফট করে। ঘড়ির কাঁটা এক মুহূর্ত থেমে থাকছে না যে! বউটি বার দুই বাথরুমে ঘুরে এল। মেয়েকে খাওয়াতে বসে বারবার চোখে আসা জল মুছলে আঁচলে। তার বয়স বেশি নয়। মাত্র ছ'বছর হল বিয়ে হয়েছে। একটা জীবন পড়ে আছে সামনে।

ঘড়ির কাঁটা জলস্রোতের মতো বয়ে চলেছে। কিছুতেই ঠেকানো যাচ্ছে না। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ, বারবার ওপরে উঠে আসে আরও ওপরে উঠে যায়। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ নেমে আসে, নেমে যায়। ঘড়ির কাঁটা ঘুরছে। সময় যাচ্ছে বয়ে।

শিশু মেয়েটি ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুমোবার আগে ক্ষীণকণ্ঠে একবার বলে—মা, বাবা—

বাক্যটা শেষ করে না। বউটি আগ্রহে শুনবার চেষ্টা করে বাক্যটি। শিশুরা তো ভগবান, ওদের কথা অনেক সময় ফলে যায়। কিন্তু শিশু মেয়েটি বাক্যটা শেষ করে না। বউটির বুক কাঁপে।

এবার বউটি একা। জানালার পাশে। শিকের ফাঁকে চেপে রাখা মুখ চোখের জলে ভাসে! ন'টা বেজে গেল বুঝি! বউটি আস্তে-আস্তে বুঝতে পারে, তার মানুষটা আর আসবে না। অমন মানুষটার নানা চিহ্ন তার মনে পড়ে। কথা বলার সময় ওপরের ঠোঁটটা বাঁ-দিকে একটু বাঁক খায়, লোকটার দাঁত একটু উঁচু, গাল ভাঙা, কপালের ডান দিকে একটা আঁচিল, সাবধানী ভীতু এবং খুঁতখুঁতে মানুষ। বড্ড মেয়ে ন্যাওটা আর বউ-ন্যাংলা। এমনিতে এসব মনে পড়ে না, কিন্তু এখন বড্ড মনে পড়ছে। বউটি হাপুস হয়ে কাঁদতে থাকে।

সদর খোলা ছিল। সিঁড়িতেও শব্দ হয়নি।

অন্ধকার ঘরের ভিতর একটা ছায়ামূর্তি এসে দাঁড়ায়! প্রশ্ন করে—এ কী, সব অন্ধকার কেন?

চমকে ওঠে বউটি, বুঝতে পারে, মানুষটা ফিরেছে।

—কী হয়েছিল শুনি?

—আর বোলো না, সত্যকে মনে আছে?

—কে সত্য?

—কোন্নগরের। আমার বুজুম ফ্রেন্ড। বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ স্ট্রোক হয়ে মারা গেল। খবর পেয়ে অফিস থেকেই গিয়েছিলুম। মনটা যে কী খারাপ লাগছে।

বউটি আলো জ্বালে, ঘরদোর আবার হেসে ওঠে! তারা খাওয়াদাওয়া সারে। হাসে গল্প করে।

মানুষটা বারবারই তার মৃত বন্ধুর কথা বলে। বউটি বলে আহা গো।

কিন্তু বউটি তবু সুখীই বোধ করে। কারণ তার মানুষটা ফিরেছে। মানুষটা ফিরেছে। মানুষটা বেঁচে আছে।

সাঁঝের বেলা

শুষনি শাক তুলতে গিয়ে খেতে সাপ দেখেছিল মেজো বউ। 'সাপ সাপ' বলে ধেয়ে আসছিল, বেড়ায় আঁচল আটকে ধড়াস করে পড়ল। পেটে ছ'মাসের বাচ্চা। তাই নিজের ব্যথা ভুলে পেট চেপে কোনও সর্বনাশের কথা ভেবে কেঁদে উঠল চেঁচিয়ে।

রোদভরা উঠানে শান্ত সকালে নরম শরীর বলের মতো গুটিয়ে বসে আছে সাদা কালো কয়েকটা বেড়াল। টিপকলের ধারে বসে বাসন মাজছিল ঝি সুধা। তাকে ঘিরে ওপর-নীচে 'খা-খা' করে ডাকছে কাক। বড় পাজি কাক এখানে, লাফিয়ে এসে খোঁপায় ঠোক্কর দেয় সুধার। আশ থেকে পাশ থেকে এঁটোকাঁটা নির্ভয়ে খেয়ে যায়, কখনও বা সাবানের টুকরো, চামচ, ঠাকুরের খুদে প্রসাদের থালা গেলাস মুখে করে নিয়ে যায়। এবাড়ি-ওবাড়ি ফেলে দিয়ে আসে। বাসন মাজতে বসে সুধার তাই বড় জ্বালাতন। বসে-বসে সে কাকের গুষ্টির উদ্ধার করছিল—কেলেভূত, নোংরাখেকো, গুখেকো গুলোন, মর মর! ভগবানের ছিষ্টি বটে বাবা, যেমন ছিরি তেমনি স্বভাব! রোসো, কাল থেকে এঁটোকাঁটায় ইঁদুর মারা বিষ না মিশিয়ে দিই তো—তা কাকেরা শোনে না। কাটা ঘুড়ির মতো নেমে আসে। সুধার মুখের দিকে চেয়ে 'খা' বলে ডাকে, লাফিয়ে সরে যায়, আবার চেয়ে ডাকে 'খা'।

বাঙালিয়া দুধ দিতে এসেছে। নোংরা ধুতি, গায়ে একটা নতুন সাদা ফতুয়া, কাঁধে নোংরা গামছা। অদ্ভুত দেখায় তাকে। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সে গোঁফ চুমরাচ্ছিল। দুধের ডেকচি এখনও মাজা হয়নি। ঝামেলা। একবার ডেকে বলছিল—এহ সুধারানী, বর্তন ভৈল? কেতো সময় লাগে তুমার—হাঁ? শুনে সুধা ঝামড়ে উঠেছিল—থামতো তুই খোট্টা খালভরা কোথাকার। আমি মরছি বটে নিজের জ্বালায়। বাঙালিয়া একটু হেসে খৈনির থুক ফেলে বলে—কৌয়া তো খুব দিক করে তুমাকে? একঠো বন্দু মূলাও না।

বড়বউ চায়ের কেটলি আঁচল চেপে নামিয়ে কৌটো খুলে দেখে চা-পাতা নেই। কুমুকে ফের পড়া থেকে তুলে দোকানে পাঠাতে হবে, একটু আগে একবার দোকানে গিয়ে

পাঁউরুটি আর ছোট খোকার রসগোল্লা এনে দিয়েছে। মেজাজটা বিগড়ে গেল বড় বউয়ের। জানালা দিয়ে ধমক দিল সে—ও সুধা, কেবল বক বক করলে কি হাত চলে? বাঙালিয়া কখন থেকে দাঁড়িয়ে আছে। ওর তো আর বাড়ির গাহেক আছে না কি?

এই যে বড়বউয়ের মেজাজ বিগড়াল এর জের সারাদিন চলবে। একে তাকে ওকে সারাদিন বকতেই থাকবে যতক্ষণ না আবার তার বর বিষ্ণুচরণের মেজাজ বিগড়োয়। বিষ্ণুচরণ ধৈর্য হারালে বড়বউ পেটায়। মেজ হরিচরণ আবার তেমন নয়। যতক্ষণ বাড়িতে থাকে ততক্ষণ বউকে দেখে। উঠানে হয়তো কাপড় মেলে মেজো বউ কলধারে একটু রুমাল গেঞ্জি কাচতে যায়, কি চুল শুকোয় তখন হরিচরণ জানালার পরদার ফাঁক দিয়ে কি কপাটের আড়ালে লুকিয়ে বউকে দেখে। কখনও কখনও আবার কোকিলস্বরে আড়াল থেকে বলে—কু—উ! সেই শুনে আবার বড়বউয়ের বুক জ্বলে! বলে—এমন মাগীমার্কা ব্যাটাছেলে দেখিনি বাপু জন্মে। হরিচরণ আবার সেটা টের পায়, ডেকে বলে—বউদি গো, বউ আমার খাবে দাবে বসে থাকবে, শুধু তুলবে পাড়বে বিছানা।

যতীন এখন বুড়ো হয়েছে। হোমিওপ্যাথির ফোঁটা ফেলতে হাত কেঁপে যায়, এক ফোঁটার জায়গায় দু-ফোঁটা তিন ফোঁটা পড়ে গিয়ে ওষুধ নষ্ট। লোকে বলে—যতীন ডাক্তারের হাতের জোর নষ্ট হয়ে গেছে ছোট ছেলেটা মরার পর থেকে; ছোট ছেলে ব্রহ্মচরণ অবশ্য বাপের সু-পুত্র ছিল না। দা, কুড়ুল দিয়ে বাপ ভাইদের কাটতে উঠত প্রায়ই বাড়ির মধ্যে। মুখে আনতে নেই এমন মুখখারাপ করে গাল দিত! এ হল মেজাজের বাড়ি। সকলেই মেজাজওয়ালা মানুষ। ব্রহ্মচরণ আবার তার মধ্যেই ছিল নুনের ছিটে। সে মরায় এ বাড়ির লোক বেঁচেছে। মরল কীভাবে কে জানে! নিরুদ্দেশ বলে রা উঠেছিল, তারপর একদিন ঝিলে তার শরীর ভেসে উঠল। সারা গায়ে ছোরার গর্ত! কোনও কিনারা হয়নি, কিনারা করার আগ্রহও নেই কারও। কেবল বুড়ো যতীন ডাক্তার আজকাল ঝাপসা দেখে, হাত কাঁপে, রাতে ঘুমোতে পারে না, উঠে-উঠে বাইরে যায়, বিড়ি টানে, কাশে।

অভ্যাস মতো যতীন ডাক্তার তার বাইরের ঘরে ওষুধের বাক্স নিয়ে বসেছে। রুগিপত্র বড় একটা হয় না। দু-চারজন গল্পবাজ বুড়ো এসে বসে আড্ডা দিতে। আর আসে দীন-দরিদ্র দশ পয়সা, দু-আনার বাকির খদ্দের কয়েকজন। সকালে একবাটি বার্লি গিলে যতীন ডাক্তার ডিসপেন্সারিতে বসে আছে। সামনে প্রায় ত্রিশবছরের পুরোনো টেবিল তার ওপর ত্রিশ বছরের পুরোনো ব্লটিং পেপার, পাতা চিঠি গেঁথে রাখার স্ট্যান্ড, পিচবোর্ডের বাক্স, পুরিয়ার কাগজ রাখার কৌটো, আঠার শিশি, ওষুধের খুদে চামচ—এইসব রাখা। মাছি বসছে উড়ে-উড়ে। যতীন ডাক্তার ঘোলাটে চোখে খোলা দরজা দিয়ে বাইরে চেয়ে বসেছিল। ঘরের সামনেই একটা সুরকির রাস্তা, রাস্তার ধারে একটা বাবলা গাছ। বালীর

এ অঞ্চলে বাবলা গাছ বড় একটা দেখা যায় না। তবু কী করে বালী-দুর্গাপুরে একটা বাবলা গাছ হয়েছে। হলদেটে ছোটো ছোটো তুলির মতো ফুল ফোটে! বাবলার কচি পাতা চিবিয়ে বা রস করে খেলে পেটের ভারি উপকার, বাবলা গাছের ওপাশে আবার বাড়ির এক সার, তার ওপাশে রেলের লাইন। বর্ধমান কর্ড টিপটিপ করে মাটি কাঁপাচ্ছে, দূরে মালগাড়ির হাক্লান্ত ঘড়ঘড়ে শব্দ উঠছে। পৃথিবীতে আর কিছু দেখার বড় একটা নেই। ফাঁকা ঘরে মাছি উড়ে-উড়ে বসছে, নাকের ডগায়, ভুরুতে জ্বালাতন করে খাচ্ছে একটা মাছি। যতবার উড়িয়ে দেয় ততবার এসে ঠিক ওইখানটায় বসে। মাছির বড় জিদ। আজ সকালে কেউ আসেনি। বড় ফাঁকা, একা লাগছে। কমললতা ওই রাস্তাটা দিয়েই ফিরবে একটু বাদে। ঘরের দরজার বাইরে দাঁড়িয়েই আজকাল জিগ্যেস করে যায়—কেমন আছ ডাক্তারবাবু।

যতীন ডাক্তার আজকাল আর উত্তর দিতে পারে না। কমললতার মুখের দিকে চেয়ে চোখে জল এসে যায়। বউ মরেছিল, সেই কবে, তার মুখখানা মনেও পড়ে না আর। তিনটে নাবালক ছেলে নিয়ে কী যে বিপদে পড়েছিল তখন। সে সময়ে রুগির ভিড় থাকত হামেহাল। বড়বাজারের শেঠেদের দোকান থেকে ওষুধ এনে তা থেকে আবার ওষুধ তৈরি করা। এরারুটের গুঁড়ো বানানো, পুরিয়া করা—অনেক কাজ! ছেলেগুলো ধুলোয় পড়ে কাঁদত। সে সময়ে কমললতা যৌবনের গরবিনী। ঝিগিরি করত বটে, কিন্তু হাঁটাচলায় ভারি একটা মোহ সৃষ্টি করে যেত। যতীন ডাক্তারের বাড়ি ঠিকে কাজ করত, একদিন বলল—ও বাবু তোমার ছেলেদের একদিন ঠিক শেয়ালে নে যাবে। যতীন ডাক্তারের তখন শেষ যৌবন। কমললতার দুটো হাত ধরে ফেলে বলল—আমার ছেলেগুলো তুই নিয়ে যা কমল। তাতে অবশ্য কমল রাজি হয়নি। তবে একটা বন্দোবস্ত করে ফেলল সে। নিজের একটা অপছন্দের বর ছিল বটে কমললতার, সে উদো মানুষটা ইটখোলার কুলিগিরি, জুটমিলের চাকরি এসব করেটরে অবশেষে সাধু হয়ে গিয়েছিল। লোকে বলে—কমললতার কাম দমন করার মতো পৌরুষ ছিল না বলেই সে নাকি লম্বা দিয়েছিল। তবে আসত মাঝে-মাঝে বাইরে থেকে—ওঁ তৎসৎ, ওঁ তৎসৎ বলে চেঁচিয়ে জানান দিত। দরকার মতো এক আধ রাত কাটিয়ে যেত বউয়ের সঙ্গে। আর তখন কমললতা বরকে যা-নয়-তাই বলে গুষ্টি উদ্ধার করে দিত। ত্রিশূল ভাঙত, দাড়ি ছিঁড়ত, কমণ্ডুলু আছড়ে টোল ধরিয়ে দিত। কিন্তু তবু লোকটা সাধুগিরি থেকে মাঝে-মাঝে কী এক নেশায় মাস দু-মাস বাদে এসে হাজির হত ঠিকই। সেই অপছন্দের লোকটাকে যেমন পাত্তা দিত না সে, তেমন আর কোনও পুরুষকেও দিত না। কিন্তু যতীন ডাক্তার তাকে কাবু করে ফেলে। তিনটে ফুলের মতো ছেলে ধুলোয় গড়ায়। কবে এসে হুলো বেড়াল গলার নলি কেটে রেখে যায়, দেখবে কে? ডাক্তারের বিয়ে করারও ফুরসৎ নেই আর একটা। আর দেখেই বা কে? কমললতা তাই

একদিন ঠিকে থেকে স্থায়ী ঝি হয়ে গেল এ বাড়ির। প্রথম প্রথম আলাদা ঘরে ছেলেদের নিয়ে শুতো সে। তারপর ব্যবস্থা পালটাল। ডাক্তারের সঙ্গে বিছানাটা এক হয়ে গেল একদা। লোকে কু বলত। কিন্তু বলা কথায় কী আসে যায়। কোনও অনুষ্ঠান ছাড়াই কমললতা হয়ে গেল ডাক্তারের বউ। অবশ্য বউয়ের মতো থাকত না। ঝিগিরিই করত বরাবর। ছেলেরা নাম ধরে ডাকত, তুই-তোকারি করত।

বিশ-পঁচিশ বছর কেটে গেছে। এই সংসারের সঙ্গে জান লড়িয়ে দিয়েছিল সে। ছেলে মানুষ করা, সংসার সামলানো, ডাক্তারির সাহায্য। সব। ঝিয়ের মতো থাকত, কিন্তু তার কথাতেই চলত সংসার। ডাক্তার সোনাদানা, শাড়ি কাপড় দিয়েছে ঢেলে, কখনও কুকথা বলেনি, আদর করেছে খুব। শরীর উস্কালে রাত জেগে বসে থেকেছে। সাধু অবশ্য এ সংসারেও হানা দিয়েছিল। সে কী চোটপাট, হম্বিতম্বি, পুলিশের ভয় দেখানো! কিছু চেলা-চামুণ্ডা নিয়ে এসে হামলারও চেষ্টা করেছিল। ডাক্তার ভয় খেয়ে গিয়েছিল। কমললতা ভয় খায়নি। শুধু একবার দু চোখ মেলে খর দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চেয়ে ছিল সাধুর দিকে। তাইতেই সাধুর বুক চুপসে যায়। আসত বটে তার পরেও, তবে ভিক্ষে বা সিধে নিয়ে যেত, আর কিছু চাইত না।

কমললতা ভেবেছিল, এরকমই দিন যাবে। একটা জীবন আর ক'দিনের। মানুষ তো টুকুস করে মরে যায়। কিন্তু দিন যায়নি। ছেলেরা বড় হয়ে বুঝতে শিখে আপত্তি শুরু করে। এরকম সম্পর্ক নিয়ে বাপের থাকা চলবে না। সম্মান থাকে না। ঝঞ্ঝাটের শুরু তখন থেকেই। সেটা চরমে ওঠে বড় ছেলের বিয়ের পর। বড় বউ বিয়ের পর এ বাড়িতে ঢুকেই যেন সাপ দেখল। এক বছর ঘুরতে না ঘুরতেই বলতে থাকে—আমার বাবা বলেছে, এখানে রাখবে না। এ হচ্ছে নিশ্চরিত্র জায়গা, নরক। স্বামীর ঘর করার সুখের চাইতে বাড়িতে থাকার দুঃখেও সোয়াস্তি আছে। হরিচরণ আর বিষ্ণুচরণও ক্ষেপে গেল হঠাৎ। এক ব্রহ্মচরণ মা বলে ডাকত তাকে, সে বুক দিয়ে ঠেকাত। কিন্তু হাউড়ে ছেলে, বাইরে দাঙ্গাবাজি করে বেড়ায়, ঘরে থাকে কতক্ষণ? ডাক্তারও বুড়োবয়সে ছেলেদের সঙ্গে এঁটে ওঠে না। তবু ব্রহ্মচরণ বেঁচে থাকা অব্দি ছিল কমললতা। তারপর বেরিয়ে যেতে হল। ইটখোলার দিকে আবার ঘর নিয়েছে সে। বুড়োবয়সে সে এখন পাঁচবাড়ি ঠিকে ঝি-র কাজ করে খায়। একটি ছোট্ট বোনপোকে এনে রেখেছে, সেই দেখাশোনা করে।

মায়া তো যায় না। রোজ তাই বাইরে থেকে একবার কি দুবার খোঁজ নিয়ে যায় সে ডাক্তারের।

সারাদিন ওইটুকুরই অপেক্ষায় থাকে ডাক্তার। এই একা ফাঁকা বিশ্ব-সংসারে ওই কমললতা ছাড়া আর কেউ বন্ধু নেই।

মাছিটা উড়ে-উড়ে এসে ভ্রূতে বসছে। সুড়সুড়ি পায়ে নাক বেয়ে নেমে আসে। উড়িয়ে দেয় ডাক্তার। আবার টক করে এসে নাকের ডগায় বসে। নড়ে চড়ে হাঁটে। সকাল বেলাটা কেমন আঁধার-আঁধার মতো লাগে। নিঃশব্দ ঘরে শ্বাস পড়ে শ্বাস ওঠে। ভগবান।

হরিচরণ মাড়োয়ারি ফার্মে কাজ করে। সকালে যেতে হয়। দেরি হয়ে গিয়েছিল। এই সময়টায় মেজবউ নারায়ণী কখনও কাছে যদি থাকে ঠিক পালিয়ে বেড়াবে। নিজেকে দুর্লভ করার ওই হচ্ছে তার কলাকৌশল। পুরুষমানুষকে জ্বালাতন করে না খেলে আর মেয়েছেলের কাছা হয় না? দুবার তিনবার 'ক-উ ক-উ' ডাক ডাকল সে। এই ডাকে দুটো কাজ হয়। বউকে জানান দেওয়া হয়, আবার বড় বউকে জ্বালানোও হয়। ডালশুখো আর কাঁচা পেঁয়াজ লঙ্কা দিয়ে ফ্যানসা ভাত খেতে টকচা ঢেঁকুর তুলে হরিচরণ বিরক্ত হয়ে বসে থাকে। মুখখানা না দেখে বেরোই কী করে। দিনটাই খারাপ হয়ে যাবে। কুমু আর রাখু দাদার দুই ছেলেমেয়ে হল্লা চিল্লা করছে পাশের ঘরে। বিরক্তি। মেজাজ খারাপ থাকলে শব্দ সহ্য হয় না। 'অ্যা-ই' বলে একটা ধমক দিল এঘর থেকে—লেখাপড়া ফেলে হচ্ছেটা কী? শব্দটা বন্ধ হলে আবার 'কু-উ' ডাক ছাড়ে সে।

বড় বউ বোধহয় শুনতে পায়। খেঁকিয়ে ওঠে সুধাকে—তোমার আক্কেল দেখে মরে যাই। ইস্টিলের বাসন কেউ ছাই দিয়ে মাজে? দ্যাখো তো দাগ ধরে গেল কেমন?

হরিচরণ একটু হাসে। বড় বউয়ের মেজাজ ভালো নেই। ডালশুখোটা আজ মেখেছিল নারায়ণী! একটু হিঙের গুঁড়ো দিয়ে তেলে উলটেপালটে বাসি ডালটার দিব্যি তার করেছিল। বড়বউ খাওয়ার সময়ে জিগ্যেস করল—কেমন ডালশুখো খাচ্ছ গো, মেজদা?

—বেশ।

—তার আর কথা কী! কথাতেই বলে—বউ রেঁধেছে মুলো, খেলে লাগে তুলো-তুলো।

আসলে নারায়ণী নিজের হাতে বরের ডালশুখো করেছে বলে রাগ। হিন্দমোটরের মেকানিক বিষ্ণুচরণ যখন সাঁঝের ঘোরে এসে আজ পেটাবে তখন কেঁদে-কেটে রাগ পড়বে।

কিন্তু বউটা যে কোথায় গেল?

মেজবউ শাকের খেতে সাপ দেখেছিল। শুষনি শাক অযত্নে হয়ে আছে। এ সময়টায় জিভের স্বাদের কোনও ঠিক থাকে না। ফোটা ভাতের গন্ধে বমি আসে, আবার চামড়া পোড়া গন্ধ পেলে বুক ভরে দম নিতে ইচ্ছে করে। এই শীত আসি-আসি শরৎকালটা বড্ড ভালো। আকাশ কেমন নীলাম্বরী হয়ে আছে। গাছপালার রং ধোয়ামোছা ঝকঝকে! রোদ এখন ওম লাগে।

শীত-রোদে নিশ্চিন্তে দক্ষিণের বাগানে শুষনি শাক তুলছিল মেজবউ, লোকটা এখন বেরোবে। ফুঁসছে। তবু এখন কাছে যাবে না সে। অত বউমুখো মেনিমুখো কেন যে লোকটা। বড্ড লজ্জা করে নারায়ণীর। বিয়ের পর যেমন তেমন ছিল, কিন্তু পেটে বাচ্চা আসার পর এখন চক্ষুলজ্জা বলে বস্তু নেই। দিনরাত পারলে হামলায়।

এইসব ভাবতে-ভাবতে ঘাসজমি, আগাছার মধ্যে শুষনির পাতা ডাঁটা টুকুস-টুকুস করে ছিঁড়ছিল। মাঝে-মাঝে চোখ তুলে দেখছিল চারিধারে। অনেকখানি দূর পর্যন্ত দেখা যায়। আকাশ যেন নীল! গাছ যেমন সবুজ। দুটো চারটে ঘুড়ি উড়ছে আকাশে ওই উঁচুতে চিল। ছাতারে উড়ে যায় একটা। কালচে একটা কুবো পাখি কালকাসুন্দের ডালে হাঁটছে। 'বুক বুক বুক বুক' করে একটা মন খারাপ-করা ডাক ডাকছিল একটু আগেই।

একটা টসটসে ডগা ছিঁড়তে হাত বাড়িয়েই মেজবউ ঘাসের মধ্যে চকরাবকরা দেখতে পায়। প্রথমটায় যেন গা নড়ে না, পা চলে না। সারা গায়ে শিরশিরানি। রোঁয়া দাঁড়িয়ে আছে। লকলকে শরীরটা এঁকেবেঁকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। লম্বা ঘাসে হারিয়ে আবার জেগে উঠছে।

সাপ! সাপ! বলে চেঁচিয়ে বাগানের ফটক পরে হয়ে গিয়ে আঁচল আটকে পড়ে গেল মেজবউ। পড়ে কিছু টের পায় না। কোনও ব্যথা না, জ্বালা না। কেবল বুকটা হাহাকারে ভরে দিয়ে যায় এক আতঙ্ক। ছ'মাসের বাচ্চা যে পেটে! কী হবে ভগবান!

কেঁদে ওঠে মেজবউ।

বড় বউ স্তম্ভিত হয়ে যায়। নড়ে না। দাঁড়িয়ে আবার থরথর করে বসে পড়তে থাকে ভীতু, বউ-সর্বস্ব হরিচরণ। কলতলায় একটা বাসন আছড়ে ছুটে আসে সুধা। আর আসে কমু রাখু!

বাঙালিয়া দুধ দিয়ে ফিরে যাচ্ছিল। বালতিটা রেখে এসে প্রথম ধরে নারায়ণীকে। বলে ক্যা হুয়া? সাপ কাটা হ্যায় কিয়া!

বাঙালিয়ার বেশি বুদ্ধি নেই। সে মেজবউকে ছুঁয়েই বুঝতে পারে, রূপের আগুনে তার হাত পুড়ে গেল বুঝি। কী ফরসা, কী নরম, কী সুন্দর! এরকমই হয় বটে বাবুদের বাড়ির মেয়েরা। নাকি বাঙালি বলেই নরম। নরম শনিচারী কিছু কম নয়। কিন্তু এ তো তুলো। তার ওপর নাক-মুখ-চোখ আর ফরসা রঙের কী বাহার।

মেজবউ তার হাত ছাড়িয়ে নিল। বোকার মতো দাঁড়িয়েই থাকে তবু বাঙালিয়া। খাসজমিতে যেন পুজোর ফুল কে একরাশ ঢেলে দিয়ে গেছে। বউটিকে কতবার দেখেছে

সে। ছোঁয়নি। ছোঁয়ার পর সে যেন সব আলাদারকম দেখে। হাতটা মেখে আছে নরম স্পর্শে।

হরিচরণ আসে। বড়বউ এসে ধরে তোলে নারায়ণীকে। সুধা এসে মাজাটা ওর মধ্যেই একটু ডলে দেয়, বলে—ভালো করো, ভালো করো, ভালো করো ভগবান।

আশপাশের বাড়ি থেকে দু-চারজন এসে জুটে যায়।

সাপের দাঁতের দাগ অবশ্য খুঁজে পাওয়া যায় না।

ডাক্তার রাস্তার দিকে চেয়েছিল অপলক। মাছিটা বড় জ্বালাচ্ছে। ভোরবেলাটা কেন আঁধার-আঁধার লাগছে আজ? ডাক্তার একটা চিৎকার শুনতে পায়, 'সাপ-সাপ'! চেয়ারে শরীরটা বাঁ-ধার থেকে ডান ধারে মুচড়ে বসে ডাক্তার। পা দুটো তুলে হাঁটু জড়ো করে বুকের কাছে। বাতাসে একটু শীতভাব। সময়টা ভালো না। কে চেঁচাল 'ডাক্তার ডাক্তার' বলে? না, ডাক্তার বলে নয়, 'সাপ সাপ' বলে। মেয়েছেলের গলা। কমল নয় তো।

মাথাটা ভালো লাগে না ডাক্তারের।

পেছনে জোর করে শব্দ উঠে যেন। ডাক্তার ভয় খায় নাতি রাখুকে। মিষ্টি ওষুধের লোভে প্রায়ই এসে চুরি করে শিশিকে শিশি ফাঁক করে দেয়। অ্যাকেসিসের মাদার টিংচার একবার শিশিসুদ্ধ খেতে গিয়েছিল।

ডাক্তার পিছু ফিরে দেখে। বেড়ালটা হুশ-হুশ করে শব্দ করে। বেড়ালটা সবজে চোখ মেলে তার দিকে চায়। ক্ষীণ একটা শব্দ করে। কমল এদের পালত পুষত। দুটো কমলের সঙ্গে গেছে, আর দুটো রয়ে গেছে। কেউ পারে না, পোষে না, আদর করে না। এরা এমনি থাকে।

বাবা! একটা বুকফাটা চিৎকার করে কে ঘরে ঢোকে।

ডাক্তার চমকে ওঠে। মাথার মধ্যে একটা আলো যেন ঝলসে উঠেই নিভে যায়। মাছিটা ঠিক বসে আছে ভ্রূর মাঝখানে নড়ছে হাঁটছে।

—বাবা, শিগগির আসুন।

ডাক্তার বিরক্ত হয়ে মুখ ফেরায়—কে?

—আমি হরি।

—ও! চেঁচিও না।

—চেঁচাব না কী। আপনার বউমার কী হয়েছে দেখে যান।

—তোমরা দ্যাখো গে।

হরিচরণ স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে থাকে। তারপর এই চরিত্রহীন অপদার্থ নাম ডোবানো বুড়োটার প্রতি তীব্র হিংস্র একটা আক্রোশ বোধ করে সে। দু-হাতে যতীনের কাঁধ ধরে একটা ঝাঁকুনি দেয় সে।

—কী বলছেন?

—ওঃ! যতীন নাড়া খেয়ে ভারী ভয় পেয়ে যায়। মাথার মধ্যে লাল আলো নিভে একটা সাদা আলো জ্বলে। আবার সাদাটাও নিভে যায়।

—শিগগির আসুন।

—কোথায়?

—আপনার বউমাকে সাপে কামড়েছে।

ভিতরে একটা হুলুস্থূলের শব্দ হচ্ছে! সেই শব্দ থেকেই বড় বউ গলা তুলে বলে—সাপে কামড়াল কোথায়! কামড়ায়নি! পড়ে গেছে বাপু।

হরিচরণ বাবাকে একটা খোঁচা দেয়—পড়ে গেছে। বাচ্চাটা নষ্ট হতে পারে। আসুন।

—পড়ে গেছে। যতীন বড়-বড় চোখ করে চারিদিকে চায়। শালার মাছিটা। ঠিক বসে আছে এখন নাকের ডগায়। ছাড়ছে না। যতীন বলে—কী করব!

—একটু দেখুন।

—ডাক্তার ডাক।

—ডাকতে পাঠিয়েছি। সে তো দু-মাইল দূর থেকে, আসতে যেতে তিন ঘণ্টা। তার মধ্যে কিছু যদি হয়ে যায়।

ডাক্তার ভাবে ওষুধের নাম কিছুই মনেই পড়ে না। অনেক ভেবে বলে—থুজা টু হানড্রেড।

—কী বলছেন?

—উঁহু। ডানদিকে ব্যথা তো? লাইকোপোডিয়াম দেওয়াই ঠিক হবে।

—ডানদিকে না কোনদিকে কে জানে। আপনি আসুন।

ছেলের দিকে ভীত চোখে চেয়ে থাকে ডাক্তার। বলে—আমি কিছু জানি না বাপু, আমার কিছু মনে পড়ছে না।

তার হাত ধরে একটা হেঁচকা টান দিয়ে হরিচরণ বলে—তা বলে একবার চোখে এসে দেখবেন না। আপনারই তো ছেলের বউ।

বিড়বিড় করে ডাক্তার বলে—ছেলে না ইয়ে। তোমরা আমার কেউ না। বলতে-বলতেও ডাক্তার সঙ্গে-সঙ্গে যায়। হ্যাঁচকা টানে বুকের বাঁ-দিকে একটা খিঁচ ব্যথা ওঠে। মাথাটা দুটো টাল খায়। আলোটা দপ করে জ্বলে ফুস করে নিভে যায়।

ভিতরের ঘরে লোকজন জুটেছে মন্দ নয়। মেজবউ শুয়ে আছে খাটে। কোঁকাচ্ছে। শ্বাসকষ্টের কোঁকানি, চোখের তারা স্থির। মুখে গাঁজলার মতো কষ গড়াচ্ছে।

বিড়বিড় করে যতীন ডাক্তার বলে—নাক্স ভমিকা টু হানড্রেড! শিগগির।

হরিচরণ ছুটে যাচ্ছিল ডিসপেনসারিতে ওষুধ আনতে।

ডাক্তার মাথা নেড়ে বলে—না। ভুল।

—তবে?

—সালফার থার্টি।

—কী সব বলছেন?

—ভুলে যাই যে বাবা।

হরিচরণ কী করবে ভেবে পায় না। হাঁ করে চেয়ে থাকে অপদার্থ বাপের দিকে। যতীন ডাক্তার বিড়বিড় করে বলে—পুত্র আর মূত্র একই পথ দিয়ে আসে। বুঝলে? পুত্র যদি পুত্রের কাজ না করে সে তো মূত্র। না কী?

কথাটা অবশ্য হরিচরণের কানে যায় না। কিন্তু সে লক্ষ করে এই দুঃসময়েও তার বাবা বিড়বিড় করে বকছে। এরকম কখনও করত না তো বুড়ো! পেগলে গেল নাকি!

বাঙালিয়া বাঁ-হাতে খৈনির গুঁড়োর ওপর ডান হাতে একটা আনন্দিত চাপড় মারে। কনুইয়ের ভাঁজ থেকে দুধের খালি বালতি ঝুলছে, মনে অনেক আশ্চর্য আলো এসে পড়েছে আজ। ভারী অন্যমনস্ক সে। একটা দেশওয়ালি গান গুনগুন করে গায় সে। হাতে একটা নরম স্পর্শ লেগে আছে এখনও।

কমললতার সঙ্গে দেখা।

—ক্যায়া হো কমলদিদি।

—ও বাড়িতে কী হয়েছে রে বাঙালু?

—সাপু কাটা নেহি। গিরে পড়ল।

—কে?

—বহুজী। যান না, দেখিয়ে আসন।

বিপদে বারণ নেই। কমললতা তাই এদিক-ওদিক একটু দেখে নেয়। ভয় করে। পঁচিশ বছর কাটিয়েও ভয়। তবু সে ঢুকে পড়ে।

—কী হয়েছে?

বলে সে সোজা ঘরে ঢুকে যায়। কেউ কিছু বলে না, বারণ করে না। সাহস পেয়ে কমললতা বিছানার কাছে উপুড় হয়ে দেখে নারায়ণীকে। মুখটা তুলে বলে—বড়বউমা একটু গরম জল করো, আর মালসায় একটু আগুন। এ কিছু না। ঠিক হয়ে যাবে।

কেউ কিছু বুদ্ধি খুঁজে পাচ্ছিল না। কমললতার কথায় যেন বিশ্বাস খুঁজে পায় সবাই। বড় বউ ধেয়ে যায় রান্নাঘরে। চোখের জল মুছে, উনুন থেকে হাঁড়ি নামিয়ে জল চাপায়।

কমললতা সাহস পেয়ে মেজবউয়ের মাথা কোলে নিয়ে বসে হাওয়া করে। বহুকাল বাদে নিজের হারানো জায়গাটা যেন পেয়ে গেছে কমললতা। হরিচরণকে ডেকে বলে—তোর বাপের ঘর থেকে অ্যালকোহল দশ ফোঁটা একটু গরম দুধে দিয়ে নিয়ে আয়।

হরিচরণ কমললতার দিকে এক পলক চায়। চোখে কী ফোটে না জানে। তারপর বাপের ঘরের দিকে চায়।

যতীন ডাক্তার খাটের বাজু ধরে দাঁড়িয়ে চেয়েছিল। মেজবউয়ের দিকে নয়। মেজবউ বা পৃথিবী আর কিছুর কোনও অস্তিত্বই তো নেই। সে চেয়েছিল কমললতার দিকে। কাম কবে মরে গেছে, যৌবনের প্রেম বলতে কিছু নেই এখন। কিন্তু বুক জুড়ে আছে সহবাস। সে বিড়বিড় করে ডাকে—কমল, কমল, কমল বড় একা ফাঁকা জগৎ। থাকো। এখানেই কেন থাকো না। থাকো।

কমললতা যতীনের দিকে চায়। বুড়োটার চোখ ঘোলাটে লাগে যে? বিড়বিড় করে কী বকছে। আহা, ওরা কি আর যত্ন করে?

সন্ধের দিকেই ঠিক হয়ে যায় মেজবউ। ডাক্তার দেখে গেছে। বলছে, গাইনির ডাক্তার দেখাতে। তবে ভয় নেই। বিকেলের দিকে মেজবউ ওঠা-হাঁটাও করল খানিক। চুল বাঁধল

হাসল। হরিচরণ গেছে কলকাতা থেকে বউয়ের জন্য বলকারী ওষুধ আনতে।

সারাদিন কমললতা আজ এ বাড়িতে রয়ে গেল। মেজবউয়ের কাছেই রইল বেশিক্ষণ। যতীন ডাক্তার ডিসপেন্সারিতেই আগাগোড়া বসে আছে আজ। ভাত খেতে বসে অর্ধেক খেয়ে উঠে গেল দুপুরে। শরীরটা খারাপ নাকি! কমললতার বুকের মধ্যে কেমন করে। তিন-চারদিন আগে খবর এসেছে, সাধু মানুষটা মরেছে কুলটির হাসপাতালে। একটু কেঁদেছিল কমল। কান্নাটা মেয়েদের রোগ, নইলে সে মানুষের জন্য কান্নাই কী, দুঃখই কী! কমললতা ভালোবাসা যা পেয়েছে তা এই যতীন ডাক্তারের কাছে। কাছে যাবে সে উপায় নেই। কে কী বলে। বাড়ি থেকে বেরই করে দিল হয়তো। এ বাড়ির বাতাসে শ্বাস না নিলে বুক মরুভূমি হয়ে থাকে। সাধুটা মরে গেল! ডাক্তারও কেমন যেন করছে। তাই এ বাড়ি ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছিল না আজ। মেজবউয়ের সেবার নাম করে সারাটা দিন থেকেছে। বড়বউ ডেকে দু-মুঠো খাইয়েছে দুপুরে। সে কথা ভাবতেই মনটা ভালো লাগে।

সন্ধের পর একটু ফাঁক পেয়েই কমললতা বুড়োমানুষটার ঘরে আসে। ডিসপেন্সারি থেকে উঠে এসে কখন বিছানায় শুয়েছে। লণ্ঠনের আলোয় কমললতার মুখের দিকে চাইল। বলল—মাছিটা কেবল বসছে।

—কোথায় মাছি?

—কপালে। সকাল থেকে উড়ে-উড়ে বসছে!

কমললতা কপালটা দেখে। বলে—নেই তো।

—আছে।

কমললতা যতীন ডাক্তারের মুখখানা দেখে ভালো করে। চোখ ঘোলা আর লালচে। শ্বাস গরম। কপালে হাত চেপে ধরলে বোঝা যায়, শিরার মধ্যে রক্ত লাফাচ্ছে। কমল বলে—আমি কপালে হাত বুলিয়ে দিচ্ছি।

—তুমি থাকো।

—থাকার জো কী? বিষ্ণুচরণ এলেই তাড়াবে।

—না। তুমি থাকো।

—আচ্ছা, শরীরটা কি খারাপ?

—না। বড় একা লাগে।

—একা কেন? সবাই রয়েছে।

—কেউ নেই।

কমললতার চোখে জল আসে। গাল বেয়ে নামে। নাকে সর্দি টানার শব্দ হয়। একটা গাঢ় শ্বাস ফেলে সে। সংসার বড় মায়াহীন।

ডাক্তার দেখে কমললতা চাঁদকে লণ্ঠনের মতো ধরে আলো দেখাচ্ছে। ডাক্তার ওঠে। বলে—দাঁড়াও, ওষুধ বানাচ্ছি।

—বানাও।

এ ওষুধে দুজনের সব সেরে যাবে, বুঝলে কমল?

—জানি। তুমি ধন্বন্তরী।

ডাক্তার জ্যোৎস্নার লণ্ঠনে কমললতার সঙ্গে পথ চিনে বাগানে যায়। ফুল তুলে আনে। চুপিচুপি ডিসপেন্সারিতে ঢোকে দুজন। ডাক্তার একটা ঝিনুকে ফুল টিপে মধু ফেলে ক'ফোঁটা। একটু জ্যোৎস্না মেশায়। একটু চোখের জল তার সঙ্গে। আর দু-ফোঁটা অ্যাকসিস।

—অমৃত। ঝিনুকটা তুলে ডাক্তার বলে।

—জানি।

—দুজনে খাই, এসো।

স্বপ্নটা ভেঙে যায়। ডাক্তার জাগে। কেউ কোথাও নেই। মাথার মধ্যে তীব্র যন্ত্রণা সব বোধ গুলিয়ে দেয়।

যতীন ওঠে। তারপর শূন্য ডিসপেন্সারিতে গিয়ে ঢোকে। অন্ধকার। খোলা জানালা দিয়ে দুধের মতো জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে ঘর।

আধছায়ায় যতীন ডাক্তার উলটোদিকের চেয়ারটায় গিয়ে বসে। তারপর নিজের বসা শূন্য চেয়ারটার দিকে চেয়ে বলে—ডাক্তারবাবু, আমার বড় অসুখ। বড় অসুখ।

হরিচরণ তখন বউকে জড়িয়ে আষ্টে-পৃষ্ঠে হাতে পায়ে বেঁধে রেখেছে। নারায়ণী ঘুমের মধ্যে ঠেলা দিয়ে বলে—আঃ, দম আটকে মারবে নাকি বাপু?

হরিচরণ ঘুমচোখে বলে—তুমি যা দুষ্টু হয়েছ।

—উঃ সরো বাপু। গরম লাগছে।

হরিচরণ বলে—তোমার জন্যে সবসময়ে ভয়ে-ভয়ে থাকি।

নারায়ণী পাশ ফিরে বলে—ইঃ।

তখন হামলে তাকে আদর করতে থাকে হরিচরণ। বাধা মানে না।

বিষ্ণুচরণ বউয়ের গা-ঘেঁষা ভাব পছন্দ করে না। লাইনের ওধারে তার আবার মেয়েছেলে রাখা আছে। এক কাতে শুয়ে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। কাঁচা ঘুমটা ভাঙিয়ে বউ বলল—কমল কিন্তু অনেক সেবা-টেবা করেছে।

—করুকগে। আর ঢুকতে দিও না।

মায়া পড়ে গেছে তোমাদের ওপর।

—হুঁ। শেষমেশ বাড়ির অংশ চাইবে। তা ছাড়া কলঙ্ক। আপদ যখন বিদেয় হয়েছে, আর না।

—কোলেপিঠে করেছে তোমাদের।

—খুব দরদ যে!

—বলছিলাম মাঝে মধ্যে আসে যদি আসুক।

—উঁহু। ফের যদি ঢুকতে দাও তো তোমার কপালে কষ্ট আছে।

—কিন্তু ওকে ছাড়া বুড়োমানুষটা যে থাকতে পারে না।

বিষ্ণুচরণ ঝাঁকি মেরে ওঠে—পারে না। অ্যাঁ:। এই বুড়ো বয়সেও রস আছে নাকি? ভয় খেয়ে বড়বউ চুপ করে যায়।

ডিসপেন্সারি থেকে উঠে নিজের ঘরে আসে যতীন। আবার ডিসপেন্সারিতে যায়। তারপর বেভুল হয়ে এ-ঘর ও-ঘর ঘুরতে থাকে হারানো শিশুর মতো। ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে একটু কাঁদে। মাছিটা উড়ে-উড়ে বসছে ভ্রূতে, নাকে, কপালে সুড়সুড়ি পায়ে হাঁটছে, যতীন ডাক্তার চারধারে পৃথিবীর রহস্যটা গুলিয়ে ফেলতে থাকে। চাঁদের আলো, গাছপালা, ঘরদোর—সবকিছুই অবোধ চোখে দেখে। বিড়বিড় করে বলতে থাকে—কমললতা মা, মা গো, কমলমা, মাছিটা তাড়িয়ে দাও...মাছিটা তাড়িয়ে দাও...মা...

সংবাদ : ১৯৭৬

বিশ্ব সেবার কুলু মানালিতে বেড়াচ্ছে যাচ্ছে। দুর্গাপুরে ভালো চাকরি করে, যা মাইনে পায় তার সবটুকুই নিজের পিছনে খরচ করতে পারে। সবসময়ে ঝকঝকে তার জামা কাপড়। নিত্য নতুন।

দেখা হল কল্যাণের অফিসঘরে, যেমন প্রায়ই হত। সে টেবিলের ওপর ঝুঁকে অনায়াস দক্ষতায় কোনও তরুণ কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থের প্রচ্ছদ আঁকছিল। মাথা নীচু থাকায় তার বিরল-কেশ তালু দেখা যাচ্ছে। কবিতার বইয়ের মলাটে সে ছিল সিদ্ধ।

তার মনোযোগে ঘা দিয়ে প্রশ্ন করি—কী খবর?

তার দাঁত ছিল চমৎকার, কণ্ঠস্বর অল্প ফ্যাঁসফ্যাঁসে আর নীচু পরদায় বাঁধা।

হেসে সে বলে—কুলু মানালি চললাম।

একা?

—একা। দোকার চেয়ে একাই ভালো। অন্যরা সঙ্গে গেলে নিজের ইচ্ছে মতো ঘোরা যায় না।

আমার মনে একটা দুশ্চিন্তার মেঘ ছায়া ফেলে গেল। বেড়াতে যেতে বরাবরই আমার এক ভয়াতুর অস্বস্তি! তার ওপর কোনও দূর জায়গায় একা যাওয়া তো আরও অসম্ভব।

বললাম—একা যাচ্ছেন, যদি বাইরে গিয়ে কোনও বিপদ-আপদ হয়?

—বিপদ আবার কী? বিপদ টিপদের কথা ভাবি না। একা বেড়াতেই বেশ লাগে।

—অনেক দূর! দ্বিধাভরে বলি।

—দূরই তো ভালো। নতুন একটা ক্যামেরা কিনেছি, আসাহি পেন্টাক্স। ক্যামেরার কথা জানতাম। বললাম—কত পড়ল যেন?

—দুই চেয়েছিল। আঠারোশো দেব ঠিক করেছি। যা ছবি তুলে আনব না, দেখবেন। চারটে কালার রোল নিয়ে যাচ্ছি। আমার ম্যামিয়া ক্যামেরাটা বেচে দেব। আপনি কিনবেন বলেছিলেন কী হল?

আমার এক জার্মান ক্যামেরা ছিল বহুকাল আগে। পূর্ণ দাস রোডের মেসে থাকবার সময়ে সেটা কোনও উপকারী সঙ্গী হাতসাফাই করে। তারপর থেকে ক্যামেরার জন্য একট অভাববোধ থেকে গেছে।

বললাম—ম্যামিয়া ক্যামেরাটা বড্ড ভালো। কিনবার ইচ্ছেও ছিল। কিন্তু টাকা কোথায় পাব?

—রেখে দিন না! টাকা না হয় পরে দেবেন।

একটু ভাবি। ক্যামেরাটার দাম বিশ্ব চেয়েছে আটশো টাকা। অতগুলো টাকা একসঙ্গে দেওয়া! একটু ভাবতে হয়। ক্যামেরা মানেই তো খরচ।

বললাম—আপনি ঘুরে আসুন দেখা যাবে।

বিশ্ব একটা চমৎকার কাঠকয়লা রঙে আস্তরণ দিল প্রচ্ছদের ভূমিতে। মিষ্টি হয়ে গেল এযাবৎ ভুতুড়ে ছবিটা। আঁকিয়েরা পারেও বটে ম্যাজিক দেখাতে।

তুলি দিয়ে রং এদিক-ওদিক টেনে দিতে-দিতেই বলল—প্রায়ই ক্যামেরটার জন্য খদ্দের আসছে। আপনার জন্যই ধরে রেখেছি। পাশের অফিসের ভটচায্যিই চাইছে, হাজার দেবে।

একটু লোভ শরীরে কিলবিল করে উঠল। নেব?

কিন্তু বরাবরই যে কোনও কাজের আগে, সিদ্ধান্তের আগে আমি একটু ভাবি। তার ফলেই আমি কিছু ধীর, অপটু এবং ব্যর্থ। দ্বিধা যে মানুষের কত বড় শত্রু।

অনেক ভেবে বললাম—না এক্ষুনি বলতে পারছি না। বরং ভটচায্যিকেই দিয়ে দিন।

—দেব?

—দিন।

বাকি দশ মিনিটে বিশ্ব প্রচ্ছদটা শেষ করল। অসাধারণ এক মলাট এঁকেছে সে। আগাগোড়া কথা বলতে-বলতে, আধা-অন্যমনস্কতায়।

মলাটটা আমার দিকে ঘুরিয়ে দিয়ে বলল—কেমন হল?

—দারুণ।

—তবু কমার্শিয়াল কনসার্নগুলো আমায় কাজ দেয় না।

—আমি চেষ্টা করব। কয়েকজন চেনা আছে।

—দেখবেন তো।

—বিয়ে কবে করছেন?

বিশ্ব ভারী লাজুক, হেসে বলল—এই তো শিগগিরই।

—মেয়ে তো ঠিক হয়ে আছে। দেখতে কেমন?

—মোটামুটি।

—আপনি দেখেছেন?

—হ্যাঁ।

ওর মুখভাব দেখে মনে হয়েছিল, পাত্রী পছন্দই হয়েছে।

সেই দেখা হওয়ার পর মাঝে-মাঝেই মনে হত, একা কুলু মানালি যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে বিশ্ব ভালো করেনি। অত দূরে গিয়ে যদি অসুখ করে তো কে দেখবে? যদি দুর্ঘটনায় পড়ে তবে?

ক্যামেরাটার কথাও প্রায়ই মনে হয়েছে। ছেড়ে দিয়ে খারাপ হল। নিয়ে নিলেই হত। যাওয়ার আগে ক্যামেরাটা ভটচায্যিকে দিয়ে গেছে বিশ্ব। এখন আর কিছু করার নেই।

মাসখানেক বাদে ডিউক রেস্তোঁরায় দুপুরবেলা আড্ডাধারীদের খোঁজে হানা দিতেই মাধুর সঙ্গে দেখা। বলল—বিশ্ব মারা গেছে জানেন?

—কুলু মানালিতে?

—না, না। সেখান থেকে কয়েকদিন আগে ফিরে এসেছে। অনেক ফটো তুলে এনেছে, দেখাল।

—তবে?

—মারা গেছে হাওড়ায়, বাস অ্যাকসিডেন্টে।

রেগে গিয়ে বলি—এ হয় না। ভুল খবর।

—কল্যাণকে জিগ্যেস করবেন। আমরা হাসপাতাল যাইনি, ও গেছে। সন্ধেবেলা কল্যাণ এসে বলল—বিশ্বকে শেষ করে এলাম।

—কী দেখলেন?

—কিছু না। খুব নর্মাল মুখচোখ। কোথাও থেঁতলে বা কেটে যা ভেঙে যায়নি। নাক দিয়ে সামান্য রক্ত গড়াচ্ছিল। কেউ কিছু বলতে পারছে না।

—ব্যাপারটা কীরকম হল তাহলে?

—বোধহয় ষোলো নম্বর বাসে ঝুলে আসছিল। ল্যাম্পপোস্ট বা ওইরকম কিছুতে মাথাটা লাগে। হাওড়ার রাস্তা তো বড্ড সরু। রাস্তায় পড়ে ছিল। লোকজন ধরাধরি করে তুলে যখন হাসপাতালে পাঠায় তখন ফিনিশ। ইন্টারন্যাল হেমারেজ।

অন্তর্গত রক্তক্ষরণ?

মনের মধ্যে একটা বোবা কী যেন বলতে চায়। তার শব্দ শুনি, কথা বুঝতে পারি না। মনে হয়, কখনও সে একটা ক্যামেরার কথা বলে, কিংবা কখনও কুলু মানালির দূরত্বের কথা। নাকি, একা দূরে যেতে নিষেধ করে সে?

দুই

মেদিনীপুরের এক অনুষ্ঠানে গিয়ে কেতোর জুতো চুরি গিয়েছিল। খালি পায়ে ছোটাছুটি করে জুতো খুঁজে এবং না পেয়ে অবশেষে কেতোর সে কি রাগারাগি! চেঁচিয়ে সবাইকে বলছে—এখানে ভদ্রলোক নেই, সব কটা চোর।

সে ঠান্ডা হওয়ার পর আমি আর কল্যাণ তার পেছনে হুড়ো দেওয়া শুরু করলাম। কল্যাণ বলে—কেতো, তোমার শ্বশুরের দেওয়া জুতোজোড়া তোমার শ্বশুরই আবার লোক লাগিয়ে চুরি করিয়েছে। জামাইষষ্ঠীতে আবার তোমাকে ওই জুতোই প্রেজেন্ট করবে। জুতোর দাম কী পরিমাণ বেড়েছে জানোই তো!

খ্যাপালে কেতো হি-হি করে হাসত। তার হাসির ভিতর দিয়ে হৃদয়ের ছবি দেখা যেত।

খুব ছেলেবেলা থেকেই কেতো আসত আমার কাছে। আমার ছোটো ভাইয়ের বন্ধু। রাজ্যের গল্প কবিতা লিখে আনত দেখানোর জন্য। লেখাগুলো তেমন কিছু হত না।

অবহেলায় দিয়ে বলতাম—এখনও ঢের লিখতে হবে। পাকা হও।

চমৎকার ছাত্র ছিল সে। উচ্চমাধ্যমিকে বৃত্তি পেল, ডাক্তারি পাশ করল একবারে। মেডিকেল কলেজে পড়বার সময়ে তার চেনার সূত্র ধরে আমরা কত জনা যে কতরকম চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছি। কারও কিছু হলেই কেতোর কথা মনে পড়ত সকলের। আমিও কত অনিচ্ছুক রুগিকে ঠেলেঠুলে পাঠিয়েছি কেতোর কাছে।

তার এ বিষয়ে ক্লান্তি ছিল না। কেউ গেলে দৌড়ঝাঁপ করে তার কাজ আদায় করে দিত।

ডাক্তারি পড়ার সময়ে সে কোনও হৃদয়ঘটিত ব্যাপারে একবার ঘুমের বড়ি খায়। বেঁচে গিয়ে পড়ল হেপাটাইটিসে। এ রোগটা সে পেয়েছিল অন্য এক রুগির কাছ থেকে।

তার বিয়ে ঠিক হল কয়েকবার। কপালক্রমে কোনওটাই হল না। নকশাল আন্দোলনের সময়ে একবার হোস্টেলের কিছু ছেলে তাকে মারে। নিরীহ কেতোকে কেউ মারতে পারে এ আমার ধারণায় আসে না আজও। সে তো বরাবর ধমক খেয়ে হেসেছে। কখনও দশ মিনিট একসঙ্গে গম্ভীর থাকেনি!

ডাক্তারি পাশ করার পর বিয়ে হল তার। সে বিয়েতে আমার যাওয়া হয়নি, কেন তা ভেবে পাই না। কিন্তু যাওয়া হয়নি।

বিয়ের পর অন্যরকম এক কেতোর সঙ্গে দেখা হল। প্রথম দিকে বেশ উজ্জ্বল উজ্জ্বল, তারপর কিছু বেশিমাত্রায় অন্যমনস্ক।

বলতাম—কবে বিলেতে যাচ্ছ কেতো?

—শিগগিরই। পাশপোর্ট করতে দিয়েছি।

গায়নোকলজির দিকে ঝোঁক ছিল। চমৎকার ডাক্তার ছিল সে। ক্যালকাটা হলপিটালে থাকাকালীন সে মেয়াদ ফুরোনোর পরও এক্সটেনশন পায়। নানা হাসপাতাল থেকে চাকরির ডাক এসেছে।

বলতাম—বিলেতে যাবেই কেতো?

—না গিয়ে কী করব? এম. ডি. করলাম, এতে মন ভরছে না। এম আর সি পি, আর এফ আর সি এস করে আসি।

—তখন তোমার ভিজিট কত হবে?

খুব হাসত হি হি করে। হৃদয় দেখা যেত।

—তখন তোমার ভিজিট দেবো কী করে?

—আপনাদের ভিজিট যে কত পাব সে জানি।

সামনে সিগারেট খেত না। আমিই তাকে জোর করে খাওয়াই। মোটা হয়ে যাচ্ছে দেখে অনুযোগ দিয়ে বলতাম—এই ব্যাঙের মতো থপথপে অপদার্থ চেহারা নিয়ে কী যে করবে তুমি!

—না দাদা, ডাক্তারদের একটু ফ্যাট থাকা ভালো। কাজে লাগে।

—দূর বোকা। বিলেতে গিয়ে আমার জন্য কী পাঠাবে?

—সে ভেবে রেখেছি। আপনার তো খুব কলমের শখ। একটা দারুণ কলম পাঠাব।

পাশপোর্ট হয়ে গেল ভিসা এল। টিকিট কাটা শেষ।

যে মাসের উনত্রিশ তারিখে তার রওনা হওয়ার কথা সে মাসেরই বোধহয় আঠারো তারিখে জামসেদপুরের এক আত্মীয়বাড়িতে সে কয়েকটা আপাত নিরাপদ ব্যথাহরা বড়ি খেয়েছিল। মাথা ধরেছিল বোধহয়।

জুডো ক্যারাটের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ব্রুস লিও খেয়েছিল। তারপর অন্তর্গত রক্ত নাক কান মুখ দিয়ে অবিরল ধারায় বেরিয়ে এসেছিল। ট্যাপ খোলা কলের মতো। সেই ট্যাপ বন্ধ করবার কেউ ছিল না।

কেতোর রক্তের কল খুলে গেল সেই রাতে। ঝলকে-ঝলকে উঠে আসে মহার্ঘ লোহিত তরল। প্রাণদায়ী। অস্তিত্বের সারাৎসার।

হেমারেজ সে অনেক দেখেছে, সারিয়েছে বহু। নিজের রক্ত দেখতে-দেখতে তার ক্লান্তি এল। মাথা নেড়ে বলল— ইউসলেস। আমি বাঁচব না।

অনেক ডাক্তার জড়ো হয়েছিল। একজন ডাক্তারকে বাঁচাতে।

সে বাঁচলে অনেকে বেঁচে যেত।

কিন্তু অ্যাপয়ন্টমেন্ট ছিল যে। বিলেত থেকে আর একটু রহস্যময় দূরত্বে সে চলে গেল বিনা ভিসায়। সেখান থেকে কলম পাঠানো যায় না।

আমি কি সেই কলমটার কথা ভাবি মাঝে-মাঝে! হাতে কলমটার দিকে চাইলেই কেতোটার কথা বড় মনে পড়ে।

তিন

মানুষের জীবনে এক-একটি মৃত সময় আসে। বড় নিষ্ফলা সময় সেটা। কিছু হয় না তখন, কিছু ঘটে না তখন, কিছু পাওয়া যায় না তখন। জীবন বন্ধ দরজার মতো নিরেট দাঁড়িয়ে থাকে। মাথা খোঁড়ো, কেউ সাড়া দেবে না।

আমার এইরকম খরা, অজন্মার সময়ে আমাকে শববাহকের মতো অনেকদূরে বহন করেছিল শংকর। শ্মশানের দিকে নয়, বেঁচে থাকার দিকে। ঝাঁড়ফুঁক জানা ছিল তার কিছু। অল্প স্বল্প চিকিৎসার বিদ্যা, সে হাওয়ায় উড়িয়ে দিতে জানত ছেঁড়া কাগজের মতো অন্যের বিষণ্ণতা।

তার নিজের বিষণ্ণতা ছিল অমোঘ। একদিন এই বজ্রপাতের শব্দ শুনিয়ে গেল।

শংকরের জন্য ভাবতে বসে কখন নিজের কথা ভাবতে থাকি। আমারও একদিন দেখা দেবে হৃদরোগ? কিংবা কোনও রক্তক্ষরণ? নিদেন দুর্ঘটনা?

হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরলে তাকে দেখতে যাই।

—কেমন আছেন শংকর?

—আরে, আসুন, আসুন। মা দেখে যাও, কে এসেছে!

মাসিমা তার মায়ের হাসিটি মুখে করে আসেন—দ্যাখো তো, শংকর কী কাণ্ডটা বাধাল!

শংকর অনেক কিছু বুঝত, জানত। অনেক বিষয়ই ছিল তার প্রিয়। তবু সবচেয়ে প্রিয় ছিল লেখার কথা।

বললাম—ভালো কবিতা লিখছেন এখন।

—ছেড়ে দিন ওসব কথা। অন্য সবার খবর কী?

অনর্গল তার কাছে নানা কথা বলা যেত। তার বিশ্বস্ততা ছিল খাঁটি সোনার মতো।

উনিশশো একষট্টি সালে আমরা দল বেঁধে জামসেদপুর যাই। শংকর যায়নি। কলকাতার বাইরে সে কদাচিৎ গেছে। নৈহাটি যেতে হলেও সে নার্ভাস হয়ে পড়ত। কিন্তু কলকাতা ছিল তার অনায়াস বিচরণের ক্ষেত্র।

বললাম—আর ড্রিংক করবেন না।

—ছেড়ে দিন।

—বিয়ে করছেন কবে?

—ছেড়ে দিন।

—আবার সুতৃপ্তির আড্ডায় আসুন। আপনি নাহলে জমে না।

—ছেড়ে দিন।

ছাড়তে-ছাড়তে অবশিষ্ট তার কী ছিল কে জানে! ক্রমে সে মায়ের আঁচলধরা হয়ে যাচ্ছিল ছেলেবেলার মতো। এমনভাবে 'মা' ডাকত যেন এক অবোধ শিশু পৃথিবীতে পথ হারিয়ে ফেলেছে। 'খুকু' বলে যখন বোনকে ডাকত মনে হত তার বোনটি বুঝি কোলের খুকি, কোথাও পড়ে টড়ে যাবে, কাঁদবে।

একদিন আচমকা শুনি দ্বিতীয় বজ্রের শব্দ—শংকর আবার হাসপাতালে।

অপেক্ষা করি আরোগ্য সংবাদের জন্য।

সংবাদ অবশেষে আসে। শংকর বাড়ি ফিরেছে। যাই।

—শংকর।

—আরে, আসুন, আসুন।

—এসব কী হচ্ছে?

—ছেড়ে দিন।

একবারও কখনও সে তার রোগযন্ত্রণার কথা বলেনি। এসব বলতে সে ভালোবাসত না। কতগুলো ব্যাপারে তার বিরাগ ছিল তীব্র। কমদামি সিগারেট, রুমাল, বাইরে যাওয়া। তেমনি নিজের ব্যাধির কথাও।

একদিন এল ছোট ভাইয়ের বিয়ের নিমন্ত্রণ করতে। সঙ্গে খুকু।

বললাম—ছোট ভাইয়ের বিয়ে! বড় ভাই বাকি রইল কেন?

—আহা, ছেড়ে দিন না ওসব কথা।

—আমার বউ বলল—না ছাড়াছাড়ির কথা নয়। এবার মত করে ফেলুন।

লাজুক মুখে বলল—সময় পার হয়ে গেছে।

সেই বিয়েতে বড় ধুম হয়েছিল। যেন এক সাহিত্যবাসর। শ'খানেক কবি-সহিত্যিকের হল্লা। শংকর বরকর্তার সাজে সেজে বেড়াচ্ছে। হাত ধরে, কাঁধ ধরে, আন্তরিক হর্ষধ্বনিতে

অভ্যাগতদের ধরে আনছে দরজার মুখ থেকে। চেঁচাচ্ছে—দ্যাখো, দ্যাখো, কে এসেছে।

তারপর আর একদিনও তার নিরালা দোতলার ঘরে বসে অনেকক্ষণ কত কথা বলেছি।

সে আমাকে আশ্বাস দিয়েছিল—হবে।

এক সন্ধেবেলা মেয়েকে নিয়ে রাসবিহারী অ্যাভনিউয়ের এক ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলাম। ভাবলাম, যাই শংকরকে দেখে আসি।

মাসিমা খুব খুশি হয়ে বলেন—এসো, এসো। শংকর তো অফিসের কাজে গৌহাটি গেছে।

—গৌহাটি! অবাক হই। শংকর কোথাও যেতে ভালোবাসত না যে।

মাসিমা বলেন—যেতে দিতেই হল বাবা। চাকরি। শংকরও খুব যেতে চেয়েছিল।

—কীসে গেল?

—প্লেনে।

মনটা দোল খায়। হার্টের রুগি।

মাসিমা মুখ দেখে বুঝে বললেন—শুনল না। কী করব বল!

—এবার ওর বিয়ে দিন মাসিমা। বয়স হল।

—তোমরা ওকে রাজি করাতে পারলে না তো! যা হোক বাবা, এবার এক পাত্রী ঠিক করেছি। মেয়েটির পোলিও হয়েছিল, পা একটু খোঁড়া, কিন্তু বড় ভালো মেয়ে তোমরা প্রার্থনা করো, যেন বিয়েটা দিতে পারি।

খুব খুশি হয়ে এলাম সেদিন।

বারবার একটা উড়োজাহাজের কথা মনে পড়ছিল। বারবার।

উড়োজাহাজ কি ভালো হার্টের রুগির পক্ষে? ভালো?

শংকর এখন গৌহাটির অফিসেই বুঝি স্থায়ীভাবে কাজ করছে। চিঠি দেয় না। সে আমাদের সংসর্গ ত্যাগ করেছে। আসে না। সে আমাদের মুখ দেখতে চায় না।

ভয় হয়, যদি আবার আমার জীবনে কখনও মৃত, নিষ্ফলা সময় আসে তখন কে এসে তার বিশাল কাঁধ দিয়ে ভার নেবে আমার। গম্ভীর কামানের গলায় বলবে—ঘাবড়াবেন না।

হবে।

খগেনবাবু

নলতাপুরের বাসে ভিড়ের মধে. হঠাৎ সামনের দিকে খগেনবাবুকে দেখতে পেল দিগম্বর। অন্তরাত্মা পর্যন্ত চমকে উঠল। নলতাপুরের বাসে খগেনবাবু কেন? ইদিকে তো ওনার আসার কথাই নয়। তবে কি এত বছর বাদে খবর হয়েছে।

মেয়েদের সিটে এঁটে বসে আছে জুঁইফুল। সংক্ষেপে জুঁই। জায়গা নিয়ে একটু আগে ক্যাটর ক্যাটর করে ঝগড়া করেছে অন্য সব মেয়েমানুষদের সঙ্গে। তারা বলছে, জায়গা নেই। জুঁই বলছে, ঢের জায়গা, চেপে বসলেই হয়। সেই কাজিয়ায় দিগম্বর নাক গলায়নি। জুঁইয়ের গলার জোরের ওপর তার অগাধ বিশ্বাস। পারেও বটে মেয়েটা। সিটে গায়ে গায়ে মেয়েমানুষ বসা, সর্ষে ছড়ালেও পড়বে না এমন অবস্থা। তার মধ্যেই ঠিক ঠেলে গুঁতিয়ে জায়গা করে বসেছে। খুব আরামে না হলেও বসেছে তো। এখন দিব্যি ঘাড় ঘুরিয়ে চলন্ত বাস থেকে বাইরের দৃশ্য দেখছে।

জুঁইয়ের মুখোমুখিই প্রথমে দাঁড়িয়ে ছিল দিগম্বর। প্রাইভেট বাস, কন্ডাক্টর ঠেলে লোক তোলে, যতক্ষণ না বাসের পেট ফাটো-ফাটো হয়। ফলে লোকের চাপে ঠেলা খেতে-খেতে অনেকটা সরে এসেছে সে। আরও সরত, সামনে এক বস্তা গাঁটি কচু থাকায় ঠেকে গেছে। এখান থেকে জুঁই মাত্র হাত তিনেক তফাতে। কিন্তু মাঝখানে বিস্তর কনুই, হাত, মাজা আর মাথার জঙ্গল থাকায় তিন হাতই এখন তিনশো হাত। আর বাসের মধ্যে চতুর্দিকে এমন গণ্ডগোল হচ্ছে যে, খুব চেঁচিয়ে না ডাকলে জুঁই শুনবেও না।

কিন্তু জানান দেওয়াটা একান্ত দরকার। একেবারে বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা দাঁড়াল কিনা ব্যাপারটা। আর কেউ নয়, স্বয়ং খগেনবাবুই বাসে সামনের দিকে।

একটু আগে জুঁই যখন চেঁচিয়ে ঝগড়া করছিল তখন তার গলা খগেনবাবুর কানে যায়নি তো! এতদিনে অবশ্য জুঁইয়ের গলার স্বর খগেনবাবুর ভুলে যাওয়ারই কথা। আর বাসের কে না চেঁচাচ্ছিল তখন? অত চেঁচামেচিতে কে কার গলা চিনবে!

সুবিধে এই যে, বাসে একেবারে গন্ধমাদন ভিড়। একটু আগেও দিগম্বর ভিড়ের জন্য কন্ডাক্টরকে দু কথা শুনিয়েছে, পয়সাটাই চিনলে, মানুষের সুখ দুঃখ বুঝলে না? আমাদের কি গরু ছাগল পেয়েছে, নাকি তামাকের বস্তা? এখন অবশ্য দিগম্বর মনে-মনে বলছে, ভিড় হোক, বাবা, বাসে আরও ভিড় হোক। গাড়ির পেট একেবারে দশমেসে হয়ে যাক।

খগেনবাবুকে দেখেই ঘাড়টা নামিয়ে ফেলেছে দিগম্বর। এখনও সেটা শোয়ানো অবস্থাতেই আছে। সুযোগ বুঝে পিছন থেকে কে যেন হাত ভেরে যাওয়ায় নিজের হাতব্যাগটা আলতো করে তার কাঁধে রেখেছে। অন্য সময় হলে খেঁকিয়ে উঠত, এখন কিছু বলল না। বরং ব্যাগটার আড়াল থাকায় একরকম স্বস্তি।

কিন্তু স্বস্তিটা বড় ঠুনকো। সানকিডাঙায় বেশ কিছু লোক নেমে যাবে, হত্তুকিগঞ্জে আজ হাটবার—সেখানে তো বাস একেবারে শুনশান হয়ে যাওয়ার কথা। তবে উঠবেও কিছু সেখান থেকে। কিন্তু তা ওঠানামার ফাঁকেই খগেনবাবু যে পিছনে তাকাবেন না এমন কথা হলফ করে কি বলা যায়। জুঁইকে একটু সাবধান করে দেওয়া দরকার। এদিকে তাকাচ্ছে না। নতুন-নতুন কারণে অকারণে তাকিয়ে থাকত। পুরোনো হওয়ায় এখন আর চোখেই পড়ে না।

ভেবে একটু অভিমান হচ্ছিল দিগম্বরের। এই যে সে ভালোমানুষের চাপে অষ্টাবক্র হয়ে গাঁটি কচুর বস্তায় ঠিক খেয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার জন্যে 'আহা, উহু,' করার আছে কে এই দুনিয়ায়?

কিন্তু অভিমানের সময় নেই। জানান দেওয়াটাই এখন ভীষণ দরকার। গলা তুলে ডাকতে পারছিল না দিগম্বর। খগেনবাবু শুনে ফেলবে। মাথায় একটা বুদ্ধি এল। জুঁইয়ের প্লাসটিকের চটি পরা একটা পা একটু এগিয়ে আছে। চেষ্টা করল পা বাড়িয়ে জুঁইয়ের পা-টা হয়তো ছোঁয়া যায়।

কিন্তু চেষ্টা করতে গিয়ে যেই পা তুলেছে অমনি হড়াস করে কচুর বস্তায় বসা লোকটার কোলসই হয়ে গেল দিগম্বর। লোকটা খুন হওয়ায় আগে যেমন মানুষষে চেঁচায় তেমনি চেঁচাতে থাকে, ওরে বাবারে! গেলাম! গেলাম!

দিগম্বর বুঝল, হয়ে গেছে। এই গোলমালে খগেনবাবু নিশ্চয়ই তাকাবে। সে মুখ তুলে ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বলল, চুপ! চুপ!

লোকটা কোঁকাতে-কোঁকাতেও তেজের সঙ্গে বলে, কেন চুপ করব? চুরি করেছি নাকি? কোথাকার ঢ্যামনা হে তুমি? ওপরের শিক ভালো করে ধরতে পারো না? ইত্যাদি আরও অনেক কথা।

কাঁকালে লেগেছিলে দিগম্বরের। গাঁটি কচু যে বাসের ছাদেই ওঠানো উচিত, বাসের ভিতরে নয়, সে কথাটা তুলতে পারত। কিন্তু খগেনবাবুর ভয়ে বলল না কিছু।

ভেবেছিল চেঁচামেচি শুনে সবাই তাকাবে। কিন্তু দাঁড়িয়ে উঠে বুঝল, চারদিকে হাটুরে গণ্ডগোলে ব্যাপারটা লোকে গ্রাহ্যই করেনি। জুঁইও আচ্ছা লোক বটে। সামনেই এতবড় কাণ্ড ঘটে গেল, একবার তাকাবে তো! তা নয়, জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে মাঠঘাট দেখছে।

বাস থামে। চলে। আবার থামে। দিগম্বরের দু-জোড়া চোখ থাকলে ভালো হত। তবু সাধ্যমতো সে খগেনবাবু আর জুঁইয়ের দিকে নজর রাখে। খগেনবাবুর কপালের বড় আঁচিলটা এখনও দিব্যি আছে। মাথার চুলে বাঁকা টেরি। গায়ে সেই একপেশে বোতামঘরওলা পাঞ্জাবি। জুঁই কালো রঙের মধ্যেই আরও ঢলঢলে হয়েছে। চোখ দুখানা আগের মতো চঞ্চল নয়। ধীরস্থির।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে দিগম্বর। পাপ কাজ করলে ধরা পড়ার ভয়ও থাকে বটে। কিন্তু এই হাওড়া জেলার নলতাপুরের বাসে খগেনবাবুর দেখা পাওয়ার কথাই নয়। পেট থেকে একটা ভয়ের ভুড়ভুড়ি গলায় উঠে আসায় দিগম্বর একটা ঢেঁকুর তুলল।

জুঁইয়ের মাথার ওপর দিকে কে একজন জানালায় ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছে! তার বগলটা জুঁইয়ের নাকের ডগায়। জুঁই দুর্গন্ধ পাওয়ার মতো নাক কুঁচকে মুখ তুলে বগলবাজকে কী যেন বলল। জয় মা! যদি এবার তাকায়!

তা তাকালও, কিন্তু ভিড়ের মধ্যে চিঁড়ে চ্যাপটা দিগম্বরকে চিনতে পারল বলে মনে হল না। আবার বাইরের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল। বগলবাজ ধমক খেয়ে তার বগল গুটিয়ে নিয়েছে। যত সব মেনিমুখো পুরুষ! বগলটা আর একটু রাখলে আবার তাকাত জুঁই।

সানকিডাঙা! সানকিডাঙা! দিগম্বরের পিলে চমকে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল কন্ডাক্টর।

বাস থেমেছে! হুড় হুড় করে লোক নামছে। দিগম্বর পাটাতনে উবু হয়ে বসে। সর্বনাশ! বাস খালি হয়ে যাবে নাকি! নেমেই যাচ্ছে যে!

উবু হওয়ায় জুঁইয়ের চটির ডগাটা হাতের কাছ পেয়ে গেল সে। ভিড়ও অনেক কমেছে। হাত বাড়িয়ে একবার নাড়ল। কচুওয়ালা বড়-বড় চোখে দৃশ্যটা দেখছিল। কিছু

বলতে মুখটা ফাঁকও করেছিল বোধহয়। কিন্তু তা দেখার অত সময় নেই দিগম্বরের।

জুঁই পা-টা পট করে টেনে নিয়েই সোজা তাকাল তার দিকে। বলল, ও কী গো?

এমন সুযোগ আর আসবে না। দিগম্বর একটু হামা টেনে মুখটা কাছে নিয়ে বলল, বাসের সুমুখ দিকে খগেনবাবু। তাকিয়ো না বোকার মতো। ঘোমটা টেনে মুখ ফিরিয়ে বোসো।

শুনে কেমনধারা ফ্যাকাশে মেরে গেল জুঁই। দুবার বলতে হল না। ফট করে ঘোমটা টেনে মুখ ঢাকা দিয়ে ফেলল।

সানকিডাঙায় নামল যত, উঠলও তত। আবার ঠাসা-চাপা গন্ধমাদন ভিড়। তবে দিগম্বর বসে ছিল, বসেই রইল। দু-একজন হাঁটুর গুঁতো দিয়ে অবশ্য দাঁড় করানোর চেষ্টা করছিল। বলল, দাঁড়াও! দাঁড়াও! বসলে জায়গা আটকে থাকে। দিগম্বর কাতর মুখ করে বলল, শরীর খারাপ। বড় বমি আসছে। শুনে লোকজন আর কিছু বলল না, বরং একটু যেন তফাতে চেপে থাকারই চেষ্টা করতে লাগল। কচুওয়ালা মহা ত্যাঁদড়! কিছু আঁচ করে মাঝে-মাঝে শেয়ালের মতো চাইছে। দিগম্বর তার দিকে চেয়ে দেঁতো হাসি হেসে বলল, হত্তুকিগঞ্জের হাটে যাচ্ছ নাকি? কচুওয়ালা দিগম্বরকে পাত্তা না দিয়ে অন্য দিকে চোখ ফিরিয়ে নেয়। ছোটলোক আর বলে কাকে!

বসে থেকে চারদিকে বাঁশবনের মতো লোকের পা দেখে দিগম্বর। পা দেখে কে কেমন লোক তা বোঝা যায় না। মুখ দেখে যায়। বেশির ভাগ পা-ই প্যান্ট ধুতি পায়জামা আর লুঙ্গিতে ঢাকা। এর ফাঁক-ফোঁকর দিয়ে অবশ্য জুঁইকে দেখতে পাচ্ছে দিগম্বর। কাণ্ড দেখ! জুঁই গলা টানা দিয়ে ঘোমটা ফাঁক করে সামনের দিকে চাইছে মাঝে-মাঝে। মেয়েমানুষ কোনওকালে কথা শুনবে না। হাঁ-হাঁ করে ওঠে দিগম্বর, কিন্তু তার কথা জুঁইয়ের কানে যায় না।

বসে আরও কষ্ট। হাঁটু ঝিনঝিন করে এত টাইট মেরে বসে থাকায়। চারদিকে পা, তার ঠেলাও কম নয়। কচুর গাঁটটায় এক হাতে ভর দিতে গিয়েছিল, কচুওয়ালা তেরিয়া হয়ে বলল, ভর দেবে না। কচু থেঁতলে যাবে। দিগম্বর ফোঁস করে ওঠে, আর তুমি যে বসেছ কচুর ওপর! কচুওয়ালা তার জবাব দিল, আমার কচু। আমি বসব তোমার তাতে কী যায় আসে?

বিপদে পড়লে সবাই মাথায় চড়ে। দিগম্বর আর কথা বাড়ায় না।

কখন যেন একটা মেয়েছেলে নেমে যাওয়ায় জুঁই একটু এগিয়ে এসে বসতে পেরেছে! এখন প্রায় দিগম্বরের মুখোমুখি। হঠাৎ ঘোমটায় ঢাকা মুখখানা নামিয়ে এনে বলল, কোথায়

দেখলে? আমি দেখতে পাচ্ছি না তো।

দিগম্বর দাঁত কিড়মিড় করে। আহা, দেখার জন্যে একেবারে আঁকুপাঁকু যে। দু-দুটো বউ পেরিয়েও মেয়েছেলেদের ব্যাপারটা আজও ধাঁধা লাগে দিগম্বরের। কী যে চায় তা ওরাই জানে।

সে চাপা ধমক দিয়ে বলল, আছে আছে। ঘোমটা টেনে চুপ মেরে বসে থাক। খবরদার তাকাবে না!

কচুওয়ালা সব শুনেছে। ভারী লজ্জা লাগে দিগম্বরের।

ভুল দ্যাখোনি তো! জুঁই বলে।

জলজ্যান্ত খগেনবাবু। ভিড় টপকে দেখবে কী করে? দাঁড়ালে দেখা যাবে।

একটু দাঁড়িয়ে দেখব?

আ মোলো? একজন বসা মেয়েমানুষের হাঁটুতে কপালটা ঠুকে গেল দিগম্বরের। বলল, পাগল হলে নাকি?

আহা আমার তো ঘোমটা আছে। দেখব?

মরবে বলছি, মরবে!

জুঁই আবার সোজা হয়ে বসে। দেখার চেষ্টা করে না ঠিকই। তবে বে-খেয়ালে ঘোমটা অনেক সরে গেছে।

হত্তুকির হাট! হত্তুকির হাট! কন্ডাক্টর গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে।

খগেনবাবু কোথায় নামবে তা জানা নেই। কাঁটা হয়ে থাকে দিগম্বর। চারদিকে পায়ের যে ঘন বাঁশবন ছিল তা এক লহমায় ফাঁকা-ফাঁকা হয়ে এল। হত্তুকির হাট জায়গাটা বড় ভয়ের। এখানেই সবচেয়ে বেশি লোক নামে। এমন কি কচুওয়ালা পর্যন্ত তার গাঁট কাঁধে তুলছে। সামনে একটা আড়াল ছিল। তাও গেল। গাঁট তুলতে-তুলতে কচুওয়ালা কটমট করে তাকাচ্ছে তার দিকে। কিছু লোক আছে কিছুতেই অন্য মানুষকে ভালো চোখে দেখে না।

দিগম্বর চোখ বুজে ভগবানকে বলছিল, খগেনবাবুর যেন এখানেই কাজ থাকে।

বেহায়া মেয়েছেলেটাকে দ্যাখো। ঘোমটা প্রায় খসে পড়েছে। মুখখানা উদোম খোলা। গলা টানা দিয়ে প্রায় দাঁড়িয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে দেখছে ড্যাবা ড্যাবা চোখে। লজ্জার

মাথা খেয়ে দিগম্বর জুঁইয়ের কাপড় ধরে টান দিল। চাপা গলায় বলল, বসে পড়ো। বসে পড়ো।

জুঁইয়ের জ্ঞান ফেরে। ঘোমটা টেনে মুখ ঢাকা দেয়। তারপর কুঁজো হয়ে দিগম্বরকে বলে, দেখেছি।

দিগম্বর কটমট করে তাকায়। বলে, উদ্ধার করেছ। তোমাকে দেখেছে?

না। এদিকে তাকাচ্ছে না। সঙ্গে কারা আছে মনে হল। তারা বসে আছে বলে দেখা গেল না। আবছা যেন মনে হয়, বউ মতো কেউ। তার সঙ্গে কথা বলছে আর সিগারেট খাচ্ছে। বলেই জুঁই আবার সোজা হয় এবং ফের অবাধ্য হয়ে সামনের দিকে টালুকটলুক চেয়ে থাকে।

বাসের মাথায় ধমাধম মাল চাপানোর শব্দ হচ্ছে। বিস্তর চেঁচামেচি। কাতারে লোক উঠছে ভিতরে। অনেক ধমক চমক অপমান সয়েও দিগম্বর বসেই থাকে। সামনে বাঁশগেড়ের খাল। পুরোনো পোল দু-বছর আগের বানে ভেসে গেছে। নতুন পোল তৈরি হচ্ছে সবে। ফলে বাস ওপারে যায় না। যাত্রীরা একটা বাঁশের সাঁকো পায়ে হেঁটে পেরিয়ে ওপাশে বাস ধরে। বাঁশগেড়েতে বাস থেকে নামলে কী হবে তাই ভাবে দিগম্বর, আর বিরক্ত চোখে জুঁইয়ের কাণ্ড দেখে! নতুন-নতুন যেমন তাকে অপলক চোখে দেখত, এখন ঠিক সেই চোখে সামনের দিকে চেয়ে খগেনবাবুকে দেখছে! মেয়েছেলেদের কি ভয়ভীতি নেই?

ভিড়টা আবার চেপে আসার পর বুকে আটকানো দম ছাড়ে দিগম্বর। জুঁই এখনও দেখছে। বিরক্তি কেটে এবারে একটু মায়া হল দিগম্বরের। জুঁইকে দোষ দেওয়া যায় না। একসময়ে তো খগেনবাবুরই বিয়ে করা বউ ছিল জুঁই। চার-পাঁচ বছর সুখে দুঃখে টানা ঘরও করেছে। তারপর না হয় পালিয়ে এসেছে দিগম্বরের সঙ্গে। তা বলে তো আর সব কিছুই ভুলে যাওয়া যায় না। দিগম্বরের সঙ্গে আছে মাত্র চার বছর, ভুলে যাওয়ার পক্ষে সময়টাও বেশি যায়নি। বাচ্চা কাচ্চা হয়নি ভাগ্যিস! হলে এতক্ষণে বোধহয় গিয়ে হামলে পড়ত।

জুঁই হঠাৎ আবার নীচু হল। বলল, সঙ্গের জন মেয়েছেলেই বটে, বুঝলে।

হোক না, দিগম্বর তেতো মুখে বলে।

মুখটা দেখতে পাচ্ছি না অবশ্য। নীল রঙের শাড়ি, জরির পাড়।

তোমাকে দেখেনি তো!

না। দুজনে খুব কথা হচ্ছে!

হোক। তুমি মুখ ঘুরিয়ে থাকো!

পান খেল এইমাত্র। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে পিক ফেলতে দেখলাম। মেয়েছেলেটাই পান দিল।

দিকগে। অত দেখো না, ধরা পড়ে যাবে।

জুঁই ভ্রূ কুঁচকে বলে, মেয়েছেলেটা কে বলো তো! বউ নাকি?

কে বলবে! তুমিও যা জান, আমিও তাই।

খুব বলত, আমি মরে গেলে নাকি আর বিয়ে করবে না।

আহা, তুমি তো আর মরে যাওনি!

মরার চেয়ে কম কী? মেয়েমানুষের কতরকম মরণ আছে, জানো?

জুঁই আবার সোজা হয়।

বাঁশগেড়ে এসে গেল বলে। বসে থেকেও বুঝতে পারে দিগম্বর। এইবার নামতে হবে। ভাবতে শরীর হিম হয়ে আসে। মাঝখানে শুধু পাথরগড়ে একটুখানি থামবে। তা সে পাথরগড়েই থামল বোধহয়। কারা যেন নামল সামনের দরজায়। এখানে বেশি লোক নামেও না, ওঠেও না। তাই নামবার তেমন হইচই নেই। তবু বোঝা গেল কারা যেন নামছে। খগেনবাবুই কি?

জুঁইয়ের শাড়ি ধরে আবার একটু টান মারে দিগম্বর। জুঁই নীচু হয়।

কী বলছ?

কারা নামল?

কী করে জানব? কত লোক নামছে উঠছে! কেন?

ওরা কি না?

জুঁই ফিক করে এই বিপদের সময়ে একটু হাসেও। বলে, না। কর্তা বসার জায়গা পেয়েছেন। এদিকে পিছন ফেরানো! ভয় নেই। মেয়েমানুষটাকে কিছুতেই দেখতে পাচ্ছি না।

দেখতে চাইছে কেন?

দেখি না কীরকম।

ভালোই হবে। খগেনবাবুর মেলা পয়সা। ভালো মেয়েছেলেই পাবে। তুমি তো খারাপ ছিলে না।

আমি তো কালো।

রংটাই কি সব?

জুঁই মুখ গোমড়া করে বলে, কর্তা অবশ্য কোনওদিন কালো বলেনি। বরং বলত, মাজা রংই আমার পছন্দ।

এদিকে কোথায় যাচ্ছে বলো তো। দিগম্বর জিগ্যেস করে।

কী জানি।

আত্মীয় স্বজন কেউ নেই তো।

না। তবে শ্বশুরবাড়ি হতে পারে।

দূর। এদিকে বিয়ে হলে সে খবর আমি ঠিক পেতাম।

জুঁইয়ের কথা বলায় মন নেই। আবার সোজা হয়ে বসে দেখছে। মাঝে-মাঝে দাঁড়িয়ে পড়ছে প্রায়।

এই করতে-করতে বাসটা থেমে এল। কন্ডাক্টর ছোকরা তেজি গলায় চেঁচাল বাঁশগেড়ে, বাঁশগেড়ে। বাস আর যাবে না।

ঘচাং করে বাসটা থামতেই হুড়ুম হুড়ুম লোক নামতে থাকে। জুঁই দাঁড়িয়ে পড়েছিল, দিগম্বর হাত ধরে টেনে বলল, দেখেশুনে! দেখেশুনে!

জুঁই হাঁ করে চাইল দিগম্বরের দিকে, যেন চিনতেই পারছে না। চেয়ে থেকে-থেকে হঠাৎ যেন চেতন হয়ে বলে উঠল, ফরসা। খুব ফরসা। বুঝলে!

কে?

বউটা।

হোক না। তাতে তোমার কী?

জুঁই মাথা নেড়ে বলে, কিছু না। বললাম আর কি!

সাবধানে মাথা তোলে দিগম্বর। ভিড়ের প্রথম চোটটা নেমে গেছে। ধীরে সুস্থে খগেনবাবু উঠল। ফরসা মেয়েছেলেটাও। খগেনবাবু মেয়েছেলেটার কোল থেকে একটা বছর খানেকের খোকাকে নিজের কোলে নিলে। বলল, সাবধানে নেমো।

জুঁই প্রায় চেঁচিয়েই বলে উঠল, খোকাটা দেখেছ! কী সুন্দর নাদুস-নুদুস।

আর একটু হলেই খগেনবাবু ফিরে তাকাত। ধুতির খুঁটটা সিটের কোণে আটকে যাওয়ায় সেটা ছাড়াচ্ছিল বলে তাকিয়েও তাকাল না। সেই ফাঁকে পিছদের দরজা দিয়ে জুঁইয়ের হাত ধরে টেনে নেমে পড়ে দিগম্বর। বাসের পিছনে আড়াল হয়ে দাঁড়িয়ে খিঁচিয়ে ওঠে, তোমার মতলবখানা কী বলো তো! বুদ্ধি-সুদ্ধি লোপ পেল নাকি?

জুঁই হাঁ করে দিগম্বরের দিকে তাকায়। মেঘলা আকাশের ফ্যাকাশে আলোয় ওর মুখখানা দেখায় যেন ঘোরের মধ্যে আছে। চিনতে পারছে না দিগম্বরকে। অনেকক্ষণ সময় নিয়ে চিনতে পারল যেন। বলল, বিয়েই করেছে তাহলে।

করবে না কেন? দুনিয়ায় কে কার জন্য বসে থাকে?

জুঁই মাথা নেড়ে ভালো মানুষের মতো বলে, সে অবশ্য ঠিক কথা।

দিগম্বর উঁকি দিয়ে দেখল বহু মানুষ বাঁশের সাঁকো পেরোতে লাইন দিয়েছে। ভিড়ে ভিড়াক্কার। তার মধ্যে খগেনবাবু বা সেই ফরসা মেয়েছেলেটাকে খুঁজে পাওয়া মুশকিল।

খানিকটা সময় ছাড় দিয়ে ধীরে ধীরে দিগম্বর আর জুঁই এগোয়। দেরি হয়ে গেছে। ওপারের বাসে আর বসার জায়গা পাবে না তারা। কিন্তু সে কথা কেউ ভাবছে না।

সাঁকোটা নড়বড় করে দোলে। মেলা লোকের পায়ের চাপে মড়মড় শব্দ উঠছে। কখন ভাঙে তার ঠিক নেই। খুব সাবধানে জুঁই আগে আগে, দিগম্বর তার পিছু পিছু সাঁকোতে ওঠে। নীচে ভরা বর্ষার খাল গোঁ-গোঁ করে বয়ে যাচ্ছে। স্রোতের টানে সাঁকো থরথর করে কাঁপে। সবটাই ভালোয় ভালোয় পেরিয়ে একেবারে জমিতে পা দেওয়ার মুখে জুঁইয়ের পা ফসকাল।

উরে বাবাঃ। বলে টাল্লা খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল সামনের দিকে, কিন্তু গায়ে গায়ে মেলাই লোক, পড়বে কোথায়। তাই পড়ল না জুঁই। একজনে পিঠে ধাক্কা খেয়ে সেই পিঠেই হাতের ভর দিয়ে সোজা হয়ে উঠল।

একটা খোকা কেঁদে উঠল, হঠাৎ। লোকটা মুখ ফিরিয়ে বিরক্ত গলায় বলল, দেখেশুনে চলবে তো মেয়ে! আর একটু হলেই ছেলেটা ছিটকে পড়ত।

জুঁই কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। দিগম্বরের বুক হিম হয়ে যায়। লোকটা খগেনবাবু। কোত্থেকে যে উদয় হল হঠাৎ।

দুজনেই দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকবে তার সাধ্য কী? সাঁকোর সরু মুখে ঠেলাঠেলি দৌড়াদৌড়ি। কে আগে যাবে। তাই দুজনকেই এগোতে হল।

সামনেই খগেনবাবু যাচ্ছে। কোলের খোকাটা চুপ করে চেয়ে দেখছে পিছন বাগে।

ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ে দিগম্বরের। চাপা স্বরে বলে, চিনতে পারেনি।

জুঁই ফিরে চায়। তেমনি ভ্যাবলা আনমনা মুখ। চোখের দৃষ্টিতে যেন সর পড়ছে। কিছু দেখছে না যেন।

কিছু বলছ?

বললাম, কপালটা ভালো। আমাদের চিনতে পারেনি।

বউটাকে দেখলে ভালো করে?

ও আর দেখব কী? রংটাই যা ফরসা।

জুঁই মাথা নাড়ে, না মুখটাও সুন্দর।

থ্যাবড়া মুখ। তোমার মতো বড়-বড় চোখ নয়।

তুমি তো ভয়ে চামচিকে হয়ে আছ, দেখলে কখন?

দেখেছি।

ছাই দেখেছে। বউটা সুন্দরীই।

আমার চোখে লাগল না।

জুঁই হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে, ওমা। দ্যাখো ওরা মাঠের মধ্যে নেমে যাচ্ছে।

দুজনেই দাঁড়িয়ে যায়। কাঁচা সরু রাস্তায় লোকের ঠেলাঠেলি। বাসটা সামনেই দক্ষিণমুখো দাঁড়িয়ে। তার গায়ে লোকে গিয়ে পিঁপড়ের মতো জমাট বাঁধছে।

পথ ছেড়ে দুজনে ঘাস জমিতে সরে দাঁড়ায়। দেখে খগেনবাবু কোলে বাচ্চা আর পিছনে বউ নিয়ে মাঠের পথে ধরে পুবমুখো যাচ্ছে।

দিগম্বর বলল, এ জায়গা হল দীঘরে। পুবে গামছাডোবা। গামছাডোবাতেই যাচ্ছে তাহলে।

জুঁই তেমনি আচ্ছন্ন ঘোর ঘোর চোখে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ আস্তে করে বলল, বেশ দেখাচ্ছে না?

বউ বাচ্চা নিয়ে খগেনবাবু মেঘলা আকাশের নীচে মাঠ পেরিয়ে গামছাডোবায় যাচ্ছে তাতে সুন্দর দেখানোর কী আছে বোঝে না দিগম্বর।

দেরি করলে চলবে না। বাস ছাড়বে এখুনি। নলতাপুরে জুঁইয়ের দেড় বছরের মেয়েটা বড় বউয়ের জিম্মায় আছে। বড় বউ আবার বেশিক্ষণ বাচ্চা রাখতে হলে চেঁচামেচি করে। তার নিজেরই তিনটে।

দিগম্বর তাড়া দেয়, চলো চলো। দেরি হচ্ছে।

আঃ, দাঁড়াও না।

দাঁড়াব! বলো কী? এরপর সেই সাড়ে সাতটায় লাস্ট বাস।

হোকগে।

তার মানে?

জুঁই কথাটা শুনতে পায় না। সামনে আদিগন্ত খোলা হা-হা করা মাঠে মেঘলা আলোর মধ্যে খগেনবাবু অনেকটা এগিয়ে গেছে। সাবধানে আল পেরোচ্ছে। বউয়ের হাতে একটা চামড়ার ছোট স্যুটকেস।

কন্ডাক্টর হাঁকাহাঁকি করছে জোর গলায়, নলতাপুর...নলতাপুর...চরণগঙ্গা।

দিগম্বর চেয়ে দেখে, বাসের বাইরে আর লোক পড়ে নেই। যে যেখানে পেরেছে উঠে পড়েছে। ছাদে পর্যন্ত।

জুঁইফুল! কী হচ্ছে শুনি। দিগম্বর একটু আদর মিশিয়ে ডাকে।

জুঁই-জবাব দেয় না। তবে বড়-বড় চোখে তাকায়। এরকম তাকানো কোনও কালে দ্যাখেনি দিগম্বর। আজই কেমনধারা একটু অন্যরকম দেখছে। ভূতে পেলে বোধহয় এমন হয়।

কিছু বলছ? আবার জিগ্যেস করে জুঁই। কিন্তু জবাব শোনার আগেই আবার মাঠের দিকে চেয়ে দেখে। ফিসফিস করে বলে, সত্যি বলছ চিনতে পারেনি?

বরাতজোর আর কাকে বলে। চিনলে রক্ষে ছিল না। একসময়ে তো খগেনবাবুর চামচাগিরি করতাম।

কিন্তু চিনল না কেন বলো তো।

ভুলে গেছে। মুখটা ভুলে গেছে।

তা কি হয়! আমি তো ভুলিনি। তবে কর্তা ভোলে কী করে?

দেখেনি ভালো করে।

ধমকাল কিন্তু। মেয়ে বলে ডাকল।

শুনেছি তো।

এত কাছে থেকে দেখেও না চেনারা কথা তো নয়।

তুমিই বা বেছে-বেছে ওর ঘাড়ে পড়তে গেলে কেন?

সে কি ইচ্ছে করে? পড়লাম, উঠে বুঝলাম একেবারে কর্তার পিঠের ওপর...ওঃ, গায়ের রোঁয়া দাঁড়িয়ে যাচ্ছে দ্যাখো! কতকাল পর...

কী কতকাল পর?

সে তুমি বুঝবে না। কিন্তু এই বলে দিচ্ছি তোমায় মেয়েমানুষটা যত ফরসাই হোক, কর্তার চোখে ও রং ধরবে না।

তাই বা বলছ কী করে?

বলছি, জানি বলেই। কর্তার পছন্দ মাজা রং।

বিরক্ত হয়ে দিগম্বর বলে, না হয় তাই হল। এবার চলো না। বাস ভেঁপু দিচ্ছে। কন্ডাক্টর ওই হাতছানি দিয়ে ডাকতে লেগেছে, দ্যাখো চেয়ে।

দাঁড়াও না। এ বাসটা ছেড়ে দাও। পরের বাসে যাব।

উরে ব্বাস! বলো কী। সাড়ে সাতটা পর্যন্ত থাকব কোথায়? জল এলে দীঘরেতে মাথা বাঁচানোর জায়গা নেই!

আমি এখন যাব না। দেখব।

কী দেখবে?

ওরা কতদূর যায়। একদম মিলিয়ে গেলে তবে যাব।

কিন্তু বাস যে—

তাহলে তুমি একা যাও। আমি একটু দেখি।

বাস তাদের আশা ছেড়ে দিয়ে অবশেষে ছাড়ে। দিগম্বর অবশ্য যায় না। একটা হাই তুলে গাছতলায় গিয়ে বসে বিড়ি ধরায়।

জুঁই মেঘলা আলোয় মাঠের দিকে তেমনি চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

খেলা

খুব ভোরে ইনডোর সুইমিং পুলের ধারে তিনি এসে দাঁড়ালেন, মুখে হাসি নেই, গাম্ভীর্যও নয়, একটু চিন্তিত বোধহয়, প্যান্টের দু-পকেটে হাত, কাঁধটা একটু উঁচুতে তোলা, দু-পা পরস্পরের সঙ্গে কাটাকুটি করা, গায়ে সাদাকালো একটা ব্যানলনের গেঞ্জি। নিথর জলে তাঁর ছায়া পড়েছে। একটু ঝুঁকলেই নিজের ছায়া তিনি দেখতে পারেন। কিন্তু গত বিশ-বাইশ বছর ধরে তিনি পৃথিবীর হাজারও পত্রপত্রিকায়, পোস্টারে, চলচ্চিত্রে বা টেলিভিশনে নিজের এত ছবি দেখছেন যে নিজের ছায়া বা প্রতিবিম্ব দেখতে তাঁর আর কোনও ইচ্ছেই হয় না। সারাটা জীবন তাঁকে তাড়া করছে হাজারও ক্যামেরা, ফ্ল্যাশ লাইট, হাজারও সাক্ষাৎকার, লক্ষ-লক্ষ লোকের জয়ধ্বনি, স্তুতি ও ভালোবাসা।

এই হোটেলটা কতদূর ভালো তা তিনি বলতে পারেন না। এই শহরটাই বা কীরকম তাও তাঁর জানা নেই। গতকাল গভীর রাতে তিনি এই শহরে নেমেছেন বিমান থেকে। বিমানবন্দরে অত রাতেও অগুন্তি লোক অপেক্ষা করছিল। গভীর জয়ধ্বনি সমুদ্র গর্জনের মতো রোল তুলল তিনি বিমান থেকে বেরোতে-না-বেরোতেই। তিনি মানুষ দেখে-দেখে ক্লান্ত—একথা বলা যায় না। তবে মানুষ কি তাঁকে দেখে-দেখে ক্লান্ত হয় না কখনও? জয়ধ্বনি তাঁর আজকাল একইরকম লাগে, যদিও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষ বিভিন্ন ভাষায় তাঁকে স্বাগত জানায়। তবু ধ্বনি কিন্তু প্রায় এক।

শহরটা তিনি দেখতে পেলেন না। দেখার ইচ্ছেও ছিল না। লাক্সারি বাসে তাঁর টিমসহ যখন তাঁকে তোলা হয় তখনও সাংবাদিকরা কাছে ঘেঁষার চেষ্টা করেছে। তাঁর দেহরক্ষী কাউকেই কাছে ঘেঁষতে দেয়নি বটে, তবু ওর মধ্যেই এক আধজন যেন কী কৌশলে ঢুকে

পড়েছিল। তাদেরই একজন পাশ থেকে ভয়ে-ভয়ে চুরি করে তাঁকে দুটো চারটে কথা বলতে অনুরোধ করে। তাঁর বড় মুশকিল, তিনি কাউকেই প্রত্যাখ্যান করতে পারেন না। দেহরক্ষী তেড়ে এসেছিল, তিনি করতলের মুদ্রায় তাকে নিরস্ত করে ছদ্মবেশী সাংবাদিকের সঙ্গে কথা বলেছিলেন।

তাঁর সম্পর্কে আর কী জানার থাকতে পারে লোকের? এই ভেবে তিনি আজকাল অবাক হন। তাঁর নিজের আত্মজীবনী ছাড়াও কয়েক ডজন বই লেখা হয়েছে তাঁর ওপর। প্রতিটি বই পৃথিবীর সব প্রধান ভাষায় লাখ লাখ বিকিয়েছে। তাঁর সব ক্রীড়াকৌশল দেখানো হয়েছে বারংবার সিনেমায়, টিভিতে, স্থিরচিত্রে। তবে মানুষ আর কী জানতে চায়। মাত্র সাঁইত্রিশ বছর বয়েসের এ জীবনে তাঁর আর কোন গুপ্ত সংবাদ থাকবে যা লোকে জানে না? তিনি যখন যা বলেন তা তৎক্ষণাৎ টেপ করা হয়, নয়তো তুলে নেওয়া হয় শর্টহ্যান্ডে, তিনি যখন যা বলেন তাই প্রচারিত হয়ে যায় সাধারণ্যে।

আজ এই খুব ভোরে তিনি কিছুটা অনিশ্চয় একা। একা হওয়ার অভ্যাস তাঁর নেই-ই প্রায়। অবশ্য একা বলতে ঠিক যা বোঝায় তা তিনি কখনওই হতে পারেন না। তাঁর দেহরক্ষী ছায়ার মতো পিছু নেয়। তাঁর দু-পকেটে দুটো রিভলভার, মজবুত ও সতর্ক ওই প্রহরীটি তার কর্তব্য পালন করার জন্য কারও অনুমতির অপেক্ষা রাখে না। তাঁরও নয়। কারণ, এই রক্ষীকে নিয়োগ করেছে একটি বিমা কোম্পানি—যে কোম্পানিতে তিনি কয়েক মিলিয়ন ডলারে বিমাবদ্ধ রয়েছেন।

কোনওদিনই ঘুম থেকে উঠে আবার ঘুমোতে যাওয়া পর্যন্ত দীর্ঘ সময়ে নিজেকে তিনি কখনও মুক্ত মানুষ বলে অনুভব করতে পারেন না। তিনি যা বলেন, যা করেন তা সব সময়েই গোচরে বা অগোচরে মানুষ লক্ষ করে। তাই যতক্ষণ জেগে থাকেন তিনি, ততক্ষণ তাঁকে সচেতন থাকতে হয়। নিজের মতো থাকা তাঁর আর হয়ে ওঠে না।

আজ এই ভোরে ইনডোর সুইমিং পুলের ধারে দাঁড়িয়ে তিনি তাঁর জীবনের নানা বেড়াজালের কথা ভাবছিলেন। কিংবা তাও নয়। তাঁর হয়তো ইচ্ছে করছিল, একা একটু রাস্তায় বেরিয়ে পড়তে। একা ঘুরে-ঘুরে এ শহরটা একটু দেখে আসতে। কিন্তু তা হওয়ার নয়। কাল রাত থেকে হোটেলের বাইরে হাজার হাজার মানুষ চাপ বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের ঘুম নেই, বিশ্রাম নেই, ক্লান্তি নেই। ওরা একবার তাঁকে দেখতে চায়। বেরোলেই ওই অতি উৎসাহীরা ঘিরে ধরবে, ছোঁবে, ছাপবে, তারপর আদরের উন্মাদনায় শ্বাসরোধ করে ফেলবে তাঁর।

তিনি জানেন, তাঁর কোনও শত্রু নেই। কিন্তু জনপ্রিয়তাই যে কতবড় শত্রু তা তিনি আজ বুঝে গেছেন।

কাল রাতে তাঁর ভালো ঘুম হয়নি। ঘুমহীনতায় কোনও রোগ নেই, উদ্বেগ নেই, দুশ্চিন্তাও নেই। তবু তাঁর ঘুম সহজে আসে না।

নিঃশব্দে স্ত্রীর ঘুম না ভাঙিয়ে তিনি উঠেছেন, কফি খেয়েছেন একা, বেরিয়ে এসেছেন ঘর থেকে। তিনি যেদিকে আছেন হোটেলের সেদিকটা সম্পূর্ণ আলাদা করে দেওয়া হয়েছে। কোনও অনভিপ্রেত লোকজন আসতে পারে না এদিকে। নিরাপত্তা প্রায় নিশ্চিন্ত।

তত ভোরে সুইমিং পুলের ধারে কেউই নেই। কিন্তু কে জানে, কোনও গুপ্ত জানালা থেকে, কোনও ফাঁক ফোঁকর দিয়ে, কোনও দূর অলিন্দ বা কক্ষ থেকে এই বিশাল হোটেলের কেউ না কেউ তাঁকে দূরবিণ দিয়ে দেখছে না, বা টেলি লেন্সে ফটো তুলছে না? আসলে ওই সন্দেহটাই নিশ্চিত সত্য। কেউ না কেউ সব সময়েই তাঁকে দেখছে। এ পৃথিবীর কোটি কোটি লোক তাঁর অচেনা, কিন্তু তাঁকে চেনে পৃথিবীর প্রায় সবাই। এইটেই সবচেয়ে জটিল ঘটনা।

সুইমিং পুলটা দুবার প্রদক্ষিণ করলেন তিনি। তারপর ভোরের প্রথম জাগ্রত মানুষটির দেখা মিলল।

লোকটা লম্বাটে, এশীয় ড্রেসিং গাউন পরা অবস্থায় একটা পাইপ কামড়ে পকেটে দেশলাই বা লাইটার খুঁজতে-খুঁজতে খুবই উদভ্রান্ত অন্যমনস্কতায় চত্বরে বোধহয় এসেছিল। তাঁর দিকে একবার দৃষ্টিক্ষেপ করেই অবহেলা ভরে চোখ সরিয়ে নিল। লাইটার বের করে পাইপ ধরিয়ে আবার একবার চাইল। তারপরই কেমন হতভম্ব আর ফ্রিজ হয়ে চেয়ে রইল তাঁর দিকে।

ধূমপান তিনি পছন্দ করেন না। নাকটা একটু কুঁচকে নিলেন। আর লোকটার ওই হতভম্ব ভাবটা তিনি একটুও উপভোগ করলেন না। বরং ভারী সঙ্কোচ হল তাঁর। অপ্রত্যাশিত তাঁর দেখা পেলে লোকে কেন ভূত দেখে?

যে সৌভাগ্য লোকটা সারাজীবনও কল্পনা করতে পারেনি তিনি আজ ভোরে লোকটার জীবনে সেই সৌভাগ্যের কারণ ঘটলেন। একটু হেসে তিনি বললেন—গুড মর্নিং।

লোকটা তোতলাতে লাগল। সম্পূর্ণ বিকারগ্রস্তের মতো বলতে লাগল—মাই গড!...ইউ...ইউ আর...ওঃ, গুড মর্নিং...গুড মর্নিং! গুড মর্নিং...!

তিনি স্মিত হাস্যে লোকটাকে আনন্দের ঝর্নাধারায় ধুইয়ে দিয়ে মুখ ফিরিয়ে আবার আস্তে-আস্তে হাঁটতে থাকেন।

লোকটা জানে যে তিনি ধূমপান পছন্দ করেন না। পৃথিবীর সব মানুষই তাঁর পছন্দ অপছন্দের কথা জেনে গেছে। পাইপ নিভিয়ে অত্যন্ত সংকোচের সঙ্গে পিছু-পিছু হাঁটতে-হাঁটতে বলল—আপনার সঙ্গে যে আমার দেখা হয়েছিল একথা তো কেউ বিশ্বাস করবে না! আপনি কি দয়া করে আমাকে একটু স্মারক দেবেন না? ছোট স্বাক্ষর একটি?

তিনি মুখ ফিরিয়ে মৃদু হাস্যে বললেন—এই সাক্ষাৎকার কি আপনার পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ?

—বোধহয় আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ঘটনা।

—কেন?

—আমি এক সম্রাটের সাক্ষাৎ পেয়েছি যিনি ক্রীড়াজগতে গত বিশ বছর তাঁর অপ্রাকৃত জাদুবিদ্যা দেখিয়েছেন, যাঁর মতো কেউ কখনও জন্মায়নি, আগামী একশো বছরে কেউ জন্মাবেও না।

তিনি বললেন—মানুষের সাধ্য যা নয় আমি তা কী করে করতে পারি? আমি যা করেছি তা মানুষের সাধ্যায়ত্ত নিশ্চয়ই। আর জাদুবিদ্যা আমি কিছুই জানি না, সারাজীবন আমাকে কঠোর অনুশীলন করতে হয়েছে।

—এ সবই আমরা জানি। কিন্তু তবু আপনি অলীকতার সীমারেখা ছুঁয়েছেন। বিশ্বকাপের এক ফাইনালে দেখেছি আপনার ভৌতিক ড্রিবলিং। সে যে না দেখেছে...

খুবই ক্লান্ত লাগে তাঁর। হয়তো এরা ঠিকই বলে। তাঁর মধ্যে কিছু একটা আছে। ধাঁধার মতো, রহস্যের মতো, অলৌকিকত্বের মতো। তিনি নিজে কোনওদিনই তা টের পাননি। কিন্তু অন্যেরা বলে যেসব কৌশলে আর পাঁচজন বড় খেলোয়াড় খেলে তাঁর নিজের কৌশল তার চেয়ে আলাদা কিছু নয়। কিন্তু প্রয়োজনের ক্ষেত্রে হয়তো তিনি বেশি ত্রুটিহীন। আর সেটাই হাজারও লোক মিরাকল বলে মনে করে। তিনি বললেন—আমি যা করি তা সবই চেষ্টার দ্বারা।

বলতে-বলতে তিনি চোখের কোণ দিয়ে লক্ষও করলেন, তাঁর দেহরক্ষী অধৈর্য হয়ে পড়ছে, এগিয়ে আসতে চাইছে। উটকো এই লোকটা যদি কোনও বেতাল নড়াচড়া করে তবে তাঁর দেহরক্ষী ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে।

তিনি তাই তাড়াতাড়ি বললেন—আপনি অটোগ্রাফ চাইছিলেন না?

—হ্যাঁ। হ্যাঁ। বলে লোকটা একটা দশ টাকার নোট বের করে পকেট থেকে। একটা ডটপেনও।

তিনি দশ টাকার নোটটা নিয়ে পকেটে ভরে নিশ্চিন্তে হাঁটতে লাগলেন। এ রকম মজা তিনি প্রায়ই করেন। লোকটা চোরের মতো পিছু-পিছু আসছে আর মাঝে-মাঝে হেঁ-হেঁ শব্দ করছে।

তিনি ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন—টাকাটার জন্য ধন্যবাদ। এটা দিয়ে আমার বাল বাচ্চার জন্য কিছু কিনে নিয়ে যাব।

লোকটা হাত কচলে বলে—সম্রাট, আপনাকে আমার কিছুই দেওয়ার থাকতে পারে না। আমি কী দেব আপনাকে? দয়া করে আমাকে লজ্জা দেবেন না।

তিনি হাসলেন। তোলা হাঁটুতে নোটটা রেখে ডটপেন দিয়ে বারো অক্ষরের নাম সই করে দিলেন অভ্যস্ত দ্রুত বেগে।

তারপর সামান্য ক্লান্তি ও গরম বোধ করে ফিরে এলেন ঘরে। স্ত্রী এমন চমৎকারভাবে সেজেছেন। অপেক্ষা করছেন প্রাতঃরাশের জন্য। তিনি স্ত্রীকে একটু চুমু খেলেন। স্ত্রী উজ্জ্বল মুখ করে তাকালেন তাঁর দিকে। সেই চোখের দৃষ্টিতে সুগভীর তৃপ্তি ও অহংকার তাঁর স্বামীকে নিয়ে।

স্ত্রী বললেন—ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে এত খেলার ধকল এবার সত্যিই শেষ হচ্ছে।

তিনি বিছানায় শুয়ে থেকে বললেন—হ্যাঁ। আজ আমার শেষ খেলার আগের খেলাটি।

—তুমি কি নামবে মাঠে?

—নিশ্চয়ই?

—খুব সাবধান। এদের মাঠ ভালো নয় শুনেছি।

তিনি হাসলেন। বললেন—আমিও শুনেছি। তুমি কিন্তু অকারণে দুশ্চিন্তা কোরো না। এটা আর একটা খেলা মাত্র। খেলাই, তার চেয়ে বেশি কিছু নয়। যুদ্ধে সৈন্যরা এর চেয়ে অনেক শক্ত কাজ করে।

প্রাতঃরাশের পর তিনি ঘুমোলেন।

বেশিক্ষণ নয়। একটু বাদেই দরজায় টোকার শব্দ। বিশিষ্ট লোকরা আসছেন। ফোনে খবর নিচ্ছেন। অন্য সব খেলোয়াড়রা দেখা করতে চাইছে। আসছে সাংবাদিক, ফোটোগ্রাফার, টি ভি বা রেডিওর লোক, আসছে ম্যাসাজ করতে মেসেউয়ার।

তাঁর স্ত্রী বহুক্ষণ এই ভিড় ঠেকিয়ে রাখলেন, আর ভিড় ঠেকাল তাঁর মজবুত দেহরক্ষী। তবু এক সময়ে তাঁকে উঠতে হয়। হাসতে হয়। কথা বলতে হয়।

দুপুর গড়াতে না গড়াতে খেলা-পাগল এক শহর ভেঙে পড়ে স্টেডিয়ামে। কী গভীর আনন্দের চিৎকারে ভরে ওঠে পরিমণ্ডল।

তিনি মাঠে নামেন এগারো জনের সঙ্গে। সবই অভ্যস্ত তাঁর। সেই জয়ধ্বনি, ক্যামেরা, ভিড়।

তারপর সব সরে যায়। হঠাৎ দেখেন, তিনি স্বক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে আছেন। দাবার ঘুঁটির মতো সাজানো বাইশজন খেলোয়াড় দুদিকে। মাঝখানে সেই ফুটবল। পৃথিবীর মতো গোল। এই বল তাঁকে সব দিয়েছে যা হয়তো সবটাই পাওনা ছিল না।

শরীরে এতটুকু ক্লান্তি বা অসুস্থতা ছিল না। মাঠ যথেষ্ট ভালো না হলেও কিছুটা খেলা যায়। চারদিকের আকুল চোখগুলি তাঁর দিকেই চেয়ে আছে তিনি জানেন। সমস্ত ক্যামেরার লেন্স তাঁরই দিকে নিবদ্ধ তিনি জানেন। সমস্ত ভাষ্যকার কণ্ঠ বারংবার তাঁরই নাম উচ্চারণ করছে—তিনি জানেন। তাঁর সমস্ত চলাফেরা, ছোটা, বল ধরা বা মারা এ সবগুলিই বারংবার দেখানো হবে, বর্ণিত হবে, ব্যাখ্যা করা হবে। মাঠের বাইশজনের মধ্যে বাদ বাকি একুশজনের কোনও গুরুত্বই নেই এই হাজার লক্ষ কোটি মানুষের কাছে।

এত দিয়েছি তোমাদের—তবু কেন চাও? এবার চোখ ফিরিয়ে নাও আমার দিক থেকে। ফিরিয়ে নাও। আমি যে কখনও নিজমনে থাকতে পারি না।—এই কথা তিনি মনে-মনে বললেন।

চেষ্টাহীন রইলেন সারাক্ষণ। ছুটলেন না, উদ্যোগ করলেন না, বল কেউ কেড়ে নিতে এলে সহজেই ছেড়ে দিলেন। জানেন, তিনি চেষ্টা করলে কিছুতেই ওরা কেড়ে নিতে পারবে না। জানেন, তিনি যদি বল পায়ে ছোটেন তবে এরা বৃক্ষরাজির মতো স্থির হয়ে যাবে। তিনি অনায়াসে গোলরক্ষককে ঠেকিয়ে বল পাঠাতে পারেন জালে। কিন্তু কেন তা করবেন তিনি? আরও হাজার লক্ষ কোটি চোখকে নিজের ওপর টেনে আনতে? আরও অনির্জন, একাকিত্বহীনতাকে বরণ করবেন? ভক্তের মৃগয়া কি এক সময়ে শেষ করা উচিত নয়? ওরা ভাবুক তিনি জাদুকর নন, স্বাভাবিক ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষ মাত্র।

খেলা শেষ হল। ড্র। তিনি বুঝলেন, তাঁর দল ম্লানতার ছায়ায় ফিরে যাচ্ছে ড্রেসিং রুমে। সবাই বলছে—উনি আজ খেলতে পারেননি।

তিনি হাসলেন আপনমনে। আজ একরকম আনন্দ হয় তাঁর। আনন্দটা নিখাদ নয়। একটু বিষাদের বিষ তাতে মিশে থাকে।

পরদিন রাতে সুদূর স্বদেশের দিকে ধাবমান বিমানে বসে ঘুমোচ্ছিলেন। ঘুমের মাঝখানে অকারণে জেগে উঠলেন একবার। কেন জাগলেন তা বুঝতে পারছিলেন না।

কিন্তু জাগলেন। মনে হল, খুবই ক্ষীণ একটা বাঁশির আওয়াজ যেন ঘুমঘোরে শুনেছেন তিনি। কোনও নিয়মভঙ্গের জন্য রেফারি যেমন বাঁশি বাজায়।

তিনি একটু অপ্রস্তুত হয়ে চারদিকে চাইলেন। সবাই ঘুমে। বাইরে নীল রাত্রির আকাশ তীর বেগে উঠে যাচ্ছে।

নিয়ম ভঙ্গ ঘটল নাকি কিছু? কখন? কোথায়? তিনি ভাবলেন, খুঁজলেন মনে-মনে। তাঁর সারামুখে, শরীরের অজস্র শুকিয়ে যাওয়া ক্ষতের বন্ধুরতা। ডান গালে একটি প্রিয় ক্ষত চিহ্নে তিনি প্রায়ই আঙুল বুলিয়ে নেন। এখনও নিলেন, কিছু মনে পড়ল না।

আবার ঘুমোতে চেষ্টা করলেন তিনি। হেলানো সিটে মাথা এলিয়ে চোখ বুঝলেন। খুব স্বস্তি পেলেন না। তাঁর ভিতর থেকে কে যেন বলছে—ঠিকই শুনেছিলে। বাঁশি বেজেছিল।

এবার তিনি মৃদু হাসলেন। মাথা নাড়ালেন আপন মনে। জানেন, তিনি জানেন। নিয়মভঙ্গের জন্য কোথাও কে যেন বাঁশি বাজিয়েছে। ঠিক কখন নিয়মভঙ্গ ঘটেছে তা তিনি জানেন না। ফাউল? না হ্যান্ডবল? অফসাইড নয় তো?

না এসব নয়। তিনি তা জানেন। খেলার মাঠটা আর ছোট থাকছে না। বড্ড ছড়িয়ে পড়ছে এবার। বিশাল তার পরিধি। সারা পৃথিবীময় আকাশময়, খেলাও এবার কত বিচিত্র! কত নিয়ম, কত অনিয়ম! অলীক রেফারি তাঁকে জানিয়ে দিচ্ছে, সতর্ক করছে।

প্রসন্ন মনে তিনি মাথা নাড়লেন।

বৃষ্টিতে নিশিকান্ত

কেচ্ছাকেলেঙ্কারির মতো বৃষ্টি হচ্ছে কদিন। জলের ফোঁটা লক্ষ অর্বুদ গুডুলের মতো ছুটে আসে আকাশ থেকে, মাটি ফুঁড়ে বসে যায় ভিতরে। গায়ে লাগলে ফটাস করে ফাটে। ব্যথা পায় নিশিকান্ত। আদিঅন্ত সাদা হয়ে আছে, শীতের কুয়াশার মতো, কিছু নজর চলে না। আর সেই সাদাটে ভাবের আবডালে কী যে লণ্ডভণ্ড কাণ্ড হচ্ছে কে জানে! উলটে পালটে যাচ্ছে জগৎসংসার। সেই কেচ্ছাকেলেঙ্কারির কথাই বৃষ্টির শব্দে ছড়িয়ে যাচ্ছে, ফিস ফাস গুজুর গুজুর। ওই বৃষ্টির আবডালে আবার জগৎসংসার যে থেমে আছে এমনও নয়। বেলপুকুরের বাজারে মহেন্দ্রর দর্জির দোকানে মেশিন চলছে খরখর শব্দে। মুদির দোকানে দু-চারজন কাকভেজা লোক সওদা করছে। আলু পেঁয়াজ নিয়ে ভূপেন বসেছে ভূষিওয়ালার বারান্দায়। দোকান সব একটু আধটু ফাঁক করে কাজকর্ম চলছে ঠিকই। কিন্তু সেটা বোঝা যায় না। বৃষ্টির রকম দেখে মনে হয় মানুষজন বুঝি ভাসিয়ে নিয়ে গেছে সব। দুনিয়ায় আর মানুষ মাটির চিহ্ন রাখবে না।

বাগনানের বাস কখন বন্ধ হয়ে যায় কে জানে। এখনও চলছে। নিশিকান্ত অন্ধকার বিকেলবেলায় বেলপুকুরে নেমে পড়ে বাস থেকে। গায়ে ফতুয়া, পরনের ধুতিখানা উরুত পর্যন্ত তোলা। ছাতাখানা বগলদাবা করেই নামে। এই বাতাস বৃষ্টিতে ছাতা খুলতে ভয় করে তার। ফটাস করে উলটে গিয়ে পুরোনো ছাতার শিকটা ছরকুটে যাবে। অবশ্য ছাতা খুলতে তাকে কখনও দেখেওনি কেউ।

রাস্তাঘাট কিছু দেখা যায় না। ঝুপুস করে জলে পা দেয় নিশিকান্ত। দোলের দিনে যেমন ছোঁড়ারা রঙের বেলুন ছুড়ে মারে আর সেটা ফটাস করে ফাটে, তেমনি

আকাশঠাকুর ছুড়ছে তার বিদঘুটে বেলুন সব। নিশিকান্তের শরীরে অ্যাই বড়-বড় ফোঁটা ফাটছে। নামতে না নামতেই ভিজিয়ে একশা করে দিল। দৌড়ে গিয়ে সামনের দোকানটায় উঠে দাঁড়ায় সে। বৃষ্টির রকমটা দেখে দাঁড়িয়ে পড়ে। বাসটা তাকে ফেলে ইস্টিমারের মতো চলে গেল। কোমরের কাপড়ের মধ্যে শতপাল্লার ভাঁজে সাবধানে বিড়ি আর দেশলাই মুড়ে রেখেছে। দোকান ঘরের বেঞ্চটায় বসে কোমরের কাপড় আলগা দিয়ে নিশিকান্ত বিড়ি দেশলাই বের করে আনে। চায়ের দোকানদার তার দিকে বিরক্তির চোখে চায়। তার গা বেয়ে জল নেমে বেঞ্চ ভিজছে। নিশিকান্ত যে খদ্দের নয় একথা দোকানি জানে।

বিড়িটা জখম হয়ে গেছে। নিশিকান্ত দুধারে ফুঁ দিয়ে টিপেটুপে দেখে তারপর নিরাসক্ত গলায় বলে—আগুনটা দাও তো।

সামনে উনুন জ্বলছে, খামোকা দেশলাইয়ের একটা কাঠি নষ্ট করে কোন বুরবাক। দোকানদার অবশ্য গা করে না। তাই নিশিকান্ত উঠে বিড়িটা কেটলির পাশ দিয়ে উনুনে গুঁজে দেয়। ধরিয়ে আবার জুত করে বসে। তাড়া নেই। মহেন্দ্র দর্জির দোকানে আধবোতল চুয়া রাখা আছে, গতকাল মহেন্দ্র কলকাতা থেকে এনে রেখেছে, আজ নিয়ে যাওয়ার কথা। এই বৃষ্টি বাদলায় সে কাজটা নিশিকান্তকে দিয়ে না করালেই চলছিল না বউমণির। নিশিকান্ত বসে থাকে—এটা তার সহ্য হয় না। আজ দুপুরের কথাই ধরা যাক। এমন বাদলায় কার যে ডাব খেতে ইচ্ছে করে তা জন্মে জানে না নিশিকান্ত, কিন্তু বউমণির করল। তিনদিন রাতে খিচুড়ি খেয়ে খেয়ে নাকি ধাত গরম হয়েছে। বৃষ্টি মাথায় সাঁই-সাঁই বাতাসের মধ্যে নিশিকান্তকে উঠতে হল গাছে। ভিজে-ভিজে পিছল হয়ে ছিল গাছ। পা হড়কে কয়েক হাত নীচে পড়েছিল সে। ঘষটানিতে বুকের নুনছাল উঠে গেছে খানিক। এখনও জ্বালা করছে। দুটো বোঁটা আলগা ঝানু ডাব খসে পড়েছিল। লুকিয়ে নিশিকান্ত সে দুটোর মুখ কেটে ভিতরে আঙুল ঢুকিয়ে লেইটাকে জলের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছিল। লেই মেশানো ডাবের জল মিষ্টি ঘোলাটে একটা শরবতের মতো হয়ে যায়, তার ভারী স্বাদ। সেই শরবত খেয়ে খোলা দুটো ছুড়ে পুকুরে ফেলেছিল সে। তারপর বাবলা তলায় দাঁড়িয়ে দেখে পুকুরের ছাপানো জলে ভেসে-ভেসে ডুবন্ত মানুষের দুটো মাথার মতো কোন দেশান্তরে চলে গেল। এই ঝাপসা বৃষ্টির বেলায় পৃথিবীটা কত ছোট্টটি হয়ে এসেছে, তবু কালো মেঘের ছায়ায় এখনও কত নিরুদ্দেশ হওয়ার মতো জায়গা আছে। জল থেকে খুদে মাছ উঠে আসছিল, বাবলাতলায় কই মাছ বেয়ে উঠে এসেছে, ভেজা গাছের ডালে বসে কাক খাখা করে। নিশিকান্তর তখন কত কী মনে পড়ি-পড়ি করে। কিন্তু আদতে কিছু তেমন মনে পড়ে না তার। নিশিকান্তর ওই হচ্ছে রোগ।

অন্ধকারে টর্চ বাতি জ্বেলে চলার মতো নিশিকান্তর অবস্থা। টর্চ বাতির যেটুকু আলো হয় সেটুকু গোলপানা আলোয় একটুখানি দেখা যায় মাত্র। সামনেও হাঁ করা অন্ধকার পিছনেও হাঁ করা অন্ধকার। অর্থাৎ নজর চলে না নিশিকান্তর হাতেও তেমনি এক টর্চ বাতি ধরিয়ে অন্ধকার দুনিয়ার দিগদারিতে পাঠিয়ে দিয়েছে কে। যেমন তার বিস্মরণ তেমনি তার ভবিষ্যৎ চিন্তা। ভাবতে বসলেই নিশিকান্তর কাছে তার জীবনটা এক ঝাপসা বাদলদিনের মতো লাগে, পৃথিবীটা ছোট্টটি হয়ে যায়। নজর চলে না বহুদূর পর্যন্ত। কে তার বাপঠাকুরদা, কোথায় তার বাড়ি ঘর, কী তার জাত গোত্র এ নিশিকান্তর জানা নেই। লোকে বলে সে হল হাবাগোবা মানুষ। তাই হবে। তবু নিশিকান্ত খুব ভাবতে ভালোবাসে। যেমন সেই ডাবের খোলা দুটো কোথায় হারিয়ে গেল, কোন বিশাল বিশ্বসংসারে চলে গেল ডুবন্ত মানুষের মতো ডাব দুটো তা নিশিকান্ত ভাবতে বসে।

ট্যাঁকে চুরি করা দুচার পয়সা তার থাকেই। হঠাৎ চায়ের একটা দমকা গন্ধ আর সেই সঙ্গে হাওয়ায় উনুনের একটু তাপ উড়ে এসে গায়ে লাগতেই নিশিকান্ত নড়েচড়ে বসে। তারপর তাচ্ছিল্যের গলায় বলে—দাও তো এক ভাঁড় তোমার চা। খেয়ে দেখি।

দোকানদার উনুনটা খুঁচিয়ে একটু আঁচ তুলছিল। একটা ডেকচিতে আলু পেঁয়াজ কুঁচিয়ে রেখেছে, বোধহয় এক্ষুনি কেটলি নামিয়ে রাতের রান্নাটা সেরে রাখত। নিশিকান্তর কথা শুনে ফিরে তাকাল, তারপর চায়ের গুঁড়ো ঢালতে লাগল খয়েরি ন্যাকড়া-দেওয়া ছাঁকনিতে।

নিশিকান্ত বেঞ্চ থেকে উনুনের ধারটিতে আগুনের তাপে তেতে-ওঠা চৌহদ্দির মধ্যে এসে উবু হয়ে বসে। অল্প অল্প করে চায়ে চুমুক মারে, গরম ভাঁড়টা মাঝে-মাঝে চেপে ধরে ঠান্ডা গালে। কিছুই মনে পড়ে না, তবু কত কী যে মনে পড়ি-পড়ি করে তার। আধবোতল চুয়ার জন্য পলতাবেড়ে থেকে মাইল দেড় হেঁটে শিবগঞ্জ বাগনানের বাস ধরে সে যে এতটা পথ এসেছে এই বাদলায়, তাতে তার ক্ষতিবৃদ্ধি হয়নি। এ সময়টায় ঘরে থাকলে তাকে বউমণি টোকার সঙ্গে হয় মাছ ধরতে পাঠাত, নয়ত সাঁজাল দিতে। কিছু একটা করাতই। কিন্তু বাদলায় দোক্তা ফুরিয়েছে। বিকেলের আগে তামাক পাতা সেঁকা হয়েছে, ভাজা হয়েছে ধনে আর মৌরি। বিপিনবিহারী হামানদিস্তা নিয়ে বসেছে, দুমদাম শব্দে গুঁড়ো করছে সব। চুয়া মিশিয়ে বউমণি খাবে। ভাজা মশলার মাতাল মিঠে গন্ধে বর্ষার ছাতকুড়োপড়া গন্ধটা চাপা পড়েছে। কিছু গন্ধ আছে ভালোবাসার, যেমন গন্ধ গোলাপে, বক-ফুলের ভাজা বড়ায়, সোঁদা-স্যাঁতা মাটিতে। আবার কিছু নেশাড়ু গন্ধ। যেমন গন্ধ কেয়াফুলে, কিশোরীর ঘেমো শরীরে, ভাজা দোক্তাপাতায়। এমন কত গন্ধ যে হঠাৎ উড়ে আসে। তুলসীতে আর চন্দনে এক রকম ভগবানের গন্ধ আছে। পুরোনো পুঁথির

পাতায় পাওয়া যায় কতকালের মন কেমন করা গন্ধ। সব গন্ধ ঠিক ঠিক বুঝে ওঠা যায় না। এই বর্ষার গন্ধটা যেমন। বড্ড মন খারাপ করে দেয়।

এই বর্ষায় ঘরের বার হওয়া মানুষের বড় তাড়া। একজন ছাতা-মাথায় গেরস্ত লোক ওপাশের দোকানে দৌড়ে এল কোলকুঁজো হয়ে, এক ঠোঙা মুড়ি কিনে আবার কোলকুঁজো হয়ে রাস্তা পেরোয়। ভাবগতিক দেখে মনে হয় ঘরে ঢুকেই হড়াস করে দরজা দিয়ে ঘড়াক করে হুড়কো তুলে দেবে। নিশিকান্ত একটুখানি হাসে। জগৎসংসারে মানুষের কত তাড়া থাকে। নিশিকান্তর নেই, তাই বউমণি বকে-বকে হয়রান। সারাদিন কোথাও বসে নিশিকান্ত একটু যে ভাববে তার উপায় নেই! কানে পালক দিয়ে সুড়সুড়ি দিলে নিশিকান্তর ভালো সব ভাবনাচিন্তা আসে। মাদার গাছটার তলায় বসে শুকনো উদাস দিনে নিশিকান্ত নিরিবিলি কানে পালক দিয়ে যখনই ভাবতে বসে তখনই বউমণির হাতে একটা লাটাইয়ে সুতোয় ঠিক টান পড়ে। ডাকে—নিশি...ই। নিশি অমনি চিন্তার শূন্যে উড়তে-উড়তে টান খেয়ে চমকে ওঠে। ভাবনা-চিন্তা সব লাট খেয়ে যায়।

সওদা করতে গিয়ে নিশিকান্ত ঠিকঠাক হিসাব মেলাতে পারে না। বউমণি নিয়ম করেছে অঙ্ক শিখতে হবে। বিপিনবিহারীর তাই আজকাল রাতের দিকে তাকে হিসাব শেখানোর ঝোঁক চাপে। বলে—বল দেখি দু টাকা পঁয়তাল্লিশ পয়সা থেকে এক টাকা আশি পয়সা বাদ দিলে কত থাকে? তখন তার দুনিয়াটাই কেমন ঝাপসা হয়ে যায় এই বাদলা দিনের মতো। কত থাকে! তাই তো! কত থাকে! দু-টাকা পঁয়তাল্লিশ থেকে এক টাকা আশি বাদ দিলে অনেক থেকে যায় মনে হয়। নাকি কিছুই থাকে না! দশটা বিড়ির দাম যদি হয় পাঁচ পয়সা, একটা ম্যাচিস দশ...তাহলে...কত যে থাকে। বাদ দিতে গিয়ে জান কাঠকয়লা হয়ে যায়। আর তখন গাঁট্টা মারে বিপিন। বলে—তোর কত বয়স খেয়াল আছে।

—হুঁ-উ! নিশিকান্ত বলে—দেড় কুড়ি।

—দূর ভূত, এক কুড়ি তো টোকারই বয়স। তুই তো আমার চেয়েও বড়। পঞ্চাশের কাছাকাছি তো হবিই।

তাই হবে! বয়েসের হদিস জানলে এ দশা হবে কেন তার!

আবার কিছু খারাপও সে নেই। বিস্মরণ হওয়াটা যে মন্দ সে টের পায় না। বেশ আছে। টর্চ বাতির আলোয় যেটুকু দেখা যায় সেটুকু দেখে-দেখে সে চলেছে ঠিক। আজ যা ঘটে তা বড়জোর এক হপ্তা সে মনে করতে পারে, তার ওপারে সাদা বৃষ্টি সব ঢেকে রাখে। বিস্মরণ হচ্ছে ঠিক টর্চ বাতির আলোর চৌহদ্দির বাইরের অন্ধকারের মতো, বাদলা

দিনের মতো। চা-টা খেয়ে উঠে পড়ে নিশিকান্ত। সবাই জানে সে হচ্ছে একটু মাঠো লোক—ধীরস্থির, ঢিলাঢালা। কিন্তু তা বলে যে ইচ্ছেমতো কোথাও বসে থাকবে তার উপায় নেই। লাটাই বউমণির হাতে, সে হচ্ছে এক লাতন ঘুড়ি। যত দূরেই যায় নিশিকান্ত হঠাৎ হঠাৎ চমকা টান টের পায় সুতোর। লাট খায়। ঠিক যেন বউমণি ডাকে—নিশি-ই।

ছাতাটা না খুলেই সে বৃষ্টির জলে ছপাৎ পা ফেলল। যা বাতাস! ছাতা খুললে রক্ষে আছে, উড়িয়ে নিয়ে যাবে হাত থেকে।

এখানকার মাটি বেলে, তাই তেমন পিছল নয়। তবু দু-একবার পা হড়কায় নিশিকান্তর। চবাস চবাস করে বৃষ্টি চাবকাচ্ছে, মাথা মুখ ফুটো করে দিয়ে যাচ্ছে রে বাবা! জলে ঝাপসা হয়ে আসে চোখের দৃষ্টি, কান বন্ধ। আবছা-আবছা দোকানঘর, মানুষজন দু-একটা দেখা যায়। জগৎসংসার যেন বা থেমে গেছে দম ফুরানো ঘড়ির মতো।

মহেন্দ্র তার অবস্থাটা চোখ তুলে দেখে। দর্জিঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে নিশিকান্ত কাপড় নিঙড়ে নেয়, পিরানটা খুলে জল চিপে মাথা গা মুছতে থাকে। ছাতাটা আগাগোড়া খোলেনি সারা রাস্তা, তবু ছাতাটা ভিজে গেছে। মহেন্দ্র হেঁকে বলে—ছাতা বাইরে রাখ, তুমিও বাপু ছাঁচতলায় দাঁড়িয়ে গায়ের জলে ঝরিয়ে এসো। এ বাদলায় ঘর যদি ভেজে তো শুকোবে না।

তাই করে নিশিকান্ত। দাঁড়িয়ে থাকে।

মহেন্দ্র কল চালাতে-চালাতে বলে—ছাতাটা তো সারা জীবন বগলেই দেখলাম। কোনওদিন খুলেছ?

—খুলি মাঝে-মাঝে, রোদে শুকোতে যখন দিই।

মহেন্দ্র হাসে। বলে—নিশি, ছাতাটা তো ভোগে লাগালে না। তবে কেন বয়ে বেড়াও হে?

—কাজে লাগে। নিশিকান্তর উদাস উত্তর।

মহেন্দ্রর শাগরেদ গুপে পাটির ওপর বসে একটা জামার কলার ঠিকঠাক করছিল। সে দাঁতে কামড়ানো ছুঁচটা বেরে করে হাসল, বলল—কাজটা কী?

—সঙ্গে-সঙ্গে থাকে। তাতেই কাজে লাগে।

গুপে আর মহেন্দ্র নিজেদের মধ্যে একটা চোখ ঠারাঠারি করে।

নিশিকান্ত দাঁড়িয়েই থাকে। ওই তার স্বভাব বলা যায়। সময়ের জ্ঞান থাকে না, কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা দরকার তা বিচার করতে পারে না। একটা বিড়ি ধরানোর চেষ্টা করে। বর্ষায় ম্যাচিসের কাঠি সব ম্যাদা মেরে গেছে, ঠুকলেই বারুদ খসে যায়। অনেক কষ্টে অবশেষে ধরে ওঠে বিড়িটা। মিয়ানো গলায় বলে—জিনিসটা দিয়ে দাও, বেলাবেলি চলে যাই।

মহেন্দ্র সেলাই করতে-করতে বলে—যাবে যাবে। একটু বসে যাও। জলটা ধরে যেতেও তো পারে?

বসতে বলায় নিশিকান্ত বসে। চৌকাঠের কাছে মেঝের ওপর উবু হয়ে বসে বলে—আর ধরেছে।

এইটুকু বলেই তার কথা ফুরোয়। আর কিছু ভেবে পায় না। মানুষে-মানুষে যে কত কথা বলাবলি হয়! বাসে আসতে সামনের সিটে দুই হাটুরে বসে তাদের বিকিকিনি, লাভালাভ, বাজার এবং ভগবান নিয়ে কত কথা বলে গেল। মানুষের মাথায় কথাও আসে বাবা, যেন শেষ নেই। নিশিকান্তর মাথায় আসে না। আবার এও ঠিক যদিই বা দু-চারটে কথা তার প্রাণে আসে তো তা শোনারও লোক নেই। কথা বলার জন্য, প্রাণ ঢেলে কথায় বাদলা নামিয়ে দেওয়ার জন্য এক একবার তার বিয়ের বাই চাপে। সুন্দরপানা মেয়েছেলের সঙ্গে ফুলের মালা বদল করে হ্যাজাকের আলোয় বিয়ে—সে ভারী একটা রহস্যময় আমুদে ব্যাপারও বটে। তার ছাতাটার সঙ্গে এমনি এক বিয়ে পাগলামির গল্প জুড়ে আছে। মায়াচরের কাছে সেবার ভীমপুজো দেখতে গিয়ে নিশিকান্তর আলাপ এক জোচ্চোরের সঙ্গে। অনেক কথা বিস্মরণ হয়ে হয়েও যে দু-চারটে তার মনে আতরের তুলোর মতো গন্ধমাখা হয়ে থাকে বহুদিন বাদেও, তেমনি কোনও কোনও কথা মনে থেকে যায়। জোচ্চোরটা নিশিকান্তকে প্রথম নজরেই জরিপ করে নিয়েছিল। ভীমের বিশাল মূর্তি জরাসন্ধকে পেড়ে ফেলে ঠ্যাং ফাঁক করে চিরে ফেলে বধ করছে, এ দৃশ্য দেখে হাঁ হয়ে গিয়েছিল সে। জোচ্চোরটা তার ভাবসাব দেখে ধরে নিয়ে গিয়ে চা সিগারেট খাওয়ায়। দু-চার কথার পর নিশিকান্তর বিয়ের ইচ্ছেটা জানতে পেরে বলে—পুরুষমানুষের আবার বিয়ের ভাবনা, চাকর-বাকর মুনিশ-মুটে ভিখিরি যাই হও বউ ঠিক জোটে।

ভীম পুজোর মণ্ডপ থেকে পুরোপাক্কা তিন ক্রোশটাক হাঁটিয়ে তাকে নিয়ে গিয়েছিল মেয়ে দেখাবে বলে। আর ততক্ষণে নিশিকান্তর চুরি করে জমানো পয়সা ফাঁক করেছিল বিস্তর। বিয়ের আশায় নিশিকান্ত 'না' করেনি। লোকটা ফুলুরির দোকানে দাঁড়িয়ে যায়, সিগারেট কেনে, দু-চারটে বাজারহাট সারে, নিশিকান্ত সঙ্গে-সঙ্গে ঘুরে হয়রান। তার ওপর ধার বলে পয়সা নিয়ে-নিয়ে নিশিকান্তের ট্যাঁক ফাঁক করেছিল লোকটা। একটা অচিন গাঁয়ে

নিয়ে গিয়ে একটা কোটাবাড়ির সামনে দাঁড় করিয়ে বলল—এই হচ্ছে আমার বাড়ি। নিজের বাড়ি বলে মনে করে নাও। যাও ওই বাইরের ঘরে গিয়ে বোসো, আমি আট্টু বাজার ঘুরে সেরটাক মাংস নিয়ে আসি, মস্ত একটা খাসি কেটেছে শুনলাম। খাসির তেলের বড়া খাও তো?

খুব খায় নিশিকান্ত। তাই ঘাড় নেড়েছিল। তখন বেশ দুপুর হয়ে গেছে। লোকটা বলে—আজ এবেলা থেকেই যেতে হবে তোমাকে, ওবেলা মেয়ে দেখিয়ে দেব, তারপর পাকা কথা বলে যেও।

নিশিকান্ত খুব রাজি। লোকটা চলে যেতে সে দিব্যি কোঠাবাড়ির বাইরের ঘরে গিয়ে বসল। চেয়ার-টেয়ার পাতা ভালো বন্দোবস্ত। বসে থাকতে কিছু বাদে সেখানে এক খিটকেলে বুড়ো এসে হাজির। কি চাই, কাকে চাই প্রশ্নে বিরক্ত করে তুলল। খ্যাঁচাকল আর বলে কাকে। জোচ্চোরটার নামও মনে রাখেনি নিশিকান্ত, কেবল বলে—এ বাড়ির কর্তাই আমাকে বসতে বলে গেছে গো! বুড়োটা খ্যাঁকশিয়ালের মতো হুয়া-হুয়া শব্দ করে বলে—বাড়ির কর্তা তো আমি, নিত্যহরি গোঁসাই। নিশিকান্ত তখন গম্ভীর হয়ে বলে—তাহলে তোমার ছেলেই হবে, আমাকে বসিয়ে রেখে বাজারে গেল মাংস আনতে, খাসির তেলের বড়াও খাওয়াবে বলেছে দুপুরে। বুড়ো তখন তেড়ে মারতে আসে—বৈষ্ণবের বাড়িতে খাসির মাংস! বেরোও, বেরিয়ে যাও।

কোথায় একটা ধন্দ থেকে গিয়েছিল, তাই সবটা না বুঝেই বেরিয়ে এসেছিল নিশিকান্ত। কোঠাবাড়ির বারান্দায় ছাতাখানা দেওয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড় করানো। কার ছাতা, কোথা থেকে এসেছে এতসব জানার দরকার মনে হয়নি তার। হাতটানের স্বভাবের দরুন অভ্যাসমতোই নিশিকান্ত ছাতা বগলে করে বেরিয়ে এসেছিল।

জগৎসংসারে এই ছাতাখানার বাবুগিরি ছাড়া তার আর বেশি কিছু নেই। যক্ষীর মতো সে ছাতা আগলে থাকে। রোদে জলে খোলবার জন্য নয়, কেবলমাত্র বাবুগিরিরই জন্যই বয়ে বেড়ায়। ছাতার ইজ্জতই আলাদা।

—শুনতে পাই, তোমার ছাতার সঙ্গে নাকি তোমার কথাবার্তা হয় নিশি! মহেন্দ্র একখানা পায়জামার পা টানা সেলাই করতে-করতে বলে।

নিশিকান্ত লজ্জা পেয়ে যায়। মুখে বলে—দূর, বিপিনদার যতো বানানো কথা।

—না গো, বানানো হবে কেন। বিপিন নিজে কানে শুনেছে, নিশুতরাতে উঠে বসে তুমি নাকি ছাতাকে তোমার দুঃখের কথা বলো, আর নাকি ছাতাও তোমার কথার সব জাবাব-টবাব দেয়! ছাতার গলার স্বর নাকি একটু খোনা-খোনা, কিন্তু কথা ভারি পরিষ্কার!

গুপে ছুঁচ হাতে চেপে কলারটা পাট করতে-করতে বলে—হ্যাঁগো, নিশিদা, তোমার ছাতাটা মেয়ে না ছেলে!

—আমি ওসব জানি না বাবু। তোমরা বড় দিক করো। জিনিসটা দিয়ে দাও চলে যাই।

—কথাটা চেপে যাচ্ছ নিশিদা, কিন্তু সেই পলতাবেড়ে থেকে বাগনান তক সবাই জানে যে তোমার ছাতাটা মেয়েছেলে।

—যাঃ।

—মাইরি। গুহ্য কথা আমাদের না হয় না বললে, কিন্তু ভাব ভালোবাসার কথা হচ্ছে আতর এসেন্সের মতো, চেপে রাখা যায় না। ছড়াবেই।

মহেন্দ্র পায়জামার পাখানা সরিয়ে রেখে আর একখানা পায়ের পট্টি মারতে লাগে, বলে—কথা আরও আছে। শুনি ওই ছাতাখানার সঙ্গেই তোমার বিয়ে হবে।

—যদি হয় তো নেমন্তন্নটা কোরো বাপু। বলে গুপে।

নিশিকান্ত তেতে উঠে বলে—পেছুতে লাগবে তো চললাম বলছি। গিয়ে বিপিনদাকেই পাঠিয়ে দেবখন।

মহেন্দ্র গুপেকে একটা ধমক দেয়—তোর যত ইয়ার্কি কথা। বসো নিশি, রাগ করো না।

নিশিকান্ত বসে। দেরি হচ্ছে। একটা হাই তোলে সে। মহেন্দ্রর কলখানা দেখতে তার বড় ভালো লাগে। কলকবজা এক আশ্চর্য জিনিস। কোথাও কিছু না, পায়ের নীচে একখানা পাটা নড়ছে আর ওপর খাপে ছুঁচখানা বৃষ্টির ফোঁটার মতো কপাকপ নেমে এসে সেলাই ফেলে যাচ্ছে।

বড় আশ্চর্য কাণ্ডকারখানা! কলখানা যতবার দেখে ততবারই তার ভিতর একটা কী যেন মনে পড়ি-পড়ি করে। পড়ে না অবিশ্যি। ওটাই তো তার রোগ। বড় বিস্মরণ। তার মনখানা বাদলা দিনের মতো, টর্চ বাতির আলোর মতো। কতকটা দেখা যায়, বাদবাকি সব বিস্মরণের বাদলায়, কালিঢালা অন্ধকারে ঢাকা।

বসে থাকতে-থাকতে ঢুলুনি এসে গিয়েছিল তার। গুপে ডেকে তোলে তাকে। চুয়ার বোতলটা হাতে দিয়ে বলে—দিনক্ষণ দেখে বিয়েটা সেরে ফ্যালো বাপু। আইবুড়ো মেয়েছেলে নিয়ে রাত বিরোতে বসে থাকো, এ ভালো কথা নয়। ছাতারও তো সমাজ অছে।

বোতল নিয়ে নিশিকান্ত উঠে পড়ে। দরজার কোণে ছাতাটার জন্যে হাত বাড়িয়ে দেখে, নেই।

—ই কী! নিশিকান্ত বলে ওঠে।

মহেন্দ্র গম্ভীর মুখ তুলে বলে—কী হল!

—ছাতাখানা!

—নেই?

—না। তোমরা লুকিয়েছ।

—আমরা! গুপে হাঁ করে চেয়ে থেকে বলে—পরের মেয়েছেলে লুকোব আমাদের তেমন ভাব নাকি!

—ছাতাটা কী হল রে গুপে? মহেন্দ্র নিরীহ মুখে জিগ্যেস করে।

—হবে আর কী! একটু আগে কতগুলো লোধা মেয়েছেলে বৃষ্টির মধ্যে হুড়মুড়িয়ে এসে উঠেছিল। এ ঠিক তাদের কাজ। নিশিদা ঢুলছিল তখন খেয়াল করেনি।

নিশিকান্ত ক্ষেপে গিয়ে বলে—দিয়ে দাও বলছি।

গুপে বলে—তোমার ছাতারও স্বভাবের বলিহারি। কোন আক্কেলে তোমার মতো ভালো মানুষটাকে ছেড়ে না বলে কয়ে চলে গেল!

ভারী রেগে যায় নিশিকান্ত। ডাক হাঁক করে গাল পাড়ে—তোমরা দুটো চোরের ব্যাটা, গর্ভস্রাব...

গুপে গম্ভীর মুখে বলে—তা মুখ খারাপ করলে কী হবে! লোকে যে বলে তুমি ছাতা চোর। আমি অতশত জানি না বটে, কিন্তু শুনেছি ওই ছাতা মেয়েছেলেটাকে তুমি মায়াচরের কোনও গেরস্তর ঘর থেকে ভাগিয়ে এনেছ!

নিশিকান্তর মাথার মধ্যেটা ভারী বেসামাল হয়ে যায়, বলে, কোন রাঁড়ির ব্যাটা বলে, কোন...ইত্যাদি।

মহেন্দ্র বিরক্ত হয়ে বলে—মুখ খারাপ করবে না বলছি। দিয়ে দে গুপে ওর ছাতাখানা। খিস্তির চোটে জল গরম করে দিল।

রেগে গেলে নিশিকান্ত এরকম। হাট মাঠ ঘুরে যা গাল শোনে তার কিছু মনে রাখে সে। কারণ, ওই হচ্ছে তার অস্ত্রশস্ত্র। লোকে তাকে দিক করলে তাকেও তো কিছু করতে

হয় তখন!

গুপে উঠে চৌকির তলা থেকে ছাতা বের করে দিল। তারপর আচমকা পিছনে একটা লাথি দিয়ে বলল—বেরো শালা!

লাথিটা খেয়ে দরজাটা ধরে সামলে নেয় নিশিকান্ত।

—এ-ই-ই...বলে মহেন্দ্র চেঁচিয়ে ওঠে—মারিস না। আর একটু হলে বোতলটা হাত থেকে পড়ে ভাঙত।

—শালার বড় মুখ। গুপে বলে রেগে।

নিশিকান্ত তখন গুপের মা বাবা তুলে নোংরা খিস্তি দিয়ে বেরিয়ে আসে। গুপে অবশ্য ছাড়ে না। দৌড়ে এসে ঠাঁই করে মাথায় একটা কী দিয়ে মারে। ঝিমঝিম করে ওঠে নিশিকান্তর মাথা। সে বোতলটা অবশ্য চেপে রাখে বুকে। ভাঙলে বউমণি আর বিপিন তো আর গুপের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে আসবে না। মেরে তারই গা-গতর ব্যথা করে দেবে। নিশিকান্ত রাগে অন্ধকার হয়ে বৃষ্টির মধ্যে ঠায় দাঁড়িয়ে চেঁচায়—গু খা, গু খা রাঁড়ির ছেলে...

গুপে আবার বেরিয়ে আসে। দূর থেকে একটা মাটির ভাঁড়ই বুঝি ছুড়ে মারে তাকে।

নিশিকান্তর বুকে এসে লাগে সেটা। নিশিকান্ত দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে গাল দিতেই থাকে—আমার পা খা, বাঁ-হাত খাঁ, হেগো খা...

অনেকক্ষণ ধরে বকে-বকে নিশিকান্তর মাথা ফরসা হয়ে গেল। আসলে কাকে বকছে সেটাই ভুলে গেল সে। কী হয়েছিল তাও মনে পড়ে না আর। তখন নিশিকান্ত ভারী অবাক হয়ে চুপ করে যায়। কার ওপর রেগে গিয়েছিল, কেন গাল দিচ্ছিল কিছুই তেমন মনে পড়ে না।

এদিকে বৃষ্টি থেমে চাঁদ উঠে গেছে কখন। দোকানে দোকানে ঝাঁপ পড়ে যাচ্ছে। অবাক নিশিকান্তর ভিতরে একটা সুতোর টান লাগে। লাটাই বউমণির হাতে। নিশিকান্ত ঘুড়ি তাই চমকে ওঠে, লাট খায়। বউমণি নিশ্চয়ই ডাকছে—নিশি-ই!

খাড়ুবেড়ের মোড়ে যখন নামল নিশিকান্ত তখন পৃথিবীটা বড্ড অদ্ভুত হয়ে আছে। কী এক ভুতুড়ে চাঁদ উঠেছে আজ আকাশে। চারধারে মেঘের কালি তার মাঝখানে ফ্যাকাসে একটা ডুম। বারবার মেঘ ডাকছে পাথর ঘষা শব্দে। তিনদিন বাদে বৃষ্টি এই ধরল। জাড়ের মাস নয়, তবু কেমন শীত ঝরিয়ে দিচ্ছে আকাশঠাকুর। জলে জলময় পৃথিবীটা সাদাটে হয়ে পড়ে আছে অলক্ষুণে জোছনায়।

যেমন ভয় ভূত প্রেত বেহ্মদৈত্যকে, তেমনি ভয় বিপিনবিহারী আর বউমণিকে। খালধারে পিছল মাটি ধরে প্রাণপণে হাঁটে নিশিকান্ত। মাথায় একটা টাটানো ব্যথা! মাজায় ব্যথা। কখন কোথায় লাগল ঠিক খেয়াল করতে পারে না সে।

তিনদিন ধরে লক্ষ হাত দিয়ে মাটিকে মেখেছে আকাশ। মাখাজোখা হয়ে তাই ভুতুড়ে জোছনায় সিটোনো পৃথিবীটা পড়ে আছে। মেখেছিল বিপিনবিহারীও বউমণিকে। বর্ষা বাদলায় কাজকর্মে বড় সংক্ষেপ। হাঁড়িকুড়ি ছাড়া আর কিছু সকড়ি করেনি বউমণি। কলাপাতা কেটে হড়হড়ে খিচুড়ি ঢেলে খাওয়া। ঘাটলার কাজ ছিল না, কাচাকুচি ছিল না, রোদে দেওয়া জিনিস টানাটানি করা ছিল না। ঘরমোছা ছিল না। বউমণি তেপহর বিছানায় পড়ে থাকত। বিপিন মাঠে একটু চাষের কাজ দেখে এসেই দরজায় হুড়কো তুলে দিত। ভিতরে কী হত তা কি আর বোঝে না নিশিকান্ত। সেও ওই মাখামাখিরই ব্যাপার। বিকেলে আমতেল দিয়ে মাখা মুড়ি কাঁচালঙ্কা কামড়ে খেয়ে বিপিন যেত বাজানিদের বাড়িতে, ধর্মকথা শুনতে।

কিন্তু ধর্মকথার আগেও কথা থাকে পরেও কথা থাকে। বৃষ্টি বাদলায় সেইসব কথাই কলঙ্কের কথার মতো ছড়িয়ে গেল। চারধার ফিসফাস গুজগুজ। নিশিকান্ত একা-একা হাসে।

খালধারে একটা আগুন জ্বলছে বিশাল। আগুনের ধারে কালো-কালো লোকজন। বাবলাগাছের আড়ালে বড়-বড় সব ছায়া নড়াচড়া করছে! নিশিকান্ত থমকে দাঁড়িয়ে যায়। দূর থেকে কাণ্ডটা দেখে আর তখন একটা পোড়াঘিয়ের বদ গন্ধ উড়ে আসে। আর আসে চামড়া পোড়া চিমসে মতো গন্ধ।

নিশিকান্ত মাথা নেড়ে আবার হাঁটে। নেতাইয়ের ঠাকুমাটা মরল বোধহয়। জোর কদমে হেঁটে চলে আসে আগুনটার কাছে। বাঁধা শ্মশান বলতে কিছু নেই এখানে, যে যেখানে পারে মড়া পোড়ায়। বাবলাতলায় একটু উঁচু জমি পেয়ে ওরা ওখানেই কাজ সেরে নিচ্ছে।

নেতাই মাল খেয়ে চেল্লাচ্ছিল। স্যাঙাৎদের মধ্যে কে যেন চিতা থেকে চ্যালাকাঠ টেনে বিড়ি ধরিয়েছে, তাতে অপমান হয়েছে নেতাইয়ের। চোঁচিয়ে বলে—কোনও শালা চিতা থেকে বিড়ি ধরাবে না বলে দিচ্ছি। আমার ঠাকুরমার চিতা শালা, কারও বাপের নয়—বলে দিচ্ছি।

স্যাঙাৎদের একজন সান্ত্বনা দিয়ে বলে—বিড়ি নয় রে, সিগারেট...

—কেন ধরাবে? ওর বাপের চিতা শা...?

বলতে-বলতে নেতাই বাবলাতলা থেকে উঠে খালের উঁচু পাড়ে দাঁড়িয়ে পেচ্ছাপ করে। আর বলে—আমার ঠাকুমার শালা পুণ্যি দেখ, চিতা নিভে যাবে ভয়ে বৃষ্টি থেমে গেছে। দেখেছিস কখনও অমনধারা শালা? বিড়ি ধরাচ্ছিস চিতা থেকে। আমার ঠাকুমার সম্মান নেই?

স্যাঙাৎরা খি-খি করে হাসছে।

নিশিকান্ত দেখে, নেতাইয়ের ঠাকুমার মুখখানা দেখা যাচ্ছে। এখনও সেখানে আগুনটা পৌঁছয়নি। চোখের পাতায় চন্দন, তাতে তুলসিপাতা সাঁটা। পোড়ার সময়টায় মানুষের কেমন লাগে তা বড় জানতে ইচ্ছে করে নিশিকান্তর। দু-কদম এগিয়ে এসে সে ছাতা আর বোতল হাতে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখে। কেউ কিছু বলে না। সব ব্যাটা বোতল টেনে যাচ্ছে। বেসামাল।

আর হঠাৎ যেন কেউ দেখছে না দেখে, ফাঁক বুঝে নেতাইয়ের ঠাকুমা টক করে চোখ চাইল। নিশিকান্তর কিছু মনে থাকে না। বড় বিস্মরণ। কিন্তু নেতাইয়ের ঠাকুমা চোখ খুলে ভালোমানুষের মতো তার দিকে তাকাতেই নিশিকান্তর ঝড়াক করে মনে পড়ে গেল, বহুকাল আগে, পেটব্যথায় বুড়ি কাতরাচ্ছিল একা ঘরে। তখন নিশিকান্ত বাবলার কচিপাতা থেঁতো করে রস খাইয়ে সারিয়ে ছিল ব্যথা। সেই বাবলা গাছের তলায় নিশিকান্ত দাঁড়িয়ে, আর চিতার আগুনের মধ্যে আধপোড়া নেতাইয়ের ঠাকুমা। চোখে চোখ পড়তেই যেন বলে ওঠে, কী বাবা মনে পড়ে?

মনে পড়ে? মনে পড়ে? বাদলা কেটে মনের মধ্যে একটা জোছনা যেন ভেসে ওঠে হঠাৎ। পড়ে বইকি! কত কী মনে পড়তে থাকে হঠাৎ। নিশিকান্ত টের পায় মনে পড়ার বেনো জল হঠাৎ বাঁধ ফাটিয়ে ধেয়ে আসে যে! নিশিকান্ত ছাতাটা সাপটে ধরে বোতল চেপে ধরে বুকে। একটা 'আঁক' চিৎকার পেড়ে আবার খালধারের রাস্তায় উঠে আসে।

কিন্তু তবু মনে পড়া কি ছাড়ে। আকাশ থেকে হঠাৎ টাপুর-টুপুর খসে পড়ে অতীতের জল। পড়তেই থাকে। নেতাইয়ের স্যাঙাৎ দু-পা এগিয়ে এসে তাকে ধরে—কী বাবা বোতলে? কোথায় নিয়ে যাচ্ছ বাবা নিশি!

—ছেড়ে দাও। বলে নিশিকান্ত একটা ঝটকা মারে। আর ওই ঝটকাতেই টর্চ বাতির আলোর মতো তার বর্তমানটা ছিটকে যায়। বাদলা দিনে ছোট পৃথিবীটা হঠাৎ যেন আদিগন্ত দেখা যায়। মনে পড়ে। মনে পড়ে।

তার নাম নিশিকান্ত নয়। সে নয় এদেশের লোক। নীলকুঠির ধারে একটা ছোট কুঠিবাড়ি ছিল তাদের। মা ছিল মনোরমা, বাবা চন্দ্রনাথ। সুখের ছিল সংসার। জায়গাটা

কী যেন! কী যেন! মনে পড়ে, বেঁটে লিচু গাছের বন ছিল সেখানে, থোকা থোকা ফল ধরত, পাকা সড়কের ওপর ছিল ইস্কুল বাড়ি, তার ঘণ্টা বাজত ঢং-ঢং, নিশিকান্তকে ডাকত।...মনে পড়ে, মনে পড়ে...

কিন্তু কী যে যন্ত্রণার ঝড় ওঠে বুকের মধ্যে! হাহাকার এক বাতাস বয়ে যায়। কী হয়েছিল তারপর? অতীতের বৃষ্টি মাতালের মতো টলে টলে পড়ে, দোল খায়, মারদাঙ্গা আগুন কী সব হয়েছিল, দাড়িওলা, কালি-মাখা মশাল হাতে কিছু লোক...তারা পায়খানার তলায় নোংরায় লুকিয়ে কাঁপছে! মনে পড়ে...রেল লাইন ইস্টিশান...লঙ্গরখানা...

নিশিকান্ত চিৎকার করে পিছলে পড়ে যায়। রাস্তা বেভুল। কোথায় যাচ্ছে সে? কার কাছে? জোছনায় দাঁড়িয়ে হাঁ করে চারধারে চায় নিশিকান্ত? এ সে কোথায়?

মাঠের মাঝখানে ছাতা আর বোতল হাতে সে দাঁড়িয়ে আকাশ-জোড়া পৃথিবীটা দেখে। কী প্রকাণ্ড! সে একা! হারিয়ে গেছে!

ভূতুড়ে জোছনার হাহাকার চারদিকে। তার ঘর নেই, বাড়ি নেই, কেউ নেই।

—আঁ—আঁ—আঁ বাক্যহারা চিৎকার দিতে থাকে নিশিকান্ত। চোখে জল আসে। সে উপুড় হয়ে পড়ে মাঠের কাদায় জলে। কোমর সমান ডুবে যায়। মাথা চেপে ধরে বিড়বিড় করে বলতে থাকে—ভুলিয়ে দাও, ভুলিয়ে দাও...

ঠিক সময়ে একটা সুতো কে যে গুটিয়ে নেয় লাটাইয়ে, হাত্তা মারে। টান লাগে। ঘুড়ি টাল খায়। বউমণি বুঝি ডাকে—নিশি-ই...

—যাই। বলে কাদাজল থেকে ওঠে নিশিকান্ত। ছাতাটা আর বোতলটা চেপে ধরে বুকে। পিরানের হাতায় চোখ মুছে নেয়। ঘুড়ির সুতো গুটিয়ে নিচ্ছে বউমণি। বড় টান। চাকর বলো চাকর, জন বলো জন, টান একটা আছেই।

বেশ আছি বাবা, বেশ আছি। বিড়বিড় করে বলে নিশিকান্ত। পৃথিবীটা আবার বাদলা দিনের মতো ছোট হয়ে এসেছে। টর্চ বাতির আলোর চৌহদ্দিতে বাঁধা জীবন। আগুপিছু আর কিছুই দেখা যায় না। এই বেশ আছে নিশিকান্ত। এবার নিশ্চিন্তে সে হাঁটে।

চিঠি

ভূতটাকে আমি দেখেছিলাম পুরোনো পোস্ট-অফিসের বাড়িতে। সেই থেকে ভূতের গল্পটা সবাইকে বলে আসছি, কেউ-কেউ বিশ্বাস করছে, কেউ কেউ করছে না।

নদীর একটা দিক ভাঙতে-ভাঙতে শহরের উত্তর দিকটা অনেকখানি গিলে ফেলল। পুরোনো পোস্ট-অফিসের বাড়িটা থেকে যখন আর মাত্র বিশ গজ দূরে জল, তখনই প্রমাদ বুঝে সরকার তরফ অফিসটা শহরের মাঝখানে তুলে আনেন। পুরোনো বাড়িটা নদীগর্ভে যাওয়ার জন্য মৃত্যুদণ্ডাদেশ পেয়ে একা পোড়োবাড়ির মতো দাঁড়িয়ে রইল, তার বিশ গজ দূর নদীর পাড় আরও খানিক ভাঙল। আরও খানিক। আরও খানিক। ভাঙতে-ভাঙতে একদিন সেই জল এসে বাড়ির ভিত ছুঁয়ে ফেলল। তলা থেকে ধুয়ে নিয়ে গেল মাটি। কিন্তু সে সময়ে বর্ষার পর জলে মন্দা লেগে যাওয়ায় সে বছরের মতো পুরোনো পোস্ট-অফিসের বাড়িটা বেঁচে যায়। কেবল নদীর দিকটায় ভিতের জোর কমে যাওয়ায় একটু কাৎ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার বারান্দার দুটো মোটা থাম ভেঙে ছাদের একটা অংশ নেমে এসে আড়াল দিল। নৌকো বেয়ে নদী দিয়ে যেতে-যেতে চেয়ে দেখলে মনে হত, ঠিক যেন নতুন বউ ঘোমটা দিয়েছে লজ্জায়, যেমন নতুন বউরা ঘাটে এসে নৌকো দেখলে দেয়।

ওই ভাবেই রয়ে গেল বাড়িটা, কেউ সে বাড়ির দখল নেয়নি। কেবল তার জানালা দরজাগুলো গরিব-গুর্বোরা খুলে নিয়ে গেল, কিছু আলগা ইঁট নিয়ে গেল লোকজন। কিন্তু পিসার হেলান স্তম্ভের মতো সেই হেলা-বাড়িতে কেবল নদীর বাতাস বইত দীর্ঘশ্বাসের মতো, আর ছিল বাদুড়, ইঁদুর, চামচিকে, সাপখোপ আর উদ্ভিদ। গাছের জান বড়ো সাংঘাতিক, তারা ভিত ফাটিয়ে গজায়, দেওয়ালে শেকড় দিয়ে গর্ত খুঁড়ে ফেলে। তা এরাই সব ছিল, আর কেউ নয়।

তখন আমি ছোট, বছর সাত আটেক বয়স হবে। সে বয়সটার ধর্মই এই যে পৃথিবীর সব কিছু হাঁ করে দেখি, সব কথা হাঁ করে শুনি। কিছু বোকা-সোকাও ছিলাম। বড়রা কেউ

সঙ্গে না থাকলে যেখানে সেখানে যাওয়া বারণ ছিল, যাওয়ার সাহসও ছিল না।

তখন দাদু বিকেলবেলায় প্রতিদিন একহাতে আমার হাত অন্য হাতে লাঠি নিয়ে বেড়াতে বেরোত। সবদিন একদিকে বেড়ানো হত না। তবে প্রায়দিনই আমরা নদীর পাড়ে যেতাম। নদী শহরের ভিতর ঢুকে এসেছে, কাজেই বেশি দূর যেতে হয় না। একটু হাঁটলেই নদী। শহর বাঁচানোর জন্য বাঁধের ব্যবস্থা হয়েছে। চাঁই চাঁই পাথর, মাটি সব ফেলা হচ্ছে। শীতকাল তখন, বিশাল, বিস্তীর্ণ চর ফেলে নদী আবার অনেকটা উত্তরে সরে গেছে। সে চরের মাটি চন্দনের মতো নরম, তার উর্বরতা খুব। সেই মাটিতে বিষয়ী বিচক্ষণ লোক চাষ দিয়েছে, জমির কোনও দাবিদার নেই। যে চষে তার। চমৎকার গাঢ় সবুজ সব ফসলের সতেজ চেহারা নদীর মারকুটে ভয়ংকরতাকে ঢাকা দিয়েছে, সেই ফসলের জল যোগান দিয়ে তিরতিরে নদীটা বয়ে যাচ্ছে ক্ষীণ তিন চারটে ধারায়।

আমি আর দাদু সেই নদীর পাড়ে দাঁড়াতাম, দাদু লাঠিটা তুলে দূরের দিকে দেখাতেন। বলতেন—ওই যে কাকতাড়ুয়া কেলেহাঁড়ি দেখছ ওইখানে ছিল একটা বহু পুরোনো ডুমুর গাছ। ওর তলায় পঞ্চাশ ষাট বছর আগেও রাম পণ্ডিতের পাঠশালা ছিল। আর ওই যে ডালের খেতে একটা খোড়ো ঘর, ও ছিল ডাকাতে কালীবাড়ি। এখন দেখে বোঝাই যায় না, ওই নদীর ওপর দিয়ে একটা সুরকি বাঁধানো সড়ক গিয়েছিল জমিদার বাড়ি তক।

শহরের অনেকটা অঞ্চল হারিয়ে গেছে। সেই অংশটুকুতে ছিল বসত, ইস্কুল, মন্দির, রাস্তা। সেইটুকুই সব নয়, তার সঙ্গে অনেকের বাল্য ও কৈশোরের নানা স্মৃতিচিহ্ন। কত পুরোনো গাছ, পাথর ঘাট-আঘাটা।

দাদু নদীর ধারে এলে কিছুক্ষণ আমাকে উপলক্ষ্য করে সেই সব পুরোনো স্মৃতির চিহ্নগুলোর স্থান নির্দেশ করার চেষ্টা করতেন। তারপর চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতেন। নতুন ঘাট তৈরি হয়েছে, সেখানে নৌকো বাঁধা। দাদু কখনও সেই ঘাটের কাছে গিয়ে ঝিম হয়ে বসে থাকতেন। তাঁর একদিকে লাঠি, অন্য ধারে আমি।

বাঁ-ধারে, অনেকটা দূরে পুরোনো পোস্ট-অফিসের রহস্যময় হেলা বাড়ি দেখা যেত। জানলা দরজার প্রকাণ্ড হাঁ-গুলো শোকার্ত চোখের মতো চেয়ে আছে সজীব পৃথিবীর দিকে। ভিতরে অন্ধকার ঘুটঘুট্টি। সামনের বর্ষায় যদি বাঁধ ভাঙে তো আর পৃথিবীর মেয়াদ শেষ হবে। বাঁধ না ভাঙলেও হেলাবাড়ি নিশ্চয়ই ওইভাবে রেখে দেবে না লোকে। ভেঙে ফেলবে। মুমূর্ষু বাড়িটা এই সত্যটা বুঝতে পেরেছিল। সে তাই অজানা মানুষের কাছে তার মৃত্যুর সংবাদ পাঠাত ওইসব অন্ধকার চোখের ভাষায়।

বিকেল ফুরিয়ে এলে আমরা নিঃশব্দে উঠে আসতাম।

একদিন ওইভাবে দাদু ধ্যানস্থ। নদীর ওপর শীতের শেষবেলার একটা অদ্ভুত আবছা আলো পড়েছে। ফসলের খেত নিস্তব্ধ নিঃসাড়। একটা কুয়াশার গোলা নদীজল থেকে উঠে আসছে। ঘাটে জনহীন নৌকো বাঁধা। জলে স্রোত নেই, শব্দ নেই।

সেই বয়সের যা স্বভাব। আমি উঠে কিছুদূর একা-একা হাঁটলাম। কাঁকড়ার গর্ত, মানুষ ও পশুর মল পড়ে আছে, বিজবিজে কাঁটাঝোপ সর্বত্র। জলের একটা পচাটে গন্ধ শীতের বাতাসকে ভারী করে তুলছিল। একটা লাল বল গড়িয়ে-গড়িয়ে পায়ে-পায়ে নিয়ে আমি আস্তে-আস্তে ছুটছি। কখনও দাঁড়াচ্ছি। দাদুর দিকে ফিরে দেখি, দাদু তেমনি বসে আছেন। সাদা লাঠিটা দূর থেকেও দেখা যাচ্ছে।

কোথায় একটা ইশারা ছিল। একটা ইংগিতময় ষড়যন্ত্র! নদীর ভাঙা পাড় বেয়ে নেমে গিয়ে জল ছুঁয়ে শীতভাব টের পাই। বলটায় নোংরা লেগেছিল। সেটা জলে ধুয়ে উঠে আসছি, ঠিক সে সময়ে মুখ তুলে দেখি ঠিক মাথার ওপরে হেলা বাড়িটা ঝুলছে। ভিতের থেকে মাটি ক্ষয়ে গিয়ে একটা ঝুল বারান্দার মতো ঝুঁকে আমাকে দেখছে।

এত কাছ থেকে ওভাবে বাড়িটাকে দেখিনি কখনও। দাদুকে তখনও দেখা যাচ্ছিল, বিকেলের হালকা অন্ধকার তাঁকে ঢেকে ফেলেনি তখনও। সাদা লাঠিটা তখনও ঝলকাচ্ছে। মুখ তুলে বাড়িটা আবার দেখি। বাড়িটার মাথার ওপরে একটা ফ্যাকাসে চাঁদ।

ভূতটাকে তখনই দেখতে পেলাম।

কথাটা কিছু ভুল হল। ভূতটাকে আসলে আমি দেখেছি কি? বোধহয় না। দেখা নয়, ভূতটাকে তখনই টের পেলাম।

নদীর দিক থেকে কখনও-কখনও হাওয়া দেয়। দমকা হাওয়া! একবার শ্বাস ফেলেই চুপ করে যায়। চাঁদের আলোটা তক্ষুনি একটু ঢেকে দিল কুয়াশা এসে। ঘোমটা খুলে বাড়িটা তখন চারধারে চেয়ে দেখে নিল একটু।

পায়ে-পায়ে আমি খাড়া পাড় বেয়ে উঠতে লাগলাম। কোনও কারণ ছিল না, কেবল মনে হল, একটু বাড়িটা দেখে আসি তো।

কিন্তু দেখার কিছু ছিল না, চারধারে ভাট আর শ্যাওড়ার জঙ্গল, বিছুটির পাতা ছোঁয়ার জন্য হাত বাড়িয়ে আছে। দু-একটা বড় নিম গাছ, এসব পার হয়ে অন্ধকার দরজার কাছে গেলে দেখা যায়, ভিতরে গভীর অন্ধকার, ধুলোর ধূসরতা, চামচিকে ডেকে ওঠে। একটা বাদুড় ডানা ভাসিয়ে শূন্যে ঝুলে পড়ে আচম্বিতে। দাঁড়িয়ে থাকি। অন্ধকার সয়ে আসে চোখে। তাকিয়ে থাকতে-থাকতে হঠাৎ দেখতে পাই, বড় ঘরটার মেঝেয় একটা চিঠি পড়ে আছে। একটা চিঠি। আর কিছু নয়।

একটার-পর-একটা বাদুড় অন্ধকারের আভাস পেয়ে জানলা দরজা দিয়ে উড়ে যাচ্ছে, জ্যোৎস্নায় ঝুলে পড়ছে নদীর ওপরকার শূন্যতায়। ব্যস্ত চামচিকেরা ডাকছে পরস্পরকে। পুরীষ গন্ধ নাকে এসে লাগে। দাঁড়িয়ে থাকি! একটা চিঠি পড়ে আছে ঘরে।

কার চিঠি? কাকে লিখেছে? কে ফেলে গেল ওইখানে?

একসঙ্গে অনেকগুলি শব্দ ওঠে। নিমগাছে ফিসফিস হাওয়া কথা কয়। তক্ষক ডেকে ওঠে নিজস্ব ভাষায়। বাড়িটার ভিতরে নীচে অদৃশ্য জলের শব্দ হয়। কার চিঠি! কার চিঠি!

দাঁড়িয়ে থাকি। চিঠিটা পড়ে আছে ধুলোয়। সাদা, চৌকো।

সন্ধে হয়ে এল। আলো জল থেকে তুলে নেয় তার শরীর। নদীর পরপারে ঘোর লাগা অন্ধকার। বেলা যায়।

কথা হয়। সে কেমন কথা কে জানে! কিন্তু তবু জানি, চারধারে কথা হয়। গাছের, জলের, বাতাসের, কীট-পতঙ্গের। প্রাণপণে তারা করে বার্তা বিনিময়। সে রকমই একটা কথা চারধারে তৈরি হতে থাকে।

হঠাৎ উত্তর পাই—তোমার, নাও।

প্রকাণ্ড অন্ধকার ঘরের মেঝেয় চিঠিখানা পড়ে আছে। সাদা, চৌকো। তুলে নাও। ও চিঠি তোমার জন্যই পড়ে আছে।

আমার চারধার অপেক্ষা করছে, দেখছে। চিঠিটা আমি তুলে নিই কি না।

আমি নিলাম না।

দাদু দূর থেকে ডেকেছিল—কোথায় গেলে ভাই?

আমি মুখ ফিরিয়ে নিলাম। মাথা নেড়ে বললাম—না, নেব না।

উত্তর পেলাম—যেখানেই থাকো, পৃথিবীর যে-প্রান্তেই থাকো, একদিন-না-একদিন এই চিঠি ঠিক তোমার ঠিকানা খুঁজে যাবে। চিঠি পাবে, চিঠি পাবে।

ভূতটা আমি দেখেছিলাম সেই প্রথম ও শেষবার, পুরোনো পোস্ট-অফিসের বাড়িতে। ঠিক দেখা একে বলে না। অনুভব করা। একটা প্রকাণ্ড ঘর, ধুলোটে মেঝে, একটা সাদা চৌকো চিঠি পড়ে আছে।

ভয় করে না। তবে চোখে জল আসে কখনও কখনও। বয়স হল। কবে সেই শহর ছেড়ে চলে এসেছি। কতদূরে। কিন্তু ঠিক জানি, চিঠি পাব। চিঠি পাব।

জ্যোৎস্নায়

বিলেত থেকে মোট দেড়খানা চিঠি লিখতে পেরেছিল লেবু। আর সময় পায়নি। মদ সেখানে বেজায় সস্তা, আর ভারী ভালো। অফিসের সময়টুকু বাদ রেখে বাদবাকি সময় লেবু লন্ডনের নালায় নর্দমায় পড়ে থাকে, সাহেবরা বড্ড বিপদে আছে তাকে নিয়ে।

এ খবর জানিয়েছে ডাক্তারের ভাইঝি-জামাই নৃপেন, তার কাছেই থাকে লেবু। থাকে মানে ওই আর কি—থাকার কথা, আসলে তো থাকে ফুটপাথেই।

চিঠি পেয়ে ভারী রেগে যায় ডাক্তার। রুগিভরা চেম্বার ছেড়েই উঠে আসে ভিতর বাড়িতে, দুই বউকে ডেকে হেঁকে বলে—এই দ্যাখো তোমাদের দেওরের কাণ্ডটা দ্যাখো। বলে নৃপেনের লেখা এয়ারোগ্রামখানা তাদের দিকে ছুড়ে দিয়ে আবার গোঁ-গোঁ করতে-করতে চেম্বারে গিয়ে ঢোকে।

দুই বউ আসলে দু-বোন। বড়টি সোনালি। বাঁজা। বিয়ের দশ বছর তক বাচ্চা না হওয়ায় স্বামীর পায়ে মাথা খুঁড়ে নিজের ছোট বোন রূপালিকে বিয়ে করিয়েছে। ভারী ভাব দুই বোনে, সতীনের কোঁদল নেই। রূপালি দুটো ছেলেমেয়ের মা। সোনালি বাচ্চাগুলো নিয়ে সারাদিন পড়ে থাকে। রূপালি হুটোপাটা করে কাজ সারে, গান গায়, সিনেমায় যায়। বাচ্চাদের সঙ্গে তেমন সম্পর্কই নেই। তাতে সোনালিই বেশি খুশি। বাচ্চারা কথা বলতে শিখতেই সে তাদের নিজেকে মা আর রূপালিকে ছোট মা ডাকতে শিখিয়েছে।

এয়ারোগ্রামখানা দুই বোনে পড়ে। লেবু সোনালির চেয়ে বয়সে ছোট, রূপালির চেয়ে বড়। সোনালি দেওরের জন্য চিন্তায় পড়ে। রূপালি গালে হাতে দিয়ে বলে—ওমা! বিলাতেও নালা-নর্দমা আছে! বলে সে গুনগুন করে গান গাইতে-গাইতে নিজের কাজে উঠে যায়।

পেটের রোগে ডাক্তারের খুব হাতযশ। একটা খয়েরি রঙের ক্কাথ মতো ওষুধ দেয়, তাতেই খিদে বেড়ে রোগীরা চাঙ্গা হয়ে ওঠে। অনেকের সন্দেহ ডাক্তারের ওষুধে আফিঙ

মেশানো আছে। তা হোক, চেম্বার তবু খালি যায় না। ইচ্ছে করলে আরও দুটো বউ মেনটেন করতে পারে।

'ব্লাডি ড্রাঙ্কার্ড' বিড়বিড় করে এই কথা বলে আবার চেম্বারে ঢোকে ডাক্তার। ভ্রূ কোঁচকানো, মুখ গম্ভীর। এমনিতে ডাক্তার ভারী হাসিখুশি গোলগাল শান্ত মানুষটি। গম্ভীর হলে থলথলে গাল দুটো কাঁপে, ঠোঁট নড়ে, তখন তাকে দেখলে হাসি সামলানো দায়। বিলেতটা সিভিলাইজড দেশ, সেখানে কত রকম গাড়ি-ঘোড়া চলে, আর সেখানে ল্যাবাবাবু রাস্তায়-ঘাটে পড়ে থাকে, অ্যাকসিডেন্ট হতে কতক্ষণ! তা ছাড়া দেশের প্রেস্টিজ বলেও একটা কথা আছে। সাহেবরা বাঙালিকে ভাববে কী? পুরো সকালটাই ডাক্তার গম্ভীর থাকে, গাল কাঁপে, ঠোঁট নড়ে।

বেলা এগারোটায় কল-এ বেরিয়ে চৌমাথায় হাতকাটা হরেন পাড়ুইকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে লঝঝরে মোটর সাইকেলখানা থামায় ডাক্তার।

—হরেন, ব্ল্যাকিটার খবর জানিস?

ব্ল্যাকি বা ডার্টি নিগার, ব্লাডি ড্রাঙ্কার্ড কিংবা শুধু ল্যাবা একজনেরই নাম, ডাক্তারের দেওয়া। লোকটা লেবু।

—কী খবর দাদা? লেবু খুব টানছে?

—টানবে সে তো জানা কথা। বংশের ধাত। কিন্তু নিগারটা যে কাছা আলগা দিয়ে গিলছে। প্রেস্টিজ রাখল না।

—টানতেই তো গেছে।

—সাহেব সুবোরা এদেশে এসে মাতাল হয়, কখনও দেখেছিস? ডার্টি নিগারগুলোই ওদেশে গিয়ে মদ আর ইয়ের নামে হামলে পড়ে!

—সাহেব আর দেখলাম কোথায় দাদা! যখন আমাদের চোখ ফুটেছে, ততদিনে তোমরা যে দেশ থেকে সাহেব ফরসা করে দিয়েছ!

একটু খুশি হয় ডাক্তার। সে নিজে ঠিক স্বদেশি ছিল না বটে, কিন্তু একবার বিয়াল্লিশে পুলিশের সামনে বন্দেমাতরম বলে চেঁচিয়ে ছিল বলে তাকে পুলিশ ধরে নিয়ে যায়, পরদিন আদালতে কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আটকে রেখে ছেড়ে দেয়। সেই থেকে স্বদেশি বলে তার খুব নামডাক। তাম্রপত্র পাওয়ার কথাও উঠেছিল। পায়নি শেষ পর্যন্ত।

—সাহেব তাড়িয়েই খারাপ হল দেখছি। তারা থাকলে অন্তত তোরা সাহেবি মাতলামিটা শিখতে পারতিস।

—লেবু শিখে নেবে, সদ্য গেছে তো। ভেবো না।

একটু দুঃখের সঙ্গে ডাক্তার বলে—সে সব সাহেব কি আছে আর? এখন শুনি তারা সব কেত্তন করে, উলিঝুলি পোশাক পরে ভিখিরির মতো ঘোরে। যত সব ন্যাকরা। কলকাতায় যে-সব সাহেব আসে...হুঁ:। বলে মোটর সাইকেল চালিয়ে দেয় ডাক্তার।

বিকেলে ডাক্তার ঘুড়ি ওড়ায়। শরতের আকাশ দেখলে ডাক্তার আর থাকতে পারে না। উপরন্তু লেবুর জন্য দুশ্চিন্তা আছেই। দুশিন্তা কি একটা? লেবুর রেশনকার্ড থেকে এখনও রেশন তোলা হচ্ছে। ডাক্তার বারণ করেছিল, কিন্তু বড় বউটা বড্ড টিকরমবাজ, বলে—সবার ঘরেই দু-চারখানা বাড়তি কার্ড আছে। অন্যায়টা কী শুনি! এ এক দুশ্চিন্তা ডাক্তারের। তার ওপর আফিমের ব্যাপারটা খুব চাউর হয়ে গেছে। সেটা আর একটা পৃষ্ঠব্রণ। ঘুড়ি ওড়ালে মনটাও ওড়ে। বিকেলবেলাটায় গোটা পাঁচেক ঘুড়ি কেটে ডাক্তারের মন ভালো হয়ে গেল।

সন্ধের মুখে জটা এল। গায়ে র‍্যাপার। বিস্তর ভাইনাম গ্যালোসিয়া ফাঁক করেছে ডাক্তারের। আবারও চায় বুঝি, ভেবে মনে-মনে আঁতকে উঠেছিল ডাক্তার। পাড়ার মস্তানদের সর্দার-পোড়ো, আফিমের ব্যাপার কিংবা রেশন কার্ডের খবর সবই রাখে।

—কী ব্যাপার রে?

—মুরগি আনাও দাদা।

—কেন?

—কাল দুপুরের লোকালে কেষ্টনগরে ফ্লাই করছিলুম, আজ সকালে এসে ল্যান্ড করছি আবার। এক ওস্তাদ কেষ্টনগরে মৌরি থেকে মাল তৈরি করেছে। এক বোতল এনেছি তোমার জন্যই।

বলে র‍্যাপারের তলা থেকে একটা মস্ত বোতল বের করে। ডাক্তার ভারী খুশি হয়ে পড়ে। বোতলের মুখ খুলে শুঁকে বলে—দিব্যি গন্ধ ছাড়ছে রে!

—মিঠে মাল দাদা। গোলাপি নেশা লেগে যায়। মাইরি, মুরগি আনাও।

ডাক্তার গম্ভীর হয়ে বলল—মাল ফাল আর ছুঁতে ইচ্ছে করে না। ল্যাবাটা ঘেন্না ধরিয়ে দিলে।

—সবই শুনেছি দাদা, লেবুটা তোমাদের ঘরানা পায়নি। তোমার বাপ দাদারা মাল খেত, আমার বাপ-দাদার কাছে শুনেছি। তারা কিছু কম খানেওয়ালা ছিল না। তারা মাল খেয়ে রাজা-উজির সাজত, মুখে হাতিঘোড়া মারত, কু-বাক্যি বলা কি মারধর করা তাদের ধাতে ছিল না, রাস্তায় গড়ানো মাতালকে তারা ঘেন্না করেছে। কিন্তু লেবুটা? ছিঃ ছিঃ!

বংশ গৌরবে ডাক্তারের চোখ চিকচিক করছিল। একদৃষ্টে জটার মুখের দিকে চেয়ে কথাগুলো পান করল সে। তারপর নিশ্বাস ছেড়ে বলল—বাবাকে দেখেছি, চুরচুরে মাতাল অবস্থায় ঘোড়ার গাড়ি থেকে নামছেন। পাদানিতে পা ফেলেছেন ঠিক মতো, কোঁচানো ধুতি এদিক ওদিক হয়নি, সিল্কের পাঞ্জাবির পাট নষ্ট হয়নি, কাঁধে চাদরের পাটটি পর্যন্ত ঠিকঠাক আছে। দুটো চাকর গিয়ে দুবগলে কাঁধ দিয়ে দোতলায় পৌঁছে দিয়ে যেত। মাথা উঁচু করে চলাফেরাটা মাতাল অবস্থাতেও বজায় রেখেছিলেন। আর তাঁর ছেলে লেবুর মুখে কতবার রাস্তার কুকুর ইয়ে করে দিয়ে গেছে। কার ছেলে কোথায় নেমেছে দ্যাখ!

মুরগি এসে গেল। ফোঁড়া কাটার ছুরিটা বের করে ডাক্তার তার সাবেক কালের বাড়ির উঠোনে গিয়ে জোড়া মুরগি নিয়ে বসে। ছাড়াবে। উড়ুক্কু মাছের গল্প পড়তে-পড়তে উঠে এল মেয়েটা, ছেলেটা বাতাসের মুখে খবর পেয়ে খেলা ছেড়ে দৌড়ে আসে। বড়-বউ সোনালি এসে সাবধান করে —পেটে ডিম থাকলে মেরো না কিন্তু।

ডাক্তার লাল-চোখে চায়। আধ বোতল মৌরীর মাল ফাঁক করে গেছে ইতিমধ্যে। পান-জরদা অ্যালকোহলের গন্ধ ছেড়ে ডাক্তার বলে—পেটের ভিতরকার ডিম আন-ফার্টিলাইজড, খেলে শরীরে টক্সিন ডিপোজিট কম হয়। যা জানো না, তা নিয়ে কথা বলা কেন?

—তুমি বাপু বড্ড নির্দয় মানুষ। বলে বড়-বউ সরে যায়।

মেয়েটা ওই রকম ডিম ভালোবাসে। ডাক্তার একটা মুরগির পেট থেকে সাবধানে দুর্লভ ডিমসুদ্ধ থলি বের করে। মেয়েটা আনন্দে চেঁচায়।

জটা পাড়ায় খবরটা ছড়িয়েই এসেছিল। মুরগি কষা হতে না হতে পাড়ার মস্তান-মুরিব্বি দু-চারজন এসে গেল। মৌরির মাল ততক্ষণে ফরসা। অগত্যা ডাক্তার তার নিজের স্টক বের করে। দুর্লভ জিনিস। বিলেত থেকে দেড়খানার বেশি চিঠি পাঠায়নি লেবু, কিন্তু চার-পাঁচ কিস্তিতে কয়েকজন ঘরে ফেরা বাঙালির সঙ্গে পাঠিয়েছে, স্কচ হুইস্কি, রাম, এক বোতল শ্যাম্পেন। লোকে কলম, রেডিও, ঘড়ি পাঠায়, লেবু সে-সবের ধার দিয়েও যায়নি। ল্যাবাটার দূরদৃষ্টি খুব। সমঝদার ছেলে।

মাইফেলটা জমে গেল খুব। জটা আর তার সাকরেদরা বিদায় নিল ইংরিজি তারিখ পেরিয়ে। সামনের মহল থেকে ভিতর মহল পর্যন্ত দোতলায় একটা ঝুলবারান্দা আছে,

অনেকটা পোলের মতো। সেটা ধরে ভিতরে মহলে ফিরবার সময়ে ডাক্তার দেখে, ভারী ভালো জ্যোৎস্নায় মাখামাখি হয়ে আছে বারান্দাটা। রেলিঙের ছায়ায় নানা নক্সা। তারই মধ্যে ডাক্তারের ছায়াটা টলতে-টলতে যাচ্ছে। ভারী লজ্জা পায় ডাক্তার। জিভ কাটে। ধমক মারে—'অ্যাও!' ছায়াটা ভয় পেয়ে স্টেডি হয়ে যায়। রেলিঙে ভর রেখে সাবধানে হাঁটে ডাক্তার! ছায়াটা না টলে আবার।

মাসি

দু-হাতের দুটো বুড়ো আঙুল নেই বলে ফটকের আটকায় কীসে? কিছুতেই না। কেবল মাঝে- মাঝে মাসি দুঃখ করে বলে—আহা, আমার ফটকের যদি দুটো বুড়ো আঙুল থাকত।

মাসি হচ্ছে কড়ে রাঁড়ি। ফটকেই তার ধ্যান জ্ঞান। বর্ধমানে ফটকের অপদার্থ বাপ এক ভুসিওলার আড়তে দাঁড়িপাল্লা সামলায়, বাদবাকি সময়টা হয় দিশি মাল গেলে, নয়তো বোকা মুখে সুখসুখ ভাব ফুটিয়ে পায়ের একজিমা চুলকোয়। ছেলেপুলেগুলো রাস্তার ধুলোকাদা মেখে ভূত সেজে বাউণ্ডুলেপনা করে বেড়ায়। ওই ভূতের দল থেকে মাসি বেছেগুছে ফটিককেই তুলে এনেছিল একদিন। দুটো বুড়ো আঙুল না থাকায় সে ছিল মা-বাপের কমতি ছেলে। পুরো ছেলে নয় বলে বাপ তাকে পুষ্যিপুত্তুর দিতে আপত্তি করেনি, মা কিছু কান্নাকাটি করেছিল, তা সে হচ্ছে মায়েদের ধাত, মনোমাসির বিষয়সম্পত্তি একদিন যে ফটিকই পাবে তা বুঝতে না পেরে। এক ভাগীদার ভাগনে মাঝে-মাঝে এসে হামলা করে। নইলে মাসির খোলার চালের বাড়ির আর তিন বিঘে ধানী জমি, কিছু সোনাদানা—এসব ফটকেই পাবে। মাসি ধর্মভীরু লোক, স্বামীর ব্যাঙ্কের টাকা-পয়সার সুদ থেকে সংসার চালায়। ইচ্ছে করলে মাসি টাকাটা বাইরে চড়া সুদে খাটাতে পারত। খাটায় না। সন্ধেবেলা ভাগবত পড়ে বারান্দায় বসে। সেই ভাগবত শুনতে মাঝে-মাঝে দু-চারজন বুড়ি বিধবা এসে বসে। তাদের কাছেই দুঃখ করে মাসি—আহা আমার ফটকের যদি দুটো বুড়ো আঙুল থাকত।

বুড়িরা সায় দিয়ে বলে—আঙুল থাকলে ও ছেলের আর দেখতে হত না। বুড়ো আঙুল ছাড়াই বা ওর আটকায় কীসে?

ঠিক কথা। ফটিকের আটকায় না। মাসি তাকে বসে থাকতে দেয় না। সাইকেল চালানো শিখতে পাঠায়। তবলা বাজানো শিখতে পাঠায়। গাড়ি চালানো শিখতে পাঠায়। তার ধারণা, ফটিককে দিয়ে সব হবে। দিব্যি সাইকেল চালায় ফটিক, চাটুজ্জেদের ড্রাইভার

মদনার সঙ্গে ভাব জমিয়ে গাড়ি চালাতেও শিখে গেল প্রায়। ভরসা আছে, মাসি একটা লরি কিনে দেবে ওকে। লম্বা লম্বা ট্রিপ মেরে দেদার কামাবে ফটিক। বুড়ো আঙুল ছাড়াই ও সবাইকে বুড়ো আঙুল দেখাবে একদিন।

পাড়ার ফাংশানে সেদিন রেডিয়ো আর্টিস্ট অনিলবরণ গাইতে এসে ফটিককে দেখে চোখ কোঁচকাল, বলল—তুই পারবি?

ফটকে তবলায় পাউডার মাখাতে-মাখাতে বলল—তুমি গান ধরো না।

অনিলবরণের চাকরি ভালো নয়। হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির জমাদারদের কাজ দেখে বেড়ায়। কিন্তু তার চুল ফাঁপানো, পোশাক হালফিলের প্যান্ট-শার্ট, পায়ে চোখা জুতো, কণ্ঠে সর্বদা গুনগুনানি। একবার রেডিয়োতে চান্স পেয়েছে। গায়ক অনিলবরণের ডাঁটই আলাদা। এ অঞ্চলের সব ফাংশানে সে বাঁধা আর্টিস্ট। ফটকেকে তাই নীচু নজরে দেখে। অবহেলায় ফাংশানমারা একখানা সাপটা মেরে মৃদু স্বরে ফুলপ্রজাপতি-তুমি-আমি-মার্কা আধুনিক ধরে ফেলল। টপাটপ টুম টপাটপ টুম আওয়াজে তবলায় বোল তুলে ফেলে ফটিক। শ্রোতারা অনিলবরণকে ছেড়ে ফটিকের আট আঙুলের কাজ দেখে, আর বাহবা দেয়। সামনে বাচ্চারা চেঁচাচ্ছে—ফটিকদা, চালিয়ে যাও।

অনিলবরণ হারমোনিয়ামে সুর ধরে রেখে নীচু স্বরে বলল—ফটকে, ঘিঁষে মার।

তা ফটিক ঘিঁষে মারল। বাঁয়াতে দিব্যি পরিপাটি কাজ দেখায় সে। মুখে হাসি। অনিলবরণ গেয়ে উঠে তার পিঠ চাপড়ে দিল—বেশ বাজিয়েছিস।

তা ফটিকের আটকায় না। মাসির ছানি কাটার পর আজকাল সে-ই জামাকাপড়ের ফাটাফুটো ছুঁচ সুতোয় সেলাই করে, ছেঁড়া বোতাম বসিয়ে নেয়। বুড়ো আঙুল ছাড়াই সে দিব্যি উলও বুনতে পারে। তর্জনী আর মাঝের আঙুলে কলম চেপে ধরে সে গোটা-গোটা অক্ষরে লেখালেখি যা চালায়, কে বলবে সেই হাতের লেখা বুড়ো আঙুল ছাড়াই লেখা হয়েছে। পাড়ায় সে হচ্ছে একটা উদাহরণ। দু-আঙুল কমতি ফটকে যা পারে তা বাড়তি দু-আঙুলের লোকেরা পারে না।

উদাহরণ আরও আছে। পঞ্চাননতলার হারাধন। কোমরের নীচের অংশটুকু শুকিয়ে কুঁকড়ে এইটুকু। হারাধন হাঁটে হামাগুড়ি দিয়ে। হাঁটুতে দড়ি দিয়ে বাঁধা চামড়ার একটু গদি, দুহাতে একজোড়া কাঠের খড়ম, ভিড়ের রাস্তায় এঁকেবেঁকে অনায়াসে চলে যায় সে। আটকায় না। কুকুর বেড়াল যদি চার পায়ে বিশ্বসংসার চষতে পারে তবে হারাধনই বা পারবে না কেন? হারাধন বাজার করে, দোকানে সওদা করে, দোতলার সিঁড়িও দরকার মতো ভাঙতে পারে। বেঁচে থাকা মানেই হচ্ছে কম্পিটিশন।

নানা ধান্ধায় ঘুরেটুরে অবশেষে হারাধন গত বারো বছর যাবৎ তার বাড়িতে এক কালীমন্দির দিয়েছে। ভারী জাগ্রত কালী। হাফ প্যান্টপরা হারাধন গায়ে একটা পাটের চাদর জড়িয়ে পুজো করতে বসে। বেলা দশটায় শুরু হয় তার জনসংযোগ। একটা একসারসাইজ বুক খুলে পেনসিল হাতে বসে থাকে। খাতায় কয়েকটা খোপ কাটা। সেইসব খোপে বিচিত্র অঙ্ক লেখা আছে। তার রোগা-টোগা বুড়োমানুষ বিধবা মা ছেলের পিছনে এসে হাতজোড় করে বসে থাকে তখন।

লোকজন এলে তাদের সমস্যার কথা শুনে টুনে হারাধন গম্ভীরভাবে চোখ বুজে ধ্যানস্থ হয়, এক সময়ে হঠাৎ আস্তে-আস্তে ডাকতে থাকে—মা, মাগো, ও মা। সে ডাক তার আসল মাকে নয়, কালীকে। হাতের পেন্সিল যেন স্বপ্নের ঘোরে সরতে-সরতে একটা ঘরে গিয়ে স্থির হয়। এসেছে, মা এসেছে। হারাধন তখন এমনভাবে কথাবার্তা শুরু করে যেন টেলিফোনে কারও সঙ্গে কথা বলছে। বলে—তা হ্যাঁ মা, এই জয়চরণদার বড় বিপদ, একবার এদিকে বেড়াতে-বেড়াতে আসবেন নাকি? সময় কি হবে মা? ওপার থেকে কালী কী বলেন, তা এ পাশের সাধারণ শুনতে পায় না, কিন্তু হারাধন শোনে ঠিকই। বলে—এই ধরুন কাল রাত দশটা-এগারোটা নাগাদ মিনিট পনেরোর জন্য কি সময় হবে মা! হবে আচ্ছা মা, তবে ওই কথাই রইল—। এবং তখন চোখ খুলে আসল মার দিকে চেয়ে হারাধন গম্ভীর হয়ে বলে—শুনলে তো? কাল রাত দশটা এগারোটার মধ্যে মা আসবেন। তার মা তখন ভারী আতঙ্কিত হয়ে বলে—তাহলি তো পুজোর জোগাড় করতি হয়। হারাধন অবজ্ঞাভরে জয়চরণের দিকে চেয়ে বলে—তাহলে, খরচাপাতি ইত্যাদি।

আট-আঙুলের ফটকের সঙ্গে হারাধনের ভারী ভাব। যাতায়াতের পথে ফটকে হারাধনের জাগ্রত কালীর স্থানে একবার মাথা ঠুকে যায়। সময় থাকলে বসেও পড়ে। হারাধন তার দুটো কমতি আঙুলের হাতদুখানার দিকে চেয়ে বলে—জন্মের দোষ বুঝলি?

ফটকে মাথা নাড়ে—আর তোমারটা?

—এ হচ্ছে ক্ষণের দোষ। টাইফয়েড না হলে—একটা শ্বাস ফেলে বলে—সবই মায়ের ইচ্ছে। তিনিই পা ভেঙে আটকে রেখেছেন তাঁর কাছে, নইলে হয়তো পিছলে যেতুম।

তবু কারও কিছু আটকে থাকে না। হারাধনেরও দিন চলে। ফটিকেরও। হারাধন মাঝে-মাঝে ডেকে বলে—মন্তর নিবি নাকি, ও ফটিক?

ফটিক রাজি। কিন্তু মাসি রাজি নয়। অল্পবয়স থেকে ব্রহ্মচর্য করে-করে মাসি ভারী জেদি আর তেজি হয়ে গেছে। বলে—পঞ্চাননতলার হারু দেবে মন্তর! ওম্মাগো! ঠাকুরদেবতার নামে কিছু বলতে নেই, হারাধনের কালীমায়ের পায়ে গড়। কিন্তু ও কি

মন্তর দেবে খ্যাপা? ন্যালাহ্যাবলা, কুচুটে। খবরদার, ও কথা মনেও ঠাঁই দিবি না। সব নিংড়ে নেবে।

ফটিক তাই রাজি হয় না। হারাধন দুঃখ করে বলে—শেষতক লরি চালাবি ছোট লোকদের মতো! আমারই হয়েছে বিপদ! আমার সব মন্তরতন্তর, তত্বের সব গুহ্যকথা, মন্ত্রগুপ্তি—এগুলো কাকে দিয়ে যাই!

—তোমার তো অনেক শিষ্য!

কথাটা মিথ্যে। বস্তির কিছু হাঘরে, কয়েকটা রেলকুলি, আর দু-চারজন ছাতুওয়ালাকে ধরে মন্তর দিয়েছে বটে হারাধন, কিন্তু সংখ্যায় তারা বড়জোর পঁচিশ-ত্রিশ হবে কুড়িয়ে বাড়িয়ে। তবু হারাধন কথাটা শুনে খুশি হয়। বলে—তা অনেক শিষ্য বটে, কিন্তু মানুষ কটা? এই তো সেদিন লালুবাবু মন্তর নিতে এল, পয়সাওয়া লোক, বড়বাজারে পাইকারি রুমালের কারবার—কিন্তু হলে কী হয়! পলকা গেলাসে কড়া মদ ঢাললে যেমন ফেটে যায় চড়াক করে, এও হচ্ছে তাই। আধার দেখে বুঝলুম চলবে না। মন্তর কানে ঢুকতে-না-ঢুকতেই দড়াম করে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবে। আর উঠবে না। একটা কমজোরি মন্তর জপ করতে দিলুম, আসল মন্তর নেওয়ার লোক কই রে? তোকে দেখেই বুঝেছি, এই হচ্ছে আসল আধার। আমার সব সাধনটাধন ধরে রাখতে পারবে।

ফটিককে ভালোবাসে সবাই। মদনাও। চাটুজ্জেদের গাড়িটায় মদনাই তাকে সুযোগ বুঝে তুলে নেয়, এটা ওটা শেখায়। বলে—আট আঙুলে তোর যা এলেম। বুঝলি, আমার ইচ্ছে একটা গাড়ি সারাইয়ের কারখানা করি। কাঁচা পয়সা। তোর মাসি যদি কিছু ছাড়ত, কদমতলায় রাস্তায় মোড়ে একটা ভালো স্পট দেখে রেখেছি। দুজনে মিলে কারখানা চালাতাম। চাকরি করে আর কটা পয়া?

সে ফাঁদে পা দেয় না ফটিক। পিছলে বেরিয়ে যায়। কিন্তু আশ্বাস দিয়ে রাখে। ফাঁকতালে মোটরের ইঞ্জিনটা মদনার কাছ থেকে ভালোমতো চিনে নিতে থাকে।

ফটিকের আসল জায়গা হচ্ছে তার মাসি। সারাদিন শুদ্ধাচার আর শুচিবাই। ঘরে গুরুর ছবি আছে—দিনের বেশিরভাগ সেখানে বসে থাকে। ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারত এ সব হচ্ছে মাসির সারাদিনের সঙ্গী। তবু ফটিক হচ্ছে মাসির বুকের পাঁজর। সারাদিন ফটিকের কথা ভেবে-ভেবে সারা। ফটিক তাই নিশ্চিন্ত আছে।

কিন্তু নিশ্চিন্তে থাকতে দেয় না মাসির ভাগনে শ্রীপতি। কালো মতো ক্ষয়া চেহারা, বয়স চল্লিশ-টল্লিশ হবে, একসময়ে ঠিকাদারি করত, এখন কী করে কে জানে। অভাবী লোক, বড্ড বদমেজাজি, বউয়ের সঙ্গে ঝাগড়া করে একদা আত্মহত্যা করতে বাড়ি থেকে

বেরিয়ে পড়ে। হাঁটতে-হাঁটতে সেই রামরাজাতলা পর্যন্ত চলে যায়। তারপর একটা নির্জন জায়গা দেখে রেল লাইনে গলা দিয়ে শুয়ে থাকে। কিন্তু কপাল খারাপ। আগে থেকে শুয়ে থাকার ফলে একটু ঘুমভাব এসে গিয়েছিল বুঝি। হঠাৎ ট্রেনের হুইশিলের শব্দে আঁতকে উঠে আঁ-আঁ করতে-করতে কেমন হয়ে গেল, লাইন থেকে আর গলা তুলতে পারে না। বিশ গজ দূরে গাড়িটা থামিয়ে বদরাগি ড্রাইভারটা তেলকালি মাখা ভূতের মতো নেমে এসে ঘেঁটি ধরে যখন তুলল তাকে তখন সে বিড়বিড় করে বলছে, হ্যাঁ মরে গেছি। হ্যাঁ-হ্যাঁ নিশ্চয়ই মরে গেছি! ড্রাইভার সাহেব মুগুরের মতো হাতে দু-চারটে থাপ্পড় বসাতেই শ্রীপতি সজ্ঞানে আসে। তারপর সে কী দৌড়! তাই শ্রীপতির আর মরা হয়নি। জ্যান্ত শ্রীপতি তাই এসে মাঝে-মাঝে ফটিককে শাসায়—কবে কাটছ বলো দেখি ফটিকচাঁদ? আমাকে জানো তো, সালকের এক নম্বর মস্তান হচ্ছে এই শ্রীপতি সমাদ্দার। ঘাড়ে ধরে বের করব যদি নিজে থেকে না-যাও। মাসির ওপরেও টং করে যায় সে—মামি, আমি কিন্তু উকিল মোক্তার করব না। ওই ফটকের যদি ভালো চাও তো ওকে পাঠিয়ে দাও দেশে। আমার মামার ভিটেয় কাউকে চেপে বসতে দেব না।

ফটিক এসব অবস্থায় ভারী অসহায় বোধ করে। ভাবে, এমন সুখের জায়গা ছেড়ে আবার বুঝি সত্যিই তাকে বর্ধমানের বাড়িতে ফিরে যেতে হয়। কিন্তু মাসির মুখের রেখায় নড়চড় হয় না। শ্রীপতি যেন সামনে নেই, এমনভাবে মাসি তাকে অগ্রাহ্য করে, ঘরের কাজ সারে। শ্রীপতি পাড়া মাত করে ফিরে যায়। ওই রোগা, ফরসা ছোট্ট, বুড়ি মাসির কোথায় যেন একটা ভারী জোর আছে। সেই জোরটা যেন সব সময়ে ঘিরে রাখে ফটিককে। তাই একদিন শ্রীপতি এলে ফটিক তাকে উলটে শুনিয়ে দেয়—ভারী তো মাস্তান, ইঞ্জিনের ড্রাইভার চড়িয়ে ঠান্ডা করে দিয়েছিল। আবার মাস্তান!

—তবে রে আট আঙুলে, অলক্ষুণে। বলে তেড়ে আসে বটে শ্রীপতি, কিন্তু সহসা উদ্যত হাত থামিয়ে কেবল তড়পাতে থাকে। মারে না। ঠিক সাহস পায় না বোধ হয়।

মাসির কী বা আছে! অল্প কিছু জমি, সামান্য টাকা, কিছু সোনাদানা। তার ওপরেই সকলের চোখ। মাসিই কেবলমাত্র উদাসীন। এ তত্বটা বুঝতে পারে ফটিক। নিজের ওপর ঘেন্না হয় মাঝে-মাঝে। সেও তো ওই ভরসায় আছে।

হারাধনের কালীর স্থানে সেদিন প্রণাম সেরে বেরিয়েই যদু মোক্তারের সঙ্গে দেখা। বুড়ো হাড়ে হারামজাদা, রোগা খিটখিটে চেহারা, চোখে বুদ্ধির চিকিমিকি। ফটিককে দেখে বলে—কী বাবা ফটিক, শুনেছ?

—কী?

—তোমার বাড়া ভাতে ছাই। মাসি যে সম্পত্তি সব দেবোত্তর করে দিল।

কথাটা বিশ্বাস হয় না ফটিকের। চেয়ে থাকে। বুড়ো তার মুখের দিকে ভারী খুশি-খুশি ভাবে চেয়ে থাকে। কারও কোনও গর্দিশ হলে যদু মোক্তারের ভারী আনন্দ। বলে—তোদের বাড়ি থেকেই আসছি উইলে সাক্ষী দিয়ে। তোর মাসির ভিটেয় গুরুর মঠ হবে। এবার নিজের রাস্তা দ্যাখ।

কথাটা মাসিকে মুখোমুখি জিগ্যেস করতে লজ্জা পায় ফটিক। মাসিও যেচে কিছু বলে না। মনটা ভারী দমে যায় তার। চার বছর বয়স থেকে মাসির কাছে সে এত বড়টি হল। সবাই জানে, সে মাসির ছেলের চেয়েও বেশি। আট আঙুলের ফটিককে মাসি কত স্নেহে ভালোবাসায় দশ আঙুলের মানুষের মতে সবকিছু শিখিয়েছে। তবে মাসির এটা কীরকম ব্যবহার?

হারাধনের কাছে দুঃখ করে ফটিক—এমনটা হবে জানলে কোনও শালা এসে এতকাল পড়ে থাকত!

—দুঃখ করিস না ফটিক। মঠ যদি হয় তো, মাসিকে বল আমায় যেন সেবাইত করে। তোরটা পুষিয়ে দেব।

মদনা ফটিককে ধরে বলে—তখনই বলেছিলুম, কদমতলার জায়গাটা দুজনে নিই আয়, কাঁচা পয়সা লুটে নিতাম।

খবর পেয়ে শ্রীপতিও আসে। ফটিকের সঙ্গে দেখা হয় চৌরাস্তায়। নরম গলায় বলে—বুড়ির মাথাটাই গেছে বিগড়ে। দেবোত্তর আবার কীরে! না হয় তোর নামেই থাকত সম্পত্তি, আমরা দু-ভাইয়ে ভোগ করতুম? হাজার পঞ্চাশেক নগদ, সোনাদানা মিলে আরও ধর হাজার ত্রিশ-চল্লিশ—ইস ভাবা যায় না!

ভাবতে-ভাবতে নিজের আট আঙুলের ওপর ভরসা হারিয়ে ফেলে ফটকে। দিনরাত লোকজন তার কানমন্তর দিচ্ছে। মাথা ক্রমে গরম হয়ে যায়। বুঝতে পারে, মাসি তাকে সবচেয়ে বড় ধাপ্পাটা দিয়েছে। ফটিক তাই রাগে-রাগে বাসাতেই থাকে না বড় একটা। সকালে বেরোয়, রাত করে ফেরে। মনের মধ্যে একটা পাখি কেবল কু-ডাক ডাকে।

বারান্দায় একা বসে ভাগবত পড়ছে মাসি। সামনে পিদিম। ননীচোরা কৃষ্ণের মুখ ফাঁক করে মা যশোদা দেখছেন সত্যিই খেয়েছে কি না কৃষ্ণ। ওমা কোথায় ননী! মা যশোদা দেখেন, কৃষ্ণে মুখের মধ্যে বিশ্বরূপ। রাত হয়েছে। ফটিক এইবার ফিরবে। মাসি টের পায়, চরাচর নিঝুম। ভাগবত পাঠের শব্দ যতদূর যায় ততদূর বড় পবিত্র। কত

পোকামাকড় কাছে আসে, কত সাপখোপ। ওই শব্দ সবাইকে টেনে আনে কাছে। আজও এসেছে। চোখ না তুলেও টের পায় মাসি। সিঁড়ির মুখে উঠে এসেছে দুটি দীর্ঘ দেহ। নিস্পন্দ পড়ে আছে। শুনছে। কারও ক্ষতি করে না। কিন্তু গায়ে পা পড়লে? ফটিক এ সময়েই ফেরে। পিদিমের আলোয় যদি দেখতে না পায় সাপ দুটোকে? আজ কৃষ্ণপক্ষ, বাইরেটা বেজায় অন্ধকার।

মাসি শোনে, আগল ঠেলে ফটিক ঢুকল উঠোনে। সোজা সিঁড়ির দিকে হেঁটে আসছে। অধ্যায় শেষ না হলে পাঠ শেষ করা চলবে না। মাসি ঝুঁকে থাকে বইখানার ওপর। ঠাকুর! চোখ থেকে এক ফোঁটা জল পড়ে। ফটিক আসছে।

ঠিকাদারদের লরি একটু আগেই মাটি ফেলছিল সাঁইদের মজা পুকুরে। তারই একটা হেডলাইট জ্বালল। সমস্ত বাড়ি, উঠোন ধাঁধিয়ে একটা আলো এসে পড়ে। ফটিক থেমে যায়। মাসি ঝুঁকে পড়ে বইয়ের ওপর। ঠাকুর।

ফটিক চিৎকার করে ওঠে—মাসি পালাও।

মাসি একখানা হাত তুলে করতলখানা তাকে দেখাল। উঠল না, নড়ল না। শুধু হাতখানা তুলে ফটিককে অভয় দিল।

অনেক ভেবে-ভেবে ফটিকের আজকাল মনে হয়—না, মাসি তাকে বঞ্চিত করেনি। কী যেন একটা দিয়েছে, যার হিসেবনিকেশ করতে ফটিকের এ জন্মটা চলে যাবে বোধহয়।

মৃণালকান্তির আত্মচরিত

ভূমিকা

মৃণালকান্তি আমাকে অনেক গলিঘুঁজি, চোরাপথ, ভাঁটিখানা, বেশ্যাদের আস্তানা, হিজড়েদের আড্ডা চিনিয়েছিল। এইভাবে চেনা রাস্তা ভুলিয়ে অচেনা রাস্তায় সে বহুবার আমাকে নিয়ে গেছে। মনে আছে অনেকদিন মৃণালকান্তির সঙ্গে শিয়ালদা স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের রিফিউজিদের বিবাহ, সঙ্গম, জন্ম এবং মৃত্যু দেখব বলে দাঁড়িয়ে থেকেছি। উপকরণের খোঁজে এইভাবে সে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াত। যতদূর জানা যায় মৃণালকান্তি তখন তার আত্মজীবনী রচনায় ব্যস্ত ছিল। তার সেই আত্মজীবনীর কিছু-কিছু পৃষ্ঠা আমি পড়ে দেখেছি। সদ্যলব্ধ অভিজ্ঞতা, স্মৃতি ও স্বপ্ন—এই ছিল তার আত্মজীবনীর উপকরণ এবং এইসব নিয়ে সে এত বেশি উত্তেজিত থাকত যে, কখনও রাস্তায় ঘাটে হঠাৎ দেখা হয়ে গেলে সে তার মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে কপাল টিপে রেখে এমনভাবে তাকাত যেন চিনতে পারছে না। তার রুক্ষ চোয়াল, গাল-ভাঙা মুখের ওপর নীল শিরাগুলি দেখা যেত। কখনও আমি তাকে বলতাম, 'তোমাকে মাঝে-মাঝে ভীষণ অচেনা মনে হয় হে মৃণালকান্তি, বাস্তবিক!' পকেট থেকে জাদুকরের মতো নিমেষে একটা রুমাল বের করে মৃণালকান্তি তার মুখের বিষণ্নতা ও ক্লান্তি চাপা দিয়ে বলত, 'কোথায় যাচ্ছ!' কিংবা 'খুব ব্যস্ত কি?' আমি 'না' জানালে সে বলত 'তবে এসো, একটু চা খাওয়া যাক।' নির্জন অচেনা নিঃশব্দ কোনও রেস্তরাঁয় আমরা মুখোমুখি বসতাম আর তখন মৃণালকান্তি কাঁধের ঝোলা ব্যাগ থেকে সদ্যলেখা তার আত্মজীবনীর পৃষ্ঠাগুলি বের করে আমাকে পড়তে দিত।

আমার মনে হয় আত্মজীবনী বলতে যা বোঝায় মৃণালকান্তি ঠিক তা লেখেনি। এইরকম জনশ্রুতি আছে যে, মৃণালকান্তি প্রায়ই স্মৃতি ও স্বপ্নের দ্বারা আক্রান্ত হত। এই সম্বন্ধে সে নিজে লিখে গেছে, 'আমার মনে হয় স্মৃতি এবং স্বপ্ন—এই দুইটি শব্দ আমাদের সচেতন করিবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। পাপ-পুণ্যময় এ জগতে স্মৃতি এবং স্বপ্ন সকলেরই স্বাভাবিক অবলম্বন। বাস্তবিক ঠিকমতো অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে, যে, আমাদের অধিকাংশ প্রেমের কবিতা, দার্শনিক প্রবন্ধ, ইস্পাতের কারখানা এবং দূরবীক্ষণ যন্ত্র স্মৃতি ও স্বপ্নের দ্বারা রচিত।' মনে হয় এইখানে মৃণালকান্তি স্মৃতি অর্থে অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান এবং স্বপ্ন অর্থে কল্পনা বোঝাতে চেয়েছে। কিন্তু আমার অনুমান এইমাত্র যে, মৃণালকান্তির স্মৃতি ও স্বপ্ন খুব স্বাভাবিক স্তরে ছিল না, কেন না সে নিজেই অন্যত্র লিখেছেঃ '...কিন্তু আমার আত্মজীবনী বাস্তবিক ইস্পাতের কারখানা, প্রেমের কবিতা কিংবা দার্শনিক প্রবন্ধ নয়। ইহার ভিতরে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের দু-একটা লক্ষণ বর্তমান থাকিলেও বাস্তবিক ইহাকে ষোলো আনা দূরবীক্ষণ যন্ত্রও বলিতে পারা যায় না। যাহাদের স্মৃতি এবং স্বপ্ন স্বাভাবিক স্তরে আছে তাহারা প্রেমের কবিতা এবং দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিস্কারের চেষ্টা করে বটে, কিন্তু আত্মজীবনী রচনার চেষ্টা কদাচ করে না। আমার মতো মানুষের আত্মজীবনীর মূল্য কি তা—যাহাদের স্মৃতি এবং স্বপ্ন স্বাভাবিক স্তরে আছে—তাহাদের কাছে বোধগম্য নয়। কেন না যে স্মৃতি এবং স্বপ্ন অতীতে একদা আমাদের ইস্পাতের কারখানা ও দার্শনিক প্রবন্ধ রচনা করিতে সাহায্য করিয়াছে তাহা আমার ভিতরে উপস্থিত থাকিলে আমার যাবতীয় পণ্ডশ্রম একটি মাত্র আত্মজীবনী রচনাতেই কেন্দ্রীভূত হইল কেন! তাও স্থির প্রত্যয়জাত অঙ্কের মতো নির্ভুল কোনওকিছু এই রচনাতে নাই—বরং এর সর্বত্র রচয়িতার তীব্র সন্দেহ মাত্র উপস্থিত আছে। কোনও ঘটনায় মাথার ভিতরে চকিতে বিস্ফোরণ ঘটিলে তাহার আলোতে যতদূর দেখা যায় ততদূর হইতে আমার স্মৃতি ও স্বপ্নগুলি আহরণ করিতেছি। মাঝে-মাঝে ভ্রম হয় আমি কতদূর অর্থহীন তাহা জানিবার আগ্রহেই আমি এই আত্মজীবনী রচনা করিতেছি।'

আখ্যান

ছায়া ছিল খুব হিসেবি মেয়ে। যাদবপুরের কোনও রিফিউজি কলোনি থেকে ছায়া কলকাতায় মাস্টারি করতে আসত। মৃণালকান্তি পরিচয় করিয়ে দিলে আমি ছায়াকে প্রথম দেখে বড় হতাশ হই। টলটলে চোখ ছিল না ছায়ার—শীতকালে শুকনো ঠোঁটের ওপর মামড়ি দেখা যেত। শরীরে মেয়েদের যে সব আকর্ষণ থাকে তার কোনওটাই ছিল না। খুব

ঘন ঘন সিনেমা দেখত ছায়া—সব বাঙলা ছবিই তার মোটামুটি ভালো লাগত। কখনও কোনও কবিতার লাইন ছায়া বলেছিল কি! আমার মনে পড়ে না। প্রথমবার পরিচয় করিয়ে দেওয়ার সময় মৃণালকান্তি 'এই ছায়া। আমার—' বলে কথা শেষ করবার আগেই মনে পড়ে ছায়া বলল, 'থাক আর বলতে হবে না, উনি বুঝতে পারছেন।' মৃণালকান্তির সামনে প্রথমদিনই ছায়া আমার ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করেছিল। বলেছিল, 'আমি খুব বেশি খাই না', বলেছিল, 'আমার ছোট বোন গান জানে, আপনার সঙ্গে বেশ মানায়।' প্রতি বৃহস্পতিবার আর শনিবার সন্ধে পাঁচটা থেকে সাড়ে সাতটা পর্যন্ত সে মৃণালকান্তির সঙ্গে থাকত। ওই দুদিন তার টিউশনি ছিল না। সাতটা পঁয়তাল্লিশের ট্রেন ধরে ছায়া বাড়ি ফিরত—যদিও ছায়ার হাতে কখনও ঘড়ি দেখিনি। যেমন টনটনে ছিল তার সময়জ্ঞান তেমনি বুদ্ধিসুদ্ধি ছিল ছায়ার। মৃণালকান্তি ডায়েরি লিখছে জেনে সে মধ্যে-মধ্যে তার ডায়েরি পড়তে চাইত। মৃণালকান্তির আত্মজীবনীর সবটুকু আমি পড়িনি। ছায়াকে কোথা থেকে কেন জোগাড় করেছিল—সে আমি জানি না। মনে পড়ে তার আত্মজীবনীর কোথাও ছায়ার সঙ্গে তার পরিচয় হওয়ার আগে সে লিখেছিল, '...কোনওদিন কোনও যুবতী মহিলার সঙ্গে রাস্তায় হাঁটিয়া যাই নাই—যাহাতে মনে হয় চতুস্পার্শ্বস্থ সবকিছু আমাদের কেন্দ্র করিয়াই আবর্তিত হইতেছে। আমি কখনও মায়ের সঙ্গে, আত্মীয় মহিলার সঙ্গে রাস্তায় হাঁটিয়াছিলাম। সমান বুদ্ধিমতী সমান বয়স্কা কোনও মহিলার সঙ্গে হাঁটিয়া গেলে এমন মনে হইবে কি যে, এই মুহূর্তগুলি আমার সব চেয়ে প্রিয়; যেন আমরা সব কিছুর কেন্দ্রস্থলে আছি! মনে হইবে কি যে আমি কখনও মৃত্যুশোক অনুভব করি নাই! নিজেকে ক্ষুদ্রজীবী শিশুর মতো মনে হইবে কি যে, তাহার প্রিয়জনের দেহে ক্ষুদ্র হস্ত পদের দ্বারা প্রবল আঘাত করিয়া জানাইতে চাহে—আমি আছি!...'

মনে হয় ছায়া ক্রমশ মৃণালকান্তি সম্পর্কে হতাশ হচ্ছিল। মৃণালকান্তি ছিল প্রায় বেকার। কোনও এক ছোট্ট প্রকাশকের দোকানে সে কিছুদিন কাজ করেছিল। মাঝে-মাঝে বইয়ের প্যাকেট বয়ে নিয়ে তাকে এখানে ওখানে পৌঁছে দিতে হত। কিন্তু খুব গরিব সে ছিল না। তার বাবার জমানো কিছু টাকা সে পেয়েছিল, ভাই-বোন না থাকাতে পাকিস্তানের জমিজমা বিক্রি করে কিছু টাকার নিরঙ্কুশ মালিকানা সে পেয়েছিল। এইসব বন্দোবস্ত তার মা মৃত্যুর আগেই তার জন্য করে যান। নইলে ষাট টাকা মাইনে পেয়ে বেনেটোলা লেন-এর যে ঘরটা ভাড়া করে সে থাকত তার ত্রিশ টাকা ভাড়া দিয়ে দিলে পাইস হোটেল, সিগারেট এবং প্রতিদিনের পয়সা তার থাকত না। মৃণালকান্তি বেহিসেবি ছিল না, কিন্তু সম্ভবত ছায়া চাইত—বিয়ের পর মৃণালকান্তি তাকে চাকরি ছেড়ে দিতে বলুক, এবং দোকানের শো-কেসে সাজানো কিছু-কিছু জিনিসপত্র মৃণালকান্তির ঘরে থাক। বিয়ে করার

কথা ছায়া এত বেশি ভেবেছিল যে, একদিন শ্রদ্ধানন্দ পার্কে অন্ধকারে মুখ রেখে বলে, 'আমি চাই তুমি এমন কোনও কাজ করো যাতে আমাকে ছেড়ে তোমাকে অনেকদিনের জন্যে দূরে চলে যেতে হয়। আমি বেশ তোমার অপেক্ষায় থাকব।' অন্যদিন শিয়ালদায় ট্রেন লেট আছে জেনে প্ল্যাটফর্মের বেঞ্চিতে পাশাপাশি বসে বলেছিল, 'অফিস থেকে ফিরে এলে পিছু-পিছু অফিসের পিওন ফাইল নিয়ে আসে—দেখতে আমার বেশ লাগে।'

মৃণালকান্তি ছায়াকে কখনও খুব দূরে নিয়ে যেতে চেয়েছে, ছায়া রাজি হয়নি। মনে হয় নানা পরিবেশে সে ছায়াকে দেখতে চাইত। কি দেখতে চাইত মৃণালকান্তি! ঠিক কি চাইত তা আমি জানি না, তবে তার আত্মজীবনীর কোনও এক জায়গায় আমি পড়েছিলাম, একদিন লিন্ডসে স্ট্রিটের এক দোকানের পাশ দিয়ে যেতে-যেতে কাচের শো-কেসে একটা মেয়ের 'ডামি' দেখে মুখটা খুব পরিচিত মনে হওয়ায় সে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। সে লিখেছে 'ইহাকে আমি কোথায় দেখিয়াছি! এইরূপ প্রাণহীন প্রস্তরবৎ মূর্তি নয়, আমি অবশ্যই ইহার কণ্ঠস্বর শুনিয়াছি, ইহাকে হাসিতে ও কথা বলিতে দেখিয়াছি। ইহাকে আমি বিষাদগ্রস্ত ও নিঃসঙ্গ অবস্থায় দেখিয়াছি। কিন্তু কিছুতেই মনে পড়ে না। এমন মাঝে-মাঝে হয় গতকালের কথা কতবার ভুলিয়া গিয়াছি। স্টেটবাসে কে আমার পাশে বসিয়াছিল—তার মুখ দেখি নাই, কন্ডাকটরের হাতে পয়সা গুনিয়া দিয়া টিকিট লইয়াছিল—কই কোনও কন্ডাকটরের মুখ তো মনে পড়ে না! মনে হয় কতকাল মানুষের সহিত আমি কিছুই বিনিময় করি নাই।' তারপর মৃণালকান্তি লিখছে, 'মনে হয় এই মুখে কোথাও বিষণ্ণতা ছিল। দীর্ঘকাল কাচের আবরণে ঢাকা থাকিতে-থাকিতে সেই আবরণ ভাঙিয়া বাহিরে আসিবার ইচ্ছা জন্মায় নাই বলিয়া কি এই বিষাদ! মনে পড়ে যাহাদের মুখে বিষণ্ণতা ছিল না তাহাদের সহিত কখনও আমার বন্ধুত্ব হয় নাই। বোধকরি সেইজন্যই সুবলের মুখ আমি ভুলিয়া যাই নাই।' এরপর মৃণালকান্তি সুবলের কথা অনেকটা লিখেছে। সুবল চমৎকার গল্প বলতে পারত। স্কুলে অনেকে সুবলকে ঘিরে বসে গল্প শুনত। বলতে-বলতে সে ইচ্ছামতো গল্পটাকে বড় কিংবা ছোট করতে পারত, বদলে দিতে পারত, গল্পটা যেদিকে যাচ্ছিল ঠিক তার উলটোদিকে নিয়ে যেতে পারত। তার গল্প শুনে সবচেয়ে যে বেশি মুগ্ধ হয়ে যেত সে ছিল মৃণালকান্তি। সুবলের গায়ে নানা জায়গায় কতগুলি দীর্ঘস্থায়ী ঘা ছিল—যা কখনও শুকোত না; মাঝে-মাঝে ঘা বেয়ে রক্ত পড়ত, প্রায়ই খোস পাঁচড়ায় ভুগত সুবল, এবং কাছ থেকে কথা বললে সুবলের মুখ থেকে বিশ্রী পচা গন্ধ পাওয়া যেত। মৃণালকান্তি তাকে ঘেন্না করত। সেই সুবল একবার তার ঠোঁটে চুমু খেয়েছিল। মৃণালকান্তি লিখছে, 'সহসা আমার ভিতরে সে কী সঞ্চার করিয়াছিল! চকিত বিস্ফোরণের আলোয় আমি কী দেখিতে পাইয়াছিলাম! মনে পড়ে না। সুবলকে দেখিতাম—স্কুলের সিঁড়িতে সে একা বসিয়া আছে, গ্রাম্য মেঠো পথ দিয়া একা-একা ফিরিতেছে। আমি আর

তাহার কাছে যাই নাই।' দীর্ঘদিন—প্রায় আঠারো-উনিশ বছর পর সুবলকে সে আবার দেখেছিল, কলকাতায় সিনেমা হলের কর্মীরা মিছিল বের করলে সেই মিছিলে সুবলের মুখ চকিতে ভেসে যাচ্ছিল। সুবল কোনও সিনেমা হলে 'গেট-কিপার' হয়েছিল। সে লিখছে, 'একদা ছেলেবেলায় মুখোমুখি হইয়া সহসা শূন্য বোধ করিলে যাহা আমরা করিয়াছিলাম তাহার স্মৃতি আমাকে গভীর আহত করিল। আজ আবার দেখা হইলে আমরা পরস্পর কি বিনিময় করিব! কিন্তু এতদিন পর সুবলকে আমি পুনরায় হাজার লোকের মিছিলে হয়তো চিনিয়া বাহির করিয়াছি। আমি কী দেখিয়াছিলাম! মনে হয় সুবলের মুখের সেই বিষাদ কখনও পালটায় নাই, মনে হয় একাকী, কিংবা বহুজনের সঙ্গে মিলিয়া বরাবরই সুবলের কী একটা কথা বলিবার ছিল—ছেলেবেলায় তাহার গল্পের ভিতর দিয়া, চুম্বনের ভিতর দিয়া, শেষ যৌবনে আর্ত স্লোগান ও উৎক্ষিপ্ত বাহুর ভিতর দিয়া সে সেই কথাই বলিয়া চলিয়াছে। আমি তাহাকে ঠিক চিনিয়াছিলাম। দেখা হইলে আজ আমরা পুনরায় চুম্বন না বিষণ্ণতা বিনিময় করিব! ভিড়ের ভিতরে আত্মগোপন করিতে-করিতে আমার মনে হইল আজ আমি পুনরায় সুবলকে ভালোবাসিতে পারিতেছি।'

তেমন করে মৃণালকান্তিকে ছায়ার কিছু বলবার ছিল কি? যতদূর জানি বিষণ্ণতা ছায়ার ভিতর কোথাও ছিল না। বিভিন্ন চুম্বনের আলাদা আস্বাদ মৃণালকান্তি টের পেত কিনা আমি জানি না। সুবলের কথা শেষ করে মৃণালকান্তি লিখছে, 'কিন্তু বাস্তবিক ভালো করিয়া চাহিয়া দেখিলাম—এই ডামির মুখে আনন্দ বা বিষাদ কিছুই নাই। প্রাণহীনতা আছে মাত্র। এই প্রতিমার মতো মুখের সহিত অলৌকিক চিত্ত-বিনিময় সম্ভব নহে। দুর্গা প্রতিমার বিসর্জনের বাজনায় কেবল ইহার তাৎক্ষণিক বিষণ্ণতা ধ্বনিত হয়।'

মনে হয় ছায়ার ভিতর তবু কিছু খুঁজে পেয়েছিল মৃণালকান্তি যা তার ডামির মুখের বিষণ্ণতার মতো তাৎক্ষণিক। মৃণালকান্তি আত্মজীবনী থেকে জানতে পারি কোনও শনিবার ময়দান থেকে বেরিয়ে ফিরবার পথে বৃষ্টি নামলে ছায়া ওর আগে-আগে দ্রুত হাঁটছিল। ছায়া কোনও 'শেড' খুঁজছিল—মৃণালকান্তি ওকে দাঁড়াতে দিল না। ওরা সাবধানে হাঁটছিল। ঝিরঝিরে বৃষ্টিতে ভিজছিল। ছায়ার শাড়ির কলপ ভিজে গিয়ে শাড়িটা ওরা রোগা শরীরের সঙ্গে লেপ্টে যাচ্ছিল। পিছন থেকে ওকে দেখাচ্ছিল হঠাৎ চোপসানো, ভেজা একটা চড়াই পাখির মতো। ময়ূর তার পেখম গুটিয়ে নিলে হঠাৎ তার পিছনে যে শূন্যতা দেখা দেয়—মৃণালকান্তি লিখছে, 'ছায়ার সম্মুখে সেইরূপ শূন্যতার ভিতর দিয়া দেখা গেল একজন ট্রাফিক পুলিশ একটা কানা ভিখিরির ছেলেকে হাত ধরিয়া রাস্তা পার করিয়া দিতেছে। ছায়া এইসব কিছুই দেখিল না। দেখিল না তাহার সম্মুখে ক্ষণস্থায়ী সেই কম্পমান দৃশ্যের পশ্চাদভূমিতে তাহার ঘাড়ের তিনটা হাড় উঁচু হইয়া আছে, চূর্ণ চুলের ওপর জলের ফোঁটায় সহসা প্রলয় প্রতিভাত হইতেছে। আমি মনে-মনে তাহার নিকট প্রার্থনা করিতেছিলাম—

এখন তোমার চতুর চোখ আমার দিকে ফিরাইও না, সোজা হাঁটিয়া যাও—আমি তোমার পিছনে এইরূপে শাশ্বতকাল হাঁটিতে থাকিব। কিন্তু কোথায় যেন বিসর্জনের বাজনা বাজিতে ছিল। ছায়া মুখ ফিরাইয়া আমাকে কি বলিতেছিল—আমি শুনি নাই। শুধু চূর্ণ দৃশ্যের উপর, জলে প্রতিভাত বিম্বের উপর হইতে ডামির মুখের ক্ষণস্থায়ী বিষণ্ণতা ভাঁটার টানে নামিয়া যাইতেছিল।'

সেই রাতে ফিরে এসে মৃণালকান্তি লিখেছিল, 'আমার বাবা সুধাকর হালদার ছিলেন দারোগা। তাঁহার মফসসল ভ্রমণের জন্য একটা প্রকাণ্ড কালো ঘোড়া ছিল। আমি একটু বড় হইলে আমার রোগা রোগা হাত পায়ের দিকে চাহিয়া তাঁহার সন্দেহ হইয়াছিল খুব শক্ত সমর্থ হইয়া গড়িয়া না উঠিলে তাঁহার পুত্র মৃণালকান্তি জীবনে এমন কি দারোগাও হইতে পারিবে না। তাই আমার ভিতরে প্রাণসঞ্চার করিবার জন্য আমাকে একদিন সেই ঘোড়ায় সওয়ার করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইল। মনে পড়ে আমি ভয়ে অনেক চিৎকার ও কান্নাকাটি করিয়াছিলাম। অবশেষে ঘোড়াটা আমাকে এক মাঠের ভিতরে আনিয়া পিঠ হইতে ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছিল। অনেক বড় হওয়ার পরও সেই দুঃস্বপ্নকে আমি ভুলিয়া যাই না। অনেকবার ঘোড়ার পিঠ হইতে পড়িয়া যাওয়ার স্বপ্ন দেখিয়া চমকিয়া উঠিয়া আমার ঘুম ভাঙিয়াছে। মনে হয় জাগরণেও সেই পতনের অনুভূতি আমাকে কখনও ঝাঁকি দিয়া যায়। সংশয় হয় আমি শাশ্বতকাল একটিমাত্র ঘোড়ার পৃষ্ঠে সওয়ার হইয়া থাকিবার চেষ্টা করিতেছি না তো!' তারপর সুধাকর হালদারের কথা লিখতে গিয়ে মৃণালকান্তি দীর্ঘ বর্ণনা করেছিল। শেষে সে লিখেছে '....তখনও আমি ছোটো, মফসসল হইতে ঘোড়ার পিঠে একা ফিরিবার পথে কাহার মাছের জাল ছুঁড়িয়া তাঁহাকে ঘোড়া হইতে ফেলিয়া এবং সেইখানেই লাঠিপেটা করিয়া তাঁহাকে মারিয়া ফেলে। বনতলীর নির্জন মাঠের ভিতর সেই গ্রাম্য দারোগা-হত্যার ঘটনাতেই সম্ভবত সুধাকর হালদার তাঁহার পুত্র মৃণালকান্তির অনুভূতিগুলি প্রথম ও শেষবারের মতো প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃতদেহ লইয়া বিরাট শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছিল। মনে পড়ে মায়ের মৃত্যুতে তেমন ঘনঘটা কিছুই ছিল না। কলিকাতার এক ভাড়াটে বাড়িতে তাঁর চেষ্টাহীন নিঃশব্দ মৃত্যু ঘটিয়াছিল। বাড়িওয়ালাই কিছু লোকজন ডাকিয়া আনিয়াছিল। শোক না, বৈরাগ্যও না—বিরাট এক মিশ্র জনতার ভিতর দিয়া খোলা রাস্তায় উজ্জ্বল রৌদ্রে আমার রোগা ছোট্ট মায়ের মৃতদেহের অনুগমন করিয়া যাইতে আমার লজ্জা করিতেছিল। আমি কাহার জন্য শোক করিব, কাহাকে ভালোবাসিব! পৃথিবীর যে প্রকাণ্ড মিশ্র জনতার ভিতর আমি রহিয়াছি তাহাদের কয়জন জানে যে, একজন মৃণালকান্তির একজন মা ছিল এবং মৃণালকান্তির সেই রোগা, ছোট্ট দুর্বল মা আর নাই!' মৃণালকান্তি লিখেছিল 'নিজেকে এমন

উদ্বাস্তু মনে হয় কেন! কখনও নিশ্চিতভাবে বলিতে পারি না—আমি ভালোবাসি! ভালোবাসি না—এ কথাও সংশয়ে কতবার বলা হয় নাই!'

গড়িয়াহাটার দিকে কোথায় যেন মৃণালকান্তির সোনাকাকা গেঞ্জি ফিরি করে বেড়াত। তার এইরকম কিছু-কিছু আত্মীয়স্বজন নানা জায়গায় ছড়িয়ে ছিল। বিধবা 'রাঙামাসি', বাবার খুড়তুতো ভাই সোনাকাকা, বড়পিসি, গ্রামসম্পর্কে জ্যাঠামশাই ইত্যাদি এবং যাদবপুর, টালিগঞ্জ, কসবা, মধ্যমগ্রাম কিংবা আরও দূরে তার আরও আত্মীয়রা ছিল। কখনও কারও সঙ্গে দেখা হলে আর কাউকে মনে পড়ত—তখন খেয়াল করে খোঁজ নিত, একদিন গিয়ে সকলের সঙ্গে দেখা করে আসবে বলে কথা দিত। প্রায়ই যাওয়া হয়নি। কখনও কারও অভাব শুনলে দু-পাঁচ টাকা সাহায্য পাঠিয়েছে, কখনও পাঠানো হয়নি। কলেজ স্ট্রিটে ছায়ার সঙ্গে একদিন রাস্তা পার হতে গেলে কাঁধে গেঞ্জির বোঝা নিয়ে সোনাকাকা পথ আটকাল—দুজনকে একসঙ্গে দেখেও। আর্তকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল সোনাকাকা, 'বিয়া করস নাই!' মৃণালকান্তি লিখছে, 'সোনাকাকাকে কষ্টে চিনিতে পারিয়া আমি সিগারেট ফেলিয়া দিলাম। তবে কি আমি আস্তে-আস্তে প্রিয়জনদের মুখগুলি ভুলিয়া যাইতেছি! মনে পড়ে হাওড়া স্টেশনে একজন তাহার বিড়ি ধরাইতে আমার সিগারেটটা চাহিয়া লইয়াছিল। কেমন সন্দেহ হওয়ায় আমি আর সিগারেটটা ফেরত না লইয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া আসিলাম। মনে হইল, ইহাকে আমি কখনও জ্যাঠা বলিয়া ডাকিতাম কি! আত্মীয়দের মুখ ক্রমশ ভুলিতেছি। রাঙামাসির মুখ মনে পড়ে না। কবে যেন বড়পিসি আমাকে বলিয়াছিল, 'মনু, বাইরে চলাফিরা করো, একখান পঞ্জিকা রাখছ তো!' ছায়া কি ভাবিল জানি না। সে আমাকে কিছু বলে নাই। আমি পকেটে হাত দিতে গেলে সোনাকাকা আমার হাত আটকাইল 'মনু, তরেই তো আমার দ্যাওনের কথা।' তাহার পর ছায়ার সঙ্গে নিঃশব্দে হাঁটিয়া গেলাম। মনে পড়ে না কোনওদিন আমার মানুষকে ভালোবাসিবার সর্বব্যাপী সাধ হইয়াছিল কিনা।'

অন্য একদিনের কথা মৃণালকান্তি লিখেছিল। দুপুর বেলায় এসপ্ল্যানেডে একটা ফাঁকা রেস্তোরাঁয় সে বসে ছিল। সেটা একটা মাদ্রাজি রেস্তোরাঁ। কিছুক্ষণ আগে সে দ্বিতীয়বার স্টেনলেস স্টিলের কাপ থেকে গরম চা খেয়েছে। তার ঠোঁট জ্বলছিল। বাইরে সব কিছুই খুব আলোকিত, উত্তপ্ত এবং ছায়াহীন। রেস্তোরাঁর ভিতরটা অনেক ঠান্ডা এবং নির্জন। সে লিখছে, 'যেখানে বসিয়া আমি আমার নোট লিখিতেছি সেখান হইতে রাস্তা, ময়দান, মনুমেন্ট সবই দেখা যায়। স্টেটবাসগুলি রাস্তা গিলিতে-গিলিতে যাইতেছে। আমি রাস্তায় পায়ের শব্দ এবং কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইতেছি। জুন মাসের দুপুর বলিয়া রাস্তায় লোকজন কম। হঠাৎ তাকাইলে—আমি সব কিছুর কেন্দ্রস্থলে আছি—এমন মনে হয়। এমন মুহূর্তগুলি আমার এত প্রিয়—যেন সবকিছুই আমাকে স্পর্শ করিয়া আছে। এমন সব মুহূর্ত

হইতেই আমরা নূতন করিয়া যাত্রা আরম্ভ করি। পাশের টেবিল হইতে দুজন ব্যবসায়ী উঠিয়া গেলে চর্বির পাহাড় গলায় থাক-থাক গলকম্বলওয়ালা এক পাঞ্জাবি আসিয়া বসিল। আধ খোলা ঘুমচোখে সে আমাকে লিখিতে দেখিতেছে। কী লিখিতেছি আমি! এই মুহূর্তেই যেন মনে হইতেছে কাহারা আমার হাত ছাড়িয়া দিয়া চিরতরে চলিয়া গিয়াছে।'

'একশত বৎসর একটানা ঘুমাইবার পর সহসা জাগিয়া উঠিয়া আমি পরিচিত লোকজন কাহাকেও দেখিতে পাইতেছি না। কি বলিয়া আত্মপরিচয় দিব। আমি কাহার সন্তান! আমি বিশেষ কাহারও কি! ওই পর্বতকার পাঞ্জাবিটার সন্তান আমি হইলাম না কেন? আমি গাছ হই নাই কেন; আমি মাছ হইয়া জন্ম গ্রহণ করিলেই বা কাহার কি ক্ষতিবৃদ্ধি ছিল! পরিচিত বৃত্তের বাহিরে নিজেকে আত্মপরিচয়হীন, নামগোত্রহীন বোধ হইলে ভাবিয়া দেখি আমার মুখ কাহারও মনে আছে কি! একশত বৎসর পূর্বে কবে দেখিয়াছিলাম সোনাকাকা গড়িয়াহাটার মোড় হইতে গেঞ্জি হাঁকিতে-হাঁকিতে ভিড়ের ভিতর পথ চিনিয়া চলিয়াছে। ছায়াকে মনে পড়ে না! সহসা সুবলের মুখ একশত বৎসর পার হইতে বিস্ফোরিত হয়। মনে হয় অনেক মৃত মানুষ আমাদের জীবিত মানুষদের মধ্যে গা-ঢাকা দিয়া বে-আইনিভাবে বসবাস করিতেছে।'

মৃণালকান্তি একদিন ছায়াকে ট্রেনে তুলে দিলে ট্রেন প্ল্যাটফর্মের আলো থেকে বাইরের অন্ধকারের দিকে সরে যাচ্ছিল। জানলায় মুখ রেখে হাত বাড়িয়ে ছায়া রুমাল নাড়তে— সেই ছোট্ট সাদা দোমড়ানো রুমাল অন্ধকার থেকে ফুলের মতো ছিটকে-ছিটকে আসছিল। মৃণালকান্তি লিখছে, 'মনে হয় আমাকে দেখানোর উদ্দেশ্যে ছায়া তাহার শাড়ি, তাহার মুখ তাহার অবয়ব ট্রেনের জানলায় একটি ব্রাকেটে টাঙাইয়া রাখিয়া নিজে কামরায় ভিতরে কোথাও সরিয়া গিয়া বসিয়াছে। ট্রেন তাহার আলো ও ছায়া পর্যায়ক্রমে আমার শরীরের উপর হইতে তুলিয়া লইলে, সহসা শূন্য দিগন্তপ্রসারী রেলদ্বয়ের দিকে চাহিয়া সন্দেহ হয় আমাকে কি কোনওদিনই কিছু স্পর্শ করে নাই! খুব তীব্র ক্ষুধা, তৃষ্ণা, কিংবা কোনও বোধ আমি অনুভব করি নাই! আমি কখনও খুব আনন্দিত বা ক্রুদ্ধ হই নাই কেন! আমি আমার হস্তপদগুলি বিপথগামী করিয়া সহসা নৃত্যে উদ্বাহু হই নাই।'

মৃণালকান্তির আত্মজীবনী আমি যতটুকু পড়েছি তা লক্ষ করলে দেখা যায় সে খুব স্বাভাবিক মানুষ ছিল না। মনে আছে সে একদিন গড়ের মাঠে ঘাসের ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে চোখে হাত চাপা দিয়ে বলেছিল, 'জানো, রোগা লোকেরা নিজেকে বড্ড বেশি টের পায়! দেখো, খুব শিগগিরই আমার অসুখ হবে।' তার বেনেটোলা লেন-এর ঘরে আমি মাঝে-মাঝে যেতাম। কখনও দেখেছি মৃণালকান্তি ইঁদুর আরশোলা কিংবা পিঁপড়েদের চলফেরা লক্ষ করছে। কখনও তাকে আমার খুব অচেনা মনে হত, কখনও মনে হত সে নিজেকে

বড় বেশি টের পাচ্ছে। তার আত্মজীবনীর সর্বশেষ যে ঘটনাটি আমি পড়েছিলাম তাতে মৃণালকান্তি লিখেছে...'কত তুচ্ছ মনে হয় যখন ভাবি ঘটনাটা ঘটিয়াছিল একটি আরশোলাকে লইয়া। সিঁড়ির উপর চিৎ হইয়া শুইয়া থাকিয়া আরশোলাটা মরিতেছিল। তাহার প্রবীণ দেহের চারিপাশে তুলনায় বিশাল বিস্তৃত সেই সিঁড়ির উপর তাহার দেহলগ্ন ছায়া ছাড়া আর কিছুই ছিল না।' আরশোলার কথা মৃণালকান্তি অনেকটা লিখেছিল। লিখেছিল, 'মৃত্যু মাত্রই আত্মীয়হীন, স্বজনহীন। মৃত্যুতে কোনও সহগামী নাই। তাহার সেই অর্বাচীন শরীরকে ঘিরিয়া মুহূর্তের জন্য আমার চোখের সামনে ছায়াপথ ও নীহারিকাপুঞ্জের আর্চ-এর মতো অর্ধবৃত্তাকার ছড়ানো তারাগুলি দুলিয়া গেল কি! মনে হয় তাহার তুচ্ছ মৃত্যুর নিকট আমাদের সম্মিলিত বাঁচিয়া থাকা নগণ্য মাত্র। ভালোবাসার, ইচ্ছার, লোভের মাধ্যাকর্ষণ ছাড়িয়া অকস্মাৎ বৈজ্ঞানিক মহৎ শূন্যতার ভিতরে সে অগ্রসর হইতেছিল।' মৃণালকান্তির পাশে রেস্তোরাঁর সেই সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে ছায়া কথা বলছিল। মৃণালকান্তি লিখছে যে, ছায়া তখনও বলছিল, 'কাল ছাত্রীর মা আমাকে একটা খাম দিল। বাড়িতে গিয়ে খুলে দেখি পঞ্চাশ। আমার কিন্তু চল্লিশ পাওয়ার কথা। ভাবছিলাম...' মৃণালকান্তি লিখছে, 'দেখিতেছিলাম ছায়ার স্যান্ডেল-পরা পা গোড়ালির উপর ভর করিয়া দুলিতেছে। ছায়া কথা বলিতেছে—আমি কি তাহাকে চুপ করিতে বলিব! আমি কি সকলকেই চুপ করিতে বলিব! জানি কথা শেষ করিয়া হাসির বেগে যখন সে ঝুঁকিবে তখন ছায়ার পা আরশোলাটার উপর নামিয়া আসিবে। বলিব কী পা সরাইয়া লও। ভাবিতেছি—আমার কী হইয়াছিল! এত তুচ্ছ কথা বলার অর্থ নাই। বলিলেও ছায়া আমাকে পাগল ভাবিবে। কিন্তু আরশোলাটা অপেক্ষা করিতেছে। কোটি-কোটি আলোকবর্ষ দূর হইতে কোনও-কোনও নক্ষত্রের আলো পৃথিবীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়াছিল—এখনও আসিয়া পৌঁছে নাই—সে সেই দিকে চাহিয়া আছে।' তারপর ছায়া বলছিল, 'বুঝলাম ছাত্রী থার্ড হয়েছে বলে এটি আমার ইনক্রিমেন্ট...' ছায়া হাসতে যাচ্ছিল—সেই হাসির আভাস হাসি আসবার আগেই তার মুখে চোখে খেলে যেত চকিতে—মৃণালকান্তি লিখছে...'আমি আমার সর্বস্ব দিয়া বলিতে চাহিলাম—না। সরিয়া দাঁড়াও। আমি দুই হাত বাড়াইয়া সহসা শূন্য বোধ করিয়াছিলাম। সহসা আয়নায় চিড় ধরিবার শব্দ হইল। আমার প্রসারিত হাতে কেন্দ্রবিচ্যুত ছায়া বৃষ্টিতে ভেজা সিঁড়ির ফুটপাথে গড়াইয়া গেল। আমি কি ছায়াকে ধাক্কা দিয়াছিলাম! জানি না।' ভিড় জমে যাওয়ার আগেই আস্তে-আস্তে ছায়া উঠে দাঁড়িয়েছিল। কোনও কথাই বলেনি ছায়া, আঙুল তুলে মৃণালকান্তির দিকে স্থাপনও করেনি। সে চলে গিয়েছিল। আর আসেনি। মৃণালকান্তি লিখছে, 'সে আর আসিবে না জানিয়া তাহাকে আমার সেই মুহূর্তে বড় প্রিয় বোধ হইল। আমি তাহাকে চলিয়া যাইতে দেখিলাম।'

চারুলালের আত্মহত্যা

ট্রাম থেকে হিরণ দেখল প্রেসিডেন্সি কলেজের সামনে ফুটপাথ দিয়ে চারুলাল উত্তরমুখো হেঁটে যাচ্ছে। হাতে একরাশ বই, চুল উশকোখুশকো। এতদূর থেকেও বোঝা যায় চারুলালের হ্যান্ডলুমের গেরুয়া পাঞ্জাবি বড় ময়লা হয়ে গেছে। চারুলালের কাছে পাঁচটা টাকা পাওনা ছিল—হঠাৎ মনে পড়ায় হিরণ হাত নেড়ে 'চারু' বলে ডাকল। চারুলাল শুনতে পেল না। লক্ষ করে হিরণ তাড়াহুড়ো করে ট্রাম থেকে নেমে পড়ল।

নেমে খেয়াল হল যে, তার ট্রামের টিকিট কাটা হয়ে গিয়েছিল। এসপ্লানেডের টিকিট। এখন যদি চারুলালকে না পাওয়া যায় তবে আর একবার টিকিট কাটতে হতে পারে! কিংবা সে দ্বিতীয়বার যদি টিকিট না কাটে এবং পরবর্তী কোনও ট্রামের কন্ডাক্টর যদি ভদ্র ও অন্যমনস্ক হয় তবে সে একবার ভাড়া দিয়ে এসপ্লানেড না গিয়ে অন্যবার ভাড়া না দিয়ে এসপ্লানেডে পৌঁছতে পারে। একটু অন্যমনস্ক হিরণ হাত তুলে একটা ধীরগতি ফিয়াট গাড়িকে দাঁড় করিয়ে তার সামনে দিয়েই রাস্তা পার হল এবং যথাসম্ভব দ্রুত গতিতে ভিড় ঠেলে চারুলালের পিছু নেওয়ার চেষ্টা করল। সে হ্যারিসন রোড পার হল এবং কলেজ স্ট্রিট মার্কেটের ডাবপট্টি পর্যন্ত এগিয়ে গেল। হিরণ একটু বেঁটে, ভিড়ের গড়পড়তা উচ্চতাকে অতিক্রম করে চারুলালের মাথা কিংবা পাঞ্জাবির অংশ কোথাও দেখতে পেল না। তা ছাড়া চারুলাল যে সহজ সোজা পথে যাবে তারও কোনও নিশ্চয়তা ছিল না—কেন না চারুলাল কবি, অন্যমনস্ক, অমিতব্যয়ী ও বিপথগামী।

হতাশ হিরণ একটু দীর্ঘতর শ্বাস ছাড়ল। হাতের টিকিটটার দিকে চেয়ে সে আর একবার অন্যমনস্ক হয়ে গেল। এ কথা ঠিক যে তার চিন্তা ভাবনা সব সময়েই অর্থনীতির ধার ঘেঁষে যায়। এখন তাকে একজন ভদ্র ও অন্যমনস্ক ট্রাম কন্ডাক্টর খুঁজে বের করতে হবে। অথচ ব্যাপারটা ঠিক আইনমাফিক হবে না। হাতের ট্রামের টিকিটটা ক্রমশ তার

অর্থনৈতিক চিন্তাকে উজ্জীবিত করে। সে ভেবে দেখছিল এসব ক্ষেত্রে কন্ডাক্টরের কাছে 'জার্নি ইনকমপ্লিট' লেখা কোনও স্ট্যাম্প থাকলে সে ভদ্রভাবে এবং আইনমাফিক লক্ষ্যস্থলে পৌঁছোতে পারত।

যে স্টপেজে নেমেছিল আবার সে স্টপেজের দিকেই ফিরে আসছিল হিরণ। পুরানো বইয়ের দোকানের ধার ঘেঁষে, ফড়ে, দোকানি, ছাত্র-ছাত্রীর ভিড়ের ভিতর দিয়ে ইঁদুরের মতো দ্রুত গর্ত খুঁড়ে এগোতে গিয়ে সে লক্ষ করল কলেজ স্ট্রিটে মন্থর একটি ট্রাফিক জ্যাম সৃষ্টি হচ্ছে। 'ধুত্তোর' বলে ট্রাম-বাস থেকে নেমে পড়ছে লোক। 'শালার মিছিল'— হিরণের প্রায় কান ঘেঁষে একজন চলতি মানুষ বলে গেল।

হিরণ মিছিল ভালবাসে না, আবার বাসেও। সে লক্ষ করল উত্তর দিকে কলেজ স্ট্রিট হয়ে মাঝারি এক মিছিল সামনে লাল সালুর ওপর রূপালি লেখা ভাসিয়ে দক্ষিণমুখো আসছে। অতএব কিছুক্ষণের জন্য এসপ্লানেডের ট্রামবাস বন্ধ। মন্দ নয়। হিরণ ভেবে দেখল মিছিলের সঙ্গ ধরলে সে দ্বিতীয় বারের ট্রামভাড়া সঞ্চয় করতে পারে এবং এসপ্লানেড পর্যন্ত এতটা পথ গোলেমালে কাটিয়ে দিতে পারে।

কিন্তু তার আর দরকার হল না। কেননা সে দেখতে পেল চারুলাল উলটোদিকের ফুটপাথে দাঁড়িয়ে এইমাত্র একটা সিগারেট ধরাল। 'চারু' বলে চিৎকার করে হিরণ হাত নাড়ল এবং থেমে-থাকা গাড়ি ও ট্রামগুলি অতিক্রম করে দেখল মিছিলটা ধীরগতিতে চারু আর তার মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে। চারু মিছিল দেখছে। 'চারু' বলে আবার ডাকল হিরণ, আর সেই মুহূর্তে মিছিলের উন্মত্ত স্লোগান...'চাই' ধ্বনিতে শেষ হলে হিরণ দেখল 'চারু' ও 'চাই' দুটি শব্দ মিলে মিশে 'চাইরু' গোছের একটা শব্দ ধ্বনিত হল। 'চাইরু' শব্দটা বিস্মিত হিরণ আপন মনে উচ্চারণ করল। কিমিদং! এর অর্থ কী! ভাবল সে। সে চারুকে আর ডাকল না, মিছিলটাকে চলে যেতে দিল। তার চারুলালকে নিয়ে ভাবনা হচ্ছিল। কেননা চারুলাল ইতিমধ্যে পূর্ব-পশ্চিম বা উত্তর-দক্ষিণ যে কোনও দিকে খামোকা রওনা হয়ে পড়তে পারে। কেননা ইতিপূর্বে সে চারুলালকে উত্তর দিকে যেতে দেখেছিল, এবং এখন দেখা যাচ্ছে যে, সে আবার দক্ষিণ দিকে উজিয়ে এসেছে। চারুলালের চলাফেরার মধ্যে কোনও পরিকল্পনা নেই। কোনও লক্ষ্যে পৌঁছোবার একমুখিনতা নেই। এবং আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বাস্তবিক মিছিলটা শেষ হওয়ার পর দেখা গেল চারুলাল যথাস্থানে নেই। পুলিশের কালো গাড়িটা কয়েক মুহূর্তের আড়াল তৈরি করেছিল এবং সেটুকু সময়েই অস্থিরমনস্ক চারুলাল মত পরিবর্তন করেছে।

রাস্তা পার হয়ে হিরণ হতাশ হল। কেননা হিরণ কয়েক মুহূর্তের চিন্তায় ঠিক করে নিয়েছিল সে চারুলালকে পেলে জিগ্যেস করে বাঙলা অভিধানে 'চাইরু' বলে কোনও শব্দ

পাওয়া যায় কি না এবং পাওয়া গেলে তার অর্থ কী। কেননা শব্দ সঞ্চয় করা চারুলালের স্বভাব এবং এইসব নিয়ে আলোচনা করাও তার প্রিয়। হিরণ ঠিক করেছিল শব্দ নিয়ে আলোচনা ক্রমশ জমে উঠলে সে একসময়ে আকস্মিকভাবে হঠাৎ মনে পড়ার মতো করে পাওনা টাকাটার কথাও বলে ফেলতে পারবে। কিন্তু আপাতত চারুলালকে একটা সমস্যার মতো মনে হচ্ছে।

হিরণ কফিহাউসের মোড় থেকে কলেজ স্ট্রিটের মোড়ের লাল ডাকবাক্সটা পর্যন্ত এবং লাল ডাকবাক্সটা থেকে কফিহাউসের মোড় পর্যন্ত জঙ্গল ভেদ করে চারুলালকে বারকয়েক খুঁজে দেখল। অবশেষে হতাশ হয়ে আবার ট্রাম স্টপেজে দাঁড়াল হিরণ।

মানুষের চলাফেরার মধ্যে একটা অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য থাকলে হিরণ খুশি হয়। এমন মানুষকে ধরা ছোঁয়া বোঝা সহজ। অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যসম্পন্ন কোনও মানুষের সারাদিনকার চলাফেরার একটা ম্যাপ যদি আঁকা হয় তা হলে দুই রকম মানুষের উদ্দেশ্য ও উদ্দেশ্যহীনতার একটা বাস্তব তফাত পাওয়া যেতে পারে। মনে-মনে চারুলালের সম্ভাব্য গতিবিধির একটা ম্যাপ ছকে ফেলবার চেষ্টা করে দেখল হিরণ। কিন্তু ম্যাপটা ক্রমশ তার মনে নানাবিধ বক্র ও অর্ধবৃত্তাকার রেখায় এমন জটিল অ্যাবস্ট্রাক্ট রূপ ধারণ করল যে, সে ভয় পেয়ে হাল ছেড়ে দিল, সহজ অন্য কিছু ভেবে দেখবার চেষ্টা করতে লাগল। এ কথা ঠিক যে, চারুলাল কিংবা চারুলালের মতো মানুষগুলিকে হিরণ বোঝে না। তবে চারুলাল কিংবা চারুলালের মতো মানুষগুলি কী উদ্দেশ্য নিয়ে জটিল এবং অ্যাবস্ট্রাক্ট বক্ররেখাগুলিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে? এই জটিল এবং অ্যাবস্ট্রাক্ট রেখাগুলিকে হিরণ বোঝে না। হিরণ ভাবতে-ভাবতে হাতে তখনও ধরে থাকা ট্রামের টিকিটটার দিকে তাকাল। সে এসপ্লানেডে যায়নি অথচ তার হাতে এসপ্লানেডের এই টিকিটটা বাতিল হয়ে গেল। এই অব্যবহৃত-উপযোগ সরবরাহে অক্ষম টিকিটটা তার কোন কাজে লাগবে? যদিও ব্যাপারটি দুর্বোধ্য তবু অস্পষ্টভাবে তার মনে পড়ল একদিন কফিহাউসে চারুলাল বাড়তি কাগজ খুঁজে না পেয়ে এমন একটি ব্যবহৃত টিকিটের পিছনে তার কবিতার পয়েন্ট টুকে রাখছিল।

যতদূর মনে পড়ে কবিতাটার নাম চারুলাল দিয়েছিল 'শিল্পের কারণে আত্মহত্যা।' বাস্তবিক আলাদা আলাদাভাবে ধরলে হিরণ শিল্প, কারণ ও আত্মহত্যা এই তিনটি শব্দের অর্থ বুঝতে পারে। কিন্তু এই তিনটি শব্দের দ্বারা বাক্য গঠিত হলে সে 'চাইরু' শব্দটার যে জটিলতা তেমনি এক জটিলতার সম্মুখীন হয়। হিরণ বুঝে উঠতে পারে না শিল্পের কারণ ও আত্মহত্যার কারণ এক কি না, কিংবা চারুলাল কি বোঝাতে চেয়েছে যে, শিল্প আত্মহত্যার এবং আত্মহত্যা শিল্পের কারণ স্বরূপ!

চারুলালকে হিরণ বুঝে উঠতে পারে না। চারুলাল অদ্ভুত। একবার তারা দুজন 'নাইট শো' সিনেমা দেখে ফিরছিল। ফুটপাথে এক গাড়ি-বারান্দার তলায় জনা দশবারো লোক টান-টান হয়ে ঘুমোচ্ছে দেখে চারুলাল বলল 'দাঁড়াও।' হিরণ ফিরে দেখল অত্যন্ত অন্যমনস্ক চারুলাল হিরণের মুখের দিকে তাকিয়ে যেন কোনও পোকামাকড় খুঁজছে এমনি ভঙ্গিতে বলল, 'তোমার কি মনে হয় না যে এই লোকগুলো এখন প্রত্যেকেই ঘুমের ভিতরে স্বপ্ন দেখছে!' 'হতে পারে।' হিরণ হেসে জবাব দিল, 'তাতে কি?' খানিকটা যেন লজ্জা পেয়ে চারুলাল বলল, 'না, কিছু না। আমার মনে হল প্রতিবার পা ফেলে আমি ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন স্বপ্নগুলোকে মাড়িয়ে যাচ্ছি। অদ্ভুত! খানিকক্ষণ নিঃশব্দে হেঁটেছিল তারা। একবার শুধু হিরণের অস্পষ্টভাবে মনে হয়েছিল চারুলাল তাকে পিছন থেকে 'হিরণ' বলে ডাকল, পিছু ফিরে হিরণ দেখল চারুলাল অন্যমনস্কভাবে হাঁটছে, তার দিকে চাইছে না, অস্ফুট স্বরে কিছু বলছিল চারুলাল 'ব্যাবিলনে...শূন্যোদ্যানে...স্বপ্নে...হিরণ কতবার গিয়েছি যে...স্বপ্নোদ্যানে...শূন্যে...ব্যাবিলনে....!'

হিরণ অন্যমনস্কভাবে এইসব রহস্যের কিনারা করবার চেষ্টা করছিল, এমন সময় একজন লোক ভদ্রভাবে তার সামনে দাঁড়িয়ে গলা চুলকোতে-চুলকোতে জিগ্যেস করল, 'আজকের খেলার রেজাল্ট কি দাদা?' মুহূর্তে সংবিৎ ফিরে পেয়ে লোকটার কথার উত্তরে অস্পষ্ট 'জানি না' বলেই সে ঘড়ি দেখল ছ'টা বেজে পাঁচ মিনিট। সাধারণত হিরণ উদ্দেশ্যহীনভাবে কোথাও বেরিয়ে পড়ে না, কিন্তু এখন চারুলালের কথা বেশ কিছুক্ষণ ভাববার পর, তাকে এ কথা বেশ কষ্ট করে মনে করতে হল যে, সে কেন এসপ্লানেড যাচ্ছিল। মনে পড়ল গ্লোবের ছবিটা দেখবে বলে সে এসপ্লানেড যাচ্ছিল, হল-এর সামনে অমিয় তার জন্য অপেক্ষা করবে। কিন্তু এখন আর গিয়ে লাভ নেই! খেলার মাঠের ভিড় ট্রাম বাস বোঝাই হয়ে ফিরছে! ইস্টবেঙ্গল এক গোলে জিতেছে—চিৎকার শুনতে পেল হিরণ। ট্রাফিক জ্যাম, মিছিল, খেলার ভিড়—এই সব কিছুর মধ্যে স্বপ্নাবিষ্ট চারুলাল কোথায় থাকতে পারে ভেবে না পেয়ে হিরণ ধীরে-ধীরে অনেকদিন পর গোলদিঘির দিকে চলল।

চারুলাল সম্পর্কে কি একটা শেষ কথা জানবার ছিল হিরণের। এখনও জানা হয়নি। কিংবা কে জানে, হয়তো চারুলালকে জানবার ও বুঝবার মতো শক্তি হিরণের কোনওদিন ছিল না। তার আজ হঠাৎ মনে হল অনেকদিন থেকেই সে চারুলালকে একটু অবহেলা করে এসেছে। দুঃখ হচ্ছিল চারুলালের জন্য। সে ট্রাম থেকেও দেখতে পেয়েছিল যে চারুলালের পাঞ্জাবিটা বড় ময়লা হয়ে গেছে; মনে পড়ল, চারুলাল বড় আস্তে-আস্তে হাঁটছিল। এক মুহূর্তের জন্য হিরণ চারুলালের প্রতি গোপন ও তীব্র একটা আকর্ষণ বোধ করল। ব্যাবিলনে...শূন্যে...স্বপ্নোদ্যানে...কোথায় যেন যেতে চায় চারুলাল, হিরণ জানে না।

অমন যাওয়ার ইচ্ছে হিরণের কখনও হয়নি। তাই সে কখনও বুঝতে পারে না চারুলালের কল্পনার মধ্যে কেন একটানা দুশো মাইল উড়ে এসে একটা শকুন হাওড়ার পুলের ওপর বসে, আর অন্যদিকে ইউনিকর্ন লাল ইমলি, লিপটনের নিয়নগুলি দপদপিয়ে ওঠে, মন্থর ট্রাফিক কলকাতায় ক্রমশই কঠিনতর জ্যাম-এর দিকে অগ্রসর হয়, কোনও কিছুতেই তার প্রয়োজন নেই বলে আবার হাওয়ায় ডানা ভাসিয়ে দেয় শকুন—গোপনে সে যেন কার প্রাণ হরণ করে নিয়ে যায়। 'স্বপ্নের শকুন' নামক এই কবিতা হিরণ শুনেছে চারুলালকে খানিকটা বিখ্যাত করেছে।

গোলদিঘির ভিড় তুলনায় অনেক বেড়ে গেছে, হিরণ লক্ষ করল। সে বুঝল ফাঁকা কোনও বেঞ্চ পাওয়া অসম্ভব। সে আস্তে-আস্তে লক্ষ রেখে এগোতে লাগল এবং ভাগ্যক্রমে একটা বেঞ্চে দুজন বুড়োমানুষ এবং তাঁদের পাশে একটা খালি জায়গা দেখে অবিলম্বে ঝপ করে বসে পড়ল হিরণ। নানা অনভ্যস্ত শিল্পচিন্তায় তার মাথা ঘুরছিল। টের পেল পাশের দুই বুড়োমানুষ তার বসার ভঙ্গি ও ঘাড় হেলিয়ে দেওয়ার ঢঙ লক্ষ করছে। বুড়োমানুষদের সঙ্গী হিসেবে ভালো লাগে হিরণের। এঁরা অচেনা লোক পাশে এসে বসলে অসন্তুষ্ট হলেও উঠিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন না। অন্য সময় হলে হিরণ এঁদের সঙ্গে আলাপ জমানোর চেষ্টা করত। আজ করল না, কারণ তার মন অস্থির ছিল, ঠান্ডা বাতাস তার চোখে মুখে লাগছিল, ঘুম পাচ্ছিল হিরণের। সে চোখ বুজল। এবং প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে সে নানা এলোমেলো স্বপ্ন দেখতে শুরু করল।

আধোঘুমের ভিতর সে শুনতে পেল পাশের বুড়োমানুষ দুজন অবিশ্রাম একঘেয়ে গলায় পূর্ববঙ্গের গল্প করে যাচ্ছে। সেখানে রোদ ছিল আলাদা বর্ষা ও মেঘ ছিল আলাদা, ঋতুগুলি ছিল ভিন্নরকম। তরমুজের খেত ও কাশবন—কশাড়ের জঙ্গল, বালুচর ও ব্রতকথার সেই দেশ ছিল। কেমন সেই দেশ—উনিশশো চৌষট্টির সেপ্টেম্বরের কলকাতা থেকে আধোঘুমের ভিতরে সেই দেশকে বিদেশ বলে মনে হয়। খাঁড়ি দিয়ে বিলের জল বর্ষাশেষে নেমে যেতে থাকলে কাকামশাই চাঁদা মাছ ধরতেন, খাঁড়ির জলে ধারালো ইস্পাতের মতো ঝলসে উঠত রূপালি ইলিশ। যেন শরৎকাল ঘন হয়ে এসেছে, পাল খাটানো হয়েছে—দুলে-দুলে নৌকো চলেছে পূর্ববাংলার দিকে, স্মৃতি ও বিস্মৃতিময় দুটি নৌকো পাশাপাশি অনায়াস পাল তুলে উনিশশো চৌষট্টির কলকাতা ছেড়ে গেল। হিরণ রূপকথার মতো সেই গল্প শুনছিল।

তারপর ঘাড় কাত করে হিরণ অনেকক্ষণ আধোঘুমের ভিতরে স্বপ্ন দেখল। মাটির উনুনের আঁচে ইলিশ মাছের ঝোল ফুটছে, রূপশালির ভাত ফুটছে, ফুটফুট। কাঠের উনুনের ধোঁয়ার গন্ধ...আর দেখল উজান বিল, রাজহাঁস, কালকাসুন্দের ঝোপ ও জোনাকি

পোকা। দেখল চারুলালের স্বপ্নের শকুন হাওড়ার ব্রিজ ছেড়ে গেল বুড়িগঙ্গা বিশালাক্ষীর ওপর কশাড়বন ও কাশফুলের ওপর তার ছায়া বিস্তার করবে বলে। স্বপ্নের নৌকো ধীরে-ধীরে দুলতে থাকে।...হঠাৎ হিরণ চারুলালকে দেখছিল ইউনিভার্সিটির নতুন অন্ধকার উঁচু বাড়িটার ভিতর ঢুকে যাচ্ছে—তড়িৎগতিতে অন্ধকার লিফট চালু করল চারুলাল—সশব্দ ইলেকট্রিকের তার চারুলালকে টেনে নিতে থাকে, হিরণ প্রাণপণে সিঁড়ি ভাঙতে থাকে, চিৎকার করতে থাকে 'চারু চারু' বলে। স্তূপাকৃতি সিমেন্ট, কংক্রিটের থাম ও সিঁড়ি পেরিয়ে এই অকারণ আত্মহত্যাকে নিবারণ করতে চায় সে। কিন্তু দ্রুত ধাবমান 'এলিভেটর' চারুলালকে শকুনের মতো ছোঁ মেরে তুলে নিচ্ছে। হিরণ দু-হাত তুলে বলতে থাকে, 'তোমার উদ্দেশ্য কি চারুলাল? তুমি কত দূর যেতে চাও?' ধাবমান 'এলিভেটর' থেকে চারুলালের দূর গলার ধীর আবৃত্তি কানে আসে, 'কতবার গিয়েছি যে হিরণ....স্বপ্নে...শূন্যোদ্যানে...ব্যাবিলনে।' হিরণ অন্ধকারে বিম-কাঠের ঠেকা, কার্নিস, জ্যামিতিক সিঁড়ি ও লিফটের খাঁচার অরণ্যকে লক্ষ করে হাল ছেড়ে দেয় হঠাৎ।

কিমিদং! এর অর্থ কী! হিরণ বোকার মতো ফ্যালফ্যাল করে ঘুম ভেঙে চেয়ে দেখল বেঞ্চটা খালি হয়ে গেছে। সন্ধ্যা রাত্রির দিকে গড়িয়ে গেল। গোলদিঘির দক্ষিণ কোণে ভিড় জমেছে খুব। কিছু একটা হয়েছে ওখানে। হিরণ ভালোভাবে জেগে উঠে এইসব স্বপ্ন কিংবা স্বপ্ন ও চিন্তার সংমিশ্রণ পরিষ্কার করে নিতে চেষ্টা করল। কেন না সে তার জীবনে কখনও শিল্পের জন্য আত্মহত্যার কথা ভাবেনি, স্বপ্নের শকুনের কথাও না। উদ্ভটের প্রতি কোনও মোহ ছিল না হিরণের, তবু কেন উদ্ভটই আজ তাড়া করে ফিরছে! তার ব্যাবিলন ছিল না, মধ্যাহ্নের ভূতের মতো জাগর-স্বপ্ন ছিল না—তবু মনে হচ্ছে আজ চারুলালের ব্যবিলন পিছু নিয়েছে তার। এ কি চারুলালের সম্মোহন প্রভাব—সে অনেকক্ষণ চারুলালের কথা ভেবেছে আজ—সেই জন্যে?

গোলদীঘির দক্ষিণ কোণে গোলমালটা বেড়ে চলেছে। হিরণ দেখে অনেক লোক ছুটে যাচ্ছে ওদিকে। দারুণ ভিড়। কী হতে পারে! হিরণ ভাবল। পরমুহূর্তেই অকারণে অন্যমনস্ক হয়ে গেল হিরণ। আলস্যের সঙ্গে সে ভেবে দেখল চারুলালের সঙ্গে তার তফাতটা কোথায়। দারুণ অভাব আছে চারুলালের সংসারে। চাকরিও খোঁজে চারুলাল—কিন্তু তেমন উৎসাহের সঙ্গে নয়। টিউশনি করে সে নিজের খরচ চালায়, গাঁটের ট্রামভাড়া খরচ করে নানা পত্রিকার অফিসে কবিতা ফিরি করে বেড়ায়, সংসারে কিছু দেয় চারুলাল—কিন্তু সে তেমন কিছু না। আর হিরণ বারো বছর বয়সে কলকাতার রাস্তায় একদিন ধূপকাঠি ফিরি করে বেড়াত, ওইভাবে কলকাতা চেনা হয় প্রথম উনিশশো সাতচল্লিশ থেকে। ক্রমশ চিনতে পেরেছে সে পথঘাট ও চরিত্র। হিরণ এখন সংসার চালায়—সংসারের তরুণ অভিভাবক সে—তাকে আয়কর দিতে হয় এখন, লোককে ধারও দিতে

পারে হিরণ। পথঘাট ও চরিত্র হিরণের চেনা হয়ে গেছে। তবে কেন খামোকা চারুলালের ব্যাবিলন তার পিছু নেয়, কেন স্বপ্নের শকুনের কথা ভাবতে গেল হিরণ? 'দ্যাখো হে চারুলাল', হিরণ মনে-মনে বলল, 'আমাকে আয়কর দিতে হয়। বেশিরভাগ অফিসবাড়ি, কারবারি ও দোকানদারদের আমার জানা হয়ে গেছে। আমি যতদূর বুঝতে পারি বুলডোজারের মুখে তৈরি হচ্ছে পৃথিবী—সাদামাটা আমার চিন্তা। কিন্তু তুমি একি তৈরি করছ চারুলাল—যা আমাকেও তাড়া করে দেখছি!'

বিষণ্ণ হিরণ বসে দেখল গোলদিঘির দক্ষিণ কোণটা লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল। কিছু একটা হয়েছে ওখানে। কী হতে পারে! ভিড় দেখলে সাধারণত উৎসাহী হয় হিরণ—ভিড়ের কারণ খুঁজে দেখে। কিন্তু আজ তার উঠতে ইচ্ছে করল না, কাউকে কিছু জিগ্যেসও করল না হিরণ। চুপচাপ বসে রইল খানিকক্ষণ। তারপর উঠে পড়ল। ধীরে-ধীরে সে ভিড়ের কাছেই এসে দাঁড়ায়। কথাবার্তা না বলেও সে বুঝতে পারে কে একজন জলে পড়েছে—এখন তাকে তোলা হচ্ছে।

জলের মধ্যে কয়েকজন মানুষকে দেখতে পেল হিরণ, জলের ধারে একজন 'বিট'-এর পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে। ক্রমশ হিরণ দেখল জল থেকে কয়েকটা হাত একটা দেহকে ধরে তুলল। পুলিশটার পায়ের কাছেই শুইয়ে দিল তাকে। ভিড় ক্রমশ বাড়ছে, হিরণের দম নিতে কষ্ট হচ্ছিল। চলে যাওয়ার জন্য উদ্যত হয়েও আবার ফিরে এল হিরণ। লোকটা চেনাও তো হতে পারে—কত লোককেই তো চেনে হিরণ—এই ভেবে সে ভিড় ঠেলে সামনে এগোতে লাগল। রেলিঙের কাছে সে যখন এসে পৌঁছোল তখন লোকটাকে একটা স্ট্রেচারে শুইয়ে তোলা হচ্ছে। কিন্তু যতদূর মনে হল লোকটা মারা গেছে—কাছাকাছি যারা ছিল তারা হতাশার ভঙ্গিতে মাথা নাড়ছিল।

বাহকেরা হিরণের চোখের তলা দিয়ে স্ট্রেচারটা ধীরে-ধীরে নিয়ে গেলে প্রথমটায় একবার চমকে উঠেই কাঠ হয়ে গেল হিরণ। চারুলালের চোখ খোলা ছিল না, তবু হিরণের মনে হল চারুলাল তাকে সারাক্ষণ দেখতে-দেখতে গেল। এত কাছাকাছি ছিল চারুলাল! কিন্তু মুহূর্তেই পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে সচেতন হিরণ বুঝতে পারল এখন কোনও শব্দ করলে তার মুশকিল হবে। সে সাক্ষী থাকতে চায় না। নিঃশব্দে ভিড় ঠেলে বেরিয়ে এল হিরণ। পুলিশ চারুলালের পরিচয় ঠিক খুঁজে বের করবে। আপাতত হিরণের দায়িত্ব শেষ হয়ে গেল—স্থির নিশ্চিতভাবে সে জেনে গেল যে, চারুলাল আত্মহত্যাই করেছে।

'কিন্তু এটা কেমন হল!' 'এটা কী হল হে চারুলাল', মনে-মনে বলল হিরণ, 'এমন তো কথা ছিল না হে!' হিরণ গভীরভাবে অন্যমনস্ক হয়ে গেল। আজ বিকেলে চারুলালকে দেখবার পর থেকে যেসব অকারণ চিন্তা হিরণকে পেয়ে বসেছিল, এখন হিরণ টের পেল

এর কোনও অর্থ আছে। এই আত্মহত্যা নিশ্চিন্ত অকারণ—এর কোনও মানে নেই। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ এতদিনের মধ্যে কোনও দুর্ঘটনায় পড়েনি হিরণ—তার হাত পা অটুট আছে, ইন্দ্রিয়গুলি সতেজ ও কর্মক্ষম আছে। এইজন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। সে শিল্পের কারণ ও আত্মহত্যার প্রয়োজন ও উপযোগ বোঝে না বলে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।

সম্ভবত এতটুকুই আসবার কথা ছিল চারুলালের, এর বেশি নয়। হাত পা ইন্দ্রিয়গুলির মতো মৃত্যুও সহজাত—হিরণের একথা অজানা নয়। বেঁচে থাকলে চারুলালেরও মৃত্যু হত। সুতরাং চারুলাল নামক যে ব্যক্তিকে সে চিনত তার জন্য দুঃখ ছিল না হিরণের। তার পরিতাপ ছিল চারুলালের পরিকল্পনাহীনতা ও উদ্দেশ্যহীনতা লক্ষ করে। নিয়তিকে কে ঠেকাতে পারে? 'কিন্তু চারুলাল', হিরণের ঠোঁট নড়ছিল, 'এ উচিত নয়। এ আইন ভঙ্গ করা।' কিন্তু পরিতাপের বিষয়, এই আইনভঙ্গের কোনও আসামি নেই।

বিষণ্ণ হিরণ পথে-পথে খানিকটা ঘুরল। ট্রামে উঠল, ট্রাম থেকে নেমে পড়ল হঠাৎ, সিগারেট ধরিয়েই ফেলে দিল। তার চোখের ওপর দিয়ে ভেসে গেল নিওনের সাইন—বিনাকা-র বাচ্চা মেয়েটা হাসছে....লিপটনের কেটলি থেকে পতনশীল আলো...লুফৎহানসার উড়ন্ত অ্যাবস্ট্রাক্ট হাঁসের চিহ্ন...হ্যান্ডলুম ফ্যাব্রিকস...ক্রয় করুন, ক্রয় করুন...সেল সেল। হিরণ ভেবে দেখল...আলো ও অন্ধকারময় এই যা আছে, পাপপূণ্যময়, ধর্মাধর্মময় এই যা আছে, সবকিছুকেই বড় গোপনে ও নিঃশব্দে অবহেলা করে চারুলাল। এইখানেই কি তার জিৎ? না কি এখানেও নয়! আরও দূর বহুদূর কোনও জায়গায় চারুলাল জিৎ রেখে গেছে, যেখানে অন্য কেউ কখনও নাগাল পাবে না! সেইখানে যা যা চেয়েছিল চারুলাল সবকিছু দু হাত ভরে পেয়েছিল। আর প্রয়োজন ছিল না বলেই কি চারুলাল অবশেষে সাঁতার না শেখার প্রয়োজন হিরণকে—একমাত্র হিরণকেই বুঝিয়ে দিয়ে গেল!

আরও খানিকক্ষণ পরিকল্পনাহীন ও উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরল হিরণ। একটু রাত করে বাড়ি ফিরল এবং খুব তাড়াতাড়ি ঢাকা দেওয়া খাবারের সামান্য কিছু খেয়ে নিয়ে বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়ল। তড়িৎগতিতে অন্ধকার তাকে কামড়ে ধরল। বুঝতে পারছিল আজ রাতে তাকে অনিদ্রা-রোগ আক্রমণ করবে। মশারির সাদা আবছা চালের দিকে চেয়ে হিরণের হঠাৎ মনে পড়ল অনেকদিন আগে হিরণ একটা লোককে চিনত—তার ছিল যক্ষ্মারোগ। কিন্তু সে কখনও রুগির মতো থাকেনি—কয়েকবার বিভিন্ন জায়গায় হাসপাতাল থেকে সে পালিয়ে এসেছিল। রোগগ্রস্ত সেই লোকটাকে হিরণ কখনও সাহায্য করেছে—কিন্তু খুশিমনে নয়। হিরণ জানত এই সাহায্য নানা লোকের কাছ থেকে পাওয়া যায় বলেই লোকটা বারবার হাসপাতাল থেকে পালিয়ে আসে—নিরাময়কে বড় ভয় ছিল সেই লোকটার, কেননা, দীর্ঘকাল ধরে রোগে ভুগে-ভুগে সে সেই রোগটাকে ভালোবেসে

ফেলেছিল—যেমন আমরা আমাদের হাত পা নাক মুখ চোখ বিশ্বাস আত্মপ্রবঞ্চনা ও বৃথাগর্বগুলিকে, মেধা ও বোধগুলিকে ভালোবাসি। এর থেকে প্রতিসারিত কোনও অস্তিত্বের কথা আমরা কখনও ভেবে দেখিনি। শেষবার হিরণ লোকটাকে দেখেছিল লিন্ডসে স্ট্রিটের মুখে দাঁড়িয়ে একটা চোরাই ঘড়ি সম্ভাব্য খদ্দেরকে গছাবার তালে আছে। বিরক্ত হিরণ তাকে পাকড়াও করে প্রশ্ন করেছিল 'এ সব কী? আপনি এখানে এভাবে কেন?' লোকটা অনেকক্ষণ হিরণের দিকে চেয়ে বিড়বিড় করে বলেছিল তার রোগটা জটিল, এমন রোগ সহজে হয় না, সহজে সারেও না, এবং মৃত্যু অনিশ্চিত। হিরণ নিজের ধর্মবোধ ও পরোপকার প্রবৃত্তির দ্বারা চালিত হয়ে লোকটাকে প্রায় কোণঠাসা করে এনেছিল। লোকটা অবশেষে দৃঢ়ভাবে হিরণকে বলে দিল, 'মশাই, যদি আমার ঘড়িটা কিনতে হয় তো কিনুন, নইলে নিজের পথে যান। আমি আত্মহত্যা করছি না—কেউই কখনও তা করতে পারে না।'

এই জটিল কথাটা এতকাল হিরণ বুঝতে পারেনি। আজ হিরণ সেই লোকটার মুখ মন করতে পারে না। কিন্তু এতদিনে সে যেন সেই রোগটার অর্থ ধরতে পারছে। যদিও জটিল রোগ-দুরারোগ্য—কিয়দংশে পরিকল্পিত ক্ষয় ও স্বপ্নের দ্বারা গঠিত, তবু হিরণ এর অর্থ বুঝতে পারে।

এখন মর্গে চারুলালের মৃতদেহের ওপর তার শিল্পচিন্তাগুলি মাছির মতো এসে বসেছে। তার মেদ-মজ্জা শুষে নিচ্ছে। দুরারোগ্য সেই ব্যাধি—বড় সংক্রামক। ভাবতে-ভাবতে হঠাৎ ভয়াবহ চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে করে হিরণের। তার মনে হয় এক অচেনা কিন্তু সুসংবদ্ধ কার্যকারণ সূত্রে চারুলালের আত্মহত্যা সংঘটিত হয়েছে। এ আইনসম্মত এবং এ কারও অনুমতিসাপেক্ষ নয়।

চারুলালের সঙ্গে নিজেকে সম্পূর্ণ যোগাযোগহীন ও সম্পর্কশূন্য অনুভব করে সে একবার ভাবল—এ অন্যায়। পরমুহূর্তেই ভেবে দেখল—কিন্তু হায়, চারুলালের এই মৃত্যু ধর্ম ও অধর্মে গঠিত এক ধাঁধার মতো—যার সমাধান কখনও সম্ভব নয়।

চারুলালের কাছে পাঁচটা টাকা পাওনা ছিল। কিন্তু আজ রাত্রে হিরণ সেই পাঁচটা টাকার যাবতীয় স্বত্ব ও দাবিদাওয়া ছেড়ে দিল।

হিরণ অনুভব করে এবার সে আস্তে-আস্তে কিংবা এক্ষুনি ঘুমিয়ে পড়বে।

পটুয়া নিবারণ

আমাদের নিবারণ কর্মকার ছিলেন আঁকিয়ে মানুষ। .লাকে বলত বটে পটুয়া নিবারণ—কিন্তু তাঁর ছবি-টবি কেউ কিছু বুঝত না। সেই অর্থে পট-টট কখনও আঁকেননি নিবারণ কর্মকার। যদিও ঠিক পটুয়া ছিলেন না নিবারণ, তবু তাঁর আঁকার ধরনধারণ ছিল অনেকটা পটুয়াদের মতোই। তুলির টান, রঙের মিশ্রণ—সব কিছুই ছিল সেই পুরোনো ধরনের। শুধু বিষয়বস্তুতেই তাঁর নতুনত্ব কিংবা মতান্তরে নির্বুদ্ধিতা ধরা পড়ত। আমি তাঁর আঁকা একখানা বাঘের ছবি দেখেছিলাম যার পেটটা ছিল কাচের মতো স্বচ্ছ, আর সেই পেটের ভিতর দেখা যাচ্ছে একটি গর্ভবতী মেয়ে শুয়ে আছে—বাঘের পাকস্থলীর ওপর তার মাথা, বাঘের হৃৎপিণ্ডের ওপর তার পা, বিরাট ঢাউস পেটটা বাঘের মেরুদণ্ড পর্যন্ত ফুলে আছে, আর মেয়েটির সেই পেটের প্রায় স্বচ্ছ চামড়ার ভিতর দিয়ে কোষবদ্ধ প্রায়-পরিণত ভ্রূণটিকেও দেখা যাচ্ছে। মেয়েটি ও ভ্রূণ এই দুইজনের মুখেই নির্লিপ্ত, নির্বিকার হাসি। সব মিলিয়ে দেখলে কিন্তু বাঘটার জন্যই দুঃখ হয়। তার গোঁফ ঝুলে গেছে। অকালবার্ধক্যে তার চোখ কোটরগত ও হিংস্রতাশূন্য। ছবির নীচে লেখা 'গর্ভবতী নারীকে ভক্ষণ করিয়াছ, এখন কেমন মজা?'

'পাপের পরিণাম' সিরিজে যে ক'খানা ছবি এঁকেছিলেন নিবারণ কর্মকার, বাঘের ছবিটা ছিল তার দ্বিতীয় ছবি। সবগুলো ছবি আমি দেখিনি, কিন্তু যে কয়েকটা দেখেছি তার প্রতিটিই ছিল খানিকটা হিংস্র প্রকৃতির ছবি। যেমন মনে পড়ে একটি ছবিতে একটি অতিকায় বানর একটি কুমারী কন্যার সতীত্ব হরণ করেছে—এমনি একটা বিষয়বস্তু এঁকেছিলেন পটুয়া নিবারণ। নীচে লেখা 'সুক্ষ্মদেহীর প্রত্যাবর্তন ও নির্বিকার কাম-অভ্যাস।'

আমাদের নিশি দারোগার মেয়ে শেফালীর একবার অসুখ হল। শক্ত ব্যামো। হরি ডাক্তার এসে বলে গেল সর্বনাশ! এ মেয়ে বাঁচলে হয়! অসুখ শরীরের যতটা, মনেও

ততটা। মন ভালো রাখা চাই। ওকে কখনও কোনও অভাব দুঃখ কষ্টের কথা বলা বারণ, কোনও মৃত্যুর খবর দেওয়া বারণ। আর ও যা চায় ওকে তাই দিন।'

তাই হল। শেফালীর ঘর থেকে ধুলো ময়লা, কালো ঝুল, পিকাদানি, ইঁদুর, আরশোলা দূর করে দেওয়া হল, বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হল কালো বেড়ালটাকে। তারপর ডাক পড়ল পটুয়া নিবারণের। মন ভালো থাকে এমন ছবি এঁকে টাঙিয়ে দিতে হবে ঘরের দেয়ালে।

পট এঁকেছিলেন নিবারণ। খুব পরিশ্রম করেই এঁকেছিলেন। একটা ছবিতে ছিল নদীর তীরে একপাল বাচ্চা ছেলেমেয়ে পরস্পরের মুণ্ড খেলাচ্ছলে কেড়ে নিয়ে এর মুণ্ড ওর ঘাড়ে বসিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে; কারও মুণ্ডই যথাস্থানে নেই। এর মুণ্ড ওর হাতে, ওর মুণ্ড এর হাতে রয়েছে; আর সেই কবন্ধ ছেলেমেয়েদের দেহগুলি নিরানন্দ ও কঙ্কালসার। ছবির নাম দেওয়া ছিল 'একের মুণ্ড অন্যের ঘাড়ে চাপাইবার পরিণাম।' 'রাক্ষসীর প্রসব' নামে আর একটা ছবিতে ছিল এক বিকট দর্শন রাক্ষসী তার সদ্যোজাত সন্তানকে বৃক্ষচ্যুত ফলের মতো স্বহস্তে ধারণ করছে, আশেপাশে ইতস্তত কয়েকটা রাক্ষসশিশুর কঙ্কাল পড়ে আছে। স্পষ্টই বোঝা যায় রাক্ষসী ইতিপূর্বে তার পূর্বজাত সন্তানদের ভক্ষণ করেছে এবং আশু সন্তান-ভক্ষণের আনন্দে তার মুখ লোল, চোখ উজ্জ্বল।

এইসব ছবি দেখার ফলেই হোক কিংবা অন্য কোনও কারণেই হোক হরি ডাক্তারের সমস্ত চেষ্টা বিফল করে নিশি দারোগার মেয়ে শেফালী একদিন টুক করে মরে গেল। যতদূর জানা যায় বিকট ছবি এঁকে দারোগার মেয়ের মনে ভীতি উৎপাদনের অপরাধে গোপনে নিবারণের ওপর কিছু অত্যাচার হয়েছিল।

তাইতেই মনমরা হয়ে গেলেন পটুয়া নিবারণ। কেননা ছবি-আঁকা ছিল তাঁর প্রাণ। ছবিতেই কথা বলতে চাইতেন নিবারণ, সংসারের নানারকম মারকে ছবি দিয়েই ঠেকাতে চাইতেন। ছবি আঁকা ছাড়া আর কিছুই শেখেননি তিনি। নিশি দারোগা তাঁর সেই ছবি-আঁকা প্রায় বন্ধ করে দেওয়ার জোগাড় করলেন। কেননা কথা ছিল শেফালীর ঘরে গাছপালা, লতা, ফুল, পাখির ছবি এঁকে দেবেন নিবারণ, যাতে ঘরে বসেও শেফালীর মনে হবে যে তার চারিদিকে গাছপালা লতা ফুল পাখি মেঘ ও বাতাস রয়েছে—প্রকৃতি-টকৃতির ভিতরেই রয়েছে সে এবং এইভাবে এক জটিল মানসিক প্রক্রিয়ায় কিছুকাল প্রকৃতি-ভক্ষণ করলে শেফালীর রোগের উপশম হতে পারত। অন্তত হরি ডাক্তারের এই রকমই ধারণা ছিল।

এদিকে নিবারণের বয়স হয়ে এসেছিল। ছবির দিকেও ভাঁটা পড়ছিল। কেননা জনশ্রুতি শোনা গেল পটুয়া নিবারণের যাবতীয় শিল্পকর্ম তাঁকেই আক্রমণ করতে শুরু

করেছে। ভয়ে তিনি ঘরে ঢুকতে পারেন না। স্বপ্নের ভিতরেও তিনি স্বচ্ছ পেটওয়ালা বাঘ, মুণ্ডহীন ছেলেমেয়ে ও রাক্ষসীর সন্তান ভক্ষণ দেখতে শুরু করেছেন। তাঁর ক্রমশ বিশ্বাস হচ্ছিল একদিন এরা সবাই ছবি ছেড়ে বেরিয়ে আসবে এবং রুগ্ন অশক্ত বৃদ্ধ অবস্থার কোনও সুযোগে তাঁকে আক্রমণ করবে। সুতরাং কয়েকদিন তিনি সুন্দর ও স্বাভাবিক কিছু আঁকবার চেষ্টা করে দেখলেন—ছবি ছেড়ে বেরিয়ে এলেও যা তাঁর খুব বেশি ক্ষতি করতে পারবে না। কিন্তু কিছুই আঁকতে পারলেন না। এই সময়ে তিনি শক্ত সমর্থ একজন সঙ্গী খুঁজছিলেন—যে তাঁকে তাঁর শিল্পকর্মের আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে পারে। আর ছবি-আঁকা ভুলবার জন্য তিনি অন্যদিকে মন দিলেন। কখনও দেখা যেতে লাগল নিবারণ উঠোনের মাটি কোপাচ্ছেন। নয়তো ছাঁচতলা থেকে কন্টিকারির ঝোপ টেনে তুলে সাফ করছেন। যদিও বিয়ে করেননি, তবু মনে হচ্ছিল, সংসারে মন দিয়েছেন পটুয়া নিবারণ। এইবার হয়তো বিয়ে করবেন।

করলেনও।

মিস কে. নন্দীর নামডাক আজকাল আর শোনা যায় না। শোনবার কথাও নয়। তিনি যেসব খেলা দেখাতেন, আজকাল তার তা চলে না। কিন্তু আমাদের আমলে সেইসব খেলা দেখিয়েই দারুণ নাম হয়েছিল মিস কে. নন্দীর। 'প্রবর্তক সার্কাস' যখন নানা জায়গায় ঘুরছিল তখনই মুখে-মুখে অমানুষিক শক্তিসম্পন্ন সর্বভুক মহিলা মিস কে. নন্দীর নাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছিল। মনে পড়ে মিস কে. নন্দীর জন্য প্রবর্তক সার্কাসে একটা আলাদা তাঁবু ছিল—যার চারদিকে সারাদিন ভিড় লেগে থাকত। সার্কাসের খেলা আরম্ভ হলে এই তাঁবু থেকেই একটা চাকাওয়ালা খাঁচায় মিস কে. নন্দীকে নিয়ে আসা হত রিংয়ের পাশে। হই-হই পড়ে যেত চারদিকে। কিন্তু মিস কে. নন্দীকে দেখা যেত না—খাঁচার চারপাশে কালো পরদা ফেলা। ওর ভিতরে বাস্তবিক কে. নন্দী আছেন কি না বা থাকলেও কী করছেন কিছুই বুঝবার উপায় ছিল না। এদিকে ক্রমে ট্রপিজের খেলা, দড়ির ওপর নাচ, ভৌতিক চক্ষু এবং বাঘ সিংহের খেলা শেষ হয়ে আসত। তারপর একজন স্যুট টাই পরা লোক পরদা সরিয়ে একটা গোপন দরজা দিয়ে খাঁচার ভিতরে ঢুকে যেত। কিছুক্ষণ পরে বেরিয়ে এসে বলত 'অলরাইট'। দু-তিনজন লোক সঙ্গে সঙ্গে খাঁচার ওপর থেকে পরদা সরিয়ে নিত। হাততালিতে কানপাতা দায় হত তখন। আর তখন দেখা যেত মিস কে. নন্দীকে। প্রকাণ্ড নয়, বরং রোগাই বলা যায় কে. নন্দীকে। রং কালো। পরনে গোলাপি রঙের সার্টিনের হাফ প্যান্ট, বুকে কাঁচুলি—সেও গোলাপি রঙের সাটিনের। মাথার চুল ঝুঁটি করে ওপরে বাঁধা, চোখে কাজল, ঠোঁটে লিপস্টিক, পায়ে গোলাপি মোজা, গোলপি জুতো। কাঠের একখানা ঝকঝকে চেয়ারে নিশ্চল বসে থাকতেন মিস কে. নন্দী—আধবোজা চোখ, মুখে একটু হাসি। হঠাৎ মনে হয় ঘুমিয়ে আছেন, নয়তো সম্মোহিত করে

রাখা হয়েছে তাঁকে। একটা মুরগিকে সেই সময়ে ছেড়ে দেওয়া হত খাঁচার ভিতরে—কোক্কর কোঁ করে সেটা ডাকতে থাকত। আর, সেই ম্যানেজার গোছের লোকটা মিস কে. নন্দীতে ডাকতে থাকত, উত্তেজিত করত, হাতের লম্বা সরু লাঠিটা দিয়ে সজোরে খোঁচা মারত, কে. নন্দীর পেটে কোমরে। অবশেষে হঠাৎ কে. নন্দী রক্তবর্ণ একজোড়া চোখ খুলতেন, চারিদিকে তাকিয়ে দেখতেন, তারপর আস্তে-আস্তে উঠে দাঁড়াতেন। আর একবার হাততালি পড়ত। সম্ভবত ওই শব্দেই খেপে যেতেন মিস কে. নন্দী। মুরগিটার সঙ্গে তার প্রাণপণ লড়াই শুরু হয়ে যেত—সেই প্রাণান্তকর পাখা ঝাপটানোর শব্দ, মুরগির অস্ফুট ডাক, আর কে. নন্দীর দাঁত কড়মড় করবার শব্দে আমাদের গায়ের রোমকূপ শিউরে উঠত। মুরগিটা ধরা পড়ত অবশেষে—ততক্ষণ মিস কে. নন্দীর কৌশলে বাঁধা-চুল খুলে পিঠময় মুখময় ছড়িয়ে পড়েছে—ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে তাঁকে। প্রথমেই দুহাতে টেনে মুরগির মুন্ডুটাকে ছিঁড়তেন কে. নন্দী—মুরগিটার গলা থেকে হঠাৎ-হঠাৎ শ্বাস নির্গত হতে থাকত বলে তখন তার অস্ফুট ডাক শোনা যেত। পট করে ছিঁড়ে যেত গলাটা—মুন্ডুটা ছুড়ে ফেলে কে. নন্দী ধড়টাকে দুহাতে ধরতেন—কাটা গলাটা মুখের কাছে নিয়ে ডাবের জল খাওয়ার ভঙ্গিতে রক্তপান করতেন মিস কে. নন্দী। তখন কষ বেয়ে, গোলাপি কাঁচুলি বেয়ে, তলপেট থেকে চুঁইয়ে গোলাপি জুতো পর্যন্ত নেমে আসত রক্তের কয়েকটা ধারা। তারপর মুরগিটাকে খেতে শুরু করতেন—দু-হাতে পালক ছাড়াচ্ছেন আর ভিতরের মাংসের জঙ্গলে কামড় বসাচ্ছেন—এ দৃশ্যের কোথাও শিল্প ছিল কি না বলতে পারি না।

মুরগি খাওয়া হয়ে গেলে রক্তমাখা দেহে মুরগির পালক, নাড়িভুঁড়ি ইত্যাদি ভুক্তাবশিষ্টের মধ্যে অস্থিরভাবে পায়চারি করতেন মিস কে. নন্দী। তখনও তাঁর অভিনয় কেউ ধরতে পারত না। এই সময়ে একটা সাপের ঝাঁপি সেই খাঁচার ভিতরে ঢুকিয়ে দেওয়া হত। স্যুট পরা ম্যানেজার হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠতেন 'লেডি গণপতি দেখু-উ-উ-ন-ন—'। তার অবাঙালি টানের কথাটা বিটকেল শোনাত। দেখা যেত ঝাঁপির চারধারে কে. নন্দী লাফিয়ে বেড়াচ্ছেন আর ম্যানেজার হাতের সরু সাদা লাঠিটা খাঁচার ভিতর ঢুকিয়ে দিয়ে ঝাঁপির ঢাকনাটা খুলে দিতেই ছিটকে উঠত সাপ। পেখমের মতো ফণা মেলে দিয়ে কে. নন্দীর দিকে তাকাত। প্রথমটায় ভয় পাওয়ার ভান করতেন তিনি—কয়েক পা পিছিয়ে যেতেন। তারপর হাঁটু গেড়ে বসে হাত বাড়িয়ে দিতেন সাপের দিকে। সাপ ততক্ষণে ঝাঁপি ছেড়ে খানিকটা নেমে এসেছে—ছোবল দিতেই হাত সরিয়ে নিতেন কে. নন্দী। সারা তাঁবুতে শুধু দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শোনা যেত তখন। দ্বিতীয় ছোবলের মুখেই সাপের গলাটা চেপে ধরতেন—আর সারা হাত জুড়ে লিকলিক করে উঠত সাপ, কিলবিল করে জড়িয়ে ধরত তাঁর হাত। অনেকক্ষণ সময় নিতেন কে. নন্দী। খুব আস্তে-আস্তে হাতটাকে মুখের কাছে নিয়ে আসতেন—যেন সাপের ঠোঁটে চুমু খাবেন তিনি। এই সময়ে তাঁর শিল্পকর্ম

বোঝা যেত—ভঙ্গিতে পেলবতা ফুটিয়ে তুলতেন, তাঁর চোখে মুখে বন্য হরিণের সরল কৌতূহল ফুটে উঠত। পরমুহূর্তেই প্রকাণ্ড হাঁ করলে তাঁর রক্তাক্ত মুখাভ্যন্তর দেখে বাচ্চা ছেলেরা ভয়ে চিৎকার করে উঠত, আমরা চোখ বুজে ফেলতাম। ওইটুকুই ছিল কৌশল। হয়তো চোখ চেয়ে ঠিক মতো দেখলে দেখা যেত বাস্তবিক সাপের মুন্ডুটাকে খাচ্ছেন না তিনি। পরমুহূর্তেই চোখ চেয়ে দেখা যেত মুণ্ডহীন সাপের দেহ একখণ্ড দড়ির মতো ঝুলছে, আর সাপের মুড়োটা আরামে চিবোচ্ছেন মিস কে. নন্দী।

বাইরে থেকে দেখে বোঝা যেত না, কিন্তু কে জানে, হয়তো ওই জীবন মিস কে. নন্দীর আর ভালো লাগছিল না। তাঁর খেলার মধ্যে অনেকটাই অভিনয় ছিল সত্য, কিন্তু কেন যেন সন্দেহ হত ম্যানেজারের লাঠির খোঁচাটা ওর মধ্যেই ছিল খাঁটি। কেন না যখন চেয়ারে এলিয়ে না-ঘুম না-সম্মোহনের ভিতর থাকতেন কে. নন্দী তখন মনে হত তিনি বড়ই ক্লান্ত। মানুষের স্বাভাবিক খাদ্যাভ্যাসে প্রত্যাবর্তন করতে না পারার সেই ক্লান্তিকে দূর করতে যখন কে. নন্দীকে ম্যানেজার সেই সরু লাঠির ডগায় খোঁচা দিতেন, তখন মিস কে. নন্দীর জন্য আমি আমার যৌবনে বড় কষ্ট পেয়েছিলাম।

মিস কে. নন্দীর নামডাক এখন আর থাকবার কথা নয়। কেননা সময় পালটে যাচ্ছিল। মানুষ আর পুরোনো ধরনের খেলা পছন্দ করছিল না। ধীরে-ধীরে প্রবর্তক সার্কাসের অবস্থাও খারাপ হয়ে এল।

অবশেষে একদিন সব গোলমাল করে দিলেন মিস কে. নন্দী। ম্যানেজারের ডাক, অনুনয় লাঠির খোঁচা নিঃশব্দে হজম করে তিনি আধখোলা চোখে নিশ্চল হয়ে বসে রইলেন। মুরগিটা খাঁচার ভিতরে দাপিয়ে বেড়াল। উপায় না দেখে ম্যানেজার সাপের ঝাঁপিটাও ঢুকিয়ে দিলেন খাঁচার মধ্যে। ঢাকনাটাও খুলে দেওয়া হল। সাপটা ফণা মেলে লাফিয়ে উঠল, মুরগিটা খাঁচার ছাদে পা আটকে রেখে প্রাণপণে চেঁচাচ্ছিল। আর ঠিক এই সময়ে তাঁবু ভরতি লোককে স্তম্ভিত করে দিয়ে হঠাৎ হাউহাউ করে কেঁদে উঠলেন কে. নন্দী। খেলা ভেঙে গেল।

কিন্তু মাত্র একদিনের জন্যই। তারপর থেকে মিস কে. নন্দী আবার খেলা দেখাতে শুরু করলেন। কিন্তু ওই একদিনেই তাঁর বাজার নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, লোকে ধরে ফেলেছিল মিস কে. নন্দীকে। আর ভিড় জমল না। কে. নন্দীর খেলা শুরু হওয়ার আগেই তাঁবু ফাঁকা হয়ে যেতে লাগল। অবশেষে সার্কাস থেকে তাঁকে বিদায় দেওয়ার সময় হয়ে এল।

আমাদের পটুয়া নিবারণ এই সময়েই একজন মজবুত সঙ্গী খুঁজছিলেন—যে তাঁকে তাঁর শিল্পের আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে পারে। প্রবর্তক সার্কাসের ম্যানেজারের কাছে একদিন

দরবার করলেন নিবারণ, কিছু টাকাপয়সা দিয়ে কে. নন্দীকে ছাড়িয়ে আনলেন, তারপরে একবারে বিয়ে করে ঘরে তুললেন।

এই সময়ে আমি একদিন নিবারণ কর্মকারের সঙ্গে দেখা করতে যাই। একখানা ছবির সামনে নিবারণ কর্মকার বসেছিলেন। আমাকে দেখে সম্ভবত বিরক্ত হলেন, কিন্তু কিছু বললেন না। কিছুক্ষণ আমরা মুখোমুখি চুপচাপ বসে রইলাম। কিছুই বলার ছিল না। নিবারণ তাঁর ডান হাতটা চোখের সামনে ধরে মনোযোগ দিয়ে কিছু লক্ষ করছিলেন। মনে হল তিনি তাঁর ভাগ্যরেখা ও রবিরেখা মিলিয়ে দেখছেন। অনেকক্ষণ পর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'আমার দুটো আঙুল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।'

আমি কিছু না বুঝে প্রশ্ন করলাম, 'কোন আঙুল!'

উনি ওঁর ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনী আমায় দেখালেন 'কিছু বুঝতে পারছেন?

আমি বললাম, 'না।'

'আমিও বুঝতে পারছি না ব্যাপারটা। কিন্তু আঙুল দুটো ক্রমশ অবশ হয়ে আসছে।'

আমি আঙুল দুটো দেখলাম। স্বাভাবিক বলে মনে হল। রোগটা ওঁর মানসিক সন্দেহ করে আমি বললাম। 'শুনেছিলাম আপনি ছবি আঁকা ছেড়ে দিয়েছেন। আর আঁকছেন না!'

'ছেড়ে দিইনি। তবে দেব।' দীর্ঘশ্বাস ফেললেন নিবারণ, 'আঙুল দুটোর জন্যেই ছেড়ে দিতে হবে।'

আমি চুপ করে রইলাম। উনি নিজেই বললেন, 'এখন থেকে খেতখামারের কাজ করব ভাবছি।'

আমি ওঁর সামনের সদ্য-আঁকা ছবিটা দেখছিলাম। পালঙ্কের ওপর মিথুনবদ্ধ নগ্ন নর-নারীর ছবি এঁকেছেন তিনি; আর দেখা যাচ্ছে একটা সাপ পালঙ্কের শিয়রে ফণা তুলে পুরুষটিকে দংশন করতে উদ্যত; মেয়েটি সাপটাকে দেখছে—অথচ কিছুই করছে না; তার চোখ সম্পূর্ণ নির্বিকার। কিংবা এও হতে পারে যে মিথুন তখন এমন পর্যায়ে যে বাধা দিলে তার মাধুর্য নষ্ট হয়—তাই মেয়েটি যা নিয়তি তাকে মেনে নিচ্ছে।

হঠাৎ খুক-খুক করে হাসলেন নিবারণ। আমি উঠে পড়লাম।

চলে আসবার সময় কে. নন্দীকে দেখা গেল—ঘোমটা মাথায় সারা বাড়ি ঘুর-ঘুর করে বেড়াচ্ছেন। মনে হল সম্মোহন কেটে গেছে—সেই আধোঘুম ও অর্ধস্বপ্ন থেকে ম্যানেজারের

লাঠির খোঁচায় জেগে উঠেই অমানুষিক খাদ্যবস্তুর সম্মুখীন হতে হচ্ছে না বলে তিনি বোধহয় সুখী। কিংবা কে জানে—আমার দেখার ভিতরে ভুলও থাকতে পারে।

গ্রামে জনশ্রুতি ছিল, নানারকম গল্প প্রচলিত হচ্ছিল। কিন্তু সার্কাসের সর্বভুক মহিলার সঙ্গে পটুয়ার যৌথ জীবন ঠিক কোন পর্যায়ে এসে দাঁড়াল তা বোঝা যাচ্ছিল না। কেন না, নিবারণ আমাদের আর ডাকতেন না, গেলে বিরক্ত হতেন। কে. নন্দীও পাঁচজনের সামনে কদাচিৎ বের হতেন। ক্রমশ বাইরের জগৎ থেকে দুজনেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছিলেন। এরকম ভাবে তাঁরা আর পাঁচজনের মনোযোগ থেকে আত্মরক্ষা করে রইলেন।

দীর্ঘদিন পর আমাকে আর একবার ডেকে পাঠালেন নিবারণ। গিয়ে দেখি আঁকবার ঘরে চুপচাপ বসে আছেন নিবারণ। আমি যেতেই প্রশ্ন করলেন, 'আমার স্ত্রীকে আপনি চিনতেন?'

থতমত খেয়ে উত্তর দিলাম, ঠিক কী বলছেন বুঝতে পারছি না। তবে মিস কে. নন্দীকে আমরা অনেকেই দেখেছি।'

'আপনি কি বিশ্বাস করেন যে উনি ডাকিনী কিংবা পিশাচ-সিদ্ধ?'

'না।'

'তবে?'

'তবে কী?'

খুব চিন্তিত দেখাল নিবারণকে। কুঞ্চিত কপালে ছোট চোখে উনি ওঁর চারদিকে স্তূপাকৃতি পটগুলোর দিকে চেয়ে দেখছিলেন। সেই চেয়ে দেখার ভিতর খানিকটা ভয়ের ভাব ছিল। শুকনো ঠোঁটে জিভ বুলিয়ে উনি বললেন, 'কুসুম সার্কাসে যা করত তাকে লোকে কী বলে! সেটা শিল্প, না খেলা?'

'কে কুসুম?' আমি জিগ্যেস করলাম।

'কুসুম মানে—' হতচকিত হয়ে উত্তর দিলেন নিবারণ—'আমার স্ত্রী।'

'কে. নন্দী?'

'হ্যাঁ।' মাথা নাড়লেন নিবারণ, 'আমার সন্দেহ ছিল কাঁচা মুরগি ও সাপের মাথা খাওয়ার ভিতর কোনও শিল্প নেই; আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এখন আমার মনে হয় ধারণাটা ভুল।'

আমি কিছু না বুঝে চুপ করে রইলাম।

নিবারণ বললেন, সার্কাসে আপনারা কুসুমকে দেখেছেন, আমি দেখিনি। আমি ওর কথা শুনেছিলাম, ওকে বলা হত পিশাচ-মহিলা।' আবার ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন নিবারণ, 'কিন্তু আমার কী মনে হয় জানেন?'

'কী?'

হঠাৎ দীর্ঘশ্বাস ফেললেন নিবারণ। আর কোনও কথা বললেন না। দেখলাম উনি স্থির দৃষ্টিতে নিজের ডান হাতের দিকে তাকিয়ে আছেন। হঠাৎ বললেন, 'আমি কুসুমকে বুঝবার চেষ্টা করছি।' একটু চুপ করে থেকে আবার বললেন, 'হয়তো একটা জীবন-সময় অনেক কিছুর জন্যই যথেষ্ট নয়।'

নিবারণ কর্মকার সামান্য পটুয়া—তাঁর চিন্তায় কিছু উদ্ভট ব্যাপার ছিল—এইটুকুই আমরা জানতাম। সব মিলিয়ে মানুষটা আমাদের কাছে ছিল মজার। কিন্তু এখন কেমন সন্দেহ হল— নিবারণের গলার স্বরে, চোখের চাউনিতে অন্যরকম কিছু প্রকাশ পাচ্ছে। হঠাৎ উঠে গেলেন নিবারণ, দরজার বাইরে মুখ বার করে কী দেখে নিলেন, ফিরে এসে নিজের ডান হাতের দিকে পূর্ববৎ চেয়ে থেকে নীচু গলায় বললেন, 'কিছুদিন আগে এক দুপুরবেলা দেখি কুসুম ছাঁচবেড়ার ওপর এসে বসা একটা মোরগের দিকে স্থির চোখে চেয়ে আছে। আমি ওকে ডাকলাম, সাড়া দিল না।' একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'আপনার কী মনে হয়?'

আমি মাথা নাড়লাম—জানি না।

নিবারণ বললেন, 'আমার মনে হয় স্বাভাবিক মানুষ যা খায়—তা খেয়ে কুসুমের তৃপ্তি হয় না। এ ব্যাপারে আপনি কিছু বলতে পারেন?'

আমি আবার মাথা নাড়লাম—না। আমার গা শিউরে উঠছিল।

নিবারণ বললেন, 'একদিন আমি ওর খেলা দেখতে চাইলাম। ও প্রথমে রাজি হল না। বলল—সার্কাসে যা দেখাত তার সবটাই ছিল কৌশল। কিন্তু আমার সন্দেহ ছিল। অবশেষে একদিন আমার সাধ্য-সাধনায় রাজি হল। গভীর রাত্রে আমার সামনে একটা কাঁচা মুরগি খেল ও। সে দৃশ্য বড় ভয়ঙ্কর।' বললেন নিবারণ কর্মকার—তাঁর মুখচোখে ভয় ফুটে উঠছিল—যেন চোখের সামনে গভীর রাত্রে একা এক পিশাচ-মহিলার সামনে বসে থাকার সেই অভিজ্ঞতা তাঁকে এখনও তাড়া করছে। একটু দম নিয়ে বললেন, 'কল্পনা করুন ঘরের বউ যাকে খুব চিনি জানি বলে মনে হয়—হঠাৎ গভীর রাতে তার চেহারা ও স্বভাব বদলে যেতে দেখলে কী মনে হয়!'

আমার কিছুই বলার ছিল না। চুপ করে রইলাম।

নিবারণ বলল, 'কিন্তু ভেবে দেখলে এ ব্যাপারে বোধহয় ভয়ঙ্কর কিছু নেই।' বলেই খানিকক্ষণ চিন্তা করলেন নিবারণ, তারপর প্রায় আপন মনে বললেন, 'ছবি আঁকার সঙ্গে এর তফাত কী? আমি ভেবে দেখেছি—অভ্যাস না কৌশল না অসুখ—কোনটা?' দীর্ঘশ্বাস ছড়ালেন নিবারণ, আবার নিজের ডান হাতের সন্দেহজনক দুটো আঙুলের দিকে চেয়ে রইলেন। হঠাৎ বললেন, 'আপনার কি মনে হয় না যে এ ব্যাপারে ওর কিছু করার নেই?'

'কী রকম?' আমি প্রশ্ন করি।

হাসলেন নিবারণ কর্মকার 'যেমন ছবির ব্যাপারে আমার কিছুই করবার ছিল না। নিশি দারোগার মেয়ের ব্যাপারটা ভেবে দেখুন।'

'দেখব।' বললাম। কেমন সন্দেহ হল নিবারণের মাথায় কোনও অদ্ভুত ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। কেন না হঠাৎ এক সময়ে বললেন, 'আমার আঙুলগুলো তো নষ্টই হয়ে যাচ্ছে'—একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'কুসুমকে বলে দেখব, যদি ও আমার ছবি-আঁকার আঙুল দুটো খেয়ে ফেলতে পারে। বলেই পুরোনো ধরনের খিকখিক হাসি হাসলেন নিবারণ। হঠাৎ গলা নামিয়ে বললেন, 'আপনারা কুসুমকে ভয় করেন, না?'

আমি তাড়াতাড়ি উঠে পড়লাম। পাগল আর কাকে বলে! যখন চলে আসি তখনও নিবারণ বিড়বিড় করে যা বলছিলেন তার অর্থ—ওঁর ছবি আঁকার আঙুলগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে! আমরা ভেবেছিলাম মিস কে. নন্দী দেবী চৌধুরানীর মতো প্রফুল্লে রূপান্তরিত হয়েছেন। কিন্তু ব্যাপারটা যা বোঝা যাচ্ছে তাতে মনে হয় কোথাও কোনও গোলমাল থেকে গেল।

এদিকে গাঁয়ের লোকেরা কে. নন্দী কিংবা নিবারণ কারুরই এই গাঁয়ে থাকা পছন্দ করছিল না। তারা বলে বেড়াচ্ছিল কে. নন্দী এবার তাঁর শেষ খেলা দেখাবেন। তিনি বড়ই উচ্চাকাঙ্ক্ষাসম্পন্না মহিলা—সাপ মুরগির পর এবার তিনি আরও বড় কিছুর জন্য হাঁ করেছেন। নিবারণের বিপদ ঘনিয়ে এল বলে। মনে হচ্ছিল কে. নন্দীর সেই শেষ খেলাটা দেখার জন্য অনেকেই অপেক্ষা করছে।

ছবি-আঁকা ছেড়েই দিলেন নিবারণ। ঘর থেকে বড় একটা বেরোতেন না। কিন্তু তাঁর ভিতরে যে একটা বিপর্যয় ঘটে গেছে, একদিন তা প্রমাণ পাওয়া গেল। গাজনের বাজনা শুনে হঠাৎ খেপে গিয়ে ওঁর ঘর ছেড়ে বেরোলেন তিনি। ডেকে উঠলেন—হাত-পা ছুড়ে চিৎকার করলেন এবং এইসব ব্যাপারে সম্পূর্ণ অনভ্যস্ত রক্তাক্ত শরীরে অবশেষে বুড়ো শিবতলার বটগাছের নীচে লুটিয়ে পড়লেন। কে. নন্দীর সেবা-যত্নে তাঁর শরীর ক্রমশ সুস্থ

হল, কিন্তু রোখ কমল না। পথে-পথে ঘুরে বেড়ান আর বুড়ো বাচ্চা সকলকেই ডেকে তাঁর ডানহাতটা দেখান 'দ্যাখো তো, আমার আঙুলগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে কেন?'

এই সময়ে একদিন রাস্তায় আমার সঙ্গে দেখা। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে কষ্টে চিনতে পারলেন আমায়। বললেন, 'শুনেছেন কিছু? নিশি দারোগা বলে পাঠিয়েছে যে কুসুমকে ত্যাগ করতে হবে। আশ্চর্য!'

আমি কিছু বললাম না। নিবারণের পিঠে হাত রাখলাম। নিবারণ নিজেই বলে চললেন, 'কুসুম চলে গেলে আমার আঁকার কী হবে!'

'আপনি আবার আঁকছেন?'

'না।' মাথা নাড়লেন নিবারণ, 'আমার আঙুলগুলো নষ্ট হয়ে গেছে।' খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ বললেন, 'কিন্তু কুসুমকে আপনারা ভয় পান কেন? আমি তো দেখছি কুসুম সার্কাসে যা করত তাও একটা খেলা। ছবি আঁকা যেমন খেলা, ঠিক তেমনি। কিন্তু মুশকিল—আমরা কেউই অভ্যাস ছাড়তে পারছি না।' বলেই হঠাৎ হা হা করে হাসলেন নিবারণ 'কয়েকদিন আগে আমি একটা পায়রা মারলাম। তারপর ঘাড় মটকে সেটার গলার নলীর দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে রইলাম।' দীর্ঘশ্বাস ফেলে গম্ভীর হয়ে বললেন, 'মুখ দিতে প্রবৃত্তি হল না। কিন্তু দেখবেন, চেষ্টার অসাধ্য কিছু নেই।'

কয়েকদিন পর নিবারণকে বাস্তবিক দেখা গেল বনডুবির মাঠে—একপাল ছেলেপুলে ঘিরে ধরেছে তাঁক, আর মাঝখানে নিবারণ একটা আধমরা কবুতরের পালক দু'হাতে পটপট করে ছিঁড়ছেন, কাঁচা মাংসের জঙ্গলে ব্যগ্র কামড় বসাচ্ছেন। তাঁর মুখের বিস্বাদ, বমনোদ্রেক সব কিছুই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল।

এরপর প্রায় সব কিছুই ভক্ষণ করবার জন্য ব্যগ্র হয়ে পড়লেন নিবারণ। মাঝে মাঝে জ্যান্ত পাঁঠা-ছাগল কামড়ে ধরেন, কুকুরকে তাড়া করে ফেরেন। দু'বার গাঁয়ের লোক তাঁকে বাঁশ পেটা করে আধমরা করল। লোকে নিবারণের নামের আগে 'পাগলা' কথাটা জুড়ে দিল।

আমার মনে হয় নিবারণ ঠিক পাগল হয়ে যাননি। কে. নন্দী সার্কাসে যখন মুরগি এবং সাপ ভক্ষণ করতেন—তখন কেউ তাঁকে পাগল বলেনি, বরং অনেক দূর থেকে পয়সা খরচ করে দেখতে গেছে। নিবারণ সম্পর্কে আমার এই মনে হয় যে তিনি তাঁর শিল্পের অভ্যাস পরিবর্তিত করতে চাইছিলেন মাত্র। মনে হয়েছিল ছবি ছেড়ে বাস্তবিক তাঁর শিল্পগুলি এইবার তাঁকে আক্রমণ করতে শুরু করেছিল। তাই শিল্পান্তরে যেতে চাইছিলেন মাত্র।

এর কিছুদিন পরে একদল বেদে এল আমাদের গাঁয়ে। নানারকম খেলা দেখাল, ওষুধপত্র শিকড়বাকড় বিক্রি করল। তারপর একদিন ছাউনি গুটিয়ে চলে গেল।

দু-একদিন পর নিবারণ আমার কাছে এসে বললেন, 'আমার স্ত্রী কুসুমকে আপনি চিনতেন?'

আমি মাথা নাড়ালাম—হ্যাঁ।

হঠাৎ খিকখিক করে হেসে উঠলেন নিবারণ, বললেন, 'কুসুমের সার্কাসের খেলাগুলো কিন্তু তেমন সাংঘাতিক কিছু ছিল না। ওর চেয়ে সাংঘাতিক খেলা আমিই আপনাকে দেখাতে পারি।'

আমি নিবারণকে দেখছিলাম—আগেকার মতোই আছেন নিবারণ। লক্ষ করলাম তিনি আর তাঁর ডানহাতের দিকে চাইছেন না এবং তাঁর বগলে মোড়কের মধ্যে কয়েকটা ছবি রয়েছে বলে মনে হল। আমি জিগ্যেস করলাম, 'কী ব্যাপার?'

খিকখিক করে হাসলেন নিবারণ 'কুসুমের সেই খেলাটার কথা বলছিলাম। সেই খেলাগুলো আমিই কুসুমকে দেখাতে শুরু করলাম। কুসুম কিন্তু ভয় পেয়ে গেল। খেলা দেখাত কুসুম, কিন্তু ওই খেলা নিজে কখনও দেখেনি সে।' একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'আমার মতোই অবস্থা হল কুসুমের। তার শিল্পও তাকে আক্রমণ শুরু করল।'

আমি চেয়ে ছিলাম। খানিকটা আন্দাজ করে বিস্মিত না হয়ে আমি প্রশ্ন করলাম, 'কে. নন্দী কোথায়?'

'ঠিক জানি না। একদল বেদে এসেছিল লক্ষ করেছেন?' আমি বুঝলাম। চুপ করে থেকে হঠাৎ জিগ্যেস করলাম, 'আপনার আঙুল?'

নিবারণ উত্তর দিলেন না। আস্তে-আস্তে ছবিগুলোর মোড়ক খুলে আমার সামনে পেতে দিলেন। প্রথম ছবিটাতে ছিল দুটো ভয়ঙ্কর কালসাপ পরস্পকে জড়িয়ে ধরেছে। আমি আর ছবিগুলো দেখলাম না। দেখবার দরকারও ছিল না।

বুঝলাম, পটুয়া নিবারণকে এবার ঠেকানো মুশকিল হবে। কেন না, তিনি বুঝতে পেরেছেন তাঁর অস্তিত্বের অপরাংশ তাঁর শিল্পকর্মের বিদ্রোহী যাবতীয় ভয়ঙ্করতা ও হিংস্রতাকে ভক্ষণ করতে সক্ষম।

প্রতীক্ষার ঘর

টিকটিকিরা জল খায় না। বলে নতুন লোকটা খুব গম্ভীর চিন্তায় ডুবে গেল।

আমরা ক'জন দেশলাই কাঠি দিয়ে জুয়ো খেলছিলাম। তাসটা খুব পুরোনো হয়ে গেছে। চলে না। ইস্কাপনের টেক্কা কি হরতনের গোলাম সবই ছেঁড়ার দাগ দেখে পিছন থেকেই চেনা যায়, টেক্কাটা ছিঁড়েছে পাশ থেকে মাঝখান অবধি, গোলামটার দুটো কোণা নেই, এরকম সব তাসই একটু খেয়াল করলেই চেনা যায় আজকাল। বাদু তাস বাঁটতে-বাঁটতেই বলে—রন্টে, তোর ঘরে টেক্কা সাহেব গেছে, দেখ যদি বিবিটা পাস। শেষ তাসটা পেছন থেকে দেখেই মন বিগড়ে গেল। চিঁড়ের দুরি।

ব্লাইন্ড দিবি না? হারু জিগ্যেস করে।

বিস্বাদ মুখে বললাম—প্যাক। তাস ফেলে নতুন লোকটার দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করি—টিকটিকিরা জল খায় না?

লোকটা মুখ ফিরিয়ে আমার মুখটা একটু দেখল, বলল—জল খেতে কখনও দেখেছেন?

—না।

—তবে?

—শুনেছি টিকটিকি পেচ্ছাব করে, জল না খেলে...

লোকটা শ্বাস ফেলে বলে—ওসব আন-কথা কান-কথা। দেওয়াল জুড়ে মরুভূমি, জল পাবে কোথায়?

একটু ভাবতে থাকি, নতুন লোকটার মাথায় এত কথাও আসে!

ডালিম রাজার জোড়া পেয়ে দুটো কাঠি ব্লাইন্ড দিল। তাস সবই চেনা। দেখেও যা, না দেখেও তাই। তবু ব্লাইন্ড আর সীন চালু আছে নিয়ম মাফিক। ব্লাইন্ড দিয়ে সে হারুকে বলল—কাল তেরোটা কাঠি জিতেছিলাম, তার মধ্যে সাতটা জ্বলেনি, ঠুকতেই বারুদ খসে গেল।

হারু উত্তর দিল না। সে আমাদের একটা বুদ্ধি শিখিয়েছিল, দেশলাই কিনে কাঠিগুলো লম্বালম্বি ব্লেড দিয়ে চিরে ফেলে সে। তাতে কাঠিটা দু-ভাগ হয়, বারুদও দু-ভাগে হয়ে যায়। ঠিকমতো ঠুকে জ্বালতে পারলে দু-ভাগই জ্বলে। একটা কাঠিতে দুটো কাঠি পেয়ে যাই আমরা। দেশলাই সম্পর্কে হারুকে আমরা এক্সপার্ট বলে মানি।

হারু উত্তর দিল না, কিন্তু নতুন লোকটা বলল—জ্বলবে কী করে? ওই সাতটা কাঠিতে যে বারুদের বদলে মাটি লাগানো ছিল। আমিও কাল তিনটে কাঠি জ্বালতে পারিনি। কিন্তু আমার স্বভাব সবকিছু খুঁটিয়ে দেখা, বারুদ খুঁটে দেখলাম কাঠির মাথায় পোড়া দাগ। বারুদগুলো পিষে দেখি মাটি।

ডালিম অবাক হয়ে বলে—তাই বটে? কাজটা কার?

—হারুবাবুর ছাড়া আর কার! দেশলাই উনি ভাল চেনেন।

হারু রুখে উঠল না। কেমন ঠাণ্ডা চোখে নতুন লোকটার দিকে চেয়ে বলল—কাঠিতে আমার নাম সই করা ছিল?

—না। ভেবেচিন্তে বের করলাম।

ডালিম হাত বাড়িয়ে বলল—দেখি তোর কাঠিগুলো।

হারু তার কাঠি সরিয়ে বলল—মাটি নয় রে। দেশলাইটা ড্যাম্প ছিল হয়তো। ডালিম তবু হাত বাড়িয়ে দুটো কাঠি ছিনিয়ে নিয়ে আঙুলে পিষে দেখল। মাটিই।

নতুন লোকটা ডেক চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে চোখ বুজল। ডেক চেয়ারের বেতের বুনুনি কবে ছিঁড়ে গেছে। সেই ছেঁড়া জায়গা দিয়ে লোকটার পশ্চাদ্দেশ ঝুলে আছে। কিন্তু বসবার ভঙ্গি দেখে কোনও অসুবিধা হচ্ছে বলে মনে হয় না। অভ্যাস হয়ে গেছে। চোখ বুজেই বলল—যখন পয়সার খেলা চালু ছিল তখন হারুবাবু কী দিতেন?

ঠিক প্রশ্ন নয়, যেন অনেকক্ষণ বাদে একটা ভাববার মতো বিষয় পাওয়া গেছে বলে লোকটা গভীরভাবে ভাবতে লাগল চোখ বুজে!

বাদু অবাক হয়ে বলল—মাইরি হারু, এ যে কেষ্টনগরের কারিগরদের কাজ। সেবার মাসতুতো বোন চিনেবাদাম খেতে দিয়েছিল, ধরতেই পারিনি, কামড়ে দেখি মাটি! তুই শালা তো মাটির দেশলাইয়ের কারবার খুললে লাখোপতি হয়ে যাবি!

এসব কথায় আমার কান নেই, ভারী তো দেশলাইয়ের কাঠি! টিকটিকি জল খায় না—এ ব্যাপারটা আমার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল।

নতুন লোকটার দিকে চেয়ে বললাম—টিকটিকি জল খায় না, এ কথাটা ঠিকই। আমিও ভেবে দেখলাম।

লোকটা শ্বাস ফেলে বলল—যখন আপনাদের পয়সার খেলা চালু ছিল তখন হারুবাবু কী দিতেন বলুন তো!

একটু ভাবতে হলো। বললাম—কী জানি! সেই কবে আমরা পয়সা দিয়ে খেলতাম তা কি আর মনে আছে! এখন পয়সা পেলেই সিগারেট কিনে ফেলি। খেলি না।

লোকটা বুঝদারের মতো মাথা নাড়ে!

কাঠের সুইং ডোরটা নষ্ট হয়ে গেছে। এখন আর আপনা থেকে বন্ধ হয় না, হাঁ হয়ে থাকে। ইঁদুরের ডাকের মতো শব্দ করে সেটা ঠেলে মতে ঘরে এল। হাতে ঝাড়ু আর ফিনাইলের টিন, তার পরনে নীল হাফশার্ট আর নীল হাফপ্যান্ট। বলল—আজ ন'টার ট্রেনে প্যাসেঞ্জার আসছে। ঘর খালি রাখবেন।

ট্রেনের এখনও দেরি আছে। আমরা কেউ নড়লাম না। বাথরুমে মতের ঝাঁটার শব্দ হতে লাগল, আর ফিনাইলের ঝাঁঝালো গন্ধ পাওয়া গেল। গন্ধটা আমার বেশ লাগে। আগে জামাকাপড় যখন বাক্স থেকে বের করে পরতাম তখন ন্যাপথলিনের গন্ধ ভুর-ভুর করত। সে গন্ধটা এরকমই। আজকাল আর বাক্সে রাখার মতো জামা-কাপড় নেই, সেই গন্ধটা আর পাই না, জামা প্যান্ট ময়লা হলে এক-একদিন রাতে ফিরে বাংলা সাবান দিয়ে কেচে দিই। সকালের মধ্যে শুকোয় না। একটু ভেজা-ভেজা থাকে। তা-ই পরে বেরিয়ে পড়ি, গায়ে-গায়ে শুকিয়ে যায় ঠিক।

মতে বাথরুমে তালা দিয়ে আবার বেরিয়ে যাওয়ার সময় বলে গেল—প্যাসেঞ্জার আসছে মনে থাকে যেন।

প্যাসেঞ্জার অবশ্য খুব কমই আসে। উত্তরে একটা নতুন জংশন হওয়ার পর পাহাড় লাইনের যাত্রীরা ওই জংশন থেকেই হিল-স্টেশনে চলে যায়। এদিকে কেউ বড় একটা উজিয়ে আসে না। সেইটে লক্ষ্য করেই আমরা কিছুদিন হল স্টেশনের প্রথম শ্রেণির

ওয়েটিং রুমটা দখল করে আছি। স্টেশন মাস্টারও কিছু বলেন না। তাঁর মেয়েদের আমরা কখনও হুড়ো দিই না। তিনি মেয়ের বিয়ে দিতে কলকাতায় গেলে আমরা তাঁর কোয়ার্টার্সের পেঁপে কাঁঠাল আর নারকেল গাছ পাহারা দিয়েছি। তিনি বলে গিয়েছিলেন—বাবা, তোমরা দেখো। আমরা দেখেছিলাম। তিনি ফিরে এসে গাছে বোঁটাসুদ্ধ ফল দেখে ভারী খুশি। অবশ্য তাঁর ফিরে আসার দিন রাতেই আমরা সব পেড়ে নিই, আর মঙ্গলবারে হাটে বেচে দিয়ে সিনেমা দেখি। তবু তিনি আমাদের ওয়েটিং রুমের ব্যাপারে কিছু বলেন না। ঘরের বাইরে থাকলে আমাদের মাথায় অনেক বদখেয়াল আসে যে!

বাদু একটা সিগারেট আদ্দেক খেয়ে ডালিমকে দিল। চার টানের পর হারু পাবে। হারু চেয়ে আছে। আবার তাস বাঁটছে বাদু। খুব আস্তে ধোঁয়া ছাড়ছে। আমার ভাগে একটা তিন আর নলা পড়েছে। দেখে চোখ ঘুরিয়ে নিলাম। শেষ তাসটা পড়ার পর একপলক চেয়ে দেখলাম, ডায়মন্ডসের গোলাম।

তাসটা বড় তাসে রেখে দিয়ে বললাম—টিকটিকি তাহলে পেচ্ছাপ করে কী করে? অ্যাঁ!

লোকটা চোখ বুজেই বলল—ট্রেনটা কি রাইট টাইমে আসছে?

—তাই কখনও আসে?

—একটু খবর নিন তো। সকালবেলাটায় জ্বালালে! এ গরমে আর কোথায় যাব!

—ওভারব্রিজ আছে। আমি বললাম।

—দূর। ওখানে বড্ড ভিখিরির ভিড়।

লাইন ক্লিয়ারের ঘন্টার শব্দ শুনে আমরা তাস গুটিয়ে বড় গোল টেবিল থেকে নেমে পড়লাম। নতুন লোকটাও উঠল।

ওভারব্রিজের সিঁড়ির তলায় ভিখিরিরা কাঠের উনুনে খাসির নাড়িভুঁড়ি সেদ্ধ করছে। ধোঁয়ায় চোখ জ্বালা করে। ব্রিজের ওপরের দিকে কয়েকটা সিঁড়ি নেই। সেই গর্তগুলো সাবধানে আমরা পার হলাম। ছাউনি দেওয়া ব্রিজের ওপরের টিন তেতে আছে। ধুলোর ঝাপটা মারছে গরম বাতাস। পশ্চিমা কুলি আর বুড়ো ভিখিরিরা গামছা পেতে টান-টান হয়ে শুয়ে। আমরা ফুঁ দিয়ে ধুলো উড়িয়ে এক জায়গায় বসলাম। হারু বলল—ডালিম তুই স্নান করিস না? গা থেকে চামসে গন্ধ আসছে।

—কুয়ো শুকিয়ে আসছে। বাবা পরশু সকালে জল মেপে আমাদের দু ভাইয়ের, যাদের চাকরিবাকরি নেই, তাদের স্নান বারণ করে দিল।

—জল মাপে কী করে? বাদু জিগ্যেস করে।

—দড়িতে গিঁট দেওয়া আছে। সেই গিঁট না ডুবলেই আমাদের স্নান বারণ হয়ে যায়। ডালিম বলে।

নতুন লোকটা বিজ্ঞের মতো বলল—কুয়ো দু-রকমের আছে, ঝরণা-কুয়ো আর বোম-ফাটা কুয়ো, আপনাদেরটা কোনরকমের?

ডালিম বলল—আমাদেরটা বোম-ফাটা। কাটতে-কাটতে হঠাৎ চড়াক করে একজায়গা থেকে তোড়ে জল বেরিয়েছিল।

লোকটা বলল—ওই কুয়োই খারাপ, জল শুকিয়ে যায়। ঝরনা-কুয়ো কাটলে খুব ডিপ হয়, আর চারধার থেকে ঝিরঝির করে জল এসে কুয়ো ভরে ওঠে। তার জল শুকোয় না।

পৃথিবীর এত জল, তবু যে কেন টিকটিকি জল খায় না! ভাবতে ভারী অবাক লাগছিল আমার।

আমি নতুন লোকটাকে বললাম—আচ্ছা মাশাই, দেওয়াল ফুঁড়ে অশ্বত্থ গাছও তো ওঠে! শেকড় দিয়ে দেওয়াল থেকেও রস-কষ টেনে নেয়। টিকটিকির তেমন কোনও ইন্দ্রিয় নেই তো?

লোকটা আমার মুখের দিকে চেয়ে কী একটু মনোযোগ দিয়ে দেখল, তারপর মুখ ঘুরিয়ে বলল—ওই ট্রেন আসছে!

দেখলাম, বাজারের লেভেল ক্রসিং পার হয়ে ট্রেনটা হনহন করে আসছে। দুটো কুলি সেই শব্দে ঘুম ভেঙে উঠে মাথায় গামছা জড়াতে লাগল। আমরা ওভারব্রিজের রেলিঙের ফাঁক দিয়ে নীচে চেয়ে রইলাম।

দেখার কিছুই নেই এখন। এক সময়ে ছিল। ব্রিটিশ আমলে সাহেবসুবোরা এই স্টেশনে নেমেই উত্তরের পাহাড় লাইনে যেত। তখন মেল ট্রেন থামত এখানে, সারাটা স্টেশনে গমগমে ভাব ছিল, ওয়েটিংরুমে বার্মা সেগুনের ফার্নিচার, সূক্ষ্ম জালের দরজাওয়ালা রেস্টুরেন্ট—সবই ছিল। এখন উত্তরের জংশন হওয়ায় মেল ট্রেন আর এ পর্যন্ত আসে না। এটা হয়ে গেছে ব্রাঞ্চ লাইন, সারাদিনে দুটো প্যাসেঞ্জার আপ ডাউনে চলে। বিশাল স্টেশনবাড়িটা ফাঁকাপড়ে থাকে। বিনা-টিকিটের যাত্রী এত বেশি যে রেল কর্তৃপক্ষ এ লাইনটা তুলে দেওয়ার কথা ভাবছে। ওভারব্রিজের তক্তা খুলে পড়ে যাচ্ছে, প্ল্যাটফর্মে ইঁট বেরিয়ে আছে, ভিখিরির বাচ্চারা প্ল্যাটফর্মের যেখানে সেখানে তাদের শরীরের ক্বাথ ফেলে রাখে।

আমরা ট্রেন দেখবার জন্য ঝুঁকে পড়লাম। সবসুদ্ধ জনা ত্রিশ-চল্লিশ লোক নামল। বয়সের মেয়েছেলে নেই, সাহেব আমলের বুড়ো চেকার নিকলসন ঘাড় কাত করে গেট-এর কাছে দাঁড়িয়ে ভিখিরির মতো হাত বাড়িয়ে আছে। যে যার ইচ্ছেমতো সেই হাতখানা ঠেলে-ঠেলে চলে যাচ্ছে, টিকিট কেউ দেয় না। নতুন লোক এলে নিকলসনকে দেখে একটু থমকাবেই। নীল চোখ, লাল চুল, সাদা রঙের আস্ত একটা সাহেব। কিন্তু সে নিজে তার সাহেবত্ব ভুলে গেছে কবে। আমাদের বিজয়কে দেখলে 'ভিজয় ভিজয়' বলে ডাকাডাকি করে বিজয়ের কৌটো থেকে দু-তিন টিপ নস্যি নেয়। সাহেবি আমলে তার মেম-বউ ছিল, সে ছেড়ে চলে যাওয়ার পর নিকলসন তাদের নেপালি আয়াকে প্রোমোশন দিয়ে বউ করে রেখেছে। নেপালি আর ইংরিজিতে তাদের মাঝে-মাঝে ধুন্দুমার ঝগড়া হয়। নিকলসন সাহেব ঝিঙে, ঢেঁকির শাক সবই খায় আজকাল।

মেয়েছেলে দেখা গেল না। তিন-চারজন বেশ ভালো চেহারা আর পোশাকের লোক ওয়েটিং রুমের দিকে গেল। ব্রিজের তলায় ভিখিরিদের উনুনে নতুন কাঠ গুঁজে দিয়েছে। সেই ধোঁয়ায় চোখে জল এসে যাচ্ছিল।

হারু বলল—নিকলসন সাহেব আর বেশিদিন বাঁচবে না, বুঝলি! ওর বোধবুদ্ধি ভোঁতা হয়ে কেমন হয়ে গেছে।

—কেন? আমি জিগ্যেস করি।

হারু বলে—সেদিন ডাউন প্যাসেঞ্জারটা চলে যাওয়ার পর নিকলসন বেঞ্চটায় বসে বিড়ি ধরাবার সময় যেই মাথার হ্যাট খুলেছে, অমনি হ্যাটের ভিতর থেকে একটা বোলতা বেরিয়ে উড়ে গেল।

—যাঃ!

—মাইরি—মাইরি! মাথার চুল ছাঁটে না বলে ঝোপড়া হয়ে আছে মাথা, তাই কামড়ায়নি, কিন্তু টুপির ভিতর বোলতা উড়লে লোকে টের পাবে না! ও কিন্তু পায়নি। তাই বলছিলাম—

ডালিম প্ল্যাটফর্মের লোক দেখতে-দেখতে হঠাৎ চেঁচিয়ে ডাকল—আরে! মদন, এই মদন—

আমরা সবাই ওভারব্রিজের রেলিঙ ধরে ঝুঁকে পড়লাম। নিকলসনের হাতটা ঠেলে মদন বেরিয়ে এল। বগলে একটা কাগজের প্যাকেট, মুখ তুলে আমাদের দেখে একটু ভ্রূ কুঁচকে বলল—তোরা!

—খালাস পেলি? বলে আমি চেঁচিয়ে উঠেছিলাম, বাদু আমাকে খোঁচা দিয়ে বলে—এই শালা, খালাসের কথা চেঁচিয়ে বলতে আছে? তুই একটা—অশ্লীল কথা দিয়ে বাক্য শেষ করে বাদু। তারপর ঝুঁকে বলে—উঠে আয় না, মদন।

মদন একটু বিরক্ত চোখে আমাদের দেখল, একটু ইতস্তত করল, তারপর উঠে এল। তার মাথায় একটোকা চুল পিঙলে হয়ে জট বেঁধেছে, গায়ে বসা-ময়লা, হাত পায়ের গাঁট ফোলা-ফোলা খুব রোগাও হয়ে গেছে।

—কবে খালাস পেলি? হারু জিগ্যেস করে।

মদন গম্ভীর গলায় বলে—কাল।

—খালাস না জামিন? আমি জিগ্যেস করি।

মদন গম্ভীরভাবে আমার দিকে চেয়ে বলল—তোর বয়স আর বাড়ল না রন্টে! দু বছর হাজতে থাকার পরও কেউ জামিন পায়?

আমি আমতা-আমতা করে বলি—কাগজে কেবল জামিনের কথাই পড়ি তো। শোনা যায়, পুলিশ সবাইকে ধরে নিয়ে জামিনে আবার ছেড়ে দেয়, তারপর আর ধরে না।

মদন একটু গর্বের সঙ্গে বলল—আমারটা ছিল নন বেইলেবল কেস!

কথাটার মানে তেমন পরিষ্কার বুঝলাম না, ইংরেজিতে আমি বরাবর কাঁচা।

ডালিম জিগ্যেস করল—কেমন ছিলি?

মদনের চোখ চকচক করে ওঠে। একটু ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলে—কেমন আর! আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যেমন হয়—বলতে-বলতে সে নতুন লোকটার দিকে চেয়ে বলে—ইনি কে?

ডালিম নীচু গলায় বলে—শ্রেণিহীন সমাজের লোক। বলে খুক-খুক করে হাসে।

—তার মানে? মদন একটু রুখে উঠে বলে। 'শ্রেণিহীন সমাজ' কথাটা বোধহয় তার ভালো লাগে না।

নতুন লোকটা বলল—ঘাবড়াবেন না। ও একটা কথার কথা। মদন লোকটার দিকে কটমট করে তাকিয়ে বলে—কথার কথা মানে কী? ওসব কি ঠাট্টার কথা নাকি? ওই স্বপ্ন নিয়ে কত ছেলে লড়াই করে মরে যাচ্ছে।

লোকটা ঠান্ডা গলায় বলে—আসলে ইদানীং ভারতীয় অর্থনীতির রূপান্তরের সময়ে আমাদের মতো কিছু লোকের শ্রেণি লোপ পেয়েছে। ইংরিজি বলতে পারি, ক্রিকেট খেলা বুঝি, অচেনা জায়গায় ভিক্ষে করি, মচ্ছবের খবর পেলে যাই, বিয়ে-বাড়ি দেখলে সুট করে ঢুকে পড়ি। এসব অ্যাকটিভিটি থেকে একটা মানুষকে কোনও শ্রেণিতেই ফেলা যায় না। ভদ্রলোক, ছোটোলোক, ভিখারি—কোনওটাই খাটে না....

মদন একটু হাসল এতক্ষণে, বলল—সেই নিজের শ্রেণিকে ফিরে পাওয়ার জন্যই তো আমাদের লড়াই...বলতে-বলতে ভুল বুঝতে পেরে মদন একটু থমকে গেল, তারপর আবার বলল—আসলে আমাদের লড়াই শ্রেণিমুক্ত, শ্রেণিহীন সমাজের জন্য, আমাদের লড়াই—

ডালিম জিগ্যেস করল—কার সঙ্গে?

—কার সঙ্গে! ভারী অবাক হয় মদন, তারপর কনুই চুলকোতে-চুলকোতে বলে—আমলা আর শ্রেণিশত্রুর বিরুদ্ধে।

হারু শ্বাস ফেলে জিগ্যেস করল—তারা কারা? কে আমলা, কে শ্রেণিশত্রু?

মদন রেল-ইয়ার্ডের দিকে অন্যমনস্কভাবে চেয়ে বলল—বাবা।

আমরা চমকে উঠি। জিগ্যেস করি—তোর বাবা শ্রেণিশত্রু? আমলা?

মদন মাথা নেড়ে বলল—না। ওই দেখ বাবা বাজার করে ফিরছে।

আমরা চেয়ে দেখি, মদনের বাবা হরিবাবু বাজারের ব্যাগ হাতে লাইন পার হয়ে ফিরছেন। দূর থেকে তাঁকে একটা কাঁকড়ার মতো দেখাচ্ছে।

মদন সেদিকে চেয়ে থেকে বলল—দু-বছর বাদে বাবাকে দেখলাম। কী রোগা হয়ে গেছে দেখেছিস!

আমাদের মন নরম হয়ে যাচ্ছিল। চুপ করে রইলাম।

মদন একটা শ্বাস ফেলে মুখ তুলে আমাদের দিকে চেয়ে বলল—তোরা এখনও এইভাবে সময় নষ্ট করিস! ওয়েটিং রুম আর ওভারব্রিজ ঘুরে-ঘুরে জীবনটা কাটিয়ে দিলি। কত কিছু করার ছিল তোদের। বলে আমাদের মুখে সে একটু ভর্ৎসনার চোখে তাকাল, বলল—আমি জেল খেটে এলাম, দ্যাখ, কত কষ্ট পেয়েছি, কিন্তু এখানেই থামছি না। আবার যাব জেল-এ। তারপরও আবার যাব। এই ভাবে একদিন জেলখানার দেওয়াল ভেঙে পড়বে। ওরা যত মারবে, আমাদের লড়াই তত ছড়িয়ে পড়বে....

বাধা দিয়ে ডালিম বলল—খুব কষ্ট দেয় জেল-এ?

বড়-বড় চোখে চেয়ে মদন বলল—দেবে না! চুল ছাঁটিনি কত দিন, মাথায় উকুনের বাসা, গায়ে চামড়ার নীচে একরকমের পোকা হয়েছে, ভীষণ চুলকোয় চাম পোকা বলে। গাঁটে গাঁটে ব্যাথা।

—খুব মারত?

—জেল-এ মারধর নিষেধ। কিন্তু আমরা ফার্স্ট ক্লাস প্রিজনারশিপের জন্য আন্দোলন করায় মারে, তারপর এনকোয়ারির সময়ে ওপরওয়ালা এলে ওরা রিপোর্ট দিল যে আমরা জেল থেকে পালানোর চেষ্টা করেছিলাম বলে মেরেছে। উঃ যাই এখন স্নান করব। বহরমপুর থেকে টানা এসেছি, রাতে ঘুম হয়নি। কতদিন দাঁত মাজি না রে। বলে মদন নেমে গেল।

গাড়ি চলে গেছে। প্ল্যাটফর্ম আবার ফাঁকা। আমি ভাবছিলাম, যদি মদনদের কুয়োটাও বোম-ফাটা কুয়ো হয়ে থাকে আর ওর বাবা যদি জল মেপে থাকে তবে মদনের আজ স্নান হবে কি না! আমি খুব গভীরভাবে ব্যাপারটা ভাবতে থাকি। সবসময়েই আমার মাথায় অদ্ভুত সব সমস্যার চিন্তা আসে।

হারু অনির্দিষ্টভাবে জিগ্যেস করল—সিগারেট আছে?

কেউ উত্তর দিল না, জানা কথা নেই।

গাড়ি চলে যাওয়ার পর নিকলসন প্ল্যাটফর্মের বেঞ্চিতে বসে টুপি খুলে ঘাড় গলার ঘাম মোছে। তারপর একটু ঝিমোয়। আজও ঝিমোচ্ছে।

হারু উঠে বলল—যাই, নিকলসনের কাছে একটা বিড়ি পাই কি না দেখি।

আস্ত এবং খাঁটি একটা সাহেব কাছে পিঠে থাকলে অনেক সুবিধে। বিশেষ করে ইংরিজির ব্যাপারে। হারু এখনও এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের কার্ড রিনিউ করে। দু-একটা ইন্টারভিউও পায়। সেইজন্য ইংরিজিটা ঝালিয়ে রাখে। নিকলসনের সঙ্গে সে সব সময়ে ইংরিজিই বলে। অবশ্য এমনিতে দরকার হয় না, সাহেব ভাঙা বাংলা, হিন্দি, নেপালি দিব্যি বলে।

হারু দূর থেকেই বলল—গট বিড়ি হেঃ নিকলসন?

নিকলসন চোখ খুলে ফোকলা হাসি হাসল, তারপর বলল—ন্যাও, গট খৈনি অ্যান্ড চুনা। ট্রাই?

হারু একটু অবাক হয়ে বলে—খৈনি কবে থেকে সাহেব? বলেই আবার ইংরিজি করে বলে—খৈনি ফ্রম হোয়েন নিকলসন?

—অঃ ও! বলে নিকলসন একটা শ্বাস ফেলে পকেট থেকে লম্বা দু-মুখো কৌটো বার করে। তার এক মুখে চুন, অন্য মুখে তামাক পাতা। পাতা ছিঁড়তে-ছিঁড়তে বলে—রিসেন্টলি, ট্রাই? ভেরি চিপ। আই গাটেন এ হানচ ফর ইট সিনস লঙ, ডিডনট ট্রাই। বাট ইটস নাইস।

হারু খৈনির জন্য হাত বাড়ায়।

ডালিম আর বাদু উত্তর দিকে মুখ করে সবচেয়ে দূরে কে থুথু ফেলতে পারে তার কমপিটিশন দিচ্ছে। বাজি কুড়িটা কাঠি। নতুন লোকটা চোখ বুজে রেলিঙে হেলান দিয়ে বসে। আমি হারুর খৈনি-খাওয়া দেখতে-দেখতে চেঁচিয়ে বললাম—আমার জন্য একটু আনিস হারু।

সে কথার শব্দে নতুন লোকটা চোখ খুলে বলল—একটা কথা শুনেছেন?

—কী?

—উত্তরের মতো দক্ষিণেও একটা জংশন হবে।

—জানি।

লোকটা শ্বাস ফেলে বলল—দক্ষিণের জংশন উত্তরের চেয়ে পাঁচগুণ বড় হবে। আর তখন উত্তরের জংশনটা আমাদের এই স্টেশনের মতোই ফাঁকা পড়ে থাকবে।

—জানি

—ছাই জানেন! লোকটা ধমকায়। তারপর আবার আপনমনে বলল—দক্ষিণের জংশনটা হবে পৃথিবীর চতুর্দশ বৃহত্তম জংশন, ভারতের বৃহত্তম। কিন্তু রেলমন্ত্রী বলেছেন যে, ভারত ওখানেই থেমে থাকবে না। এরপর পুর্বদিকে যে জংশনটা হবে সেটা হবে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম, তারপর তাঁরা প্ল্যান পালটাবেন। তখন পশ্চিমে হবে বিশ্বের বৃহত্তম জংশন। এইভাবে ভারত তার পুরোনো প্রকল্প ছেড়ে বৃহত্তর নতুন প্রকল্প, এবং ক্রমে বৃহত্তম প্রকল্পগুলির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

আমি বললাম—যাঃ!

লোকটা চোখ ছোট করে আমার দিকে চেয়ে বলল—যাঃ বলবেন না। আপনি অনেক কিছুই জানেন না। যেমন আজ সকাল পর্যন্ত আপনি জানতেন না যে টিকটিকি জল খায়

না।

খুব লজ্জিত হয়ে পড়ি। বাস্তবিক, আমার জ্ঞান কত সীমাবদ্ধ!

লোকটা বলল—ক্রমশ বিশ্বের বৃহত্তম প্রকল্প রচনায় ভারত রেকর্ড সৃষ্টি করতে যাচ্ছে, বুঝলেন?

আমি মাথা নাড়ি।

লোকটা বলে—যখন একের পর এক জংশন শেষ হবে তখন আলটিমেটলি দেখবেন পশ্চিমের বৃহত্তম জংশন ছাড়া অন্য তিনটি জংশনই মাইনর স্টেশন হয়ে গেছে। এবং সে সব স্টেশনের ওয়েটিংরুমগুলো আমরা ক্রমে দখল করে নেব। ওয়েটিংরুম দখলের লড়াইয়ে আমরা জিতবই। অবশ্য ততদিনে আমাদের মতো শ্রেণিহীন সমাজের লোকও অনেক বেড়ে যাবে, আরও বেশি-বেশি ওয়েটিংরুম দরকার হবে তখন। সেই ওয়েটিংরুমগুলো হবে শ্রেণিহীন সমাজের মুক্তাঞ্চল।

থুথু ফেলায় ডালিমের কাছে হেরে গিয়ে বাদু দশটা কাঠি দিয়ে দিল, আর দশটা বাকি রাখল। কাল দিয়ে দেবে। মুখ ঘুরিয়ে নতুন লোকটাকে বলল—আপনি আমার ইয়ে জানেন।

লোকটা বলে—পরিষ্কার করে বলুন।

বাদু সবজান্তার মতো বলে—দক্ষিণে জংশন হবে ঠিকই। তবে উত্তরেরটার সঙ্গে দক্ষিণেরটার যোগাযোগ হবে আমাদের এই স্টেশনের ভিতর দিয়ে। তখন এই স্টেশন দিয়েও মেল ট্রেন যাবে। তিনটে স্টেশনই তখন ইম্পর্ট্যান্ট হয়ে উঠবে।

নিকলসন সাহেবের টুপির ভিতরের বোলতাটার মতোই আমার মাথার মধ্যে একটা সমস্যার চিন্তা বোঁ করে ডেকে চক্কর দিতে থাকে। আমি ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে বলি—তাহলে ওয়েটিংরুমটার কী হবে?

বাদু আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলে—আবার সেগুন বা মেহগনির চেয়ার টেবিল আসবে, সুইং ডোরটা সারানো হবে, মতের জায়গায় নতুন কেয়ারটেকার আসবে। তখন দেখবি, সুন্দর সুন্দর মানুষ আর মেয়েমানুষ গাড়ি থেকে নেমে আমাদের ওয়েটিংরুমে দু-দণ্ড জিরিয়ে যাবে।

লোকটা একটু হাসল। তারপর বলল—বাদুবাবু, তার চেয়ে বলুনন না, পৃথিবীটা আবার পিছিয়ে যাবে, ইংরেজরা ফিরে আসবে, নিকলসন মেমসাহেব নিয়ে ঘর করবে—

বাদু লোকটার দিকে তাকিয়ে থাকে। খুব রাগের চোখ।

লোকটা ঠান্ডা গলায় বলে—আপনি যা বলছেন তা হল পশ্চাদপসরণের কথা। আমি যা বলছি তা প্রগতির কথা। আমার কথাই ঠিক হবে কারণ ভারত এখন প্রগতির মেলট্রেনে উঠে পড়েছে, নামবার উপায় নেই, চেন টানলে আড়াই শো টাকা জরিমানা। তাকে যেতেই হবে। অতএব আগামী পাঁচ-ছ'বছরের মধ্যেই আমরা আরও তিন-তিনটে ওয়েটিংরুম পেয়ে যাচ্ছি।

মনে-মনে অমি নতুন লোকটাকেই সমর্থন করতে থাকি। আমার মনে হয়, লোকটাই ঠিক বলছে। মনে-মনে তাকে আমি ভীষণ সমর্থন করি, মনে-মনেই পিঠ চাপড়ে দিই। বাদুর ভয়ে মুখে কিছু বলি না।

বাদু জিগ্যেস করল—আপনি ইয়ার্কি করছেন?

লোকটা প্ল্যাটফর্মের দিকে চেয়ে ছিল। প্ল্যাটফর্মের বেঞ্চ-এ পাশাপাশি বসে হারু নিকলসনের সঙ্গে প্রাণপণে ইংরেজিতে কথা বলছে। দুজনেরই ঠোঁটের নীচে খৈনির ঢিপি। সেই দিকেই চেয়ে লোকটা বলল—সাহেবটা একেবারে দ্বারাভাঙ্গা জিলার লোক হয়ে গেল, দেখেছেন? আজকাল খুব চ্যবনপ্রাশ খায়। কার কাছে শুনেছে, চব্যনপ্রাশে যৌবনোচিত শক্তি বাড়ে।

বাদু বলে—ওর মেম-বউকে নাকি রেল কোম্পানি এখনও ওর মাইনে থেকে কেটে মাসোহারা পাঠায়।

ডালিম অবাক হয়ে বলে—সে তো বিলেতে। বিলেতে কি ইন্ডিয়ান টাকা পাঠানো যায়? আইনত পারে না।

—বিলেত না আমার ইয়ে! বলে বাদু—ওর বউ কানপুরে এক সাহেব মুচিকে বিয়ে করে সেখানেই আছে। বিয়ে করলে মাসোহারা পায় না।

আমি অবাক হয়ে বলি—তাহলে সাহেব খৈনি খায় কেন?

বাদু আমাকে পাগল দেখার মতো দেখে বলে—খৈনির সঙ্গে ওর মেম-বউয়ের কী সম্পর্ক?

আমার এইটাই হচ্ছে মুশকিল। মনের মধ্যে এমন সব চিন্তা আসে, এমনই জটিল সে সব চিন্তা যে হঠাৎ সেই চিন্তার কথা বলে ফেললে লোকে ঠিক বুঝতে পারে না। পাগল কিংবা বোকা ভাবে। আসলে আমি ভাবছিলাম, বউকে মাসোহারা পাঠাতে না হলে

নিকলসনের বেশ কিছু টাকা নিশ্চয়ই বেঁচে যায়। এবং সে ক্ষেত্রে খৈনি না খেলেও ওর চলে। অন্তত বিড়িটা তো ম্যানেজ হয়ই।

একমাত্র নতুন লোকটাই আমার কথা বুঝতে পারল বলে মনে হল। সে আমার দিকে চেয়ে বলে—ঠিকই বলেছেন রন্টেবাবু। ব্রিটিশ আমলে যখন ও কম মাইনে পেত তখন ও মেম-বউ পুষত, গোল্ডফ্লেক সিগারেটও খেত। গত পঁচিশ বছর ধরে একটানা চেকারের চাকরি, মাইনে নিশ্চয়ই ওর আন্দাজ ভালোই এবং ব্রিটিশ আমলের চেয়ে বেশিই পায়, তবু ক্রমে ব্র্যান্ড পালটে বিড়ি হয়ে খৈনিতে পৌঁছে গেছে। কিন্তু খৈনির পর কী? হোয়াট নেকস্ট সেইটাই সমস্যা! বলে লোকটা গভীর চিন্তা করতে থাকে।

আমি লোকটাকে ভাবতে দিয়ে আবার টিকটিকিদের কথা ভাবি। জল খায় না? টিকটিকি সত্যিই জল খায় না?

ডালিম হাই তুলে বলে—ছেঁদো কথায় কী হবে? মোটে সাড়ে দশটা বাজে, লম্বা দুপুর পড়ে আছে। রন্টে, ওয়েটিংরুমটার কী হবে? একবার মতের কছে খোঁজ নিয়ে আয় না!

ওয়েটিংরুমের কথায় নতুন লোকটা ধ্যান ভেঙে তাকায়। তারপর আমাকে চুড়ান্ত সম্মান দিয়ে আমাকেই বলে—রন্টেবাবু, একটা জিনিস লক্ষ করেছেন?

লোকটার জ্ঞানের কাছে আমি ক্রমেই বিকিয়ে যাচ্ছি। সঙ্গে-সঙ্গে উৎসুক হয়ে বলি—কী?

—ওয়েটিংরুমটা আমরা পেয়েছি বটে, কিন্তু বাথরুমটা পাইনি। ওটা এখনো মতে তালা দিয়ে রাখে।

আমি সত্যটা উপলব্ধি করতে থাকি। মাঝখানে বাদু বলে—মতে খুলে দেয় না যে, কী করব?

লোকটা চোখ ছোট করে বলে—তা হলে বলতেই হয় যে, আপনাদের জয় সম্পূর্ণ হয়নি। বাথরুমটা তালা দিয়ে রাখা কিন্তু চূড়ান্ত অপমান।

বলতে কি, এই ব্যাপারটা আমাদের বিশেষত আমার মাথায় কোনওদিনই আসেনি। ওয়েটিংরুমে বসবার অধিকার পেয়ে আমরা আনন্দে এতই আত্মহারা হয়ে যাই যে, বাথরুমটার তালার কথা মনেই হয়নি। আমরা যা পেয়েছি সেটার বিস্ময়ের ঘোরই এখনো কাটেনি। কিন্তু লোকটার কথায় আমার বুকের মধ্যে একটা বিদ্যুৎ ছুঁয়ে গেল। বস্তুত একটু আগে জেল-ফেরত মদনের কাছে সংগ্রাম এবং লড়াইয়ের কথা শুনে আমার ভিতরটা তেতেই ছিল। আমি ঝাঁকি দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। বললাম—মতের এটা ভারী অন্যায়।

নতুন লোকটা হাসল। ঠান্ডা গলায় নিকলসনের মতো ইংরেজিতে বলল—দ্যাটস দা স্পিরিট।

আমি সিঁড়ি ভেঙে উত্তেজিতভাবে নেমে যাচ্ছিলাম। ডালিম ডেকে বলল—রন্টে, বেশি মেজাজ দেখাসনি মতের সঙ্গে। বের করে দেবে। আজকাল দুপুরে কাঁঠাল-পাকানো গরম পড়ে, শহরের আর কোথাও অমন মাগনা বসতে দেবে না—এ সব মনে রাখিস।

মতে ওয়েটিংরুমের দরজার সামনেই বশংবদ দাঁড়িয়ে। আমাকে দেখে চোখের ইশারায় ধমকাল দূর থেকে। অর্থাৎ ভিতরে এখনও মেহমান আছে তারপর কাছে এসে নীচু গলায় বলল—এখন চলে যান।

আমি ভয়ে-ভয়ে বললাম—কারা এসেছে?

—চা-বাগানের বড়-বড় সাহেব সব। বাগান থেকে গাড়ি এসে নিয়ে যাবে, তাই ইনতেজার করছে। চলে গেলে আমি আপনাদের ডেকে দেব।

আমার ভিতরের সংগ্রামী মনোভাব তখন অর্ধেক হয়ে এসেছে। কাছে পিঠে যদি এমন লোক থাকে যে খুব বড় অফিসার, কিংবা খুব শিক্ষিত বা খুব বড়লোক, তা হলেই আমার ভিতরটা কেমন যেন ভয়-ভয় ভাবে ভরে ওঠে।

তবু আমি সাহস করে বললাম—মতে, তুমি আমাদের বাথরুমটা খুলে দাও না কেন?

—বাথরুম! বলে মতে কিছুক্ষণ অবাক হয়ে দেখে আমাকে। তারপর বলে—বাথরুম দিয়ে কী হবে?

আমি রাগ করে বলি—বাথরুম দিয়ে কী হয় তুমি জানো না?

মতে বুঝদারের মতো মাথা নেড়ে বলে—পেসাপ করবেন তো? সে তো অ্যানেক জায়গা আছে। স্টেশনভর তো পেসাপেরই জায়গা, কত লোক করে যায়। বেগ পেলে লাইনের ধারে এসে ছেড়ে দেবেন। পিলাট ফরম থেকে নামতেও হবে না। মালগুদামের পিছনে টাট্টি ভি করতে পারেন। ওদিকের পুখুরে জল ভি আছে।

আমি পয়েন্ট খুঁজে পাই না। তার কথায় প্রায় সায় দিয়ে ফেলি আর কি! তবু কাঁইমাই করে একটা পয়েন্ট খুঁজে পেয়ে বললাম—পুকুরটার জল তো নোংরা।

মতে উদার গলায় বলল—নোংরা আবার কি! কয়েকটা ভৈষ বসে থাকে বলে একটু ঘোলা। জল-খরচে ওর চেয়ে ভাল জল দিয়ে কী হবে?

হতাশ হয়ে আমি ফিরে আসি।

—কী হল? ডালিম জিগ্যেস করে।

—বাথরুম খুলে দেবে না।

—ঘরটা?

—বাগানের সাহেবরা আছে, তারা গেলে ডেকে দেবে।

সবাই অপেক্ষা করতে থাকি। এগারোটা বাজতে চলল। বাতাস তেতে উঠছে, ধুলো উড়ছে। সিঁড়ির নীচে ভিখিরিরা নাড়িভুঁড়ি সেদ্ধ করে নামিয়ে একগাদা তরকারির খোসা সেদ্ধ চাপিয়েছে। প্ল্যাটফর্মের বেঞ্চ-এ ঘুমিয়ে পড়েছে নিকলসন সাহেব, হাঁ-মুখ থেকে একটা বড় নীল মাছি বেরিয়ে এল। হারু অনেকটা তামাক-পাতা নিয়ে এসেছে, আর চুন।

সকলের পকেটেই একটা দুটো লুকোনো সিগারেট আছে। কেউ তো বের করে না। যে বের করবে সে পাবে প্রথম পাঁচ টান, বাকি সবাই তিন টান করে। তাই সবাই চেপে যায়। আমি হাত বাড়িয়ে খৈনি নিই। ঠোঁটে টিপে থুথু ফেলতে থাকি। নতুন লোকটা চোখ বুজে আছে। নতুন কিছু ভাবছে নিশ্চয়ই। লোকটা জানে অনেক।

ডালিম বলল—বাথরুমটা পেলে দুদিন বাদে স্নানটা হত।

লোকটা আবার চোখ খোলে। আমি উৎসুকভাবে তাকাই।

লোকটা বলে—রন্টেবাবু কোনও কাজের নয়। বাথরুমটা আমরা পাবই। পেতেই হবে।

আমি একটু অপমানিত বোধ করলেও চেপে গেলাম। আগামী কয়েক বছরের মধ্যে যদি আরও তিনটে ওয়েটিংরুম আমাদের দখলে আসে তবে কি তখনও বাথরুম তালা দেওয়া থাকবে? এই সমস্যাটা আমাকে ভাবিয়ে তোলে।

অনেকক্ষণ বাদে মতে এসে নীচে থেকে ডাকল—যান সব। ঘর খালাস হয়েছে। বকশিশ যেন মনে থাকে।

নতুন লোকটা গা ঝাড়া দিয়ে উঠেই আমাদের সংগ্রামে ডাক দেয়—উঠুন, ওকে ছেড়ে দেওয়া যায় না। সরকারি ওয়েটিং রুমে বসতে দেয়, তাতে তো ওর বাবার টাকা খরচা হয় না। ওসব সামান্য খাতিরে আমদের ভুলে গেলে চলবে না। বাথরুম ওকে খুলে দিতেই হবে।

আমরা গিয়ে মতেকে ধরি।

—বাথরুম খুলে দাও। দিতেই হবে।

আমাদের মারমুখো মুখের দিকে চেয়ে মতে একটু থতিয়ে যায়। বলে—বাথরুম খুলে দিলে তা আপনারা নোংরা করবেন। আমি বুড়ো হয়েছি, হাতে বাত, ধোলাই করতে আমার জান বেরিয়ে যায়।

আমরা অনেক পয়েন্ট পেয়ে যাই। নতুন লোকটা বলে—ধরো যদি এই স্টেশন আগের মতোই হত, রোজ প্যাসেঞ্জার নামত, তাহলে তো রোজই তোমাকে ধোলাই করতে হত! তখন কী করতে?

মতে গম্ভীর এবং করুণ মুখে বলে—সেদিন তো এখুন নাই। এখন একটু সুখে আছি, আপনারা দিবেন না?

লোকটা সরকারি কর্মচারীদের গাফিলতির কথা তোলে। নেহরুর একটা কোটেশন দেয়, এবং ভবিষ্যতে স্টেশনগুলোর ওয়েটিংরুম দখলে শ্রেণিহীন সমাজের সংগ্রামী ভূমিকার ভয়ও দেখায়। মতে ক্রমশ পয়েন্ট লুজ করতে থাকে। শেষদিকে কেবল নিজের বুড়ো বয়সের অক্ষমতার উল্লেখ ছাড়া আর কোনও জোরালো পয়েন্ট দিতে পারে না। তখন মোক্ষম অস্ত্রটি ছাড়ে লোকটা, বলে—তোমার বয়স কম করেও সত্তর।

মতে ভয় পেয়ে গিয়ে বলে—না না, ওই নিকলসন সাহেবের উমর কেবল পঁচাত্তর। ওই চোট্টা সাহেবটা ছাড়া আর আমরা কেউ, এই স্টেশনের কোনও গভরমিন্টের লোক উমর ছিপাইনি!

নতুন লোকটা কিন্তু চূড়ান্ত জয়ের মুখোমুখি এসে গেছে। আমরা বুঝতে পারি। এবং চারদিক থেকে হই-হই করে উঠি। মতে ঘাবড়ে যায়। তারপর সত্তর বছর বয়সের পক্ষে অত্যন্ত সাদা এবং সুন্দর দাঁত দেখিয়ে সে হেসে ফেলে। বলে—ঠিক আছে, মাঝে-মধ্যে বিড়িটা সিগারেটটা দিবেন, চা-পানির পয়সা দিবেন, বাথরুম খুলে দিচ্ছি।

দুদিন বাদে স্নান করে ডালিম খুব খুশি। হারুকে গা শুঁকিয়ে বলল—দ্যাখ তো, আর সেই চামসে গন্ধটা পাওয়া যাচ্ছে?

—না। হারু শুঁকে বলল।

সবাই স্নান করলাম। ওপর থেকে ঝাঁঝরি দিয়ে কী মিঠে ঠান্ডা ঝিরঝিরে জল যে পড়ল! আহা! ঘুম পেয়ে গেল। স্নানের পর বেশ ভালোই দেখাতে লাগল আমাদের। তার সঙ্গে একটা লড়াই জেতার আনন্দ।

নতুন লোকটা আবার ডেক চেয়ারে বসেছে। পশ্চাদ্দেশ ঝুলে আছে ফুটো দিয়ে। টেবিলে আমরা চারজন। তাসগুলো আবার বাঁটা হচ্ছে। পিছন থেকেই তাসগুলো চেনা

যায়। কিন্তু সামনে আরও অনেক দুপুর পড়ে আছে, আরও অনেক দিন। আমাদের কিছু করার নেই।

বাজে তাস পেয়ে আমি তাস ফেলে দিলাম। টিকটিকি কেন জল খায় না তা আবার গভীরভাবে ভাবতে লাগলাম। আশ্চর্য এই যে, প্রতিদিনই এরকম নতুন কিছু না কিছু ভাববার জিনিস ঠিক পাওয়া যায়।

উত্তরের ব্যালকনি

ব্যালকনিতে দাঁড়ালে লোকটাকে দেখা যায়। উলটোদিকের ফুটপাথে বকুল গাছটায় অনেক ফুল এসেছে এবার। ফুলে ছাওয়া গাছতলা। সেইখানে নিবিড় ধুলোমাখা ফুলের মাঝখানে লোকটা গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসে আছে। গায়ে একটা ছেঁড়া জামা, জামার রং ঘন নীল। পরনে একটা খাকিরঙের ফুলপ্যান্ট—লজ্জাকর জায়গাগুলিতে প্যান্টটা ছিঁড়ে হাঁ হয়ে আছে। মাথায় একটা ময়লা কাপড়ের ফগগে জড়ানো। পিঙ্গল দীর্ঘ চুলগুলি আস্তে-আস্তে জটা বাঁধছে। গালে দাড়ি বেড়ে গেছে অনেক, তাতে দু-চারটি সাদা চুল। গায়ে চিট ময়লা কনুইয়ে ঘা, তাতে নীল মাছি উড়ে-উড়ে বসে। এই হচ্ছে লোকটা। দু-পা ছড়িয়ে নির্বিকার বসে আছে, দুই চোখে অবিকল ক্লান্তিহীন তাকিয়ে থাকে। ঘা থেকে উড়ে মাছিগুলি চোখের কোণে এসে বসে। লোকটা দু-হাত তুলে চেঁচিয়ে বলে—সরে যা, সরে যা, মেল ট্রেন আসছে।

পাগল।

সকালে ভাত খেয়ে একটা পান মুখে দেয় তুষার। সুগন্ধী জরদা খায়। তারপর পিক ফেলতে আসে ব্যালকনিতে। ফুটপাতের ধারে কর্পোরেশনের ময়লা ফেলার একটা ড্রাম আছে। অভ্যাসে লক্ষ স্থির হয়। তুষার একটু ঝুঁকে দোতলার ব্যালকনি থেকে সাবধানে পিক ফেলে। লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না। পিকটা ঠিক গিয়ে পড়ে সেই ড্রামটায়। এদিক-ওদিক হয় না। অনেক দিনের অভ্যাস।

পিক ফেলে তুষার বকুলগাছের তলার সেই লোকটাকে একটু দেখে। পাগল। তবু এখনও চেনা যায় অরুণকে। চেনা যায়? তুষার একটু ভাবে। কিন্তু অরুণের আগের চেহারাটা কিছুতেই সে মনে করতে পারে না। ফরসা রং, ভোঁতা নাক, বড় চোখ—এইরকম কতগুলি বিশেষণ মনে পড়ে, কিন্তু সব মিলিয়ে চেহারার যে যোগফল—সেই

যোগফলটাই একটা মানুষ—সেই মানুষটার নাম ছিল অরুণ—সেই অরুণকে কিছুতেই সব মিলিয়ে মনে পড়ে না। তবু তুষারের মনে হয়, এখনও অরুণকে চেনা যায়। কিন্তু আসলে বোধহয় তা নয়। অরুণকে আর চেনা যায় না বোধহয়। তবু তুষারের যে অরুণকে চেনা মনে হয় তার কারণ, গত পাঁচ বছর ধরে অরুণ ওই গাছতলায় বসে আছে। ওইখানে বসে থেকে থেকেই তার চুল জট পাকাল, গালে দাড়ি বাড়ল, গায়ে ময়লা বসল—এই সব পরিবর্তন হল অরুণের। রোজ দেখে-দেখে সেই পরিবর্তনটা অভ্যস্ত লাগে তুষারের। তাই অনেক পরিবর্তনের ভিতরেও আজ অরুণকে চেনা লাগে তার।

পাগলটা মুখ তুলে তুষারের দিকে তাকাল। তাকিয়েই রইল। আকীর্ণ ফুলের মধ্যে বসে আছে পাগল। তার চারদিকে শোষক নীল মাছি উড়ছে। পাগলটার চোখে এখন আর কিছু নেই। প্রথম-প্রথম তুষার ওই চোখে ঘৃণা, আক্রোশ, প্রতিশোধ—এই সব কল্পনা করত। ব্যালকনি থেকে তাড়াতাড়ি চলে আসত ঘরে, পারতপক্ষে ব্যালকনির দরজা খুলত না। কিন্তু আস্তে-আস্তে তুষায় বুঝে গেছে, পাগলটার চোখে কিছু নেই। কেবল অবিন্যস্ত চিন্তারাশি বয়ে যায় মাথার ভিতর দিয়ে, ওর চোখ কেবল সেই প্রবহমানতাকে লক্ষ করে অসহায় শূন্যতায় ভরে ওঠে। তুষার এখন তাই পাগলটার দিকে নির্ভয়ে চেয়ে থাকতে পারে। কোনও ভয় নেই।

পাগল মাতাল আর ভূত—অনেক ভয়ের মধ্যে এই তিনটেয় ভয় সবচেয়ে বেশি ছিল কল্যাণীর। তার বিশ্বাস ছিল, বাসার বাইরে যে বিস্তৃত অচেনা পৃথিবী, সেখানে গিজগিজ করছে পাগল আর মাতাল। আর চারপাশে যে অদৃশ্য আবহমণ্ডল তাতে বাস করে ভূতেরা, অন্ধকারে একা ঘরে দেখা দেয়।

কোনও পাগলের চোখের দিকে কল্যাণী কখনও তাকায়নি। এখন তাকায়। ভয় করে না কি? করে। তবু অভ্যাসে মানুষ সব পারে।

পান খাওয়ার পর অভ্যাস মতো বাথরুমে গিয়ে মুখ কুলকুচো করে আসে তুষার। পরপর এক গ্লাস ঠান্ডা জল খায়। পানে খয়ের খায় না বলে ওর ঠোঁট লাল হয় না। তবু আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ভেজা তোয়ালে দিয়ে সাবধানে ঠোঁট মোছে তুষার। প্যান্ট শার্ট পরে। তারপর অফিসে বেরিয়ে যায়। যাওয়ার সময়ে অভ্যাস মতো বলে—সদরের দরজাটা বন্ধ করে দাও।

কল্যাণী সদর বন্ধ করে।

শোওয়ার ঘরের মেঝেতে বসে জলের গ্লাস রঙের বাক্স ছড়িয়ে কাগজে ছবি আঁকছে তাদের পাঁচ বছর বয়সের মেয়ে। সোমা এখনও কেবল গাছ লতাপাতা আঁকে। আর আঁকে

খোঁপাসুদ্ধ মেয়েদের মুখ। বয়সের তুলনায় সোমার আঁকার হাত ভালোই। তার আঁকা গাছপালা, মুখ সব প্রায় একই রকমের হয়, তবু মেয়েটা বিভোর হয়ে আঁকে। সারাদিন।

আজও লম্বা নিম পাতার মতো পাতাওয়ালা একটা গাছ আঁকছে সোমা। একটু দাঁড়িয়ে সেটা দেখল কল্যাণী। তারপর বলল—স্নান করতে যাবি না?

—যাচ্ছি মা, আর একটু—

মেয়ের ওই এক জবাব।

—বড্ড অনিয়ম হচ্ছে তোমার। ওই সব আজেবাজে এঁকে কী হয়?

—এই তো মা, হয়ে এল—বিভোর সোমা জবাব দেয়।

—সামনের বছর স্কুলে ভরতি হবে যখন তখন দেখবে। সময় মতো স্নান খাওয়া, সময় মতো সবকিছু। এইসব তখন চলবে না—

বলতে-বলতে কল্যাণী অলস পায়ে তুষারের স্নান করা ভেজা ধুতিটা হাতে নিয়ে ব্যালকনিতে আসে।

যখন তুষার থাকে, তখন কখনও কল্যাণী ব্যালকনিতে আসে না। সারা সকাল রান্নাবান্নার ঝঞ্ঝাট যায় খুব, তুষারকে খাইয়ে অফিসে পাঠিয়ে কল্যাণী অবসর পায়। স্নানের আগে বাঁধা চুল খুলতে-খুলতে অলস পায়ে এসে দাঁড়ায় ব্যালকনিতে। তাকায়।

আকীর্ণ ধুলোমাখা ফুলের মধ্যে বসে আছে পাগলটা। বসে আছে অরুণ।

ব্যালকনিটা উত্তরে। গ্রীষ্মের রোদ পড়ে আছে। কল্যাণীর গায়ে রোদ লাগল, সেই রোদ বোধহয় কল্যাণীর গায়ের আভা নিয়ে ছুটে গেল চরাচরে। পাগলটা বকুল গাছের নিবিড় ছায়া থেকে মুখ তুলে তাকাল।

এখন কল্যাণী পাগলের চোখে চোখ রাখতে পারে। ভয় করে না। কী করে। তবু অভ্যাস। পাঁচ বছর ধরে পাগলটা বসে আছে ওই বকুলগাছের তলায়। পাঁচ বছর ধরে উত্তরের এই ব্যালকনিটাকে লক্ষ করছে ও। ভয় করলে কী চলে।

কল্যাণী গ্রীষ্মের রোদে ব্যালকনির রেলিং থেকে তুষারের ভেজা ধুতিটা মেলে দেয়। তারপর দাঁড়িয়ে চুল খোলে, অলস আঙুলে ভাঙে চুলের জট।

পাগলটা তাকিয়ে আছে।

এখান থেকেই দেখা যায়, ওর ফাঁক হয়ে থাকা মুখের ভেতরে নোংরা হলদে দাঁত, পুরু ছ্যাতলা পড়েছে। ঘুমের সময়ে নাল গড়িয়ে পড়েছিল বুঝি, গালে শুকিয়ে আছে সেই দাগ। দুর্গন্ধ মুখের কাছে উড়ে-উড়ে বসছে নীল মাছি।

ওই ঠোঁট জোড়া ছ'সাত বছর আগে কল্যাণীকে চুমু খেয়েছিল একবার। একবার মাত্র। জীবনে ওই একবার। তাও জোর করে। এখন ওই নোংরা দাঁতগুলোর দিকে তাকিয়ে সেই কথা ভাবলে বড় ঘেন্না করে।

দুপুর একটু গড়িয়ে গেলে ঠিকে ঝি মঙ্গলা এসে কড়া নাড়ে। তখন ভাতঘুমে থাকে কল্যাণী। ঘুম চোখে উঠে দরজা খুলে দেয়। মঙ্গলা যখন রান্নাঘরের এঁটোকাটা মুক্ত করতে থাকে তখন কল্যাণী রোজকার মতোই ঘুম গলায় বলে—ভাতটা দিয়ে এসো।

নিয়ম। প্রথম যখন পাগলটা ওই গাছতালায় এল তখন এই নিয়ম ছিল না। পাগল চিৎকার করত, আকাশ বাতাসকে গাল দিত। চিৎকার করে হাত তুলে বলত টেলিগ্রাম....টেলিগ্রাম...! তখন ঘরের মধ্যে তুষার আর কল্যাণী থাকত কাঁটা হয়ে। পাগলটা যদি ঘরে আসে। যদি আক্রমণ করে। তারা পাপবোধে কষ্ট পেত। অকারণে ভাবত অরুণের প্রতি তারা বড় অবিচার করছে। কিন্তু আসলে তা নয়। অরুণকে কখনও ভালবাসেনি কল্যাণী, সে ভালবাসত তুষারকে। অরুণের সঙ্গে তুষারের তাই কোনও প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল না। তুষারের ছিল সহজ জয়। অরুণের ছিল পৃথিবী হারানোর দুঃখ। সেই দুঃখ তার দুর্বল মাথা বহন করতে পারেনি। তাই লোভ, ক্ষোভ, আক্রোশবশত সে এসে বসল, তুষার কল্যাণীর সংসারের দোরগড়ায়। চৌকি দিতে লাগল, চিৎকার করতে লাগল। সংসারের ভিতরে তুষার আর কল্যাণী ভয়ে সিঁটিয়ে থাকত, দরজা জানালা খুলত না।

—চলো, অন্য কোথাও চলে যাই। কল্যাণী বলত।

—গিয়ে লাভ কী? সন্ধান করে সেখানেও যাবে।

আস্তে-আস্তে অভ্যাস হয়ে যাচ্ছিল। অরুণ গাছতলা পর্যন্ত এল। তুষার কল্যাণীর সংসারে দোরগড়ায় বসে রইল। কিন্তু তার বেশি এগোল না। চিৎকার করত, কিন্তু কল্যাণীর নাম উচ্চারণ করত না, তুষারেরও না। লোকে তাই বুঝতে পারল না, পাগলটা ঠিক এখানেই কেন থানা গেড়েছে।

ভয় কেটে গেলে মানুষের মমতা জন্মায়।

তুষার একদিন বলল—ওকে কিছু খেতে দিয়ো। সারাদিন বসে থাকে।

—কেন?

—দিয়ো। ও তো কোনও ক্ষতি করে না। বরং ওর ক্ষতি হয়েছে অনেক। আমরা একথালা ভাতের ক্ষতি স্বীকার করি না কেন!

সেই থেকে নিয়ম। কল্যাণী দুবেলা ভাত বেড়ে রাখে। ঠিকে ঝি দুপুর গড়িয়ে আসে। অ্যালুমিনিয়ামের থালায় ভাত, অ্যালুমিনিয়ামের গেলাসে জল দিয়ে আসে। পাগলটা খিদে বোঝে। তাই গোগ্রাসে খায়, জল পান করে। অবশ্য খেতে-খেতে কিছু ভাত ছড়িয়ে দেয়। কাকেরা উড়ে-উড়ে নামে, চেঁচায়, নীল মাছির ভিড় জমে যায়। খাওয়ার শেষে পাগলটা এঁটো হাত নিশ্চিন্ত মনে জামায় মোছে। গাছের গুঁড়িতে মাথা হেলিয়ে ঘুমোয়।

ঘুমোয়! না, ঠিক ঘুম নয়। এক ধরনের ঝিমুনি আসে তার। আর সেই ঝিমুনির মধ্যে অবিরল বিচ্ছিন্ন চিন্তার স্রোত কুলকুল করে তার মাথার ভিতর বয়ে যায়। চোখ বুজে সে সেই আশ্চর্য স্রোতস্বিনীকে প্রত্যক্ষ করে।

মঙ্গলা আপত্তি করত—আমি ভিখিরির এঁটো মাজতে পারব না, মা।

মাইনের ওপর তাকে তাই উপরি তিনটে টাকা দিতে হয়।

মঙ্গলা ভাত নিয়ে গিয়ে পাগলটার সামনে ধরে দেয়। তারপর একটু দূরে দাঁড়িয়ে উঁচু গলায় গাল পাড়ে—হাভাতে, পাগল, রোজ ভাতের লোভে বসে থাকা! কপালও বটে তোর, এমন বাসার সামনে আস্তানা গাড়লি যে তারা তোকে সোনার চোক্ষে দেখল।

ভাতঘুমে রোজ কল্যাণী মঙ্গলার গাল শুনতে পায়।

আগে আলাদা ভাত যত্ন করে বেড়ে দিত কল্যাণী। ক্রমে সেইসব যত্ন কমে এসেছে। এখন তুষারের পাতের ভাত, সোমার ফেলে দেওয়া মাছের টুকরা, নিজের ভুক্তাবশেষ সবই অ্যালুমিনিয়ামের থালাটায় ঢেলে দেয়। পাগলটা সব খায়।

গত বছর একটা প্রমোশন হয়েছে তুষারের জুনিয়ার থেকে। এখন সে সিনিয়র একজিকিউটিভ। নিজের কোম্পানির দশটা শেয়ার কিনেছে সে। ফলে সারাদিন তার দম ফেলার সময়ই নেই।

বিকেলের আলো জানালার শার্সিতে ঘরে আসে। তখন এয়ারকন্ডিশন করা ঘরখানায় সিগারেটের ধোঁয়া জমে ওঠে। কুয়াশার মতো আবছা দেখায় ঘরখানা। তখন খুব মাথা ধরে তুষারের। ঘাড়ের একটা রগ টিকটিক করে নড়ে। অবসন্ন লাগে শরীর। সিগারেটে সিগারেটে বিস্বাদ, তেতো হয়ে যায় জিব। চেয়ার ছেড়ে উঠবার সময় প্রায়ই টের পায়, দুই পায়ে খিল ধরে আছে। চোখে একটা আঁশ-আঁশ ভাব।

অফিসের ছুটি হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। কেবল বেকাদায় আটকে থাকা তার ছোকরা স্টেনোগ্রাফারটি তাড়াতাড়ি তার কাগজপত্র গুছিয়ে নিচ্ছে। ঘর ঝাঁট দিচ্ছে জমাদার। চাবির গোছা হাতে দারোয়ান এঘর-ওঘর তালা দিচ্ছে।

দীর্ঘ জনশূন্য করিডোর বেয়ে তুষার হাঁটতে থাকে। নরম আলোয় সুন্দর করিডোরটিকে তখন তার কলকাতার ভূগর্ভের ড্রেন বলে মনে হয়।

বাইরে সুবাতাস বইছে। ফুটপাথে দাঁড়িয়ে এই প্রথম ফুসফুস ভরে বাতাস টানে সে! কোনও কোনও দিন এইখানে দাঁড়িয়েই ট্যাক্সি পেয়ে যায়। আবার কোনও কোনও দিন খানিকটা হাঁটতে হয়।

আজ ট্যাক্সি পেল না তুষার। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে তারপরে হাঁটতে লাগল।

একটা বিশাল বাড়ির কাঠামো উঠছে! দশ কি বারোতলা উঁচু লোহার খাঁচা। ইঁট কাঠ বালি আর নুড়ি পাথরের স্তূপ ছড়িয়ে আছে। নিস্তব্ধ হয়ে আছে কংক্রিট মিক্সার, ক্রেন হ্যামর উটের মতো গ্রীবা তুলে দাঁড়িয়ে। জায়গাটা প্রায় জনশূন্য। কুলিদের একটা বাচ্চা ছেলে পাথর কুড়িয়ে ক্রমান্বয়ে একটা লোহার বিমের গায়ে টং-টং করে ছুড়ে মারছে। ঘণ্টাধ্বনির মতো শব্দটা শোনে তুষার। শুনতে-শুনতে অন্যমনস্ক হয়ে যায়।

ওই তুচ্ছ শব্দটি—ঘণ্টাধ্বনিপ্রতিম—তার মাথার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। সে আবার ফিরে তাকায়। লোহার প্রকাণ্ড, ভয়ঙ্কর সেই কাঠামোর ভিতরে-ভিতরে দিনশেষের অন্ধকার ঘনিয়ে উঠেছে। চারিদিক আকীর্ণ আবর্জনার মতো ইঁট কাঠ পাথরের স্তূপ! ঘণ্টাধ্বনিপ্রতিম শব্দটি সেই অন্ধকার কাঠামোর অন্ধকারে প্রতিধ্বনিত হয়ে ছুটে আসছে।

ওই শব্দ যেন কখনও শোনেনি তুষার। তার শরীরের অভ্যন্তরে অবদমিত কতগুলি অনুভুতি দ্রুত জেগে ওঠে। তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগে—ছুটি চাই, ছুটি চাই। মুক্তি দাও, অবসর দাও।

কীসের ছুটি! কেন অবসর! সে পরমুহূর্তেই অবাক হয়ে নিজেকে প্রশ্ন করে। কিন্তু উত্তর পায় না। প্রতিদিন নিরবিচ্ছিন্ন কাজের মধ্যে ডুবে থাকা—এ তার ভালোই লাগে। ছুটি নিলে তার সময় কাটে না। বেড়াতে গেলে তার অফিসের জন্য দুশ্চিন্তা হতে থাকে। কাজের মানুষদের যা হয়।

তবু সে বুঝতে পারে, তার মধ্যে এক তীব্র অনুভূতি তাকে বুঝিয়ে দেয়—কী রহস্যময় বন্ধন থেকে তার সমস্ত অস্তিত্ব মুক্তি চাইছে। ছুটি চাইছে। চাইছে অবসর। সে তন্ন-তন্ন করে নিজের ভিতরটা খুঁজতে থাকে। কিছুই খুঁজে পায় না। কিন্তু তীব্র অজানা ইচ্ছা এবং আকাঙ্ক্ষায় তার মন মুচড়ে ওঠে।

আবার সে পিছন ফিরে সেই লোহার কাঠামো দূর থেকে দেখে। সেখানে অন্ধকার জমে উঠেছে। একটা বাচ্চা ছেলে অদৃশ্যে এখনও পাথর ছুড়ে মারছে লোহার বিমের গায়ে।

চৌরঙ্গির ওপরে তুষার ট্যাক্সি পায়।

—কোথায় যাবেন?

ঠিক বুঝতে পারে না তুষার, কোথায় সে যেতে চায়। একটু ভাবে। তারপর দ্বিধাগ্রস্তভাবে বলে—সোজা চলুন।

গাড়ি সোজা চলতে থাকে দক্ষিণের দিকে, যেদিকে তুষারের বাসা। সেদিকে যেতে তুষারের ইচ্ছে করে না। বাড়ি ফেরা—সেই এক-ঘেয়ে বাড়ি ফেরার কোনও মানে হয় না।

সে ঝুঁকে ট্যাক্সিওয়ালাকে বলে—সামনের বাঁদিকের রাস্তা।

এলগিন রোড ধরে ট্যাক্সি ঘুরে যায়।

কোথায় যাব। কোথায়। তুষার তাড়াতাড়ি ভাবতে থাকে। ভাবতে-ভাবতে মোড়ে এসে যায়। এবার? ভিতরে সেই তীব্র ইচ্ছা এখনও কাজ করছে। অন্ধকারময় একটা বাড়ির কাঠামো—লোহার বিমে নুড়ি ছুড়ে মারার শব্দ—তুষারের বুক ব্যথিয়ে ওঠে। মনে হয়—কেবলই মনে হয়—কী একটা সাধ তার পূরণ হয়নি। এক রহস্যময় অস্পষ্ট মুক্তি বিনা বৃথা চলে গেল জীবনে।

সে আবার বলে—বাঁয়ে চলুন।

ট্যাক্সি দক্ষিণ থেকে আবার উত্তর মুখে এগোতে থাকে। আবার সার্কুলার রোড। গাড়ি এগোয়। ভিতরে-ভিতরে ছটফট করতে থাকে তুষার।

একটা বিশাল পুরোনো বাড়ি পেরিয়ে যাচ্ছিল গাড়ি। তুষার বাড়িটাকে দেখল। কী একটা মনে পড়ি পড়ি করেও পড়ল না। আবার বাড়িটা দেখল। হঠাৎ পাঁচ-সাত বছর আগেকার কয়েকটা দুরন্ত দিনের কথা মনে পড়ল। নিনি। নিনিই তো মেয়েটির নাম।

গাড়ি এগিয়ে গিয়েছিল, তুষার গাড়ি ঘোরাতে বলল।

সেই বিশাল পুরোনো বাড়িটার তলায় এসে থামে গাড়ি।

হাতে সদ্য কেনা এক প্যাকেট দামি সিগারেট আর দেশলাই নিয়ে সেই পুরোনো বাড়ির তিন তলায় সিঁড়ি ভেঙে উঠতে-উঠতে তুষার ভাবে— এখনও নিনি আছে কি

এখানে? আছে তো!

বাড়িটায় অসংখ্য ঘর আর ফ্ল্যাট। ঠিক ঘর খুঁজে পাওয়া মুশকিল। তার ওপর পাঁচ-সাত বছর আগেকার সেই নিনি এখনও আছে কি না সন্দেহ। যদি না থেকে থাকে তবে ভুল করে ঢুকে বিপদে পড়বে না তো তুষার?

একটু দাঁড়িয়ে ভেবে, একটু ঘুরে-ফিরে দেখে তুষার ঘরটা চিনতে পারল। দরজা বন্ধ। বুক কাঁপছিল, তবু দরজায় টোকা দিল তুষার।

দরজা খুললে দেখা গেল, নিনিই। অবিকল সেইরকম আছে।

চিনতে পারল না, ভ্রূ তুলে ইংরিজিতে বলল—কাকে চাই?

তুষার হাসল—চিনতে পারছ না?

নিনি ওপরের দাঁতে নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরে একটু ভাবল। তুষার দেখল ডান দিকের একটা দাঁত নেই। সেই দাঁতটা বাঁধানো, দাঁতের রং মেলেনি। পাঁচ বছরে এইটুকু পালটেছে নিনি।

—আমি তুষার।

নিনির মুখ হঠাৎ উদ্ভাসিত হয়ে গেল।

এবার বাংলায়—আঃ, তুমি কি সেই রকম দুষ্টু আছ। বুড়ো হওনি?

—আগে বলো, তুমি সেই নিনি আছ কি না! তোমার স্বামী পুত্র হয়নি তো! হয়ে থাকলে দোরগোড়া থেকেই বিদায় দাও।

নিনি ঠোঁট উলটে বলল—আমার ওসব নেই। এসো।

ঘরে সেই রঙিন কাগজে ছাওয়া দেওয়াল, ভাড়া করা ওয়ার্ডরোব, মেয়েলি আসবাবপত্র। এখনও সেন্ট-পাউডার ফুলের গন্ধ ঘরময়। বিছানার মাথার কাছে গ্রামোফোন, টেবিলে রেডিও আর গিটার।

নিনি কয়েক পলক তাকিয়ে বলল—তুমি একটুও বদলাওনি।

—তুমিও।

কিন্তু তুষারের তীব্র ইচ্ছাটা এখনও অস্থির অন্ধের মতো বেরোবার পথ খুঁজছে! সে কি এইখানে তৃপ্ত হবে? হবে তো? উত্তেজনায় অস্থিরতায় সে কাঁপতে থাকে।

ওয়ার্ডরোবের পাল্লা খুলে সাবধানে গুপ্ত জায়গা থেকে একটা দামি মদের বোতল বের করে নিনি, তারপর হেসে বলে—এই মদ কেবল আমার বিশেষ অতিথিদের জন্য।

এই সবই তুষারের জানা ব্যাপার। ওই যে গোপনতার ভান করে দামি বোতল বের করা ওটুকু নিনির জীবিকা। তুষারের মনে আছে নিনি বারবার তাকে এই বলে সাবধান করে দিত—মনে রেখো এটা ভদ্র জায়গা। আর, আমি বেশ্যা নই। মাতাল হয়ো না, হুল্লোড় করো না।

তুষার হাসল। সে বারবার নিনির কাছে মাতাল হয়ে হুল্লোড় করেছে।

তুষার আজ মাতাল হওয়ার জন্য উগ্র আগ্রহে প্রস্তুত ছিল। একটুতেই হয়ে গেল। তখন তীব্র মাদকতায় একটা গৎ গিটারে বাজাচ্ছিল নিনি। ওত পেতে অপেক্ষা করছিল তুষার। বাজনার সময়ে নিনিকে ছোঁয়া বারণ। বাজনা থামলে তারপর—

ভিতরে তীব্র ইচ্ছেটা গিটারের শব্দে তীব্রতর হয়ে উঠেছে।

মুক্তি। সামনেই সেই মুক্তি। চোখের সামনে আবার সেই খাড়া বিশাল লোহার কাঠামোতে ঘনায়মান অন্ধকার, লোহার বিমে নুড়ির শব্দ।

বাজনা থামতেই বাঘের মতো লাফ দিল তুষার।

তীব্র আশ্লেষ ইচ্ছা আনন্দময় আবরণ উন্মোচন, তারই মাঝখানে হঠাৎ ব্যাথায় ককিয়ে ওঠে নিনি—থামো, থামো, আমার বড় ব্যথা—

তুষার থামে—কী বলছ?

নিনি ঘর্মাক্ত মুখে ব্যথায় নীল মুখ তুলে বলে—এইখানে বড় ব্যথা—

পেটের ডান ধার দেখিয়ে বলে—গত বছর আমার একটা অপারেশন হয়েছিল। অ্যাপেন্ডিসাইটিস—

তুষারের লিত হাত পড়ে যায়। পাঁচ বছরে অনেক কিছু নষ্ট হয়ে গেছে। সবকিছু কি আর ফিরে পাওয়া যায়?

সময় পেরিয়ে গেল, তুষার ফিরল না।

বিকেলে চুল বেঁধেছে কল্যাণী। সেজেছে। চায়ের জল চড়িয়েছিল, ফুটে-ফুটে সেই জল শুকিয়ে এসেছে। গ্যাসের উনোন নিভিয়ে কল্যাণী ব্যালকনিতে এসে দাঁড়াল। উত্তরের ব্যালকনি, উলটোদিকে ফুটপাথে সেই বকুলগাছ, গাছতলায় ধুলো-মাখা আকীর্ণ ফুলের মধ্যে বসে আছে পাগলটা। একটু দূরে বসে একটা রাস্তার কুকুর পাগলটাকে দেখছে।

দৃশ্যটাকে করুণ বলা যায়। আবার বলা যায়ও না। অরুণকে নিয়ে এখন আর ভাববার কিছু নেই। এখন এক রাস্তার পাগল। মুক্ত পুরুষ।

এখন ব্যালকনিটা অন্ধকার। পিছনে ঘরের আলো। তাই রাস্তা থেকে কল্যাণীকে ছায়ার মতো দেখায়। পাগলটা মুখ তুলে ছায়াময়ী কল্যাণীকে দেখে। টুপটাপ বুকুল ঝরে পড়ে। অবিকল পাগলটা হাত বাড়িয়ে ফুল তুলে নেয়। লম্বা নোংরা নখে ছিঁড়ে ফেলতে থাকে ফুল। রাত বাড়ছে। তার খিদে পাচ্ছে।

পুরোনো বাড়িটার সিঁড়ি বেয়ে অনেকক্ষণ হল রাস্তায় নেমে এসেছে তুষার। কখনও নির্জন শেক্সপিয়র সরণি, কখনও চলাচলকারী মানুষের মধ্যে চৌরঙ্গি রোড ধরে বহুক্ষণ হাঁটল সে। এখনও মাঝে-মাঝে উঁচু বাড়ির লোহার কাঠামোর ভিতরে ঘনায়মান অন্ধকার তার মনে পড়ছে, মাঝে-মাঝে শুনতে পাচ্ছে, নেপথ্যে কে যেন নুড়ি ছুড়ে মারছে লোহার বিমের গায়ে। তার মন বলছে, এখানে নয় এখানে নয়। চলো সমুদ্রে যাই। কিংবা চলো পাহাড়ে। ছুটি নাও। মুক্তি নাও। বৃথা বয়ে যাচ্ছে সময়।

কেন যে এই ভূতুড়ে মুক্তির ইচ্ছা? সে কি চাকরি করতে-করতে ক্লান্ত? সে কি সংসারের একঘেয়েমি আর পছন্দ করছে না? কল্যাণীর আকর্ষণ সব কি নষ্ট হয়ে গেল?

বেশ রাত করে সে বাড়ি ফিরল।

সোমা ঘুমিয়ে পড়েছে। কল্যাণী দরজা খুলে মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

—মদ খেয়েছ?

—খেয়েছি।

—আর কোথায় গিয়েছিলে?

—কোথায় আবার?

কল্যাণী বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে কাঁদতে থাকে।

ভারী বিরক্ত হয় তুষার—কাঁদছ কেন? মদ তো আমি প্রথম খাচ্ছি না? আমদের যা স্ট্রেইন হয় তাতে না খেলে চলে না—

কাঁদতে-কাঁদতেই হঠাৎ তীব্র মুখ তোলে কল্যাণী—শুধু মদ! মেয়েমানুষের কাছ যাওনি? তোমার ঠোঁটে গালে শার্টে লিপস্টিকের দাগ—তোমার গায়ে সেন্টের গন্ধ—যা তুমি জন্মে মাখো না—

তুষার অপেক্ষা করতে লাগল। এখন অপেক্ষা করা ছাড়া কিছু করার নেই।

অনেক রাত হল আরও। বেশ পরিশ্রম করতে হল তুষারকে। তারপর রাগ ভাঙল কল্যাণীর। উঠে ভাত দিল।

বাইরে বকুল গাছের তলায় তখন পাগলটা অনেকগুলি ফুল নখে ছিঁড়ে স্তূপ করেছে। উগ্র চোখে সে চেয়ে আছে অন্ধকার ব্যালকনিটার দিকে। ঘরের দরজা বন্ধ। তার খিদে পেয়েছে। মাঝে-মাঝে সে চেঁচিয়ে বলছে—অন্ধকার। ভীষণ অন্ধকার! কোই হ্যায়।

সে ডাক শুনতে পেল তুষার। খেতে-খেতে জিগ্যেস করল—পাগলটাকে রাতের খাবার দাওনি?

—কী করে দেব। রোজ মঙ্গলা রাতে একবার আসে খাবারটা দিয়ে আসতে। আজ আসেনি, ওর ছেলের অসুখ।

—আমার কাছে দাও, দিয়ে আসছি।

—তুমি দেবে? অবাক হয় কল্যাণী।

—নয় কেন?

—শুধু দিয়ে আসা তো নয় বাবুর খাওয়া হলে এঁটো বাসন নিয়ে আসতে হবে। পাগলের এঁটো তুমি ছোঁবে?

তুষার হাসল—তোমার জন্য ও অনেক দিয়েছে ওর জন্য আমরা কিছু দিই—

থালায় নয়, একটা খবরের কাগজে ভাত বেড়ে দিল কল্যাণী। তুষার সেই খবরের কাগজের পোঁটলা নিয়ে বকুল গাছটার তলায় গেল।

পাগলটা তুষারের দিকে তাকালও না। হাত বাড়িয়ে পোঁটলাটা নিল। খুলে খেতে লাগল গোগ্রাসে।

একটুদূরে দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা সিগারেট খেতে-খেতে দেখতে লাগল তুষার।

—খাওয়া ছাড়া তুমি আর কিছু বোঝো না অরুণ?

পাগলটা মুখ তুলল না। তার খিদে পেয়েছে। সে খেতে লাগল।

—ওইখানে, ওই ব্যালকনিতে মাঝে-মাঝে কল্যাণী এসে দাঁড়ায়। তাকে দেখ না? তার বাঁ গালে সেই সুন্দর কালো আঁচিলটা এখনও মাছির মতো বসে থাকে—দ্যাখো না? এখনও আগের মতোই ভারী তার চোখের পাতা, দীর্ঘ গ্রীবা, এখনও তেমনি উজ্জ্বল রঙ। চেয়ে দ্যাখো না অরুণ?

পাগল গ্রাহ্য করে না। তার খিদে পেয়েছে। সে খাচ্ছে।

আকাশে মেঘ করেছে খুব। তুষার মুখ তুলে দেখল! পিঙ্গল আকাশ, বাতাস থম ধরে আছে। ঝড় উঠবে। এই ঝড়বৃষ্টির রাতেও বাইরেই থাকবে পাগল। হয়তো কোনও গাড়ি বারান্দার তলায় গিয়ে দাঁড়াবে। ঝড় খাবে। আর অবিরল নিজের মধ্যবর্তী বিচ্ছিন্ন চিন্তার এক স্রোতস্বিনীকে করবে প্রত্যক্ষ।

—তোমার কোনও নিয়ম না মানলেও চলে, তবু কেমন নিয়মে বাঁধা পড়ে গেছ অরুণ। তোমার মুক্তি নেই?

ডাল তরকারিতে মাখা কাগজটা ছিঁড়ে গেছে। ফুটপাথের ধুলোয় পড়েছে ভাত। পাগল তার নোংরা হাতে, নখে খুঁটে খাচ্ছে। একটা রাস্তার কুকুর বসে আছে অদূরে, আর দুটো দাঁড়িয়ে আছে। তুষার চোখ ফিরিয়ে নিল।

ঘর অন্ধকার হতেই সেই লোহার কাঠামো, তার ভিতরকার ঝুঁঝকো আঁধার আর একবার দেখা গেল। লোহার বিমের গায়ে নুড়ি পাথরের টুং-টুং শব্দ। অবিরল অবিশ্রাম। বুকে খামচে ধরে মুক্তির তীব্র সাধ। কীসের মুক্তি? কেমন মুক্তি? কে জানে! কিন্তু তার ইচ্ছা উত্তপ্ত পারদের মতো লাফিয়ে ওঠে।

আকুল আগ্রহে সে আবার বাতি জ্বালে। কল্যাণী বলে—কী হল?

উত্তেজিত গলায় তুষার ডাকে—এসো তো, এসো তো কল্যাণী।

তারপর সে নিজেই হাত বাড়িয়ে মশারির ভিতর থেকে টেনে আনে কল্যাণীকে। আনে নিজের বিছানায়। কল্যাণী ঘেমে ওঠে। উজ্জ্বল আলোয় কল্যাণীকে পাগলের মতো দেখে তুষার, চুমু খায়, তীব্র আগ্রহে রিরংসায় তাকে মন্থন করে। বিড়বিড় করে বলে—কেন তোমার জন্যে ও পাগল? কী আছে তোমার মধ্যে? কী সেই মহামূল্যবান। আমাকে দিতে পারো তা?

বৃথা। সব শেষে ঘোরতর ক্লান্তি নামে।

এইটুকু। আর কিছু নয়!

ওরা ঘুমোয়। বাইরে ঝড়ের প্রথম বাতাসটি বয়ে যায়! প্রথম বৃষ্টির ফোঁটাটি একটি পোকার মতো উড়ে এসে বসে পাগলটার ঠোঁটে। বসে-বসে ঝিমোয় পাগল। তার রক্তবর্ণ চুলগুলি নিয়ে খেলা করে বাতাস। বিদুৎ উদ্ভাসিত করে তার মুখ। তার মাথায় অবিরল বকুল ঝরিয়ে দিতে থাকে গাছ।

বহু উঁচু থেকে ক্রেন হ্যামারটা ধম করে নেমে আসে। চমকে উঠে বসে তুষার। বুকের ভিতরটা ধক-ধক করতে থাকে। এত জোরে বুক কাঁপতে থাকে যে দুহাতে বুক চেপে ধরে কাতরতার একটা অস্ফুট শব্দ করে সে।

কীসের শব্দ ওটা? অন্ধকারে উঁচু উটের গ্রীবার মতো নিস্তব্ধ ক্রেন হ্যামারটা সে কোথায় দেখেছে? কবে? বাইরে ঝড়ের প্রচণ্ড শব্দ বাড়ি-বাড়ি কড়া নেড়ে ফিরছে। একা-একা উল্লাসে ফেটে পড়ছে ঝড়। সেই শব্দে মাঝরাতে ঘুমভাঙা তুষার চেয়ে থাকে বেভুল মানুষের মতো। বুক কাঁপে। আস্তে-আস্তে মনে পড়ে একটা বিশাল লোহার কাঠামো, তাতে ঘনায়মান অন্ধকার, উঁচু ক্রেন হ্যামার। অমনি ব্যথিয়ে ওঠে বুক। তীব্র মুক্তির ইচ্ছায় ছটফট করতে থাকে সে। তার মন বলে—চলো সমুদ্রে। চলো পাহাড়ে! চলো ছড়িয়ে পড়ি।

বুক চেপে ধরে তুষার। আস্তে-আস্তে হাঁপায়।

বাইরে খর বিদুৎ দিয়ে মেঘ স্পর্শ করে মাটিকে।

এই ঝড়ের রাতে তুষারের খুব ইচ্ছে হয়, একবার উঠে গিয়ে পাগলটাকে দেখে আসে।

কিন্তু ওঠে না। নিরাপদ ঘরে ভীরু গৃহস্থের মতো সে বসে থাকে। বাইরে ভিখিরি, পাগলদের ঘরে ঝড় ফেটে পড়ে। তাদের ঘিরে নেমে আসে অঝোর বৃষ্টির ধারা।

পরদিন আবার বুকলতলায় পাগলকে দেখা যায়। অফিস যাওয়ার আগে পানের পিক ফেলতে এসে উত্তরের ব্যালকনি থেকে তাকে দেখে তুষার। একটু বেলায় কল্যাণী আসে। দ্যাখে। অভ্যাস।

কাজের মধ্যে ডুবে থাকে সে। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে তুষার মাঝে-মাঝে অস্বস্তি বোধ করে। অফিসের পর বাদুড়ের পাখনার মতো অন্ধকার ক্লান্তি নামে চার ধারে। অনেক দূর হেঁটে যায় তুষার। ট্যাক্সিতে ওঠে, কোনওদিন ওঠে না। হেঁটে-হেঁটে চলে যায় বহু দূর। কী একটা কাজ বাকি রয়ে গেল জীবনে! করা হল না! এক রোমাঞ্চকর আনন্দময় মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল আমার। পেলাম না। অস্থিরতা বেড়ালের থাবার মতো বুক আঁচড়ায়।

মাঝে-মাঝে রাতে ঘুম ভেঙে যায় তার। উঠে বসে। সিগারেট খায়। জল পান করে। কখনও বা উত্তরের দরজা খুলে ব্যালকনিতে এসে দাঁড়ায়। মোমবাতির মতো স্থির দাঁড়িয়ে আছে সাদা বাতিস্তম্ভ, তার নীচে বকুলগাছ। তার ছায়া। অন্ধকারে একটা পুঁটলির মতো পড়ে আছে পাগল।

আবার ফিরে আসে ঘরে। বাতি জ্বালে। পাতলা নেট-এর মশারির ভিতর দিয়ে তৃষিত চোখে ঘুমন্ত কল্যাণীকে দেখে। তার বুক ঘেঁষে জড়সড়ো হয়ে শুয়ে আছে বাচ্চা সোমা। সোমার মাথার কাছে দুটো কাগজ, তাতে ছবি আঁকা। একটাতে নদী, নৌকো, গাছপালা। অন্যটাতে খোঁপাসুদ্ধু একটা মেয়ের মুখ, নীচে লেখা সোমা। অনেকক্ষণ ছবি দুটোর দিকে চেয়ে রইল তুষার। একটা শ্বাস ফেলল।

কল্যাণী শান্তভাবে ঘুমোচ্ছে। মুখে নিশ্চিন্ত কমনীয়তা। চেয়ে থাকে তুষার। আস্তে-আস্তে বলে—কী করে ঘুমোও?

—চলো, বাইরে যাই। কিছুদিন ঘুরে আসি। এক সকালে চায়ের টেবিলে কল্যাণীকে এই কথা বলল অবসন্ন তুষার।

—চলো। কোথায় যাবে?

—কোথাও। দূরে। সমুদ্রে বা পাহাড়ে।

—পুরীর সমুদ্র তো দেখেছি। দার্জিলিং শিলং-ও দেখা।

—অন্য কোথাও। অচেনা নির্জন জায়গায়। বলে তুষার। কিন্তু সে জানে মনে-মনে, ঠিক জানে—যাওয়া বৃথা। সে কতবার গেছে বাইরে, সমুদ্রে, পাহাড়ে। তার মধ্যে মুক্তি নেই, জানে। মুক্তি এখানেই আছে। আছে দুর্লভ ইচ্ছাপূরণ। খুঁজে দেখতে হবে।

তবু তারা বাইরে গেল। এক মাস ধরে তারা ঘুরল নানা জায়গায়। পাহাড়ে, সমুদ্রেও। ফিরে এল একদিন।

পাগলটা ঠিক বসে আছে। উত্তরের ব্যালকনিটার দিকে চেয়ে।

মাঝে-মাঝে কাজের মধ্যেও তুষার হঠাৎ বলে ওঠে—না নাঃ। বলেই চমকায়। কীসের না? কেন না?

ছোকরা স্টেনোগ্রাফারটিকে জরুরি ডিকটেশন দিতে-দিতে বলে ওঠে—নাঃ-নাঃ। স্টেনোগ্রাফারটি বিনীতভাবে থেমে থাকে।

তুষার চারিদিকে চায়। অদৃশ্য মশারির মতো কী একটা ঘিরে আছে চারদিকে। ওটা কী! ওটা কেন! কী আছে ওর বাইরে?

নির্জন শেক্সপিয়ার সরণি ধরে হাঁটে তুষার, হাঁটে নির্জন ময়দানে, হাঁটে ভিড়ের মধ্যে। বহু দূরে-দূরে চলে যায়। কিন্তু সেই অলীক মশারির বাইরে কিছুতেই যেতে পারে না।

ট্যাক্সিতে উঠে বলে—জোরে চালাও ভাই। আরও জোরে—আরও জোরে...

ট্যাক্সি উড়ে যায়। তবু চারদিকে অলীক সূক্ষ্ম জাল।

হতাশ হয়ে ভাবে—আছে কোথাও বাইরে যাওয়ার পথ। খুঁজে দেখতে হবে। চোখ বুজে ভাবে। উটের মতো একটা ক্রেন হ্যামার আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে, পিছনে বিশাল লোহার কাঠামো, সেইখানে একটা লোহার বিমে নুড়ি ছুড়ে শব্দ তুলছে বাচ্চা একটা ছেলে।

এক-একদিন রাতে ভাত দিতে নেমে আসে তুষার। ভাত রেখে একটু দূরে দাঁড়ায়। সিগারেট খায়।

—অরুণ, তোমার কি ইচ্ছে করে আমার ঘরে যেতে?

পাগল খায়। উত্তর দেয় না।

—ইচ্ছে করে না কল্যাণীকে একবার কাছ থেকে দেখতে?

পাগল খায়। কথা বলে না।

—জানতে চাও না সে কেমন আছে?

ফিরেও তাকায় না পাগল। খেয়ে যায়।

—একদিন তোমাকে নিয়ে যাব আমাদের ঘরে! যাবে অরুণ?

একজন প্রতিবেশী পথ চলতে-চলতে দাঁড়ায়। হঠাৎ বলে—আপনার বড় দয়া। রোজ দেখি দুবেলা পাগলটাকে আপনারা ভাত দেন। আজকাল কেউ এতটা করে না কারও জন্য! আমরা আমাদের ছেলে মেয়েদের কাছে আপনার কথা বলি।

কৌতূহলে প্রশ্ন করে তুষার—কী বলেন?

—বলি, ওইরকম মহাপ্রাণ হয়ে ওঠো। আমরা তো নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত। আমাদের দ্বারা কিছু হল না পৃথিবীর। কাছাকাছি আপনি আছেন—এটাই আমাদের বড় লাভ।

তুষার মূক হয়ে যায়। এ কেমন মিথ্যা প্রচার! দয়া! দয়া কথাটা কেমন অদ্ভুত! এমন কথা সে তো ভাবেওনি!

কিন্তু ভাবে তুষার! ভাবতে থাকে। কাজকর্মের ফাঁকে-ফাঁকে তেমনি বলে ওঠে—না নাঃ। চমকায়! জালবদ্ধ এক অস্থিরতায় অন্যমনস্ক হয়ে যায়। ঝড়বৃষ্টি হলে এখনও মাঝে-

মাঝে ক্রেন হ্যামারটা ধম করে নেমে আসে। জেগে উঠে যন্ত্রণায় বুক চেপে কাতরতার শব্দ করে সে।

এত রাতে সত্যিই তুষার কল্যাণীকে ভাত বাড়তে বলে নিঃশব্দে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল। রাস্তা পার হয়ে এল বকুল গাছটার তলায়।

—চলো অরুণ। একবার আমার ঘরে চলো। কোনও দিন তুমি যেতে চাওনি। আজ চলো। আমি নিয়ে যাচ্ছি তোমাকে। আজ তোমার নিমন্ত্রণ।

বলে হাত ধরল পাগলের। পরিষ্কার সুন্দর হাতে ধরল নোংরা হাতখানা।

কে জানে কী বুঝল পাগল, কিন্তু উঠল!

সাবধানে তার হাত ধরে রাস্তা পার করল তুষার। সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল। দাঁড়াল এসে খাবার ঘরের দরজায়।

—কল্যাণী, দ্যাখো কাকে এনেছি।

—কল্যাণীর হাত থেকে পড়ে গেল একটা চামচ। ভয়ঙ্কর ঠিনঠিন শব্দ হল। কেঁপে উঠল কল্যাণীর বুক। শরীর কাঁপতে লাগল। ভয়ে সাদা হয়ে গেল তার ঠোঁট।

—মা গো! চিৎকার করল সে।

নরম গলায় তুষার বলল—ভয় নেই, ভয় নেই কল্যাণী। তুমি খাবার সাজিয়ে দাও। অরুণ আজ আমার অতিথি।

নীরবে দাঁড়িয়ে রইল কল্যাণী। জলে তার চোখ ভরে গেল। তুষারের হাতে-ধরা পাগল নতমুখে দাঁড়িয়ে রইল।

এত কাছ থেকে অরুণকে অনেকদিন দেখেনি কল্যাণী। কী বিপুল দারিদ্র্যের চেহারা। খালাসিদের যে নীল জামাটা ওর গায়ে তা বিবর্ণ হয়ে ছিঁড়ে ফালা-ফালা। খাকি প্যান্টের রং পালটে ধূসর হয়ে এসেছে। কী পিঙ্গল ওর ভয়ঙ্কর রাঙা চুল। পৃথিবীর সব ধুলো আর নোংরা ওর গায়ে লেগে আছে। কেবল তখনও অকৃপণ, সুন্দর, সুগন্ধ বকুল ফুলে ছেয়ে আছে ওর মাথায় জটায় ঘাড়ে।

কাঁপা হাতে খাবার সাজিয়ে দিল কল্যাণী। তার চোখ দিয়ে অবিরল জল গড়িয়ে পড়ছে। পাগল তার দিকে তাকালই না। চোখ নীচু রেখে খেয়ে যেতে লাগল।

মাঝে-মাঝে বিড়বিড় করে তুষার বলছিল—খাও অরুণ, খাও।

খাওয়া শেষ হলে তাকে আবার হাত ধরে তুলল তুষার। নিয়ে এল ঘরে।

—এই দ্যাখো আমার ঘরদোর। ওই যে মশারির নীচে শুয়ে আছে, ও আমার মেয়ে সোমা। এই দ্যাখো, ওর হাতে আঁকা ছবি। এই দ্যাখো ওয়ার্ডরোব, ফ্রিজিডেয়ার। ওই ড্রেসিং টেবিল। এই দ্যাখো, আরও কত কী—

ঘুরে-ঘুরে অরুণকে সব দেখায় তুষার।

মাঝে-মাঝে প্রশ্ন করে—এখানে এই সুন্দর ঘরে থাকতে ইচ্ছে করে না অরুণ? ইচ্ছে করে না এই সব জিনিসপত্রের মালিক হতে? তুমি আর চাও না কল্যাণীর মতো সুন্দর বউ? সোমার মতো মেয়ে।

অরুণের হাতে জোর ঝাঁকুনি দেয় তুষার—বলো অরুণ, ইচ্ছে করে না!

—অন্ধকার! ভীষণ অন্ধকার! পাগল বলে।

—কোথায়—কোথায় অন্ধকার?

—এইখানে।

বলে চারদিকে চায় পাগল।

—আর কোথায়?

—চারদিকে।

—থাকবে না অরুণ। থাকো থাকো। থেকে দ্যাখো।

পাগল কিছু বলে না।

হতাশ হয়ে তার হাত ছেড়ে দেয় তুষার!

পাগলটা আস্তে-আস্তে সদর পার হয়। সিঁড়ি ভাঙে। রাস্তা পেরিয়ে চলে যায় বকুল গাছটার তলায়। পা ছড়িয়ে বসে। গুঁড়িতে হেলান দেয়। কুলকুল করে বয়ে চলে তার অন্যলগ্ন চিন্তার স্রোতস্বিনী। চোখ বুজে অনাবিল আনন্দে সে সেই স্রোত প্রত্যক্ষ করে।

উত্তরের ব্যালকনিতে এসে দাঁড়াল তুষার। চেয়ে দেখে নিশ্চিন্তে বুকুল গাছের ছায়ায় আবার বসেছে পাগল। টুপটাপ বকুল ঝরছে তার মাথায়।

উত্তরের ব্যালকনি থেকে দৃশ্যটা দেখে তুষার। তার দুই চোখ ভরে আসে জলে।

—কিছুই চাও না অরুণ? বকুল গাছের তলায় তোমার হৃদয় জুড়িয়ে গেছে। হায় পাগল, ভালোবাসা নয়, এখন কেবল ভাতের জন্য তোমার বসে থাকা।

এখন আর কল্যাণীর কোনও সন্দেহ নেই। সে কাছ থেকে অরুণকে দেখেছে। সে কেঁপেছিল থরথর করে। দুঃখে ভয়ে উৎকণ্ঠায়। কিন্তু অরুণের মুখে সে দেখেছে বিস্মৃতি। তাকে আর মনে নেই অরুণের।

বড় শীত পড়েছে এবার। বকুল গাছ থেকে শুকনো পাতা খসে পড়ছে পাগলের গায়ে? ছোঁড়া জামা দিয়ে হু-হু করে উত্তরের হাওয়া লাগছে শরীরে। বড় দয়া হয়। মঙ্গলার হাত দিয়ে একটা পুরোনো কম্বল পাঠিয়ে দেয় কল্যাণী! পাগল সেই কম্বল মুড়ি দিয়ে নির্বিকার বসে থাকে।

মাঝে-মাঝে কল্যাণীরও বুক ব্যথিয়ে ওঠে। ভালোবাসার কথা মনে পড়ে। তুষার কি তাকে ভালবাসে এখনও! কে জানে? মাঝে-মাঝে উগ্র হিংসায় তাকে মন্থন করে তুষার। কখনও দিনের পরদিন থাকে নিঃস্পৃহ। আর ওই যে ভালোবাসার জন্য পাগল অরুণ—ও বসে আছে ভাতের প্রত্যাশায়। কল্যাণীকে চেনেও না।

তাহলে কী করে বাঁচবে কল্যাণী। বুক খামচে ধরে এক ভয়।

আবার, বেঁচেও থাকে কল্যাণী। বাঁচতে হয় বলে।

মাথার ওপর সব সময়ে উদ্যত নিস্তব্ধ ক্রেন হ্যামারটাকে টের পায় তুষার। অস্বস্তি! কখন যে ধম করে নেমে আসে। অকারণে বুক কাঁপে। ব্যথায় ককিয়ে উঠে তুষার।

ঠিক সকাল ন'টায় পিক ফেলতে এসে উত্তরের ব্যালকনি থেকে বকুল গাছটার গোড়ায় পাগলকে দেখে। দুজনে দুজনের দিকে চেয়ে থাকে।

কোম্পানি এবার উনিশ লক্ষ টাকা লাভ করেছে! ক্লান্তি বাড়ে। দিন শেষে তার শরীর জুড়ে নেমে আসে বাদুড়ের ডানার মতো অন্ধকার ক্লান্তি। তার ডালপালা ধরে কেবলই নাড়া দেয় এক তীব্র ইচ্ছা। নাড়া দেয়, নাড়া দিতে থাকে। অলীক ছুটি, মিথ্যা অবসর, অবিশ্বাস্য মুক্তির জন্য খামোকা আকুল হয় সে। পৃথিবী ঘুরে যাচ্ছে। বয়ে যাচ্ছে সময়। বয়স বাড়ছে।

তুষার অস্থির হয়। অস্থিরতা নিয়ে বেঁচে থাকে।

ঠিক যেন এক নদীর পাড়ে বসে আছে পাগল। কী সুন্দর আবছায়া নদীটি। চারদিকে আধো আলো আধো অন্ধকার। অনন্ত সন্ধ্যা। নদীটি বয়ে যায় অবিরল। স্মৃতি বিস্মৃতিময় তার স্রোত। পাগল প্রত্যক্ষ করে। ক্লান্তি আসে না। বকুলের গাছ থেকে পাতা খসে পড়ে, কখনও ফুল, বৃষ্টি আসে, ঝড় বয়ে যায়, আবার দেখা দেয় রোদ। তবু আবছায়ায় নদীটি বয়ে যায়। বয়ে যায়।

পাগল বসে থাকে।
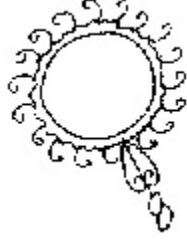
হলুদ আলোটি

অদ্ভুত এক আলোর ভিতরে ঘুম ভাঙে মনোরমার। রোজকার আলো নয়। পাকা যজ্ঞিডুমুর ভাঙলে যেমন রং তেমন এক আলো। মনোরমার পায়ের দিককার জানালার ধারে ডুমুর ফল রোজ এসে ঠোঁটে ভাঙে বুলবুলি। সেই রংটাই এখন পৃথিবীময় ছড়িয়ে গেছে এই বৈশাখের বিকেলে।

শানুর থুতনিতে ঘাম, নাকের নীচে ঘাম, বুকে গলায় মুক্তোফল ফুটে আছে ঘামের। বড্ড ঘামে মেয়েটা। কোমরের জাঙিয়ার ইলাস্টিক আঁট হয়ে কোমরে বসেছে। ঘুমের আগে বাতাসা খেয়েছিল, বিছানায় সেই বাতাসার গুঁড়ো, আর লাল পিঁপড়ে। কামড়েছে সারাক্ষণ, তবু নিপাট ঘুমোচ্ছে মেয়েটা। মনোরমা শানুর জাঙিয়া খুলে দেয়, বিছানাটা হাত দিয়ে ঝাড়ে, তারপর হঠাৎ নিঃঝুম হয়ে আলোর দিকে চেয়ে থাকে। এ কি পৃথিবী? এ কি পৃথিবী নয়?

পৃথিবীর কি-ই বা সে জানে। একটা শ্বাস ফেলে। কিছু না। তবু মনে হয় তার ঘুম ভেঙেছে এক স্বপ্নের ভিতরে। মাঝে-মাঝে গাছপালা, মাটি, আকাশ পালটে যায়। যজ্ঞিডুমুরের গাছে একটা বুলবুলি ডুমুর ভাঙছে। পাখির গায়ের রোঁয়া উলটে যাচ্ছে হাওয়ায়! মনোরমা ঝুঁকে দেখল, আকাশে ঝড়ের মেঘ। গুমোট ভেঙে দমকা হাওয়ায় ধুলোবালি আর পুকুরের আঁশটে গন্ধ উড়ে এল।

জানালার জালের নীচে একটুখানি ফোকর দিয়ে সাবধানে হাত বাড়িয়ে মনোরমা জানালা বন্ধ করে। উঠে বাইরে আসে। হাওয়ায় তারের ওপর শুকোতে দেওয়া শাড়ি ঝুলে উঠোনে লুটোচ্ছে, শানুর ফ্রক উড়ে গেছে বাগানে, কয়লার স্তূপের ওপর পড়ে আছে ব্লাউজ। সেগুলো কুড়িয়ে নেয় মনোরমা, আর তখনও তার নিবিড় এলোচুলে ঝড়ের বাতাস এসে লাগে, ছুটে আসে বৃষ্টির গন্ধ, তামাটে মেঘে থেকে অদ্ভুত আলোটি ধীরে-ধীরে বহুদূর

পর্যন্ত রঙিন করে দিচ্ছে। এই হচ্ছে ঝড়ের রং। এখুনি রেলগাড়ির মতো ঝড় এসে যাবে। তবু দু-দণ্ড মনোরমা দাঁড়ায়। কত অচেনা জায়গা ছুঁয়ে আসে ঝড়, কেমন পুরুষ স্পর্শ তার। মনোরমা দু-দণ্ড দাঁড়ায়, তার কপালের ওপর বড় একটা বৃষ্টির ফোঁটা এসে পাখির ডিমের মতো চড়াৎ করে ফাটে। অমনি দৌড়ে ঘরে আসে মনোরমা, মনে পড়ে—ওই যাঃ অনুপমার ঘরের জানলা তো সে বন্ধ করেনি! কত ধুলো ঢুকে গেছে। দিদি চেঁচাবে ঠিক।

অনুপমার ঘুম ভেঙেছে অনেকক্ষণ, সমস্ত বিছানাময় বালি কিরকির করছে, দাঁতে ধুলো, চুলে ধুলো। বিছানার চাদর উলটে গেছে হাওয়ায়। জানালার পাল্লাগুলো মড়মড় করছে, একটা পাল্লা ব্যাং খুলে ঠাস করে শব্দ করল। খড়কুটো উড়ে পড়েছিল কিছু, ভেন্টিলেটারে পাখির বাসা দমকা হাওয়ায় খসে পড়ল বিছানায়! চমকে উঠে মনোরমার নাম ধরে চেঁচাতে যাচ্ছিল সে, ঠিক সে সময়ে বাইরের রংটা চোখে পড়ল। শালিকের পায়ের মতো হলুদ এ কেমন রং? হলুদ রংটাই কেমন শিরশিরানি তুলে দেয় শরীরে। মনে পড়ে হুলুধ্বনি, শাঁখের আওয়াজ, মাঘের দুপুরে উঠোনে পিঁড়ির উপর দাড়িয়ে শীতল জলে সেই রোমাঞ্চকর স্নান। হলুদ সেই রংটা কে ঢেলে দিয়েছে চারধারে এখন! পাখির বাসাটা আপনিই গড়িয়ে পড়ে গেল মেঝেয়। আজকাল বড্ড মনে পড়ে। বাতাস বয় উলটোবাগে, ঠিক সেইসব পুরোনো কথা ধুলো বালির মতো উড়িয়ে আনে, ঘরময় ছড়িয়ে দিয়ে যায়! সে এক বাতাস অনুপমার বুকের ভিতরে দমকা মেরে ঘোরে, ঝড় ওঠে। আজকাল বড্ড মনে পড়ে।

পাশ ফিরতে অনুপমা কুসি ছানাটাকে দেখতে পেল। আহা রে, কতটুকু চড়াইয়ের ছানা একটা, মুখে বোল ফোটেনি তবু বারবার হাঁ করছে। সদ্য জন্মেছে বলে গায়ের পাতলা চামড়ায় এখনও রোঁয়া ওঠেনি, রাঙা শরীর কাত করে পড়ে আছে বিছানায়, অনুপমার পায়ের পাতার পাশেই। আর একটু হলে চাপা পড়ত।

অনুপমার উঠে বসতে বড্ড কষ্ট হয়। বুক ধড়ফড় করে। পাখির ছানাটার দিকে হাত বাড়ায় ঠিকই, ধরতে সাহস হয় না। কতটুকু ওর শরীর। ডিমসুতোর গুলির মতো একটুখানি। এমন পলকা জীব ধরতে ভয় করে। যদি হাতের চাপে মারা যায়!

বৈশাখী ঝড়ের একটা ঝাপটা এসে লাগে বড় নারকেল গাছে। ডগাশুদ্ধ বিশাল একটা শুকনো নারকেল পাতা টিনের চালের ওপর হুড়মুড় করে খসে পড়ে। অনুপমা আজকাল আর চমকায় না।

চড়াইয়ের ছানাটা হাঁ করে আছে। তেষ্টা পেয়েছে নাকি? তোর মা মুখপুড়ি কোথায় রে? আহা কাঁপছে দ্যাখো থিরথির করে। অনুপমা সাবধানে হাত বাড়িয়ে চড়াই ছানাটাকে তুলে

নেয়!

সরু কাঠির মতো দু-খানা পা, ছুঁচের মতো সরু নখ তাই দিয়ে ছানাটা অনুপমার একটা আঙুল আঁকড়ে ধরল। শিউরে উঠে বে-খেয়ালে হাত ঝেড়ে ছানাটাকে ফেলে দিল অনুপমা, চেঁচিয়ে ডাকল—মনো, শিগগির আয়।

কেউ শুনল না, শুকনো পাতা উড়ছে, বৃষ্টির ফোঁটা ফাটছে চড়বড় করে টিনের চালে—তার শব্দে অনুপমার গলা ডুবে গেল। জানলার জালের নীচে ছোট্ট ফোকর, সেই ফোকরটা দিয়ে পাখির ছানাটা গলে বাইরে গিয়ে পড়েছে। বাইরে ঝড়।

অনুপমা ঝড়ের বাতাস উপেক্ষা করে বিছানায় কষ্টে হাঁটু গেড়ে বসে জানলা দিয়ে বাইরেটা দেখছিল। জানালার ধারে নর্দমা, নর্দমার পাশে-পাশে ডুমুরের গাছ কচুর ঝোপ, ভাঙের জঙ্গল। কোথায় গিয়ে পাখিটা পড়ল!

বাইরে সেই অদ্ভুত আলোটি, হলুদ। পাখিটা খুঁজতে-খুঁজতে অনুপমা অন্যমনস্ক হয়ে গেল। আলোটা তার গায়ে কেমন আভা ছড়িয়েছে! ইচ্ছে করল এই আলোতে হাত-আয়নায় একবার নিজের মুখটা দেখে।

অনুপমার ঘরের জানালাগুলো বন্ধ করেছে মনোরমা। এখন বিছানাটা ঝাড়ছিল।

অনুপমা নিস্তেজ গলায় জিগ্যেস করে—শানু উঠেছে?

—না! ঠান্ডা বাতাস পেয়ে ঘুমোচ্ছে। আরও একটু ঘুমোবে আজ।

অনুপমার একবার বলতে ইচ্ছে হল—শানু উঠলে ওকে সবজির ঝোলটা খাওয়াস মনে করে। তারপর ভাবল, মনোই তো খাওয়ায়, ঘুম পাড়ায়, সব করে। বলার দরকার কী? গত দু-মাস ধরে মনোই তো সব করছে! শানু অনুপমার কাছে বড় একটা আসে না আজকাল।

—একটা পাখির বাসা বিছানায় পড়েছিল, একটা চড়াইছানা শুদ্ধ। চড়াইছানাটাকে ধরতে গিয়ে বাইরে ফেলে দিয়েছি। বৃষ্টিটা থামলে একটু ঘরের পেছনে গিয়ে দেখিস তো?

—ফেলে দিলে? কাকগুলো ঠুকরে কিছু রাখবে নাকি? নইলে বেড়াল মুখে করে নিয়ে যাবে।

—ধরতে গিয়েছিলাম, আঙুলটা সরু পায়ে আঁকড়ে ধরল এমন! মাগো বলে চমকে হাত ঝাড়লাম, ছিটকে বাইরে পড়ে গেল। বাঁচবে না ঠিকই, তবু দেখিস তো একটু। কুসি ছানাটা, মা-পাখিটা রাতে এসে কাঁদবে হয়তো।

মনোরমা বলে—এ পাশটা বৃষ্টির ছাঁটে একটু ভিজে গেছে দিদি।

—ভিজুকগে। বড় বিছানা, আমি তো একটা পাশে পড়ে থাকি।

—ঠান্ডা বাতাস দিচ্ছে, তুমি একটা কিছু গায়ে দিয়ে শোও। একটা কাঁথা বের করে দেব?

—থাকগে, একটু জুড়োই কিছুক্ষণ। পিঠটা ঘামাচিতে ভরে গেছে। চা করবি নাকি? করলে একটু দিস।

—এক্ষুনি করব? চা খাওয়ার একজন লোক তো বিকেলে আসেই, সে এলে একেবারে করতাম।

—তোটন কি আজ আসবে? যা বৃষ্টি!

পালকের ঝাড়নে খাটের বাজুর মিহি ধুলো ঝাড়তে-ঝাড়তে মনোরমা মুখ লুকিয়ে হাসে। আসবে না আবার! না এসে পারে নাকি?

—তোর জামাইবাবুর ছবিটা মুছিস। মালাটা শুকিয়ে গেছে, ফেলে দিস।

ছবিটার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মনোরমার বুকটা কেমন করে। অভিরামদা তেমন সুন্দর ছিল না। মোটাসোটার ওপরে চেহারা, প্রকাণ্ড গোঁফ ছিল, মুখখানা সাধারণ। কিন্তু এসবে কিছু যায় আসে না। পৃথিবীতে কোটি-কোটি পুরুষ আছে, তবু তার মধ্যে ওই একজনই ছিল অনুপমার মানুষ। আলাদা মানুষ, একার মানুষ, নিজের মানুষ। মাসদুই আগে অভিরামদা মারা গেছে, অনুপমা তারপর থেকে আজও বিছানা ছাড়েনি। সেই কালিকাপুর থেকে মনোরমা এসে আছে টানা দু-মাস। শানুকে রাখে, অনুপমার দেখাশুনা করে। অভিরামদা বাড়িটা করে না গেলে দিদি আজ অবশ্যই কালিকাপুরে বাপের বাড়ির গলগ্রহ হয়ে থাকত। অল্পবয়সেই বাড়ি করেছিল অভিরামদা। তোটন পারবে কি? ছাই পারবে। এখনও চাকরিই পেল না।

বৃষ্টির সাদা চিক-এ ঢেকে গেল কয়েকজন ফুটবল খেলোয়াড়। মাঠে দুধের মতো সাদা-সাদা ফেনা তুলছে বৃষ্টি। বাতাসে বলটা ঘুরে যায় এদিক-সেদিক, জলের মধ্যে থপ করে পড়ে আটকে যায়, আবছা হয়ে গেল মাঠ। খেলোয়াড়রা দৌড়ে মাঠ ছেড়ে চলে আসতে থাকে। সবার আগে তোটন, তার বুকে ধরা বল।

চারধারেই পুকুর, মাঠ, ঘাট, আর শহরতলির নতুন না-হওয়া বাড়ির ভিত। তারা কেউ একসঙ্গে ছোটে না। দু-চারজন একটা বাড়ির নীচের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ায়। বাদবাকি সবাই শিবাজীর চায়ের দোকানে।

দাঁড়ায় না একমাত্র তোটন, বুকের বলটা শিবাজীর চায়ের দোকানের ভিতরে ভিড়ের মধ্যে ছুঁড়ে দিয়ে বলে—সন্ধের পর দেখা হবে গণেশ।

গণেশ পিছন থেকে চেঁচায়—কোথায় যাচ্ছিস?

তোটন জবাব দেয় না। তার চারধারে ঝড় আর ঝড়। এক পাল পাগল হরিণের মতো বৃষ্টি ছুটছে। জলপ্রপাতের মতো পড়ছে। তার ভিতরে দেখা যায়, মজা পুকুরের কচুরিপানার পাতাগুলো উলটে দিচ্ছে বাতাস। তার পায়ে বুট, গায়ে কলারওয়ালা সাদা গেঞ্জি, পরনে খাটো প্যান্ট। ঝড়ের প্রতিদ্বন্দ্বীর মতো নিজেকে বোধ করে সে। কোথায় যাবে? কোথাও না, তোটন দৌড়োবে একা, অনেক দূর।

নীল আগুন ঝলসে ওঠে অকাশে। গুড়গুড় করে মাটি কাঁপে। তোটন হা-হা করে হাসে। বাতাসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দৌড়োয়।

আজ স্টেট ব্যাঙ্ক থেকে একটা রিগ্রেট লেটার এসেছে। চাকরিটা তার হল না। না হোক। তোটন এখন যে ঘাসপাতা, যে মাটির ওপর দিয়ে দৌড়োচ্ছে, চারধারে যে বৃষ্টির ঝরোকা, উদ্ভিদের স্বেদগন্ধ, যে শব্দ ও স্পর্শ—এসবের মধ্যে ঠিকই থেকে যাবে তোটন। থাকবে আনন্দ। সে কখনও কাউকে কষ্ট দেবে না। কী ভালো এই ঝড় এবং একাকী সে! অনেকক্ষণ দৌড়োবে তোটন! একা একা।

সন্ধেবেলায় বীণা তার দোতলার অন্ধকার বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকে রোজ। মোটা কালো বীণার স্বামী আশু পোদ্দার পয়সা করেছে। দু-দুটো দোকান। কিন্তু এক দুঃখ, তাদের ছেলেপুলে নেই। স্বামীর তেমন টান নেই বীণার দিকে। রাত করে ফেরে, কাকভোরে আবার বেরোয়। সারাদিন বীণা একা। প্রেতচক্ষু মেলে সে দোতলা থেকে নীচের লোকালয়টির দিকে লক্ষ রাখে। পাড়ার সব কুমারীর খবর রাখে সে, সব বউয়ের। কোন কুমারীর পেটে ভ্রূণ এল, কোন বউকে স্বামী নেয় না, কে পরপুরুষের সঙ্গ করে, কার বা আছে বাঁধা মেয়েছেলে—কাকের মতো এইসব নোংরা খোঁটে সে, তারপর এ-বাড়ি ও-বাড়ি ছড়ায়।

সন্ধের পর নীচের রাস্তা দিয়ে তোটন যায়। টেরিলিনের প্যান্ট-শার্ট, চুল আঁচড়ানো, ঠোঁটে সিগারেট।

বীণা অন্ধকারে হেসে নেয়। তারপর গলা বাড়িয়ে ডাকে—তোটন।

তোটন মুখ তুলে বলে—কী বউদি?

—কোথায় যাচ্ছ?

—অভিরামদার বাড়ি।

—রোজ যাও?

—যাই! দেখাশোনা করি, আমরা আত্মীয়রা কাছাকাছি আছি, আমরা না দেখলে কে দেখবে?

বীণা হাসে—আত্মীয় আবার কী? তুমি তো অভিরামবাবুর পিসতুতো ভাইয়ের শালা, ওকে আত্মীয়তা বলে নাকি?

তোটন সিগারেটটা এতক্ষণ লুকিয়ে রেখেছিল পিছনে। হঠাৎ মেয়েমানুষটার প্রতি একটা ঘেন্না বোধ করে সিগারেটটা বের করে একটা টান দিয়ে বলল—যা ভাবেন।

—ভাবাভাবির কী আছে ভাই? যার যেখানে ভালো লাগবে যাবে।

—তাই তো যাচ্ছি।

বীণা একটা শ্বাস ফেলে। তোটন চলে গেলে আবার প্রেতচক্ষু মেলে চেয়ে থাকে। তার চোখে ঝড়ের আগের হলুদ আলোটি কখনও বিস্ময় সৃষ্টি করেনি। সে অনুভব করেনি বৃষ্টির সৌন্দর্য। নীচের লোকালয়টির মানুষগুলির পচনশীল শরীরের মাংস কৃমির কথা সে শুধু ভাবে। তার ভারী আনন্দ হয়।

শানু ঘুম থেকে উঠে ডাকে—মাসি।

—যাই! রান্নাঘর থেকে সাড়া দেয় মনোরমা।

—আমাকে মশা কামড়াচ্ছে। চুলকে দাও।

কেটলির জল ফুটে গেল, তোটন এখনও এল না। আবার বাবুর জন্য জল চড়াতে হবে না কি? ভারী বিরক্ত বোধ করে মনোরমা।

রান্নাঘরে হাতজোড়া বলে মনোরমার উঠতে দেরি হচ্ছিল। অনুপমা ও-ঘর থেকে ডাকল—শানু, মাসি কাজ করছে, আমার কাছে আয়, গা চুলকে দেব।

পরিষ্কার রাগের গলায় শানু বলল—না, মাসি দেবে।

বোধহয় অভিমানে অনেকক্ষণ চুপ করে রইল অনুপমা, তারপর হতাশ গলায় বলল—মনো, শানু আমার পর হয়ে যাচ্ছে।

কেটলিটা নামিয়ে ও-বেলার তরকারি গরম করতে বসিয়ে মনোরমা বলল—কী যা তা বলো, মাসি কি কখনও মা হয়!

অনুপমা ও-ঘর থেকে গুনগুন করে বলে—তোর ওপর আমার হিংসে নেই রে মনো, শানু বরাবরই আমার পর ছিল। বাপ বেঁচে থাকতে বাপকেই চিনত, মার কাছে ঘেঁষত না।

শানুকে কলতলায় নিয়ে গেল মনোরমা। মুখ-চোখ ধুইয়ে যখন জামা পরাচ্ছে তখন এল তোটন।

—চা হয়ে গেছে নাকি! বলে গোটা দুই হাঁচি দিল পরপর।

অনুপমা বিছানায় উঠে বসল, বলল—তোটন, আজ একটা চড়াইয়ের বাচ্চা আমার হাতে মরল। মনো, তোটনকে নিয়ে একবার যা না, কুসি বাচ্চাটা, একটু খুঁজে আন।

—এনে কী হবে? ঝঙ্কার দেয় মনোরমা!

—একটু মাটি চাপা দিয়ে রাখ উঠোনে! অন্ধকার হয়ে গেছে, টর্চটা নিয়ে যা।

—যাচ্ছি বাবা, একটু রোসো। মেয়েকে খাওয়াই, তরকারিগুলো গরম করে দিই, তোমার যে কী সব বাতিক!

—বাতিক না রে, আমার হাতেই মরল তো! কষ্ট হয়। কাকে বেড়ালে ছিঁড়ে খাবে, একটু মাটি চাপা দে। হরিনাম করে দিস, ওতে গতি হয়।

খুক করে একটু হাসল তোটন, বলল—চড়াইয়েরও গতি আছে নাকি! অল্পবয়সেই আপনি বড্ড বুড়ো হয়ে গেলেন বউদি!

—হলাম। বলে পাশ ফেরে অনুপমা।

মেঘ কেটে আকাশ এখন বড় পরিষ্কার। ঝলমলে নক্ষত্র আকাশময়। চাঁদও উঠবে একটু পরে। বাতাস ঠান্ডা, ভেজা। বাইরের ফিকে অন্ধকারের দিকে অভিমানভরে চেয়ে শুয়ে আছে অনুপমা। শিশুর মতো শোওয়ার ভঙ্গি।

সেদিকে চেয়ে বড় কষ্ট হল মনোরমার। ভগবান ওর সব কেড়ে নিলেন। বর্ষার পর গাছে যেমন পাতা আসে তেমনি ওর সুখ সদ্য ফুটতে শুরু করছিল। তখনই—

তোটন চায়ে চুমুক দিয়ে বলল—সর্দি লেগে গেল।

মুখ ফিরিয়ে গিন্নির মতো মনোরমা বলে—বৃষ্টিতে ভেজা কেন?

তোটন বলল—এমনিই। নতুন বর্ষা, প্রথম ঝড় দেখে ভাবলাম, একটু ঝড় খাই। ঠান্ডা লেগে গেল, ফ্যারিংসের দোষও আছে। জ্বর না এসে যায়!

শরীর যতটা খারাপ তার চেয়ে বেশি ভান করা হচ্ছে। মনোরমা বোঝে। পুরুষদের কায়দা-কৌশল সবই পুরোনো এবং বোকার মতো, সেই কারণেই ভালো লাগে মনোরমার।

শানু ডাকে—মাসি!

—উমম!

শানু রাগের গলায় বলে—আমাকে আবার মশা কামড়াচ্ছে।

—এ ঘরে এসো।

—না। তুমি আমার কাছে এসো।

অনুপমার ঘর থেকে ওই ঘরে চলে যাওয়ার এই একমাত্র অজুহাত এবং সুযোগ। মনোরমা শানুর কাছে উঠে গেল। শানু বিছানায় ছবির বই খুলে বসেছে, কোলে পুতুল। পুতুলকে ফ্রক দিয়ে ঢেকে ঘুম পাড়াচ্ছে। ওর পাশে বসে পিঠে হাত বোলাতে-বোলাতে উৎকর্ণ হয়ে থাকে মনোরমা। তোটন আসবে। অনুপমার সঙ্গে দু-একটা কথা বলে ঠিক উঠে আসবে। রোজই আসে।

তোটন বলল—যাই।

—এসো।

তোটন ও-ঘরে গেল। অনুপমা চিৎ হয়ে শুয়ে ওপরের দিকে চেয়ে দেখছিল। মা-পাখিটা ফিরে এসেছে। ভিজেছে খুব, থরথর করে কাঁপছে। ভেন্টিলেটর থেকে বাসাটা বাচ্চাসুদ্ধ খসে গেছে। শূন্য জায়গাটায় বসে পাখিটা ডাকছে। ভাষাটা বোঝা যায় না। কিন্তু অনুপমা বুঝতে পারে। বুঝতে কষ্ট হয় না।

তোটন আর মনোরমা পাখির বাচ্চাটাকে খুঁজতে গেল না। ভুলে গেছে। ও-ঘরে বসে কথা বলছে দুজন। হাসছে। অনুপমা এখন আর হাসে না! হাসবে না বহুদিন। পৃথিবীর হলুদ রংটা মুছে গেছে। বাতাস এখন উলটোবাগে বয়, যত রাজ্যের পুরোনো কথার ধুলোবালি ছড়িয়ে যায় ঘরময়। বড্ড মনে পড়ে আজকাল।

ভেজা চড়াইটা ডানা ঝাপটাচ্ছে। ডাকল 'চিড়িক' করে। অনুপমা চেয়ে থাকে। হ্যারিকেনের ম্লান আলোয় ভালো দেখা যায় না। অনুভব করা যায়। পাখিটা কাঁপছে। ডানা ঝাপটাচ্ছে।

ঝড়ের রংটা নিঃশেষে মুছে গেছে। রং মুছে গেলেই পৃথিবীটা কেমন গভীর হয়ে যায়।

সাপ

বাপ্পা তার বাবার সঙ্গে এই বাগানে এল। সে, তার বাবা আর রেনি।

শরৎকাল এখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। বাগানের ফুল, ঘাসের রং আর রোদের তাপ থেকে তার আন্দাজ পাওয়া যায়। যে ঘাসগুলো বর্ষার জলে ঘন সবুজ হয়ে উঠেছিল তা এখন নিষ্প্রভ। এই রোদ, ঘাস আর ফুলের রং—সব কিছুই যেন স্তিমিত, নিঃশেষপ্রায়। আর এখন না-দুপুর না-বিকেলের সময়টাতে সব কিছুই খুব নিস্তব্ধ। এই শব্দহীনতা যেন সরু সুতোয় ঝোলানো কোনও ভারী জিনিসের মতো দুলছিল। যেন একটু নাড়া পেলেই সুতো ছিঁড়বে, হরিণের মতো ত্রস্ত পায়ে নিঃশব্দ সময়টা পালাবে।

বাপ্পা জানে যে ইচ্ছে করলেই এই নিঃশব্দতাকে সে ছিঁড়ে দিতে পারে না। একেবারেই যে শব্দ নেই তা নয়। বাগানের নিস্প্রভ চারাগাছগুলোর দীর্ঘ ছায়া পড়েছে ঘাসে। সেই আলোছায়ায় কয়েকটা মৌমাছি উড়ছিল। তাদের উড়বার শব্দ ঘড়ির শব্দের মতো একটানা, একঘেয়ে। সেই শব্দটাকে শব্দ বলে মনে হচ্ছিল না বাপ্পার।

এখন এই বাগানে লাল কাঁকরের রাস্তার ওপর বাবার হাত ধরে বেড়াতে তার বিশ্রী লাগছিল। রোজই লাগে। কেমন নিস্তেজ অবসন্ন বিকেল। যাই-যাই ভাব। এক্ষুনি আলোটুকু যাবে। অন্ধকার হয়ে আসবে একটু পরেই।

হাঁটতে-হাঁটতে বাপ্পা পাথের পাশে সাজানো ত্রিভুজের মতো উঁচু হয়ে থাকা ইটগুলোকে দেখছিল। এক দুই করে গুনে যাচ্ছিল ইটগুলোকে। রেনি মাটি শুঁকতে-শুঁকতে এগিয়ে যাচ্ছিল। গেটের কাছে রেনি একবার থমকে দাঁড়াল। ফিরে তাকাল। এমনিভাবে ফিরে তাকালে রেনীর লম্বা সরু শরীরটা ধনুকের মতো সুন্দর একটা বাঁক নেয়। চাবুকের মতো সরু লেজটা আছড়ে পড়ছে পিঠের ওপর।

এবার একটা কিছু বলতে পেরে বাপ্পা বেঁচে গেল। বলল, 'বাবা ওই দ্যাখো!'

—কী! বাবার গলাটা খুব গম্ভীর।

আঙুল উঁচু করে রেনিকে দেখিয়ে বলল বাপ্পা, 'ওই দ্যাখো রেনি পালাচ্ছে।'

বাবার ভ্রূ দুটো জোড়া লাগল। 'কোথায় পালাচ্ছে! ও তো গেটের ভিতরেই রয়েছে।'

—ও পালাবার পথ খুঁজছে। আর পালিয়ে গিয়ে ও যা-তা খেয়ে আসে। বাড়িতে এসে বমি করে।

সে ভেবেছিল এবার বাবা তার হাতটা ছেড়ে দিয়ে রেনিকে গিয়ে ধরবে। বকলশটা ধরে টানতে-টানতে বাবুর্চিখানার খালি ঘরটাতে নিয়ে বেঁধে রাখবে রেনিকে। সেই ফাঁকে বাপ্পা এক ছুটে গেটটা খুলে বেরিয়ে যাবে, দুই লাফে রাস্তা পার হয়ে ওপাশে শেখ-এর বাড়িতে পৌঁছে যাবে। সমশের হয় এখন মাটি কোপাচ্ছে নয়তো মুরগিকে দানা দিচ্ছে। যে অবস্থাতেই থাক, তার ঘাড়টা ধরে কাছে টেনে এনে বলবে, 'রাত্রিতে আমার পড়ার ঘরে আসিস। দুজনে লুডো খেলব।'

কিন্তু বাবা কিছুই বলল না। তার বাঁ-হাতটা যেভাবে বাবার প্রকাণ্ড মুঠোটার মধ্যে ধরা ছিল সে ভাবেই রইল। তেমনিভাবেই আস্তে-আস্তে সে তার বাবার পাশে-পাশে হাঁটতে লাগল। বাবার পায়ের রবারের চটির কোনও শব্দ হচ্ছে না।

হাঁটতে-হাঁটতে তারা গেটের কাছে আসে। আবার ফিরে যেতে থাকে বারান্দার সিঁড়িটার কাছে। বাপ্পার পায়ের রবারের 'সোল'ওয়ালা শু্য'টার কোনও শব্দ নেই।

কেমন যেন হাঁফ ধরল বাপ্পার। বলতে ইচ্ছে করল, 'বাবা আমি আর পারছি না।' বাবার মুঠোয় ধরা তার হাতটা ঘামছে। ঘামতে-ঘামতে কব্জিটা যেন গলে যাচ্ছে তার।

রোজই তাকে তার বাবার সঙ্গে এই বাগানে আসতে হয়। এমন দিন খুব কমই গেছে যেদিন সে বাবার সঙ্গে এই বাগানে আসেনি। বারান্দা পেরিয়ে চারটে সিঁড়ি ভেঙে লাল কাঁকরের পথ। পুরানো, চেনা পথ, চেনা বাগান, মরা-মরা গাছ, ঘাস। জানলা দিয়ে তাকিয়ে-তাকিয়ে এই দৃশ্যকে সে সারাদিন দেখে। বিকেলেও আবার এখানেই আসতে হয়। কখনও-কখনও গেট পেরিয়ে রাস্তা পেরিয়ে প্রকাণ্ড উদোম মাঠটার মধ্যে বাবার সঙ্গে গিয়েছে সে। সেই মাঠটার মধ্যে অনেকটা চলে গেলে তাদের বাড়িটাকে খুব সুন্দর ছোট্ট একটা ছবির বাড়ির মতো দেখায়। ওই মাঠটার মধ্যে খুব ছুটে বেড়াতে ইচ্ছে করে বাপ্পার। কিন্তু একা তার এই বাড়ির কম্পাউন্ডের বাইরে যাওয়া বারণ। সে একা-একা কখনও কোথাও যেতে পারে না।

এক সময়ে তার বাবা দাঁড়িয়ে পড়ল। নীচু হয়ে রাস্তার পাশে ডালিয়া গাছটাকে দেখতে লাগল।

বাবা গাছটা দেখছে। বাপ্পা দাঁড়িয়ে রইল। শুকনো ডালিয়া গাছটা কুঁকড়ে ছোট্ট হয়ে গেছে। গাছটা মরেই গেছে। অস্ফুট স্বরে বাবা বলল, 'আহা মরেই গেল গাছটা! রাখা গেল না।'

বাবা গাছটাকে দেখতে লাগল। বাপ্পা জানে এখন অনেকক্ষণ ধরে বাবা গাছটাকে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখবে। আর ততক্ষণ তার কব্জিটা বাবার মুঠোর মধ্যে ধরা থাকবে।

এখন, এইবার কবজিটা ব্যথা করে বাপ্পার। কেমন যেন অস্বস্তি। কতক্ষণ যে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে কে জানে! ওই একঘেয়ে মরা গাছটা বাবা এখন কতক্ষণ ধরে দেখবে কে জানে!

বাপ্পা সিঁড়িগুলোর দিকে তাকাল। ছোট্ট খোলা বারান্দায় এখন রোদ। ঢাকা-না-দেওয়া রং-চটে যাওয়া কয়েকটা চেয়ার-টেবিল এলোমেলোভাবে রেখে দেওয়া। রাত্রিবেলা অন্ধকারে বারান্দায় আসতে গেলে প্রায়ই কেউ-না-কেউ ওই চেয়ার টেবিলগুলোর সঙ্গে ধাক্কা খায়। কেন যে ওগুলোকে সাজিয়ে রাখা হয় না,—বাপ্পা ভাবে। বারান্দায় দুটো দরজা হাট করে খোলা। এখন বাগানের রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে ঘরের ভেতরগুলো অন্ধকার মনে হচ্ছে। কিছু দেখা যাচ্ছে না। দুটো দরজা। একটা ড্রয়িংরুমের, অন্যটা শোওয়ার ঘরের। ঘরে আলো জ্বললে এখান থেকেই স্পষ্ট মাকে দেখতে পেত বাপ্পা।

কম্পাউডের ওপাশে মরা আমগাছটার ডালে বসে অনেকগুলো কাক। বিচ্ছিরি কালো অনেকগুলো কাক মরা আমগাছটার ডালে। অনেক—অনেকগুলো। ক'টা? বাপ্পা গুনতে চাইল। এক, দুই, তিন, চার...

কিন্তু চেষ্টা করেও অন্যমনস্ক হতে পারল না সে! বাবার মুঠোয় ধরে থাকা বাঁ-হাতের কবজিটা এখন প্রায় অবশ। ইচ্ছে করে খুব জোরের সঙ্গে ঝাঁঝিয়ে হাতটা ছাড়িয়ে নেয় কিংবা চিৎকার করে বলে, 'আমার হাতটা ছেড়ে দাও তুমি।'

কিন্তু বাপ্পা কখনও তা বলে না। লিকলিকে সরু কালো একটা চাবুক আছে বাবার। বাড়ির পেছন দিকে কম্পাউন্ডের শেষে খালি বাবুর্চিখানার দেওয়ালে টাঙানো থাকে চাবুকটা। ঘরটা রেনির, চাবুকটাও রেনির জন্যেই। মাঝে-মাঝে যখন কথা শুনতে চায় না রেনি, ডাকলেও কাছে আছে না তখন বাপ্পা দেখেছে বাবা রেনির গলার বকলশটা ধরে হিড়হিড় করে টানতে-টানতে নিয়ে যাচ্ছে বাবুর্চিখানার দিকে। তারপর দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ। তারা কেউ কাছে থাকলে বাবা বলে, 'তোমরা কেউ এসো না এদিকে।' তারা কেউ

কাছে যায় না কিন্তু এত দূর থেকেও চাবুকের শ্লিক-শ্লিক শব্দটা সে শুনেছে। বাসনপত্র মেঝেতে ফেলে দিলে যেমন হয় তেমনি কর্কশ বিকট একটা চিৎকার করে রেনি কাঁদতে থাকে।

তখন বাপ্পাও কাঁদতে থাকে ভিতরে-ভিতরে। তার সমস্ত শরীরটা কাঠ হয়ে থাকে। 'গেট'টা ডিঙিয়ে অনেক দূরে চলে যেতে-যেতে চিৎকার করে বলে : 'আমি কক্ষনো-কক্ষনো এখানে থাকব না।'

ফিরে-ফিরে বাঁ-হাতের কব্জিটাকেই মনে পড়ল বাপ্পার। কব্জিটা অবশ হয়ে-হয়ে এখন ছিঁড়ে যেতে চাইছে। বাবা নীচু হয়ে গাছের গোড়া দেখছে। সে এক-পাও নড়তে পারছে না। বাপ্পা জানে বাবা তাকে যেভাবে দাঁড় করিয়ে রেখেছে সেভাবেই তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। কখনও সে বাবার অবাধ্য হয় না। অবাধ্য হওয়ার কথা মনে হলেই চাবুকে বাতাস কাটবার সেই অদ্ভুত শব্দটা তার কানের কাছে বাজতে থাকে। বুকের ভিতরটা ছলাৎ-ছলাৎ করতে থাকে। আর সে তখন খুব শান্ত হয়ে যায়। খুব শান্ত হয়ে থাকে বলেই মাঝে-মাঝে বাবা দুই হাতের মধ্যে তার মাথাটা চেপে ধরে বলে—'কখনও তুমি আবার অবাধ্য হও না, তাই না! এই তো আমি চাই। খুব শান্ত, সংযত, ভদ্র হতে চেষ্টা করো।'

'কচু! কচু' বাপ্পা মনে-মনে বলল : 'মোটেই আমি শান্ত হতে চাই না, মোটেই না।' পা দুটো ঝিনঝিন করছে বাপ্পার। ডেঁও পিঁপড়ে কামড়ানোর মতো একটা যন্ত্রণা হাঁটুর কাছে, গোড়ালিতে। বাঁ-হাতটা এখন অবশ। কী ব্যথা হাতটায়। আঙুলগুলো আছে কি নেই বোঝা যাচ্ছে না।

বাপ্পা এখন রেনিকে দেখছিল। রেনি পথ থেকে নেমে বাগানের উত্তরে কোণটার কাছে চলে গেছে। একটা গঙ্গাফড়িং রেনির নাকের ডগায় উড়ছে। আর সেই ফড়িংটাকে তাড়া করে ঝোপঝাড়গুলোর ভিতর দিয়ে এঁকে-এঁকে বেঁকে সরে যাচ্ছে।

ফড়িংটাকে ধরবার জন্যে রেনি লাফিয়ে ওঠে। বাপ্পা তাকিয়ে থাকে। রেনির লম্বা শরীরটা বাতাসে ঢেউ খেয়ে নিঃশব্দে মাটির ওপর পড়ে। ফড়িংটা এক ঝটকায় অনেকটা ওপরে উঠে গেছে।

রেনি লাফিয়ে ওঠে আবার। ফড়িংটা উড়তে-উড়তে উত্তর কোণ থেকে বাগানের বেড়ার কাছে কেয়া ঝোপটার পাশে সরে যাচ্ছে।

রেনি লাফাচ্ছে, দৌড়াচ্ছে সরে যাচ্ছে। ডিগবাজি খাওয়ার মতো ভঙ্গি করে মাটির ওপর গড়াগড়ি দিচ্ছে।

ফড়িংটা লাফিয়ে উঠল। ফড়িংটা যেন রেনির সঙ্গে খেলছে।

বাপ্পা তার পা দুটো সামান্য নাড়ল। ডান পা-টা বাড়িয়ে দিল। জুতোর 'হিলটা' পথের কর্কশ কাঁকরের ওপর ঘষতে লাগল আস্তে-আস্তে! খুব মৃদু সাইকেলের 'চেন' ছাড়বার মতো কিরকির-কিরকির একটা শব্দ হতে লাগল।

বাপ্পা পা-টা জোরে চেপে ধরে পথের ওপর। জুতোটা ঘষতে থাকে। জুতোর তলায় মিহি ফুরফুরে কাঁকরগুলো গুঁড়িয়ে যাচ্ছে। বাপ্পার ইচ্ছে করছিল কাঁকরের ওপর ঘষে-ঘষে হিলটা ক্ষয় করে ফেলে তারপর জুতোজোড়া পা থেকে খুলে টান মেরে ছুড়ে ফেলে দেয়।

রেনি এখন কেয়া ঝোপটার পাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। ফড়িংটা ওর মাথার অনেকটা ওপরে। রেনি ফড়িংটাকে দেখছে। পাতা ঝরে যাওয়া বিশ্রী শুকনো কুচ্ছিত বাগানটার সঙ্গে রেনির গায়ের বাদামি রংটা মিশে আছে।

রেনি পিছনের পা দুটো ভাঙল। ল্যাজটা নামালো। সামনের পায়ে অল্প একটু ভাঁজ। এক্ষুনি লাফ দেবে রেনি!

ফড়িংটা দূরে সরে যাচ্ছে।

রেনি লাফ দেবে।

জুতোর 'হিলটা মাটিতে জোরে-জোরে ঠোকে বাপ্পা।

'আঃ বাপ্পা,' বাবা সোজা হয়ে দাঁড়াল, 'এক মিনিট—এক মিনিটও তুমি চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারো না!'

তার হাতটা ধরে একটা ঝাঁকুনি দেয় বাবা। বাপ্পা টাল খেয়ে পড়ে যেতে-যেতে বাবার হাতটা চেপে ধরে আবার দাঁড়িয়ে পড়ল।

—কী হয়েছে? জুতোটা ঘষছিলে কেন? বাবা খুব জোর গলায় বলে।

রেগে গেলে বাবা এভাবেই চিৎকার করে। অবাধ্য রেনিকে বাবা এভাবেই চেঁচিয়ে ডাকে। বাবার দুটো চোয়াল শক্ত হয়ে ঢিপির মতো উঁচু হয়।

অস্পষ্টভাবে চাবুকে বাতাস কাটবার একটা শব্দ বাপ্পার কানের কাছে বাজতে থাকে।

—একটা কাঁকর আমার জুতোর মধ্যে ঢুকে গেছে।

—কাঁকর! বাবার ভ্রূ দুটো জোড়া লাগে।

এবার বাবা তার হাতটা ছেড়ে দেয়।

—কাঁকরটা বের করে ফেলো।

বাপ্পা নীচু হয়ে হাঁটু ভেঙে লাল কাঁকর ছড়ানো পথের ওপর বসে জুতোটা খুলতে যাচ্ছিল।

বাবা একটা হাত তার দিকে বাড়িয়ে দেয়, 'অসভ্য, নোংরা, জানোয়ার কোথাকার।' বাবা বলে। বাড়ানো হাতটা দিয়ে তার ঘাড়ের কাছে শার্টের কলারটা ধরে তাকে আবার দাঁড় করিয়ে দিল বাবা।

—ধুলোর ওপর বসতে তোমার ঘেন্না হল না। দাঁতে-দাঁত চেপে বাবা বলে, 'অসভ্য ছোটলোকদের ছেলের সঙ্গে মিশলে এরকমই হয়।'

আপন মনে মাথা নাড়ে বাবা, 'নাঃ, তোমাকে দিয়ে কিচ্ছু হবে না। তোমার ওপর আমার কোনও আশাই নেই। তুমি নষ্ট হয়ে যাবে, একদম নষ্ট হয়ে যাবে।'

বাপ্পা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। এখন সে বাবাকে দেখছিল না। বাবার কথাও শুনছিল না। সে দেখতে পেল ফড়িংটা কেয়া ঝোপের পাশ দিয়ে উড়ে কম্পাউন্ডের বেড়ার ওপর দিয়ে বাইরে চলে গেল। রেনি দৌড়ে বেড়াটার ধারে গেল।

রেনি এখন বাইরে যাওয়ার একটা পথ খুঁজছে।

বাপ্পা তাকিয়েই রইল।

রেনি অস্পষ্ট শব্দ করল। বাবা ফিরে তাকাল।

রেনি এদিক-ওদিক ছুটে একটা পথ খুঁজছে। বাপ্পা তাকিয়ে রইল।

বাবা ডাকল, 'রেনি।' চোখের পলক না ফেলতেই তারের আর মেহেদি পাতার বেড়ার ভিতরে ছোট একটা গর্তের মধ্যে রেনির বাদামি লম্বা শরীরটা ঢুকে গেল।

রেনি এখন ওপাশে।

বাবা ডাকল, রে-ই-নি-ই-ই।'

ছোট একটা নিশ্বাস ফেলল বাপ্পা। এতক্ষণ ধরে যে এইটেই চাইছিল।

বাবার আঙুলগুলো পাক খেল, জোঁকের মতো জড়িয়ে গেল। বাবার মুখটা লাল। চোয়ালের ওপর দুটো ঢিপি।

বাবা গেটের কাছে এগিয়ে গেল।

আবার ডাকল, 'রেই—নি—ই—ই।'

শব্দটা শিস দেওয়ার শব্দের মতো তীব্রতর হল। তারপর অনেকগুলো তিরের মতো বাতাস চিরে ছড়িয়ে পড়ল। কিন্তু রেনি ফিরল না। রেনির বাদামি রঙের হিলহিলে লম্বা শরীরটা দুলতে-দুলতে দূরে চলে যেতে লাগল।

বাবা 'গেটটা খুলে বাপ্পার দিকে ফিরল, 'তুমি এখানেই থেকো। বাড়ির বাইরে যাবে না।' বাপ্পা মাথা নাড়ল।

বাবা গেটটা বন্ধ করে রাস্তা পার হয়। জোরে-জোরে হাঁটতে থাকে মাঠটার মধ্যে। রেনি এখন ছুটছে। সহজে ধরা দেবে না রেনি—বাপ্পা জানে।

বাপ্পা মাঠটার দিকে একবার তাকাল, তারপর শুকনো ঘাসফুলের বেড়া ডিঙিয়ে এক দৌড়ে বাড়ির পিছন দিকটায় চলে এল। এখানে গাছগুলো বড়-বড়। একবার সমশেরের বাড়ি গেলে হয়—ভাবল বাপ্পা। কিন্তু সামনের দিকে গেট পেরোতে গেলে খোলা মাঠ থেকে বাবা তাকে দেখে ফেলতে পারে।

ভাবতে-ভাবতে জামগাছটার তলায় চলে এল বাপ্পা। খুব নির্জন এদিকটা। কেউ নেই। কম্পাউন্ডের পাশ দিয়ে টেলিগ্রাফের তার চলে গেছে।

বাঁ-হাতটা কবজির কাছে এখনও লাল। যেন কোনও সাড় নেই হাতে। হাতটা পুরোপুরি অবশ হয়ে গেছে কি না দেখবার জন্যই বাপ্পা বাঁ-হাত দিয়ে একটা নুড়ি কুড়িয়ে নেয়। চারদিকে তাকায় বাপ্পা। কেউ নেই।

সবচেয়ে কাছে যে টেলিগ্রাফের পোস্টটা ছিল বাপ্পা সেটার দিকে নুড়িটা ছুড়ে মারে। নুড়িটা অনেক দূর দিয়ে চলে গেল।

বাঁ-হাতের কব্জিটাতে তেমন জোর পাচ্ছে না সে। সে আর সমশের প্রায়ই এইখানে দাঁড়িয়ে ওই পোস্টটার গায়ে ঢিল মারে। সমশেরের চেয়ে আমি ভালো পারি'—এই ভেবে যেখানে জামগাছের তলায় নুড়িগুলো জড়ো করে দেখত তারা সেদিকে এগোয়।

নুড়ি তোলবার জন্যে হাত বাড়ায় বাপ্পা।

গাছের তলায় ঘাসগুলো লম্বা, ঘন সবুজ। নুড়িগুলো একপাশে জড়ো করা। বাপ্পা নীচু হতে গিয়ে ঝুঁকতেই দেখতে পেল জড়ো করা নুড়িগুলোর পাশে ঘাসগুলো সরু একটা রেখার মতো দুপাশে সরে যাচ্ছে। 'সাপ'—বাপ্পা ফিসফিস করে বলল,—'সাপ। একটা সাপ।' তার প্রসারিত হাতটা ঠান্ডা।

বাপ্পা স্থির হয়ে থাকে। খুব স্বচ্ছন্দ গতিতে কালো সাপটা এগিয়ে এসে পাথরগুলোর কাছে থামল। চওড়া মস্ত বড় ফণাটা ভেসে উঠল ঘাসের ওপর। আবার ডুব দিল।

বাপ্পা পিছিয়ে আসবার জন্য একটা পা আলগা করল।

সমস্ত শরীরে ঢেউ তুলে, যেন তেল মাখানো কোনও জায়গার ওপর চলছে এমনি পিচ্ছিল গতিতে সাপটা সেই পাথরের স্তূপের ওপর উঠল। চকচকে আঁশগুলোর ওপর হলদে রঙের আলপনা।

বাপ্পা পেছন দিকে একটা প্রকাণ্ড লাফ দিল। ঠিক লাফ নয়, যেন কেউ তাকে প্রচণ্ড একটা ধাক্কা দিয়ে ছুড়ে ফেলে দিল।

মাটির ওপর পড়ে গেল বাপ্পা। সাপটা এখনও পাথরগুলোর ওপর মুখ তুলে। সেই মুখ থেকে পেট পর্যন্ত ছাই-রঙা।

হামাগুড়ি দিয়ে বাপ্পা সরে যেতে থাকে। খুব তাড়াতাড়ি সরে আসবার জন্যেই মাটিতে ছোট্ট পাথরের টুকরো আর বালিতে তার হাঁটু আর হাতের তেলো ছড়ে যেতে থাকে।

অনেকটা দূর চলে এসে বাপ্পা সোজা হয়ে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে আবার দৌড় দিয়ে আরও খানিকটা পিছিয়ে এল বাপ্পা। খুব জোরে চেঁচিয়ে উঠতে ইচ্ছে করে বাপ্পার। দাঁড়িয়ে হাঁপাতে-হাঁপাতে বুকের ভিতর ছলাৎ-ছলাৎ রক্তের শব্দ শোনে।

সাপটা ফণা তুলেছিল। ফণাটা তুলে যেন তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকেই অল্প-অল্প পিছিয়ে যেতে থাকে সাপটা। ফণাটাকে দুলিয়ে ঝাঁকানি দিয়ে-দিয়ে সাপটা পিছিয়ে যেতে থাকে।

এবার বাপ্পা হাসে। সাপটা ভয় পেয়েছে।

একটা ঢিল তুলে নিয়ে বাপ্পা হাতটা দোলাতে থাকে। সাপটাকে আরও ভয় পাইয়ে দেওয়ার জন্য বলে—'এই হ্যাট-হ্যাট। যাঃ'—

সাপটা একটু করে পেছোয়।

বাপ্পা একটু করে এগোয়।

সাপটা মুখ ঘুরিয়ে চলে যেতে থাকে। ঘাসের ওপর তেমনি আঁকাবাঁকা সরু রেখা উঠল।

বাপ্পা এগোতে থাকে।

বাবুর্চিখানার সামনে ছোট্ট বাঁধানো চত্বরটায় আবার মুখ তোলে সাপটা।

—হ্যাট, হ্যাট। যাঃ—

ধীরে-ধীরে চত্বরটা পেরিয়ে যায় সাপটা। মজা লাগে বাপ্পার। কেন যেন হাসি পায়।

সাপটা এগোচ্ছে।

বাবুর্চিখানার দরজাটা খোলা। সাপটা একবার মাথা তোলে।

—হ্যাট, হ্যাট—বাপ্পা বলে। এখন বুকের ভিতর সেই ছলাৎ-ছলাৎ শব্দটা নেই। কেমন যেন উত্তেজনা বোধ করে বাপ্পা। তার কান দুটো গরম এখন।

পকেটে হাত গুঁজে বাপ্পা দাঁড়ায়। দাঁড়িয়ে দেখতে পায় সাপটা আস্তে-আস্তে বাবুর্চিখানার চৌকাঠ ডিঙিয়ে ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে।

এবার ফিরে আসে বাপ্পা। ফিরে সামনের বাগানের দিকে চলতে থাকে। পা দুটো ঝিনঝিন করছে হাঁটুর কাছে ছড়ে যাওয়া জায়গাটা লাল পুঁতির দানার মতো রক্ত জমে আছে। হাতের তেলো দুটো জ্বলছে। এতক্ষণ এই ছড়ে যাওয়া জায়গাগুলো টের পাচ্ছিল না বাপ্পা। এখন তার চলতে কষ্ট হচ্ছে। হাঁটু দুটোয় ব্যথা, হাতের তেলোয় জ্বলুনি।

সামনের বাগানের গেটটার কাছে এসে দাঁড়াল সে। অনেক দূরে মস্ত উদোম খোলা মাঠটার ওপর বাবাকে দেখতে পায় বাপ্পা। মস্ত বড় আকাশ আর খোলা উদোম মাঠটার মাঝখানে বাবাকে ছোট্ট মতো দেখায়। বাবা রেনির গলার বকলশটা ধরে তাকে টেনে নিয়ে আসছে।

বাবা খুব কাছ এসে পড়ার আগেই বাপ্পা গাঁদা গাছগুলোর কাছে এসে দাঁড়ায়। গাঁদা পাতা ছিঁড়ে নিয়ে হাঁটুর ওপর ঘষতে থাকে।

গেটের কাছে বাবার গলা শোনা যায় : 'অবাধ্য—অবাধ্য কুকুর! চাবুক দিয়ে শায়েস্তা করতে হয় তোমাকে।' বাবা বাগানের মধ্যে দিয়ে রেনিকে টেনে নিয়ে যেতে থাকে।

—বাপ্পা, বাপ্পা—আ। বাবা ডাকে।

বাপ্পা দৌড়ে বাবার কাছে চলে আসে।

বাবা তার দিকে তাকায়। বাবার চোয়ালের ঢিপি দুটো এখন উঁচু। মুখটা লাল টক-টক করছে।

—কোথায় ছিলে তুমি এতক্ষণ? বাবা বলে।

—এখানেই।

তার হাঁটুর দিকে তাকায় বাবা। আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলে 'ওগুলো কী? অ্যাঁ। কেটে গেল কেমন করে?'

—আমি পড়ে গিয়েছিলাম।

বাবা আর কিছু বলে না। শুধু কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর আবার রেনিকে টেনে নিয়ে যেতে থাকে। বাবা এখন পেছন দিকের বাগানে যাবে।

বাবা, আমি কি আসব? বাপ্পা চেঁচিয়ে জিগ্যেস করে।

বাবা তার কথা শুনতে পায় না। রেনিকে বকতে-বকতে বাবা এগিয়ে যাচ্ছে। এবং তারপর বাবা আর রেনি বাড়ির পিছন দিকটায় চলে যায়।

নির্জন শুকনো ম্যাড়ম্যাড়ে বাগানটায় চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে বাপ্পা। সাপটা—সাপটা—ও-ঘরেই আছে—ভাবে বাপ্পা। তার বাবা এখন ও ঘরেই যাবে।

—বাবা—প্রাণপণে চেঁচিয়ে ডাকে বাপ্পা, তারপর ছুটতে শুরু করে। বুকের ভিতরে ছলাৎ-ছলাৎ শব্দটা শুনতে পায় সে। —'বাবা'—প্রাণপণে ছুটতে থাকে বাপ্পা। ছুটে এসে জামগাছটার তলায় দাঁড়ায়। বাবুর্চিখানার চত্বরে বাবা আর রেনি। বাবা রেনিকে টেনে নিয়ে যেতে চাইছে। রেনি যাবে না। রেনি চারটে পা ছড়িয়ে দিয়ে জেদি ছেলের মতো দাঁড়িয়ে পড়ল। বাবার মুখটা ভয়ঙ্কর লাল। চোয়ালের ঢিপি দুটো খুব উঁচু।

—বাবা—প্রায় ফিসফিস করে বলে বাপ্পা। বাবা রেনিকে দরজার কাছে নিয়ে গেল। বাবা তাকে দেখতে পেল, চেঁচিয়ে বলল—'বাপ্পা, এখন এখানে এসো না, চলে যাও।'

তবু বাপ্পা দাঁড়িয়ে থাকে। তার পা দুটো থরথর করে কাঁপে। ঠোঁট দুটো শুকনো, গলাটা শুকনো। প্রাণপণে চেঁচাতে ইচ্ছে করল বাপ্পার। সে বলতে চাইল—'বাবা, বাবা গো, ও-ঘরে একটা সাপ। মস্ত বড় ভয়ঙ্কর একটা সাপ; এখন ও-ঘরে তুমি যেও না, যেও না।' কিন্তু সে বলল না। ভাবল—'থাক। দেখাই যাক কী হয়।'

'একটা ভীষণ মজা হবে এক্ষুনি। কী মজা—সাপটা ও-ঘরে আর বাবাও এখন ও-ঘরে।' ভাবে বাপ্পা। তার সমস্ত শরীরটা উত্তেজনায় কাঁপতে থাকে।

বাবা ভিতর থেকে দড়াম করে দরজাটা বন্ধ করে দিল। সেই 'দড়াম' শব্দটা বাপ্পাকে যেন ধাক্কা দিল। তার প্রায় অবশ হাঁটু দুটো ভেঙে সে প্রায় পড়ে যাচ্ছিল। জামগাছটার গুঁড়িতে নিজের হাতটাকে চেপে ধরে সে। 'আমি বলে দিইনি, বলে দিইনি, ও-ঘরে কী আছে। আমি বলে দিইনি, বলে দিইনি—বলিনি'—যন্ত্রের মতো বাপ্পা এই কথাটাই বারবার

বলতে লাগল। চাবুকের শ্লিক-শ্লিক শব্দটা শুনতে পেল সে। বাসনপত্রের কর্কশ শব্দের মতো শব্দ করে রেনি কান্না শুরু করল।

বাপ্পা কাঠ।

চাবুকের শব্দটা হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। রেনির কান্নাও।

'বাবা' চিৎকার করল, বাপ্পা, 'বাবা, বাবা গো। বাবা, বাবা'—প্রাণপণে ছুটতে শুরু করল বাপ্পা। লম্বা ঘাসগুলোয় তার পা আটকে যাচ্ছিল। পড়তে-পড়তেও ছুটতে লাগল বাপ্পা। বাঁধানো চত্বরটা পার হয়ে দরজার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল সে, 'বাবা, বাবা। আমি বাপ্পা।'

'বাপ্পা'—বাবার গলা শোনা গেল। স্থির গম্ভীর গলা, 'বাপ্পা, এ-ঘরে একটা মস্ত বড় বিষাক্ত সাপ।'

—তুমি দরজাটা খুলে বেরিয়ে এসো বাবা। বেরিয়ে এসো।

—আমি বেরিয়ে যেতে পারছি না বাপ্পা। সাপটা দরজার কাছেই। আমি দরজাটা খুলতে পারছি না। নিস্তেজ গলায় বাবা বলে।

—তুমি বেরিয়ে এসো বাবা। বেরিয়ে এসো। শুধু একথাটুকুই বলতে পারল বাপ্পা, 'তুমি বেরিয়ে এসো।'

—'আঃ বাপ্পা, আমি কেমন করে বেরোব—!' দরজার ওপাশে যেন অনেক দূর থেকে বাবার গলা শোনা গেল, 'এ-ঘরে কিছুই নেই! তুমি আমাকে একটা কিছু দাও। একটা লাঠি কিংবা ওই ধরনের কিছু।'

বাপ্পা ছুটে জানালাটার কাছে এল। কাচভাঙা ছোট্ট জানালাটার ওপর উপুড় হয়ে পড়ল প্রায়। 'বাবা মরে যাচ্ছে। মরে যাচ্ছে'—বাপ্পা বলে।

ঘরের ভিতরটা অন্ধকার। বাপ্পা চোখ বড়-বড় করে তাকাল।

—কোথায় তুমি বাবা? কাঁদতে থাকে বাপ্পা!

—এই যে বাপ্পা। বাবা সিমেন্টের তৈরি বেদির মতো উনুনটার কাছ থেকে জানালার দিকে তাকাল। বাবার চোখ দুটো বড়-বড়। বাবা ভয় পেয়েছে।

—বাপ্পা দেখতে পায় উনুনটার ওপরে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে রেনি। বাবার হাতের চাবুকটা স্থির। বাবা এতটুকু নড়ছে না।

—বাপ্পা, আমি নড়তে পারছি না। তুমি দাঁড়িয়ে থেকো না। একটা কিছু এনে আমার হাতে দাও। বাবার গলাটা কাঁপছে।

সাপটা দরজার কাছে। সমস্ত শরীরটা দুটো বাঁক খেয়ে গোল হয়ে রয়েছে। ফণাটা উঁচু করে আস্তে-আস্তে দুলছে সাপটা। ফণাটা এত উঁচুতে যে সেটা অনায়াসে তার বাবার বুকের কাছে বোধহয় ছোবল দিতে পারে। বাবা পিছন দিকে হাত বাড়িয়ে কিছু খুঁজছে। সেই হাতদুটো থরথর করে কাঁপে। বাপ্পা দেখে।

'বাপ্পা। বাবা স্থির দৃষ্টিতে সাপটাকে দেখছে।

সাপটা একটু ঝাঁকানি দিয়ে পিছু হটে গেল। মাথাটা পিছন দিকে হেলাল।

'বাপ্পা দাঁড়িয়ে থেকো না,' বাবা চাপা গলায় বলে।

সাপটা চাবুকের মতো ছিটতে লাফিয়ে পড়ল সামনের দিকে। বাবা ডান দিকে সরে গেল। সরতে গিয়ে উনুনটার ওপর টাল খেয়ে পড়ে গেল বাবা। সাপটা সরে যাওয়ার আগেই বাবা হামাগুড়ি দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

রেনির দাঁতগুলো বিশ্রীভাবে বেরিয়ে এল। 'ঘ্যাক' করে একটা অদ্ভুত শব্দ করে রেনি। দেয়ালের দিকে সরে যায়। তারপর সেখানেই দাঁড়িয়ে থেকে গোঁ-গোঁ করতে থাকে। সাপটা একটা দোল খেয়ে সোজা হয়। আবার দরজার দিকে সরে যেতে থাকে। বাবার কপালের কাছে দুটো শিরা জোঁকের মতো ফুলে আছে। চোখ দুটো বড়-বড়। 'বাপ্পা, দাঁড়িয়ে থেকো না' বাবা বলে। চকচকে আঁশ আর হলদে ডোরাকাটা সাপটা তার বাবার দিকে ফেরে। উঁচু ফণাটা দুলতে থাকে।

বাপ্পা চোখ বোজে, 'আমি নড়তে পারছি না বাবা, নড়তে পারছি না। আমার হাত-পা গুলো অবশ।' বাপ্পা ফিসফিস করে বলে। জানলার কাছে থেকে সরে আসে বাপ্পা। দাঁতে-দাঁত চাপে। কোমরটা অবশ। দুটো হাত মুঠো পাকিয়ে ছুটতে শুরু করে বাপ্পা। 'একটা লাঠি—একটা লাঠি—একটা লাঠি' বাপ্পা যন্ত্রের মতো বলতে থাকে। আর ছুটতে থাকে। চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছে করে তার।

বাপ্পা দেখে ছুটে বাগানটা পার হতে অনেক সময় লেগে যাবে। বাড়ির ভিতর থেকে লাঠি আনতে—। বাপ্পা থেমে বাঁ-দিকে ছোটে। কিন্তু কোথাও একটা লাঠি নেই। কিছু খুঁজে পায় না বাপ্পা। জিওল গাছটার তলায় এসে দাঁড়ায় বাপ্পা। এখন হাঁফাতে-হাঁফাতে তার দম বন্ধ হয়ে আসছে। নিমগাছটার সঙ্গে ঠেস দিয়ে একটা মস্ত বড় ঘুণে ধরা বাঁশ দাঁড় করানো। বাপ্পা এক লাফে নিমগাছটার কাছে চলে আসে।

বাঁশটা নিয়ে আবার জানলার কাছে আসে বাপ্পা। বাবা এখন উনুনটার ওপর দাঁড়িয়ে। রেনি গোঁ-গোঁ করে দেওয়ালের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। 'উঃ বাপ্পা'—বাবা চিৎকার করে বলে —'বাঁশ দিয়ে কী হবে? বাঁশ নয়। একটা লাঠি এনে দাও। তাড়াতাড়ি বাপ্পা। তাড়াতাড়ি।' বাঁশটা ফেলে দিয়ে বাপ্পা পা বাড়ায়। কিন্তু পা অবশ। একদম নড়তে পারছে না সে। তার বুক মাথা গলা জুড়ে একটা কল চলবার মতো শব্দ। সাপটা পিছলে-পিছলে এগিয়ে আসে। ফণাটা বাতাসে দুলে চাবুকের শব্দ করে।

'বাপ্পা, দেরি কোরো না, দেরি কোরো না।' বাবা বলে। অস্পষ্টভাবে বাপ্পা দেখতে পায় বাবা রেনির বকলশটা চেপে ধরে ঠেলে রেনিকে সামনে এগিয়ে দিচ্ছে।

অন্ধের মতো বাপ্পা পা বাড়ায়। তার গাল বেয়ে টপটপ করে জল পড়ছে। চোখে কিছু দেখছে না সে। চোখ দুটো জলে ভরা। পা বাড়াতে গিয়ে বাপ্পা পড়ে যেতে থাকে। 'সাপ, সাপ, সা-আ-প' চিৎকার করতে-করতে বাপ্পা ছোটে। কোথায় ছুটে যাচ্ছে বুঝতে পারবার আগেই চত্বরটার ওপর তার ক্লান্ত, অবসন্ন শরীরটা টলে পড়ে যেতে থাকে।

যখন অনেক বড় হয়েছিল বাপ্পা তখন সে তার ছেলেমেয়েদের কাছে কিংবা নাতি-নাতনিদের কাছে ফিরে-ফিরে এই গল্পটাই বলত। কিন্তু যখন বলত বাপ্পা, তখন গল্পটার কোনও-কোনও অংশকে সে ঢাকা দিত। ঢাকা দিত তার কারণ, এই স্মৃতির কোনও-কোনও অংশকে সে বুঝতে পারত না। এই বুঝতে না পারা অংশগুলো ছিল ছোট্ট-ছোট্ট, অস্পষ্ট, অন্ধকার গর্তের মতো। এই গর্তে কী আছে, কোন অদ্ভুত রহস্য তা বাপ্পা বুঝতে পারত না। তাই গল্পটা বলতে-বলতে মাঝে-মাঝে থামত সে। অনেক কিছুই তো আমরা ঢাকা দিই, ঢাকতে চাই,—ভাবত বাপ্পা। ভাবতে-ভাবতে অদ্ভুতভাবে একটু হাসত সে। বুকের ভিতরে ছলাৎ-ছলাৎ রক্তের শব্দ শুনত। তীব্র একটা উত্তেজনাকে অনুভব করত দেহের ভিতরে। তারপর থেমে-থাকা গল্পটাকে শুরু করবার জন্য মনে-মনে প্রস্তুত হত।

মনে-মনেই সেই অদ্ভুত রহস্যময় অন্ধকার গর্তগুলোকে লাফ দিয়ে পেরিয়ে আসত বাপ্পা।

আমাকে .দখুন

দয়া করে আমাকে একবার দেখুন। এই যে আমি এখানে। একটু আগে আমি বাসের পা-দানিতে ঠেলে-ঠুলে উঠলাম, তারপর নীরেট জমাট ভিড়ের ভিতর আমি এ-বগল সে-বগলের তলা দিয়ে, এর-ওর পায়ের ফোঁকর দিয়ে ঠিক ইঁদুরের মতো একটা গর্ত কেটে-কেটে এতদূর চলে এসেছি। বাসের রডগুলো বড় উঁচুতে—আমি বেঁটে মানুষ—অতদূর নাগাল পাই না। আমি সিটের পিছন দিক ধরে দাঁড়াই, তারপর গা ছেড়ে দিই! বাসের ঝাঁকুনিতে যখন আমি দোল খাই আশেপাশের মানুষের গায়ে ভর দিয়ে টাল সামলাই, তখন আমার আশেপাশের লোক কেউ খুব একটা রাগ করে না। কারণ, আমার ওজন এত কম যে, কারও গায়ে ঢলে পড়লেও সে আমার ভার বা ধাক্কা টেরই পায় না। হ্যাঁ, এখন আমি বাসের পিছন দিকটায় একটা সিট চেপে ধরে দাঁড়িয়ে আছি। আমার দু-ধারে পাহাড়ের মতো উঁচু-উঁচু সব মানুষ। তারা আমাকে এত ঢেকে আছে যে, বোধহয় আমাকে দেখাই যাচ্ছে না। কিংবা দেখলেও লক্ষ করছে না কেউ। ওইটাই মুশকিল। আমাকে অনেকেই দ্যাখে, কিন্তু লক্ষ করে না। এখন আমি যার পাশে দাঁড়িয়ে আছি, কিংবা যার মুখোমুখি, তারা আমাকে হয়তো দেখছে, কিন্তু নির্লিপ্তভাবে। যেন আমি না থাকলেও কোনও ক্ষতি বা লাভ ছিল না। তার কারণ বোধহয় এই যে, আমার চেহারায় এমন কিছু নেই, যাতে আমাকে আলাদা করে চেনা যায়। হ্যাঁ মশাই আমি মাত্র পাঁচ ফুট দুই ইঞ্চি লম্বা, রোগাই, তবে খুব রোগা নয় যেটা চোখে লাগে, কালোই তবে খুব কালো নয় যে, আর-একবার তাকিয়ে দেখবে কেউ। চল্লিশ বছরের পর আমার মাথা ক্রমে ফাঁকা হয়ে চুল পাতলা হয়ে এসেছে অথচ টাকও পড়েনি—টেকোমানুষকেও কেউ-কেউ দেখে। তার ওপর

আমার মুখখানা—সেটা না খুব কুচ্ছিত না সুন্দর—আমার নাক থ্যাবড়া নয় চোখাও নয়, চোখ বড়ও নয় আবার কুতকুতেও নয়। কাজেই এই যে এখন ভিড়ের মধ্যে আমি দাঁড়িয়ে আছি—দু-ধারে উঁচু-উঁচু মানুষ—এই ভিড়ের মধ্যে কেউ কি আমাকে দেখছেন? দেখছেন না। কিংবা দেখলেও লক্ষ করছেন না—আমি জানি।

আমার বিয়ের পর একটা খুব মর্মান্তিক মজার ঘটনা ঘটেছিল। বউভাতের দুই-একদিন পর আমি আমার বউকে নিয়ে একটু বাজার করতে বেরিয়েছিলাম। আর কয়েকদিন পরই দ্বিরাগমনে শ্বশুরবাড়ি যাব, সেই কারণেই কিছু নমস্কারি কাপড়-চোপড় কেনা দরকার ছিল। রাস্তায় বেরিয়ে আমি আমার বউকে জিগ্যেস করলাম, 'নিউ মার্কেটে যাবে?' আমার যা অবস্থা তাতে নিউ মার্কেটে বাজার করার কোনও অর্থ হয় না, বরাবর আমার বাসার কাছে কাটরায় সস্তায় কাপড়-চোপড় কিনি। তবু যে আমি এই কথা বলেছিলাম, তার এক নম্বর কারণ ছিল যে, আমার বউটি ছিল মফসসলের মেয়ে, নিউ মার্কেট দেখেনি, আর দুই নম্বর কারণ হল আমার শ্বশুরবাড়ির দিকটা আমাদের তুলনায় বেশ একটু পয়সাওয়ালা। আমি নিউ মার্কেটের কথা বললাম যাতে আমার নতুন বউটি খুশি হবে, আর শ্বশুরবাড়ির লোকেরা যখন শুনবে, কাপড়-চোপড় নিউ মার্কেট থেকে কেনা, তখন তাদের ভ্রূ একটু ঊর্ধ্বগামী হবে। কিন্তু ওই নিউ মার্কেটের প্রস্তাবটাই একটা মারাত্মক ভুল হয়েছিল। কারণ ওখানে না গেলে ঘটনাটা বোধহয় ঘটতই না। ব্যাপারটা হয়েছিল কি নিউ মার্কেটে ঢোকার পর ঝলমলে দোকান-পশার দেখে আমার বউ মুগ্ধ হয়ে গেল। যে-কোনও দোকানের সামনেই দাঁড়ায়, তারপর শো-কেসে চোখ রেখে এক-পা এক-পা করে হাঁটে! আমার দিকে তাকাতেও ভুলে গেল। তখন আমার নতুন বউ, কাজেই আমার অভিমান হওয়া স্বাভাবিক। আমি তাকে এটা-ওটা দেখিয়ে একটু মাতব্বরির চেষ্টা করলাম বটে, কিন্তু সে বিশেষ কোনও জিনিসের দিকে মনোযোগ না দিয়ে সব কিছুই দেখতে লাগল। অভিমানটা একটু প্রবল হতেই এক সময়ে আমি ইচ্ছে করেই হাঁটার গতি খুব কমিয়ে দিলাম, কিন্তু বউ সেটা লক্ষ না করে নিজের মনে হেঁটে যেতে লাগল। তাই দেখে এক সময়ে আমি একদম থেমে গেলাম। কিন্তু বউ হাঁটতে লাগল। দোকান-পশারের দিকে তার বিহ্বল চোখ, আর গার্ড অফ অনার দেওয়ার সময়ে সোলজাররা যেমন হাঁটে তেমনি তার হাঁটার ভঙ্গি। আমি দূর থেকে দেখতে লাগলাম আমার বউ সেই ঝলমলে আলোর মধ্যে লোকজনের ভিড় ঠেলে হেঁটে যাচ্ছে। মাঝে-মাঝে সে কথাও বলেছিল বটে, আমি তার সঙ্গেই আছি ভেবে, কিন্তু সত্যিই আছি কি না তা সে লক্ষ করল না। এইভাবে বেশ কিছুদূর যাওয়ার পর সে কী একটা জিনিস দেখে খুব উত্তেজিতভাবে আমাকে দেখানোর জন্য মুখ ফিরিয়ে আমাকে খুঁজতে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। চারদিকে চেয়ে আকুল হয়ে খুঁজতে লাগল আমাকে। তখনই মজা করার একটা লোভ আমি আর সামলাতে পারলাম না। নিউ মার্কেটে যে গোলকধাঁধার

মতো গলিগুলো আছে তার মধ্যে যেটা আমার সামনে ছিল আমি তার মধ্যে ঢুকে গেলাম। এবার মফসসলের মেয়েটা খুঁজুক আমাকে। যেমন সে আমাকে লক্ষ করছিল না, তেমন বুঝুক মজা। আমি আপনমনে হাসলাম, আমি উঁকি মেরে দেখলাম আমার বউটা কান্নামুখে চারিদিকে চাইতে-চাইতে ফিরে আসছে দ্রুত পায়ে। আমার কষ্ট একটু হল ওর মুখ দেখে, তবু আর-একটু খেলিয়ে ধরা দেব বলে আমি গলির মধ্যে ঢুকে গেলাম। আর ও দিশেহারার মতো এদিক-ওদিক অনেকবার হাঁটল, এ-গলি সে-গলিতে খুঁজতে লাগল আমাকে। আমি ওকে চোখে-চোখেই রাখছিলাম। এক সময়ে বুঝতে পারলাম যে, এবার আমাকে না পেলে ও কেঁদেই ফেলবে—এমন করুণ হয়ে গেছে ওর মুখশ্রী! চোখ দুটোও ছলছলে আর লাল হয়ে গিয়েছিল। তাই একসময় ও যে গলিটাতে হেঁটে যাচ্ছিল, আমি পা চালিয়ে অন্য পথে গিয়ে সে গলিটার উলটোদিক দিয়ে ঢুকলাম। তারপর হাসি-হাসি মুখ করে দাঁড়িয়ে রইলাম! বিপরীত দিক থেকেও ও হেঁটে এল, ঠিক মুখোমুখি দেখা হল আমাদের, এমনকী ও আমার এক ফুট দূরত্বের ভিতর দিয়ে হেঁটে গেল তবু আমাকে চিনতে পারল না। খুব অবাক হলাম আমি—ও কি আমাকে দেখেনি। আবার অমি অন্যপথে তাড়াতাড়ি গিয়ে অন্য এক গলিতে একটা কাচের বাসনের দোকানের সামনে কড়া আলোয় দাঁড়ালাম। ঠিক তেমনি ও উলটোদিক থেকে হেঁটে এল, চারদিকের লোকজনকে লক্ষ করল, আমার চোখে ওর চোখ পড়ল, কিন্তু আবার আমাকে পেরিয়ে গেল ও, এমনকী পেরিয়ে গিয়ে একবার পিছু ফিরেও দেখল না। এরকম কয়েকবার আমাদের দেখা হল—কখনও বইয়ের দোকানের সামনে কখনও ফলের দোকান কিংবা পুতুলের দোকানের সারিতে। কিন্তু ও আমাকে কোনও বারই চিনতে পারল না। উদভ্রান্তভাবে আমাকে খুঁজতে-খুঁজতে আমাকেই পেরিয়ে গেল। তখন আমি ভাবলাম মফসসলের এই মেয়েটা খুব ঘড়েল, আমি ইচ্ছে করে লুকিয়ে ছিলাম বুঝতে পেরে এখন ইচ্ছে করেই চিনতে চাইছে না। কিন্তু ওর মুখের করুণ এবং ক্রমে করুণতর অবস্থা দেখে সে কথাটা সত্যি বলে মনে হচ্ছিল না। তবু আমি অবশেষে একটা ঘড়ির দোকানের সামনে ওর রাস্তা আটকে দাঁড়িয়ে গেলাম। বললাম—এই যে! ও ভীষণ চমকে গিয়ে অবাক হয়ে আমাকে দেখল। বেশ কিছুক্ষণ দেখে-টেখে তারপর ভীষণ জোরে শ্বাস ফেলে কেঁপে-কেঁপে এসে বলল—তুমি! তুমি! কোথায় ছিলে তুমি! আমি কতক্ষণ তোমাকে খুঁজছি! আশ্চর্য এই যে, তখন আমার মনে হল ও সত্যি কথাই বলছে। বাসায় ফেরার সময় ওকে আমি বললাম যে, ওর সঙ্গে ওই লুকোচুরি খেলার সময়ে আমি বারবার ওকে ধরার সুযোগ দিয়েছি, ওর সামনেই দাঁড়িয়েছিলাম আমি। ও প্রথমটায় বিশ্বাস করল না, কিন্তু অমি বারবার বলাতে ও খুব অবাক হয়ে বলল—সত্যি! তাহলে তুমি আর কখনও লুকিয়ো না। এরকম করাটা বিপজ্জনক।

বেঁধে ভাই কন্ডাক্টর, এইখানেই আমি নেবে যাব—দেখি দাদা... দেখবেন ভাই আমার চশমাটা সামলে...ওই দেখুন, কেউ আমার কথা শুনল না। আমি নামার আগেই কন্ডাক্টর বাস ছাড়ার ঘন্টি দিয়ে দিল, গেট আটকে ধুমসো মতো লোকটা অনড় হয়েই রইল আর হাওয়াই শার্ট পরা ছোকরাটা কনুইয়ের গুঁতোয় চশমাটা দিলে বেঁকিয়ে। তাই বলছিলাম যে, কেউই আমাকে লক্ষ করে না, বাসে-ট্রামে না, রাস্তায় ঘাটে না।

আজকের দিনটা বেশ ভালোই। ফুরফুরে হাওয়া আর রোদ দিয়ে মাখামাখি একটা আদুরে-আদুরে গা-ঘেঁষা দিন। শরৎকাল বলে গরমটা খুবই নিস্তেজ। এখন এই রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে আমার বেশ ভালোই লাগছে। ওই তো একটু দূরেই একটা ক্রসিং আর তার পরেই আমার অফিস। এই দ্যাখো আমি ক্রসিংটার কাছে এসে রাস্তা পেরোবার জন্য পা বাড়াতেই ট্রাফিক পুলিশ হাত নামিয়ে নিল, আমার পার হওয়ার রাস্তাটা আটকে এখন চলন্ত গাড়ি আর গাড়ি। কেন ভাই ট্রাফিক পুলিশ, আমি যে রাস্তা পেরোচ্ছি তা কি দেখতে পাওনি? আর-একটু হাতখানা তুলে রাখলে কি হাতখানা ভেরে যেত?

যে লিফটে দাঁড়িয়ে আমি দোতলায় উঠছি এই লিফটটা বোধহয় একশো বছরের পুরোনো। এর চারদিকে কালো লোহার গ্রিল—ঠিক একখানা খোলামেলা খাঁচার মতো, মাঝে-মাঝে একটু কাঁপে, আর খুব ধীরে-ধীরে ওঠে। গত তেরো বছর ধরে আমি এই লিফট বেয়ে উঠছি, এই তেরো বছর ধরে আমাকে সপ্তাহে ছ'দিন লিফটম্যান রামস্বরূপ আভোগী ওপরে তুলছে। কী বলো ভাই রামস্বরূপ, তুমি তো আমাকে বেশ ছোটটিই দেখেছিলে—যখন আমার বয়স চাব্বিশ কি সাতাশ, যখন আমার ভালো করে বুড়োটে চাপ পড়েনি মুখে। এখন বলো তো আমার নামটা কী! যদি সত্যিই জিগ্যেস করি তাহলে এক্ষুনি রামস্বরূপ হাঁহাঁ করে হেসে উঠে বলবে—আরে জরুর, আপনি তো অরবিন্দবাবু। কিন্তু মোটেই তা নয়। কোনওকালেই আমি অরবিন্দ ছিলাম না। আমি চিরকাল—সেই ছেলেবেলা থেকেই অরিন্দম বসু।

আমার চাকরি ব্যাঙ্কে। দোতলায় আমার অফিস। আগে আমি অন্যান্য ডিপার্টমেন্টে ছিলাম, গত দশ বছর ধরে আমি বসছি ক্যাশ-এ। আমি খুব চটপট টাকা গুনতে পারি, হিসেবেও আমি খুব পাকা। তাই ক্যাশ থেকে আমাকে অন্য কোথাও দেওয়া হয় না। হলেও আবার ফিরিয়ে আনা হয়। দশ বছর ধরে আমি খুবই দক্ষতার সঙ্গে ক্যাশের কাজ করছি। কখনও পেমেন্ট, কখনও রিসিভিঙে। পেমেন্টেই বেশি, কারণ ওখানেই সবচেয়ে সতর্ক লোকের দরকার হয়। একটা তারের খাঁচার মধ্যে আমি বসি, আমার বুকের কাছে থাকে অনেক খোপওয়ালা একটা ড্রয়ার। তার কোনটায় কত টাকার নোট তার কোনটায় কোন খুচরো পয়সা রয়েছে, তা আমি নির্ভুলভাবে চোখ বুজে বলে দিতে পারি। পেমেন্টের

সময়ে আমি ড্রয়ার খুলে গুনে টাকা বের করি, তারপর ড্রয়ার বন্ধ করি, তারপর আবার গুনি, আবার...তারপর টাকা দিয়ে পরের পেমেন্টের জন্য হাত বাড়াই, টোকেন নিয়ে আবার ড্রয়ার খুলি, টাকা বের করে গুনে...তারপর একইভাবে চলতে থাকে। সামনের ঘুলঘুলিটা দিয়ে যারা আমাকে দেখে তাদের সম্ভবত খুবই ক্লান্তিকর লাগে আমার ব্যবহার—ইস লোকটা কী একঘেয়েভাবে কাজ করছে—কী একঘেয়ে! ঘুলঘুলি দিয়ে তারা আমাকে দেখে, কিন্তু মনে রাখে না। রামবাবু আমাদের পুরোনো বড় খদ্দের—প্রকাণ্ড কারখানা আছে, এজেন্টও তাকে খাতির করে। খুব খুঁতখুঁতে লোক, বেশির ভাগ সময়েই লোক না পাঠিয়ে নিজেই এসে চেক ভাঙিয়ে নিয়ে যান। আমি কতবার তাঁকে পেমেন্ট দিয়েছি, তিনি ঘুলঘুলি দিয়ে প্রসন্ন হাসিমুখে ধন্যবাদ দিয়েছেন। একবার আমার বড় শালা কলকাতায় বেড়াতে এসে অনেক টাকা উড়িয়েছিল। সেবার সে আমাকে নিয়ে পার্ক স্ট্রিটের বড় একটা রেস্তোরাঁয়। সেখানে গিয়ে দেখি রামবাবু! একা বসে আছেন, হাতে সাদা স্বচ্ছ জিন, খুব স্বপ্নালু চোখ। সত্যি বলতে কী আমি ভাগ্যোন্নতির কথা বড় একটা ভাবি না। অন্তত সে কারণে রামবাবুর সঙ্গে দেখা করার কথা আমার মনেই হয়নি। আমি পুরোনো চেনা লোক দেখে এগিয়ে গিয়েছিলাম। রামবাবু ভ্রূ তুলে বললেন—কোথায় দেখেছি বলুন তো। মনেই পড়ছে না। তখন শালার সামনে ভীষণ লজ্জা করছিল আমার। লোকটা যদি সত্যিই চিনতে না পারে, যদি সত্যিই তেমন অহংকারী হয়ে থাকে লোকটা—তবে আমার বেইজ্জতি হয়ে যাবে। তখন আমি মরিয়া হয়ে আমার ব্যাঙ্কের নাম বললাম, বললাম যে আমি ক্যাশ-এ...সঙ্গে-সঙ্গে পরিষ্কার জিন-এর মতোই স্বচ্ছ হয়ে গেল তাঁর মুখ, প্রসন্ন হেসে বললেন—চিনেছি। কী জানেন, ওই ঘুলিঘুলি আর ওই খাঁচার মধ্যে দেখতে-দেখতেই অভ্যস্ত হয়ে গেছি, তাই হঠাৎ এ জায়গায়...বুঝলেন না! আসল কথা হল ওই পারসপেকটিভ—ওটা ছাড়া মানুষের আর আছেটা কী যে, তাকে চেনা যাবে? ওই খাঁচার মধ্যে ঘুলঘুলির ভিতর দিয়ে যেমন আপনি, তেমনি দেখুন এই কোট-প্যান্ট টাই আর টাক মাথা—এর মধ্য দিয়ে আমি। এসব থেকে যদি আলাদা করে নেন, তবে দেখবেন আপনি আর আমি—আমাদের কোনও সত্যিকারের পরিচয়ই নেই। এই দেখুন না, একটু আগেই আমি পারসপেকটিভের কথাই ভাবছিলাম! ছেলেবেলায় আমরা থাকতাম রেলকলোনিতে। আমার বাবার ছিল টালিক্লার্কের চাকরি। কাটিহারে আমাদের রেল-কোয়ার্টারে প্রায়ই পাশের বাড়ি থেকে একটি মেয়ে আসত, তার সৎ-মা বলে বাসায় আদর ছিল না। আমাদের বাসায় রান্নাঘরে উনুনের ধারে আমার মায়ের পাশটিতে সে এসে মাঝে-মাঝে বসত। জড়সড়ো হয়ে ছেঁড়া ফ্রকে হাঁটু ঢেকে পরোটা বেলে দিত, কখনও আমার কাঁদুনে ছোট বোনটাকে কোলে করে ঘুরে-ঘুরে ঘুম পাড়াত। মা আমাকে বলত—ওর সঙ্গে তোর বিয়ে দেব। সেই শুনে সেই মেয়েটাকে আমি ভালো করে দেখতাম—আ কী যে নেশা লেগে যেত। কী করুণ কৃশ খড়িওঠা মুখখানা—আর কী তিরতিরে সুন্দর। যেন পৃথিবীতে

বেশিদিন থাকবে বলে ও আসেনি। রামবাবু এটুকু বলেই দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন, আর আমি ব্যগ্র হয়ে জিগ্যেস করলাম—তারপর কী হল, সে কি মরে গেল? রামবাবু মাথা নাড়লেন—না-না মরবে কেন। তাকে আমি বিয়ে করেছি বড় হয়ে। সে এখনও আমার বউ। ইয়া পেল্লায় মোটা হয়ে গেছে, বদমেজাজি, আমাকে খুব শাসনে রাখে। কিন্তু যখন দেখি ফ্রিজ খুলছে, গয়না হাঁটকাচ্ছে, চাকরদের বকছে কিংবা সোফারকে বলছে গাড়ি বের করতে, তখন কিছুতেই বিশ্বাস হয় না যে, এ সেই। সেই বেলি—যার অসুখের সময় মা দুটো কমলালেবু দিয়ে এসেছিল বলে এক গাল হেসেছিল। আজ দেখুন, খুব ঝগড়া করে বেরিয়েছি ওর সঙ্গে। মনটা খিঁচড়ে ছিল—সেই ভালোবাসা কোথায় উবে গেছে এখন। কিন্তু এখানে নির্জনে বসে সেই পুরোনো দিন, উনুনের ধারে বসে থাকা, ছেঁড়া ফ্রকে হাঁটু ঢেকে ওর বাসার ভঙ্গি মনে পড়ে গেল। মনে পড়ল আমার মায়ের মুখ—সে মুখ বড় মায়ামমতায় ওর বসার দীন ভঙ্গিটুকু চেয়ে দেখছে। অমনি আবার এখন ভালোবাসায় আমার মন ভরে উঠেছে। বাসায় ফিরে গিয়েই এখন ওর রাগ ভাঙাব। বুঝলেন না...বলে রামবাবু সেই সাদা স্বচ্ছ জিন মুখে নিয়ে হাসলেন, বললেন—ওই যে ঘুলঘুলিটা—যেটার ভিতর দিয়ে আপনাকে দেখি সেটাই আসল—ওই ঘুলঘুলিটা....

এই যে তেইশ-চব্বিশ বছর বয়সের ছেলেটা এখন পেমেন্টের জন্য দাঁড়িয়ে আছে, পিতলের টোকেনটা ঠুকঠুক করে অন্যমনস্কভাবে ঠুকছে কাউন্টারের কাঠে, ও আমাকে চেনে। ওর বাবার আছে পুরোনো গাড়ি কেনাবেচার ব্যাবসা। আগে ওর বাবা আসত, আজকাল ও আসছে ব্যাঙ্কে। মাঝে-মধ্যে চোখে চোখ পড়লে আমি হেসে জিগ্যেস করি,—কী, বাবা ভালো তো! ও খুশি হয়ে ঘাড় কাত করে বলে—হ্যাঁ—। কিন্তু আমার সন্দেহ হয় যে, একদিন যদি হঠাৎ করে এখান থেকে আমাকে সরিয়ে নেওয়া হয়, এবং মোটামুটি সাধারণ চেহারার কোনও লোককে বসিয়ে দেওয়া হয় এ জায়গায়, তবে ও বুঝতেই পারবে না তফাতটা। তখনও ও অন্যমনস্কভাবে পিতলের টোকেনটা ঠুকবে কাঠের কাউন্টারে, অন্যমনস্কভাবে চেয়ে থাকবে, চোখে চোখ পড়লে সেই নতুন লোকটার দিকে চেয়ে পরিচিতের মতো একটু হাসবে। ভুলটা ধরা পড়তে একটু সময় লাগবে ওর। কারণ, ও তো সত্যি কখনও আমাকে দেখে না। ও হয়তো ওর নতুন প্রেমিকাটির কথা ভাবছে এখন, শিগগিরই ও একটা স্কুটার কিনবে। ও ঘাড় ফিরিয়ে রিসেপশনের মেয়েটির দিকে কয়েক পলক তাকাল, তারপর ঘড়ি দেখল। একবার টোকেনটার নম্বর দেখে নিল, ঘুলঘুলির ভিতর দিয়ে দেখল আমার দুখানা হাত ক্লান্তিকরভাবে মোটা একগোছা টাকা গুনছে। ও আমার মুখটা একপলক দেখেই চোখটা ফিরিয়ে নিল। কিন্তু আমি জানি যে, ও আমাকে দেখল না। আর পনেরো মিনিট পরে দুটো বাজবে। তখন আমি ক্যাশ বন্ধ করে

নীচে যাব টিফিন করতে। তখন যদি ও আমাকে রাস্তায় দেখতে পায়, আমি ফুটপাথের দোকানে দাঁড়িয়ে থিন অ্যারারুট আর ভাঁড়ের চা খাচ্ছি, তখন কি আমাকে চিনবে ও!

কলা কত করে হে? চল্লিশ পয়সা জোড়া—বলো কী? হ্যাঁ-হ্যাঁ, মর্তমান যে তা আমি জানি, মর্তমান কি আমি চিনি না? ওই সুন্দর হলুদ রং, মসৃণ গা, প্রকাণ্ড চেহারা—মর্তমান দেখলেই চেনা যায়। তা আজ অবশ্য আমার কলা খাওয়ার তারিখ নয়। গতকালই তো খেয়েছি। আমি দু-দিন পর-পর কলা খাই। দাও একটা। না, না ওই একটাই—এই যে কুড়ি পয়সা ভাই। আহা বেশ কলা। চমৎকার। খাওয়া হয়ে যাওয়ার পরও আমি অনেকক্ষণ খোসাটা হাতের মুঠোয় ধরে রইলাম স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে। দশ-পনেরো মিনিট একটু এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ালাম। কলার খোসাটা আমার হাতেই ধরা। আমার চারপাশেই নিরুত্তেজভাবে লোকজন হেঁটে যাচ্ছে। খুবই নির্বিকার তাদের মুখচোখ। এরা কখনও যুদ্ধবিগ্রহ করেনি, দেশ বা জাতির জন্য প্রাণ দিতে হয়নি এদের, এমনকী, খুব কঠিন কোনও কাজও এরা সমাধা করেনি সবাই মিলে। জাতটা মরে আসছে আস্তে-আস্তে, অন্তর্ভাবনায় মগ্ন হয়ে হাঁটছে, চলছে—একে অন্যের সম্পর্কে নিস্পৃহ থেকে। এদের সময়ের জ্ঞান নেই—উনিশশো উনসত্তর বলতে এরা একটা সংখ্যা মাত্র বোঝে, দু-হাজার বছরের ইতিহাস বোঝে না। এদের কাছে 'টেলিপ্যাথি' কিংবা 'ক্রিক রো' যেমন শব্দ, 'ভারতবর্ষ'ও ঠিক তেমনি একটা শব্দ।

দয়া করে, আমাকে দেখুন; এই যে আমি—অরিন্দম বসু—অরিন্দম বসু—এই যে না লম্বা, না-রোগা, না-ফরসা একজন লোক। আমি টেলিপ্যাথি নই, ক্রিক রো নই, ভারতবর্ষও নই—ওই শব্দগুলোর সঙ্গে অরিন্দম বসু—এই শব্দটার একটু তফাত আছে, কিন্তু তা কি আপনি কখনও ধরতে পারবেন?

যাক গে সেসব কথা! মাঝে-মাঝে আমারও সন্দেহ হয়—আমি কি সত্যিই আছি? না কি, নেই? ব্যাঙ্কের ওই ঘুলঘুলি দিয়ে লোকে হাত এগিয়ে টাকা গুনে নেয়, কেউ-কেউ মৃদু হেসে ধন্যবাদ দিয়ে যায়। কিন্তু লোক বদল হলেও তারা অবিকল ওইভাবে হাত বাড়িয়ে টাকা গুনে নেবে আর কেউ-কেউ ধন্যবাদ দিয়ে যাবে, খেয়ালই করবে না ঘুলঘুলির ওপাশে বিশাল পরিবর্তন ঘটে গেছে। সেই নিউ মার্কেটের ঘটনাটার কথাই ধরুন না—আমার বউ হেঁটে-হেঁটে আমাকে খুঁজছে—আমাকে সামনে দেখে, চোখে চোখ রেখেও পেরিয়ে যাচ্ছে, আমাকে, ভাবছে— কী আশ্চর্য লোকটা গেল কোথায়!

খুব যত্নের সঙ্গে কলার খোসাটা আমি ফুটপাথের মাঝখানে রেখে দিলাম! উদাসীন মশাইরা, যদি এর ওপর কেউ পা দেন তাহলে পিছলে পড়ে যেতে-যেতে আপনি হঠাৎ চমকে উঠে আপনার সংবিৎ ফিরে পাবেন। যদি খুব বেশি চোট না পান আপনি, যদি

পড়ো-পড়ো হয়েও সামলে যান, তাহলে দেখবেন আপনার মস্ত লাভ হবে। আপনি চারপাশে চেয়ে দেখবেন। কোথায় কোন রাস্তা দিয়ে আপনি হাঁটছেন তা মনে পড়ে যাবে। দুর্ঘটনা গুরুতর হলে আপনার হাত-পা কিংবা মাথা ভাঙতে পারত ভেবে আপনি খুব সতর্ক হয়ে যাবেন আপনার বিপজ্জনক চারপাশটার সম্বন্ধে। হয়তো আপনার ভিতরকার ঘুমন্ত আমিটা জেগে উঠে ভাববে 'বেঁচে থাকা কত ভালো।' তখন হয়তো মানুষের সম্বন্ধে আপনি আর একটু সচেতন হয়ে উঠবেন এবং বলা যায় না আপনার হয়তো এ কথাও মনে পড়ে যেতে পারে যে, আজ হচ্ছে উনিশশো উনসত্তর সালের ষোলোই জুলাই—আপনার বিয়ের তারিখ, যেটা আপনি একদম ভুলে দিয়েছিলেন এবং এই সালে আপনার বয়স চল্লিশ পার হল। তখন মশাই ভেবে দেখবেন এই যুদ্ধ এবং বিপ্লবহীন ভারতবর্ষে একটি নিস্তেজ দুপুরে রাস্তায় কলার খোলা ফেলে রেখে আমি আপনার খুব অপকার করিনি!

আপনি কি এখন চাঁদের কথা ভাবছেন! আর তিনজন দুঃসাহসী মানুষের কথা! ভাববেন না মশাই, ওসব ভাববেন না। কী কাজ আমাদের ওসব ভেবে। খামোকা মানুষ ওতে ভয়ঙ্কর উত্তেজিত হয়ে পড়ে আর তারপর ভীষণ অবসাদ আসে এক সময়ে। ওদের খুব ভালো যন্ত্র আছে, ওরা ঠিক চাঁদে নেমে যাবে, তারপর আবার ঠিকঠাক ফিরেও আসবে। কিন্তু সেটা ভেবে আপনি অযথা উত্তেজিত এবং অন্যমনস্ক হবেন না। রাস্তা দেখে চলুন। রাজভবনের সামনে বাঁকটা ঘুরতেই দেখুন কী সুন্দর খোলা প্রকাণ্ড ময়দান, উদোম আকাশ। কাছাকাছি যেসব মানুষগুলো হাঁটছে তাদের দেখে নিন, চিনে রাখুন যত দূর সম্ভব অন্যের মুখ—যেন যে-কোনও জায়গায় দেখা হলে আবার চিনতে পারেন। এই সুন্দর বিকেলে ময়দানের কাছাকাছি আমি আপনার পাশেই হাঁটছি—আমাকে দেখুন। এই তো আমি আমার অফিস থেকে বেরিয়েছি। একটু আগেই বেরিয়েছি আজ, খেলা দেখতে যাব বলে। মনে হচ্ছে আপনিও ওইদিকে—না?

দেখুন কী আহাম্মক ছেলেটা—অফসাইডে দাঁড়িয়ে সুন্দর চান্সটা নষ্ট করে দিল। আর মাত্র দশ মিনিট আছে, এখনও গোল হয়নি। আর ওই ছেলেটা—হায় ঈশ্বর, কে ওকে ওই লাল সোনালি জার্সি পরিয়েছে! ওকে বের করে দিক মাঠ থেকে। দিন তো মশাই আপনারা চোস্ত গালাগালিতে ওর ভূত ভাগিয়ে। আমার জিভে আবার খারাপ কথাগুলো আসে না। কিন্তু দেখুন, রাগে আমারও হাত-পা কাঁপছে! আজ সকাল থেকেই চাঁদ আর তিনজন দুঃসাহসী মানুষের কথা ভেবে-ভেবে আমার নার্ভগুলো অসাড় হয়ে আছে! তার ওপর দেখুন এই ফালতু টিমটা আমার দলের কাছ থেকে নিয়ে নিচ্ছে এক পয়েন্ট। একটা পয়েন্ট—কী সাংঘাতিক! ওদিকে আর আট কি ন'মিনিট সময় আছে মাত্র। কী বলেন দাদা, গোল হবে? কী করে হবে! খুদে টিমটার সব খেলোয়াড় পিছিয়ে এসে দেওয়াল তৈরি

করছে গোলের সামনে। আর এরা খেলছে দেখুন, কে বলবে যে গোল দেওয়ার ইচ্ছে আছে? ওই যে ছেলেটা—অফসাইডে দাঁড়িয়ে দিনের সবচেয়ে সহজ চান্সটাকে মাটি করে দিল—আমার ইচ্ছে করছে ওর সামনে গিয়ে বলি—এই আমাকে দ্যাখো, আমি অরিন্দম বসু, এই টিমটাকে আমি ছেলেবেলা থেকে সাপোর্ট করে আসছি। জিতলে ঠাকুরকে ভোগ দিয়েছি, হারলে সুইসাইডের কথা ভেবেছি। তা বাপু, তুমি কি বোঝো সেসব? তুমি তো জানই না যে, আমি—এই ভিড়ের মধ্যে বিশেষ একজন—কীরকম দুঃখ নিয়ে ছলছলে চোখে ঘড়ি দেখছি। অবশ্য তাতে কী যায় আসে। আমি কাঁদি কিংবা হাসি—কিংবা যাই করি—কেউ তো আর আমাকে দেখছে না।

না মশাই গোল হল না। রেফারি ওই লম্বা টানা বাঁশি বাজিয়ে দিল। খেলা শেষ। এখন দয়া করে আমাকে একবার দেখুন কীরকম অবসাদগ্রস্ত আমি, কাঁধ ভেঙে আসছে। দেখুন আমার টিমটাকে আমি কত ভালোবাসি, কিন্তু তাতে টিমের কিছু যায় আসে না। ওরা চেনেই না আমাকে। অথচ আমি প্রতিটি হারজিতের পর কত হেসেছি-লাফিয়েছি-কেঁদেছি-চাপড়ে দিয়েছি অচেনা লোকের পিঠ। খামোকা। তাতে কারও কিছু এসে যায় না। এই যে আমি সকাল থেকে চাঁদ আর তিনজন মানুষের কথা ভেবে চিন্তান্বিত—ভালো করে ভাত খেতে পারিনি উত্তেজনায়—এতেই বা কার কী এসে যায়।

দয়া করে আমাকে একবার দেখুন। না, আমি জানি, আপনি লিগ টেবিলে আপনার টিমের অবস্থা ভেবে বিব্রত। তার ওপর চাঁদ আর সেই তিনজন মানুষের কথাও ভাবতে হচ্ছে আপনাকে। কত কিছু ঘটে যাচ্ছে পৃথিবীতে। সাড়ে উনত্রিশ ফুট লং জাম্প দিচ্ছে মানুষ, গুলিতে মারা যাচ্ছে প্রেসিডেন্ট, ভোটে হেরে যাচ্ছে আপনার দল, বিপ্লব আসতে বড় দেরি করছে। তাই, আমি—অরবিন্দ বসু, ব্যাঙ্কের ক্যাশ ক্লার্ক—আপনার এত কাছে থাকা সত্বেও আপনি আমাকে দেখতে পাচ্ছেন না।

ওই যে দোতলার বারান্দায় রেলিঙের ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে আমার চার বছর বয়সের ছোট ছেলেটা—হাপু। বড় দুরন্ত ছেলে। সকাল থেকে বায়না ধরেছে—রথের মেলায় যাব বাবা, তুমি তাড়াতাড়ি ফিরো। ওই যে এখন দাঁড়িয়ে আছে আমার জন্য। ঝাঁকড়া চুলের নীচে জ্বলজ্বল করছে দুখানা চোখ, আমি এত দূর থেকেও দেখতে পাচ্ছি।

আমি সিঁড়িতে পা দিয়েছি মাত্র, ও ওপর থেকে দুড়দাড় করে নেমে এল—ওর মা ওপর থেকে চেঁচাচ্ছে—হাপু-উ কোথায় গেলি, ও হাপু—উ—উ। এক গাল হেসে হাপু ঝাঁপিয়ে পড়ল প্রায়—কত দেরি করলে বাবা, যাবে না? হ্যাঁ মশাই, বাইরে থেকে ফিরে এলে—এই আপনজনদের মধ্যে আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। কচি ছেলেটাকে আমি কোলে তুলে নিলাম। ওর গায়ে মিষ্টি একটা ঘামের গন্ধ, শীতের রোদের মতো কবোষ্ণ ওর নরম গা।

মুখ ডুবিয়ে দিলে মনে হয় একটা অদৃশ্য স্নান করে নিচ্ছি যেন! বললাম—যাব বাবা, বড় খিদে পেয়েছে, একটু বিশ্রাম করে খেয়ে নিই।

যতক্ষণ আমি বিশ্রাম করলাম ততক্ষণ হাপু আমার গায়ের সঙ্গে লেগে রইল, উত্তেজনায় বলল—শিগগির করো। ওর মা ধমক দিতেই বড় মায়ায় বললাম—আহা, বোকো না, ছেলেমানুষ! আসলে ওর ওই নেই-আঁকড়ে ভাবটুকু বড় ভালো লাগে আমার।

বড় দুরন্ত ছেলে। মেলায় পা দিয়েই হাত ছাড়িয়ে ছুটে যেতে চায়। বললাম—ওরকম করে না। হাপু, হাত ধরে থাকো, আমার হাত ধরেই তুমি ঠিকমতো মেলা দেখতে পাবে। ও কেবল এদিক-ওদিক তাকায় তারপর ভীষণ জোরে চিৎকার করে জিগ্যেস করে—ওটা কী বাবা! আর ওটা! আর ওইখানে! আমি ওকে দেখিয়ে দিই—ওটা নাগরদোলা। ওইটা সার্কাসের তাঁবু। আর ওটা মৃত্যুকূপ!

আস্ত একটা পাঁপর ভাজা হাতে নাগরদোলায় উঠে গেল হাপু। ওই যে দেখা যাচ্ছে তাকে—আকাশের কাছাকাছি উঠে হিহি করে হেসে হাত নাড়ছে—সাঁই করে নেমে আসছে আবার—আবার উঠে যাচ্ছে—সারাক্ষণ আমার দিকে চেয়ে হাসছে হাপু। দেখে মন ভরে যায়।

মৃত্যুকূপের উঁচু প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে ওকে দেখালাম দেওয়াল বেয়ে ভীষণ শব্দে ঘুরে-ঘুরে উঠে নেমে যাচ্ছে তীব্রবেগে মোটর সাইকেল। ও আমাকে আঁকড়ে ধরে থেকে দেখল।

তারপর আধঘন্টার সার্কাস দেখলাম দুজন। দুই মাথাওলা মানুষ সিংগিং ডল, আট ফুট লম্বা লোক। হাপুর কথাবার্তা থেমে গেল। ঝলমল করতে লাগল চোখ।

বাইরে এনে ওকে ছেড়ে দিলাম। আমার পাশে-পাশে ও হাঁটতে লাগল। ওর হাতে ধরা হাতটা থেমে গিয়েছিল বলে আমি ওর হাত ছেড়ে দিলাম।

ওই তো ও এগিয়ে যাচ্ছে আমার হাত ছেড়ে! দোকানে সাজানো একগাদা হুইশল দেখছে ঝুঁকে, আবার এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ায় আর একটা দোকানে, যেখানে এরোপ্লেনের দৌড় হচ্ছে। তারপর আস্তে-আস্তে এগিয়ে যাচ্ছে, ও এয়ার গান আর রংচঙে বল দেখতে-দেখতে আস্তে-আস্তে পা ফেলছে... ক্রমে ভিড়ের মধ্যে চলে যাচ্ছে হাপু...আমি তখন আমার টিমটার কথা ভাবছিলাম—খামোকা একটা পয়েন্ট নষ্ট হয়ে গেল আজ। চাঁদের দিকে চলেছে তিনজন মানুষ—ওরা কি পৌঁছতে পারবে?

হঠাৎ খেয়াল হল, হাপুকে দেখা যাচ্ছে না কোথাও। ভিড়ের মধ্যে এক সেকেন্ড আগেও ওর নীল রঙের শার্টটা আমি দেখেছি। তক্ষুনি সেটা টুপ করে আড়াল হয়ে গেল। হাপু-উ বলে ডাক দিয়ে আমি ছুটে গেলাম....

হ্যাঁ মশাই, আপনারা কেউ দেখেছেন নীল জামা পরা চার বছর বয়সের একটা ছেলেকে? তার নাম হাপু, বড় দুরন্ত ছেলে! দ্যাখেননি? ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া চুল, জ্বলজ্বলে দুটো দুষ্টু চোখ...না, না, ওই পুতুলের দোকানের সামনে যে দাঁড়িয়ে আছে সে নয়—যদিও অনেকটা একইরকম দেখতে। না, তার চেহারার কোনও বিশেষ কিছু চিহ্ন আমার মনে পড়ছে না—খুবই সাধারণ চেহারা, অনেকটা আমার মতোই। কেবল বলতে পারি যে, তার বয়স চার বছর। আর গায়ে নীল জামা। তা নীল জামা পরা অনেক ছেলে এখানে রয়েছে, চার বছর বয়সেরও অনেক। না মশাই, আমার পক্ষে ঠিকঠাক বলা সম্ভব নয় এত—এই হাজার-হাজার ছেলেমেয়ের মধ্যে ঠিক কোন জন—ঠিক কোন জন আমার হাপু—আর বোধহয় হাপুর পক্ষেও বলা সম্ভব নয় এত জনের মধ্যে কোন জন—ঠিক কোন জন—বুঝলেন না, ওর মা-ও একবার ঠিক করতে পারেনি—। যদি হাপুকে দেখতে পান তবে ওকে একবার দয়া করে বলে দেবেন যে এই যে, আমি—এই আমিই ওর বাবা—। এই আমাকে একটু দেখে রাখুন দয়া করে—কাইন্ডলি, ভুলে যাবেন না—

ভুল

আগস্ট মাসের এক সকালবেলায় বিধুভূষণ নামক চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সের এক ভদ্রলোক অফিসে যাওয়ার জন্য কলেজ স্ট্রিটের এক বাসস্টপে দাঁড়িয়েছিলেন।

রাস্তা গিলতে-গিলতে দোতলা বাসগুলো একটার-পর-একটা আসছিল। বিধুভূষণ সকলের মতো হাত তুলছিলেন, কিন্তু অতিরিক্ত বোঝাই ছিল বলে বাসগুলো থামল না। ড্রাইভার হাত নেড়ে পরের বাস-এ ইঙ্গিত করে গেল। এইভাবে পরপর তিনবার।

বিধুভূষণ একবার আড়চোখে দেখে নিলেন এখানকার পুরোনো বাসস্টপটা উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে কি না। না, সেরকম কোনও ঘটনা ঘটেনি। হাতে সময় ছিল। তিনি নিশ্চিন্তভাবে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

অবশেষে একটা বাস থামল। 'নামতে দিন আগে—' হাঁকল কন্ডাক্টর। সে দিকে কান না দিয়ে বিধুভূষণ সকলের সঙ্গে একজোটে ঢেউয়ের মতো ঝাঁপ খেলেন। কে নামল, কে উঠল তা তিনি বুঝলেন না, কিন্তু বাসটা ছেড়ে দেওয়ার পর বুঝলেন যে, তিনি উঠতে পারেননি। দু-তিনজন লোক হইহই করে বাসটার পিছনে ছুটল। তিনি সেরকম কিছু না করে সতর্কভাবে হাত-ঘড়ি, চশমা, মানিব্যাগ ঠিকঠাক আছে কি না দেখে নিয়ে শান্তভাবে অপেক্ষা করতে লাগলেন। আবছাভাবে তাঁর মনে হল একটা মোটা মতো লোক তাঁর সামনে পা-দানিটা আড়াল করেছিল—নইলে তিনি উঠতে পারতেন।

পরের বাসটাও এসে থামল। 'নামতে দিন আগে—' কন্ডাক্টর হাঁকল। সকলে ঢেউয়ের মতো ঝাঁপ খেল। সেই ভিড়ে বিধুভূষণ ইঁদুরের মতো দ্রুত চেষ্টায় একটা গর্ত খুঁড়ে নিলেন। এবারে হ্যান্ডেলটা ধরতে পারলেন তিনি। কিন্তু পা-দানিতে পা রাখতে পারলেন না। বাসটা ছেড়ে দেওয়ার পর তিনি হ্যান্ডেল ছাড়লেন এবং বুঝলেন এবারও তিনি উঠতে পারেননি। এবারও তিনি অপেক্ষা করতে লাগলেন, কেন না এখনও সতেরো মিনিট সময়

আছে। কিন্তু এবার তাঁর স্পষ্ট মনে হল একটা মোটামতো লোক—পাঞ্জাবি-পরা, ঘাড়ের চুল পুলিশদের মতো ছোট করে ছাঁটা—তাঁর পথ আটকে ছিল। তিনি দু-একবার চোখ বুলিয়ে লোকটাকে খুঁজলেন, সম্ভবত লোকটা উঠে গেছে। তিনি বিরক্তিকর ভিড় থেকে চোখ তুলে ল্যাম্পপোস্টে লটকানে চৌকো বাক্সের গায়ে একটা সিনেমার পোস্টার দেখতে লাগলেন। 'এই তো আমাদের জাতীয় চরিত্র'—ভাবলেন তিনি—'মানুষের পথ আটকে রাখা, নিজে উঠে যাওয়া—এই সব—।'

পরের বাসটা আসতে দেখে এবার সর্তক হলেন। এ বাসটাও থামল। 'নামতে দিন আগে'—হাঁক কন্ডাক্টর। এবার তিনি ঢেউয়ে গা ছাড়লেন না। আগে থেকে সতর্ক ছিলেন বলে শক্ত থেকে কৌশলে তিনি হ্যান্ডেল ধরলেন। বারবার তিনবার। এইবার তিনি পাদানিতে পা রাখলেন।

কিন্তু নিয়তি। টের পেলেন কে যেন পিছন থেকে তাঁর কোমর ধরেছে। লোকটা টাল খাচ্ছে—তার নিশ্বাস বিধুভূষণের ঘাড়ের ওপর পড়ছিল। 'আমি পড়ে যাচ্ছি যে, ও মশাই—' বিধুভূষণ আর্তকণ্ঠে বললেন—'আমার কোমরটা ছেড়ে দিন।' বিধুভূষণকে অবশেষে নামতে হয়। লোকটাই টেনে নামায় তাঁকে।

কখনও যা করেন না—এমনিতেই ভিতু, শান্তপ্রকৃতির বিধুভূষণ হঠাৎ তাই করলেন। 'এটা কী হল?' বলে লোকটার মুখোমুখি দাঁড়ালেন। দেখলেন এই সেই লোক—পরনে পাঞ্জাবি, মাথার চুল পুলিশের মতো ছোট করে ছাঁটা—চর্বির পাহাড়। কোনও উত্তর দিল না লোকটা বিধুভূষণের দিকে চেয়েও দেখল না। অলসভাবে পান চিবোচ্ছিল। আধখোলা চোখ দুটো দেখে হঠাৎ মনে হয় লোকটা ঘুমিয়ে আছে।

এত রেগে গিয়েছিলেন বিধুভূষণ যে, তিনি তার পুরোনো হাঁপানির চাপটা অনুভব করলেন। তাঁর গলা আটকে আসছিল এবং হাত পা কাঁপছিল। মনে পড়ল তাঁর প্রেসার সম্প্রতি দু-শোর খুব কাছাকাছি গিয়েছিল—কোনওরকম উত্তেজনা ডাক্তারের বারণ। প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে বিধুভূষণ ঠান্ডা হয়ে গেলেন। রাস্তাঘাটে হাঙ্গামা উত্তেজনা তিনি সব সময়ে এড়িয়ে চলেন—তা ছাড়া তাঁর ভয় আছে হঠাৎ করোনারি অ্যাটাক হতে পারে। দুম করে মরে যেতে তিনি চান না।

বিধুভূষণ সরে এলেন। লোকটার থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে তিনি দাঁড়িয়ে দেখলেন পরপর তিনখানা একই নম্বরের বাস আসছে। তিনি সাবধানে লোকটাকে দূর থেকে একবার দেখে নিলেন। আশ্চর্য! বিধুভূষণের মনে হল তাঁর কোনও কথাই লোকটার কানে যায়নি। লোকটা বিধুভূষণ যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন সেদিকে তাকাল—কিন্তু বিধুভূষণকে দেখল বলে মনে হল না। যেন বিধুভূষণের দেহ ভেদ করে লোকটার দৃষ্টি

সরে গেল। কোথাও বাধা পেল না। নির্বিকার লোকটির দিকে বিধুভূষণ তাকিয়ে রইলেন, আশ্চর্য!

তৃতীয় বাসটাতে জায়গা পেলেন বিধুভূষণ। যদিও ঠেলাঠেলি ভিড় ছিল তবু ভিতরে ঢুকতে পারলেন এবং রড ধরে দাঁড়ালেন। তাঁর অফিস পার্কস্ট্রিটে, ডালহৌসিতে বাসটা খালি হয়ে গেলে পার্কস্ট্রিট পর্যন্ত বসে যাওয়া যাবে। ঘড়ি দেখলেন বিধুভূষণ—প্রায় কুড়ি মিনিট কিংবা তারও কিছু বেশি দেরি হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। তা হোক! আঠারো বছরের পুরোনো পোষা চাকরি তাঁর—এটুকু খাতির তিনি পেতে পারেন—পানও।

ডালহৌসিতে বাসটা খালি হতে শুরু করল। ঠিক বিধুভূষণের সামনের সিট থেকে দুজনেই উঠে গেল—তাদের যাওয়ার জায়গাটা করে দিতে গিয়ে একটু কাত হলেন বিধুভূষণ। জানলার ধারের সিট বিধুভূষণের প্রিয়। লোকদুটো বেরিয়ে যাওয়া এবং বিধুভূষণের বসবার চেষ্টা করার ভিতরে যেটুকু সময়ের এবং দূরত্বের ব্যবধান ছিল তারই এক ফাঁক দিয়ে কী করে যে তা বিধুভূষণ বুঝলেন না—একটা মোটা মতো লোক ঢুকে গেল এবং জানলার ধারে বসে পড়ল। বিধুভূষণ তাকিয়ে দু-চোখকে বিশ্বাস করতে পারলেন না। আশ্চর্য! এ সেই লোকটা—মোটামতো, পাঞ্জাবি পরা ঘাড়ের চুল পুলিশদের মতো ছোট করে ছাঁটা! মুহূর্তেই অন্যমনস্ক হয়ে গেল লোকটা, জানলার বাইরে তাকিয়ে রইল, বিধুভূষণের দিকে ফিরেই তাকাল না। কার পাছার ধাক্কা খেয়ে বিধুভূষণ লোকটার পাশেই বসে পড়লেন।

তাহলে এসব কী হচ্ছে! বিধুভূষণ চোখ বুজে ভেবে দেখবার চেষ্টা করলেন। ছেলেবেলায় লজিকে চান্স আর প্রব্যাবিলিটির যে কথা পড়েছিলেন তা মনে করবার চেষ্টা করে দেখলেন। কিছুই মনে পড়ল না। একবার সন্তর্পণে চোখ খুলে দেখলেন লোকটা তেমনি অন্যমনস্ক, বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে। বিধুভূষণ যে পাশে আছেন তা জানে বলে মনে হল না। বিধুভূষণ লক্ষ করলেন লোকটার মুখের বাঁ-পাশে ঠিক চোখের কাছেই একটা লালচে আঁচিল রয়েছে।

তারপর ময়দানের খোলা হাওয়া লাগতেই বিধুভূষণের একটু ঢুলুনি এল। বারকয়েক ঝুঁকে পড়ল মাথা। নিজেকে এইভাবে ঘুমিয়ে নিতে দেন তিনি! জানেন, ঠিক স্টপেজে গাড়ি থামলেই তাঁর ঘুম ভেঙে যাবে। এই কোনওদিন অন্যথা হয়নি। এর সঙ্গে পাভলভের কন্ডিশনড রিফ্লেক্সের কোনও সম্পর্ক আছে কি না তা বিধুভূষণ ভেবে দেখেননি। কন্ডিশনড রিফ্লেক্সের কথা আবছাভাবে শুনেছেন তিনি। একটা কুকুরকে নিয়ে এই ধরনের পরীক্ষা চালানো হয়েছিল। কিন্তু পৃথিবীর কোনও কুকুরের সঙ্গেই আজ পর্যন্ত তিনি নিজের সাযুজ্য খুঁজে পাননি।

আজও ঠিক স্টপেজে ঘুম ভাঙল এবং বিধুভূষণ ভাতঘুম থেকে জেগে উঠে আজকের যাবতীয় ঘটনার কথা ভুলে গিয়ে অফিসের দিকে হাঁটতে লাগলেন। ঘাড়ে মাথায় ময়দানের খোলা বাতাস লাগছিল। ভারী খুশি হয়ে উঠলেন তিনি।

অফিসে গিয়েই তিনি একগ্লাস জল খান। আজও খেলেন। হাজিরা খাতায় সই করলেন হাতঘড়ি দেখে। ঠিক পঁচিশ মিনিট লেট! তাই লিখে দিলেন। তারপর চক্রবর্তীর মুখোমুখি একই টেবিলে বসলেন বিধুভূষণ। চক্রবর্তী মাথা গুঁজে অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে একটা ফাইল খুলে দেখছিল যা সে কখনও করে না। চক্রবর্তী মুখ তুলেই খুব নীচু গলায় বলল, 'আজই লেট করলেন!'

'কেন! আজ কী!' জিগ্যেস করেন বিধুভূষণ।

'আজ নতুন ম্যানেজার চার্জ নিয়েছে যে! বম্বে অফিসের লোক একটু কড়া ধাতের।'

হাসলেন বিধুভূষণ। সে হাসিতে আত্মপ্রত্যয় ছিল—চক্রবর্তী আড়চোখে দেখল।

দিনটা যেমন খারাপ যাবে বলে প্রথমটায় মনে হয়েছিল বিধুভূষণের তেমনটা হল না। লাঞ্চ পর্যন্ত বেশ কেটে গেল। বাকিটাও যাবে—এই ভেবে তিনি দুটি কলা দু-খানা বিস্কুট ও এক কাপ চায়ের টিফিন সেরে এসে চেয়ারে বসতেই বেয়ারা একটা চিরকুট নিয়ে এল। তাতে লেখা 'ব্যাপারটা জরুরি। তাড়াতাড়ি আসুন।' নীচে অস্পষ্ট সই। তার নীচে লেখা—'ম্যানেজার।' একটু ভড়কে গেলেন বিধুভূষণ। গত আঠারো বছরে তিনি তিনবার মাত্র ম্যানেজারের ঘরে গিয়ে তাঁর মুখোমুখি হয়েছেন—তার মধ্যেও প্রথমবার সেই ইন্টারভিউয়ের সময়। দেখলেন চিরকুটটিতে সই ছাড়া আর বাদবাকি অংশ সুন্দর ঝরঝরে টাইপ করা। বুঝলেন—নতুন ম্যানেজার কাজের লোক—কোনও বিষয় অস্পষ্ট রাখতে চান না। বেয়ারার মুখে সেলাম পাঠালেও হত—কিন্তু তা তিনি করেননি।

বিধুভূষণ কাউকে কিছু বললেন না। ব্যাপারটা গোপন রেখে তিনি দোতলা থেকে তিনতলায় উঠে এলেন। তিনতলায় মাত্র দুখানা ঘর—একখানা কমিটি রুম, অন্যটি ম্যানেজারের। দুটিই এয়ারকন্ডিশন করা—করিডোরে দাঁড়িয়েও সেই ঠান্ডা ভাব টের পাওয়া যায়। বিধুভূষণের প্রায় শীত ধরে গেল।

নিজের নামধাম লিখে একটা চিরকুট ভিতরে পাঠানোর পরও অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হল। দুজন লোক—সুটপরা—ম্যানেজারের ঘর থেকে বেরিয়ে আসবার পর তাঁর ডাক পড়ল। বিধুভূষণ প্রকাণ্ড দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকলেন। দরজাটা তাঁর পিছনে আবার নিঃশব্দে বন্ধ হয়ে গেল।

সবকিছুই প্রকাণ্ড দেখলেন বিধুভূষণ। প্রকাণ্ড জানলা, প্রকাণ্ড শেলফ, প্রকাণ্ড টেবিল—সবকিছুই খুব চকচকে ঝকঝকে। দেখলেন আরও অনেক আসবাব রয়েছে যার নাম তাঁর জানা নেই। এত কিছুর ভিতরে লোকটাকে চোখেই পড়ে না।

লোকটা—নতুন ম্যানেজার—কিন্তু মুখ তুলল না, বিধুভূষণের নামধাম লেখা চিরকুটটার দিকে চোখ রেখে বলল, 'আপনি ব্যাঙ্কিংয়ের কিছু জানেন?'

বিধুভূষণকে কেউ একবার শূন্যে তুলেই নামিয়ে দিল—কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই তার ওজনটা চুরি করে নিল। নিজেকে খুব হালকা অনুভব করলেন বিধুভূষণ—পাছে পাখার বাতাসে উড়ে যান সেই ভয়ে সামনের চেয়ারে পিছনটা চেপে ধরতেই তাঁর খেয়াল হল—এই ঘরে পাখা নেই।

চেয়ারটা চেপে ধরতে গেলে কোনও শব্দ হয়ে থাকবে। ম্যানেজার তাঁর অন্যমনস্ক চোখ তুলে বিধুভূষণকে দেখলেন। আবার একে না-দেখাও বলা যায়। সে দৃষ্টি বিধুভূষণকে ভেদ করে গেল। কোনওখানে বাধা পেল না। কিন্তু বিধুভূষণ দেখলেন বাঁ-চোখের পাশে সেই লালচে আঁচিল—মাথার চুল পুলিশদের মতো ছোট করে ছাঁটা, চর্বির পাহাড়। কী করে সম্ভব হল! আশ্চর্য!

'স্যার...!' বিধুভূষণ বললেন।

'আমাদের কাজের সঙ্গে ব্যাঙ্কিংয়ের যোগাযোগ বেশি। আমার মনে হয়, আপনার ব্যাঙ্কিংটা শিখে নিতে হবে।' ম্যানেজার বললেন, 'আপনার বয়স কত?'

'আজ্ঞে?' বিধুভূষণ কোনওরকমে মাথা ঠিক রেখে বললেন, 'তেতাল্লিশ।'

'তা এমন আর বেশি কী? এই বয়সেও অনেকে শেখে।' ম্যানেজারকে একটু চিন্তিত দেখাল, 'কিন্তু আপনাকে আরও বুড়ো দেখায়। ধরুন পঞ্চাশ টঞ্চাশ!' একটু হাসলেন ম্যানেজার 'সার্টিফিকেটের বয়স তা হলে তেতাল্লিশ?'

'মানে, আমার আসল বয়সও....'

'ঠিক আছে।' হাত তুলে বিধুভূষণকে থামালেন ম্যানেজার 'কয়েকটা বই আপনাকে পড়তে হবে।' ম্যানেজার খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন। বিধুভূষণকে দেখেও দেখলেন না। কিন্তু চোখ দুটো বিধুভূষণের দিকেই রাখা আছে।

'স্যার...' বিধুভূষণ প্রায় লিত কণ্ঠে বলবার চেষ্টা করলেন 'বাসের সেই ব্যাপারটা।'

'আপনাকে একটা অফিসিয়াল পরীক্ষাতেও পাশ করতে হবে।' বিধুভূষণের কথায় কান না দিয়ে ম্যানেজার বললেন।

'...ব্যাপারটার জন্য আমি দুঃখিত।' বিধুভূষণ তাঁর কথা শেষ করেন।

'কোন ব্যাপারটা?' ভ্রূ কোঁচকালেন ম্যানেজার।

'কলেজ স্ট্রিটে পৌনে দশটা—না, দশটা বাজতে সতেরো মিনিটের সময়....'

'কী হয়েছিল?'

বিধুভূষণ অসহায়ভাবে মেঝের কার্পেটের দিকে চোখ রেখে বললেন, 'ব্যবহারটা খুবই খারাপ হয়েছিল স্যার—আমি স্বীকার করছি। আপনাকে চিনতে পারিনি!'

'কখন? কোথায়?'

'কলেজ স্ট্রিটে স্যার, পৌনে দশটায়—না, দশটা বাজতে সতেরো মিনিটের সময়...'

'পৌনে দশটা! কলেজ স্ট্রিট!' ম্যানেজারকে খুব অন্যমনস্ক দেখাল, 'কিন্তু আমি তো অনেক আগে অফিসে এসেছি! সাড়ে ন'টায়।' বলেই সকৌতুকে বিধুভূষণের দিকে তাকিয়ে নিষ্ঠুরভাবে হাসলেন ম্যানেজার, 'আপনি আমাকে পেলেন কোথায়? আর আমার ফ্ল্যাট তো বালিগঞ্জে!'

বিধুভূষণ কথা খুঁজে পেলেন না। কিন্তু তাঁর মনে হচ্ছিল এর উত্তরে উপযুক্ত যে কথাগুলো বলা যায় সেগুলো তাঁর মাথার চারপাশে বাতাসের ভিতরে বিজবিজ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারই দু-একটা ধরবার জন্য তিনি মাথা ঝাঁকালেন, কান চুলকোলেন, হাত দিয়ে মশা তাড়ানোর মতো বাতাসে ঝাপটা মারলেন। শেষপর্যন্ত তাঁর মুখ দিয়ে বেরোল, 'ভুল স্যার...সবই ভুল...'

'Crasy?' হাসলেন ম্যানেজার, 'কিন্তু ব্যাঙ্কিংটা ভুললে চলবে না। মনে থাকবে?'

অসহায় বিধুভূষণ মাথা নাড়লেন—থাকবে।

'আর দেখছি—আপনি আজ পঁচিশ মিনিট লেট!' বলে সোনার চেনে বাঁধা গাড়ির চাবিটা বোঁ করে ঘোরালেন ম্যানেজার। বিধুভূষণের মনে পড়ল ম্যানেজারের গাড়ি আছে—অফিস থেকেই গাড়ি দেওয়া হয়। চাবিটা ঘোরাতে-ঘোরাতেই ম্যানেজার বললেন, 'এরকম যেন আর না হয়।'

কি না হওয়ার জন্য বলেছেন ম্যানেজার, তা না বুঝেই বিধুভূষণ মাথা নাড়লেন—হবে না।

'আপনি আসুন তাহলে...' ম্যানেজার বললেন, তাঁর হাতে তখনও চাবিটা ঘুরছে, তিনি অস্ফুট গলায় বললেন, 'পৌনে দশটা! কলেজ স্ট্রিট!'

বিধুভূষণ ফিরে আসছিলেন, কী একটা শব্দে পিছন ফিরে দেখলেন ম্যানেজারের হাত থেকে চাবিটা ছিটকে প্রথমে গ্লাসটপ টেবিলের ধারে লেগে মেঝের কার্পেটের ওপর পড়ে গেল। অন্যমনস্ক ম্যানেজার সেটা তুলতে নীচু হতেই ভীষণ চমকে উঠলেন বিধুভূষণ। তাঁর মনে হল ম্যানেজারের পিছন দিকটা কলকবজায় ভরা। রেডিওর পিছনের ঢাকনাটা খুলে ফেলল ভেতরটা যেমন দেখায়, অনেকটা তেমনি। মনে হল কোমরে একটা প্লাগ লাগানো আছে—যার তার কোনও গুপ্ত প্লাগ পয়েন্ট পর্যন্ত গেছে! বিস্ময়ে ঘুরে দাঁড়ালেন বিধুভূষণ। এক পলকের ভুল সংশোধন করে ম্যানেজার আবার সোজা হয়ে বসেছেন তখন, গম্ভীর মুখ, চোখ অন্যমনস্ক। ধীরে বললেন, 'আপনি আসুন।'

বিধুভূষণ কিছুই বললেন না। তাঁর মনে হল তিনি এক অদৃশ্য বেতার সংকেত পেলেন, ম্যানেজারের দূরমনস্ক চোখ যেন বলল, 'কী করা যাবে বলুন, চাবিটা পড়ে গেছে—সুতরাং সেটা কুড়িয়ে নেওয়াই নিয়ম! একটা ভুল হয়ে গেছে—আপনি আমার কলকবজা দেখে ফেলেছেন। কিন্তু আমার কি করার ছিল?'

বিধুভূষণ একটু ইতস্তত করলেন। কিন্তু ম্যানেজারের পিছন দিকটা আর দেখা গেল না। এবার উনি খুব সতর্ক। বিধুভূষণকে উঁকিঝুঁকি দিতে দেখে বিরক্ত হয়ে বললেন, 'কী ব্যাপার?'

'কিছু না স্যার!' বিধুভূষণ খানিকটা দুঃসাহসে ভর করে হাসলেন, 'আপনার পিছনটা...'

'আমার পিছনটা...! ম্যানেজার হাঁ করে বিধুভূষণকে দেখতে লাগলেন।

'আজ্ঞে, আমি দেখে ফেলেছি!' দুষ্টু ছেলের মতো মুখ করলেন বিধুভূষণ।

'কী দেখেছেন?' প্রশ্ন করলেন ম্যানেজার।

'আপনার পিছনে...' বলতে গেলেন বিধুভূষণ।

প্রায় লাফিয়ে উঠলেন ম্যানেজার, 'কী? কাঁকড়াবিছে? আরশোলা?' উঠে দাঁড়ালেন ম্যানেজার।

বিধুভূষণ দেখলেন। না, কলকবজা কিছুই নেই। পাঞ্জাবির সাদা পিঠ দেখা যাচ্ছে। এ কি চোখে দেখবার ভুল। নিজের চোখ কচলালেন বিধুভূষণ। কোনওক্রমে বললেন, 'ভুল স্যার....সবই ভুল...'

মুহূর্তেই ম্যানেজারের ফরসা মুখ রাঙা হয়ে গেল। তিনি উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। দু-হাতে পাঞ্জাবির পিছন দিকটা ঝাড়বার চেষ্টা করেছিলেন। হঠাৎ বিধুভূষণের কথা শুনে তিনি—যেন আরশোলা বা কাঁকড়াবিছে খুঁজে না পেয়ে—ভয়ংকর রেগে গিয়ে বললেন, 'নাউ গেট ইওরসেলফ আউট! ইউ...ইউ...!'

বিধুভূষণ নিঃশব্দে দরজা ঠেলে বেরিয়ে এলেন। আসতে-আসতে শুনলেন ম্যানেজার চাপা রাগের গলায় বলছেন, 'কলেজ স্ট্রিট...পৌনে দশটা...আমার পিছনটা...কাঁকড়াবিছে...আরশোলা! এর মানে কী?'

'ভুল...স্যার...সবই ভুল...' বিধুভূষণ মনে-মনে বললেন। বাইরে এসে করিডোর ধরে এগিয়ে গেলেন তিনি। চাকরিটা বোধহয় আর রাখা গেল না। কিন্তু কেন? কেন? কোথায় ভুল হচ্ছে।

নিজের সিটে এসে বসবার কিছুক্ষণ পরেই সেকশন ইনচার্জ-এর একটা চিরকুট পেলেন বিধুভূষণ। তাতে লেখা : 'ম্যানেজারের আদেশ মতো আপনাকে জানানো হচ্ছে যে, ম্যানেজার মনে করেন আপনি আজ খুব সুস্থ নন। আপনাকে অফিস ছেড়ে যাওয়ার এবং বিশ্রাম নেওয়ার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে। আজ এখন আপনার ছুটি।' নীচে অস্পষ্ট সই। তার নীচে লেখা 'সেকশন ইনচার্জ।'

মুহূর্তেই খুশি হয়ে উঠলেন বিধুভূষণ। গত আঠারো বছর চাকরিতে এই প্রথম তিনি একা ওপরওয়ালার ইচ্ছেয় ছুটি পেয়েছেন। কাউকে কিছু বললেন না বিধুভূষণ, চক্রবর্তীকেও না। তাড়াতাড়ি ফাইলে কাগজপত্র বেঁধে-ছেঁদে রাখলেন। আশ্চর্য! তাঁর বিশ্রাম দরকার! কথাটা তাঁর নিজেরও অনেকবার মনে হয়েছে। আশ্চর্য!

বেরিয়ে পড়লেন বিধুভূষণ। বেরিয়েই একটা ট্যাক্সি ধরলেন। পিছনের সিটে গা এলিয়ে দিয়ে চোখ বুজে বললেন, 'কলেজ স্ট্রিট—না, না, কলেজ রো...'

ট্যাক্সি দ্রুত চলল। হুহু করে হাওয়া লাগছিল বিধুভূষণের চোখে-মুখে। মুহূর্তেই ভাতঘুমটা ফিরে আসতে চাইছে টের পেয়ে যেন আধোস্বপ্নের ভিতর হাসলেন বিধুভূষণ। অনেক কিছুর শখ ছিল তাঁর। নিজের এমনি একটা গাড়ি থাকলে এমনি ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে অফিসে আসতে পারতেন তিনি, ঘুমিয়ে যেতেও পারতেন। না, কিছুই হয় না নিজের মনোমতো, কখনওই হয় না। কিন্তু কেন?

সামান্য চোখ খুলে তিনি বাইরের দিকটা দেখলেন। খানিকক্ষণ দেখেই চমকে উঠলেন তিনি—এ তো রেড রোড। আশ্চর্য! এ রাস্তায় তো তাঁর আসবার কথা নয়। ঝাঁঝিয়ে উঠলেন তিনি 'এটা কী হল, অ ট্যাক্সি ড্রাইভার?' 'এটা তো রেড রোড...ধর্মতলা যে...'

ট্যাক্সিওয়ালা মুখ ঘোরাতেই খানিকটা থতমত খেয়ে আমতা-আমতা করে বিধুভূষণ বললেন, 'ভুল স্যার...সবই ভুল...' তিনি চোখ বুজে ফেললেন। কেন না ততক্ষণে ট্যাক্সি ড্রাইভারের বাঁ চোখের পাশে লালচে আঁচিলটা দেখে ফেলেছেন, সেই পুলিশদের মতো ছোট করে ছাঁটা চুল, পরনে পাঞ্জাবি। আশ্চর্য! আর কিছুই দেখতে চাইলেন না বিধুভূষণ। শুধু আর-একবার বিড়বিড় করলেন 'ভুল স্যার...'

ড্রাইভার ঘাড় ঘুরিয়ে নিলে অনেকক্ষণ পর আর-একবার অতি সন্তর্পণে চোখ খুললেন বিধুভূষণ। টেলিভিশন তিনি কখনও দেখেননি। কিন্তু তাঁর হঠাৎ মনে হল সামনের উইন্ডস্ক্রিন জুড়ে ছবি ভেসে উঠেছে, অচেনা পথঘাট, অচেনা গাছ, অদেখা বাড়ি-ঘর, লোকজন। এ কি বিদেশ! এত সহজে বিদেশ! এত অল্প সময়ে! না কি টেলিভিশন! মোটা ফরসা ম্যানেজারের কাঁধের পাশ দিয়ে কিছুক্ষণ সেই টেলিভিশন দেখে তিনি আর-একবার বলবার চেষ্টা করলেন 'ভুল স্যার...সবই ভুল...' ম্যানেজার—এখন ড্রাইভার—তাঁকে লক্ষই করল না।

চোখ বুজে হঠাৎ পরম আরামে ঘুমিয়ে পড়লেন বিধুভূষণ।

কলেজ রো-তে নেমে ট্যাক্সি ভাড়া মিটিয়ে দিলেন তিনি। ভাড়াটা সরাসরি ম্যানেজারের হাতে দিতে একটু লজ্জা করছিল তাঁর। ম্যানেজার সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করল না, তাঁর দিকেও তাকাল না। এমন কি ভাড়ার এক টাকা কুড়ি পয়সা গুনেও নিল না। বিধুভূষণ বিনীতভাবে নমস্কার করলেন তাঁকে।

ট্যাক্সিটা চলে গেল। সেইদিকে চেয়ে রইলেন বিধুভূষণ। আশ্চর্য!

বাড়িতে ঢুকতেই একটা হইচই পড়ে গেল। বড় দুই ছেলেমেয়ে ছুটে এল, গিন্নি নেমে এলেন হাঁপাতে-হাঁপাতে, 'কি গো, কী হয়েছে তোমার? শরীর-টরীর?'

মৃদু হেসে বরাভয়ের ভঙ্গিতে হাত তুলে তাদের নিরস্ত করলেন বিধুভূষণ, 'কিছু হয়নি।'

'তাহলে অফিস?'

'ছুটি হয়ে গেল আজ।'

'কেন গো?'

হঠাৎ দীর্ঘশ্বাস ফেললেন বিধুভূষণ, 'একজন কেরানি মারা গেল হঠাৎ। তাই...' একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'আমাকে বিরক্ত কোরো না কেউ। আমি একটু ঘুমোব।' বলে

সিঁড়ি ভেঙে নিজের ঘরে এলেন বিধুভূষণ। সন্তর্পণে দরজা বন্ধ করে ছিটকিনি তুলে দিলেন।

কী করে, কোন পথে গেলে লোকটাকে এড়ানো যায়—তা বিধুভূষণ ভেবে পেলেন না। চাকরি ছেড়ে দিয়ে ঘরে বসে থাকবেন! কিন্তু সেটা কেমন দেখাবে? তা ছাড়া তাঁর ছেলেমেয়েরাও বড় হয়নি—বুড়ো মা-বাবাকে টাকা পাঠাতে হয়—গিন্নিকে নিয়ে তাঁর সাধআহ্লাদ এখনও মেটেনি। কী করবেন বিধুভূষণ?

অনেক ভেবে-টেবে দেখলেন বিধুভূষণ। তাঁর মনে হল এ ব্যাপারটা কাউকে জানিয়ে দিলে হয়। কাকে জানাতে হবে তার কিছুই তিনি জানেন না। তবু আবছাভাবে তাঁর মনে হল এ ব্যাপারে একটা যুক্তিপূর্ণ অভিযোগ তিনি খাড়া করতে পারেন।

কিছুই জানেন না বিধুভূষণ কাকে জানাবেন—কী জানাবেন—এবং কীভাবে জানাবেন—তবু তিনি গোটা দুই ফুলস্ক্যাপ কাগজ তাঁর ছেলের লম্বা খাতা থেকে ছিঁড়ে নিলেন। তারপর কলম বাগিয়ে বসলেন তিনি।

পাঠ লিখলেন : 'মান্যবরেষু।'

তারপর লিখলেন : আমার একটি অভিযোগ আছে...

তারপর কী লিখবেন ভেবে না পেয়ে কলম কামড়ে ধরে জানালার বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলেন। কোথায় কী একটা গোলমাল রয়েছে, ষড়যন্ত্র রয়েছে যা কিছুতেই ধরতে পারছেন না তিনি। উঠে খানিকক্ষণ পায়চারি করলেন। আবার বসলেন, খানিকটা আঁকিবুকি করলেন কাগজটার ওপর। আরও কাগজ ছিঁড়লেন খাতা থেকে। তারপর টেবিলে মাথা রেখে আস্তে-আস্তে ঘুমিয়ে পড়লেন বিধুভূষণ।

ঘুম ভাঙল গিন্নির ডাকে। ধড়মড় করে উঠে দেখলেন অন্ধকার হয়ে এসেছে। দরজা খুলে দিতেই গিন্নি বললেন 'এত ঘুম!' খেঁকিয়ে উঠতে যাচ্ছিলেন বিধুভূষণ হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল এতক্ষণ অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছেন তিনি। স্বপ্ন দেখেছেন যে একটা স্বপ্ন দেখে তাঁর ঘুম ভেঙে গেছে—কিন্তু আশ্চর্য হচ্ছে এই যে সেই ঘুম ভাঙাটাও আসলে স্বপ্নের ভিতরেই ঘটেছে—তারপর আরও একবার ঘুম ভাঙল, তাঁর মনে হল আগের জেগে ওঠাটাই স্বপ্ন ছিল। এইভাবে একটার-পর-একটা স্বপ্ন ভাঙছিল তাঁর আরও মনে হচ্ছিল আগের স্বপ্নটাই ছিল স্বপ্ন, আগের ঘুমটাই ছিল ঘুম। স্বপ্নের ভিতরে স্বপ্ন, তার ভিতরে স্বপ্ন এবং প্রতিটি স্বপ্নই ভেঙে যাওয়ার স্বপ্ন। এই ভাবে ঘুমের ভিতরে ঘুম ভেঙে যাওয়ার স্বপ্ন এবং তারও ভিতরে ঘুম ভেঙে যাওয়ার স্বপ্ন দেখতে-দেখতে কতদূর তলিয়ে গিয়েছিলেন বিধুভূষণ?

ভেবেই উত্তেজিত হলেন বিধুভূষণ। রক্তচাপ বেড়ে গেল। গিন্নিকে বললেন, 'আমায় একটা রামচিমটি কাটো তো! প্রথম-প্রথম যেমন কাটতে!'

'কেন গো?'

'বুঝতে পারছি না জেগে আছি কি না।'

'আহা।' গিন্নি বললেন।

'দ্যাখো না!'

গিন্নি ফিক করে হেসে ফেললেন। হাসিটা চমৎকার, দুপাশে দুটি ছোট-ছোট আক্কেল দাঁত দেখা যায়—এখনও বুকের ভিতর তোলপাড় করে ওঠে বিধুভূষণের। তিনি দুই ব্যগ্র হাত বাড়িয়ে দিতেই গিন্নি ছুটে পালালেন।

বিধুভূষণ হাই তুললেন। লাইট জ্বাললেন। তারপর চুপচাপ টেবিলের ওপর অভিযোগ পত্রটার দিকে তাকিয়ে রইলেন : 'মান্যবরেষু, আমার একটি অভিযোগ আছে...' ব্যস, আর কিছু লেখা নেই।

গিন্নি চা নিয়ে এলেন কিছুক্ষণ পর। চায়ের কাপটা রেখে সদ্য বাঁধা খোঁপাটা ঠিকঠাক করতে-করতে হঠাৎ বললেন, 'ওঃ, তোমায় বলতে ভুলে গেছি। তুমি যখন ঘুমোচ্ছিলে তখন তোমায় খুঁজতে একটা লোক এসেছিল।'

চায়ের কাপটা প্রায় উলটে ফেলে ঘুরে দাঁড়ালেন বিধুভূষণ, 'কে?'

গিন্নি হেসে বললেন, 'কে যেন চিনি না। একটা চিরকুট দিয়ে গেছে।'

'কেমন চেহারা লোকটার?' রুদ্ধশ্বাসে বললেন বিধুভূষণ।

'তেমন লক্ষ করিনি তো! তবে বেশ সুন্দর চেহারা। ফরসা, মোটা-সোটা, ছোট করে ছাঁটা চুল।'

'পুলিশদের মতো?'

'না, পুলিশ-টুলিশ মনে হল না তো?'

'আহা, পুলিশ কে বলছে! বলছি চুলটা কি পুলিশদের মতো?'

'কী জানি বাপু!' রসালো ঠোঁট উলটে বললেন গিন্নি। কিন্তু সেদিকে লক্ষ করলেন না বিধুভূষণ, জিগ্যেস করলেন, 'বাঁ-চোখের পাশে একটা লালচে আঁচিল ছিল? মনে করে দ্যাখো তো?'

গিন্নি খানিকক্ষণ ভেবে বললেন, 'ঠিক মনে পড়ছে না, তবে হতে পারে। চোখ দুটো যেন কেমন বাপু, এমন হাঁ করে দেখছিল। মনে হচ্ছিল কোথায় যেন...'

'ম্যানেজার...' প্রায় আর্তকণ্ঠে বললেন বিধুভূষণ।

'কে? কার কথা বলছ!'

জবাব দিলেন না বিধুভূষণ, হঠাৎ দু-হাত বাড়িয়ে বললেন, 'কই দেখি!'

চমকে দু-হাত পিছিয়ে গেলেন, গিন্নি, বললেন, 'কী চাইছ? তোমার লজ্জা শরম....'

'আহা ওসব নয়, চিরকুটটা দেখি!'

'ওঃ! যেন খানিকটা হতাশ হলেন গিন্নি। আঁচলের গেরো খুলে চিরকুটটা দিলেন বিধুভূষণের হাতে। চলে যেতে-যেতে প্রায় হতাশ অস্ফুট গলায় বললেন, 'কী যে হয়েছে তোমার...'

চিরকুটটা খুলে স্তব্ধ হয়ে গেলেন বিধুভূষণ। ঝকঝকে টাইপ পরা ছোট্ট একটু চিঠি : 'এতদ্বারা শ্রীবিধুভূষণ সরকারকে জানানো যাইতেছে যে আমরা তাহার অভিযোগপত্রটির প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি...'

তাড়াতাড়ি আবার টেবিল হাতড়ে দেখলেন বিধুভূষণ—অভিযোগপত্রটা তখনও লেখাই হয়নি, শুধু পাঠটুকু লেখা আছে : মান্যবরেষু, আমার একটি অভিযোগ আছে...।'

আস্তে-আস্তে আবছাভাবে বুঝলেন বিধুভূষণ—এই অদ্ভুত খানাতল্লাশি থেকে তাঁর কোনও রেহাই নেই। আবছাভাবে তিনি ম্যানেজারের পিছনের সেই কলকবজা, প্লাগ ও গুপ্ত প্লাগ পয়েন্ট, বেতার সংকেত ও টেলিভিশনের অর্থ ধরতে পারলেন।

হতাশভাবে বসে রইলেন বিধুভূষণ। না, তাঁর আর কিছুই করবার নেই।

সেই আমি, সেই আমি

They all must fall

In the round I call.

ভি, তোমার স্বামীর জন্য লজ্জার কিছু নেই। ও ওর যথাসাধ্য লড়েছে। লক্ষ্মী বোন ভি, কেঁদো না, আমি ওকে তেমন জোরে মারিনি। আমি তো জানতুম ওর সুন্দরী স্ত্রী আছে, যে ওকে ভালোবাসে, আর আছে দুটি কিশোর-কিশোরী ছেলেমেয়ে, যারা ওকে পুজো করে। স্বামীকে লড়াই করতে দেখছে স্ত্রী, বাপকে লড়তে দেখছে ছেলেমেয়ে, তাদের সামনে আমি কি ওকে খুব বেশি লজ্জা দিতে পারি? দিইনি যে তা তুমি দেখেছ। নইলে প্রথম রাউন্ডেই ওর পড়ে যাওয়া উচিত ছিল। তবু আমি ওকে ফেলিনি। রিংয়ের খুব কাছেই তুমি ছিলে, তোমার দুপাশে ছিল তোমার দুই ছেলেমেয়ে। তোমাদের ভীত মুখ আমি দেখেছিলুম। তোমরা সাক্ষী আছ, আমি ওকে খুব বেশি মারিনি। এ কথা ঠিক যে আমি লড়াইয়ের সময় ওর গায়ে থুথু ছিটিয়েছি, মুখ ভাঙিয়ে ঠাট্টা করেছি, চেঁচিয়ে বলেছি, তোর মরণ আমার হাতে অবিমৃষ্যকারী বেল্লিক, আমার হাতে তুই মরবি, এবং এ কথাও ঠিক প্রথম রাউন্ডেই ওর পড়ে যাওয়া উচিত ছিল। তবু ওকে আমি লড়াই করতে দিয়েছি, নাচতে-নাচতে সরে গেছি ওর নাগালের বাইরে, যেন ওকে আমি কত ভয় করি! ইচ্ছে করে অসতর্ক হওয়ার ভান করে আমি ওর অনেকগুলো আঘাত নিয়েছি শরীরে। সেটা শুধু তোমাদের জন্যেই। তোমরা দেখে খুশি হও। পাঁচ রাউন্ড পর্যন্ত ও লড়ে গিয়েছিল। পড়ল ছয় রাউন্ডেই। ভি. লক্ষ্মী বোন আমার, কেঁদো না। ছয় রাউন্ড! পৃথিবীর লোকের কাছে আমার এই রকমই কথা দেওয়া ছিল। ছয় রাউন্ড—তার বেশি না। কী করব বলো! তোমাকে বলছি, ওর খুব বেশি লাগেনি। লক্ষ্মী বোন আমার, তুমি ওকে বাড়ি নিয়ে যাও, ক্যামেরার আলো আর সংবাদদাতার পেন্সিলের ডগা থেকে ওকে দূরে নিয়ে যাও। আড়ালে, ওকে এই লজ্জা থেকে বাঁচাও। ওকে বোলো, এতে লজ্জার কিছু নেই, যার কাছে ও হেরেছে তার কাছে

একদিন না একদিন পৃথিবীর সব সেরা লড়িয়েই হেরে যাবে। খুব শিগগিরই ও আবার দিনের আলোয় লোকসমাজে মাথা উঁচু করে চলাফেরা করতে পারবে। ওকে বোলো, আমি নিজেকে যত বড় বলি আমি তত বড়-ই। বরং তার চেয়েও কিছু বেশি। ভি, আমি দুঃখিত। সেটা শুধু তোমাদের কথা ভেবেই। কিন্তু আমি যদি তুমি হতুম তাহলে আজ আমি আমার স্বামীকে নিয়ে একটু অহংকারও করতুম। কারণ আজ তোমার স্বামী পৃথিবীর সবার সেরা লড়িয়ের কাছে হেরেছে। এটা কিছু কম গৌরবের? তুমি শুনেছ, যারা লড়াই দেখছিল তারা চেঁচিয়ে আমাকে গালাগালি দিচ্ছিল। বলছিল, আমি ভন্ড, জালিয়াত খুনি, আমি লড়াই সাজিয়ে নিই, আমি লড়াইয়ের আগে প্রতিপক্ষকে সম্মোহিত করে নিই। তারা তোমার স্বামীকে বলছিল, ওকে খুন করো, ওকে দড়ির ধারে ঠেলে নিয়ে যাও, ওকে মারো, ভয় নেই, তোমার ফাঁসি হবে না। আমরা গির্জায় মোমবাতি জ্বেলে দেব, আমরা তোমার স্বাস্থ্য পান করব, দোহাই ওকে জিতে যেতে দিয়ো না। কিন্তু আমি জানি, ওরা যতই চিৎকার করুক, ওদের সকলের ভিতরেই একটি শুদ্ধ বিচারক আছেন। ওদের সকলেরই অন্তরের সেই শুদ্ধ বিচারক আমার লড়াই দেখে উঠে দাঁড়িয়ে মাথার টুপি খুলে ফেলেছিল। ওরা মুখে তা কোনওদিন স্বীকার করবে না। হাতের নাগালে পেলে ওরা একদিন আমাকে লিঞ্চ করবে। লক্ষ্মী ভি, বোন আমার, দ্যাখো রিংয়ের বাইরে কি আমাকে খুব বেশি ভয়ংকর বলে মনে হয়? দ্যাখো, এখন আমি একতাল কাদামাটির মতো মানুষ দ্যাখো, আমার স্নায়ু এত দুর্বল যে আমার হাত-পা কাঁপছে। সাজঘরের আয়নায় আমার ভয়-পাওয়া নেংটি ইঁদুরের মতো মুখচোখ আমি দেখতে পাচ্ছি। তোমার চোখের জল দেখে মনে ক্ষোভ হচ্ছে যে কেন আমি তোমার স্বামীর কাছে হেরে গেলাম না। তোমার ওই অবোধ কিশোরী মেয়েটির সামনে আমার হাঁটু গেড়ে বসতে ইচ্ছে করছে; হায়, ওর বাবাকে যখন মেরেছিলুম তখন ওর মুখে কী দুর্বোধ্য যন্ত্রণা ফুটে উঠেছিল। তোমার ওই কিশোর ছেলেটিকে আমার কাছে নিয়ে এসো, ও চোখের জল চেপে রাগি মুখে দাঁড়িয়ে আছে, কাল ওর স্কুলের বন্ধুরা হয়তো ওর দিকে আড়চোখে চেয়ে মুচকি হাসবে। ভি, ঠিক এতটাই দুর্বল, রিংয়ের বাইরে আমি একতাল কাদা-মাটির মানুষ। তোমার সঙ্গে এখন আমার কাঁদতে ইচ্ছে করছে। দ্যাখো, এখন গ্লাভস খোলা আমার দুটি নগ্ন হাত কী ভদ্র ও সুন্দর! দ্যাখো, লড়াইয়ের খাটো প্যান্ট ছেড়ে এখন আমি গায়ে পরেছি সাদা একটা জোব্বা। এখন কি আমাকে একজন ধর্মপ্রচারকের মতো বিশুদ্ধ দেখাচ্ছে না? দ্যাখো, আমার চোখে চিকচিক করছে সামান্য একটু জল। সন্দেহ কোরো না, আজ রাতে তোমাদের খাওয়ার টেবিলে আমাকে মনে করে একটা চেয়ার খালি রেখে দিয়ো, ইচ্ছে হলে টেবিলের ওপর ফেলে রেখো এক টুকরো রুটি। আজ থেকে আমাকে তোমাদের পরিবারের একজন বলে ভেবো।

ওরা সব সাজ-বদল করা মানুষ। ওরা আমাকে টেলিফোনে ডেকে বলছে, এল, অভিনন্দন! চমৎকার লড়েছ, চমৎকার! ওরা আমাকে বেনামা চিঠিতে লিখছে, এল, রাস্তার কুকুর, বেজন্মা, তোর জন্য দূরবিন লাগানো চমৎকার একটা রাইফেল কিনেছি, যে রাইফেলে 'কে' মারা পড়েছিল সেই একই মেকারের। এরপর যদি তুই কখনও লড়াইতে নামিস, তবে গ্যালারি থেকে আমর নিশানা ঠিক থাকবে। ওরা সব সাজ-বদল করা মানুষ। দেখো, বিকিনি পরা মেয়েটি মায়াময়ী সমুদ্রতীরে উপুড় হয়ে পড়ে বালিতে গর্ত খুঁড়ে গোপনে বলে রাখছে, এল, আমি তোমাকে ভালোবাসি। তারপর বালি দিয়ে গর্তের মুখ বুজিয়ে দিচ্ছে লজ্জায়। আবার দ্যাখো, আধবুড়ো লোকটা টেলিভিশনের কাছ থেকে হতাশ হয়ে সরে যেতে নিজেকেই নিজে বলছে, ওই বদমাশ গুন্ডা লোচ্চা এলটাকে কেন দ্বীপান্তরে পাঠানো হচ্ছে না! কেউ কি নেই যে ওকে খুন করে শহীদ হতে পারে! ওরা আমার পক্ষে কিংবা বিপক্ষে বাজি ধরে জিতছে, কিংবা হেরে যাচ্ছে। ওরা এই সময়ে, রাগে, হতাশায় চেয়ে দেখছে আমি উড়োজাহাজ থেকে নামতে-নামতে দু-হাত তুলে ওদের দেখাচ্ছি ছটা আঙুল। ছয় রাউন্ড—তার বেশি না। এবার এই লড়াইতে আমার প্রতিপক্ষের আয়ু ছয় রাউন্ড মাত্র। ওরা জানে, আমি কথা রাখব। ওরা চেঁচিয়ে বলে, নরকে যা, বেজন্মা! ওরা সব সাজ-বদল করা মানুষ। শূন্য ঘরে আমার ছবির দিকে তাক করে ওরা গুলি ছুড়ছে। রাস্তার মোড়ে-মোড়ে দাঁড়িয়ে বিক্রি করছে আমারই ছবি। ওরা আমাকে ভয় করে, ঘেন্না করে, ভালোবাসে। ওরা সব সাজ বদল করা মানুষ। জানে না যে, যে এল-কে ওরা খুঁজে বেড়াচ্ছে আমি সে নই। সে নই।

আসলে আমি সেই শহরতলির রাস্তার ছোট্ট এল, যে পাথর কুড়িয়ে বেড়ায়, নিশানা ঠিক করে গাছে বা ল্যাম্পপোস্টে ছুড়ে মারে। কোন রাস্তায় যে সে যাবে তার কোনও ঠিক-ঠিকনাই নেই! একদিন গ্রীষ্মের এক সুন্দর সকালে যে এল পাথর কুড়িয়ে অভ্যাস মতো ছুড়বার আগে নিশানা ঠিক করে নিতে গিয়ে টের পেয়েছিল তার কোনও নিশানা, নির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তু বলতে কিছু নেই! রাস্তার একধারে তাদের কালো মানুষদের বস্তি, অদূরে বিশাল হাইওয়ের ওপর দিয়ে তীব্র গতিতে গাড়ি চলে যাচ্ছে, আর এক পাশে—এল দেখেছিল—মিশনারি স্কুলের উঠোনে নীল ইউনিফর্ম পরা কালো মেয়েরা সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। সামনে বেদির মতো উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে আছেন মাদার—তাঁর সাদা পোশাক, মাথা ঢাকা আলগা ঘোমটার মতো কালো কাপড় তাঁর কাঁধ আর পিঠের ওপর পড়ে আছে, তাঁকে তাই পেঙ্গুইন পাখির মতো দেখায়। সাদা সুন্দর সেই পেঙ্গুইন পাখির মতো নান আর তাঁর সামনে প্রার্থনারত নীল পোশাক পরা কালো মেয়েদের সারি, একধারে হাইওয়ে আর অন্যদিকে তাদের নোংরা বস্তি—এইসব কিছুর ওপর সুন্দর সকালের আধ-ফোটা রোদ পড়ে আছে। কোনদিকে, কোথায় যে হাতের পাথরখানা ছুড়ে মারবে এল, ছোট্ট এল

তো ভেবেও পেল না। তার কুড়ানো পাথর হাতে রয়ে গেল অনেকক্ষণ। সেই প্রথম সে বুঝতে পেরেছিল, তার সত্য কোনও লক্ষ্যবস্তুও নেই, কোনও ল্যাম্পপোস্ট, কোনও গাছই তার শত্রু নয়, তার হৃদয় ওই সকালের মতোই পবিত্র ও সুন্দর। তাই সে হাতের পাথরখানা আবার গড়িয়ে দিল রাস্তায়। না, কোনও কিছুকেই সে আর আঘাত করতে চাইল না। আমি এল, আমি সেই ছোট্ট এল, পাথর কুড়িয়ে নিয়েও যে আবার সে পাথর রাস্তায় গড়িয়ে দিয়েছিল একদিন।

এল, তুমি যখন হাঁটছ, তখন তোমার পায়ের অত শব্দ হয় কেন? চোরের মতো হাঁটতে শেখো, এল। নইলে একদিন ওই পায়ের শব্দই তোমার মৃত্যু ডেকে আনবে। এই কথা একদিন আমাকে বলেছিল সেই লোকটা যে ছিল একজন হাটুরে পটুয়া, যার কোনও ছবিরই দাম পঞ্চাশ সেন্টের বেশি ছিল না। যার ব্যাবসা ছিল ছবি নকল করে বিক্রি করা, যে লোকটা বিখ্যাত সব ছবি স্কেচ আর কপি করতে-করতে মাঝে-মাঝে ছুড়ে ফেলে দিত তার রঙের ব্রাশ আর তুলি, কখনও খেপে গিয়ে পাগলের মতো দেয়ালের গায়ে আবোল-তাবোল রং মাখাত, গভীর রাতে মদ খেয়ে বাড়ি ফেরার সময়ে যে আবেগ-ভরে গাইত নিগ্রো লোক-সংগীত! এই লোকটা ছিল আমার বাবা। হাতের রং ঝাড়নে মুছতে-মুছতে যে সব-জান্তার মতো হেসে বলত, এল, চোরের মতো হাঁটতে শেখো, ঠিক চোরের মতো। সবসময়ে এই কথা ভেবো যে রাস্তার প্রতি মোড়ে, প্রতিটি দেয়ালের আড়ালে তোমার জন্য শান্তভাবে অপেক্ষা করছে বন্দুকের ব্যারেল, রিভলবারের নল, আঙুলের মধ্যে লুকোনো ধারালো ব্লেড, বুটের তলায় লাগানো লোহার নাল। অত অহংকার করে হেঁটো না, অপরাধবোধ নিয়ে হাঁটতে শেখো, চোরেরা যেভাবে হাঁটে। ছায়ার মতো চলাফেরা করো, ভেবে নাও তোমার শরীর নেই, তুমি ছায়া মাত্র! ভাবতে-ভাবতে ক্রমে ক্রমে ছায়া হয়ে যেয়ো। পালাতে শেখো, খুব জোরে দৌড়োতে শেখো। দেখো, যেন পায়ের শব্দ না হয়, গলার শব্দ না হয়, তোমার হৃৎপিন্ড যেন খুব জোরে শব্দ না করে। জীবন-মরণ এল, এর ওপর তোমার জীবন-মরণ। বলতে-বলতে টপ করে হঠাৎ লাফিয়ে উঠত সেই পাগল পটুয়া, এল, পায়ের পাতার ওপর তুমি হাঁটতে পারো না? খুব গম্ভীর মুখে নিজেই সে হেঁটে দেখাত আমাকে, এইভাবে...ঠিক এইভাবে পায়ের শব্দ গোপন করা যায়। পায়ের পাতার ওপর ভর দিয়ে হাঁটতে শেখো। তখন দেখবে তুমি দ্রুত হাঁটতে পারছ, শরীরকে ইচ্ছে মতো হালকা করে নিতে পারছ। আবার কখনও কখনও লোকটা চোখ পিটপিট করে আমার দিকে চেয়ে থেকে খুব হতাশ হয়ে বলত, হায় এল, তুমি এত লম্বা-চওড়া কেন? ভিড়ের ভিতরে তোমাকেই যে সকলের আগে চোখে পড়ে যাবে! হায়, তুমি আরও ছোট খাটো হলে না কেন, আরও রোগা, আরও বিষণ্ণ হলে না কেন, এল?

কখনও আমি সাদা ছোকরাদের টিটকিরি শুনে ঘুঁষি তুলেছি, অমনি এক পথ-চলতি নিগ্রো বুড়ি আমার হাত চেপে ধরে কানের কাছে ফিসফিস করে বলেছে বাছা, ভয় পেতে শেখো, ভয় পেতে শেখো। এখনও আমাদের জোট বাঁধতে অনেক দেরি। হ্যাঁ, আমি সেই এল, যে ভয় পেতে শিখেছিল। রাতে ঘরের চালের ওপর দিয়ে লাফিয়ে যাচ্ছে বেড়াল, সেই শব্দে ঘুম ভেঙে সে ভয়ে আঁকড়ে ধরত বালিশ। হেমন্তে শুকনো পাতা ঝরে পড়ছে, সেই শব্দে সে তড়িৎগতিতে বড় রাস্তা ছেড়ে দৌড়ে নেমে যেত গলিতে। বর্ষার জল-জমা গর্তের মধ্যে লাফিয়ে পড়েছে ব্যাঙ সেই শব্দে তার হৃৎপিন্ড লাফিয়ে উঠত গলায়। সে বাতাসের মধ্যে শুনতে পেত ফিসফিশ শব্দ, ট্রিজন! হত্যা! লুট। দূর সমুদ্রের শব্দের মধ্যে সে শুনতে পেত সেই গান, পায়ে-পায়ে লাথি মারতে-মারতে নিয়ে চলো ওই নিগ্রোটাকে। টেক দি নিগার বাই দি টো। বাতাসের ভিতরে লুকোনো আছে বিস্ফোরক, সূর্যের আলোয় মেশানো আছে গন্ধক, প্রতিটি গাছের চিক্কণতায় লুকোনো আছে বিশ্বাসঘাতকতা। সে কেবল এই বীজ-মন্ত্র শিখেছিল, বিশ্বাস কোরো না, এল, বিশ্বাস কোরো না।

প্রতিপক্ষের নাগাল থেকে আমি ছায়ার মতো পালিয়ে যেতে শিখেছিলুম আমি জোরে দৌড়তে শিখেছিলুম, আমি পায়ের পাতার ওপর ভর দিয়ে হাঁটতে শিখেছিলুম, আমি চোখ বুজে ভাবতে শিখেছিলুম যে আমি আমার ছায়া। এখন লড়াইয়ের পর রিংয়ের মধ্যে লাফিয়ে উঠে আসে মানুষ, রিংয়ের দড়ির ওপার থেকে ঝুঁকে চিৎকার করে বলে, এ লড়াই নয়, কালো-শিল্প, সম্মোহনবিদ্যা, অ্যালকেমি। কুকুর, তুই কেবল চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে যেতে শিখেছিস। আমার আহত প্রতিপক্ষ হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে সংবাদদাতাদের কাছে গম্ভীর মুখে বিবৃতি দেয়, লড়াইয়ের সময় রিংয়ের মধ্যে ও এত দ্রুত সরে যাচ্ছিল যে আমি ওকে ভালো করে দেখতেই পাচ্ছিলুম না। ও যেন ঠিক ছায়ার মতো পড়ছিল আমি ওকে ছুঁতেই পারিনি। আমার পরবর্তী প্রতিপক্ষ বুক ঠুকে চেঁচিয়ে বলে, তোমাকে দেখে নেব এল, এবার তোমাকে আমি দেখে নেব। আমি মৃদু হেসে পৃথিবীর লোকের সামনে আবার আমার দুই হাত তুলে ধরি! আঙুল দেখাই। সাত রাউন্ড! তার বেশি না। এবার আমার প্রতিপক্ষের আয়ু মাত্র সাত রাউন্ড। বিস্ময়ে, ক্ষোভে, হতাশায় ওরা চিৎকার করে বলে, নরকে যা, নরকে যা, বেজন্মা। কেননা ওরা জানে যে আমি আমার কথা রাখব। কেননা, আমি প্রজাপতির মতো উড়ে বেড়াই, মৌমাছির মতো হুল ফুটিয়ে দিই। আমি আমার প্রতিদ্বন্দ্বীকে ডেকে বলি, গোঙাও, বাছা গোঙাও। আমাকে ছুঁতে পারোনি বলে দুঃখ কোরো না। কে কবে ছুঁতে পেরেছে আমাকে! আমি যে সেই ভয় পাওয়া নেংটি ইঁদুরের মতো ছোট্ট এল, যে ভয়ঙ্করভাবে পালিয়ে যেতে শিখেছিল। যে সূর্যের আলো থেকে বাতাস থেকে, সমুদ্রের শব্দের কাছ থেকে কেবল পালিয়ে গেছে, যে নিজেকে ভাবতে শিখেছিল ছায়া। তুমি তো দেখেছ কেমন দ্রুত চলে আমার পা, রুহমবা

নাচের হালকা শরীর নর্তকের মতো আমি কেমন আমার প্রকাণ্ড শরীরকে দূরে-দূরে সরিয়ে নিয়ে যাই, কেমন করে আমি হয়ে যাই ছায়ার মতো অবাস্তব, হয়ে যাই মায়াবী জাদুকর!

ভি, তোমাকে জিগ্যেস করি, দ্যাখো তো আমি কি দেখতে সুন্দর নই! আমাকে কি যথেষ্ট ভদ্রলোকের মতো দেখতে নয়? দ্যাখো, আমার প্রকাণ্ড শরীর এমন সুষম ও স্বাভাবিকভাবে গড়ে-ওঠা যে আমাকে একটুও বিকট দেখায় না, দেখো আমার থুতনির কাছে ছোট্ট একটু আঁচিল, ঘন ভ্রূ, মাথায় কালো চুল, আমার চোখ দ্যাখো, এর ভিতরে কি কোনও ঘেন্নার আগুন আছে, কিংবা প্রতিশোধস্পৃহা? বরং শিশুর মতোই নিষ্পাপ ও কৌতূহলী আমার চোখ। তুমি যদি কখনও দ্বিধা ত্যাগ করে আমাকে তোমার ওই কিশোর ছেলেটি ভেবে বুকে জড়িয়ে ধরো তবে নিশ্চিত জেনো, তোমার এই টোল খাওয়া শরীর নরম বুক যুবতী-মুখের ডোল এইসব ভুলে গিয়ে আমি তোমাকে আমার মা ভেবে কাঙাল ছেলের মতো চোখ বুজে চুপ করে থাকব। কিন্তু দ্যাখো, খুব বেশিক্ষণ আমাকে এই ভাবে রেখো না। খুব বেশিক্ষণ আমি কারও কিছু হয়ে থাকতে পারি না। আমার নিজেরই এক অদৃশ্য হাত আমাকে সবকিছু থেকে—ইচ্ছা, লোভ এবং বিশ্বাস থেকে ছিঁড়ে আনে। দুবার আমার বিয়ে ভেঙে গেছে। না, আমি পত্নীপরায়ণ স্বামী নই, যেমন আমি নই মা-বাবার আদুরে বাধ্য ছেলে, নই ভাই-বোনের প্রিয় সহোদর, আমি নই বন্ধুদের বিশ্বাসভাজন। আমি অত হতে পারি না। আমি এক প্রকাণ্ড শিশুর মতোই নতুন খেলনা পেতে ভালোবাসি, আবার ভেঙে দুমড়ে সেই খেলনা ফেলে দেওয়াও আমার কাছে সমান প্রিয়। শিশুর মতো নিষ্ঠুর ও উদাসীন আর কে আছে? আবার শিশুর মতো ভীতুই বা আর কে? দ্যাখো রিংয়ের বাইরে আমি এখন একতাল কাদামাটির মতো মানুষ, পাতা ঝড়ে পড়ার শব্দে আমি চমকে উঠি, বেড়ালের পায়ের শব্দ হলে রাতে আমার ঘুম হয় না, আমার আমিই সেই এল যে আঙুল তুলে এক দুই তিন রাউন্ড দেখাই। ভি, কিছুক্ষণের জন্য এ সব কিছুই সত্য। দ্যাখো, গ্লাভস পরা সেই দুটি ভয়ংকর হাতকে এখন দ্যাখো, আমি এখন খুব সূক্ষ্ম ছুঁচে সুতো পরাতে পারি, আমি এই হাতে আঁকতে পারি পাখি, রমণী ও প্রজাপতির ছবি, বেহালায় বাজাতে পারি প্রেমের গান। ভি, বোন আমার, পৃথিবীতে কিছুক্ষণের জন্য এই সব কিছুই সত্য। যেমন একথাও সত্য যে, একদিন ছেলেবেলায় আমাকে শ্রান্ত ও পিপাসার্ত দেখে বুড়ো এক সাহেব ডেকে বলেছিল, এসো এল, এক কাপ কফি খেয়ে যাও। আবার এ কথাও সত্য, সাদা মানুষের হাতে একদিন বেধড়ক মার খেয়ে একটি অশিক্ষিত নিগ্রো ছেলে রক্তমাখা মুখে উদভ্রান্তের মতো ম্যানহাটনের পথে-পথে ঘুরে বেড়িয়েছিল। পথচারীদের ধরে-ধরে করুণ গলায় জিগ্যেস করেছিল, মশাই, বলতে

পারেন আফ্রিকাটা কোন দিকে? আমি আফ্রিকায় যেতে চাই। আমি আফ্রিকায় চলে যেতে চাই।

কিছুক্ষণের জন্য এই পৃথিবীতে সব কিছুই বড় সত্য।

একদিন আমি সমুদ্রের তীরে এক জাহাজঘাটায় চারজন প্রার্থনারত লোককে দেখেছিলুম। আরব বেদুইনদের মতো অদ্ভুত তাদের ঢিলাপোশাক, মাথায় সাদা ফেজ টুপি। তারা মক্কার দিকে মুখ করে নানা বিচিত্র ভঙ্গিতে তাদের প্রার্থনা সেরে নিচ্ছিল। দেখলুম তারা কখনও উবু হচ্ছে, উঠে দাঁড়াচ্ছে, বসছে কানে হাত দিচ্ছে। আমি দু-পা ফাঁক করে, প্যান্টের পকেটে দুই মুষ্টিবদ্ধ হাত নিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে রইলুম। আমার সামনে সমুদ্রের গভীর সবুজ রং মাথার ওপরে লালফিরোজায় মাখামাখি আকাশ, দুইয়ের মাঝখানে নিঃসঙ্গ এক জাহাজের দীর্ঘ মাস্তুল, আর তারা চারজন। তখন আমি শহরতলির বাচ্চা-বখাটে এল চোর, ছিনতাইবাজ; পাছা-ভারী বুক-উঁচু মেয়েদের দেখে প্রকাশ্যে শিস দিই, মাঝে-মাঝে হিসেব করে দেখার চেষ্টা করি আমাদের মধ্যে কার কটা বে-আইনি ছেলে-পুলে আছে। অথচ আমার সামনে সেদিন সেই তুচ্ছ, অতি তুচ্ছ সাধারণ সেই দৃশ্যটি যেন রুখে দাঁড়াল। আমি নড়তে পারলুম না। উদাসীন একটি মেঘ আমার মনের ওপর একটুক্ষণের জন্য তার ছায়া ফেলে গেল। প্রার্থনার শেষে তারা চারজন বুড়োসুড়ো লোক সামনে আমার দু-পকেটে মুষ্টিবদ্ধ হাত এবং দু-পা ফাঁক করে দাঁড়ানোর ভঙ্গি দেখে ভয়ে জড়সড়ো হয়ে দ্রুত গুটিয়ে নিল তাদের কাপড়ের টুকরোগুলি যার ওপর দাঁড়িয়ে তারা প্রার্থনা করছিল, তারপর তারা তাড়াতাড়ি সরে পড়বার চেষ্টায় ছিল। আমি তাদের সঙ্গ ধরে জিগ্যেস করলুম, তোমরা কারা? তারা প্রথমে সন্দেহের চোখে আমাকে দেখল, একটু ইতস্তত করল, তারপর হেসে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিল। আমরা বালির ওপর বসলুম। তারা সিগারেট এগিয়ে দিয়ে বলল, আমরা তীর্থযাত্রী। আমাদের গোত্র-পরিচয় এখন আর নেই, সে সব আমরা পিছনে ফেলে এসেছি। আমি হেসে ঠাট্টা করে বললুম, বাহবা! চমৎকার! কিন্তু যে কাপড়ের টুকরোগুলো মাটিতে পেতে তোমার প্রার্থনা করছিল সেগুলো কিন্তু তোমরা গুটিয়ে নিয়েছ, ফেলে যাওনি। শুনে সবচেয়ে বুড়ো লোকটা, যার পাকা ভ্রূ, নিরীহ মুখ, সে বলল, বাছা কোনও কিছুকেই ফেলে যে আমরা যাচ্ছি না একথা সত্যি। তবে তীর্থযাত্রীকে ওরকমই ভাবতে হয়। নইলে কোনও কিছুকেই কি ফেলে যাওয়া যায়? দেখো ওই আকাশ, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, এই আমাদের পৃথিবী—এরা সবাই চলেছে, কেউ কাউকে ফেলে রেখে যাচ্ছে কি? এখন তুমি যদি অনুমতি দাও তবে আমরা এই প্রার্থনা করার কাপড়ের টুকরোগুলো সঙ্গে নেব; আর যদি তোমার ইচ্ছে হয়তো বলো আমরা এগুলো সমুদ্রে ফেলে দিয়ে যাই। কেন না কে জানে, তুমিই ঈশ্বরের প্রেরিত পুরুষ কি না, তীর্থযাত্রার মুখে হয়তো আমাদের পরীক্ষা করতে এসেছ।

ভি, ওরা ছিল অশিক্ষিত সামান্য মানুষ, ওদের ধর্মজ্ঞান ওরকমই যুক্তিহীন ও আবেগপূর্ণ। তবু সমুদ্রের ধারে বালির ওপর বসে চারজন বুড়োসুড়ো লোকের মুখোমুখি, পিছনে জাহাজ, আকাশ ও সমুদ্রের মায়া, ঢেউয়ের আর এলোমেলো বাতাসের শব্দের মধ্যে ওই কথা আমার অদ্ভুত লেগেছিল—আমি ঈশ্বরের প্রেরিত পুরুষ কি না? আমি মনে-মনে নত হয়ে আমার বিদ্রূপ সামলে নিলুম। তারা আমার মঙ্গল প্রার্থনা করল, তারপর খুশি হয়ে ঢালু বালিয়াড়ি ভেঙে ধীরে-ধীরে সুবজ জলের কাছে নেমে গেল।

এখন আমার চারধারে সবসময়ে ঘিরে থাকে ঘুঁষি মারবার থলি, ওজন তুলবার যন্ত্র, মেসিন বল, দৌড়োবার জুতো, আমার সারাদিনের সঙ্গী সেইসব দৈত্যকায় মানুষেরা যাদের সঙ্গে আমি লড়াই অভ্যাস করি। আমি এল, যে নাম শুনলে আমারই বুকের ভিতর দপ করে জ্বলে ওঠে অহংকার। আমি মূল্যবান। আমার নামে বাজি ধরা হয়। লড়াইয়ের আগে ওজন নেওয়ার সময়ে প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে দেখা হয়, আমি ফুঁসে উঠে বলি, বুড়ো শুয়োর, হোঁতকা ভালুক, আমি গান গাইতে-গাইতে তোকে মেরে ফেলতে পারি। আমি রাস্তার লোককে জড়ো করে বলি, আমি সর্বশ্রেষ্ঠ ; আমিই সর্বকালের একমাত্র সেরা লড়িয়ে। আমি অজেয়, ভয়ঙ্কর দ্যাখো এল—তোমরা আমার জয়ধ্বনি দাও। দেখো ভি, তবু রিংয়ের বাইরে আমি একতাল কাদামাটির মানুষ; মনের ভিতরে খুব গভীরে আমি এখনও এক বিমনা এল, যে নদীর ওপর ঝোলানো পোলে দাঁড়িয়ে রাতের কুয়াশার দিকে চেয়ে থাকে, যে একা-একা ঘুরে বেড়ায় শহরতলির রাস্তায়-রাস্তায়, জাহাজঘাটায় যে পথে চলতে দেখা বুড়ি ফলওয়ালির ঝুড়ি থেকে মজা করবার জন্য টপ করে তুলে নেয় ফল, যে সদ্য-হাঁটতে-শেখা নিগ্রো শিশুর দিকে দু-হাত বাড়িয়ে বলে, এসো, এসো আর একটু....আর একটু...শাবাশ! আমি সেই এল, যে একদিন সমুদ্রের ধারে চারজন বুড়োর মুখোমুখি ভাবতে বসেছিল, সে ঈশ্বর প্রেরিত পুরুষ কি না। যে একদিন হাতের কুড়োনো পাথর রাস্তায় গড়িয়ে দিয়ে ভেবেছিল, পৃথিবীর কোনও গাছ, কোনও ল্যাম্পপোস্টই তার শত্রু নয়।

মাঝে-মাঝে তাই উজ্জ্বল আলোর নীচে, রিংয়ের ভিতরে দুটি গ্লাভসবদ্ধ হাত শূন্যে তুলে পৃথিবীর মানুষকে ডেকে আমার এই কথা বলতে ইচ্ছে করে, দ্যাখো, চেয়ে দ্যাখো তোমরা আমাকে কোথায় নির্বাসিত করেছ!

কার্যকারণ

রাত দুটোয় জানলার কাছে দাঁড়িয়ে আমি সিগারেট জ্বাললুম। নিঃসাড় ঘুমে অচেতন আমার বউ সোনামন তা জানতেও পারল না। সারা বিকেল আমার সিগারেটের প্যাকেট লুকোনো ছিল হাতব্যাগে। খেয়াল করেনি সোনামন, বিছানায় যাওয়ার আগে অবহেলায় সে আমাদের দুই বালিশের ফাঁকে রেখেছিল ব্যাগটা আমি তা দেখে রেখেছিলাম।

বিয়ের একমাস আগে আমার গ্যাসট্রিকের ব্যথাটা বেড়ে গেল খুব। ব্যথা লুকিয়ে আমি ঘুরে বেড়াতাম। পেট আর বুকের মাঝখানে একটা বিন্দুতে ব্যথাটা প্রথমে শুরু হত। ফুলের কলির মতো। তারপরেই ছিল তার আস্তে-আস্তে পাপড়ি মেলে দেওয়া। কিছু খেলেই কমে যেত। তারপর আবার গোড়া থেকে সে শুরু করত। সোনামন যখন রাস্তায় আমার পাশে হাঁটত, ট্যাক্সিতে ঢলে পড়ত আমার কাঁধে, কিংবা রেস্টুরেন্টে বসে চাপা ঠোঁটের হাসিটি হাসতে-হাসতে চায়ে চিনি মেশাত তখন আমি বুক-জোড়া টক জল আর কামড়ে ধরা ব্যথাটা গিলে রেখে অনায়াসে হাসতাম, কথা বলতাম। ওকে টের পেতে দিতাম না। শুধু মাঝে-মাঝে সোনামন চমকে উঠে বলত—তোমাকে অত সাদা দেখাচ্ছে কেন মানিকসোনা (আমরা পরস্পরকে নানা নামে ডাকি)? আমি শান্ত গলায় উত্তর দিতাম —বোধহয় আলোর মতো। ও বিশ্বাস করত না। বলত—আলো না, তোমাকে কেমন ক্লান্তও দেখাচ্ছে! কী হয়েছে? আমি হাসতাম। হেসেই ধরিয়ে নিতাম সিগারেট। ওই সময়টুকুর মধ্যেই আমি কৌশলে সোনামনকে অন্য কোনও বিষয়ে নিয়ে যেতাম নিজেকে আড়াল করে। আমি কখনও লক্ষই করতাম না, আমি কত সিগারেট খাই। সোনামনের সঙ্গে জীবনে প্রথম এবং একমাত্র প্রেম করার সময়ে আমি মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিলাম। কেন না দেখা হলে বা দেখা হওয়ার আগের কিছুটা সময়ে আমার শরীর কাঁপত, স্নায়ুর ওপর চাপ

পড়ত প্রবল। সঙ্গে-সঙ্গে সিগারেটের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে নেওয়া আমার ছিল প্রিয় অভ্যাস। বিবাদে, আনন্দে কিংবা উত্তেজনায় আমার কেবলই ছিল সিগারেট আর সিগারেট। সিগারেটের চেয়ে স্বাদু কিছুই ছিল না।

বিয়ের একমাস আগে আমরা একটা ইতর ট্যাক্সিওয়ালার পাল্লায় পড়েছিলাম। গঙ্গার ধার থেকে সে আমাদের ঘুরপথে নিয়ে যাচ্ছিল। জোড়া ছেলে মেয়ে উঠলে ওটা তাদের অভ্যাস। আমি তাকে রেড রোড দিয়ে বালিগঞ্জের পথ বললাম, সে আমাদের অন্যমনস্ক দেখে সোজা উঠে এল ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের কাছে। পরপর সে অবাধ্যতা করে যাচ্ছিল। গাড়িতে তার মুখের সামনে লাগানো ছোট্ট আয়নাটায় আমি তার রুক্ষ মুখে বিচ্ছিরি একটু হাসিও দেখতে পেয়েছিলাম।—আমি ড্রাইভারকে লক্ষ করছি দেখে সোনামন রাগ করে বলল—তুমি কেবল ওইদিকেই চেয়ে আছ। ওখানে কী! আমি তোমার ডানপাশে। আমি মৃদু হেসে সোনামনের দিকে মুখ ফিরিয়ে ওর কথা শুনছিলাম। কিন্তু আমার লক্ষ ছিল আয়নার দিকে। নির্জন গুরুসদয় রোডে গাড়ি ঢুকলে আমি শান্ত গলায় ড্রাইভারকে থামতে বললাম। ড্রাইভার মুখ ফিরিয়ে ঠোঁট আর জিভের শব্দ করল। সোনামন আমার হাত আঁকড়ে বলল, এখানে কেন? আমি হেসে বললাম—বাকিটুকু হেঁটে যাব, সোনামন। বিয়ের আগে একটু পয়সা বাঁচাই।

সোনামন নেমে ফুটপাথে দাঁড়াতেই আমি ট্যাক্সিটা ঘুরে ড্রাইভারের দরজায় গিয়ে একটা ঝটকায় দরজা খুলে ফেললাম। কী করছিলাম তা আমার খেয়াল ছিল না। আঠাশ উনত্রিশ বছর বয়সের শক্ত কাঠামোর ড্রাইভারটা মুখে একটু রাগ দেখাবার চেষ্টা করল। তারপরই আমার মাথার ভিতরে অস্বচ্ছ একটা ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠেছিল। তাকে গাড়ির বনেটের ওপর চিৎপাত করে ফেলে আমি একনাগাড়ে অনেকক্ষণ মেরে গেলাম। নির্জন রাস্তাতেও লোকজন ছুটে আসছিল। প্রথম ভ্যাবাচাকার ভাবটা সামলে নিয়ে সোনামনই প্রথম ছুটে এসে আমার কোমর জড়িয়ে ধরল দু-হাতে—মানিকসোনা, এই মানিকসোনা...ওগো...পায়ে পড়ি। আমি সোনামনের কান্নার শব্দও শুনতে পেলাম।

কলকাতার লোকেরা এমনিতেই ট্যাক্সিওয়ালাদের পছন্দ করে না। তার ওপর আমার সঙ্গে সুন্দর একটি মেয়ে রয়েছে। কাজেই ট্যাক্সিওয়ালাকে আরও কিছু মারমুখো লোকের ভিড়ের মধ্যে রেখে দিয়ে আমি সোনামনকে নিয়ে বেরিয়ে এলাম। অভ্যাসমতোই আমার স্বয়ংক্রিয় হাত সিগারেট ধরিয়ে নিল। অনেককাল আমি কোনও দাঙ্গাহাঙ্গামার মধ্যে যাইনি। আমার রক্ত ঠান্ডা। তবু কী করে যে ব্যাপারটা হয়ে গেল। আমার ছেলেবেলায় শেখা ঘুষি মারার কৌশল আমি প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। অনেককাল আর আমার দুই হাত মারধরে ব্যবহৃত হয়নি।

চুপচাপ অনেকটা হেঁটে যাওয়ার পর হঠাৎ সোনামন তখনও তার কিছুটা ধরা গলায় বলল—তুমি যে এমন রাগতে পারো জানতুম না।

লজ্জা পেলাম। গম্ভীর মুখে শুধু বললাম—হুঁ।

সোনামন হঠাৎ বলল—তুমি অত সিগারেট খাও বলেই নার্ভ অত ইরিটেটেড হয়।

অবাক গলায় বললাম—দূর!

সে মাথা নাড়ল—ঠিকই বলছি। ট্যাক্সিতে ওঠার আগে তুমি যখন সিগারেট কিনতে গেলে আমাকে গাড়িতে বসিয়ে রেখে, তখন আমি ট্যাক্সিওয়ালাকে বলেছিলাম যেন সে তোমার কথা না শোনে, যেন একটু ঘুরে-ঘুরে যায়। আমি মফসসলের মেয়ে, ট্যাক্সিতে চড়ে কলকাতা দেখতে আমার ভালো লাগে।

দাঁড়িয়ে পড়ে আমি বললাম—সত্যি বলছ?

—সত্যি। সে মাথা নাড়ল—কে জানত তুমি রেগে গিয়ে ওই কাণ্ড করে বসবে মানিকসোনা। আমি তোমাকে বলবার সময়ই পেলাম না। তার আগেই তুমি মারতে শুরু করেছ। মাগো! ওর মুখ দিয়ে রক্ত পড়ছিল!

অনেকক্ষণ চুপ করে হাঁটতে-হাঁটতে আমি শুধু বললাম—ট্যাক্সির ভাড়াটা দেওয়া হল না।

এ কথা ঠিক যে, উত্তেজনা বেশি হলে আমার ব্যথা বাড়ে। গলা বুক জুড়ে বিষাক্ত টক জল কলকল করতে থাকে। কোনও কিছুতেই তখন আর স্বস্তি পাওয়া যায় না। ওই উত্তেজনার পর সেই বিকেলে আমার ব্যথা বাড়তে লাগল। যখন সুইন-হো স্ট্রিটে আমার ছোট্ট একটেরে ঘরটার তালা খুলছি তখনও আমার মনে হচ্ছে একটু বমি হয়ে গেলে স্বস্তি পাব। সঙ্গে সোনামন না থাকলে বাথরুমে গিয়ে আমি তাই করতুম। কিন্তু পাছে তার কাছে আমার অসুখ ধরা পড়ে যায়, আর সে ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠে, সেই ভয়ে আমি সামান্য কষ্টে আমার যন্ত্রণা চেপে রাখলাম। কিন্তু যে ভালোবাসে তার কাছে গোপন করা বড় শক্ত। আমাকে ঘিরে সোনামনের সমস্ত অনুভূতিগুলো বড় সচেতন। অনেক সময় সোনামন ঠিকঠাক বলে দেয় আমি কী ভাবছি। কিংবা আমার মন মেজাজ কখন কেমন থাকে বা থাকতে পারে তাও মাত্র আট-ন মাসের পরিচয়ে সে বুঝে গেছে। নির্জন রাস্তা তোমার ভালো লাগে, না গো? ওঃ, তোমার হাই উঠছে, একটু চা খাবে, না? অনেকক্ষণ খাওনি। তুমি খোলা জায়গায় প্রায়ই আমার মুখ আড়াল করে রাখতে চেষ্টা করো, যাতে কেউ না আমার মুখ দেখতে পায়, তাই না, বলো! ইস, কী বোকা! সোনামন এরকম অজস্র বলে যায়। ধরা পড়ে গিয়ে আমি আর লজ্জা পাই না। তবু আমি বহুদিন আমার ব্যথাটার কথা

গোপন রাখতে পেরেছিলাম। সেদিন ঘরে ঢুকতে-ঢুকতে আমি প্রবল ব্যথাটাকে কষ্টে চেপে রাখছিলাম। আমার ঘরে যখন সোনামন আসে তখন আমি দরজা হাট খোলা রাখি, মাঝখানে একটা টেবিল, তার দুধারে বসি দুজনে যাতে খারাপ কেউ না ভাবে। সেরকমভাবেই বসেছিলাম দুজনে। কথা হচ্ছিল। আমার ব্যথাটার চরিত্র এই যে, শরীর কুঁজো করে কুঁকড়ে রাখলে সামান্য স্বস্তি লাগে। সাধারণত আমি সোজা এবং সহজভাবে বসি। সেদিন আমার শরীর দুবার কি তিনবার ঝাঁকুনি দিয়ে কুঁকড়ে গেল। ভেবেছিলাম অত সামান্য অস্বাভাবিকতা ও লক্ষ করবে না। কিন্তু তিনবারের বার ও কথা থামিয়ে চুপ করে আমার দিকে চেয়ে রইল। আমি হাসছিলাম। ও আস্তে-আস্তে উঠে দাঁড়িয়ে বলল—তোমার শরীর ভালো নেই?

প্রশ্ন নয়, ঘোষণা।

শরীর সহজ করে নিয়ে হেসে বলি—কোথায় কী! শরীর ঠিক আছে।

ও মাথা নাড়ল—বাজে বোকো না। তোমার ব্যাপারে আমি বোকা নই। সব বুঝি।

—কী বোঝো?

—তোমার একটা কিছু যন্ত্রণা হচ্ছে।

—কই!

—হচ্ছে, আমি জানি। তোমার মুখ আবার সাদা দেখাচ্ছে। তুমি লুকোচ্ছ।

হাসলাম—বেশ! কিন্তু বলো তো কোথায় যন্ত্রণা?

ও একটু থমকে গেল। দাঁতে সামান্য ঠোঁট চেপে রেখে বলল—বলব?

মাথা নাড়লাম—বলো।

ও আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। তারপর আস্তে-আস্তে ওর চোখে আমার এলানো শরীরের সব ভঙ্গি খুঁটিয়ে দেখে নিল। তারপর একটা হাত বাড়িয়ে ও আমার পেট দেখিয়ে দিল—ওইখানে।

—না। আমি মাথা নাড়লাম—ঠিক পেটে নয়, তবে কাছাকাছি। আন্দাজ করে বলো।

কিন্তু এই লুকোচুরির খেলা খেলল না সোনামন। আমার একটা হাত ধরে টানতে-টানতে বলল—কোথায় ব্যথা জানবার দরকার নেই. এখন চলো তো!

—কোথায়?

—ডাক্তারের কাছে।

বহুকাল, প্রায় সেই ছেলেবেলার পর থেকেই কোনও ডাক্তারের কাছে যাওয়া হয়নি। বড় লজ্জা করছিল। কিন্তু সোনামন শুনল না, জোর করে নিয়ে গিয়ে প্রথম যে ডাক্তারখানা পাওয়া গেল সেখানেই এক বুড়োসুড়ো ডাক্তারের সামনে দাঁড় করিয়ে দিল আমাকে। কানে শুধু বলে দিল—দেখো, ডাক্তারকে আবার বোলো না যেন, আমার ব্যথাটা কোথায় বলুন তো!

রোগা একটা হাড় জিরজিরে ছেলে বুড়ো ডাক্তারের সামনে মা কালীর মতো জিভ বের করে দাঁড়িয়েছিল। তার দিক থেকে একবার আড়চোখ তুলে ডাক্তার আমাকে প্রশ্ন করলেন —কী?

সোনামনকে খ্যাপানোর জন্যেই আমি ভেবেচিন্তে ধীরেসুস্থে কেটে-কেটে বললাম—আজ আমি একটা ট্যাক্সির ভাড়া দিইনি ডাক্তারবাবু। তার ওপর ট্যাক্সিওয়ালাকে আমি খুব মেরেওছিলাম।

ডাক্তার হাঁ করে তাকালেন। পিঠে সোনামনের একটা চিমটি টের পেলাম।

ধীরেসুস্থে আমি ডান হাতটা এগিয়ে দিলাম ডাক্তারের সামনে, বললাম—দেখুন ডাক্তারবাবু, ট্যাক্সিওয়ালাটার দাঁতে লেগে আঙুলটা অনেকখানি কেটে গেছে। মানুষের দাঁত বড় বিষাক্ত। এর জন্যে একটা ওষুধ দিন।

আমাকে ঠেলে সরিয়ে তখন সোনামন লালচে লাজুক মুখে এগিয়ে এল—না ডাক্তারবাবু, ওর কথা শুনবেন না...ইত্যাদি।

দুটি পাগল প্রেমিক প্রেমিকার পাল্লায় পড়ে আসল ব্যাপারটা বুঝতে ডাক্তারবাবুর অনেকটা সময় এবং ধৈর্য গেল। তারপরও ব্যাপারটা চট করে মিটল না। ডাক্তার অনেক কিছু পরীক্ষা করতে চাইলেন। সোনামনের পাল্লায় করে পড়ে দু-চার দিন ধরে সেই সব ক্লান্তিকর পরীক্ষা আমাকে দিতে হচ্ছিল। কিন্তু সারাক্ষণ আমার মন অন্য কথা বলছিল। বুঝতে পারছিলাম যে, এসব কিছুই নয়; আসলে সারাজীবন ধরে আমি যে কিছু কিছু অন্যায় করেছি তা সবই তার প্রতিক্রিয়া। সবচেয়ে কাছাকাছি কারণটা হচ্ছে ট্যাক্সির ভাড়া না দেওয়া এবং ট্যাক্সিওয়ালাকে ওই মার। অবশেষে রোগ ধরা পড়ল— হাইপার অ্যাসিডিটি। গালভরা চমৎকার নামটি শুনে আমি খুশি হলাম, সোনামন হল না।

ডাক্তার আমার ব্যাপারে তাকে কিছু কিছু উপদেশ দিয়েছিলেন। পাড়ার একটা ছোট্ট চায়ের দোকানে আমি মাঝে-মাঝে চা খেতাম। সেইখানে এক বিকালে দোকানভরতি লোকের সামনে সোনামন দোকানদারকে বোঝাল আমার কি বিশ্রী একটা অসুখ হয়েছে।

আর চা কত খারাপ। এর পর থেকে আমি চা চাইলে সে যেন আমাকে এক কাপ করে দুধ দেয়। দোকানদারকে কথা দিতে হল।

তারপর চলল গয়লার খোঁজ যে রোজ সকালবেলায় আমার ঘরের সামনে গরু নিয়ে এসে দুধ দুইয়ে দিয়ে যাবে। আমি আপত্তি করলাম—রোজ সকালে উঠে আমি গরুর মুখ দেখতে পারব না। কিন্তু সোনামন শুনল না।

যে হোটেলটায় আমি খেতাম সেখানে গিয়েও সোনামন আমার খাবারে ঝাল মশলার ওপর একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারি করে এল। আর আমার ঘরের টেবিলটা ভরে উঠল বিস্কুটের টিন আর ওষুধের বাক্সে। আর সেই থেকেই আমার সিগারেট হাত-ছাড়া হয়ে সোনামনের হাতব্যাগে ঢুকে গেল। বিয়ের একমাস আগে থেকেই।

বহুদিন হল প্রায় চোদ্দো-পনেরো বছর বয়স থেকেই আমি বাড়ি আর মা বাবাকে ছেড়ে বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছি। কখনও পড়ার জন্য, কখনও চাকরির জন্য। নিঃসঙ্গ জীবন আমার একরকম প্রিয় ছিল। সেইখানেই পড়ল ডাকাত। সোনামন বিকেলে ফিরে যাওয়ার সময়ে রোজ দিব্যি দিয়ে যেত—রাত্রে যেন দুটোর বেশি সিগারেট না খাই। ও চলে গেলে দীর্ঘ অপরাহ্ন আর রাত-জোড়া নিঃসঙ্গতায় সিগারেট ছাড়া তাই হঠাৎ বুকের মধ্যে ধক করে উঠত! তবু খেতাম না। ওর দিব্যি মনে পড়ত। একটু হেসে আমি আমার প্রিয় সিগারেটে আগুন না জ্বেলে হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতাম।

আস্তে-আস্তে ব্যথাটা কমে যেতে লাগল। দশ পনেরো দিনের মধ্যেই আর ব্যথার চিহ্ন ছিল না। টক জলের স্বাদ মুছে গেল বুক আর জিভ থেকে। চেহারা ফিরল একটু। আর সোনামনের মুখে বাচ্চা লুডো খেলুড়ির ছক্কাফেলার মতো ছেলেমানুষি হাসি ফুটে উঠল। তবু মাঝে-মাঝে আমার দুর্বোধ্যভাবে মনে হত আমার অসুখের কারণ কেবলমাত্র সিগারেট কিংবা অনিয়ম নয়। কেননা অনিয়ম এবং সিগারেটেরও আবার কারণ রয়েছে। এই রকম অনুসন্ধান করে যেতে থাকলে হয়তো দেখা যাবে আমার প্রস্তরীভূত মূল অন্যায়গুলিকে। সেই ট্যাক্সির ব্যাপারটা আমার প্রায়ই খুব মনে পড়ত। সোনামনকে আমি দু একবার বলতে গিয়েও সামলে গেছি। কেননা ও হয়তো ব্যাপারটায় নিজের দোষ মনে করে দুঃখ পাবে।

বিয়ের পর দু-মাস কেটে গেছে। আমার অসুখ নেই। নিঃসঙ্গতা নেই। সোনামন যত্ন করে রেঁধে দেয় মশলা আর ঝাল ছাড়া খাবার। কম সিগারেট। আমার সমস্ত শরীরে ধীরে-ধীরে ফুটে উঠছে স্বাস্থ্যের সুলক্ষণ। আর আমাকে নিজের কাছ থেকে পালাতে হয় না বন্ধুদের বিকারগ্রস্ত ভিড়ে কিংবা আড্ডায়। খিদে মেটাবার আলসেমিতে যখন তখন চায়ের কাপ টেনে বসতে হয় না। আমি সুন্দরভাবে বেঁচে আছি। জানি, অলক্ষে অজান্তে কখন

সোনামনের গভীর উষ্ণ অন্ধকারে চলে গেছে আমার বীজ। ওই বৃক্ষ থেকে পাকা ফলের মতো বোঁটা ছিঁড়ে শিগগিরই একদিন নেমে আসবে আমার প্রিয় আত্মজরা। আমি জানি। আমি তা জানি। তবু আজ রাত দুটোয় আমি সোনামনকে ঘুমন্ত একা বিছানায় রেখে চুরি-করা সিগারেট জ্বেলে এসে জানলায় দাঁড়ালাম। হায় ঈশ্বর! আমি কীভাবে বলব! সোনামনকে আমি কীভাবে বলব!

ট্যাক্সিওয়ালাটা জানে যে, একটা রাস্তায় দুর্ঘটনার জন্য তার ফাঁসি হবে না। কিন্তু পরিপূর্ণ প্রতিশোধ নেওয়া হবে। আমি তার ট্যাক্সির নম্বর মনে রেখেছি। কিন্তু আমি জানি তাতে লাভ নেই। আমি তাকে আর ছুঁতেও পারি না।

পরশুদিনই আমি তাকে আর একবার দেখলাম। এক পলকের জন্য। সুইন হো স্ট্রিটের ঘরটা ছেড়ে দিয়ে আমরা এখন যে ছোট্ট বাসাটায় আছি তা বাস রাস্তা থেকে অনেকটা দূরে। একটু নির্জন চওড়া রাস্তা। বড়লোকদের পাড়া। বিকেলে আমি ফিরছিলাম। সারা মন সোনামনের নাম ধরে ডাকছিল। মনে পড়ছিল দরজা খুলে দিয়ে সোনামন কেমন লঘু পায়ে আমার আক্রমণ থেকে সরে দাঁড়াবে। চলে যাবে ছোট্ট ফ্ল্যাটটার কোণে কোণে। অনেকক্ষণের সেই ক্লান্তিহীন হুটোপুটি। সে সময়ে সোনামন তার ঘন শ্বাসের ফাঁকে-ফাঁকে বলবে—মোটেই তিনটে না মশাই, তুমি আজ পাঁচটা সিগারেট খেয়েছ সারাদিন। ভুরভুর করছে গন্ধ। ভাবতে-ভাবতে আমি অন্যমনে ফুটপাথ থেকে পা বাড়িয়েছি রাস্তা পার হওয়ার জন্য। অভ্যাসমতো ডানদিকে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলাম। মোড় থেকে ধীরে-ধীরে আসছে একটা ট্যাক্সি। ওটা আসার অনেক আগেই আমি পেরিয়ে যাব মনে করে যখন আমি রাস্তার মাঝামাঝি তখনই হঠাৎ মোটর ইঞ্জিনের তীব্র শব্দ হয়েছিল। হর্ন বাজেনি। হতচকিত আমি দেখলাম। পাগলাটে খ্যাপা ট্যাক্সিটা বাঘের মতো লাফিয়ে চলে এল। বৃথাই আমি একটা হাত তুলে আমার অসহায়তা তাকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম। কেননা ততক্ষণে আমি বুঝে গেছি সে কী চায়। সময় ছিল না। একদম সময় ছিল না। শুধু শেষ চেষ্টায় আমি খুব জোরে শূন্যে লাফিয়ে উঠলাম। ট্যাক্সির নীচু বনেটটায় আমার পায়ের জুতোর ঠক করে শব্দ হল। আমাকে পাকিয়ে ছুড়ে একধারে ফেলে রেখে গাড়িটা তার তীব্র গতি বজায় রেখে বেরিয়ে গেল। খুব সামান্য এক পলকেরও ভগ্নাংশ সময়ের জন্য আমি ড্রাইভারের রুক্ষ মুখটা দেখতে পেলাম, অস্বচ্ছভাবে শুনতে পেলাম তার চাপাগলার গালাগাল—শালা...

উঠে দাঁড়াবার পরও অনেকক্ষণ আমার সামনে শূন্য রাস্তাটাকে বড় বেশি শূন্য বলে মনে হয়েছিল। চারপাশ খুব নির্জন এবং শীতল—যেন কিছুই ঘটেনি। পুরোনো অভ্যাসমতো আমি সিগারেটের প্যাকেটের জন্য পকেটে হাত বাড়ালাম। সোনামনের মুখ

মনে পড়ল। আমি যাতে নিরাপদে থাকি সেইজন্যেই আমার সিগারেট কেড়ে নিয়েছে সোনামন। সে চায় আমি দীর্ঘকাল বেঁচে থাকি, কোনও অসুখ, সামান্য অসুখও যেন না থাকে তার মানিকসোনার।

রাত দুটোর নির্জন রাস্তার দিকে চেয়ে আমার সেই একদিনের চেনা ট্যাক্সিওয়ালাকে ডেকে জিগ্যেস করতে ইচ্ছে করে —ভাই ট্যাক্সিওয়ালা, তুমি কি জানো আমার সোনামন চায় যে, আমি আরও দীর্ঘকাল নিরাপদে বেঁচে থাকি?

তবু আমি জানি এই ঘরে আমার সোনামনের সতর্ক যত্নের বাইরে খোলা রাস্তায় আমাকে যেতে হবে। কলকাতায় রাস্তার গলিতে হাঁটাপথে কোথাও না কোথাও পছন্দমতো জায়গায় সে আমাকে পেয়ে যাবে। হয়তো সারাদিন ধরে তার ট্যাক্সি ওঁত পেতে অপেক্ষা করে থাকবে গলির মোড়ে, অফিসের পাশেই কোনও চোরা গলিতে, হয়তো বা সে আমার পিছু নিয়ে ফিরবে দীর্ঘ পথ। তারপর একদিন দেখা হবে। সে তো জানেও না কে আমার সোনামন, কীংবা কীরকম আমাদের ভালোবাসা! জানেও না সোনামনের শরীর জুড়ে আমাদের সন্তান আসবে শিগগিরই একদিন! সে শুধু বিচ্ছিন্নভাবে আমাকে জানে যে, আমি অন্যায়কারী, সে জানে আমি তাকে একদিন মেরেছিলাম। তাই বহু খুঁজে-খুঁজে সে আমার চলাফেরার পথ বের করেছে। এখন কেবল সময় এবং সুযোগের অপেক্ষায় আছে সে।

পরিপূর্ণ শান্ত আমার ঘরের জানালায় দাঁড়িয়ে আমার চুরি-করা প্রিয় স্বাদু সিগারেট ধরিয়ে সামান্য অন্যমনে অনিশ্চয়ভাবে আমি মৃত্যুর কথা ভাবছিলাম। তিনমাস আগে সেরে যাওয়া বুক ও পেটের মাঝখানের সেই ব্যথাটা আস্তে-আস্তে ফুলের কলির মতো ফুটে উঠে ছড়িয়ে যাচ্ছিল।

তোমার উদ্দেশে

"In search of you, in search of you...."

ওইখানে তুমি থাকো। ওই সাদা বাড়িটায়, যার চূড়ায় শ্বেতপাথরের পরিটাকে বহু দূর থেকে দেখা যায়। নির্জন তোমাদের ব্যালকনি, বড়-বড় জানালায় ভারী পরদা ঝুলছে, দেয়ালে লাগানো এয়ারকুলার। মসৃণ সবুজ লনে বুড়ো একটা স্প্যানিয়াল কুকুর ঘুমিয়ে আছে।

পরিস্কার বোঝা যায়, এসব এক পুরুষের ব্যাপার নয়। জন্মের পর থেকেই তুমি দেখেছ খিলান-গম্বুজ, বড় ঘর, ছাদের ওপর ডানা মেলে-দেওয়া পরি—যা কেবলই উড়ে যেতে চায়। যায় না।

বিকেলের রাস্তায় ক্কচিৎ চোখে পড়ে কালো যুবতী আয়া মন্থর পায়ে প্র্যাম ঠেলে নিয়ে চলেছে। কদাচিৎ দু-একজন ভবঘুরে লক্ষহীন চোখ চেয়ে হেঁটে যায়। বড় সুন্দর অভিজাত নিস্তব্ধতা তোমাদের। তাই যদিও আমার পথে পড়ে না, তবু আমি মাঝে-মাঝে তোমাদের এই নির্জন পাড়ার রাস্তা দিয়ে ঘুরপথে যাই।

আজ দেখলুম তোমাকে। তুমি একা হেঁটে যাচ্ছিলে।

যখন ক্কচিৎ কখনও তুমি এরকম হেঁটে যাও, তখনই বলতে কি তোমার সঙ্গে এক সমতলে আমার দেখা হয়। আজ যেমন। নইলে মাঝে-মাঝে তোমাকে দেখি তোমাদের মভ রঙের মোটরগাড়িতে। হু-হু করে চলে যাও।

তোমাদের পুরোনো মোটর গাড়িটার কোনও গোলমাল ছিল কি আজ! কিংবা নিকেলের চশমা চোখে তোমাদের সেই বুড়ো ড্রাইভারটার!

অনেকদিন দেখা হয়নি। দেখলুম এই শীতকালে তুমি বেশ কৃশ হয়ে গেছ। সাদা শাড়ি পরেছিলে, তবু কচি সন্ন্যাসিনীর মতো দেখাচ্ছিল তোমাকে। সুন্দর অভ্যাস তোমার—শাড়ির আঁচল ডান ধার দিয়ে ঘুরিয়ে এনে সমস্ত শরীর ঢেকে দাও, মুখ নীচু করে হাঁটো—যেন কিছু খুঁজতে-খুঁজতে চলেছ। নাকি পাছে কারও চোখে চোখ পড়ে যায় সেই ভয়েই তোমার ওই সতর্কতা। ওরকম মুখ নীচু করে যাও বলেই বোধহয় তুমি কোনওদিন লক্ষ করোনি আমায়। আজকেও না।

মোড়ের মাথায় রঙ্গন গাছের ছায়ার যে লাল ডাকবাক্সটা আছে তুমি সেটা পেরিয়ে গিয়ে বাঁক নিলে। তোমাকে আর দেখা গেল না। এত কাছ দিয়ে গেলে আজ যে, বোধহয় তোমার আঁচলের বাতাস আমার গায়ে লেগেছিল। ইচ্ছে হয়েছিল একটুক্ষণের জন্য তোমার পিছু নিই। নিলুম না। কেননা ফাঁকা রাস্তার মোড় থেকে বেঁটে, মোটাসোটা কালো টুপি পরা লাল ডাকবাক্সটা স্থির গম্ভীরভাবে আমার দিকে চেয়েছিল। মনে হচ্ছিল তোমার পিছু নিতে গেলেই সে গটগট করে হেঁটে এসে আমার পথ আটকাবে।

একটু আগে আমি ওই মোড় পেরিয়ে এলুম। বাঁক ছাড়িয়ে কিছুদূরে এক গাড়িবারান্দার তলায় দেখলুম জটলা করছে পাড়ার বখাটে ছেলেরা। বড় রাস্তাতেও রয়েছে নির্বোধ পুরুষের ভিড়। একা ওইভাবে কোথায় যাচ্ছিলে তুমি? আমার কাছ থেকে তুমি যত দূরে আছ, সুরক্ষিত আছ, অনেকের কাছ থেকে কিন্তু তুমি তত দূর নও। আমি তাই অনেকক্ষণ ভাবলুম তুমি ঠিকঠাক চলে যেতে পেরেছিলে কি না।

তোমাদের পাড়া ছাড়িয়ে বড় রাস্তায় পা দিতেই কয়েকটা ভিখিরির ছেলেমেয়ে আমাকে ঘিরে ধরল। রুক্ষ চুল করুণ চোখ কৃশ চেহারা। লক্ষ করলুম একটি ছেলের মাথায় ঠোঙার মুকুট। একটি মেয়ের গলায় শুকনো গাঁদা ফুলের মালা। কাছেই ফুটপাতের কোথাও বসে এতক্ষণ বর-বউ খেলছিল বোধহয়। কিছু সময় তারা আমার পিছু নিল। 'দাও না, দাও না।' উলটো দিক থেকে ধীর গতিতে হেঁটে আসছিল একজন পুলিশ। কাছাকাছি হতে হঠাৎ কি ভেবে সে তার হাতের ব্যাটনটা দুলিয়ে বলে, 'ভাগ।' বাচ্চাগুলো পালিয়ে গেলে সে একবার আমার দিকে চেয়ে একটু তৃপ্তির হাসি হাসল। আমিও হাসলুম। বাচ্চাগুলো দূর থেকে চেঁচিয়ে বোধহয় আমাকেই বলছিল 'ভাগ! ভাগ!'

২

রাত সোয়া ন'টায় সোমেনের পড়ার ঘরের পাশে হলঘর থেকে ওদের পুরোনো প্রকাণ্ড দেওয়াল ঘড়িটায় পিয়ানোর টুংটাং বেজে উঠল। আমি দাঁড়িয়ে হাই তুললাম। সোমেন তার বইপত্র গুছিয়ে রাখছিল।

চলে আসছিলুম, সোমেন ডাকল, 'মাস্টারমশাই।'

'বলো।'

'কাল সবাই বরানগর যাচ্ছি, মাসিমার বাড়ি। পড়ব না।'

'আচ্ছা।'

'আর মাস্টারমশাই...' বলে ও লাজুক মুখে একটু হাসল।

'কী হল?'

কথা না বলে ও ইঙ্গিতে হলঘরের দরজাটা দেখিয়ে দিল। হলঘর পেরিয়ে ওদের অন্দরমহল। আজ হলঘরটা অন্ধকার। মাঝে-মাঝে অন্ধকার থাকে। বললুম, 'তুমি না এসো ও পি সি-তে বক্সিং করো! একটা অন্ধকার হলঘর পার হতে পারো না! বলতে-বলতে কাঁধে হাত রাখলুম। কিছুদিন আগে পৈতে হওয়ার পর মাথার চুল এখনও ছোট ছোট—আর দণ্ডীঘরের ব্রহ্মচর্যের আভা এখনও ওর সমস্ত শরীরে ফুটে আছে।

'এই ঘরে তোমার দাদু মারা গিয়েছিলেন না! বেঁচে থাকতে যিনি তোমাকে অত ভালোবাসতেন, মরার পর কি তিনি তোমাকে ভয় দেখাতে আসবেন?'

শুনে সামান্য শিউরে উঠল সোমেন। আমি ওর মাথায় হাত রাখলুম। কখনও যখন হোম-টাস্কের খাতার দিকে ঝুঁকে থাকা ওর মনোযোগী মুখে টেবিল বাতির সবুজ ঢাকনার আলো এসে পড়ে, কিংবা যখন কখনও ভুলে যাওয়া পড়া মনে করার চেষ্টায় ও দাঁতে ঠোঁট চেপে, হাত মুঠো করে অসহায় চোখে টালমাটাল তাকায় তখন আমার কখনও-কখনও মনে হয়—এই সুন্দর, পবিত্র ছেলেটি আমার। এই আমার ছেলে সোমেন—যার হাতে রাজ্যপাট দিয়ে খুব শিগগিরই একদিন আমি বানপ্রস্থে যাব।

আমি হলঘরের দরজার কাছে দাঁড়ালুম। সোমেন এক ছুটে অন্ধকার হলঘর পার হয়ে গেল।

আমাদের বাসার সদর দরজার ছিটকিনিটা বাইরে থেকেই খোলা যায়। প্রথমে দরজাটা টেনে বন্ধ করো। তারপর ডানদিকের পাল্লাটা আস্তে-আস্তে চেপে ধরো। খুব অল্প একটু ফাঁক হবে। সেই ফাঁকে সাবধানে ঢুকিয়ে দাও বাঁ-হাতের আঙুল। এইবার আঙুলটা

ডানদিকে বেঁকিয়ে দিলেই তুমি ছিটকিনির মুখটা নাগালে পাবে। সেটা ওপরে তুলে ঘোরাও। তারপর ছেড়ে দাও। ঠক করে ছিটকিনি খুলে যাবে।

রাত সাড়ে দশটায় কৌশলে সদরের ছিটকিনি খুলে, অন্ধকার প্যাসেজ পার হয়ে আমি ঘরে ঢুকলাম। বাতি জ্বলছে। মা'র বিছানায় মশারি ফেলা। মার জেগে থাকার কোনও শব্দ শোনা যায় না।

রান্নাঘরে আমার ভাতের ঢাকনা খুলে বেড়ালে মাছ খেয়ে গেছে। মা টেরও পায়নি। আজকাল বড় সহজেই ঘুমিয়েই পড়ে মা। বয়স হচ্ছে। কথা বলতে বলতেও হঠাৎ বুকের ওপর ঝুঁকে নেমে আসে মাথা। খেয়াল হতে চমকে জেগে উঠে জিগ্যেস করে, 'কী বলছিলাম যেন!' আমি হেসে বলি, 'কিছু না মা, কিছু না।'

রান্নাঘরের জানালার একটি শার্সি ভাঙা! মেঝের ওপর ফোঁটা-ফোঁটা ঝোল, আর তার সঙ্গে এখানে-ওখানে বেড়ালের পায়ের ছাপ। ভাঙা শার্সিওলা জানালাটা পর্যন্ত গেছে। ভাতের পাশে কালচে আর মেরুন রঙের দুটো তরকারি, হাতল ভাঙা কাপে হলুদ ডাল! রাতে ঠান্ডা এই খাবারের দিকে চেয়ে মনে হয় মুখে দিলে বড় বিস্বাদ লাগবে।

খেয়ে ঘরে এসে একটা সিগারেট ধরাব, মা ঘুমের মধ্যেই অঃ' শব্দ করে পাশ ফিরল।

'কে!'

'আমি।'

মা চৌকির শব্দ করে উঠে বলল, 'দেখ তো, একটা চিঠি এসেছে বিকেলে। চোখে ভালো দেখি না। দেখ তো। কর্তার চিঠি মনে হয়।'

মশারির ভিতর থেকে হাত বের করে মা আমার হাতে চিঠি দিল, 'জোরে পড়।'

কালচে রঙের পাকিস্তানি পোস্টকার্ডের ওপরে ইংরেজিতে লেখা—'কালী। তার নীচে পাঠঃ 'পরমকল্যাণবরেষু বাবা রম, ইতিপূর্বে তোমার নিকটে কার্ডে পত্র দিয়াছি তাহা পাইয়াছ কিনা জানাইও। তোমাদের চিঠি না পাইলে চাঞ্চল্য ও চিন্তা অত্যন্ত বাড়িয়া যায়, তখুনি অসুখ অশান্তি দেখা দেয়, সঙ্গে-সঙ্গে শারীরিক ও মানসিক অবস্থা খারাপ হইয়া যায় —চোখে ভালোরূপ দেখিতে পারি না বলিয়া নানারূপ জ্বালা যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি। বর্তমান অবস্থা ব্যবস্থা দৃষ্টে প্রতীয়মান হয়, তাড়াতাড়ি কোনও কিছু না হইলে ব্যবস্থা ক্রমশ জটিল ও সঙ্কটাপন্ন হইবে। তোমার কাগজাত ঢাকা আসিলে অবশ্য খবর পাওয়া যাইত। অনিলের সহিত যোগাযোগ করিও। ওই সঙ্গে কলিকাতা পাকিস্তানি হাই-কমিশনার বরাবর দরখাস্ত দিয়া তাহাতে অনুমতি পাইবার ব্যাপারে রিকমেন্ড করাইয়া পাঠাইতে

পারিলে সর্বাপেক্ষা ভালো হয়। কারণ এখানকার ডি আই জি হইতে পাওয়া অত্যন্ত কষ্টকর ও দুষ্প্রাপ্য জানিবা।...বলিয়াছিলাম, বরং মুসলমান হইব তবু ভিটা ছাড়িব না।...অসুখে অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িয়াছি...তোমরা নিকটে না থাকায় অত্যন্ত অসহায় ও দুর্বল বোধ করি। মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট পাওয়া অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার, রিকমেন্ড থাকিলে কাজের সুবিধা হইবে। দেরি হইলে আরও বৃদ্ধ ও অশক্ত হইয়া পড়িব...তোমাদের সহিত আর দেখা হইবে না। হিন্দুস্থানে মরিতে চাহি। তোমরা গুড়া কাকিমার মাথার কিচ্ছু বিকৃতি দেখা দিয়াছে—আজ চার-পাঁচ মাস যাবৎ নানারূপ চিকিৎসা চলিতেছে। সোনারপুরে আমাদের যে জমি তাহাতে অন্তত দুইখানি দুই চালা তোলার চেষ্টা করিও। বর্তমান যে দুঃসময় দেখা দিয়াছে তাহাতে মিতব্যয়ী না হইলে নিরুপায় হইবা। সাবধানে থাকিও ও মঙ্গল জানাইও। অন্যান্য এক প্রকার। ইতি আং তোমার বাবা।'

চিঠি শুনে মা কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর আস্তে-আস্তে বলল, 'সারাদিন তুই করিস কি? সার্টিফিকেটটার জন্য একটু ঘোরাঘুরি করলে যদি হয়, করিস না কেন! অনিলের কাছে যা—ও অত বড় চাকরি করে, ঠিক বের করে দেবে।'

'যাব।'

'যাস! বুড়ো বয়সে এখন জেদ কমেছে লোকটার, এইবেলা নিয়ে আয়।'

মা মশারির ভিতরে বসে চুলের জট ছাড়াচ্ছে। বলল, চোখে কেন কুয়াশার মতো দেখি আজকাল। কর্তা আসবে, তার আগেই একবার হাসপাতালে নিয়ে যাস তো!'

আমি মা'র মশারি তুলে দিয়ে ভিতরে পায়ের কাছে গুটিসুটি মেরে শুলুম। 'মশা ঢুকছে না!' বলে ছোট্ট একটু ধমক দিয়ে মা আমার পিঠে হাত রেখে বলল, 'কী এত খরচ করিস! এতদিন একটু আধটু জমালে দুটো দোচালা সত্যিই উঠে যেত। একটু গাছ-গাছালি লাগাতে পারতুম। নিজেদের বাগানের ফল-পাকুড় খাই না কত দিন!'

'একটু আদর করো না সোনা মা!'

৩

আমার সামনের রাস্তায় হঠাৎ পড়ে লাফিয়ে উঠল একটা লাল বল। এমন চমকে উঠেছিলুম! তারপরই শোনা গেল সামনের হলুদ বাড়িটার দেওয়ালের আড়াল থেকে বাচ্চা

ছেলেদের চিৎকার, 'ওভারবাউন্ডারি...ওভারবাউন্ডারি!...মিলনের একুশ।' শুনে আমি আপন মনে হেসে উঠলুম।

পিছনের পার্কটায় দেখে এলুম এক পাল কাকের সভা বসেছে। আর খোলা মাঠে ছেঁড়া কাগজ উড়িয়ে খেলছে বাতাস। মোড় ফিরতেই মুখোমুখি দেখা হল সেই মোটা, লাল ডাকবাক্সটার সঙ্গে। দূরে দেখা যায় তোমাদের বাড়ির চূড়ায় পরিটাকে—আকাশের দিকে বাড়ানো এক হাত—অন্যহাতে সে তার বাঁ-দিকের স্তন ছুঁয়ে আছে।

এখন দুপুর। রাধাচূড়া গাছের তলায় জলের ড্রাম, পেতলের থালা, আর ছাতুর ঝুড়ি সাজিয়ে বসেছে এক অল্পবয়সি ছাতুওয়ালা। তাকে ঘিরে রিকশাওয়ালাদের ভিড়। এক হাত খাবারের থালায় রেখে অন্যহাতে লোভী পাখিপক্ষীদের তাড়াতে-তাড়াতে যখন মাঝে-মাঝে আকাশের দিকে চেয়ে দেখে তখন মনে হয় খাবারের সঙ্গে আকাশ, মাটি ও উদ্ভিদদের বড় মায়া মিশে আছে। ইচ্ছে করে ওদের সঙ্গে বসে যাই।

চমৎকার দিন আজ। আকাশে এতটুকু মেঘ নেই। শীতের খর বাতাস বইছে।

তুমি আজ কোথাও ছিলে না। যখন তোমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে হেঁটে গেলুম তখন দেখি একটা ঘাস-ছাঁটা কল বাগানময় ঠেলে নিয়ে বেড়াচ্ছে তোমাদের মালি। ব্যালকনিতে দুটো ডেকচেয়ার। তোমাদের অর্ধবৃত্তাকার গাড়িবারান্দার তলায় দাঁড়িয়ে আছে একটা একটু স্কুটার, যার রং ছানার জলের মতো সবুজ।

সারা দুপুর আমি আজ আর ভুলতে পারলুম না—ওই ঘাস-ছাঁটা কল, দুটো ডেকচেয়ার, আর ওই সবুজ একা একটা স্কুটার।

৪

আজ প্রথম পিরিয়ডে আমি ক্লাসে ছাত্রদের ফুল্লরার বারো মাসের দুঃখের ভিতরে তখনকার গার্হস্থ্য চিত্র আর সমাজজীবন বিষয়ে একটা প্রশ্ন লিখতে দিয়ে জানালার কাছে এসে যখন দাঁড়ালুম তখন দেখা যাচ্ছে আকাশে নীচু একটু মেঘ। বৃষ্টি হবে কি! বৃষ্টির আগে ভেজা মাটির যে গন্ধ পাওয়া যায় আমি তার জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছিলুম। বৃষ্টি এল না! শেষ ক্লাস ছিল সেভেন-এ। ওরা গেল ক্লাস লিগে ক্রিকেট খেলতে। টিফিনে তাই ছুটি পেয়ে বেরিয়ে আসছি, গিরিজা হালদার একটা কাগজ এগিয়ে দিয়ে বলল, সই করুন।' চটপট সই করে দিলুম! হালদার গজগজ করতে-করতে কমনরুম থেকে বেরিয়ে

যাচ্ছিল, 'কীসে সই করলেন, একবার পড়েও দেখলেন না।' চেঁচিয়ে বললুম, 'যে কোনও আন্দোলনই করুন—আমি সঙ্গে আছি। বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক।' বেরিয়ে এসে খুশি মনে দেখলুম ঝকঝক করছে দিন।

পাবলিক ইউরিন্যালের নোংরা দেয়ালে পেনসিলে লেখা অনেক অশ্লীল কথার মধ্যে কে লিখে —গোপাল আর নাই। 'গোপাল' থেকে পেন্সিলের হালকা রেখা 'নাই'-তে এসে গম্ভীর। যেন বা হতাশা থেকে ক্রমে ক্রোধ! লেখা নেই, তবু মনে হয় হতাশার 'হায় গোপাল' থেকে শুরু, শেষে এসে রাগ—'নাই কেন?' লেখা আছে—গোপাল আর নাই। আমি পড়লুম—'হায়! গোপাল!' পড়লুম, 'গোপাল আর নাই কেন?'

বেরিয়ে আসছি, দেখি দেশপ্রিয় পার্কের কাছে ট্রামের স্টপে ভিড়ের মধ্যে একটা চেনা মুখ! সুধাকর না! কলেজ টিমের দুর্দান্ত লেফট আউট ছিল! দেখি গায়ে চর্বি জমেছে, থলথল করছে ভুঁড়ি, কাঁধে ঝুলছে শান্তিনিকেতনের ঝোলা ব্যাগ। পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি। পায়ে চপ্পল।

ফার্স্ট ডিভিশনেও কিছুদিন খেলেছিল সুধাকর। তখন ওর দৌলতে ডে স্লিপে কত খেলা দেখেছি। মনে পড়ে লাইটহাউসে দুজনে দশ আনার লাইন দিতে গেছি, দুটো অচেনা ছেলে লাইন থেকে ডেকে বলল, 'আপনি এস সেন না?' সুধাকর মাথা নাড়ল—'হ্যাঁ'। 'আসুন না, এখানে জায়গা করে দিচ্ছি।' লাইনে দাঁড়িয়ে সুধাকর চাপা গলায় বলেছিল, 'কিরে শালা দেখলি!'

চার বছর আগে শেষ দেখা চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার হাসপাতালের সামনে। তখন ওর মায়ের ক্যানসার। ইউটেরাসে। দুজনে চৌরঙ্গি পর্যন্ত হেঁটে গিয়েছিলুম। বললে, 'খেলা ছাড়ার পরই একটা মজার চাকরি পেয়ে গেছি ভাই। কনস্ট্রাকশনে। কাজকর্ম কিছু বুঝি না, কিন্তু এধার-ওধার থেকে কেমন করে যেন পয়সা এসে যায়!' পরমুহূর্তে গম্ভীর হয়ে বলল, কিন্তু আমি ইমমর‍্যাল নই, খেলার মাঠেও মার না খেলে কখনও মারিনি।' তখন শীত শেষ হয়ে কলকাতায় গরম পড়ে গেছে, তবু সুধাকরের গায়ে ছিল একটা পুরোনো ব্লেজার—বুকের কাছে মনোগ্রাম করা, যেন চোখ পাকিয়ে বলছিল—আমি খেলোয়াড় সুধাকর।

আমি ওকে ডাকলুম না। দূর থেকে দেখলুম ধুতি-পাঞ্জাবি-চপ্পল পরা মোটা থলথলে সুধাকর যেন সবাইকে দেখিয়ে চলন্ত ট্রামের হ্যান্ডেল ধরে চটপটে পায়ে পা-দানিতে উঠে গেল।

সন্ধেবেলায় কফি হাউসে অনেকের সঙ্গে দেখা। অমর ফিরেছে বিলেত থেকে অনেক দিন পর। আড্ডা তাই জমজমাট ছিল। অমররা সিং। পাঞ্জাবি শিখ, বাঙালি হয়ে গেছে।

আগে দাড়ি গোঁফ পাগড়ি ছিল না।

আজ দেখি জালে ঢাকা দাড়ি, মাথায় জরির চুমকি দেওয়া পাগড়ি, বললুম, 'আগে না তুই ছিলি মেকানাইজড শিখ! তবে আবার কেন দাড়ি গোঁফ পাগড়ি, হাতে কেন তোর বালা?'

হাতজোড় করে বলল, রিলিজন নয় ভাই, এ আমার পলিটিক্স। বিলেতে গিয়ে দেখি ইন্ডিয়ানদের পাত্তা দেয় না। আমার গায়ের রং ফরসা, অনেকেই সাহেব বলে ভুল করে, খাতির যত্ন পাই। কেমন লেগে গেল সেন্টিমেন্টে। তাই দাড়ি গজিয়ে পাগড়ি বেঁধে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলুম—ইন্ডিয়ানদের যে পাওনা তাই দাও আমাকে। খাতির চাই না।

রাত আটটার সময় ওরা উঠে গেল মদের দোকানে। সেলিব্রেট করবে। আমি গেলুম না। যাওয়ার সময় তুলসী আড়ালে ডেকে বলে গেল, অনিমেষকে একবার দেখতে যাস। ওর অসুখ।'

'কী অসুখ!'

মুখ টিপে হেসে বলল, 'বলছিল, অসুখের নাম মীরা। দেখিস গিয়ে।'

৫

রাত সাড়ে ন'টায় আমি লন্ডনের এক অচেনা রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিলুম। চারদিক হিম কুয়াশায় আচ্ছন্ন, কিছুক্ষণের মধ্যেই বরফ পড়বে। একটা দোতলা বাস হল্টে থেমে আছে, বাস-এর পিছনে বিজ্ঞাপন—'সিনজানো'। চোখ পড়ে অদ্ভুত পুরোনো ধরনের গথিক লাইটপোস্ট, ভিকটোরিয় দালানের ভারী স্থাপত্য, পিছনে দূরের বহুতম স্কাইক্র্যাপারের জানালায় আলোর আভাস। ওভারকোটের পকেটে আমার দুই হাত। আমি হেঁটে যাব। সামনের যে কোনও পাব-এ রহস্যময়ভাবে ঢুকে আমি খেয়ে নেব এক গ্লাস বিয়ার, অল্প গুনগুন করে গাইব ওই অচেনা শব্দটি যা কিনা কোনও মদের নাম—'সি-ই-ন-জা-আন-ও-ও'। ঘরে ফেরার আগে আমি কোনও হোটেলের বলরুমে ঢুকে নেচে নেব। দু-চক্কর নাচ, 'হেঃ এ, টুইস্ট, টুইস্ট, টুইস্ট।'

আমি দূর বিদেশে পৌঁছে গেছি আজ। ঘন কুয়াশার পরদা সরালেই দেখা যাবে আমার চারধারে জীবন্ত এই ছবি।

চেনা রাস্তাঘাট আজ আর চেনা যাচ্ছিল না। বিবর্ণ দেওয়াল, ছেঁড়া পোস্টার, কালো ক্ষয়া চেহারার মানুষ—এই সবই ঢাকা পড়েছিল। কলকাতায় বড় সুন্দর ছিল আজকের কুয়াশা। হাজরার মোড়ে দাঁড়িয়ে আমি ধরিয়ে নিলুম একটা সিগারেট। ট্রাফিকের সবচেয়ে সুন্দর আর ক্ষণস্থায়ী হলুদ বাতিটি ঝলসে উঠলে স্টেটবাসের গিয়ার বদলানোর শব্দ হয়েছিল। জ্বলে উঠল সবুজ। 'আস্তে ভাই ট্যাক্সিওয়ালা' বলতে-বলতে আমি ডান হাত ট্র্যাফিক পুলিশের ভঙ্গিতে তুলে ধরে দুই লাফে রাস্তা পার হয়ে গেলুম।

আমার যাওয়ার কথা বকুলবাগান, সেদিকে না গিয়ে আমি মোড় নিলুম ডাইনে, এসে দাঁড়ালুম আদিগঙ্গার পোলের ওপর। আমার পায়ের তলা দিয়ে অন্ধকার রেলগাড়ির মতো বয়ে চলেছে জল। না, গঙ্গা কোথায়! এ তো রাইন! অদূরে ট্রাফলগার স্কোয়ার থেকে ভেসে আসছে রাতের ঘুমভাঙা কবুতরের পাখার শব্দ, আমার পিছনে অস্পষ্ট ইফেল টাওয়ার, সামনে বহুদূরে স্ট্যাচু অব লিবার্টি, বাঁয়ে ব্রহ্মপুত্রের ওপর দিয়ে শম্ভুগঞ্জের দিকে ভেসে চলেছে গুদারা নৌকা। কুয়াশার আবডাল সরে গেলেই সব দেখা যাবে। কিংবা বলা যায়, কুয়াশার আবডালেই বহু দূরের সবকিছু পুরোনো এই কলকাতার হৃদয়ের বড় কাছাকাছি এসে গেছে। কাছে আসবার এই তো সুসময়—বর্ষায়, বা ঝড়ে, বা কুয়াশায়! ভালোবাসায় একাকার হয়ে যায় পৃথিবী, সমুদ্র তার তট অতিক্রম করে উত্তাল হয়ে আসে স্থলভূমির দিকে, আমাদের চেনা শহরে ফুটে ওঠে অচেনা বিদেশের ছবি।

আজ রাতে তুমি একবারও খোলা জানালার কাছে এসে দাঁড়াবে কি? যদি দাঁড়াও, তবে—আমার মনে হয়, তুমি টের পাবে তোমাদের বাড়ির চূড়ার শ্বেতপাথরের পরিটা কুয়াশার আড়ালে তার মার্বেলের ভিত ছেড়ে উড়ে গেছে মোড়ের ওই লাল রঙের বেঁটে ডাকবাক্সটার কাছে। বহুকালের পুরোনো তাদের প্রেম—কেউ কখনও টেরও পায়নি। এখন পায়ের কোনও শব্দ না করে যদি তুমি ছাদে উঠে যেতে পারো তবে দেখবে—পরিটা সত্যিই নেই।

নাকি রাতের ডাকে চিঠিপত্র চলে গেছে বলে হালকা সেই ডাকবাক্সটা বেলুনের মতো উড়ে এসেছে তোমাদের ছাদে! পরিটার কাছে! এখন তাই ডাকবাক্সটা খুঁজে না পেয়ে পৃথিবীর ভুলো মানুষেরা ভাবছে—কোথায় গেল আমাদের এতকালের চেনা সেই ডাকবাক্স! নাকি আমাদেরই রাস্তা ভুল!

অনিমেষ একা থাকে। অসুখ শুনে দেখতে গিয়েছিলুম।

শুয়ে আছে। দেখলুম নাকটা অল্প ফুলে লাল হয়ে আছে। মুখের এখানে ওখানে ফাটা-ছেঁড়া, কপাল থেকে থুতনি পর্যন্ত টানা লম্বা একটি কালশিটের দাগ।

আমাকে দেখে কনুইয়ে ভর রেখে উঠবার চেষ্টায় মুখ ভয়ঙ্কর বিকৃত করে বলল, 'চারটে লোক! বুঝলি, চারটে লোক ফিলজফি পালটে দিয়ে গেল।'

'কী হয়েছে তোর?'

'কি জানি। একা পড়ে আছি, সিগারেট এনে দেওয়ারও লোক নেই। আর শালা দুপুরটা যে কি লম্বা মনে হয়!'

'চারটে লোক কারা?'

পাশ ফিরে বলল, 'চিনি না! নাইট শো দেখে ট্যাক্সিতে ফিরছি, তখন রাত বারোটা। আমার ঘরের সামনে ওই যে অনেকটা ফাঁকা জায়গা, মাঠের মতো, বড় রাস্তায় ট্যাক্সিটা ছেড়ে দিয়ে যেই মাঠে পা দিয়েছি, টের পেলুম ঘরের বারান্দায় অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আবছা চারটে লোক। তক্ষুনি কেন যেন মনে হল—বিপদ। ফিরে দেখলুম ট্যাক্সিটা ব্যাক করে মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছে। ভাবলুম ট্যাক্সিওয়ালাকে একবার ডাকি। ততক্ষণে চারটে লোক চটপটে পায়ে এসে আমার চারধারে দাঁড়াল। মুখোমুখি যে, তার হাতে একটা সাইকেল চেন। জিজ্ঞাসা করল—তুমি শালা অনিমেষ চৌধুরী? মীরার সঙ্গে তোমারই ভাব? বোঁ করে চেনটা এসে মুখে লাগল। পড়ে যাচ্ছিলুম, ধরে বলল, ঘরে চল। ঘর নিয়ে এল! আমি তালা খুললে চারজনেই ঢুকল ঘরে। বলল, তোমাকে কাট মারতে হবে। আমি অল্প টলছিলুম, মাথার ভিতরটা ধোঁয়াটে লাগছিল, তবু ওদের কথা বুঝলুম। বললুম, কেন? বলল, মীরার সঙ্গে বিয়ে হবে হরির। ছেলেবেলা থেকে ওদের ভাব, মাঝখানে তুমি কে? হরিকে আমি চিনি, মীরাদের বাসায় কাজকর্মে আসে, ছুতোরের কাজ করে, জগুবাজারে দোকান আছে। আমি মাথা ঠিক রাখার চেষ্টা করে বললুম, মীরা শিক্ষিতা মেয়ে, হরিকে বিয়ে করবে কেন? আমার বুকে আঙুল ঠুকে বলল, কেন, শালা শিক্ষিতা মেয়ের শরীরে ফুল ফোটে না! পাতা গজায় না? হাসল, বিয়ে করতে না চায়, আমরাই জোর করে দেব। সমাজের ব্যবস্থা আমরা পালটে দিচ্ছি শিগগিরই। তোমাকে চিঠি লিখতে হবে। লেখো। ওরা বলে গেল, আমি লিখলুম—প্রিয় মীরা, তোমার সঙ্গে আমার আর সম্বন্ধ নেই। কাল থেকে তোমার সঙ্গে কাট। দেখা হলে আমাকে না চিনবার চেষ্টা কোরো। আমি তোমাকে আর ভালোবাসি না। ইতি অনুতপ্ত অনিমেষ। লেখা হলে ওরা একটা খাম বের করে দিয়ে বলল, নিজের

হাতে ঠিকানা লিখে দাও। দিলুম। তারপর ওরা আমাকে মারল, মেরে শুইয়ে দিয়ে গেল মেঝেয়। বলে গেল, 'যদি কথার নড়চড় হয় তবে আবার দেখা হবে, না হলে গুডবাই।'

অনিমেষ আমার দিকে চেয়ে চকমকে চোখে হাসল, মীরা এসেছিল দু-দিন পর। দরজা খুললুম না। বাইরে থেকেই বলল, 'অফিসে তোমাকে ফোন করে পাইনি। তুমি এত খারাপ বাংলা লেখো, জানতুম না। এ চিঠি তুমি লিখেছ?' শান্তভাবে বললুম, হ্যাঁ। জিগ্যেস করল, কেন? বললুম—

'কী বললি!'

ধপ করে বালিশ মাথা থেকে ফেলে অনিমেষ মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে হাত নাড়ল, 'দূর শালা! সে অনেক কথা। ছেড়ে দে। তোর কাছে যে ক'টা সিগারেট আছে দিয়ে যা।'

আমার সিগারেটের প্যাকেট নিয়ে বালিশের পাশে রাখল, মীরার কথা এখন আর ভাবছিই না। ভাবছি ওই চারটে লোকের কথা। কী আত্মবিশ্বাস! আমাকে দিয়ে ওই চিঠি লিখিয়ে নিল, আর ঘরে ঢুকে মেরে গেল আমাকে, বুঝিয়ে দিয়ে গেল আমার জোর কতখানি। আমি শালা হারামির বাচ্ছা এতদিন ভদ্রলোক...'

রাতে বেড়াল খুঁজতে গিয়ে মা পড়ে গিয়েছিল উনুনের ধারে। হাঁটুতে চোট। একটা আঙুল সামান্য পুড়েছে। ডাক্তার বলে গেল—হাই প্রেসার, সাবধানে রাখবেন। খুব বিশ্রাম। আর নুন বারণ।

পায়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললুম, 'কেন মা, এত কাজকর্ম করতে যাও?'

মা মিনমিন করে বলল, 'বউ আন।'

স্বপ্ন দেখলুম।

আমার চোখের সামনে দেয়ালের পর দেয়ালের সারি। আর সেই অসংখ্য দেয়ালের গায়ে কে যেন অবিশ্রাম চক দিয়ে লিখে যাচ্ছে—গোপাল আর নাই। গোপাল আর নাই। গোপাল আর নাই। কোথাও লেখা—'হায় গোপাল!' কোথাও বা—'গোপাল আর নাই কেন?' আর রাস্তার মোড়ে মোড়ে বিয়ের 'স্বাগতম' লিখবার লাল শালুতে উড়ছে কর্পোরেশনের বিজ্ঞাপন, বসন্ত—টিকা নিন। বিপদ—টিকা নিন। ভয়—টিকা নিন।

দেখলুম স্টিয়ারিং হুইলে তোমার দুই অসহায় হাত, অহঙ্কারে একটু উঁচু তোমার মাথা। কপালের ওপর নেমে এসে দুলছে চুলের একটা ঘুরলি। দাঁতে ঠোঁটে চেপে হাসছ। তোমার কপালে ঘাম। তোমার মুখ লাল। পাশে খাকি শার্ট পরা নিকেলের চশমা চোখে বুড়ো সেই ড্রাইভার। একটু ডান দিকে হেলে সে তার একখানি সাবধানী হাত বাড়িয়ে রেখেছে স্টিয়ারিং হুইলের ওপর তোমার হাতের দিকে।

বড় ভালোবাসার তোমাকে আগলে নিয়ে গেল তোমাদের পুরোনো মভ রঙের গাড়ি। মোড়ের বেঁটে মোটা লাল ডাকবাক্সটা তার কালো টুপি পরা মাথা নেড়ে নিঃশব্দে চিৎকার করে বলল, 'হ্যাপি মোটরিং মাদমোয়াজেল, হ্যাপি মোটরিং।' বাড়ির চুড়া থেকে শ্বেতপাথরের পরিটা পুব থেকে পশ্চিম মাথা ঘুরিয়ে বহুদূর পর্যন্ত একবার দেখে নিল— কোনও বিপদ আছে কি না। যত দূরেই যাও, সে তোমাকে ঠিক চোখে চোখ রাখে।

যদিও একটু টাল খাচ্ছিল তোমার গাড়ি, তবু বলি, তুমি অনেকটা শিখে গেছ। আর কদিন পরেই তুমি তোমার গাড়ি একা চালিয়ে নিয়ে যাবে।

চোখ বুজে দেখলুম, দূরে রাসবিহারীর জংশনে ট্রাফিকের লাল আলোয় থেমে আছ তুমি।

থেমেছিলে? নাকি অপেক্ষা করেছিলে? দেখো একদিন আমি ঠিক রাস্তার মাঝখানে দুহাত দুদিকে ছড়িয়ে দাঁড়াব তোমাদের ওই মভ রঙের মোটর গাড়িটার মুখোমুখি। চেঁচিয়ে হয়তো বলব, 'বাঁচাও', কিংবা হয়তো বলব, 'মারো আমাকে।' কুয়াশায় বা ঝড়ে বা বৃষ্টিপাতে কোনওদিন সেই সুসময় দেখা দিলে, তখন আর ওই দুই শব্দের আলাদা মানে নেই।

৮

ফেব্রুয়ারি। কলকাতায় এবারের শীত শেষ হয়ে এল। বাতাসে চোরা গরম। রাস্তায় খুব ধুলো উড়ছে। চারদিকেই রাগী ও বিরক্ত মানুষের মুখ।

বিদায়ী শীতের সম্মানে একদিন স্কুল কামাই করা গেল। 'ম্যাটিনি'তে বেলেল্লা একটা হিন্দি ছবি দেখলুম। আমি আর তুলসী। বেরিয়ে দেখি বৃষ্টি। লবিতে দাঁড়িয়ে তুলসী হাত বাড়িয়ে বৃষ্টির জল ধরছিল। বললুম, 'তোর জমবে না কিছুই। তোর হাতে জল দাঁড়ায় না।' অসময়ে বৃষ্টি, তবু রাস্তায় জল জমে গেল। ট্রাম বাস বন্ধ। হাতে স্যান্ডেল, কাপড়

গুটিয়ে দুজনে ছপ করে জলে নামলুম। হঠাৎ অকারণে খুশি গলায় তুলসী বলল, 'পৃথিবী জায়গাটা মন্দ নয়, কী বলিস!'

পাড়ার চেনা ডাক্তার ধরে একদিন টি এ বি সি দিয়ে দিল। দু-দিন জ্বরে পড়ে রইলুম। মা কাছাকাছি ঘুরঘুর করে গেল বারবার। এমন ভাব—কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়াস, হতভাগা ছেলে, এবার পেয়েছি তোকে। তৃতীয় দিনে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে বসলুম। সকালেই দেখি, মা বাক্স খুলে কবেকার পুরোনো লালপেড়ে গরদের শাড়িটা বের করে পরেছে। 'কী ব্যাপার?' মা অপ্রস্তুত মুখে একটু হাসল 'কাল রাতে একটা বিচ্ছিরি স্বপ্ন দেখেছি।' মুখ ফিরিয়ে বলল, 'তোর জ্বরটাও সারল। কালীঘাটে একটু পুজো দিয়ে আসি।'

আমি আর গিরিজা হালদার স্কুল থেকে একসঙ্গে বেরোলুম একদিন। হালদার গলা নামিয়ে বলল, 'আমার জীবনে একটা ট্র্যাজেডি আছে মশাই। আপনাকে বলব একদিন।' পরমুহূর্তেই রুমাল বের করে বলল, 'গরম পড়ে গেল।' রেস্টুরেন্টে বসলুম দুজনে, গিরিজা হালদার কাটলেট খেল না, আঙুল দেখিয়ে বলল, 'দুটো টোস্ট। আমার মশাই নিরামিষ। দেখেন না হিন্দুর বিধবারা কতদিন বাঁচে।' হালদার প্রাণায়াম-টানায়াম করে। দম বন্ধ করে এক গ্লাস জল খেয়ে মুখ মুছে বাইরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'লক্ষ করেছেন কলকাতায় অনেকদিন কিছুই ঘটছে না! না লাঠিচার্জ, না গোলাগুলি, না কারফিউ। তেমন বড়সড় একটা মিছিলও দেখছি না বহুকাল। লোকগুলো মরে গেছে, কি বলেন!' অন্যমনস্কভাবে বললুম, 'হুঁ।' হালদার টেবিলে আঙুল বাজিয়ে গুন গুন করল, 'জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে...'

দূর গঙ্গায় বেজে ওঠে জাহাজের ভোঁ। মাথার ওপরে উড়োজাহাজের বিষণ্ণ শব্দ। অন্যমনে সাড়া দিই—'যাই।'

রাতে হঠাৎ চমকে ঘুম ভেঙে উঠে বসলুম, 'মা, ও মা, তুমি আমায় ডাকলে।' মা জেগে উঠে অবাক গলায় বলল, 'না তো।' বিড়বিড় করে বীজমন্ত্র পড়ে বলল, 'ঘুমো।' চৌকির শব্দ করে পাশ ফিরল মা, বলল, 'বাইরে খুব বৃষ্টি হচ্ছে, না রে!' আমি নিঃশব্দে হাসলুম, 'না তো!'

তারপর অনেকক্ষণ জেগে থাকি। মা'রও ঘুম আসে না। বলে, 'সারাদিন কী যে করিস। ঘুরে ঘুরে আত্মীয়স্বজনদের একটু খোঁজখবরও তো নিতে হয়! আমি মরলে আর কেউ তোকে চিনবেই না। দেখলেও ভাববে কে না কে!' মা'র দীর্ঘশ্বাসের শব্দ হয়, 'বুঝতেও পারি না, কে বেঁচে আছে, আর কে মরে গেছে। একটু খোঁজ নিস।' জবাব দিই, 'কে কোথায় থাকে মা!' মা আস্তে-আস্তে বলে যায়, 'কেন, মাঝেরহাটে তোর রাঙা কাকিমা, কাঁচড়াপাড়ায় সোনা ভাই...' শুনতে-শুনতে ঘুমিয়ে পড়ি।

মনে পড়ে, ছুটির এক দুপুরে বসেছিলুম ছোট একটা চায়ের দোকানে। চারটে টেবিল, প্রতি টেবিলকে ঘিরে চারটে চেয়ার, আর সবুজ পরদাওয়ালা দুটো কেবিন খালি পড়ে আছে। মাছি ওড়ার শব্দ শোনা যায়। দেয়ালে ভয়ঙ্কর সব যুবতীদের ছবিওলা ক্যালেন্ডার! দুপুরের ঝিমঝিম ভাবের মধ্যে অনেকক্ষণ একা বসেছিলুম। এ সময়ে দরজায় এসে দাঁড়ালেন সাদা চাদর গায়ে বুড়ো এক ভদ্রলোক। চোখে চোখ পড়তেই ভীষণ চমকে উঠেছিলুম। বড় দয়ালু ওঁর চোখ। আমি স্পষ্ট শুনতে পেলুম উনি মনে-মনে বললেন, 'এই যে, কী খবর?' তটস্থ আমি তৎক্ষণাৎ মনে-মনে উত্তর দিলুম 'এই যে, সব ভালো তো?' পরমুহূর্তেই উনি চোখ সরিয়ে নিলেন, গিয়ে বসলেন কোণের একটা চেয়ারে, পত্রিকা খুলে মুখ আড়াল করে নিলেন। আমি টেবিলের কাছে আমার অন্ধকার ছায়ার দিকে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে চেয়ে রইলুম। সেই ভাবটুকু তারপর কেটে গিয়েছিল, যখন সদ্য ঘুম-থেকে-ওঠা বাচ্চা বয় খালি গায়ে হাই তুলতে-তুলতে এসে চা দিয়ে গেল।

একদিন স্কুলে এল টেলিফোন! 'শিগগির বাড়িতে আসুন।' শরীর হিম হয়ে গেল। রিসিভার নামিয়ে রাখলুম আস্তে-আস্তে। দীর্ঘদিন ধরে যেন এ রকম একটি আহ্বানেরই ভয় ছিল আমার। আমার সমস্ত শরীর জুড়ে 'মা' এই শব্দ বেজে উঠেছিল। অদ্ভুত ঘোরের মধ্যে আমি এসে দেখলুম ঘরে চার-পাঁচজন পাড়া পড়শি, বালিশে মার নিবন্ত মুখ, আধখোলা চোখ ভয়ঙ্কর লাল, ঠোঁট ফ্যাকাসে। ডাক্তার ব্লাডপ্রেসারের পারদের দিকে চেয়ে আছে। বলল—'তাড়াতাড়ি করুন।' বুঝতে না পেরে আমি চারদিকে চেয়ে বললুম, 'কী?' আবার কে যেন বলল, 'তাড়াতাড়ি করুন।' আমি বুঝতে পারলুম না, বাচ্চা ছেলের মতো সামনের শূন্যতার দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলুম, 'কী?' বাড়িওয়ালার বউ আমাকে একদিন টেনে নিয়ে বলল, 'যা তারকেশ্বরে মানত করে আয়!'

পরদিন। আমি তারকেশ্বর থেকে ফিরছিলুম। ভিড়ের ট্রেন! আমি বসবার জায়গা পাইনি। ট্রেন থামছে। প্রতিবার আমি মফসসলের লোকের মতো নিজেকেই জিগ্যেস করছি, 'এটা কি হাওড়া? এই কি হাওড়া?' অনেক ঘাড়, অনেক মাথার জঙ্গল সামনে, আমি পায়ের পাতায় ভর দিয়ে উঁচু হয়ে বাইরেটা দেখবার চেষ্টা করছিলুম। হঠাৎ এক ঝলক তেতো জলে ভেসে গেল মুখ, কষ বেয়ে জামা-কাপড় ভাসিয়ে দিল, 'এটা কি হাওড়া' আবার এই প্রশ্ন করতে গিয়ে দেখি চোখের সামনে নড়ছে কালো-চাদর, ঝড়ের মতো ছুটছে ট্রেন, অথচ যেন বাতাস লাগছে না। পড়ে যাচ্ছি, কয়েকটা হাত আমাকে ধরল। টের পেলুম, আস্তে-আস্তে দূরে সরে যাচ্ছে পৃথিবীর সব শব্দ—যেন আমি আবার মায়ের কোলের সেই শিশু রম—এক্ষুনি ঘুমিয়ে পড়ব। তবু সেই আধ-চেতনার মধ্যে আমার চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করছিল, 'আপনারা সবাই শুনুন। আমি রমেন। আমার মায়ের বড় অসুখ। দুদিন আমি তাই কিছুই খাইনি।' আমি বলতে চাইছিলুম, 'আমি

দীর্ঘকাল ধরে আপনাদের সকলের কাছে অপরাধী।' আমার প্রাণপণে বলবার ইচ্ছে হয়েছিল, 'আমি আজ আপনাদের ইচ্ছাশক্তিগুলি ভিক্ষা চাই। আপনাদের আশীর্বাদগুলি ভিক্ষা চাই।' ট্রেনের মেঝেয় ঘোর অন্ধকারের ভিতরে দুটো সাদা পা। যেন চেনা! মুখ দেখা যায় না, তবু বুঝলুম সেই বুড়ো ভদ্রলোক। আজও তার চোখ কথা বলছিল। 'আমি তোমার জন্যই এসেছি রমেন। তুমি ভাগ্যবান। চলে এসো।' আমি কাঁদছিলুম, 'আমার মা'র বড় অসুখ। আমার বাবা বিদেশে পড়ে আছে।' সহজে উত্তর দিল না তার চোখ, বলল, 'জীবন ও মৃত্যুই কিছু লোকের দেখাশোনা করে; কিছু লোককে দেখে ভাগ্য; কিছু লোককে ধর্ম এসে নিয়ে যায়।'

ভালো হয়ে গেলে মা একদিন চিহ্নিত মুখে বলল, 'চোখে ভালো দেখি না। কিন্তু মনে হচ্ছে তুই বড় রোগা হয়ে গেছিস!' হাসলুম, 'কই!' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মা বলল, আর কর্তার সার্টিফিকেটটা? সেটা পেলি না!'

৯

তখন বিকেল। পাকিস্তানি হাই কমিশনারের অফিস থেকে বেরিয়ে গড়িয়াহাটার দিকে যাব, এমন সময় হঠাৎ দেখি—তুমি! শিকড়সুদ্ধ আমার ডালপালা নাড়া খেয়ে গেল।

বলতে কি, স্কুটারের পিছনের সিটে তোমাকে মানায় না। এত খোলামেলা আর এত ভিড়ের মধ্যে।

দেখলুম সবুজ রুমালে ঘিরেছ মুখ, আজ নীল শাড়ি পরেছিলে, স্কুটারের পিছনের সিটে তুমি জড়সড়ো, টালমাটাল। চওড়া পুরুষের কাঁধ আঁকড়ে ধরে হাসছিলে ভয় পাওয়া হাসি —'পড়ে গেলু—উ-উম!'

তারপরই অবহেলায় আমাকে পিছনে ফেলে রেখে ছুটে গেল তোমাদের স্কুটার। যেতে-যেতে আচমকা ঘুরে গেল বাঁয়ে—পড়ো-পড়ো হল, পড়ে গেল না। তোমরা গেলে পার্ক স্ট্রিটের দিকে।

আমি গড়িয়াহাট রোড ধরলুম। অপরাহ্ণের আলোয় ফুটপাথে আমার দীর্ঘ ছায়ার ওপর দিয়ে হেঁটে চলেছে অচেনা মানুষ। তাদের ছায়া ছুঁয়ে যাচ্ছে আমাকে। সামনেই ট্রাফিক পুলিশের উত্তোলিত হাত, আর গাড়ির মিছিল দাঁড়িয়ে আছে। একজন হকার আমাকে উদ্দেশ করে ধীর গম্ভীর গলায় হাঁকল 'গেঞ্জি...!' এসব কিছুই আমি তেমন খেয়াল করলুম

না। আমার মন গুনগুন করছিল, কেন তুমি কোনওদিনই লক্ষ করলে না আমায়! 'হায়, আমি যে আছি তুমি তো জানোই না!'

রাতে ঘুম না এলে জেগে থেকে মাঝে-মাঝে বড় সাধ হয়। তুমি এসে একদিন বলবে, 'আমাকে চাও?'

আত্মবিশ্বাসে ভরপুর আমি শান্ত চোখে চেয়ে বলব, 'চাই না।'

অবেলায়

. তীন

খুব ভোরবেলায় আমি ঘুম থেকে উঠেছিলাম। ঘুম থেকে ওঠা বলতে যা বোঝায় ঠিক তা নয় অবশ্য। আসলে রাতে আমার সত্যিকারের ঘুম একটুও হয়নি। একটু-একটু তন্দ্রা এসেছিল হয়তো বা, আর সঙ্গে-সঙ্গে অস্বস্তিকর সব স্বপ্ন। পাগলাটে, অযৌক্তিক সব স্বপ্ন। ভয় পেয়ে বার-বার ঘুম ভেঙে যাচ্ছিল। বিরক্ত হয়ে বিছানা ছাড়লাম। ঘড়িতে দেখি সোয়া পাঁচটা প্রায়। শীতকাল বলে আলো ফোটেনি। পাছে মায়ের ঘুম ভেঙে যায় সেই ভয়ে নিঃসাড়ে উঠে কলঘরে গিয়ে চোখে জল দিয়ে এলাম। না ঘুমোনো চোখ কর-কর করে উঠল। স্নায়ু শিরা সব উত্তেজিত হয়ে আছে, মাথার মধ্যে এলোমেলো অস্থির চিন্তা। আমি পাথরের মতো ঠান্ডা বাসি জল ঘাড় মাথার তালু কনুই আর পায়ে ঘষে থাবড়ে নিজেকে স্বাভাবিক করার চেষ্টা করলাম। হাড়ের ভিতরে চলে গেল শীতের ভাব তবু একটুও সতেজ লাগল না নিজেকে।

ভোর রাতের দিকেই মার একটু ঘুম হয়। সকালের দিকে আমার ডিউটি থাকলে আমি মার সেই সামান্য ঘুমটুকুও কেড়ে নিই। অত সকালে বিশেষত শীতকালে বড় কষ্ট হয় মার। খদ্দরের একটা পুরোনো খাটো চাদর জড়িয়ে জড়সড়ো হয়ে মা যখন আমাকে চা করে বাসি রুটি তরকারি সাজিয়ে দিতে থাকে, তখন প্রায়ই মনে হয়, মাকে সারাজীবন বড় কষ্ট দিলাম। মার গলায় কিছু একটা অসুখ আছে, সকালে সারাক্ষণ মা কাশতে থাকে। শুকনো কাশি, কিন্তু সেই শব্দে আমার বুকের ভিতরটা কেমন গুলিয়ে ওঠে। মনে হয় আমারও ওইরকম কাশি শুরু হয়ে যাবে।

আজ মাকে আমি ঘুমোতে দিলাম। জানালাটা খুলে দিয়ে একটু বাইরের বাতাসে শ্বাস টানতে ইচ্ছে করছিল। ঘরের মধ্যে কেমন একটা ভেজা চুলের গন্ধ, পুরোনো কাপড়-চোপড়ের গন্ধ। স্যাঁতসেঁতে ঘর, অস্বাস্থ্যকর। ইচ্ছে করলেও জানালা খুললাম না। মায়ের কাশিটার কথা মনে পড়ল। গতকাল রাতে এক প্যাকেট সিগারেট কেনা ছিল। তোশকের তলায় লুকিয়ে রেখেছিলাম। বের করে দেখি প্যাকেটটা চেপটে গেছে। কোনওদিনই অভ্যাস ছিল না, কিন্তু কয়েক দিন খাচ্ছি সিগারেট। খুব যে কিছু হয় খেলে তা বুঝি না। অন্তত মন বা শরীরের কোনও পরিবর্তন টের পাই না, গলাটা কেবল খুশখুশ করে, আর ধোঁয়া লেগে চোখে জল আসে। তবু সিগারেট ধরালে নতুন খেলনার মতো একটা কিছু নিয়ে খানিকটা সময় কাটিয়ে দেওয়া যায়।

পাশের ঘরে যাওয়ার দরজাটা খোলা। ঘরটা আমার দাদা মতীনের। পাগল মানুষ। ঘরটায় আমার আজকাল আর ঢোকাই হয় না। আমি আর মা ঘরটা দাদাকে পুরোপুরি ছেড়ে দিয়েছি। দরজায় দাঁড়িয়ে দেখি দাদার মাথার কাছে জানালাটা খোলা। সারা রাত ধরে হিম এসে ঘরটাকে ঠান্ডা করে রেখেছে। মেঝেয় অনেক সিগারেটের টুকরো। আমার দাদা মতীন সত্যিই সিগারেটের স্বাদ জানে। সস্তা বাজে সিগারেট, তবু কতগুলো খায় দিনে! কতবার মাকে ঘর ঝাঁট দিতে হয়। অনেক দিন পরে এ ঘরে এলাম। তাও সিগারেট খাওয়ার জন্য। খোলা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে আমি একটা সিগারেট খাব। কোনওদিন দাদার শিয়রের কাছে দাঁড়িয়ে এরকম সিগারেট খাওয়ার কথা ভাবা যায়নি। ঘুমন্ত দাদার শিয়রে দাঁড়িয়েও না। আমার দাদা মতীনকে ছেলেবেলা থেকেই আমি ভয় করি। সাত-আট বছরের তফাত তো ছিলই। তা ছাড়া ছিল আমাদের সবাইকে আড়াল করে রেখে দাঁড়ানোর অদ্ভুত গুণ। তাই সিগারেট ধরাতে আমার বাধো-বাধো লাগছিল একটু। একবার চেয়ে দেখলাম। গা থেকে লেপ সরে গেছে, মশারির চারটে খুঁট ছিঁড়ে সেটাতে জড়িয়েছে সারাটা শরীর। মুখটা দেখা যায় না। বালিশের ওপর চুলের ভারে প্রকাণ্ড একটা মাথা পড়ে আছে। আসবাব বলতে চৌকি বাদ দিলে একটা টেবিল আর চেয়ার, একটা শেলফে বই। এ সবই দাদার মাস্টারির চাকরির সময় কেনা। তখন সামান্য আসবাবেরই কত গোছগাছ ছিল, যত্ন ছিল বইয়ের। মাঝে-মাঝে টেবিলের ফুলদানিতে নিজেই ফুল এনে সাজাত, ধূপকাঠি জ্বালিয়ে দিত সন্ধেবেলায়। দেখলাম সুন্দর পাতিলেবুর রঙের ফুলদানিটার গায়ে সন্ন্যাসীর শরীরের মতো ছাই মাখা। বোধহয় ওতে এখন সিগারেটের ছাই ফেলা হয়। ভালো করে দেখলে দেখা যাবে সারা ঘরেই সন্ন্যাসীর শরীরের সেই ছাই রং। উদাসীন ঘরখানা। সারা ঘরে ছড়ানো চিঠির প্যাডের নীল কাগজ। সুন্দর কাগজ। প্রতি কাগজেই খুদে খুদে কী যেন লেখা। সারাদিন লেখে আমার দাদা মতীন। চিঠি লেখে। কাকে লেখে কে জানে। শুনেছি বালিগঞ্জে কোথায় যেন পাথরের কড়িওয়ালা

একটা প্রকাণ্ড বাড়ি ছিল, তার চারধারে ছিল ঘেরা-পাঁচিলে ঘেরা প্রকাণ্ড বাগান, আর সেই বাড়িতে ছিল একটি মেয়ে। না, তাদের সঙ্গে কোনও কালে বিন্দুমাত্র পরিচয় ছিল না দাদার। দাদা কেবল দূর থেকে তাকে মাঝে-মাঝে দেখেছিল। আমার দাদা মতীনকে সে মেয়েটি বোধ হয় দেখেওনি। বোধ হয় দুর্বল লোকেদেরই অসম্ভব কিছু করার দিকে ঝোঁক বেশি থাকে। আমার দাদারও ছিল। কথাটা হয়তো একটু কেমন শোনাবে। একটু আগেই বললাম দাদা আমাদের সবাইকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে ছিল। তবু কথাটা কিন্তু সত্যি। আমার বিশ্বাস দাদা দুর্বল প্রকৃতির মানুষ। অতি বেশি টান ভালোবাসা মানুষকে দুর্বল করে দেয়। আমার এবং মায়ের প্রতি দাদার অসম্ভব ভালোবাসা দেখে বরাবর মনে হয়েছে দাদা বড় দুর্বল মানুষ! মার সঙ্গে রাগারাগি করে আর ভাব করার জন্য চিরকাল ঘুরঘুর করেছে মায়ের আশেপাশে। যা বলছিলাম, অসম্ভব কিছু করার দিকে এই দুর্বল মানুষটির হয়তো প্রবল একটা ঝোঁক ছিল। নইলে আমাদের মতো ঘরের সাধারণ ছেলে হয়ে কেউ ওই বড় বাড়ির মেয়ের জন্য পাগল হয়! তাও পরিচয় নেই, নাম জানা নেই, ভালো করে চোখাচোখি অবধি হয়নি। সঠিক ঘটনাটা আমি জানি না। শুনেছি ওই অসম্ভব সুন্দর নির্জন পাড়ার রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরে আমার দাদা মতীন তার অবসরের সময় বইয়ে দিত। সম্ভবত মা ব্যাপারটা টের পেয়েছিল। মায়েরা পায়। মাঝে-মাঝে মাকে বলতে শুনেছি, 'কী জানি কোন ডাইনি ধরেছে।' আমি তখন সদ্য বেহালার একটা কারখানায় ঢুকেছি, প্রথম মাসের মাইনে পাইনি। সে সময়ে একদিন দাদা ফিরলে দেখলাম তাকে খুব উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। অস্বাভাবিক উজ্জ্বল। অবাস্তব। জ্বলজ্বল করছে চোখ, মুখখানা লাল, আর ক্ষণে-ক্ষণে হাসির লহর তুলে সে যে কত কী কথা! খেতে বসেছি পাশাপাশি, সামনে মা, দাদা হঠাৎ হেসে বলল, 'একটা ব্যাপার হয়ে গেল মা।' বলে নিজেই খুব হাসল। 'একটা মেয়ে বুঝলে—বেশ সুন্দর চেহারার পবিত্র মেয়ে—সন্ন্যাসিনী হলে মানাত—তাকে দেখলাম স্কুটারের পিছনে বসে বিচ্ছিরি গুন্ডা টাইপের একটা ছেলের সঙ্গে হাওয়া হয়ে গেল।' বলেই ভীষণ হাসল দাদা। 'সমাজটা যে কী হয়ে যাচ্ছে না মা! কার বউ যে কার ঘরে যাচ্ছে! কী ভীষণ যে ওলটপালট হয়ে যাচ্ছে সব, তোমরা ঘরে থেকে বুঝতেই পারছ না।' বলতে-বলতে বিষম খাচ্ছিল দাদা। মা মাথায় ফুঁ দিয়ে বলল, 'কথা বলিস না আর। জল খা।' কার বউ কার ঘরে যাচ্ছে! আমার দাদা মতীনের ওই কথাটা আমার আজও বুকের মধ্যে লেগে আছে। আমরা তখন পাশাপাশি চৌকিতে দু-ভাই শুই, অন্য ঘরে একা মা। সে রাতে দাদাকে দেখলাম খুব হাসিখুশি মনে শুতে এল। টেবিল ল্যাম্প জ্বেলে শোয়ার আগে কী যেন লিখছিল। চিরকালই আমাদের মধ্যে কথাবার্তা কম হয়। সে রাতে দাদা জিগ্যেস করল হঠাৎ, 'তুই যেন কত মাইনে পাস?' বললাম। শুনে দাদা একটু ভেবে আপনমনে বলল, 'চলে যাবে।' নতুন চাকরির পরিশ্রমে খুব নিঃসাড়ে ঘুম হত তখন। মাঝরাতে সেই চাষাড়ে ঘুম ভেঙে গেল। চমকে উঠে দেখি আমার শরীরের ওপর দু-খানা হাত ব্যাকুল হয়ে ঘুরে

বেড়াচ্ছে। উঠে বসলাম। মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে দাদা, মাথাটা চৌকির ওপর রাখা, হাত দু-খানা দিয়ে আমাকে জাগানোর শেষ একটা চেষ্টা করছে সে। আমি উঠতেই তার অবশ শরীর মাটিতে পড়ে গেল। তখনই আমাদের পরিবারের একজন কমে যাওয়ার কথা। কিন্তু কমল না। ছারপোকা মারার যে বিষ দাদা খেয়েছিল হাসপাতালের ডাক্তাররা সেটা তার শরীর থেকে টেনে বের করে দিল। বের করল কিন্তু পুরোটা নয়। খানিকটা বোধ হয় দাদার মাথার মধ্যে রয়ে গেল।

ওই তো এখন বিছানায় মশারি জড়িয়ে শুয়ে আছে আমার দাদা মতীন। পাগল মানুষ। দাদা কিছুই দেখে না, লক্ষও করে না আমাদের। ঘুমিয়ে আছে। তবু তার শিয়রে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাতে কেমন বাধো-বাধো লাগে। ভেবে দেখলে আমার সেই দাদা মতীন তো আর নেই। তবু না থেকেও যেন আছে।

সিগারেট ধরিয়ে আমি খোলা জানালার কাছে দাঁড়ালাম। অমনি হি-হি বাতাস নাক গলা চিরে ভিতরে ঢুকে অবশ করে দিল। চোখে জল এসে গেল। শরীরে উত্তেজিত অসুস্থ ভাবটা সামান্য নাড়া খেল। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আছে, তবু একটুও ঘুম হয় না আজকাল। কারখানা বন্ধ না থাকলে শীতের এই ভোরে সামনের ওই রাস্তাটা দিয়ে আমি কাজে যেতাম। এই ভোরবেলার চারপাশ কী সুন্দর থাকে। ঠিক কতখানি সুন্দর তা বলে বোঝানোই যায় না। একমাত্র এই ভোর-রাত্রেই কলকাতাকে নিঃঝুম মনে হয়। অন্ধকারে পাখিরা ডাকাডাকি করে বাসা ছাড়ে না। রাস্তায় পা দিয়ে মনে হয় গ্রামের রাস্তায় চলেছি। বাতাস খুব পরিষ্কার থাকে, জীবাণুশূন্য। একটু অন্ধকার আর একটু কুয়াশা থাকে বলে চারপাশে নানা রহস্যময় ছবি ভেসে ওঠে, চেনা জায়গার গায়ে অচেনার প্রলেপ পড়ে যায়। চারদিকের বাড়িগুলো আবছা আর ঝুপসি গাছের মতো দেখায়। প্রকৃতির সঙ্গে তারা এক হয়ে যায়। দাদার ঘরে একখানা বই আছে, সংবাদপত্রে সেকালের কথা। তাতে পুরোনো কলকাতার দুটো চারটে ছবি আমি দেখেছি। কাঁচা রাস্তা, পুকুর আর গাছগাছালিতে ভরা কলকাতা, শেয়াল ঘুরে বেড়ায়। পুরোনো আমলের গোল গম্বুজ আর থামওয়ালা বাড়ির সামনে ঘোড়ায় টানা ব্রুহাম গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, বাঙালিবাবুদের মাথায় টোপরের মতো টুপি, পায়ে নাগরা, আর পরনে কাবাকুর্তা। ভোর রাত্রের কলকাতা সেই পুরোনো কলকাতা। পুকুর আর গাছগাছালির গ্রাম্য শহর। আমি সেই পুরোনো শহর ধরে হেঁটে যাই কসবা থেকে বালিগঞ্জ স্টেশনের ট্রাম ডিপো পর্যন্ত। ভোরের প্রথম ট্রাম ধরি।

কারখানার মধ্যে বিলিতি শহর। ফুলগাছে আধো-ঢাকা কাচের বাড়ি যত্নে লাগানো ঝাউ আর ইউক্যালিপটাসের সারির লন। স্বয়ংক্রিয় লন-মোয়ার বটবট করে সারাদিন ঘুরে বেড়ায়। দয়ালু পাদরির মতো সুন্দর হাসিমাখা মুখে সাহেব ম্যানেজার ডিলান সারা দিন

আমাদের আশেপাশে ঘুরে বেড়ায়। ভাবতেই এখন বুকের মধ্যে ধক করে ওঠে। আমি মুখ ঘুরিয়ে ঘরের দেওয়াল খুঁজলাম। দাদার ঘরে কোনও ক্যালেন্ডার নেই। না থাক। গতকাল ছিল ষোলো, আজ ধর্মঘটের সতেরো দিন। মনে হচ্ছে আমরা একটা হারা-লড়াই লড়ে যাচ্ছি। প্রবেশন পিরিয়ডে বিশ্বনাথকে ছাঁটাই করা হল। সেটা কোম্পানির ইচ্ছে। শিক্ষানবিশের চাকরির কোনও নিশ্চয়তা থাকে না। বিশ্বনাথের হাতের জব বারবার স্ক্রাপ হয়ে যেত। কোম্পানির দোষ ছিল না। তবু ইউনিয়ন রুখে দাঁড়াল। তিনদিন ধর্মঘটের পর কোনও বিজ্ঞ লোক এসে বলল—এটা বে-আইনি হচ্ছে। স্ট্রাইক টিকবে না। তোমরা বরং চার্টার অব ডিমান্ড দাও। রাতারাতি চার্টার অব ডিমান্ড তৈরি হল। চোদ্দো দফা দাবি। তবু বোঝা যাচ্ছিল হারা-লড়াই। ট্রাইব্যুনালে চলে গেল দাবিপত্র। কোথাকার কোন আনাড়ি কারিগর বিশ্বনাথের জন্য সুন্দর মনভোলানো বিলিতি শহর থেকে আমি চললুম নির্বাসনে। যেমন নাম-না-জানা অচেনা একটা বড় বাড়ির মেয়ের জন্য আমার দাদা মতীন চিরকালের জন্য হয়ে রইল পাগল মানুষ। কেমন যেন অদ্ভুত যোগাযোগ। বললে অবিশ্বাস্য শোনাবে। তবু এটা সত্য যে, সেই অচেনা মেয়েটার জন্য দাদা পাগল না হলে আমি ইউনিয়নে নামতামই না। সে ছিল বড় বাড়ির মেয়ে, আমার খ্যাপা দাদা মতীন তার কাছাকাছিই যেতে পারল না। বলতেই পারল না, 'তোমাকে চাই।' কেবল ঘুরে বেড়াল রাস্তায়-রাস্তায়। তারপর একদিন তার চোখের ওপর দিয়ে চালাক একটি সাহসী ছেলে মেয়েটিকে স্কুটারের পেছনে নিয়ে চলে গেল। কেন এরকম হবে? কেন এরকম দুষ্প্রাপ্য হয়ে থাকবে একটি মেয়ে আমার দাদার কাছে? কেন থাকবে তাদের এরকম দামি বাগানের চারদিকে ওই অত উঁচু ঘেরা-পাঁচিল, যার মধ্যে আমরা কোনওদিনও যেতে পারব না? মেয়ে ভুলিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কারও কারও থাকবে স্কুটার, যা কেন আমাদেরও নেই? নিজের ঘরসংসার বজায় রেখে, পাগল ভাই আর বিধবা মায়ের দায় নিয়ে সমাজের সেই অব্যবস্থা আমি কী করে পালটে দেব? তেমন কোনও উপায় আমার ছিল না হাতের কাছে। টিমটিম করে অফিসের ইউনিয়নটা চলছিল তখন। আমার মাত্র একুশ কি বাইশ বছর বয়স। রাগে আক্রোশে ক্ষোভে আমি সেই ইউনিয়নের মধ্যে ফেটে পড়লাম। যদি তা না পড়তাম তবে আজ আমার পিছিয়ে যাওয়ার রাস্তা থাকত। আমি ইউনিয়নের চিহ্নিত কর্মী, দাঙ্গাবাজ, আক্রমণকারী মনোভাবাপন্ন লোক; আমার পিছনে ঘুরছে চার্জসিট আর তিনটে পুলিশ কেস। ভেবে দেখলে আমার দাদা মতীনের জন্যই আজ আমার এই রাত জাগার ক্লান্তি, অনভ্যাসের সিগারেট আর ভয়। হাইস্কিলড অপারেটরের সুন্দর বেতন থেকে শূন্যতা। কিংবা এই সবের জন্য সেই মেয়েটাই দায়ী, যাকে আমি চিনি না, যাকে চিনত না আমার দাদা মতীনও। তা হোক। তবু সমাজের ব্যবস্থা পালটে যাওয়াই ভালো। আজ বরং আমি একটা হারা-লড়াই না-হয় হেরেই গেলাম। মেয়েটিকে ধন্যবাদ।

চিঠির একটা নীল কাগজ সামান্য উড়ে এসে আমার পায়ের গোড়ালিতে লাগল। কৌতূহলে তুলে নিলাম। খুদে খুদে অক্ষরে লেখা—'কেউ ঠিকঠাক বেঁচে নেই। পুরোপুরি মরেও যায়নি কেউ। ওরকম কিছু কি হয় কোনওদিন? ঠিকঠাক বেঁচে থাকা, কিংবা পুরোপুরি মরে যাওয়া?...' আমি আর পড়লাম না। কী যে লেখে পাগল। মাঝে-মাঝে ঠিকানা-না-লেখা খাম আমাকে দিয়ে বলে, 'ডাকে দিয়ে দিস।' কখনও নিজেই গিয়ে ডাকবাক্সে ফেলে আসে ভাঁজ করা কাগজ। পিওনেরা হয়তো ফেলে দেয়, কিংবা হয়তো বাড়িতে নিয়ে গিয়ে পড়ে হাসাহাসি করে। সারা ঘরময় ছড়ানো এই কাগজ আর সিগারেটের টুকরো। পয়সা নষ্ট। হঠাৎ রাগ হয়ে গেল বড়। তোমার জন্যই, তোমার জন্যই এত সব গণ্ডগোল।

আমি মশারির ঢাকাটা রুক্ষ হাতে সরিয়ে নিলাম। রোগা একখানা মুখ। চমকে চোখ খুলল। জুলজুল করে ভীত সন্ত্রস্তভাবে আমাকে দেখতে থাকল। মশারির মুঠ ধরে থাকা আমার লোহাকাটা প্রকাণ্ড হাতখানার দিকে তাকিয়েই আমি লজ্জা পেলাম। আবার ঢাকা দিয়ে দিলাম দাদার মুখ। ও তো খুব বেশি কিছু চায় না। কেবল চিঠির কাগজ আর সস্তা সিগারেট। দেখলাম ওর ময়লা ঘেমো গন্ধের গেঞ্জি, গালে না-কামানো দাড়ি, আ-ছাঁটা চুল। বড় যত্নে নেই আমার দাদা মতীন। ঘুম ভেঙে ও এখন সন্দেহের চোখে ভীত মুখে আমাকে দেখছে। না, আমি ওর স্বপ্নের কেউ না। আমি বাস্তব, যার সঙ্গে ওর পাট অনেক দিন চুকে গেছে। আমি তাই আস্তে-আস্তে ও ঘর থেকে এ ঘরে চলে এলাম।

থাক, আমার দাদা মতীন ওরকমই থাক। আমরা যা দেখতে পাই না, ও হয়তো তাই দেখে। বনের পাখিপাখালিরা এসে হয়তো ওর সঙ্গে কথা বলে যায়, হয়তো মায়ারাজ্য থেকে আসে ওর চেনা পরিরা, ওকে ঘিরে আছে স্বপ্নের সব মানুষ। মনে হয় আমার দাদা মতীনের এখন আর কোনও দুঃখ নেই। সেই অচেনা মেয়েটি যদি এসে এখন সামনে দাঁড়ায়, যদি বলে, 'আমাকে চাও?' তা সে ওইরকম ভয় পাওয়া চোখে জুলজুল করে চেয়ে দেখবে। চিনবেই না; সেও তো এখন আর দাদার সেই স্বপ্নরাজ্যের কেউ নয়। কী হবে ওকে আর সুখ-দুঃখের বাস্তবের মধ্যে টেনে এনে? তার চেয়ে এই বেশ আছে আমার দাদা মতীন। পাগল মানুষ।

মা

কাল রাতে যেন খুব বৃষ্টি হয়ে গেল। ঘুমের মধ্যেই শুনছিলাম টিনের চালের ওপর খই-ফোটার মিষ্টি শব্দ। করমচা গাছের ডালপালায় বাতাস লাগছে। কী বৃষ্টি! কী বৃষ্টি! সেই

বৃষ্টির মধ্যে দেখি কর্তা খোলা জানালা বন্ধ করবার চেষ্টা করছে। বৃষ্টির ছাটে ভিজে যাচ্ছে মানুষটা। সেদিকে খেয়াল না করে আমি রাগে দুঃখে মানুষটাকে জিগ্যেস করছি—তুমি বেঁচে থাকতেও আমার বিধবার দশা কেন! সেই শুনে খুব হাসছিল মানুষটি। বেঁচে থাকতে একটা হাড়জ্বালানো শ্লোক বলত প্রায়ই—'সেই বিধবা হলি আমি থাকতে হলি না।' দেখলাম জানলার কাছে দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে ভিজতে-ভিজতে বিড়বিড় করে সেই শ্লোকটাই বলছে। এই দেখতে-না-দেখতেই ঘুম ভেঙে গেল। ওমা, কোথায় বৃষ্টি। আর কোথায়ই বা সেই মানুষ। টিনের চালই বা কোথায়, কোথায়ই বা সেই করমচার গাছ। মরা মানুষের স্বপ্ন দেখা ভালো না। তবু আমি প্রায়ই দেখি। তাঁর মরার পর বারো বছর হয়ে গেল। ধর্মকর্মের দিকে ঝোঁক ছিল খুব। বলত—'যদি জন্মান্তর থাকে—বুঝলে, তবে আমি বতুর ছেলে হয়ে আসব।' বোধহয় সেইজন্যেই এখনও পৃথিবীতে জন্মায়নি মানুষটা। আত্মাটা আমাদের কাছাকাছি ঘুরঘুর করে। দেখে যায় তাঁর আসার রাস্তা কতদূর তৈরি হল। ঘুম ভেঙে উঠে বসে চুলের জট ছাড়াচ্ছিলাম। কর্তার স্বপ্ন দেখে মনটা খারাপ হয়ে গেল। ওদের তো বাড়িঘর নেই, আকাশে বাতাসে ঘুরে বেড়ানো। হয়তো শীতে বৃষ্টিতে বড় কষ্ট পেতে হয়। ওম পাওয়ার জন্য আমাদের কাছে চলে আসেন। ইচ্ছে করে কয়েকজন ব্রাহ্মণ ডেকে ছাতা আর কম্বল দান করি। অনেক টাকার ঝক্কি! মাঝরাতে বসে কত কথা ভাবছিলাম। শুনি বাইরে কাক ডাকছে। রাতে কত ডাকা ভালো নয়। হয়তো জ্যোৎস্না ফুটেছে খুব। তবু বড় বুক কাঁপে। মঙ্গলের কোনও চিহ্ন তো দেখি না। টের পেলাম বতু তার বিছানায় পাশ ফিরল। আগে এক কাতের ঘুম ছিল ওর। ভোরবেলা তুলে দিতে গেলে ময়দার দলার মতো বিছানার সঙ্গে লেগে থাকত। বাচ্চাবেলার মতো খুঁতখুঁত করে বলত—আর একটু মা, আর একটু। ডান কাতের ঘুম হল, এবার বাঁ-কাতে একটু ঘুমোতে দাও। পাঁচ মিনিট। কষ্ট হত তুলতে। তবু চাকরি উন্নতি এসব ভেবে মায়া করতাম না। তুলে দিতাম। যখন চা করে রুটি তরকারি খেতে দিতাম তখনও দেখতাম, ওর দুচোখে রাজ্যের ঘুম লেগে আছে। আর, এখন কয়েক দিন হল রাতে ওর পাশ ফেরার শব্দ পাই। সারা রাত কেবলই পাশ ফেরে। ঘুম হয় না বোধ হয়। ও এখন জামিনে খালাস আছে। পরশু দিনও পুলিশের লোক এসে বলে গেল—ও যেন বাড়িতে থাকে, কোথাও না যায়। কারখানার ব্যাপারটা আমি একটু একটু জানি। বেশি জানতে ভয় করে। তবু একদিন সাহস করে জিগ্যেস করেছিলাম—'তোরা কি জিতবি?' ও ঠোঁট ওলটাল। বুঝি অবস্থা ভালো নয়। বললাম—'কী দরকার ওসব হাঙ্গামা করে! মিটিয়ে ফেল।' ও শুকনো হেসে একটা কবিতার লাইন বলল—'যে পক্ষের পরাজয় সে পক্ষ ত্যজিতে মোরে কোরো না

আহ্বান...!' ভালো বুঝলাম না। কারখানা থেকে ওর বন্ধুরা আসে। আমি রান্নাঘরে গিয়ে বসে থাকি, এ ঘরে ওরা মিটিং করে। মাঝে-মাঝে একটু চেঁচামেচি হয়, এ ওকে শাসায়। বুঝি ওদের মধ্যে মিল হচ্ছে না। সবাই এককাট্টা নয়। বতু গোঁয়ার। তবু জানতে ইচ্ছে করে ও এখন কোন দলে। ওর অবস্থাটা কী! আবার ভাবি বাইশ বছর বয়স থেকে সংসার ঘাড়ে নিয়েছে। ও কি আর ওর দায়িত্ব বোঝে না! আমার চেয়ে বরং ভালোই বোঝে। আমি তো মাত্র রান্না করি আর ঘর আগলাই। ওকে কত কষ্ট করতে হয়, হয়তো অপমান সহ্য করে বকাঝকা খায়, শীতে বৃষ্টিতে কতটা পথ পার হয়ে যাতায়াত করে। খুঁটে এনে আমাদের খাওয়ায়। গত আশ্বিনে আঠাশে পা দিল বতু। কারখানায় যখন ঢুকল তখনও দাড়িতে ভালো করে ক্ষুর পড়েনি, কচি মুখখানি। এখন বয়েসকালের গোটাগুটি মানুষ হয়ে উঠেছে। মতু যদি ঠিক থাকত তবে বতুর বিয়ে দিতাম। এটাই ঠিক বয়স। কর্তাকে আবার আমাদের মধ্যে ফিরিয়ে আনবার রাস্তা তৈরি হয়ে যেত। বতুর ছেলে হলে রোদে বসে তেল মাখাতাম, চুপচুপে করে। ঠাট্টা করে বলতাম, 'হ্যাঁ রে, সত্যিই কি আর জন্মে তুই আমার ভাতার ছিলি?' ভাবতেই গায়ে কেমন শিরশির করে কাঁটা দেয়। বতুর ছেলে হয়ে কর্তা যদি সত্যিই আসত তবু নতুন সম্পর্কে কেমন লাগত আমার!

আজকাল কেমন যেন ভুলভাল হয়ে যায়। পুরোনো কথার সঙ্গে আজকালের কথা গুলিয়ে ফেলি। তাল থাকে না। বোধ হয় পরশু দিন দুপুরে একটু ঘুমিয়েছি। ঘুম ভাঙল যখন তখন শীতের বেলা ফুরিয়ে এসেছে। তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে উঠতে-উঠতে সুদর্শন চাকরের নাম ধরে ডাকছিলাম। মনে হয়েছিল শ্বশুরমশাই কাছারি থেকে ফিরে এলে বড়ঘরের বারান্দায় পুবমুখো ইজিচেয়ারটায় বসে আছেন, এখনও তাঁকে তামাক দেওয়া হয়নি। সুদর্শনকে ডাক দিয়ে আমি মাথার ঘোমটা ঠিক করে উঠতে যাচ্ছি, শ্বশুরমশাইয়ের পা থেকে জুতো খুলে দেব বলে। ভুল বুঝতে পেরে কেমন যেন অবশ-অবশ লাগল। কতকালকার কথা, সব তবু যেন মনে হয় গতকালের দেখা। সুদর্শন সাতাশ বছর চাকরি করে শ্বশুরবাড়ির কাছারিঘরে মারা গেল। তখন বতুর বয়স বোধ হয় চার কি পাঁচ। সুদর্শনের কাঁধে চড়ে সে অনেক ঘুরেছে। সুদর্শন মরে গেলে বাড়িসুদ্ধু লোক কেঁদেছিল। সাতাশ বছরে ও আর চাকর ছিল না। যে কথা বলছিলাম, যে ভুল পেয়ে বসেছে আমাকে। বতু মাঝে-মাঝে জিগ্যেস করে, সারাক্ষণ বিড়বিড় করে কী বকো মা? চমকে উঠি। বিড়বিড় করি। হয়তো করি। সারাদিন বড় কথা বলতে ইচ্ছে করে। মাথার মধ্যে ঠাসা সব পুরোনো দিনের কথা। শোনার লোক নেই। তাই বোধ হয় আকাশ বাতাসকে শোনাই। তোরা তো কাছে থেকেও নেই। বতুর চাকরি আর ইউনিয়ন, সারা দিনে কথা দূরে থাক, আমার দিকে ভালো করে তাকায় না পর্যন্ত। আর মতু! সে আমাকে চেনেই না। সারাদিন

নীল চিঠির মধ্যে ডুবে থাকে। কর্তা বলত, 'তোমার দুটো ঘোড়া, গাড়ি চলবে ভালো।' গাড়ি বলতে আমাকেই বোঝাত, যেন আমার চলার ক্ষমতা নেই ছেলেরা না চালালে। কাছে তাকে পেলে এখন বলতাম—ঘোড়া দুটো কেমন দু-মুখো ছিটকে গেল দ্যাখো। খাদের মুখে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, একটু জোর বাতাস এলেই গড়িয়ে পড়বে। আর উঠবে না।

মরতে অবশ্য আমার একটুও দুঃখ নেই। কিন্তু মতু-বতুর কথা ভাবলে মরার ইচ্ছেটাই চলে যায়। ওরা দুজন দুরকমের পাগল। আবার ভাবি, ওদের জন্যেই যদি বেঁচে থাকতে হয় তবে তো আরও বহুকাল বেঁচে থাকতে হবে। সে যে বড্ড একঘেয়ে। আবার যদি মরে যাই তবে ওদের দেখবে কে? বিশেষ করে মতুকে! হয়তো ততদিনে বতুর বউ এসে যাবে। কিংবা এমনও তো হতে পারে যে, মতু ভালো হয়ে গেল আবার আগের মতো চাকরি-বাকরি করল। হতে পারে না কেন! এরকম কি হয় না।

সামনের শনিতে একটু বারের পুজো দেব। আর প্রতি বিষ্যুৎ বারে একটা বামুন ছেলেকে ডেকে এনে পাঁচালি পড়াব। নিজে কয়েক দিন পড়বার চেষ্টা করেছি। চোখে বড় জল এসে যায়। তিনটে মানসিক করা আছে আমার মতুর জন্য। অনেক দিন হয়ে গেল। মনের ভুলে একটা মানসিক করে রেখেছি ময়মনসিংহের কালীবাড়িতে। কালীর সোনার চোখ গড়ে দেব। এখানে বসেই করেছি সেই মানসিক, এখন ভাবি মতু ভালো হলে কী করে ওখানে পুজো পাঠাব? ওরা কি দেবে আমাকে যেতে? বতুই কি ছাড়বে? কিন্তু বুঝি না, গেলে কী হয়! ওসব তো আমাদেরই দেশ জায়গা ছিল। বতু মতু দুজনেই, জন্মেছে ওখানে। কত যে বালাই তৈরি করছে মানুষ।

বতুর বউ এসে মতুকে দেখবে—এইরকম একটা বিশ্বাস আঁকড়ে আছি। মরার সময় হলে—যদি বতু ততদিনে বিয়ে না করে—

তবে ওই বিশ্বাস নিয়েই আমাকে যেতে হবে। তবু বড় ভয় করে। যদি বতুর বউ তেমন লক্ষ্মীমন্ত না হয়! যদি মায়াদয়া না থাকে তার! মাঝে-মাঝে এসব কথা ভেবে উতলা হয়ে বলে ফেলি। বতু রাগ করে—সমাজ-সংসারের কথা ভাবো মা, কেবল নিজেরটুকু চিন্তা করে করেই গেলে। দ্যাখো না, সমাজের চেহারা এমন পালটে দেব যে, মানুষকে আর নিজের সংসারের কথা ভাবতেই হবে না। তখন সবাইকেই দেখবে সমাজ। বতুটাও একরকমের পাগল। সমাজ কি আমার ঘরে এসে হাড়ির খোঁজ নেবে! কিংবা হয়তো ও ঠিকই বলে। সমাজ-সংসারের আমি কতটুকু দেখেছি? ঘোমটার মধ্যেই তো আদ্দেক বয়স কেটে গেল। যখন সহজভাবে চারদিকে তাকাতে পারলাম তখন চোখে ছানি আসছে। তবু আমি বতুর সমাজের ওপর ভরসা না করে ওর বউয়ের ভরসাই করে আছি। যদি সে

মেয়েটার মনে একটু মায়ের ভাব থাকে তবে মতুর জন্য চিন্তা নেই। ওকে বালাই বলে না ভাবলেই হল। ও তো কাউকে জ্বালায় না, চেঁচামেচি করে না। খুব শান্ত থাকে। সারাদিন কেবল চিঠি আর সিগারেট। আমি মাঝে-মাঝে ঘরটা পরিষ্কার করি। চিঠির কাগজ জড়ো করে টেবিলে গুছিয়ে দিই। ওই কাগজগুলো ফেলতে গেলেই ভীষণ রাগ করে মতু। মুখে কিছু বলে না, কিন্তু 'উঃ' 'উঃ' বলে ওপর দিকে হাত ছুড়তে থাকে। তবু জোর করে যদি ফেলি তবে মাথার চুল ছেঁড়ে, দুম-দুম করে দেওয়ালে মাথা ঠুকে কাঁদে। নিজের মাথাটার ওপরেই ওর চিরকালের রোখ। চুল ছেঁড়া, মাথা ঠোকা সেই ছেলেবেলায় মতোই আবার ফিরে এসেছে। ছেলেবেলায় আমার ওপর রাগ হলে ও মাথা দিয়ে আমাকে ঢুঁ মারত। একবার বুকের মাঝখানে ঢুঁ মেরেছিল। এমনিতেই অম্বলের ব্যথা আমার, সেই ঢুঁ খেয়ে দম বন্ধ হয়ে চোখে কপালে উঠল। এখনও বুকের হাড়ে পাঁজরায় সেই ব্যথা একটুখানি রয়ে গেছে। আর কোনওদিন কি মতু আদর করতে গিয়ে আমার বুকে মুখ গুঁজবে কিংবা রেগে গিয়ে মারবে ঢুঁ? না, মতু আর সে মতু তো নেই। তাই বুকের সেই ছোট্ট ব্যথাটুকু আমার চিরকাল থাক। সেই ব্যথাটুকুই মতু হয়ে আমার কাছে আছে।

খুব ভোরবেলাতেই বতু উঠে তার দাদার ঘরে গিয়েছিল আজ। এমনিতে বড় একটা যায় না। কি জানি আজ বোধহয় দাদার জন্য মায়া হয়েছিল একটু। তাই দেখে এল। কিংবা হয়তো রাতে কোনও স্বপ্ন দেখেছিল দাদাকে নিয়ে। বতুর ভালোবাসা বাইরে থেকে বোঝা যায় না। মতুরটা যেমন যেত। তবু বতুর মনেও বড় মায়া—আমি জানি। মানুষের জন্য ও ভাবে, সমাজ-সংসারের জন্য ভাবে। পাড়ার লোকেদের দায়ে দফায় ও দেখে। মতুরও ভালোবাসা ছিল, তবে সেটা অন্য রকমের। অন্যের দুঃখ দেখলে মন খারাপ করে থাকত, হয়তো লুকিয়ে কাঁদতও, কিন্তু বুক দিয়ে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ত না, বতু যেমন করে। হয়তো মতুর লজ্জা সংকোচ বেশি ছিল। তা ছাড়া ছিল ওর কুনো স্বভাব, মাথার মধ্যে ছিল চিন্তার কারখানা। তাই ওর ভালোবাসা ছিল ভাবের।

চা খেয়েই সকালেই বতু বেরিয়ে গেল। বলে গেল—'ভাত ঢাকা দিয়ে রেখো, ফিরতে দেরি হবে।' ওর মুখ চোখের অবস্থা ভালো না। কী জানি কী হবে। ওর বন্ধুরা আমাকে বলে যায়—ওর কিছু হবে না। চাকরি গেলেও ও আবার চাকরি পাবে। পুলিশের কথা ভাবি। ওরা নাকি বড্ড মারে!

অনেক বেলা পর্যন্ত মতু শুয়ে আছে। গায়ে হাত দিয়ে ডাকলাম—ওঠ রে। উঠল। পারতপক্ষে অবাধ্যতা করে না। চায়ের কাপ হাতে দিলাম। বাসি মুখে চা খেতে লাগল। অনেক করেও ওকে দাঁত মাজাতে পারি না, স্নান করাতে পারি না। গায়ে চিট হয়ে ময়লা বসেছে। ওকে যে জোর করে কলঘরে টেনে নিয়ে যাব এমন আমার সাধ্যে কুলোয় না।

ছুটির দিনে মাঝে-মাঝে বতু জোর করে স্নান করিয়ে দেয়। ওই জোর করাটা দেখতে আমার ভালো লাগে না। বুকের মধ্যে একটু কেমন করে। বেশ কয়েক দিন হল বতু দাদাকে স্নান করায় না।

মেঝে থেকে সিগারেটের টুকরোগুলো তুলে বাঁ-হাতে তেলোয় জমা করছিলাম। শিউলি ফুল কুড়োনোর কথা মনে পড়ে। সামান্য একটু শ্বাস বুক থেকে বেরিয়ে গেল। আস্তে-আস্তে অথর্ব হতে চললাম। অথচ খুব বেশি দিন আগে জন্মেছি বলে মনে হয় না। বে-ভুল মনে কেবল পুরোনো দিনের কথা কালকের কথার মতো মনে হয়। কিন্তু সেটা তো সত্যি নয়। মতুরই বয়স ছত্রিশ পার হয়ে গেল। ওর আগেও একটা হয়েছিল। বাঁচল না। ভালোই হয়েছে। সেটা আবার কোন রকমের পাগল হত কে জানে!

মতু একটুক্ষণ আমাকে দেখল। যেন চেনে না। তবু আমি জানি মতু মাঝে-মাঝে খুব স্বাভাবিক হয়ে যায়। একদিন মাঝারাতে ওর ডাক শুনলাম—মা, ওমা, আমার টেবিলে জল রাখোনি কেন? ভীষণ চমকে উঠেছিলাম। আনন্দে ধক করে উঠল বুকের ভিতরটা। জল খাওয়ার পর কিন্তু আর চিনল না আমাকে। তারপর মাঝে-মাঝে ইচ্ছে করে জল না রেখে দেখেছি আবার 'মা' বলে ডাকে কি না। ডাকত মাঝে-মাঝে। কিন্তু জল খাওয়ার পরই ভুলে যেত। জল না রেখে কষ্ট দিয়ে ওকে পরীক্ষা করতে আর ইচ্ছে হয় না। বেশি সিগারেট খায় বলেই বোধ হয় ওর জলতেষ্টা খুব। তেষ্টার জলের চেয়ে কি মা ডাকটা বেশি? তাই আমি জল রাখতে ভুলি না।

ওর এ অবস্থা হওয়ার সময়ে প্রথমদিকে বন্ধুরা খুব আসত। এখন আর আসে না। লজ্জার মাথা খেয়ে তাদের কাছে মেয়েটির কথা জিগ্যেস করতাম। কেমন মেয়ে, কীরকম বয়স, কোন জাত! তারাও কেউ দেখেনি। মতুর কাছেই শুনেছে বেশি বয়স না তার, খুব পবিত্র সুন্দর চেহারা, আর খুব অহংকারী। কোনওদিকে নাকি তাকাতই না। তার নাম, জাত কেউই জানে না। এসব শুনে আমি একদিন বতুকে বলেছিলাম—'কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দে। তাতে মেয়েটার চেহারার বর্ণনা দিয়ে লেখ যে, আপনার জন্যই আমার দাদার এই অবস্থা, আপনি এসে তাকে বাঁচান। আমরা আপনার কাছে কেনা হয়ে থাকব।' বতু রাজি হল না, ঝাঁকি দিয়ে বলল—'সে মেয়েটা কী করে বুঝবে যে, এটা তাকেই লেখা? তা ছাড়া আমরা এত হীন হতে যাবই বা কেন?' তারপরেই বতু মেয়েটাকে গালাগাল দিতে লাগল, সে বড় লোকের মেয়ে বলে। আমি কিন্তু বতুর মতো করে বুঝি না। মেয়েটাকে চিনতে পারলে আমি গিয়ে তাকে সাধ্যসাধনা করতাম, দরকার হলে পায়ে ধরতাম। সম্মানের চেয়েও যে ছেলেটা আমার বেশি। হয়তো বিজ্ঞাপন মেয়েটা দেখত না, হয়তো দেখলেও বুঝত না, তবু চেষ্টা করলে দোষ কী ছিল? তা না করে বতু গেল

সমাজের ব্যবস্থা পালটাতে। দূর থেকে যে এত ভালোবাসা যায় আর পাগল হওয়া যায় তা বতু বোঝেই না। আমি কিন্তু একটু-একটু বুঝি। বতু-মতুর বাবা এখন তো বহুদূরের লোক, তার শরীর নেই, ডাকলেও তার সাড়া পাওয়া যাবে না। তবু আমার এই বুকটাতে ওই লোকটার জন্য ভালোবাসা টলটলে হয়ে আছে। যদি ভগবানকে দেখতে চাই তবে হয়তো বলব—'তুমি ওই চেহারা ধরে এসো।' কী জানি হয়তো মতুর ভালোবাসা সেরকম নয়। আমি তো তাকে পেয়েছিলাম কোনওদিন, মতু তো পায়ইনি। কিংবা হয়তো মতুও সেই মেয়েটিকে তার নিজের মতো করে মনে-মনে পেয়েছে। ঠিক জানি না। আমার ভাবনা-চিন্তায় অনেক গণ্ডগোল। মতুর মনের ভিতরটা তো আমরা কেউ দেখতে পাই না।

একটা নীল কাগজ কুড়িয়ে টেবিলে রাখতে গিয়ে পড়ার চেষ্টা করলাম। ছানিকাটা চোখ, মোটা চশমা, তাই ভালো পড়া গেল না। মনে হল যেন লেখা আছে যে, পৃথিবীতে কেউই ঠিকঠাক বেঁচে নেই, পুরোপুরি মরেও যায়নি কেউ। সুন্দর কথাটা। মতুর মাথায় চিরকালই সুন্দর-সুন্দর কথা আসে। মনে-মনে বললাম—'ঠিকই লিখেছিল মতু। পৃথিবীতে কেউই ঠিকঠাক বেঁচে নেই, আবার পুরোপুরি কেউই মরে যায়নি। তোর অনেক জ্ঞান, তুই বড় ভালো বুঝিস।'

ঘর থেকে বেরিয়ে আসার সময় দেখি মতু তাকিয়ে আছে। ঠিক যেমন ছেলে মায়ের দিকে তাকায়। মনে হল এক্ষুনি 'মা' বলে ডাকবে, বলবে, 'খিদে পেয়েছে, খেতে দাও।' চৌকাঠে দাঁড়িয়ে রইলাম ওর একটু কথা শোনার চেষ্টায়। ও চোখ ফিরিয়ে নিল।

সেই মেয়েটার ওপর মাঝে-মাঝে বড় রাগ হয় আমারও। কেন রে পোড়ারমুখী, কোন কপালে আমার ছেলের চোখে তুই পড়েছিলি? হ্যাঁ, ঠিক ওইরকম গ্রামের ভাষায় মেয়েটার সঙ্গে আমি মনে-মনে ঝগড়া করি। আবার ভাবি, আমার মতু যাকে অত ভালোবেসেছিল তাকে আমি কী করে ওরকম ঘেন্না করব! তাই আবার মনে মনে বলি, 'তোমাকে চিনি না, তবু বলি, মা, সুখে থাকো।'

মতীন

কেউ ঠিকঠাক বেঁচে নেই। পুরোপুরি মরেও যায়নি কেউ। ওরকম কিছু কি হয় কোনওদিন? ঠিকঠাক বেঁচে থাকা, কিংবা পুরোপুরি মরে যাওয়া?

তবু দ্যাখো মাঝে মাঝেই মানুষেরা মরে যায়। হঠাৎ সময় চলে আসে। অসময়ে। কেউ বুঝতেই পারে না। সখেদে বলে—বহু কাজ বাকি রয়ে গেল। বাস্তবিক মানুষের, পিঁপড়ের,

পাখিদেরও বহু কাজ বাকি থেকে যায়। ঠিক সময়ে-সময়ে হয় না।

আবার একটু পুরোনো হলে সকলেই নতুন জীবন চায়, নতুন শরীর কিংবা চায় দুঃখ-দূর, কিংবা চায় তাকে, যাকে এবার পাওয়া হল না।

তাই নির্বাসনে কেউ যায় না, কিংবা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে। কেউ একজন করপুটে ধরে নেয়। আবার ফিরিয়ে দেয় খেলার ভিতরে।

ফিরে এলে আবার সেই অবিরল মাটিকাটার শব্দ। ধুপ ধুপ ধুপ। দিনরাত। খুব দূরে নয়। মাঝে-মাঝে অন্য সব শব্দের সঙ্গে মিশে যায়। তবু শোনা যায়, ঠিকমতো কান পাতলে। যেন গভীর মাটির নীচে নেমে যাচ্ছে একজন মাটি-মজুর। পরিশ্রমী সে। সারাক্ষণ তৈরি করছে বিচিত্র সুড়ঙ্গ, সুঁড়িপথ। হয়তো তুচ্ছ কাজ, অকাজের। তবু তার কত মনোযোগ! সে ফিরেও দেখে না কতখানি কাটা হল, হিসেবও করে না আর কতখানি বাকি। সারাদিন রাত অবিশ্রান্ত তার কাজ চলতে থাকে। শব্দ উঠে আসে, গর্ত গভীরের দিকে নেমে যায়।

মনে হয় ওটা বুকের শব্দ! কিন্তু তা নয়।

কিংবা হয়তো ওটা বুকের শব্দই! আমারই ভুল হয় কেবল।

কোনও কাজ নেই। তাই মাঝে-মাঝে মিঠিপুর ঘুরে আসি। তুচ্ছ শহর। জানালার তাকের ওপর এক দুই দানা চিনি ফেলে দিই। শূন্য শহরের লুকোনো জায়গা থেকে অমনি উঠে আসে পরিশ্রমী পিঁপড়ের সারি। মিঠিপুরে সচ্ছলতা দেখা দেয়। ওরা কি জানে পরিশ্রমই সচ্ছলতা? কিংবা মনে করে সচ্ছলতা ঈশ্বরের দয়া?

হামাগুড়ি দিয়ে আমি জেলেদের গ্রামে চলে আসি। আমার টেবিলের তলায় ঘন ছায়ায় নিবিড় সেই গ্রাম। জাল ছড়িয়ে অপেক্ষা করছে তিনজন জেলে। শান্ত, ধৈর্যশীল, আশাবাদী তিন মাকড়সা। কখনও মুড়ির টুকরো ছুড়ে মারলে জালে একটু আটকে থাকে। সঙ্গে-সঙ্গে তারা নড়ে ওঠে। শান্ত ধৈর্যশীল তিনজন আশাবাদী মাকড়সার কাছে জ্ঞানলাভের জন্য বসে থাকি।

খনিশ্রমিকের মতো আঁকাবাঁকা পথ কাটছে উঁইপোকা আমার বইয়ের তাকে। তাক থেকে বইয়ের ভিতরে। আমার বইগুলো ঝুরঝুরে হয়ে এল। তবু আমি বাধা দিই না। তাদের ক্লান্তিহীন কাজ দেখি। দ্যাখো, কেমন তৈরি করছে গভীর জালিপথ, নকশা ছাড়াই মিলিয়ে দিচ্ছে এ ধারের সঙ্গে ওধারের সুড়ঙ্গ। যশোলাভ নেই, বাহবার ধারও ধারে না।

দেখে যাই। আশ্চর্য এইসব শহর থেকে গ্রাম, গ্রাম থেকে খনির কাছাকাছি। সুন্দর ভ্রমণ। লোভ বেড়ে যায়। দেখতে ইচ্ছে করে আরও কত গ্রাম, গঞ্জ, পাহাড় ও প্রান্তর পড়ে আছে এইখানে, রয়েছে নিস্তব্ধ জীবাণুদের বিস্তৃত কর্মক্ষেত্র, ধুলোর কণার মধ্যে নিহিত রয়েছে পরমাণুর দিক-প্রদক্ষিণ। দ্যাখো আমাদের ইন্দ্রিয়ের ক্ষমতা কত কম। সব আছে চারধারে, দেখা যায় না।

দুঃশীল রত্নাকর বসে আছে গাছতলায়। পথিকের অপেক্ষায়। এ পথে এখন আর কোনও পথিক আসে না। সম্ভবত ঈশ্বর তাদের নিরাপদ ঘুরপথ চিনিয়ে দিয়েছেন। তবু অপেক্ষায় বেলা যায়। জীর্ণ হয়ে আসে ঘরদুয়ার, বয়স বেড়ে যায়, ক্ষুধা বাড়ে। রত্নাকর বসে থাকে গাছতলায় পথিকের অপেক্ষায়। বহুকাল কেটে যায়। অভ্যাসবশত রত্নাকর বসে আছে, পাশে রাখা বশংবদ খাড়া, হঠাৎ দূরে শোনা গেল পথিকের গান, সর্বাংস্তত্রবানুরঞ্জয়ানি...।' অমনি শরীরে রক্ত ছলকে ওঠে। রত্নাকর খড়্গ তুলে নেয় শূন্যে, দৌড়ে যায়। তারপরই ঢলে পড়ে, ভয়ংকর ভারী খড়্গ তাকে টেনে রাখে। ঝাপসা চোখে রত্নাকর চেয়ে দেখে অদূরে পথিক। তরুণ, ঐশ্বর্যবান। রত্নাকর কেঁদে ওঠে। পথিক সামনে এসে দাঁড়ায়, 'কী চাও রত্নাকর?' রত্নাকর হাতজোড় করে বলে, 'আমার পরিবার উপোস করে আছে, দয়াময়, দয়া করো। ভগবান তোমার মঙ্গল করবেন।'

মাঝে-মাঝে তাকে ডাক দিই, 'রত্নাকর, ওহে রত্নাকর।' বুড়ো ভিখিরিটা জানালার কাছে চলে আসে। আমি তাকে একটা দুটো পয়সা দিই। জিগ্যেস করি, 'কখনও কি ডাকাত ছিলে?' সে মাথা নাড়ে। হাসে। চলে যায়।

প্রায়ই তাকে দেখি বসে আছে গাছতলায়। পথিকের অপেক্ষায়। একমাত্র সঙ্গী তার কর্মফল।

কোনও মানে নেই। তবু দেখি ভাঙা, ছেঁড়া, অবান্তর দৃশ্য ভেসে যায়। কিছুতেই মেলানো যায় না।

কখনও দেখি একটা বল গড়িয়ে যাচ্ছে ঘাসের ওপর। খেলুড়ির দেখা নেই। তবু বল গড়িয়ে যাচ্ছে। একা, সাদা, রৌদ্রের ভিতরে।

কখনও দেখি প্রকাণ্ড ভাঙা একটা মসজিদবাড়ি। আগাছায় ভরা, পরিত্যক্ত, দেউলিয়া। তবু পড়ন্ত বেলায় তার উঠোনে কে একজন নীরবে নমাজ পড়ছে।

দেখি আল্লা বুড়ো দরজি। আল্লার বুকের ভিতরে হঠাৎ জেগে উঠছে ধানভানার তোলপাড় শব্দ। ফসলের মতো উঠে আসছে ভালোবাসা। তাই তার ছুঁচের মুখে সুতো ছিড়ে যাচ্ছে বারবার। আল্লা বুড়ো দরজি অন্যমনে চেয়ে আছে। কিছুই মেলানো যায় না।

কিছুতেই মেলানো যায় না। তবু চেয়ে দেখি আমার ছেলেবেলায় হারানো বল তার কোলের কাছে পড়ে আছে।

একদিন সুসময়ে তিনি সব ফিরিয়ে দেবেন।

চায়ে চিনি কম হয়েছিল, খুব কম। হয়তো দেওয়াই হয়নি। কদাচিৎ কখনও টের পাই চায়ে চিনি কম কিংবা বেশি। আজ পেলাম। তার মানে আজ আমি স্বাভাবিক আছি। অন্য অনেক দিনের চেয়ে ভালো।

আমি ভালো আছি। তোমাকে দেখতে খুব ইচ্ছে করে। তুমি কেমন আছ?

মনে হয় তুমি একরকমের ভালো আছ। আমি আর-একরকমের। তবু হয়তো চেনা মানুষেরা একে অন্যকে ডেকে মতীনের দুঃখের কথা বলে, 'দেখ হে, এতদিনে সুখেই মতীনদের দিন কেটে যাচ্ছিল। সবই ঠিকঠাক ছিল। কিন্তু তারপর একদিন মতীনের চোখে পড়ে গেল সুন্দর একটি মেয়ে...।' এইভাবেই মতীনের দুঃখের কথা ছড়িয়ে যাচ্ছে। হয়তো তোমার কানেও যাবে একদিন। চিন্তা কোরো না। আমি ভালো আছি। ভালো থাকা এক-একরকমের।

চায়ে চিনি কম হয়েছিল। কেন? কোথাও কি কোনও গণ্ডগোল হচ্ছে খুব! দূরে কোথাও যুদ্ধ বাধলে আমাদের চায়ে মাঝে-মাঝে চিনি কম হয়ে যায়। মনে হয় কি যেন একটা টানাপোড়েন চলছে চারপাশে। হয়তো এটা এ-বাড়িতে, হয়তো সেটা বাইরের জগতে কোথাও। সংসারে কি খুব অভাব চলছে! কে জানে। বাইরে কোথাও কি হচ্ছে কোনও গণ্ডগোল? কে জানে! আমি শুধু জানি, আজ চায়ে, চিনি কম হয়েছিল।

সকালের দিকে কে একজন ঘরে এসেছিল। আমার মুখের ঢাকা সরিয়ে তাকাল। চোখে চোখ। মনে হল তার চোখে বড় আক্রোশ। হয়তো মারবে। কিন্তু মারল না। আবার আমার মুখ ঢেকে দিল। যখন চলে যাচ্ছে লোকটা, তখন পিছন থেকে দেখে চিনতে পারলাম না। বতু। আমার ভাই ব্রতীন। ঘরে পোড়া সিগারেটের গন্ধ। বতু কি সিগারেট খায়? আগে তো খেত না। কেমন যেন দেখলাম ওর মুখ চোখ! ইচ্ছে হল ডেকে জিগ্যেস করি, 'তোর কিছু হয়নি তো বতু? ভালো আছিস তো?' কিন্তু কেমন লজ্জা করল।

একটু পরেই ঘরে এল মা। চিনতে পারলাম। দেখলাম মা মেঝে থেকে আমার সিগারেটের টুকরোগুলো কুড়িয়ে নিচ্ছে; চিঠির একটা কাগজ পড়ার চেষ্টা করল ভ্রূ কুঁচকে। কী যেন বিড়বিড় করল একটু। ইচ্ছে হল জিগ্যেস করি, 'চোখে আজকাল কেমন দেখছ মা?'

মায়েরা হয়তো কিছু টের পায়। দরজায় দাঁড়িয়ে মা ফিরে তাকাল। যেন তক্ষুনি বলবে, 'মতু, তুই কি কিছু বলবি?' লজ্জা করল। চোখ ফিরিয়ে নিলাম।

জানলার রোদ এসে লেগে আছে। জানালার কাছে এসে দাঁড়াই। খুবই স্বাভাবিক দেখি চারপাশ। রাস্তার তেমাথায় বকুল গাছ, চৌধুরীদের বাগানের ঘেরা পাঁচিলের ইট বেরিয়ে আছে, দেখা যাচ্ছে একটা চৌখুপি জমি—বাড়ি উঠবে বলে ইট সাজানো হয়েছে, পাল্লাখোলা লরি থেকে বালি খালাস করছে কয়েকজন কুলি, ইলেকট্রিকের তারে লটকে আছে পুরোনো ছেঁড়া সাদা একটা ঘুড়ি। চিন্তিত মানুষেরা হেঁটে যাচ্ছে। উঁচুতে নীল ছাদের মতো আকাশ, কয়েকটা কাক চিল উড়ছে।

খুবই স্বাভাবিক আছে চারপাশ। তবে কেমন চায়ে চিনি কম হয়েছিল। দূরে কিংবা কাছে কোথাও কি যুদ্ধ হচ্ছে খুব? সংসারে কি খুব অভাব চলছে? অতি তুচ্ছ ঘটনা। চায়ে চিনি কম। মাঝে-মাঝেই তো এরকম ঘটে। ভুল হতে পারে। তবু দ্যাখো, সারাদিন বিস্বাদ চায়ের স্বাদ মুখে লেগে আছে।

মাঝে-মাঝে মনে হয় আমি থেমে আছি। বড় বেশি থেমে। মৃত্যু এরকমই হয়। নিস্তব্ধতার মতো। অথচ দ্যাখো সারাদিন আমার চারদিকে চলছে কাজ। পরিশ্রমী পিঁপড়েদের, ধৈর্যশীল মাকড়সার, উইপোকার। সারা পৃথিবীময় জঘন্য জীবাণুরাও ঘুরছে কাজের সন্ধানে, কিংবা আশ্রয়ের। আমিই থেমে আছি কেবল। ইচ্ছে করে জাল ফেলে বসে থাকি, গর্ত খুঁড়ি, কিংবা চাষ করে ফসল নিয়ে আসি ঘরে। এরকম ভাবতে-ভাবতে হঠাৎ যেন আমার ভিত নড়ে যায়। যেন ঘুম থেকে জেগে উঠি। প্রশ্ন করি, 'আমি এরকম হয়ে আছি কেন? কেন আর সব জীবন্ত প্রাণীর মতো আমারও নেই সুখ দুঃখ? আমি কি মরে গেছি? কিংবা, আমার জন্মই হয়নি? আমি কি সব পাওয়া পেয়ে গেছি? কিংবা কিছুই পাইনি।' আস্তে-আস্তে কারণমুখী হতে চেষ্টা করি। অমনি জীবন বড় জটিল বলে বোধ হয়। আমি সারা ঘরময় বেড়াই, দেওয়ালে হাত চেপে ধরি, ঢকঢক করে মাথা ঠুকি। বেরিয়ে পড়ব বলে দরজার কাছে চলে যাই। তখনই মনে পড়ে—আমি অস্ত্রহীন। যথেষ্ট পোশাক নেই গায়ে। অবহেলা সহ্য করার মতো যথেষ্ট শক্তি নেই। যাওয়া হয় না। ফিরে আসি ঘরের ভিতরে। স্বপ্নের ভিতরে।

পাশের ঘরে কারা কথা বলছে! বিকেলে ঘুম থেকে উঠে শুনি খুব গণ্ডগোল। চিৎকার। আস্তে-আস্তে উঠি, ঘরের মধ্যে বেড়াই। চিৎকার খুব বেড়ে যায়। বিরক্তি বোধ হয়। মাঝখানের দরজা বন্ধ। সেই বন্ধ দরজায় টোকা দিয়ে বলি—'চুপ করো।' কেউ চুপ করে না। মাঝে মাঝেই ওই ঘরে কারা যেন আসে। গোপনে কথা বলে। হয়তো পরস্পরকে ভালোবাসার কথা। কিন্তু আজ বড় গণ্ডগোল। আমি আবার চিৎকার করে বলি—'চুপ

করো।' কেউ চুপ করে না; হতাশ লাগে বড়। শুনতে পাই মোটা ভাঙা বিশ্রী গলায় কে যেন চিৎকার করে বলছে—'আমারও পাগল ভাই, বিধবা মা আছে, আমি স্বার্থত্যাগ করছি না?' কথাটা শুনে লোকটার জন্য আমার সামান্য দুঃখ হয়। আহা রে, লোকটা! পাগল ভাই আর বিধবা মা নিয়ে দুঃখে আছে বড়। ইচ্ছে করে ওকে এই ঘরে ডেকে আনি, একটি দুটি সান্ত্বনার কথা বলি। বলা হয় না। ওরা ভয়ংকরভাবে চিৎকার করে ওঠে। ইমপস্টার। সোয়াইন। তোমার জন্যই আমরা ডুবে যাচ্ছি।...বাঁচার জন্য...সংগ্রামের জন্য...। তুমি আমাদের খুন করছ, খুন...।...স্বার্থত্যাগ করতে শেখো...।

আমি ঘরের মাঝখানে যাই, কোণে চলে যাই, কিন্তু গণ্ডগোল সমানভাবে কানে আসতে থাকে। জানালার কাছে যাই, বাইরে অন্ধকারের দিকে চেয়ে থাকি। চেয়ারে বসে সিগারেট ধরিয়ে নিই। গণ্ডগোল, বড় বেশি গণ্ডগোল। হঠাৎ মনে পড়ে সকালে চায়ে চিনি কম হয়েছিল। বিকেলে চা দেওয়াই হয়নি। ইচ্ছে করে পাশের ঘরে গিয়ে ওদের ধমক দিয়ে বলি—'আমি জানতে চাই আমাকে কেন চা দেওয়া হয়নি? কেন আমার চায়ে চিনি কম হবে?'

বোধ হয় অনেক দিন বৃষ্টি হয়নি। আখের চারা গাছগুলি অসময়ে মরে গেছে। আমাদের দেশে তাই চিনি তৈরি হল না এবার। আমি মনে-মনে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করতে থাকি। বিস্বাদ চায়ের স্বাদ মুখে লেগে থাকে।

টের পাই মাথার চুলের ভিতরে বিলি কেটে দিচ্ছে একখানা হাত। বুঝি, মা। ইচ্ছে হল জিগ্যেস করি, 'আমার চায়ে চিনি দাওনি কেন মা? কোথাও যুদ্ধ বেধেছে খুব? চিনি আজকাল পাওয়া যায় না!' কিন্তু সে প্রশ্ন করা হয় না। টের পাই পাশের ঘর থেকে দুড়দাড় লোক বেরিয়ে যাচ্ছে। আবার ফিরে আসছে। গালাগালি শুনতে পাচ্ছি। দাঁত ঘষার শব্দ। কোনও উত্তেজনা বোধ করি না। কেবল মাকে বলতে ইচ্ছে করে, 'চিন্তা কোরো না মা। দূরের যুদ্ধ থেকে গেলে আবার সব ঠিকমতো পাওয়া যাবে। আগের মতোই।' কিন্তু সে কথাও বলা হয় না। শুনি মা বিড়বিড় করে বলছে, 'তুই কেন এমন হয়ে রইলি মতু! তুই থাকলে সব ঠিক হয়ে যেত।' অমনি আমি ভয়ে জড়সড়ো হয়ে যাই। চারপাশেই বড় গণ্ডগোল চলেছে। দুঃসময়। তাই বসে থাকি। অন্ধকারে চুপ করে বসে থাকি। চাল-ধোয়া হাতের গন্ধ পাই। অন্ধকারে ঘরে বসে টের পাই চারদিকে যোজন জুড়ে অনাবৃষ্টির নিস্ফলা মাঠ পড়ে আছে। আখের চারাগুলি মরে গেল। দুঃসময়।

ভয় করে। চায়ে চিনি কম। পাশের ঘরে গণ্ডগোল। কোথাও যাওয়ার নেই। যেতে ইচ্ছে করে অথচ যথেষ্ট পোশাক নেই গায়ে। অবহেলা সহ্য করার মতো শক্তি নেই। অস্ত্রহীন যাওয়া যায় না তাই বসে থাকি। অন্ধকারে চুপ করে বসে থাকি।

পাশের ঘরে গণ্ডগোল থেমে গেল। লোক বেরিয়ে যাচ্ছে। সবাই। নিস্তব্ধতা। শুনতে পাই মা কাঁদছে। অস্থির লাগে বড়। আমার মাথার ওপর একখানা হাত কাঁপে। বড় শান্ত ও সুন্দর বিশ্রামের মধ্যে ঘুমিয়ে আছে শহর মিঠিপুর, জেলেদের গ্রাম, কিংবা সেই আশ্চর্য খনিগুলির বসতি। শান্ত ও সুন্দর বিশ্রামের রাত্রি আমার চারপাশে। তার মধ্যে মার কান্নার শব্দ হয়। খুব শব্দ হয়। বলে, 'বতুকে ওরা কোথায় নিয়ে গেল? কি করবে ওকে? বতু কেন গেল?' আমি চুপ করে থাকি। নিস্তব্ধতার মধ্যে মা কাঁদতে থাকে। বুঝতে পারি না। দূরে বোধ হয় খুব যুদ্ধ চলছে। আর অনাবৃষ্টি। দুঃসময়। অস্থির লাগে। সিগারেট ফেলে দিয়ে আবার ধরাই। কিছুই মেলাতে পারি না। শুধু দেখি হিংসাশূন্য স্থবির ও অক্ষম রত্নাকর বসে আছে গাছতলায়, পথিকের অপেক্ষায়। আবার দেখি পশ্চিমের প্রকাণ্ড খোলা বারান্দায় একটি শিশু একা-একা হাঁটতে শিখছে। বতু না? হ্যাঁ, বতুই। আমার ছেলেবেলায় হারানো বল কোলে করে বসে আছে আল্লা বুড়ো দরজি, দেখতে পাই দুপুরের ঘুমে শুয়ে আছে মা, এলো চুলের ওপর প্রকাণ্ড খোলা মহাভারত উপুড় করে রাখা। শুনতে পাই কাছেই কোথাও যেন দিন রাত চলছে এক মাটি-মজুরের গর্ত খোঁড়ার কাজ। দেখি কুয়াশার মধ্যে তুমি দূরে চলে যাচ্ছ। মনে পড়ে চায়ে চিনি কম হয়েছিল। দূরে কোথাও খুব যুদ্ধ চলছে। আর অনাবৃষ্টি। কিছুই মেলাতে পারি না। বতুর নাম ধরে কাঁদছে মা। ইচ্ছে করে বলি—'ঈশ্বর প্রতিটি রাস্তাকেই নিরাপদ রাখছেন। কোনও ভয় নেই।' পরমুহূর্তেই বোধ করি, এই কথার পিছনে আমার বিশ্বাস বড় কম। মা কাঁদে। মেলাতে পারি না। কিছুতেই মেলাতে পারি না।

চোখে জল চলে আসে। আমি আস্তে-আস্তে তোমার জন্য কাঁদতে থাকি।

সাদা ঘুড়ি

ওই যে কালো ঘুড়িটা লাট খেয়ে বেড়ে আসছে, তার মানে হচ্ছে ওটা লড়বে। কালো রঙের মাঝখানে একটা লালচে ছোপ—তাতে ঘুড়িটাকে ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে। আমার ছাদে রেলিঙ নেই। বাড়িটা এখনও শেষ হয়নি—এটার নানা জায়গায় বহু কাজ বাকি রয়ে গেছে। অফিস থেকে ধার তুলে একটু-একটু করে করছি। যতই করছি ততই কেবল মনে হয়, একটা বাড়ি আসলে কখনওই শেষ হয় না—যতই করা যায় ততই বাকি থেকে যায়। অনন্তকাল লেগে যায়। ওই রেলিঙহীন ছাদে আমার একগুঁয়ে ছোট ছেলেটা—হাবু—তার সাদা ঘুড়ি বহু দূরে বাড়িয়ে লাটাই ঘোরাচ্ছে। লড়বে। হাবুর ঘুড়ির দিকে ছোঁ মেরে-মেরে সরে যাচ্ছে ভয়ঙ্কর কালো ফাইটার ঘুড়িটা। রেলিঙহীন ছাদে দাঁড়িয়ে হাবু পিছু হাঁটছে।

বেশিক্ষণ দেখার সময় নেই। ছাদে রেলিঙ নেই—ভগবান হাবুকে দেখবেন বোধহয়। আমি গরিব মানুষ, ছাদে রেলিঙ দিতে পারিনি এখনও। ভগবান গরিবকে দেখবেন। এখন আমার সময় নেই, সারারাত শীতে কষ্ট পেয়েছে আমার দুটো গরু। মশা রক্ত খেয়েছে কত! বাছুরটার পায়ে বাত, পেছনের ঠ্যাং দুটো একটার সঙ্গে আর-একটা লেগে থাকে। আমার দুটো গরুই হারামি। সাদাটার বিয়োনোর বালাই নেই, সারাবছর খড় খোলের শ্রাদ্ধ করছে। এবছর ভাবছি আমার শ্বশুরবাড়ির দেশ অভয়গ্রামে পাঠিয়ে দেব। আমার কালোটা প্রায় বছর-বিয়ানি। তার বাঁকা শিং, বাঁকা মেজাজ। মাসখানেক আগে আমাকে মাটিতে ফেলে হিঁচড়ে দশ গজ রাস্তা নিয়ে গিয়েছিল। তার ফলে আমাকে টিটেনাসের ইঞ্জেকশন নিতে হয়। কোমরে সেই থেকে একটা ব্যথা বোধহয় পাকাপাকি বাসা নিয়েছে। বুড়ো বয়সের চোট তো! আমার কালোটা প্রায়ই খোঁটা উপড়ে পালাতে চায়। কোথায় পালাতে চায় কে জানে!

সাঁই করে কালো ঘুড়িটা নেমে এল ওই। হাবু সিঁড়িঘরের দরজায় পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে। খুব জোরে সুতো গোটাচ্ছে, ওর ঘুড়িটা সূর্যের আলোর মধ্যে, তাই ঠিক দেখতে পেলাম

না। কালোটা অনেক বেড়ে এসেছে, হাবুর ঘুড়ি পালাচ্ছে। ছাদে রেলিং নেই। ভগবান হাবুকে দেখবেন।

বীণাপাণি ক্লাবের পশ্চিম কোণে একটা ভাঙা টিউবওয়েল। এই কলটার সঙ্গে আমি রোজ সাদাটাকে বেঁধে রাখি। একটু মাঠ মতন আছে, কিন্তু রাতে ব্যাডমিন্টন খেলা হয় বলে ঘাস মরে মাটি বেরিয়ে গেছে। দু-চারখানা ঘাসের মরা ডগা দাঁতের আগায় সারাদিন খোঁটে গরুটা। কালোটাকে বাঁধি দত্তদের জমিতে। জমিটা ছাড়া পড়ে আছে বহুকাল। বাড়ির ভিত গাঁথা হয়েছিল বহুদিন আগে। চারটে ঘর, একটা বারান্দা, পিছন দিকে একটা কুয়ো—এই হচ্ছে বাড়িটার ছক। ভিত সেইভাবেই গাঁথা আছে, তার ওপর বাড়িটা আর হয়ে ওঠেনি। কুয়োটা মজে এল—রাজ্যের কুটোকাটা শ্যাওলা আর ব্যাঙের আস্তানা। বাড়ির ভিতর জঙ্গলে ছেয়ে গেছে। বছরে একবার দত্তবাবু এসে দূরে দাঁড়িয়ে আতঙ্কিত চোখে দৃশ্যটা দেখে চলে যান দূর এক স্টিমারঘাটায় তাঁর কেরানিগিরিতে। আমার কালো গরুটা এইখানে চরে। এখানে গাছগাছালির ছায়ায় কিছু ঘাস জন্মায়। গরুটা সারাদিন খায় আর খায় আর খায়। গরুদের কখনও পেট ভরে না।

এবার শীতটা পড়েছে খুব। আলুখেতের মাটি উসকে দিয়ে বেগুন চারাগুলোর কাছে এসে বসি। বেগুনের বাড় নেই এ বছর। পোকা লেগেছে। ফুলকপির ফুলগুলোও কেন জানি ছড়িয়ে গেছে, দুধের মতো সাদা হয়ে জমাট বাঁধেনি। কলার ঝাড়ে কেঁচো লেগেছে। বাগান থেকে আকাশ স্পষ্ট দেখা যায় না, তবু গাছপাতার ফাঁকে একঝলক একটা সাদা ঘুড়ি দেখতে পাই। যাক বাবা এখনও কাটেনি হাবুরটা। কালো ঘুড়িটা কি এখনও ছোঁ মারছে? কে জানে!

কতকাল ধরে পৃথিবীর রস শুষছে গাছপালা। শুষতে-শুষতে মাটি ছিবড়ে হয়ে গেছে। ছেলেবেলায় যেমন স্বাদ পেতাম তরিতরকারিতে, এখন আর তেমন স্বাদ পাই না। আমার নাকের দোষ কিনা কে জানে, আজকাল শাকপাতায় কেমিক্যাল সারের গন্ধ পাই। পায় আমার গিন্নিও। কেবল ছেলেপুলেরা কিছু টের পায় না।

সামনে ছায়া পড়তেই চোখ তুলে দেখি, দুজন মানুষ বেড়ার ওধারে দাঁড়িয়ে।

—কাকে চাইছেন?

—শ্যামাপদ ঘোষালের বাড়ি কি এটা?

—আজ্ঞে, আমিই।

তারা বিনীতভাবে নমস্কার করে। তাদের মধ্যে লম্বা জন বলে—আমরা কলকাতা থেকে আসছি, এ বাড়িতে একটা ঘর খালি আছে শুনলাম।

—আছে। দেখবেন?

—দেখি একটু।

চাবি আনতে যেতে-যেতে একবার মুখ তুলি। হাবু একেবারে রেলিঙহীন ছাদের ধারে দাঁড়িয়ে পিছু ফিরে। যদি বে-খেয়ালে এক পা পিছু হটে। হাবু-উ, সরে যা, সরে যা, মরে যাবি...পড়ে যাবি! কিন্তু আমি কিছুই বলি না। বললেও হাবু কখনও শোনে না। থাক, যা করবার করুক। ভগবান ওকে দেখবেন।

—ঘরটা তো ছোটই দেখছি। দক্ষিণটা একেবারে বন্ধ। ভিতরের বারান্দা তো কমন, না?

—হ্যাঁ, বাথরুমও তাই।

—ইস। রান্নাঘর উঠোনের ওপাশে। জল বলতে পাতকো—না? উঠোনে তো রোদ আসে না, মনে হয়—জামাকাপড় শুকোবে কোথায়? আর পায়খানা...?

—দুটো। একটা আপনাদের ছেড়ে দেব।

—ভাড়া বলেছেন পঞ্চাশ টাকা! কলকাতা থেকে দশ কিলোমিটার দূর, রেল স্টেশন থেকে সাত আট মিনিটের হাঁটাপথ—তবু পঞ্চাশ টাকা! ওর মধ্যে কি ইলেকট্রিক চার্জ ধরা আছে?

—না ইলেকট্রিক আলাদা। মাসে দশ টাকা ফিকসড।

—দশ টাকা। মাত্র চারটে পয়েন্টের জন্য দশ টাকা।

—গরমকালে পাখা চলবে তো!

—আমাদের পাখাটাখা নেই।

—তা হলেও কলকাতার চেয়ে এখানকার ইউনিটের দর দ্বিগুণ।

লোক দুজন বিতৃষ্ণ চোখে ঘরটা দেখে। পছন্দ হয় না বোধ হয়। গত এক বছর ধরে এরকম বহু লোক এসে ফিরে গেছে। আমি নিস্পৃহভাবে তাকিয়ে থাকি।

লম্বা লোকটা বলে—আমি এখন যে বাড়িতে আছি—সন্তোষপুরে—সেটার ভাড়া পঁয়তাল্লিশ, দুখানা ঘর সামনে পিছনে বারান্দা, দক্ষিণের হাওয়া আসে হুড়হুড় করে। তার ওপর সেটা কলকাতা —এরকম গ্রামগঞ্জ নয়—

—ছেড়ে দিচ্ছেন কেন?

—আমার সামনের বারান্দায় বসে পাড়ার ছোকরারা বোম বাঁধে মশাই।

অপেক্ষাকৃত বেঁটে লোকটি লম্বা লোকটির শালা। খুব বিনীত হাসি তার মুখে। সসঙ্কোচে বলে—এ ঘরটায় কে থাকে? চৌকিতে বিছানা দেখছি। আঠার শিশি, পোস্টারের কাগজ তুলি রাজনীতির বই—এসব কী ব্যাপার!

—আমার মেজো ছেলে পটল।

—পলিটিকস করে?

—না, পলিটিকসের বোঝে কী? এ সি ই পাস করে বেকার বসে আছে। ওইসব করে সময় কাটায়। ওটা একটা শখ।

লম্বা লোকটাকে চিন্তিত দেখায়!—এসব এলাকা কেমন? ঝঞ্ঝাট-টঞ্ঝাট আছে কিছু?

—আজ্ঞে না, খুব নিরিবিলি।

—কিন্তু খবরের কাগজে যেন দেখেছি এই এলাকাতেও—

—ও, সে ওই অভয়নগর—বেলাবাগান রিফিউজি এলাকায়। এদিকটায় কিছু নেই।

লোক দুজনকে তবু চিন্তিত দেখায়।

আমি তাদের কিছুদূরে এগিয়ে দিই। বুঝতে পারি, তারা আর আসবে না।

গত এক বছর ঘরটা ভাড়া হচ্ছে না। আগের ভাড়াটেরা তিরিশ টাকা দিত, ইলেকট্রিক চার্জ দিত তিন টাকা। তারা ছাড়ার পর আমি ভাড়া বাড়িয়েছি। টাকাটা জমিয়ে বাড়িটাতেই লাগাব। ভাড়া হচ্ছে না বটে, কিন্তু হবে। কলকাতার গণ্ডগোলটা যদি জোর লেগে যায়। লম্বা লোকটার সামনের বারান্দায় যদি ছোকরাদের বাঁধা বোমা একটাও একদিন ফাটে—

হাবু এখন ছাদের মাঝখানে আবার সুতো ছেড়েছে। কালো ঘুড়িটা কোথায়? কেটে গেছে নাকি! না সুতো গুটিয়ে একটু সরেছে পুবদিকে। কিন্তু লড়বে! এগোচ্ছে। হাবু ছাদের মাঝখানে দাঁতে ঠোঁট টিপে হাসছে।

বাছুরটা রোদে গা এলিয়ে শুয়ে। পায়ে বাত, ল্যাজের দিকটায় পাতলা গোবরে মাখামাখি। মাথার কাছে একটা কাক বসে মন দিয়ে ওর মুখ দেখছে।

কুয়োর পাড়ে হাত পা ধুচ্ছি, রান্নাঘর থেকে হাবুর মা চেঁচিয়ে বলে—ওরা কী বলে গেল?

—নেবে না বোধ হয়। ভাড়া বেশি।

—না নিক। তুমি কমিও না। কলকাতা থেকে লোক চলে আসছে এখন। ধরদের বাড়ি কুষ্ঠরোগীর বাড়ি বলে ভাড়া হচ্ছিল না, গত শুক্রবারে সেটাও আশি টাকায় ভাড়া হয়েছে। তুমি চেপে বসে থেকো।

রোদে দেওয়া তোষক বালিশের ওপর তপুর বেড়ালটা ডন মারছে। বেড়ালটাকে তাড়িয়ে রোদে একটু বসি। একটা সিগারেট টানি। আকাশে সাদা কালো দুটো ঘুড়িই সমান-সমান বেড়েছে। এইবার লাগবে, ছাদে হাবুর পা দাপানোর শব্দ হচ্ছে। ঘুড়ির লড়াইটা কি দেখে যাব? থাকগে। এখন আর সে বয়স নেই। সপ্তাহে এই একটাই তো মাত্র ছুটির দিন! সময় নষ্ট করা ঠিক না।

উঠোনটায় গতবারে বর্ষা থেকে জল জমছে। আগে জমত না। পশ্চিমে একটা মজা পুকুর ছিল, সেখানে নাবালে গড়িয়ে নেমে যেত। গত বছর থেকে এক বড়লোক পুকুরটা কিনে উঁচু করে মাটি ফেলেছে। উঁচু ভিতের বাড়ি গাঁথছে, জলটা এখন উলটোবেগে গড়িয়ে আসে। গরিবের উঠোন ভেসে যায়। কী করব ভেবে পাই না। চিন্তিতভাবে ঘরে আসি। পরশুদিন সন্ধেবেলা কারেন্ট ছিল না, অসাবধানে মোমবাতি জ্বেলে দিল তপু। দেওয়ালে কালো দাগ। সাবান জলে সেই দাগ তুলি। ক্যালেন্ডারের পেরেক পুঁততে গিয়ে দেওয়ালের চালটা উঠিয়েছে পটল। ভ্রূ কুঁচকে দৃশ্যটি একটু দেখি। দোতলা উঠবে, সেই আশায় সিঁড়িঘরটা পোক্ত করে করা হয়নি, বর্ষার জল সেইখান দিয়ে চুইয়ে এসে নষ্ট করেছে ইলেকট্রিকের তার। দাঁড়িয়ে সমস্যাটা একটু ভাবি। ছাদের ওপর জমানো আছে লোহার শিক—তাতে জং পড়েছে, বাইরে এক গাড়ি বালি ক্রমে মাটি হয়ে যাচ্ছে, পাথরকুচিগুলো ছুড়ে-ছুড়ে নষ্ট করেছে পাড়ার ছেলেরা। সারা বাড়ি ঘুরে আমি এইসব দেখি। বাড়িটা শেষ হতে অনন্তকাল লেগে যাবে মনে হয়। কুয়োতলায় মাথায় সাবান দিতে বসেছে তপু—আমার কালো মেয়েটা। গত জ্যৈষ্ঠে চব্বিশ পার হয়ে গেল। তপুর বিয়ে হলে আমার তিনটে মেয়েই পার হত। কিন্তু কালো বলে তপুই কেমন আটকে গেছে। গতকাল জি টি রোডে তিনটে মড়া পড়েছিল। পটল চারদিন বাড়ি নেই। আমার বেতো বাছুরটা কি বাঁচবে? ফুলকপিগুলো আঁট বাঁধল না, বেগুনে পোকা। ওই লম্বা লোকটা আর আসবে বলে মনে হচ্ছে না। এক বছর একটা ফালতু ঘর পড়ে আছে। কোমরের ব্যথাটা আঁট হয়ে বসেছে। আমার দুটো গরুই হারামি। ভগবান কি সত্যিই হাবুকে দেখবেন?

যদি দোতলাটা তুলতে পারতাম তবে পুরো একতলা ভাড়া দিতাম। দেড় দুশো টাকা নিশ্চিন্ত আয়। দক্ষিণ দিকে দোতলায় আমার একটা নিজস্ব ছোট্ট বারান্দা করতাম। রেলিঙ ঘেঁষে বসাতাম মোরগফুলের টব। ঝোলাতাম অর্কিড। ছেলেবেলায় সাহেববাড়িতে ওরকম বারান্দা দেখে আমার বড় শখ রয়ে গেছে। চাকরির আর মাত্র আট মাস বাকি। তারপর

অখণ্ড অবসর, দক্ষিণের বারান্দায় বসতাম ইজিচেয়ারে, হাতে খবরের কাগজ, মাঝে-মাঝে এক পেয়ালা চা পায়ের কাছে পড়ে-থাকা রোদ...এইসব খুব একটা বেশি কিছু নয়। যে কেউ এইসব চাইতে পারে।

একটা বাচ্চা ছেলে দৌড়ে এসে চেঁচিয়ে খবর দেয়—মেসোমশাই, আপনাদের কেলে গরু খোঁটা উপড়েছে দেখুনগে...

সত্যিই তাই। হারামি গরুটা ছাড়া জমি পার হয়ে রেলরাস্তায় ঢালু বেয়ে উঠছে। চিৎকার করে ডাকি। গলা শুনে একবার পিছনে ফিরে দেখে তারপর জোর কদমে ভারী শরীর টেনে উঠে পড়ে রেলরাস্তায়। পাথরে কাঠের খোঁটার খটখট শব্দ হয়। আপ-ডাউন দুটো লাইন পাশাপাশি। আপ লাইনটা পার হওয়ার চেষ্টা করছে আমার কালো গরু। এইখানে রেল লাইনে একটা গভীর বাঁক। গাড়ি এলে দূর থেকে ড্রাইভার গরুটাকে দেখতেও পাবে না...

—হারামির বাচ্চা। আমি ছুটতে থাকি। গরুটা টের পায়। লাইনটা আর পার হওয়ার চেষ্টা না করে লাইন ধরে ছোটে। আমার কোমর ভেঙে আসে। মেরুদণ্ড দিয়ে একটা ছুরির ফলা লকলক করে চমকে ওঠে। ঢাল বেয়ে উঠতে আবার দম বেরিয়ে যায়। পাথর, খোয়া,। রেলের স্লিপারে হোঁচট খাই। গোরুটা 'বা-হা' বলে ডাক দেয়, ছুটতে থাকে। রেল লাইনের গভীর বাঁক এখানে—আমার অবোধ দুধেল গাইটা বুঝতেও পারে না।

চনচনে রোদে, খালি পায়ে কোমরের সেই ব্যথা নিয়ে আমি প্রাণপণে খানিকটা তাড়া করি। তারপর দাঁড়াই, হঠাৎ মনে হল ভগবান ওকে দেখবেন।

অবাধ্য গরুটাকে যেতে দিয়ে রেলরাস্তা থেকে নামবার আগে আমি সংসারের দৃশ্যটা ভালো করে দেখি। পিছনে বহুদূরে ওই জি টি রোড যেখানে কাল তিনটে মৃতদেহ পড়ে ছিল। পটল সারাদিন বাড়িতে নেই। ডানধারে রেল লাইনের গভীর বাঁক ধরে হেঁটে যাচ্ছে আমার দুধেল গাই। কোথায় সে যাবে কে জানে! সামনে কলাঝোপের আড়ালে দেখা যাচ্ছে আমার পলেস্তারাহীন অসম্পূর্ণ বাড়িটা। ওটা কোনওদিনই শেষ হবে না। রেলিঙহীন ছাদে ঘুড়ি ওড়াতে-ওড়াতে হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে তারপর দ্রুত সুতো গুটিয়ে নিচ্ছে হাবু। ওই অনেকটা সুতো নিয়ে তার সাদা ঘুড়ি টাল খেয়ে-খেয়ে ভেসে যাচ্ছে। আনন্দে গোত্তা খেয়ে ওপরে উঠে ঘুরপাক খাচ্ছে কালো ঘুড়িটা।

কয়েক পলক স্তব্ধতায় দাঁড়িয়ে আমি সংসারের অসম্পূর্ণতাকে দেখে নিই, অনুভব করি ব্যর্থতাগুলি। সাদা কাটা ঘুড়িটা আমার মাথার ওপর দিয়ে ভেসে যায়।

হঠাৎ তড়িৎস্পর্শের মতো আমার হাত ছোঁয় সুতোর হালকা স্পর্শ, মাঞ্জার কড়া ধার। আমি সংসারের দৃশ্য থেকে মুখ ফেরাতেই নীল আকাশে সাদা হাসিটির মতো দোল খাওয়া ঘুড়িটাকে দেখি। সুতোটা আমার হাত ছুঁয়ে আবার সরে যাচ্ছে। আমার পিছনে রাজ্যের ছেলের পায়ের শব্দ আর চিৎকার শুনি। তারা ঘুড়িটার দিকে ছুটে আসছে।

সুতোটা আমার মাথার একটু ওপরে দোল খায়। আমি সংসারের সব ভুলে গিয়ে আনন্দে হাসি। লাফ দিয়ে উঠি। সুতোটা সরে যায়। অল্প দূরেই আবার স্থির হয়ে বাতাসে দোল খায়। আমি এগোই। সুতোটা সরে যায়। আমি এগোই। আমি এগোতে থাকি। ক্রমে সংসারের কোলাহল দূরে যায়। নিস্তব্ধ হয়ে যায় পৃথিবী। ঘুড়িটা টলতে-টলতে এগোয়। সুতোটা আমার হাতের নাগালে-নাগালে থাকে। ধরা দেয় না।

ক্রমে আমরা আশ্চর্য এক অচেনা পৃথিবীতে চলে যেতে থাকি।

উড়োজাহাজ

অনেক ওপর দিয়ে মন্থর এক এরোপ্লেন উড়ে যায়। পুরোনো আমলের উড়োজাহাজ, ঘুমপাড়ানি গানের মতো তার শব্দ, সেই শব্দে আকাশ পেরোনোর ক্লান্তি। অনেক সময় নিয়ে সে তার অনন্ত পথ অতিক্রম করতে থাকে। কুয়াশার আকাশে তার আবছায়া চিহ্নটি একবার দেখা গিয়েছিল। তারপর মিলিয়ে গেল। কিন্তু তার শব্দটা আসতে থাকল। আসতেই থাকল।

উড়োজাহাজ দেখার মধ্যে আর মজা নেই। এখন কাকপক্ষীর মতো কত উড়ে যায় আকাশ দিয়ে, নির্গুণহরি চোখ তুলে দেখে না। কিন্তু এটা দেখার চেষ্টা করল সে। কারণ, শব্দ শুনে মনে হয়েছিল, এ হচ্ছে বুড়ো-সুড়ো এক এরোপ্লেন। আকাশের গরুর গাড়ির মতো ধীরে চলা উড়োজাহাজ, তার যৌবন সময়ে যে শব্দ পেয়ে ছেলেবুড়ো ঘর ছেড়ে মাঠেঘাটে দৌড়ে আকাশমুখো চোখ তুলে হাতের পাতায় রোদ আড়াল করে চেয়ে থাকত।

নির্গুণহরি আবছা প্লেনটাকে একবার দেখল। দেখা পেল না ঠিক। কাকতাড়ুয়ার মতো দু'দিকে ছড়ানো দুই সটান হাত, আর কেলেহাঁড়ির মতো মাথা, একটা লম্বা শুঁটকো শরীর —এই রকম একটা ভূতুড়ে ছায়া কুয়াশা থেকে কুয়াশায় ডুবে গেল। একটা চোখে ছানি কাটা আর একটায় আসছে। পৃথিবীতে দেখারও আর বেশি কিছু নেই। সংসারে শান্তি না থাকলে...

বাঁ-হাতে সিগারেটের তামাক জলকাগজে পাক খাওয়াবে নির্গুণহরি, সেই সময়ে উড়োজাহাজটা গেল। চোখ নামিয়ে আবার পাকানোর চেষ্টা করতে লাগল সে। বিড়বিড় করে বলল—সংসারে শান্তি না থাকলে...শুয়োরের বাচ্চা..

ডানহাতটা একবার সুমুখে তুলে ধরে দেখে সে। হাতটা কাঁপে। অনবরতই গত চার পাঁচ বছর ধরে কেঁপেই যাচ্ছে। ফলে তামাকটা কাগজে পাক খাওয়ানোর ব্যাপারটা কত

জটিল হয়ে গেছে এখন! হাতটাকে কত কী গালমন্দ দেয় সে, কিন্তু শালা নিজের মতো কেঁপেই যায়। কেঁপেই যায়। ফলে এখন নির্গুণহরি বাঁ-হাতেই দেশলাই জ্বালা শিখেছে, বাঁ-হাতেই সই সাবুদ করে, টিপ ছাপ দেয়, বাঁ-হাতেই হেঁসে ধরে গরুর ঘাস নিড়িয়ে আনে, কুয়োর বালতি টেনে তোলে। অভ্যেস। সংসারে নানা অশান্তি, তার ওপর এই ডানহাতটা...

হাতটাকে ফের আর একবার শুয়োরের বাচ্চা বলে গাল দেয় নির্গুণহরি। তারপর সিগারেট পাকানোর মতো সহজ বহুদিনের অভ্যস্ত কাজটা আর একবার চেষ্টা করতে থাকে। কেনা সিগারেটের তামাক নরম, নইলে কবে এই সিগারেট পাকানোর নেশা ছেড়ে দিত সে। সিগারেটের প্যাকেট কিনে ফসফস একটার পর একটা ধরাত। কিন্তু সিগারেটটাই তো নয়, তামাকটা কাগজে পাক খাওয়ানাটাও একটা নেশা। আগে নির্গুণহরি চমৎকার নিটোল পাকানো সিগারেট তৈরি করত। একধারটা মোটা, একধারটা সরু। তামাকটা এমন মিহি করে ডলে নিত যে আগুন ধরালে সহজে নিবত না। সরু ধারটা ঠোঁটে ধরে টানলে ধোঁয়া বেরিয়ে আসত। বহুদিনের অভ্যেস!

অনেক কষ্টে সিগারেটটা পাক খেল। থ্যাবড়া দেখতে হল। জিব বুলিয়ে আঠা জুড়ে চেয়ে দেখল নির্গুণহরি। থুথুটা বেশি লেগে জ্যাবড়া হয়ে গেছে। ভেজা ভেজা। এর চেয়ে ভালো এখন আর ভাবা যায় না। শালার ডানহাতটা...

সিগারেট ধরিয়ে উঠল নির্গুণহরি। উঁচু বাঁধের মতো কর্ড লাইন পড়ে আছে, নিস্তেজ আলোয় দু-ফলা ইস্পাত ঝিকোচ্ছে। খাটালের দুটো মোষ নির্ভয়ে পেরিয়ে যাচ্ছে লাইন। ওপাশে জলা, সেইখানে ডুবে থাকবে। ভাবতেই শীত করে ওঠে। নির্গুণহরি মাথার উলের টুপিটা টেনে নামায়, সতর্ক হাতে গলায় ফাঁস দেওয়া কম্ফর্টারটা দেখে নেয়। গায়ে কোট, পায়ে মোজা তবু শীতটা ঠিক শরীরে ঢুকে পড়ে। এই হচ্ছে বুড়ো বয়েস।

নির্গুণহরি দাঁড়িয়ে কোন ধারটায় যাবে তা একটু চিন্তা করে নেয়। ছেলেটা যে কোথায় কোন রাস্তায় পড়ে আছে তা বলা মুশকিল। কিন্তু কাছে-পিঠেই আছে কোথাও। কাল রাতে বাড়ি ফেরেনি। কিন্তু তার জন্যে দুশ্চিন্তা নেই তার। বাড়ি না ফিরলেও বেঁচেই আছে। প্রায়দিনই নেশা করে। তবু ছেলের মা সারারাত ঘুমোতে দেয় না। রাত না পোয়াতেই ঠেলে বের করে দেয়, ছেলে খুঁজে আনো আগে, তারপর অন্য কথা। ছেলে না পেলে আমি কুরুক্ষেত্র করব...

ছেলে প্রতি রবিবারই পাওয়া যায়। রাস্তায় ঘাটে পড়ে থাকে। নির্গুণহরি দেখতে পায়, কিন্তু কুড়িয়ে নেয় না শুধু নজর রাখে। সতুয়ার চায়ের দোকানে বসে ভাঁড়ে চা খেতে-খেতে খবরের কাগজ দেখে। হিন্দি কাগজ, নির্গুণহরি ভাষাটা জানে না। তবু পড়বার চেষ্টা করে। ফাঁকে-ফাঁকে নজর রাখে, উঠে গিয়ে ছেলের আশেপাশে ঘুরে আসে, কুকুর-টুকুর

কাছে পিঠে থাকলে তাড়িয়ে দেয়। মুখের কাছে প্রায়দিনই বমির স্তূপ দেখা যায়, তার ওপর নীল মাছির ভিড়। সেগুলোও ঝাপটা মেরে উড়িয়ে দিয়ে আবার সতুয়ার দোকানে এসে বসে। চা খায়। দুর্বোধ্য হিন্দি কাগজটা চোখের সামনে তুলে চেয়ে থাকে। তখন তার ডানহাতটা কাঁপে। কখনও চা চলকে পড়ে ছ্যাঁকা লাগে। নির্গুণহরি গাল দেয়—শুয়োরের বাচ্চা।

হাতটাকে দেয়। ছেলেটাকে দেয়। জগৎ সংসারকে দেয়।

উড়োজাহাজটা এতক্ষণে কত দূর চলে গেছে? তবু শব্দটা গড়িয়ে-গড়িয়ে আসছে ঠিক। মুছে যাচ্ছে না। হাঁপিয়ে গেছে বুড়ো উড়োজাহাজটা। আকাশটা তো কম বড় নয়। সেটা পেরোতে আরও কত সময় চলে যাবে।

নির্গুণহরি নিশ্চিন্দার রাস্তা ধরে এগোল। মুখের শ্বাসের সঙ্গে ধোঁয়ার মতো ভাপ বেরিয়ে যাচ্ছে। সিগারেটের গোড়াটা মুখের লালায় ভিজে নেতিয়ে গেছে। কটু স্বাদ পায় সে। তামাকের আঁশ জিব থেকে থুঃ করে ছিটকে ফেলে ধ্যাবড়া সিগারেটটার দিকে তাকায়। নিবে গেছে। আবার ধরায়। কাশে, হাঁটে।

সতুয়ার দোকানে পশ্চিমা কুলি কামিনদের মেলা বসে গেছে। ভাঁড়ের চা সাত পয়সা। গুড় দেওয়া। আর তিন পয়সা বেশি দিলে কাপে চিনি-দেওয়া চা পাওয়া যাবে। স্বাদ একই, আট টাকা কিলো দরের চা আর শুকনো পেয়ারা পাতায় কোনও তফাত নেই।

নগেনের ডিসপেন্সারি পেরিয়ে মাকালতলার রাস্তায় পা দিতেই ছেলের দেখা পেয়ে গেল নির্গুণহরি। গায়ে লাল সাদা ডোরাওলা শার্টটা বাহার দিয়েছে। এক ঠ্যাং সোজা পড়ে আছে, অন্য ঠ্যাংটা শোয়ানো, ঠ্যাঙের ওপর ভাঁজ করা। উপুড় হয়ে হাতের খাঁজে মাথা রেখে শুয়ে আছে ছেলেটা। মাথা ঘিরে মাছি। ধুলোর মধ্যে মুখ। মরেনি। শ্বাস বইছে, ওঠানামা করছে পিঠ। আশপাশ দিয়ে বাজারমুখো রাস্তায় লোকজন যাচ্ছে, আসছে, গা করছে না। পরিচিত দৃশ্য। নির্গুণহরি এগোল। কাছাকাছি এসে একটু নুয়ে দেখল। কালো রোগাটে-রোগাটে চেহারা, চোয়াল ভাঙা, মাঞ্জা দেওয়া সুতোয় জড়িয়ে একবার কানের ওপরটা ফেঁসে গিয়েছিল। সেই দাগটা দেখা যাচ্ছে। ছেলেটা তারই। মমতাভরে একটু চেয়ে থাকে নির্গুণহরি। নাড়াচাড়া করতে ইচ্ছে করে। ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছে করে। রাতের হিম শরীরটা কেমন ঠান্ডা মেরে গেছে।

কিন্তু ছুঁল না। উঠে দাঁড়াল। উড়োজাহাজটা এখনও যাচ্ছে। আশ্চর্য! শব্দটা কোন দিগন্ত থেকে অস্পষ্ট ভেসে আসছে এখনও?

ফিরে এসে মোড় ঘুরে সতুয়ার দোকানে ঢুকল নির্গুণহরি। পশ্চিমাদের ভিড়ের একপাশে বসল। খবরের কাগজটা ভাগ-ভাগ হয়ে গেছে হাতে হাতে। একটা পাতা পড়ে ছিল। নির্গুণহরি তুলে নিল পাতাটা। ভারী দুর্বোধ্য ভাষা। তবু অক্ষর চিনে-চিনে পড়বার চেষ্টা করতে লাগল। অ্যালুমিনিয়ামের বড় মগে চামচে নেড়ে চায়ের ক্বাথ গুড় আর দুধে মেশাচ্ছে সতুয়া। শীতের সকালে চায়ের লিকারের গন্ধটি বড় ভালো লাগে। নির্গুণহরি নিশ্চিন্তে অপেক্ষা করতে থাকে।

পশ্চিমাদের ভিড়ের পিছনে নগেনের কম্পাউন্ডের বনবিহারী তার কৌটোটি র‍্যাপারে ঢেকে কুঁজো হয়ে বসেছিল। মুখখানা তুলে বলল—দাদা যে?

নির্গুণহরি চিনতে পেরে হাসল—বনবিহারী? অনেককাল দেখি না?

—কোথায় বেরিয়েছেন সকালে? ছেলে খুঁজতে?

—হু।

—পেলেন?

—পেয়েছি। তোমার কোলে চাদরে ঢাকা ওটি কে? বাচ্চা নাকি?

বনবিহারী হেসে ফেলে—না, বাচ্চা নয়, বাচ্চার ফুড। আজকাল পাওয়া যায় না। অনেক কষ্টে জোগাড় হল নিয়ে যাচ্ছি।

কৌটোটা চাদরের তলা থেকে বের করে দেখায় বনবিহারী। নির্গুণহরি দেখে ভ্রূ কোঁচকায়—মায়েদের বুকে আজকাল দুধ হয় না কেন হে? সব আমড়া-আঁটি হয়ে যাচ্ছে!

—কী জানি দাদা। সেটাই ভাবি। আমরা তো মায়ের দুধ খেয়েই...

—খুব অবাক কাণ্ড। কারও বুকে দুধ নেই, এ কী করে হয় ভেবেছ?

—ভাবছি।

ভাবো, খুব ভাবো। ভেবে বের করে ফেল। এ ভালো কথা নয়।

বোধহয় ভাবনার জন্যই বনবিহারী র‍্যাপারের ভিতরে আবার কৌটো ঢেকে কুঁজো হয়ে বসে। হাতে সাত পয়সার ভাঁড়ের চায়ে চুমুক দিয়ে চোখ মিটমিট করে। শিশুর মতো আদরে পরিপাটি আঁকড়ে ধরে কোলের বেবিফুডের কৌটো।

নির্গুণহরি হিন্দি কাগজটার পাতার দিকে তাকিয়ে থাকে। আকাশ থেকে এখনও একটা এরোপ্লেনের গুনগুন শব্দ ঝরে পড়ছে। কেউ না শুনুক র্নিগুণহরি ঠিক শুনতে পায়।

বুকে কফের ঘড়ঘড় শব্দের মতো আওয়াজ তুলে উঁচু দিয়ে এরোপ্লেন উড়ে যায়।

ধুলো থেকে চোখ তুলে চেতন দেখল, আকাশময় এক সাদা আলোর বল। এরোপ্লেনটা দেখতে পায় না চেতন। আলোটা ফটাস করে চোখে কামড়ায়, মাথা তুলতেই ঝিনন করে একটা বিদ্যুৎ স্পর্শ করে তাকে। মাথার ভিতরে ফেটে পড়ে একটা রঙের বোমা। নানা রঙের ঢেউ মাথাটা ভাসিয়ে নেয়। আবার ধুলোয় মাথাটা রেখে দেয় চেতন। চারদিকটা এখনও স্পষ্ট নয় তার কাছে। সেই আবছা চেতনায় একটা বুড়ো উড়োজাহাজের আকাশ পেরোনোর দূর শব্দ আসতে থাকে।

কিছুক্ষণ চুপ করে পড়ে রইল চেতন। চোখ বুজে থাকলেও তার সাড় ফিরে আসছে। বুকের নীচে মাকালতলার কাঁচা রাস্তা, শরীর ঘেঁষে লোকজনের পা যায় আসে। রবিবারই হবে আজ, কাল যখন শনিবার ছিল, কাল রাতে রিকশাওয়ালাটা তাকে ঢেলে দিয়ে গেছে এইখানে। রিকশাওয়ালাটার তেমন দোষ নেই, নয়া আদমি, চেতনের বাড়ি তার চিনবার কথা নয়, তবু অনেক রাত পর্যন্ত ঘুরে-ঘুরে খুঁজেছে, তারপর ঢেলে দিয়েছে রাস্তায়। চেতনের মনে পড়ে উঁচু রিকশা থেকে ধাক্কা খেয়ে সে পড়ে গেল শক্ত মাটির ওপর। কিন্তু লাগেনি। ভেসে-ভেসে পড়েছিল।

চোখ মিটমিট করে নিজেকে একটু দেখল সে। পায়ের চপ্পলজোড়া ঠিক আছে, টেরিকটনের ওলিভ গ্রিন প্যান্টটা কেউ খুলে নেয়নি, পায়ে লালমোজা, ডোরাওলা জামা, জামার নীচে সোয়েটার—সবই ঠিক আছে। গায়ে ধুলো লেগেছে খুব। মুখের এক ফুট দূরে তার বমির ওপর মাছি জমাট বেঁধে আছে। সাড় ফিরে আসতেই কম্প দিয়ে একটু শীত করে তার। কুয়াশার জন্য রোদ এখনও তেমন তেজাল নয়। সারা রাতের হিমে শরীরটা ভিজে আছে। উঠে পড়ল চেতন। ঠিক ওঠা নয়, নিজেকে দাঁড় করানো। ভারী কসরতের ব্যাপার এসব সময়ে। হাত কাঁপে, পা ঠিক থাকে না, মাথাটাকে দু'হাতে ঘটের মতো ধরে জায়গামতো রাখতে হয়। পেচ্ছাপে তলপেটটা ভারী। মাকালতলার রাস্তার ধুলো এক পোঁচ জিবে উঠে এসেছে। থুথু ফেললে কাদাগোলা রং দেখা গেল।

নগেন ডাক্তারের ডিসপেন্সারির দেওয়ালে বিচিত্র একটা নকশা কেটে পেচ্ছাপ করল চেতন, এক হাত বাড়িয়ে দেওয়ালটায় ভর রেখে। তলপেটটা কেমন টনটন করে এখনও। শরীরটা আরও একটু দুর্বল লাগে।

চেতন জানে, তার বাপটা বসে আছে সতুয়ার দোকানে। বাপের এই বসে থাকাটা ভারী বিরক্তিকর। এসব সময়ে বাপটাপ কাছে এলে একরকমের অসোয়াস্তি হতে থাকে। বাপ আছে তো আছে, বাপগিরি পাঁচজনকে দেখানোর কী? প্রেস্টিজ নেই?

দেওয়ালটা ধরে-ধরেই চেতন মোড় পর্যন্ত আসে। রিকশা স্ট্যান্ডের দিকে হাতে ইশারা করে। একটা রিকশা এগিয়ে আসে। গাছে চড়ার মতো কষ্টে রিকশার সিট পর্যন্ত উঠবার চেষ্টা করতে গিয়ে টের পেল কে যেন তার বাঁ-হাতের কনুয়ের ওপর ধরে তাকে উঠতে সাহায্য করে। মুখ ফিরিয়ে দেখল, নির্গুণহরি—তার বাপ।

—আঃ, তুমি আবার ধরছ কেন? আমিই পারব। যাও—

নির্গুণহরি পিছিয়ে যায়।

—সোজা বাড়ি যাস, বুঝলি? নির্গুণহরি চেঁচিয়ে বলে দিল।

ফালতু কথা। আর কোন চুলোয় যাওয়ার আছে! কথা না বলেই মুখটা ফিরিয়ে নেয় চেতন। বাপটাপগুলো হচ্ছে এক একটা গেরো।

রিকশাটা দুকদম এগোতেই কাঁচা রাস্তার গর্তে ঝকাং করে ঝাঁকুনি খেল। মাথার ভিতরে আর একটা রঙের বোমা ফেটে রামধনুর রং ছড়াল। নিজের পকেটগুলো একবার হাতিয়ে নেয় চেতন। ফরসা। রাতে রিকশাওয়ালাটা কিংবা অন্য কেউ হিস্যা নিয়ে গেছে, অনেকেরই গত-জন্মের বিস্তর পাওনা আছে চেতনের কাছে। সবাই নেয়। বেশি যায়নি। সত্যিকারের মাতাল কখনও বেশি পয়সা পকেটে নিয়ে বেরোয় না। বাড়ি ফিরলে রিকশার ভাড়ার জন্য চিন্তা নেই। মা মিছরি ভিজিয়ে রেখেছে। দাদামশাইয়ের একসেরি কাঁসার গ্লাস ভরে দেবে। চেতন চোখ বুজে রইল। পাতকোটায় পোকা হয়েছে। সাদাটে পোকার খোসায় বিজবিজ করে বালি ওঠে। দশটা কই মাছ ছাড়া হয়েছে, চুন আর পটাস দেওয়া হয়েছে। কিছু হয়নি। খাওয়ার জল বাইরে থেকে আনতে হয়।

পাথরবাটিতে মিছরি ভেজানো আছে। দাদাশ্বশুরের দিয়ে যাওয়া একসেরি কাঁসার গ্লাসটা মেজে ঝকঝকে করে রাখা হয়েছে। টাটকা জল আনলে শরবত হবে।

—বউ, গেলি? শাশুড়ি চেঁচাচ্ছে ঘর থেকে।

—যাই। মিনতি পুবের জানালার ধারে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে উত্তর দেয়। হাতে পাউডারের পাফ। মোছা-মোছা করে একটু দিয়ে নেবে মুখে। চুল আঁচড়ে নিয়েছে। ধোঁয়াটে আয়নাটার ওপর ঝুঁকে মুখখানা দেখছিল মিনতি। কালো কুচ্ছিৎই বলা যায় তাকে, চিরকালই সবাই তাই বলেছে। ইদানীং কি একটু জেল্লা লেগেছে তার? চোখের কোল আর তেমন বসা লাগে না তো! রংটা মাজা মাজা হয়েছে যেন একটু! আর ভ্রূর মাঝখানে একটা কুমকুমের টিপ বসিয়ে নেয় সে।

—কখন থেকে তো যাই-যাই করছিস। ছেলেটা হ-ক্লান্ত হয়ে এসে পড়বে এখখুনি। বাসি জল মেটে কলসিতে পাথর হয়ে আছে, মুখে দিলে দাঁত নড়ে যায়। পা চালিয়ে যা—

—যাই। উত্তর দেয় মিনতি। তবু তার তাড়া নেই। সামনের চুলগুলো হাতের তেলোয় চেপে কপালটা একটু ঢাকবার চেষ্টা করে সে। উঁচু কপাল তার, সহজে ঢাকা পড়ে না। কী ভেবে কাজললতা খুলে চোখের কোলে একটু টেনে দেয়। খুব বেশি সাজগোজ হয়ে গেল নাকি? ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মুখখানা দেখে। মণ্ডলদের বাড়ির কলে জল আনতে গেলে আজকাল মেস-বাড়ির মোটা পুলিশটা তার সঙ্গে যেচে ঠাট্টা-ইয়ার্কি করে। ভাবতেই একটা আনন্দের গুরুগুরুনি ওঠে বুকে। সে খুব কুচ্ছিৎ হলে কি হত এরকম?

সে সাজগোজ করলে শাশুড়ি রাগ করে না, বরঞ্চ খুশি হয়। ভাবে ছেলেকে মজাতে বউ সাজছে। বয়ে গেছে মিনতির। চেতন দেখে নাকি মিনতিকে? কোনওদিন দেখেছে? বিয়ের আগে মিনতি তার কেপ্পন দাদার সংসার আগলাত। গোটা দশেক গরু, পাঁচ সাত বিঘে ধানজমির মালিক তার দাদা পয়সা খরচের ভয়ে বোনের বিয়ের নামও করত না। সেসময়েই এক দোলের দিনে দাদার সিদ্ধি-গেলা একপাল বন্ধু গিয়ে রং মাখিয়েছিল। চেতনের হাতে ছিল রুপোলি তেলরং, লঙ্কা বাটা মেশানো। সেই রং মুখে চোখে ডলে দিয়েছিল খুব। কী কান্না মিনতির! সেই দেখে নেশার ঝোঁকে তাকে ভালোবেসে ফেলেছিল চেতন। ওর বাপ-মা রাজি হয়নি বিয়েতে। চেতন তখন আর একদিন গভীর নেশা করে পুরুত আর জনকয় বাজনদার আর-এক পাল বন্ধু নিয়ে গিয়ে বিয়ে করে আনল তাকে। দাদার এক পয়সা খরচ হয়নি। বিয়ের পর মিনতি শ্বশুরবাড়ি রওনা হল—সামনে হ্যাজাক উঁচু করে ধরে একজন হাঁটছে, তার পেছনে রোগা রোগা কয়েকজন বাজনদার ট্যাং ট্যাং করে বাজনা বাজাতে-বাজাতে চলেছে, পিছনে রিকশায় মাতাল চেতনের পাশে কাঠ হয়ে বসে মিনতি। শ্বশুরবাড়িতে কেউ নতুন বউ বরণ করেনি, বরঞ্চ কান্নার রোল উঠেছিল। হিন্দ মোটরের হাতুড়ে চেতন বিড়বিড় করে বলছিল—মালটা যখন এনেই ফেলেছি তখন তুলেই নাও না। বিয়ে তো করতুমই...

ওকে বিয়ে বলে না। সঠিক বিয়ে মিনতির আজও হয়নি। তবু তার শ্বশুরবাড়ি আছে। শ্বশুর-শাশুড়ি দেওর আছে—এ বড় আশ্চর্য!

বালতি আর কলসি নিয়ে বেরোনোর সময়ে খুড়িশাশুড়ির উঁচু গলা শুনতে পায় মিনতি।

—দেখে নাও, নড়া ব্যথা করে সাত সকালে বারান্দা মুছেছি, কাদা মেখে নোংরা করে দিয়ে গেল, শত্তুরের বারান্দা যে...

বাড়িটা ভাগ ভাগ হয়ে গেছে। তিনটে ভিটে জুড়ে ব্যারাকবাড়ির মতো, উঠোন একটা, কুয়ো পায়খানাও একটা করে। হাঁড়ি আলাদা। লেগে যায় প্রায়ই।

দেওর রতন বারান্দায় মাদুর পেতে পড়তে বসেছিল। মাদুরটা তেমনি পড়ে আছে, বই খোলা। সে নেই, একটু আগে বড়-বাইরে সেরে এসে কুয়ো পাড়ে হাত মুখ ধুচ্ছিল, দেখেছে মিনতি। বোধ হয় কাটা ঘুড়ি ধরতে ওই অবস্থায় ছুটে গেছে খুড়ির বারান্দা দিয়ে ভিজেপায়ে। উঠোনের ধুলোর ছাপ ফেলে গেছে।

শাশুড়ি কুয়োপাড় থেকে ডাল ধুয়ে গামলা হাতে বারান্দায় উঠছিল, তাকে দেখে থমকে বলল—এতক্ষণে সময় হল? ছেলেটা সারারাত বাইরে, চিন্তায় মরি, তোদের প্রাণে ফূর্তি দেখলে মরে যাই! হাঁদানে ছেলেটা এসে পড়বে...বলতে-বলতে গলা নামিয়ে বলে—কে উঠেছিল রে ও বারান্দায়?

—রতন বোধহয়।

—আন্দাজে বলিস না, বলি দেখেছেটা কে? বলেই গলা চালায় শাশুড়ি—বলি কার পা সারা বারান্দায় ছাপ ফেলেছে তা কি কেউ গজ ফিতে নিয়ে মেপে দেখেছে নাকি...

গোলমাল থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে এল মিনতি। একটু হাঁটলে দুগগাপুরের সদর রাস্তা। সেটা পেরিয়ে মণ্ডলদের বিশাল বাড়ি, সতেরো ভাড়াটের হাট। এ অঞ্চলের জল ভালো না। লোহার গন্ধ, ঘোলা, তার মধ্যে মণ্ডলদের বাড়িতেই যা ভালো জল ওঠে। কুয়া দুটো, টিউবওয়েলে পাড়াপড়শি অনেকেই জল নেয়।

নীচের তলায় পুলিশদের মেস। আসল পুলিশ নয়, এরা হচ্ছে কর্ডনিংয়ের পুলিশ, চোর ধরে না। মোটা পুলিশটার নাম বিজয় সোরেন। ভুড়ির নীচে বেল্ট বাঁধে, গোঁফের ডগায় মোম লাগায়। অবিকল পশ্চিমা মনে হয়। কথাও বলে ওই রকম টানে—বুঝলে হে চেতনের বউ, এবার যখন চেতনকে তুলে লিব, আর ছাড়ব না, মাতালটাকে বুঝিয়ে দিও। রোজ রাতে শালাদের ডানা গজায়। জায়গাটা মাতালের হাট বানিয়ে দিয়েছে। তোমরা আটকাতে পারো না?

পুলিশের পোশাক পরলে ভারী চমৎকার দেখায় বিজয় সোরেনকে। লুঙ্গি আর গেঞ্জি পরা থাকলে নিরীহ ভালোমানুষ মনে হয়। দেখা হতেই হাসল মিনতি।

বিজয় সোরেন চোখ নামিয়ে বলে—চেতনটা কোথায়? ফিরেছে?

—তার খবর কে রাখে?

বিজয় সোরেন একটু গম্ভীর হয়ে গেল। আবার ফিক করে হেসে বলে—কাল বাদলপাড়া থেকে ফিরতে রাত হয়ে গেল, কুমোরপট্টির ভাঁটিখানায় দেখি একটা মাতাল আকাশের দিকে চেয়ে বসে আছে। সবজিওয়ালা নিধে, জিগ্যেস করলাম, করছে কী? বলে, চেতন এইমাত্র আকাশে উড়ে গেল, এইবার নেমে আসবে।

খুব হাসল বিজয় সোরেন।

পুরুষমানুষের সামনে টিউবওয়েল পাম্প করতে লজ্জা করে। শরীরটা লকড়পকড় করে তো। কিন্তু বিজয় সোরেন ওই যে মোড়া পেতে বারান্দায় বসেছে, আর নড়বে না। মিনতি জল নিয়ে গেলে উঠবে, ভাবতে একটু রাগ মেশানো শিহরণ বোধ করে মিনতি। তেমন কুচ্ছিৎ সে এখন আর নয়!

শাড়িটা শক্ত করে জড়িয়ে সে টিউবওয়েলের হাতলটা ধরল। বড় শক্ত হাতল। কষ্টে পাম্প দিতে থাকল। কপালের ওপর চুল উড়ে আসছে। মাঝে-মাঝে চোখে পড়ছে বিজয় সোরেনকে, একটু চোখাচোখি, একটু আধটু হাসির ছিটে। বড় ভালো লাগে মিনতির।

—এবার যখন ধরব চেতনকে, ছাড়ব না, বলে দিও।

মিনতি ঠোঁট উলটে বলে—ইস! চাল ধরা পুলিশের ক্ষমতা জানা আছে।

বিজয় সোরেন হাসে—ক্ষমতাটা দেখবে একদিন, দেখবে।

—আচ্ছা, জানা আছে।

বাঁ-কাঁখে কলস, ডান হাতে বালতি। জল চলকে পড়ছে ছপছপ। মিনতি দুলকি পায়ে সদর রাস্তা পার হয়ে চক্রবর্তীদের ভাঙা মন্দিরের চাতালে পড়ল। বালতিটা নামিয়ে দম নিল একটু। কাঁখ বদলাবে। ঠিক সেই সময়ে এরোপ্লেনটা এল। অনেক উঁচু দিয়ে কুয়াশার ভিতর একটা ছায়া ধীরে উড়ে যাচ্ছে।

মিনতি কপালের চুল সরিয়ে ঘাড়ের ওপর মাথা ফেলে মুখখানা সম্পূর্ণ আকাশে তুলে দেখল। ধীর, গম্ভীর শব্দ। মিনতি চেয়েই থাকে। ভাবে, একজন কালো চশমা পরা লোক এরোপ্লেনটা উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তার মাথায় টুপি, ফরসা রং, খুব অহঙ্কারী চেহারা। তার ঘর-সংসার নেই, খাওয়া পরার ভাবনা নেই। কেবল দিন রাত সে তার উড়োজাহাজ নিয়ে উড়ে যায়। উড়ে যায়।

আকাশ থেকে মুখ নামায় মিনতি। কলসটি কাঁখ বদলে নেয়। আবার হাঁটে, জল চলকে পড়ে ছপছপ। শাড়িটা পায়ের কাছে ভিজে যায়। শীত করে।

শাশুড়ি মাঝে-মাঝে তার দিকে সন্দেহের চোখে চেয়ে বলে—কুড়ির বুড়ি তবু বাচ্চা হয় না কেন রে? বাঁজা নোস তো?

মিনতি ঠোঁট ওলটায়। কে জানে! ধামার মতো পেট নিয়ে ঘুরে বেড়ানো। মাগো! এই বেশ আছে মিনতি। চ্যাপটা শরীর। আর একটু চর্বি হলে চমৎকার গড়ন হবে তার। বাচ্চা কাচ্চার দরকার নেই। সে বড় ঝামেলা। একদিন সে উড়ে যাবে। বিজয় সোরেন কিংবা গগলস-পরা উড়োজাহাজের লোকটা কেউ না কেউ একদিন লুটে নিয়ে যাবে ঠিক।

ডাক্তাররা বলে বটে মাঝে-মাঝে জোলাপ নিতে। কিন্তু সেটা কোনও কাজের কথা নয়। নির্গুণহরি জানে, বয়সে মলভাণ্ডং না চালয়েৎ।

দুপুরে জল সরতে গিয়ে বেগ চাপল। কঠিন কোষ্ঠের মানুষ নির্গুণহরির কাছে ভারী আনন্দের ব্যাপার সেটা। কদিন বুকটা পেটটা চাপ ধরে আছে। প্রেশারটাও ভালো না।

গামছা পরে, বালতিতে জল নিয়ে গিয়ে দেখে পায়খানার দরজা বন্ধ।

বারান্দায় এসে ওই অবস্থায় বসে রইল নির্গুণহরি। দরজাটা খুলল না। ভিতরে থেকে থুথু ফেলার আওয়াজ আসছে। ছোটো বউ-টউ কেউ গিয়ে থাকবে। শ্বশুর, ভাসুর যাবে টের পেয়েছে, তাই ইচ্ছে করে বেরোচ্ছে না।

সংসারে শান্তি নেই। কাঁপা ডানহাতে অতি কষ্টে সিগারেটটা পাকিয়েছিল। জ্বলে-জ্বলে শেষ হয়ে গেল সেটা।

নিজেদের আলাদা ব্যবস্থা করার কথা প্রায়ই ভাবে নির্গুণহরি, কিন্তু ব্যবস্থা কি সোজা কথা! সেপটিক ট্যাঙ্ক ফ্যাঙ্ক বসাতে গুচ্ছের টাকা। ছেলেটা শুঁড়ির হাতে মাস মাইনের অর্ধেক তুলে দিয়ে আসে। অন্য বদখেয়ালও আছে। পাত্তিখেলার জো এসেছে গঞ্জে। সেদিকেও কিছু ঢালে নিশ্চয়ই।

বেগটা চলে গেল। আবার লুঙ্গি পরে ঘরে ফিরে আসে নির্গুণহরি। দক্ষিণের জানলার ধারে বসে। নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে চেতনের মা। গালে পানের ঢিবি। নির্গুণহরি ডানহাতটা তুলে ধরে চেয়ে থাকে। বিশ্বসংসারে সবাই বিশ্রাম নেয়, ঘুমোয় কিংবা চুপ করে থাকে। কেবল এই শুয়োরের বাচ্চারই বিশ্রাম নেই, ঘুম বা চুপ করে থাকা নেই। শালা নড়ছে তো নড়ছেই।

বিকেলের দিকে ঘুম ভাঙতে বালিশটা খাটের বাজুতে খাড়া করে উঁচু হয়ে শুয়েছিল চেতন। হাতে সিগারেট। পূবের জানালার কাছে ধোঁয়াটে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সাজছে

মিনতি। খুব মন দিয়ে সাজছে।

একপলক সেদিকে চেয়ে থাকে চেতন। খুব নেশার ঘোরেই বিয়েটা করেছিল সে, সন্দেহ নেই।

আলগা গলায় জিগ্যেস করল—অত সাজগোজ কীসের?

মিনতি ফিরে তাকালও না। বলল—কীসের আবার! এমনিই।

—এমনিই কেউ সাজে নাকি?

—মেয়েরা সাজে।

—কেন?

—ভালো লাগে?

—দূর ঢ্যামনা, এমনি সেজে কী হয়? গুচ্ছের পাউডার স্নো নষ্ট।

মিনতি ফুঁসে উঠে বলে—আমারটা নষ্ট হচ্ছে হোক। তোমার কী?

—বাপের বাড়ি থেকে ক'বাক্স রূপটান এনেছিলে? বড় বড় কথা।

মিনতি একটুও মিইয়ে যায় না। সমান তালে বলে—আর কী দাও শুনি? কেবল তো একটু স্নো, পাউডার।

চেতনের শরীরটা এ সময়ে বড় ঢিস মিস করে। ঝগড়া কাজিয়া ভালো লাগে না। হাই তোলে। দু-চারটে কথা কাটাকাটি হলেই মেরে বসবে, থাকগে।

—চা করো তো।

—মা করছে।

—কই, শব্দ পাচ্ছি না তো। মা উঠলে শব্দ পেতাম।

—উঠেছে। আমি দেখেছি।

—অ! বলে চুপ করে চেয়ে মিনতির সাজ দেখে সে। হতে পারে যে মিনতি আগের মতো রুক্ষ নেই। গা একটু মোলায়েম মনে হচ্ছে। একটু ভার-ভারিকও হয়েছে বোধহয়। কিন্তু তবু তেমন ছুঁতে ঘাঁটতে ইচ্ছে করে না। কার জন্য সাজে মাগিটা? কাউকে যদি পটাতে পারে তো খুশিই হবে চেতন। উড়ে যা পাখি, উড়ে যা। পিছু নেবে না কেউ, উড়ে যেতে দেবে। সংসারে যত টান কমে তত ভালো। সতুয়ার দোকানে গিয়ে বাপটা বসে

থাকে তার খোঁয়াড়ি ভাঙার সময়ে। মা মিছরি ভিজিয়ে রাখে। বউটা সাজে, এসব একদম ভালো লাগে না। চেতনের কোথাও একটু নিশ্চিন্তে নিজের মতো গড়িয়ে থাকার উপায় নেই। বাড়িশুদ্ধু লোক তোমার জন্য ওঁত পেতে বসে আছে। তার চেয়ে উড়ে যা পাখি, উড়ে পুড়ে যা সব। যে যেখানে খুশি চলে যা। চেতন একাই থাকবে।

—বউ, চা নিয়ে যা। মা ডাকছে। মিনতি উঠে গেল।

উড়ে বেরিয়ে গেল ছুটির একটা দিন। কাল থেকে হপ্তা পড়ে যাচ্ছে, ছুটির দিনটা কেমন কুয়াশার মধ্যে কেটে যায়। ছুটি কেমন তা বুঝতে পারে না। যেমন বুঝতে পারে না বউ কেমন, বাবা কেমন, মা কেমন, কিংবা এই বাড়িটা কেমনধারা, বুঝতে না পেরে ভালোই আছে চেতন।

আয়না দিয়ে একপলক দেখেছিল মিনতি। সাজতে-সাজতে, দেখল অন্যমনস্ক চেতন তাকে গোগ্রাসে দেখছে। চেতন দেখছে। ভারী অবাক হল মিনতি। তবে কি সত্যিই সুন্দর হয়েছে আগের চেয়ে? ভাবতেই বুক গুরুগুরু করে উঠল তার। বিয়ের রাতে যেমনটা করেছিল।

চা আনতে উঠে গিয়েও মিনতি উত্তেজনাটা সামলাতে পারছিল না। তিন বছরের বিয়ে তাদের। তার মধ্যে শেষ আড়াই বছর চেতনকে নেশার মধ্যে ছাড়া কখনও দেখেনি মিনতি। নেশার মধ্যে কখনও-সখনও তাকে ঘেঁটেছে চেতন। জ্ঞান হলে তাকিয়ে দুপলক দেখেনি। এই প্রথম দেখল, ওইরকমভাবে।

একটা আনন্দ খিমচে ধরে তার বুক। যদি সে সত্যিই সুন্দর হয়ে থাকে, আর চেতনের যদি চোখ পড়ে যায় তবে হয়তো কী একটা কাণ্ড হবে! ভাবতেই ভালো লাগে। বিশ্বাস হতে চায় না।

শাশুড়ি বড় যত্নে পরিষ্কার কাপ প্লেটে চা করে দেয়। কাপের ধারে দুটি চিঁড়ের মোয়া।

চা হাতে সাবধানে ঘরে এসে ঢোকে মিনতি। উত্তেজনায় চা একটু চলকে যায় বুঝি! সাবধানে হাঁটে মিনতি। এক-পা, এক-পা করে বিছানার কাছে আসে। এসে নববধূর মতো মাথা নত করে দাঁড়ায়। এসব সময়ে কী করতে হয় তা তো জানে না। কিছু একটা হবে, প্রত্যাশা করে।

—চা নাও। কাঁপা গলায় বলে।

হাত বাড়িয়ে নেয় চেতন, উঠে বসে চা খায়।

মিনতি একটু দাঁড়িয়ে থাকে কাছে। তারপর ধীর পায়ে ফিরে যায় জানালাটার ধারে। সেখানে ধোঁয়াটে আয়না, তার সামনে সস্তা স্নো পাউডার।

মিনতি ঝুঁকে নির্লজ্জের মতো মুখখানা দেখে। সুন্দর কি না তা বুঝতে পারে না।

চেতন উঠে পোশাক পরছে। নেশা করতে যাবে। রোজ অবশ্য বেশি নেশা করে না, ঝুমঝুমে মাতাল হয়ে ঘরে ফেরে। বেশি নেশা করে ছুটির আগের দিন। সেদিন প্রায়ই ফেরে না। না ফিরুক, মিনতিও তাই চায়।

চেতন জুতো পরে বেরিয়ে গেল।

বাইরে শাশুড়ির গলা শোনা গেল—চেতন, বেরোচ্ছিস?

—হ্যাঁ।

—রাতে ফিরবি তো? বলে যা নইলে ভাত নষ্ট।

—ফিরব।

চেতনের পায়ের শব্দ উঠোন পেরিয়ে গেল।

জানালার ধারের আয়নার সামনে বসে আছে মিনতি। বিজয় সোরেনের কথা ভাবছে। কিংবা ভাবছে উড়োজাহাজের সেই কালো চশমা পরা যুবকটির কথা।

খেলার ছল

মিঠুর গোলগাল মোটামোটা দুটো পায়ের একটা জীবনের বুকের ওপর, আর একটা তার শোয়ানো হাতে। তার বুকের ওপর কাত হয়ে শুয়েছে মিঠু, ঘাড়ের কাছে মাথা আর ল্যাভেন্ডারের গন্ধময় চুল। জীবন কানের ওপর মিঠুর দুরন্ত শ্বাস-প্রশ্বাস আর কবিতা-আবৃত্তি শুনতে পাচ্ছিল : 'ঝরনা তোমার স্ফটিক জলের স্বচ্ছ ধারা, তাহারি মাঝারে দেখে আপনার সূর্যতারা। তারি একধারে আমার ছায়ারে আনি মাঝে-মাঝে দুলায়ো তাহারে, তারি সাথে তুমি হাসিয়া মিলায়ো কলধ্বনি...' একটা ছোট নরম হাতে মিঠু তার বাবার গাল ধরে মুখটা ফিরিয়ে রেখেছে তার দিকে। জীবন অন্যমনস্ক ভাব দেখালেই মুখ টেনে নিয়ে বলছে 'শোনো না বাবা!'

মিঠুর ভারী শরীর, নরম তুলতুলে। বুকের ওপর যেখানে মিঠুর পা সে জায়গাটা অল্প ধরে আসছিল জীবনের। পা-টা একবার সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতে মিঠু দাপিয়ে উঠল। পরমুহূর্তেই উঠে এল জীবনের বুকের ওপর, দুই কনুইয়ের ভর রেখে জীবনের মুখের দিকে চেয়ে হেসে হঠাৎ অকারণে ডাকল 'বাবা!'

'উ'।

'তুমি শুনছ না।'

'শুনছি মা-মণি।' জীবন চোখ খুলে তার ছয় বছরের শ্যামবর্ণ মেয়েটির দিকে তাকালে হঠাৎ তার বুক কানায়-কানায় ভরে ওঠে। চুলে ল্যাভেন্ডারের গন্ধ, চোখে কাজল, মুখে অল্প পাউডারের ছোপ—এত সকালেই মেয়ে সাজিয়েছে অপর্ণা। না সাজালেও মিঠুকে দেখতে খারাপ লাগে না। কী বড়-বড় চোখ, আর কী পাতলা ঠোঁট মিঠুর! জীবন মিঠুকে আবার দু-হাতে আঁকড়ে ধরে বলে, 'তোমার কবিতাটা আবার বলো।' মিঠু সঙ্গে-সঙ্গে দুলে ওঠে, 'ঝরনা তোমার স্ফটিক জলের স্বচ্ছ ধারা...' শুনতে-শুনতে সকালের গড়িমসির ঘুম-ঘুম

ভাবটা আবার ধীরে-ধীরে জীবনকে পেয়ে বসতে থাকে। বলতে কি সারাদিনের মধ্যে মিঠু আর তার বাবাকে নাগালে পায় না, সকালের এটুকু সময় ছাড়া। তাই এটুকুর মধ্যেই সে পুষিয়ে নেয়। ধামসে, কামড়ে, কবিতা বলে, গান গেয়ে বাবার আদর কেড়ে খায়। জীবনের মাঝে-মাঝে বিশ্বাস হতে চায় না যে এই সুন্দর, সুগন্ধী মেয়েটা তার!

মাঝখানের ঘর থেকে অপর্ণার গলা পাওয়া যাচ্ছিল। চাপা গলা, কিন্তু রাগের ভাব। মিঠু মাথা উঁচু করে মায়ের গলা শুনবার চেষ্টা করে বাবাকে চোখের ইংগিত করে বলল, 'মা!' নিঃশব্দে হাসল 'মা আতরদিকে বকছে। রোজ বকে।' জীবন নিস্পৃহভাবে বলে 'কেন'! মিঠু মাথা নামিয়ে আনল জীবনের গলার ওপর, তার থোকা থোকা চুলে জীবনের মুখ আচ্ছন্ন করে দিয়ে বলল, 'আতরদি রোজ কাপডিশ ভাঙে। সকালে দেরি করে আসে। মা বলে ওকে ছাড়িয়ে দেবে।' বলতে-বলতে টপ করে জীবনের বুক থেকে পিছলে নেমে যায়, মশারি তুলে মেঝেয় লাফিয়ে পড়ে। জীবন ওকে ধরবার জন্য হাত বাড়িয়ে বলে 'কোথায় যাচ্ছ, মা-মণি!' দরজার কাছে এক ছুটে পৌঁছে গিয়ে মিঠু ঘাড় ঘুরিয়ে বলে 'দাঁড়াও, দেখে আসি।'

গোয়েন্দা! এই মেয়েটা তার পুরোপুরি গোয়েন্দা। বাড়ির সমস্ত খবর রাখে, আর সকালে বাবাকে একা পেয়ে সব খবর চুপিচুপি বলে দেয়। বিশেষত অপর্ণার খবর। মিঠু তার সহজ বুদ্ধিতে বুঝে গেছে যে, বাবা মায়ের খবরটাই বেশি মনোযোগ দিয়ে শোনে। গতকাল তাদের মোটরগাড়িটার জ্বর হয়েছিল কিনা, কিংবা তিনশো ছিয়ানব্বই নম্বর বাড়িতে কুকুরটার কটা বাচ্চা হল এসব খবরে বেশি কান দেয় না। মিঠুর উলটো হচ্ছে মধু—জীবনের তিন বছর বয়সের ছোট মেয়ে। সে মায়ের আঁচল ধরা। জীবনকে চেনে বটে, কখনও-সখনও কোলেও আসে কিন্তু থাকতে চায় না। দুই মেয়ের কথা ভাবতে-ভাবতে জীবন উঠে সিগারেট ধরাল। মাথা ধরে আছে—কাল রাতের হুইস্কির গন্ধ এখনও যেন ঢেঁকুরের সঙ্গে অল্প পাওয়া যাচ্ছে। কেমন ঘুমে জড়িয়ে আছে চোখের পাতা। কিছুতেই মনে পড়ে না কাল রাতে 'বার' থেকে কী করে সে ঘরের বিছানা পর্যন্ত পৌঁছোতে পেরেছিল। কোনওদিনই মনে পড়ে না। কাল বিকেলে কারখানা থেকে তার ড্রাইভার তাকে 'বার' পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে গাড়ি নিয়ে ফিরে এসেছিল। বার-এ দেখা হয়েছিল দুজন চেনা মানুষের সঙ্গে। আচার্য আর মাধবন। তারপর!'

মিঠু ছোট পায়ে দৌড়ে এসে মশারি তুলে আবার ঝাঁপিয়ে পড়ল জীবনের কোলে। হাঁফাচ্ছে। এত বড়-বড় চোখ গোল করে বলল, 'আমাদের বেড়ালটা না বাবা ফ্রিজের মধ্যে ঢুকে ছিল। মরে কাঠ হয়ে আছে।' একটু অবাক হয়ে জীবন বলল, 'সে কী!' তার হাত ধরে টানতে-টানতে মিঠু বলল, 'চলো দেখবে। নইলে এক্ষুনি আতরদি ডাস্টবিনে ফেলে

দিয়ে আসবে।' কৌতূহল ছিল না, তবু মিঠুকে এড়াতে পারে না জীবন, তাই হাই তুলে বিছানা ছাড়ল।

ঘরের চারিদিকেই লক্ষ্মীর শ্রী। মেঝেতে পাতা চকচকে লিনোলিয়ম। ওপাশে অপর্ণা আর মিঠু মধুর আলাদা বিছানা। নীচু সুন্দর খাটের ওপর শ্যাওলা রঙের সাদা ফুলতোলা চমৎকার বেডকভার টান-টান করে পাতা। মশারি খুলে নেওয়া হয়েছে। ডানদিকে প্রকাণ্ড বুককেস যার সামনেটা কাচের, বুককেসের ওপর বড় একটা হাইফাই রেডিও, তার ঢাকনার অর্গান্ডিতে অপর্ণার নিজের হাতের এমব্রয়ডারি, পাশে মানিপ্ল্যান্ট রাখা, লেবু রঙের চিনেমাটির ফুলদানি, সাদা ক্যাবিনেটের ভিতরে রেকর্ডচেঞ্জার মেশিন—কোথাও এতটুকু ধুলোময়লা নেই। পুবের জানালা খোলা, নীল পাতলা পরদার ভিতর দিয়ে শরৎকালের হালকা রোদ আর অল্প হিম হাওয়া আসছে। অপর্ণা ঘর বড় ভালোবাসে, তা ছাড়া তার রুচি আছে। এর জন্য জীবন কখনও মনে-মনে কখনও প্রকাশ্যে অপর্ণাকে বাহবা দেয়। কোন জায়গায় কোন জিনিসটা রাখলে সুন্দর দেখায় জীবন তা ভেবেও পায় না, যদিও এ সবই জীবনের রোজগারে অর্জিত জিনিস, তবু তার মাঝে-মাঝে মনে হয় এই ঘরদোর, এই ফ্ল্যাট বাড়িটার আসল মালিক অপর্ণাই। সারাদিন ঘুরে-ঘুরে অপর্ণা বড় ভালোবাসায়, যত্নে, বড় মায়ায় এই সবকিছু সাজিয়ে রাখে। জীবনের সন্দেহ হয়, সে যখন থাকে না, তখন—পোষা গৃহপালিতের গায়ে লোকে যেমন হাত রেখে আদর করে তেমনি অপর্ণা রেডিও, বুককেস, সোফায় বা টেবিলে তার স্নেহশীল সতর্ক হাত রেখে আদর জানায়। তাই জীবন যখনই ঘরে ঢোকে তখনই মনে হয় এ সব জিনিস অপর্ণারই পোষমানা, এ সব তার নয়। তাই যখন সে ঘরে চলাফেরা করে, বসে, বা শুতে যায়, যখন ওয়ার্ডরোবের পাল্লা খোলে তখন সে তার নিজের ভিতরে এক ধরনের কুণ্ঠা ও সতর্কতা লক্ষ্য করে মনে-মনে হাসে। বাস্তবিক অপর্ণা হয়তো তার এ স্বভাব লক্ষ করে না, কিন্তু জীবন জানে লোকে যেমন তাদের ঘরে ফিরে সহজ, খোলামেলা, আরামদায়ক অবস্থা ভোগ করে সে ঠিক তেমন করে না।

'শিগগির বাবা' বলতে-বলতে মিঠু তাকে টেনে আনল মাঝখানের ঘরে। আসলে ঘর নয়, প্যাসেজ। তিনদিকে তিনটে দরজা—একটা রান্নাঘর, অন্যটা বসবার, তৃতীয়টা তাদের শোওয়ার ঘরের। তিন কোণা প্যাসেজের একধারে দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়ান ক্রিম রঙের সুন্দর ফ্রিজটা। রাতে যখন প্রায়ই ভীষণ ঘোর অবস্থায় খানিকটা এলোমেলো পায়ে অন্ধকার প্যাসেজটা পার হয় জীবন তখন সে মাঝে-মাঝে ফ্রিজটার কাছে একবার দাঁড়ায়, কোনওদিন ঠান্ডা সাদা ফ্রিজটার গায়ে হাত রাখে। মনে হয় ঘুমন্ত সেই ফ্রিজটা তার হাত টের পেয়ে আস্তে জেগে ওঠে, সাড়া দেয়। জীবনের মনে হয় ফ্রিজটা এতক্ষণ যেন এই আদরটুকুর জন্য অপেক্ষা করে ছিল। এখন দিনের বেলা সব কিছু অন্যরকম। ফ্রিজটার

দুটো দরজা দু-হাট করে খোলা, সামনে হাঁটু গেড়ে বসে আছে গম্ভীর মুখ অপর্ণা, তার পিঠে ঝুঁকে মধু, আতর নীচু হয়ে তলার থাকে অন্ধকারে কিছু দেখবার চেষ্টা করছে। জীবন লক্ষ করে সে এসে দাঁড়াতেই অপর্ণার শরীর হঠাৎ শক্ত হয়ে গেল। জীবন অল্প হেসে জিগ্যেস করে 'কী হল!' অপর্ণা ফ্রিজটার দিকে চেয়ে থেকেই জবাব দিল 'দ্যাখো না, বেড়ালটা ভিতরে ঢুকে মরে আছে!' জীবন অপর্ণার মুখের খুব সুন্দর কিন্তু একটু নিষ্ঠুর পাথুরে প্রোফাইলের দিকে চেয়ে সহজ গলায় বলে 'কী করে গেল ভেতরে!' অপর্ণা সামান্য হাসে, 'কি জানি! হয়তো আমিই কখনও যখন ফ্রিজ খুলেছিলুম তখন ঢুকে গেছে। খেয়াল করিনি।' জীবন সঙ্গে-সঙ্গে সান্ত্বনা দিয়ে বলে 'ওরকম ভুল হয়। ওটাকে বের করে ফ্রিজটা ভালো করে ধুয়ে দিয়ো। মরা বেড়াল ভালো নয়।' 'আচ্ছা।' জীবন চলে যাচ্ছিল বাথরুমের দিকে, হঠাৎ মনে পড়ায় ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে 'আর আজ বাজারে যাবে বলেছিলে! ছুটির দিন। যাবে না!' এক ঝলক মুখ ফিরিয়ে জীবনের চোখে চোখ রাখল অপর্ণা, হাসল 'যাব না কেন! একটা বেড়াল মরেছে বলে! তুমি তৈরি হও না।' কথাটা ঠিক বুঝল না জীবন, শুধু অপর্ণার ওই একঝলক তাকানোর দিকে চেয়ে ওর সুন্দর ছোট কপালে সিঁদুরের টিপের চারপাশে কোঁকড়ানো চুল, ঈষৎ ফুলে থাকা অভিমানী সুন্দর ঠোঁট, নিখুঁত আর্চ-এর মতো ভ্রূ আর থুঁতনির চিক্কণতা দেখে হঠাৎ নিজেকে তার বড় ভাগ্যবান মনে হল। বড় সুন্দর বউ তার। বড় সুন্দর অপর্ণা। ছেলেবেলা থেকে অনেকে এরকম বউ পাওয়ার আশায় বড় হয়ে ওঠে। ভেবে দেখতে গেলে জীবনের ছেলেবেলা ছিল বড় দুরন্ত, বড় ঝোড়ো হাওয়া আর বৃষ্টির বড় দামাল দিন ছিল তখন। আজ একটা বেড়াল তার ফ্রিজ-এর ভিতর মরে পড়ে আছে, আর তখন সেই ছেলেবেলায় যখন সে ছিল চায়ের দোকানের বাচ্চা বয়, তখন উনুনের পাশে ছোট্ট নোংরা যে চৌখুপী জায়গায় সে চট আর শতরঞ্জির বিছানায় শুত তখন আর একটা বেড়াল তার মাথার কাছে শুয়ে থাকত সারা রাত। মিনি নামে সেই বেড়াল উনিশ শো পঞ্চাশে চক্রবর্তীদের তিনতলা থেকে দিয়েছিল লাফ। জীবন আজও জানে না বেড়ালটা আত্মহত্যা করেছিল কিনা। সেই সব ছেলেবেলার দিনে জীবন কখনও অপর্ণা বা অপর্ণার মতো সুন্দর অভিজাত বউ-এর কথা ভাবেইনি।

বাথরুমের বড় আয়নায় কোমর পর্যন্ত নিজের আকৃতির দিকে চেয়ে মৃদু হাসল জীবন। দুর্ধর্ষ কাঁধের ওপর শক্ত ঘাড়, বুকে দু-ধারে চৌকো পেশি, দাঁতে ব্রাশ ঘষতে হাতের শক্ত রগ, শিরা আর মাংসপেশিতে ঢেউ ওঠে। ছোট করে ছাঁটা চুল, টানা, মেয়েলি এবং দুঃখী এক ধরনের অদ্ভুত চোখ তার। তার গায়ের রং শ্যামবর্ণ, যেমনটা মিঠুর। মধু তার মায়ের মতোই ফরসা। জীবনের নাক চাপা, ঠোঁট একটু পুরু কিন্তু সুন্দর। তার সঙ্গে মিঠুরই মিল বেশি, মধুর সঙ্গে অপর্ণার। জীবনের চেহারায় পরিশ্রমের ছাপ আছে, বোঝা যায় আলস্য বা আরামে সে খুব অল্প সময়ই ব্যয় করেছে। তৃপ্তিতে আয়নার দিকে চেয়ে হাসে জীবন।

বাস্তবিক প্রায় ফুটপাথের, রাস্তার জীবন থেকে এতদূর উঠে আসতে পারার পরিশ্রম ও সার্থকতার কথা ভাবলে তার মাঝে-মাঝে নিজেকে বড় ভালোবাসতে ইচ্ছে করে। সে তার বউ মেয়ে এবং পরিবারের জন্য কি সমস্ত কর্তব্যই করেনি! এই ভেবেই সে তৃপ্তি পায় যে এরা কেউ দুঃখে নেই, জীবনের ওপর পরম নির্ভরতায় এরা নিশ্চিন্তে বেঁচে থেকে বেঁচে থাকাকে ভালোবাসছে। সে নিজেও কি বেঁচে থাকাকেই ভালোবাসেনি বরাবর। যখন সেই অনিশ্চিত ছেলেবেলায় সে কখনও চায়ের দোকানের বাচ্চা বয়, কখনও বা মোটরসারাই কারখানার ছোকরা কারিগর, তখনও সে রাস্তা পার হতে গিয়ে কৃষ্ণচূড়া গাছে ফুল দেখে আনন্দে গান গেয়েছে, খাদ্য অনিশ্চিত ছিল তবু প্রতিটি খাদ্যকণার কত স্বাদ ছিল তখন! তখন দেশভাগের পর কলকাতায় এসে রহস্যময় এই শহরকে কত সহজে চিনে নিয়েছিল জীবন! আজ সে যখন তার ফ্ল্যাটের ব্যালকনি থেকে, গাড়ির জানালা থেকে, বা বার-এর দরজার কাচের পাল্লার ভিতর দিয়ে দেখে তখন এখানকার রাস্তাঘাট, ভিড়, আলো কত দূরের বলে মনে হয়! কিংবা রাতে ঘোর মাতাল অবস্থায় ফিরে এসে যখন খাওয়ার ঘরে ঢাকা খাবার খুলে সে সুন্দর সমস্ত খাবারের রঙের দিকে চেয়ে দেখে তখনও তার মনে হয় এসব খাবারে কি সেই সব স্বাদ আর পাওয়া যাবে!

জীবন ঘরে ঢুকে দেখল ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে অপর্ণা মধুকে সাজাচ্ছে। জীবন বলল 'ও যাবে নাকি!'

অপর্ণা মধুর মাথায় রিবন জড়াতে-জড়াতে বলল 'যাবে না! থাকবে কার কাছে! যা বায়না মেয়ের।'

জীবন বিরক্তভাবে মুখ ফিরিয়ে দেখল মিঠু মেঝের লিনোলিয়মে খোলা 'হাসিখুশি'র সামনে বসে হাঁ করে মা আর মধুর দিকে চেয়ে আছে। জীবন বলল 'দোকানে-দোকানে ঘুরতে হবে, ওকে নিলে অসুবিধে। কখন জলতেষ্টা পায়, কখন হিসি পায় তার ঠিক কী!'

শুনে মিঠু মুখে হাত চাপা দিয়ে হাসে। অপর্ণা তার ধীর হাতে মধুর মাথার রিবন সরিয়ে নেয়। তখনই গম্ভীর মুখে একবার মিঠুর দিকে চেয়ে বলে 'ঠিক আছে।'

জীবন সঙ্গে-সঙ্গে সহজ হওয়ার ভাব করে বলে 'অবশ্য তোমার যদি ইচ্ছে হয়—'

'না, থাক। আতর তো রইলই, ও দেখতে পারবে।'

'কাঁদবে বোধ হয়।'

'তা কাঁদবে।'

'কাঁদুক।' জীবন হাসে 'কাঁদা খারাপ নয়। তাতে অভ্যেস ভালো হয়। জেদ-টেদ কমে স্বাভাবিকতা আসে।'

অপর্ণা উত্তর দিল না।

জীবনের খয়েরি রঙের ছোট সুন্দর গাড়িটা সামনে দাঁড় করানো। ড্রাইভার গাড়ির দরজায় হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে। জীবনের এক পা পিছনে অপর্ণা—ছাইরঙা সিল্কের শাড়ি, ছাইরঙা ব্লাউজ, হাতে বটুয়া, মাথায় এলো খোঁপা, পায়ে শান্তিনিকেতনি চটি—বড় সুন্দর দেখায় অপর্ণাকে। পাশাপাশি যেতে কেমন অস্বস্তি হয় জীবনের। সে নিজে পরেছে সাদা টেরিলিনের শার্ট আর জিন-এর প্যান্ট—নিঃসন্দেহে তাকে দেখাচ্ছে ক্রিকেট খেলোয়াড়ের মতো, তবু অপর্ণার পাশে কী কারণে যেন কিছুতেই তাকে মানায় না। ড্রাইভারকে ইঙ্গিতে সরে যেতে বলে জীবন একবার পিছু ফিরে চাইল। ব্যালকনিতে আতরের কোলে মধু—সে ভীষণ কাঁদছে, চোখের জলে মুখ ভাসছে তার। রেলিঙের ওপর ঝুঁকে চেয়ে আছে মিঠু—বিষণ্ন মুখ—জীবনের চোখে চোখ পড়তেই হাসল, হাত তুলে বলল 'টা-টা বাবা! দুর্গা দুর্গা বাবা!' অপর্ণা খুব তাড়াতাড়ি ব্যালকনির দিকে চেয়েই চোখ সরিয়ে গাড়িয়ে ঢুকে গেল। জীবন হাসিমুখে হাত তুলে ব্যালকনিতে মিঠু আর মধুর উদ্দেশ্যে বলল 'শিগগিরই আসছি ছোট মা! টা-টা, দুর্গা দুর্গা বড় মা।'

'টা-টা, দুর্গা দুর্গা বাবা। টা-টা দুর্গা দুর্গা।'

'টা-টা। দুর্গা-দুর্গা।'

জীবন গাড়ি এনে দাঁড় করাল মোড়ের পেট্রোল পাম্পে। অপর্ণা নামল না। জীবন নেমে ধরাল একটা সিগারেট। আকাশে শরৎকালের ছেঁড়া মেঘ, রোদ উড়ছে। পেট্রোল পাম্পের একদিকে বিরাট একটা সাইন বোর্ড 'হ্যাপি মোটরিং!' সেই দিকে চেয়ে রইল জীবন, হঠাৎ আলগা একটা খুশিতে তার মন গুনগুন করে উঠল 'হ্যাপি মোটরিং! হ্যাপি হ্যাপি হ্যাপি মোটরিং!' যে বাচ্চা ছেলেটা মোটরে পেট্রোল ভরল, হাত বাড়িয়ে তাকে একটা টফি দিল অপর্ণা। খুশি হল জীবন। অপর্ণার মুখ এখন পরিষ্কার ও সহজ। হায়! কতকাল অপর্ণার সঙ্গে জীবনের ঝগড়া বা খুনসুটি হয় না। জীবন যা বলে অপর্ণা একটু গম্ভীর মুখে তাই মেনে নেয়। সত্যিই মেনে নেয় কি না জীবন তা জানে না অন্তত বিয়ের আগে অপর্ণা যে বাড়ির মেয়ে ছিল সে বাড়ির লোকেরা সহজে অন্য কারও কথা মেনে নিতও না, বশও মানত না। অপর্ণাই মানছে কি! ঠিক জানে না জীবন। আসলে সারাদিনে তাকে অপর্ণার বা অপর্ণাকে তার কতটুকু দরকার পড়ে!

ভালো করে দেখাও হয় না। শুধু রাতে যখন সে ঘোরলাগা অবস্থায় ঘরের দরজায় পৌঁছোয়, আর দরজা খুলে দিয়ে অপর্ণা সরে যায় তখন প্যাসেজের আলো-আঁধারিতে সে একঝলক অপর্ণার সুন্দর কিন্তু নিষ্ঠুর মুখে একটু বিরাগ লক্ষ করে মাত্র। সেটুকুও ভুল হওয়া সম্ভব। তবু অপর্ণাকে ছাড়া অন্য কোনও মেয়েকে ভালোবাসার কথা মনেও হয় না জীবনের।

সামনেই ট্র্যাফিকের হলুদ বাতি লাল হয়ে যাচ্ছিল। আগে একটা সাদা বড় প্লিমাউথ শ্লথ হয়ে থেমে যাচ্ছিল, জীবন স্টিয়ারিং ডাইনে ঘুরিয়ে তাকে পাশ কাটাল, গতি কমাল না, জ্বলজ্বলে লাল আলোয় নাকের ডগা দিয়ে বেরিয়ে এল তার ছোট গাড়ি, আড়াআড়ি ক্রসিং-এর গাড়িগুলো সদ্য চলতে শুরু করেছে, জীবন অনায়াসে ধাক্কা বাঁচিয়ে বেরিয়ে গেল। অপর্ণা চমকে উঠে বলল 'এই! কী হচ্ছে!' জীবন বাঁ-হাতটা তুলে অপর্ণাকে শান্ত থাকতে ইঙ্গিত করল শুধু। অপর্ণা ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনের রাস্তা দেখে নিয়ে বলে 'পুলিশ তোমার নাম্বার কল করছে, হাত তুলে থামতে বলছে।' জীবন গম্ভীর মুখে বলল, 'যেতে দাও।' অপর্ণা চুপ করে যায়। চওড়া সুন্দর গড়িয়াহাটা রোড দিয়ে গাড়ি যাচ্ছে পার্ক সার্কাসের দিকে। সকাল। ট্র্যাফিক খুব বেশি নয়। তবু সামনেই বাস স্টপে একটা দশ নম্বর বাস আড় হয়ে থেমেছে, ফলে পাশ কাটানোর রাস্তা প্রায় বন্ধ। জীবন নিঃশ্বাসের সঙ্গে একটা গালাগাল দেয়, গাড়ির গতি একটুও কমায় না, তার ছোট গাড়ি বাসটাকে প্রায় বুরুশ করে বেরিয়ে গেল। অপর্ণা কিছু বলে না, শুধু তার বড়-বড় চোখ কৌতূহলে জীবনের মুখের ওপর বার বার ঘুরে যায়। জীবনের মুখ বড় গম্ভীর, কপালে অল্প ঘাম। যেতে যেতে জীবন ভীষণ বেগে হঠাৎ স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে আবার সোজা করে নিল, গাড়ি এত জোরে টাল খেল যে ড্যাশবোর্ডে মাথা ঠুকে গেল অপর্ণার। 'উঃ।' গাড়ির সামনের রাস্তায় চমৎকার সাজগোজ করা একটি যুবতী মেয়ে তিড়িং করে লাফ দিয়ে ট্রামলাইনের দিকে গিয়ে পড়ল। ওই বয়সের মেয়েকে এরকম লাফ দিতে আর দেখেনি জীবন, সে ঘাড় ঘুরিয়ে আর একবার মেয়েটিকে দেখবার চেষ্টা করে, অপর্ণা হঠাৎ তীব্র গলায় বলে, 'তোমার আজ কী হয়েছে বলো তো! এটা কি বাহাদুরি নাকি!' জীবন তার গম্ভীর অকপট মুখ ফেরায়, 'অপর্ণা, আমরা একটু মুশকিলে পড়ে গেছি।' অপর্ণা বড় চোখে তাকায় 'মুশকিল।' জীবন রাস্তার দিকে তার পুরো মনোযোগ রেখে বলে 'গাড়ির ব্রেকটা বোধহয় কেটে গেছে। ধরছে না।' অপর্ণা নিঃশব্দে শিউরে ওঠে, চুপ করে জীবনের দিকে একটু চেয়ে থেকে বলে 'স্টার্ট বন্ধ করে দাও।' জীবন একটা টেম্পোকে পাশ কাটিয়ে নিল, অদূরে একটা ক্রসিং, আড়আড়িভাবে একটা লরি পাশের রাস্তা থেকে প্রকাণ্ড কুমিরের মতো মুখ বার করেছে—এক্ষুনি রাস্তা জুড়ে যাবে। জীবন এই বিপদের মধ্যেও ছোট

আয়নার একপলকের জন্য নিজের ভয়ঙ্কর উদ্বিগ্ন ও রেখাবহুল মুখ দেখতে পেল, অপর্ণা চোখ বুজে হাতে হাত মুঠো করে ধরে আছে। জীবন হাত বার করে লরির ড্রাইভারের উদ্দেশ্যে নাড়ল, তারপর হাত নাড়তে-নাড়তেই এক হাতে স্টিয়ারিং ধরে জীবন গাড়িটাকে এক ঝটকায় মোড় পার করে দিল। অল্প হাঁপায় জীবন। 'স্টার্ট বন্ধ হচ্ছে না। ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না। একটু আগেও সব ঠিকঠাক ছিল। অথচ...'। অপর্ণা বক্তব্যহীন ফ্যালফ্যাল চোখে তাকায় 'কী হবে তাহলে!' ড্যাশবোর্ডে ঝুলছে স্টিলের চকচকে চাবির রিং, দোল খাচ্ছে। জীবন আর একবার স্টার্ট বন্ধ করার চেষ্টা করল। অপর্ণা শ্বাসরুদ্ধ গলায় বলে 'ঠেলা গাড়ি, ওঃ, একটা ঠেলাগাড়ি...' জীবন তার হাতের ওপর অপর্ণার নরম হাত টের পায়, বলে 'ভয় পেয়ো না, চেঁচিয়ো না, মাথা ঠিক রাখো, সামনে যতদূর দেখা যায় দেখে দেখে আমাকে বলো। ফাঁকা রাস্তা পাচ্ছি এখনও। বোধহয় বেরিয়ে যাব।' অপর্ণা হাতের দলাপাকানো রুমালে চোখ মোছে, 'গাড়ির এত গণ্ডগোল, আগে টের পাওনি কেন?' খোলা জানলা দিয়ে হু-হু করে বাতাস আসছে, তবু জীবনের কপালের ঘাম নেমে আসছে চোখে মুখে, জিভে সে ঘামের নোনতা স্বাদ পায়, বলে 'দিন পনেরো আগেই তো গ্যারাজ থেকে আনলুম, গিয়ারটা একটু...' অপর্ণা হঠাৎ প্রায় লাফিয়ে উঠে বলে 'বাঁ-দিকে, বাঁ-দিকে মোড় নাও, সামনে জ্যাম।' তিনটে রিকশা একে অন্যকে কাটিয়ে যাওয়ার চেষ্টায় ছিল, পাশ কাটাতে গিয়ে গাড়ির বনেট লাগল একটা রিকশার হাতলে, ছোট্ট একটা ধাক্কায় রিকশাটাকে সরিয়ে বাঁয়ে মোড় ফিরল জীবন, রিকশাওয়ালা, হাতল শূন্যে তুলে প্রাণপণে রিকশাটাকে দাঁড় করবার চেষ্টা করছে—এই দৃশ্য দেখতে দেখতে হাজরা রোডে ঢুকে উলটোদিক থেকে আসা একটা ষোলো নম্বর বাস এর দেখা পায় জীবন। বাসটা একটা ধীরগতি কালো অস্টিন অফ ইংল্যান্ডকে ছাড়িয়ে যাবে বলে রাস্তা জুড়ে আসছে। দাঁতে ঠোঁট চাপে জীবন, টের পায় ঠোঁটের চামড়া কেটে দাঁত বসে যাচ্ছে, ফুটপাথ ঘেঁষে স্টিয়ারিং ঘোরায় সে, তবু বুঝতে পারে অত অল্প জায়গা দিয়ে গাড়ি যাবে না। চোখ বুজে ফেলার ভয়ঙ্কর একটা ইচ্ছে দমন করে সে দেখে ষোলো নম্বর বাসটা তার ঘাড়ের ওপর দিয়ে যাচ্ছে, বাস-এর ড্রাইভার হাত বাড়িয়ে তার কান মলে দিয়ে বলতে পারে 'শিখতে অনেক বাকি হে!' কিন্তু জীবন খুব অবাক হয়ে দেখল তার ছোট গাড়িটা যেন ভয় পেয়ে জড়সড়ো এবং আরও ছোট হয়ে রাস্তার সেই খুব অল্প ফাঁক দিয়ে ফুরুৎ করে বেরিয়ে গেল। নেশাগ্রস্তের মতো হাতে জীবন, 'অপর্ণা!'...তাকিয়ে দেখে অপর্ণা দু-হাতে মুখ ঢেকে কাঁদছে, জীবনের ডাক শুনে শুধু বলল 'আমার মেয়ে দুটো! মেয়ে দুটোর কী হবে!'

মুহূর্তের জন্য স্টিয়ারিঙের ওপর হাত ঢিলে হয়ে যায় জীবনের। গাড়ি টাল খায়। দুর্বল সময়টুকু আবার সামলে নেয় জীবন, বলে 'কেদো না, কাঁদলে আমার মাথা ঠিক থাকবে না। একটু ভুল হয়েছে তোমার, এই রাস্তার মোড় নিতে বললে, কিন্তু রাস্তায় বড় ভিড়।'

গাড়ি খুব জোরে চলছে না, জীবন চারদিকে তাকিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার পথ খুঁজছিল। অপর্ণা চোখের জল মুছে শক্ত থাকার প্রাণপণ চেষ্টা করে বলে 'যেমন করে হোক বাসার দিকে গাড়ি ঘোরাও।' জীবন স্থির গলায় বলে 'তাতে লাভ কী! বাসার সামনে গেলেই কি গাড়ি থামবে!' অপর্ণা জোরে মাথা নাড়ে, 'না থামুক। মধু আর মিঠু হয়তো এখনও ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে আছে।' জীবনের ঘাড় টন টন করছিল ব্যথায়, সহজ ভঙ্গিতে না বসে সে অনেকক্ষণ তীব্র উৎকণ্ঠা ও উত্তেজনায় সোজা হয়ে বসে আছে। বাঁ-দিকে পর পর কয়েকটা সরু নোংরা গলি, মোড় ফেরা গেল না। সামনেই চৌরাস্তা, দূর থেকেই দেখল জীবন ট্র্যাফিক পুলিশ অবহেলার ভঙ্গিতে হাত তুলে তার সোজা রাস্তা আটকে দিল। অপর্ণা হঠাৎ জোরালো গলায় বলল 'ডান দিকে মোড় নাও, ওদিকে ফাঁকা রাস্তা, তারপর রেইনি পার্ক...' কিন্তু জীবন মোড় নিতে পারল না, গাড়িটা অল্পের জন্য এগিয়ে গিয়েছিল, তারপর সহজ নিশ্চিন্তভাবে ট্যাফিক পুলিশটাকে লক্ষ্য করেই ছুটছিল। লোহার হাতে স্টিয়ারিং সোজা রাখে জীবন, পুলিশটার হাতের তলা দিয়ে তার গাড়ি ছোটে। বাঁকের মুখে নীল রঙের একটা ফিয়াট তার গাড়ির বাফারের ধাক্কায় নড়ে উঠে থেমে কাঁপতে থাকে। ফিরেও তাকায় না জীবন, দুটো লরি পর পর কাটিয়ে নেয়। পিছনের পুলিশটা চেঁচিয়ে গাল দিচ্ছে। সামনেই হাজরার মোড়, লাল বাতি জ্বলছে, অনেক গাড়ি পর পর দাঁড়িয়ে। কিছুই ভাবতে হয় না জীবনকে, সে থেমে থাকা গাড়িগুলোকে বাঁয়ে রেখে অবহেলায় এগিয়ে যায়, আবার একটা ডবল ডেকার, পিছনে লম্বা ট্রাম আড়াআড়ি রাস্তা জুড়ে যাচ্ছে, জীবন শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বলে 'আজ কেবলই লাল বাতি, রোজ এমন হয় না তো!' অপর্ণা বাঁ-হাত বাইরে বের করে মোড় নেওয়ার ইঙ্গিত দেখায় ডবলডেকারটার মুখ কোনওক্রমে এড়িয়ে জীবন গাড়িটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারল। রাস্তা ফাঁকা নয়, কিন্তু অনেকটা সহজ। বাঁয়ে মনোহরপুকুরের মুখ, একটু দ্বিধাগ্রস্ত হাতে গাড়ি ঘোরাবে কিনা ভাবতে-ভাবতে জীবন সোজাই চলতে থাকে। কালীঘাটের স্টপে গোটা চার-পাঁচ স্টেট বাস একসঙ্গে থেমে আছে। দূর থেকেই জীবন দেখে প্রথম বাসটা ধীর-স্থির ভাবে স্টপ ছেড়ে যাচ্ছে, সে পৌঁছবার আগে আর বাসগুলো যে ছাড়বে না তা নিশ্চিত। ওখানে বাস স্টপের পাশেই একটা পাবলিক ইউরিনাল। আগে থেকেই জীবন তাই ট্রামের ট্র্যাকে তুলে দিল তার গাড়ি। অপর্ণা কী বলতে গিয়ে থেমে যায়। কিছু লোক রাস্তায় দাঁড়িয়ে গেছে, তাদের গাড়িটাকে এবার অনেকের নজরে পড়ছে। জীবন কালীঘাট পেরিয়ে ট্রামের ট্র্যাকে ঘাসমাটির জমির ওপর দিয়েই চলতে থাকে। লোকজন দূর থেকে চেঁচিয়ে কী বলছে। জীবন একটু ঘোলাটে চোখে অপর্ণার দিকে চায়; 'অপর্ণা...' অপর্ণা অর্থহীন চোখে তার মুখের দিকে তাকায়। জীবন বলে 'আমার কেমন ঘুম পাচ্ছে।' অপর্ণা বুঝতে না পেরে বলে 'কী বলছ?' জীবন মাথা নাড়ে, 'চোখের সামনে আঁশ-আঁশ জড়ানো একটা ভাব। অনেকক্ষণ সিগারেট না খেলে আমার একরকম হয়। আমি অনেকক্ষণ সিগারেট খাইনি।'

অপর্ণার চোখে জল টলমল করছে, রুমালের ঘষায় চোখের আশেপাশের জায়গা লাল, বড় সুন্দর দেখায় তাকে। কপালের সিঁদুর অল্প মুছে গেছে। সে তৎপর গলায় বলে 'কোথায় তোমার সিগারেট? জীবন তার দিকে চেয়ে বলে 'পকেটে।' অপর্ণা বলে 'বের করে দাও।' এবার সামনের মোড়ে সবুজ বাতি জ্বলছে, বালিগঞ্জের ট্রাম দাঁড়িয়ে আছে বাঁকা হয়ে, ট্রাম ট্র্যাকের পাশে-পাশে কয়েকটা গাছ, স্টপে লোকের ভিড়। তাদের গাড়িটা কাছে আসতেই লোকে চেঁচাচ্ছে 'এই কী হচ্ছে...!' জীবন ক্রমান্বয়ে হর্ন দিয়ে ট্রামের ট্র্যাক থেকে রাস্তায় নামে। সামনেই একটা নয় নম্বর। এটা ট্রলি বাস—প্রকাণ্ড বড়, আস্তে-আস্তে রাস্তা জুড়ে চলে। জীবন হর্ন দেয়, বাসটাকে পাশ কাটানোর চেষ্টা করা বৃথা—জায়গা নেই। ট্রাম ট্র্যাকের দিকে আবার মুখ ঘোরাতে গিয়ে জীবন দেখে তিন-চারজন লোক রাস্তা পার হওয়ার জন্য দাঁড়িয়ে আছে, ভীষণ ঝাঁকুনি দিয়ে বাঁয়ে স্টিয়ারিং চেপে ধরে জীবন। কংক্রিটে প্রবল ধাক্কা দিয়ে গাড়িটা সোজা ফুটপাতে উঠে যায়। এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের গাড়িবারান্দার তলা থেকে একেবারে শেষ মুহূর্তে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে কয়েকজন লোক সরে যায় জীবনের গাড়ির মুখ থেকে। জীবন গালাগাল শুনতে পায় 'এই শুয়োরের বাচ্চা, হারামি...' ছোট আয়নার দিকে তাকিয়ে দেখে কয়েকজন তার গাড়ির পিছু নিয়ে দৌড়োতে-দৌড়োতে পিছিয়ে পড়তে থাকে। তারা দূর থেকে হাত নেড়ে শাসায়। মুক্ত-অঙ্গনের সামনে জীবন ফুটপাথ ছেড়ে আবার রাস্তার নামে। একটা ঢিল এসে পিছনের কাচে চিড় ধরিয়ে দিল। এতক্ষণ উত্তেজনায় অপর্ণাকে দেখেনি জীবন, এখন দেখে অপর্ণা গাড়ির দরজায় ঢলে চোখ বুজে আছে। কপালে একটু জায়গা কাটা, একটা রক্তের ধারা থুঁতনি পর্যন্ত নেমে এসেছে। জীবন চেঁচিয়ে ডাকে 'অপর্ণা।' আস্তে চোখ খোলে অপর্ণা, কেমন বোধ ও যন্ত্রণাহীন দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ জীবনের মুখের দিকে তাকায়, হঠাৎ তীব্র আক্রোশে বলে 'তুমি ছোটোলোক। তুমি বরাবর ছোটলোক, ভিখিরি ছিলে। তুমি কখনও আমার উপযুক্ত ছিলে না।' ঠিক। সে কথা ঠিক। জীবন জানে। ফাঁকা সুন্দর রাস্তার দিকে চেয়ে সে বলে 'আমার ঘুম পাচ্ছে অপর্ণা। আমি রাস্তা ভালো দেখছি না।' অপর্ণা তেমনই আক্রোশের গলায় বলে 'ভেবো না, তুমি মরলেও আমার কিছু যায় আসে না। আমি দরজা খুলে এক্ষুনি লাফিয়ে পড়ব।' বলতে-বলতেই দরজার হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে দেয় অপর্ণা, আঁধখোলা দরজার দিকে ঝুঁকে পড়ে, দ্রুত হাত বাড়িয়ে অপর্ণার কনুইয়ের ওপর বাহুর নরম অংশ চেপে ধরে তাকে টেনে আনে জীবন। বলে 'কপালটা কী করে কাটল! দরজায় ঠুকে গিয়েছিল, না! রুমালে ওটা মুছে ফেল, বিচ্ছিরি দেখাচ্ছে।' বলতে-বলতে লেকের দিকে গাড়ির মুখ ফেরায় জীবন, বলে 'গাড়ির স্পিড পঁচিশের মতো। এখন লাফিয়ে পড়লেও তুমি বাঁচবে না। যা নরম শরীর তোমার! কোনওকালে তো শক্ত কোনও কাজ করোনি। বলতে-বলতে হাসে জীবন। অপর্ণা রুমালে মুখ চেপে ফোঁপায়, 'কেমন অসম্ভব...অসম্ভব লাগছে...এমন সুন্দর সকালটা ছিল...মিঠু মধু আর এখন! দুজনেই হয়তো

মরে যাব।' জীবন প্যান্টের বাঁ-পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই বের করে গাড়ির সিট-এর ওপরে রাখে, বলে 'একটা সিগারেট আমার মুখে লাগিয়ে দাও তো। আর ধরিয়ে দাও।' অপর্ণা কাঁপা হাতে জীবনের ঠোঁটে সিগারেট লাগায়। লেকের হাওয়া দিচ্ছে, অপর্ণা অনভ্যাসের হাতে দেশলাই ধরাতে গিয়ে পর পর কাঠি নষ্ট করে। জীবন মাথা নাড়ে 'হবে না, ওভাবে হবে না।' বলতে-বলতে ঠোঁটের সিগারেট নিয়ে অপর্ণার দিকে বাড়িয়ে দেয় 'তুমি নিজে ধরিয়ে দাও। গাড়ির মধ্যে নীচু হয়ে বসে ধরাও।' অপর্ণা প্রায় আর্তনাদ করে বলে 'তার মানে? আমাকে মুখে দিতে হবে?' জীবন একবার তার দিকে চেয়েই চোখ ফিরিয়ে নেয় 'তাড়াতাড়ি করো। আমার বিশ্রী ঘুম পাচ্ছে।' অপর্ণা একটু দ্বিধা করে, তারপর গাড়ির মধ্যে ঝুঁকে পড়ে মুখে লাগিয়ে সিগারেটটা ধরানোর চেষ্টা করে। ধরায়, তারপর সিগারেট জীবনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে আবার বলে 'ছোটলোক, তুমি ছোটলোক ছিলে। কোনও দিন তুমি সুন্দর কোনও কিছু ভালোবাসোনি। ভেবো না আমি টের পাইনি। কাল রাতে যখন তুমি প্যাসেজ দিয়ে আসছিলে তখন আমি ফ্রিজ-এর দরজা খোলার আর বন্ধ করার শব্দ পেয়েছিলুম।' স্টিয়ারিং হুইলের ওপর জীবনের হাতের পেশি ফুলে ওঠে 'তার মানে?' অপর্ণা হিসহিসে গলায় বলে 'ওই বেড়ালটা, ওই সুন্দর কাবলি বেড়ালটা...তুমি কোনওদিন ওটাকে সহ্য করতে পারোনি।' লেক-এর চারধারে ফাঁকা রাস্তায় জীবন গাড়ি ঘুরপাক খাওয়াতে থাকে। হাওয়া দিচ্ছে, প্রবল হাওয়ায় তার কপালের ঘাম শুকিয়ে যেতে থাকে, আর তার আবছা মনে পড়ে...হ্যাঁ মনে পড়ে...সে ফ্রিজ-এর দরজা খুলেছিল কাল রাতে। অপর্ণা ঠিক বলছে। অপর্ণাই ঠিক বলছে। তার গাড়ি টাল খায়, ঘুড়ি ওড়াতে-ওড়াতে একটা ছেলে রাস্তার ওপর এসে দাঁড়িয়েছে, আকাশের দিকে চোখ। জীবন তার দিকে সোজা এগিয়ে যেতে থাকে, অপর্ণা চিৎকার করে ওঠে 'এই—এই-ই...' ছেলেটা চমকে উঠে তাকায়, তারপর দৌড়ে রাস্তা পার হয়। ঘুড়ির সুতো গাড়ির উইন্ডস্ক্রিনে লেগে দু'ভাগ হয়ে যায়। ভো-কাট্টা। জীবন হাসে। অপর্ণা হাঁপাতে-হাঁপাতে বলে 'আমাদের পিছনে একটা পুলিশের গাড়ি...' জীবন আয়নায় তাকিয়ে একটা কালো গাড়ি দেখতে পায়। সঙ্গে-সঙ্গে ডানদিকের প্রথম রাস্তা দিয়ে গাড়ি ঘুরিয়ে নেয় সে, অল্পক্ষণ পরেই তার গাড়ি লেক পার হয়ে ঢাকুরিয়া ওভারব্রিজ-এর ওপর উঠে আসে। ব্রিজ-এর নীচে একটা পুলিশ দু হাত দুদিকে ছড়িয়ে তার গাড়িতে থামবার ইঙ্গিত করে। গ্রাহ্য না করে জীবন বেরিয়ে যেতে থাকে। অপর্ণা পিছু ফিরে দেখে বলে 'তোমার নম্বর টুকে নিল।' বলতে-বলতেই আবার কেঁদে ফেলে অপর্ণা, 'তোমার ফাঁসি হওয়া উচিত। তোমার অনেক বছর জেল হওয়া উচিত।' জীবন কথা বলে না। সামনেই যাদবপুরের ঘিঞ্জি বাস ট্রার্মিনাস, বাজার দোকানপাট। একটা লরি দাঁড়িয়ে আছে, পিছনের চাকার কাছে একটা লোক বসে ঠিকঠাক করে কী যেন ঠিক করছে, একটা সাইকেল রিকশা মুখ ফেরাল। জীবন সোজা রাখে তার গাড়ি, রিকশার সামনের চাকা আর লরির পিছনের চাকায় সেই

লোকটার মাঝখান দিয়ে যাওয়ার সময় সে স্পষ্ট টের পায় কিছু একটায় তার গাড়ির ধাক্কা লাগল, একটা চিৎকার শোনা যায়। সে মুখ না ফিরিয়ে জিগ্যেস করল, 'দেখো তো লোকটা মরে গেছে কি না!' কিন্তু অপর্ণা কী বলল শুনতে পেল না জীবন। তার কান মাথা চোখ জুড়ে দপ দপ করে চমকে উঠল একটা রগ। সে জিগ্যেস করল 'কী বলছ?' অপর্ণা অস্ফুট উত্তর দিল। শোনা গেল না। সামনে লোক, অজস্র লোক, সরু রাস্তা, রিকশা লাইন, নীচু দোকান ঘর—এইসব হিজিবিজি ছবির মতো তার চোখে দুলে-দুলে উঠছিল।... একটা বেড়াল...কাল রাতে একটা বেড়াল ফ্রিজ-এর মধ্যে সমস্ত রাত...না মনে পড়ে না, মনে পড়ে না...জীবন দেখল ব্যালকনিতে মধু আর মিঠু দাঁড়িয়ে, মিঠু আর বাবার মতো, মধু তার মায়ের মতো—তারা হাত নাড়ছে, টা-টা, দুর্গা দুর্গা বাবা। অপর্ণা কিছু বলছে? 'কী বলছ তুমি?' সে জিগ্যেস করে, অপর্ণা ভ্রূ কুঁচকে তার দিকে তাকায়, হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে স্টিয়ারিং সোজা রাখাবার চেষ্টা করে। জীবন ঝাঁকুনি খেয়ে আবার ধোঁয়াটে ভাবটুকু কাটিয়ে নেয়। অপর্ণা কাঁদে কী হচ্ছে...এবার তুমি মাথা খারাপ করছ। চারজনকে ধাক্কা দিলে পর পর। ওরা ঢিল ছুড়ছে, গালাগাল দিচ্ছে।' বাস্তবিক ঢিল এসে পড়ছিল, পিছনে লোক দৌড়ে আসছে, সামনের দিকে একটা লোক বাঁশ তুলে চিৎকার করছে 'মাইরা ফালামু...।' জীবন ক্লান্ত গলায় বলল, 'এত লোক কেন বলো তো! কেন এত অসংখ্য লোক! ইচ্ছে করে খুন করে ফেলি।' জীবন বাঁশ হাতে লোকটাকে পুরোপুরি এড়াতে পারল না, গাড়ির জানালা দিয়ে লোকটা বাঁশ ঢুকিয়ে দিয়ে সরে গেল। বাঁশের নোংরা ধারালো মুখটা তার গাল আর থুঁতনি কেটে, গলায় ধাক্কা দিয়ে প্রচণ্ড শব্দ করে আবার বাইরে বেরিয়ে গেল। জীবন সিটের ওপর পড়ে গিয়ে সঙ্গে-সঙ্গে আবার উঠে বসে। মাথা নীচু রাখবার চেষ্টা করে। তার চোখের সামনে হিজিবিজি, হিজিবিজি দোকানপাট, টেলিগ্রাফের পোস্ট, সিনেমার বিজ্ঞাপন আর অজস্র মানুষের মুখ একটা ধোঁয়াটে আচ্ছন্নতার ভিতরে সরে যেতে থাকে। তার মাথা টলতে থাকে, ঘুড়ির মতো লাট খায়, সে সব ভুলে একবার সিগারেটের জন্য স্টিয়ারিং ছেড়ে হাত বাড়ায়, আবার স্টিয়ারিং চেপে ধরে। অপর্ণা কেবলই কী যেন বলছে, সে বুঝতে পারছে না। এখনও তার ট্যাঙ্ক ভর্তি পেট্রল। সে কলকল শব্দ শুনতে পাচ্ছে। ক্রমে বাঘাযতীন, বৈষ্ণবঘাটা পেরিয়ে যায় জীবন। গাড়িয়ার পর হু-হু করে রাস্তা। কিন্তু জীবনের কাছে ক্রমে সবকিছুই আবছা হয়ে আসছিল। হঠাৎ জীবন যেন শেষ চেষ্টায় ব্রেকে পা দেয়, তারপর স্টিয়ারিং ছেড়ে দু হাত শূন্যে তুলে বলে 'অপর্ণা, আমি আর পারছি না, পারছি না...', গাড়ি বেঁকে গেল, রাস্তার ঢাল বেয়ে নেমে এল মাঠের ওপর। উঁচু-নীচু খোয়াইয়ের মতো জমির ওপর দিয়ে কয়েক গজ এগিয়ে কাত হয়ে থেমে পড়ল।

আস্তে-আস্তে চোখ খোলে জীবন। অপর্ণা গাড়ির ছোট্ট ফাঁকটুকু দিয়ে মেঝের ওপর পড়ে গেছে। ছোট্ট ছাইরঙা একটা পুঁটলির মতো দেখাচ্ছে তাকে। জীবন আপন মনে হাসে, দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়ায়। এখনও সকালের মতো নরম রোদ, ধান কেটে নিয়ে যাওয়া খেত। জীবন হাত-পা ছড়িয়ে একটু দাঁড়ায়, তারপর এসে দরজা খুলে অপর্ণাকে বের করে, মাঠের ওপর শুইয়ে দেয়। আস্তে আস্তে ঝাঁকুনি দেয় তাকে 'অপর্ণা, এই অপর্ণা...' গালে থুতনিতে তীব্র জ্বালা টের পায় সে। গলায় ডেলা পাকানো ব্যথা। মাথা এখনও অল্প ধোঁয়াটে। অপর্ণা চোখ খোলে, অনেকক্ষণ জীবনের দিকে অর্থহীন চেয়ে থাকে। জীবন হাসে 'ওঠো। উঠে বোসো। আমরা বেঁচে আছি।'

অপর্ণার চোখ জীবনের মুখ থেকে সরে আকাশের ওপর কয়েক মুহূর্তের জন্য উড়ে যায়। তারপর আঁচল সামলে সে উঠে বসে। তার মুখের কঠিন, একটু নিষ্ঠুর অথচ সুন্দর পাথরের মতো প্রোফাইল ঘাসের সবুজ পশ্চাৎভূমিতে জেগে ওঠে। জীবনের মন গুন গুন করে ওঠে 'ঝরনা, তোমার স্ফটিক জলের স্বচ্ছ ধারা...' অপর্ণা দাঁড়িয়ে বলে 'এবার, তাহলে?' জীবনের দিকে চায় 'তোমার মুখের ডানদিক কী ভীষণ ফুলে লাল হয়ে আছে, কেটে গেছে অনেকটা!' জীবন হাতে অবহেলার ভাব ফুটিয়ে বলে 'ও কিছু না।' রাস্তা থেকে জমি পর্যন্ত এমন কিছু ঢালু নয়। জীবন ভেবে দেখে সে একাই গাড়িটা ঠেলে তুলতে পারবে। কয়েকজন পথ চলতি লোক দাঁড়িয়ে গেছে, মাঠের ওপর দিয়ে দূর থেকে দৌড়ে আসছে কয়েকটা কালো কালো ছেলেমেয়ে। জীবন অপর্ণাকে বলে 'তুমি একা পারবে কেন?' 'পারব।' অপর্ণা মাথা নাড়ে 'তা হয় না।' পরমুহূর্তেই একটু অদ্ভুত নিষ্ঠুর হাসি হাসে সে 'এক সঙ্গেই মরতে যাচ্ছিলুম দুজনে। তা ছাড়া আমি তো তোমার সহধর্মিনীও, অনেক কিছুই ভাগ করে নেওয়ার কথা আমাদের।' বলতে-বলতে সে কোমরে আঁচল জড়ায়, গাড়িতে 'হেইঁয়ো' বলে ঠেলা দেয়, রাস্তার লোকেরাও কয়েকজন নেমে আসে। 'কোথায় যাবে এটাকে নিয়ে!' জীবন চিন্তিত মুখে বলে কিছু দূরেই বোধহয় একটা পেট্রল পাম্প আছে।' যারা ঠেলছিল তাদের একজন সায় দেয়, 'হাঁ, আছে।'

বুড়ো মেকানিক খোলা বনেটের ভিতর থেকে মুখ তুলে জীবনের দিকে তাকায় 'কই! কিছু পাচ্ছি না তো! কোনও গোলমাল নেই ইঞ্জিনে।' জীবন চিন্তিত মুখে তাকিয়ে থাকে, তারপর বলে 'আমি জানি যে কোনও গোলমাল নেই।' মেকানিক ঝাড়নে হাত মোছে 'চালিয়ে দেখব?' জীবন মাথা নাড়ল 'না।' বলল 'বোধহয় হর্নটায় একটু...', মেকানিক বলল, 'কানেকশনের গোলমাল? আচ্ছা দেখছি' কয়েক মিনিটেই কাজ সারা হয়ে গেল। অপর্ণা পেট্রল পাম্পের অফিস ঘরে বসে ছিল। জীবন ডাকতেই উঠে এসে গাড়ির কাছে

একটু থমকে দাঁড়াল। জীবন তাকিয়ে ছিল। একটুও দ্বিধা না করে অপর্ণা গাড়িতে উঠে বসল। জীবন গাড়ি স্টার্ট দেয়।

সারা রাস্তায় আর কথা হয় না দুজনে।

সন্ধেবেলায় জীবন বসবার ঘরে সোফায় জানালার দিকে মুখ রেখে এলিয়ে পড়ে ছিল। মধু আর মিঠু আতরের সঙ্গে বেড়াতে গেছে পার্কে। জীবন মনে মনে ওদের জন্যেই অপেক্ষা করছিল। অপর্ণা এসে সামনেই দাঁড়াল। জীবন একবার চেয়ে চোখ ফিরিয়ে নেয়।

অপর্ণা জানালার থাকের ওপর বসে বলে 'তোমার সঙ্গে একটা কথা ছিল।'

জীবন দু'আঙুলে কপাল টিপে রেখে বলে 'বলো।'

অপর্ণার মুখ খুবই গম্ভীর 'যখন পেট্রল পাম্পে বসে ছিলুম, তখন ওখানকার লোকটার সঙ্গে কথা হল আমার। আমি গাড়ির কিছুই বুঝি না, কিন্তু লোকটাকে যখন আমাদের গাড়ির গোলমালের কথা বললুম, তখন সে খুব অবাক হয়ে বলল অত গোলমাল এক সঙ্গে একটা গাড়ির হতে পারে না। গাড়ি থামাবার অনেক উপায় নাকি ছিল।'

জীবন হাসে 'ঠিক। সে কথা ঠিক।'

'তবে গাড়ি থামেনি কেন?'

জীবন মাথা নাড়ে 'গাড়ি থামেনি গাড়ি থামানো হয়নি বলে।'

'কেন? তুমি কি ঠিক করেছিলে আমাকে নিয়ে সহমরণে যাবে! না কি এ তোমার খেলা?'

জীবন অস্থির চোখে অপর্ণাকে দেখে, 'খেলা!' পরমুহূÓর্তেই মুখ নীচু করে মাথা নাড়ে আবার 'কি জানি কেন আমি গাড়ি থামাতে পারিনি। থামানো সম্ভব ছিল না—এইমাত্র।'

'কেন?'

'কেন!' জীবন শূন্য চোখে চারপাশে চায়, ভেবে দেখবার চেষ্টা করে, তারপর অসহায়ভাবে বলে, 'কেন, তা তুমি বুঝবে না।'

ভ্রূ কোঁচকায় অপর্ণা, 'বুঝব না কেন? বোঝাও! আমি বুঝবার জন্য তৈরি।'

জীবন অপর্ণার চোখ এড়িয়ে যায়, কী একটা কথা যেন বলবার ছিল কিন্তু তা খুঁজে পাচ্ছে না সে, তবু সে ম্লান হেসে হালকা গলায় বলে 'তুমি কোনওদিন আমাকে সুন্দর দেখোনি, তাই না! কিন্তু আজ যখন ওই ভিড়ের রাস্তায় প্রতি মুহূর্তে অ্যাকসিডেন্টের ওই

ভয়ের মধ্যেও আমি ঠিক পঁচিশ মাইল স্পিডে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলুম—আমার মনে হয়—তখন আমাকে সুন্দর দেখাচ্ছিল। তুমি দ্যাখোনি।'

জীবন মুগ্ধ চোখে চেয়ে দেখে অপর্ণার মুখ রাগে ঝলমল করে উঠল 'সুন্দর! কীসের সুন্দর! তুমি জানতে না তোমার সংসার আছে? দুটো বাচ্চা শিশু মেয়ে তোমার? তোমার নিজের হাতে তৈরি কারখানা যা অনেক কষ্টে তৈরি করতে হয়েছে? কতগুলো মানুষ তোমার ওপর নির্ভর করে আছে, সে কথা তুমি কী করে ভুলে যাও?'

জীবন বুঝতে পারে সে অপর্ণার সঙ্গে লড়াইয়ে হেরে যাচ্ছে, বস্তুত তার কোনও যুক্তিই নেই, তবু হাসি ঠাট্টার সুর বজায় রাখবার চেষ্টায় সে বলে 'বোধ হয় তোমার কাছে একটু বাহবাও পেয়ে চেয়েছিলুম। তুমি তা দাওনি। কিন্তু মনে রেখো রাস্তার ওই ভিড়, পর পর অত বিপদের মধ্যেও আমি ঠিক পঁচিশ মাইল স্পিডে গাড়ি চালিয়ে গেছি, একবারও থামিনি। মনে রেখো, একবারও থামিনি।'

রাস্তার একটা ন্যাংটো পাগলের দিকে লোকে যেভাবে তাকায়, সেভাবেই অপর্ণা জীবনের দিকে এক পলক চেয়ে চোখ ফিরিয়ে নেয়, তারপর এই প্রথম সে জীবনকে নাম ধরে ডাকে 'জীবন, তুমি ছিলে রাস্তার ছেলে, প্রায় ভিখিরি। তোমার সঙ্গে কোনও ব্যাপারেই আমার মিল নেই। ভাগ্য তোমাকে এত দূর এনেছে। তবু আজ ওই কাণ্ড করে তুমি সব কিছু ভেঙে তছনছ করে দিতে চেয়েছিলে। ডোবাতে চেয়েছিলে নিজেকে, আমাদেরও। এর জন্যই কি তুমি বাহবা চাও?'

জীবনের মাথার ভিতরে ঘোলা জল টলমল করে ওঠে। অপর্ণার কথার ভিতরে কোথায় যেন একটু সত্য ছিল, কিন্তু জীবন তা ধরতে পারে না। তার প্রাণপণ ইচ্ছে হয় অপর্ণার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে বলে—তুমি ঠিক বলছ অপর্ণা। ঠিক বলছ। এই ঘর-বাড়ি-সংসার আমার নিজের বলে মনে হয় না। এখানকার খাবারে আমি এক কণা স্বাদ পাই না। আমার কেবলই ইচ্ছে এই সব কিছুর বুকের ওপর দিয়ে একবার জোরে চালিয়ে দিই, আমার গাড়ি। কিন্তু সেসব কিছুই বলে না জীবন, মুখে মৃদু হাসি টেনে আনে, তেমনই ঠাট্টার সুরে বলল, 'জীবনে সে কয়টি মুহূর্তই দামি যে সব মুহূর্তে মানুষ মানুষকে সুন্দর দেখে। জন্ম থেকে তুমি কি কেবলই শিখেছ কী করে নিরাপদে দীর্ঘকাল বেঁচে থাকা যায়?'

মাথার ভিতরে, বুকের ভিতরে এক অদ্ভুত অস্থিরতা বোধ করে জীবন। অপর্ণা নিষ্ঠুর ধারাল চোখে কিছুক্ষণ চুপ করে তার দিকে চেয়ে থাকে, তারপর সামান্য বিদ্রূপের মতো করে বলে যায়, আমাদের কাবলি বেড়ালটারও সেই দামি মুহূর্ত বোধ হয় কাল রাতে এসেছিল যখন তাকে তুমি সুন্দর দেখেছিলে। আমি, আর তোমার দুই মেয়েও তো সুন্দর

জীবন, তাদের জন্য এবার একটা বড় দেখে ফ্রিজ কেনো, দোহাই, জোরে গাড়ি চালিয়ে নাটক কোরো না।'

হঠাৎ তীব্র এক অসহায়তা সঙ্গীহীন জীবনকে পেয়ে বসে। তার মাথার ভিতরে কল চলবার শব্দ, বুকের ভিতরে কেবলই একটা রবারের বল লাফিয়ে ওঠে। তবু তার এই কথা বলবার ইচ্ছে হয়—ঠিক, তুমি ঠিকই বলছ অপর্ণা। আমার ওই রকমই মনে হয়। এই সব ভেঙেচুরে শেষ করে দিয়ে আমার আবার ফিরে যেতে ইচ্ছে করে ছেলেবেলার সেই চায়ের দোকানের উনুনের পাশে, চট আর ছেঁড়া শতরঞ্জির বিছানায়, যেখানে দুঃখী রোগা এক মায়াবী বেড়াল আমার শিয়রের কাছে শুয়ে থাকবে সারা রাত। কিংবা ফিরে যেতে ইচ্ছে করে সেই মোটর সারাই কারখানায়, যেখানে লোহার জোড় মেলাতে মেলাতে আমি কৃষ্ণচূড়া গাছে ফুল দেখে গান গাইব আবার। হ্যাঁ, অপর্ণা, আমি এখনও ছোটলোক, ভিখিরি। মুখে মৃদু হাসল জীবন, তার মুখ সাদা দেখাচ্ছিল, কোনওক্রমে সে গলার স্বরে এখনও সেই ঠাট্টার সুর বজায় রাখছিল, 'কে জানে তোমার কাবলি বেড়ালটাও আত্মহত্যা করেছিল কি না!'

অপর্ণা কী বলতে যাচ্ছিল, হাত তুলে জীবন বলে 'চুপ, অপর্ণা!' তারপর লিত গলায় বলে, 'তুমি সহমরণের কথা বলছিলে না! ধরে নাও আজ আমি তোমাকে সহমরণেই নিতে যেতে চেয়েছিলুম। তুমি বুঝবে কি এসব অপর্ণা?'

অপর্ণা মাথা নাড়ে—না। তার চোখে জল, মুখের প্রতিটি রেখায় রাগ আর আক্রোশ। সে জীবনের দিক থেকে দ্রুত মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে উঠে চলে যায়। জীবন বাধা দেয় না। শুধু এতক্ষণ অপর্ণা যে জায়গায় বসেছিল সেইখানে গভীর চোখে চেয়ে থাকে, যেন এখনও অপর্ণা বসে আছে।

ঘরে কেউ ছিল না, তবু হঠাৎ জীবন চমকে উঠে বলে 'কে?' তারপর শূন্য চোখে চারদিকে চায়। সিগারেট আর দেশলাইয়ের জন্য চারিদিকে হাতড়ে দেখে। বড় ক্লান্তি লাগে জীবনের। এলোমেলো অনেক কথা তার ভিতর থেকে ঠেলে আসতে চায়। মাথার ভিতরে ঘোলা জল টলমল করতে থাকে। সে ভীষণ অন্যমনস্কের মতে বলে 'আঃ, অপর্ণা...' পরমুহূর্তেই চমকে ওঠে 'কেউ কি আছ?' কেউ ছিল না, তবু জীবন একবার পরম বিশ্বাসে দুটো হাত আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে শূন্যে তুলে ধরে, যেন ভিক্ষুকের মতো বলতে চায়—আমাকে নাও।

দরজার কাছ থেকে মিঠু ডাকে, 'বাবা!'

অলীক আত্মসমর্পণের এক শূন্যতা থেকে জীবন আবার শব্দ, গন্ধ ও স্পর্শের বাস্তবতার ভিতরে দ্রুত ফিরে আসে।

কীট

একদিন নীলা চলে .গল।

একদিন-না-একদিন চলে যাওয়ার কথাই ছিল নীলার। তাই না যাওয়া এবং যাওয়ার মধ্যে খুব একটা তফাত হল না। সুবোধ নিজেই গিয়েছিল হাওড়া স্টেশনে নীলাকে গাড়িতে তুলে দিতে। বিদায় মুহূর্তে স্বামী-স্ত্রীর যেমন কথা হয় তেমন কিছুই হল না। রুমাল উড়ল না, চোখের জল পড়ল না, এমন কি গাড়ি যখন ছেড়ে যাচ্ছে তখন জানালায় নীলার উৎসুক মুখও দেখা গেল না।

নীলা গেল তার বাপের বাড়ি মধুপুরে। সেখানেই থাকবে, না আর কোথাও যাবে তার কিছুই জানল না সুবোধ। শুধু জানল নীলার ফিরে আসার সম্ভাবনা নেই; অনেকদিন থেকেই বোঝা যাচ্ছিল এরকমটাই হবে। খুব শান্তিপূর্ণভাবেই শেষ পর্যন্ত ঘটে গেল ব্যাপারটা।

খুব যে খারাপ লাগল সুবোধের—তা নয়। ভালোও লাগল না অবশ্য। তার সম্মানের পক্ষে, পৌরুষের পক্ষে ব্যাপারটা মোটেই ভালো নয়। কত লোকের কত জিজ্ঞাসাই যে এখন তার ঘরে উঁকি মারবে তা ভাবতেও ভয় লাগা উচিত। তবু সব ভেবেও সুবোধের মন শান্তই রইল। খুবই শান্ত। বাসে জানালার ধারের বসবার জায়গায় গঙ্গার সুন্দর হাওয়া এসে লাগছিল। এখন বসন্তকাল। কলকাতায় চোরা-গরম শুরু হয়ে গেছে। বাতাসটুকু বড় ভালো লাগল সুবোধের। লোহার প্রকাণ্ড জালের মধ্যে দিয়ে সে উৎসুক চোখে গঙ্গার ঘোলা রূপ, নৌকো, জাহাজের মাস্তুল আর কলকাতায় প্রকৃতিশূন্য আকাশরেখায় প্রকাণ্ড বাড়িগুলোর জ্যামিতিক শীর্ষগুলি দেখল। মনোযোগ দিয়ে দেখল, দেখায় কোনও অন্যমনস্কতা এল না। ভালোই লাগল তার। এমন অসলভাবে আয়েসের সঙ্গে অনেককাল কিছু দেখেনি সে। বিয়ের পর থেকেই তার মন ব্যস্ত ছিল, গত দশ বছর ধরে সেই ব্যস্ততা, সেই উৎকণ্ঠা আর বিষণ্ণতা নিয়েই সে সবকিছু দেখেছে। আর দশ বছর পর সেই

ব্যস্ততা হঠাৎ কেটে গেছে। বড় স্বাভাবিক লাগছে সবকিছু। বহুকালের চেনা পুরোনো কলকাতার হারানো চেহারাটি হঠাৎ তার চোখে আবার ফিরে এসেছে আজ।

অনেকক্ষণ ধরে চলল বাস। ট্রাফিকের লাল বাতি, মন্থরগতি ট্রাম, রাস্তা পেরোনো মানুষের বাধা। সময় লাগল, কিন্তু অস্থির হল না সুবোধ। কোনওখানে পৌঁছনোর কোনও তাড়া নেই বলে জানালার বাইরে তাকিয়ে ঘিঞ্জি ফুটপাথ, দোকানের সাইনবোর্ড, দোতলা বাড়ির জানালায় কোনও দৃশ্য—কত কি দেখতে-দেখতে মগ্ন হয়ে রইল।

সন্ধ্যের মুখে ঘরে এসে তালা খুলল সে। বাতি জ্বালল, জামাকাপড় ছাড়ল, হাত-মুখ ধুল, চুল আঁচড়াল, তারপর একখানা চেয়ার টেনে জানালার পাশে বসে পরদা সরিয়ে বাইরে তাকাল। বাইরে দেখার কিছু নেই। ঢাকুরিয়া বড় ম্যাডম্যাড়ে জায়গা, প্রায় আট বছরের টানা বসবাসে এ জায়গার সব রহস্য নষ্ট হয়ে গেছে। চেনাশুনোও বেড়েছে অনেক। এবার জায়গাটা ছাড়া দরকার। দু-এক মাসের মধ্যেই। যতদিন নীলার বাপের বাড়ি থাকাটা লোকের চোখে স্বাভাবিক দেখায় ততদিনই নিরুদ্বেগে থাকতে পারে সুবোধ।

তারপর অচেনা একটা পাড়ায় তাকে উঠে যেতে হবে।

ঘরের দিকে চেয়ে দেখল সুবোধ। জিনিসপত্র বেশি কিছু নিয়ে যায়নি নীলা, কেবল তার নিজস্ব জিনিসপত্র ছাড়া। তাই ঘরটা যেমন ছিল প্রায় তেমনই আছে। কেবল আলনায় নীলার শাড়িগুলোর রঙের বাহার দেখা যাচ্ছে না, আয়নার টেবিলে রূপটানের শিশিকৌটোগুলোও নেই। তাই তফাতটা খুব চোখে পড়ে না। যেমন নীলার থাকা এবং না থাকার মধ্যে নিজের মনের তফাতটাও সে ধরতে পারছে না।

না, ব্যাপারটা মোটেই ভালো হল না। গভীরভাবে ভাবলে এর মধ্যে লজ্জার-ঘেন্নার অনেক কিছু খুঁটিনাটি তার লক্ষে পড়বে। মন-খারাপ হওয়ার মতো অনেক স্মৃতি। তবু কী এক রহস্যময় কারণে মনটা হালকা লাগছিল সুবোধের। জানালার কাছে বসে রইল, সিগারেট খেল। নীলা থাকলে এখানে বসেই এক কাপ চা পাওয়া যেত। সেটাই কেবল হচ্ছে না। মাত্র এক কাপ চায়ের তফাত। তবে চা করার একটা লোক রাখলেই তো তফাতটুকু বুজে যায়। ভেবে একটু হাসল সুবোধ। হাতঘড়িতে প্রায় আটটা বাজল। তাদের রান্নার লোক নেই, নীলাই রাঁধত। সুবোধ ভেবেছিল হোটেলে খেয়ে আসবে। তারপর ভাবল হোটেলে খেতে গেলে তফাতটুকু আরও বেশি মনে পড়বে। তাই সে ঠিক করল রান্নার চেষ্টা করলেই হয়।

রান্নাঘরে একটা প্রেসার কুকার ছিল। কেরোসিনের স্টোভে সেইটেতে ভাতে ভাত রান্না করে খেল সুবোধ। দেখল এই সামান্য রান্নাটুকুতেই সমস্ত রান্নাঘরটা সে ওলটপালট করে

দিয়েছে। আবার সেই তফাত! সুবোধ আপনমনে হাসল। তারপর বিছানা ঝাড়ল, মশারি টাঙাল, বাতি নেভাল—এইসব কাজই ছিল নীলার। শুয়ে-শুয়ে সে অনেকক্ষণ মশারির মধ্যে সিগারেট খেল সাবধানে। ঘুম এল না। নীলা মাঝরাতে পৌঁছবে আসানসোলে। সেখানে ওর জামাইবাবুকে খবর দেওয়া আছে, ওকে নামিয়ে নেবে। কয়েকদিন পরে যাবে মধুপুরে। নীলার এখন বোধহয় সুখের সময়। ঘুরে-ঘুরে বেড়াবে খুব। এখন এই রাত এগারোটায় নীলা কোথায়! কী করছে নীলা! ভাবতে-ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ল। কাল থেকে তার ঝরঝরে একার জীবন শুরু হবে। মাত্র ছত্রিশ বছর তার বয়স, এখন নতুন করে সবকিছুই শুরু করা যাক। সময় আছে।

সকালে ঘুম ভাঙলে তার মনে পড়ল সারারাত সে অস্বস্তিকর সব স্বপ্ন দেখেছে। অধিকাংশ স্বপ্নেই নীলা ছিল। একটা স্বপ্নে সে দেখল—সে অফিস থেকে ফিরে এসেছে। এসে দেখছে ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। সে দরজার কড়া না নেড়ে দরজার গায়ে কান পাতল। ভিতরে নীলা আর একজন পুরুষ কথা বলছে। মৃদু স্বরে কথা, সে ভালো বুঝতে পারছে না, প্রাণপণে শোনার চেষ্টা করল সে। বুঝল কথাবার্তার ধরন খুবই অন্তরঙ্গ। ভয়ঙ্কর রেগে গিয়ে দরজায় ধাক্কা দিল সুবোধ, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, তার হাত এত দুর্বল লাগছিল যে মোটেই শব্দ হল না। ভিতরে কথাবার্তা তেমনিই চলতে লাগলে, সে চিৎকার করে নীলাকে ডাকল—দরজা খোলো, বলতে গিয়ে সে টের পেল, সে মোটেই চিৎকার করতে পারছে না। 'দরজা খোলো' বলতে গিয়ে সে ফিসফিস করে বলছে 'জোরে কথা বলো।' এরকম বারবার হতে লাগল। এত হতাশ লাগল তার যে ইচ্ছে করছিল দরজার সামনেই সে আত্মহত্যা করে। ভাবতে-ভাবতে সে একই সঙ্গে চিৎকার করে দরজায় ধাক্কা দিচ্ছিল। অবশেষে দরজায় মৃদু শব্দ হল, থেমে গেল ভিতরের অন্তরঙ্গ কথা, তারপর হঠাৎ দরজা খুলে গেল। বিশাল শরীরওলা একজন পুরুষ দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যেতে লাগল। চমকে উঠল সুবোধ। চেনা লোক—মনোমোহন। তার অনেকদিন আগেকার বন্ধু। হায় ঈশ্বর! মনোমোহন কোথা থেকে কী করে যে এল। রাগে দুঃখে ঘেন্নায় লাফিয়ে উঠে মনোমোহনের পিছু নেওয়ার চেষ্টা করল সুবোধ। কিন্তু পারল না। পা আটকে যাচ্ছিল, যেন এক হাঁটু জল ভেঙে সে দৌড়োবার চেষ্টা করছে। মনোমোহন দু'তিন লাফে অদৃশ্য হয়ে গেল। সে পিছু ফিরে দেখল, নীলা অসংবৃত শাড়ি পরে দরজায় দাঁড়িয়ে নিস্পৃহ মুখে তার খোলা চুলের ভিতরে আঙুল দিয়ে জট ছাড়াচ্ছে। কাকে যে আক্রমণ করবে সুবোধ, তা সে নিজে বুঝতে পারছিল না। রাগ দুঃখ ঘেন্নার সঙ্গে-সঙ্গে হিংস্র একটা আনন্দকেও সে টের পাচ্ছিল। পাওয়া গেছে, নীলাকে এতদিনে সুবিধেমতো পাওয়া গেছে। এইরকম স্বপ্ন আরও দেখেছে সে রাতে। কখনও নীলাকে অন্য পুরুষের সাথে দেখা গেল, কখনও বা দেখা গেল নীলা এরোপ্লেনে বা নৌকোয় দূরে কোথাও চলে যাচ্ছে।

সকালের উজ্জ্বল আলোয় জেগে উঠে সুবোধ স্বপ্নগুলোর কথা ভেবে সামান্য জ্বালা অনুভব করল বুকে। বস্তুত নীলার সঙ্গে কারও প্রেম ছিল এটা এখনও পর্যন্ত প্রমাণসাপেক্ষ। মনোমোহনের স্বপ্নটা একেবারেই বাজে। কারণ নীলার সঙ্গে তার বিয়ের অনেক আগে থেকেই মনোমোহনের সঙ্গে পরিচয়। মনোমোহনের সঙ্গে আর দেখা হয় না সুবোধের। মনোমোহন বোধহয় এখন পুলিশে চাকরি করে—তার ঘর সংসার আছে, সে নিরীহ মানুষ। স্বপ্নে যে কত অঘটন ঘটে!

তবু বুকে মনে কোথাও একটু জ্বালার ভাব ছিলই সুবোধের। স্টোভ জ্বেলে সে চা করল। চা-টা তেমন জমল না, লিকার পাতলা হয়েছে, চিনি বেশি। সেই চা খেয়ে সকালবেলাটা কাটাল সে। ঝি এসে বাসন-কোসন মেজে দিয়ে গেছে, তবু নিজে আজ আর রান্না করবে না সুবোধ। আজ ছুটির দিন—রবিবার। দুপুরে গিয়ে কোনও হোটেলে খেয়ে আসবে। সকালবেলাটায় সে ঘরের কোথায় কী আছে তা ঘুরে-ঘুরে দেখল। এখন সবকিছু তাকেই দেখতে হবে। নিজেকে নিজেই চালাতে হবে তার। ব্যাপারটা যে খুব সুবিধেজনক হবে না—তা বোঝা যাচ্ছিল। বিয়ের আগে সে ছিল মা বোন বউদিদের ওপর নির্ভরশীল। বিয়ের বছর দুয়েকের মধ্যেই গড়পাড়ের সেই যৌথ সংসার ছেড়ে চলে এল ঢাকুরিয়ায় নীলাকে নিয়ে। কখনও সে একা থাকেনি বিশেষ। যে কয়েকবার নীলা একটু বেশি দিনের জন্য বাপের বাড়ি গেছে সে কয়েকবারই মাকে নিজের কাছে নিয়ে এসেছে সুবোধ। কাজেই এখন একা-একা সংসারের মতো কিছু চালানো তার পক্ষে মুশকিল। মাকেও আর আনা যায় না—বাতে অম্বলে এই বুড়োবয়সে মা বড় জবুথুবু হয়ে গেছে। তা ছাড়া মাকে আনলেও স্থায়ীভাবে আনা যায় না, গড়পাড়ের সংসার ছেড়ে মা এখানে থাকতেও চাইবে না বেশিদিন। এর ওপর আছে মায়ের অনুসন্ধানী চোখ—এক লহমায় বুঝে নেবে যে নীলা আর আসবে না।

নীলা আর আসবে না ভাবতেই সকালবেলায় একটু কষ্ট হল সুবোধের। কষ্টটা নিতান্তই অভ্যাসজনিত। দশ বছর একসঙ্গে বসবাস করার অভ্যাসের ফল। নীলা না থাকলে হরেকরকমের অসুবিধা। সেই অসুবিধেটুকু বাদ দিলে মনটা বেশ তাজা লাগল তার। বেলা বাড়লে রাতের স্বপ্নগুলোর মধ্যে একমাত্র মনোমোহনের স্বপ্নটা ছাড়া আর কোনও স্বপ্নই তার মনে থাকল না। মনোমোহনের সঙ্গে নীলার কিছুই ছিল না—সুবোধ জানে। তবু স্বপ্নটার মধ্যে বিশ্বাসযোগ্য একটা কিছু আছে বলেই তার মনে হচ্ছিল। হয়তো এই ঘরে, তার এই সংসারের মধ্যে থেকেও নীলা কখনও ঠিক পুরোপুরি সুবোধের ছিল না। বিয়ের মাসখানেকের মধ্যেই সুবোধের এইরকম ধারণা শুরু হয়। গড়পাড়ের বাড়িতে বাচ্চা ছেলেমেয়ের অভাব ছিল না। দুই দাদার গোটা পাঁচেক ছেলেমেয়ে। তাদের মধ্যে যাদের বুদ্ধি তেমন পাকেনি তাদের কাছে সে প্রায়ই গোপনে জিগ্যেস করত, সে অফিসে

চলে গেলে নীলা কী কী করে, বিকেলে ছাদে যায় কিনা, নীলার নামে কোনও চিঠি এসেছিল কি না। বস্তুত কেন যে সেসব জিজ্ঞাসা করত সুবোধ তা স্পষ্টভাবে নিজে আজও জানে না। বাপের বাড়ির কোনও লোক এসে নীলার খোঁজ করলে সে বিরক্ত হত। কখনও-কখনও ঠাট্টার ছলে সে নীলাকে জিগ্যেসও করেছে বিয়ের আগে নীলার জীবনে কে কে পুরুষ এসেছে। সুবোধের মনের গতি তখনও ধরতে পারেনি নীলা, তাই ঠাট্টা করেই উত্তর দিত—ছিল তো, সে তোমার চেয়ে অনেক ভালো। ঠাট্টা জেনেও মনে-মনে ম্লান হয়ে যেত সুবোধ। বিয়ের বছরখানেকের মধ্যেই বাড়িতে একটা গণ্ডগোল শুরু হল মেজদাকে নিয়ে। মেজদার কারখানায় গণ্ডগোল হয়ে লক-আউট হয়ে গেল। ছ'মাস পরে কারখানাটা হাতবদল হয়ে গেল। মেজদা পুরোপুরি বেকার তখন। লোকটা ছিল বরাবরই একটু বন্য ধরনের, হইচই করা মাথা-মোটা গোঁয়ার মানুষ। চাকরি গেলে এসব লোকের সচরাচর যা হয় তাই হল। বাংলা মদ খেয়ে রাত করে বাসায় ফিরত। গোলমাল বা চেঁচামেচি করত না, কিন্তু মাঝে-মাঝেই কান্নাকাটি করত অনেক রাত পর্যন্ত। তিন ঘরের ছোট্ট বাসাটায় ঠাসাঠাসি লোকজনের মধ্যে ব্যাপারটা বিশ্রী হয়ে দাঁড়াল। মেজদার মদ খাওয়ার স্বভাব ছিলই, কিন্তু আগে মাত্রা রেখে খেত, পুজো পার্বণ বা অন্য উপলক্ষ্যে বেশি খাওয়া হয়ে গেলে বাসায় ফিরত না। কিন্তু চাকরি যাওয়ার পর লোকটাকে রোজই মাত্রার বেশিই খেতে হত, আর বাসা ছাড়া অন্য জায়গাও ছিল না তার। প্রতি রাত্রেই মেজদাকে গালাগাল করত সবাই, মা বলত—ওকে রাতে ঘরে ঢুকতে দিস না। বউদি সামলাত বটে, কিন্তু কিছুদিন পর বউদিরও ধৈর্য থাকল না। কিছুদিনের জন্য বাপের বাড়ি চলে গেল বউদি। সে সময়ে সত্যিই মুশকিল হল মেজদাকে নিয়ে। তাকে সামলানোর লোক কেউ রইল না। মাঝে-মাঝে সদরের বাইরেই সারারাত শুয়ে থাকত মেজদা। দরজা খুলত না কেউই। সে সময়ে এক বৃষ্টির রাতে নীলা উঠে গিয়ে মেজদাকে দরজা খুলে দিয়েছিল। সুবোধ জেগে থাকলে নীলাকে এ কাজ করতে দিত না। যখন জাগল তখন নীলা উঠে গিয়ে দরজা খুলছে। রাগে উত্তেজনায় কাঁপতে-কাঁপতে উঠে ঘরের দরজার সামনে গিয়ে নীলাকে ধরল সুবোধ—কোথায় গিয়েছিলে? নীলা দুর্বল গলায় উত্তর দিল—মেজদাকে দরজা খুলে দিতে। ভীষণ রেগে গিয়ে সুবোধ চেঁচিয়ে বলল—কী দরকার তোমার? মাতাল, লোফার, লুম্পেন ওই ছোটলোকটার কাছাকাছি তুমি কেন গিয়েছিলে? সে কেন তোমার গায়ে হাত দিল? নীলা এবার অবাক হয়ে বলল—গায়ে হাত দিল। কই, না তো। সুবোধ তবু চেঁচিয়ে বলল—আমি নিজে দেখেছি সে তোমার হাত ধরে আছে। অন্ধকারে নীলার মুখের রং দেখা গেল না, নীলা একটু চুপ করে থেকে বলল—চেঁচিও না। বিছানায় চল। বলে দরজায় খিল দিল নীলা। সুবোধের সমস্ত শরীর জ্বলে গেল। সে বলল—কেন গিয়েছিলে? তোমাকে আমি বারণ করিনি ওই লোফারটার কাছাকাছি কখনও যাবে না? নীলা সামান্য হাঁফ ধরা গলায় বলল—দরজা খুলে না দিলে উনি সারারাত বৃষ্টিতে

ভিজতেন। সুবোধ ছিটকে উঠল—তাতে কী হত! মাতালের সর্দি লাগে না। কিন্তু তাকে তুমি প্রশ্রয় দাও কেন? এ বাসায় তার আপনজন কেউ নেই? লোফারটা তোমার হাত...। সামান্য কঠিন হল এবার নীলার গলা—তুমি নিজে দেখেছ? বাস্তবিক সুবোধ কিছুই দেখেনি, সে উঠে দেখেছে নীলা ঘরে ফিরে আসছে, তবু কেন যেন তার মনে হয়েছিল ওরকম কিছু একটা হয়েছে। তাই সে গলার তেজ বজায় রেখে বলল—হ্যাঁ, দেখেছি। নীলা আস্তে-আস্তে বলল—উনি মাতাল অবস্থাতেও চিনতে পেরে আমায় বললেন—তোমাকে কষ্ট দিলাম বউমা। আমার হাতে ওঁর হাত লাগেওনি। সত্যিই কি তুমি নিজে দেখেছ। সুবোধের আর তেমন কিছু বলার ছিল না, তবু সে খানিকক্ষণ গোঁ গোঁ করল। সারারাত ঘুমের মধ্যেও ছটফট করল। জ্বালা যন্ত্রণা হিংস্রতার এক অদ্ভুত মিশ্র অনুভূতি। হাতের কাছেই নীলা, তবু কেন নীলাকে দূরের বলে মনে হচ্ছে কে জানে! পরদিন থেকে ব্যাপারটা অন্য চেহারা নিল। রাতে সুবোধের চিৎকার সবাই শুনেছিল। সম্ভবত হাত ধরার ব্যাপারটা বিশ্বাস করে নিয়েই মা আর বড়দা কিছু বলেছিল মেজদাকে। মেজদার সম্বন্ধে তখন ওরকম কোনও ব্যাপারই অবিশ্বাস্য ছিল না। সুস্থ অবস্থায় সম্ভবত মেজদাও বুঝতে পারছিল না ব্যাপারটা সত্যিই ঘটেছিল কি না। তাই পরদিন থেকেই মেজদা কেমন মিইয়ে গেল। দিনের বেলাতে আর বাসায় থাকতই না। নীলা সুবোধকে এ ব্যাপারে সরাসরি দায়ী করেনি, কিন্তু তখন থেকেই আলাদা বাসা করার জন্য সুবোধকে বলতে শুরু করে নীলা। তাই বিয়ের দু-বছরের মাথায় সুবোধ আলাদা হয়ে এল।

তবু শান্তি ছিল না সুবোধের। যাতায়াতের পথে দেখত রকে বসে পাড়ার ছেলেরা মেয়েদের টিটকিরি দিচ্ছে, পথে ঘাটে দেখত সুন্দর পোশাক পরে সুপুরুষ মানুষেরা যাচ্ছে, কখনও বা বন্ধুদের কাছে শুনত চরিত্রহীনতার নানা রঙদার গল্প। সঙ্গে সঙ্গেই নীলার কথা মনে পড়ত সুবোধের। পৃথিবীতে এত পুরুষমানুষের ভিড় তার পছন্দ হত না। তার ইচ্ছে যত নীলাকে সে সম্পূর্ণ পুরুষশূন্য কোনও এলাকায় নিয়ে গিয়ে বসবাস করে। অফিসে বেরিয়ে বোধহয় সে অনেকবার মাঝপথে বাস থেকে নেমে পড়েছে। মনে বিষের যন্ত্রণা। একটু এদিক ওদিক ঘুরে চুপিচুপি ফিরে এসেছে বাসায়। নিঃসাড়ে সিঁড়ি ভেঙে উঠে এসেছে দোতলায়, দরজায় কান পেতে ভিতের কোনও কথাবার্তা হচ্ছে কি না শুনতে চেষ্টা করেছে। তারপর আস্তে-আস্তে দরজায় কড়া নেড়েছে। প্রায়ই দরজা খুলে নীলা অবাক হত —এ কী, তুমি! খুব চালাকের মতো হাসত সুবোধ, বলত—দূর রোজ অফিস করতে ভালো লাগে? চলো আজ একটা ম্যাটিনি দেখে আসি। শেষের দিকে নীলা হয়তো কিছু টের পেয়েছিল। আর তাকে দেখে অবাক হত না। শক্ত মুখ আর ঠান্ডা চোখে চেয়ে একদিন বলেছিল—চৌকির তলাটলাগুলো ভালো করে দেখে নাও।

ধরা পড়ে মনে-মনে রেগে যেত সুবোধ। নিজের সঙ্গে নিজেই বিজনে ঝগড়া করত—কিন্তু একটা কিছু মনে না হলে আমার মনে এরকম সন্দেহ আসছে কেন! আমার মন বলছে কিছু একটা আছেই। বাইরে থেকে আর কতটুকু বোঝা যায়।

তবু নীলা চোখের জল ফেলেনি কোনওদিন। ঝগড়া করেনি। কেবল দিনে-দিনে আরও গম্ভীর, শীতল, কঠিন হয়ে যাচ্ছিল। সুবোধের ধরা-ছোঁয়ার বাইরেই চলে যাচ্ছিল নীলা। বছর চারেক আগে পেটে বাচ্চা এল তার। তখন আরও রুক্ষ আরও কঠিন দেখাল নীলাকে। হাসপাতালে যাওয়ার কয়েকদিন আগে সে খুব শান্ত গলায় একদিন সুবোধকে বলেছিল—শুনেছি মেয়ের মুখে বাপের ছাপ থাকে, আমার যেন মেয়ে হয়। সুবোধ অবাক হয়ে বলল—কেন? নীলা মৃদু হেসে বলল—তাহলে প্রমাণ থাকবে যে সে ঠিক বাপের মেয়ে। মুখের আদল তো চুরি করা যায় না। মেয়েটা বাঁচেনি। বড় রোগা দুর্বল শরীর নিয়ে জন্মেছিল। আটদিন পর মারা গেল। মুখের আদল তখনও স্পষ্ট হয়নি। কোথায় যেন একটা কাঁটা এখনও খচ করে বেঁধে সুবোধের। নীলা কথাটা যে কেন বলেছিল!

তারপর থেকেই সুবোধ জানত যে নীলা চলে যাবে। আজ কিংবা কাল। আজ কাল করে করেও বছর তিনেক কেটে গেল। খুব অশান্তি কিংবা ঝগড়াঝাঁটি কিছুই হয়নি তাদের মধ্যে। বাইরে শান্তই ছিল তারা। ভিতরে-ভিতরে বাঁধ তুলে দিল কেবল। অবশেষে নীলা চলে গেল কাল।

সারা সকাল কাটল নির্জনতায়, ঘরের মধ্যে! একরকম ভালোই লাগছিল সুবোধের। দশ বছরের উৎকণ্ঠা, বিষণ্ণতা, অস্থিরতা, রাগ—এখন আর তেমন অনুভব করা যায় না। কোনও দুঃখও বোধ করে না সে! সন্দেহ হয় নীলাকে সে কোনওদিন ভালোবেসেছিল কি না। সে বুঝতে পারে না ভালো না বেসে থাকলে নীলার প্রতি ওরকম অদ্ভুত আগ্রহই বা তার কেন ছিল! গত দশবছরে নীলার কথা সে যত ভেবেছে তত আর কারও কথা নয়। দুপুরের দিকে ঘরে তালা দিয়ে সে বেরিয়ে পড়ল। বিয়ের আগে যেমন হঠাকারী দায়িত্বহীন সুন্দর সময় সে কাটিয়েছে সে-রকমই সুন্দর সময় আবার ফিরে এসেছে আজ। বাধাবন্ধনহীন। মনটা ফুরফুরে রঙিন একটি রুমালের মতো উড়ছে। মাত্র ছত্রিশ বছর বয়স তার, সামনে এখনও দীর্ঘ জীবন—দায়দায়িত্বহীন। তার চাকরিটা মাঝারি গোছের। উঁচু থাকের কেরানি। তাদের দুজনের মোটামুটি চলে যেত। এবার একা তার ভালোই চলবে। নীলা টাকা চাইবে না বলেই মনে হয়। চাইলেও দিয়ে দেওয়া যাবে। মোটামুটি নীলার ভাবনা থেকে মুক্তিই পেয়েছে সে। এবার পুরোনো আড্ডাগুলোয় ফিরে যাওয়া যেতে পারে। এবারে গ্রীষ্মে প্রতিটি ফুটবল খেলাই দেখবে সে। রাতের শোয়ে দেখবে সিনেমা। ছুটি পেলেই পাড়ি দেবে কাশ্মীর কিংবা হরিদ্বারে, দক্ষিণ ভারত দেখে আসবে।

এবার থেকে সে মাঝেমধ্যে একটু মদ খাবে। খারাপ মেয়েমানুষের কাছে যায়নি কোনওদিন, এবার একবার যাবে। আর দেখে আসবে ঘোড়দৌড়ের মাঠ। মুক্তি—মুক্তি—তার মন নেচে উঠল।

হোটেলে খেয়ে আর ঘরে ফিরল না সুবোধ। সিনেমায় গেল। দামি টিকিটে বাজে বই দেখে বেরিয়ে গেল কলেজ স্ট্রিটে। ঘিঞ্জি পুরোনো একটা চায়ের দোকানে আট নয় বছর আগেও তাদের জমজমাট আড্ডা ছিল। সেখানে পরপর কয়েক কাপ চা খেয়ে সন্ধে কাটিয়ে দিল সুবোধ। পুরোনো বন্ধুদের কারোই দেখা পেল না। বেরিয়ে পড়ল আবার।

সন্ধে সাতটা। কোথায় পাওয়া যায়!

অনেকদিন আগে সঙ্গীসাথীদের সঙ্গে মাঝেমধ্যে শখ করে মদ খেয়েছে সুবোধ। সঙ্গীছাড়া কোনওদিন খায়নি। মদের দোকানগুলোকে সে ভয় পায়। তবু আজ একটু খেতে ইচ্ছে করছিল তার। উত্তেজনার বড় অভাব বোধ করছিল সে।

বাসে ট্রামে ভিড় ছিল বলে সে হেঁটে-হেঁটে এসপ্ল্যানেডে এল। অনেক মদের দোকানের আশেপাশে ঘুরে দেখল। বেশি বাতি, বেশি লোকজন, হইচই তার পছন্দ নয়। অনেকগুলো দেখে সে গলি-ঘুঁজির মধ্যে একটা ছোট্ট দোকান পছন্দ করে ঢুকল। ভিতরে আলো কম, দু-চারজন লোক বসে আছে এদিক-ওদিক। কাউন্টারের কাছে দাঁড়িয়ে দুটি মেয়ে—আবছা আলোয় তাদের মুখ বোঝা যাচ্ছে না। মেয়েগুলোর দিকে বেশি তাকাল না সুবোধ। ফাঁকা একটা টেবিলে দেওয়াল ঘেঁষে বসল। বেয়ারা এলে একসঙ্গে তিন পেগ হুইস্কির হুকুম করল সে।

বেশিক্ষণ লাগল না। অনভ্যাসের মদ তার মাথায় ঠেলা মারতে থাকে। আস্তে-আস্তে গুলিয়ে যায় চিন্তা ভাবনা, শরীরের মধ্যে একটা অবোধ কষ্ট হতে থাকে, পা দুটো ভারী হয়ে ঝিনঝিন করে। এই তো বেশ নেশা হচ্ছে—ভেবে সুবোধ কাউন্টারের কাছে দাঁড়ানো একটি মেয়ের দিকে তাকায়। চোখে চোখ পড়তেই মেয়েটি পরিচিতার মতো হাসে। সুবোধ হেসে তার উত্তর দেয়। পরমুহূর্তেই গ্লাসে চুমুক দিয়ে চোখ তুলে সে দেখে মেয়েটি তার উলটোদিকের চেয়ারে বসে আছে। মেয়েটি কালো, মোটা থলথলে, বয়স ত্রিশের এদিক-ওদিক। মেয়েটি বলে—বাব্বাঃ, তেষ্টায় বুক শুকিয়ে যাচ্ছে। একটু খাওয়াও তো।

কোনও-কোনও বন্ধুর কাছে এদের কথা শুনেছে সুবোধ। তাই অবাক হয় না। মেয়েটির জন্যও এক পেগের হুকুম দিয়ে সে জিগ্যেস করে—তোমার ঘর কোথায়?

—কাছেই। যাবে?

—মন্দ কী?

—তবে আরও দু-পেগের বলে দাও। তাড়াতাড়ি বলো। এরপর বন্ধ হয়ে যাবে।

সুবোধ আরও দু-পেগের কথা বলে দিয়ে হাসল—মদ খাও কেন?

—তুমি খাও কেন?

—আমার বউ চলে গেছে।

—আমার স্বামীও চলে গেছে। বলেই মেয়েটি ভ্রূ কুঁচকে বলে—শোনো, ঘরে যেতে কিন্তু ট্যাক্সি করতে হবে। হেঁটে যেতে নেশা থাকে না।

—ট্যাক্সি! হাঃ-হাঃ। বলে হাসল সুবোধ। তার খুব কথা বলতে ইচ্ছে করছিল। বলল

—আমার বউয়ের গল্প তোমাকে শোনাব আজ—

—খুব ছেনাল ছিল?

—না না। ছেনাল নয় তবে অন্যরকম—

—চলে গেল কেন?

—সেটাই তো গল্প।

—ওরকম আকছার হচ্ছে। তোমার বউয়ের দুঃখ আমি ভুলিয়ে দেব।

—দুঃখ! বড় অবাক হল সুবোধ। দুঃখের কোনও ব্যাপারই তো নয় নীলার চলে যাওয়াটা! তবু নেশার ঘোরে এখন তার মনটা হু-হু করে উঠল। দুঃখিত মনে সে মাথা নেড়ে বলল—হ্যাঁ, খুব দুঃখের গল্প—

—কেটে যাবে। বিলটা মিটিয়ে দাও।

বিল মেটাল সুবোধ। তারপরও গোটা ত্রিশেক টাকা রইল ব্যাগে। মেয়েটা আড়চোখে দেখে বলল—তুমি কি আমার ঘরে সারারাত থাকবে?

—মন্দ কী? সুবোধ হাসল।

—ত্রিশ টাকায় হবে না কিন্তু।

—হবে না?

—হয়! বলো না, এই বাজারে...ত্রিশ টাকায় ঘণ্টা দুই, তার বেশি না।

—না। ত্রিশ টাকায় সারারাত।

—পাগল!

—তবে কেটে পড়ো। আমি কেরানির বেশি কিছু না।

দাঁত বের করে হাসল মেয়েটি। গ্লাস নিঃশেষ করে আঁচলে মুখ মুছল। বলল—মদ খাওয়ালে, ভালোবাসলে, ছাড়তে ইচ্ছে করে না।

—কেটে পড়ো।

—ঠিক আছে। চলো। ত্রিশ টাকাতেই হবে, আহা তোমার বউ চলে গেছে—না? ঠিক আছে, চলো তো দেখি তোমার বউ ভালো না আমি ভালো। বলতে-বলতে সুবোধকে হাত ধরে টেনে তুলল মেয়েটা।

ট্যাক্সিতে সুবোধ মেয়েটির কাঁধে মাথা রেখেছিল। সস্তা প্রসাধন আর তেলের বিশ্রী গন্ধ। তবু মুখ সরিয়ে নিতে তার ইচ্ছে করছিল না। মেয়েটি ট্যাক্সিওয়ালাকে নানা জটিল পথে নিয়ে যেতে বলছে। কথা আর কথায় বুক ভরে আসছিল সুবোধের। সে অনর্গল কথা বলছিল—নীলার কথা, কাল রাতের স্বপ্নের কথা, মেজদার কথা, মরা মেয়েটার কথা। কখনও সে বলছিল সে এবার বেড়াতে যাবে হরিদ্বারে, যাবে ঘোড়দৌড়ের মাঠে, ফুটবল ম্যাচ দেখবে। একা-একাই থাকবে সে। মেয়েটি কোনও কথাতেই কান দিল না। শুধু মাঝে-মাঝে বলল—শুয়ে পোড়ো না বাপু গায়ের ওপর। পুরুষমানুষগুলো যা ন্যাতানো হয়, একটু দুঃখটুঃখ হলেই গড়িয়ে পড়ে। কথাগুলো ঠিকঠাক বুঝতে পারছিল না সুবোধ। দুঃখ! দুঃখ কীসের! মেয়েটি জানেই না তার মন রঙিন একখানা রুমালের মতো উড়ছে।

ট্যাক্সি যেখানে থামল সে জায়গাটা সুবোধ চিনল না। শুধু টের পেল গোলকধাঁধার মতো খুব জটিল প্রকাণ্ড একটা বাড়ি মধ্যে সে ঢুকে যাচ্ছে। অনেক সিঁড়ি, সরু বারান্দা, আবার সিঁড়ি—বিচিত্র অচেনা লোকজন, মাতাল, বেশ্যা, ফড়ের গা ঘেঁষে মেয়েটি তাকে নিয়ে যাচ্ছে। নিয়ে যাচ্ছে নীলার দুঃখ ভুলিয়ে দিতে। অথচ, জানে না দুঃখই নেই আসলে। ভেবে সে হাসল—ভালো জায়গায় থাকো তুমি—কী যেন নাম তোমার!

মেয়েটি বলল—অনিলা।

হাসল সুবোধ—চালাকি হচ্ছে?

—কেন?

—আবার বউয়ের নাম তো নীলা।

—ওমা! তাই নাকি! বলোনি তো।

—বলিনি?

—না। মাইরি...

—চালাকি হচ্ছে? অ্যাঁ!

মেয়েটি হাসে—সত্যিই আমি অনিলা। তোমার বউয়ের উলটো। দেখো প্রমাণ পাবে। খুব সুন্দরী ছিল তোমার বউ? ফরসা?

—না। কালোই। মন্দ না।

—খুব কালো?

—না। শ্যামবর্ণ। এই আমার গায়ের রং।

—ওমা! তুমি তো ফরসাই?

—যাঃ—হাসল সুবোধ। লজ্জায়।

ঘরখানা ভালোই। ছিমছাম। বসতে ঘেন্না হয় না। পরিষ্কার বিছানাটাই আগে চোখে পড়ল সুবোধের। ভারী মাথা নিয়ে গড়িয়ে পড়ল। বলল—মদ খেয়ে কিছু না হয়। উত্তেজনা লাগছে না।

—আর খাবে?

—না। পয়সা নেই।

—পয়সা না থাক, ঘড়ি আংটি আছে। জমা রেখে খেতে পার। পরে পয়সা দিয়ে ছাড়িয়ে নেবে।

—না। আর খেলে ঘুম পাবে, বমিও হবে।

—তবে থাক।

সুবোধ মেয়েটিকে অনাবৃত হতে দেখছিল। হঠাৎ কী খেয়াল হলো, জিগ্যেস করল—আজ কি তোমার আর খদ্দের আছে? তাড়াতাড়ি করছ কেন?

—মেয়েটি হাসল—আছে। কিন্তু তোমার কী! তোমাকে আলাদা বিছানা করে ঘুম পাড়িয়ে রাখব। তুমি টেরও পাবে না।

—পাব না?

—না।

মেয়েটি কাছে আসে। আস্তে-আস্তে উঠে বসে সুবোধ—তুমি তো অনিলা!

—হুঁ।

—দূর। তাহলে হবে না। বলে হাই তোলে সুবোধ।

—কেন?

সুবোধ উত্তর দেয় না! অন্যমনস্ক চোখে চেয়ে থাকে। নীলা! নীলা! এখন কোথায়। তার মাথার মধ্যে নানা চিন্তা ঘুরপাক খায়। পৃথিবীময় লক্ষ লক্ষ পুরুষ তার মধ্যে নীলা একা কোথায় চলে গেল? কী করছে এখন নীলা?

মেয়েটি বলে—আমার দিকে তাকাও। দ্যাখো না আমাকে।

সুবোধ গরুর মতো নিরীহ চোখে তাকায়। হাসে। বলে—দূর। তোমার দ্বারা হবে না।

—কেন?

—তুমি তো পরিষ্কার মেয়ে। কিচ্ছু লুকোনো নেই তোমার। তোমাকে একটুও সন্দেহ হয় না।

—বাঃ। তা তুমি চাও কি?

—সন্দেহ করতে। বলতে-বলতে হাসে সুবোধ। হেসে চোখ ফিরিয়ে নেয়।

রাজার গল্প

চৈত্র সংক্রান্তির দিন রাজা তাঁর মুকুট এবং সিংহাসন ত্যাগ করবেন। সেদিন প্রজাবর্গের সামনেই তিনি তাঁর পিতৃপুরুষের বৃত্তি গ্রহণ করবেন হলকর্ষণ করে। তাঁর রাজকীয় মহিমার অবসান হবে। রাজাহীন রাজ্যে তিনি প্রজাসাধারণের সঙ্গে সমভূমিতে নেমে আসবেন। সেদিন সেনাপতি, নগরকোটাল এবং পৌরপ্রধানেরাও নিয়োজিত হবেন তাঁদের পুরাতন বৃত্তিতে। পৈতৃক কামারশালায় ফিরে যাবেন সেনাপতি, নগরকোটাল যাবেন তাঁর বিপণিতে, চিকিৎসাবিদ্যায় ফিরে যাবেন পৌরপ্রধান। কারাগার বহুকাল বন্দিশূন্য, কারাধ্যক্ষ প্রত্যাবর্তন করবেন বৈজ্ঞানিক গবেষণাকেন্দ্রে। সমাজ রাষ্ট্রশূন্য হবে। শাসনযন্ত্রের প্রয়োজন ফুরিয়েছে।

সংক্রান্তির আগের রাত্রিতে রাজা তাঁর মন্ত্রণাকক্ষে ডেকে পাঠালেন সেনাপতিকে। সহাস্যমুখে প্রশ্ন করলেন—সেনাপতি, আপনার প্রয়োজন কি এ রাজ্যের পক্ষে সত্যিই ফুরিয়েছে?

সেনাপতি অনায়াসে উত্তর দিলেন—মহারাজ, এ রাজ্যের জন্য সেনাপতির প্রয়োজন নেই। আমরা আর রাজ্য জয় করি না, রাজ্য রক্ষারও কোনও প্রয়োজন নেই। প্রতিবেশি রাষ্ট্ররা একে একে সকলেই আমাদের আদর্শ গ্রহণ করেছেন। আদর্শের দ্বারাই আমরা প্রকৃত রাজ্য জয় করেছি। তাঁরা মিত্রভাবাপন্ন হয়েছেন, সমাজতন্ত্রের মূল্য উপলব্ধি করেছেন। শীঘ্রই মানুষের মন থেকে নিজরাজ্য এবং পররাজ্যের ভেদবুদ্ধি লুপ্ত হবে। ফলে আক্রমণের কোনওই আশঙ্কা নেই। হ্যাঁ মহারাজ, আমার সেনাপতিত্বের প্রয়োজন এ রাজ্যের পক্ষে ফুরিয়েছে। আমি খুব আনন্দিত মনে কামারশালায় ফিরে যাব। সেই

কামারশালায় আমি ছেলেবয়সে হাপর ঠেলতাম, আমার বাবা লোহা গলাতেন। সেই স্মৃতি আমাকে এখনও সুখবোধে আচ্ছন্ন করে। আমি এখন সেই কামারশালাকে উন্নত করেছি। নূতন যন্ত্রলাঙ্গলের নানা অংশ সেখানে তৈরি হবে—সেইভাবেই আমি নূতন করে কাজে লাগব।

তাঁকে বিদায় দিয়ে রাজা ডাকলেন নগরকোটালকে। রাজার প্রশ্নের উত্তরে কোটাল নির্দ্বিধায় বললেন মহারাজ, বহুকাল হয় আমি কোটালত্ব ভুলে গেছি। রাজ্য সুশাসিত হয় তখনই, যখন প্রতিটি মানুষ তার নিজের দ্বারা শাসিত হয়। এখন এ রাজ্যে একজন সালঙ্কারা সুন্দরী অষ্টাদশী কন্যা একাকিনী দিনে ও রাত্রে সর্বত্র ভ্রমণ করতে পারেন, তাঁর আভরণ ও সতীত্ব অক্ষুণ্ণ থাকবে, গৃহস্থরা দ্বার উন্মোচিত রেখে শয়ন করতে পারেন, ঘরে কেউ প্রবেশ করবে না। মহারাজ, আমাকে আর এ রাজ্যের প্রয়োজন নেই। আমার ঠাকুরদার মুদিখানায় আমি ফিরে যাব। যদিও সে দোকান এখন রাষ্ট্রায়ত্ত। সব দোকানই তাই। তবে সেখানে আমার ছেলেবেলার স্মৃতি আছে। সেই দোকানটিকে এখনও আমি ভালোবাসি।

এরপর পৌরপ্রধান। প্রশ্নের উত্তরে বললেন—মানুষের কর্তব্যবোধ জেগেছে। এ নগরকে পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্ব সব নাগরিকই বহন করছেন। আমার আর প্রয়োজন কী? প্রধানের প্রয়োজন তখনই যখন অধস্তনরা নাবালকের মতো দায়িত্বজ্ঞানহীন হয়। চিকিৎসক হিসেবে এক সময়ে আমি দেখেছি যে রুগি আরোগ্যলাভ করলে তাকে চিকিৎসামুক্ত করতে হয়। এখন পৌরকার্যও চিকিৎসামুক্ত হোক। নাগরিকরা সুস্বাস্থ্যের অধিকারী, সংক্রামক ব্যাধি কিছু নেই, নদীর জল জীবাণুমুক্ত, মানুষের জন্মহার নিয়ন্ত্রিত, বৃদ্ধ ছাড়া আর কোনও বয়সেই কোনও মৃত্যুহার পরিলক্ষিত হয় না। মহারাজ, আমার পুরোনো বৃত্তি যদিও আর খুব একটা কাজে লাগবে না, তবু সেই বৃত্তিতেই আমাকে ফিরে যেতে দিন।

এলেন কারাধ্যক্ষ। বললেন—প্রজারা আর নিয়ম ভাঙে না। বড় অপরাধ দূরের কথা, তারা পরস্পরকে কথাচ্ছলে অপমানও করে না আর। প্রত্যেকেই বিনয়ী এবং ভদ্র, কর্তব্যে সজাগ। ফলে প্রধান এবং তাঁর সহকারী বিচারকেরা কেবল আইনতত্ব গবেষণা করে সময় কাটান, প্রয়োগের সুযোগ ঘটে না। মানুষ নিজের মহামূল্যবান জীবনকে উপলব্ধি করেছে, ফলে নরহত্যা ঘটে না। মানুষ তার প্রয়োজনীয় সব কিছুই অনায়াসে পাচ্ছে, ফলে চৌর্যবৃত্তি বন্ধ। পূর্ব অভিজ্ঞাতাবলে প্রতিটি মানুষই জানে যে তার কর্তব্যে অবহেলা অন্যের সাতিশয় অসুবিধার কারণ ঘটাতে পারে, ফলে বিনা উৎকোচে সমস্ত কার্য যথাসময়ে সিদ্ধ হয়। ফলে কারাগার জনশূন্য। এত জনশূন্য যে প্রহরীরা সে দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে

বিষণ্ণ থাকে। মহারাজ, আপনি আমাকে বিদায় দিন, কারাভবনকে অন্য কোনও ভবনে রূপান্তরিত করুন, প্রহরীদেরও ভিন্ন বৃত্তিতে নিয়োগ করুন।

এইভাবে একে-একে সব রাজকর্মচারীকেই জিজ্ঞাসা করলেন রাজা। বুঝতে পারলেন, বাস্তবিকই রাষ্ট্রের প্রয়োজন ফুরিয়েছে।

তবু নিশ্চিত হওয়ার জন্য তিনি এবার একে-একে কিছু-কিছু প্রজাকে ডেকে পাঠাতে লাগলেন।

প্রথমেই এলেন রাজ্যের সবচেয়ে বৃদ্ধ মানুষটি, যার বয়স একশো ষাট বৎসর, যিনি এখনও সরলকাণ্ড বিশিষ্ট গাছের মতো দাঁড়ান, যিনি নিয়োজিত আছেন বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ কেন্দ্রে, বিশ্রাম জানেন না। রাজ্যের নিয়ম অনুযায়ী নামমাত্র অভিবাদন করলেন রাজাকে, সমান আসনে বসলেন। রাজা তাঁকে অভ্যর্থনা করে বিনীত মুখে জিগ্যেস করলেন—আপনি সবচেয়ে প্রাচীন মানুষ। এ রাজ্যের পূর্ণ অবস্থাও জানেন। এখন বলুন এ রাজ্যে রাজা বা রাষ্ট্রীয় শাসনের প্রয়োজন আছে কি না।

বৃদ্ধ ক্ষণেক চিন্তা করে বললেন, মহারাজ, আপনি নিজে এ রাজ্যের প্রজা ছিলেন। আপনার পিতা ছিলেন আমার প্রতিবেশি। এ রাজ্যের অরাজক অবস্থায় আপনি রাজদণ্ডের ভয় না রেখে দুর্বল ভীরু পীড়িত জনসাধারণকে জোটবদ্ধ করে বিপুল এক মনুষ্যশক্তির জন্ম দিয়েছিলেন। শক্তি মাত্রই নিরপেক্ষ—শুভ বা অশুভ যে-কোনও কাজেই তাকে লাগানো যায়। আপনি সেই শক্তিকে মঙ্গলাভিমুখী করেছিলেন। ফলে আমরা এক অদ্ভুত রাষ্ট্রের জন্ম হতে দেখেছি। এ রাজ্যে যখন প্রথম খাদ্য ও শস্য বিনামূল্য হয়ে গেল তখন এটাকে সত্য বলে মনে হয়নি। সেদিন আমি নগরের বিভিন্ন আহারগৃহে গিয়ে আহার করেছি। যদৃচ্ছা যা প্রাণে চায় তাই খেয়েছি, এবং বেরোনোর সময়ে কেউ দাম চাইছে না দেখে ভীষণ অস্বস্তি বোধ করেছি, নিজেকে চোরের মতন মনে হয়েছে। আমার মতো বহু মানুষই সেদিন ওইরকম করেছে, তারা দেখছে সত্যিই সব বিনামূল্যে, তবু তাদের বিশ্বাস হচ্ছিল না। এই বিনামূল্যে খাদ্য পাওয়ার ব্যাপারটা বেশি দিন স্থায়ী হবে না ভেবে কয়েকদিন আমি খুব খেয়েছিলাম। ফলে আমার পেট খারাপ হয়। আমার নাতি আমার এই কাণ্ড দেখে খুব হেসেছিল। তারপর মহারাজ, এক সময়ে এই রাজ্যে পরিধেয় বস্ত্র, তৈজস, আসবাব সবকিছুই মূল্যহীন হয়ে গেল। আমি বিস্তর দোকানে ঘুরে হাজার জিনিস নিয়ে এসে বাসা ভরতি করলাম। কিন্তু কেউ সেগুলো কেড়ে নিতে এল না। জিনিসগুলো আমারই রয়ে গেল। ক্রমে বুঝতে পারলাম আমি খামোখা এত জিনিস সংগ্রহ করেছি। আমরা আগে দুর্দিনের জন্য সুদিনের সঞ্চয় রাখতাম। কিন্তু এখন দুর্দিন নিঃশেষিত হয়েছে, ফলে এই সঞ্চয় ঘরকে অরণ্যে পর্যবসিত করছে। আমি তাই সব জিনিস ফিরিয়ে দিয়ে

এলাম। তারপর আগের মতোই অপ্রচুর জিনিসের ঘরগৃহস্থালিতে সুখী বোধ করতে লাগলাম আবার আগের মতো। আমি মিতাহারী। মহারাজ, যখন সেদিন আমার কানে এল যে আপনি সিংহাসন ত্যাগ করে সাধারণ জীবন গ্রহণ করবেন সেদিনও আমার মনে শঙ্কা এসেছিল যে, রাজা না থাকলে আবার অরাজকতা দেখা দেবে হয়তো, আবার পাপ আসবে। কিন্তু মহারাজ, একটু ভেবে দেখলাম। ঠিক যেভাবে আপনি আপনার পূর্বসিদ্ধান্তগুলোতে সাফল্যলাভ করেছেন, ঠিক সেভাবে এতেও আপনি সফল হবেন। না মহারাজ, সম্ভবত এ রাজ্যে আর রাজার প্রয়োজন নেই।

আর একজন প্রজা এসে পূর্ববৎ অভিবাদন করে আসন গ্রহণ করলেন এবং বললেন— মহারাজ, আপনার শাসনবিধির তুলনা নেই। খাদ্য, পানীয়, বসতগৃহ, চিকিৎসা, যানবাহন ইত্যাদির জন্য আমাদের কোনও ব্যয় নেই। এ রাজ্যের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত আমি যে কোনও যানে ভ্রমণ করতে পারি, যে কোনও চিকিৎসককে ডেকে চিকিৎসা করাতে পারি। তার জন্য আমাকে কিছুই ব্যয় করতে হবে না। মহারাজ, আমার পিতামহের দানশীলতার খ্যাতি ছিল কিন্তু তিনি যদি আপনার রাজ্যে বাস করার অভিজ্ঞতা লাভ করতেন তবে অবশ্যই খ্যাতিলোপের ভয়ে রাজ্য ছেড়ে পালাতেন। কারণ, তাঁর দান গ্রহণ করার মতো একজনও দুঃখী বা অভাবী লোক এখানে নেই। মহারাজ, আমরা এখন আর মানুষের দয়াধর্মকে মহৎ গুণ বলে অভিহিত করি না, কারণ দয়াগ্রহণ মনুষ্যত্বের অবমাননাস্বরূপ। মহারাজ, আমরা আমাদের যৌথ দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ সম্পর্কে সজাগ। কাজেই রাজকীয় শাসনও দয়াধর্মের মতোই অপ্রচলিত হয়ে গেছে।

পরবর্তী প্রজা এক মধ্যবয়স্ক চিত্রকর। তিনি বললেন—মহারাজ, আমার পিতা ছিলেন যোদ্ধা। তিনি এক সময়ে এ রাজ্যের হয়ে বিভিন্ন রাজ্যের সঙ্গে অনেক যুদ্ধ করেছেন। তিনি মহাবীর খ্যাতি লাভ করেছিলেন। তাঁর গায়ে নানা অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন ছিল। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ওই চিহ্নগুলিকে তিনি পদকের মতো ভালোবাসতেন। এই যুদ্ধপ্রিয় লোকটি নরহত্যার অপ্রয়োজনীয়তাকে কখনও বুঝতে চাইতেন না। যুদ্ধ না থাকলে মানুষ হীন ও নির্বীর্য হয়ে যাবে বলে তাঁর বিশ্বাস ছিল। ছেলেবেলায় তাই আমি যুদ্ধবাজ মনোভাবাপন্ন ছিলাম। আমি প্রথমে ফড়িং, পাখি, তারপর কুকুর, বেড়াল, বাঁদর এইসব হত্যা করতে শুরু করি। বাবার মতো হওয়ার জন্য শীঘ্রই আমি কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী বালককে দ্বন্দ্বযুদ্ধে হত্যা করব এরকম অভিলাষও আমার ছিল। ঠিক সেই সময়েই আমি আপনার বিপ্লবে অংশীদার হই যুদ্ধের আশায়। এবং কালক্রমে আপনার আদর্শকে বুঝতে পারি, এবং আমার হৃদয় শান্ত হয়, যুদ্ধস্পৃহা জ্বরের মতো সেরে যায়। নিরীহ পশুপাখি হত্যা করে যে পাপ আমি করেছিলাম এখন তার [illegible] করি এই হাতে তাদেরই ছবি এঁকে। মহারাজ, এ সমাজব্যবস্থায় হয়তো যুদ্ধের এবং বীরত্বের প্রয়োজন ছিল, এখন তা ফুরিয়েছে

মহারাজ, হয়তো সেরকম রাষ্ট্রযন্ত্রেরও প্রয়োজন ফুরিয়েছে। আপনি সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আমরা এতটাই আত্মবিশ্বাসী যে ঈশ্বরও আমাদের কাছে কিংবদন্তি মাত্র।

সংক্রান্তির দিন সকালে রাজা স্নান করলেন। পুরোহিতকে বললেন—কেউ যখন রাজা হয় তখন তার অভিষেকের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু রাজা যদি যে কেউ একজন হতে চায় তখন কি তার কোনও অভিষেক আছে?

পুরোহিত মাথা নাড়লেন—না, মহারাজ।

প্রাকারের পাশে সুসজ্জিত বেদিতে সাজানো সিংহাসন। রাজা সেখানে এসে বসলেন। হাতে তুলে নিলেন রাজদণ্ড, মাথায় পরলেন মুকুট। শেষবারের মতো। সামনের আম্রকাননে হাজার-হাজার কৌতূহলী প্রজা সমবেত। এক পাশে শূন্য একটু জমিতে চাষার পোশাক এবং বলদযুক্ত একখানা হাল রয়েছে। রাজা আজ আনুষ্ঠানিকভাবে সিংহাসন, মুকুট ও দণ্ড ত্যাগ করে হলকর্ষণ করবেন। রাজাকে আজ বেশ আনন্দিত ও তৃপ্ত দেখাচ্ছিল।

রাজা আস্তে-আস্তে উঠে দাঁড়ালেন। চারিদিক নিস্তব্ধ হয়ে গেল। তিনি গম্ভীর গলায় গতকাল রাত্রে যাদের সঙ্গে কথা হয়েছিল তাদের সাক্ষ্যপ্রমাণ উল্লেখ করে বললেন যে, তাঁর শাসনের প্রয়োজন সত্যিই ফুরিয়েছে। এবার সমাজ হবে রাষ্ট্রহীন। মনুষ্যত্বই হবে প্রকৃত শাসক।

রাজা মুকুট খুললেন, রাজপোশাক উন্মোচন করলেন, সিংহাসন ত্যাগ করে সিঁড়ি দিয়ে ধীর পদক্ষেপে নামতে লাগলেন।

নিস্তব্ধতার মধ্যে হঠাৎ কে যেন চেঁচিয়ে বলে উঠল—মহারাজ, কাল রাত্রিতে আমার ঘরে চোর ঢুকেছিল...

সবাই চকিত হয়ে চারপাশে তাকাতে লাগল। সেনাপতি কোমরবন্ধ তলোয়ারসুদ্ধু খুলে রাখতে যাচ্ছিলেন। এই কথা শুনে কোমরবন্ধ আবার আঁটলেন। কারাধ্যক্ষ চকিত হয়ে হাতে ধরা ইস্তফাপত্রটি লুকিয়ে ফেললেন।

আর একটি কণ্ঠ চেঁচিয়ে বলল—মহারাজ, আজকের অনুষ্ঠানে সম্মুখবর্তী এই আসনটি পাওয়ার জন্য আমাকে বিশ মুদ্রা উৎকোচ দিতে হয়েছে...

আর একটি কণ্ঠও আর্তনাদ করল—মহারাজ, কিন্তু তার অভিযোগ গোলমালে, পালটা চিৎকারে শোনা গেল না। বহু কণ্ঠের আর্তনাদ উঠতে লাগল মহারাজ, মহারাজ, মহারাজ...

মাঝসিঁড়িতে থেমে দাঁড়ালেন রাজা। বিস্মিত, ব্যথিত। ভ্রূকুটি করলেন। তারপর হতাশ ক্লান্ত দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন সামনের উদ্বেলিত জনসাধারণের দিকে।

তারপর ধীর ক্লান্ত পায়ে আবার সিঁড়ি বেয়ে উঠে যেতে লাগলেন পরিত্যক্ত সিংহাসনের দিকে।

আমার মেয়ের পুতুল

গাড়িটা থেমে আসছে।

আমরা যেন ঘুম থেকে জেগে উঠলাম। এতক্ষণ ক্লান্ত একটানা শব্দের তালে-তালে অলস নাচের ছন্দে গাড়িটা কোমর দোলাচ্ছিল। নাচের ছন্দটা ছড়িয়ে পড়ছিল আমার রক্তের মধ্যে। আমি জেগে ছিলাম। শুধু আমার মনটা নেশার ঘোরে থিতিয়ে যাচ্ছিল।

গাড়িটা থেমে আসছে। শান্তা আমার দিকে তাকাল। অনেকক্ষণ পর ও চোখ মেলল। খুব ক্লান্ত অবসন্ন কণ্ঠে বলল, 'জানালাটা বন্ধ করে দাও না।'

আমি হাত বাড়িয়ে জানালাটা বন্ধ করে দিয়ে ওর কাছে বসলাম। বললাম, 'শীত করছে তোর?'

'না, শীত করছে না। আমি একটু বসব এবার। বাবা, তুমি আমার মুখোমুখি বসছ না কেন!'

আমি ওর গায়ে কম্বলটা ভালো করে জড়িয়ে দিতে-দিতে একটু হাসলাম। ওর চুলগুলো রুক্ষ লালচে। আমি ওর মাথায় হাত রাখলাম। গরম। উত্তাপটা আমার হাতটাকে কাঁপিয়ে দিল, আমার বুকটা ধড়াস করে উঠল। আমি ওর মুখোমুখি বসলাম।

'এটা কী স্টেশন বাবা? গাড়িটা থেমে আসছে যে!'

আমি জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখে বললাম, 'রংটং।'

'বাঃ, কী মজার নাম। রংটং, রংটং,' ও টেনে-টেনে বলল, 'ঠিক যেন মনে হয় ঢং ঢং ঢং ঢং'।

শব্দ হচ্ছে ঢং ঢং। ঘণ্টার শব্দ। নিস্তব্ধ, জংলি স্টেশনটার চারপাশে পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খেয়ে শব্দটা ফিরে এল। আবার পিছিয়ে গেল। গাড়ি ছাড়বার সংকেত। বিদায়ের সংকেত। শান্তা আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমার হাসি পাচ্ছে না। রজতশুভ্রর কথা আমার মনে পড়ছে।

'কার্সিয়াং আর কতদূর বাবা?'

'এখনও অনেক দূর।' আমি আস্তে-আস্তে ভেঙে-ভেঙে বললাম। আমার গলার স্বরটা কাঁপল। জানালায় কাঠের ওপর আমার হাতটা শক্ত। আমি মনে-মনে কথা বলছি। সে-কথা কেউ শুনছে না। আমি মনে-মনে বলছি, শান্তা, তুই ঘুমো। এই স্টেশনগুলোকে পার হয়ে যেতে দেখিস না, এই জঙ্গলকেও না, এই পাহাড়কেও না। বড় বিস্বাদ আজকের দিনটা। তোর জ্বর বেড়েছে। আরও বাড়বে। তুই ঘুমিয়ে পড়। খুব শান্ত ছোট্ট পুতুলের মুখের মতো তোর মুখটা কম্বলের ওপর জেগে থাক। তুই ঘুমিয়ে পড়। আমি জেগে থাকি।

'লুডোটা একটু বার করো না বাবা। একটু খেলব।'

আমি চমকে উঠলাম। তাকালাম। হাসলাম। শান্তা কাচের সার্সির বাইরে তাকিয়ে আছে। আমার হাসিটাকেও ও দেখল না।

আমি উঠে বাস্কেট থেকে লুডোটা বের করলাম। গাড়ির দেওয়ালের আয়নায় আমার ছায়া পড়ল। অতি প্রবীণ একটি মুখ। এই মুখটা আমার। আমি কী আশ্চর্যভাবে বুড়ো হয়ে গিয়েছি। একটা নিশ্বাসকে চেপে রাখি বুকের ভিতর। আমার সতেরো বছরের মেয়ে এই নিশ্বাসটার শব্দ শুনলে চমকে উঠবে। কিন্তু নিশ্বাসটা আছে। প্রতি মুহূর্তেই সেটা বেরিয়ে আসতে চায়। আমি তাকে যত অনুভব করি, তত যন্ত্রণার ছাপ আমার মুখে বার্ধক্যের চাবুক মেরে কতগুলো নতুন রেখা এঁকে দেয়। শান্তার মতো আমিও রজতশুভ্রকে ভুলতে চেষ্টা করি।

আমরা লুডো খেলতে শুরু করেছি। আমি হারছি। শান্তার চোখ দুটো আনন্দে জ্বলজ্বল করছে। ও হাসছে, 'বাবা, তুমি হেরে যাচ্ছ যে। ওমা, এক ছয়-তিন দিয়ে তুমি আমার গুটিটা খেতে পারতে না?'

আমি কিছু শুনছি না, কিছু দেখছি না। অলস নাচের ছন্দে গাড়িটা কোমর দোলাচ্ছে, টাল খাচ্ছে, বেঁকে যাচ্ছে, আবার সোজা হচ্ছে। শান্তা হাসছে। আমার বুকে নির্জন যন্ত্রণা। একক, অসহনীয়।

'থাক বাবা, খেলতে ভালো লাগছে না। এসো, একটু গল্প করি।' শান্তা বলল। ওর মুখটা আমি দেখছি। সুন্দর, কোমল, কিন্তু শুষ্ক। শুধু চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে।

আমি বললাম, 'কেন, বেশ তো খেলছিলি।'

'কিন্তু তুমি মন দিয়ে খেলছ না। তার চেয়ে আমাকে গল্প বলো। ভালো গল্প বলো, সুন্দর গল্প, যে গল্প শুনে মন খারাপ হয়ে যায় না।'

আমি একটু হাসলাম, 'কিন্তু এখন যে তোর ওষুধ খাওয়ার সময় হল শানু।'

'ওষুধ থাক বাবা। আর ভালো লাগে না ওষুধ খেতে।'

'কিন্তু যেখানে যাচ্ছ, সেখানে যে তোমাকে আরও নিয়মে থাকতে হবে মা, ছেলেমানুষি করলে অসুখ সারবে কী করে?'

'অসুখ আমার সারবে না বাবা। আমি জানি।' কথাটা বলেই শান্তা আমার দিকে তাকাল। হাসল। আমার বুকের ভিতরটা পাক খাচ্ছে।

'আমি জানি বাবা, আমি জানি।' খুব হালকাভাবে একটুও না ভেবে কথাগুলোকে উচ্চারণ করল শান্তা। আমি আমার নিজের মুখটা দেখতে পাচ্ছি না। শান্তা দেখছে। ও হাত বাড়িয়ে আমাকে স্পর্শ করল, 'বাবা, ডাক্তার সেনের কথাগুলো আমি শুনেছি। আমি নিজেও টের পাই যে, আমি বাঁচব না। তোমাকে আমি দিন-দিন শুকিয়ে যেতে দেখছি, বুড়ো হয়ে যেতে দেখছি। আমার জন্যে ভেবে ভেবেই তোমার এমনটা হচ্ছে। থাক বাবা, তুমি কষ্ট পাচ্ছ। থাক, আমি এই চুপ করলাম। দাও, আমাকে ওষুধ দাও।'

ওষুধ খেতে মুখটা বিকৃত হয়ে গেল ওর। তারপর চুপ করে রইল। এ কামরায় আর কেউ নেই। আমি ডাকলাম, 'শানু, একটু শুয়ে থাকবি?'

ও হাসল, বলল, 'না।'

'কার্শিয়াঙে আমাকে রেখে আসতে তোমার কষ্ট হবে বাবা?'

আমি চুপ করে রইলাম। শান্তা হাঁটু দুটো বুকের কাছে জড়ো করে নিয়ে সকৌতুকে আমার দিকে তাকাল। ওর চোখ দুটো হাসছে। থিরথিরে, হালকা চপল হাসি। ওর থুতনিটা হাঁটুর ওপর। আমি কথা বলছি না। আমি অন্য দিকে চোখ ফিরিয়ে নিলাম। শান্তা এবার শব্দ করে হাসল, 'তুমি যে আমাকে এত ভালোবাসো বাবা, অসুখ হওয়ার আগে কিন্তু বুঝতেই পারতাম না।'

এ-কামরায় আর কেউ নেই, থাকলে ওর কথা শুনে সে নিশ্চয়ই হেসে উঠল। আমি ওর দিকে তাকালাম। ওর সুন্দর ঠোঁটে একটা কোমল হাসি প্রজাপতির মতো কাঁপছে। আমি মনে-মনে বলছি, শানু, তুই ওভাবে হাসিস না। তুই ওভাবে হাসলে আমার ভয় করে। তোর হাসির অর্থ আমি বুঝি। তুই সব জেনে গেছিস। তোর অসুখের খবরটা আর তার শেষ পরিণতিটা তোর কাছে লুকোনো নেই। ওরকম হাসি হাসতে তোর কষ্ট হয় না? আমাকে দয়া কর শানু, তুই ঘুমিয়ে পড়। সবকিছু বুঝে কোনও সুখ নেই। সবকিছু বুঝে গেলে শুধু দুঃখ।

'আমরা এখানে আসবার আগের দিন সুকুমারী শ্বশুরবাড়ি থেকে ফিরল।' শান্তা আস্তে-আস্তে যেন আপনমনেই বলল, 'কী মোটাসোটা আর ফরসা হয়েছে সুকুমারী, যেন আর চেনাই যায় না।'

'সুকুমারী কে?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'বাঃ রে, কলকাতায় আমাদের পাশের বাড়ির পরেশবাবুর মেয়ে! তুমি সব ভুলে যাও বাবা, সুকুমারী তোমাকে এসে প্রণাম করল না সেদিন।'

'ওঃ হো, মনে পড়েছে, সেই রানাঘাটে যার বিয়ে হয়েছে, সেই তো?'

'হ্যাঁ। কিন্তু তুমি তো ওর ছেলেটাকে দ্যাখোনি। কী মোটাসোটা আর সুন্দর ছেলেটা, এক গা গয়না, ঠিক ডল পুতুলের মতো। ছেলেটা খুব হাসে, শুধু হাসেই, কাঁদতে যেন জানেই না। আমার ইচ্ছে করছিল ছেলেটাকে একটু কোলে নিই, কিন্তু—'

আমি তাড়াতাড়ি বললাম, 'এখন নিশ্চয়ই তোর খিদে পেয়েছে শানু, একটা আপেল কেটে দিই?'

শান্তা করুণ চোখে আমার দিকে তাকাল। কথা বলল খুব ক্লান্ত, অবসন্ন কণ্ঠে, 'না, খিদে পায়নি। খিদে আমার পায় না। বোধহয় জ্বরটা বাড়ছে, জিভটা তেতো-তেতো। আমাকে একটু মৌরি দাও। থার্মোমিটারটা দিয়ে জ্বরটা দেখবে একটু?'

'না,' আমি বললাম, 'না থাক। জ্বর আসছে না নিশ্চয়ই। অনেকক্ষণ বসে আছিস কিনা। এবার একটু শুয়ে থাক।'

শান্তা হাসল। বেড়ালের মতো গুটিসুটি হয়ে শুল। গাড়িটা থামল। আবার চলল। গাড়িটা একঘেয়ে। বাইরে নিস্তব্ধ, নির্জন পাহাড়ের ধূসর অনড় শরীর। শীত আর কুয়াশা। ঠান্ডা বাড়ছে। গাড়িটা ঘুরে-ঘুরে আপনমনে ওপর দিকে উঠছে।

'বাবা, ছেলেবেলায় আমি খুব পুতুল খেলতে ভালোবাসতাম।' শান্তা বলছে। যেন স্বপ্নের ঘোরে কথা বলছে ও, 'তুমি আমাকে কত পুতুল কিনে দিয়েছ যে তার হিসেব নেই। আমার কাঠের বাক্সে পুতুলগুলো সাজানো আছে, কিছু আমি চন্দ্রাকে দিয়ে দিয়েছি। কিন্তু একটা পুতুলের কথা আমার প্রায়ই মনে পড়ে। তুমি জন্মদিনে আমাকে দিয়েছিলেন। পুতুলটা মস্ত বড়, ঠিক সুকুমারীর ছেলেটার মতো বড়। সেই পুতুলটাকে তোমার বোধহয় মনে নেই বাবা?'

'কোন পুতুলটা? শোওয়ার ঘরের আলমারিতে যে ডল-পুতুলটা আছে, সেইটে?'

'হ্যাঁ, সেইটেই। বড় হয়ে আমি আর পুতুল খেলি না। কিন্তু মাঝে-মাঝে খেলতে ইচ্ছে করে। তোমাকে বলতে লজ্জা নেই, সুকুমারীর ছেলেটাকে আমি আদর করতে পারিনি। কিন্তু তার বদলে সেই পুতুলটাকে নিয়ে আমার বিকেলটা কেটেছিল।'

বাঁ-দিকের পাহাড় মুছে গিয়েছে। ট্রেনটা এখন অনেক ওপরে। পাহাড়গুলো মাথা নীচু করে আছে। কালো মেঘে আকাশ ঢাকা। ধূসর সমতলটা কী বিষণ্ণ! ট্রেনটার গতি শ্লথ। শান্তা আস্তে-আস্তে উঠে বসল। ওর মুখের কাছে জানালাটাকে ঘষা কাচের মতো অস্বচ্ছ মনে হচ্ছে। ওর নিশ্বাস কাচটার ওপর বারবার একটা বাষ্পের বৃত্ত এঁকে দিয়ে মুছে দিচ্ছে। ওর মুখটা অন্ধকার।

আমার মনে পড়ছে খুব ছোটবেলায় যখন সবেমাত্র একটু-একটু লিখতে শিখছে শান্তা, তখন ওই পুতুলটার কপালে পেনসিল দিয়ে আঁকাবাঁকা অক্ষরে লিখে রেখেছিল—'আমার ছেলে।' সেই কথাটা এখন আর নেই। বড় হয়ে ও নিজেই সেটা মুছে ফেলেছে। আমার চোখের সামনে পাতলা একটা জলের পরদা দুলছে. কামরাটাকে আঁকাবাঁকা বন্ধুর মনে হচ্ছে। আমি মনে-মনে শান্তাকে যেন বলছি, তোর পুতুলগুলোকে তুই ফেলে এসেছিল, কিন্তু পুতুলখেলাকে ফেলে আসিসনি। শানু, আমরা সবাই অমনিভাবে পুতুল খেলি। তোর পুতুলগুলোকে আমি চিনি। রজতশুভ্র তেমনি পুতুল। তাকে তুই মেরে ফেলেছিস। কলকাতা ছাড়বার পর গাড়িতে তুই গম্ভীর দৃষ্টিতে অ্যালার্ম চেনটাকে দেখেছিলি। ওটা টানলেই গাড়িটা থেমে যাবে। রজতশুভ্র নিজেকে অমনিভাবে থামিয়ে দিয়েছিল, অমনিভাবে চেনটার মতো দুলতে-দুলতে, তোর আঙুলগুলো বেঁকে যাচ্ছিল, তোর মুখটায় জলরঙের কতকগুলো রেখা খেলা করে গেল। আমি জানি, ওরকমই হয়। রজতশুভ্ররা মরবার জন্যেই জন্মায়। রজতশুভ্র আর সুকুমারী—অনেক তফাত। একজনের জন্য প্রেম, আর একজনের জন্য ঘৃণা। একজনকে সাজিয়ে গুছিয়ে আলমারিতে তুলে রাখিস, আর একজনকে তীব্র ঘৃণায় দূরে ছুড়ে ফেলে দিস। কিন্তু তোর ভাগ্য তাকে কুড়িয়ে এনে তোর সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়। আলমারির পুতুলটা বারবার চুরি হয়ে যায়।

ধোঁয়ার মতো কুয়াশা জানলার কাছে পিঠ ঘষছে। আলো আর অন্ধকার আমাদের ঘিরে-ঘিরে খেলছে। শান্তা আমার দিকে তাকাল।

'তুমি কাঁদছ বাবা?'

'না, না তো। ও এমনিই।'

'আমি তোমাকে কষ্ট দিলাম বাবা? সবাইকেই আমি কষ্ট দিই।'

'দূর পাগলি!'

শান্তা নিশ্বাস ফেলল। শব্দটা ছোট্ট একটা পাখির মতো ডানা দিয়ে বাতাস তাড়াতে-তাড়াতে আস্তে-আস্তে মিলিয়ে গেল। শান্তা, তোর নিজেকে ঘিরে একটা অদৃশ্য বৃত্ত আছে। সেই বৃত্তের পরিসরে তোর দুঃখটা তোকে ঘিরে-ঘিরে পাখির মতো ওড়ে। তুই নিজের দুঃখে কাঁদিস, তুই নিজের সুখে হাসিস। রজতশুভ্র, সুকুমারী, আমি, আমরা সবাই রংচং-এ পুতুলের মতো সেই অদৃশ্য বৃত্তটার বাইরে থেকে তোকে দেখি। আমাদের জন্যে তোর ক্রোধ, ঘৃণা, প্রেম, স্নেহ কিছুই নেই। আমরা পুতুলের মতো মিথ্যে। তোর কান্নাটা, তোর আনন্দটা তোর আপন। আমরা সবাই এইরকম শানু। আমাদের অনুভূতিগুলো সব একরকম, সব অদ্ভুত।

বাইরে বৃষ্টি পড়ছে। আকাশের রং ছাইয়ের মতো। সুদীর্ঘ, সরল পাইনের বনে গম্ভীর নির্জনতা। শানু তোর শেষ কথাটা শোনবার জন্য আমি উদগ্রীব হয়ে আছি। তুই কি কাঁদতে ভুলে গেছিস?

'কার্শিয়াং আর কতদূর বাবা?'

'এখনও দেরি আছে। এবার কিন্তু তোর কিছু খাওয়া উচিত শানু।'

'কী দেবে দাও।' ও ডান হাতটা আমার দিকে প্রসারিত করে দিয়ে ছেলেমানুষের মতো একটু হাসল।

কার্শিয়াং এসে গেল প্রায়। আর দুটো বাঁক ঘুরলেই কার্শিয়াং। আমি অপেক্ষা করে আছি শান্তার সেই কথাটা শোনবার জন্য। ও বলবে, বাবা, আমার বাঁচতে ইচ্ছে করছে। রজতশুভ্র আমার ভালোবাসাটাকে চুরি করে নিয়ে পালিয়ে গেল। শেষ হয়ে গেল। সুকুমারীকে আমি ঘৃণা করি সেই কারণেই। অথচ ওর কী দোষ! রজতশুভ্র মরে গেল, আমি রইলাম। সুকুমারীও বেঁচে রইল, অথচ ওর কিছুই হারাল না। ওর ছেলেটা মোটাসোটা, সুন্দর—ওর মুখের মতো সুন্দর, ওর ভবিষ্যতের মতো সুন্দর। সুকুমারীর

সবটুকু দেখবার জন্য আমার বাঁচতে ইচ্ছে করছে। এই তীব্র ইচ্ছাশক্তি আমাকে বাঁচিয়ে তুলবে।

'শানু, কী দেখছিস?'

'যা চোখে পড়ছে তাই। বাবা, আমি সবকিছুকে দেখতে চাই।'

আমি হাসলাম। তারপর চুপিচুপি হাসিটাকে গিলে ফেললাম। আমি অপেক্ষা করে থাকব। কিন্তু শান্তা সেই কথাটা বলবে না। আমি জানি, ও বলবে না। এ-সব কথা বলতে নেই। কিন্তু আমি তবু অপেক্ষা করে থাকব।

শানু, তোকে একটা গল্প বলতে ইচ্ছে করছে। জানলার ঠান্ডা কাচে গালটা চেপে তুই বাইরের দিকে তাকিয়ে আছিস। তোর চোখে গাম্ভীর্যের গভীরতা। গল্পটা তুই শুনবি না। আমার ইচ্ছে করছে, তবু আমি কোনওদিন তোকে গল্পটা বলব না। শুধু মনে-মনে ভাবব, তুই বড় হয়ে গেছিস। মস্ত বড়। একপাল ছেলেমেয়ে ঘরভরতি। সংসারটা উপচে পড়ছে সম্পদের আধিক্যে।

শানু, কার্শিয়াং আর কয়েক মিনিটের পথ। তোর মুখের পাশে জানলার কাচে তোর নিশ্বাস বারবার একটা বাষ্পের বৃত্ত এঁকে দিয়ে মুছে দিচ্ছে। তোর মুখটা অন্ধকার। করুণ, গভীর অন্ধকার।
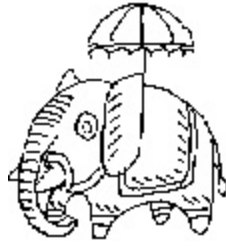
সোনার ঘোড়া

তিনটে খরগোশ তুরতুর করে মাটি ভাঙে চিনাবাদামের খেতে। মাটি উলটে বের করে বাদাম। সামনের দুই থাবায় ধরে কুটকুট করে খায়। তাদের কান নড়ে আনন্দে।

ভুট্টা খেতের ভিতরে ঝুঁঝকো আঁধার। সেইখানে সরসর করে শব্দ হয়। দুটি শিশু কচি ভুট্টা ছেঁড়ে, খোলস আর রোঁয়া সরিয়ে দাঁত বসায়। দানা ফেটে উছলে ওঠে ভুট্টার দুধ। স্বাদে তাদের মুখ ভরে যায়। তারা ভুট্টার দুধ শুষে নিতে থাকে। একে অন্যের দিকে তাকিয়ে ঝুঁঝকো আঁধারে বুঝদারের মতো হাসে। মেয়েটার চুল রুক্ষ লালচে, পরেছে এক বিবর্ণ ডুরে শাড়ি, পুরু দুটি ঠোঁটে একটু উঁচু দাঁত ঢাকা পড়ে না। ছেলেটার পরনে নোংরা লেংটি, গা উদোম, ন্যাড়া মাথায় লম্বা টিকি!

বাবুদের বাগানের এককোণে মেয়েটির বাবা রাজ্যের বুনো ঘাস নিড়িয়ে নেড়া করেছে। সারাদিন ঝরে পড়ে শুকনো গাছের পাতা। সেইসব পাতা কুটো শিমুলের ডাল থেকে খসে পড়া একটা বাবুইয়ের বাসা—এইসব দিয়ে একটা স্তূপ তৈরি করেছে সে। তারপর সাবধানে দেশলাই জ্বেলে সে একটা বিড়ি ধরায়, তারপর জ্বলন্ত সেই কাঠিটা দিয়ে বাবুইয়ের বাসাটার আগুন দিয়ে শুকনো পাতার স্তূপটা ধরিয়ে দেয়। পাতা পোড়ার মিষ্টি ঝাঁঝালো ধোঁয়ার গন্ধ পায় সে। আগুন জ্বলে ওঠে। একটু দূরে ঘাসের ওপর উদাসী ভঙ্গিতে বসে সে বিড়ি খায়।

ভুট্টা খেতের মধ্যে মেয়েটি সেই গন্ধ পায়। পাতা পোড়ার মিষ্টি গন্ধ। তাহলে বাবা আগুন জ্বেলেছে। ঝলসে নিয়ে খাবে বলে সে দুটো ভুট্টা ছিঁড়ে কোঁচড়ে নিয়ে খেত থেকে বেরোয়। অমনি দেখতে পায়, খরগোশের কাণ্ড। চিনেবাদাম গাছের শিকড় খুঁড়ে বেগোছ করছে।

মুখ ফিরিয়ে সে ছেলেটাকে ডাকে—এ গেনিয়া, মোমফালি খা লেল কৈ।

—কৌন?

—হৌ দেখ।

গেনিয়া ভিখমাঙা সুরদাসের ছেলে। তার হাতে সব সময়ে একটা খেঁটে লাঠি থাকে। ওই লাঠির এক প্রান্ত ধরে তার বাবা অন্যপ্রান্ত ধরে সে। ওই ভাবে লাঠি ধরে, সে বাবাকে ভিখ মাঙতে নিয়ে যায় রাস্তায়-রাস্তায়, বাড়িতে-বাড়িতে। চলে যায় যশিডির সাটল গাড়িতে উঠে মেল ট্রেনে ঝাঁকা কিংবা মধুপুর ঘুরে আসে। সেই লাঠি হাতে ছেলেটা লাফ দিয়ে বেরোল।

তিনটে খরগোশ ছুটে পালায়। তারা বেশি দূরে যায় না। এ বাগানের সীমা পেরিয়ে কাঁটা গাছের বেড়ার তলা দিয়ে উত্তরে আর একটা বাড়ির বাগানে ঢুকে যায়। গেনিয়া মেয়েটাকে বীরত্ব দেখাতে খেঁটে লাঠিটা হাতে নিয়ে দু-চারবার লাফ ঝাঁপ করে, চেঁচায়। তার লেংটির একটা প্রান্ত দু-পায়ের মাঝখান বরাবর ঝুলে থাকে, এখন লাফ ঝাঁপ দেওয়ার সময়ে সেই অংশটা লেজের মতো নড়ে। মেয়েটা তাই দেখে হেসে গড়িয়ে পড়ে।

চিনেবাদামের খেত পার হয়ে তারা প্রকাণ্ড নিস্তব্ধ বাড়িটা ঘুরে আগুনের কাছে চলে আসে। আগুনের আঁচ থেকে দূরে ঘাসে বসে উদাস ভঙ্গিতে মাটি-মাখা হাতে বিড়ি খায় ভূতনাথ। তার চোখ শূন্যে নিবদ্ধ। মেয়েটা বাবার ওই ভঙ্গি দেখে আসছে জন্মাবধি। সে জানে এ দেশের মাটি তার বাবার পছন্দ না। তার বাবা যে-মাটির দেশে ছিল সে-মাটির দেশে আরও নিবিড় গাছপালা জন্মাত। সেখানে ছিল অনেক জল। জলে-মাটিতে মাখামাখি হত খুব। এখানে তা হয় না। সেই ঢাকার দেশে বাবার ছিল বউ, একটা ছেলেও। তারা দুজনেই ঘরের আগুনে মারা যায় দাঙ্গার সময়ে। তার বাবা একা পালিয়ে আসে কলকাতায়। সাহাবাবুরা দেশের লোক, তারা ভুতনাথকে দু-একটা কাজ দিয়েছিল। কিন্তু লোকটার মাটির নেশা দেখে বুড়ো কর্তা বললেন—বৈদ্যনাথ ধামে আমার বাড়িটা পড়ে আছে। মালিটা বুড়ো-হাবড়া, তা তুমি সেখানে গিয়ে বরং মাটি ছানো গিয়ে। তোমার হাতে গুণ আছে, গাছপালা করো গে সেখানে—

বুড়ো বিহারি মালির চাকরি গেল। বড় কষ্ট হয়েছিল ভূতনাথের। সেই কষ্ট থেকেই ভূতনাথ এক ঢিলে দুই পাখি মারল। বুড়োর এক মেয়ে ছিল, যদিও বাঙালি না, তবু তার মুখচোখে বিহারের সহজ লাবণ্য দেখা যায়। বুড়োকে কন্যাদায় থেকে উদ্ধার করতে গেল সে, তার নিজের তখনও বিয়ের বয়স যায়নি। বুকে খামচে থাকা স্ত্রী পুত্রের দুঃখটাতেও একটা প্রলেপ পড়া দরকার। বুড়ো বিড়বিড় করে বলল—মেয়ে আমাদের দুধেল গাইয়ের মতো। বিয়ে করতে চাও করো—নগদ দুশো টাকা ধরে দাও। ভূতনাথ থ। কোথায় সে বিনাপণে দায় উদ্ধার করতে এসেছিল, কোথায় আবার উলটে কন্যাপণ? তবু নিয়ম। রফা

হল একশোয়। কিন্তু এক দফায় না, চার দফায়। ইনস্টলমেন্টে বিয়ে করে ঘর বাঁধল ভূতনাথ, সাহাবাবুদের বাড়ির আউট হাউসে। চারদিকে জমি মেলাই। মনের আনন্দে মাটিতে ডুব দিল সে। ফুল-ফলের বুদবুদে ভরে দিল বাগান। এতোয়ারির কোলে এল কমলি।

সেই কমলি এখন ওই পাতার আগুনের দিকে সাবধানে হাত বাড়িয়ে কচি ভুট্টা সেঁকছে, সঙ্গে ভিখিরির ছেলে গেনিয়া। উদাস চোখে দৃশ্যটা দেখে ভূতনাথ। আমার বউ, আমার সন্তান, আবার সেই জমি নিয়ে মাখামাখি, তবু কোথা থেকে এক অন্যমনস্কতা এসে বাসা বেঁধেছে ভূতনাথের মাথায়। মাঝে-মাঝে তার বোধে আসে যে, সে যেন এই পৃথিবীর সঙ্গে ঠিকমতো আটকে নেই। কোথায় একটু ঢিলে বাঁধুনি রয়েছে, একটা আলগা ভাব। মাঝে-মাঝে তাই সে বসে গাছের ছায়ায় ঘাসগজারির মধ্যে চুবিয়ে—জলের কথা ভাবে, জমির রঙের কথা ভাবে, কখনও বা তার মনে পড়ে সেই বউ-ছেলের মুখ, কখনও মনে পড়ে দুঃসময়ের আগুনরঙা আকাশ। কিংবা কিছুই মনে পড়ে না, কেবল এক কাতরতা তাকে বকের মতো একা করে রাখে। এক ঠাঁই ঝিম মেরে থেকে-থেকে মাঝে-মাঝে মাথার মধ্যে টের পায়, চিন্তার মাছ পলকে ঘাই মেরে ডুব দেয়। আর ধরা যায় না। খেলাটা বেলাভোর তাকে বসিয়ে রাখে, বিড়ি নিভে তেতো হয়ে যায়। তখন কখনও কমলি 'বাবা' বলে ডাক দিলে সে ভারী চমকে উঠে ভাবে—কে রে মেয়েটা?

ভুট্টার দানা দাঁতে নিতেই পোড়া ভুট্টার সুঘ্রাণে ভরে গেল শরীর। গেনিয়া কমলির দিকে চেয়ে হাসে, কমলি গেনিয়ার দিকে চেয়ে।

গেনিয়া আস্তে করে বলে—একটু নুন হলে—

কমলি তখন লক্ষ করে বাবার পিঠে একটা ডাঁশ বাইচে। তড়িতে উঠে গিয়ে আঁচল ঝাপটে ডাঁশ তাড়ায়....

বাবা মুখ তুলে বলে—কী রে?

—ডাঁশ।

বাবা আবার চুপ করে বসে থাকে। বিড়ি খায়।

—বাবা পাগলা ডাক্তারের খরগোশগুলো রোজ এসে বাদামের খেত ভেঙে যায়।

—তাড়িয়ে দিস।

—তাড়াই না বুঝি! এবার আমি একটা কুকুর পুষব। গেনিয়ার চমেলি কুকুরের বাচ্চা হোক—কেমন বাবা! হ্যাঁ?

—আচ্ছা।

বাবা বড় ভালো। কুকুরের ওপর মায়ের বড় রাগ।

সুনসান বাগানখানা রোদ মাখছে, বাতাস মাখছে। ফুলের গর্ভকোষে পরাগ-সঞ্চার করে ফিরছে পোকারা। তাদের ওড়াওড়ি শব্দ। ফুলের বেড লাফিয়ে-লাফিয়ে পার হয় গেনিয়া, পিছনে কমলি। নিস্তব্ধ ভয়াল বাড়িটার দিকে তাকালেই তাদের বুকে নানা ইচ্ছের রং এসে পড়ে।

দুজনে এসে বারান্দার গ্রিলের ভেজানো দরজা খুলে ঢোকে। বারান্দায় ওপাশে সারিবদ্ধ ঘর। বড় তালা ঝুলছে। বহুবার দেখেছে তারা, তবু রোজ একবার করে দরজার পাখি তুলে অন্দর দেখে। ভিতরে গোধূলির মতো অন্ধকার। তবু বিচিত্র আসবাব দেখা যায়। ইংলিশ বেড, ড্রেসিং টেবিল, জাপানি ফুলদানি, দেওয়ালে প্রকাণ্ড সব ছবি, খেলনার আলমারি, বইয়ের শেলফ। তারা ঘুরে এক-এক ঘরের দরজার পাখি তুলে এক-এক রকমের জিনিস দেখে। পনেরো দিন অন্তর ভূতনাথ দরজা খোলে, এতোয়ারি বালতি করে জল আনে, ঝাঁটা আনে। ঘর ধোলাই হয়। তখন ঘুরে ঢুকে এটা ওটা ছুঁয়েছে কমলি। গোনিয়াকে এতোয়ারি ঢুকতে দেয় না, বলে—ওটা চোট্টা। এক পলকে জিনিস তুলে উধাও হবে।

গেনিয়া তাই তৃষিত চোখে ভিতরটা দেখে। রোজ।

কিন্তু কমলি বেশিক্ষণ দেখতে দেয় না। গেনিয়ার চোখ বড্ড লোভী।

দরজার পাখি ফেলে দিয়ে কমলি বলে—আর না।

একগাল হাসে গেনিয়া, বলে—আলমারিতে একটা সোনার ঘোড়া আছে—না রে?

কমলি ঠোঁট ওলটায়, বলে—কী জানি! কত কিছু আছে!

উত্তরের ঘরটায় জানালায় একটা শিক নেই। গেনিয়া তা দেখে রেখেছে।

*

অন্ধ রামজি সারা সকাল বিছানায় শুয়ে। বুড়ো হলে শরীরের তাপ কমে যায় নাকি! বিছানার ওম বড় ভালো লাগে। বাঁশের ওপর খড় পাতা, তার ওপর চিটচিটে ন্যাকড়া আর ন্যাকড়া। এই বিছানা, তবু ওম দেয়! রাতে গেনিয়া শোয় পাশে, তার শরীরের ওমটিও ভালো লাগে। কোন ভোরবেলা উঠে গেছে গেনিয়া বুড়ো বাপকে একা ফেলে রেখে।

চোখ দুটো পাথর হয়ে গেছে বটে তবু আন্দাজে বেলা ঠাহর পায় রামজি। পেটে খিদে চাগাড় দিয়ে ওঠে। খিদের সঙ্গেই বসবাস, তাই অস্থির হয় না। ধীরেসুস্থে উঠে, মাচান থেকে নামতে-নামতে চেঁচিয়ে গেনিয়াকে ডাকে। ডাকটা কর্কশ, তবু ডাকের মধ্যে আদর আছে।

গেনিয়ার সাড়া পাওয়া যায় না। রামজি উঠে ঘরের পিছনের জঙ্গলে পেচ্ছাপ করে আসে। মাটির খোরায় দু-মুঠো ভেজানো ভাত আছে। জল খায়। তারপর গেনিয়াকে সঙ্গে করে রামজি বেরোবে মাংতে।

গেনিয়াকে আরও কয়েকবার ডাকে রামজি। সাড়া নেই।

মাটির খোরায় হাত দিয়েই টের পায়, একটা অবধি ভাতও খুঁটে খেয়ে গেছে রেন্ডির ব্যাটা। বুড়ো বাপের জন্যে একদানাও রেখে যায়নি।

—এ গেনি—ইই—রেন্ডির ব্যাটা—

রোদে বসে প্রাণপণ ডাক দিতে থাকে রামজি—ভিখমাঙ্গা সুরদাস।

এ বাড়ির কলে কেমন হিলহিল করে জল পড়ে। মিঠে জল। হাঁটু গেড়ে কলের তলায় বসে আঁজলা ভরে জল খায় গেনিয়া। অদূরে চৌবাচ্চার চাতালে বসে মাথার চুলে আঙুল ডুবিয়ে গম্ভীর মুখে উকুন খোঁজে কমলি।

জলে পেট ভরে ওঠে। তবু কল থেকে জল পড়া দেখতে ভালো লাগে বলে গেনিয়া আঁজলা পেতে মুখ ডুবিয়ে রাখে। জল পড়ে যায়।

কমলি উঠে এসে কল বন্ধ করে বলে—জল মাগনা না? এবার ভাগ।

আউট-হাউসের সামনে শাকের খেত। সেখান এতোয়ারি খুঁটে-খুঁটে শাক তুলছে। সেইখান থেকেই দেখতে পায় ভিখমাঙ্গা সুরদাসের চোর ছেলে গেনিয়াটার সঙ্গে কমলি বাইরের কলের চাতালে বসে। মেয়েটার নজর নীচু হয়ে যাচ্ছে। সে ডাক দেয়—এ কমলি —

কমলি চলে যেতেই এক লাফে গেনিয়া ভুট্টার খেতে সেঁধোয়। মট-মট করে ভুট্টা ভেঙে নেয় আট দশটা। বুকে জড়ো করে ধরে নিঃসাড়ে বাড়ির উত্তর দিকের ধার ঘেঁষে দ্রুত পায়ে এগোয়। কাঁটা বেড়ার ভিতরে একটা গোপন ফোকর আছে, তাই দিয়ে গলে রাস্তায় পড়ে।

গেনিয়ার পায়ের শব্দ পেতেই রামজি নিঃসাড়ে লাঠিটার দিকে হাত বাড়ায়।

—আওল তু?

গেনিয়া উত্তর দেয় না। কিন্তু তবু তার শরীরের অবস্থিতি টের পায় রামজি। লাঠিটা আচমকা তুলে প্রাণপণে বসায়।

কিন্তু গেনিয়ার অভ্যাস আছে। খরগোশের মতো লাফ দিয়ে সরে যায় সে। বুক থেকে দুচারটে ভুট্টা খসে পড়ে। লাঠিটা মাটিতে পড়ে খট করে ওঠে।

—রেন্ডির ব্যাটা, শরম নেই? বুড়ো আন্ধা বাপের জন্য একটা দানা রেখে যাসনি।

দূর থেকে বাপের দিকে একটা ভুট্টা ছুড়ে মারে গেনিয়া। সুরদাস রামজি প্রথমটায় চেঁচিয়ে ওঠে—আমাকে মারছিস শালা চুহা? অ্যাঁ! আমাকে—বুড়ো আন্ধা বাপকে তোর—অ্যাঁ?

আবার লাঠিটার দিকে হাত বাড়াতে গিয়ে ভুট্টাটা হাতে পায়ে। তুলে নেয়। খোসা ছাড়িয়ে হাত বোলায় দানাগুলের গায়ে। তারপর হাসে।

—কোথায় পেলি? ভুতুয়ার বাগানে বুঝি! একটু সেঁকে দিবি গেনি? একটু আগুন কর না ব্যাটা।

গেনিয়া উত্তর দেয় না। চুপচাপ ঝোপড়ায় ঢোকে আর ক্যাম্বিসের ময়লা ছেঁড়া টুপিটা পরে বেরিয়ে আসে!

তার বাবা ভিখমাঙ্গা সুরদাস রামজি রোদে বসে ভুট্টার দানা ভাঙে দাঁতে। মুখে, শরীরে খড়ি উঠছে, চোখের কোল ফোলা-ফোলা, উড়ো চুল, ভাঙা গালে দাড়ি আর ন্যাকড়া পরা লোকটাকে অমানুষের মতো দেখায়। গেনিয়ার চোখে অবশ্য বাপের কোনওটাই অস্বাভাবিক ঠেকে না।

সে লাঠিটা বাড়িয়ে দিয়ে বলে—চলি চল।

সুরদাস রামজি বাতাস হাতড়ে লাঠিটা ধরে উঠে দাঁড়ায়।

ভিক্ষের বাজারে এখন আকাল। বাড়িগুলো খালি পড়ে আছে। বৈদ্যনাথধামে কোনও তীর্থযাত্রার সময়ও এটা নয়। শহর তাই ফাঁকা। নিরিবিলি রাস্তায় দুজন হাঁটে—লাঠির দুই প্রান্তে দুজন। সঙ্গে গা-ঘেঁষে হাঁটে চমেলি কুকুর।

—সেই রেন্ডিটার কাছে তুই যাস নাকি?

—না তো?

—না তো! অ্যাঁ? আমি টের পাই না ভেবেছিস? আন্ধা বলে টের পাই না? তুই যাস?

—কখন গেছি?

—রোজ যাস। মাঝে-মাঝে আমি তোকে ডেকে পাই না কেন? তুই গিয়ে ওইখানে ভালোমন্দ গিলে আসিস। ঘুমোলে আমি তোর পেট হাতিয়ে টের পাই তোর পেট ঢাক হয়ে আছে। কোথায় খেতে পাস তুই?

—না। কির—

—কীসের কির?

—বৈদ্যনাথজির।

সুরদাস চুপ করে থাকে। রেন্ডিটা চার বছর তাকে ছেড়ে গিয়ে মহিন্দরের ঘর করছে লাইনের পারে। ছেলেটাকে ফেলে গেছে—কিন্তু ছেলেটা মাঝে-মাঝে মা পানে ছুটতে চায়। অন্ধের নড়ি, এটা ছুটে গেলে সুরদাস রামজির নৌকো হাল ছাড়বে। তাই সে সাবধান করে দেয়।

—যাবি না কখনও। আমি তোকে খাওয়াব, দেখিস। আমার পয়সা আছে।

—জানি।

শুনে অমনি খরগোসের মতো তার কান খাড়া হয়ে ওঠে। মিহিন সতর্ক গলায় বলে—কী জানিস?

—পয়সার কথা।

রামজি ভারী বিপদে পড়ে যায়। জানে নাকি! সত্যিই জানে! আনমনে হাঁটে। হঠাৎ বলে তাড়াতাড়ি চল। গাড়ি আসছে।

—কোথায়?

—এই যে মাটি কাঁপছে! টের পাচ্ছিস না?

গেনিয়া টের পায় না। তার বাপ এইসব টের পায়।

উদাসী স্বামীর চেয়ে ঝগড়াটে মারকুটে স্বামী ভালো। তার স্বামী ভূতনাথ যে উদাসী তা বুঝতে একটু সময় লেগেছে এতোয়ারির। সে যখন মেহদিতে হাত পায়ের নকশা করত, কপালে পরত টিকলি, চোখে সুর্মা, তখন কদাচিৎ ভূতনাথ তার সে সাজগোজ লক্ষ করত।

বোধহয় পশ্চিমা সাজ ওর পছন্দ নয়—এই মনে করে এতোয়ারি তারপর পায়ে পরত আলতা, সিঁথিতে ভুরভুরে লাল সিঁদুর দিত, ডানদিকের বদলে বাঁ-দিকে আঁচল নিত। তারপর বুঝল, লোকটা এ সব দেখে না। বাগানের মাটি ঘেঁটে-ঘেঁটে মাঝে-মাঝে চুপ করে ঝিম মেরে থাকা—ওই হচ্ছে ওর স্বভাব। এই ভেবে এতোয়ারির বুক ভারী হয়েছে কতবার। এখন সয়ে গেছে। এতোয়ারি ঝগড়াটে কম নয়। কিন্তু এ লোকটার সঙ্গে সে ঝগড়া করে না। বয়সে ভূতনাথ তার চেয়ে অনেক বড়। এখনই মানুষটার চুলে পাক ধরে গেছে। সবসময়ে চিন্তা নিয়ে থাকে বলে মুখে গম্ভীর বুড়োটে ভাব। এইসব মিলে একটা সমীহের ভাব আসে এতোয়ারির মনে। তার ওপর মানুষটা ভিনদেশি।

দুপুরে খেয়ে মানুষটা বাইরের খাটিয়ায় বসে বিড়ি ধরিয়েছে। তেমনি উদাস ভঙ্গি। এঁটো ফেলতে বাইরে এসে একপলক নীরবে স্বামীকে দেখল। দেখতে ভালোই লাগে। একটু পরেই কমলি খেয়ে এসে বাপের হাত-পা দাবাতে বসবে। তখন রাজ্যের গল্প ফাঁদবে কমলি। তারপর গল্পের মাঝখানেই কখন বাপের বুক ঘেঁষে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়বে। পিপুলের ছায়ায় রোদের একটা জাল মৃদুমন্দ নড়বে ওদের মুখে, শরীরে।

ইস্টিশানে বাপ-ব্যাটাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে চমেলি কুকুর রোজ ল্যাং-ল্যাং করে একা ফেরে। মাঝে বাতাস শুঁকে দাঁড়ায়, এধার যায় ওধার যায়। ঘুরে ফিরে এক সময়ে ঠিক দুপুরবেলা এসে দাঁড়ায় কমলিদের উঠোনে। দাঁড়িয়ে হাঁক ছেড়ে জানান দেয় যে সে এসেছে। কমলিও তৈরি থাকে শেষ কয়েকটা গ্রাস সে খায় না। সেটা মুঠোভরে নিয়ে দৌড়ে আসে। নাড়তে-নাড়তে ল্যাজটা বুঝি আনন্দে খসেই যায় চমেলির। যদিও সে গেনিয়ার কুকুর, তবু বাপ-ব্যাটার খাওয়ার পর ভুক্তাবশেষ কিছুই থাকে না বলে চমেলির পেট ভরে না। প্রায়দিনই তাই তাকে কমলির কাছে আসতে হয়। দু-মুঠো ভাতের পরিবর্তে সে বিস্তর অত্যাচার সহ্য করে যায়। কমলি চিরুনি দিয়ে তার গা আঁচড়ে দেয়, মেহদি বেটে গায়ে নকশা আঁকে, গলার চামড়া টেনে আদর করে।

ভাঙা একটা সানকি পড়ে আছে আঁস্তাকুড়ে। তাতে পাতের ভাত ঢেলে দিয়ে কমলি চমেলির সঙ্গে কথা বলে—কঁহা গৈল তোহর মালিক। বিজনেসমে?

শুখা অন্ধকে লোকে খুব একটা দয়া করে না। বিজনেস ভালো হয় গলায় গান থাকলে।

সেই কথা মাঝে-মাঝে বাপকে বোঝায় গেনিয়া। কিন্তু সুরদাস রামজির গানের গলা নেই। হাঁ করলে ফাটা বাঁশের আওয়াজ বেরোয়।

—তুই শেখ গেনি। হিন্দি ফিলিমের গানা দু-চারটে কাবেজে রাখ।

গেনিয়ার লজ্জা করে। আড়ালে অবশ্য সে গায়। গাইবার চেষ্টা তার আছে। দুটো চ্যাপটা পাথর আঙুলে বাজিয়ে যশিডির ভিখন এই এত পয়সা রোজগার করে। দুটো পাথর গেনিয়ারও জোগাড় আছে।

সন্ধেবেলা সীতারামপুর কি ঝাঁঝা থেকে ফিরতি গাড়ি ধরে ফেরে বাপ-ব্যাটা। ঝোপড়ার কাছে এসে বাপকে একা ছেড়ে দেয় গেনিয়া, তারপর পিছন ফিরে জোর কদমে হাঁটতে থাকে। পিছন থেকে তার বাপ প্রাণপণে তাকে ফিরে ডাকে, শাপ-শাপান্ত করে, মিনতি করে, গেনিয়া ফেরে না। এক দৌড়ে লাইন পার হয়ে চলে আসে গুমটি ঘরের পিছনে ব্যারাকবাড়িতে। রোজ সন্ধেবেলা গান গায় মহিন্দর—যার সঙ্গে তার মা আছে এখন। পুরোনো একটা হারমোনিয়ম আছে মহিন্দরের, খাটিয়ায় চাগিয়ে বসে সে, এক পা তুলে দেয় হারমোনিয়মের ওপর গোড়ালি দিয়ে বেলো করে, দুই হাতে রিড চেপে আওয়াজ বের করে হারমোনিয়মের। দরাজ গলায় গান গায় তার সামনের দুটো উঁচু দাঁতে দু-ফোঁটা সোনা চিকচিক করে। শৌখিন লোকটা। তার সামনে চমেলির মতোই খাপ পেতে বসে থাকে গেনিয়া। মনপ্রাণ দিয়ে গান শোনে, তুলে নিতে চেষ্টা করে মনে-মনে।

তার মায়ের দুটো বাচ্চা হয়েছে, তারা কিলকিল করে ঘরে। চেঁচায়। আস্তে-আস্তে রাত বেড়ে যায়। প্রায় দিনই পেঁয়াজ রসুন আলুর চচ্চড়ি দিয়ে মা তাকে বাচ্চা দুটোর সঙ্গে ভাত খাইয়ে দেয়। ভাত দিতে-দিতে বলে—খবরদার, ওই বুড়োটার মতো ভিখিরি হবি না।

গেনিয়া হাসে—কিন্তু গান জানলে মাঙ্গা ভালো বিজনেস।

—হোক গে, তোর তাতে দরকার নেই। বুড়ো মরলে আমি তোকে নিয়ে আসব।

কথাটা কাজের নয়। গেনিয়া জানে, শত হলেও মা তার পরের ঘর করে। মহিন্দরের দুটো ভৈষ আছে, একটা চায়ের দোকান আছে বটতলায়, সেই দোকানে চোর ছ্যাঁচোড়দের আড্ডা। বড় রাগি মহিন্দর। মাকে মাঝে-মাঝে বাশডলা মার দেয়। নিজের পায়ের বুড়ো আঙুলে থুথু ফেলে মাকে দিয়ে চাটায়। এক-এক বেলা বেঁধে রেখে চলে যায়, কতদিন গিয়ে সেই দৃশ্য দেখে ভয়ে পালিয়ে এসেছে গেনিয়া, মার মুখ দিয়ে টসটসে রক্ত পড়ে শুকিয়ে আছে, চোখ ফোলা, পিছমোড়া করে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় অসহায় বসে আছে, দুটো বাচ্চা সেই অবস্থাতেই বুক খুলে চুষছে। এ সবের চেয়ে তার সুরদাস অন্ধ ভিখমাঙ্গা বাপের কাছেই সে সুখে আছে। যদিও বুড়োটা খচাই, পয়সাকড়ি কোথায় যে লুকোয় কে জানে, তবু গেনিয়ার বিশ্বাস, বুড়োর তবিল একদিন সে-ই পাবে। বুড়ো মরলে সে একদিন ঝোপড়াটা তোলপাড় করে দেখবে, মাটি খুঁড়বে, ঝোপড়া ভেঙে বাঁশের গর্তে খুঁজবে। থাকবেই কোথাও না কোথাও। সেই পয়সায় ঘর ভাড়া নেবে সে, কিনবে হারমোনিয়ম, গলায় বেঁধে চলে যাবে ট্রেনে-ট্রেনে, বিজনেস করে এত পয়সা নিয়ে আসবে।

গেনিয়া রাত করে ফেরে। হঠাৎ পৃথিবীর সব দারিদ্র্য মোচন করে শাঁকালুর মতো সাদা একটা ক্ষয়া চাঁদ তার দুধ ঝরিয়ে দেয় চারদিকে। সাদা ফটফটে ইউক্যালিপটাস গাছ বেয়ে দুধ ঝরে পড়তে থাকে। ফুলের গন্ধে ম-ম করে বাতাস। নির্জন রাস্তায় বেভুল দাঁড়িয়ে পড়ে গেনিয়া। তারপর আনন্দে উদ্ভাসিত গলায় গান ধরে সে, দু-চক্র নাচ নেচে নেয়, পাথর তুলে দু-হাতে খঞ্জনির মতো বাজায়।

গেনিয়া এগোতে থাকে। সামনেই কমলিদের বাড়ি। বাগানের গাছপালার ভিতর দিয়ে দেখা যায়। ওদের ঘরে বিজলির আলো জ্বলছে। বড় বাড়িটা অন্ধকার, বাইরের ফটক বন্ধ। চারদিক নিঃঝুম। সেই নিঃঝুমতার মধ্যে একটা সোনার ঘোড়া আকাশ থেকে লাফ দিয়ে নামে। দুধের মতো স্বাদু জ্যোৎস্নায় সেই ঘোড়াটাকে গেনিয়া মনশ্চক্ষে দেখে আর দেখে। সোনার দাম অনেক। গেনিয়া জানে।

অভাবের সংসার বলেই তার মা অভাবী অন্ধ বাপকে ছেড়ে গেছে। খুব বেশিদূর যেতে পারেনি অবশ্য। লাইনের ওপারে রাগি মহিন্দরের লাথিঝাঁটা খেয়ে আছে। সোনার ঘোড়াটা পেলে সে ঝোপড়া ভেঙে পাকা ঘর তুলবে একটা। রাগি মহিন্দরের কাছ থেকে নিয়ে আসবে মাকে। সুরদাস ভিখমাঙ্গা রামজি শীতের রোদে একখানা ভাগলপুরি চাদর গায়ে দিয়ে রোদ পোয়াবে। আর গেনিয়া গলায় হারমোনিয়ম বেঁধে চলে যাবে যশিডির মেল ট্রেন ধরে ঝাঁঝা কিংবা মধুপুর হয়ে গিরিডি অবধি।

নিঃসাড়ে গেটটা ডিঙোলো গেনিয়া। গাছগাছালির ভিতরে-ভিতরে দুধ টলটল করছে। ছায়া পড়ছে বিচিত্র। তার ছায়াটা ঠিক যেন ন্যাংটো মানুষের ছায়া। গাছপালা ভেদ করে সে ধীরে-ধীরে অন্ধকার বাড়িটার ছায়ায় এসে দাঁড়ায়। চারদিকে চেয়ে দেখে। কোনওখানে কোনও নড়াচড়া নেই।

উত্তরের জানলাটার সামনে এসে দাঁড়ায়, জানলাটার একটা শিক ভাঙা। সন্তর্পণে জানলার পাল্লাটা টেনে দেখে সে। বন্ধ হলেও খুব আঁট নয় পাল্লাটা। ঢকঢক করে একটু নড়ে। গেনিয়া একটা পাল্লা চেপে ধরে আর-একটা টানে, মাঝখানে এক আঙুল পরিমাণ একটা ফাঁক দেখা যায়। ডান হাতের কচি আঙুলগুলো ঢোকে, আটকায় হাতের তেলোটা। প্রাণপণে পাল্লাটা টেনে ধরে গেনিয়া। আপ্রাণ চেষ্টা করে হাত ঢোকাতে। ভারী পাল্লাদুটো কামড়ে ধরে তার কচি হাত, চিবিয়ে খেতে থাকে। তবু ছিটকিনির গোল মুখটা তার আঙুলে লাগে। কিন্তু সেটাকে ধরার মতো অবস্থা তার হাতের নয়। তার ওপর পাল্লা টান থাকায় ছিটকিনিটা শক্ত হয়ে জমে আছে। তবু সে চেষ্টা করতে থাকে। জানলার দুই ভারী পাল্লা রাক্ষসের মুখের মতো নিবিড় আনন্দে তার হাতখানা চিবোতে থাকে। যন্ত্রণায় সে গোঙানির শব্দ করে।

কাছেপিঠে একটা কুকুর ডাকছে। হারামিরা হরবখত কেন যে ডাকে গেনিয়া ভেবে পায় না। হাতটা টেনে বের করার সময়ে ছাল ছড়ে যায়, হাতটা জ্বালা করতে থাকে খুব। জ্যোৎস্নায় বাগানের মধ্যে সে একটুকরো কাঠ কি কাঠি খুঁজে দেখে। পেয়েও যায়। ছোট একটুকরো পাতলা কাঠ। আবার জানলা ফাঁক করে সে কাঠের গোঁজা ঢোকায়। তারপর আবার হাত ভরে। ক্রমে-ক্রমে প্রচন্ড চেষ্টায় সে কবজি পর্যন্ত ঢুকিয়ে দিতে পারে।

কুকুরের ডাকটা এগিয়ে আসছে। দূরে কমলির গলা শোনা যাচ্ছে। সে ডাকছে—চমেলি—এ চমেলি—ই-ই-ই—

কুকুরটা চমেলিই। রেন্ডি কোথাকার। ভাতের লোভে দু-বেলা এইখানে এসে বসে থাকে।

নিবিষ্ট মনে ছিটকিনির মাথাটা ধরার চেষ্টা করতে থাকে গেনিয়া। ধরেও। সেই সময়ে ঝোপঝাড় ভেঙে ছুটে আসে চমেলি। দুটো বুকফাটা আনন্দের ডাক দিয়ে সে কুঁইকুঁই করতে-করতে প্রবল ল্যাজের তাড়নায় গেনিয়ার দুই পায়ের ফাঁকে মাথা গুঁজে দেয়। লাফিয়ে ওঠে গায়ে, পা চেটে দেয়।

—রেন্ডি! চাপা গলায় গাল দেয় গেনিয়া। তারপর প্রবল লাথি কষায় একটা। কেঁউ করে ছিটকে পড়ে চমেলি। পরমুহূর্তেই অপমান ভুলে আবার কুঁইকুঁই করে এগিয়ে আসে, ল্যাজের ঝাপটা মারে, নানারকম আদরের শব্দ করতে থাকে। ওদিকে গেনিয়ার আঙুলের ডগায় ছিটকিনিটা ঘুরে যাচ্ছে। বিনবিন করে ঘাম ফুটে উঠছে তার মুখে।

একটা টেমি উঁচু করে ধরে ধীরে-ধীরে এগিয়ে আসছে কমলি, ডাকছে—চমেলি—এ চমেলি—ই—ই—

ছিটকিনিটা ঘুরছে। ঘুরে যাচ্ছে। ঘরের ভিতরে অন্ধকারে লাফ দিচ্ছে সোনার ঘোড়াটা। ঘুরছে ঘরময়। বেরোবার পথ খুঁজছে। কিন্তু হাতটা জ্বলে যাচ্ছে গেনিয়ার, মটমট করছে হাতের হাড়, ব্যথায় নীল হয়ে যাচ্ছে সে। কামড়ে ধরছে জানালার পাল্লা, দাঁতে-দাঁত ঘষছে।

ধোঁয়াটে টেমি হাতে এগিয়ে আসছে কমলি ডাকছে চমেলি—ই—

গেনিয়ার দুপায়ের ভিতর থেকে আনন্দে সাড়া দিচ্ছে চমেলি।—ঘে-উ-উ—ঘেউ—

ঠক করে ছিটকিনিটা উঠে পাল্লাটা হাঁ হয়ে যায়। অবশ হাতটা পড়ে যায় গেনিয়াব। আর এক হাতে কবজিটা চেপে ধরে গেনিয়া। আর-একটা লাথি কষায় চমেলির পেটে।

চোখের পলকে গেনিয়া জানালায় উঠে পাল্লাটা টেনে দেয়। বাইরে জানলার দিকে মুখ করে প্রবল চিৎকার করতে তাকে চমেলি। টেমির আলোটা উঁচু করে ধরে একটু দূরে দাঁড়িয়ে কমলি দৃশ্যটা দেখে। তার ভয় করতে থাকে।

সে হঠাৎ পিছন ফিরে বাবা আর মাকে ডাকতে-ডাকতে দৌড়োতে থাকে।

অন্ধকারে এক ঘর থেকে আর-এক ঘরে চলে যায় গেনিয়া। দরজার গায়ে হাতড়ে ছিটকিনি খোলে, আর এক ঘরে যায়। ধাক্কা খায় আসবাবপত্রের সঙ্গে। হোঁচট খায় কার্পেটে, পাপোশে। অন্ধকারে ঠাহর পায় না, তবু প্রাণপণে সেই ঘরটা খুঁজতে থাকে যে ঘরে আলমারি, আলমারিতে সোনার ঘোড়া। খুঁজতে-খুঁজতে ঘুরে মরে। দুটো ঘর খুলে তৃতীয় ঘর খুলতে গিয়ে সে ভারী বেকুব বনে যায়। এ ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। দরজা হাতড়ে সে এই তত্ব বুঝে যায়। এইটাই মাঝখানের ঘর বলে তার বোধহয়। এই ঘরেই সেই আলমারিটা রয়েছে। দরজাটা আক্রোশে প্রাণপণে টানে সে। পাথরের মতো অনড় থাকে ভারী পাল্লা। অনেকক্ষণ চেষ্টা করে সে! বৃথা তারপর হাঁফিয়ে যায়। ক্লান্ত লাগে।

অন্ধকারে সে তখন বেভুল ঘোরে। ধাক্কা খায়। আবার ঘোরে। রাস্তা ঠিক করতে পারে না। ইঁদুর দৌড়োয় মেঝের ওপর দিয়ে। আরশোলা পিড়পিড় করে। বাইরে থেকে চেনা বাড়িটা ভিতর থেকে অন্ধকারে কেমন ভীষণ অচেনা লাগে। সে প্রতিটি জানলা হাতড়ায়। শিকভাঙা জানালাটা খুঁজে পায় না কিছুতেই। বাইরে চমেলি আর ডাকছে না। নিঃঝুম হয়ে গেছে চারধার। এখন গেনিয়া করে কী? যদিও সে চোর, রেন্ডির ব্যাটা, ভিখমাঙ্গা, তবু তারও আছে ভয়ডর। কমলি গেছে লোকজন ডেকে আনতে। এদিকে অন্ধকারে ভুল রাস্তায় টক্কর খেয়ে মরছে সে। বন্ধ দরজার ওপাশে—সে স্পষ্টই টের পায়—সোনার ঘোড়াটা চক্কর দিয়ে ফিরছে। বেরোবার রাস্তা পাচ্ছে না।

ভূতনাথের হাতে মশাল, কমলির হাতে টেমি। তারা দুজন বাড়িটা ঘুরে-ঘুরে দেখে। জানলাগুলি টেনে দেখে ভালো করে। সবই ঠিক আছে। উদাস গলায় ভূতনাথ বলে—কোথায় কী! তুই ভুল দেখেছিস।

তারপর নিশ্চিন্ত মনে তারা শুতে যায়।

গভীর রাতে ঘুমের ঘোরে শীতবোধ করে সুরদাস রামজি। আজ বিছানায় তেমন ওম নেই। ওম-এর জন্য খুঁতখুঁত করে সে কোঁকায়। ঘুমের ঘোরেই বিছানা হাতড়ে গেনিয়াকে খোঁজে। অন্ধের নড়ি। ওর শিশু শরীর বুকের মধ্যে নিলে তাপ আসে। কিন্তু বিছানাটা

শূন্য। কোনও চোরচোট্টার শাগরেদি করতে গেছে গেনিয়া কে জানে? নাকি ওই রেন্ডিটা ফুসলে রেখে দিল! হা ভগবান, জীবনভর তবে দুনিয়া হাতড়ে প্রাণটা যাবে তার। আধোঘুমেই সে গাল পাড়ে, বিলাপ করে। আবার ধীরে-ধীরে ঘুমিয়ে পড়ে।

বাইরের উঠোনে জ্যোৎস্নার নদী বয়ে যাচ্ছে। চমেলি সেই দৃশ্য দেখে মাঝে-মাঝে ঘুমচোখে খায়। একটা দুটো ডাক ছাড়ে। আবার কুণ্ডলী পাকিয়ে চোখ বোজে।

রাত বাড়ে।

নরম গদির ইংলিশ বেড-এর ওপর উদোম গায়ে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে গেনিয়া! ভারী ক্লান্ত সে। কেঁদেছিল, চোখের জল শুকিয়ে আছে গালে। দু-এক ফোঁটা জমে আছে চোখের কোলে।

মাঝরাতে বাগানের ছায়াগুলো বেঁকে ভেঙে যাচ্ছিল। জ্যোৎস্না তীব্র হয়েছে, ফুলের গন্ধে গাঢ়, মন্থর হয়েছে বাতাস।

দুঃখীদের জন্য স্বপ্নের সন্ধানে বেরিয়েছেন ঈশ্বর। আনাচে-কানাচে ঘুরে তিনি চরাচর থেকে স্বপ্নদের ধরেন নিপুণ জেলের মতো। আঁজলা ভরা সেই স্বপ্ন তিনি আবার ছড়িয়ে দেন। মাঝরাতে তারার গুঁড়োর মতো সেই স্বপ্নেরা ঝরে পড়ে পৃথিবীতে।

গেনিয়া দেখে সোনার ঘোড়ার পিঠে চেপে তারা চলেছে। পিঠের কাছে অন্ধ বাপ, তার কোমর জড়িয়ে মা। গেনিয়ার দুই হাতে খঞ্জনির মতো দুটো পাথর। সে পাথর বাজিয়ে ভারী সুন্দর গান গাইছে। সামনেই সোনালি নদী, নদী পেরোলেই আকালের দেশ শেষ হয়ে যাবে। ওই পাড়ে ভিক্ষে পাওয়া যাবে খুব।

চোখে জল নিয়েই ঘুমের মধ্যে একটু হাসে গেনিয়া।

মুনিয়ার চারদিক

লেবুগাছের গোড়া থেকে মুখ তুলল কালো একটা সাপ। মুখ তুলে সে একটা অদ্ভুত সুন্দর দৃশ্য দেখল। শীতের কুয়াশায় আবছা সকাল, রোদ এখনও নিস্তেজ সোনালি। সেই সুন্দর আলোয় ডালিম গাছের ডগায় একটি ছোট্ট ফলের দিকে হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে মুনিয়া। দু-পায়ের আঙুলের ওপর ভর, দেহটি টান, উৎকণ্ঠ মুখটি ওপরে তোলা, দু-কাঁধে এলো চুলে ভেঙে পড়েছে। তার সোনালি ফ্রক, নীল একটি সালোয়ার, পায়ে চপ্পল, মাথায় ডালিমপাতা খসে পড়েছে, পায়ে শিশির আর কুটোকাটা। বড় সুন্দর সকালটি, মেয়েটি সুন্দর, যেমন সুন্দর আলো—সাপটা দেখল। কিন্তু শীত বাতাসে তার শরীর অসাড় হয়ে আসে, কেঁপে উঠে সে মুখ ফিরিয়ে নেয়। লেবুগাছের গোড়ায় তার গর্তর দিকে এগোয়। তার শরীর পাকে-পাকে খুলে দীর্ঘ হয়ে যেতে থাকে। এত দীর্ঘ হয় যে তা প্রায় ডালিম গাছের গোড়া পর্যন্ত চলে যায়, যেখানে মুনিয়ার গোড়ালি।

বাঁ-হাতে একটি ডাল নামায় মুনিয়া। সে ডালটার টানে গাছটা ঝুঁকে আসে। ডান হাতে বড় ডালটা ধরে মুনিয়া। ক্রমে ছোট্ট ডালিমটা নাগালে আসে। মুনিয়া ছিঁড়ে নেয় ফলটা। দাঁতে ঠোঁট টিপে সুন্দর হাসে। শ্বাস ফেলে। তারপর গোড়ালির ওপর ভর দিয়ে দাঁড়ায়। হাতে ডালিম ফল, তাতে কয়েকটা লালচে সবুজ পাতা।

তীব্র ব্যথায় কালো সাপ তার মুখখানা ফিরিয়ে দেখে। সেই সুন্দর আলো, সুন্দর মেয়েটি। কালো সাপ মুখ ফিরিয়ে নেয়। শ্বাস ফেলে। শরীর টেনে নিয়ে চলে যেতে চায় উষ্ণ গর্তটিতে। সে ব্যথা ভুলবার চেষ্টা করে, সুন্দর শীতের বেলাটিকে দেখে।

মুনিয়া কিছুই টের পায় না। সুন্দর শিশিরে ভেজা ডালিমটা তার হাতে। সে বড় অন্যমনস্ক। ফুটফুটে চপ্পল পরা পা বাড়িয়ে সে এক পা এগোয়।

ব্যথায় নীল হয়ে যায় কালো সাপ। তার দীর্ঘ দেহের কোনও উৎস থেকে অন্ধকারের স্রোতের মতো তীব্র রাগ ছুটে আসে, আসে হিংসা, ভয়। শীত ভুলে সে তার শরীর তুলে দোল খায়। তারপর সমস্ত অস্তিত্ব নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। চলে যাওয়ার সময় সে ভিক্ষুকের মতো রিক্ত বোধ করে। মুনিয়ার কাছে, সুন্দর শীতের বেলাটির কাছে।

মুনিয়া প্রথমে ভারী অবাক হয়ে দৃশ্যটা দেখে। এত অপ্রত্যাশিত, এত অদ্ভুত। কালো সাপটা তার পায়ের ওপর দিয়ে ছলকে সরে যায়, এক ঝলক ছোট ঢেউয়ের জল যেন। তার ফুটফুটে সাদা পায়ের পাতায় দুটি ছুঁচের মুখের মতো লাল ফোঁটা ধীরে-ধীরে ফুটে উঠেছে। সমস্ত শরীর ঝিন-ঝিন করে, শরীরের ভিতর বিদ্যুতের মতো চমকায়।

একটু সময় লাগে বুঝতে। তারপর বোঝে মুনিয়া।

—মা—গো—ও—

খুব ভোরবেলায় উঠে পরাগ অনেকক্ষণ দৌড়োয়। পায়ে কেডস, গায়ে গরম জামা, পরনে খাটো প্যান্ট। দৌড়ে এসে সে খানিকটা জিরোয়। তারপর খোলা ছাদে উঠে আসে। অনেকগুলো বেন্ডিং করে, পা তুলে লাফায়, হাজার স্কিপিং করে। করতে-করতে নটা বেজে যায়। শীতের বেলা, তাই বেলা বোঝা যায় না। কুয়াশায় জড়ানো রোদে সোনালি রং লেগে থাকে, ভোরের মতো। এ বছর সে একটা বড় টিমে ফুটবল খেলবে—এই কথা ভাবতে-ভাবতে পরাগ তার শরীরে আর মনে একরকমের উষ্ণ আনন্দ বোধ করে। তার পোষা চন্দনা পাখিটিকে কাঁধে নিয়ে সে ব্যায়ামের শেষে সারা ছাদে ঘুরে বেড়ায়। হাতে মুঠো ভরতি ভেজা ছোলা, আর আদার কুচি। সে খায়, খায় তার পাখিটা একই মুঠো থেকে। পাখিটা তার আঙুল কামড়ে ধরে। পা দিয়ে তার মুঠো খুলবার চেষ্টা করে। পরাগ হাসে, পাখির মোলায়েম গায়ে তার কিশোর গাল ঘষে দেয়। পাখি তার পায়ের থাবায় পরাগের হাতের আঙুল জড়িয়ে দোল খায়।

এ সময়ে প্রতিদিনই ছাদের দক্ষিণের রেলিং দিয়ে ঝুঁকলে সে মুনিয়াদের বাগান দেখতে পায়। মুনিয়াদের বাগানে গাছপালা ঘন, সবুজ। মুনিয়া বাগানে ঘোরে। ফুল তোলে, পেয়ারা পাড়ে, কখনও সখনও পরাগদের ছাদের দিকে তাকায়। পরাগ তার পাখিকে আদর করতে-করতে মুনিয়াদের বাগানে রোজ সকালে মুনিয়াকে দেখতে ভালোবাসে।

আজও দেখছিল। সোনালি ফ্রক পরনে, আর নীল সালোয়ার, গলায় গরম সাদা একটা মাফলার—মুনিয়া এই বেশে ডালিমের উঁচু ডাল থেকে ডালিম পাড়ছে।

পাখিটা তার মুঠো খুলবার চেষ্টা করছে, হাতের আঙুল দিয়ে একটা ছোলা ফেলে দিল পরাগ। পাখিটা লাফিয়ে নামল। মুনিয়ার টান শরীরখানা ধীরে-ধীরে ডালিমের নাগাল পাচ্ছে—এই দৃশ্য কুয়াশা ভেদ করে আগ্রহভরে দেখছিল পরাগ। দেখছিল, কেমন সুন্দর সাদা হাতে পাতাসুদ্ধু ডালিমটা ছিঁড়ে আনল মুনিয়া। সে ঝুঁকে বলতে যাচ্ছিল—মুনিয়া, কী রে?

ঠিক সে সময়ে কালো বিদ্যুৎ স্পর্শ করল মুনিয়াকে। পরাগ কুয়াশায় কিছু দেখেনি। শুধু দেখল, মুনিয়া উবু হয়ে বসে পা চেপে ধরেছে, ডাকছে—মা গো—

পরাগ তার মুঠো খুলে ভেজা ছোলা ছড়িয়ে দিল, ভুলে গেল তার প্রিয় পাখিটাকে। সে দৌড়ে ছাদের দরজা দিয়ে সিঁড়িতে নামল। পাখিটিও শুনেছিল মুনিয়ার সর্বনাশের ডাক। তবু নির্বিকার লাফিয়ে ঘুরতে লাগল গড়ানো ছোলার ওপর। ঘুরতে লাগল, আর আনন্দে পাখা ঝাপটে চিৎকার করতে লাগল।

দীর্ঘদিন লক আউটের পর কারখানা খুলছে। খুলবার আশা ছিলই না প্রায়! একবার শোনা গিয়েছিল, মালিক কারখানা তুলে নিয়ে যাচ্ছে গুজরাতে। আর একবার শোনা গেল, কারখানা বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। প্রতিদিনই সুবিনয় ভোরবেলা এসেছে কারখানায়। দূর থেকে দেখতে পেত কারখানায় গেট-এর সামনে নীরব মানুষ দাঁড়িয়ে আছে, তাদের হাতে পতাকা, ফেস্টুন, বুকে ব্যাজ, কিন্তু মুখে নিরাশা। কারখানার দেওয়াল জুড়ে দাবিপত্র। প্রতিদিন একই দৃশ্য। নীরবে প্রতিটি ভোরে কারখানার সামনে সেই নৈরাশ্যপীড়িত জমায়েতের মুখোমুখি দাঁড়াত সুবিনয়। মাঝে-মাঝে তারও মন কেমন ডুব জলে নেমে যেত। বুকটা গ্রীষ্মের প্রান্তরের মতো শূন্য লাগত, তবু তারই মুখ চেয়ে এতজন শ্রমিক—সে এদের নেতা—এই বোধ সর্বক্ষণ তাকে উসকে রেখেছে। পূর্ব এশিয়ার মুক্তি আনছেন কার্ল মার্কস। আরও কত লড়াই পড়ে আছে। এ তো সামান্য একটা কারখানার কয়েকজন শ্রমিক, আর লড়াইটাও ছোট—যার কথা খবরের কাগজে খুব ছোট হরফে বেরোয়। এইসব ভেবে সুবিনয় মনের জোর ফিরিয়ে আনত।

যদি সত্যিই কারখানা গুজরাতে চলে যেত, কিংবা হত হাতবদল? সে অবস্থার কথাও ভেবে রেখেছিল সুবিনয়। রমলার সেলাই-ফোঁড়াইয়ের হাত ভালো, তাকে একটা সেলাইমেশিন কিনে দিত সে! মুনিয়াকে ইস্কুলে ছাড়িয়ে আনত। আর তার অবশ্য একটু পুরোনো এল-এম-ই ডিপ্লোমা আছে—কিন্তু সে মার্কামারা লোক বলে এবং কারখানাগুলির অবস্থা ভালো না বলে কিছুতেই চাকরি পেত না—ফলে সে হয়ে যেত পার্টির হোলটাইমার। বাড়িটা তার নিজের। পাকিস্তান হওয়ার পর বাবা সেখানকার সম্পত্তির সঙ্গে বদল করে

বাড়িটা পেয়েছিলেন। অনেকটা জমি, বাগান। বাড়িটা বরাবরই তাকে পার্টির হোলটাইমার হতে এক ধরনের জোর দিয়েছে।

কিন্তু অতটা কিছু হয়নি। কারখানা খুলেছে। সুবিনয় লড়াইটা জেতেনি। শ্রমিকেরা দু'দলে ভাগ হয়ে মারামারি শুরু করে। অবস্থাটা সামলে দেওয়া যায়নি। মালিক সুযোগ বুঝে তাদের ডেকে কয়েকটা এলোমেলো শর্ত মেনে নিল, 'আপনারাই তো জিতলেন' এরকম একখানা ভাব করল। সেই ভাবটা বজায় রাখতে হল সুবিনয়দেরও।

অবশেষে কারখানা খুলেছে।

ইন্সপেকশন ডিপার্টমেন্টের ঘরটির দুই দিকে কেবল কাচের আবরণ। আলোয় টই-টুম্বুর ঘর। বাইরে এখনও সকালের কুয়াশার আবছায়া, রোদ রাঙা। সেই রাঙা রোদে ঘরে একটা আনন্দিত উৎসবের আভা। সুবিনয় খুব মন দিয়ে একটা যন্ত্রাংশের মাপ নিচ্ছিল। টেবিলের এক পাশে একটা গরম চায়ের কাপ। হাতের কাজটি নামিয়ে রেখে সে চায়ে চুমুক দেয়। অসম্ভব সুন্দর সকাল বেলাটিকে দেখে। এই সব সুন্দর দৃশ্য দেখলে তার কেবলই মুক্তি পেতে ইচ্ছে করে। মানুষের জন্য মস্ত লড়াই পড়ে আছে এশিয়া জুড়ে, আর সে পড়ে আছে কোন কোণে। তার শোয়ার ঘরে মাথার কাছে আছে কার্ল মার্কসের একখানা ছবি। স্মিত মুখ, তৃপ্ত, আত্মবিশ্বাসী। যতবার সেই মুখ মনে পড়ে ততবার সুবিনয় অন্যমনস্ক হয়ে যায়। মনে হয়, এ ঠিক জীবন নয়, অন্যতর এক জীবন অপেক্ষা করছে তার জন্য! পূর্ব এশিয়ার যোজন জুড়ে শকুনের ডানার ছায়া। মুক্তি আনবেন কাল মার্কস। কাচের স্বচ্ছ আবরণের ওপাশে কুয়াশায় জড়ানো রোদ, সুন্দর সকাল, সুবিনয় অন্য মনে চেয়ে থাকে, চায়ে চুমুক দেয়।

—সুবিনয় চৌধুরী—ইন্সপেকশনের সুবিনয় চৌধুরী—আপনার ফোন—ওয়ার্কস ম্যানেজারের ঘরে—শিগগির যান—

ডিপার্টমেন্টের ফোনটা খারাপ হয়ে আছে কাল থেকে। ঝামেলা। কথায় কথায় ওয়ার্কস ম্যানেজারের ঘরে যাওয়া সুবিনয় পছন্দ করে না। লোকটা শত্রুপক্ষের। যদিও সুবিনয়ের এই চাকরিটা পাওয়ার পিছনে লোকটার হাত ছিল এক সময়ে। কিন্তু এখন দেখা হলেই ভ্রূ কোঁচকায়, মুখ ফিরিয়ে নেয়। আগে 'সুবিনয়' বলে ডাকত, এখন ডাকবার নিতান্ত দরকার পড়লে 'মিস্টার চৌধুরী' বলে ডাকে।

ওয়ার্কস ম্যানেজারের মুখে আজ একটু ভাবান্তর ছিল। ভ্রূ কোঁচকানোই ছিল, তবে সেটা বিরক্তিতে নয়। দুশ্চিন্তায়। সুবিনয়কে ফোনটা এগিয়ে দিয়ে মুখের দিকে চেয়ে বলল —দেখুন।

একটা অনিশ্চিত উৎকণ্ঠা গলা আক্রমণ করে তাকে—কে! সুবিনয় চৌধুরী? আমি—আমি পরাগ বলছি কাকাবাবু—

—পরাগ! ভারী অবাক হয় সুবিনয়—কে পরাগ?

—আমি সান্যালদের বাড়ির পরাগ—আপনাদের পাশের বাড়ি—

—ওঃ কী ব্যাপার?

—একবার শিগগির আসুন—

কেমন একটু অনিশ্চয় লাগে সুবিনয়ের, পা দুটো কাঁপে, বুক কাঁপে, গালাটা ঠিক নিজের গলার মতো শোনায় না,—ওঃ, কী হয়েছে! অ্যাঁ, কী ব্যাপার?

—তেমন সিরিয়াস কিছু না, ছোটখাটো একটা অ্যাকসিডেন্ট—

—কার?

—মুনিয়ার।

ফোনটা অন্যমনস্ক সুবিনয় ক্রাডলে না রেখে টেবিলের ওপর রাখতে যাচ্ছিল, ওয়ার্কস ম্যানেজার হাত বাড়িয়ে নিলেন, বললেন—চলে যান। আমি ছুটির ব্যবস্থা করছি—

বড় অসহায় বোধ করে সুবিনয়, কয়েক পলকের জন্য ওয়ার্কস ম্যানেজারের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, কিন্তু লোকটিকে ঠিক চিনতে পারে না।

শীতের বেলা পড়ে এল। বড় ঝিলের ওপারে সূর্য ডুবছে। সি-সি-আর-এর রেল লাইনের পাথরে গাঁইতি চালিয়ে ক্লান্ত দুটি লোক উঁচু রেলপথের ধারে ঘাসের ঢালু জমিতে একটু জিরোতে বসে। বিড়ি ধরায়। আকাশে কাচ-স্বচ্ছ কোদালে মেঘের রক্তিম খণ্ডগুলির দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে থাকে। পশ্চিমের দিগন্ত জুড়ে এক নিস্তব্ধ বিশাল রক্তারক্তি কাণ্ড। তারা দুজন খোলা প্রকৃতির রোদ কিংবা বর্ষার বিস্তর দৃশ্য দেখেছে। তাই অবাক হয় না, মুগ্ধও না। কেবল কয়েক পলক তাকিয়ে থেকে চোখ নামিয়ে নেয়। সি-সি-আর-এর উঁচু রেলবাঁধের তলায় নিশ্চিন্দার রাস্তা বেয়ে একটা রিকশা ধীর গতিতে চলে যাচ্ছে। লোক দুটির একজন থুথু ফেলে বলে—ওই দেখ, হামিদ ডাক্তার চলেছে।

—আই। অন্যজন বলে।

—গত বছর খুব বাঁচিয়েছিল মোকে, বুইলে?

যতক্ষণ দেখা যায় ততক্ষণ তারা নীরবে রিকশাটাকে লক্ষ করে। ধীরে-ধীরে রিকশাটা দৃষ্টির বাইরে যায়।

তখন একজন অন্যজনকে বলে—বুইলে, গত বছর বোশেখের ঝড়ে মোদের দক্ষিণের আমবাগানে আম পড়েছিল মেলাই। মাঝরাতে উঠে দৌড়ে গেনু। অন্ধকার ভালো ঠাহর হয় না, হাতড়ে-হাতড়ে তুলছি কোঁচড়ে, একটু কামড় বসাইতেই জিবটা একটু চিনচিন করল। তেমন কিছু বুইতে পারিনি তখনও। দু-চার কামড় খেতেই পেটে গোঁতলান, মুখে লোত, সারা শরীরে জ্বালা-জ্বালা। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই মুখে গাজলা উঠে এল। রাত না পোয়াতে জি. টি. রোডের এক লরি ধরে মেডিকেল কলেজের হাসপাতাল, না সেখানেও জবাব দিয়ে দিলে, বললে—এ তো বিষক্রিয়া, চিকিচ্ছের বাইরে গেছে। হাসপাতালেই মরি আর কী। এ সময়ে তো আর চৈতন্য ছিল না, পরে শুনেছি। আর বাপ-ভাই বাইরের ফুটপাথে বসে কাঁদছে, একজন পথচলতি লোক দাঁড়িয়ে সব শুনে-টুনে বলল, মরবেই যখন তখন একবার হামিদাকে দেখিয়ে মরুক। দূর তো নয়। তাই হল। আধমরা আমাকে টেনে নিয়ে এল ও হামিদ ডাক্তারের কাছে। সে বেশি কথা-টথা বলেনি, আমার পা দুখানা কেবল নেড়েচেড়ে দেখে ঠিক দু-পুরিয়া ওষুধ দিলে। বললে, এক পুরিয়া কষে ঢেলে দাও, ভিতরে যাবে না—না থাক, ওতে যদি কাজ হয়, যদি চোখের পাতা ফেলে কি পা নাড়ে তো কাল সকালে আর এক পুরিয়া...সাতদিন বাদে আমি গা ঝাড়া দিয়ে উঠলুম।

—ধন্বন্তরী। অন্যজন বলে।

—আই। আর একজন দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

পরনে চেক লুঙ্গি, সাদা ঢোলা হাতা পাঞ্জাবি, মাথায় ফেজ টুপি, শীতকালে কাঁধে একটা তুষের চাদর, খালি পা, গালে রুখু দাড়ি। তীক্ষ্ণ নাকখানা, তীব্র একজোড়া চোখ। এই হচ্ছে ডাক্তার হামিদ, জি. টি. রোডের বিখ্যাত হোমিওপ্যাথ, যার সম্বন্ধে বিস্তর কিংবদন্তি ছড়ানো রয়েছে গ্রামে গঞ্জে, সমবায় পল্লি, ঘোষপাড়ায়। লোকে পথ চলতে-চলতে, কিংবা চায়ের দোকানে বসে, সেলুনে চুল ছাঁটতে-ছাটতে সেইসব কিংবদন্তীর কথা বলে, শোনে। আবার যে যার পথে চলে যায়। গ্রামে, গঞ্জে, পল্লীতে পাড়ায়-পাড়ায় লোকে রোগ-ভোগের ভয় থেকে আত্মরক্ষা করে ডাক্তার হামিদের কথা ভেবে। হামিদ মরা মানুষ বাঁচায়।

হাসপাতাল থেকে মুনিয়াকে ছেড়ে দিয়েছে অনেকক্ষণ আগে। এখন তাদের বাসার বারান্দায় তাকে শোয়ানো হয়েছে। ঠোঁট দুটি নীল। বেলাশেষের আলোয় সেই ডালিম গাছটার ছায়া এসে একটুখানি স্পর্শ করেছে মুনিয়ার পা।

বহু লোকের ভিড়ের মধ্যে সুবিনয় কিছুই লক্ষ করতে পারছিল না। বহু চেষ্টার পর হাসপাতালের ডাক্তার একবার দাঁতে ঠোঁট চেপে হতাশায় আক্ষেপ করে বলেছিল—ডেড! কিন্তু সে কথা সুবিনয়ের বিশ্বাস হয়নি। ডেড! কথাটা কেমন যেন! একটা ভারী পাথর খুব গভীর কুয়োর মধ্যে পড়ে গেল।

একটু পরেই মুনিয়াকে নিয়ে যাবে সবাই। তবু সবাই অপেক্ষা করছে হামিদ ডাক্তারের জন্য। যদি হামিদ পারে! যদি হামিদ পারে!

সুবিনয় এককোষ জল-বমি করেছে বারান্দার ধারে বসে। এ শরীর যেন আর তার শরীর নয়, এমনই শিথিল তার হাত-পা। কেউ একজন তার কাঁধে হাত রেখে বলছে—ভরসা রাখো। এখনও হামিদ আছে। সে এল বলে।

হামিদ! সুবিনয় যেন বা এ নাম আগে শোনেনি। কে হামিদ? কোথা থেকে সে আসবে! সুবিনয় মুখ তুলে পশ্চিমের আকাশে রক্তিম মেঘখণ্ডগুলি দেখে। মেঘ সূর্যকে আড়াল করেছে, আলোর তীব্র ছটা বহুদূর নীলিমায় ব্যাপ্ত। ওই কি হামিদের পথ। সে কি রথে আসবে!

মাথাটা কেমন টলমল করে সুবিনয়ের। রমলাকে ডেকে বলতে ইচ্ছে করে—কেঁদো না। হামিদ আসছে। হামিদ আসছে। ওই দেখ, চরাচর জুড়ে হামিদের জন্য পাতা হয়েছে পথ। আসছে হামিদ। মুনিয়া অনেক বড় হবে—দ্যাখো।

বুড়ো রিকশাওয়ালা খলিল ঝুঁকে প্যাডল মারে, শরীর কাত করে শরীরের ভয় দেয় প্যাডলের ওপর। রিকশা ধীরে-ধীরে চলে। বুড়ো খলিল কেবল কাশে আর কাশে। রিকশা ধীরে চলে।

রিকশা এসে দাঁড়ায় মুনিয়াদের বারান্দায় ধারে, গোলাপি বোগেনভেলিয়ার ঝাড়ের তলায়। রঙিন পাপড়িগুলি শীতের বাতাসে খসে পড়ছে। পাপড়ি খসে পড়ে হামিদের গায়ে, তুষের চাদরে, রিকশার হুডের ওপর। চাপা গুঞ্জন ওঠে—হামিদ! ওই তো হামিদ।

সুবিনয় মুখ তোলে। শ্যামবর্ণ ছিপছিপে হামিদকে দেখে, দেখে তার বুড়ো রিকশাওয়ালাকে। ডেড—এই কথাটা আবার হঠাৎ ভারী পাথরের মতো গভীর কুয়োর মধ্যে পড়ে যায়।

ডালিম গাছের ছায়া কখন এগিয়ে গেছে অনেকটা। তার রং গাঢ়। সিঁদুরে মেঘের আভার আলোর ভিতর দিয়ে গাঢ় কালো ত্রিশূলের মতো ছায়া বিদ্ধ করেছে মুনিয়ার বুক।

খলিল দেখেছে অনেক। সে জানে, সময়মতো হামিদের হাতে পড়লে মানুষ মরে না। তবু মানুষ যে মরে সে তাদের নিজেদের দোষে। নিজেদের শরীরে রোগের লক্ষণ তারা দীর্ঘকাল বুঝতেই পারে না। বুঝতে প্রায়ই দেরি হয়ে যায়। তারপর অ্যালোপ্যাথির বিষ জমায় শরীরে। রোগের লক্ষণ চাপা পড়লে ভাবে—সেরে গেল। অ্যালোপ্যাথ জবাব দিলে তখন অনতিক্রমণীয় মৃত্যুকে ভোজবিদ্যায় ফাঁকি দেওয়ার জন্য তারা ঈশ্বরের মতো হামিদকে খোঁজে। তাই, মানুষ যে মরে সে তাদের নিজেদের দোষে। মাঝে-মাঝে খলিল তার ছানির গ্রহণলাগা চোখে হামিদের মুখখানা বড় মমতাভরে দেখে। দেখে, হামিদের মুখে নানা চিন্তার দৃশ্য। বাচ্চা লড়ছে রোগের সঙ্গে। মানুষের জটিল দেহযন্ত্রের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এখন ঘুরে বেড়াচ্ছে হামিদ। লড়াই জমেছে খুব। খলিল তার বুড়ো শরীর হেলিয়ে প্যাডল মারে আর আপনমনে হাসে। মনে-মনে সে আল্লার দয়া ভিক্ষা করে। প্রতিটি লড়াই জিতে আসুক হামিদ। মানুষের ঘরে-ঘরে তার নামগান হোক।

ফেরার পথে রিকশা আরও ধীরে চলে। খোয়া-ওঠা রাস্তায় কাঁচাপথে রিকশা টাল খায়। শীতের বেলা ফুরিয়ে আসে হঠাৎ। উঁচু রেলবাঁধের ছায়ায় ঝুমকো আঁধার নামে পথে। গ্রহণলাগা চোখে সমুখের দিকটা ঠিক ঠাহর হয় না। খলিল রিকশা থামিয়ে নামে, কাঁপা হাতে কেরোসিনের ছোট বাতিটা জ্বেলে নেয়। একপলক হামিদকে দেখে। মুখটা হুডের তলাকার অন্ধকারে, ঋজু রোগা দেহটি স্থির, কোলের ওপর সেই চামড়ার পুরোনো ওষুধের বাক্সটি। ওই স্থির মূর্তি দেখলে খলিলের বুকটা ভয়ে আর সম্ভ্রমে ভরে ওঠে। আল্লার প্রেরিত পুরুষ ওই বসে আছে তার রিকশায়। এই ধন্বন্তরীকে সে-ই নিয়ে যায় গ্রামে, গঞ্জে, পাড়ায়, পল্লিতে। মিঞা হামিদ—এই নামে কত অন্ধকার বুকে আলো জ্বলে ওঠে! তবু যে মানুষ মরে সে তাদের নিজেদের দোষে। খলিল তার বুড়ো শরীর নিয়ে আবার রিকশায় উঠে। প্যাডল ঠেলতে-ঠেলতে বিড়বিড় করে—আল্লা, হামিদকে আরও শক্তি দাও। তার দুই হাত আলোর তলোয়ার হয়ে উঠুক।

যেদিন হামিদের রুগি মরে সেই রাতে খলিল তীব্র আবেগে, গভীর তৃষ্ণায় মদ খায়। জ্বালাময় অন্ধকারে তার শরীর ভেসে যায়। তারপর ক্রমে তার মাথায় ভিতরে একটি আলোর ফুলঝুরি ফেটে পড়ে। সে হয়ে যায় চুর-চুর এক আনন্দিত মাতাল।

ফেরার পথটা দীর্ঘ চড়াইয়ের মতো কষ্টকর। ফুটফুটে মেয়েটা মারা গেল। বাঁচল না। খলিল বিড়বিড় করে—হামিদ কী করবে! হামিদের কোনও দোষ নিও না। তোমরা—

মুনিয়ার শ্মশানবন্ধুরা তৈরি হয়েছে। মুনিয়ার বন্ধুরা সাজিয়ে দিচ্ছে তাকে। কপালে টিপ, চন্দনের ফোঁটা। এলোচুল আঁচড়ে দুটি বেণী ছড়িয়ে দিয়েছে দু-ধারে। বড় সুন্দর

দেখাচ্ছে মুনিয়াকে। বোগেনভেলিয়ার পাপড়ি ঝরে পড়ছে শীত বাতাসে, উড়ে এসে রঙিন প্রজাপতির মতো বসছে মুনিয়ার খাটে, শরীরে, চুলে।

খাটের পায়া ধরে পড়ে আছে রমলা। যেতে দেবে না। পাড়ার বউ-ঝিরা ছাড়িয়ে নিচ্ছে তাকে। সুবিনয় এ সবকিছু দেখছে না। হামিদ নামে একজন অলৌকিক পুরুষের আসার কথা ছিল। আকাশে তৈরি হয়েছিল তার আলোকিত পথ। সেই পথে কেউ আসেনি। এক বিশাল শকুন তার ডানা বিস্তার করেছে, চরাচর জুড়ে তারই ছায়া।

নিহত মুনিয়ার শেষ ভেলা চারজন বাহকের কাঁধে দুলে-দুলে ভেসে যায়।

অনেক রাতে মুনিয়ার শ্মশানবন্ধুরা ফিরছিল। তারা শুনল, চৈতলপাড়ার পথে-পথে ক্ষুব্ধ এক বুড়ো মাতালের চিৎকার। চুর-চুর মাতাল খলিল চেঁচিয়ে বলছে—তোমরা সাক্ষী আছ। আমি হামিদের এক ফোঁটা ওষুধও কখনও খাইনি। আমি যদি মরি তবে তার দোষ যেন হামিদকে না অর্সায়। হামিদ ধন্বন্তরী—হামিদ মরা মানুষ বাঁচায়—বিশ্বাস করো—

অনেক রাতে, ঘুমোবার আগে হামিদ তার সাদা, ছোট, সহজ বিরল বিছানাটিতে হাঁটু মুড়ে বসে, নমাজ পড়ার মতো পবিত্র ভঙ্গিতে। প্রতিদিন ঘুমোবার আগে সে এই কথা বলে—আল্লা, আমি তোমার সমকক্ষ নই। মানুষকে তুমি এই বিশ্বাস দিও যে, একমাত্র তিনি ছাড়া আর কেউ তার সমকক্ষ নয়।

দুই

মাঘের শেষে এক মাঝরাতে পরাগের ঘুম ভাঙে। ঘুম ভেঙে দেখতে পায় বুকের ওপরে আকাশ। গভীর সমুদ্রের মতো অথৈ। নক্ষত্রের আলো কাঁপছে।

ত্রিপলের একটা কোণ উত্তরের বাতাসে উড়ে গেছে। শীত করছে খুব। কম্বলটা গায়ে জড়িয়ে উঠে বসে পরাগ। এক প্যাকেট সিগারেট চুরি করে রেখেছিল। বালিশের পাশ থেকে সেই প্যাকেট তুলে অনভ্যাসের একটা সিগারেট ধরায় সে। তারপর মৃদু শব্দে একটু কাশে।

সন্ধে থেকে গভীর রাত পর্যন্ত সানাই বেজেছে, বেজেছে উলুধ্বনি, হাসি, নানা শব্দ। সন্ধ্যারাতে ছোড়দির বিয়ে হয়ে গেল। এখন রাত গভীর। ছাদের ওপর ঘুম ভেঙে বসে আছে পরাগ। মাথার ওপর ছাদের ত্রিপলের একটা কোণ উড়ে আকাশ দেখা যাচ্ছে। নীচে এঁটো পাতা নিয়ে ঘেয়ো কুকুরদের গম্ভীর ঝগড়ার আওয়াজ।

পরাগ অপলক চোখে অথৈ আকাশটুকু দেখে। এ রকম মধ্যরাত্রের আকাশ এমন বিরলে সে আর কখনও দেখেনি। আজকাল আর হইচই ভালো লাগে না তার, তাই শোওয়ার সময়ে সে একটা চেয়ারের গদি আর কম্বল টেনে নিয়ে এসে ছাদে শুয়েছিল। এখন বুঝতে পারে, এই ভয়ঙ্কর শীতে আর ঘুম আসবে না। সে বসে থেকে সিগারেট খায়, আর অপলক শূন্য চোখে আকাশ দেখতে থাকে।

কোথায় যেন একটা কাশির আওয়াজ হয়, নাল-পরানো জুতোর আওয়াজ, মাটিতে লাঠি ঠুকবার শব্দ। পরাগ উঠে ছাদের আলসের ধারে আসে। অন্ধকারে ঝুঁকে দেখে, মুনিয়াদের বাইরের বারান্দার অন্ধকারে কে যেন বসে আছে। একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বলে ওঠে। লোকটা সিগারেট ধরায়।

পরাগ ডাকে—কাকাবাবু।

—উ। সুবিনয় উত্তর দেয়।

—এখনও শোওনি। রাত দুটো বেজে গেছে।

সুবিনয় গলার মাফলারটা ভালো করে জড়ায়, পায়ের মোজাটা একটু টেনে তোলে। তারপর বলে—ঘুম আসে না।

হাতের টর্চটা জ্বেলে চারদিক একবার দেখে নেয় সুবিনয়, তারপর বলে—তুমি ঘুমোওনি?

—আমি ছাদে শুয়েছিলাম, কিন্তু এখানে বড় শীত। ঘুম আসছে না।

—হুঁ। এবারে শীতটা খুব পড়ল।

বাতাসে ত্রিপলের কোণটা উড়ে ফটাস শব্দ করে। তারা কেউ চমকায় না।

পরাগ চাপা গলায় বলে—এই অন্ধকারে কি খুঁজে পাবেন? এবার গিয়ে শুয়ে পড়ুন।

—যাই। উত্তর দেয় সুবিনয়, কিন্তু ওঠে না। বসে থাকে।

মুনিয়া মারা গেছে এক মাস। প্রায় এক মাস ধরে সারাদিন সুবিনয় শাবল আর লাঠি হাতে বাগানে ঘুরছে। খুঁড়েছে গাছের তলা, মাটির ঢিপি, ইঁদুর আর ছুঁচোর গর্ত। প্রথম-প্রথম সঙ্গে পরাগ থাকত, থাকত পাড়ার উৎসাহী ছেলেমেয়েরা, যারা ভালোবাসত মুনিয়াকে। ক্রমে-ক্রমে সবাই যে যার কাজে ফিরে গেছে। এখন একা সুবিনয় সারা দিন সাপটাকে খোঁজে। গভীর রাত পর্যন্ত। আজকাল বড় একটা ঘুম আসে না।

পরাগ তার কম্বলটা ভালো করে জড়িয়ে নেমে আসে। বারান্দা থেকে পাখিটা তীব্রস্বরে ডাকে—'পরাগ'। পরাগ নেমে আসে, সদর খুলে বেরোয়।

—কাকাবাবু এই নিন এক প্যাকেট সিগারেট। আপনার জন্য রেখেছিলাম।

খুশি হয় সুবিনয়। হাত বাড়িয়ে নেয়। তারপর হঠাৎ অপ্রত্যাশিত বলে—মুনিয়া বেঁচে থাকলে তোমার সঙ্গে বিয়ে দিতাম, বুঝলে পরাগ! মনে মনে আমি ঠিক করে রেখেছিলাম।

শীত বাতাস বয়ে যায়।

—এবার গিয়ে শুয়ে পড়ুন কাকাবাবু। শীতকাল—এখন সাপেরা বড় একটা বেরোয় না।

—তাই হবে। সুবিনয় বলে বসে থাকে। তারপর বলে—তুমি যাও। আমি আর একটু দেখে গিয়ে শুয়ে পড়ব। যতক্ষণ ওটা আছে ততক্ষণ কিছুতেই শান্তি পাই না।

পরাগ ওঠে। খুব শীত বলেই কিনা কে জানে তার চোখে জলে আসতে থাকে।

একা আরও কিছুক্ষণ অন্ধকারে বসে থাকে সুবিনয়। তারপর টর্চবাতিটা জ্বালে। ব্যাটারির জোর কমে গেছে, আলোটা লালচে। টর্চটা ঘুরিয়ে সামনের মাঠটা একটু দেখে, বাগানের বেড়ার ধারে যায়। লেবুগাছ আর ডালিমগাছের গোড়া থেকে আলো সরিয়ে নেয়। দত্তদের বাড়ি উঠছে, তাদের ইটের পাঁজাটা দেখে সুবিনয় পথে নামে। পরাগদের বাড়ির সামনে ঘেয়ো কুকুরদের ভিড়কে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যায়। বন্ধ ডাক্তারখানার চাতালে একজন মাতাল বসে আছে। সুবিনয় এগোয়। পুলিশ-ব্যারাকের পিছনের দেওয়ালের সামনে কয়েকটা ছেলে দাঁড়িয়ে। তাদের হাতে মোমবাতি আলকাতরার টিন, তুলি। কী লিখছে।

টর্চের আলো ফেলে সুবিনয় দাঁড়াতেই ছেলেগুলো রুখে মুখ ফেরায়।

—কে?

এ-পাড়ারই ছেলে। তাকে চিনতে পারে। একজন এগিয়ে এসে বলে—আমরা কাকাবাবু। আপনি কি খুঁজছেন—সেই সাপটাকে? ওটাকে কি আর পাবেন! বাড়ি গিয়ে শুয়ে পড়ুন।

সুবিনয় টর্চের আলো ফেলে দেওয়ালে, বলে—এসব কী লিখছ?

—তেমন কিছু না। আপনি বাড়ি যান কাকাবাবু। আমরা লিখি।

সুবিনয় লেখাগুলো পড়ে। ঠিকঠাক কিছু বুঝতে পারে না।

—লিখছ! আচ্ছা লেখো। বলে সুবিনয় আবার এগোয়। রেলরাস্তা পর্যন্ত চলে যায়। আবার ফিরে আসে। চারদিকেই অন্ধকার, নির্জনতা।

দিন কেটে যায়।

তখনও অন্ধকার ঝুলে আছে চারদিকে। ভোর রাত্রে পরাগের চন্দনা পাখিটা ডাক দেয় —পরাগ ওঠো। পরাগ ওঠো।

পরাগের আলস্যজড়িত ঘুম ভাঙে। উঠতে ইচ্ছে করে না। পাখিটা ডাকে, ডাকতেই থাকে। বিরক্ত পরাগ পাশ ফিরে ধমক দেয়—এই, চুপ!

পাখিটা ডানা ঝাপটায়, কিন্তু আবার ডাকে পরাগ ওঠো। পরাগ ওঠো। পরাগ ওঠো।

উঠতে ইচ্ছে করে না। সকালের সবচেয়ে সুন্দর দৃশ্যটি আর দেখা যায় না। মুনিয়াদের বাগানে মুনিয়া! কী হবে বড় হয়ে আর? পরাগের আর বড় হতে ইচ্ছে করে না। মাঝে-মাঝে তার বুকের ভিতরে এক গ্রীষ্মের প্রান্তরে হু-হু করে হাওয়া বয়ে যায়।

পরাগ পাশ ফিরে শোয়। সিগারেট এখন তার অভ্যাস হয়ে গেছে। বালিশের পাশেই থাকে প্যাকেট। সে শুয়ে-শুয়ে সিগারেট খায়। কিন্তু পাখিটা ডাকতেই থাকে—পরাগ ওঠো। পরাগ ওঠো। পরাগ ওঠো।

পরাগ চুপ করে থাকে। একবার ভাবে, উঠব না—খেলোয়াড়, হয়ে আমার কী হবে! আর একবার ভাবে উঠি। ভাবতে-ভাবতে তার শীত করে। লেপটা মুড়িসুড়ি দিয়ে শোয়। মুনিয়াদের বাগানে আর মুনিয়াকে দেখা যাবে না। তাই শুয়ে সিগারেট টানে পরাগ। এই অনিয়ম দেখে তার চন্দনা পাখিটা রেগে গিয়ে ডানা ঝাপটায় আর ডাকে। ডানা ঝাপটায় আর ডাকে।

হঠাৎ মাথার ভিতরে একটি ঘন সবুজ মাঠের দৃশ্য ফুটে ওঠে। উঁচুতে একটা সাদা বল। সেই বলের দিকে লাফিয়ে উঠছে কয়েকজন লাল-সোনালি-নীল-লাল জার্সি পরা খেলোয়াড়। হঠাৎ উষ্ণ একটা রক্তস্রোতে পরাগের শরীর ভেসে যায়। এ বছর পরাগকে ডেকেছে কলকাতার বড় একটা ফুটবল ক্লাব।

ভাবতে-ভাবতে পরাগের শরীর চনমন করে। সেই উষ্ণস্রোত তার শরীরের শীতভাব দূর করে দেয়। সে উঠে তার শর্টস পরে, পরে নেয় কেডস, তার পাখিটি চুপ করে দেখে। খুশি হয়।

মুনিয়াদের বাগানে আর মুনিয়াকে দেখা যাবে না।

পরাগ এ বছর কলকাতার বড় একটা ক্লাবে খেলবে।

ভোরবেলা বহু দূরে এক কারখানার ভোঁ বাজতে থাকে।

সুবিনয় চাকরি ছেড়ে দিয়েছে। রমলা একটা সেলাই মেশিন কিনবে। দুজনের চলে যাবে কোনওক্রমে। সারাদিন এবং রাত পর্যন্ত সাপটাকে খোঁজে সুবিনয়। ঘুম আসে ভোর রাত্রে।

দাড়িওয়ালা, স্মিতমুখ কার্ল মার্কসের ছবিখানা এখনও তার শিয়রে টাঙানো, মাঝে-মাঝে সে ঘুম-জড়ানো চোখে ছবিখানার দিকে চায়। অস্ফুট গলায় বলে—আমি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতুম আমার মুনিয়াকে। আর কিছুকে নয়, আর কাউকে নয়। আমার এ অপরাধ ক্ষমা কোরো।

ক্রমে কার্ল মার্কসের ছবিখানায় ধুলো পড়ে। এক দুঃসাহসী মাকড়সা লাফ দিয়ে উঠে আসে, তারপর স্মিতহাস্যময় সেই মুখের ওপর তার অমোঘ জালখানা বুনতে শুরু করে।
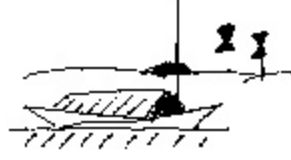
ডুবুরি

আঁচিয়ে এসে ঘরে ঢুকতেই থমকে .গল টুনু। বাঁশের মাচার ওপর বিছানায় মাথা গুঁজে মা কাঁদছে। একটু আগে তাদের খেতে দিয়ে মা পুকুরে গিয়েছিলেন স্নান করতে। এখনও মা'র শাড়িটা ভেজা। মাটির মেঝেটা শাড়ির জলে অনেকটা ভিজে গিয়ে কাদা-কাদা হয়ে গিয়েছে। সেই কাদা মা'র হাঁটুর কাছে আর গোড়ালিতে লেগে আছে। মেজেতে বসে উঁচু হয়ে ময়লা কাঁথা আর শাড়ির পাড় ছিঁড়ে তৈরি করা চাদরের বিছানায় মুখ গুঁজে মা ফুলে ফুলে কাঁদছে।

মাকে কাঁদতে এই প্রথম দেখছে না টুনু, বাবার সঙ্গে ঝগড়া হলে কিংবা বাবা মারলে মা চিৎকার করে সারা কলোনিকে জানিয়ে কাঁদতে বসে। কিন্তু এইভাবে ফুলে ফুলে নিঃশব্দে কান্নাটা অন্যরকম। টুনু ভয় পেয়ে গেল। বুকের ভিতরটা কেমন যেন মুচড়ে উঠল তার।

টুনু ফিসফিস করে ডাকে—'মা, ওমা, মা।' মা উত্তর দেয় না। টুনু আস্তে-আস্তে মার কাছে এগোয়—'মা, কান্দ ক্যান গো? কী হইছে?'

কান্নার সঙ্গে-সঙ্গে মা'র খালি পিঠের পাতলা চামড়া ভেদ করে পাঁজরের হাড়গুলো গিরগির করে উঠছে। টুনু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ প্রায় চিৎকার করে ওঠে সে—'কি হইছে কও না ক্যান?'

প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে মা'র কান্না থেমে যায়। সোজা হয়ে বসে মা। ভেজা মাথার চুল থেকে কেঁচোর মতো মোটা-মোটা ধারায় জল এঁকে-বেঁকে নেমে চোখের জলের সঙ্গে মিশে হাড়-উঁচু শুকনো মুখের থুতনিতে এসে টুপটাপ করে ঝরে পড়ছে।

টুনু চেয়ে থাকে। মার গলার কাছটা ফুলে ফুলে উঠছে। ফোঁপাতে-ফোঁপাতে চোখের জল হাত দিয়ে মুছে মা বলে—'কিসু হয় নাই, চিক্কইর দিস না।'

—'কিসু হয় নাই, তবে কান্দ ক্যান? কী হইছে কও না আমারে।'

—'কইলাম তো কিছু হয় নাই। খাইছস নি প্যাট ভইরা?'

টুনু এগিয়ে গিয়ে মার কাছে, খুব কাছে দাঁড়ায়। তারপর সোজা হয়ে মা'র চোখের দিকে তাকিয়ে বারো বছরের টুনু বিজ্ঞের মতো বলে—'কী হইছে কও না আমারে।'

—'চুপ-চুপ, আস্তে। কেউ য্যান শোনে না।' মা তাড়াতাড়ি চাপা গলায় বলে—'তর বাবায় ট্যার পাইলে কিন্তু আস্ত রাখব না। দুলটা পুকুরে হারাইছি।'

টুনু বুঝতে পারে। কেন না, সে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে, মার বাঁ-কানের লতিটা শূন্য। ওখানে একটু আগেও ঝকঝকে সোনার দুলটা দুলছিল। যদিও মাকে খুব বে-মানান লাগছিল। হাড়-উঁচু মুখ, প্রায় ন্যাকড়ার মতো জ্যালজেলে ময়লা শাড়ি আর রুক্ষ তেল-না-দেওয়া চুলের সঙ্গে দুলটার কোনও মিল ছিল না। কাল রাতেও বাবা ঠাট্টা করে বলেছে—'গোবরে পদ্মফুল। মাইনসের যেমুন দুল চাই, দুলেরও হেমুন মানুষ চাই। সাজলেই হয় না গো মাইজ্যা বউ।' এসব কথায় মা রেগে গিয়েছিল খুব। রাগ করে বলেছে—'হগো হ' শরীল যে গেছে হেই দোষটা আমারে না দিয়া বুঝি শান্তি পাও না। মাইয়ামানুষ পালতে গেলে মুরাদ চাই, বুঝলানি! কয় ট্যাহা রোজগার করো তুমি যে, শরীল তুইল্যা কথা কও!' কিন্তু ঝগড়াটা শেষ পর্যন্ত খুব সাংঘাতিক হয়নি। কারণ, কাল সুভাষ পল্লির হারান জ্যাঠার মেয়ে লতিদির বিয়েতে গিয়েছিল দুজন। তা না হলে কীভাবে মার একটা একটা গয়না নিয়ে বিক্রি করে সংসার খরচ চালিয়েছে বাবা, সে কথা না বলে এবং বুক চাপড়ে না কেঁদে মা থামত না।

কাল রাতে মা তার বহু পুরোনো লাল রঙের ওপর সাদা জরির তারাফুল তোলা বেনারসিটা পরে বাবার সঙ্গে লতিদির বিয়েতে গিয়েছিল। বিয়ের নিমন্ত্রণে গেলেই মা বেনারসিটা পরে আর কানে দুলজোড়া। এছাড়া মা'র আর ভালো পোশাক নেই, গয়নাও নেই, শুধু হাতে কয়েক গোছা ব্রোঞ্জের চুড়ি ছাড়া।

কাল রাতে সুভাষ পল্লিতে হারান জ্যাঠার মেয়ের বিয়ের নিমন্ত্রণ থেকে ফিরে এসে মা আর দুলজোড়া খুলে রাখেনি। কাল রাতে মার মুখটা হাসি-হাসি ছিল। বাবার মেজাজ ভালো ছিল কাল।

কিন্তু আজ? ভাবতেই টুনুর গা-টা শিরশির করে।

রোগা হাড়-বের করা মায়ের দিকে তাকায় টুনু। বলে—'ভালো কইরা খুইজ্যা দ্যাখছানি? অন্য কোনখানে পড়ে নাই তো?'

মা চাপা গলায় বলে—'চুপ। আস্তে কথা কইতে পারস না। বুলকি আর পানু যদি শুইন্যা ফ্যালায়?'

টুনু রান্নাঘরের দিকে তাকায়। দরজা দিয়ে দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু বেড়াগুলো পুরোনো হয়ে ভেঙে গেছে এদিকটায়। পানুর ডোরাকাটা শার্ট আর বুলকির সবুজ রঙের ফ্রকের অংশ দেখতে পায় সে।

—'না, শুনব না। আরা অখনও পাকঘরে। খাইত্যাছে।'

—'শয়তান দুইটা। শুনলেই বাপের কানে লইয়া তুলব।'

বাবার ভয়ে মা সিঁটিয়ে যাচ্ছে যেন। মার চোখের পাতাগুলো পড়ছেই না। টুনু চুপ করে থাকে।

বাবাকে সে চেনে। খুব ভালো করেই চেনে। চারদিকের সবকিছুর ওপর বাবা যেন সবসময়ে খেপে আছে। টুনু একবারের বেশি দুবার ভাত চাইলেই বাবা চিৎকার করতে থাকে—'হ, সোয়াস্যার গিল্যা খাসি হইতাছ; ল্যাখাপড়ার নামে তো লবডঙ্কা! যাগো ল্যাখন পড়ন হয়, তারা স্যার-সোয়াস্যার চাউলের আহার করে না।' কিংবা কখনও কেউ কোনও জিনিস ভেঙে ফেললে বাবা বলে—'কিরে বাসি, ঠাকুরদার জমিদারির জিনিস পাইছ নাকি নিব্বইংশো পোড়ারমুখো—'

বাবার রুদ্র মূর্তির কথা মনে পড়তেই টুনু শিউরে উঠল। আস্তে-আস্তে বলল—'আর একবার খুইজ্যা দ্যাখবা না?'

মা বলে—'হ, আর একবার খুজুম। তুইও চ' দেখি আমার লগে।' একটু চুপ করে থেকে আবার বলে—'ঘাটে কেউ নাই অখন। একলা ডুব দিতে ডর করে।'

টুনু মনে-মনে হাসে। মা সাঁতার জানে, কিন্তু ডুব দিতে মার ভীষণ ভয়।

ঠিক দুপুর। নিস্তরঙ্গ সবুজ জল। কয়েকটা শুকনো পাতা জলের ওপর ভাসছে। খুব নির্জন চারদিকে। কেউ কোথাও নেই।

টুনু বলে—'কোনখানে?'

কাটা সুপুরিগাছ আর বাঁশ দিয়ে তৈরি করা সিঁড়ির তৃতীয় ধাপে পা দিয়ে মা ইতস্তত করে। চারদিকেই সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকায়।

টুনু আবার বলে—'কোনখানে মা?'

মাঝখানের জলটা সবুজ, আর ঘাটের কাছে ঘোলা। কেউ বাসন মেজে গেছে সেই ছোবড়াগুলো ছাই-কাদার মধ্যে পুকুরপাড়ে পড়ে আছে। কেমন যেন আঁশটে গন্ধ।

ঘোলা জলের দিকে তাকিয়ে মা বলে—'এইখানেই পড়ছে। কিন্তু—'

আঁশটে গন্ধটা এড়াবার জন্যেই টুনু ঘাটের কাছ থেকে সরে এসে ঢেঁকির শাক আর কচুর জঙ্গলের ধার ঘেঁষে দাঁড়াল।

মা ঠিক কোমরজলে দাঁড়িয়ে আছে। পা ঘষে-ঘষে খুঁজছে দুলটাকে। টুনু তাকিয়ে রইল। মা আর একধাপ নামল। জলের দিকে নিবিষ্টভাবে তাকিয়ে আছে মা। কিন্তু জলটা ঘোলা। কিছু দেখতে পাচ্ছে না মা।

—'এমনিই কপাল! দুল কি পাওন যাইব! তিন আনি আর তিন আনি—এই ছয় আনি সোনাই আছিল ঘরে। পোড়ার কপালে ছয় আনির তিন আনি গেল।' ঠিক গলাজলে দাঁড়িয়ে মা বলে—'ইচ্ছা করে বাকি তিন আনিও উদ্দা মাইরা ফ্যালাইয়া দেই।'

কচুগাছের পাতা হাওয়ায় দুলে টুনুর পায়ে লাগে। কেমন সুড়সুড় করে যেন। খুব তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মাকে দেখে টুনু। জলগুলো গোল চাকতির মতো মার চারদিকে, বিস্তৃত হয়ে যাচ্ছে। মা'র কথাটা একটুকরো কাঠের মতো জলের ওপর ভাসছে।

মার থুতনির কাছে জল এখন।

হঠাৎ মা চিৎকার করে—'এই যে, কী জানি একটা পায়ে লাগল রে!'

মা ডুব দেয়। ছলাৎ করে খানিকটা সবুজ জল ফেনা তুলে সরে যায়। টুনু একলাফে ঘাটের কাছে এগোয়। জলের ঠিক ওপরের ধাপে কুঁজো হয়ে হাঁটুতে হাতের ভর দিয়ে তাকিয়ে দেখে মার সাদা শাড়িটা সবুজ জলের ভিতরে মাছের মতো ডুবে যাচ্ছে। টুনু দম বন্ধ করে থাকে।

কিছুক্ষণ জলটা অল্প ঢেউ তুলল। টুনু তাকিয়ে রইল।

হুস করে মাথা তুলল মা! মুঠো-করা হাতটা জলের ওপর তুলে আঙুলগুলো আলগা করে দিল। মার হাতের চেটোয় ছোট্ট একটা লোহার স্ক্রু।

হাসি পায় টুনুর, কিন্তু হাসে না।

মা'র মুখটা এখন আরও সাদা, ঠোঁট দুটো চেপে লেগে আছে। মা জোরে-জোরে নিশ্বাস ফেলছে এখন।

স্ক্রুটা খুব জোরে আরও গভীর জলের দিকে ছুড়ে দেয় মা। ক্লান্ত সরে বলে—'দ্যাখ তো বুলকি আর পানু এদিকে আছে নাকি? আইলে কইস কিন্তু। আমি আর একটু খুঁজি।'

—'আইচ্ছা' জবাব দেয় টুনু। চারদিকে তাকিয়ে দেখে কেউ কোথাও নেই।

মার সরু রোগা দেহটা আরও গভীর জলের দিকে সরে যাচ্ছে ঢেউ তুলে। ডিঙি নৌকোর মতো স্বচ্ছন্দ গতি, দুপাশে সরু রেখার মতো ঢেউ তুলে জল কেটে এগিয়ে যাচ্ছে। জোড়া হাতে আর পায়ের আঘাতে জলে ছপছপ শব্দ হচ্ছে আর ঢেউ উঠছে জলে। পায়ের কাছে দুটো ট্যাংরা মাছ মুখ তুলল। টুপ করে ডুবে গেল আবার।

—'আর দূরে যাইও না, মা।' টুনু চিৎকার করে বলে। ভয় করে তার।

—'আরে ডরস ক্যানে।' গাঙপারের মাইয়া আমি, এত সহজে ডুবুম না।' মা বলে। জলের ওপর দিয়ে তার গলার স্বরটা কাঁপতে-কাঁপতে এল। খুব ক্লান্ত স্বর। জলের জন্যেই বোধহয় ঠিক কাঁসির মতো শব্দ হল।

পায়ের পাতায় ভর দিয়ে উঁচু হয়ে টুনু দেখে মা টুপ করে ডুবে গেল। জলের নীচে এখন আর মাকে দেখা যাচ্ছে না। তবু টুনু চোখ দুটো স্থির করে পলক না ফেলে তাকিয়ে রইল। দুপুরের রোদ ওপারে নারকোল গাছের পাতায় লেগে ঝিকমিক করছে।

চোখ দুটো করকর করে তার। চোখে জল আসে। হাতের উলটো পিঠ দিয়ে চোখ ঘষে টুনু তারপর আবার তাকায়।

এবার প্রথমে মা'র হাতদুটো সরু দুটো কাঠির মতো জলের ওপর ভেসে উঠল। তারপর মাকে দেখা গেল। টুনু নিশ্বাস ফেলে নড়ে চড়ে দাঁড়ায়।

মা চিৎ করে পা দিয়ে জল কাটে। চিৎ সাঁতার দিয়ে পাড়ের দিকে এগোতে থাকে। টুনু বুঝতে পারে যে, মা আর দম পাচ্ছে না।

পাড়ে এসে কাদার মধ্যে সুপুরিগাছ আর বাঁশের সিঁড়িতে বসে হাঁফাতে থাকে মা। দুটো হাত দিয়ে ভর দেয় ছাইমাখা ছোবড়া ছড়িয়ে থাকা নোংরা জায়গাটায়। শাড়িটা কাদায় মাখামাখি।

—'আর পারি না।' ভীষণভাবে হাঁফাতে-হাঁফাতে মা বলে—'দম পাই না আর। পোড়া কপাইল্যা দুল! শরীলটায় পিছা মারে।'

—'আমি একবার দেখুম, মা?'

—'দূর! জলে লামলে ঠান্ডা লাগব তর। আরে, কপালে নাই ঘি, ঠক ঠকাইলে হইব কি।' খুব ক্লান্ত সুরে মা বলে। পা দুটো জলের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে নোংরা মাটিতে হাতের ওপর শরীরের ভার রেখে মাথাটা ডান কাঁধে কাত করে দিয়ে মা বলে। মাথার চুলগুলো একদিকে সরানো। মা'র সরু ঘাড় আর ঘাড়ের ওপর তিনটে ঢিবির মতো উঁচু হাড় দেখতে পায় টুনু। মার জন্য কেন যেন ভীষণ কষ্ট হয় তার।

—'মা'—টুনু মা'র খুব কাছে এগিয়ে গিয়ে মার পাশেই উবু হয়ে বসে চাপা গায় বলে —'পরাণ মাঝিরে ডাকুম একবার?'

—'কী হইব হ্যারে ডাইক্যা?'

—'একবার খুইজ্যা দেখব।'

—'পয়সা নিব না? তখন পয়সা পামু কই?'

একটু চিন্তা করে টুনু। বলে—'বেশি লাগব না। দুলটা যদি পাওন যায়—'

—'হু, দে একবার খবর। বেশি জানাজানি হইলে কিন্তু আমার কপালে কষ্ট আছে।' মা খুব আস্তে-আস্তে বলে। জল থেকে পা দুটো টেনে আনে মা। পা দুটো ভেজা, পায়ের পাতার নীচের দিয়ে বলে—'একবার ধর তো আমারে টুনু। শরীলটা য্যান কাঁপে আমার।'

টুনু মা'কে ধরে। সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না মা। পা দুটো থরথর করে কাঁপছে। মাথাটা নুয়ে পড়েছে সামনের দিকে।

—'ওয়াক'—হিক্কা ওঠে মা'র। টুনু মাকে জড়িয়ে থেকে টের পায় যে মার শরীরের ভিতরটা গুরগুর করে কাঁপছে। মা'কে শক্ত করে ধরে থাকে সে। মাথার ভেজা চুলগুলো সামনের দিকে দড়ির মতো দুলছে। মুখটা সাদা।

আর একবার হিক্কা তোলে মা। খানিকটা হলুদ জল বেরোয় মুখ দিয়ে। তারপর মা হাঁফাতে থাকে। টুনু চিৎকার করে—'কীগো মা কী হইছে তোমার?'

মা এবার তার কাঁধে ভয় দেয়— 'কিছু না, কিছু হয় নাই। সারাদিন খাই নাই তো কিছু। পিত্তি পড়ছে। গিয়া একটু শুইয়া থাকলেই সারব।'

—'হ তোমারও মাথা খারাপ। এই শরীল লইয়া কেউ জলে ডুবায়?' টুনু বলে। তার চিৎকার করে কাঁদছে ইচ্ছে হয় যেন।

—'কিন্তু দুলটা'—হাঁফাতে হাঁফাতেই বলে—'আমার বিয়ার দুল। তর বাবায় দিছিল। বড় শখের দুল রে! সব তো গেছে। এই দুলজোড়া আছিল।' মা কাঁদতে থাকে, আর হাঁফাতে

থাকে আর কাঁপতে থাকে।

টুনু ধমক দেয়—'কান্দনের কী হইছে। বাবায় ট্যার পাওনের আগেই দুল পাইয়া যাইবা। অখন গিয়া শুইয়া থাক। আমি পরাণ মাঝিরে একবার খবর দেই।'

মা'কে ধরে খুব সাবধানে আস্তে-আস্তে চলতে থাকে টুনু। মা'র গা থেকে ভিজে জলের আর বমির কটু গন্ধ তার নাকে এসে লাগে। একটু গা ঘিনঘিন করে তার।

উঠোনের আগলটা হাত বাড়িয়ে ধরে মা বলে—'তুই এইবার মাঝির কাছে যা। আমি একলাই ঘরে যাইতে পারুম।' তারপর ঘরের দিকে তাকিয়ে দুর্বল স্বরটায় যতদূর সম্ভব জোর দিয়ে মা ডাকে—'বুলকিরে, পানুরে, এদিকে আইয়া ধর দেখি আমারে একটু।'

টুনু বলে—'শয়তান দুইটা পাড়া বেড়াইতে বাইর হইছে বোধ হয়।'

মাকে ধরে মাটি লেপা দাওয়ায় বসিয়ে রেখে টুনু বলে—'ঘরে গিয়া শুইয়া থাক, আমি পরাণ মাঝিরে খবর দেই।'

পরাণ মাঝি পুকুর থেকে চোখ ঘুরিয়ে টুনুর দিকে তাকাল। একটু হেসে বলল—'না কর্তা, আট আনায় হইব না। পুরা একখানা ট্যাহা দিলে লামতে পারি জলে।'

—'ক্যান মাঝি, জল দেইখ্যা ভয় পাইলা নাকি?' মনে-মনে যেন একটু রাগ করেই বলে টুনু। দৈত্যের মতো প্রকাণ্ড চেহারা নিয়ে লোকটা হাসছে।

—'ভয়? কত পদ্মা ম্যাঘনা পার হইলাম কর্তা, অখন হালার পুষ্কর্ণীরে ভয়! দিয়েন কর্তা, বারো আনাই দিয়েন।'

পরাণ মাঝি মাথার গামছাটা খুলে কোমরে জড়াল। এবার খালি মাথাটা দেখতে পেল টুনু। চুলগুলো প্রায় সাদা হয়ে এসেছে, গালের খোঁচা খোঁচা দাড়িগুলোও সাদায় কালোয় মেশান। শরীরটা মস্ত বড় পরাণ মাঝির, কিন্তু চামড়াটা ঢিলে, কোঁচকান। খাটো একটা কাপড় আঁট করে পরা। পায়ের অনেকটা দেখা যাচ্ছে! কেঁচোর মতো শিরাবহুল মোটা গোড়ালি। পাগুলো সরু সরু।

খুব আস্তে-আস্তে জলটাকে একটুও ঘোলা না করে মাঝি জলে নামতে লাগল। গলাজলে দাঁড়াল মাঝি। এক আঁটি বিচালির মতো সাদা মাথাটা জলে ভাসছে।

টুনু দেখে মাঝির কালো লম্বা শরীরটা প্রকাণ্ড একটা বোয়াল মাছের মতো নড়ছে জলের নীচে।

হুস করে ডুব দেয় মাঝি। অনেকক্ষণ পর ভেসে ওঠে। টুনুর দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ে। অর্থাৎ পাওয়া যায়নি। মুখ থেকে খানিকটা জল 'পিড়িক' করে ছুড়ে দিয়ে আবার ডুব দেয় মাঝি। দুপুরের কড়া রোদে সবুজ, ঘন জলের নীচে অনেক নীচে একটা প্রকাণ্ড মাছের মতো পরাণ মাঝির শরীরটা নেমে যেতে থাকে। তারপর তাকে আর দেখতে পায় না টুনু।

পরাণ মাঝিকে কুশলী ডুবুরির মতো লাগে টুনুর। সে সব ডুবুরি (সে বইতে পড়েছে) একটুও ভয় না করে সমুদ্রের জলে ডুব দিয়ে ঝিনুক তুলে আনে। সেই ঝিনুকের ভিতরে মুক্তো। মুক্তো দেখেনি টুনু, ডুবুরিও না। পরাণ মাঝিকে দেখে শুধু ডুবুরির কথা মনে হয়।

পরাণ মাঝির মাথাটা এবার প্রায় মাঝ-পুকুরে ভেসে ওঠে। হাতের মুঠো থেকে খানিকটা কাঁদা ছুঁড়ে ফেলে পরাণ মাঝি আবার ডুব দেয়। সেই ছুড়ে দেওয়া কাদার মধ্যে কয়েকটা শামুক।

এবার পাড়ের কাছে মুখ তোলে মাঝি। ভীষণভাবে হাঁফাতে-হাঁফাতে বলে—'না কর্তা, ঠিক কুনখানে পড়ছে হেইরে না জানলে হইব না।'

টুনু মনে-মনে ভয় পায়। ব্যস্ত হয়ে বলে—'এইখানেই পড়ছে। তুমি আর একটু খুইজ্যা দ্যাখো। ছানের সময় বেশি দূরে যায় নাই মা।'

পরাণ মাঝি হতাশভাবে জলের দিকে একবার তাকায়। ঘাটের সিঁড়িতে ভর দিয়ে ক্লান্ত স্বরে বলে—'দেখি আর অ্যাকবার! হালার দমে কুলায় না, না হইলে হালার পুষ্কর্ণীরে—' কথাটা শেষ না করেই পিচ্ছিল গতিতে সাপের মতো জলে নামে মাঝি।

এবার পরাণ মাঝিকে স্পষ্ট দেখতে পায় টুনু। ঘাটের খাড়া পাড়ের কাছে জলটা গভীর। পরাণ মাঝি প্রকাণ্ড দুটো হাত মাছের পাখনার মতো নাড়তে-নাড়তে নেমে যাচ্ছে। কিন্তু গতিটা এবার আর সহজ নয়। খুব আস্তে-আস্তে নামছে মাঝি। সবুজ জলের ভিতরে তার পায়ের সাদা তলাটা নড়ছে। পা দুটো ওপর দিকে আর মাথাটা নীচের দিকে মাঝির।

অনেকটা নেমে প্রায় পুকুরের তলায় মাঝি থেমেছে। টুনু দেখতে পায়, মাঝি খুব সন্তর্পণে মাটিটা দেখছে। একটু পরেই জলটা আস্তে-আস্তে ঘোলা হয়ে গেল। কাদা কাদা হয়ে গেল ওপরটা। মাঝিকে আর দেখতে পেল না টুনু।

অনেকখানি জল ছিটিয়ে মাঝি ভেসে উঠল আবার। এবার পাড়ের খুব কাছে। মুখ তুলে দম নেয় মাঝি। বলে—'আর একটু কর্তা, দেখি একবার। মনে লয় পাইয়া যামু।' কথাগুলো এক নিশ্বাসে বলতে পারল না মাঝি। হাঁফাতে-হাঁফাতে কেটে-কেটে বলল। বলেই আবার ডুবে গেল জলের মধ্যে। জলের ওপর সাদা কতগুলো বুদবুদ জমা হল।

আরও বুদবুদ উঠে এল জলের ভিতর থেকে। কাচের মার্বেলের মতো সেগুলো ভাসতে লাগল জলের ওপর।

টুনু তাকিয়ে দেখে মাঝি উঠে আসছে। টুনু চেয়ে দেখল মাঝির হাতে মুঠো করা কাদা-মাটি।

পরাণ মাঝি ভেসে উঠল জলের ওপর। ক্লান্ত হাতে জলে ধাক্কা দিয়ে এগিয়ে এসে দাঁড়াল। তারপর সিঁড়ি ভেঙে উঠে এল ওপরে।

'কর্তা'—দম নেওয়ার প্রাণপণ চেষ্টা করে মাঝি বলে—'দ্যাখেন তো এইগুলির মধ্যে আছে নাকি!'

কাদার মুঠোটা খুলে মাঝি তাকে দেখায়। টুনু কাদার দলাটা হাত বাড়িয়ে নেয়। খানিকটা কাদা কয়েকটা পচা গাছের পাতা, একটু শ্যাওলা শামুক। আর কিছু নেই। টুনু নিশ্বাস ছাড়ল।

—'না মাঝি নাই তো এর মধ্যে।'

কোমরের গামছাটা খুলে মাটিতে বসে সেটা নিংড়োতে থাকে মাঝি। বলে—'দ্যাখলাম য্যান দুলের মতোই। খাংলা দিয়া তুললামও। কপালে নাই কর্তা, কী করব্যান!'

পরাণ মাঝির গলার স্বরটা যেন অনেক দূর থেকে আসছে ঠিক এমনি ক্ষীণ স্বরে সে বলে—'পারি না কর্তা আর। যখন মাঝি আছিলাম শরীরের জোর আছিল। একদমে নদীর তল থিক্যা মাটি উঠাইতাম। গাঙ পার হইতাম ভরা বর্ষার। হেইদিন গেছে। অখন মাঝির নাম ঘুচাইয়া রিফিউজি হইছি।'

গা মুছতে মুছতে পরাণ মাঝি টুনুর দিকে তাকায়। টুনু মাঝিকে দেখে। প্রকাণ্ড শরীর কড়া পরা হাত। অথচ মাঝির হাত দুটো যেন কাঁপছে।

মাটিতে ফেলে রাখা ময়লা কাদা জামাটার পকেট থেকে বিড়ি বার করে পরাণ মাঝি। সেটা ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া টেনে বলে—'আছিলাম পরাণ মাঝি, একডাকে মাইনষে চিনতে পারত। কুয়ার মইধ্যে লাইম্যা ঘটি বাটি গলার হার তুলছি, অখনে অ্যাক বুক জলে ডুব দিতেই দম শ্যাষ। বয়স বাড়ছে অখন, শরীলে আর হেই তাকত নাই, প্যাটে ভাত নাই কর্তা।'

মাঝি ধোঁয়া ছাড়ে। আর পুকুরপাড়ে ভেজা মাটির ওপর দাঁড়িয়ে টুনু বাবার কথা ভাবে। বাবা ফিরে এলে যদি জানতে পারে তবে মা আজ আর বেঁচে থাকবে না। গাটা শিরশির করে তার। বড় দুঃখী মা, টুনু ভাবে মা বড় দুঃখী। লোহার মতো শক্ত হাত বাবার, রোমশ

বুক, পেট। খালি গায়ে যখন উঠোনে কিংবা দাওয়ায় বসে তামাক খায় বাবা, তখন তারা কেউ কাছাকাছি যায় না। মাঝে-মাঝে যখন মাকে মারে বাবা, বিশ্রী গালাগাল দেয়, তখন মা কুঁইকুঁই করে ইঁদুর ছানার মতো কাঁদতে থাকে। বাবার প্রকাণ্ড দেহের দুটো হাতের ভিতর মাকে তখন ইঁদুরের মতোই ছোট্ট আর অসহায় মনে হয় তার।

পরাণ মাঝি উঠে দাঁড়িয়ে জামাটা গায়ে দেয়। বলে 'চলি কর্তা—কাইল আইয়া আর একবার দেখুম অনে।'

টুনু চেয়ে থাকে। জামরুল গাছটার তলা দিয়ে বিন্দু-পিসির ঘরের বেড়ার কাছ ঘেঁষে আস্তে আস্তে মাথা নীচু করে পরাণ মাঝি চলে গেল। টুনু ভাবে ঠিক তার রোগা, ছোট্ট মায়ের মতোই পরাণ মাঝিও যেন দুর্বল। খুব দুর্বল।

টুনু জলের দিকে তাকায় এবার। সবুজ জল, ঘন শ্যাওলা। দুপুরের সূর্য অনেকটা হেলেছে পশ্চিমের দিকে। কিন্তু এখনও দুপুর। গরম লাগছে টুনুর। সে আস্তে-আস্তে জলের প্রান্তে এসে দাঁড়ায়।

গায়ের শার্টটা খুলে ছুড়ে ফেলে দিল সে ঘাসের ওপর। একটা ব্যাঙ লাফিয়ে পড়ল জলে। কচু গাছ হাওয়ায় দুলছে। কেমন বিশ্রী একটা আঁশটে গন্ধ। পানা পুকুরে জলে তার ছায়া পড়ল।

টুনু তার ছায়ার দিকে তাকায়। রোগা লম্বাটে একটা ছেলের ছায়া। ছায়াটা জলের ভিতরে। একটু ডুবুরির মতো জলের মধ্যে থেকে ছায়াটা তাকে দেখছে। মায়ের কথা ভাবল সে, পরাণ মাঝির কথাও। আজ সন্ধেবেলা কিংবা অন্য কোনওদিন যখন বাবা টের পাবে তখন মাকে বাবা মারবে। হয়তো এবার মেরেই ফেলবে। কেন না, দুলটা সোনার আর সোনা বলতে তাদের ঘরে ওই দুলজোড়াই।

নীচু হয়ে জলটা দেখতে লাগল টুনু। ইচ্ছে হল একবার পরাণ মাঝির মতো ডুবুরি হয়ে খুঁজে দেখে দুলটাকে। কিন্তু সে সাঁতার জানে না। সাঁতার জানলে পাথর নুড়ি, শ্যাওলা আর গাছের পচা পাতার মধ্যে গিয়ে সবুজ জলে ডুবুরির মতো সে দুলটাকে একবার খুঁজে দেখত।

একটা পা বাড়িয়ে নিয়ে সিঁড়িতে রাখে সে। ঠান্ডা জলটা সুড়সুড়ি দেয় পায়ে। টুনু আর এক ধাপ নামে। আর-এক দাপ। হাঁটুর ওপর জল এবার। টুনু নীচু হয়।

ঘোলা জলটা এবার পরিষ্কার হয়ে গেছে। এখন সেই ঘন সবুজ রং। জলের নীচে অনেকটা দেখা যাচ্ছে। টুনু চোখটা বড়-বড় করে তাকায়। চোখটা সরিয়ে আনে

সিঁড়িগুলোর দিকে। একটা, দুটো, তিনটে সিঁড়ি স্পষ্ট এবং তারপর আরগুলো ছায়ার মতো দেখা যাচ্ছে। সিঁড়িগুলো গুনতে শুরু করে টুনু—তারপর—

চিৎকার করে উঠতে গিয়েও নিজের মুখে হাতচাপা দেয় টুনু। স্পষ্ট পরিষ্কার জলের নীচে চতুর্থ সিঁড়িটার ঠিক শেষে বাঁকা আর সুপুরি গাছের দড়ির বাঁধনটার কাছে সোনার দুলটার ছোট হুকটা চিকচিক করছে। কী আশ্চর্য! কেউ দেখতে পায়নি। টুনু মস্ত বড়-বড় চোখে চেয়ে থাকে। বুকটা ঢিপঢিপ করে তার।

টুনু ঝপ করে আর এক ধাপ নামল। কোমরের কাছে জল এবার। প্যান্টটা ভিজে গেল। ঠিক এই ধাপে দাঁড়িয়েই রোজ স্নান করে সে। এর বেশি নামতে সে ভয় পায়। সিঁড়িগুলো উঁচু উঁচু। আর এক ধাপ নামলেই গলা জল।

কিন্তু দুলটা সে নিজেই তুলবে। চারদিকে তাকায় টুনু। কেউ নেই। আরও দু-ধাপ নামলে দুলটা।

টুনু পা বাড়ায়। গলা জল।

টুনু নিশ্বাস টানে। পচা শ্যাওলা আর পানাপুকুর আর মাটির গন্ধ। টুনু পা বাড়ায়।

ঝপ করে পরের সিঁড়িটায় পা রাখতে না রাখতেই টুনু ডুব দেয়।

দুলটা! হাতের কাছেই।

কিন্তু নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে টুনুর।

সে মাথা তোলে।

পায়ের নীচেই সিঁড়িটা। ওপরের ধাপ। গলা জলে দাঁড়িয়ে নিশ্বাস টানে টুনু। বুক ভরে বাতাস নেয়। দুলটা তাকেই তুলতে হবে। টুনু তাকায়। জলে ঢেউ। জল ছলছল করছে গলার কাছে। সেই ঢেউ আর সবুজ শ্যাওলার ভিতর দিয়ে দুলটা চিকচিক করছে।

টুনু নীচু না হলে হাতে পাবে না।

ডুব দেয় সে। জলের ভিতরে অন্ধকার। জলের ভিতরে সবুজ রঙের অন্ধকার। পায়ের তলা দিয়ে একটা কী-যেন সরাৎ করে সরে গেল। বোধহয় মাছ! চমকে উঠে সে।

হাত বাড়ায় সে। আরও এক ধাপ।

মুখ থেকে বুদবুদ বেরিয়ে গাল ঘেঁষে জলের ওপর উঠে যাচ্ছে।

পরের ধাপে পা দেয় টুনু। নীচু, আরও নীচু হয়।

আর মাত্র এক বিঘত দূরে দুলটা! দম পায় না টুনু। বুকটা ফেটে যেতে চাইছে।

কোমরের নীচের দিকটা হালকা হয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছে। তার মাথাটা নীচে। পরাণ মাঝির মতো হাত দুটো দু-দিকে দোলায় টুনু। খুব তাড়াতাড়ি।

দুলের কাছেই হাতটা এদিক-ওদিক চলে যাচ্ছে। শেষবারের মতো দাঁতে দাঁত চাপে টুনু।

দুলটা! কাছেই।

দু-আঙুলে মধ্যে হুক-টা!

একটা হ্যাঁচকা টানের সঙ্গে-সঙ্গে দুলটা তার হাতের মুঠো এসে যায়।

যেন অনেক ভার বুকে। টুনু মুঠো-করা হাতটা বুকের কাছে চেপে ধরে। হাতের আঙুল আর চামড়া কেটে দুলটা যেন তার হাতের মধ্যেই বসে যাবে।

সিঁড়িটায় পায়ের চাপ দিয়ে টুনু সরে যায়। কোনদিকে যে সরছে, তা বুঝবার আগেই চোখে সূর্যের আলো লাগে।

বাতাস। আঃ!

হাঁ করে বুক ভরে নিশ্বাস টানে। হাত-পায়ের সমস্ত গ্রন্থিগুলো শিথিল।

কিন্তু তারপরেই আবার টুনু ডুবতে থাকে। এক পলকের জন্য সে দেখতে পায় হাত দশেক দূরে ঘাট। ঘাটে কেউ নেই। সে অনেকখানি সরে এসেছে। হাতের মুঠোয় দুলটা।

প্রাণপণে হাত আর পা দিয়ে জলে আঘাত করে সে। তারপর ডুবে যেতে থাকে। হাতের মুঠোটা শিথিল হয়ে আসছে।

আবার মাথা তোলে। ঘাট এখন হাত-কয়েকের মধ্যেই। কিন্তু টুনুর মনে হল, পুকুরটা যেন বহুবিস্তৃত সমুদ্রের মতো বড় হয়ে গেছে। যেন কূল-কিনারা কিচ্ছু নেই পুকুরটার। থই নেই পায়ের নীচে। হাতের মুঠোয় দুলটাকে প্রাণপণে চেপে রাখবার চেষ্টা করে।

গাঁটে গাঁটে অসংখ্য ফোঁড়ার যন্ত্রণা। সমস্ত শরীরটা শিথিল। হাত-পা নাড়তে পারছে না সে। চোখের সামনে সূর্যের আলোটা নিভে গিয়েই জ্বলে উঠছে। কানে শুধু কলকল ছলছল জলের শব্দ।

না, আর জোর নেই শরীরে। আর কিছু নেই। হাতের পেশিগুলো সঙ্কুচিত হচ্ছে না। মুঠোটা আলগা হয়ে আসছে। প্রাণপণে আঙুলগুলোকে বাঁকিয়ে রাখতে চাইছে সে। পারছে

না।

প্রাণপণে চিৎকার করতে গেল টুনু। মুখে জল ঢুকল। টুনু ঢোঁক গেলে।

জল তাকে ঘিরে যেন ঘুরছে। তাকে টেনে নিচ্ছে পাতালের দিকে। কত নীচে যে তলিয়ে যাচ্ছে সে! বেঁকানো আঙুলগুলো জট ছাড়িয়ে আস্তে আস্তে খুলে যাচ্ছে। বুক থেকে সমস্ত নিশ্বাস শুষে নিচ্ছে জল। দম নেওয়ার জন্যে সে হাঁ করে। জল ঢোকে মুখে।

মাথাটা ডুবে যাওয়ার আগে হাত চারেক দূরে ঘাট দেখতে পায় সে। দেখতে পায় একপাঁজা বাসন হাতে বিন্দুপিসি আসছে ঘাটের কাছে।

তারপর জল আর পাতাল। ঝাঁকড়া মাথা বিরাট একটা দৈত্যের মতো কার মুখ যেন জলের ভিতরে।...ঝপ করে একটা শব্দ। একটা চিৎকার।

শেষবারের মতো ক্লান্তি, ঘুম আর অন্ধকারের মধ্যে তলিয়ে যেতে-যেতে সে টের পায়, তার শরীরটা আছড়ে পড়ল মাটিতে। বুকটা হালকা। আর ডান হাতের তেলোয় তার মুঠোর মধ্যে শিথিল আঙুলের ফাঁক থেকে গড়িয়ে পড়বার আগের মুহূর্তে দুলটাকে সে অনুভব করে। দুলটা আছে! হাতেই!

তারপর একটা ছুড়ে-দেওয়া কালো চাদরের মতো অন্ধকারটা তাকে ঢেকে ফেলল।

টুনু চোখ মেলে চায়। অল্প অন্ধকার। ঘরে আলো জ্বলছে। অনেক লোক তাকে ঘিরে, তার ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে। টুনু বুঝতে পারে না কিছু। মার মুখটা সবচেয়ে কাছে। মা কাঁদছে। আর অন্য সকলের ভিড়ের ভিতরে বাবা দাঁড়িয়ে। বাবার পাশেই বিন্দুপিসি। তাকে দেখছে সবাই। সবাইকে একসঙ্গে দেখে কেমন যেন অদ্ভুত লাগে তার। তারপর আস্তে-আস্তে মাথার ঝিমুনি ভাবটা কেটে যায়। মনে পড়ে যায় আজ দুপুরবেলায়, ঠিক দুপুরবেলায় জলের অনেক নীচে সে আর সোনার দুলটা একই সঙ্গে ডুবে যাচ্ছিল।

টুনু চোখ বোজে। ক্লান্তি আর ঘুম।

অনেকক্ষণ পরে তাকায় সে। তার পাশে বাবা। আর কেউ নেই।

আবছাভাবে লণ্ঠনের অল্প আলোয় বাবার মুখটা দেখতে পাচ্ছে সে। মুখটা তার ওপর ঝুঁকে পড়েছে। অল্প দাড়ি বাবার মুখে। কোমল, শান্ত দুটো চোখ। বাবার রোমশ কঠিন একটা হাত আলতোভাবে তার কাঁধের ওপর, আর একটা হাত তার মাথার চুলের ভিতরে আঙুল বুলিয়ে দিচ্ছে।

খুব নম্র শান্ত গলায় বাবা বলে—'কেমন আছস রে বাবা?'

—'ভালো—ক্ষীণ কণ্ঠে জবাব দেয় টুনু।

—'বাঘের বাচ্চা'—বাবা বলে—'বাঘের বাচ্চা তুই।'

সব কথা বুঝতে পারে না টুনু। তবু চুপ করে থাকে।

রান্নাঘর থেকে মা এ-ঘরে এল।

'টুনু, টুইন্যারে, তর দুধ আনছি'—এই বলে মা তার শিয়রের কাছে বসে। মা'র চুলগুলো ছাড়া। আবছা আলো-আঁধারেতে মা'র মুখটা দেখতে পায় সে। আর দেখতে পায় মা'র বাঁ-কানের লতিটা আর শূন্য নেই। সেখানে ঝকঝক করে জ্বলছে দুলটা। মা'র মুখটা হাসছে। যেন ভাঙাচোরা হাড়-উঁচু মুখটা বদলে গেছে হঠাৎ। খুব সুন্দর দেখাচ্ছে মা'কে। মা'র মুখটা অনেক উঁচুতে। দুল দুটো যেন মুক্তো—যে মুক্তো সমুদ্রের অনেক নীচে থেকে কুড়িয়ে আনে ডুবুরিরা।

টুনু নড়ে।

—'না, তুই উঠিছ না'—বাবা বলে।

মা তার কপালের ওপর ঈষৎ তপ্ত একটা হাত দিয়ে চাপা দিয়ে বলে—'উঠিছ না তুই, আমি তরে ঝিনুক দিয়া খাওয়াইয়া দিতাছি।'

টুনু তাকায়। ওপাশের মাচাইয়ে বুলকি আর পানু ঘুমোচ্ছে।

টুনু হাঁ করল। দুটো ঠোঁটের কোণে ঝিনুকটা আর মার কয়েকটা আঙুল। অল্প গরম দুধটা তার জিভ বেয়ে গলার কাছে নেমে এল। হাসি পেল টুনুর, যেন সে অনেক অনেক ছোট হয়ে গেছে। যেন সে মা'র কোলে, আর মা তাকে ঝিনুক দিয়ে দুধ খাইয়ে দিচ্ছে।

শেষবার তার ঠোঁটের পাশ থেকে ঝিনুকটা সরিয়ে নিয়ে নিতে মা বলে—'এই ঝিনুকটা দিয়া ছোটবেলায় তরে দুধ খাওয়াইতাম। তর কি আর মনে আছে? মা'র গলাটা কাঁপছে অল্প অল্প। মা'র চোখে বোধহয় জল।

—'হ অর কি মনে থাকনের কথা!' বাবা বলে।

বাবা যেন একটা কাচের ওপাশ থেকে কথা বলছে। গলার স্বরটা ক্ষীণ। বাবা যেন দুর্বল, কথা বলতে পারছে না। বাবা কাঁদছে? না, বাবা কাঁদছে না। বাবা কোনওদিকে তাকিয়ে নেই। গায়ের চাদরটা দিয়ে দেহটা ঢাকা। চোখ দুটো বন্ধ। ভেজা-ভেজা। অল্প-অল্প দুলছে বাবা। ছবিতে দেখা যিশুখ্রিস্টের মতো মুখ বাবার।

হঠাৎ টুনুর মনে হল, খুব সুন্দর তার বাবা। খুব সুন্দর। বহু-পরিচিত পুরোনো বাবাকে যেন চিনতে পারছে না সে। এখন এই আধো-অন্ধকার ঘরে শিয়রের কাছে মা, আর পাশে খুব কাছেই বাবা। খুব কাছাকাছি দুজন। মা আর বাবা। দুজনেই তাকে ছুঁয়ে আছে।

খুব ক্ষীণ স্বরে, যেন একটা কাচের ওপাশ থেকে বাবা বলে—'মধ্যে-মধ্যে মনে লই যে মরি। অখন মরণ হইলেই ভালো। কিন্তু মাইজ্যা বউ, এত সহজে আমরা মরুম মা। আমরা—'

আর শুনতে পায় না টুনু। ঘুমে জুড়ে আসে চোখ। এক মুহূর্তের জন্য তার মনে হয়, মা বাবা আর পরাণ মাঝি যেন একই রকমে দুঃখী, অসহায় দুর্বল। তারা কেউ নিষ্ঠুর নয়।

তারপর সুখী টুনু, তার দুঃখী মা-বাবার মাঝখানে থেকে তাদের শরীর ওম-এর ভিতরে ডুবুরি হওয়ার স্বপ্ন দেখতে-দেখতে, আর তার দুঃখী মা-বাবা তার ছোট রোগা নরম শরীরে তাদের নিজেদের দেহের তাপ সঞ্চার করে দিতে-দিতে একটা বৃহত্তম কূল-কিনারাহীন অথই অন্ধকারের সমুদ্রের ভিতরে পৃথিবীর আরও লক্ষ-লক্ষ কোটি-কোটি মানুষের সঙ্গে একসঙ্গে একই দুঃখ-বেদনায় জ্বলতে-জ্বলতে খুব ছোট্ট সোনার টুকরোর মতো সুখস্বপ্নের দিকে চোখ রেখে আস্তে-আস্তে ডুবে যেতে লাগল।

নীলুর দুঃখ

সক্কালবেলাতেই নীলুর বিশ চাক্কি ঝাঁক হয়ে গেল। মাসের একুশ তারিখ। ধারে কাছে কোনও পেমেন্ট নেই। বাবা তিনদিনের জন্য মেয়ের বাড়িতে গেছে বারুইপুর—মহা টিকরমবাজ লোক—সাউথ শিয়ালদায় গাড়িতে তুলে দিয়ে নীলু যখন প্রণাম করল তখন হাসি-হাসি মুখে বুড়ো নতুন সিগারেটের প্যাকেটের সিলোফেন ছিঁড়ছে। তিনদিন মায়ের আওতায় বাইরে থাকবে বলে বুঝি ওই প্রসন্নতা—ভেবেছিল নীলু। গাড়ি ছাড়বার পর হঠাৎ খেয়াল হল, তিনদিনের বাজার খরচ রেখে গেছে তো! সেই সন্দেহ কাল সারা বিকেল খচখচ করেছে। আজ সকালেই মশারির মধ্যে আধখানা ঢুকে তাকে ঠেলে তুলল মা—বাজার যাবি না, ও নীলু?

তখনই বোঝা গেল বুড়ো চাক্কি রেখে যায়নি। কাল নাকি টাকা তুলতে রানাকে পাঠিয়েছিল কিন্তু দস্তখত মেলেনি বলে উইথড্রয়াল ফর্ম ফেরত দিয়েছে পোস্টাপিস। কিন্তু নীলু জানে পুরোটা টিকরকমবাজি। বুড়ো আগে ছিল রেলের গার্ড, রিটায়ার করার পর একটা মুদির দোকান দিয়েছিল—অনভিজ্ঞ লোক, তার ওপর দোকান ভেঙে খেত—ফলে দোকান গেল উঠে। এখন তিন রোজগেরে ছেলের টাকা নিয়ে পোস্ট অফিসে রাখে আর প্রতি সপ্তাহে খরচ তোলে। প্রতিদিন বাজারের থলি দশমেসে পেটের মতো ফুলে না থাকলে বুড়োর মন ভেজে না। মাসের শেষ দিকে টাকা ফুরোলেই টিকরমবাজি শুরু হয়। প্রতি সপ্তাহে যে লোক টাকা তুলছে তার নাকি দস্তখত মেলে না!

নীলু হাসে। সে কখনও বুড়ার ওপর রাগ করে না। বাবা তার দিকে আড়ে-আড়ে চায় মাসের শেষ দিকটা। ঝাঁক দেওয়ার নানা চেষ্টা করে। নীলুর সঙ্গে বাবার একটা লুকোচুরির খেলা চলতে থাকে।

বাঙালের খাওয়া। তার ওপর পুঁটিয়ারির নাড়ুমামা, মামি, ছেলে, ছেলের বউ—চারটে বাইরের লোক নিমন্ত্রিত, ঘরের লোক বারোজন—নীলু নিজে, মা, ছ'টা ভাই, দুটো ধুমসী

বোন, বিধবা মাখনী পিসি, বাবার জ্যাঠতুতো ভাই, আইবুড়ো নিবারণ কাকা—বিশ চাক্কির নীচে বাজার নামে?

রবিবার বাজার নামিয়ে রেখে নীলু একটু পাড়ায় বেরোয়। কদিন ধরেই পোগো ঘুরছে পিছন পিছন। তার কোমরে নানা আকৃতির সাতটা ছুরি। ছুরিগুলো তার মায়ের পুরোনো শাড়ির পাড় ছিঁড়ে তাই দিয়ে জড়িয়ে সযত্নে শার্টের তলায় গুঁজে রাখে পোগো। পাড়ার লোক বলে, পোগো দিনে সাতটা মার্ডার করে। নিতান্ত এলেবেলে লোকও পোগোকে যেতে দেখলে হেঁকে ডাক পাড়ে—কী পোগোবাবু, আজ কটা মার্ডার হল? পোগো হুম হাম করে চলে যায়।

পরশুদিন পোগোর মেজবউদি জানালা দিয়ে নীলুকে ডেকে বলেছিল—পোগো যে তোমাকে মার্ডার করতে চায়, নীলু, খবর রাখো?

তাই বটে। নীলুর মনে পড়ল, কয়েকদিন যাবৎ সে অফিসে যাওয়ার সময়ে লক্ষ করেছে পোগো নিঃশব্দে আসছে পিছনে পিছনে। বাস-স্টপ পর্যন্ত আসে। নীলু কখনও ফিরে তাকালে পোগো ঊর্ধ্বমুখে আকাশ দেখে আর বিড়বিড় করে গাল দেয়।

আজ বিশ চাক্কি ঝাঁক হয়ে যাওয়ায় নীলুর মেজাজ ভালো ছিল না। নবীনের মিষ্টির দোকানের সিঁড়িতে বসে সিগারেট ফুঁকছিল পোগো। নীলুকে দেখেই আকাশে তাকাল। না দেখার ভান করে কিছুদূর গিয়েই নীলু টের পেল পোগো পিছু নিয়েছে।

নীলু ঘুরে দাঁড়াল। সঙ্গে-সঙ্গে পোগো উলটোবাগে ঘুরে হাঁটতে লাগল। এগিয়ে গিয়ে তার পাছায় ডান পায়ের একটা লাথি কষাল নীলু—শালা, বদের হাঁড়ি।

কাঁই শব্দ করে ঘুরে দাঁড়ায় পোগো। জিভ আর প্যালেটের কোনও দোষ আছে পোগোর, এখনও জিভের আড় ভাঙেনি। ছত্রিশ বছরের শরীর তিন বছর বয়সি মগজ নিয়ে সে ঘুরে বেড়ায়। গরম খেয়ে বলল—খুব ঠাবহান, নীলু, বলে ডিট্টি খুব ঠাবহান।

—ফের! কষাব আর একটা?

পোগো থিতিয়ে যায়। শার্টের ভিতরে লুকোন হাত ছুরি বের করবার প্রাক্কালের ভঙ্গিতে রেখে বলে—একডিন ফটে ডাবি ঠালা।

নীলু আর একবার ডান পা তুলতেই পোগো পিছিয়ে যায়। বিড়বিড় করতে-করতে কারখানার পাশের গলিতে ঢুকে পড়ে।

সেই কবে থেকে মার্ডারের স্বপ্ন দেখে পোগো। সাত-আটখানা ছুরি বিছানায় নিয়ে ঘুমোতে যায়। পাছে নিজের ছুরি ফুটে ও নিজে মরে—সেই ভয়ে ও ঘুমোলে ওর মা এসে

হাতড়ে-হাতড়ে ছুরিগুলো সরিয়ে নেয়। মার্ডারের বড় শখ পোগোর। সারাদিন সে লোককে কত মার্ডারের গল্প করে! কলকাতায় হাঙ্গামা লাগলে ছাদে উঠে দুহাত তুলে লাফায়। মার্ডারের গল্প যখন শোনে তখন নিথর হয়ে যায়।

নীলু গতবার গ্রীষ্মে দার্জিলিং বেড়াতে গিয়ে একটা ভোজালি কিনেছিল। তার সেই শখের ভোজালিটা দিনসাতেক আগে একদিনের জন্য ধার নিয়েছিল পোগো। ফেরত দেওয়ার সময়ে চাপা গলায় বলেছিল—ভয় নেই, ভালো করে ঢুয়ে ডিয়েছি।

—কী ধুয়েছিস? জিগ্যেস করেছিল নীলু।

অর্থপূর্ণ হেসেছিল পোগো, উত্তর দেয়নি। তোমরা বুজে নাও কী ধুয়েছি। সেদিনও একটা লাথি কষিয়েছিল নীলু—শালার শয়তানি বুদ্ধি দেখ। ধুয়ে দিয়েছি—কী ধুয়েছিস আব্বে পোগোর বাচ্চা?

সেই থেকেই বোধহয় নীলুকে মার্ডার করার জন্য ঘুরছে পোগো। তার লিস্টে নীলু ছাড়া আরও অনেকের নাম আছে যাদের সে মার্ডার করতে চায়।

আজ সকালে ব্রিটিশকে খুঁজছে নীলু। কাল ব্রিটিশ জিতেছে। দুশো সত্তর কি আশি টাকা। সেই নিয়ে খিচাং হয়ে গেল কাল!

গলির মুখ আটকে খুদে প্যান্ডেল বেঁধে বাচ্চাদের ক্লাবের রজত জয়ন্তী হচ্ছিল কাল সন্ধেবেলায়। পাড়ার মেয়ে, বউ, বাচ্চারা ভিড় করেছিল খুব। সেই ফাংশন যখন জমজমাট, তখন বড় রাস্তায় ট্যাক্সি থামিয়ে ব্রিটিশ থামল। টলতে-টলতে ঢুকল গলিতে, দু-বগলে বাংলার বোতল! সঙ্গে ছটকু। পাড়ায় পা দিয়ে ফাংশনের ভিড় দেখে নিজেকে জাহির করার জন্য দুহাত ওপরে তুলে হাঁকাড় ছেড়েছিল ব্রিটিশ—ঈ-ঈ-ঈ-দ কা চাঁ-আ-দ! বগল থেকে দুটো বোতল পড়ে গিয়ে ফট-ফটাস করে ভাঙল। হুড়দৌড় লেগে গিয়েছিল বাচ্চাদের ফাংশনে! পাঁচ বছরের টুমিরানি তখন ডায়াসে দাঁড়িয়ে 'কাঠবিড়ালি, কাঠবিড়ালি, পেয়ারা তুমি খাও...' বলে দুলতে-দুলতে থেমে ভ্যাঁ করার জন্য হাঁ করেছিল মাত্র। সেই সময়ে নীলু, জগু, জাপান এসে দুটোকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল হরতুনের চায়ের দোকানে। নীলু ব্রিটিশের মাথায় জল ঢালে আর জাপান পিছন থেকে হাঁটুর গুঁতো দিয়ে জিগ্যেস করে—কত জিতেছিস? প্রথমে ব্রিটিশ চেঁচিয়ে বলেছিল—আব্বে, পঞ্চা-আ-শ হা-জার-আ-র। জাপান আরও দুবার হাঁটু চালাতেই সেটা নেমে দাঁড়াল দু হাজারে। সেটাও বিশ্বাস হল না কারও। পাড়ার বুকি বিশুর কাছ থেকে সবাই জেনেছে, ঈদ কা চাঁদ হট ফেরারিট ছিল। আরও কয়েকবার ঝাঁকাড় খেয়ে সত্যি কথা বলল ব্রিটিশ—তিনশো, মাইরি বলছি বিশ্বাস কর। পকেট সার্চ করে শ-দুয়েক মতো পাওয়া গিয়েছিল।

আজ সকালে তাই ব্রিটিশকে খুঁজছে নীলু। মাসের একুশ তারিখ। ব্রিটিশের কাছে ত্রিশ টাকা পাওনা। গত শীতে দর্জির দোকান থেকে ব্রিটিশের টেরিকটনের প্যান্টটা ছাড়িয়ে দিয়েছিল নীলু। এতদিন চায়নি। গতকাল নিয়ে যেতে পারত, কিন্তু মাতালের কাছ থেকে নেওয়া উচিত নয় বলে নেয়নি। আজ দেখা হলে চেয়ে নেবে।

চায়ের দোকানে ব্রিটিশকে পাওয়া গেল না। ভি. আই. পি. রোডের মাঝখানে যে সবুজ ঘাসের চত্বরে বসে তারা আড্ডা মারে, সেখানেও না। ফুলবাগানের মোড় পর্যন্ত এগিয়ে দেখল নীলু। কোথাও নেই। কাল রাতে নীলু বেশিক্ষণ ছিল না হরতুনের দোকানে। জাপান, জগু ওরা ব্রিটিশকে ঘিরে বসেছিল। বহুকাল তারা এমন মানুষ দেখেনি যার পকেটে ফালতু দুশো টাকা। জাপান মুখ চোখাচ্ছিল। কে জানে রাতে আবার ওরা ট্যাক্সি ধরে ধর্মতলার দিকে গিয়েছিল কিনা! গিয়ে থাকলে ওরা এখনও বিছানা নিয়ে আছে। দুপুর গড়িয়ে উঠবে। ব্রিটিশের বাড়িতে আজকাল আর যায় না নীলু। ব্রিটিশের মা আর দাদার সন্দেহ ওকে নষ্ট করেছে নীলুই। নইলে নীলু গিয়ে ব্রিটিশকে টেনে তুলত বিছানা থেকে, বলত—না হকের পয়সা পেয়েছিস, হিস্যা চাই না, আমার হক্কেরটা দিয়ে দে।

নাঃ। আবার ভেবে দেখল নীলু। দুশো টাকা—মাত্র দুশো টাকার আয়ু এ বাজারে কতক্ষণ। কাল যদি ওরা সেকেন্ড টাইম গিয়ে থাকে ধর্মতলায় তবে ব্রিটিশের পকেটে এখন হপ্তার খরচও নেই।

মোড়ে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরায় নীলু। ভাবে, বিশ চাক্কি যদি ঝাঁক হয়েই গেল তবে কীভাবে বাড়ির লোকজনের ওপর একটা মৃদু প্রতিশোধ নেওয়া যায়!

অমনি শোভন আর তার বউ বল্লরীর কথা মনে পড়ে গেল তার। শোভন কাজ করে কাস্টমসে। তিনবারে তিনটি বিলিতি টেরিলিনের শার্ট তাকে দিয়েছে শোভন, আর দিয়েছে সস্তার একটা গ্রুয়েন ঘড়ি। তার ভদ্রলোক বন্ধুদের মধ্যে শোভন একজন—যাকে বাড়িতে ডাকা যায়। কতবার ভেবেছে নীলু শোভন, বল্লরী আর ওদের দুটো কচি মেয়েকে এক দুপুরের জন্য বাড়িতে নিয়ে আসবে, খাইয়ে দেবে ভালো করে। খেয়ালই থাকে না এসব কথা।

মাত্র তিন স্টপ দূরে থাকে শোভন। মাত্র সকাল ন'টা বাজে। আজ ছুটির দিন, বল্লরী নিশ্চয়ই রান্না চাপিয়ে ফেলেনি। উনুনে আঁচ দিয়ে চা-ফা, লুচি-ফুচি হচ্ছে এখনও। দুপুরে খাওয়ার কথা বলার পক্ষে খুব বেশি দেরি বোধহয় হয়নি এখনও।

ছত্রিশ নম্বর বাসটা থামতেই উঠে পড়ল নীলু।

উঠেই বুঝতে পারে, বাসটা দখল করে আছে দশ-বারোজন ছেলে-ছোকরা। পরনে শার্ট পায়জামা, কিংবা সরু প্যান্ট। বয়স ষোলোর এদিক-ওদিক। তাদের হাসির শব্দ থুথু ফেলার আগের গলাখাঁকারির—খ্যা -অ্যা-অ্যা-র মতো শোনাচ্ছিল। লেডিজ সিটে দু-তিনজন মেয়েছেলে বাইরের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে। দু-চারজন ভদ্রলোক ঘাড় সটান করে পাথরের মতো সামনের শূন্যতার দিকে চেয়ে আছে। ছোকরারা নিজেদের মধ্যেই চেঁচিয়ে কথা বলছে। উলটোপালটা কথা, গানের কলি। কন্ডাক্টর দুজন দু-দরজায় সিঁটিয়ে দাঁড়িয়ে। ভাড়া চাইবার সাহস নেই।

তবু ছোকরাদের একজন দলের পরমেশ নামে এক-একজনকে ডেকে বলছে—পরমেশ, আমাদের ভাড়াটা দিলি না?

—কত করে?

—আমাদের হাফ টিকিট। পাঁচ পয়সা করে দিয়ে দে।

—এই যে কন্ডাক্টরদাদা, পাঁচ পয়সার টিকিট আছে তো! বারোখানা দিন।

পিছনের কন্ডাক্টর রোগা, লম্বা, ফরসা। না কামানো কয়েকদিনের দাড়ি থুতনিতে জমে আছে। এবড়োখেবড়ো গজিয়েছে গোঁফ। তাতে তাকে বিষণ্ণ দেখায়। সে তবু একটু হাসল ছোকরাদের কথায়। অসহায় হাসিটি।

নীলু বসার জায়গা পায়নি। কন্ডাক্টরের পাশে দাঁড়িয়ে সে বাইরের দিকে মুখে ফিরিয়ে ছিল।

বাইরে কোথাও পরিবার পরিকল্পনার হোর্ডিং দেখে জানলার পাশে বসা একটা ছেলে চেঁচিয়ে বলল—লাল ত্রিভুজটা কী বল তো মাইরি!

—ট্রাফিক সিগন্যাল বে, লাল দেখলে থেমে যাবি।

—আর নিরোধ। নিরোধটা কী যেন।

—রাজার টুপি...রাজার টুপি...

—খ্যা—অ্যা-অ্যা-অ্যা-খ্যা-অ্যা-অ্যা...

—খ্যা...

পরের স্টপে বাস আসতে তারা হেঁকে বলল—বেঁধে...লেডিজ...

নেমে গেল সবাই। বাসটাকে ফাঁকা নিস্তব্ধ মনে হল এবার। সবাই শরীর শ্লথ করে দিল। একজন চশমা চোখে যুবা কন্ডাক্টরের দিকে চেয়ে বলল—লাথি দিয়ে নামিয়ে দিতে পারেন না এসব এলিমেন্টকে!

কন্ডাক্টর ম্লান মুখে হাসে।

ঝুঁকে নীলু দেখছিল ছেলেগুলো রাস্তা থেকে বাসের উদ্দেশে টিটকিরি ছুড়ে দিচ্ছে। কান কেমন গরম হয়ে যায় তার। লাফিয়ে নেমে পড়তে ইচ্ছে করে। লাঠি ছোরা বোমা যা হোক অস্ত্র নিয়ে কয়েকটা খুন করে আসতে ইচ্ছে করে।

হঠাৎ পোগোর মুখখানা মনে পড়ে নীলুর। জামার আড়ালে ছোরা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে পোগো। স্বপ্ন দেখছে মার্ডারের। তারা সবাই পোগোর পিছনে লাগে, মাঝেমধ্যে লাথি কষায়। তবু কেন যে পোগোর মতোই এক তীব্র মার্ডারের ইচ্ছে জেগে ওঠে নীলুর মধ্যেও মাঝে-মাঝে। এত তীব্র সেই ইচ্ছে যে আবেগ কমে গেলে শরীরে একটা অবসাদ আসে। তেতো হয়ে যায় মন।

শোভন বাথরুমে। বল্লরী এসে দরজা খুলে চোখ কপালে তুলল—ওমা, আপনার কথাই ভাবছিলাম সকালবেলা। অনেকদিন বাঁচবেন।

শোভনের বৈঠকখানাটি খুব ছিমছাম সাজানো। বেতের সোফা, কাচের বুককেস, গ্রুন্ডিগের রেডিওগ্রাম, কাঠের টবে মানিপ্ল্যান্ট, দেওয়ালে বিদেশি বারো-ছবিওলা ক্যালেন্ডার, মেঝেয় কয়ের কার্পেট। মাঝখানে নীচু টেবিলের ওপর মাখনের মতো রঙের ঝকঝকে অ্যাশ-ট্রে টার সৌন্দর্যও দেখবার মতন। মেঝেয় ইংরেজি ছড়ার বই খুলে বসে ছিল শোভনের চার আর তিন বছর বয়সের মেয়ে মিলি আর জুলি। একটু ইংরেজি কায়দায় থাকতেই ভালোবাসে শোভন। মিলিকে কিন্ডারগার্টেনের বাস এসে নিয়ে যায় রোজ। সে ইংরিজি ছড়া মুখস্থ বলে।

নীলুকে দেখেই মিলি জুলি টপাটপ উঠে দৌড়ে এল।

মিলি বলে—তুমি বলেছিলে ভাত খেলে হাত এঁটো হয়। এঁটো কী?

দুজনকে দুকোলে তুলে নিয়ে ভারী একরকমের সুখবোধ করে নীলু। ওদের গায়ে শৈশবের আশ্চর্য সুগন্ধ।

মিলি জুলি তার চুল, জামার কলার লণ্ডভণ্ড করতে থাকে। তাদের শরীরের ফাঁক দিয়ে মুখ বের করে নীলু বল্লরীকে বলে—তোমার হাঁড়ি চড়ে গেছে নাকি উনুনে।

—এইবার চড়বে। বাজার এল এইমাত্র।

—হাঁড়ি ক্যানসেল করো আজ! বাপ গেছে বারুইপুরে। সকালেই বিশ চাক্কি ঝাঁক হয়ে গেল। সেটা পুষিয়ে নিতে হবে তো! তোমার এ দুটো পুঁটলি নিয়ে দুপুরের আগেই চলে যেয়ো আমার গাড্ডায়, খুমে লিও সবাই।

বল্লরী ঝেঁঝে ওঠে—কী যেসব অসভ্য কথা শিখেছেন বাজে লোকদের কাছ থেকে। নেমন্তন্নের ওই ভাষা।

বাথরুম থেকে শোভন চেঁচিয়ে বলে—চলে যাস না নীলু, কথা আছে।

—যেয়ো কিন্তু। নীলু বল্লরীকে বলে—নইলে আমার প্রেস্টিজ থাকবে না।

—বাঃ, আমার যে ডালের জল চড়ানো হয়ে গেছে। এতবেলায় কি নেমন্তন্ন করে মানুষ।

নীলু সেসব কথায় কান দেয় না। মিলি জুলির সঙ্গে কথা বলতে শুরু করে।

শোভন সকালেই দাড়ি কামিয়েছে। নীল গাল। মেদবহুল শরীরে এঁটে বসেছে ফিনফিনে গেঞ্জি, পরনে পাটভাঙা পায়জামা। গত বছর যৌথ পরিবার থেকে আলাদা হয়ে এল শোভন। বাসা খুঁজে দিয়েছিল নীলুই। চারদিনের নোটিশে। এখন সুখে আছে শোভন। যৌথ পরিবারে থাকার সময়ে এত নিশ্চিন্ত আর তৃপ্ত আর সুখী দেখাত না তাকে।

পাছে হিংসা হয় সেই ভয়ে চোখ সরিয়ে নেয় নীলু।

নেমন্তন্নের ব্যাপার শুনে শোভন হাসে—আমিও যাব-যাব করছিলাম তোর কাছে। এর মধ্যেই চলে যেতাম। ভালোই হল।

এক কাপ চা আর প্লেটে বিস্কুট সাজিয়ে ঘরে আসে বল্লরী।

শোভন হতাশ গলায় বলে—বা মোটে এক কাপ করলে! ছুটির দিনে এ সময়ে আমারও তো এক কাপ পাওনা।

বল্লরী গম্ভীরভাবে বলে—বাথরুমে যাওয়ার আগেই তো এক কাপ খেয়েছ।

মিষ্টি ঝগড়া করে দুজন। মিলি জুলির গায়ের অদ্ভুত সুগন্ধে ডুবে থেকে শোভন আর বল্লরীর আদর-করা স্বর শোনে নীলু। সম্মোহিত হয়ে যেতে থাকে।

তারপরই হঠাৎ গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বলে—চলি রে? তোরা ঠিক সময়ে চলে যাস।

—শুনুন, শুনুন, আপনার সঙ্গে কথা আছে। বল্লরী তাকে থামায়।

—কী কথা?

—বলছিলুম না আজ সকালেই ভেবেছি আপনার কথা। তার মানে নালিশ আছে একটা। কারা বলুন তো আমাদের বাড়ির দেওয়ালে রাজনীতির কথা লিখে যায়? তারা কারা? আপনাদের তো এলাকা এটা, আপনার জানার কথা।

—কী লিখেছে?

—সে অনেক কথা। ঢোকার সময়ে দেখেননি? বর্ষার পরেই নিজেদের খরচে বাইরেটা রং করালুম। দেখুন গিয়ে, কালো রং দিয়ে ছবি এঁকে লিখে কী করে গেছে শ্রী। তা ছাড়া রাতভর লেখে, গোলমালে আমরা কাল রাতে ঘুমোতে পারিনি।

নীলু উদাসভাবে বলে—বারণ করে দিলেই পারো।

—কে বারণ করবে? আপনার বন্ধু ঘুমোতে না পেরে উঠে সিগারেট ধরাল আর ইংরেজিতে আপনমনে গালাগাল দিতে লাগল—ভ্যাগাবন্ডস, মিসফিটস, প্যারাসাইটস...আরও কত কী! সাহস নেই যে উঠে ছেলেগুলোকে ধমকাবে।

—তা তুমি ধমকালে না কেন? নীলু বলে উদাসভাবটা বজায় রেখেই।

বল্লরী হাসল উজ্জ্বলভাবে। বলল—ধমকাইনি নাকি! শেষমেষ আমিই তো উঠলাম। জানলা দিয়ে গলা বাড়িয়ে বললাম—ভাই, আমরা কি রাতে একটু ঘুমোব না? আপনার বন্ধু তো আমার কাণ্ড দেখে অস্থির। পিছন থেকে আঁচল টেনে ফিসফিস করে বলছে—চলে এসো, ওরা ভীষণ ইতর, যা তা বলে দেবে। কিন্তু ছেলেগুলো খারাপ না। বেশ ভদ্রলোকের মতো চেহারা। ঠোঁটে সিগারেট জ্বলছে, হাতে কিছু চটি চটি বই, প্যামফলেট। আমার দিকে হাতজোড় করে বলল—বউদি, আমাদেরও তো ঘুম নেই। এখন তো ঘুমের সময় না এদেশে। বললুম—আমার দেওয়ালটা অমন নোংরা হয়ে গেল যে! একটা ছেলে বলল—কে বলল নোংরা! বরং আপনার দেওয়ালটা অনেক ইর্ম্পট্যান্ট হল আগের চেয়ে। লোক এখন দাঁড়াবে, দেখবে, জ্ঞানলাভ করবে। আমি বুঝলুম, খামোখা কথা বলে লাভ নেই। জানলা বন্ধ করতে যাচ্ছি অমনি একটা মিষ্টি চেহারার ছেলে এগিয়ে এসে বলল—বউদি, আমাদের একটু চা খাওয়াবেন? আমরা ছ'জন আছি।

নীলু চমকে উঠে বলে—খাওয়ালে না কি?

বল্লরী মাথা হেলিয়ে বলল—খাওয়াব না কেন?

—সে কী?

শোভন মাথা নেড়ে বলল—আর বলিস না, ভীষণ ডেয়ারিং এই মহিলাটি। একদিন বিপদে পড়বে।

—আহা, ভয়ের কী! এইটুকু-টুকু সব ছেলে, আমার ভাই বাবলুর বয়সি। মিষ্টি কথাবার্তা। তাছাড়া এই শরতের হিমে সারা রাত জেগে বাইরে থাকছে—ওদের জন্য না হয় একটু কষ্ট করলাম!

শোভন হাসে, হাত তুলে বল্লরীকে থামিয়ে বলে—তার মানে তুমিও ওদের দলে।

—আহা, আমি কী জানি ওরা কোন দলের? আজকাল হাজারও দল দেওয়ালে লেখে। আমি কী করে বুঝব!

—তুমি ঠিকই বুঝবে। তোমার ভাই বাবলু কোন দলে তা কি আমি জানি না! সেদিন খবরের কাগজে বাবলুর কলেজের ইলেকশনের রেজাল্ট তোমাকে দেখালুম না? তুমি ভাইয়ের দলের সিমপ্যাথাইজার।

অসহায়ভাবে বল্লরী নীলুর দিকে তাকায়, কাঁদো-কাঁদো মুখ করে বলে—না, বিশ্বাস করুন। আমি দেখিওনি ওরা কী লিখেছে।

নীলু হাসে—কিন্তু চা তো খাইয়েছ!

—হ্যাঁ। সে তো পাঁচ মিনিটের ব্যাপার। গ্যাস জ্বেলে ছ'পেয়ালা চা করতে কতক্ষণ লাগে। ওরা কী খুশি হল। বলল—বউদি দরকার পড়লে আমাদের ডাকবেন। যাওয়ার সময়ে পেয়ালাগুলো জল দিয়ে ধুয়ে দিয়ে গেল। ওরা ভালো না?

নীলু শান্তভাবে একটু মুচকি হাসে—কিন্তু তোমার নালিশ ছিল বলেছিলে যে! এ তো নালিশ নয়। প্রশংসা।

—না নালিশই। কারণ, আজ সকালে হঠাৎ গোটা দুই বড়-বড় ছেলে এসে হাজির। বলল—আপনাদের দেওয়ালে ওসব লেখা কেন? আপনারা কেন এসব আলাউ করেন? আপনার বন্ধু ঘটনাটা বুঝিয়ে বলতে ওরা থমথম করে চলে গেল। আপনি ওই ছ'জনকে যদি চিনতে পারেন তবে বলবেন—ওরা যেন আর আমাদের দেওয়ালে না লেখে। লিখলে আমরা বড় বিপদে পড়ে যাই। দু-দলের মাঝখানে থাকতে ভয় করে আমাদের। বলবেন যদি চিনতে পারেন।

শোভন মাথা নেড়ে বলে—তার চেয়ে নীলু, তুই আমার জন্য আর একটা বাসা দেখ। এই দেওয়ালের লেখা নিয়ে ব্যাপার কদ্দুর গড়ায় কে জানে। এরপর বোমা কিংবা পেটো ছুড়ে দিয়ে যাবে জানলা দিয়ে, রাস্তায় পেলে আলু টপকাবে। তার ওপর বল্লরী ওদের চা খাইয়েছে—যদি সে ঘটনার সাক্ষীসাবুদ কেউ থেকে থাকে তবে এখানে থাকাটা বেশ রিস্কি এখন।

বল্লরী নীলুর দিকে চেয়ে বলল—বুঝলেন তো! আমাদের কোনও দলের ওপর রাগ নেই। রাতজাগা ছ'টা ছেলেকে চা খাইয়েছি—সে তো আর দল বুঝে নয়! অন্য দলের হলেও খাওয়াতুম।

বেরিয়ে আসার সময়ে দেওয়ালের লেখাটা নীলু একপলক দেখল। তেমন কিছু দেখার নেই। সারা কলকাতার দেওয়াল জুড়ে ছড়িয়ে আছে বিপ্লবের ডাক। নিঃশব্দে।

কয়েকদিন আগে এক সকালবেলায় হরলালের জ্যাঠামশাইকে নীলু দেখেছিল প্রাতঃভ্রমণ সেরে ফেরার পথে লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে আছেন দেওয়ালের সামনে। পড়লেন লেখা। নীলুকে দেখে ডাক দিলেন তিনি। বললেন—এইসব লেখা দেখেছ নীলু। কীরকম স্বার্থপরতার কথা। আমাদের ছেলেবেলায় মানুষকে স্বার্থত্যাগের কথাই শেখানো হত। এখন এরা শেখাচ্ছে স্বার্থসচেতন হতে, হিংস্র হতে—দেখেছ কীরকম উলটো শিক্ষা!

নীলু শুনে হেসেছিল।

উনি গম্ভীর হয়ে বললেন—হেসো না। রামকৃষ্ণদেব যে কামিনীকাঞ্চন সম্বন্ধে সাবধান হতে বলেছিলেন তার মানে বোঝ?

নীলু মাথা নেড়েছিল। না।

উনি বললেন—আমি এতদিনে সেটা বুঝেছি। রামকৃষ্ণদেব আমাদের দুটো অশুভ শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হতে বলেছিলেন। একটা হচ্ছে ফ্রয়েডের প্রতীক কামিনী, অপরটা মার্ক্সের কাঞ্চন। ও দুই তত্ত্ব পৃথিবীকে ব্যাভিচার আর স্বার্থপরতার দিকে নিয়ে যাচ্ছে। তোমার কী মনে হয়?

নীলু ভীষণ হেসে ফেলেছিল।

হরলালের জ্যাঠামশাই রেগে গিয়ে দেওয়ালে লাঠি ঠুকে বললেন—তবে এর মানে কী? অ্যাঁ! পড়ে দেখ, এ সব ভীষণ স্বার্থপরতার কথা কি না।

তারপর থেকে যতবার সেই কথা মনে পড়েছে ততবার হেসেছে নীলু। একা-একা।

বেলা বেড়ে গেছে। বাসায় খবর দেওয়া নেই যে শোভনরা খাবে। খবরটা দেওয়া দরকার। ফুলবাগানের মোড় থেকে নীলু একটা শর্টকার্ট ধরল। বড় রাস্তায় যেখানে গলির মুখ এসে মিশেছে সেখানেই দেওয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সাধন—নীলুর চতুর্থ ভাই। কলেজের শেষ ইয়ারে পড়ে। নীলুকে দেখে সিগারেট লুকোল। পথচলতি অচেনা মানুষের মতো দুজনে দুজনকে চেয়ে দেখল একটু। চোখ সরিয়ে নিল। তাদের দেখে কেউ বুঝবে না যে তারা এক মায়ের পেটে জন্মেছে, একই ছাদের নীচে একই বিছানায় শোয়! নীলু

শুধু জানে সাধন তার ভাই। সাধনের আর কিছুই জানে না সে। কোন দল করছে সাধন, কোন পথে যাচ্ছে, কেমন তার চরিত্র—কিছুই জানা নেই নীলুর। কেবল মাঝে-মাঝে ভোরবেলা উঠে সে দেখে সাধনের আঙুলে, হাতে কিংবা জামায় আলকাতরার দাগ। তখন মনে পড়ে, গভীর রাতে ঘুমোতে এসেছিল সাধন।

এখন কেন জানে না, সাধনের সঙ্গে একটু কথা বলতে ইচ্ছে করছিল নীলুর। সাধন, তুই কেমন আছিস? তোর জামাপ্যান্ট নিয়েছিস তো তুই? অনার্স ছাড়িসনি তো! এরকম কত জিজ্ঞাসা করার আছে।

একটু এগিয়ে গিয়েছিল নীলু। ফিরে আসবে কি না ভেবে ইতস্তত করছিল। মুখ ফিরিয়ে দেখল সাধন তার দিকেই চেয়ে আছে। একদৃষ্টে। হয়তো জিগ্যেস করতে চায়—দাদা, ভালো আছিস তো? বড্ড রোগা হয়ে গেছিস, তোর ঘাড়ের নলী দেখা যাচ্ছে রে! কুসুমদির সঙ্গে তোর বিয়ে হল না শেষপর্যন্ত, না? ওরা বড়লোক, তাই? তুই আলাদা বাসা করতে রাজি হলি না, তাই? না হোক কুসুমদির সঙ্গে তোর বিয়ে—কিন্তু আমরা—ভাইয়েরা তো জানি তোর মন কত বড়, বাবার পর তুই কেমন আগলে আছিস আমাদের। আহারে দাদা, রোদে ঘুরিস না, বাড়ি যা। আমার জন্য ভাবিস না—আমি রাতচরা—কিন্তু নষ্ট হচ্ছি না রে, ভয় নেই।

কয়েক পলক নির্জন গলিপথে তারা দুজনে দুজনের দিকে চেয়ে এরকম নিঃশব্দে কথা বলল। তারপর সামান্য লজ্জা পেয়ে নীলু বাড়ির দিকে হেঁটে যেতে লাগল।

দুপুরে বাড়িতে কাণ্ড হয়ে গেল খুব। নাড়ুমামি কলকল করে কথা বলে, সেই সঙ্গে মা আর ছোট বোনটা। শোভনের দুই মেয়ে কাণ্ড করল আরও। বাইরের ঘরে শোভন আর নীলু শুয়েছিল—ঘুমোতে পারল না। সাধন ছাড়া ভাইয়েরা যে যার আগে খেয়ে বন্ধু-বান্ধবদের বাড়িতে কি আস্তানায় কেটে পড়েছিল, তবু যজ্ঞিবাড়ির ভিড়ের মতো হয়ে রইল রবিবারের দুপুর।

সবার শেষে খেতে এল সাধন। মিষ্টি মুখের ডৌলটুকু আর গায়ের ফরসা রং রোদে পুড়ে তেতে কেমন টেনে গেছে। মেঝেতে ছক পেতে বাইরের ঘরেই লুডো খেলছিল বল্লরী, মামি, আর নীলুর দুই বোন। সাধন ঘরে ঢুকতেই নীলু বল্লরীর মুখখানা লক্ষ করল।

যা ভেবেছিল তা হল না। বল্লরী চিনতেও পারল না সাধনকে। মুখ তুলে দেখল একটু, তারপর চালুনির ভিতর ছক্কাটাকে খটাখট পেড়ে দান ফেলল। সাধনও চিনল না।

একটু হতাশ হল নীলু। হয়তো রাতের সেই ছেলেটা সত্যিই সাধন ছিল না, নয়তো এখনকার মানুষ পরস্পরের মুখ বড় তাড়াতাড়ি ভুলে যায়।

নীলু গলা উঁচু করে বলল—তোমার মেয়ে দুটো বড় কাণ্ড করছে বল্লরী, ওদের নিয়ে যাও।

—আঃ, একটু রাখুন না বাবা, আমি প্রায় ঘরে পৌঁছে গেছি।

রাত্রির শোতে শোভন আর বল্লরী জোর করে টেনে নিয়ে গেল নীলুকে। অনেক দামি টিকিটে বাজে একটা বাংলা ছবি দেখল তারা। তারপর ট্যাক্সিতে ফিরল।

জ্যোৎস্না ফুটেছে খুব। ফুলবাগানের মোড়ে ট্যাক্সি ছেড়ে জ্যোৎস্নায় ধীরে-ধীরে হেঁটে বাড়ি ফিরছিল নীলু। রাস্তা ফাঁকা। দুধের মতো জ্যোৎস্নায় ধুয়ে যাচ্ছে চরাচর। দেওয়ালে-দেওয়ালে বিপ্লবের ডাক। নিরপেক্ষ মানুষেরা তারই আড়ালে শুয়ে আছে। দূরে-দূরে কোথাও পেটো ফাটবার আওয়াজ ওঠে। মাঝেমধ্যে গলির মুখে-মুখে যুদ্ধের বূ্যহ তৈরি করে লড়াই শুরু হয়। সাধন আছে ওই দলে। কে জানে একদিন হয়তো তার নামে একটা শহিদ স্তম্ভ উইটিবির মতো গজিয়ে উঠবে গলির মুখে।

পাড়া আজ নিস্তব্ধ। তার মানে নীলুর ছোটলোক বন্ধুরা কেউ আজ মেজাজে নেই। হয়তো ব্রিটিশ আজ মাল খায়নি, জগু আর জাপান গেছে ঘুমোতে। ভাবতে ভালোই লাগে।

শোভন আর বল্লরীর ভালোবাসার বিয়ে। বড় সংসার ছেড়ে এসে সুখে আছে ওরা। কুসুমের বাবা শেষপর্যন্ত মত করলেন না। এই বিশাল পরিবারে তাঁর আদরের মেয়ে এসে অথই জলে পড়বে। বাসা ছেড়ে যেতে পারল না নীলু। যেতে কষ্ট হয়েছিল। কষ্ট হয়েছিল কুসুমের জন্যও। কোনটা ভালো হত তা সে বুঝলই না। একা হলে ঘুরে ফিরে কুসুমের কথা বড় মনে পড়ে।

বাবা ফিরবে পরশু। আরও দু-দিন তার কিছু চাক্কি ঝাঁক যাবে। হাসি মুখেই মেনে নেবে নীলু। নয়তো রাগই করবে। কিন্তু ঝাঁক হবেই। বাবা ফিরে নীলুর দিকে আড়ে-আড়ে অপরাধীর মতো তাকাবে, হাসবে মিটিমিটি। খেলটুকু ভালোই লাগবে নীলুর। সে এই সংসারের জন্য প্রেমিকাকে ত্যাগ করেছে—কুসুমকে—এই চিন্তায় সে কি মাঝে-মাঝে নিজেকে মহৎ ভাববে?

একা থাকলে অনেক চিন্তার টুকরো ঝড়ে-ওড়া কুটোকাটার মতো মাথার ভিতরে চক্কর খায়।

বাড়ির ছায়া থেকে পোগো হঠাৎ নিঃশব্দে পিছু নেয়। মনে-মনে হাসে নীলু। তারপর ফিরে বলে—পোগো, কী চাস?

পোগো দূর থেকে বলে—ঠালা, টোকে মার্ডার করব।

ক্লান্ত গলায় নীলু বলে—আয়, করে যা মার্ডার।

পোগো চুপ থাকে একটু, সতর্ক গলায় বলে—মারবি না বল!

বড় কষ্ট হয় নীলুর। ধীরে-ধীরে পোগোর দিকে এগিয়ে গিয়ে বলে—মারব না। আয়, একটা সিগারেট খা।

পোগো খুশি হয়ে এগিয়ে আসে।

নিশুত রাতে এক ঘুমন্ত বাড়ির সিঁড়িতে বসে নীলু, পাশে পাগলা পোগো। সিগারেট ধরিয়ে নেয় দুজনে। তারপর—যা নীলু কখনও কাউকে বলতে পারে না—সেই হৃদয়ের দুঃখের গল্প—কুসুমের গল্প—অনর্গল বলে যায় পোগোর কাছে।

পোগো নিবিষ্ট মনে বুঝবার চেষ্টা করে।

আমরা

সেবার গ্রীষ্মকালের শেষদিকে দিন চারেক ইনফ্লুয়েঞ্জাতে ভুগে উঠলেন আমার স্বামী। এমনিতেই তিনি একটু রোগা ধরনের মানুষ, ইনফ্লুয়েঞ্জার পর তাঁর চেহারাটা আরও খারাপ হয়ে গেল। দেখতাম তাঁর হনুর হাড় দুটো গালের চামড়া ফুঁড়ে বেরিয়ে আছে, গাল বসা, চোখের নীচে কালি, আর তিনি মাঝে-মাঝে শুকনো মুখে ঢোক গিলছেন—কণ্ঠাস্থিটা ঘনঘন ওঠা-নামা করছে। তাঁকে খুব অন্যমনস্ক, কাহিল আর কেমন যেন লক্ষ্মীছাড়া দেখাত। আমি তাঁকে খুব যত্ন করতাম। বীট-গাজর সেদ্ধ, টেংরির জুস, দু-বেলা একটু-একটু মাখন, আর রোজ সম্ভব নয় বলে মাঝেমধ্যে এক-আধটা ডিমের হাফবয়েল তাঁকে খাওয়াতাম। কিন্তু ইনফ্লুয়েঞ্জার এক মাস পরেও তাঁর চেহারা ভালো হল না, বরং আরও দুর্বল হয়ে গেল। সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় উঠে তিনি ভয়ঙ্কর হাঁফাতেন, রাত্রিবেলা তাঁর ভালো ঘুম হত না, অথচ দেখতাম সকালবেলা চেয়ারে বসে চায়ের জন্য অপেক্ষা করতে-করতে তিনি ঢুলছেন, কষ বেয়ে নাল গড়িয়ে পড়ছে। ডাকলে চমকে উঠে সহজ হওয়ার চেষ্টা করতেন বটে, কিন্তু স্পষ্টই বোঝা যেত যে তিনি স্বাভাবিক নেই। বরং অন্যমনস্ক এবং দুর্বল দেখাচ্ছে তাঁকে।

ভয় পেয়ে গিয়ে আমি জিগ্যেস করলাম—তোমার কী হয়েছে বলো তো!

তিনি বিব্রতমুখে বললেন,—অনু, আমার মনে হচ্ছে ইনফ্লুয়েঞ্জা আমার এখনও সারেনি। ভিতরে-ভিতরে আমার যেন জ্বর হয়, হাড়গুলো কটকট করে, জিভ তেতো-তেতো লাগে। তুমি আমার গা-টা ভালো করে দ্যাখো তো!

গায়ে হাত দিয়ে দেখি গা স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি ঠান্ডা। সে কথা বলতেই তিনি হতাশভাবে হাত উলটে বললেন—কী যে হয়েছে ঠিক বুঝতে পারছি না। আমার

বোধহয় একটু একসারসাইজ করা দরকার। সকাল বিকেল একটু হাঁটলে শরীরটা ঠিক হয়ে যাবে।

পরদিন থেকে খুব ভোরে উঠে, আর বিকেলে অফিস থেকে ফিরে তিনি বেড়াতে বেরোতেন। আমি আমাদের সাত বছর বয়সের ছেলে বাপিকে তাঁর সঙ্গে দিতাম। বাপি অবশ্য বিকেলবেলা খেলা ফেলে যেতে চাইত না, যেত সকালবেলা। সে প্রায়ই এসে আমাকে বলত—বাবা একটুও বেড়ায় না মা, পার্ক পর্যন্ত গিয়েই দাঁড়িয়ে পড়ে, আর রেলিঙে ঠেস দিয়ে ঢুলতে থাকে। আমি বলি, চলো বাবা, লেক পর্যন্ত যাই, বাচ খেলা দেখে আসি, আমাদের স্কুলের ছেলেরাও ওখানে ফুটবল প্র্যাকটিস করে, কিন্তু বাবা রেললাইন পারই হয় না। কেবল ঢুলঢুল চোখ করে বলে, তুই যা, আমি এখানে দাঁড়াই, ফেরার সময়ে আমাকে খুঁজে নিস।

আমাদের স্নানঘরটা ভাগের। বাড়িওয়ালা আর অন্য এক ভাড়াটের সঙ্গে। একদিন সকালবেলা অফিসের সময়ে অন্য ভাড়াটে শিববাবুর গিন্নি এসে চুপিচুপি বললেন—ও দিদি আপনার কর্তাটি যে বাথরুমে ঢুকে বসে আছেন, তারপর আর কোনও সাড়া শব্দ নেই। আমার কর্তাটি তেল মেখে কখন থেকে ঘোরাফেরা করছেন, এইমাত্র বললেন—দেখি তো, অজিতবাবু তো কখনও এত দেরি করে না—

শুনে ভীষণ চমকে উঠলাম। তাড়াতাড়ি গিয়ে আমি বাথরুমের দরজায় কান পাতলাম। কিন্তু বাথরুমটা একদম নিশ্চুপ। বন্ধ দরজার ওপাশে যে কেউ আছে তা মনেই হয় না। দরজায় ধাক্কা দিয়ে ডাকলাম—ওগো, কী হল—

তিনি বললেন—কেন?

—এত দেরি করছ কেন?

তিনি খুব আস্তে, যেন আপনমনে বললেন—ঠিক বুঝতে পারছি না—তারপর হুড়মুড় করে জল ঢেলে কাক-স্নান সেরে তিনি বেরিয়ে এলেন।

পরে যখন জিগ্যেস করলাম, বাথরুমে কী করছিলে তুমি? তখন উনি বিরসমুখে বললেন, গা-টা এমন শিরশির করছিল যে জল ঢালতে ইচ্ছে করছিল না। তাই চৌবাচ্চার ধারে উঠে বসে ছিলাম।

—বসেছিলে কেন?

—ঠিক বসে ছিলাম না। জলে হাত ডুবিয়ে রেখে দেখছিলাম ঠান্ডাটা সয়ে যায় কি না।

বলে তিনি কিছুক্ষণ নীরবে ভাত নিয়ে নাড়াচাড়া করে এক সময়ে বললেন—আসলে আমার সময়ের জ্ঞান ছিল না। বাথরুমের ভিতরটা কেমন ঠান্ডা-ঠান্ডা, জলে অন্ধকার, আর চৌবাচ্চা ভরতি জল ছলছল করে উপচে বয়ে যাচ্ছে খিলখিল করে—কেমন যেন লাগে!

ভয় পেয়ে গিয়ে আমি জিগ্যেস করলাম—কেমন?

উনি ম্লান একটু হাসলেন, বললেন—ঠিক বোঝানো যায় না। ঠিক যেন গাছের ঘন ছায়ায় বসে আছি, আর সামনে দিয়ে নদী বয়ে যাচ্ছে—

সেদিন বিকেলে অফিস থেকে ফিরে এসে তিনি বললেন—বুঝলে, ঠিক করলাম এবার বেশ লম্বা অনেকদিনের একটা ছুটি নেব।

—নিয়ে?

—কোথাও বেড়াতে যাব। অনেকদিন কোথাও যাই না। অনু, আমার মনে হচ্ছে একটা চেঞ্জের দরকার। শরীরের জন্য না, কিন্তু আমার মনটাই কেমন যেন ভেঙে যাচ্ছে। অফিসে আমি একদম কাজকর্ম করতে পারছি না। আজ বেলা তিনটে নাগাদ আমার কলিগ সিগারেট চাইতে এসে দেখে যে আমি চোখ চেয়ে বসে আছি, কিন্তু সাড়া দিচ্ছি না। সে ভাবল, আমার স্ট্রোক-ফোক কিছু একটা হয়েছে, তাই ভয় পেয়ে চেঁচামেচি করে সবাইকে ডেকে আনল। কী কেলেঙ্কারি! অথচ তখন আমি জেগেই আছি।

—জেগেছিলে! তবে সাড়া দাওনি কেন?

—কী জানো! আজকাল ভীষণ অলস বোধ করি। কারও ডাকে সাড়া দিতে অনেকক্ষণ সময় লাগে। এমনকী মাঝে-মাঝে অজিত ঘোষ নামটা যে আমার তা বুঝতে অনেকক্ষণ সময় লাগে। কেউ কিছু বললে চেয়ে থাকি কিন্তু বুঝতে পারি না। ফাইলপত্র নাড়তে ইচ্ছে করে না, একটা কাগজ টেবিলের এধার থেকে ওধারে সরাতে, পিনকুশনটা কাছে টেনে আনতে গেলে মনে হয় পাহাড় ঠেলার মতো পরিশ্রম করছি। সিগারেটের ছাই কত সময়ে জামায় কাপড়ে উড়ে পড়ে—আগুন ধরার ভয়েও সেটাকে ঝেড়ে ফেলি না—

শুনে, আমার বুকের ভিতরটা হঠাৎ ধক করে উঠল। বললাম—তুমি ডাক্তার দেখাও। চলো, আজকেই আমরা মহিম ডাক্তারের কাছে যাই।

—দূর! উনি হাসলেন, বললেন—আমার সত্যিই তেমন কোনও অসুখ নেই। অনেকদিন ধরে একই জায়গায় থাকলে, একই পরিবেশে ঘোরাফেরা করলে মাথাটা একটু জমাট বেঁধে যায়। ভেবে দ্যাখো, আমরা প্রায় চার-পাঁচ বছর কোথাও যাইনি। গতবার কেবল বিজুর পৈতেয় ব্যান্ডেল। আর কোথাও না। চলো, কাছাকাছি কোনও সুন্দর জায়গা থেকে

মাসখানেক একটু ঘুরে আসি। তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। এমন জায়গায় যাব সেখানে একটা নদী আছে, আর অনেক গাছগাছালি—

আমার স্বামী চাকরি করেন অ্যাকাউন্ট্যান্ট অফিসে। কেরানি। আর কিছুদিন বাদেই তিনি সাবর্ডিনেট অ্যাকাউন্টস সার্ভিসের পরীক্ষা দেবেন বলে ঠিক করেছেন। অঙ্কে তাঁর মাথা খুব পরিষ্কার, বন্ধুরা বলে—অজিত এক চান্সে বেরিয়ে যাবে। আমারও তাই বিশ্বাস। কিছুদিন আগেও তাঁকে পড়াশুনো নিয়ে খুব ব্যস্ত দেখতাম। দেখে খুব ভালো লাগত আমার। মনে হত, ওঁর যেমন মনের জোর তাতে শক্ত পরীক্ষাটা পেরিয়ে যাবেনই। তখন সংসারের একটু ভালো ব্যবস্থা হবে। সেই পরীক্ষাটার ওপর আমাদের সংসারের অনেক পরিকল্পনা নির্ভর করে আছে। তাই চেঞ্জের কথা শুনে আমি একটু ইতস্তত করে বললাম—এখন এক-দেড় মাস ছুটি নিলে তোমার পড়াশুনোর ক্ষতি হবে না?

উনি খুব অবাক হয়ে বললেন—কীসের পড়াশুনো?

—ওই যে এস-এ-এস না কী যেন!

শুনে ওঁর মুখ খুব গম্ভীর হয়ে গেল! ভীষণ হতাশ হলেন উনি। বললেন—তুমি আমার কথা ভাব, না কি আমার চাকরি-বাকরি, উন্নতি এইসবের কথা? অনু, তোমার কাছ থেকে আমি আর-একটু সিমপ্যাথি আশা করি। তুমি বুঝতে পারছ না আমি কী একটা অদ্ভুত অবস্থার মধ্যে আছি!

আমি লজ্জা পেলাম, তবু মুখে বললাম—বাঃ, তোমাকে নিয়ে ভাবি বলেই তো তোমার চাকরি, পরীক্ষা, উন্নতি সব নিয়েই আমাকে ভাবতে হয়। তুমি আর তোমার সংসার এ ছাড়া আমার আর কি ভাবনা আছে বলো?

উনি ছেলেমানুষের মতো রেগে চোখ-মুখ লাল করে বললেন—আমি আর আমার সংসার কি এক?

অবাক হয়ে বললাম—এক নও?

উনি ঘনঘন মাথা নেড়ে বললেন—না। মোটেই না। সেটা বোঝো না বলেই তুমি সব সময়ে আমাকে সংসারের সঙ্গে জড়িয়ে দ্যাখো, আলাদা মানুষটাকে দ্যাখো না।

হেসে বললাম—তাই বুঝি!

উনি মুখ ফিরিয়ে বললেন—তাই। আমি যে কেরানি তা তোমার পছন্দ না, আমি অফিসার হলে তবে তোমার শান্তি। এই আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি, আমি চিরকাল, এইরকম কেরানিই থাকব, তাতে তুমি সুখ পাও আর না পাও।

—থাকো না, আমি তো কেরানিকেই ভালোবেসেছি, তাই বাসব।

কিন্তু উনি এ কথাতেও খুশি হলেন না। রাগ করে জানালার থাকের ওপর বসে বাইরের মরা বিকেলের দিকে চেয়ে রইলেন। বেড়াতে গেলেন না। দেখলাম, জ্বর আসার আগের মতো ওঁর চোখ ছলছল করছে, মাঝে-মাঝে কাঁপছে ঠোঁট, হাঁটু মুড়ে বুকের কাছে তুলে এমনভাবে বসে আছেন যে রোগা দুর্বল শরীরটা দেখে হঠাৎ মনে হয় বাচ্চা একটা রোগে-ভোগা ছেলেকে কেউ কোলে করে জানালার কাছে বসিয়ে দিয়েছে।

আচ্ছা পাগল। আমাদের ছেলের বয়স সাত, মেয়ের বয়স চার। আজকালকার ছেলেমেয়ে অল্প বয়সেই সেয়ানা। তার ওপর বাসায় রয়েছে ঠিকে ঝি, ভাড়াটে আর বাড়িওয়ালার ছেলেমেয়ে —এতজনের চোখের সামনে ভরসন্ধেয় কী করে আমি ওঁর রাগ ভাঙাই। তবু পায়ের কাছটিতে মেঝেতে বসে আস্তে-আস্তে বললাম—লক্ষ্মী সোনা, রাগ করে না। ঠিক আছে, চলো কিছুদিন ঘুরে আসি। পরীক্ষা না হয় এবছর না দিলে, ও তো ফি-বছর হয়—

উনি সামান্য একটু বাঁকা হাসি হেসে বললেন—তবু দ্যাখো, পরীক্ষার কথাটা ভুলতে পারছ না। এ বছর নয় তো সামনের বার। কিন্তু আমি তো বলেই দিয়েছি কোনওদিন আমি পরীক্ষা দেব না—

—দিয়ো না। কে বলেছে দিতে। আমাদের অভাব কীসের! বেশ চলে যাবে। এবার ওঠো তো—

আমার স্বামীর অভিমান একটু বেশিক্ষণ থাকে। ছেলেবেলা থেকেই উনি কোথাও তেমন আদরযত্ন পাননি। অনেকদিন আগেই মা-বাবা মারা গিয়েছিল। তারপর থেকেই মামাবাড়িতে একটু অনাদরেই বড় হয়েছেন। বি. এস. সি. পরীক্ষা দিয়েই ওঁকে সে-বাড়ি ছেড়ে মির্জাপুরের একটা মেসে আশ্রয় নিতে হয়। সেই মেসে দশ বছর থেকে চাকরি করে উনি খুব নৈরাশ্যবোধ করতে থাকেন। তখন ওঁর বয়স তিরিশ। ওঁর রুম মেট ছিলেন আমার বুড়োকাকা। তিনিই মতলব করে ওঁকে একদিন আমাদের বাড়িতে বেড়াতে নিয়ে এলেন। তারপর মেসে ফিরে গিয়ে জিগ্যেস করলেন—আমার ভাইঝিকে কেমন দেখলে? উনি খুব লজ্জা-টজ্জা পেয়ে অবশেষে বললেন—চোখ দুটি বেশ তো! তারপরই আমাদের বিয়ে হয়ে গেল। আমরা উঠলাম এসে লেক গার্ডেন্সের পাশে গরিবদের পাড়া গোবিন্দপুরে। যখন এই একা বাসায় আমরা দুজন, তখন উনি আমাকে সারাক্ষণ ব্যস্ত রাখতেন দুরন্ত অভিমানে—এই যে আমি অফিসে চলে যাই, তারপর কি তুমি আর আমার কথা ভাবো! কী করে ভাববে, আমি ত্রিশ বছরের বুড়ো, আর তুমি কুড়ির খুকি। তুমি আজ

জানালায় দাঁড়াওনি...কাল রাতে আমি যে জেগেছিলাম কেউ কি টের পেয়েছিল! কী ঘুম বাব্বা!

ওঁর অভিমান দুরন্ত হলেও সেটা ভাঙা শক্ত না। একটু আদরেই সেটা ভাঙানো যায়। কিন্তু এবারকার অভিমান বা রাগ সেই অনাদরে বড় হওয়া মানুষটার ছেলেমানুষি নেই-আঁকড়ে ব্যাপার তো নয়! এই ব্যাপারটা যেন একটু জটিল। হয়তো উনি একেবারে অমূলক কথা বলছেন না। আমি সংসারের ভালোমন্দর সঙ্গে জড়িয়েই ওঁকে দেখি। এর বাইরে যে একা মানুষটা, যার সঙ্গে অহরহ বাইরের জগতের একটা অদৃশ্য বনিবনার অভাব চলছে তার কথা তো আমি জানি না। নইলে উনি কেন লোকের ডাকে সাড়া দেন না, কেন চৌবাচ্চার জলে হাত ডুবিয়ে অনেকক্ষণ বসে থাকেন, তা আমি বুঝতে পারতাম।

রাত্রিবেলা আমাদের ছেলেমেয়ে ঘুমিয়ে পড়লে উনি হঠাৎ চুপিচুপি আমার কাছে সরে এলেন। মুখ এবং মাথা ডুবিয়ে দিলেন আমার বুকের মধ্যে। বুঝতে পারলাম তাঁর এই ভঙ্গির মধ্যে কোনও কাম ইচ্ছা নেই। এ যেমন বাপি আমার বুকে মাথা গোঁজে অনেকটা সেরকম। আমি কথা না বলে ওঁকে দু-হাতে আগলে নিয়ে ওঁর রুক্ষ মাথা, আর অনেকদিনের আ-ছাঁটা চুলের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে গভীর আনন্দের একটা শ্বাস টেনে নিলাম। বুক ভরে গেল। উনি আস্তে-আস্তে বললেন—তোমাকে মাঝে-মাঝে আমার মায়ের মতো ভাবতে ইচ্ছে হয়। এরকম ভাবটা কি পাপ?

কী জানি! আমি এর কী উত্তর দেব? আমি বিশ্ব সংসারের রীতি-নীতি জানি না। কার সঙ্গে কীরকম সম্পর্কটা পাপ, কোনটা অন্যায় তা কী করে বুঝব! যখন ফুলশয্যার রাতে প্রথম উনি আমাকে জড়িয়ে ধরেছিলেন, সেদিনও আমার শরীর কেঁপে উঠেছিল বটে। কিন্তু সেটা রোমাঞ্চে নয়—শিহরণেও নয়, বরং মনে হয়েছিল—বাঁচলাম! এবার নিশ্চিন্ত। এই অচেনা, রোগা কালো কিন্তু মিষ্টি চেহারার দুর্বল মানুষটির সেই প্রথম স্পর্শেই আমার ভিতরে সেই ছেলেবেলার পুতুলখেলার এক মা জেগে উঠেছিল। ছেলেমেয়েরা যেমন প্রেম করে, লুকোচুরি করে, সহজে ধরা দেয় না, আবার একে অন্যকে ছেড়ে যায়—আমাদের কখনও সেরকম প্রেম হয়নি।

উনি বুকে মুখ চেপে অবরুদ্ধ গলায় বললেন—তোমাকে একটা কথা বলব কাউকে বোলো না। চলো জানলার ধরে গিয়ে বসি।

উঠলাম। ছোট্ট জানলার চৌখুপিতে তাকের ওপর মুখোমুখি বসলাম দুজন। বললাম—বলো।

উনি সিগারেট ধরালেন, বললেন—তোমার মনে আছে, বছর দুই আগে একবার কাঠের আলমারিটা কেনার সময় সত্যচরণের কাছে গোটা পঞ্চাশেক টাকা ধার করেছিলাম?

—ওমা, মনে নেই! আমি তো কতবার তোমাকে টাকাটা শোধ দেওয়ার কথা বলেছি!

আমার স্বামী একটা শ্বাস ফেলে বললেন—হ্যাঁ, সেই ধারটার কথা নয়, সত্যচরণের কথাই বলছি তোমাকে। সেদিন মাইনে পেয়ে মনে করলাম এ-মাসে প্রিমিয়াম ডিউ-ফিউ নেই, তা ছাড়া রেডিয়োর শেষ ইনস্টলমেন্টটাও গতমাসে দেওয়া হয়ে গেছে, এ-মাসে যাই সত্যচরণের টাকাটা দিয়ে আসি। সত্যচরণ ভদ্রলোক, তা ছাড়া আমার বন্ধুদের মধ্যে একমাত্র ওরই কিছু পৈতৃক সম্পত্তি আছে—বড়লোক বলা যায় ওকে—সেই কারণেই বোধহয় ও কখনও টাকাটার কথা বলেনি আমাকে। কিন্তু এবার দিয়ে দিই। তা ছাড়া ওর সঙ্গে অনেককাল দেখাও নেই, খোঁজখবর নিয়ে আসি। ভেবে-টেবে বিকেলে বেরিয়ে ছ'টা নাগাদ ওর নবীন পাল লেনের বাড়িতে পৌঁছোলাম। ওর বাড়ির সামনেই একটা মস্ত গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল যার কাচের ওপর লাল ক্রশ আর ইংরিজিতে লেখা—ডক্টর। কিছু না ভেবে ওপরে উঠে যাচ্ছি, সিঁড়ি বেয়ে হাতে স্টেথসকোপ ভাঁজ করে নিয়ে একজন মোটাসোটা ডাক্তার মুখোমুখি নেমে এলেন। সিঁড়ির ওপরে দরজার মুখেই সত্যর বউ নীরা শুকনো মুখে দাঁড়িয়ে ছিল। ফরসা, সুন্দর মেয়েটা, কিন্তু তখন রুখু চুল, ময়লা শাড়ি, সিঁদুর ছাড়া কপাল আর কেমন একটা রাতজাগা ক্লান্তির ভারে বিচ্ছিরি দেখাচ্ছিল ওকে। কী হয়েছে জিগ্যেস করতেই ফুঁপিয়ে উঠল—ও মারা যাচ্ছে, অজিতবাবু। শুনে বুকের ভিতরে যেন একটা কপাট হাওয়া লেগে দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল। ঘরে ঢুকে দেখি সত্যচরণ পূর্বদিকে মাথা করে শুয়ে আছে, পশ্চিমের খোলা জানালা দিয়ে সিঁদুরের মতো লাল টকটকে রোদ এসে পড়েছে ওর সাদা বিছানায়। ওর মাথার কাছে ছোট টেবিলে কাটা ফল, ওষুধের শিশি-টিশি রয়েছে, মেঝেয় খাটের নীচে বেডপ্যান-ট্যান। কিন্তু এগুলো তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু না। ঘরের মধ্যে ওর আত্মীয়স্বজনও রয়েছেন কয়েকজন। দুজন বিধবা মাথার দু-ধারে ঘোমটা টেনে বসে, একজন বয়স্কা মহিলা পায়ের দিকটায়। একজন বুড়ো মতো লোক খুব বিমর্ষ মুখে সিগারেট পাকাচ্ছেন জানালার কাছে দাঁড়িয়ে, দুজন অল্পবয়সি ছেলে নীচু স্বরে কথা বলছে। দু-একটা বাচ্চাও রয়েছে ঘরের মধ্যে। তারা কিছু টের পাচ্ছিল কি না জানি না, কিন্তু সেই ঘরে পা দিয়েই আমি এমন একটা গন্ধ পেলাম—যাকে—কী বলব—যাকে বলা যায় মৃত্যুর গন্ধ। তোমাকে ঠিক বোঝাতে পারব না কিন্তু আমার মনে হয় মৃত্যুর একটা গন্ধ আছেই। কেউ যদি কিছু নাও বলত, তবু আমি চোখ বুজেও ওই ঘরে ঢুকে বলে দিতে পারতাম যে ওই ঘরে কেউ একজন মারা যাচ্ছে। যাকগে, আমি ওই গন্ধটা পেয়েই বুঝতে পারলাম নীরা ঠিকই বলেছে, সত্য মারা যাচ্ছে। হয়তো এখুনি মরবে না, আরও একটু সময় নেবে। কিন্তু আজকালের মধ্যেই হয়ে যাবে

ব্যাপারটা। আমি ঘরে ঢুকতেই মাথার কাছ থেকে একজন বিধবা উঠে গেলেন, পায়ের কাছ থেকে সধবাটিও। কে যেন একটা টুল বিছানার পাশেই এগিয়ে দিল আমাকে বসবার জন্য। তখনও সত্যর জ্ঞান আছে। মুখটা খুব ফ্যাকাশে রক্তশূন্য আর মুখের চামড়ায় একটা খড়ি-ওঠা শুষ্ক ভাব। আমার দিকে তাকিয়ে বলল—কে? বললাম—আমি রে, আমি অজিত। বলল—ওঃ অজিত! কবে এলি? বুঝলাম একটু বিকারের মতো অবস্থা হয়ে আসছে। বললাম—এইমাত্র। তুই কেমন আছিস? বলল—এই একরকম, কেটে যাচ্ছে। আমি ঠিক ওখানে আর বসে থাকতে চাইছিলাম না। তুমি তো জানো ওষুধ-টসুধের গন্ধে আমার কীরকম গা গুলোয়! তাই এক সময়ে ওর কাছে নীচু হয়ে বললাম—তোর টাকাটা দিতে এসেছি। ও খুব অবাক হয়ে বলল—কত টাকা! বললাম—পঞ্চাশ। ও ঠোঁট ওলটাল—দূর, ওতে আমার কী হবে! ওর জন্য কষ্ট করে এলি কেন? আমি কি মাত্র পঞ্চাশ টাকা চেয়েছিলাম তোর কাছে? আমি তো তার অনেক বেশি চেয়েছিলাম! আমি খুব অবাক হয়ে বললাম—তুই তো আমার কাছে চাসনি! আমি নিজে থেকেই এনেছি, অনেকদিন আগে ধার নিয়েছিলাম—তোর মনে নেই? ও বেশ চমকে উঠে বলল—না, ধারের কথা নয়। কিন্তু তোর কাছে আমি কী একটা চেয়েছিলাম না? সে তো পঞ্চাশ টাকার অনেক বেশি। জিগ্যেস করলাম—কী চেয়েছিলি? ও খানিকক্ষণ সাদা ছাদের দিকে চেয়ে কী ভাবল, বলল—কী যেন—ঠিক মনে পড়ছে না—ওই যে—সব মানুষই যা চায়—আহা, কী যেন ব্যাপারটা। আচ্ছা দাঁড়া বাথরুম থেকে ঘুরে আসি, মনে পড়বে। বলে ও ওঠার চেষ্টা করল। সেই বিধবাদের একজন এসে পেচ্ছাপ করার পাত্রটা ওর গায়ের ঢাকার নীচে ঢুকিয়ে ঠিক করে দিল। কিছুক্ষণ—পেচ্ছাপ করার সময়টায়, ও বিকৃত মুখে ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা ভোগ করল শুয়ে-শুয়ে। তারপর আবার আস্তে-আস্তে একটু গা ছাড়া হয়ে আমার দিকে চেয়ে বলল—তোর কাছেই চেয়েছিলাম না কি—কার কাছে যে—মনেই পড়ছে না। কিন্তু চেয়েছিলাম—বুঝলি—কোনও ভুল নেই। খুব আবদার করে গলা জড়িয়ে ধরে গালে গাল রেখে চেয়েছিলাম, আবার ভিখিরির মতো হাত বাড়িয়ে ল্যাং-ল্যাং করেও চেয়েছিলাম, আবার চোখ পাকিয়ে ভয় দেখিয়েও চেয়েছিলাম—কিন্তু শালা মাইরি দিল না...। কৌতূহলী হয়ে জিগ্যেস করলাম—কী চেয়েছিলি! ও সঙ্গে-সঙ্গে ঘোলা চোখ ছাদের দিকে ফিরিয়ে বলল—ওই যে—কী ব্যাপারটা যেন—নীরাকে জিগ্যেস কর তো, ওর মনে থাকতে পারে—আচ্ছা দাঁড়া—একশো থেকে উলটোবাগে গুনে দেখি, তাতে হয়তো মনে পড়বে। বলে ও খানিকক্ষণ গুনে হাল ছেড়ে দিয়ে বলল—না, সময় নষ্ট। মনে পড়ছে না। আমি তখন আস্তে-আস্তে বললাম—তুই তো সবই—পেয়েছিস! ও অবাক হয়ে বলল—কী পেয়েছি—অ্যাঁ—কী? আমি মৃদু গলায় বললাম—তোর তো সবই আছে। বাড়ি, গাড়ি, ভালো চাকরি, নীরার মতো ভালো বউ, অমন সুন্দর ফুটফুটে ছেলেটা দার্জিলিঙে কনভেন্টে পড়ছে। ব্যাঙ্কে টাকা, ইন্সিওরেন্স—তোর আবার কী চাই? ও অবশ্য ঠোঁটে একটু হাসল, হলুদ ময়লা দাঁতগুলো একটুও

চিকমিক করল না, ও বলল—এসব তো আমি পেয়েইছি। কিন্তু এর বেশি আর-একটা কী যেন—বুঝলি—কিন্তু সেটার তেমন কোনও অর্থ হয় না। যেমন আমার প্রায়ই ইচ্ছে করে একটা গাছের ছায়ায় বসে দেখি সারাদিন একটা নদী বয়ে যাচ্ছে। অথচ ওই চাওয়াটার কোনও মাথামুণ্ডু হয় না। ঠিক সেইরকম—কী যেন একটা—আমি ভেবেছিলাম তুই সেটাই সঙ্গে করে এনেছিস! কিন্তু না তো, তুই তো মাত্র পঞ্চাশটা টাকা—তাও মাত্র যেটুকু ধার করেছিলি—কিন্তু কী ব্যাপারটা বলত, আমার কিছুতেই মনে পড়ছে না—! অথচ খুব সোজা, জানা জিনিস সবাই চায়!

আমার স্বামীকে অন্ধকারে খুব আবছা দেখাচ্ছিল। আমি প্রাণপণে তাকিয়ে তাঁর মুখের ভাবসাব লক্ষ করার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। উনি একটু বিমনা গলায় বললেন—অনু, সত্যচরণের ওখান থেকে বেরিয়ে সেই রাত্রে প্রথম বর্ষার জলে আমি ভিজেছিলাম—তুমি খুব বকেছিলে—আর পরদিন সকাল থেকেই আমার জ্বর—মনে আছে?

আমি মাথা নাড়লাম।

—সত্যচরণ তার তিনদিন পর মারা গেছে। সেই কথাটা শেষপর্যন্ত বোধহয় তার মনে পড়েনি। কিন্তু আমি যতদিন জ্বরে পড়েছিলাম ততদিন, তারপর জ্বর থেকে উঠে এ পর্যন্ত কেবলই ভাবছি কী সেটা যা সত্যচরণ চেয়েছিল! সবাই চায়, অথচ তবু তার মনে পড়ল না কেন?

বলতে-বলতে আমার স্বামী দু-হাতে আমার মুখ নিয়ে গভীরভাবে আমাকে দেখলেন। তারপর আস্তে-আস্তে বললেন—তবু সত্যচরণ যখন চেয়েছিল তখন আমার ইচ্ছে করছিল সত্যচরণ যা চাইছে সেটা ওকে দিই। যেমন করে হোক সেটা এনে দিই ওকে। কিন্তু তখন তো বুঝবার উপায় ছিল না ও কী চাইছে। কিন্তু এখন এতদিনে মনে হচ্ছে সেটা আমি জানি—

আমি ভীষণ কৌতূহলী হয়ে জিগ্যেস করলাম—কী গো সেটা?

আমার স্বামী শ্বাস ফেলে বললেন—মানুষের মধ্যে সব সময়েই একটা ইচ্ছে বরাবর চাপা থেকে যায়। সেটা হচ্ছে সর্বস্ব দিয়ে দেওয়ার ইচ্ছে। কোথাও কেউ একজন বসে আছেন প্রসন্ন হাসিমুখে, তিনি আমার কিছুই চান না, তবু তাঁকে আমার সর্বস্ব দিয়ে দেওয়ার কথা। টাকা-পয়সা নয়, আমার বোধবুদ্ধি-লজ্জা-অপমান-জীবনমৃত্যু—সবকিছু। বদলে তিনি কিছুই দেবেন না, কিন্তু দিয়ে আমি তৃপ্তি পাব। রোজগার করতে-করতে, সংসার করতে-করতে মানুষ সেই দেওয়ার কথাটা ভুলে যায়। কিন্তু কখনও-কখনও

সত্যচরণের মতো মরবার সময়ে মানুষ দেখে সে দিতে চায়নি, কিন্তু নিয়তি কেড়ে নিচ্ছে, তখন তার মনে পড়ে—এর চেয়ে স্বেচ্ছায় দেওয়া ভালো ছিল।

সুখদুঃখ

লোকটা সারা দিন তার খেতে কাজ করে। একা-একা সে মাটির সঙ্গে কত ভালোবাসার কথা বলে। আল তুলে জল বেঁধে রাখার সময়ে সে ঠিক যেন এক পিপাসার্তকে জলদানের তৃপ্তি পায়। সে ভালোবাসে গাছগুলিকেও। যারা ফল দেয়, ছায়া দেয়, দূরের মেঘকে টেনে আনে। সে প্রতিটি গাছের সুখদুঃখকে বোধ করার চেষ্টা করে। সে ভালোবাসে তার গৃহপালিতগুলিকেও। সে বোঝে, প্রতি-প্রত্যেকের টান ভালোবাসার ওপর সংসার বেঁচে আছে।

পাপপুণ্যময় দিনশেষে সে তার নির্জন নিকোনো দাওয়াটিতে বসে। গুড়গুড় করে তামাক খায়। অন্ধকারে ময়ূরপুচ্ছের মতো নীল আকাশে দেবতার চোখের মতো উজ্জ্বল তারা ফুটে ওঠে। সে সেই হিম, নিথর ঐশ্বর্যের দিকে চেয়ে থাকে। দেখে বিশাল ছায়াপথ, ওই পথ গেছে তার পূর্বপুরুষদের কাছে। কখনও ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় উঠোনে খেলা করে তার তিনটি শিশু ছেলেমেয়ে। সে মুগ্ধ বিস্ময়ে চেয়ে থাকে। সে কখনও সেই নিথর আকাশকে, কখনও বা সেই নিষ্পাপ তিন শিশুকে উদ্দেশ্য করে বিড়বিড় করে বলে—আমি তোমাদের কাছে কোনও লাভ-লোকসান চাই না। তোমরা আমাকে অনাবিল আনন্দ দিও।

সারা রাতই প্রায় সে জেগে থাকে। গোয়ালঘর থেকে গোরুর দাপানোর শব্দ পেলে উঠে গিয়ে মশা কিংবা ডাঁশ তাড়ায়। টেমি হাতে চলে আসে হাঁসের ঘরে। দেখে, তাদের ডিম স্বচ্ছন্দে প্রসব হয়েছে কি না। ঝড়ের রাতে সে উঠে চলে যায় বাগানের গাছগুলির কাছে। বাঁশ কাঠের ঠেকনো দিয়ে রাখে বড় গাছগুলিতে।

মাঝে-মাঝে অন্ধকার নিশুত রাতে বারান্দায় বসে সে যখন তামাক খায়, তখন তার বউ আর ছেলেমেয়েরা ঘরে ঘুমোয়, ঘুমোয় তার গাছপালা, তার গৃহপালিতেরা, লোকটা

তখন একা জেগে দেখে, দূরের মাঠ ভেঙে ধোঁয়াটে লণ্ঠন হাতে অস্পষ্ট কারা যেন চলে যাচ্ছে, কানে আসে ক্ষীণ হরিধ্বনি। কখনও বা দেখে, ভিন গাঁয়ের দিকে মশাল হাতে চলেছে একদল লোক, তাদের হাতে বন্দুক, সড়কি, খাঁড়া, মুখে ভুসোকালি মাখা। লোকটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চেয়ে থাকে। তার আর ঘুম আসে না।

গ্রামের ধারে রুপোলি নদীটির পাশে শিবরাত্রি কি রথযাত্রার মেলা বসে। কত দূর থেকে রঙে ছোপানো জামাকাপড় পরে আসে অচেনা মানুষেরা। রঙিন ছেলেমেয়েরা মুখোশ পরে ঘোরে, বাজিকর খেলা দেখায়। পায়ে-পায়ে রাঙা ধুলোর মেঘ ওড়ে। ছেলের হাত ধরে লোকটি মেলায় আসে। ছেলেকে ডেকে বলে—মানুষের মুখ দেখ বাবা, মানুষের মুখ দেখ। এর বড় নেশা। হাটুরেরা ঘোরে ফেরে, দরদাম করে। লোকটা কেনাকাটার ফাঁকে-ফাঁকে অচেনা হাটুরেদের দেখে আর দেখে। কখনও বা ছেলেকে বলে—অচেনা মানুষকে একটু পরপর লাগে বটে, কিন্তু আপন করে নেওয়া যায়। কাজটা শক্ত না।

সে জানে দেশের আইন, জমি এবং ফসলের মাপ, অঙ্কের হিসেব, লোকটা জানে চিকিৎসা-বিদ্যা। সে জানে, কোন উদ্ভিদের কী গুণ, কোন মাটিতে কোন ফসল, কোন বীজ থেকে কী গাছ। তাই এ-গাঁ সে-গাঁ থেকে নানা জন আসে তার কাছে। আইন জেনে যায়। জমির মাপ জেনে যায়, আসে চিঠি লেখাতে কিংবা হিসেব মিলিয়ে নিতে। লোক আসে রোগের ওষুধ জানতে। সে কেবল মানুষকে দেখে আর দেখে। সে জানে, পৃথিবীর কোনও কিছুই একটি ঠিক আর-একটির মতো নয়। আছে বর্ণভেদ। আছে বৈশিষ্ট্যের তফাত। এক গাছের দুটি পাতাও নয় একরকমের। সে মানুষে-মানুষে সেই ভেদ দেখতে পায়। দ্যাখে বৈশিষ্ট্য। তাই প্রতিটি মানুষের জন্য তার আলাদা বিধান, আলাদা ব্যবহার, আলাদা ওষুধ, এক-একটি মানুষের অর্থ এক-একটি আলাদা জগৎ। প্রতিটি মানুষেরই আছে অস্তিত্বের বিকিরণ। মানুষ দেখতে-দেখতে লোকটার এমন অবস্থা হয়, যে সে মানুষের সেই বিকিরণটি অনুভব করে। সেই বিকিরণ অনেকটা আলোর মতো। বিভিন্ন মানুষের আলোর রং আলাদা। বড় সরল লোক সে। সে ভাবে তার মতো আর সবাইও মানুষের বিকিরণ দেখতে পায়। তাই সে কখনও হয়তো কোনও লোককে দেখে চেঁচিয়ে বলে—এঃ হেঃ তোমার আলোটা যে লাল গো—বড্ড লাল। ও যে রাগের রং।

শুনে লোকে হাসে, বলে পাগল।

লোকটা নানা রকমের আলো দেখেছে জীবনে। কখনও পাঠশালা থেকে ফেরার পথে—যখন বর্ষার ভারী মেঘ নীচু হয়ে ঘন ছায়া ফেলেছে চরাচরে—ঝুমকো হয়ে এসেছে আলো—তখন মহাবীরথানের বটগাছ পেরোবার সময়ে লোকটা হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। অবাক হয়ে দেখেছে, তার সামনে এক আলোর গাছ। আলোর ঝালর তার পাতায়-পাতায়,

কাণ্ডে, ডালে। তারপর সে চারিদিকে চেয়ে দেখছে হঠাৎ যেন পালটে গেছে পৃথিবীর রূপ। বাতাসে মাটিতে শূন্যে সর্বত্রই আলোময় কণা। খেলা করছে চরাচর জুড়ে আলোর কণিকাগুলি। সে দেখল নানা রঙের আলোর কণা ছাড়া আর কিছু নেই। সেই কণাগুলিই খেলার ছলে তৈরি করছে গাছপালা, মাটি, মেঘ। এই বিচিত্র দৃশ্য দেখে সে ভয় পেয়ে চোখ বুজল। টের পেল, তার দেহ জুড়ে সেই কণাগুলিরই খেলা চলছে। মাঝে-মাঝেই সে সেই কণাগুলিকে দেখতে পেত, ভাবত—তবে কি সৃষ্টির সত্য চেহারাটা এই যে, তা আলোময় এবং কণিকাময়? কখনও-কখনও সে দেখেছে, সেই কণাগুলির চলাফেরা ছন্দময় যেন এই মহাবিশ্বের কোনও অশ্রুত সঙ্গীতের সঙ্গে তারা সুরে বাঁধা। তাদের দোলা এবং চলা সেই ছন্দটিকে প্রকাশ করছে।

কোনও লোকই তার এইসব কথা ঠিকঠাক বুঝতে পারে না। সেসব বিচিত্র আলোর বর্ণনা দিত মায়ের কাছে, বন্ধুর কাছে। তারা বলেছে পাগল।

সংসারী মানুষের আছে সুখবোধ। গৃহস্থ সুখ পায় পুত্রমুখ দেখে, নিজের সঞ্চয় দেখে যত কিছু সে অধিকার করে পৃথিবীতে তত তার সুখ। লোকটার তেমন সুখ নেই। কিন্তু মাঝে-মাঝে তার অদ্ভুত এক আনন্দ আসে। একা-একা সেই অকারণ আনন্দের প্লাবনে ভেসে যেতে-যেতে সে চিৎকার করে ছেলে-বউকে ডাকে, ডাকে চেনা লোকেদের, সেই আনন্দে সবাইকে সামিল করতে। বস্তুত কেউই তার সেই আনন্দকে বুঝতে পারে না। লোকটা অবাক হয়ে ভাবে, তবে বুঝি আমি পাগলই! আমার একার জন্যই বুঝি কিছু দৃশ্য আছে, কিছু শব্দ আছে, আছে অপার্থিব আনন্দ!

মাঝে-মাঝে খেতের কাজ করতে-করতে, পোয়াল নাড়া বাঁধতে-বাঁধতে, গোয়াল পরিষ্কার করতে-করতে, হঠাৎ চমকে উঠে ভাবে—আরে! আমি যেন কোথায় ছিলাম—কোথায় ছিলাম! সে যে এক গভীর নীল স্নিগ্ধ জগৎ। সেখানে এক অদ্ভুত আলো ছিল। ছিল এক বিচিত্র সুন্দর শব্দ! সেই আমার জগৎ থেকে কে আমাকে এখানে আনল? কেন আনল এই মৃত্যুশীলতার মধ্যে, হঠাৎ সে চমকে উঠে বোধ করে—যে পথ দিয়ে আমি এসেছিলাম সেই পথের দু-ধারে ছিল অনেক তারা নক্ষত্র। সেই বীথিপথটি অনন্ত থেকে চলে গেছে অনন্তে। তার শুরু নেই শেষও নেই। সেই পথে চলতে-চলতে কেন আমি থেমে গেলাম। নেমে এলাম এইখানে? এই কথা ভেবে লোকটা চারদিকে চেয়ে এক সম্পূর্ণ অচেনা অদ্ভুত অপার্থিবতাকে বোধ করে। কোনও কিছুকেই সে আর চিনতে পারে না।

সংসারী মানুষদের কাছে খেতখামার পশুপাখি গাছপালা ছেলে-বউ। এই সবের সঙ্গে তারা কেমন মেখেঝুখে থাকে। তারা নিজের জিনিস চেনে, চেনে পরের জিনিস। তারা

সেসব জিনিসে নিজেদের চিহ্ন দিয়ে রাখে। অবিকল তাদের মতোই এই লোকটারও আছে সব। কিন্তু তাতে তার চিহ্ন দেওয়া নেই। বউ রাগ করে—তোমার বাড়ি তো বাড়ি নয়, এ হচ্ছে হাট। সারাদিন এখানে লোক আসে যায়। তোমার দিন কাটে দাওয়ায় বসে। কখনও বা বলে—তুমি অন্যের খেত থেকে পাখপাখালি তাড়াও, ছাগল গরু তাড়াও, অন্যের অসুখের দাও ওষুধ, অন্যের দুঃখে গলে পড়ো। আমাদের ওপর তোমার মন নেই। অথচ আমরাই তোমার আপনজন, আর এ সমস্ত তোমার নিজের জিনিস।

লোকটা ঠিকঠাক উত্তর দিতে পারে না। কেমন গুলিয়ে যায়। মাঝে-মাঝে সে যে নিজেকেই অনুভব করতে পারে না ঠিকমতো, তবে নিজের বলে কী অনুভব করবে?

একথা সত্য যে মানুষটি পৃথিবীকে ভালোবেসে গলে যায়। গলে যায় মানুষের দুঃখ দেখে। গৃহস্থের এরকম হতে নেই। গৃহস্থকে আরও শক্ত হতে হয়, হতে হয় হিসেবি সঞ্চয়ী, তার চাই আত্মপর ভেদজ্ঞান। তার বউ বলে—আরও পাঁচ জনকে দ্যাখো। দ্যাখো, তারা নিজেদের ঘরে বাস করে। তোমাকে দেখে মনে হয় তুমি আছ পরের ঘরে।

লোকটার বউ বলে একথা। লোকটার বুড়ি মা-ও বলে। বেঁচে থাকতে লোকটার বাবাও বলত—এ সংসারে তুমি দুঃখ পাবে বলেই জন্মেছ।

লোকটা অন্য রকম বোঝে। সে যখন দাওয়ায় বসে দূরের গাঢ় ধূসর পাহাড়টিকে দেখে, যখন দেখে ময়ূরপুচ্ছের মতো নীল আকাশ কিংবা নিষ্পাপ শিশুর মুখ, তখন যে অনাবিল আনন্দকে সে টের পায়, সে আনন্দ তো তার নিজের। সে আনন্দের কারণ হোক না তার নিজের শিশু কিংবা দূরের পাহাড় কিংবা আকাশ—যা কিনা সংসারের বাইরে—তার সৌন্দর্য। তবে তো আনন্দই নিজের, সেই আনন্দই আপন করে তোলে এই বিশ্ব সংসারকে। যে জানে সে জানে, পর বলে কিছু নেই।

জলে ডুবে মারা গেছে একটি শিশু। বাপ তার মৃত শিশুকে শরীর ঢেকে কোলে নিয়ে চলেছে। লোকটা থেমে চেয়ে থাকে। দেখে শিশুটির মুখখানা ঢাকা, তবে পা দুটি কেবল ঝুলে আছে। সেই শিশুটিকে কোনওদিনই দেখেনি লোকটা। আজও দেখল না। কেবল সেই চির অপরিচিত শিশুটির দু-খানা পা দেখে রাখল। বুকখানা ব্যথিয়ে উঠল তার। হুহু করে কান্না এল। অচেনা বাপটির মুখ দেখে ফেটে গেল বুক। বড় অবাক হল সে। ভাবতে বসল, কেন এরকম হবে। যাকে কোনওদিন দেখিনি, যে আমার চেনা ছিল না, তার জন্য কান্না কেন। তাহলে কি যাদের পর করে রেখেছি তারা আমার যথার্থ পর নয়? ওই যে এক মুহূর্তের একটু দুঃখ তা কি কাঁটার মতো নির্ভুল বলে দেয় না যে, ওই অপরিচিত শিশুটিও ছিল আমারই জন। যেমন দূরের দেশে আকাল এলে, মড়ক লাগলে মানুষের প্রাণ ছটফট করে। ওই একটু দুঃখ কি কয়েক পলকের জন্য দূর ও নিকট, আপন ও

পরের ভেদরেখা মুছে দেয় না? চাবুকের মতো চকিতে আঘাত করে না মানুষের স্বার্থপরতাকে?

গাঁয়ের বুড়ো মাতব্বররা শুনে বলে—তুমি বাপু আহাম্মক। অচেনা একটা জলে ডোবা শিশুকে দেখে তোমার যে দুঃখ তা তো আসলে তোমার নিজের ছেলের কথা ভেবেই। ওই যে অচেনা বাপটির মুখে তুমি শোক দেখলে, ওই বাপের জায়গায় তুমি দেখেছ নিজেকেই। মানুষ কি পরের জন্য দুঃখ পায়। দুঃখ পায় নিজের যদি ওই অবস্থা হয়—এই ভেবে। দূরের দেশের আকাল কি মড়কের কথা শুনে লোকে যে অস্থির হয়, তা তার নিজের দেশের কথা মনে করেই। পরের জন্য যে দুঃখ, তা আসলে নিজেরই প্রক্ষোপ।

লোকটা উঠে পড়ে। ভাবতে-ভাবতে যায়। মাঝপথে কী যেন মনে পড়ে। অমনি ফিরে এসে মাতব্বরদের সবচেয়ে প্রবীণ মানুষটাকে বলে—খুড়োমশাই, পূর্ণিমা কি অমাবস্যা জোরে আপনার হাঁটুতে বাতের ব্যথাটা বাড়ে, তা কি সত্যি?

—বাড়ে তো।

—তাহলে তো বলতেই হয় দূরের চাঁদের সঙ্গে আপনার শরীরের একটা সম্পর্ক আছে! বাইরে থেকে তো তা বোঝা যায় না।

আকাশে ঘনিয়ে আসে বর্ষার গাঢ় মেঘ। ঘন মেঘের ছায়া পড়ে চারধারে। বর্ষার ব্যাং ডাকে। বৃষ্টি নামে। লোকটা তখন তার দরজার চৌকাঠে বসে সেই বৃষ্টির দৃশ্য দেখে। কোন দূর থেকে বৃষ্টির ফোঁটাগুলি আসে, গাঢ় ভালোবাসায় মাখে মাটিকে, ভিজিয়ে দেয় গাছপালা! বৃষ্টির শব্দে যেন কোনও ভালোবাসার কথা বলা হতে থাকে। সে ভাষা বোঝে না লোকটা, কিন্তু টের পায়। ওই যে বর্ষার ব্যাং ডাকে, গাছপালার শব্দ হয়, সে প্রাণ দিয়ে তা শোনে। তার মনে হয় ওই ব্যাঙের ডাক মেঘকে টেনে আনে, গাছপালা তাকে আকর্ষণ করে, মাটিতে টেনে নামায় মেঘ থেকে জল—এরকম টান ভালোবাসার ওপরেই চলেছে সংসার! লোকটা সেই বৃষ্টির দৃশ্য দেখে নিথর হয়ে তার চৌকাঠে বসে থাকে তো বসেই থাকে। তার চোখের পলক পড়ে না। এমনিই বসে থেকে সে শীতের কুয়াশা দেখে, দেখে বৈশাখের ঝড়।

মাঝে-মাঝে বিছানায় শুয়ে নিশুতরাতে তার ঘুম ভাঙে। বুকচাপা অন্ধকার ঘরে শুয়ে আছে সে তবু তার হঠাৎ মনে হয় সে ঠিক ঘরে নেই। নিশিরাতের পরি তাকে উড়িয়ে এনেছে ঘরের বাইরে। শুইয়ে দিয়ে গেছে অবারিত মাঠের মাঝখানে। ঘরের দেওয়াল নেই, দরজা নেই, আগল নেই। টের পায়, ম্লানমুখ চাঁদের মৃদু জ্যোৎস্নায় মায়াবী রূপ ধরেছে চরাচর। কুকুর কাঁদে। বাতাসে ভাসে পায়রার পালক। পায়রার ঘর ভেঙে রক্তমাখা

মুখে বেড়ালটা নিঃশব্দ থাবায় হেঁটে উঠেছে ঘরের চালে। তারপর স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কুকুরটা কাঁদছে, চাঁদ ও শূন্যতার দিকে চেয়ে—তার দুটি ছানা নিয়ে গেছে শেয়ালে। বেড়ালটা সেই কান্না শুনে আকাশের দিকে তাকায়। দেখে, বিপুল বিস্তার। ম্লান জ্যোৎস্না। সেই জ্যোৎস্নায় পার্থিব পালকগুলি ঝেড়ে উড়ে যায় একটি পায়রা। নিশুতরাতের মায়াবী আলোয় সে পৃথিবীর সব সীমা পার হয়। স্তব্ধ বিস্ময়ে বেড়ালটা সেই দৃশ্য দেখে। কুকুরটা কাঁদে, আর কাঁদে। চাঁদ দ্যাখে, দ্যাখে শূন্যতা। কায়াহীন সেই দূরগামী পায়রাটির দিকে একবার থাবা তোলে বেড়ালটা—দূরতর পায়রাটির জন্য সে একবার লোভ বোধ করে। তারপর কুকুরের কান্না শুনে থাবাটি তুলে রেখেই সে বসে থাকে।

লোকটা ঘুমোয় না। প্রতিটি দুঃখীর দুঃখকেই তার বহন করতে ইচ্ছে করে, ক্ষমা করতে ইচ্ছে করে প্রতিটি পাপীকে। তার বাবা তাকে অভিশাপ দিয়েছিল—এই সংসারে দুঃখ পাবে বলেই তুমি জন্মেছ। সেই অভিশাপকে হঠাৎ তার আশীর্বাদ বলে মনে হয়। সে উঠে চলে আসে। রুপালি নদীটির ধারে অবারিত মাঠটিতে! দেখে, আকাশের মহাসমুদ্র সাঁতরে ধীরগতিতে চলেছে গ্রহপুঞ্জ, অথৈ সময়কে পরিমাপ করতে চেষ্টা করে, ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে তাদের জ্যোতি। লোকটির পায়ে-পায়ে ক্ষণস্থায়ী ঘাসের ডগাগুলি থেকে গড়িয়ে পড়ে শিশিরের কণা। ঘরের চালে তখনও স্তব্ধ বিমর্ষতায় থাবা তুলে বসে থাকে বেড়ালটি। কুকুরটি তার দুটি হৃত সন্তানের জন্য চাঁদের দিকে মুখ করে কাঁদে। লোকটির পায়ে-পায়ে শিশির ঝরতে থাকে। কেবল শিশির ঝরে যায়।

কেমন নির্বিকার বয়ে যায় রুপালি নদীটি। সেই নদীটির আছে উচ্ছ্বাস, আছে আনন্দ বেদনা তবু, কেমন উদাসীনতার গৈরিক রং তার সর্বাঙ্গে লোকটা দ্যাখে, আর ভাবে। দুঃখও একরকমের ভাব, সুখও একরকমের ভাব। জীবনের উদ্দেশ্য দুঃখকে একদম তাড়িয়ে দেওয়া, সুখকেও। সুখ-দুঃখ কোনওটাই যেন ব্যাপ্ত না হয়, সব উৎপাত চুকে যাক। এই দয়া হোক তার প্রতি চিত্ত যেন উদাস থাকে। দয়া হোক তার প্রতি—এই দয়া হোক। সুখেদুঃখে তার থাক অপ্রতিহত আনন্দ, তার থাক বয়ে যাওয়া। রুপালি নদীটি যেমন নিয়ে যায় মানুষের আবর্জনা ক্লেদ শ্রান্তি, বহন করে মানুষের বাণিজ্যের ভার! তেমনই সে বোধ করে, দুঃখ পাবে বলে নয়, সে সংসারে জন্মেছে সকলের দুঃখকে বহন করবে বলে। রূপালি নদীটির মতো নির্বিকার বয়ে যাবে।

বিনীত, সুন্দর একখানা অহংশূন্য মন নিয়ে সে চেয়ে থাকে। তখন তার চারপাশে খেলা করে আণবিক আলোর কণিকাগুলি। এক নিস্তব্ধ সঙ্গীতের দোলাচল তাদের চলাফেরায়। তার কাছে উড়ে আসে এক নীলাভ জগতের স্মৃতি, উড়ে আসে আলো, আসে সুন্দর সব শব্দ—যা এই সংসারের নয়। এক অপরূপলতাকে ঘিরে ধরে। তখন একে

একে নিভে যায় জাগতিক হাত, পা, চোখ এবং মন। নিভে যায় চেনা মানুষের মুখ। তখন পাখির ডিমের মতো নীল আকাশের নীচে ঘাসের ওপর সে বসে হাঁটু গেড়ে। অনুভব করে, সে আর সে নয়। এখন ভোর, আকাশের তলায়, রূপালী নদীটির পাশে, অবারিত মাঠের ঘাসের ওপর পড়ে আছে তার বীজ। সেই বীজটিতে একটিমাত্র বোধ সংলগ্ন হয়ে আছে—আমি। সে প্রাণপণে পৃথিবীর ঘাস মাটি আঁকড়ে ধরে। যেন বা এক দূত এসে দাঁড়িয়েছে পৃথিবীর দরজায়, হাত বাড়িয়ে ভিক্ষা চাইছে তাকে। সে বিড়বিড় করে বলে—আর কিছুক্ষণ—আর কিছুক্ষণ আমাকে সংলগ্ন থাকতে দাও এই সংসারের সঙ্গে। তারপর আমি চলে যাব।

গ্রামের এক প্রান্তে থাকে এক সাধক। বুড়োসুড়ো মানুষ। সাধন-ভজন আর ভিক্ষেসিক্ষে করে তার দিন কাটে। লোকটা তার কাছে যায়, তার দাওয়ায় বসে, জিগ্যেস করে—আপনি কি কখনও দেখেছেন আলোর গাছ? কিংবা ছন্দোবদ্ধ আলোর কণিকাগুলি? দেখেছেন মানুষ আলো বিকিরণ করে? কখনও কোন নীলাভ জগতের স্মৃতি আপনার মনে আসে না? আপনি শোনেননি সেই শব্দ যা মানুষকে ভিক্ষা করে ফেরে?

বুড়োসুড়ো মানুষটা অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। তারপর মাথা নেড়ে নিঃশব্দে জানায়—না। অনেকক্ষণ চিন্তান্বিত মুখে তামাক খায়। তারপর এক সময়ে লোকটার দিকে চেয়ে বলে—আমি ওসব কিছুই দেখিনি বাবা, কিন্তু তোমাকে দেখে মনে হয় তুমি দেখলেও বা দেখতে পারো। হয়তো সত্যিই আছে ওসব। আমিও শুনেছি সৃষ্টির মূলে আছে এক শব্দ।

লোকটার আর চাষবাস করতে ইচ্ছে করে না, যেমন ইচ্ছে করে না গোরুর দুধ দোয়াতে, ইচ্ছে করে না নিজের জন্য উপার্জন করতে। তা বলে সে বসেও থাকে না। সে লোয়াজিমা সংগ্রহ করে মানুষের জন্য। সে দেখে মানুষের জ্যোতি। বৈশিষ্ট্যমাফিক তাদের সমস্যার সমাধান করতে চেষ্টা করে। সে মানুষকে আকর্ষণ করে নিজের দিকে। দান করে দক্ষতা এবং ধর্ম। সে যা জানে সবই শেখায় তাদের বর্ণভেদ অনুসারে। কেউ নেয় তার চিকিৎসাবিদ্যা, কেউ নেয় অঙ্কশাস্ত্র, কেউ শেখে চাষবাস।

বউ গঞ্জনা দেয়—তোমার সংসার যে ভেসে গেল।

লোকটা হাসে—তাই কখনও যায়!

বউ বলে—তোমার যে বৃত্তি-পেশা নেই, উপার্জন নেই।

লোকটা বলে—তা কেন! আমার সব আছে। যেখানেই আমি বীজ বপন করেছি সেখানেই দেখেছি বৃক্ষের উৎপত্তি! একথা ঠিক যে নিজের জন্য আমার কিছু করতে ইচ্ছে হয় না। কিন্তু মানুষে যদি বুঝতে পারে যে, আমাকে বাঁচিয়ে রাখা তাদের স্বার্থের পক্ষেই

প্রয়োজন, তবে তারাই আমাকে বাঁচিয়ে রাখবে। আমার লোয়াজিমা তারাই এনে দেবে আমাকে। সংসারের মরকোচটা এরকমই হওয়া উচিত। টান ভালোবাসার ওপর সংসার চলুক। আমি কেন স্বার্থ খুঁজে বেড়াব? লোকের ভালোবাসা জাগিয়ে দিই, তারা আমার সংসার কাঁধে করে নিয়ে যাবে। এই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ বৃত্তি।

কিন্তু বউ তা মানতে চায় না। ঝগড়া করে। ছেলেরা বড় হয়েছে, তারা বাপকে সাবধান হতে বলে। কিন্তু ততদিনে লোকটা হয়ে গেছে মানুষ-মাতাল, জগৎ-মাতাল। তার নিকটজনেরা তাকে বলে—অপদার্থ, বাউণ্ডুলে। তারা মনে করে এই লোকটাই তাদের দুঃখের কারণ। তারা লোকটার হাজার দোষ দেখতে পায়, দেখে কাণ্ডজ্ঞানহীনতা।

কিন্তু যারা দূর থেকে আসে, তারা তার কাছে এসে এক আশ্চর্য সুগন্ধ পায়। তারা টের পায়, এক স্নিগ্ধ আলোর ছটা তাকে ঘিরে আছে। বলে—আহা গো কী সুন্দর গন্ধ এখানে! তুমি যে মানুষের গায়ের আলোর কথা বলো, সে আলো যে তোমারও রয়েছে! বড় সুন্দর আলোটি—হাঁসের পালকের মতো সাদা—এর মধ্যে কোনও হিংসে নেই, দ্বেষ নেই। এই আলোতে দু-দণ্ড বসে থাকতে ইচ্ছে করে।

কেউ বা এসে বলে—তুমি যে আমাকে ওষুধের গাছ চিনিয়েছিলে, চিনিয়েছিলে রোগ নির্ণয় করতে, দ্যাখো, সেই পেশায় আমি এখন দাঁড়িয়ে গেছি। একটা সময়ে আমি পড়ে থাকতুম বাবুদের বাড়ির আস্তাবলে, গরু ঘোড়ার সেবা করতুম, কিন্তু সে কাজে আমার কোনও ক্ষমতা ছিল না। কেউ আমাকে দেখে বুঝতে পারত না যে আসলে ও কাজ আমার নয়। আমার মধ্যে যে বৈদ্য হওয়ার গুণ আছে তা তুমিই বুঝেছিল। এই দ্যাখো, তোমার জন্য জামাকাপড়, তোমার বউয়ের জন্য শাড়ি গয়না, তোমার ছেলেপুলেদের জন্য খেলনা আর খাবার।

এইভাবে লোকটার সামনে অযাচিত উপহার জমে ওঠে।

যে লোকটা ছিল এ-গাঁয়ের বিখ্যাত চোর, সে এসে একদিন সলজ্জ হাসিমুখে প্রণাম করে দাঁড়াল, বলল—আমাকে—মনে আছে তো তোমার? আমি ছিলাম এদিকের দশখানা গাঁয়ের বিখ্যাত চোর। রোজ আমি রাতে চুরি করতে বেরোতুম, আর তুমি তোমার দাওয়া থেকে আমাকে ডাক দিয়ে বলতে—ওরে আয়, চুরি করতে যাবি তো তার আগে একটু তামাক খেয়ে যা। দুটো সুখ-দুঃখের গল্প করি। তা আমি বুদ্ধিটা মন্দ নয় দেখে এসে বসতাম। তামাক খেতে-খেতে পাঁচটা কথা এসে পড়ত। কথায়-কথায় যেত ভোর হয়ে। আমি কপাল চাপড়ে-চাপড়ে দুঃখ করে বলতাম—ওই যাঃ, গেল আমার এক রাতের রোজগার। তুমি সান্ত্বনা দিয়ে বলতে—আজ রাতে সকাল-সকাল বেরোস। আবার পরের রাতেও তুমি ডাক দিতে। আবার রাত পুইয়ে যেতে। আমি মনে-মনে ভাবতাম, এই

লোকটাই খাবে আমাকে। উপোষ করিয়ে মারবে। তাই আমি তোমার দাওয়ার সামনেকার রাস্তাটা ছেড়ে অন্য রাস্তা ধরলাম একদিন। কী করে টের পেয়ে মাঝপথে তুমি ছিলে ঘাপটি মেরে। ধরলে আবার, কথায়-কথায় দিলে রাত পুইয়ে। রোজ এমন হতে থাকলে আমি একদিন অন্য উপায় না দেখে ধরলাম ঠেসে তোমার পা, বললাম—ঠাকুর ব্রাহ্মণ হয়ে কেন তুমি আমার অন্ন মারছ? এ যে আমার বৃত্তি। এ না করলে যে ভাতে মরণ? তুমি হেসে বললে—আচ্ছা, আজ বাড়ি যা। তুই আর চুরির জানিস কী? আমি তোকে চুরির ভালো কায়দা-কৌশল শিখিয়ে দেব। আজ আমি যাব তোর সঙ্গে। শুনে ভারী ফূর্তি হল মনে। জানতাম, তোমার জানা আছে বিবিধ বিদ্যা। তুমি জানো রসায়ন, জানো গণিত, জানো বলবিদ্যা, জানো পদার্থের গুণ, তুমি সঙ্গে থাকলে আমি হব চোরের রাজা। সেই রাতে বেরোলাম তোমার সঙ্গে। গল্পে-গল্পে পথ হাঁটছি, যাব ভিনগাঁয়ে, ধনী মহাজনের দোকান লুটে আনব দুজনে। মনে বড় ফূর্তি। হঠাৎ মাঝপথে তুমি থমকে দাঁড়িয়ে বললে—হ্যাঁরে, তোর ঘরে না সুন্দরী বউ আছে। আমি বললাম—তা আছে তো! তুমি বললে—আরে, তুই না একবার বলেছিলি, তোর পাশের বাড়িতে একটা বদ লোকের বাস, সে লোকটা তোর বউয়ের দিকে নজর দেয়! আমি বললাম—হ্যাঁ, সত্যি! তখন তুমি বললে—তা এই রাতে যদি সে লোকটা তোর ঘরে আসে! তুই তো রাতবিরেতে ফিরিস, তোর বউ ঘুমচোখে উঠে দরজা খুলে দেয়। সে লোকটা হয়তো তোর গলা নকল করে ডাকবে, আর তোর বউ উঠে দরজা খুলে দেবে। যদি তাই হয়। রাতবিরেতে একা সুন্দরী বউকে রেখে বেরিয়েছিস—পাশেই ঘোঘের বাসা—কাজটা কি ঠিক হয়েছে? অমনি বিছের কামড়ের মতো মন ছটফট করে উঠল। বললাম—তাই তো! বলে সিঁদকাঠি ফেলে দৌড় লাগালাম ঘরের দিকে। তারপর থেকে সেই বিষ-যন্ত্রণায় আর ঘর থেকে বেরোতে পারি না। রাত হলেই ঘরের বাইরে মন টানে। বাইরে বেরোই তো ঘরের কথা ভেবে ফাঁপর হয়ে পড়ি। সে এমন দোটানায় পড়লাম যে খেতে পারি না, ঘুমোতে পারি না, রোগা হয়ে হাড় বেরিয়ে গেল। তখন আবার গিয়ে তোমার পায়ে পড়লাম—এ কী সর্বনাশ করলে আমার! আমার যে বৃত্তি ঘুচে গেল। অথচ চুরি ছাড়া আর যে আমি কিছুই শিখিনি! এখন কী করে আমার দিন চলবে? তুমি গম্ভীর হয়ে ভাবলে, ভেবে বললে—তোর যন্ত্রপাতিগুলো আন তো। এনে দেখালাম। তুমি সেসব দেখে টেখে বললে—তুই তো তালাচাবির কলকবজা ভালো চিনিস। জানিস এদের মরকোচ। দেখ তো ভালো তালা বানাতে পারিস কি না—যে তালা চোর খুলতে পারে না। এইসব যন্ত্রপাতি তোর সবই কাজে লাগবে তাতে। তোমার সেই কথামতো মনের দুঃখে অগত্যা তালা তৈরি করতে লাগলাম। আস্তে-আস্তে সেসব তালার সুনাম ছড়িয়ে পড়ল। এখন শহরে আমার ফলাও কারবার। পাঁচজন আমাকে ভদ্রলোক বলে সম্মান করে।

সেই চোর এই কথা বলে লোকটার সামনে তাঁর পোঁটলা খুলে দেয়, বলে—তোমার জন্য এনেছি ভালো তামাক, হুঁকো, একজোড়া শহুরে চটিজুতো, ফলমূল—

এইভাবে মানুষেরা আসে। নিজেদের গল্প বলে। তাদের সংগৃহীত উপহার দিয়ে যায়। তারা জানে, এ লোকটা বেঁচে থাকলে তারাও বাঁচবে, বাঁচবে আরও হাজারটা লোক! তাই লোকেরা এসে তাকে ঘিরে বসে, নিজের খাবারের ভাগ দিয়ে যায়, দেয় পরিধেয় কখনও বা শৌখিন জিনিস, রাত জেগে তাকে পাহারা দেয়।

তবু কেউই তাকে সঠিক বুঝতে পারে না। বলে—আরে! আহাম্মকটাকে দেখছি বিগ্রহ বানিয়েছে সবাই! প্রণামীর ঠেলায় আহাম্মকটা যে হয়ে গেল ধনী। কেউ বলে—ঘড়েল লোকটাকে দেখ, আহাম্মকদের মাথায় হাত বুলিয়ে খাচ্ছে!

এরকম বিবিধ কথা হয় লোকটার সম্বন্ধে। কিন্তু সকলেরই জিজ্ঞাসা—'বাপু, তুমি আসলে কে? আসলে কী? তুমি সত্যিকারের কেমন?'

লোকটা উত্তর দিতে পারে না। আলো যেমন বলতে পারে না—আমি আলো, বাতাস যেমন বলতে পারে না—আমি বাতাস; সেইরকম সেও বলতে পারে না সে কী বা কে। কিন্তু মানুষের প্রাণে-প্রাণে ছড়িয়ে পড়ে সে নিজেকে এক রকম অনুভব করে। বুঝতে পারে যোজন-যোজন বিস্তৃত তার অস্তিত্ব। সে কেবল পৃথিবীকে ভালোবেসে গলে যায়। গলে যায় মানুষের দুঃখ দেখে।

চৈতন্যময় আলোর আণবিক কণিকাগুলি তাকে ঘিরে খেলা করে। তার ভিতর থেকে স্পন্দমান সৃষ্টির মূল শব্দটি উঠে আসতে থাকে। লোকটা ময়ূরপুচ্ছের মতো নীল আকাশের দিকে চায়, চেয়ে থাকে দূরের পাহাড়টির দিকে। হঠাৎ অনুভব করে, তারই অস্তিত্ব থেকে জন্ম নিচ্ছে আকাশ, বাতাস, নক্ষত্রপুঞ্জ, আলো এবং অন্ধকার। ওই যে দূরের পাহাড়টি, রুপালি নদীটি, ওই যে অবারিত মাঠ, অচেনা যেসব মানুষ চলেছে রাস্তা দিয়ে, এই যেসব গাছপালা, পশুপাখি এই সবই জন্ম নিচ্ছে তার অস্তিত্ব থেকে, লয় পাচ্ছে তারই ভিতরে। সে তার এই অনন্ত অস্তিত্বের কথা লোককে বলতে পারে না। সে রাত জেগে দাওয়ায় বসে গুড়গুড় করে তামাক খায়, আর ভাবে, আর অনুভব করে। অনাবিল এক আনন্দের স্রোত তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে থাকে। সে সেই আনন্দের ভাগ কাউকেই দিতে পারে না। সে ঘোরে ফেরে তার গাছপালাগুলির কাছে, বলে বেঁচে থাকো। বেড়ে ওঠো। সে পশুপাখি, গৃহপালিতদেরও বলে—বেঁচে থাকো। বেড়ে ওঠো। সে তার ছোট ছেলেটির মাথায় হাত রেখে বলে—বেঁচে থাকো। বেড়ে ওঠো। তার দেহ থেকে সৌরভ এবং আলোর মতো ওই কথা সমস্ত বিশ্বচরাচর ছড়িয়ে থাকে—বেঁচে থাকো। বেড়ে ওঠো।

তারপর একদিন পড়ে থাকে তার সংসার, তার সঞ্চিত সম্পদ। সে একা-একা চলে আসে পাহাড়ে। একটা গুহা খুঁজে বের করে। গুহায় ঢুকে সে গুহার মুখ বন্ধ করে দেয় ভারী পাথরে। তারপর সেই নিস্তব্ধতায় বসে সে মানুষের জন্য কয়েকটি সৎচিন্তা করে মরে যায়।

লোকটা মরে যায়, তার সেই চিন্তাগুলি কিন্তু মরে না। তারা ধীরে-ধীরে তার দেহ ছেড়ে বেরিয়ে আসে। ঘুরে-ঘুরে গুহা থেকে বেরোবার মুখ খোঁজে। তারপর তারা পাহাড় ভেদ করে, পার হয় নদী, প্রান্তর, পার হয়ে যায় সমুদ্র। অদৃশ্য কয়েকটি অলীক পাখির মতো মানুষের কাছে চলে আসে। ঘুরে-ঘুরে বলে—তমসার পাড়ে আছেন এক আলোকময় অনামি পুরুষ। আমরা তার কাছ থেকে এসেছি, তোমরা আমাদের গ্রহণ করো।

কিন্তু, নিজের সুখ-দুঃখে কাতর মানুষ সেই ডাক শুনতেই পায় না।

শেষ বেলায়

নেত্য, নেত্যগোপাল সামন্তর বাড়িটা এদিকে কোথায় জানেন? ও মশায়—

রকে এক বুড়ো বসে। একটা তেলচিটে তুলোর কম্বল থেকে মুখখানা জেগে ওঠে। বড় বেশি খানা খোঁদল মুখে, আর নারকেল ছোবড়ার মতো রুখু দাড়ি-গোঁফ। শিরা-উপশিরা সব ভেসে উঠেছে। মরকুটে বুড়ো। চোখের কোণে মাখনের মতো পিচুটি জমছে।

—নেত্য?

—নেত্যগোপাল।

—সামন্ত বাড়ি? কী বললে?

—তাই বলছি। নেত্য সামন্ত। দালাল!

—হবে।

—সে থাকে কোথা?

বুড়োটে ঘোলাটে চোখে একটু চেয়ে থাকতেই কপালের চামড়ার নীচে বান মাছের মতো একটা রগ সরে গেল একটু পিছলে। মরবে! পিত্ত কফ শ্লেষ্মা তিনটেই প্রবল। গলার ঘর্ঘরটা সামলাতে পারছে না। বুকে বাতাস ডাকছে।

—শেলেশ শা। বুঝলে?

—বুঝেছি।

—অনেক নতুন-নতুন লোক বসেছে নিশ্চিন্দায়। নতুন কালের মানুষ সব। সবাইকে কি চিনি? হরেন চৌধুরী বুঝল, হবে না, বলল—কিন্তু খুব নামডাকের লোক। তিন-চার

রকমের দালালি।

—রাখো তোমার দালালি। দালাল নয় কে? কী নাম বললে? নেত্যগোপাল? নেত্যগোপাল! সামন্ত বাড়ি—

—এই বাড়িটাই দেখিয়ে দিল একজন।

এই—বাড়ি? বলে মাথা নাড়ে বুড়োটা—কিছু ঠাহর পাই না। এই মনে পড়ে। ভুলে যাই। ঝুব্বুস হয়ে বসে গেছি বাপ, কে আর দেখে আমাকে! জারটাও বাড়ল খুব এবার।

হরেন হাসে—জার কোথা খুড়োমশাই? দিব্যি বসন্তের হাওয়া দিচ্ছে।

—তোমার তো দিবেই। যার মাথায় হাত তার জার। শরীরে সেই কোন সকালে শীত ঢুকে বসে আছে। তাড়াই কত। যায় না।

—তো নেত্য সামন্তর খোঁজ পাই কী করে? বাড়িতে কে আছে?

—আছে অনেক। জ্ঞাতিগুষ্টি কি কম? তিষ্ঠোতে পারি না বাপ, বড্ড জ্বালায় ছেলেগুলো। নিত্যগোপালের ছেলে, আমার নাতি—

হরেন ঝুঁকে সাগ্রহে বললেন—কী নাম বললেন? আপনার ছেলে নিত্যগোপাল?

বুড়ো হতচকিত চোখে চায়—তবে কার ছেলে? ভুল বললুম না কি?

—তাহলে তো এইটেই নিত্যগোপালের বাড়ি।

—এইটাই।

—চেনেন না বললেন যে?

—চিনি। আমার ছেলে। ভুল হয়ে যায় বাপ। আমি হচ্ছি গয়েশ সামন্ত। বলে বুড়ো মাড়ি আর মুখের ফোকর দেখিয়ে হাসে—এইবার মনে পড়েছে। সব হিসেব ঠিকঠাক। সামন্ত বাড়ি, নেত্য।

—নেত্যকে আমার দরকার।

—যাও না ভেতরে। এটা কি সকাল বাপ? ক'টা বাজল?

—বিকেল চারটে। এ সময়ে থাকার কথা।

—আছে বোধহয়। এখানেই থাকে। গয়েশ সামন্তর ছেলে হল নেত্যগোপাল, নেত্যগোপাল।

—ছেলেপুলে তো কাউকে দেখছি না। কাকে দিয়ে ডাকাই! অচেনা লোক হুট করে ঢুকে পড়াটা কি ঠিক হবে?

—ছেলেপুলে? নেত্যর? তারা সব গর্ভস্রাব।

গালাগালটা হরেনের শোনা। বাবা দেয়।

বলল—ছেলেগুলো জ্বালায় নাকি?

—কিছু রাখে না। এক পুরিয়া চিনি লুকিয়েছি তোষকের তলায়। লোপাট। কিছু রাখে না। বড় এলাচ খেলে বুক ভালো থাকে, চিত্ত এনে দিয়েছিল এক মুঠো। কড়মড় করে চিবিয়ে খেল। বউমারা সব যে পেটে এগুলো কী ধরেছিল, ছিঃছিঃ!

হরেন চৌধুরী দরজায় উঠে 'নেত্যবাবু' বলে ডাকতে লাগে।

—ভেতরে শোনা যায় না। বুড়োটা বলে।

—কেন?

—সব অনেক ভেতরে থাকে। ছেলেগুলো সর্বক্ষণ খাচ্ছে, চেঁচাচ্ছে, কিচ্ছু শোনা যায় না, ঢুকে যাও।

—মেয়েছেলে রয়েছেন, যদি কেউ কিছু মনে করেন! উটকো লোক।

—পরদানশিন তো নয়। যখন গাল পাড়ে তখন তো ইয়ের কাপড় মাথায় উঠে যায়। মেয়েছেলে? যাও। সর্বক্ষণ লোক আসছে, এ-বাড়ি হচ্ছে হাট।

তা হরেন চৌধুরী কিছুক্ষণ দোনোমোনো করে ঢুকেই পড়ে। রক পেরিয়ে দরজা। ভিতরে একটা বাঁধানো জায়গা, বারান্দামতো। তারপর মস্ত উঠোন। বাড়িটার কোনও প্ল্যান ছিল না নাকি? যেখান-সেখান দিয়ে ঘর বারান্দা সব গজিয়েছে। দেওয়ালে প্লাস্টারের বালাই নেই, ইট বেরিয়ে আছে। এক পাশে ভারা বাঁধা, রাজমিস্ত্রির কাজ চলছে বোধহয়। কাণ্ডটা প্রকাণ্ডই। উঠোনের চার ধারেই ঘর, ঘরের ওপর ঘর উঠেছে কোথাও। একটাই বাড়ির খানিকটা একতলা, খানিকটা দোতলা, তেতলাও আছে। উঠোনের মাঝখানে কুয়ো, কুয়োর পাশেই আবার টিউওয়েল। বিস্তর বাচ্চাকাচ্চা, আর কয়েকটা মেয়েছেলে দেখা যায়। কুয়োপাড়ে বাসনের ডাঁই মাজতে বসেছে কুঁজো চেহারার কালো এক মেয়েছেলে। মাজতে-মাজতে বকবক করছে। তার কাঁকালের ফাঁক দিয়ে বাঁদরের বাচ্চার মতো একটা বছর দেড়েকের মেয়ে ঝুলে আছে, তার মাথাটা বুকের মধ্যে সেঁদানো। মেয়েমানুষেরা পারেও! ভেবে একটু শিউরেও ওঠে হরেন।

হেঁকেই জিগ্যেস করে—নেত্যগোপালবাবুর বাড়ি তো এটা?

কেউ তাকালও না। উঠোন জুড়ে চিল চেঁচানি। খাপড়া ছুড়ে গুটি সাতেক ছেলেমেয়ে গঙ্গাযমুনা খেলছে। তাদের মধ্যে একজন এক ঠ্যাঙে লাফিয়ে তিন ঘর পেরিয়ে গেল, সবাই চেঁচাচ্ছে তাই!

এই হচ্ছে জয়েন্ট ফ্যামিলির ছবি। হরেনের চোখ দুটো করকর করে উঠল। দুঃখে। এক সময়ে সে এরকম একটা পরিবারে মানুষ হয়েছিল। সে সব ইতিহাস। আজ সামন্তমশাইয়ের কাছে এসেছে ছোট্ট একটা প্লট বা বাড়ির সন্ধানে। লোকটার হাতে বিস্তর জমির খোঁজ। কলকাতায় আর জমি নেই। যাও বা ছিল ঢাকুরে, যাদবপুর, বেহালা বা গড়িয়ায়—তাও টপাটপ ফুরিয়ে এল বলে। এরপর কলকাতার জমি বিক্রি হবে ঝুড়িতে। মানুষ তাই কিনে ঘরে সাজিয়ে রাখবে। দেখবার মতো জিনিস হবে একটা। তা সেই দুর্লভ জমি ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই হরেন এক মুঠো চায়, ছোট্ট প্লট হলেই তার চলে যাবে। সংসার বড় নয়। বউ আর দুটো ছেলে, দুটো মেয়ে। কাঠাখানিক কি দেড়েক হলেই তিনতলা তুলবে। সুবিধেমতো জায়গায় হলে একতলাটা হবে দোকানঘর, দোতলায় ভাড়াটে, তিনতলায় তাদের ছোট সংসার।

ছোট পরিবারই সুখী পরিবার বলে বটে, কিন্তু হরেনের মনে ধন্দটা যায়নি। সামন্তমশাইয়ের বাড়ির দৃশ্যটা দেখে কি জানি কেন হরেনের বুকটায় মেঘ জমে ওঠে। এইরকম একটা হাটখোলায় সে মানুষ হয়েছিল। সুখে নয়, আবার তেমন সুখ আর পাবেও না।

দীর্ঘশ্বাস চেপে সে দু-কদম এগোল। বারান্দার নীচে নর্দমা, তাতে একটা নীল বল পড়ে আছে। উঠোনে ফাটা বেলুনের রবার ন্যাতার মতো, একটা ছাগল ঘাস থেকে মুখ তুলে হরেনের চোখে চোখ রাখে। কোনও বিধবার রোদে-দেওয়া কাপড় অশুচি করেছে হতচ্ছাড়া কাক, বুড়ি দোতলার রেলিং ধরে ঝুঁকে চেঁচাচ্ছে—বলি নেন্ডি, কাকে ছোঁয়া কাপড় মা, রাঁড়ি বলে তো আর মানুষের বাইরে যাইনি, তখন থেকে বলছি, ধো না হয় গঙ্গাজলের ছিটে দে...

হরেন নির্বাক দাঁড়িয়ে থাকে।

বোঝা যায় যে, এ-বাড়িতে লোকের যাতায়াত বিস্তর। সে যে ঢুকে এসে দাঁড়িয়ে আছে কেউ গ্রাহ্যই করে না। যেন বা বাড়ির লোক। জয়েন্ট ফ্যামিলিতে বাড়ির লোক আর বাইরের লোক চেনা ভারী মুশকিল। কেউ অচেনা এসে দাঁড়ালে ছোটবউ ভাবে বড় বউর

কাছে এসেছে, বাপ ভাবে ছেলের কাছে এসেছ, ভাই ভাবে দাদার কাছে এসেছে। কেউ গা করে না।

গলা খাঁকারি দিয়ে-দিয়ে গলায় ব্যথা। বাচ্চাগুলোকে জিগ্যেস করার চেষ্টা বৃথা। তারা আরও ব্যস্ত।

মিনিটদশেক ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে অবশেষে একটা চলতি বাচ্চাকে থামিয়ে জিগ্যেস করতে হদিস পাওয়া গেল। নেত্য থাকে দোতলার ঘরে। 'ওই সিঁড়ি বেয়ে উঠে যান, ঘর খোলা আছে, কাকামশাই এ সময়ে অঙ্ক কষেন।' বলে বাচ্চাটা উঠোনে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

সিঁড়ি চটা ওঠা। হয় সিমেন্ট পায়ে-পায়ে উঠে গেছে, নয়তো লাগানোই হয়নি। গোয়াল সকলের, ধোঁয়া দেবে কে।

দোতলার ঘরে নেত্য সামন্তর অফিস কাম বেডরুম। ঘরটায় তক্তপোশ আছে, টেবিল চেয়ারও। কিন্তু দলিল দস্তাবেজ, মুসাবিদা আর মামলার কাগজে ছয়লাপ। টেবিল-চেয়ার ডাঁই, বিছানাও অর্ধেক দখল নিয়েছে কাগজেরা। থলথলে চেহারার কালো মতো নেত্যগোপাল মেঝেয় বসে চৌকির ওপর গ্রীবা তুলে জিরাফের ভঙ্গিতে—হ্যাঁ—অঙ্কই কষছে বটে। আসলে ফর্দ। কীসের ফর্দ তা অবশ্য দেখার চেষ্টা করে না হরেন।

—কী চাই আজ্ঞে?

—নেত্যগোপাল সামন্তমশাই কি আপনি?

—আজ্ঞে।

—এসেছিলাম একটু বিষয় ব্যাপারে—

নিত্য বা নেত্যগোপাল ঘাবড়ায় না। নিত্যকর্ম। ফর্দটা মুড়ে রেখে বলে—আসুন।

—বসুন। বলে নেত্যগোপাল বিড়ি ধরায়। তারপর বলে—বলুন।

—একটু বাস্তুজমি।

—জমি?

—আজ্ঞে। হুবহু নেত্যগোপালের অনুকরণ করে হরেন বলে।

—খরচাপাতি কীরকম? এলাকা? তৈরি বা পুরোনো বাড়ি চলবে না?

—চলবে, তবে তিনতলার ভিত হওয়া চাই।

নেত্যগোপাল হাসল। হাতের বিড়িটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল একটু। তারপর বলল—যারা বাড়ি করে তারা তিন কি চারতলার ভিতই গাঁথে, সে একতলা বাড়ি করলেও। শেষপর্যন্ত আর তিন-চারতলা হয়ে ওঠে না। বেশিরভাগই টাকার অভাবে য-তলার ভিত তার আদ্দেক উঠে ফুরিয়ে যায়। মাটির তলায় বৃথা টাকা খরচ।

হরেন চুপ করে রইল। তিনতলাটা তার চাই-ই।

—আমাদের বাড়িরই সেই দশা। মাটির নীচে হাজার পনেরো-বিশ টাকা ওপরেতে ঠেঙে ভূতে-পাওয়া বাড়ি। বলে হাসল নেত্যগোপাল।

হরেনও হাসল। কারণ নেই। তারপর হঠাৎ, দালালের সামনে বেশি হাসা উচিত নয় ভেবে গম্ভীর হয়ে বলল—তবে বাড়ির চেয়ে জমিই ভালো। পছন্দমতো করা যাবে।

—কী রকম করতে চান?

—একতলায় দুটো দোকানের প্রভিশন থাকবে, আর গ্যারেজ। দোতলায় দুটো ফ্ল্যাট, তিনতলাটা আমার। ওটা—

নেত্য বা নিত্যগোপাল বিড়িটা মন দিয়ে দেখে। চোখ ছোট, কপালে লম্বা কোঁচকানো দাগ।

—শুনছেন? হরেন সন্দেহবশত জিগ্যেস করে।

—শুনেছি। বলে নেত্যগোপাল।

—তিনতলাটায় চতুর্দিকে বারান্দা টারান্দা হবে, চিলে কোঠার পাশে চারতলায় হবে ঠাকুরঘর।

—নেত্যগোপাল শ্বাস ছাড়ল।

কথাবার্তায় আরও সময় গেল খানিক। আগামপত্তর করতে হল কিছু। পেয়ে যাবে হরেন। বর্ষার আগেই ভিত গেঁথে ফেলতে পারবে। নেত্যগোপালের দু-হাতের দশটা আঙুলের নখে নখে কলকাতার মাটি লেগে আছে। কলকাতার জমি ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই এক খামচা তুলে নিতে পারবে বলে ভরসা হয় হরেনের। একতলার দুটো দোকানঘরের একটাতে বসাবে গবেট বড় ছেলেটাকে। গ্যারেজটা অবিশ্যি খালিই পড়ে থাকবে এখন, যদি ভগবান কখনও সুদিন দেন...। গরু পুষবার বড় শখ ছিল তার। হবে না। গরু, সবজিখেত, হাঁস-মুরগি এসবের জন্য মফসসলের দিকে কাঁদাল জায়গাই পছন্দ ছিল তার, কিন্তু গিন্নির শখ কলকাতায় থাকবে। থাকো তাই। হরেনের গোরু তাই বাদ

গেল। একটা শ্বাস পড়ে যায়। বাপ-দাদার সঙ্গে চিরকালের মতো ছাড়ান কাটান হয়ে যাচ্ছে। যাক। এজমালি সংসারের লোভী মুখখানার হাঁ আর যে বন্ধই হয় না। বাবা গত এগারো বছর বসে আছে, দাদা হাইকোর্টে ফোলিও টাইপ করে বুড়ো হয়ে গেল। পরের ভাই মোটরমিস্ত্রি, তার ওপর লাভ ম্যারেজের দজ্জাল বউ। থাকা যায় না একসঙ্গে। পয়সাকড়িতে রোজগারে, ওর মধ্যে হরেনেরই যা হোক একটু চিকিমিকি। বউ তাই রোজই সাবধান করে—এই বেলা ভেন্ন হও, নইলে সব তোমার ঘাড়েই হামলে থাকবে।

বুড়োটা নীচের বারান্দায় খেতে বসেছে। বাটিতে চিঁড়ের জাউ কিংবা সাগু—কিছু একটা হবে। সপসপে জিনিসটা হাতের কোষে তুলে ভয়ঙ্কর মুখখানা হাঁ করে সড়াৎ টেনে নিচ্ছে। এই বয়সে খাওয়া বাড়ে। বাড়লেই বুঝতে হয়, দিন শেষ হয়ে আসছে। হরেন মুখটা ফিরিয়ে নেয়।

প্রশ্নটা এসে পড়ে মুখে, সামলাতে পারে না হরেন। জিগ্যেস করে—তা সামন্তমশাই তো ইচ্ছে করলেই নিজের মতো একখানা বাড়ি করে ভিন্ন থাকতে পারেন। এই ক্যাঁচকেঁচির মধ্যে থাকা—

নেত্য বা নিত্যগোপাল হাত রসিদটায় চোষ কাগজ চেপে বলে—ভাবি মাঝে-মাঝে বুঝলেন। সাত ভাইয়ের সংসার, ছেলেপুলে মিলে একটা পুরো পল্টন। পয়লা তিন ভাইয়ের বিয়ে দেখেশুনে হয়েছিল, পরের চারজন কোথা থেকে একে-একে সব বউ নিয়ে এসে পটাপট ঢুকিয়ে দিল বাড়িটায়। গুষ্টি বাড়ছে। ভাবি বুঝলেন!

—আপনি ইচ্ছে করলেই তো হয়।

—হয়। এক সদ্যবিধবার জমি পেয়েছিলাম সুবিধামতো। বায়না-টায়নাও হয়ে গেল। ঝপ করে দর পেয়ে ছেড়ে দিলাম। দালালি করার ওই অসুবিধে। দামটা সব সময়ে মাথায় বিঁধে থাকে নিজের জন্য আর আমি ভাবতেই পারি না। কয়েকবার চেষ্টাও করে দেখেছি। ভাবি, চলে যাচ্ছে যখন যাক। তবে ভাবি মাঝে-মাঝে, বুঝলেন! ভাবনাটা আছেই। বলে খুব হাসে নেত্য বা নিত্যগোপাল।

—আজকাল আর জয়েন্ট ফ্যামিলি চলে না—

—সে তো বটেই। একা থাকার যুগ পড়ে গেল। ছোট সংসার সুপ সাপ ঘরদোর, ছোট হাঁড়ি, ছোট পাতিল। এসবই চল হয়েছে। ইচ্ছেও করে খুব।

বুড়োটা হড়হড়ে পদার্থটা তরল করে গোটাদুই রুটি গুড় আর জল দিয়ে মাখছে। দাঁত নেই, তবু জলে গুলে খাবে। খাওয়াটা এই বয়েসেই বাড়ে হরেনের বাবারও বেড়েছে। দিনরাত খাওয়ার গল্প। হরেনের বউ করে খুব বুড়োর জন্য। আলাদা হয়ে উঠে গেলে কষ্ট

হবে উভয়তই। বাবাকে কি নিজের কাছে নিয়ে যাবে হরেন? ভেবে আপন মনেই মাথা নাড়ে। নেওয়াটা ঠিক হবে না। কেন ঠিক হবে না তা অবশ্য ভেবে পায় না সে। নিজের ঘরবাড়ি, তার মায়া বড়-বড় সাংঘাতিক। বুড়ো মানুষ ঘরে হাগবে মুতবে। তা ছাড়া, হরেনের বউ-ই একটা জীবন করে গেল হরেনের বাপের জন্য। এবার অন্য ভাইয়ের বউরাও করুক। এসব ভেবেই হরেন আপনমনে মাথা নাড়ে।

নেত্য বা নিত্যগোপাল রসিদখানা হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলে—কথা তখনই পাকা হয় যখন জায়গাটা হয়ে গেল। ভাববেন না চৌধুরীমশাই, টাকা যখন আগাম বায়না নিয়েছি ভাবনা এবার আমার।

হরেন ওঠে। উঠতে-উঠতে বলে—পরের ভাবনা তো ভাবলেনই। আমি ভাবছি আপনার কথা। কত জমি আপনার তাঁবে। লাখোপতি থেকে আমার মতো অভাজন ধর্না দেয়। সকলেরই জোতজমি করে দেন আপনি! অথচ নিজের বেলায়—

নেত্য বা নিত্যগোপাল ভ্রূ কোঁচকায়। অমায়িক মুখে বলে—আমিও ভাবি। ভেবে-ভেবে কেটে যাক জীবনটা। আলাদা বাড়ি, আলাদা সংসার তার স্বাদই আলাদা। বউও বলে, খুব বলে। জলে-জলে হাত-পা হেজে মজে যায়, জায়েদের ছেলেপুলে টেনে কাঁখে ব্যথা, প্রলয় উনুনের ওপর বিশাল কুম্ভীপাকে রান্না করে-করে মাথাধরার ব্যামো, অম্বল। সবই বুঝি মশাই। কিন্তু মাথার মধ্যে এমন এক দাঁও মারার মতলব বাসা বেঁধেছে যে কী বলব।

আরও দু-চারটে কথা বলে হরেন চৌধুরী বেরোয়।

রকে এসে আবার মুড়িসুড়ি দিয়ে বসেছে। বুড়ো। হাতে বিড়ি। তাকে দেখে মুখ তুলে জিগ্যেস করে—ক'টা বাজে বাপ?

হরেন হাসে। ঘড়ি ঘড়ি টাইম জানা চাই, যেন কত অফিস বা সিনেমার বেলা বয়ে যাচ্ছে। ঠাট্টা করে বলে—টাইম জেনে কী হবে খুড়োমশাই? ইষ্টচিন্তা করুন।

—সময় কি ফুরিয়েছে বাপ?

হরেন হাসিটা গিলে বলে—বেলা তো ফুরিয়েই এল খুড়োমশাই।

—বেলা ফুরিয়েছে? বলে খুড়ো একটু থমকে চেয়ে থাকে। মুখখানা তুবড়ে অদ্ভুত দেখতে হয়। ঠোঁট দুটো ফোকলা হাঁয়ের মধ্যে কচ্ছপের মুখের মতো ঢুকে বেরিয়ে আসে। বুড়ো বলে—এটা কি বিকেল?

—তাই বটে।

—তবে যে মেজবউমা বড় চিঁড়ের জাউ খাওয়ালে? অ্যাঁ! জাউ তো আমি সকালে খাই। বৈকেলে আজ হালুয়া খাব বলেছিলাম যে? অ্যাঁ!

হরেনের একটু কষ্ট হয় বুকের মাঝখানটায়। বলে—খাবেন, তাই কি? খাওয়া কি একদিনের?

—চিত্ত সুজি এনে রেখেছিল, আমি নিজের চোখে দেখেছি। সে তাহলে ওই গর্ভস্রাবগুলোকে খাইয়েছে। বাপ ঝুব্বুস হয়ে বসে আছি, এখন কে আর দেখে আমাকে! চিঁড়ের জাউ আমার বেহান বেলায় খাওয়ার কথা—নেত্যর বউ কিছু খেয়াল রাখে না বাপ। সাত-সাতটা বউ ইয়ের কাপড় মাথায় তুলে দিনরাত্তির ছেলেগুলোকে গেলাচ্ছে। বিড়িটা ধরিয়ে দাও তো বাপ, হাত বড্ড কাঁপে—

হরেন চৌধুরী গয়েশের বিড়িটা ধরিয়ে দেয় যত্ন করে। একটু হেসে বলে—হিসেব সব মেলে খুড়োমশাই?

—হিসেব! কোন হিসেবের কথা বলছ?

এই যে আপনি গয়েশ সামন্ত, আপনার সাতটা ছেলে, সাত বউ, কত নাতি-নাতনি, তারপর এটা বেহান বেলা না সাঁজবেলা—এসব হিসেব?

বুড়ো বিড়িটা টেনে কাশতে-কাশতে গয়ের তোলে গলায়। হাঁপানির টান। বিড়ি খাওয়া বারণ নিশ্চয়ই, লুকিয়ে চুরিয়ে খায়। খাওয়াটা আসল।

—মেলে না বাপ ভুল পড়ে যায়। এই একটু আগে একজন কার খোঁজ করছিল।

—আমিই।

—হবে। বলে বিড়বিড় করে বলতে থাকে। হরেন কান পেতে শোনে। বুড়ো হিসেব মেলাচ্ছে—আমি হলুম গে গয়েশ সামন্ত...সামন্ত বাড়ি...বড় ছেলে চিত্ত, মেজো নিত্য, আরও কতকগুলো...

হরেন ঘড়িটা দেখে নিয়ে হাঁটা দেয়। রেললাইন বরাবর হেঁটে প্ল্যাটফর্মে ওঠে। পাঁচটা পাঁচে ট্রেন। সিগন্যাল দেয়নি এখনও। প্ল্যাটফর্মে কালো-কালো কিছু মেয়ে-পুরুষ আর বাচ্চা সংসার পেতে আছে। পোঁটলা, পুঁটলি, ইটের উনুন, কৌটোর মগ ছত্রাকার। উকুন বাছছে, ছেলে ঠেঙাচ্ছে, ঘুমোচ্ছে। বিশ-ত্রিশখানা রুটি রোদে শুকোতে দিয়ে একটা মেয়ে বসে কাক তাড়াচ্ছে। কেন যে রুটি শুকোয় এরা কে জানে! একটা বাচ্চা হামা দিয়ে এসে হরেনের জুতো ধরে ফেলেছে। হরেন ঠ্যাং টেনে নেয়। সংসারটার দিকে একটু চেয়ে থাকে। ভারী নিশ্চিন্ত হাবভাব, দুনিয়াজোড়া জমি ওদের। যেখানে সেখানে বসে যায়।

শীতের বেলা। রোদ মরে গিয়ে এ সময়টা বাতাসটা ভারী হয়ে ওঠে। মাটির ভাপ না ধোঁয়া মেঘের মতো মাটির ওপর। ওর ভারী বাতাস। দুঃখের শ্বাসের মতো জমে আছে পৃথিবীর ওপর।

সামন্তমশাই পাকা লোক। জমি একটা পেয়েই যাবে সুবিধে মতো। বর্ষার আগেই ভিত গেঁথে ফেলবে। ভারী একটা আনন্দ হয় হরেনের।

আবার কী জানি কেন রোদমরা বিকেলটার দিকে চেয়ে বুকটা হঠাৎ ঝাঁৎ করে ওঠে। কী একটা যেন মনে হয়, একটু ভয়-ভয় করে। বুকটায় বগড়ি পাখির মতো কী একটা গুরগুর করে ডাকে। পেটটা পাকিয়ে ওঠে।

ভিখিরিদের সংসার, প্ল্যাটফর্মের কৃষ্ণচূড়া গাছ, দূরের সিগন্যাল—এ সবের ওপর দিয়ে আকাশ আর জমির মাঝ-বরাবর একটা অদ্ভুত আলো-আঁধারি ঘনিয়ে আসছে। ট্রেন রেল-পুল পেরিয়ে আসছে। হরেন চৌধুরী গাড়ির শব্দটা ঠিক শুনতে পায় না। সেই আলো-আঁধারিটার দিকে অন্য মনে চেয়ে থাকে।

পুরোনো দেওয়াল

হাড় জিরজিরে রোগা ছেলের মতো ইঁট বের করা দেওয়ালের গলি। দু-পাশেই শুধু দেওয়াল, জানলা নেই, দরজাও না। গলিটা খুব নির্জন। জগদীশ নিশ্বাস টানলে গন্ধটা পায়। অত্যন্ত মৃদু মাটির গন্ধের সঙ্গে ভিজে শ্যাওলার গন্ধ। গন্ধটা মিষ্টি। শরীর অবশ করে নেওয়ার মতো আমেজ যেন গন্ধটার সঙ্গে মিশে থাকে। যেন এইখানে দাঁড়ালে অনেক পুরোনো কথাকে মনে পড়বে।

রোজ না, কিন্তু কখনও-কখনও সন্ধ্যাবেলা এই গলিটা দিয়ে হেঁটে আসতে জগদীশের গা-টা ছমছম করে। ভয় নয়, কেমন বিচিত্র একটা অনুভূতি। একটা টিমটিমে আলো গলিটার কোণে দাঁড়িয়ে জ্বলে। মাটির ওপর নিজের পায়ের শব্দটা অনেক বড় হয়ে তার কানে লাগে। গলিটাকে মনে হয়, একটা প্রাচীন প্রাগৈতিহাসিক গুহার মতো। নিজেকে মনে হয় কোন এক প্রাগৈতিহাসিক মানুষের মতো, যে অনেক রোদে পুড়ে, জলে ভিজে পরিশ্রান্ত হা-ক্লান্ত হয়ে হঠাৎ একটা অনাবিষ্কৃত আশ্রয়ের সন্ধান পেয়ে গিয়েছিল। এই সেই গুহা যেন। চোখ দিয়ে দেখা যায় না, কিন্তু যেন অনুভব করা যায়, দেওয়ালে বিচিত্র সব ছবি খোদাই করা। একটা পবিত্র শুষ্ক হাওয়া গুহাটার ভিতর খুব মৃদু হয়ে বইছে। আর কেবলই মনে হয়, যারা এই গুহাকে পিছনে ফেলে চলে গেছে, তারা আর ফিরে আসবে না। কেন তারা ফিরে আসবে না? জগদীশ ভাবে। তারপর মনে হয়, বোধহয় প্রিয়জনদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গেলে আর ফিরে আসতে নেই।

জগদীশের ইচ্ছে হয়, এইখানে হাঁটু গেড়ে বসে, যারা চলে গেছে তাদের মঙ্গলের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে। সত্যিই সে প্রার্থনা করতে বসে না, কিন্তু কথাটা মনে হলেই কেন যে সে নিজেই জানে না, তার কান্না পায়। তার ষোলো বছরের অপরিণত ছিপছিপে দেহটা সেই কান্নার আবেগে কাঁপতে থাকে, কুঁকড়ে যেতে চায়, আর তারপর গলার কাছে একটা দলা পাকানো দুঃখকে অনুভব করতে-করতে সে দৌড়তে আরম্ভ করে। গলির

শেষে বাঁ-দিকে মিত্তিরদের পোড়ো বাড়িটার উঠোনটা ডিঙিয়ে বাবুপাড়ায় ঢুকে পড়ার পর সে স্বস্তি পায়।

গোপালদার মনোহারী দোকানে একটা মস্তবড় হ্যাজাক জ্বলে। রাস্তাটা সেখানেই দুটো ভাগে ভাগ হয়েছে। আলোটা রাস্তাটার অনেকখানি পর্যন্ত উজ্জ্বল করে রাখে। এই আলোটা দেখলে বেশ ভালো লাগে, মোড়ের মাথায় কয়েকজন লোক দাঁড়িয়ে গল্প করে। গোপালদার দোকান থেকে মৃদু ধূপের গন্ধ বাতাসে ছড়িয়ে পড়তে থাকে, আর তখন শরীরে রাজ্যের ক্লান্তি অনুভব করতে-করতে জগদীশের বাড়ির কথা মনে হয়।

বিকেল বেলায় বাড়ি ফিরে আসাটা বিশ্রী। বিকেল বেলাতে যেন মাকে ভীষণ গম্ভীর আর রাগি বলে মনে হয়। যেন একটু ছুঁতে গেলেই মা ভীষণভাবে ধমকে দেবে। বোধহয় এ-সময়টাতে মা সাজগোজ করে থাকে বলেই ওরকম মনে হয়। ভাবতে-ভাবতে জগদীশ বাড়ি ঢুকল।

খিদে পেয়েছে। ভয়ংকর। কলতলার দিকে যেতে-যেতে জগদীশ চেঁচিয়ে বলল, খেতে দাও মা, খিদে পেয়েছে। মা কোথায় আছে না জেনে না ভেবেই সে চেঁচাল। বিকেল বেলা মাকে সাজগোজ করতে দেখলে ভালো লাগে না। সাজগোজ করলেই মায়েরা যেন গম্ভীর হয়ে যায়। কলতলার আবছা অন্ধকারটার দিকে তাকিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। তার মনে হল, সে মাকে খুব ভালোবাসে। খুব। হঠাৎ কেন যে কথাটা মনে হল তা সে বুঝতে পারল না। এমনি হঠাৎ-হঠাৎ কতকগুলো অদ্ভুত কথা মনে হয় যে, তার হাসি পায়। মগটা জলে ডুবিয়ে তারপর তুলে তারপর আবার ডুবিয়ে জলের গুরগুর শব্দটা শুনল সে।

সাবানটা কোথায়। অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না ভালো করে। সাবানটা হাতড়ে-হাতড়ে খুঁজতে-খুঁজতে সে ভাবল কত অদ্ভুত ইচ্ছেই যে মনে আসে।

এই ঘর জগদীশের। ঘরটা ছোট। একটা করে খাট, চেয়ার, টেবিল।

পা দুটোকে নিয়ে অস্বস্তি। টেবিলের তলা দিয়ে পা দুটো ভালো করে ছড়িয়ে দেওয়া যায় না—ওপাশের দেওয়ালে গিয়ে ঠেকে যায়। শরীরটাকে কিছুতেই একভাবে রাখা যায় না। শরীরটাকে মোচড়াতে ইচ্ছে করে, ভাঁজে-ভাঁজে ভাঙতে ইচ্ছে করে, আর একটা অস্থিরতা যেন ক্রমাগত বুকের আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়ায়। পড়ার বই খোলা থাকে, কিন্তু পড়তে ইচ্ছে করে না। তারপর হঠাৎ এক সময়ে ঘরটাকে শূন্য নিরর্থক মনে হয়। একটা কিছু যেন ঘটা উচিত, অথচ যা কিছুতেই ঘটছে না। একটা কিছু করা দরকার, কিছু একটা করতে হবে ভাবতে-ভাবতেই ঘুম এসে যায়। আর তারপর ঘুমে ঢুলতে-ঢুলতে

চেয়ার থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বিছানায় যেতে-যেতে সারাদিনের ভাবনাগুলো তালগোল পাকিয়ে ধোঁয়াটে হয়ে এক সময়ে স্বপ্ন হয়ে যায়। অদ্ভুত সমস্ত স্বপ্ন।

কে যেন তাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে দিয়ে গেল। ঘুম থেকে উঠে বুঝতে পারল না কে তাকে ডেকেছে। আবছা-আবছা গলার স্বরটা কানে ঢুকছিল, নিজের নামটা শুধু বুঝতে পারছিল। রাত বেশ হয়েছে, খেতে যেতে হবে। ঘুম থেকে উঠে উঠোন রান্নাঘরে খেতে যেতে একদম ইচ্ছে করে না। বরং রাগ হয়। বাড়ির সকলের ওপর রাগ করতে ইচ্ছে হয়। কী দরকার ছিল ডাকবার! এক রাত না খেয়েও বেশ থাকা যেত।

বাঁ-পাশে বাবা, ডান পাশে মিন্টু, বেবী সামনে, জলচৌকির ওপর মা বসে। একটা হারিকেন মেঝেতে রাখা। কালি পড়ে হারিকেনটা আবছা হয়ে এসেছে বলে কিংবা সদ্য ঘুম থেকে উঠে এসেছে বলে কারুর মুখ ভালো করে দেখতে পাচ্ছে না জগদীশ। রান্নাঘরের দেওয়ালে তাদের মস্ত মস্ত ছায়াগুলো দুলছে, কাঁপছে। জগদীশের মনে হল যেন তারা সবাই—বাবা, সে, পিন্টু, বেবী, সানাই মাকে ঘিরে বসেছে একটা গল্প শুনবে বলে। তারা সবাই উদগ্রীব হয়ে আছে মা গল্পটা বলতে-বলতে হঠাৎ থেমেছে—এক্ষুনি শুরু করবে।

জিভে কোন স্বাদ পাচ্ছে না সে। পাতে ক'টা তরকারি, তাও যেন গুনতে ইচ্ছে করছে না। বিশ্রী লাগছে।

—আর দুটি ভাত দেব তোকে? মা বলল।

—না, খিদে নেই।

—বাইরে থেকে কী সমস্ত ছাইপাঁশ খেয়ে আসিস, রাতে তাই খেতে পারিস না।

পিঁড়িটা ঠিকমতো মেঝেতে বসেনি। ঠক-ঠক করে শব্দ হচ্ছে। সামনের দিকে ঝুঁকে ভাত তুলতে গেলে শব্দ হচ্ছে ঠক, পেছন দিকে হেলে মুখের গ্রাসটাকে গিলতে গেলে ঠক-ঠক, ঠুক-ঠাক ঠুক...

—শান্ত হয়ে বসে খেতে পারো না? বাবার গলাটা ভারী আর গম্ভীর। পোড়ো কেরোসিনের গন্ধটা বিশ্রী লাগল জগদীশের। সে খাওয়া বন্ধ করল। পিন্টু বেবীকে কি যেন ফিসফিস করে বলল। বেবী শব্দ করে হাসল। ওরা এত রাত পর্যন্ত জেগে আছে কী করে —জগদীশ ভাবল।

ভাত খেয়ে উঠবার পর ঘুমটা যেন কোথায় পালিয়ে যায়। আর যেন ঘুম আসবে না। অথচ শুতে হবে, রাত জাগা চলবে না। নরম বিছানা, সাদা চাদর। জগদীশ হারিকেনের কল ঘুরিয়ে সলতেটাকে কমিয়ে দেয়। ঘরটা প্রায় অন্ধকার।

এই ঘরে যেন একটা উৎসবের গন্ধ লেগে আছে। যেন অনেকদিন আগে এইখানে এক বিত্তশালী সুখী পরিবার থেকে গেছে। বাইরে অন্ধকার জমাট। এপাশে-ওপাশে বাড়িগুলো নিঃশব্দ হয়ে গেছে। আর ঠিক এই সময়ে হালকা তন্দ্রার মধ্যে অস্পষ্টভাবে জগদীশের মনে হয়, এইখানে সে অনেকদিন আগে একবার এসেছিল। বাড়িটা বেশ বড়। প্রত্যেক ঘরের ছাদে আর দেওয়ালে পুরোনো আমলের অদ্ভুত সব নকশা কাটা। আগের দিনের বড়লোকদের বাড়ির মতোই। এখন এত বড় বাড়িটায় তারা কয়েকজন মাত্র মানুষ—পুরো বাড়িটা যেন খাঁ-খাঁ করে। কিন্তু অনেক বছর আগে এখানে একটা মস্ত পরিবার থাকত। অনেক টাকা ছিল তাদের আর অনেকগুলো ছেলেমেয়ে। ছেলেমেয়েগুলো হাসিখুশি মোটাসোটা ছিল! মেয়েগুলো ছিল খুব সুন্দরী। খুব ফরসা, গোলগাল, লম্বাটে ডিমের মতো মুখ, একটু পুরু লাল ঠোঁট, অসাবধানে এসে পড়া একটু লালচে আভার চুলগুলো তাদের সাদা কপালের ওপর খেলা করত।...ভাবতে-ভাবতে হঠাৎ এক সময়ে থামে জগদীশ। ঠিক এরকম মেয়ে যেন সে কোথায় দেখেছে। কোথায় দেখেছে যেন। হ্যাঁ, মনে পড়েছে। রাখী আর পাখি। রথতলার মেলার মাঠটা ছাড়িয়ে যেতে সেই নিঃশব্দ প্রকাণ্ড জমিদার বাড়িটাকে তারা বহুবার সবিস্ময়ে দেখেছে। রাখী আর পাখি ও বাড়ির মেয়ে। ওরা বড়লোক, গাড়ি করে স্কুলে আসে। বেবী স্কুলে ভরতি হওয়ার পর বহুবার রাখী আর পাখির গল্প তাদের সবাইকে শুনিয়েছে। ওরা আজে বাজে মেয়ের সঙ্গে মেশে না, রোজ টিফিনে বাড়ি থেকে চাকর ওদের খাবার নিয়ে আসে, প্রত্যেকবার ছুটিতে ওরা বাইরে বেড়াতে যায় রিজার্ভ করা গাড়িতে। এমনি আরও কত কী। বেবীটা বাড়িয়ে বলে, সত্যিই কি আর ওদের অত দেমাক! জগদীশ তো দেখেছে ওদের।

রোদটা সোজা হয়ে নেমেছে। ভেতরকার ছায়া ছায়া অন্ধকার আর নেই—গলিটাকে এখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। উঁচু হয়ে থাকা ইটগুলোর খাঁজে-খাঁজে ছায়া আলো দিয়ে তৈরি অদ্ভুত নকশা। বাইরে এখন গরম ধুলো ওড়া বাতাসের ঝাপটা, কিন্তু এই গলিটার ভেতরটা ঠান্ডা। দেওয়াল দুটো দু-ধারে অনেক উঁচু। বাতাস ঢুকতে পারে না এই গলিটায়, তাই বোধহয় ঠান্ডা। পায়ের নীচে মাটিটা স্যাঁতস্যাঁতে। এখন এই গলিটাকে ঠিক গির্জার মতো দেখাচ্ছে। গির্জার মতো পবিত্র, শান্ত ঠান্ডা। গির্জার মতো মস্ত বড় আর উজ্জ্বল। ধারে কাছে কেউ নেই। কেউ আসে না। জগদীশ মাটির ওপর বসল দেওয়ালে ঠেস দিয়ে। একটা ইঁদুর অত্যন্ত দ্রুত গতিতে কোথা থেকে যেন ছুটে এল। কয়েক সেকেন্ড দাঁড়াল

তারপর চকচকে সরু লেজটাকে বর্শার ফলার মতো পেছনের দিকে উঁচিয়ে রেখে খুব তাড়াতাড়ি চলে গেল। ইঁদুরটা বেশ আছে জগদীশ ভাবল।

এখন ভর-দুপুর। ওপর দিকে তাকালে দেখা যায় আকাশটা জ্বলছে। দুপুরটা ঝিমঝিম করছে চারধারে। জগদীশ ভাবল তার ঘুম পাচ্ছে, নেশার মতো ঘুম। আচ্ছন্ন বা। সে যেন একা। ভীষণ একা। দেওয়ালে অনেকগুলো শুঁয়োপোকা জড়াজড়ি করে আছে। জগদীশ তাকিয়ে রইল। বহু পুরোনো একটা ছবিকে তার মনে পড়ছে। যখন আরও ছোট ছিল সে তখন এই ছবিটাকে সে বোধহয় মনে মনে তৈরি করে নিয়েছিল। ঠিক ছবি নয়—খানিকটা কল্পনা আর খানিকটা স্বপ্নের মিশেল। তার চারদিকের এখানকার চেহারাটা সেই পুরোনো ছবিটাকে তার মনে জাগিয়ে তুলছে। একটা অস্পষ্ট, গম্ভীর অথচ স্থির ছবি। একটি মেয়ে, তার লাল চুল, নীল চোখ, বাদামি ঠোঁট। আর একটা গির্জার অভ্যন্তর, লম্বা জানলা, গোল খিলান, কাচের শার্সি মোমবাতি। সে যেন হাঁটু গেড়ে মোমবাতি-জ্বলা বেদিটার সামনে বসে আছে। মেয়েটি তার কানে কানে খুব কাছ থেকে প্রার্থনার মন্ত্র বলে দিচ্ছে। সে তার গায়ের মিষ্টি কোমল গন্ধ পাচ্ছে। ঘুমে তার চোখ ঢুলে আসছে। মেয়েটা গানের সুরের মতো কথা বলছে। আরও। কী বলছে ও? আর কেনই বা বলছে! কাচের শার্সিটার বাইরে শেষ বেলার সূর্য ডুবে যাওয়া ম্লান ছাই ছাই আলো। জগদীশ চাইছে মেয়েটা আরও কাছে আসুক। সে তাকে স্পর্শ করুক।

কী বিষণ্ণ এই ছবি! জগদীশ ভাবল। ছবিটাকে তার ভালো লাগে না। কিন্তু ছবিটা আছে। থাকবে। কতদিন থাকবে কে জানে! হয়তো আজীবন। জগদীশ জানে না। সন্ধেবেলা বাতি না জ্বালিয়ে পড়ার ঘরে একা-একা বসে থাকলে এই ছবিটাকে মনে পড়ে। মনটা বিষণ্ণ উদাস হয়ে যায়। ছবিটা কখনওই সত্যি হয়ে আসবে না জগদীশ সেটা বুঝতে পেরেছে বড় হয়ে।

এই গলিটা অনেক পুরোনো কথাকে মনে করিয়ে দেয়। বোধহয় ভিজে মাটি আর শ্যাওলার ভারী গন্ধ আর পলেস্তারা খসে যাওয়া পুরোনো দেওয়ালগুলোর জন্যই ওরকম হয়। এখানে এসে বসলেই মনে হয় যেন এখানে সে আর নেই, সে যেন অনেক পুরোনো দিনগুলোয় ফিরে গেছে। এই দেওয়ালগুলোর যদি প্রাণ থাকত কিংবা প্রাণ আছে একথা যদি জগদীশ বিশ্বাস করতে পারত তবে বেশ হত। ছেলেবেলায় সে যখন প্রথম পড়েছিল যে উদ্ভিদের প্রাণ আছে তখন কথাটা তার ভালো লেগেছিল। ঠাকুমাকে বলতেই ঠাকুমা বলেছিলেন শুধু উদ্ভিদ কেন পাথর পাহাড় নুড়ি, এ সব কিছুরই প্রাণ আছে, সুখ-দুঃখ আছে, ভালোমন্দের অনুভূতি আছে। ঠাকুমার কথাটা তার বিশ্বাস হয়েছিল। অনেক বাধা পেয়ে, ঘা খেয়েও সেই বিশ্বাসটা মনের কোণে তলিয়ে থিতিয়ে অনেকদিন পর্যন্ত বেঁচে

ছিল। তারপর আস্তে-আস্তে কেমন করে সে নিজেই জানে না সেই বিশ্বাসটা হারিয়ে গেল। ঠাকুমারা মরে গেলেই কিংবা হয়তো বয়স বাড়লেই এই অদ্ভুত বিশ্বাসগুলো ভেঙে যায়। কিন্তু এই বিশ্বাসগুলো যখন ভেঙে যায় তখন ভালো লাগে না, মন খারাপ লাগে। যেন অনেক দিনের পুরোনো বন্ধুরা আমাদের ছেড়ে যাচ্ছে এরকম মনে হয়। মন তখন যেন চায় এই বিশ্বাসগুলো আবার চুপিচুপি ফিরে আসুক। সে বিশ্বাস করতে পারুক যে এই দেওয়ালগুলো, এই মাটি, ওই মিত্তিরদের ভাঙা পোড়ো বাড়িটার ভেতরেও প্রাণ আছে। ওদেরও যেন প্রিয়জন আছে যারা চলে গেলে ওরা দুঃখ পায়। সেই প্রিয়জনদের কথা ওরা জগদীশকে বলুক।...এই কথাগুলো ভাবতে-ভাবতেই যেন জগদীশ নিজের কাছে নিজেই লজ্জা পেল। ছটফট করে উঠে দাঁড়াল। বিকেল হয়ে আসছে এক্ষুনি মাঠে যেতে হবে। দল বেঁধে তাকে খুঁজতে এসে বোধহয় ফিরে গেছে বন্ধুর দল।

সন্ধ্যাবেলা রত্না এল। রত্না বেবীর চেয়ে একটু বড় আর জগদীশের চেয়ে দু-এক বছরের ছোট। কাছাকাছি বাড়ি, কিন্তু রত্না যে রোজ আসে তা নয়। কেন যে আসে না তা জগদীশ জানে না। আগে কিন্তু আসত।

হারিকেনটা উজ্জ্বলভাবে জ্বলছিল। রত্নাকে শাড়ি পরতে এর আগে দেখেনি জগদীশ। নীল রঙের ফ্রকটাকে ব্লাউজের মতো নীচে পরেছে, তার ওপর নীল শাড়ি। চেনা রত্নাকে অচেনা মনে হচ্ছে।

এই, বেবী কোথায় রে? রত্না জিগ্যেস করল। খুব ভালো করে জগদীশের দিকে না তাকিয়েই জিগ্যেস করল। ওর মুখটা লাল লাল। গলার স্বরটা ক্ষীণ। লজ্জার সুরে কাঁপল, তারপর কাঁপতে-কাঁপতে বাতাসের শরীরের সঙ্গে মিশে গেল এবং তারপরেও যেন কাঁপতে লাগল।

—কেন, বেবীকে দিয়ে কী হবে? জগদীশ অনেকক্ষণ পরে বলল।

—তা দিয়ে তোর দরকার কী! ভারী সর্দার হয়েছিস আজকাল।

—হয়েছিই তো। জগদীশ হেসে-হেসেই বলল।

—থাক, তোকে বলতে হবে না। আমি মাসিমার কাছে যাচ্ছি।

—না, মাও জানে না বেবী কোথায় আছে। শেষ কথাটা কানে নিল না রত্না। রত্না ঘুরে দাঁড়াল। দরজার দিকে। এক পা এগোল। জগদীশ কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। একটা কিছু করা দরকার না হলে ও চলে যাবে।

জগদীশ বলল,—দাঁড়া, এইখানে বোস। আমি বেবীকে খুঁজে আনছি।

—ইশ। দাঁড়াব না, আমাকে মীরাদের বাড়ি যেতে হবে।

—বুঝতে পেরেছি, শাড়িটা দেখাতেই এসেছিলি, বেবীকে খুঁজতে নয়।

রত্না শরীরটাতে একটা মোচড় দিল। ঘুরে একটু রুখে-দাঁড়ানো ভঙ্গিতে মাথাটা সোজা করে চোখের কোণ দিয়ে জগদীশের দিকে তাকাল। এই ভঙ্গিটা তার চেনা। ছেলেবেলায় খেলতে-খেলতে রেগে গেলে জগদীশের দিকে অমনি ভাবে রুখে দাঁড়াত রত্না। ভঙ্গিটা দেখে জগদীশ বরাবর হয়তো, ভয় পেত না।...কিন্তু আজ রত্নাকে অচেনা মনে হচ্ছে। যেন নতুন কোনও মেয়ের সঙ্গে এই প্রথম আলাপ হচ্ছে তার। জগদীশ ভয় পেল যেন। বুকের কাছটা একটু কাঁপল। দৃষ্টিটা পিছলে নামল যেখানে শার্টিনের নীল রঙের ফ্রকটা বুকের কাছে সামান্য একটু টাল খেয়েছে। শাড়ির ওপর থেকেও বোঝা যায়। জগদীশ মেঝের দিকে তাকাল।

জগদীশ চোখ না তুলেও বুঝতে পারল রত্না হাসছে। খুব মৃদু সে হাসিটা। হাসিটা অদ্ভুত—যেন অনেক কথা ওই হাসিটার ভেতর বলা থাকে কিন্তু সেগুলো যে কি তা জগদীশ বুঝতে পারে না। রত্নার পায়ের শব্দটা এগিয়ে এল। জগদীশ মুখ তুলল।

রত্না হাসছে না। রত্না ভীষণ গম্ভীর।

জগদীশ তাকাল। তাকিয়ে রইল।

রত্না বলল,—লজ্জা করল না ও কথা বলতে? বাঁদর কোথাকার!

জগদীশ ভীষণ অবাক হল। হঠাৎ কোথা থেকে এত সাহস পেল রত্না। জগদীশের হাত দুটো নিসপিস করে উঠল। দাঁতে দাঁত চাপল জগদীশ। আর একটা কিছু বললেই...। কিন্তু তবু কেন যেন মনে হচ্ছে রত্না তার চেয়ে ঢের-ঢের বড় হয়ে গেছে। যেন রত্নার কাছে সত্যিই সে ছেলেমানুষ। ও এত বড় হয়ে গেল কেমন করে? নিজেকে খুব অসহায় লাগল তার। কিছু একটা করতে হবে ভেবেও সে চুপ করে বসে রইল। না, রত্নার গায়ে হাত দেওয়া যায় না। ওকে অনেক বড় মনে হচ্ছে। বড় মেয়েদের গায়ে হাত দিতে নেই। ওর বেণী দুটো সামনের দিকে ছাড়া রয়েছে। ইচ্ছে করলে জগদীশ ওই বেণী দুটোতে হ্যাঁচকা টান দিয়ে ওকে শিক্ষা দিতে পারত। কিন্তু কেন যেন জগদীশের ইচ্ছে হল না।

রত্না চলে গেল না। দাঁড়িয়ে রইল। অনেকক্ষণ। জগদীশ অবাক হলেও কথা বলল না। রত্না ওর বেণী দুটো নিয়ে নাড়া চাড়া করল কিছুক্ষণ। তারপর হাসল। সেই অদ্ভুত হাসিটা

—যেন অনেক কথা ওই হাসিটার ভেতর বলা থাকে, কিন্তু সেগুলো যে কি তা জগদীশ বুঝতে পারে না। জগদীশ চুপ করে রইল।

—কীরে কথা বলছিস না যে! রত্না বলল।

—এমনিই।

—ইস এমনি বইকি! নিশ্চয়ই তুই—

রত্নার চোখের দিকে এবার স্পষ্ট করে তাকাল জগদীশ। রত্না যেন ভীষণ অবাক হয়েছে। খুব বড়-বড় চোখে তার দিকে তাকিয়ে সেই অদ্ভুত হাসিটা হাসছে রত্না। অবাক হওয়ার সঙ্গে সব বুঝে ফেলেছি ধরনের একটা ভাব। জগদীশ ভাবল, বোধহয় রত্না আশা করেছিল যে সে রেগে যাবে। রেগে গিয়ে ঠিক আগের মতোই ওর বেণী ধরে টেনে কিংবা হাত মুচড়ে দিয়ে কিংবা চড় মেরে শোধ নেবে জগদীশ। কিন্তু তা করেনি বলেই যেন অবাক হয়েছে ও। কিন্তু ওতো জানে না ওকে আজ কতো বড় আর অস্পষ্ট দুর্বোধ্য মনে হচ্ছে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে রত্না বলল, বোকার মতো মুখ করে বসে আছিস কেন?

জগদীশ চুপ করে রইল। রত্না এগিয়ে এল আর তারপর জগদীশের চেয়ারের মুখোমুখি খাটের একপাশে খুব সন্তর্পণে বসল।

ইস, রাগ হয়েছে বাবুর। রত্না আবার বলল। জগদীশ খুব স্পষ্টভাবে একটা সুগন্ধ পেল। পাউডার স্নো আর বোধহয় তেলের গন্ধ। গন্ধটা চেনা। তবু যেন জগদীশ অস্বস্তি বোধ করল। কেমন যেন সঙ্কোচে জড়সড়ো হয়ে বসল সে। রত্নাটা এত কাছাকাছি এসে বসেছে যে ওর দিকে ভালো করে তাকাতে পারছে না জগদীশ।

যেন খুব গোপন একটা কথা কানে-কানে বলবে এইভাবে মুখটা জগদীশের কাছে এগিয়ে আনল রত্না। রত্নার মুখটা খুব কাছাকাছি যেন তাকে ছোঁয়-ছোঁয়। জগদীশ একটা ঠান্ডা ভয়কে তার মেরুদণ্ড বেয়ে নেমে যেতে অনুভব করল। কেমন জ্বালা করল বুকটা। বুকটা জ্বালা করল আর কাঁপতে লাগল। রত্নার মুখটা হাসি-হাসি। রত্না বলল—এই, একটা কথা বলবি?

নিজের মুখটা দূরে সরিয়ে নেওয়ার জন্য একটু পেছন দিকে হেলে জগদীশ প্রায় অস্ফুট স্বরে বলল—কী?

রত্না বলল—কাছে আয় না, অমন হেলছিস কেন?

হারিকেনটা বড় বেশি উজ্জ্বল হয়ে জ্বলছে। জগদীশ ভাবল। আলোটা আরও কম হলে —আরও কম হলে কী যে হত সে ভেবে পেল না। রত্নার মুখটা লাল-লাল। যেন কী একটা কথা নিয়ে মনে-মনেই ও লজ্জা পাচ্ছে। জগদীশ সামনের দিকে সামান্য একটু ঝুঁকল! প্রায় কাঁপা গলায় বলল—কী বলছিস বল না।

—ঠিক বলবি তো?

—হ্যাঁ।

—আজকে—আজকে আমায় কী রকম দেখাচ্ছে রে!

জগদীশের হঠাৎ হেসে উঠতে ইচ্ছে করল। খুব জোরে। হাসিটাকে সে বুকের ভেতর অনুভবও করল, কিন্তু কিছুতেই সেটা ঠোঁটে এলো না। হাসিটা বুকের ভেতরই কাঁপতে-কাঁপতে মরে গেল। জগদীশ উজ্জ্বল চোখে রত্নার দিকে তাকাল। যেন রত্না তাকে অনেক সম্মান দিয়েছে। এই যেন প্রথম নিজের মূল্য বুঝতে পারল জগদীশ। জগদীশ খুশি হল। সঙ্গে-সঙ্গে তার মনে হল—রত্নাটা কী ছেলেমানুষ!

কিছু একটা বলতে গিয়েও থেমে গেল জগদীশ। বারান্দায় পায়ের শব্দ। মা আসছে। মার পায়ের শব্দটা জগদীশের চেনা। একটু যেন চমকে উঠল জগদীশ। অথচ চমকানোর কোনও দারকারই ছিল না, কেন না সে এমন কিছু করছে না যে—। মনে-মনে তার নিজের ওপর রাগ হল। সে কিছুই বলল না রত্নাকে।

—একী, রত্না কখন এলি? ঘরের দরজা থেকেই মা জিগ্যেস করল।

—এই মাত্র। রত্নার উত্তর।

কী মিথ্যুক—জগদীশ মনে-মনে ভাবল। মিথ্যে কথা বলবার কোনও দরকার ছিল কি রত্নার! ও তো অনেকক্ষণ এসেছে;—সেকথা বললেই বা কী হত।

মা ঘরে এল। হাতে এক রাশ ধোয়া শুকনো জামাকাপড়। সেগুলো আলনায় ভাঁজ করে রাখবার জন্য এগিয়ে যেতে-যেতেই মা রত্নাকে বলল—তুই ও ঘরে যা, আমি আসছি।

রত্না চলে গেল। যাওয়ার সময় দরজা থেকে ঘুরে জগদীশের দিকে তাকাল। ওর তাকানোর মধ্যে একটু হাসি ছিল। জগদীশ ভাবল।

মার মুখটা গম্ভীর, রাগ-রাগ। রোজ এই সময়টাতে যেন মাকে ভীষণ রাগি আর গম্ভীর বলে মনে হয়। যেন একটু ছুঁতে গেলেই মা ধমকে দেবে। বিকেলবেলা গা ধুয়েছে মা। সাবানের মৃদু গন্ধ। খোঁপাটা পরিপাটি করে বাঁধা, পরনের শাড়িটা ধপধপে পরিষ্কার।

এইরকম সাজপোশাকে মাকে যেন ভালো লাগে না, যেন মা-মা মনেই হয় না। যেন অন্য বাড়ি থেকে কোনও ভদ্রমহিলা বেড়াতে এসেছে। কাজ করতে-করতে যখন মার চুল এলোমেলো হয়ে যায়, কাপড়টা নোংরা আর হলুদের ছোপধরা হয়, আর মুখে ঘাম জবজব করতে থাকে, তখন যেন মাকে ভীষণ ভালো লাগে, আদর করতে ইচ্ছে হয়। বারবার মনে হয় মার বোধহয় খুব কষ্ট হচ্ছে কাজ করতে। বোধহয় মা'র কষ্টের জন্যেই তখন মাকে অত ভালো লাগে।

মা জগদীশের দিকে তাকাল। বলল,—তুই পড় না। রাতদিন বসে-বসে কী যে ভাবিস ছাইভস্ম।

—মা, তুমি আমার কাছে একটু বসবে? জগদীশ বলল।

—কেন রে!

—এমনিই। ভালো লাগছে না। বোসো না।

—বসবো কী করে, ও ঘরে রত্না বসে আছে একা-একা।

—কেন, বেবী আসেনি?

—কোথায়, দেখছি না তো। তার তো আড্ডার শেষ নেই।

—তাহলে রত্নাকেও এই ঘরে ডাকো।

মা কেমন যেন অদ্ভুতভাবে তাকাল আমার দিকে। যেন হঠাৎ আমাকে নতুন করে দেখছে মা। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না, তবুও জগদীশের মনে হল মার মুখটা যেন বদলে গেল। মা খুব গম্ভীর হল। মা খুব আস্তে বলল,—না। তুমি পড়ো।

মা চলে গেল।

নিজেকে ভীষণ বোকা বলে মনে হল জগদীশের। মাকে যেন সে বুঝতেই পারল না। তারপর আস্তে-আস্তে সে অনুভব করল যে, একটা বিরক্তি মেশানো ক্ষোভ আর লজ্জা তার মন জুড়ে বসেছে। তার রাগ হল। ইচ্ছে হল একটা কিছু ছুড়ে ভেঙে ফেলে রাগটা মেটায়। তারপর কেমন একটা হতাশায় ভেঙে পড়তে-পড়তে সে টেবিলের ওপর দু-হাত রেখে মুখ গুঁজল। একবার ইচ্ছে হল এ ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। বারান্দায় কিংবা ও ঘরে। তারপর একটা সঙ্কোচ এল। না, যাওয়া যায় না। একটা যেন অলিখিত অকথিত আইন আছে। সে আইনটা আঙুল উঁচিয়ে বলল, না তুমি যাবে না। সে অনুভব করল, খানিকটা স্বাধীনতা সে

হারিয়ে ফেলেছে। বুকটা জ্বালা করছে। আজকের বিকেলটা যেন খুব ভালো হতে গিয়ে খুব খারাপ হয়ে গেল।

জগদীশ ভেবেছিল রত্না চলে গেছে। কতক্ষণ সে ঘুমিয়েছিল তা সে জানে না। খুব বেশিক্ষণ নয় নিশ্চয়ই। পিঠে কিল খেয়ে উঠে দেখল, রত্না। রত্না হাসছে।

পিঠে হাত বোলাতে-বোলাতে জগদীশ বলল,—মারলি কেন?

—এমনিই।

—হাসছিস কেন?

—এমনিই।

—তোকে মারলে কেমন হয়?

—ইল্লি। মারা এত সোজা!

রত্না ঘুরে দাঁড়াল। রত্না চলে যাবে। দরজাটা খোলা। হারিকেনটা উজ্জ্বলভাবে জ্বলছে। জগদীশের মনে হল রত্নার সঙ্গে কার যেন মিল আছে। ঘুরে দাঁড়ানোর ভঙ্গী আর হাসিটার সঙ্গে কার যেন মিল আছে। কার? কেন জানে! কে জানে কেন শরীরে কাঁটা দিল তার!

—কালকে সকালে আবার আসব আমি। বেবীকে থাকতে বলিস। বলতে-বলতে দরজার চৌকাঠের ওপাশে একটা পা বাড়াল রত্না।

—দাঁড়া, তোকে একটা কথা বলা হয়নি। জগদীশ তাড়াতাড়ি বলল।

—কী?

—রাখী আর পাখিদের চিনিস?

—হ্যাঁ। কেন?

—তোকে দেখতে ঠিক রাখির মতো লাগছে। কেন যেন হঠাৎ কথাটা বলল জগদীশ তা সে নিজেই বুঝল না।

রত্না বলল, যা।

রত্না লাল হল একটু, যেন খুশি হল। তারপর একটু কী যেন ভেবে নিয়ে বলল—রাখীর বিয়ে, জানিস?

জগদীশ চমকে উঠল। কথা বলল না, বলতে পারল না। রত্না নিজেই আবার বলল,—এ মাসের সাতাশে।

—তুই কী করে জানলি? জগদীশ অবিশ্বাসের সুরে বলল।

তার বুকের ওপর দিয়ে খুব ভারী পায়ে কে যেন মাড়িয়ে গেল! বুকটা মোচড় দিল, তারপর শূন্য হয়ে গেল। দম বন্ধ হয়ে আসছিল। খুব জোরে চিৎকার দিতে গিয়েও পারল না সে। সে যেন মরে যাচ্ছে আর মৃত্যুর অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যে দিয়েও সে যেন দেখতে পাচ্ছে তার চারপাশে অনেক লোক। তাদের মুখগুলো দেখা যাচ্ছে না। তারা সব অশরীরী মূর্তির মতো নিঃশব্দে তার চারপাশে ঘুরছে ফিরছে, আর চাপা গলায় কথা বলছে। কী এত কথা ওদের। কোথা থেকে যেন মৃদু আর গভীর নীল আলো ঘরটার মধ্যে এসে পড়েছে। ঘরটা ভীষণ ঠান্ডা। কে যেন খুব কাছে এল আর চাপা গলায় তাকে জানাল যে, তার মা-ও মরে গেছে। জগদীশের ভীষণ কান্না পেল। কিন্তু সে কাঁদতে পারছে না। তার দম বন্ধ হয়ে আসছে। দরজা খুলে কারা যেন ঢুকল একটা দেহকে বহন করে নিয়ে। জগদীশ টের পেল ওই দেহটা তার মার। মা মরে গেছে। ওরা মার দেহটা ঠিক তার পাশেই শুইয়ে রাখল। জগদীশ ভাবল, তার যেন বিশ্বাস হল মা আবার বেঁচে উঠবে। ঠাকুমা যখন মরে গিয়েছিল তখনও জগদীশ ঠিক এ কথাটাই ভেবেছিল, ঠাকুমা নিশ্চয়ই বেঁচে উঠবে আবার। যেমন করেই হোক। কিন্তু ঠাকুমা বাঁচেনি। তার শিয়রে বসে কারা যেন কাঁদছে। জগদীশ চোখ তুলল। রাখী আর পাখি। আর তার পায়ের কাছে বসে রত্না। ওরা সবাই কাঁদছে। জগদীশ একটুও অবাক হল না। যেন সে এরকমটাই ভেবেছিল। জগদীশের কান্না পাচ্ছে। যেন কাঁদতে পারলেই সব দুঃখ জুড়িয়ে যাবে। কিন্তু কে যেন তার গলাটা চেপে ধরে আছে। কিছুতেই সে কাঁদতে পারছে না। রাখী-পাখি-রত্না তার দিকে তাকিয়ে আছে। ওরা জগদীশকে মরে যেতে দেখছে। জগদীশ দাঁতে দাঁত চাপল। সে মরবে না, কিছুতেই না...

ঘুম ভেঙে তড়বড় করে উঠে বসল জগদীশ। গলা শুকিয়ে কাঠ। বুকটা ধড়ফড় করছে। হ্যারিকেনটা তেমনি জ্বলছে। বইগুলো খোলা। জগদীশ উঠে দাঁড়াল। খুব আশ্বস্ত হয়ে সে অনুভব করল, মা-বাবা-পিন্টু-বেবী সবাই জেগে আছে। বেঁচে আছে। এখনও খাওয়ার ডাক পড়েনি।

মা ডাকছে। জগদীশ উত্তর দিল না। মা এ ঘরে এল,—ওমা, তুই জেগে আছিস। আমি ভাবলাম বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছিস। খেতে যাবি না!

—হুঁ।

—আয়, সবাই বসে আছে তোর জন্যে।

—তুমি আমার কাছে এসো একটু।

মা কাছে এল,—কেন রে; শরীর-টরীর খারাপ নয় ত'?

জগদীশ মাকে ছুঁলো। মাকে খুব ভালো লাগছে। মা বেঁচে আছে। মা হাসছে।

জগদীশ মার কাঁধে মুখটা গুঁজে দিল,—মা, মা, মা, মাগো, মামণি গো।

তার চোখে জল এল হঠাৎ। কেন যে কান্না পাচ্ছে তার, তা সে বুঝতে পারল না। কান্নাটা বুক ছাপিয়ে, গলা ছাড়িয়ে, শিরায় শিরায় আলোড়ন তুলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। গলাটা বুজে আসতে চাইছে।

—কী হল তোর হঠাৎ?

জগদীশ কথা বলতে পারল না। জগদীশ কান্নাটাকে প্রাণপণে চেপে রাখল।

*

দুপুর। ঘরটা বিশ্রী গরম। ঘর থেকে জগদীশ বাইরে এল। তারপর আস্তে-আস্তে হাঁটতে শুরু করল।

মিত্তিরদের নির্জন পোড়ো ভিটেটা প্রায় নিঃশব্দে ডিঙিয়ে গলিটার ভেতর এসে দাঁড়াল সে। মাটির ওপর বসল দেওয়ালে ঠেস দিয়ে। একটা নরম ঠান্ডা মৃদু বাতাস যেন তাকে আলতোভাবে জড়িয়ে ধরল। খুব ভালো লাগল তার। দুপুরের রোদ্দুরটা চোখ রাঙিয়ে তাকে শাস্তি দিতে চেয়েছিল। গলিটা স্নেহশীলা ঠাকুমার মতো, মায়ের মতো তাকে আগলে নিল। দুপুরটা গলির বাইরে দাঁড়িয়ে শাসাচ্ছে!

জগদীশ চুপ করে বসে রইল। জগদীশের মনে হল এই দেওয়াল দুটো একদিন ভেঙে পড়বে, কিংবা কেউ এসে ভেঙে ফেলবে। কোন কিছুই চিরকাল থাকে না। থাকবে না। যেদিন এ দেওয়াল দুটো ভেঙে পড়বে সেদিন জগদীশ খুব দুঃখ পাবে, খুব কষ্ট হবে তার। এই দেওয়াল দুটো তাকে অনেকদিন আশ্রয় দিয়েছে, শান্তি দিয়েছে। পোষা কুকুরছানা মরে গেলে সকলের সামনে কাঁদতে না পেরে এইখানে এসে কেঁদেছে ছেলেবেলায়। কতবার ডাঁশা পেয়ারা, কাঁচা আম কিংবা মা-বাবার চোখের বিষ তার ধনুকটা ছেলেবেলায় এইখানে এসে লুকিয়ে রেখেছে সে। কেউ টের পায়নি। এই দেওয়াল দুটো তার বিশ্বস্ত আত্মীয়ের মতো, সমবয়স্ক বন্ধুর মতো তাকে সঙ্গ দিয়েছে। কিন্তু একদিন এই গলিটাও ধ্বংস হয়ে যাবে, মরে যাবে। যেভাবে তার ঠাকুমা মরে গেছে। কেউ বেঁচে

থাকবে না। মা, বাবা, বেবী, পিন্টু, রত্না, রাখী, পাখি—এরা সবাই একদিন মরে যাবে। শেষ হয়ে যাবে।

ঠাকুমাকে সে ভয়ংকর ভালোবাসতো। একদিন রাত্রিবেলা কে তাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলল। সবাই কাঁদছিল, জগদীশকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে বুকে চেপে ধরে মা কাঁদছিল। জগদীশ ভেবেছিল ওরা বোকার মতো কাঁদছে। আসলে ঠাকুমা বেঁচে উঠবেই। ঠাকুমা কি মরে যেতে পারে? দূর তাই কখনও হয়! ঠাকুমার ফিরে আসার অপেক্ষায় জগদীশ অনেকদিন উৎকণ্ঠ হয়েছিল।

কেন যে এমন হয়! ঠাকুমা মরে যায়, রাখী-পাখিদের বিয়ে হয়ে যায়, দেওয়ালগুলো ভেঙে পড়ে।

অস্পষ্ট ধোঁয়া ধোঁয়া অনুভূতির সঙ্গে সিরসিরে বাতাসের মতো কিছু যেন একটা বুঝতে পারল জগদীশ। যেন বুঝতে পারল এগুলোকে হতেই হয়। রত্না-রাখী-পাখিরা একদিন বড় হবে তারপর বড় হতে-হতে একদিন ঠাকুমার মতো বুড়ি হয়ে একদিন মরে যাবে। মনে হতেই যেন কেমন খারাপ লাগল তার।

গলিটা শূন্য। জগদীশের মনে হল তার চারদিকের জগৎটা যেন একটা খোলস ছাড়িয়ে আস্তে-আস্তে নতুন হয়ে তার চোখের সামনে ফুটে উঠছে। চোখ বুজে সে দেখতে পাচ্ছে পুরোনো পৃথিবীটা যেন দূরে-দূরে সরে যেতে-যেতে তার দিকে বিষণ্ণ চোখে তাকিয়ে আছে। জগদীশের ঘুম পেল।

সে যেন সেই গির্জাটার ভেতরে বসে আছে। সামনে মোমবাতি-জ্বলা বেদি। খুব কাছে থেকে সেই মেয়েটি তার কানে-কানে প্রার্থনা মন্ত্র বলে দিচ্ছে। আজ তার আর ঘুম আসছে না। সে মেয়েটির দিকে তাকাল। মেয়েটি রত্না! না, রত্না নয়, বোধ হয় রাখী। হ্যাঁ, রাখীই, যার বিয়ে হবে যাবে এ মাসের সাতাশে। জগদীশের দুঃখ হল। মেয়েটি হাসছে। হাসতেই মেয়েটার মুখটা যেন তার মায়ের মতো হয়ে গেল। জগদীশ আশ্চর্য হয়ে দেখল মেয়েটির মুখে রত্না-রাখী-পাখি আর তার মা—সকলেরই মুখের আদল যেন আছে। সবাই মিলে যেন এই মেয়েটি।

মেয়েটি আরও কাছে এল। তাকে ছুঁল। জগদীশ চমকে উঠল। তার চোখের সামনে থেকে একটা মস্ত পরদা যেন হঠাৎ সরে গেল। তখন রাখী, পাখি আর রত্নাদের সব রহস্য যেন তার জানা হয়ে গেছে। এখন যেন অনেক-অনেক কিছু, জগদীশ যা এতদিন বুঝতে পারত না, তা যেন বুঝতে পারছে। জগদীশকে ভেঙে ধ্বংস করে আবার যেন কে তাকে বাঁচিয়ে তুলছে।

জগদীশ জেগে উঠল। প্রবল যন্ত্রণার মতো একটা কান্না তার বুক থেকে উঠে আসছে। এই কান্নাটাকে জগদীশ এতদিন চেপে রেখেছিল। ইটের খাঁজে হাত দুটোকে চেপে ধরল সে। ঝুর ঝুর করে বালি পড়ল। বালি পড়তেই লাগল,—জগদীশের মাথায়, গায়ে, চোখে।

জগদীশ ফুলে-ফুলে কাঁদতে লাগল। সেই কান্নার মধ্যে খুব সামান্য, ছুঁচের মুখের মতো ছোট্ট একটা সুখ ছিল।

দুপুরটা ঘন হয়ে তার রক্তের মধ্যে জ্বলতে লাগল।

চি.

অন্ধকারে ভেসে যাচ্ছে জ্বলন্ত মোমবাতি।

হলুদ আলোয় যেন জলের মধ্যে জেগে আছে ইভার মুখ। মুখখানা এখন ভৌতিক। একটু নীচুতে আলো, শিখাটা হেলছে, দুলছে, কাঁপছে। ইভার মুখে সেই আলো। গালের গর্তে, চোখের গর্তে, কপালের ভাঁজে ছায়া। মুখখানা যেন বা এখন ইভার নয়। ইভা এ ঘর থেকে ও ঘরে যাচ্ছে। মাঝখানের পরদা উড়ছে হাওয়ায়।

অমিত বলে—সাবধান। পরদায় আগুন না লাগে!

ইভা কিছু বলল না। জলে ক্লান্ত সাঁতারু যেমন শ্লথ গতিতে ভেসে যায়, তেমনি এ ঘর থেকে ও ঘরে চলে গেল।

অন্ধকারে চৌকিতে বসে আছে অমিত। তার কোল ঘেঁষে পাঁচ বছরের ছেলে টুবলু আর তিন বছরের মেয়ে অনিতা। যখনই কারেন্ট চলে যায় তখনই অমিত তার দুই ছেলেমেয়েকে ডেকে নিয়ে বিছানায় বসে থাকে। বড্ড ভীতু অমিত। অন্ধকারে কোথায় কোন পোকামাকড় কামড়ায় কিংবা আসবাবপত্রে হোঁচট লাগে। কিংবা খোলা পড়ে-থাকা ব্লেড বা ইভার পেতে-রাখা অসাবধান বঁটিতে গিয়ে পড়ে। কিংবা এরকম আর কিছু হয় সেই ভয় তার। বুক ঘেঁষে ছেলেমেয়েরা বসে আছে বুকের দুই পাঁজরে দুজনের মাথা। অমিত ঘামছে।

—একটা মোমবাতি এ-ঘরে দেবে না? অমিত চেঁচিয়ে জিগ্যেস করে।

রান্নাঘর থেকে ইভার উত্তর আসে না! ইভা ও রকমই। আজকাল দু-তিনবার জিগ্যেস না করলে উত্তর দেয় না।

—কী গো? অমিত বলল।

ইভা আস্তে বলে—মোমবাতি দিয়ে কী হবে? তোমরা তো বসেই থাকবে এখন!

—অন্ধকারে কি ভালো লাগে?

—না লাগলেও কিছু করার নেই। মোমবাতি একটাই ছিল।

—ওঃ। অমিত সিগারেট ধরাল।

অনিতার মাথাটা বুক থেকে লিত হয়ে কোলে নেমে গেল। তার দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ হয়। ঘুমিয়ে পড়বে মেয়েটা।

অমিত নীচু হয়ে ডাকল—অনি, ও অনি!

—উঁ। ক্ষীণ পাখি-গলায় সাড়া দেয় অনিতা।

—এখন ঘুমোয় না মা, ভাত খেয়ে ঘুমোবে।

—খাবো না।

—খাবে না কি? খেতে হয়। গল্পটা শোনো।

ঘুমগলাতেই অনিতা বলে—বলো তাহলে।

এইটুকু বয়সেই কি টনটনে উচ্চারণ মেয়েটার। পরিষ্কার কথা বলে, এতটুকু শিশুসুলভ আধো-কথার জড়তা নেই। অমিত মাঝে-মাঝে ইভাকে বলে—আমরা ছেলেবয়সে এত পাকা কথা বলতে পারতামই না। এখনকার ছেলেমেয়েরা কীরকম অল্প বয়সেই পাকা হয়ে যায়।

ঘুমন্ত মেয়েটাকে টেনে বসায় অমিত। মাথাটা আবার পাঁজরে লাগে। অনেকক্ষণ চুপচাপ ব্যাপারটা লক্ষ্য করে টুবলু বলে—আমি ঘুমোই না। ঘুমোই বাবা?

—না তো। তুমি লক্ষ্মী ছেলে।

ছেলেটার জন্য কত মায়া অমিতের, ভারী ভীতু ছেলে, ঘরকুনো। এ-বয়সে যেমন দুরন্ত হয় বাচ্চারা, তেমন নয়। রোগা দুর্বল ন্যাতানো। স্টেশন রোড-এর এক বুড়ো হোমিওপ্যাথ গত বছরখানেক যাবৎ ওষুধ দিচ্ছে। কিন্তু ছেলেটার তেমন বাড়ন নেই। খেতে চায় না, কখনও ওর তেষ্টা পায় না, খেলে না। ইভার ইচ্ছে একজন চাইল্ড স্পেশালিস্টকে দেখায়। সেটা হয়তো ধারকর্জ করে দেখাতেও পারত অমিত। কিন্তু তার কলেজের একজন কলিগ ছেলেকে স্পেশালিস্ট দিয়ে দেখানোর পর যে খাওয়ার চার্ট আর ওষুধ বিষুধের ফিরিস্তি

দিয়েছিল তাতে অমিত ভড়কে যায়। তাই গত একবছর যাবৎ ইভা বিস্তর অনুযোগ করা সত্ত্বেও অমিত গা করেনি। যাক গে, কৃষ্ণের জীব, টিকটিক করে বেঁচে থাক। বড় হলে সব ঠিক হয়ে যাবে। ছেলে বয়সে অমিতও তো কত ভুগেছে, মাসেক ধরে রক্ত আমাশা, চিকিৎসা ফিকিৎসা নিয়ে কেউ মাথা ঘামাত না। গ্যাঁদাল পাতা বাটা, থানকুনির ঝোল, পুরোনো আতপ চালের গলা ভাত, পাড়ার এল এম এফ ডাক্তারের দেওয়া ক্যাস্টর অয়েল ইমালশান, এই খেয়ে ফাঁড়া কাটিয়ে আজও বেঁচে আছে। তার ছেলেটাই বা তাহলে বাঁচবে না কেন?

সিগারেটের আগুন ফুলকি ছড়াচ্ছে। অন্ধকারে হাতড়ে অ্যাসট্রেটা ঠাহর করে অমিত। সাবধানে ছাই ঝাড়ে। বলে—একদিন একটা টিয়াপাখি উড়ে এল খরগোশের বাড়িতে, বলল—খরগোশ ভাই, আমি তোমার কাছে থাকব। খরগোশ—থাকবে তো। কিন্তু ঘর কোথায়! আমার তো ছোট্ট একটু খুপড়ি! টিয়াপাখি বলে—আমার বাসা পড়ে ভেঙে গেছে, এখন আমার ডিম পাড়বার সময়, তাহলে উপায়? তখন খরগোশটায় দয়া হল, একটা ছোট্ট খুপরি বানিয়ে দিল টিয়াপাখিটাকে। টিয়াপাখি থাকে, ডিম পাড়ে, তা দেয় মনে ভারী আনন্দ, ডিম ফুটে বাচ্চা বেরুবে। কত আদর করবে বাচ্চাকে, উড়তে শেখাবে, খেতে শেখাবে, শিকার করতে শেখাবে। খরগোশ একদিন খাবার আনতে বাইরে গেছে, এমন সময়ে এক মস্ত ইঁদুর এসে হাজির। বলল—এই টিয়াপাখি, দে তোর দুটো ডিম। টিয়া বলল, কেন দেব? ডিম ফুটে আমার বাচ্চা হবে, কত আদর করব, তোকে দেব কেন? ইঁদুর বলল—দিবি না তো। তবে রে বলে দাঁত বের করে কামড়াতে গেল...অনি ও অনি।

—উঁ।

—আবার ঘুমোচ্ছিস? বলে অমিত গলা ছেড়ে বলে—ইভা, ভাত হয়েছে? অনি ঘুমিয়ে পড়ছে যে।

—বাবা, তারপর? জিগ্যেস করে টুবলু।

—বলছি দাঁড়া। দ্যাখ না বোন ঘুমিয়ে পড়ছে! ও অনি!

হঠাৎ অন্ধকারে ছায়ামূর্তির মতো আসে ইভা। কথা বলে না। নড়া ধরে হিঁচড়ে টেনে নেয় মেয়েটাকে। ছেলেটাকে টানতে হয় না। ভীতু ছেলে। অন্ধকারেই টের পায় মা'র মেজাজ ভালো নেই। সে রোগা পায়ে লাফ দিয়ে নামে চৌকি থেকে। মার পিছু-পিছু বাধ্য ছেলের মতো যায়।

দু-ঘরের মাঝখানে পরদা উড়ছে। ওপাশেরটা আসলে ঘর নয়। রান্নাঘর। সেখানে মোমের আলোর আভা। অন্ধকারে বসে অমিত সেই মৃদু আভার দিকে চেয়ে থাকে।

মেয়েটা খেতে চাইছে না। ইভা তার হাতের চুড়ির শব্দ তুলে দুটো চড় কষাল। মেয়েটা কাঁদছে। ইভা চাপা স্বরে মেয়েকে বকছে এবং মেয়েকে বকতে-বকতেই বকার ঝাঁঝটা নিজের কপালের এবং ভাগ্যের প্রসঙ্গে বলে যাচ্ছে। অমিত চুপ করে বসে শোনে। ইচ্ছে করে উঠে গিয়ে একটা লাথিতে মেয়েমানুষটাকে চুপ করায়।

লাথি যে কখনও মারেনি অমিত তা নয়। লাথি বা চড় চাপড় কয়েকবারই মেরে দেখেছে। লাভ হয় না। সদ্য-সদ্য একটু ফল হয় বটে কিন্তু ইভা দ্বিগুণ বেড়ে যায়।

অবিকল ছাগলের মতো একটা লোক গলা পরিষ্কার করছে কোথায় যেন। 'হ্যা-ক' 'হ্যা-ক' শব্দটা শুনলে নিজেরও যেন বমি তুলতে ইচ্ছে করে।

কান্না থামিয়ে ছেলেমেয়েরা এখন খাচ্ছে। গুন-গুন করে এখন আবার সোহাগের গলায় ওদের গল্প শোনাচ্ছে ইভা। ইভাকে নিয়েই দিনের অধিকাংশ সময় ভাবে অমিত। বিয়ে করে তারা সুখী না অসুখী তা ঠিক বুঝতে পারে না। কেউই বোধহয় পারে না। মেয়েমানুষ জাতটার মুখের সঙ্গে মনের মিল নেই। যখন তারা খুবই সুখে আছে তখনও পুরোনো দুঃখের কথা তুলে খোঁটা দেবেই।

খেয়ে-দেয়ে ওরা এল। ইভা মশারি টাঙাল। ওরা গল্পের বাকি অর্ধেকটা না শুনেই ঘুমিয়ে পড়ল।

কারেন্ট এখনও আসেনি। পৃথিবীজোড়া অন্ধকার।

মোমবাতিটা মাঝখানে রেখে দু-ধারে নিঃশব্দে খেতে বসে ইভা আর অমিত, সম্পর্কটা সহজ নেই যেন। একধারে ছেলেমেয়েদের এঁটো থালা পড়ে আছে। তাতে ডাল-ঝোল মাখা কিছু ভাত। অমিত আড়চোখে চেয়ে দেখল। এখন দু-টাকা আশি কেজি যাচ্ছে চাল! তাদের রেশন কার্ড নেই। বলল—ভাত নষ্ট করো কেন!

—কী করব? শেষ কয়েকটা গরাস খেল না।

—কম করে নেবে। গুচ্ছের গেলাতে চাইলেই কি হয়। ওদের পেটে জায়গা কত।

—দুটো ভাতই তো, আর কী ভালোমন্দ খায়! ঘি মাখন মাছ-মাংস কি যায় ওদের পেটে?

—গরিবের সন্তান, যা জোটে তাই খেয়ে বাঁচবে।

—মুরোদ না থাকলেই ওসব কথা বলে লোকে।

—চালের দাম জানো?

—জানতে চাই না।

মেয়েমানুষটা ঝগড়া পাকিয়ে তুলছে। রোগা, দুর্বল, রক্তহীন। তবু গলা এতটুকু ক্ষীণ নয়। সবচেয়ে আশ্চর্য স্মৃতিশক্তি ইভার। বিয়ের সাত বছর ধরে প্রতিদিন অমিত যত অন্যায় করেছে, যত অবহেলা, যত অপমান সব হুবহু মুখস্থ বলে যায়। মেজাজ ভালো থাকলে মাঝে-মাঝে বলে—এরকম মেমারি নিয়ে লেখাপড়া করলে না ইভা, কেবল স্কুল ফাইনাল পাস করে বসে রইলে।

জ্বলন্ত মোমবাতির ওপর দিয়ে বাঘের চোখে ইভার দিকে চেয়ে থাকে অমিত। ইভাও চেয়ে থাকে বনবেড়ালের মতো। একটুও ভয় পায় না। ভিতরটা হতাশায় ভরে যায় অমিতের। কীরকম করলে কীভাবে তাকালে সেও একটু ভয় পাবে। একটু সমীহ করবে তাকে। অমিত আবার পাতের ওপর মুখ নামায়। লাল রুটিগুলো দেখে এবং ভাবতে থাকে সে হিপনোটিজম শিখবে। কিংবা আরও রাগি হয়ে যাবে! কিংবা একদিন কিছু না বলে কয়ে হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে।

নিরুদ্দেশও একবার হয়েছিল অমিত এক রাতের জন্য। পরদিন ফিরে দেখে ইভার কি করুণ অবস্থা। পাড়াসুদ্ধ মেয়েপুরুষে ঘর ভরতি, মাঝখানে পাথর হয়ে ইভা বসে, দু-চোখে অবিরল ধারা। তাকে দেখে সাতজন্মের হারানো ধন ফিরে পাওয়ার মতো উড়ে এসেছিল। তারপরই অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। সেই দৃশ্য মনে পড়লে আজও বুকে ব্যথা করে। ইভার ভালোবাসাও তো নিখাদ। অমিতও কি বাসে না? বাসে। ভীষণ। তেরাত্রি ইভাকে ছেড়ে থাকলে নিজেকে অনাথ বালকের মতো লাগে। সেই জন্যই ইভা বহুকাল বাপের বাড়ি যায় না। অমিতের জন্য।

চালওয়ালা দুঃখিত মুখখানি তুলল। ভ্রাম্যমাণ পুরুত কপালে চন্দনের আর সিঁদুরের ফোঁটা দিয়ে গেছে, কানে গোঁজা বিল্বপত্র। শ্বাস ফেলে বলে—তিন টাকা দশ।

—বলো কী? অমিত চমকায়। তার মাস মাইনে একশো আশি প্লাস কলেজ ডি-এ। রেশন কার্ড নেই।

করুণ একটু হাসে চালওয়ালা—আজ তো এই দর। কাল আবার কী হবে কে জানে।

—গত সপ্তাহে দু'টাকা আশি করে নিয়েছি।

—গত সপ্তাহে! সে তো বাবু গত সপ্তাহ। বলে পাল্লা তুলে বলে—কতটা দেব?

দশ কেজি নেওয়ার কথা বলে দিয়েছিল ইভা। কিন্তু সাহস পেল না অমিত। বলল—চার কেজি।

—গত সপ্তাহে আপনাকে বলেছিলাম, কিছু বেশি করে নিয়ে রাখুন। এ সময়টায় দর চড়ে। চাল ওজন করতে-করতে চালওয়ালা বলে। তারপর বিড়বিড় করতে থাকে রাম...রাম...দুই...দুই... তিন...তিন...

ক'বছর আগেও চাল কিনলে এক আঁজলা কি এক মুঠো ফাউ দিত। এখন আঙুলের ডগায় গোনাগুনতি দশ কি বারোটা চাল বাড়তি দিল।

ঘামে পিছলে নেমে এসেছিল চশমাটা। অমিত ঠেলে সেটা সেট করল। ইভাকে ধমক দিতে হবে। ছেলেমেয়েদের পাতে যেন আর ভাত নষ্ট না হয়। আর, এবার থেকে ইভা আর অমিতের মতো ওরাও রাতে রুটি খাবে। পেটে সহ্য হয় না বললে চলবে না। সকলের ছেলেমেয়ে রুটি খায় ওদের ছেলেমেয়ে খাবে না কেন? খেতে-খেতে অভ্যাস হয়ে যাবে। ইভা হয়তো ঝগড়া করবে, তেড়ে আসবে, তবু বলতে ছাড়বে না অমিত।

বাজার আর চালের বোঝা দু-হাতে নিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে অমিত ইভা কী বলবে এবং সে তার কী উত্তর দেবে তা ভাবতে-ভাবতে যায়। এবং মনে-মনে সে ঝগড়া করতে থাকে। প্রচণ্ড ঝগড়া। রাগে ফেটে পড়ে। ইভাকে লাথি মারে, চুলের ঝুঁটি ধরে হিঁচড়ে টেনে বের করে দেয় ঘর থেকে, বলে—ইঃ নবাবের মেয়ে।

কিন্তু সবই ঘটে মনে-মনে। একটু অন্যমনস্কভাবে সে রাস্তার দূরত্ব অতিক্রম করতে থাকে। আজকাল ইভার কথা ভাবলেই তার মাথা আগুন হয়ে ওঠে। মনে-মনে সে যে কত গাল দেয় ইভাকে। ভালোও কি বাসে না? বাসে। ভীষণ। এবং এই দুটি অনুভূতিই তাকে দু-ভাগে ভাগ করে খেয়ে নিচ্ছে।

ইভা রাগ করল না। মন দিয়ে অমিতের কাছে চালের দর, দেশের দুর্দিনের কথা শুনল। তারপর সংক্ষেপে বলে—দেখি।

—হ্যাঁ। দ্যাখো। গাঁয়ে মাস্টারি করতাম, সে বরং ভালো ছিল। শহরে নতুন প্রফেসারি নিয়ে এসে ফেঁসে গেছি। চেনাজানা লোকও তেমন নেই যে টপ করে হাত ধরব, দোকানেও ধারবাকি আনার মতো চেনা হয়নি। বুঝলে?

ইভা বুঝেছে। মাথা নাড়ল। এবং একটু পরে এক কাপ অপ্রত্যাশিত চা-ও করে দিল। ইকনমিক্স-এর সাহা বেঁটে এবং কালো, মুখখানা সবসময়েই দুশ্চিন্তগ্রস্ত। সহজেই উত্তেজিত হয় লোকটা, সহজেই আনন্দিত হয়। তার সঙ্গে মোটামুটি ভালোই ভাব হয়ে

গেছে অমিতের। দ্বিতীয় পিরিয়ডের পর দেখা হতেই লোকটা খুব উত্তেজিতভাবে বলল—এ হচ্ছে অঘোষিত দুর্ভিক্ষ। ফেমিন ইন ফুল ফর্ম।

—তাহলে সেটা ওরা ডিক্লেয়ার করুক।

তাই করে? ইজ্জতের প্রশ্ন আছে না? আমি সেদিন ঠাট্টা করে একজন ছাত্রকে বোঝাচ্ছিলাম, ইনফ্লেশন কাকে বলে। বলছিলাম, এখন দেখছ বাবা পকেটে টাকা নিয়ে যায় আর থলি ভরে বাজার করে নিয়ে আসে। যখন দেখবে বাবা থলি ভরে নিয়ে যায় আর পকেট ভরে বাজার নিয়ে আসে তখনই বুঝবে ইনফ্লেশন। জার্মানিতে বিশ্বযুদ্ধের পর ওরকমই হয়েছিল। এখন দেখছি ঠাট্টা নয়। ব্যাপারটা দিনকে দিন তাই দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। নাইনটিন সিকসটি ওয়ানের তুলনায় টাকার ভ্যালু...

কিন্তু এও ঠিক, সকালে তিন টাকা দশ কিলো দর-এ চাল কিনলেও অমিত টেরিকটনের হাওয়াই শার্ট পরে কলেজে এসেছে। পরনে জলপাইরঙা টেরিলিনের প্যান্ট, পায়ে বাটার জুতো, গাল কামানো। এখনও অধ্যাপকদের পরনে এরকমই পোশাক, কিংবা মিহি আদ্দির পাঞ্জাবি আর ভালো তাঁতের ধুতি। কিন্তু ক্লেশের চিহ্ন নেই।

একজন অধ্যাপক বলে—দক্ষিণ ভারত থেকে এক সন্ন্যাসী ডিক্লেয়ার করেছে সেভেনটি ফোর ইজ দি ব্ল্যাকেস্ট ইয়ার ইন দি হিস্টোরি অফ ম্যানকাইন্ড—

এ সবই হচ্ছে হাই-তোলা কথা। গায়ে লাগে না কারও। অধিকাংশ অধ্যাপকই অধ্যাপকসুলভ গম্ভীর, বিদ্যাভারাক্রান্ত চিন্তাশীল। দু-চারজন ছোকরা প্রফেসর একটু কথা চালাচালি করে হালকাভাবে। সামান্য একটু অস্বস্তিবোধ করে অমিত এখনও। দশ বছর স্কুল মাস্টারি করার পর হঠাৎ চাকরিটা পেয়েছে সে। অধ্যাপকদের মেলায় এখনও নিজেকে একটু ছোট লাগে তার। যেন বা দয়ার পাত্র সকলের। কিন্তু তা নয়। এখানে কেউ কাউকে তেমন লক্ষ্য করেই না। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার গাঁয়ে থেকে নোনা বাতাসে অমিত একটু কালো হয়ে গেছে, একটু গ্রাম্যও। তাই বোধ হয় সে একাই বসে-বসে সকালে শোনা অবিশ্বাস্য চালের কথা ভাবে। সেই মহার্ঘ ভাত এখনও তার পেটে। ভাবতে আশ্চর্য লাগে।

কলকাতায় এসেই রেশন কার্ডের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করে রেখেছিল। এখনও এনকোয়ারি হয়নি। কবে যে হবে, কিছু বোঝা যাচ্ছে না। রাইটার্স বিল্ডিংয়ের আশুতোষ মুরুব্বি গোছের লোক। পলিটিকস করে, নেতাদের সঙ্গে ভালোবাসা আছে। সে অভয় দিয়েছিল।

কলেজের পর দুশ্চিন্তাগ্রস্ত অমিত গেল তার কাছে।

—একটু দেরি হতে পারে বুঝলে পেঁপেচোর! আশু বলে—রিসেন্টলি একগাদা ভুয়া কার্ড ধরা পড়েছে। এনকোয়ারি না করে নতুন কার্ড ইসু করবে না।

—তুমি তো জানোই ভাই, আমার লুকোছাপা কিছুই নেই। আমরা স্বামী-স্ত্রী আর দুটো মাইনর—

—হয়ে যাবে। ভেবো না।

—চালের দর আজ—

—জানি, আমিও তো ভাত খাই।

—আর দু-চারদিন খোলা বাজারে চাল কিনলে আমার থ্রম্বসিস হয়ে যাবে।

আশু হাসল। বলল, তুমি তো তবু পেঁপেচোর। আমি যে কেন্নো!

আশু বোধহয় প্রফেসরিটাকে তেমন ভালো চোখে দেখে না। অমিত চাকরিটা পাওয়ার পর থেকেই আশু তাকে প্রফেসরের বদলে পেঁপেচোর বলে ডেকে আসছে। কেরানি হল গে কেন্নো।

—দ্যাখো ভাই। বলে অমিত।

আশু তাকে খাতির করল। ক্যান্টিনে নিয়ে ফ্রুট স্যালাড খাওয়াল। কফিও খাওয়াতে-খাওয়াতে বলল—দুর্দিনের জন্য তৈরি হও। সারা দুনিয়ায় এবার ফলন কম। রাশিয়া, চিন সবাই ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে বেরিয়েছে।

পিওর ম্যাথেম্যাটিক্সের প্রফেসর অমিত এত খোঁজ রাখে না। তার বাড়িতে খবরের কাগজ নেই। উদ্বেগের সঙ্গে বলে—সে কী?

বলছি কী! কেবল ওই মার্কিন মুলুকেই যা ফলার ফলেছে। কিন্তু বাংলাদেশ ইস্যুতে আমেরিকার সঙ্গে বাম্বু হয়ে গেছে আমাদের।

—দুনিয়ার মাটি কি শুকিয়ে যাচ্ছে আশু?

—শুকোবে না? যুবতীও তো বুড়ি হয় ভাই।

যুবতী ও বুড়ির কথায় তৎক্ষণাৎ অমিতের ইভার কথা মনে পড়ে। বাস্তবিক যুবতী যে কী বুড়ি হয় তা অমিতের চেয়ে বেশি কে আর জানে! দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার সেই গাঁয়ের কিশোরী মেয়েটি কত চট করে বুড়ি হয়ে গেল। ব্রোঞ্জের চুড়িওয়ালা এত ঢলঢল করে হাতে যে মনে হয় হঠাৎ বুঝি খসে পড়ে যাবে। হাতেটাতে শিরা উপশিরা জেগে আছে।

ভেজাল তেলের জন্যই কিনা কে জানে, মাথার চুলও উঠে শেষ হয়ে এসেছে। মুখের ডৌল দেখে অমিতের চেয়েও বেশি বয়সী মনে হয়।

কত লোকের কত থাকে, কিন্তু অমিতের ওই একটা বৈ মেয়েমানুষ নেই। রাগ সোহাগ সব ওই একজনের ওপর। যুবতী বলো যুবতী, বুড়ি বলো বুড়ি, অমিতের ওই একটাই মেয়েমানুষ। ভাবতে-ভাবতে হঠাৎ অমিত মনে-মনে ঠিক করে, আজ ফিরে গিয়েই ছেলেমেয়ে দুটোকে শোওয়ার ঘরে কপাট আটকে রেখে রান্নাঘরে ইভাকে জাপটে ধরে হামলে আদর করবে। ভাবতে-ভাবতে তার শরীর চনমন করে ওঠে। সারাদিনের নানা ক্লীবত্ব ভেদ করে পৌরুষ জেগে ওঠে।

চাঁদ নয়, হেমা মালিনী। অনেক ওপরে ধর্মতলার মোড়ে বড় বাড়িটার গায়ে লটকানো হোর্ডিং। হোর্ডিং জুড়ে যেন চাঁদ উঠেছে। জ্যোৎস্নার মতো ঝরে-ঝরে পড়ছে হেমা মালিনীর হাসি। অবিরল। এবং স্থির সেই হাসি। কে সি দাসের দোকানের উলটো দিকে যেখানে ট্রাম লাইনের কাটাকুটি সেইখানে একটু মেটে জায়গায় কে যেন জল ছিটিয়ে ভিজিয়ে রেখেছে। সেই ভেজা মাটির ওপর পড়ে আছে একটি যুবতী মেয়ে। ভিখিরি শ্রেণির। মাটির রঙেরই একখানা শাড়ি জড়ানো। কিন্তু সর্বাঙ্গ ঢাকা পড়েনি। বুকে পাছায় কিছু মাংস এখনও আছে। একটি স্তন কাত হয়ে ঝুলে মাটি স্পর্শ করেছে। আশেপাশে অমিত গুনে দেখল ঠিক চারটে বাচ্চা। সবচেয়ে ছোটটা বোধহয় বছর দুয়েকের। পুঁটো-পুঁটো সেইসব বাচ্চারা উদোম ন্যাংটো। সবাই মড়ার মতো শুয়ে আছে। চোখ বোজা, কেউ নড়ছে না। শ্বাস ফেলার ওঠানামা লক্ষ্য করা যায় না। তাদের চারধারে মেলা দুই নয়া তিন নয়া ছড়িয়ে আছে। তারা কুড়িয়ে নেয়নি। কেউ কুড়িয়ে নেয়নি। দয়ালু মানুষেরাই পয়সা ফেলে গেছে। আবার এও হতে পারে ওইসব ঝরে পড়েছে হেমা মালিনীর হাসি থেকেই। কে জানে! অমিত চোখ তুলে দেখল, ভুল নয়, দশমী পুজোর দিন দুর্গামূর্তির হাস্যময় মুখে যেমন কান্নার চোখ ফুটে ওঠে তেমনিই হেমা মালিনীর চিত্রার্পিত মুখে দেবীসুলভ কারুণ্য।

দুর্ভিক্ষ? অমিত চমকে ওঠে। বড় হওয়ার পর সে আর দুর্ভিক্ষের কথা ভাবেনি। ধারণা ছিল, দুর্ভিক্ষ এখন আর হয় না। ভারতবর্ষে গম চাল না হলে আমেরিকায় হবে, থাইল্যান্ড, বার্মায়, অস্ট্রেলিয়ায় হবে। পৃথিবী থেকে মানুষ দুর্ভিক্ষ তাড়িয়ে দিয়েছে। নতুন করে আবার বুক খামচে ধরছে একটা ভুলে যাওয়া ভয়।

পর মহূর্তেই ভয়টা ঝেড়ে ফেলে দিতে পারে সে। ওই তো মেট্রোর আলো জ্বলছে। দপদপিয়ে উঠছে নানা বিজ্ঞাপনের নিওন সাইন। কত দামি-দামি গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। চারদিকে দামাল, উত্তেজিত, আনন্দিত কলকাতা! ভিখিরির তুলনায় ভদ্রলোক বহু গুণ বেশি।

জায়গাটা পেরিয়ে যায় অমিত দুটি নয়া ছুড়ে দিয়ে। কুড়িয়ে নেবে তো! না কি মরে গেছে ওরা? আত্মহত্যা করেনি তো? না-না, তা করেনি ঠিক। ভিখিরিরা কতরকম অভিনয় করে তার কি শেষ আছে। এটাও একটা কায়দা!

একটু দোটানার মধ্যে থেকে ভারী মনে অমিত বাস স্টপে এসে দাঁড়ায়। বড্ড ভিড়। সে ঠিক এই সব ভিড়ে এখনও অভ্যস্ত নয়। দাঁড়িয়েই থাকে।

দুটো বাড়ন্ত যুবা কথা বলে বাসস্টপে। একজন বলে—কলকাতায় এই যে লোকে বাসে উঠতে পারে না, ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকে অফিস টাইমে, কিংবা ঝুলে-ঝুলে যায়; ঠিক সময়ে কোথাও পৌঁছতে পারে না। এর জন্যই দেখিস একদিন বিপ্লব শুরু হয়ে যাবে। দুমদাম ভদ্রলোকেরা প্যান্ট গুটিয়ে কাছা মেরে ইট পাটকেল ছুড়তে লাগবে বেমক্কা, ভাঙচুর করে সব উলটেপালটে দেবে একদিন।

অন্যজন হাসে।

অমিত হাসে না। তার মনে একটা ভয়ের প্রলেপ পড়ে। চারিদিকে কী যেন একটা ধনুকের টান-টান ছিলার মতো ছিঁড়বার অপেক্ষায় আছে। যেন এক্ষুনি ছিঁড়বে এবং হুড়মুড় করে পৃথিবীটা ভেঙে পড়বে।

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ? নাকি পৃথিবী জোড়া খরা, দুর্ভিক্ষ? নাকি মহাপ্লাবন আবার? কিংবা ছুটে আসবে অন্য একটি গ্রহ পৃথিবীর দিকে যেরকম একটা গল্প সে পড়েছিল ইন্টারমিডিয়েটের ইংরেজি র্যাকপিডে।

রাতে শোওয়ার পর নিজস্ব মেয়ে মানুষটাকে হাঁটকায় অমিত, হাঁটকায় কিন্তু যা ভুলতে চায় ভুলতে পারে না। কিছুই ভুলতে পারে না। ইভা তার বুক থেকে অমিতের হাত সরিয়ে দিয়ে বলে, সারাদিন কত খাটুনি যায় বোঝ না তো, ঘুমোতে দাও।

পাশ ফিরে শোয় ইভা।

একটামাত্র মেয়েমানুষ থাকার ওই একটি দোষ। সে দিলে দিল, না দিলে উপোস থাক! অমিত এর বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া যায় ভেবে পেল না। লাথি মারবে? মেরে দেখেছে অমিত, লাভ হয় না। লাভ নেই। খুব রাগ হয় অমিতের, কিন্তু রাগ চেপে শুয়ে থাকে। কিন্তু তখন বুকে একটা চাপ-বাঁধা কষ্ট হতে পারে। পৃথিবীর মাটি শুকিয়ে গেছে খরায়। বুড়িয়ে গেছে ফলনের পর ফলনে, এবার কালো এক দুর্ভিক্ষ এসে যাবে।

সে স্বপ্নে দেখতে পায়, কাৎ হয়ে শুয়ে থাকা মরা মেয়েমানুষের স্তন ঝুলে সেই মরা মাটি ছুঁয়ে আছে। আতঙ্কে চিৎকার করতে থাকে সে। আকাশ থেকে পয়সা বৃষ্টি হচ্ছে।

শুকনো পয়সা ঠন ঠন শব্দে ছড়িয়ে পড়ছে চারধারে। কেউ কুড়িয়ে নিচ্ছে না।

তাকে ঝাঁকুনি দিয়ে জাগাল ইভা। বলল—ফিরে শোও। বোবায় ধরেছে।

অমিত ফিরে শুল। আর তখন হঠাৎ দু-খানা হাতে তাকে কাছে টানল ইভা। চুমু খেল। বলল—এসো।

চালওয়ালার কপালে আজও ভ্রাম্যমাণ কোন পুরুত চন্দনের ফোঁটা দিয়ে গেছে, কানে বিল্বপত্র! মুখ তুলে হাসল চালওয়ালা।

অমিত ফিসফিস করে জিগ্যেস করে—দর কী হে?

—কমেছে। পুরো তিন। একটু নীচে দু-টাকা আশি। বলে চালওয়ালা পাল্লা হাতে নেয় —কত দেব?

কমেছে! কমেছে! ঠিক বিশ্বাস হয় না অমিতের।

—দশ কেজি। বলে অমিত।

চালওয়ালা মায়া মমতা ভরে চেয়ে হাসে। বলে—এখন কমতির দিকে।

ভারী ফূর্তি লাগে অমিতের। না, না, বাজে কথা ওসব। পৃথিবী জুড়ে দুর্ভিক্ষ আসছে এ কখনও হয়? চালের দাম কমে যাবে ঠিক।

অমিত হাঁটে। দু-হাতে বোঝা। কিন্তু ভারী লাগে না। আজ ইভা বেশি চাল দেখে খুশি হবে। খুব খুশি হবে।

চারদিকে কতরকম চিহ্ন ছড়ানো, দুর্ভিক্ষের আবার প্রাচুর্যেরও। মানুষ কখন কোনটা দেখে ভয় পায় কোনটা দেখে খুশি হয় তার তো কিছু ঠিক নেই।

বন্ধুর অসুখ

অনিন্দ্যর অসুখ করেছে শুনে দেখতে গিয়েছিলাম।

এই প্রথম ওর বাড়িতে যাওয়া। কোনও নিমন্ত্রণ ছিল না। আমরা কেবল খবর পেয়েছিলাম যে, ওর অসুখ। অনিন্দ্য রোগা টিঙটিঙে, এক মাথা চুল, খুব সিগারেট খায়, আর খলবল করে কথা বলে। অফিসের আমরা সবাই অনিন্দ্যকে মোটামুটি পছন্দ করি, কারণ অনিন্দ্য ঝগড়া করেই ভাব করতে পারে, সকলের সঙ্গেই তার ভাব আর ঝগড়া লেগেই থাকে। রাজনীতিতে সে উগ্র, ভগবানকে সে কাছায় বাঁধে, তবু তার মন নরম, অল্পেই সে এলিয়ে পড়ে। তাকে নিজের দুঃখের কথা শুনিয়ে বড় আরাম।

তার অসুখের খবর পেয়ে আমরা চার সহকর্মী তার বাসায় যাব ঠিক করেছিলাম। আমি, সুভাষ, সমীর আর আশুতোষ। বড় দূরে অনিন্দ্যর বাসা। শিয়ালদহ থেকে রেলগাড়িতে এক ঘণ্টা তার পরেও মাইল খানেক হাঁটা পথ। রিকশাও যায়, তবে রাস্তা খারাপ বলে ঝাঁকুনি লাগে। তাই হেঁটেই আরাম। এসব আমাদের শোনা ছিল।

এর অসুখের দশ দিনের দিন এক শনিবার পড়ল। আগে থেকেই ঠিক করা ছিল পাঁচজন যাব। কিন্তু শনিবার মানু এল না বলে হলাম চারজন। হাঁটা পথে বউবাজার থেকে চাঁদা করে আপেল কিনলাম, কয়েকটা দামি কমলা, আশুতোষ কিছু ফল কিনল নিজের পয়সায়, তারপর ঘামতে-ঘামতে দুর্জয় গরমে চারজন গিয়ে রেলগাড়িতে উঠলাম। ভিড়, গরম, ধাক্কাধাক্কি। তার মধ্যেও চারজন দলা পাকিয়ে রইলাম। মনে হচ্ছে অসুখটা ভালোই পাকিয়েছে অনিন্দ্য। নইলে দশ দিনে তার হাঁপিয়ে ওঠার কথা। জ্বর-জারি তার লেগেই থাকে, গলায় সাত-আট মাস গলাবন্ধ জড়ানো আর ফ্যারিনজাইটিসের জন্য, তবু সে বাধা মানে না। অফিসে আসে, বলে—দূর, ওই অজ পাড়াগাঁয়ে কথা বলার লোক পাই না। আমি তো রবিবারেও এসে কফি হাউসে আড্ডা মেরে যাই।

কতবার তার বাড়িতে যেতে বলেছে অনিন্দ্য। যাওয়া হয়নি। শহরে আছি বারো মাস, মাঝে-মাঝে বাইরে কোথাও একটু যেতে ইচ্ছে করে। জলজঙ্গল গাঁ-গ্রামের টান। অনিন্দ্যর অসুখ হল বলেই যাওয়াটা ঘটে গেল। নইলে যাব-যাচ্ছি করে আরও সময় কেটে যেত।

তখন প্রায় পৌনে চারটে। ঘামে ভেজা জামা কাপড় নিয়ে প্ল্যাটফর্মে নামতেই শরীর জুড়িয়ে বাতাস দিল। প্ল্যাটফর্ম থেকে মনে হচ্ছিল জায়গাটার ভাবসাব শহুরে। সেটা কিন্তু বেশিক্ষণ রইল না। স্টেশনের যে দিকটায় শহরের ভাব, আমাদের যেতে হল তার উলটোদিকে, রেল লাইন পেরিয়ে। ইটের এবড়ো-খেবড়ো রাস্তা, গাছপালার ছায়ায় আচ্ছন্ন, গরুর গাড়ি আর মন্থর রিকশা একটা দুটো চলছে। রিকশার ওপর ঝুড়ির পাহাড়, তার ওপর ঠ্যাং মেলে চিৎ হয়ে আছে গ্রামীণ চাষাভুসো লোক, বিড়ি টানছে। রিকশাওয়ালারা পায়ে হেঁটে গাড়ি টেনে নিচ্ছে। বোঝা যায়, স্টেশনের এপাশে শৌখিন সওয়ারি নেই, রিকশাও মাল পরিবহণে কাজ লাগে।

যেন অসুখ উপলক্ষ্যে নয়, বেড়াতেই এসেছি আমরা। চেঁচামেচি করে চারজন হাঁটছিলাম, হোহো হাসি আর কলকাতার গল্প। কলকাতার বাইরে ঠিক কলকাতার মতো কিছু নেই, তাই বাইরে এলে কলকাতার লোক কেবল কলকাতার গল্প করে। গাছের নীচু ডাল থেকে লাফিয়ে পাতা ছিঁড়ে, এটা-ওটা দেখার জন্য মাঝে-মাঝে থেমে, পথের হদিস জিগ্যেস করে আমরা হাঁটছিলাম। ফেরার খুব তাড়া ছিল না। শুনেছি দশটায় শেষ ট্রেন যায় কলকাতায়। ইচ্ছে করলে সেটাও ধরা যাবে। বাগড়া দিচ্ছিল সুভাষ, ওর একটা বিয়ের নিমন্ত্রণ, আর নিম-অরাজি ছিল সমীর। আমাদের মধ্যে একমাত্র সমীরই প্রেম করে। ত্রিশ বছরে প্রেমে পড়েছিল, এখন একত্রিশ চলছে। আমরা ভেবেছিলাম হয়তো টগরের জন্যই ফেরার তাড়া। সমীর বলল যে তা নয়, ওর ভাইয়ের অসুখ। এক অসুখ রেখে আর এক অসুখ দেখতে এসেছে।

গ্রামের আবহাওয়ায় এলেই আমাদের ছেলেবেলায় কথা মনে পড়ে। বিশেষত আমার। ছেলেবেলার কথা আমিই প্রথম শুরু করলাম। তারপর আর কারও কথাই থামছিল না। মা-বাবার গল্প, দাদু ঠাকুরমার গল্প, আদর শাসন, সস্তার দিন আর দাঙ্গা যুদ্ধ দেশভাগের আগেকার সব কথা এসে পড়ল, দূর পথ টের পেলাম না। চারদিকে কচুবন, মাঝখানে পায়ে হাঁটা পথ, আর অদূরে বাঁশের ছেঁচা-বেড়ার ঘের-দেওয়া একটা টিনের চালওলা বাড়ির সামনে একটা লোক দেখিয়ে দিল... এই বাড়ি।

উঠোনে এসে দাঁড়াতেই গ্রাম্য চেহারার দু একজন লোক আর বউ-ঝি নানাদিক থেকে উঁকি দিল। খালি গায়ে কালো মতো একজন আধবুড়ো লোক এসে বলল—আসুন, কলকাতা থেকে আসছেন তো?

সম্মতি জানাতেই বলল—অনু ওই ঘরে আছে।

উঠোনের চারদিকে আলাদা আলাদা ঘর, যেন শরিকানার বাড়ি। সব ঘরেরই এক-ইটের দেওয়াল, দাওয়া, আর টিনের চাল। অদূরে খড়ের গাদা, গোয়াল ঢেঁকি ঘর একটা। টিউব-ওয়েলের হাতলের ওপর শরীরের সমস্ত চাপ দিয়ে পাম্প করতে গিয়ে একটা বাচ্চা ছেলে শূন্যে উঠে হাত পা ছড়িয়ে নেমে আসছে। দেখতে-দেখতে আমরা দাওয়ায় উঠলাম। ঘরের দরজা থেকেই দেখা গেল অনিন্দ্যর রোগা মুখে শেষবেলার লাল আলো এসে পড়েছে। চোখ বুজে ছিল সে। লোকটা গিয়ে তাকে ডাকল। আমরা খবর দিয়ে আসিনি, তাই আমাদের দেখে ধড়মড় করে উঠে পড়ল অনিন্দ্য, মুখে অবিশ্বাসের হাসি, চোখ উজ্জ্বল। উঠে বসে বলল—আয় রে।

বিছানায় দুজন, আর টিনের চেয়ারে দুজন বসলাম। একথা ঠিক যে এরকম পরিবেশে অনিন্দ্যকে মানায় না। অনিন্দ্য পুরোপুরি শহুরে মেজাজের, যে টেরিলিন পরে, অল্পেই ধৈর্য হারায়, চালাক, সপ্রতিভভাবে চলাফেরা করে। তাকে দেখে আন্দাজ করা শক্ত যে তাদের বাড়িতে ঢেঁকি-ঘর আছে, কিংবা খড়ের গাদা। যে লোকটা আমাদের ওর কাছে নিয়ে এল তার মুখের আর চেহারার আদলের সঙ্গে অনিন্দ্যর মিল আছে। সম্ভবত ওর বাবা। সত্যি বলতে কি ওরকম বাবাও অনিন্দ্যকে মানায় না।

ঘরের আসবাবপত্র ভালো নয়। যে খাটে অনিন্দ্য শুয়ে আছে একমাত্র সেই খাটটার গায়েই কিছু সেকেলে কারুকার্য, আর যা আছে তার কোনওটাকেই লোক দেখানো বলা চলে না। সস্তা একটা আলামারিতে ঠাসা বই, একটা টেবিলের ওপর পাতা খবরের কাগজের ঢাকনা, ঘরের ওধারে আর একটা চৌকিতে বিছানা গুটিয়ে রাখা, মাদুর পাতা রয়েছে, ঘরের কোণে মেটে হাঁড়ি-কলসি চাল থেকে দড়িতে ঝুলছে শীতে ব্যবহার্য লেপ কাঁথার পুঁটলি। ইঁদুরের ভয়ে ঝুলন্ত দড়িতে উপুড় করা মালসা লাগানো হয়েছে। ঢুকতে-না-ঢুকতেই এত সব লক্ষ্য করা গেল।

অনিন্দ্য ফুল আর ফলের বাহার দেখে বলল—তোরা যে আমাকে রোমান্টিক হিরো বানিয়ে দিলি। আহা, গাড়ির ভিড়ে ফুলগুলো ডলা খেয়ে গেছে রে!

জিগ্যেস করলাম—তোর কী হয়েছে?

—সে অনেক কথা। শুনবি। আগে একটু মা বাবাকে ডাকি, আলাপ পরিচয় কর, তারপর।

অনিন্দ্যর বাবা সে লোকটা নয়। তার চেহারার ধরনটা একই। আরও বুড়ো, লম্বা, রোগা, ঠোঁটে শ্বেতীর দাগ আছে একটু। প্রণাম করতে গিয়ে দেখি ঘোর গ্রীষ্মেও তাঁর পায়ে

মোজা। সম্ভবত পায়েও শ্বেতী আছে। খুব কুণ্ঠিতভাবে বিড়বিড় করে কী একটু বললেন। সামান্যক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন, বললেন—গাড়িতে কষ্ট হয় নাই তো!...আইচ্ছা তোমরা বসো, অনুর লগে গল্প কর...আইচ্ছা বেশ... বলতে-বলতে ভদ্রলোক পালিয়ে বাঁচলেন। অনিন্দ্য হেসে বলল—একদম গাঁইয়া রে বাবাটা।

অনুর মা উলটোরকম। গিন্নিবান্নির মতোই মোটাসোটা চেহারা; অল্প ঘোমটা দিয়ে এসে দাঁড়িয়েই হাসলেন, পরিষ্কার কলকাতার টানে বললেন—তোমাদের তো অনেকদিন আগেই আসার কথা ছিল। আসোনি কেন?

প্রায় সমস্বরে বললাম—আসা হয় না। কত কাজ বাকি থাকে আমাদের। অফিস আমাদের যে কীভাবে গ্রাস করে বসে আছে।

—রাত্রে তোমরা খেয়ে যেও। আমি রান্না করছি।

সমস্বরে বললাম—তা হয় না। বাসায় আমাদের জন্য রান্না করা থাকবে, খাবার নষ্ট হবে।

হেসে বললেন—কলকাতার লোক তো রাত্রে রুটি খায়। আমরা ভাত খাওয়াব। যত ইচ্ছে। তারপর ছেলের দিকে চেয়ে বললেন—দ্যাখো তো, এই দুর্দিনে কী একটা রোগ বাঁধিয়ে বসে আছে। হবে না কেন! এই কটা মাত্র খায়, মরে গেলেও এক মুঠো বেশি খাবে না। জোয়ান বয়েস, এখন তেমন খোরাক না হলে কি শরীর টেঁকে! বড্ড পিটপিটে, কালো মাছ খাবে না, দুধ খেলে বমি আসে, শাকপাতা নাকি জঞ্জাল, চিঁড়ে-মুড়ি ছোঁবে না, খালি পেটে কেবল অমৃত আছে ওর—চা। যত দাও খাবে। একে আমি কী করে বাঁচাব বলো তো? মাঝখানে ধুয়ো তুলেছিল যে কলকাতায় গিয়ে মেসে থাকবে। বলো তো তাহলে ও আর বাঁচাত? যাতায়াতের অসুবিধে হয় তা বুঝি, কিন্তু লোকে তো যাচ্ছে। তা ছাড়া এখানকার স্কুলে ওর জন্য একটা মাস্টারিও জুটিয়েছিল ওর বাবা। অনেক বলেকয়ে। ঘরের খেয়ে চাকরি, কিন্তু ওতে ওর পোষাল না। এখানে নাকি লাইফ নেই, কেবল নাকি ঘোঁট পাকায় লোকেরা।

অনিন্দ্য ভ্রূ কুঁচকে বলল—মা, তুমি এবার কেটে পড়ো।

উনি হাসলেন—তা তো বলবিই। বন্ধুদের কাছে সব ফাঁস হয়ে যাচ্ছে কিনা। তারপর একটু শ্বাস ফেলে বললেন—যেদিন সত্যিই কেটে পড়ব সেদিন আর কুল পাবি না...বলতে-বলতে সামলে গেলেন, আমাদের দিকে চেয়ে হেসে বললেন, তোমরা বোসো, আমি চা পাঠিয়ে দিই গে। আর কী খাবে?

—কিছু না...কিছু না...

—আচ্ছা সে আমি বুঝব। কলকাতার লোক না খেয়ে-খেয়ে পেটে চড়া পড়ে গেছে। এখানে 'কিছু না' চলে না।

স্পষ্টই বোঝা যায় অনিন্দ্য তার বাবার চেয়ে মায়েরই বেশি ভক্ত। অনিন্দ্য যখন তার মায়ের দিকে তাকায় তখন তার নিজের মুখ শিশুর মতো হয়ে যায়। ওর মা চলে গেলে ঘরে একটু নিস্তব্ধতা রইল। তখন শোনা যাচ্ছিল অজস্র পাখির কিচমিচ, খড়মের শব্দ, হুঁকো টানার শব্দ, গরুর হাম্বা। কলকাতায় ঠিক ওইরকম শব্দ হামেশা শোনা যায় না। আশুতোষ সিগারেট ধরাতে খস করে দেশলাই জ্বালল, জ্বেলেই বলল—অনিন্দ্য, সিনিয়াররা কেউ এসে পড়বে না তো রে! দরজাটা ভেজিয়ে দেব।

দূর! খা না। আমিও তো মার সামনেই খাই। বাবা বড় একটা আমার ঘরে আসে না। বলে হাসল—বুড়ো আমাকে খুব সমীহ করে চলে। বোধহয় ছেলেকে খুব লায়েক ভাবে।

সমীর বলল—মাসিমাকে বলে দে যে আমরা রাতে সত্যিই খাব না। আমাকে তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে।

অনিন্দ্য চোখ ছোট করে বলল—টগর রানীর হুকুম নয় তো!

—নারে। ছোট ভাইটার টাইফয়েড।

অনিন্দ্য কনুইয়ে ভর দিয়ে টপ করে সোজা হয়ে বসল, বলল আর, আমার যে টি বি!

আমরা সত্যিই জানতাম না। শুনে ভয়ঙ্কর চমকে গেলাম। টি বি! পর মুহূর্তে মনে পড়ল আজকাল ওষুধ আছে। টি বি এখন আর তেমন কিছু অসুখ নয়। তবু কোথাও একটু সংস্কার রয়ে গেছে। চমকে উঠি! ওর বিছানাতেই আমি বসেছিলাম। কেমন যেন অস্বস্তি লাগতে লাগল। আশ্চর্য! ও কিংবা ওর বাবা মা কেউই ওর বিছানায় বসতে আমাদের নিষেধ করেনি। অথচ করা উচিত ছিল। এখন স্বেচ্ছায় ওর বিছানা ছেড়ে অন্যত্র বসাটাও কেমন খারাপ দেখায়। তাই অস্বস্তি নিয়েই বসে রইলাম।

অনিন্দ্য হাসল—দুর! দুম করে বলে দিলাম। ইচ্ছে ছিল অনেকক্ষণ তা দিয়ে দিয়ে জমজমাটি একটা নাটুকে সিচুয়েশন তৈরি করে তারপর রক্তাক্ত সংলাপের মতো করে কথাটা বলব। হল না। দুর!

সবাই হাসলাম। আশুতোষ বলল—এটা কবে ধরা পড়ল?

অনিন্দ্য বলল—দিন দশেক আগে, যেদিন রিপোর্ট পেলাম সেদিন থেকেই আর অফিসে যাই না।

সুভাষ বলল—চিকিৎসা কেমন চলছে?

—ওই যেমন চলে। ঘড়ি বেঁধে খাওয়া। সকাল বিকেল হাঁটা। গুচ্ছের ফলমূল গিলতে হচ্ছে। ঠাকুর দেবতা প্রণাম করতে হচ্ছে। সকালে এসে পুরুত ঠাকুর কপালে মঙ্গল টিপ না ঘোড়ার ডিম কী পরিয়ে যান। মাইরি অসুখ-বিসুখ হলে আর ব্যক্তি স্বাধীনতা বলে কিছু থাকে না।

সুভাষ বলল—এ রোগ তো আজকাল জলভাত। আমার বোনের দেওর ভুগে উঠল কিছুদিন। আগে তোর মতোই রোগা পটকা ছিল, বিয়ে হত না চেহারার জন্য। এখন তাগড়া চেহারা হয়েছে...মন-মেজাজ ভালো হয়েছে, শিগগিরই বিয়ে হয়ে যাবে।

আশুতোষ বলল—দেখিস, দু-দশ বছরের মধ্যে ক্যানসারেরও ওষুধ বেরিয়ে যাবে। সায়েন্স সব পারে। তুই তো অনেকটা সেরেই গেছিস অনিন্দ্য, তোর চোখে-মুখে রোগের খুব একটা ছাপ নেই।

দূর শালা! অনিন্দ্য হাসে—আমি সুস্থ থাকলেও লোকে রোগের ছাপ দেখে আমার মুখে, আর এখন তো সত্যিকারের রোগ আমার। গ্যাস দিস না। আমি খুব রোগা হয়ে গেছি, না রে রমেন?

মাথা নাড়লাম—খুব না। তারপর তো একটু খুঁতখুঁতে আছিস, একে রোগা তার চেয়ে বেশিই রোগা ভাবিস নিজেকে। কাজেই তোকে বলে লাভ নেই।

অনিন্দ্য হাসে—ঠিক। আমি শালা নিজেকে নিয়ে খুব ভাবি। সারাদিনই ভাবি। নারসিসাস যাকে বলে। বোধহয় সেইজন্যই ভোগানি আমাকে ছাড়ে না। সারা বছর বারোমাস কোলের পোষা বেড়ালের মতো আমার অসুখ লেগে আছে। একটু গলা ব্যথা করলেই ভাবি ক্যানসার, পেট ব্যথা করলেই মনে ভাবি আলসার, খুক খুক কেশেই ভয় হয় টি বি হল না তো! দ্যাখ শেষকালে সেই টি বি তো হলই। নিজেকে নিয়ে ভাবতে নেই, কী বলিস।

হাসলাম—নিজেকে নিয়ে আমরা সবাই ভাবি।

—কেন ভাবিস?

বোধহয় নিজেকে ভালোবাসি বলে।

অনিন্দ্য চোখ বন্ধ করে ভ্রূ কুঁচকে বলে—নিজেকে ভালোবেসে কী হয়! দ্যাখ আমিও অনিন্দ্য চাটুজ্জেকে ভালোবাসি। কিন্তু ভেবে দেখলে সে শালা ভালোবাসার উপযুক্তই নয়। স্বার্থপর, রগচটা, দাম্ভিক, অস্থিরচিত্ত—দূর, এ শালাকে ভালোবেসে হবে কী! ঠিক আমার

মতোই যদি আর একটা লোকের সঙ্গে আমার দেখা হত, তবে দু-কথাতেই ঝগড়া লাগত, মারামারি হয়ে যেত, মুখ দেখাদেখি বন্ধ করে দিতুম। তবে কেন নিজেকে ভালোবাসি!

—নিজেকে ভালোবেসে তোর এ অসুখ হয়নি। ভালো না বেসে হয়েছে। মাসিমা যে বলে গেল তুই খেতে চাস না। খালি পেটে চা খাস, অনিয়ম করিস—এগুলো নিজেকে ভালোবাসার লক্ষণ নয়।

—নীতিকথা বলছিস! বলে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে অনিন্দ্য—আসলে কীভাবে যে ভালো থাকি তো জানিই না।

অনিন্দ্যর মা এসে বললেন—রুগির ঘরে খেতে নেই। বারান্দায় তোমাদের জলখাবার দেওয়া হয়েছে। এসো।

গিয়ে দেখি বারান্দায় পিঁড়ি পাতা, জামবাটিতে দুধ, বেতের ধামায় মুড়ি, প্লেটে কাটা আম, কলা আর কাঁঠালের কোয়া। অনিন্দ্য ঘর থেকে চেঁচিয়ে বলল—আমাকে একটা চেয়ার দাও। আমি ওদের খাওয়া দেখব।

সমীর আর একবার বলতে চেষ্টা করল—আমাকে কিন্তু তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে মাসিমা। আমার ভাইয়ের অসুখ, ওরা বরং একটু থাকুক, আমি ফিরে যাই।

—কী অসুখ?

—টাইফয়েড?

—আ হা! তবে ওতো আজকাল তাড়াতাড়িতেই সেরে যায়। কত ওষুধ বেরিয়েছে। আমাদের আমলের সান্নিপাতিক সারতই না। ঠিক আছে, আমি তোমাকে সাতটার মধ্যে খাইয়ে দেব। সাতটা পঞ্চাশে একটা গাড়ি আছে—না রে অনু? সেই গাড়িতে ফিরে যেও।

বাচ্চা একটা মেয়ে আমাদের হাত পাখায় বাতাস করছিল। অনিন্দ্য তাকে দেখিয়ে দিয়ে বলল—এই আমার ছোট বোন পুটলি। দিন-রাত বেড়ালছানা ছেনে বেড়ায়। কী বলে রে তোকে সবাই পুটলি।

—ষষ্ঠী ঠাকরুণ। বলেই জিভ কাটল।

উঠোনে অনেক কাচ্চা বাচ্চা বউ, দু-একজন মুনিশ। গৃহস্থের সংসার।

অনিন্দ্যর মা বলল—শান্তি পাই না বাবা। এই দুর্দিনে ছেলেটা রোগ বাঁধাল।

অনিন্দ্য হাসে—ধানের দাম পড়ে গেলে তোমাদের দুর্দিন, কিন্তু ওদের তো দুর্দিন নয়। ওসব বোলো না, ওরা বুঝবে না।

—কী যে বলিস। বলেই অনিন্দ্যর মা হেসে প্রসঙ্গ পালটে নিলেন—তোমরা সবাই মাংস খাবে তো!

সুভাষ আমিষ খায় না। ছেলেবেলাতে বাবা মারা গিয়েছিল, তারপর থেকে বিধবা মায়ের আওতায় ও মানুষ। মাছ মাংসর স্বাদই জানে না। সেকথা জানাতে মাসিমা বললেন —তোমাকে ছানার ডালনা খাওয়াব।

ঠিক হল রাত সাতটা পঞ্চাশের গাড়িতেই সবাই একসঙ্গে ফিরে যাব। হাতে সময় ছিল। আমরা পাঁচজন কাছেপিঠে একটু ঘুরে এলাম। পুরোনো মন্দির, দিঘি, বটগাছ, কিংবদন্তির কবর—এইরকম কিছু-না-কিছু সব গ্রামেই থাকে। সেসব দেখা হল। ওদের বাড়ির পিছনেই পুকুর। তার বাঁধানো চাতালে বসলাম পাঁচজনে। অনিন্দ্য বলল—একটা সিগারেট খাওয়া। অসুখ হওয়ার পর খুব রেস্ট্রিকশন যাচ্ছে। খেতে দেয় না। সিগারেট ধরিয়েই বলল—বোধহয় জ্বর আসছে রে! গা-টা দেখ দেখি।

দেখে বললাম—একটু আছে। চল ঘরে যাই।

অনিন্দ্য মাথা নাড়ল, না থাক। একটু বসি।

গ্রীষ্মের সূর্য তখনও আকাশের প্রান্তে একটুখানি লেগে আছে। দীর্ঘ বেলা। অনিন্দ্যর রোগা মুখে আলো এসে পড়েছে। আমরা চেয়ে আছি। ও বলল—সায়েন্সের কথা কী যেন বলছিলি আশু? খুব এগিয়ে গেছে না কী যেন।

আশু হাসল—কেন শালা তুমি জান না?

—জানি, জানি আমার অসুখ সেরে যাবে, সায়েন্স আমার জন্য ওষুধ বের করেছে, সব অসুখের জন্যই করবে। তারপর হাসল অনিন্দ্য—কিন্তু আমি শালা কোনও ওষুধ বের করিনি, কারও রোগ শোক দূর করবার কোনও যন্তর-মন্তর বের করিনি। এক নম্বরের স্বার্থপর, দাম্ভিক ঝগড়াটে এই আমাকে দ্যাখ আমি কিছুই করিনি এ-পর্যন্ত। আমার বাবা খেত খামার করে, জমি বাড়ায়, ধানের দাম কমলে হায়-হায় করে। আমি চাকরি করি, টাকা আনি, নিজের জন্য ভাবি। আমার বাবা বা আমি যে বংশ রেখে যাব তারাও অবিকল এরকমই কিছু করবে। সায়েন্স এগিয়ে গেল বলে আমার শালা গর্ব করার কিছু নেই। তাই না? পরের জন্য না ভাবলে সায়েন্স এগোয় না। আর আমি কেবল শালা নিজের কথা ভাবি। তোকে বলছিলাম না রমেন, নিজেকে ভালোবেসে কী হয়। দূর, নিজেকে ভালো করে দেখলে ভালোবাসাই যায় না। মাইরি, এ-রোগটা যখন আমার সত্যিই সেরে যাবে তখন বড় লজ্জা করবে আমার।

—কী বলছিস যা তা?

—বিশ্বাস কর সত্যিই লজ্জা করবে। যার জন্য কিছু করিনি সে যদি হঠাৎ এসে আমার মস্ত উপকার করে তাহলে যেরকম লজ্জা করে ঠিক সেরকম। বুঝলি রমেন, শোধ দেওয়া না গেলে খুব লজ্জার কথা। আমি সারাদিন শুয়ে-শুয়ে ভাবি আর লজ্জায় মরে যাই। মনে-মনে লোকজনের কাছে ক্ষমা চাই বলি—দ্যাখো আমার ভিতরে বিজ্ঞান নেই, পরোপকার নেই, সেবা নেই, ভালোবাসা নেই, তবু এই আমাকে আমি সারাদিন ভেবে যাচ্ছি। আমাকে ক্ষমা করো।

আস্তে-আস্তে বললাম—আমরা সবাই ওরকম।

—হবে। বলে চুপ করে গেল অনিন্দ্য।

আমরা উঠলাম যখন তখন অনিন্দ্যর জ্বর বেড়েছে। একটু কাশছে ও।

রাত সাতটা নাগাদ আমরা গাড়ি ধরার জন্য বেরোলাম। তখন অনিন্দ্য শুয়ে আছে ঘরের মধ্যে। দরজা থেকেই ডেকে বললাম—চলি রে, অনিন্দ্য।

—আচ্ছা, ঘোলাটে চোখে চেয়ে ও হাসল—আবার বড় দল নিয়ে আসিস। মুরগি খাওয়াব। সবাইকে বলিস যে আমার ভালো হওয়ার ইচ্ছে নেই, তবু সকলের জোর জবরদস্তিতে লজ্জার সঙ্গে আমি ঠিক ভালো হয়ে যাব।

হাসলাম।

ওর কাকা লণ্ঠন ধরে আমাদের অনেক দূর এগিয়ে দিয়ে গেল।

ফেরার পথে ফাঁকা রেলগাড়ির কামরায় আমরা চার সহকর্মী বন্ধু খুব বেশি কথাবার্তা বলছিলাম না। হয়তো বেশি খাওয়ার জন্য আমাদের ঝিমুনি আসছিল। হয়তো আমরা অনিন্দ্যর কথা ভেবে বিষণ্ণ ছিলাম। কিংবা কে জানে হয়তো নিজেদের কথা ভেবেই আমরা কেন যেন শান্তি পাচ্ছিলাম না।

ছবি

পলাশের ঘরে দুটো বড় জানলা, পুবের জানলা দিয়ে দেখা যায় উঁচু রেললাইন, মাথার ওপর ইলেকট্রিকের তার, সন্ধেবেলায় প্ল্যাটফর্মে নিয়নের আলো জ্বললে স্টেশনের পাশের নোংরা পুকুরটায় অদ্ভুত সুন্দর ছায়াছবি দেখা যায়। জাতীয় সড়ক রেললাইন ভেদ করে চলে গেছে, সেই সুন্দর রাস্তার দুপাশে ইটের খাঁচায় যত্নে লালিত হয়েছে গাছের চারা। একদিন জাতীয় সড়ক আরও সুন্দর হবে। এখনও ছোট্ট স্টেশনটায় দূরপাল্লার ট্রেন থামে না। না থামুক, কিন্তু জনবসতি বাড়ছে আশেপাশে। স্টেশনটা ক্রমশ হয়ে উঠছে জমজমাট। জাতীয় সড়কের দুধারে উঠছে বাড়ি, দোকানপাট, পেট্রোল পাম্প, পুবের জানলা খুললে পলাশ তাই সভ্যতার অগ্রগতির চিহ্নগুলো দেখতে পায়।

আশ্চর্য এই, পশ্চিমের জানলার ঠিক বিপরীতে একটা ছবি টাঙানো। এদিকে সূরযের খাটাল, প্রকাণ্ড চাতাল জুড়ে গোবরের কালচে রং, অনেক গাছগাছালির ছায়ায় গরু-মোষের জলপাত্র, খাবারের চাড়ি। কচুপাতার জঙ্গল, কাঁটাগাছের হলুদ ফুলে চারিদিক আকীর্ণ, মাঝে-মাঝে জলঢোঁড়া বা হেলে সাপ ব্যাং ধরলে মর্মান্তিক শব্দ ভেসে আসে। সন্ধের পর টেমি হাতে সূরযের বাড়ির লোকে উঠোনে ঘোরে! রাতে গরু-মোষের দাপানোর শব্দ পাওয়া যায়। মানু পশ্চিমের জানালাটা তাই সহজে খুলতে চায় না। বলে—মাগো, কী বিশ্রী গন্ধ! যা মশা!

পলাশ মানুর সঙ্গে খুব বেশি মেলামেশা করার সুযোগ পায় না! তার সময়টা এখন খারাপ যাচ্ছে। গতবছরও ছিল একটা বড় কাগজের প্রেস ফটোগ্রাফার, বেশ নাম করেছিল পলাশ। তার দু-একটা স্টিল ছবি প্রাইজও পায়। একটা ছবি ছিল এইরকম—খুব বৃষ্টির মধ্যে আবছা একটা গোলপোস্টের সমকোণ দেখা যাচ্ছে, পেছন দিকটা ওয়াশ-এর ছবির মতো ধোঁয়াটে, সেই ধোঁয়াটে রহস্যময় পটভূতিতে দাঁড়িয়ে বয়স্ক এক গোলকিপার, কালো পুরোহাতার জামা গায়ে, হাতে কালো দস্তানা, পায়ে হোস, বুট। সে একটু সামনের দিকে

ঝুঁকে দাঁড়িয়ে, তার সামনে একটা সাদা বল পড়ে আছে। বলটার দিকে তার বাড়ানো হাত, আর মুখে সীমাহীন ক্লান্তি। এই ছবি। ছবিটায় কিছু নেই, কিন্তু তবু একটি মানুষের সারাজীবনের লড়াইয়ের গল্পটি যেন বলা আছে। পলাশের এই ছবি অনেকে মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখেছে একদিন। এইসব ছবি তুলেছিল পলাশ, আর তুলেছিল কিছু বিপজ্জনক ছবি। পুলিশের লাঠি-গুলির ছবি। নেতাদের অবসর মুহূর্তের ছবি। দুর্ঘটনার ছবি। ছবির চোখ ছিল বটে পলাশের। কাগজের সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল ভালোই। কিন্তু অতিরিক্ত স্পর্শকাতর লোকেরা চাকরি টিকিয়ে রাখতে পারে না। পলাশ গতবছর চাকরিটা ছেড়েছে। মানু তার স্বামী সম্বন্ধে যখন আশাবাদী হয়ে উঠেছিল ঠিক তখনই এই অঘটন। ভারী হতাশ হয়ে মানু বলেছিল—

—চাকরিটা ছেড়ে দিলে? এখন কী হবে?

—চাকরিটা করা যাচ্ছে না মানু। আমি ছবি তুলি, সেই ছবিগুলো লোকে দেখুক আমি তাই চাই। কিন্তু ওরা ছাপছে না। ছবিগুলো ওদের পলিসির উলটোদিকে যাচ্ছে।

মানু সব কথা বোঝে না। সে কেবল বোঝে কিছু ছবি ছাপা হয়, কিছু হয় না। যেগুলো ছাপা হয় না সেগুলো হতে নেই বলেই হয় না, সব ছবি কি ছাপা হতে আছে? মা গো! পলাশ বিয়ের পর মানুর অনেক ছবি তুলেছিল, তার মধ্যে অনেকগুলো ছিল যাতে মানুর গায়ে একবিন্দু পোশাক নেই! কখনও বনদেবী, কখনও বা ভেনাস সাজিয়েছিল তাকে পলাশ। সে সব ছবি কি তারা দুজন ছাড়া আর কারও দেখতে আছে? তবে!

পলাশ বড় একগুঁয়ে। সে বাড়িতে ফিরে তার ক্যামেরা খুলে ফিল্ম বের করে। বাথরুমের পাশের ছোট্ট ঘরটা ডার্করুম করেছে সে। সেইখানে ঢুকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটায়। তারপর একদিন ছবিগুলো বের করে এনে বিছানায় ওপর তাসের মতো বিছিয়ে দেয় সে। কখনও কাছ থেকে, কখনও দূর থেকে অনেকক্ষণ ধরে ছবিগুলো দেখে। একা-একা কথা বলে তখন। সেইসব ছবি অনেক দেখেছে মানু। পলাশ মগ্ন হয়ে নিজের তোলা ছবি থেকে চোখ তুলে কখনও-কখনও অচেনা মানুষকে দেখার চোখে মানুকে দেখেছে। অন্যমনে বলেছে—দ্যাখো, দ্যাখো তো—এ সবই কি এই দেশের সত্য ছবি নয়?

হবেও বা, মানু অত জানে না, শেষ দিকে পলাশের তোলা বেশির ভাগ ছবিই নাকচ হয়ে যাচ্ছিল। ছাপা হচ্ছিল না। কিন্তু তাতে কী? স্থায়ী চাকরির মাইনেটা পলাশ পেয়ে যাচ্ছিল ঠিকই। কোনও গোলমাল ছিল না সেখানে। কিন্তু চাকরির চেয়ে ছবির নেশা পলাশের অনেক বেশি।

—এই সবই এই দেশের সত্য ছবি। মানু, খবরের কাগজের জন্য শিল্প নয়। তার ছবি আলাদা। আমি থাকতে পারব না।

মানু চমকে বলেছে—তা কেন? চাকরি চাকরিই, তোমার ছবি তুমি তুলে বেড়াও না। কে দেখতে যাচ্ছে?

পলাশ মাথা নেড়েছে—আমি বুঝতে পারছি, চাকরি ছাড়লেই আমি এক বিশাল ছবির রাজ্যে চলে যেতে পারব। ছবি ছাড়া আমি যে আর কিছু বুঝি না।

মানু খুব সাধারণ ঘরের মেয়ে, তাদের বাড়িতে কেউ কোনও শিল্পচর্চা করেনি। বাবা একসময়ে শৌখিন থিয়েটার করতেন, ছোটভাইটা তবলা ঠোকে। বাস, এর বেশি কিছু না! পলাশের মতো মানুষ মানু, তাই আর দেখেনি। ফলে, সে পলাশের দুঃখটুঃখগুলো সঠিক বুঝতে পারে না কোনওদিনই, কখনও বা পলাশকে তার ভয় হয়, কখনও বা পলাশের ওপর খুব রাগ হয় তার।

পলাশ তাকে এই বলে ভোলাত—দেখো মানু, আমি ফ্রিল্যান্সে অনেক বেশি রোজগার করব।

মানু তাতে ভোলেনি, কিন্তু পলাশ গতবছর চাকরিটা ছেড়েছিল ঠিকই। বড় দায়িত্ব-জ্ঞানহীন মানুষ পলাশ। তাদের এখন দু-দুটো বাচ্চা। বড়টা ছেলে, তার নাম চিত্রার্পিত—পলাশেরই রাখা নাম। চিত্রার্পিতের ছয় বছর বয়স চলছে। ছোটটি মেয়ে—নাম সোনারেখা—তার বয়স তিন। এই বাড়ন্ত ছেলেমেয়ের বাবা কোন আক্কেলে যে চাকরি ছাড়ে।

এখন আর পলাশের সময় নেই! কোন সকালে ক্যামেরা ঘাড়ে করে বেরোয়, রোদে-রোদে ঘোরে সারাদিন। তার মুখ হয়ে যাচ্ছে রুক্ষ, গায়ে লাবণ্য কমে যাচ্ছে। গায়ে প্রায়দিনই ময়লা পোশাক থাকে, গালে দাড়ি বেড়ে যায়, সানগ্লাস পরে থাকে বলে ওর চোখের চারপাশে একটা সাদা ভাব। ভারী ক্লান্ত হয়ে রাতে ফেরে পলাশ। কারও দিকে তাকায় না। জামাকাপড় ছেড়ে একটা কালো অ্যাপ্রন পরে ডার্করুমে ঢুকে যায়। লাল আলো জ্বেলে ক্যামেরা আনলোড করে, সেখানে বসেই এককাপ চা খায়, তারপর আলো নিভিয়ে দরজা বন্ধ করে দেয়। ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা কেটে যায় তার ডার্করুমে। মানুর সঙ্গে তার মেলামেশা নেই-ই প্রায়, চিত্র আর সোনাও ক্রমেই বাপকে ভুলে যাচ্ছে। কখনও ভুলেও তাদের কাছে ডাকে না পলাশ, আদর করে না। মানু মাঝে-মাঝে বলে—তুমি কি আমার পেয়িং গেস্ট?

পলাশ কথাটার অর্থ না বুঝে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে। তারপর কোনওদিন বা হাসে, কোনওদিন নিজের মধ্যে ডুবে থাকে।

এক-একদিন পলাশ বাড়িতে থাকে। সারাদিন অজস্র ছবি ডার্করুম থেকে বের করে বিছানার ওপর তাসের মতো সাজায়। কখনও দূর থেকে, কখনও কাছ থেকে দেখে। ছবি দেখায় এক সময়ে নিশ্চয়ই ক্লান্তি আসে পলাশের। তখন সে মাঝে-মাঝে পুবের জানলার কাছে দাঁড়িয়ে বাইরে চেয়ে থাকে। মানু বুঝতে পারে, এই জানলাটা পলাশের প্রিয় নয়। এ জানলা দিয়ে যখন তাকিয়ে থাকে পলাশ, পুব আকাশের উজ্জ্বল আলোর আভা যখন তার মুখে এসে পড়ে, তখন তাকে ভারী নির্জীব দেখায়। হতাশা ফুটে ওঠে তার রুক্ষ মুখে। সে মাঝে-মাঝে মানুকে ডেকে বলে—এ জায়গাটা খুব কমার্শিয়াল হয়ে যাচ্ছে, দেখেছ! কত দোকানপাট উঠছে!

মানু বলে ভালোই তো।

—ভালো কেন?

—বাঃ। কলকাতার এত কাছে একটা জায়গা, চিরকাল কি তা গ্রাম হয়ে থাকতে পারে? কলকাতার প্রভাব আছে না? আমার বাপু, দোকানপাট, আলো, মানুষজন ভালো লাগে।

পলাশ অন্যমনে জানালাটা দিয়ে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ আস্তে-আস্তে বলে—জায়গাটা মরে যাচ্ছে।

তারপর শ্বাস ফেলে আবার নিজের তোলা অজস্র ছবির মধ্যে হারিয়ে যায়।

এ কথা ঠিক যে পলাশের রোজগার অনেক কমে গেছে। যত তার ঘোরাঘুরি তত তার রোজগার নয়। বাড়িতে ছবি জমে পাহাড় হচ্ছে, তার ক'টাই বা বিক্রি হয়? তার ওপর আছে সরঞ্জামের খরচ। সব কিছুরই দাম বেড়ে যাচ্ছে। তবু সংসার চলে যায়। এক-এক সময়ে বেশ কিছু টাকা এনে ফেলে পলাশ, এক-এক সময়ে দিনের-পর-দিন টাকার ছবি দেখা যায় না। পলাশের চারটে দামী ক্যামেরায় অজস্র ছবি আসে, টাকা আসে না। সেজন্য পলাশের তাপ উত্তাপ নেই, মানুর আছে। কিন্তু মানু ঝগড়া করে না। পলাশকে সে কখনও ভয় পায়, কখনও বুঝতে পারে না, কখনও পলাশের ওপর রাগ করে গুম হয়ে থাকে।

যেদিন পলাশ বাড়িতে থাকে সেদিন প্রায় সময়েই দুপুরবেলা সে পশ্চিমের জানালাটা খুলে একটা চেয়ার টেনে বসে থাকে। দুপুরে ঘুমোনোর অভ্যাস পলাশের নেই। কিন্তু তখন মানু ঘুমোনোর চেষ্টা করতে গিয়ে কেবল এপাশ-ওপাশ করে। কারণ, পশ্চিমের জানালা দিয়ে আসে খাটালের বিশ্রী গন্ধ, উড়ে আসে মশা, পোকামাকড়, খড় কাটার শব্দ। কিন্তু তবু পশ্চিমের জানালাটা পলাশের প্রিয়। জানালার ওপর একটা মহানিমের ছায়া নিবিড় হয়ে থাকে। সেই ছায়ায় স্নিগ্ধ দেখায় পলাশের মুখ! তার মুখের রুক্ষ রেখাগুলি

কোথায় মিলিয়ে যায়। দুই ঘুমহীন চোখে স্বপ্নেরা ভিড় করে আসে। চেয়ারটা পিছনে হেলিয়ে জানলার চৌকাঠে পা তুলে বসে পলাশ চেয়ে থাকে। তার মাথার ওপর দেওয়ালে সেই গোলকিপারের বিখ্যাত বাঁধানো ছবিটা দেখা যায়। সামনে সাদা বলের দিকে হাত বাড়িয়ে এক ধোঁয়াটে পটভূমিতে দাঁড়িয়ে বয়স্ক গোলকিপার, তার মুখের ওপর দিয়ে বৃষ্টির ফোঁটা তীরের মতো নেমে আসছে, কপালের ওপর লেপটে আছে, তার মুখে গভীর হতাশা। পশ্চিমের মহানিমের শান্ত ছায়া পড়ে সেই গোলকিপারের মুখেও, বড় অদ্ভুত দেখায় তাকে। সে যেন একটি মুহূর্তের ভঙ্গির ভিতর দিয়ে তার সারা জীবনের গল্প নীরবে বলে যাচ্ছে। বড় কষ্ট হয় মানুর, সে গোলকিপারের মুখ থেকে চোখ সরিয়ে নেয়। পলাশের মুখ থেকেও। ঘুমঘোরে সে মনে আনতে চেষ্টা করে—সে ভেনাসের সুন্দর ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে। ঠোঁট টিপে একা হাসে মানু। মনের বিষাদ উড়ে যায়।

আস্তে-আস্তে গড়িয়ে যায় শান্ত দুপুর। বিকেলে চায়ের সময় হয়ে আসে। মানু শ্লথ শরীরে আধোঘুম থেকে উঠে তখনও দেখে পলাশ পশ্চিমের জানলার কাছে চুপ করে বসে আছে। গাছগাছালির ভিতর দিয়ে রাঙা রোদ এসে পড়েছে তার রুক্ষ মুখে। মুখটা কোমল দেখাচ্ছে।

—কী দেখছ সারা দুপুর বসে-বসে? মানু জিগ্যেস করে।

পলাশ মুখ ফিরিয়ে হাসে। বলে—কী জানি! এদিকটা দেখতে আমার বেশ লাগে। ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে যায়।

যখন মানু চা এনে পলাশের হাতে দেয়, তখনও পলাশের ঘোর কাটেনি, স্তব্ধ হয়ে আছে। চা নিয়ে মানুর দিকে চেয়ে বলে—আমাদের গ্রামের বাড়িতে এইরকম একটা উঠোন ছিল। তার পশ্চিমে গোয়ালঘর, দক্ষিণে ঢেঁকিঘর, ঢেঁকিঘরের পিছনে পুকুর! আমরা এরকম বিকেলে উঠোনে খেলতে-খেলতে শুনতাম ঢেঁকিঘরে পাড় দেওয়ার শব্দ। উঠোনে খুব আলোছায়ার খেলা ছিল। পুকুরের আঁশটে গন্ধ ভরভর করত বাতাসে, গোবর-নিকোনো উঠোন থেকে সিঁদুর তুলে নেওয়া যেত! মানু, এই পশ্চিমের জানালাটা আমার অতীত, আমার নস্টালজিয়া। এই জানালা খুললেই আমি আমার দাদুকে দেখি—ওই দক্ষিণের ঘরের দাওয়ায় বসে তামাক টানতে-টানতে সুনীলকে বকছেন, বাবাকে দেখি—দুপুরে ছিপ ফেলে মাথায় গামছা দিয়ে পুকুরপাড়ে বসে আছেন, মাকে দেখি—স্নান সেরে ভেজা পায়ের ছাপ উঠোনে ফেলে ঘরে যাচ্ছেন, ঠোঁটে আদ্যার স্তব—ভেজা শাড়ি থেকে জলকণা ছড়িয়ে পড়ছে—কী ঠান্ডা গা ছিল মায়ের। পৃথিবীতে কত ছবি মুছে গেছে—সব ক্যামেরায় আসে না—কিছুতেই আসে না।

পশ্চিমের জানালার আলো মরে যায়। টিমটিমে টেমি জ্বলে ওঠে সূরযের খাটালে। তাতে মহানিমের ছায়ায় অন্ধকার আরও গাঢ় হয়ে জমে ওঠে। রাত্রির চোখ গড়িয়ে নামে। পুবের জানালায় তখন নিয়নের আলো দেখা যায়, জাতীয় সড়কের দোকানপাট ঝকমকিয়ে ওঠে, পেট্রোল-পাম্পের আলো জ্বলতে এবং নিভতে থাকে, আলো জ্বেলে দৌড়ে যায় লরি। পুবের জানালার কাছে দাঁড়িয়ে দাঁতে ফিতে চেপে চুল বাঁধে মানু। দেখে দোকানপাট, প্ল্যাটফর্ম, ইলেকট্রিক ট্রেন, লোকজন। তখন এক-এক সময়ে মানু মুখ ফিরিয়ে জিগ্যেস করে—আর, এ দিকটা দেখলে তোমার কিছু মনে হয় না?

পলাশ আধো-অন্ধকারে মুখ ফেরায়। তার মুখে স্টেশন আর জাতীয় সড়কের আলোর আভা এসে পড়ে, দ্রুত তার মুখে আবছা আলোর আভা ফেলে দৌড়ে যায় লরি, পলাশ মাথা নেড়ে বলে—হয়, মনে হয় আমি ওই জগতের কেউ না। আমি বাইরের লোক।

—কেন এরকম মনে হয়?

—কী জানি!

মানু হাসে—আমি জানি। যা নড়েচড়ে, যা জীবন্ত, তার কিছুই তোমার ভালো লাগে না। তুমি ছবির রাজ্যে বাস করতে-করতে এখন আর যার গতি আছে এমন কিছু পছন্দ করো না।

পলাশ হাসে, বলে—বাঃ মানু, তুমি কী সুন্দর সাজিয়ে বললে! বাঃ!

তারপর অন্ধকার ঘরে বসে পলাশ আবার পশ্চিমের জানালা দিয়ে বাইরে গাঢ় অন্ধকারের দিকে চেয়ে থাকে।

রাস্তা। একটা বাস স্টপ। খুব ভিড়। একটা ডবল-ডেকার থেমে আছে। তার পাদানিতে মানুষজনের প্রচণ্ড জড়াজড়ি। উদ্যত হাত-পা বাড়িয়ে বাস স্টপের মানুষেরা সেই ভিড় ভেদ করার চেষ্টা করছে। তাদের মুখে উগ্রতা; ব্যগ্র, নিষ্ঠুর চেষ্টায় তাদের সকলের মুখই প্রায় একরকম দেখাচ্ছে। এই দৃশ্যটা পটভূমি। সামনে রাস্তার ধারে বসে আছে উনিশ-কুড়ি বছরের একটা ময়লা কাগজ-কুড়নি ছেলে। জরাজীর্ণ তার চেহারা। ক্ষুধার্ত মুখ। পাশে বস্তাটা নামিয়ে রেখে সে বসে দেখছে রাস্তার পিচের ওপর কারা যেন এঁটো খাবার অজস্র ফেলে গেছে। লুচির টুকরো, মাংসের হাড়, ভাতের স্তূপ। ছেলেটা উবু হয়ে বসে তার ব্যগ্র একখানা হাত বাড়িয়েছে সেই রাস্তার ওপরকার খাবারের দিকে। ছবিটা এই।

ডার্করুমে টোকা দিয়ে চা দিতে ঢুকে মানু দেখল, টেবিল-ল্যাম্পের উজ্জ্বল আলো জ্বেলে পলাশ ছবিটা দেখছে। পলাশের ঘাড়ের ওপর দিয়ে মানুও দেখল। এরকম নগ্ন দৃশ্য মানু বাস্তবে কখনও দেখেনি। দেখতে-দেখতে তার বুক ব্যথিয়ে উঠল। চোখে জল এসে গেল।

সে প্রায় রুদ্ধগলায় বলল—ইস গো, কী অদ্ভুত ছবিটা!

পলাশ মুখ তুলল। তার মুখে স্পষ্ট হতাশা। হাত বাড়িয়ে চা নিল সে। দু-একটা চুমুক দিয়ে মাথা নাড়ল আপনমনে। বিড়বিড় করল। তারপর মানুর দিকে চেয়ে বলল—তবু এ ছবিতে সত্য দৃশ্যটা নেই।

—নেই কী গো! ছবিটা দেখলে বুক কেঁপে ওঠে। কান্না আসে।

পলাশ অনেকক্ষণ চুপ করে চা খেয়ে গেল। তারপর আবার মাথা নেড়ে বলল—নেই। ছবিটায় কী যেন নেই।

—কী নেই?

পলাশ আবার চুপ করে থাকে। তারপর আস্তে-আস্তে বলে—যখন এই দৃশ্যটা আমি দেখেছিলাম তখন কিছুতেই বুঝতে পারছিলাম না এই দৃশ্যের মধ্যে কোন বিষয়টা সবচেয়ে ইম্পর্ট্যান্ট। ওই ব্যগ্র অফিস-যাত্রীরা, না ওই ছেলেটা, না কি ওই রাস্তার ওপরকার খাবারের স্তূপটা—কোনটাকে ছবির মাঝখানে রাখব, কোনটা হবে বিষয়, আর কোনটাই বা পটভূমি! সময় হাতে নেই, কারণ, দৃশ্যটা ক্ষণস্থায়ী, ফটোগ্রাফারের জন্য কেউ কোনও দৃশ্য ধরে রাখে না বেশিক্ষণ। তাই আমি দৌড়ে চারপাশে ঘুরছিলাম, বারবার ক্যামেরা তুলে দেখছিলাম ভিউ-ফাইন্ডারে কোনটাকে সমচেয়ে ইম্পর্ট্যান্ট দেখায়। সবচেয়ে যেটা ভালো মনে হয় সেটা তুলে নিলাম। তারপরই বাসটা ছেড়ে দিল, দৃশ্যটা ভেঙে গেল। ছবিটা উঠলও সুন্দর। তবু মানু, ছবিটাতে কী যেন নেই।

—কী সেটা? মানু ব্যগ্র প্রশ্ন করে।

পলাশ চুপ করে কপালে এসে পড়া চুলে ঘুরলি পাকায় আঙুল দিয়ে। অস্থির বোধ করে। তারপর হঠাৎ হাত বাড়িয়ে আলো নিভিয়ে দেয়।

অন্ধকারে পলাশ হাত বাড়িয়ে মানুর হাত ধরে।

বলে—মানু চারিদিকে এই যে অন্ধকার, সেটা কেমন?

—ভীষণ।

—এই অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না। অথচ আমরা টের পাচ্ছি যে আমি আছি তুমিও আছ। না?

—আছি তো।

—এই অন্ধকারের কি ছবি হয়? সেই ছবিতে কি বোঝানো যায় যে, তার ভিতরে আমি এবং তুমি দুজনেই আছি?

মানু চুপ করে থাকে।

পলাশ আবার আলোটা জ্বেলে হতাশার হাসি হাসে—হয় না। মানু, ওরকম ছবি হয় না। ছবিটার ওপর আলোটা নামিয়ে আনে পলাশ। বলে—এই ছবিতে একটা অন্ধকার রয়েছে। তার মধ্যে আছে আরও কিছু। কিন্তু তা ছবিতে ধরা পড়েনি।

হাতের কাছেই পড়ে আছে একটা জাইস-ইকন। সেটা তুলে নিয়ে ঝাঁকায় পলাশ। তারপর সেটা অবহেলায় ফেলে দিয়ে বলে—ক্যামেরার সাধ্য বড় কম। কেন কম মানু?

মানু চুপ করে থাকে।

পলাশ ধীরে-ধীরে অন্যমনস্ক হয়ে যায় আবার। আপনমনে বে-খেয়ালে বলে—আমার বুকে কত ছবি জমে আছে।

মাঝে-মাঝে হাওয়া দিলে দেওয়ালে গোলকিপারের ছবিটা দোল খায়। দুপুরের আধো-ঘুমঘোরে মানু চেয়ে দেখে। বয়স্ক মানুষটা সাদা বলের দিকে হাত বাড়িয়ে ঝুঁকে আছে। মাঝখানে অনন্ত দূরত্ব। অবিরল বৃষ্টি ধারায় ভিজে যাচ্ছে সে, মুখে অফুরান হতাশা। ছবিতে ওই বৃষ্টি থেমে কোনদিন রোদ উঠবে না। অনন্ত দূরত্ব থেকে যাবে বলটির সঙ্গে বয়স্ক মানুষটার। ছবিটা দোল খায়। একটা গল্প বলতে থাকে।

সেখান থেকে ঝুপ করে মানুর চোখ নেমে আসে। পশ্চিমের খোলা জানালায় পা তুলে নিঃঝুম বসে আছে পলাশ। মহানিমের নিবিড় ছায়া তাকে ঘিরে আছে। পলাশের রুক্ষ মুখের রেখাগুলি মিলিয়ে গেছে। তার ঘুমহীন চোখে স্বপ্নের ভিড়।

মানু টের পায়, পলাশের শরীরের ভিতরকার অন্ধকারে অজস্র ছবির জন্ম হচ্ছে। ভেঙে যাচ্ছে আবার। তাই মহানিমের ছায়া কোলে করে ও বসে আছে অমন। কারণ, ও জানে, সব ছবিই পৃথিবীর আলোতে আসে না। পুবের জানলা দিয়ে দেখা যায় অগ্রসরমান পৃথিবীর ছবি, জাতীয় সড়ক, দোকানপাট, দৌড়ে যাওয়া লরি। পশ্চিমের জানালায় মহানিমের ছায়া। দেওয়ালে বয়স্ক গোলকিপারের ছবি। তার নীচেই পলাশ।

চেয়ে থাকতে-থাকতে কখনও-কখনও মানুর চোখে জল চলে আসে। সে মুখ ফিরিয়ে নেয়। জোর করে মনে করার চেষ্টা করে তার সেই ভেনাসের সুন্দর বিভঙ্গ। আধো-ঘুমে সে মুখ টিপে হাসে।
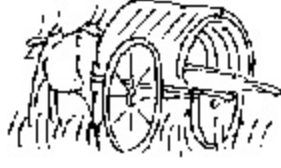
দূরত্ব

মন্দার টেবিলের ওপর শুয়ে ছিল। থার্ড পিরিয়ড তার অফ। মাথার নীচে হাত, হাতের নীচে টেবিলের শক্ত কাঠ। বুকের ওপর ফ্যান ঘুরছে। শরীরটা ভালো নেই ক'দিন। সর্দি। ফ্যানের হাওয়াটা তার ভালো লাগছিল না। কিন্তু বন্ধ করে দিলে গরম লাগবে ঠিক। শার্টের গলার বোতামটা আটকে সে শুয়ে ছিল। ক্রমে ঘুম এসে গেল। আর ঘুম মানেই স্বপ্ন, কখনও স্বপ্নহীন ঘুম ঘুমোয় না মন্দার।

স্বপ্নের মধ্যে দেখল তার বউ অঞ্জলিকে। খুব ভিড়ের একটা ডবল-ডেকার থেকে নামবার চেষ্টা করছে অঞ্জলি। অঞ্জলির কোলে একটা কাঁথা-জড়ানো আঁতুরের বাচ্চা। নীচের মানুষরা অঞ্জলিকে ঠেলে উঠবার চেষ্টা করছে, পিছনের মানুষরা নামবার জন্য অঞ্জলিকে ধাক্কা দিচ্ছে, চারিদিকের লোকেরা অঞ্জলিকে কনুই দিয়ে ঠেলছে, সরিয়ে দিচ্ছে, ধাক্কা মারছে, তার মুখখানা কাঁদো-কাঁদো, কোলের বাচ্চাটা ট্যাঁট্যাঁ করে কাঁদছে, কোনও দিকেই যেতে পারছে না সে। নামতেও না, উঠতেও না, বাচ্চাটা অঞ্জলির শরীর ভাসিয়ে বমি করে দিল, পায়খানা করল, পেচ্ছাপ করছে। চারিদিকে রাগি, বিরক্ত, ব্যস্ত মানুষরা চেঁচাচ্ছে, গাল দিচ্ছে, যেন বাচ্চাসুদ্ধু অঞ্জলি জাহান্নামে যাক, না গেলে তারাই পাঠাবে। ঘুমের মধ্যেই মন্দার ভিড় ঠেলে অঞ্জলির কাছে যাওয়ার চেষ্টা করছিল আকুলভাবে। কিন্তু প্রতিটি লোকই পাথর। কাউকে ঠেলে সরাতে পারছে না মন্দার। সে চেঁচিয়ে বলছিল— আমি কিন্তু নেমে পড়েছি অঞ্জলি, তোমাকেও নামতে হবে-এ। নামো, শিগগির নামো, বাস ছেড়ে দিচ্ছে। কিন্তু সেই স্বর এত দুর্বল যে ফিসফিসের মতো শোনা গেল। ক্রুদ্ধ কন্ডাক্টর ডবল ঘণ্টি বাজিয়ে দিচ্ছে...অঞ্জলির কী যে হবে!

দুঃস্বপ্ন। চোখ খুলে মন্দার বুকের ওপর ঘুরন্ত পাখাটা দেখতে পায়। পাশ ফিরে শোয়।

অঞ্জলি এখন আর তার ঠিক বউ নয়। মাসছয়েক আগে মন্দার মামলা দায়ের করেছিল। আপসের মামলা। সেপারেশন হয়ে গেছে। অঞ্জলি যখন চলে যায় তখন তার

পেটে মাসদুয়েকের বাচ্চা। এতদিনে বোধহয় বাচ্চা হয়েছে, মন্দার খবর রাখে না। দেখেনি। ছেলে না মেয়ে, তা জানতে ইচ্ছেও হয়নি। কারণ, বাচ্চাটা তার নয়।

বিয়ের সাতদিনের মধ্যে ব্যাপারটা ধরতে পারল মন্দার। তখনই মাসদুয়েকের বাচ্চা পেটে অঞ্জলির। তা ছাড়া, অঞ্জলির ব্যবহারটাও ছিল খাপছাড়া। কথার উত্তর দিতে চাইত না, ভালোবাসার সময়গুলিতে কাঁটা হয়ে থাকত। তবু দিনসাতেক ধরে অঞ্জলিকে ভালোবেসেছিল মন্দার। মেয়েদের সংস্পর্শহীন জীবনে অঞ্জলি ছিল প্রথম রহস্য। দিনসাতেকের মধ্যেই বাড়িতে অঞ্জলিকে নিয়ে কথাবার্তা শুরু হয়। মন্দারের কানে কথাটা তোলে তার ছোট বোন। শুনে মন্দারের জীবনে এক স্তব্ধতা নেমে আসে। অঞ্জলি অস্বীকার করেনি। মন্দার সোজা গিয়ে যখন অঞ্জলির বাবার সঙ্গে দেখা করে তখন সেই সুন্দর চেহারার বৃদ্ধটি কেঁদে ফেলেছিলেন, আত্মপক্ষ সমর্থনে একটিও কথা বলেননি। শুধু বলেছিলেন—ওর সিঁথিতে সিঁদুরের দরকার ছিল, আমি সেটুকুর জন্য তোমাকে এই নোংরামিতে টেনে নামিয়েছি। ওকে তুমি ফেরত দেবে জানতাম। যদি একটি কথা রাখো, ওর ছোট বোনের বিয়ে আর দু-মাস বাদে, সব ঠিক হয়ে গেছে, শুধু এই ক'টা দিন কথাটা প্রকাশ কোরো না। মামলা তারপর দায়ের কোরো। আমি কথা দিচ্ছি, মামলা আমরা লড়ব না।

অঞ্জলি ফেরত গেল বিয়ের দশ দিনের মাথায়। দু-মাস অপেক্ষা করে মামলা আনে মন্দার। অঞ্জলি লড়ল না, ছেড়ে দিল। অঞ্জলির সঙ্গে আর দেখা হয়নি। বিয়ের পর আট মাস কি ন'মাস কেটে গেছে। মন্দার এখনও কেমন বেকুবের মতো স্তব্ধ হয়ে থাকে।

পাশ ফিরে শুতেই দেখা যায়, বইয়ের আলমারি। আলমারির ওপরেই উইপোকার আঁকাবাঁকা বাসা। সেদিকে চেয়ে থেকে সে স্বপ্নটা কেন দেখল তা মনে-মনে নাড়াচাড়া করল একটু। আসলে স্বপ্নের তো মানে থাকে না। আর এ তো ঠিকই যে অঞ্জলির কথা সে এখনও ভুলে যায়নি। এসব কি ভোলা যায়?

আজ মঙ্গলবার। আজই তার দুটো ক্লাস। একটা সেকেন্ড পিরিয়ডে নিয়েছে, আর একটা ফিফথ পিরিয়ডে নেওয়ার কথা। এ সময়টায় কলেজে ক্লাশ বেশি থাকে না। পি. ইউতে এখনও ছেলে ভরতি হয়নি, পার্ট টু বেরিয়ে গেছে। সপ্তাহে দু-দিন ছুটি থাকে তার, অন্য দিন একটা দুটো ক্লাস নেয়, বাকি সময়টা শুয়ে থাকে। কেউ কিছু বলে না। সকলেই জেনে গেছে, মন্দার চ্যাটার্জির ডিভোর্স হয়ে গেছে, তার মন ভালো না, সে একটু অস্বাভাবিক মানসিকতা নিয়ে কলেজে আসে। এসব ক্ষেত্রে একটু আধটু স্বেচ্ছাচার সবাই মেনে নেয়। মন্দার টেবিলে উঠে শুয়ে থাকলেও কেউ কিছু বলে না। থার্ড পিরিয়ড চলছে, ঘরে কেউ নেই, মন্দার একা। আবার ঘুমোতে তার ইচ্ছে করছিল না। ওই ঘটনার পর

কয়েকটা দিন খুবই অস্বাভাবিক বোধ করছিল ঠিকই। বোধ হয় তার সাময়িক একটা মাথা খারাপের লক্ষণও দেখা গিয়েছিল। কিন্তু এখন আর তা নয়। সময়, সময়ের মতো এমন সান্ত্বনাকারী আর কেউ নেই। মন্দারের মনে সময়ের স্রোত তার পলির আস্তরণ দিয়ে দিয়েছিল। আজ হঠাৎ ওই দুঃস্বপ্ন।

বেয়ারাকে ডেকে এক পেয়ালা চা আনিয়ে খেল মন্দার। তারপর ছেলেদের খবর পাঠাল, ফিফথ পিরিয়ডের ক্লাসটা আজ সে করবে না। অনেকদিন ধরে বৃষ্টি নেই, বাইরে একটা চমকানো রোদ স্থির জ্বলে যাচ্ছে। বাইরে মন্দারের জন্য কিছু নেই। সম্পর্ক স্বাভাবিক হলে এতদিনে তার একটা বাচ্চা হতে পারত। আর তাহলে এখন মন্দার এই ক্লাস ফাঁকি দিয়ে সেই শিশুটির কাছেই ফিরে যেত হয়তো বা সেই শিশু শরীরের গন্ধটি শ্বাসে টেনে নিতে।

এতবড় জোচ্চুরি যে টেঁকে না, তা কি অঞ্জলি জানত না? তার বাবাও কি জানত না? তবে তারা খামোখা কেন ওই কাণ্ড করল? কেবল একটু সিঁদুরের জন্য কেউ কি একটা লোকের সারাজীবনের সুখ কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করে? কীরকম বোকামি এটা? দু-মাসের বাচ্চা পেটে লুকিয়ে রেখে বিয়ে—ভাবা যায় না, ভাবা যায় না।

স্বপ্নে দেখা অঞ্জলির অসহায় ব্যথাতুর মুখখানার প্রতি যে সমবেদনা জন্মলাভ করেছিল তা ঝরে গেল। জাগ্রত মন্দারের ভিতরটা হঠাৎ আক্রোশে রাগে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু কিছু করার নেই। ট্রামে বাসে অচল আধুলি পেয়ে ঠকে যাওয়ার মতোই ঘটনা। কিছু করার থাকে না। অঞ্জলি আজও তার নামে সিঁদুর পরে কি না কে জানে।

মন্দার বেরিয়ে একটা ট্যাক্সি ধরল। গরমের দুপুর রাস্তা ফাঁকা। সে ট্যাক্সিটায় বসে ঘাড় এলিয়ে স্বপ্নটার কথা না ভেবে পারে না। ভিড়ের ভিতর একটা ডবল-ডেকার থেকে নামতে পারছে না অঞ্জলি, কোলের বাচ্চাটা তারা সারা শরীর ভাসিয়ে দিচ্ছে নিজের শরীরের আভ্যন্তরীণ ময়লায়, ক্বাথে। নিষ্ঠুর মানুষেরা অঞ্জলিকে ঠেলছে, ধাক্কা দিচ্ছে, গাল এবং অভিশাপ দিচ্ছে। এই স্বপ্নের কোনও মানে হয় না। অঞ্জলির সঙ্গে তার আর দেখা হয়নি। দেখা হওয়ার কথাও নয়। এখন সে কি তার প্রেমিকের ঘর করছে? কে জানে! স্বপ্নে মন্দার অঞ্জলিকে সেই ভিড় থেকে, অপমান লাঞ্ছনা আর বিপদ থেকে উদ্ধার করার চেষ্টা করেছিল। পারেনি। জাগ্রত মন্দার কোনওদিনই সেই চেষ্টা করবে না।

ট্যাক্সিওয়ালাটা খোঁচায়। কেবলই ঘাড় ঘুরিয়ে জিগ্যেস করে—কোথায় যাবেন?

মন্দার বিরক্ত হয়ে বলে—সোজা চলুন, বলে দেব।

কিছুক্ষণ দিক ঠিক করতে সময় গেল। কলকাতার কত অল্প জায়গা চেনে মন্দার। তার চেনা মানুষের সংখ্যাও কত কম। এখন এই ট্যাক্সিতে বসে কারো কথাই তার মনে পড়ে না যার কাছে যাওয়া যায়। কোনও জায়গাও ভেবে পায় না সে যেখানে গিয়ে নিরিবিলিতে একটু বসে থাকবে। বাসায় ফেরার কোনও অর্থ নেই। সেখানে পলিটিক্যাল সায়েন্সের গাদাগুচ্ছের বইতে আকীর্ণ ঘরখানা বড্ড রসকষহীন। গত কয়েকমাস সেই বই প্রায় ছোঁয়নি। থিসিসের কিছু পাতা লেখা হয়েছিল, পড়ে আছে। ঘরে কেবল বিছানাটাই মন্দারের প্রিয়। যতক্ষণ ঘরে থাকে, শুয়েই থাকে মন্দার। ঘুমোয়, ভাবে, সিগারেট খায়। আজকাল কেউ ঘরে ঢোকে না ভয়ে।

ট্যাক্সিটা কিছুক্ষণ ইচ্ছে মতো এদিক-ওদিক ঘোরাল সে। তারপর অচেনা রাস্তায় এসে পড়ায় চিন্তিতভাবে এক জায়গায় গাড়িটা দাঁড় করিয়ে ভাড়া দিয়ে নেমে গেল।

কোথায় নেমেছে তা বুঝতে পারল না, তবু এ তো কলকাতাই! ঘুরেফিরে ডেরায় ফিরে যাওয়া যাবে। ভয় নেই। কিছুক্ষণ হাঁটলে বোধ হয় ভালোই লাগবে।

অচেনা রাস্তা ধরে আন্দাজে সে হাঁটে। বুঝতে পারে, চৌরঙ্গির কাছাকাছি অঞ্চল। নির্জন পাড়া, গাছের ছায়া পড়ে আছে, বাড়িগুলো নিঃঝুম। কয়েকটা দামি বিদেশি গাড়ি ওধারে-ওধারে পড়ে আছে। মন্দার চমকি রোদে কিছুক্ষণ হাঁটে। ভালো লাগে না, কেন ভালো লাগে না, তা বুঝতে পারে না। রোদ বড্ড বেশি। গরম লাগে, ঘাম হয়। শরীরের শ্রম মনের ভার লাঘবে কাজ করে না। মন জিনিসটা বড় ভয়ানক।

আসলে সে বুঝতে পারে, একবার অঞ্জলির সঙ্গে তার দেখা হওয়া দরকার। গত ছ'মাস ধরে বন্ধনমুক্ত মন্দার সুখী নয়। এই সুখী না হওয়ার কারণ সে খুঁজে পায় না, পাচ্ছে না। সে ঠকে গিয়েছিল বলে আক্রোশ? তাকে একটা চক্রান্তের মধ্যে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বলে ঘৃণা? সে অঞ্জলিকে ছুঁয়েছিল, ভালোবেসেছিল বলে বিবমিষা? উত্তরটা অঞ্জলির কাছে আর একবার না গেলে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। ডবল-ডেকারের পাদানির ভিড়ে অঞ্জলিকে স্বপ্নে দেখার কোনও মানে না থাক, গত ছ'মাস মন্দার যে সুখী নয় এটা সত্য। ভয়ঙ্কর সত্য। বিস্মৃতির পলি পড়েছে মনে, ক্রমে শান্ত হয়ে আসছে সে, এবং এই ভাবেই একদিন হয়তো বা সে দার্শনিক হয়ে যাবে। কিন্তু তাতে সমস্যার সমাধান নেই। সে আবার বিয়ে করবে ঠিকই। মেয়ে দেখা হয়েছে। সামনের শ্রাবণে সে খুবই অনাড়ম্বর অনুষ্ঠান থেকে তার নতুন স্ত্রীকে তুলে আনবে। কিন্তু তবু অসুখীই থেকে যাবে। অঞ্জলির কাছে একটা রহস্য গোপন রয়ে গেছে।

অঞ্জলিকে দেখতে ভালো, অন্যদিকে খুবই সাধারণ। বি-এ পড়তে-পড়তে বিয়ে হয়েছিল। খালি গলায় গাইতে পারত। রং চাপা, মাথায় গভীর চুল, ভীরু চাউনি ছিল। আর

তেমন কিছু মনে পড়ে না। বিয়ের সাতদিন বাদে এক রাত্রিতে প্রায় উন্মাদ মন্দার জিগ্যেস করেছিল—তুমি প্রেগন্যান্ট?

অঞ্জলি ভীষণ ভয়ে আত্মরক্ষার জন্য দুটো হাত সামনে তুলে, ভীরু, খুব ভীরু চোখে চেয়ে বলেছিল—আমার বাবা এই বিয়ে জোর করে দিয়েছেন, আমি চাইনি—

—তুমি প্রেগন্যান্ট কি না বলো।

—হ্যাঁ।

—মাই গুডনেস।

অঞ্জলি তবু কাঁদেনি, কেবল ভয় পেয়েছিল। কী হবে তা অঞ্জলি বোধহয় জানত। মন্দার যখন অস্থির হয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাল তখন ঘরে অঞ্জলির বাক্স গোছানোর শব্দ পেয়েছিল। অর্থাৎ অঞ্জলি ধরেই নিয়েছিল চলে যেতে হবে। মানুষ বরাবর এই সরে যাওয়াটা বিশ্বাস করে।

ক্লান্ত মন্দার আবার একটি ফুটপাথের দোকান থেকে ভাঁড়ের চা খায়। গাছের তলায় কয়েকটা পাথর। তারই একটার ওপর, অন্যমনে বসে ভাঁড়টা শেষ করে। অঞ্জলির কাছে যাওয়াটা ভারী বিশ্রী হবে। ভাঁড়টা ছুড়ে ফেলে দেয় সে। অঞ্জলিদের বাড়িতে টেলিফোন নেই।

আবার একটা ট্যাক্সি নেয় মন্দার। এবার সে উত্তর কলকাতার একটা কলেজের ঠিকানা বলে ড্রাইভারকে। তারপর চোখ বুজে পড়ে থাকে। নন্দিনীর সঙ্গে দেখা করার কোনও মানে নেই। তবু এখন একটা কিছু বড় দরকার মন্দারের। কী যে দরকার তা ঠিক জানে না। নন্দিনীর সঙ্গে তার পূর্ব পরিচয় নেই। বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছে পারিবারিক যোগাযোগে।

নন্দিনীকে পেতে একটুও কষ্ট হল না। ক্লাস ছিল না বলে কমনরুমে আড্ডা দিচ্ছিল। বেয়ারা ডেকে দিয়ে গেল।

মন্দারকে দেখে নন্দিনী ভীষণ অবাক। লোকটা কী ভীষণ নির্লজ্জ! সামনের শ্রাবণে বিয়ে, তবু দেখ তার আগেই কেমন দেখা করতে এসেছে!

—আপনি?

—আমি মন্দার...

—জানি তো!

—একটু দরকারে এলাম, ক'টা কথা বলতে।

—কী কথা?

—আমার প্রথমা স্ত্রীর সম্পর্কে।

—সেও তো জানি।

—ওঃ।

—আর কিছু?

—না, আর কিছু নয়। ভেবেছিলাম বুঝি তোমাকে আমাদের বাসা থেকে কিছু জানানো হয়নি।

—আপনি ওটা নিয়ে ভাববেন না। আমি ভাবি না।

মন্দার নন্দিনীকে একটু দেখে। চোখা চেহারার মেয়ে। খুব বুদ্ধি আছে মনে হয়। বুদ্ধি ছাড়া অন্য কোনও জলুস নেই। রং ফরসা, লম্বাটে মুখ, ছোটো নাক। আলগা সৌন্দর্য কিছু নেই।

মন্দার বলল—কিছু মনে করলে না তো?

নন্দিনী হাসে—এই কথা বলার জন্য আসার কোনও দরকার ছিল না। আজকাল চড়া রোদ হয়।

—ট্যাক্সিতে এসেছি।

—অযথা খরচ।

—আমার খুব একা লাগছিল।

নন্দিনী একটু মাথা নীচু করে ভাবল। নন্দিনীর সঙ্গে মন্দারের মাত্র একবার দেখা হয়েছিল পাত্রী দেখতে গিয়ে। বিয়ে অবশ্য ঠিক হয়ে গেছে, তবু এতদূর মন্দার না করলেও পারত। তার লজ্জা করছিল।

নন্দিনী মুখ তুলে আস্তে বলল—আমার এখন অফ পিরিয়ড চলছে, শেষ ক্লাসটা পলিটিক্যাল সায়েন্সের—ওটা তো না করলেও চলবে।

—না করলেও চলবে কেন?

নন্দিনী একটু হেসে বলে—পলিটিক্যাল সায়েন্সে ফেল করব না।

মন্দারও একটু হাসে। বলে—তাহলে তো তোমার ছুটিই এখন?

মনে করলেই ছুটি।

কোথায় যাবে?

—আমি কী জানি। যদি কেউ নিয়ে যেতে চায়।

খুবই চালু মেয়ে তার ভাবী বউ। এত চালু মন্দার ভাবেনি। ওর ভঙ্গি দেখে বোঝা যায় ও খুব কথা বলে। বেশ বুদ্ধির কথা, চটপট কথার জবাব দিতে পারে, রসিকতা করতে জানে, সাধারণ লজ্জা সংকোচ ওর নেই। পাত্রী দেখতে গিয়ে এতটা লক্ষ করেনি মন্দার। তখন অভিভাবকদের সামনে হয়তো অন্যরকম হয়েছিল। একে সঙ্গে নিতে ইচ্ছে করছিল না মন্দারের। কথা নয়, চুপচাপ পাশে বসে থাকবে, এমন একজন সঙ্গী দরকার তার। যার মন খুব গভীর, যার স্পর্শকাতরতা খুব প্রখর। যে কথা ছাড়াই মানুষকে বুঝতে পারে।

মন্দার ঘড়িটা দেখে—বলল—আমার চারটেয় একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। আজ থাক। কোনও দিন আসব।

একটু হতাশ হয় নন্দিনী। বলে—আসার তো দরকার ছিল না।

—ছিল। সে তুমি বুঝবে না।

—বুঝব না কেন?

আমি নিজেই বুঝি না।

বলে মন্দার কলেজ থেকে বেরিয়ে এল।

মাত্র গোটা চারেক টাকা পকেটে আছে। তবু মন্দার আবার ট্যাক্সি খুঁজতে লাগল। খানিকদূর হেঁটে পেয়েও গেল একটা। দক্ষিণ দিকে ট্যাক্সি চালাতে বলে আবার ঘাড় এলিয়ে চোখ বোজে সে। সঙ্গে-সঙ্গে দৃশ্যটা দেখতে পায়। সেই ডবল-ডেকারের পা-দানি, ভিড়, টালমাটাল অঞ্জলি, কোলে শিশু।

অঞ্জলিদের বাড়ির সামনে ট্যাক্সি ছেড়ে দিল মন্দার। ভাড়া দিতে গিয়ে পকেট সম্পূর্ণ ফাঁকা হয়ে গেল। টাকা আর খুচরো যা ছিল সব দিয়েও পনেরো পয়সা কম হল। ট্যাক্সিওয়ালা হেসে সেটা ছেড়ে দিয়ে গেল।

দরজা খুললেন সেই সুন্দর চেহারার বৃদ্ধ। অঞ্জলির বাবা। খুলে ভারী অবাক হলেন।

—বাবাজীবন, তুমি?

—আমিই।

—এসো-এসো।

মন্দার ঘরে ঢোকে। অঞ্জলির মা নেই। ভাইরা বউ নিয়ে আলাদা থাকে। বোনের বিয়ে হয়ে গেছে। বাড়িটা একটু অগোছালো।

—বসবে না? বুড়ো তাকে চেয়ার এগিয়ে দেয়।

মন্দার বসে। জিগ্যেস করে—কী খবর?

—খবর আর কী? কোনওরকম। বুড়ো গলা খাঁকারি দেয়।

—আমি অঞ্জলির খবর জানতে চাইছি।

বুড়োর ঠিক বিশ্বাস হয় না। একবার চোখ তুলেই নামিয়ে নেয়। বলে—সে ভিতরের ঘরে আছে।

মন্দার চুপ করে থাকে।

বুড়ো খুব সাবধানে জিগ্যেস করেন—কী চাও মন্দার? ওকে কিছু বলবে?

—হুঁ।

—যাও না, নিজেই চলে যাও ভিতরে। ডাকলেই সাড়া পাবে।

সাত দিনের জন্য এ-বাড়িটা তার শ্বশুরবাড়ি ছিল, এই সুন্দর বৃদ্ধটি ছিলেন তার শ্বশুর। বাড়িটা মন্দারের চেনা। একটু সংকোচ হচ্ছিল, তবু মন্দার উঠল।

বৃদ্ধ বলে—ভিতরে বাঁ-দিকের ঘরে আছে।

মন্দার যায়।

দরজা খোলা। অঞ্জলি শুয়ে আছে বিছানায়। পাশে একটা পুঁটলির মতো বাচ্চা তুলতুল করে। সে ঘুমোচ্ছে।

মন্দার ঘরে পা দিতেই অঞ্জলি মুখ ফিরিয়ে তাকাল। চমকে উঠল কি না কে জানে! অবাক হল খুব। উঠে বসল খুব ধীরে। কোনও প্রশ্ন করল না। কেবল বাচ্চাটাকে একটা হাত বাড়িয়ে আড়াল করার চেষ্টা করল। চোখে ভয়। মন্দার হাসে। জিগ্যেস করে—কবে হল?

—আজ আট দিন।

—ভালো আছ?

—না। খুব কষ্ট গেছে।

—আমার শরীরে রক্ত ছিল না। বসে শ্বাস ফেলল অঞ্জলি—খুব কষ্ট গেছে। বিকারের মতো হয়েছিল। তুমি বোসো। ওই চেয়ার টেনে নাও। কিছু বলবে?

—বলব।

—কী?

—আমি ভীষণ অসুখী।

—হওয়ার কথাই। এখন কী করতে চাও?

—কয়েকটা ভাইটাল প্রশ্ন করব।

—করো।

—তোমার প্রেমিকটি কে?

বিস্ময়ে চোখ বড় করে অঞ্জলি বলে—প্রেমিক?

—ওই বাচ্চাটার বাবার কথা বলছি।

—সে আমার প্রেমিক হবে কেন? তাকে তো আমি ভালোবাসতাম না, সেও আমাকে বাসত না।

—তাহলে এটা কী করে হল?

—হয়ে গেল। কত কিছু এমনিই হয়ে যায় যা ঠিক বুঝতেই পারা যায় না।

মন্দার একটা শ্বাস ফেলল। ভুল প্রশ্ন। এ প্রশ্ন সে করতে চায়নি। এই প্রশ্ন করতে সে আসেনি? তবে কী প্রশ্ন? কী প্রশ্ন?

সে বলল—তুমি ওর বাবাকে বিয়ে করবে না?

—বিয়ে! ভারি অবাক হয় অঞ্জলি, বলে—তা কি সম্ভব? সে কোথায় চলে গেছে! তা ছাড়া আমি তা করতে যাব কেন? ওটা বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে।

এও ভুল প্রশ্ন। মন্দার বুঝতে পারে। এবং তারপর সে আবার একটা ভুল প্রশ্ন করে—তুমি কি আমার কাছে কিছু চাও?

—না। তুমি অনেক দিয়েছ।

—কী দিয়েছি?

—এই বাচ্চাটার একটা পরিচয়।

মন্দার বিস্ময়ে প্রশ্ন করে—ও কি আমার বাচ্চা হিসেবেই চালু থাকবে নাকি?

—যদি তুমি অনুমতি দাও।

মন্দার একটু ভেবে বলে—থাকুক।

অঞ্জলি খুশি হল। বলল—আমি জানতাম, তুমি আপত্তি করবে না।

আমি বিয়ে করছি অঞ্জলি।

—জানি। করাই উচিত।

তবু সঠিক প্রসঙ্গটা খুঁজে পাচ্ছে না মন্দার। এসব কথা নয়। এর চেয়ে জরুরি কী একটা বলবার আছে তার। বুঝতে পারছে না। খুঁজে পাচ্ছে না। কিছুক্ষণ তাই সে বেকুবের মতো বসে থাকে।

—তোমার শরীরে রক্ত নেই?

—না। কিছু খেতে পারতুম না গত কয়েকমাস। বাচ্চাটা তখন আমার শরীর শুষে খেয়েছে। ওর দোষ নেই। বাঁচতে তো ওকেও হবে। শরীরটা তাই গেছে।

—তোমার অসুখটা কেমন?

—বুঝতে পারছি না। তবে ভীষণ দুর্বল।

—তুমি শুয়ে থাকো বরং। শুয়ে-শুয়ে কথা বলো।

—তাই কী হয়! বলে বসে-বসে অঞ্জলি একটু কাঁদে, বলে শ্বশুরবাড়িতে এসেছ, তোমাকে কেউ আদরযত্ন করার নেই। দেখ তো কী কাণ্ডটা!

মন্দার চুপ করে থাকে।

অঞ্জলি তক্ষুনি নিজের ভুল সংশোধন করে বলে—অবশ্য এখন তো আর শ্বশুরবাড়ি এটা নয়, আমারই ভুল।

মন্দার একটু দুঃখ পায়। অঞ্জলির মুখটা ফোলা-ফোলা, শরীরও তাই। বোধহয় শরীরে জল এসে গেছে ওর।

মন্দার জিগ্যেস করে—তোমার বাচ্চাটা কেমন হয়েছে?

—ভালো আর কী। আমার শরীর থেকেই তো ওর শরীর। একটা খারাপ হলে আর একটা ভালো হবে কী করে?

কিন্তু কী কথা বলতে এসেছে মন্দার? মনে পড়ছে না, কিছুতেই মনে পড়ছে না। অথচ এসব সাধারণ কথা নয়; এ ছাড়া আর-একটা কী কথা যেন! মন্দার চুপ করে বসে থাকে। ভাবে। অঞ্জলি তার দিকে তাকিয়ে আছে। চোখে সেই ভিতু ভাব। বোধহয় সবসময়ে নিজের অপরাধের কথা ভাবে ও, আর সবসময়ে ভয় পায় তার অপরাধের প্রতিফল কোনও-না-কোনও দিক থেকে আসবেই।

মন্দার জিগ্যেস করল—এ সব জানাজানির পর তোমার অবস্থা নিশ্চয়ই বেশ খারাপ?

অঞ্জলি মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে বলল—তা জেনে কী হবে?

মন্দার একটা শ্বাস ফেলল মাত্র।

সেই শ্বাসের শব্দে অঞ্জলি তার দিকে তাকাল, জলভরা চোখ। বলল—আমি খুব একা। আমার কেউ নেই।

—জানি।

—তুমি ভীষণ দয়ালু। তোমার তুলনা নেই। তুমি আমার ওপর রাগ করতে চাইছ, কিন্তু পারছ না।

মন্দার একটু চমকায়। কথাটা সত্য। সে অঞ্জলির ওপর রাগ ঘৃণা সবই প্রকাশ করতে চায়। কিন্তু তার মনের মধ্যে কিছুতেই রাগের সেই ঝড়টা ওঠে না। উঠলে ভালো হত বোধহয়। মন্দার আবার একটা শ্বাস ফেলে।

বাইরে থেকে অঞ্জলির বাবার গলা পাওয়া যায়—মন্দার!

মন্দার মুখ ফিরিয়ে ভারী অবাক হয়। সুন্দর বৃদ্ধটি দরজায় দাঁড়িয়ে। তাঁর এক হাতে খাবারের প্লেট, অন্য হাতে চায়ের কাপ। মন্দারের চোখে চোখ পড়তেই লাজুক মুখে বলে—বাড়িতে কাজের লোক নেই তাই...

মন্দার বিস্মিতভাবে বলে—নিজেই করলেন?

—আমার অভ্যাস আছে। আঁতুড় ঘরে বসে খেতে ঘেন্না করে না তো বাবা! তুমি না হয় বাইরের ঘরে এসো।

—আমি কিছু খাব না।

—খাবে না? বলে বুড়োমানুষ ভারী অপ্রতিভ হয়ে পড়ে। সাধাসাধি করতে বোধহয় তারা ভয় পায়। মন্দারকে তাদের ভীষণ ভয়।

যেন বা বুড়ো জানত যে মন্দার এ-বাড়ির খাবার খাবে না, তাই মাথা নীচু করে বলে—আচ্ছা, তাহলে বরং থাক।

অঞ্জলি অবাক হয়ে তার বাবার দিকে চেয়ে ছিল। মন্দারের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে—কলেজ থেকে এলে তো?

—হুঁ!

—খিদে পায়নি?

অঞ্জলি চুপ করে থাকে। কিছু বলার নেই। তারা অপরাধীর মতো মন্দারের দিকে চেয়ে আছে। জোর করে খাওয়াবে এমন সম্পর্ক নয়।

অসহ্য। মন্দার উঠে গিয়ে বুড়োর হাত থেকে প্লেট আর কাপ নিয়ে বলে—ঠিক আছে। খাচ্ছি।

বাপ বেটিতে খুব অবাক হয়! তারা একটুও আশা করেনি এটা।

বুড়ো চলে গেল। মন্দার অঞ্জলিকে বলে—এসব ফর্মালিটির দরকার ছিল না। অঞ্জলি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে—ডিভোর্স জিনিসটা বাবা বোঝেন না। সেকেলে মানুষ। ওঁর কাছে এখনও তুমি জামাই, বরাবর তাই থাকবে। ওঁদের মন থেকে এসব সংস্কার তুলে ফেলা ভারী মুশকিল।

মন্দার উত্তরে দেয় না।

অঞ্জলি নিজে থেকেই আবার বলে—বাবার আর দোষ কী? আমি নিজেও মন থেকে সম্পর্ক তুলে দিতে পারিনি। স্বামী জিনিসটা যে মেয়েদের কাছে কী!

—ওসব কথা থাক।

অঞ্জলি মাথা নেড়ে বলে—থাকবে কেন! এখন তো আর আমার ভয় নেই। এইবেলা বলতে সুবিধে। আমি হয়তো আর বেশিদিন বাঁচবও না।

—কী বলতে চাও?

সংস্কারের কথা। মেয়েলি সংস্কার। মন্ত্র, সিঁদুর, যজ্ঞ—এসব কিছুতেই মন থেকে তাড়াতে পারি না। তুমি আমার কেউ না, তবু মনে হয়, কেবলই মনে হয়...অঞ্জলি চুপ করে থাকে। একটু কাঁদে বুঝি!

মন্দার তাড়াতাড়ি বলে—অঞ্জলি, তোমাকে আমি কী একটা কথা বলতে এসেছিলাম, কিছুতেই মনে পড়ছে না। অথচ কথাটা খুব জরুরি।

—বলো।

—বললাম তো, মনে পড়ছে না।

—একটু বসে থাকো, মনে পড়বে। যদি ঘেন্না না করে তবে খাবারটা খেয়ে নাও। চা জুড়িয়ে যাচ্ছে। খেতে-খেতে মনে পড়ে যাবে।

মন্দার অন্যমনস্ক হয়ে বসে থাকে। অঞ্জলি তার দিকে নিবিষ্ট চোখে চেয়ে যেন বুঝবার চেষ্টা করে।

মন্দার একটু-আধটু খুঁটে খায়, চায়ে চুমুক দেয়। মনে পড়ে না।

—তুমি কি আমার কথা মাঝে-মাঝে ভাব? অঞ্জলি আচমকা জিগ্যেস করে।

—ভাবি।

—কেন ভাবো?

—তুমি আমার ওপর বড্ড অন্যায় করেছিলে যে।

—সে তো ঠিকই।

—তাই ভুলতে পারি না। মানুষ ভালোবাসার কথা সহজে ভোলে; প্রতিশোধের কথাটা ভুলতে পারে না।

—আমি এত অসহায় যে আমার ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার কিছু নেই তোমার! আমি তো শেষ হয়েই গেছি।

—কিন্তু আমার তো শোধ নেওয়া হয়নি!

—কী শোধ নেবে বলো!

—কী জানি ভেবেই তো পাচ্ছি না।

—হায় গো, কী কষ্ট!

—খুব কষ্ট। দুপুরে কলেজে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। তখন তোমাকে নিয়ে একটা দুঃস্বপ্ন দেখি।

—কীরকম দুঃস্বপ্ন?

—ভীষণ খারাপ। বলে মন্দার চুপ করে স্বপ্নের দৃশ্যটা মনে-মনে দেখে। ডবল-ডেকারে পা-দানিতে অঞ্জলি, কোলে বাচ্চা, চারিদিকে আক্রমণকারী মানুষ। কিছুতেই অঞ্জলির কাছে পৌঁছতে পারছে না মন্দার।

—বলবে না? অঞ্জলি বলে।

মন্দার শ্বাস ফেলল। তারপর আস্তে-আস্তে বলল—অঞ্জলি, আমি হয়তো শ্রাবণে বিয়ে করব। পাত্রী ঠিক হয়ে গেছে। তাতে কি তুমি দুঃখ পাবে?

—পাব। তবে এটা আশা করছিলাম বলে সয়ে নেওয়া যাবে।

—শোনো, আমি তোমার কাছে মাঝে-মাঝে আসব, এরকম বসে থাকব একটু দূরে, কথা বলব। কিছু মনে করবে না তো?

—মনে করব! কী যে বলো! তুমি আসবে ভাবতেই কী ভীষণ ভালো লাগছে!

—আসব! কী তোমাকে বলতে চাই তা যতদিন না মনে পড়ছে ততদিন আসতেই হবে।

—এসো। যখন খুশি।

—আসব। অঞ্জলি, ততদিন তুমি ভালো থেকো, সাবধানে থেকো।

অঞ্জলি চুপ করে থাকে।

—চারিদিকে বিশ্রী মানুষজন, তারা তোমাকে ঠেলবে, ধাক্কাবে, ফেলে দেবে, চারিদিকে বিপদ।

—কী বলছ?

—খুব বিপদ তোমার। এই বাচ্চাটাকে নিয়ে কি তুমি বাস থেকে নামতে পারবে! আমি যে কিছুতেই তোমার কাছে যেতে পারছি না!

—তুমি কী বলছ?

—সেইটাই তো বুঝতে পারছি না অঞ্জলি। একটু সময় লাগবে। তোমার বাচ্চাটা কি ছেলে না মেয়ে?

—ছেলে।

অকারণ প্রশ্ন। মন্দারের জেনে কোনও লাভ নেই। সে বসে রইল। মনে পড়ছে না। কতদিনে মনে পড়বে তার কোনও ঠিক নেই।

যতদিন না পড়ে ততদিন বসে থাকা ছাড়া, অপেক্ষা করা ছাড়া, পরস্পরের মুখের দিকে চিন্তিতভাবে চেয়ে থাকা ছাড়া মানুষের আর কী করার আছে?

সাধুর ঘর

পাকুড় গাছের তলায় সাধুর ঘরে কে যেন আগুন দিয়েছে। উত্তুরে বাতাস বইছে হুহু। দুপুরের রোদে আগুনের তেমন জলুস খোলে না। তবু সাধুর ঝোপড়াটা রোদ খেয়ে টনটনে হয়ে ছিল বলে আগুনটা ধরেছে ভালো। কয়েকটা হালকা পাকুড় গাছটার নীচু ডালপালা ধরে ফেলল, কয়েকটা লাফ দিয়ে গিয়ে ধরল নুলো সাতকড়ির চায়ের দোকানটা। দুপুরের খর রোদেও আগুনটার লাল হলুদ রংটা ছড়িয়ে গিয়ে খোলতাই হল। হপ্তা বাজারের রাস্তায় লোক জমে গেল খুব। কর্ড লাইনের ধারের পসারিরা ছুটে এল।

কে আগুন দিল? কে?

সাধু লোক ভালো না। কর্ড লাইনের ধারের বেওয়ারিশ পাকুড়তলার জমি তার বাপের নয়। সরকারের। সরকারের বাঁধুনি আলগা, তাঁর কোচা দিতে কাছা খুলে যায়। তাই গভর্নমেন্টকে ছোলাগাছি দেখিয়ে বছরখানেক সাধু তার ঝোপড়ায় গেঁজেল তেড়েলদের আড্ড খুলেছে। মুখোমুখি একঘর পাটকল মজুরের বাস। তাদের ছানাপোনা আঁতুড় থেকেই ধুলোয় গড়ায়, ধুলোমাটিতে হামা টানে। কয়েক গজ দূর দিয়ে বুক কাঁপানো মেল ট্রেন যায়, আর যায় বাহারি রাজধানী এক্সপ্রেস, নিঃশব্দে সাপের মতো চলে লোকাল। ছানাপোনারা সেইসব ট্রেনের চাকা থেকে দু-তিন গজের মধ্যে খেলাধুলো করে পাথর কুড়োয়। মায়েরা ভ্রূক্ষেপও করে না। বাপেরা ছেলেমেয়ের নামও ভুলে যায়। মানুষের এইসব উদাসীনতার ফাঁকে ফোঁকরে এক-আধজন লোক দুনিয়াতে বসে যায়। সাধুও বসে গিয়েছিল।

সাধুদের রাঙা পোশাক পরতে হয়, মুখ খারাপ করতে হয়, ত্রিশূল বইতে হয়—বোধহয় সেইজন্যই সাধু জটাজুট, রাঙা পোশাক, ত্রিশূল সবকিছুর জোগাড় রেখেছে। আর তার খারাপ মুখ। এমনই অনর্গল অবিরল সারাদিন সে মুখ ছোটায় যে, পাটকল মজুরদের

ছানাপোনাদের মুখে প্রথম যে কথা ফোটে, তা হল সাধুর খারাপ কথা। কেউ রাগ করে না অবিশ্যি। শিখবেই তো বড় হয়ে, বাপ যখন মাকে বকবে, কি মাতাল হয়ে হল্লাচিল্লা করবে, কি পাওনাদার যখন এসে বাপকে নেবে একহাত, তখন শেখা হবেই। সাধু শুধু কাজটা এগিয়ে রাখছে। রাখুকগে। সাধু যখন চিল্লায়, তখন সকালবেলায় ছানাপোনার মা দূরের দিকে চেয়ে বসে মাথায় উকুন চুলকোয়, বাপ পাকুড়তলায় ছায়ায় খাটিয়ায় শুয়ে আগের রাতের খোঁয়ারি ভাঙে। কেউ সাধুর দিকে ফিরেও চায় না।

সবাই জানে—এ সাধুটো ঝুট আছে। সাট্টা সাধু মেকি। সেবার যখন শীতলবাড়ির পাশে মজুমদারদের নতুন ভাড়াটের বউটাকে রাত বারোটায় তেঁতুলবিছে কামড়াল, তখন অত রাতে উপায় না দেখে তারা এসে সাধুকে ডেকেছিল, যদি সাধু এসে ঝেড়ে ফুঁকে দেয়। সাধু বিপদ বুঝে তেড়ে গাল দিতে লাগল—বিছেটাকে মেরে ফেলেছ তোমরা? অ্যাঁ? মেরে ফেলে আবার আমাকে ডাকতে এসেছ? বলি, ঝাড়ব যে, তা বিষটা টানবে কে? বিছেটা মেরে ফেললে—তা বিষটা কি আমি মুখ দিয়ে টানব?

তখনই বোঝা গিয়েছিল যে, সাধুটা সাট্টা। মজুমদার ভাড়াটেরা তখন জি টি রোড থেকে বিখ্যাত ঝাড়ুনী বুড়িকে নিয়ে এসেছিল। বুড়ি এসে প্রথমটায় দুধ আর জল দিয়ে ঝাড়ল, তারপর ঝাঁটার কাঠি দিয়ে। ব্যাপারটা দেখতে জমকালো, কিন্তু কাজ হল না। কিন্তু সাধু পদ্ধতিটা দেখে রাখল মন দিয়ে। অন্য জায়গায় চালাবে। তাকেও করে খেতে হবে তো?

গোলবাজারে বুড়ো শেখ সাহেব বসতেন এক সময়ে। দারুণ গেঁজেল। তাঁকে ঘিরে ছিল সারা হপ্তা রেসুড়েদের ভিড়। শুক্রবারে ভিড় হত সবচেয়ে বেশি। শেখসাহেব ভ্রূক্ষেপ করতেন না। গাঁজা টানতেন, আর টানতেন। তারপর নিমীলিত চোখে কখনও হুঙ্কার দিয়ে বলতেন—এক লাঠি। তার মানে হচ্ছে এক। এক নম্বর ঘোড়া ধরো তো তোমরা। কখনও বলতেন—দো রোটি। তার মানে হচ্ছে—আট। কখনও বা—তিন কাঠি। তার মানে হচ্ছে—চার। এইরকম ঠারে ঠোরে টিপস দিতেন শেখসাহেব। ঘোড়া রেসের ময়দানে শেখ সায়েবের কথা মতো চলত।

সাট্টা সাধু কায়দাটা শিখে রেখেছিল। পাকুড়তলায় গাঁজা টানতে-টানতে সে-ও মাঝে-মাঝে চিৎকার দেয়—এক লাঠি। কিংবা—তিন কাঠি। কিংবা দো রোটি।

লোকে প্রথমটায় খেয়াল করেনি। রেলের গ্যাংম্যান চানুর বাহারি দাড়ি আছে বলে তার নামডাক দেড়েল চানু বলে। দেড়েল চানু সাধুর টিপস ধরে পয়লা বারে একশো আঠারো টাকা, দ্বিতীয় দফার শ'দেড়েক টেনে আনল তারপর দিশি মদ গিলে এসে সাধুর পায়ের ওপর বডি ফেলে কাঁদতে-কাঁদতে বলল—মন্তর দাও। আজ থেকে আমি তোমার চেলা।

তা দেড়েল চানুই সাধুর প্রথম শিষ্য। মন্তর বলে যে একটা ব্যাপার আছে, তা সাধু খেয়ালই করেনি। স্বপ্নেও তার ভাবা ছিল না যে, তারও একদিন শিষ্য জুটবে। ছেলেবেলায় সে তার বাপকে দেখত, ঘুম থেকে উঠেই হাই তুলতে-তুলতে চেঁচাত—ওঁ তৎসৎ। সেই মন্তরটা জানা ছিল। দেড়েল চানুর কানে-কানে সেই মন্তরটা দিয়েছিল সে। আর ধরিয়ে দিল গাঁজার কলকে। বর্ষার পর দেড়েল চানু তার ঝোপড়াটা নতুন খড় দিয়ে ছেয়ে দিল, ভিতরে তৈরি করে দিল একটা বাঁশের মাচান, নতুন একটা লোমের কম্বল কিনে দিল। আরও গোটাকয় শিষ্যও দিল জুটিয়ে। কিন্তু চানু ছাড়া সবক'টা শিষ্যই হাড়হাভাতে। গুরুর পয়সায় গাঁজা টানে, তারই সঙ্গে সমানে বসে খিস্তিখাস্তা করে, ঝোপড়ায় বসে থুথু ছিটিয়ে ঘর নোংরা করে যায়। সাধু রাগ করে চেঁচায়, অশ্লীলতম কথা বলে গাল পাড়ে। কিন্তু চেলাগুলো তখন তার সঙ্গে ডাকটিকিটের মতো সেঁটে গেছে, মা-বাপ তোলা গালাগাল শুনে গোলাপি রঙের হাসি হাসে।

দেড়েল চানু সাট্টা সাধুটার পিছনে হক্কের পয়সা ঢালছে—এটা লোকের সহ্য হয় না। চানুকে এখানে সেখানে পাড়ার লোকে পাকড়াও করে—তোমার সংসার ভেসে যাচ্ছে চানু হে। ফুটো নৌকোর সওয়ারি তুমি—ওই শালা জোচ্চোরটার পিছনে—ইত্যাদি। তখনই লোকের চোখ টাটায়—সরকারি বেওয়ারিশ জমি, বেদখল করে শালা বসে গেছে পাকুড়তলায়, এত লোকের যাতায়াতের রাস্তার ধারে, কারো নজরেও পড়ে না নাকি! সরকারি জমি, সরকার বুঝবে, কার বাবার কী? কিন্তু তবু লোকের চোখ টাটায়। চানুটা চেলা হয়েই সাধুকে ঝোলালে।

পাটকল মজুরদের কুঠরিগুলোয় প্রায় দিনই হাঁড়ি ফাটে। রাত বিরেতে দিশি মদের ঝোঁকে মরদরা এসে বউয়ের ওপর খামোখা টং হয়, অন্ধকারে এধার ওধার লাথি চালায়। দু-চারটে বাচ্চা লাথি খেয়ে কোঁতকোঁত করে উঠে চেঁচায়, বউগুলো উড়োখুড়ো চুলে দৌড়ে বেরোয়, ছুটাছুটি করে। সেই হুড়-দৌড়ের মধ্যে পুরুষেরা ভাতের মেটে হাঁড়ি ভাঙে, উনুন ভাঙে, আরও কত কাণ্ড করে। সাধু দেখেশুনে তার ঝোপড়ায় একটা দোকান দিয়েছিল। মেটে হাঁড়ি কলসী মালসার দোকান। মাকালতলায় কুমোরদের ঘর থেকে বয়ে এনে পাটকলের মজুরদের ঘরে প্রায় দিনই হাঁড়ি কলসী বিকোয়।

শীতলাবাড়িতে রোজকার সকালের প্রণাম সেরে নিরাপদর দাদা হারু ঘোষ ফেরার পথে পাকুড়তলায় দাঁড়িয়ে চারধারটা চোখে-চোখে জরিপ করে নেয়—কতটা জমি নিয়েছিস রে, অ্যাঁ?

সাধু তার হাঁড়ি কলসির মাঝখানে ঠ্যাং ছড়িয়ে বসে উদাস গলায় বলে—তা কাঠাদুয়েক হবে।

হারু ঘোষ হাসে—দূর ব্যাটা, দু-কাঠায় তিনতলা উঠে যায়! আধ কাঠা বড় জোর, তা জায়গাটা ভালোই। গেড়ে বসেছিস একেবারে। এ আবার কী—গাছ-টাছ রুয়েছিস নাকি?

সাধু তেমনি উদাস জবাব দেয়—আমি রুইব কেন? জমি আমার বাবার নয়, যখন তুলে দেবে উঠে যাব। গাছ-গাছালি যার-যার মনমতো উঠছে।

—দেখিস বাপু।

কী দেখব, তা সাধু ভেবে পায় না। থুথু ফেলে সে খুব ভাবে। রাতারাতি একটা মন্দির তুলে ফেলতে পারলে পাকাপাকিভাবে বেওয়ারিশ জমিটাতে শেকড় চালানো যেত। সিমেন্ট না জোটে চুনসুরকি দিয়ে হাতদশেক উঁচু একটা মন্দির, ওপরে লাল নিশেন উড়ছে—এরকম একটা স্বপ্নের ছবি সে দিন-দুপুরেই দেখে। কিন্তু সকলেই চোখ পেতে আছে—মন্দির ওঠাতে গেলেই খিচাং বেঁধে যাবে। শিষ্য-সাবুদরাও কেউ মানুষ না। দিনদুপুরেই হল্লা-চিল্লা করে গাঁজা খায় ঝোপড়ায় বসে। সাধু লাথি মেরে বের করার চেষ্টা করে দেখেছে। নড়ে না। শালখুঁটির মতো শক্ত হয়ে গেড়ে গেছে শালারা। এদের দিয়ে মন্দির? সাধু আবার থুথু ফেলে।

যেমন করেই হোক, মানুষকে দাঁড়াতে হয়। ওই যে নিরাপদ—ছ'মাস আগেও জ্ঞাতিদাদা হারু ঘোষের আটাকলের পার্টনার ছিল। চালের আড়ৎ, আটাকল একা সামলাত। সারা শরীরে, চুলে, লোমে, ভ্রূতে আটা মেখে দাদা হারু ঘোষ তাকে একদিন ডেকে বলল—এবার থেকে মাইনে নিয়ে থাক, পার্টনারশিপ আর নয়। নিরাপদর বড় লেগে গেল কথাটা। দাদার কারবার থেকে তার সামান্য পুঁজি তুলে দেড়শো গজের মধ্যে আবার দোকানঘর ভাড়া নিল, কিনল আটাকল, খুলল চালের কারবার। পাকুড়তলায় বসে ওই দেখা যায় নিরাপদকে—পিছনে গোঙাচ্ছে চাক্কি, ফিতে ঘুরছে, ধুলোর মতো উড়ছে আটা ময়দা, কালো নিরাপদ সাদা হয়ে খাটছে, মাপছে, দিচ্ছে, নিচ্ছে, এক মুহূর্তের অবসর নেই। দাঁড়িয়ে গেল মানুষটা। বসে না থাকলে মানুষ দাঁড়ায় ঠিক।

পাকুড়তলায় বসে সাধু এইরকম তার ভবিষ্যৎ ভাবত। নুলো সাতকড়ির ডানহাতে সাড় নেই। হাতটা শরীরের সঙ্গে লেগে থেকে লাঠির মতো ঝোলে। অমন হাত ফেলে দিলেই হয়, তবু সাতকড়ি রেখেছে। হাঁটতে চলতে হাতটা লটরপটর করে, বাজারে হাটে লোকের সঙ্গে ধাক্কা খায় হাতটা। আর একটা হাতে সাতকড়ি রেল ইঞ্জিনের মতো গেলাসে চামচ নেড়ে চা বানায়। তার ছোকরা নেই, একার দোকান। পাটকল মজুর, স্টার সেলুনের আড্ডাবাজ আর ইটের কাজের জোগানিরা দশ পয়সায় চা মারে। একটুখানি ছাপরার দোকান, গোটা দুই বেঞ্চ, একটা চায়ের টেবিল, দু-চারটে কৌটোবাউটো—ব্যস। গুড় মেরে

রস করে রাখে সাতকড়ি—গুড়ের চা সাত পয়সা। সাধুর ঝোপড়ার চার হাতের মধ্যে একহেতে সাতকড়িও দাঁড়িয়ে গেল বুঝি! মানুষ দাঁড়ায় বসে না থাকলে।

কথাটা সে তার চেলাদেরও বলে। কিন্তু চেলারা ভঙ্গি বদলায় না। দিনকাল ভালো যায় না সাধুর। দেড়েল চানু ছাড়া তার আর কোনও চেলা হাত উপুড় করে না। মেটে হাঁড়ি কলসি বেচে দিন যায়।

নেশাখোর নানকুর দোকানটা বিলেৎ বাকি পড়ে উঠে গেল গত বছর। সাহেব বাগানের জমিটা দর পেয়ে বেচে দিল। উঠে গেল ইটখোলার দিকে। ওয়াগন ভাঙিয়েদের দলে ভিড়ল কিছুদিন। তারপর পোষাল না বলে সব ছেড়ে ছুড়ে এখন মাল টেনে পড়ে থাকে। জ্ঞান ফিরলে নিখরচার হাট করতে বেরোয় থলি হাতে। একটা বউ দুটো বাচ্চা তার। হাটবাজার না করলে চলে কী করে? তাই আর পাঁচজন লোকের মতোই সে যায় হপ্তা বাজারে। দোকান থেকে আনাজপত্র তুলে নেয় খুশি মতো, পয়সা দেয় না। দোকানিরা ব্যাজার মুখে চুপ করে থাকে। ফেরার পথে ঝন্টুর দোকান থেকে চা খায়, স্টার সেলুনে দাড়ি কামিয়ে ফিটফাট হয়ে নেয়, শুটকের দোকান থেকে ভালো জর্দা দেওয়া পান খায়, এক প্যাকেট পছন্দসই সিগারেট পকেটে পোরে, ঘোষের দোকান থেকে চাল তোলে, মুদির দোকান থেকে সওদা নেয়—এমন অনায়াসে সব তুলে নেয় যেন অদৃশ্য পয়সা গুনে দিচ্ছে। নিখরচায় সব সেরে ফেরার পথে—পাকুড়তলায় সাধুর ঝোপড়ার বাইরে দাঁড়িয়ে হাঁক পাড়ে—সাধো, এই শালা সাধো—

পুরো একটা ছিলিম টেনে নেয় শালা। তারপর অনেকক্ষণ ঝিম মেরে থাকে। উঠবার সময় হলে আবার সাধুকে ডেকে সামনে দাঁড় করায়। পাছায় একটা লাথি কষিয়ে বলে—পাকুড়তলাটা কি বাপের জমিদারি? সরকারি খাজনা লাগে না?

খাজনাটা নানকুই নেয়। তারপর পথে নামে। গান গায়। সাধু বিড়বিড় করে বকে—ইটখোলার দিকে অন্ধকারে মা গোখরো যেন দেয় ঠুকে, হেই ভগবান, ভগবান হে!

এই হচ্ছে সাধু। এইমতো তার দিন যায়।

এখন উত্তুরে বাতাসে সাধুর ঝোপড়াটা ওই জ্বলছে। আগুনটা ধরেছে ভালো। পাকুড়তলা থেকে হাত বাড়িয়ে নুলো সাতকড়ির দোকানটা নিয়ে বাহার খুলেছে আগুনটার। পাটকল মজুরদের ছানাপোনারা নাকে আঙুল পুরে দাঁড়িয়ে গেছে, কাজের লোক নিরাপদ চাক্কি বন্ধ করে চলে এসেছে, স্টার সেলুনের আড্ডাবাজরা লাফিয়ে পথে নামল, কর্ড লাইনের ধারের ছোট্ট বেআইনি বাজারের খুদে পসারিরা দু-চারজন দৌড়ে আসছে। সাধুর দুই চেলা দুটো শুখো হাঁড়ি জল ছিটিয়ে দেওয়ার ভঙ্গিতে দোলাচ্ছে, তাদের

চোখেমুখে এখনও ভ্যাবলা ভাব। গাঁজার নেশা এখনও কাটেনি। একটু দূরেই ধুলোয় বসে সাধু বিড়ি ধরিয়েছে, তার মুখচোখ জুলজুল করছে।

কে আগুন দিল? কে?

সাধু দেশলাইয়ের কাঠিটা ছুড়ে ফেলে বলে, আমি।

সবাই বোকা। বলে—কেন?

—আমার ইচ্ছে। সব জ্বলে যাক শালা।

একটু ব্যোমকে থাকে ভিড়টা। তারপরই হঠাৎ সাধুর যে দুই চেলা শুকনো হাঁড়ি থেকে অদৃশ্য জল আগুনে ঢালছিল তাদের একজন ব্যাপারটা বুঝতে পেরে হাঁউরে মাউরে করে চেঁচিয়ে বলল—যখন আগুন দেয়, তখন আমরা মাইরি ঘিরে ছিলাম।

পোড়েলবাড়ির বেঁটে ছেলেটা এগিয়ে সামনে এসে জিগ্যেস করে—নিজের ঘরে আগুন দিয়েছ। বেশ। কিন্তু নুলো সাতকড়ির দোকানটা যে গেল—গরিব মানুষ—তার ক্ষতিপূরণ কে দেবে?

সাধু ঝেঁঝে উঠে বলে—তা আমি কী করব? আগুন কি আমার বাপের? নিজের ঘরে আগুন দিয়েছি আমি, সে আগুন যদি বাতাস বেয়ে—

বালির বাজারে মাল তুলতে গিয়েছিল সাতকড়ি। চটের থলিতে গুঁড়ো চা, আক্রার চিনি, গুড়। ফেরার পথে দূর থেকে আগুন দেখে দৌড়োচ্ছে। একহাতে ব্যাগ, নুলো হাতটা লটপট করে এধার-ওধার বেমক্কা দোল খাচ্ছে। পরনে খাকি হাফ প্যান্ট, গায়ে ময়লা তেলচিটে গেঞ্জি, গেঞ্জি ফুঁড়ে বুকের হাড়গোড় কাঠকুটোর মতো ফুটে উঠেছে। সে চেঁচিয়ে বলছে—আমার একশো টাকার মাল—একশো টাকার—

—ওই তো সাতকড়ি।

সাতকড়ির দৌড়োনোর দৃশ্যটা খুবই করুণ। সবাই ঘাড় ফিরিয়ে দেখল। ঘামে তেলতেলে মুখ, গালে বিজবিজে দাড়ি, ভ্রূতে পাকা চুল, লটপটে নুলো হাতটা, ছেঁড়া গেঞ্জি, বুকের হাড়গোড়—সব মিলিয়ে ক্ষয়াভাব চেহারাতে। ভিড়টা সেই দৃশ্য দেখে খেপে গেল।

—নুলো সাতকড়ির ঘর কে বানিয়ে দেবে?

—দুটো লোক ঘরে ছিল, তুমি তাদের সুদ্ধু আগুন দিয়েছিলে। শালা খুনে।

—গভর্নমেন্টের জমি, বেদখল করে—মামাদোবাজি—

সাধু বিড়িটা ফেলে উঠে দাঁড়ায়। বিপদ। উত্তুরে হাওয়া টেনে দিয়েছে আগুনটাকে, কিন্তু হক কথা, সে সাতকড়ির দোকানে আগুনটা যাক—তা চায়নি, সে কথাটা ভালোভাবে বলবার আগেই পোড়েলদের বেঁটে ছেলেটা চড় কষাল।

পেটে ভালো খাবার পড়ে না বহুকাল, তার ওপর নেশাভাঙ। সাধু ঝিম হয়ে আবার বসে পড়ে। তারপর বেজায়গায় এক লাথি খেয়ে জমি নিল কোলবালিশের মতো। ধুলোয় গড়িয়ে চিৎকার করে বলল—মেরে ফেল, কেটে ফেলে দাও আগুনে—

—তাই দিচ্ছি। তার আগে বল, কেন আগুন দিয়েছিস—

সাধু ধুলোয় গড়ায়, আর লাথি খায়, আর বলে—নিজের ঘরে দিয়েছি, তাতে কার কী? আমার আগুন—

—তোর আগুন অন্যের ঘরে যায় কেন?

জটিল প্রশ্ন। যন্ত্রণার মধ্যে প্রশ্নটার জুতসই জবাব ভেবে পায় না সে। তবু মুখে রক্ত তুলে বলে—ওই শালারা কেন চানুকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিচ্ছে? কেন দুখন, মোধে, নিধে আমার ঘরে গেড়ে বসে গ্যাঁজা খায়, কেন নানকু আমাকে রোজ সাঁঝের বেলায় লাথি মারবে, কেন হারু ঘোষ—

সবটা বলা হয় না। দাড়ি মুঠো করে ধরে কে যেন তাকে তোলে। সে বুঝতে পারে, তার সঙ্গে পাবলিকের কোনও খানাপিনা নেই। তার কথার উত্তরে তখন পাবলিক বলতে থাকে—

—তুমি যে দেড়েল চানুকে শুষে নিচ্ছ হারামজাদা—

—ভদ্রলোকের যাতায়াতের পথে তেড়েল গেঁজেলের আড্ডা বসিয়েছ—

—গভর্নমেন্টের জমি মেরেছ শালা।

—ঝাড়ফুঁক মন্তর জানে না, গুল-চাল মেরে মানুষের মাথা খাচ্ছে—

—সাতকড়ির দোকানে যে তোমার আগুন গিয়ে লাগল—

সাধুর ঝোপড়া আর সাতকড়ির দোকান জুড়ে দপ করে যেমন আগুনটা ধরেছিল তেমনি কয়েক মিনিটেই নেতিয়ে গেল আবার। দু-চারটে ছাঁচ বেড়া, মাচান, দুটো টুলবেঞ্চি তো আর আগুনের বেশিক্ষণের খোরাক নয়। কিন্তু আগুনটা নিভতে-নিভতেই সাধুর মুখ ফুলে ঢোল, টসটস করে রক্ত ঝরছে নাকে, কপাল বেয়ে। দাড়ি ছিঁড়ে হাওয়ায় ওড়ে, ছেঁড়া জটার চুল মুঠো থেকে রাস্তায় ফেলে দিচ্ছে মারকুটেরা। কে যে মারছে শালা কে জানে।

সবাই এখন পাবলিক। সে একা। সাধু। বিড়বিড় করে কেবল বলে—মার শালা, মেরে ফেল। কেটে ফেলে দে আগুনে, দুনিয়া থেকে পাতলা হয়ে যাই।

মারধোরে আর হিসেব রাখে না সাধু। অনেকক্ষণ ধরে ব্যাপারটা চলে। অনেক হাত, অনেক পা। শেষটায় আর ব্যথা লাগে না তেমন। কেমন যেন নেশাড়ু ঘুম-ঘুম ভাব পেয়ে বসে। টের পায় ল্যাম্পপোস্টের সঙ্গে কারা যেন বাঁধছে তাকে।

—এইখানে থাক শালা, যে যাবে একটা করে লাথি মেরে যাবে।

—মার না শালা। তোরা পারবি নিজের ঘরে আগুন দিতে? বুকের পাটা আছে? সাধু বিড়বিড় করে বলে।

সেই বিড়বিড় কারও কানে পৌঁছোয় না। পৌঁছোলে বিপদ ছিল।

ঝিমুনির নেশাটা যখন জমে এসেছে, তখন আস্তে-আস্তে পাবলিক ফোটে। চারদিকে কালো ছাই ওড়ে। শ্মশানের কলসির মতো ছাইয়ের মাঝখানে সাধুর কলসি হাঁড়ির স্তূপ পড়ে থাকে। উত্তর দিক থেকে টেনে হাওয়া দেয়। সাধুর ঝোপড়ার ছাই চারদিকে ছড়ায়। ল্যাম্পপোস্টের হাতবাঁধা সাধু ত্রিভঙ্গ হয়ে মাথা রেখেছিল ধুলোর ওপর, সেখান থেকেই পিটিরপিটির চেয়ে দেখে নুলো সাতকড়ি একা পাকুড়তলায় বসে কাঁদছে, পাশে তার পাঁচ বছর বয়সের ছেলেটা পিলে বের করে দাঁড়িয়ে।

কারও জন্য এই প্রথম সাধুর মায়া হয়। মায়া মানেই বন্ধন। সাধুদের মায়া থাকতে নেই, তবু মাথায় একটা ঝাঁকুনি দিয়ে উঠে বসে সাধু। মাথাটা হালকা লাগছে, মাথার জটটা পরচুলার মতো পড়ে আছে ধুলোয়। সাধু ভ্রূক্ষেপ করে না। নুলো হাত বলেই কি না কে জানে, সাতকড়ি তাকে মারেনি। দূরে বসে কাঁদছে। সে উঠে বসতেই সাতকড়ি মুখ তোলে। আবার নববধূর মতো মুখ নামিয়ে কাঁদে।

সাধু বলে—কাঁদছ কেন মেয়েমানুষের মতো? বিড়ি থাকে তো দাও।

সাতকড়ি উঠে আসে? মুখে বিড়ি গুঁজে ধরিয়ে দেয়। তারপর বলে—কিন্তু আমার দোষটা কী বলো তো? আমার ঘরটা কেন নিলে আগুনে?

সাধু দাঁতে দাঁত চেপে বলে—আগুনটা আমার বাবার কিনা, তাই—

—তা আমার কী হবে এবারে?

—কী আর হবে? আমার তো মালকড়ি নেই, গতরে খেটে ঘর তুলে দিব। চানুকে বলি, যদি দু-দশ টাকা দেয় তো সে তোমার—

ঘর বাঁধতে-বাঁধতে শীত গিয়ে গরম চলে আসে। রোদের হলকা দুপুরের চরাচর চেটে যায়। রাস্তার কুকুরটাও ছায়া ঘেঁষে বসে। সাধু আর নুলো সাতকড়ি মিলে সাতকড়ির দোকানঘর বাঁধে। জটা দাড়ি-ছেঁড়া সাধুর দুই হাত, নুলো সাতকড়ির এক। বাঁশ-বাঁখারি-খুঁটি যত্নে বাঁধে সাধু, সাতকড়ি তার এগিয়ে দেয়, দড়ি ফেরায়। দুজনে কত কথা হয় ভরদুপুর, সারা দিনমান।

সাতকড়ি বলে—তুমি লোকটা সাধুই বটে হে।

সাধু অনাবিল একটু হাসে, বলে—বুঝলে সাতকড়ি, পাকুড়তলায় ঘরটায় যখন তেড়েল গেঁজেদের আড্ডা বসল, লোকের চোখ টাটাল, আমার সুখ ছিল না; নানকু শালা এসে রোজ লাথি মেরে যায়; তখন মাঝে-মাঝে ভাবতাম, মরি যদি তো আরবার গুন্ডা হব। ভাবতে-ভাবতে মনে হল, কিন্তু এ জন্মটায় শালা কেন আমি সাট্টা সাধু? একবার ঝাঁকি মেরে উঠে দেখি না কী হয়! তখন ঠিক করলাম, মরদের মতো কিছু একটা করি।

সাতকড়ি চুপ করে থাকে।

সাধুর চোখ জুলজুল করে—মাইরি, নিজের ঘরে আগুন দিলাম তবু কেউ বললে না, কাজটা মরদের মতো করেছে সাধু। একজনও তো বলবে!

—তুমি পাগলা আছ। নিজের ঘরে আগুন দিলে কী আর হাতিঘোড়া হয়!

—হয় সাতকড়ি হে, হয়। এই যে আমি নিজের ঘরে আগুন দিলাম, তার জন্যই এখন তোমার ঘর আমাকে বেঁধে দিতে হচ্ছে। আর তুমি বলছ, আমি সাধু বটে।

—বলছি। তোমার মনটা ভালো।

—এইরকম কত লোকের ঘর আমি এবার থেকে বেঁধে দিব। আর লোকে বলবে, লোকটা সাধু বটে। বুঝলে সাতকড়ি হে, যে লোকটা বসে থাকে না, সে দাঁড়ায়। দেখো, পরের ঘর বাঁধতে-বাঁধতে আমি একদিন ঠিক সাচ্চা সাধু হয়ে যাব।
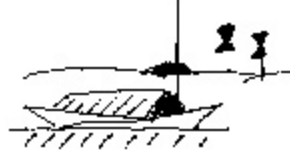
ঝুমকোলতার স্নানের দৃশ্য ও লম্বোদরের ঘাটখরচ

ভূষণ একটু দূর থেকে তার বউ ঝুমকোলতাকে দেখছিল। ঝুমকো কুয়ো থেকে জল তুলছে। মাত্র পাঁচ দিনের পুরোনো বউ। কত কী দেখার আছে নতুন-নতুন। ভূষণ কি কালও জানত যে, তার বউয়ের মাথার গড়নটা অনেকটা মাদ্রাজি নারকোলের মতো? এরকম গড়নের মাথা ভালো না মন্দ তা ভূষণ জানে না। সে ঝুমকোতলার যা দেখছে তাতেই মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছে। এই একটা মেয়েমানুষের মধ্যে যে নিত্যি নতুন মহাদেশ আবিষ্কার করছে, পেয়ে যাচ্ছে গুপ্তধন, লাভ করছে কত না জ্ঞান। মাত্র পাঁচ দিনে।

ঝুমকো এই যে সাতসকালে বালতি-বালতি জল তুলছে চান করবে বলে, এ ভূষণের ভালো লাগছে না। তার ইচ্ছে করছে হাত থেকে বালতি কেড়ে নিয়ে নিজেই জল তুলে দেয়। কিন্তু তা হওয়ার নয়। বাড়িভরতি গুরুজন, আত্মীয়-কুটুম, হাজার জোড়া চোখ নজর রাখছে তাদের দিকে। রাখবেই। নতুন বিয়ের বর-বউ তো নজর দেওয়ারই জিনিস। তবু তার মধ্যেই ভূষণ নানা কায়দা কৌশল করে লুকিয়ে চুরিয়ে ঝুমকোলতাকে একটু আধটু দেখে নেয়। এই যে এখন উত্তর দিককার ঘরে ভূষণের কোনও কাজ নেই, তবু সে এসে ঢুকে পড়েছে। এ-ঘর তুলসীজ্যাঠার। বুড়োমানুষ। দেশের কাজে গান্ধীবাবার অনুগত হয়ে জীবন উৎসর্গ করবেন বলে নাছোড়বান্দা হয়ে লেগে গিয়েছিলেন, তাই আর সংসারধর্ম করেননি। উড়নচণ্ডী হয়ে গাঁ-গঞ্জে ঘুরে বেড়াতেন, তকলি চরকা কাটতেন। বুড়ো বয়সে এসে আবার বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন। কিন্তু ততদিনে গুষ্টি বেড়েছে, ভালো-ভালো ঘরগুলো বেহাত হয়েছে। উত্তরের এই ঘরে থাকে জ্বালানি কাঠ, খোলভুসির বস্তা, বীজধান, তারই একধার দিয়ে কোনওরকমে বুড়ো মানুষটার জন্য একটা চৌকি পাতা হয়েছে। আগে গুটিকয় ছাগলও থাকত। আজকাল থাকে না, তবু ঘরটায় কেমন ছাগল-ছাগল গন্ধ। কস্মিনকালেও ভূষণ এই ঘরে আসে না। কিন্তু ঝুমকোলতা চান করতে যাচ্ছে আঁচ পেয়েই ভূষণ হঠাৎ এ ঘরে এসে সেঁধিয়েছে। কারণ, এ ঘরের জানালার ফোকর

দিয়ে কুয়োতলাটা ভারী পরিষ্কার দেখা যায়। একটা লেবুগাছের আবডালও আছে, তাকে কেউ দেখতে পাবে না।

কিন্তু ঘরে ঢুকেই তো আর জানলায় হামলে পড়া যায় না। জ্যাঠা কী বা মনে করবে। যদিও গান্ধীবাবার শিষ্য, চিরকুমার এবং বুড়ো, তবু সাবধানের মার নেই। ভূষণ ঘরে ঢুকেই চৌকির একধারটায় চেপে বসে বলল, জ্যাঠামশাই, শরীর-গতিক কেমন?

তুলসীজ্যাঠা বুড়ো হলেও মজবুত গড়নের লোক। মাঠে ঘাটে ঘুরে-ঘুরে শরীর পোক্তই হয়েছে। তার ওপর খাওয়ায়-দাওয়ায় খুব সংযমী। নেশা ভাঙ নেই। এখনও নিজের কাপড় নিজে কাচেন, নিজের ঘর নিজে সাফ করেন, স্নানের জলও নিজেই তোলেন। কারও তোয়াক্কা রাখেন না।

বসে একখানা বই পড়ছিলেন। হিন্দি বই। মুখ তুলে বললেন, খারাপ থাকব কেন রে? ভালোই আছি। তোর খবর-টবর কী?

মাথা চুলকে ভূষণ বলে, এই আর কী, ঘাড়ে আবার বোঝা চাপল, বুঝতেই তো পারেন।

বোঝা বলে বোঝা? এ একেবারে গন্ধমাদন। বলে তুলসীজ্যাঠা একটু হাসলেন। তারপর বললেন, বউ তো আনলি, তা মেয়েটা লেখাপড়া জানে তো?

ভূষণের নজর কুয়োতলায়। বলল, ওই আর কী। গাঁয়ের স্কুলে অজ আম পড়েছে।

এঃ, স্ত্রী শিক্ষাটাই আমাদের দেশে হল না। তা একখানা বই দেবোখন, ভারতীয় নারীর ঐতিহ্য। বইখানা বউমাকে পড়াস।

ও বাবা, ওসব খটোমটো বই কি আর পড়বে?

পড়বে। জোর করে পড়াস। পড়াটা অভ্যাসের ব্যাপার। প্রথম-প্রথম পড়তে চাইবে না। তারপর রস পেলে হামলে পড়বে।

বুড়োমানুষরা এমনিতেই একটু ভ্যাজর-ভ্যাজর করে, তার ওপর এ মানুষ আবার আদর্শবাদী, ভূষণ জানালাটার দিকে একটু চেপে বসে বাইরের দিকে চেয়ে উদ্বেগের সঙ্গে বলল, এঃ, লেবুগাছটায় দেখি পোকা লেগেছে।

তুলসীজ্যাঠা তাঁর হিন্দি বইখানা সাবধানে মুড়ে রাখলেন। তারপর বললেন, যাই, হোমিওপ্যাথির বাক্সটা নিয়ে একটু মাঠেঘাটে পাক দিয়ে আসি।

সেই ভালো। বলে ভূষণ এ ঘরে থাকার ছুতো খুঁজতে হিন্দি বইখানাই খুলে বসল। বলল, ইঃ, বাবা এ যে দেখছি তুসলীদাসের রামচরিতমানস। অ্যাঁ! কতকাল ধরে বইখানা পড়ার ইচ্ছে।

তা পড় না, বসে-বসে পড়।

তুলসীজ্যাঠা বেরিয়ে যাওয়ার পর থেকে ভূষণ অপলক নয়নে ঝুমকোকে দেখছে। হাতে রামচরিতমানস এলিয়ে আছে।

আচ্ছা, এই যে ভূষণ ঝুমকোলতাকে দেখছে, ঝুমকো কি তা টের পাচ্ছে? মোটেই না। ভূষণের তো মনে হয় এই পাঁচ দিনে একটা অচেনা মেয়েকে সে যেমন আষ্টেপৃষ্টে ভালোবেসে ফেলেছে, তার সিকির সিকি ভাগও ঝুমকোলতা পারেনি। ভূষণের যেমন আনচান অবস্থা, চোখে-হারাই ভাব, তেমনটা ঝুমকোলতার কই? দিব্যি ঘুমোচ্ছে, খাচ্ছে, শ্বশুরবাড়ির নতুন সব চেনাদের সঙ্গে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা মারছে, ভূষণ বলে যে কেউ আছে তাই বোধহয় সারাদিন মনে পড়ে না। এসব কথা নিয়ে কাল রাতেও হয়ে গেছে একচোট। কিন্তু যা কথায়-কথায় কাঁদতে পারে মেয়েটা। ভূষণ শেষে পা অবধি ধরেছে।

কে একজন ছোকরা মতো ঝুমকোর খুব কাছ ঘেঁষে এসে দাঁড়াল? অ্যাঁ! সাহস তো কম নয়। পিছন থেকে মুখটা দেখা যাচ্ছে না বটে। কে ও? ভূষণ একটু খর চোখেই তাকিয়ে রইল। নাঃ, পল্টু। ভূষণের ভাইপো। কাকিমার জল তুলতে কষ্ট হচ্ছে দেখে এগিয়ে এসেছে। ছেলেটা বড় ভালো। খুব হেসে-হেসে গল্প করছে কাকিমার সঙ্গে।

ভূষণ মুখটা একটু আড়াল করল। পল্টুটা না আবার তাকে দেখে ফেলে। আবার সন্তর্পণে মুখ বার করে দেখতে পেল, আরও দুচারজন এসে জুটেছে কুয়োতলায়। পল্টু জল তুলছে। ঝুমকো গুলতানি মারছে। মুখটা আড়াল করতেই হয়। নইলে দেখে ফেলবে।

রামচরিতমানসখানা খুলে দু-চার লাইন পড়ার চেষ্টা করল ভূষণ। হিন্দিটা তার ভালো আসে না। তা ছাড়া রামচরিত পড়ার মতো মনের অবস্থাও নয়। মন এখন উচাটন। বই রেখে বালিশের পাশে ডাঁই করে রাখা বইপত্র থেকে একটা খাতামতো জিনিস তুলে নেয়, খুলে দেখে, মুক্তোর মতো পরিষ্কার অক্ষরে ঝরঝরে বাংলা লেখা।

'তিনি চলিয়াছেন, গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে, দেশ হইতে দেশান্তরে। পরনে সেই দরিদ্র ভারতবাসীর লজ্জা নিবারণের পক্ষে যৎসামান্য দুটি বস্ত্রখণ্ড। ভুলিলে চলিবে না, তাঁহার এই পোশাকও বড় উপযুক্ত, বড় দেশজ, বড়ই প্রতীকী। হাতে দীর্ঘ শীর্ণ যষ্টি। তাঁহার সহিত আকারে প্রকারে ওই যষ্টিটারও যেন সুদূর মিল রহিয়াছে। রস মরিয়া ওই যষ্টি

যেমন ঋজু ও কঠিন হইয়াছে, জীবনের সমস্ত উপভোগ, আমোদ, আনন্দ ইত্যাদিকে ত্যাগ ও তপস্যার অনলে শুকাইয়া তিনিও ঋজু, রিক্ত, কঠিন। সেই কাঠিন্য কাহাকেও আঘাত করে না, কিন্তু সব আঘাতকেই অনমনীয়ভাবে প্রতিরোধ করে।'

'বাবুরা, ধনিকেরা, গৃহীরা তাঁহাকে চিনে না। তাহারা শুধু মহাত্মা গান্ধীর জয় জোকার দিয়া ক্ষণিক আবেগ অনুভব করে মাত্র। মহাত্মাজি দেশের কাজ করিতেছেন, তিনিই দেশোদ্ধার করিবেন, আমাদের কিছু করিবার নাই, এইরূপ ধারণা লইয়া তাহারা বেশ নিশ্চিন্তে ইংরেজের গোলামি করিতেছে বা কালোবাজারিতে মুনাফা লুটিতেছে, ঘুস লইতেছে বা অন্যবিধ অপকর্ম করিয়া যাইতেছে। গান্ধীবাবা আছেন, ভালো কাজ তিনিই করিবেন।'

'মাঝে-মাঝে ভাবি, তিনি এই দেশে জন্মগ্রহণ করিলেন, তবু কই দেশের তো কলঙ্ক ঘুচিল না। ইহাও কি সম্ভব যে তিনি এই দেশের বাতাসে শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করিলেন, তবু এই দেশের বায়ু পবিত্র হইল না? তাঁহার চরণরেণু মাখিয়াও এই দেশের মাটি ধন্য হইল না।'

ঝুমকোলতা বেড়া দিয়ে ঘেরা চানের জায়গাটায় ঢুকে আড়াল হল, কিন্তু তাতে কী?

ঝুমকোর টুকটুকে লাল শাড়ি, রাঙা গামছা আর ধপধপে শায়া যে বেড়ার ওপর। তারও কি শোভা কম? তাতেই নেশা লেগে যায় যে।

উঁকি মেরে মুখটা আবার চট করে সরিয়ে নেয় ভূষণ। তার মেজকাকিমা চাল ধুতে এসে এদিকপানে চেয়ে কী যেন দেখছে।

দেওয়ালের দিকে সরে বসল ভূষণ, এ বাড়িটা একেবারে হাট। এত লোক যে কেন যেখানে সেখানে হুটহাট আনাগোনা করে তা বোঝা মুশকিল। দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে ভূষণ ঘরখানা দেখছিল। লকড়ির মাচানের নীচে কুঁইকুঁই শব্দ শুনে ভূষণ উঁকি মেরে দেখল, গোটাচারেক কুকুরছানা দলা পাকিয়ে আছে। বাড়িতে কুকুরের অভাব নেই, তারই একটা এসে এ-ঘরে বাচ্চা দিয়েছে। বাস্তবিক গান্ধীবাবার শিষ্য ছাড়া বোধহয় আর কারও পক্ষেই এ-ঘরে বাস করা সম্ভব নয়। বস্তা-বস্তা বীজধান, ভুসি, খোল আর রাজ্যের লকড়িতে ঘর পনেরোআনা বোঝাই। একটা বিটকেল গন্ধও থানা গেড়ে আছে। মাটির ভিতে নানা মাপের অজস্র ফুটো। লেপাপোঁছার বালাই নেই। এমন বুকচাপা দম আটকানো ঘরে তুলসীজ্যাঠাই থাকতে পারে, যার জন্য লড়ার কেউ নেই।

একটু কেমন যেন আনমনা হয়ে পড়েছিল ভূষণ, সেই ফাঁকে কখন চানটি সেরে বেরিয়ে পড়েছে ঝুমকোলতা। বেরিয়ে সোজা সেজোকাকির ঘরের ভিতর দিয়ে

অন্দরমহল। তবে ভূষণ একেবারে বঞ্চিত হল না। উঠোনের তারে ভেজা শাড়ি মেলার জন্য মিনিটদুই দাঁড়িয়ে ছিল, তখন ভালো করে দেখে নিল।

এ-বাড়ির অন্দরমহল হল রাক্ষসপুরী। একবার যাকে গ্রাস করে নেয় তাকে আর সহজে ছাড়ে না। এই যে ঝুমকোলতা অন্দরে ঢুকল এর মানে হল, সে সংসারে সামগ্রী হয়ে গেল। আর ভূষণের নিজস্ব জিনিস রইল না। ফের সেই রাত দশটার পর ঝুমকোলতা আবার ভূষণের হবে। রাক্ষসপুরীর কথা কি আর সাধে মনে হয় ভূষণের।

আর তুলসীজ্যাঠার ঘরে বসে লাভ নেই। ভূষণ বেরিয়ে এসে দরজায় শিকল তুলে দিল।

বিয়ের মধ্যে যে আনন্দ আর রোমহর্ষ ছিল, তা বিয়ের আগে জানত কোন আহাম্মক? ভূষণ ভাবত, বিয়েটা একটা ব্যাপারই হবে বটে, কিন্তু তা যে এরকম ভালো, তা তার কল্পনাতেও ছিল না। যারা বিয়ে না করে থাকে, তাদের জীবনটাই বৃথা। এই যে তুলসীজ্যাঠা, কী নিয়ে যে বেঁচে আছে ভগবান জানে। মাঠেঘাটে ঘুরছে, হোমিওপ্যাথি করে বেড়াচ্ছে, আর দিনান্তে রামচরিতমানস বা গান্ধীর বই খুলে মুখ গুঁজে বসে আছে। অসুখ-বিসুখ হলে জলটুকু এগিয়ে দেওয়ারও লোক নেই।

অসুখের কথায় ভূষণ হঠাৎ নিজেই চমকায়, তাই তো। কথাটা তো বড় জব্বর মনে পড়েছে। অ্যাঁ! এখন যদি তার অসুখ হয়, তাহলে ঝুমকোসুন্দরী কী করবে? অ্যাঁ! ধরো জ্বর উঠে গেল পাঁচ-সাত ডিগ্রি, ভূষণ চোখ উলটে গোঁ-গোঁ করছে, ডাক্তার নাড়ি ধরে গম্ভীর মুখে বসে আছে আর ঘড়ি দেখছে, অ্যাঁ। তখন কী করবে ঝুমকো? বুকের ওপর পড়ে, 'ওগো, পায়ে পড়ি...' এই সব বলবে না? অ্যাঁ! কাণ্ডটা কী হবে তখন!

বেজায় শীত পড়েছে এবার। সকালের রোদটাও বড্ড ঢিমে। একটা মোটা খদ্দরের চাদর জড়িয়ে ভূষণ বেরিয়ে পড়ল বাড়ি থেকে। বন্ধুবান্ধবরা আজকাল তাকে দেখলেই মুখ বেজার করছে। সেদিন ফণী তো বলেই ফেলল, উরে বাব্বা, তোর ঝুমকোলতার গল্প শুনতে-শুনতে যে আঁত শুকিয়ে গেল বাপ।

তা ভূষণই বা করে কী? ঝুমকোলতার কথা ছাড়া তার যে আর কথা আসছে না গত তিন-চার দিন। এখনও মেলা কথা বলার বাকি।

ছোলাখেত বাঁয়ে রেখে হনহন করে হাঁটছে ভূষণ। পাশের গাঁ হল মুনসির চক। গোকুল থাকে। এমনিতে গোকলোটা যাকে বলে গর্ভস্রাব। ধান বলতে কান বোঝে। কিন্তু তার কাছে কথা বলে সুখ আছে। যাই বল না কেন, হাসি-হাসি মুখ করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুনবে, ফোড়ন কাটবে না, বিরক্ত হবে না, উঠি-উঠি করবে না, কাজ দেখাবে না। আজ

গোকলোকে পাকড়াও করতে হবে। পেটে ঝুমকোলতার গপ্প ভুড়ভুড়ি কাটছে। না বললেই নয়। এ গাঁয়ের বন্ধুগুলো বড্ড সেয়ানা হয়ে গেছে।

মনসাতলায় অশ্বত্থ গাছের নীচে বাঁধানো জায়গাটায় কয়েকজন বসে আছে গোমড়া মুখে। একজন তুলসীজ্যাঠা। তিনি ওষুধের বাক্স খুলে শিশি তুলে-তুলে নাম দেখছেন ওষুধের। ওরে ও ভূষণ, কোথা যাস?

ভূষণ জ্যাঠার ডাক শুনে একটু থমকায়। তারপর বলে, এই যাচ্ছিলাম একটু, কাজেই।

এদিকে যে লম্বোদর পরামানিকের হয়ে গেল। ঘাটখরচের জোগাড় নেই। একটু দেখবি বাবা?

ভূষণ একটু গরম হল। লম্বোদরের কী হল, বৃকোদরের কী হবে, দামোদরের কী হচ্ছে, এসব নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকারটাই বা কী আছে, তাই সে বোঝে না। যে যার মতো বেঁচে থাকছে, মরে যাচ্ছে, খাবি খাচ্ছে, দুনিয়ার তাই নিয়ম। থাক, যাক, খাক, তাতে তার কী?

তবু ভূষণ দাঁড়িয়ে গেল। যত যাই হোক, এই পাগল লোকটার তো বউ নেই, জীবনের স্বাদই পায়নি, মায়া হল ভূষণের।

—কী করতে হবে জ্যাঠা?

করার অনেক আছে। চারটে ছেলেপুলে, একটা মুখ্যু বউ, ঘরে দানাপানির জোগাড় নেই। তা সে না হয় পরে ভাবা যাবে। আগে ঘাটখরচা তো তোলা লাগে। এই এরা সব বসে আছে ওষুধের জন্যে, আমি নড়তে পারছি না। একটু গাঁয়ের ঘরে-ঘরে ঘুরে খরচটা তুলে দিবি বাবা?

সে কী কথা? ঘুরব কেন? ঘাটখরচ নয় পকেট থেকেই দিয়ে দিচ্ছি!

তুলসীজ্যাঠা একগাল হাসলেন, দূর পাগল। ও বাহাদুরি ক'দিন? আজ লম্বোদর গেছে, কাল বিধু নস্কর যাবে, পরশু বিনোদ হাতি মরবে, কারোর ঘরে মামলোত নেই। ক'জনেরটা দিতে পারবি? তার চেয়ে ঘরে-ঘরে ঘোরা ভালো। পাঁচজনকে সমাজ-সচেতনও করা যায়, দশের কাজে নামানো যায়। যাবি বাবা?

ভূষণ তত্বটা বুঝল না। তবে একটু আঁচ করল। কথাটা খুব মন্দ নয়। একটু মাথা চুলকোল সে। তারপর বলল, আচ্ছা দেখছি।

যা বাবা, তুই পারবি।

দোনোমনো করে ভূষণ গাঁয়ের দিকে ফিরল। কাজটা খুব শক্ত নয়। সবাই তাকে চেনে। চাইলে দেবে।

দিলও। বেলা দশটা নাগাদ শুরু করেছিল ভূষণ। সাড়ে এগারোটার মধ্যে শ'আড়াই টাকা উঠে গেল। পাঁচ টাকা কম ছিল, সেটা নিজে পূরণ করে দিল।

লম্বোদর যখন মাচানে চেপে শ্মশানে রওনা দিল, তখন পড়ন্ত বেলা। চারটে ছেলেমেয়ে আর বউ কিছুটা শোকে, কিছুটা খিদেয় আর কিছুটা ভবিষ্যতের ভয়ে কাঁদছে লুটোপুটি খেয়ে।

দৃশ্যটা বেশিক্ষণ দেখতে পারল না ভূষণ। ঘরদোরের যা চেহারা, তাতে বোঝা যায়, এদের নুন পান্তা জুটলে সেদিন ভোজ।

ফেরার সময় তুলসীজ্যাঠা ছাতাটা মেলে ধরে বলল, আয়, ছাতার নীচে আয়। মুখটা রাঙা হয়ে গেছে তোর।

জ্যাঠার এত কাছাকাছি কখনও হয়নি ভূষণ। আজ তার বড় জিগ্যেস করতে ইচ্ছে করছিল, কীসের আনন্দে বেঁচে আছেন আপনি? কী সুখ পেয়েছেন জীবনে?

কিন্তু কথাটা সরল না মুখে।

আনন্দেরও তো কোনও ঠিক-ঠিকানা নেই। কে যে কী থেকে আনন্দ পায়! কখনও ঝুমকোলতার স্নানের দৃশ্যে, কখনও লম্বোদরের ঘাটখরচ জোগাড়ে।

আমেরিকা

আমেরিকায় নামবার আগে ভালো করে দাঁত মেজে নিও। কারণ তোমার দাঁতে প্রাচ্যদেশিয় বীজাণু থাকতে পারে। হাতঘড়ির সময়টাও মিলিয়ে নাও। কারণ আমেরিকায় সবকিছু ঘড়ি ধরে চলে। তোমার জুতোর তলায় রয়েছে প্রাচ্যদেশিয় ধুলো-ময়লা। রুমালে সেগুলো সাবধানে মুছে নাও। আমেরিকাকে নোংরা কোরো না। এবার প্রস্তুত হও। সিট-বেল্ট বাঁধো। সিগারেট নিভিয়ে ফেলো। আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমরা কেনেডি এয়ারপোর্টে নামছি।

এসব আমার জানাই ছিল। অনেক আগেই আমি দাঁত মেজে, হাতঘড়ি মিলিয়ে এবং জুতো পরিষ্কার করে বসে আছি। আমার পাশে বসা একটা খুনখুনে তিব্বতি বুড়ি ভাঙা হিন্দিতে বিড়বিড় করে আমাকে বলল, আমার দাঁত নেই, হাতঘড়ি নেই, রুমাল নেই! বাঁচলাম। নীচে ওই যে জঙ্গলের মতো দেখা যাচ্ছে, মস্ত-মস্ত উঁচু গাছ অথচ ডালপালা নেই ওটা কী জায়গা বলো তো?

চুপ-চুপ। আমি চাপা গলায় বলি, ওটাই নিউইয়র্ক।

নিউইয়র্ক! বুড়ি চোখ কপালে তুলে বলল, কিন্তু কার্পেটটা দেখতে পাচ্ছি না কেন বলো তো! আমার ছেলে নিউইয়র্ক থেকে লিখেছিল গোটা আমেরিকাই একটা মস্ত কার্পেট দিয়ে মোড়া।

আমিও শুনেছি।

শুনেছ। যাক বাঁচালে। বলে বুড়ি বিড়বিড় করতে-করতে তার পোঁটলাপুটলি গোছাতে লাগল।

প্লেন নামল। থামল। দরজা খুলে হোসটেস বলল, প্রাচ্যবাসীগণ, তোমাদের সামনে স্বর্গের দরজা খোলা। এখানে সব কিছুই অফুরন্ত। ডলার, মেয়ে, ফরেন গুডস, যাও কয়েকদিন লুটেপুটে খাওগে। ইউরোপীয়গণ, আমেরিকা তোমাদের কাছে স্বর্গ না হলেও চমৎকার এক চারণভূমি। যাও দ্বিতীয় এই স্বদেশকে বারবার আবিষ্কার করো। আমেরিকানগণ, তোমাদের কাছে আমেরিকা সম্পর্কে নতুন কিছু বলার নেই। এই সেই নরক, যেখানে মরতে তোমাদের ফিরে আসতে হয়।

আমি নামলাম। এবং নেমেই তাজ্জব হয়ে গেলাম। আমেরিকায় পা রাখার সঙ্গে সঙ্গেই যেন আমেরিকা আমাকে তার কোলে তুলে নিল। আদর করে কানে-কানে বলল, বাছা রে, গরিবের ঘরে পথে ধুলো-কাদা ঘেঁটে বড় হয়েছিস। ভালো জিনিস চোখে দেখিসনি, জিবে ঠেকাসনি, ভোগ করিসনি। আয় বাছা, ক'দিন ভোগ-সুখ করে যা।

কৃতজ্ঞতায় আমার চোখে জল এল। আমি গোপনে রুমালে চোখের জল মুছে নিলাম।

আমেরিকায় কাঁদা বারণ। তবে আমেরিকা সম্পর্কে আমি যা-যা শুনেছিলাম, তা সবই সত্যি। দেশটা আগাগোড়া মহার্ঘ কারপেটে মোড়া। সেই কার্পেটের ওপর কোথাও ঘাস এবং কোথাও কংক্রিট বসানো। এক অতি উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে এখানকার আকাশকে আরও একটু বেশি নীল করা হয়েছে। প্রাচ্যের সংবাদপত্রগুলো ঠিকই বলে, আমেরিকার মাধ্যাকর্ষণ বল কিছু কম। ফুরফুর করে হাঁটা যায়, কষ্ট হয় না। এখানকার বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণও বেশি। পানীয় জল জীবাণুমুক্ত এবং ভিটামিনযুক্ত।

একশো আশি তলা উঁচু একটা হোটেলের একশো সত্তর তলার একটা ঘরে ঢুকে আমি দেখলাম, একটা লোক একটা হেলিকপটারে বসে বাইরে থেকে আমার ঘরের জানালার শার্শি ভাকুয়াম ক্লিনার দিয়ে পরিষ্কার করছে! ঘরের মধ্যেও চমৎকার ব্যবস্থা। রঙিন টিভি, ফ্রিজ, রাজকীয় বিছানা ও সুন্দরী রমণী সবই প্রস্তুত! ব্যবহারের অপেক্ষা মাত্র।

টেলিফোন তুলে আমি প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথা বলতে চাইলাম।

একটু বাদেই টেলিফোনে মার্কিন প্রেসিডেন্টের গমগমে এবং আহ্লাদিত গলা পাওয়া গেল, বলো বন্ধু, বলো!

আমি এক ভারতীয় পর্যটক, মাননীয় প্রেসিডেন্ট।

ভারতীয়! ভারতীয়! প্রেসিডেন্ট একটু স্মরণ করতে সময় নিলেন। তারপর উচ্চকিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, ওঃ! ভারত! হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমি জানি। ভারত হল পৃথিবীর দ্বিতীয় বা তৃতীয় বৃহত্তম গণতন্ত্র। সেখানে তাজমহল আছে। তাই না?

আজ্ঞে হ্যাঁ, মাননীয় প্রেসিডেন্ট। স্বাগতম ভারতীয় পর্যটক। আমাদের দেশ সর্বদাই ভারতীয় পর্যটকদের শ্রদ্ধার চোখে দেখে। প্রকৃতপক্ষে আমরা সব দেশের লোককেই শ্রদ্ধার চোখে দেখে থাকি, যদিও তাদের মধ্যে অনেকেই প্রকৃত শ্রদ্ধার যোগ্য নয়।

আমেরিকা অতীব মহান দেশ মাননীয় প্রেসিডেন্ট।

ধন্যবাদ ভারতীয় পর্যটক, তোমার কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তো?

না মাননীয় প্রেসিডেন্ট। এই হোটেলের ঘরে রঙিন টিভি থেকে সুন্দরী রমণী সবই আছে।

চমৎকার। তুমি নিশ্চয়ই ওসব জিনিসের ব্যবহার জানো। আমি তো শুনেছি, ভারতে ট্রেন চলে এবং কোথাও-কোথাও এরোপ্লেনও নামাওঠা করে। দিল্লিতে টেলিফোনও আছে আমি জানি। ভারত যে গত কয়েক বছরে দুর্দান্ত অগ্রগতি করেছে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

ধন্যবাদ মাননীয় প্রেসিডেন্ট। আমি শুনেছি গোটা আমেরিকাই কারপেটে মোড়া। মাননীয় প্রেসিডেন্ট, এরকম মহান কীর্তি আর কোনও দেশের নেই।

ধন্যবাদ, ভারতীয় পর্যটক। আমরা যথাসাধ্য দেশটাকে সুন্দর করার চেষ্টা করছি মাত্র। তোমার ভালো লাগলেই খুশি হব।

মাননীয় প্রেসিডেন্ট, আমি শুধু পর্যটন করতেই আসিনি। আমি দুজন মৃত আমেরিকান নাগরিক সম্পর্কে খোঁজ-খবরও করতে এসেছি। একজন সোনি লিস্টন, আর একজন উইলিয়াম হোলডেন।

তারা কারা?

দুজনেই বিশ্ববিখ্যাত লোক।

প্রেসিডেন্ট অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গেই বললেন, অধিকাংশ আমেরিকান নাগরিকই বিশ্ববিখ্যাত মানুষ। তাদের সকলকে মনে রাখা মুশকিল। তবে তুমি যে-কোনও জীবিত বা মৃত আমেরিকান সম্পর্কেই খোঁজ-খবর নিতে পার। কোনও বাধা নেই।

ধন্যবাদ মাননীয় প্রেসিডেন্ট।

তোমার সফর আনন্দময় হোক ভারতীয় পর্যটক।

টেলিফোন রেখে আমি জানালার কাছে যাই। হেলিকপ্টারে বসা লোকটা অখণ্ড মনোযোগে শার্সি পরিষ্কার করে যাচ্ছে। ঠোঁট থেকে ঝুলছে আধপোড়া সিগারেট।

আমি জানালার একটা শার্সি ফাঁক করে বললাম, শুভ সন্ধ্যা।

শুভ সন্ধ্যা।

আমি একজন ভারতীয় পর্যটক।

ইন্ডিয়ান? ইন্ডিয়ানদের তো আমরা তাড়িয়ে দিয়েছি।

আমি রেড ইন্ডিয়ান নই।

খুব ভালো। রেড ইন্ডিয়ান হওয়াটা কাজের কথা নয়।

তোমার দেশ খুব ভালো লাগছে।

লাগারই কথা। আমিও শুনেছি আমেরিকা খুব ভালো দেশ।

এই দেশটার বৈশিষ্ট্য কী বলতে পারো?

পারি। এখানে মেলা কাচের শার্সি। এত শার্সি তুমি অন্য কোনও দেশে পাবে না। আমি দিনে প্রায় দু-তিন হাজার শার্সি পরিষ্কার করি।

তাহলে তোমার রোজগার ভালোই?

কী যে বলো। এদেশে এখন মিলিওনেয়ারদেরই গরিব বলে ধরা হয়। এই জানালা থেকে তুমি যদি নীচের রাস্তায় এলোপাতাড়ি গুলি চালাও, তাহলে যে ক'টা লোক মারা পড়বে তাদের অধিকাংশই মিলিওনেয়ার, বিলিওয়েনার বা ট্রিলিওনেয়ার। আমার আয় তো দিনে মোটে দু-তিন শো ডলার। তাও সকাল থেকে সন্ধে অবধি খাটতে হয়। পুরোনো হেলিকপটারটা বেচে নতুন একটা মডেল কেনার ইচ্ছে বহু দিনের, পেরে উঠছি না। তবে সুখের কথা এখানে শার্সি বাড়ছে। আরও বাড়বে।

আমেরিকায় কাচের শার্সি ছাড়া আর কী আছে?

অনেক কিছুই আছে। নায়েগ্রা প্রপাত, ডিজনিল্যান্ড, স্ট্যাচু অব লিবার্টি।

দেখেছ?

দেখেছি। তবে ওসব হলো ট্যুরিস্টদের জন্য। আসল আমেরিকাকে আবিষ্কার করতে চাও তো আমার মতো হেলিকপ্টার কিনে তাতে উঠে পড়ো। কাচের শার্সি পরিষ্কার করার কাজ নাও। তখন দেখবে তোমার সামনে আসল আমেরিকার বুক ও নিতম্ব অনাবৃত হয়ে পড়ছে।

সেটা কী করে সম্ভব?

কাচ স্বচ্ছ জিনিস এবং সব ঘরেই তো পরদা টানা থাকে না। শার্সিতে চোখ রাখলে ঘরে-ঘরে আমেরিকার বিচিত্র রূপ দেখতে পাবে।

ধন্যবাদ। বলে আমি জানালা বন্ধ করে দিই।

ঘরের মেয়েটি আপনমনে আয়নার সামনে বসে সাজছিল। খুবই সুন্দরী সে। লম্বা, স্বাস্থ্যবতী। ফরসা রঙের কথা আর কী বলব!

আমি জানলা বন্ধ করার পর সে আমার দিকে চেয়ে বলল, ভারতীয় পর্যটক, মহিলাদের সম্বন্ধে তোমার পূর্ব ধারণা কীরকম?

খুব পরিষ্কার নয়। আচ্ছা, তোমাদের দেশের নিগ্রোদের সম্পর্কে তোমার ধারণা কীরকম?

খুব পরিষ্কার নয়। তবে শুনেছি ওরা ভীষণ দুষ্টু। মারপিট করে, রেপ করে।

করে? আমি চোখ কপালে তুলি।

হ্যাঁ, আমি রেপ জিনিসটা একদম পছন্দ করি না। সেক্স খুব ভালো। কিন্তু রেপ ভীষণ খারাপ।

আমি মাথা নেড়ে বলি, আমারও সেই মত। আমি শুনেছি গোটা আমেরিকাই একটা চমৎকার কার্পেটে ঢাকা। কথাটা কি সত্যি?

নিশ্চয়ই।

তাহলে তোমাদের চাষবাস কোথায় হয়?

কেন কার্পেটটা তো ভীষণ উর্বর। খুব গভীরও। আমরা কার্পেটের ওপরেই চাষ করি।

বাঃ-বাঃ, আমেরিকা প্রযুক্তিবিদ্যায় তো বহুদূর এগিয়ে গেছে।

বহুদূর।

কার্পেটের তলায় কী আছে জানো?

না। আমরা জন্ম থেকেই কার্পেটটা দেখেছি। সম্ভবত কার্পেটটার তলায় আছে প্রিমিটিভ আমেরিকা। কিন্তু কথা অনেক হয়েছে। এবার এসো খানিকটা সেক্সের চর্চা করা যাক।

হবে-হবে। কিন্তু আমেরিকার বৈশিষ্ট্য কী তা বলতে পারো?

পারি। আমেরিকা মানেই হচ্ছে বিছানা। এত সুন্দর নকশাদার ও নরম বিছানা তুমি কোথাও পাবে না। সুখে বা দুঃখে তুমি কেবল বিছানায় ডুবে থাকতে পার। তুলো, ফোম, রবার এবং পালকের এমন বিচিত্র সমানুপাতিক সংমিশ্রণ আজও পৃথিবীর কোথাও কেউ ঘটাতে পারেনি। এসো, শুয়ে দ্যাখো।

আমি এক-পা পিছিয়ে গিয়ে বলি, হবে-হবে। আমার আরও কিছু জানার আছে।

মদির চোখে আমার দিকে চেয়ে মেয়েটি বলে, প্রাচ্যের ভীরু পুরুষ, কেন সংকোচ? কেন দ্বিধা? দেখ ওই যে উঁচু সটান সব স্কাইস্ক্র্যাপার এগুলো কীসের প্রতীক জানো?

না তো।

আমেরিকানরা সেক্সকে কত মর্যাদা দেয় তা বুঝতে পারবে যদি ভালো করে ওগুলো প্রত্যক্ষ করো। তোমাদের দেশের শিবলিঙ্গ যেমন সৃষ্টির প্রতীক, আমেরিকান স্কাইস্ক্র্যাপারও তেমনি এক প্রতীক। এদেশে লজ্জার স্থান নেই। এসো, এসো...

আমি আর্তনাদ করে বলি, দাঁড়াও। আমার কয়েকটা কথা জানবার আছে।

মেয়েটা হাই তুলে বলল, কিন্তু এখন আমার একটু গরম বিছানা দরকার। আমি বরং অন্য ঘরে যাই।

মেয়েটা চলে গেলে আমি লিফটে নীচে নেমে আসি। সামনেই একটা চমৎকার পার্ক। একটি নিরিবিলি বেঞ্চিতে ভবঘুরে চেহারার একজন লোক বসে ঢুলছে। টুপিটা চোখের ওপর নামানো।

আমি তার কানে-কানে বললাম, কার্পেটটা একটু তুলে দেখাতে পারো?

সে কিছুমাত্র নড়ল না। শুধু ডান হাতটা বাড়িয়ে মৃদুস্বরে বলল, পাঁচ ডলার।

আমি পাঁচটা ডলার তার হাতে দিতেই বুড়ো লোকটা টুপি সরিয়ে আমার দিকে চাইল।

একটা শ্বাস ফেলে উঠতে-উঠতে বলল, এসো। পার্কের ওই কোণায় কার্পেটটা সবচেয়ে পাতলা।

খুব বেশি মেহনত করতে হল না। পার্কের নির্দিষ্ট কোণে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে লোকটা একটা পকেট-ছুরি বের করে কুচকুচ করে ঘাস-মাটির একটা অংশ কেটে চাড় দিয়ে কার্পেটটা তুলে ফেলল, বলল, যাও।

নীচে একটা গর্ভগৃহ। ভয়ের কিছু নেই। নামবার সিঁড়িও আছে। আমি নেমে গেলাম। এত বড় গর্ভগৃহ আমি জীবনে দেখিনি। এ-মুড়ো ও-মুড়ো দেখা যায় না। একটু ঝুঁঝকো

অন্ধকার ভাব। টেবিল পাতা। এক-একটায় এক-একজন লোক বিমর্ষভাবে বসে আছে। শব্দহীন। শুধু একটা চাপা 'হায় হায়' ধ্বনি সেখানকার বদ্ধ বাতাসে ছড়িয়ে যাচ্ছিল। অনেকগুলো দীর্ঘশ্বাস যেন একযোগে বলছিল, একা, বড় একা।

খুব বেশি খুঁজতে হল না। একটা টেবিলে সোনি লিস্টন বসেছিল। মড়ার মতো ফ্যাকাশে মুখ। চোখের দৃষ্টি দীপ্তিহীন। সেই বিশাল শরীরটা কোনও ক্রমে টেবিলে ধরে নিজেকে সামলে রেখেছে।

মিস্টার লিস্টন, কিছু বলুন।

কী বলব? একা, বড় একা।

মৃত্যুর সময়টা আপনার কেমন লেগেছিল?

ওঃ বোলো না। বাড়িতে কেউ ছিল না। একা। বড় একা।

একা?

একদম একা।

কেন?

তা তো জানি না। স্ত্রী বাইরে কোথায় যেন গিয়েছিল কয়েকদিনের জন্য। ছেলেপুলেরা কাছে থাকত না। আমি ছিলাম। আর বাড়িটা আমাকে গ্রাস করতে আসছিল। বুকে প্রচণ্ড ব্যথা। কত ডেকেছি, চেঁচিয়েছি। কেউ শুনতে পায়নি।

তারপর?

আমি ঢলে পড়ে গেলাম। মেঝেয়। দমের জন্য আঁকুপাঁকু করছিলাম আর মানুষের মুখ দেখতে চাইছিলাম।

আপনি খুব ভালো মুষ্ঠিযোদ্ধা ছিলেন। বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন। কত টাকা ছিল আপনার। কত গুণমুগ্ধ। তবু একা?

তবু একা, ওঃ বোলো না।

তারপর কী হল?

একটা প্রেত হঠাৎ আমেরিকার বিখ্যাত কার্পেটটা তুলে আমাকে বলল, ঢুকে পড়ো, ঢুকে পড়ো। আমি ঢুকে পড়লাম। এইখানে।

আমি উঠে ধীরে-ধীরে খুঁজে-খুঁজে উইলিয়াম হোলডেনকেও পেয়ে যাই। এই সেই চিত্তচাঞ্চল্যকর চলচ্চিত্রাভিনেতা। বিশ্বাস হয় না।

হাড়গোড় বেরিয়ে পড়েছে। মুখের হনু দুটো উঁচু হয়ে আছে।

মিস্টার হোলডেন?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

আমি শুধু জানতে চাই, মৃত্যুর সময় আপনি কেন একা ছিলেন?

আমিও পালটা প্রশ্ন করতে চাই, মৃত্যুর সময় অধিকাংশ আমেরিকানই কেন একা থাকে?

আমি বোকার মতো তাঁর দিকে চেয়ে আছি দেখে তিনি মৃদু একটু হেসে বললেন, প্রতিটি আমেরিকানই একা। সঙ্গী বা আত্মীয়হীন। আমেরিকানদের কেউ থাকে না কেন বলো তো?

আপনার কেউ ছিল না? অত টাকা! অত খ্যাতি! অত মেয়েছেলে!

হোলডেন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। বললেন, তবু কেন উইলিয়াম হোলডেন একা মরে?

কেন তার মৃত্যুর পাঁচ দিন পর তার লাশ বাড়ি থেকে বের করে পুলিশ?

সেটাই আমার প্রশ্ন।

আমারও প্রশ্ন। এখন যাও, বিরক্ত কোরো না।

আমি আবার ওপরে ফিরে আসি।

আমেরিকার প্রেসিডেন্টকে আবার ফোনে পেয়ে যাই আমি।

মাননীয় প্রেসিডেন্ট।

বলো ভারতীয় পর্যটক।

আমি এক জায়গায় কারপেটটা তুলে আমেরিকার ভিতরে ঢুকে গিয়েছিলাম।

অভিনন্দন ভারতীয় পর্যটক। কী দেখলে?

অনেক কিছু। আমি জানতে চাই মাননীয় প্রেসিডেন্ট, কেন সোনি লিস্টন এবং উইলিয়াম হোলডেন ফাঁকা ঘরে মারা গিয়েছিল?

গিয়েছিল নাকি?

হ্যাঁ, মাননীয় প্রেসিডেন্ট। সংবাদপত্রে তার অকাট্য প্রমাণ আছে।

ভারতীয় পর্যটক, আমি এইমাত্র খবর পেলাম ভারত প্রযুক্তিবিদ্যায় আরও এগিয়ে গেছে।

সে মোটরগাড়ি এবং লরি তৈরি করতে পারে। তুমি এ কথাটা আমাকে জানাওনি।

কিন্তু মাননীয় প্রেসিডেন্ট, আপনি কি দেখেছেন, অধিকাংশ আমেরিকানই বুড়ো বয়সে খুব একা হয়ে পড়ে। তাদের স্ত্রী কাছে থাকে না বা ছেড়ে চলে যায়। ছেলেমেয়েরা ভিন্ন হয়ে যায়। মৃত্যুর সময় হলে...

ভারতীয় পর্যটক, তুমি এখনও হিউস্টন দেখনি, এমপায়ার স্টেট বিল্ডিংসে ওঠোনি, লাস ভেগাসে জুয়ার আড্ডায় যাওনি, এমনকী এখনও একটিও মার্কিন মেয়েকে চুমু খাওনি! এটা কেমন কথা?

কিন্তু মাননীয় প্রেসিডেন্ট, একাকিত্বের কথাটা আমাকে শেষ করতে দিন। আমি আমেরিকার অভ্যন্তরে ঢুকে—

কার্পেটটা আবার আমরা নতুন করে পাতব ভারতীয় পর্যটক। এবার সেটা এত সুন্দর হবে যে তার তলায় কী আছে তা আর কারও দেখতে ইচ্ছেও করবে না!

আরোগ.

আরোগ্য!

একেই কি আরোগ্য বলে? কে জানে! নার্সিংহোমের বিশাল জানালার পর্দাটা আজ সরানো। ভোরের আলোয় ভরে আছে ঘরখানা। টেবিলের ওপর ফুলদানিতে একগোছা পাঁচমিশেলি ফুল। এ ঘরে কোনও গন্ধ নেই। কিংবা থাকলেও তা নাকে সয়ে গেছে বলে শান্তশীল সাধারণত কোনও গন্ধ পায় না। আজ এয়ারকন্ডিশনিং বন্ধ এবং জানলার কাচের শার্সি খোলা বলে সাত তলার এই ঘরে বঙ্গোপসাগর থেকে নোনা বাতাস এসে ঢুকে পড়েছে বুঝি!

শান্তশীল খুব গভীর শ্বাস নিল।

মাত্র বিয়াল্লিশ বছর বয়েস তার। দুরন্ত স্বাস্থ্য ছিল এককালে। তবু যে কেন হৃদযন্ত্র এমন গণ্ডগোল পাকিয়ে বসল কে জানে! মনে হচ্ছে, আজ তার আরোগ্যের দিন।

কয়েকবার শ্বাস নিল শান্তশীল। তার ওঠা বারণ, হাঁটা বারণ। ডাক্তার অনুমতি না দিলে উঠে বসা অবধি বারণ। নিষেধের বেড়াজাল তাকে ঘিরে ছিল কাল অবধি। আজ কি সে মুক্তি পাবে?

ধীরে, খুব ধীরে শান্তশীল পাশ ফিরল। জানালার দিকে। কলকাতার আকাশরেখা কী মনোরম! ভোরের আলোয় কী পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন দেখাচ্ছে সাততলা থেকে কলকাতা! এ পাড়াটায় কোথাও নোংরা নেই, ভাঙা বাড়ি নেই, কুশ্রীতা নেই।

শরৎকাল। শান্তশীলের বড় প্রিয় ঋতু। শরতে শিউলি আর কাশফুল ফোটে, শরতে ঘাসের ওপর ঝরে পড়ে শিশিরের মুক্তো, শরতে ঢাকের বাদ্যি আর আগমনী গান।

শান্তশীল কি উঠবে একটু? বসবে? দু-এক পা হাঁটবে? বড্ড ভয় করে। মৃত্যুর খুব কাছাকাছি চলে গিয়েছিল সে। ডাক্তার গুহ বলেছেন, যদি পৃথিবীতে আরও কিছুদিন বাঁচতে চান তাহলে ক'টা দিন নড়াচড়া অবধি বন্ধ রাখুন।

ডাক্তার গুহ রুগিদের একটু ভয় দেখাতে ভালোবাসেন। তাঁর অভিমত হল, হার্টের রুগিদের একটু ভয় খাওয়ানো ভালো, তাতে দুষ্টুমিটা কমবে।

শান্তশীলের বাঁ-দিকে পাশ ফিরে শোয়া অবধি বারণ। ভাগ্য ভালো জানালাটা তার ডান দিকে।

নিজের হৃদযন্ত্রকে ভারী ভয় পায় আজকাল শান্তশীল। নিজের শরীরকেই ভয় পায়। এই রহস্যময় দেহযন্ত্রকে সে এতকাল টেরই পেত না।

বিশাল এ-দেওয়াল ও-দেওয়াল জোড়া জানালা দিয়ে প্যানোরামিক দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। আজ যেন বাইরেটা হুহু করে ঢুকে আসছে ঘরে। রোদ, বাতাস, দৃশ্য। কতকাল সে শুয়ে আছে বিছানায়! কতকাল বাইরে যায়নি। এমনকী কাল অবধি তার কেটেছে আধা ঘোরের মধ্যে। যন্ত্রণায় ডুবে থেকে কতগুলো দিন বেঘোরে কেটে গেল!

বুকে একটু ভার এখনও বোধ করে শান্তশীল। দিনে কত যে ট্যাবলেট খেতে হয় তার কোনও হিসেব নেই। জিব বড় বিস্বাদ। সারাক্ষণ এক ক্লান্তিকর পুকুরে ডুবে থাকা।

কফির গন্ধে মুখখানা আস্তে ফেরাল শান্তশীল।

গুড মর্নিং, স্যার।

শান্তশীল তার নার্সের দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। মধ্যবয়স্কা, কালো, দেখতে সুন্দর নয়। তবু এই সকালের আলোয় মহিলার চেহারায় বেশ নতুন মাত্রা যোগ হল আজ।

হাসিমুখে সে বলল, ফাইন মর্নিং। আমি কি আজ কফি খাব?

মেয়েটি ভাঙা বাংলায় বলল, আজ কয়েকটা সিপ ড্রিংক করবেন। ব্ল্যাক কিন্তু। নো সুগার।

অনেকদিন বাদে আজ কফি খাবে বলে শান্তশীল উঠতে যাচ্ছিল।

মেয়েটি বলে উঠল, উঁহু ডোন্ট একজার্ট। আমি বসিয়ে দিচ্ছি।

হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে খাটের আধখানা ধীরে-ধীরে ওপরে তুলে দিল মেয়েটি।

অবসাদ। বড় অবসাদ। শান্তশীল কফির জন্য হাতখানা পর্যন্ত নাড়াল না কিছুক্ষণ।

মহিলাটি তার বুক থেকে পেট অবধি ন্যাপকিনে ঢেকে দিলেন যত্ন করে। তারপর ফিডার কাপটি হাতে নিয়ে বললেন, জাস্ট এ ফিউ সিপস।

শান্তশীল পাতলা হালকা কফির লিকারে প্রথম চুমুক দিয়েই টের পেল, যতটা ভালো লাগবে বলে ভেবেছিল ততটা লাগছে না। তবু খেলো।

মুখটা সযত্নে মুছিয়ে দিলেন মহিলা। খাটটা নামাতে যাচ্ছিলেন, শান্তশীল হাত তুলে বলল, থাক, একটু বসে থাকি।

বেশিক্ষণ নয় কিন্তু। ডাক্তার অ্যাডভাইস করেছেন, শুয়ে থাকতে হবে।

শান্তশীল কলকাতা শহরের বিশাল পটভূমির ওপর ভোরের আলোর নরম আভা দেখতে লাগল। সে যেন বড় ভাগ্যবান। সাততলা থেকে কলকাতার এই শোভা যে সে আজ দেখতে পাচ্ছে তা তার নিজের কৃতিত্ব নয়। সে দরিদ্র ঘরের মেধাবী ছেলে। একটা সময়ে জীবনে সে বেশ কষ্ট পেয়েছে অভাবে। মেধাবী বলেই চটপট পাশটাশ করে ইঞ্জিনিয়ার হয়ে ভালো চাকরি পেয়েছে। তার কোম্পানি তাকে ফ্ল্যাট দিয়েছে, গাড়ি দিয়েছে। এই চিকিৎসার বিপুল খরচও বহন করবে কোম্পানি। তার কোনও মাথাব্যথা নেই। গরিবের ছেলে হয়ে যেদিন সে টাকার মুখ দেখতে লাগল, যেদিন থেকে স্ট্যাটাস এবং এটিকেট নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করল, সেদিন থেকেই কিন্তু বদ অভ্যাসও ধরে ফেলল তাকে। সাধারণত সুরা-মদির ঘুম তার এত ভোরে ভাঙে না, যদি বা ভাঙে শরীরে থাকে রাজ্যের জড়তা, হ্যাং ওভার। আজ সেসব নেই। আজ ভারী ভালো লাগছে তার।

সিস্টার, ডাক্তার কখন আসবেন?

সিস্টার ঘড়ি দেখে বললেন, ন'টা হয়ে যাবে।

আমি একটু হাঁটতে চাই।

সিস্টার মাথা নাড়লেন, ইমপসিবল। ইউ আর নট আউট অব ডেনজার।

শান্তশীল সেটা জানে। তাকে টানা সাতদিন ইনটেনসিভ কেয়ারে রাখা হয়েছিল। যমে মানুষে টানাটানি গেছে। মাত্র কয়েকদিন আগে তাকে আনা হয়েছে কেবিনে।

অবসন্ন শান্তশীল ক্লান্ত গলায় বলে, কতকাল খবরের কাগজ পড়ি না, টেলিফোন করি না, গাড়ি চালাই না।

সব হবে। হ্যাভ পেশেন্স। কথা বেশি না বলাই ভালো। টেক রেস্ট।

রেস্ট! বলে শান্তশীল ভ্রূ কোঁচকাল। বিশ্রাম অনেক হয়েছে। তবু এত অবসাদ যে কেন!

ঘড়ি দেখে সিস্টার চলে গেলেন। ব্রেকফাস্টের সময় হল। বিস্বাদ, অদ্ভুত সব খাবার দেয় এরা। ক্যালোরিহীন, ফ্যাটহীন, চিনিহীন, লবণহীন।

শান্তশীলের শরীর সায় দিচ্ছে না, তবু ইচ্ছে করছে জানলার কাছে গিয়ে একটু বসতে। কী সুন্দর বাতাস বইছে। একটা পাখি এসে জানলার কানায় বসল। চড়াই। চুরুক করে ডেকে ফের উড়ে গেল। রাস্তায় গাড়ির শব্দ হচ্ছে, ঝাঁটার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে কেবিন থেকে। জানলা দরজা বন্ধ থাকলে কোনও শব্দই পাওয়া যায় না।

দুটি চড়াই এসে ঘরে ঢুকল। চক্কর মারল কয়েকটা। তাদের দ্রুত সঞ্চালিত পাখার শব্দ একটা ভাইব্রেশনে ভরে দিল ঘরটা। শব্দটা কি মৃদু ধাক্কা দিচ্ছে তার হৃৎপিণ্ডে? বুকের মধ্যে একটা ডুগডুগি বাজছে।

চোখ বন্ধ করে গভীর শ্বাস নিতে লাগল সে। রক্তচাপ তার বড্ড বেশি ছিল। কান ঝাঁ ঝাঁ করত, ঘাড়ে ব্যথা হত। এখনও যেন সেই অস্পষ্ট লক্ষণগুলি রয়ে গেছে।

আরোগ্য? না, সে এখনও বোধহয় আরোগ্যের চৌকাঠ ডিঙোয়নি।

ব্রেকফাস্ট এসে গেল। আবার ন্যাপকিনে বুক পেট ঢাকা পড়ল। তারপর শিশুর মতো হাঁ করে নার্সের হাত থেকে চামচে-চামচে বিস্বাদ খাবার খাওয়া। তারপর ওষুধ।

মুখ মুছিয়ে খাটটা নামিয়ে দিল নার্স।

কত ঘুম ঘুমোবে শান্তশীল? এত বকেয়া ঘুম জমে ছিল তার শরীরে? নাকি এরা বারবার ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখে? কে জানে কী, তবে শান্তশীল ঘুমোল।

যখন জাগল তখন ঘরের জানালা বন্ধ। এয়ারকন্ডিশনিং চালু হয়েছে। ঘর নিস্তব্ধ। ছুঁচ পড়লে শোনা যায়।

ডাক্তার এলেন। মুখে পেশাদার অভয় হাসি। দাড়ি নিখুঁত কামানো। চোখে বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা। অমায়িকতায় মাখামাখি মুখশ্রী।

কেমন দেখছেন ডক্টর গুহ?

চমৎকার। গুড প্রোগ্রেস।

আমার একটু হাঁটতে ইচ্ছে করছে।

হাঁটবেন। তবে আজ নয়। উইকনেস এখনও আছে। হাঁটতে গেলে মাথা রিল করতে পারে।

পোর্টেবল যন্ত্রে ডাক্তার ইসিজি রিডিং নিলেন। শান্তশীল চোখ বুজে রইল। তার শৈশবে অসুখ হলে একজন সস্তার এলএমএফ ডাক্তার ছিল বাঁধা। ছিল মার্কামারা ওষুধ। মার্কামারা পথ্য। মিকশ্চার, বড়ি, বার্লি, দুধ সাগু, শান্তশীলের সতেরো বছর বয়সে তার স্কুল শিক্ষক বাবা মারা গেলেন। সাত ভাইবোন আর মা নিয়ে বিরাট সংসার। তখন অসুখ হলে ডাক্তারও আসত না। শান্তশীলের এক দাদা ছিল জড়বুদ্ধি। সে মারা যায় মেনিনজাইটিসে, চিকিৎসাই হল না। শুধু ডেথ সার্টিফিকেট লিখতে ডাক্তার এসেছিলেন। চার টাকা ভিজিটও নিয়েছিলেন।

সেই চারটে টাকার কথা আজ খুব মনে পড়ল। চারটে টাকার জন্য তখন হাহাকার ছিল।

বাঃ, অলমোস্ট নরমাল। আর কয়েকটা দিন রেস্ট নিন। সব ঠিক হয়ে যাবে।

শান্তশীলের চোখের কোণে কি একটু জল? অবসন্ন হাত তুলে সে চোখ মুছে নিল।

নার্সের সঙ্গে চাপা গলায় কথা বললেন, ডাক্তার। তারপর চলে গেলেন।

আজ সে একশো-দেড়শো টাকা পেগের মদ খায়, মহার্ঘ হোটেলে গিয়ে খেয়ে আসে ডিনার।

অথচ, শৈশবে, বেড়ে ওঠার সময়ে এক কাপ দুধও কখনও জোটেনি। সাত ভাইবোনের সেই ছিল সবচেয়ে মেধাবী। তাই তার ওপরে ছিল সকলের আশা আর নজর। একটা পরিবারের সে-ই হয়ে উঠেছিল নিউক্লিয়াস।

কী করেছে শান্তশীল তার পরিবারের প্রতি?

হিসেব করে দেখলে সে তার এক ভাইয়ের চাকরি করে দিতে পেরেছে। দুই বোনের বিয়েতে মোটামুটি সাহায্য করেছে। চাকরি জীবনের প্রথমে সে মাইনে বেশি পেত না।

ধার-কর্জ করতে হয়েছিল। ধীরে-ধীরে সেই ঋণ শোধ হয়েছে।

শান্তশীলের বুকটা ভার লাগছে। ব্যথা নেই, কিন্তু ভার। আর ক্লান্তি।

আমি কি বই পড়তে পারি সিস্টার?

বই! নার্স একটা যেন চিন্তা করে মাথা নেড়ে বলে, না।

অন্তত নিউজ পেপার?

ওঃ, ইউ আর ন্যাগিং। আচ্ছা দেখছি দাঁড়ান।

নার্স চলে গেল। একটু বাদে একটা ইংরেজি খবরের কাগজ এনে দিয়ে বলল, ফর টেন মিনিটস। নো মোর। পড়লে কিন্তু স্ট্রেন হয়।

শান্তশীল কাগজটায় চোখ বোলাল। পৃথিবীর খবর সম্পর্কে তার খিদে ছিল। এখন খিদেটা কেন যেন নেই। কাগজটা বালিশের পাশে ভাঁজ করে রেখে দিল সে। পরে পড়বে। দরজায় টোকা পড়ল।

শান্তশীল কোনও কৌতূহল বোধ করল না। জানলা দিয়ে বাইরে রোদ আর হাওয়ার খেলা দেখতে লাগল।

একটা ছায়া পড়ল চোখে।

শান্তশীল তার অনাগ্রাহী চোখ তুলে যুবতীটিকে দেখল। যেন অচেনা বা আধোচেনা কেউ। বিয়ের বারো-তেরো বছর পরও শান্তশীল স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারেনি যে, সে তার স্ত্রী মধুশ্রীকে প্রকৃতই ভালোবাসে কি না। আর এখন অসুখের পর, পৃথিবীর সঙ্গে তার এত ব্যবধান রচিত হয়েছে যে, এই মহিলাকে কাছের লোক বলেও মনে হচ্ছে না।

মধুশ্রীর শরীর থেকে ইন্টিমেট পারফিউমের তীব্র গন্ধ আসছে। গন্ধটা ভালো লাগছে না শান্তশীলের। গন্ধটা তার বুকে ধাক্কা দিচ্ছে, শ্বাসবায়ুকে মন্থন করে গাঢ় করে তুলছে। একটু নীচু হয়ে তার কপালে আলতো হাত রাখে মধুশ্রী।

শান্তশীলের দুটি মেয়ে আছে। এ সময়ে তাদের স্কুল। রোজ নয়, তবে মাঝে-মাঝে তারা দুটি করুণ উদ্বিগ্ন মুখ নিয়ে বাবাকে দেখতে আসে। মধুশ্রী আসে রোজ। আসে নিজস্ব গাড়িতে। ফেরার পথে মার্কেটিং করে যায়।

শান্তশীল খুব স্থির অপলক চোখে মধুশ্রীর দিকে চেয়ে রইল। এইভাবে সে তার স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্কটাকে খুঁজে দেখছিল। কীরকম সম্পর্ক, কোন সম্পর্ক, কোথায় তাদের যোগসূত্র? এ একটি নারী, সে একজন পুরুষ সেটাও একটা সম্পর্ক বটে, কিন্তু বড্ড পলকা। আরও গভীর কিছু নেই? আরও অবিনশ্বর কিছু?

তুমি তো ভালোই আছ এখন। ডাক্তার গুহ বলছিলেন—আর এক সপ্তাহ পরে ছেড়ে দেবেন।

এক সপ্তাহ! এক সপ্তাহে ক'টা দিন? কত ঘণ্টা? কত মিনিট? কত সেকেন্ড? মধুশ্রী কি জানে নার্সিংহোমের এই ঘরে এক-একটা সেকেন্ড কত লম্বা হয়?

শান্তশীল নির্বিকার মুখে বলল, ওঃ।

একটা সপ্তাহ দেখতে-দেখতে কেটে যাবে।

যেদিন তার হার্ট অ্যাটাক হয় সেদিন সকালে মধুশ্রীর সঙ্গে তার বিশ্রী একটা শো-ডাউন হয়েছিল। ঝগড়া তাদের মধ্যে কমই হয়। আসলে সেলস ইঞ্জিনিয়ার শান্তশীলকে কলকাতার বাইরে যেতে হয় খুব বেশি, অফিসের কাজ তার সময়টুকু রাক্ষসের খাবার কেড়ে খেয়ে নেয়। দুটি ফুটফুটে মেয়ে আর অভিমানী বউয়ের সঙ্গে কাটানোর মতো সময় আর তার হাতে বিশেষ থাকে না। কিন্তু সেদিন হয়েছিল। সাংঘাতিক শো-ডাউন। বুকের ব্যথার শুরু সেই থেকে। দুপুরে অফিসে ব্যথা বাড়ল। সন্ধেবেলা আরও। রীতিমতো তীব্র ব্যথা। সারা শরীর ঘামে ভিজে গেল। একটা ক্লাব-ডিনার ছিল বিকেলে। শান্তশীল মদ দিয়ে ব্যথাটাকে ধুয়ে দিতে চেষ্টা করেছিল। সিগারেট খেয়েছিল পর পর। ব্যথা উঠতে লাগাল মাথায়। বিপদ বুজে সে বেরিয়ে আসতে চেয়েছিল পার্টি থেকে। গাড়ি পর্যন্ত পৌঁছোতে পারলেই যথেষ্ট।

পারেনি। তবে গাড়ি পার্ক করার চত্বর অবধি চলে গিয়েছিল সে। তারপর বুক চেপে ধরে বসে পড়ল মাটিতে। ড্রাইভার নঈম তাকে দেখতে পেয়েছিল আরও কিছু পরে। লোক জড়ো করে শান্তশীলকে সে ধরাধরি করে গাড়িতে তোলে এবং বুদ্ধিমানের মতো সোজা নিয়ে আসে নার্সিংহোমে। তারপর বাড়িতে খবর দেয়।

মেয়েরা দাম্পত্য কলহের কথা সহজে ভোলে, ছেলেরা ভোলে না, শান্তশীলের জিবে যে বিস্বাদ এখনও লেগে আছে, তা ওই দিনের ঝগড়ার স্মৃতি জড়িয়েও।

মধুশ্রী এমনিতে দেখতে খারাপ নয়। রাস্তায় ঘাটে পুরুষরা দু-একবার ফিরে তাকাতে পারে। পঁয়ত্রিশ, কিন্তু পঁয়ত্রিশ বলে মনেও হবে না। তা এই মধুশ্রীকে দেখে শান্তশীলের কোনও প্রতিক্রিয়া হচ্ছে না। লক্ষণটা কী খারাপ?

তুমি নিজে কেমন ফিল করছ?

ভালো।

চোখের কোণে জল কেন বলো তো! কেঁদেছ নাকি?

না। ও এমনিই। চোখ জ্বালা করেছিল।

তোয়ালে দিয়ে চোখ মুছিয়ে দিল মধুশ্রী। তারপর বলল, এরা এত করছে তোমার জন্য যে, আমার আর কিছু করার থাকছে না। আমি দেখি, চলে যাই, কোনও মানে হয়?

কেন, সেবা করতে চাও?

কিছু করতে পারলে ভালো লাগত।

এই তো ভালো।

জানি। দে আর প্রফেশন্যাল পিপল। আমরা তো এদের মতো পারব না। তবু মনে হয়, আপনজনের অসুখ করলে কিছু করতে পারলে ভালো হয়।

শান্তশীল চোখ বুঝে বলল, ডোন্ট বি সেন্টিমেন্টাল।

আমাদের সময়ও কাটছে না। ক'দিন যা টেনশন গেল। কাল রাতে একটু ঘুমোতে পেরেছি।

এতদিন ঘুমোওনি?

হয় নাকি? যা টেনশন।

শান্তশীল জানলায় চড়াই দেখতে পাচ্ছিল। এখন শার্সি বন্ধ। কিন্তু শার্সির বাইরে দুটো চড়াই বরাবর চক্কর খাচ্ছে। হয়তো একটা মেয়ে চড়াই, অন্যটা পুরুষ।

শান্তশীল কোনও দিনই আবেগপ্রবণ নয়। আর পৃথিবীর কোনও মানুষের প্রতিই তার কোনও নাড়িছেঁড়া টান নেই। তার মা থাকে শান্তশীলের ছোট ভাইয়ের কাছে। জব্বলপুর। এত গুরুতর অসুখের পরও মা'কে দেখতে ইচ্ছে করেনি তার। তার দুটি ফুটফুটে মেয়েকে সে ভালোবাসে বটে, কিন্তু সেরকম বাড়াবাড়ি কখনও করে না। তবে আবেগহীনতা তাকে মাঝে-মাঝে বিপদে ফেলে দেয়। বাবা মারা যাওয়ার পর কাঁদা দূরের কথা, সে এত স্বাভাবিক আচরণ করেছিল যে মা পর্যন্ত ওই শোকের সময়েও তার ওপর রেগে উঠেছিল।

অবসন্ন শান্তশীল চোখ বুঝে ভেবেছিল, সে কি একটু নিষ্ঠুর? হৃদয়হীন?

যখন চোখ মেলল শান্তশীল তখন মধুশ্রী চলে গেছে। শুধু দম বন্ধ করা গন্ধটা রেখে গেছে ঘরের বাতাসে।

নার্স ঘরে নেই। সবসময়ে থাকে না। সে ঘুমোচ্ছে দেখে হয়তো করিডোরে বান্ধবীদের সঙ্গে আড্ডা মারছে। অসুবিধে নেই, হাতের কাছেই কলিং বেল আছে। বোতাম টিপলেই দৌড়ে আসবে। কিন্তু তাকে ডাকবার কোনও প্রয়োজন আপাতত নেই। একটু জলতেষ্টা

পেয়েছে। তেমন কিছু নয়, একটু পরে জল খেলেও চলবে। শান্তশীল জানলার দিকে চেয়ে হতাশ হল। রোদ্দুর আসছে বলেই বোধ হয় পুরু পরদায় গোটা জানলাটা ঢেকে দেওয়া হয়েছে। প্রেক্ষাগৃহের মতো এই ঘরে আর কতদিন তাকে শরীরে বন্দি হয়ে থাকতে হবে?

শান্তশীল বুকের ভারটা টের পাচ্ছে এখনও। শরীরের অবসাদও। খুব ধীরে সে কনুইয়ের ওপর ভর রেখে উঠে বসবার চেষ্টা করল। মাথার মধ্যে কেমন একটা পাক মেরে চোখে অন্ধকার দেখল কিছুক্ষণ। তারপর সে-ভাবটা কেটে গেল। খুব ধীরে-ধীরে শরীরে যতদূর সম্ভব কম চাপ দিয়ে সে উঠে বসল। এই সামান্য পরিশ্রমেই কি হাঁফ ধরল তার? বড়-বড় শ্বাস ফেলতে লাগল সে।

এইবার? শান্তশীল দেখল তার স্টিলের বেডটা বেশ উঁচু। সে কি নামবে? পারবে নামতে? পড়ে যাবে না তো? উচিত হবে কি নামাটা?

আরও সাত দিন এই অবরোধে কাটানোটা অর্থহীন। তার বাবা মারা গিয়েছিল অনেক অনাদরে, প্রায় বিনা চিকিৎসায়, তার পরিবারের ডাক্তার ডাকার বা ওষুধ খাওয়ার রেওয়াজই ছিল না একটা সময়ে। তার দাদার করুণ মৃত্যুর কথা এখনও এত স্পষ্ট মনে পড়ে। কী হবে তার? মৃত্যুর বেশি আর কী হতে পারে?

শান্তশীল তার পায়জামা পরা পা-দুটো ঝুলিয়ে দিল নীচে। তারপর সামান্য দ্বিধাজড়িত কয়েকটা সেকেন্ড।

শান্তশীল মেঝের ওপর দাঁড়াল। হাঁটু ভেঙে পড়তে চাইছে। শরীরে একটা অদ্ভুত থরথরানি। বিছানায় ভর রেখেই সে এই দুর্বলতা সামাল দিল। হাঁটবার জন্য এখন তাই দুর্জয় সাহস। বুকের থরথরানি, শরীরের অভ্যন্তরে ঝিঁঝির ডাক, মাথার চক্কর এসব নিয়ে হাঁটবার চেষ্টা করাটাও যে বিপজ্জনক তা শান্তশীল জানে।

এক-পা এক-পা করে সে কয়েক পা এগিয়ে গেল। শরীরে তেমন ভারসাম্য থাকছে না। সে টলছে। সোজা যেতে গিয়ে বেঁকে যাচ্ছে। জানলার কাছ বরাবর এসে পরদাটা সরিয়ে বাইরে তাকাল। বেলা দশটার কাছাকাছি কি এখন? বা আর একটু বেশি? এ-ঘরে একটা দেওয়াল ঘড়ি আছে। কিন্তু সেদিকে তাকাল না সে। ক'টা বাজে জেনে তার লাভ কী? তার জানলার নীচেই একটা পার্ক, পার্কে জলাশয়। নিবিড় গাছপালা আছে চারদিকে।

শান্তশীল খানিকক্ষণ তৃষিতের মতো চেয়ে রইল সেই দিকে। একটা রাধাচূড়া গাছের তলায় বেঞ্চে ময়লা জামাকাপড় পরা একজন বুড়ো মানুষকে দেখতে পাচ্ছিল সে। বসে ঝিমোচ্ছে।

শান্তশীল ধীর পদক্ষেপে হেঁটে দরজার কাছে এল। সাবধানে দরজাটা খুলে দেখল করিডোর ফাঁকা। বাইরে বেরিয়ে এল শান্তশীল। দরজাটা সাবধানে ভেজিয়ে দিয়ে সিঁড়ি ধরে নামতে থাকল নীচে। লিফট নিল না। দরকার কী?

সাত বা আটতলা থেকে নামারও কিছু পরিশ্রম আছে। শান্তশীল রেলিং-এ হাত রেখে নামতে লাগল। নামতেই লাগল। একটার পর একটা ধাপ। অশেষ। অনেক উর্দিপরা লোক তাকে দেখল। কয়েকজন নার্সও। কিন্তু কেউ কিছু বলল না। যে যার নিজের কাজে ব্যস্ত। কারও তেমন সময় নেই।

খালি পায়ে নীচে নেমে এল শান্তশীল। বুক ভার, শরীরে অবসাদ, তবু তেমন কিছু ঘটল না তার শরীরে। কোনও বিস্ফোরণ নয়, কোনও যবনিকা নয়।

সামনে চমৎকার কংক্রিটের ড্রাইভওয়ে। ঢালু হয়ে নেমে গেছে রাস্তায়। শান্তশীল ধীর এবং দৃঢ় পদক্ষেপে পথটুকু পেরিয়ে রাস্তায় নামল।

চারদিকে জমজম করছে কলকাতা। অবারিত পৃথিবী। শান্তশীলের মাথার মধ্যে একটা পংক্তি আপনা থেকেই চলে এল, বন্ধন হোক ক্ষয়। রবীন্দ্র জয়ন্তীতে কতবার গানটা শুনেছে। কিন্তু মাথায় ঘুরপাক খেতে লাগল ওই একটি লাইন, বন্ধন হোক ক্ষয়...

শান্তশীল এত মুক্ত কোনওদিন বোধ করেনি। তার পকেটে একটি পয়সাও নেই, পায়ে জুতো নেই, পরনে শুধু পায়জামা আর বুশ শার্ট গোছের। কয়েকদিন দাড়ি কামানো হয়নি। তাকে কেমন দেখাচ্ছে কে জানে?

শান্তশীল যথেষ্ট সাহস বোধ করছে, আত্মবিশ্বাসও। শরীরের জড়তা কেটেছে, বুকের ভার ততটা অনুভব করছে না। সে পায়ে-পায়ে পার্কটায় চলে এল। ফটক ঠেলে ঢুকে পড়ল ভিতরে।

একজন দারোয়ান গোছের লোক গম্ভীর মুখে এগিয়ে এসে বলল, ইঁহা ঘুসনা মানা হ্যায় জি।

শান্তশীল তর্ক করল না। বিনয়ের সঙ্গে বেরিয়ে এল। পার্কটাতেই যে তাকে ঢুকতে হবে এমন কোনও কথা নেই। সে তো এখন সব দিকেই যেতে পারে। যেখানে খুশি। সুতরাং সে কিছু চিন্তা না করেই হাঁটতে লাগল।

একটু বাদেই সে যখন বুঝতে পারল যে বাড়ির দিকেই হাঁটছে তখন ইচ্ছে হল পথ পালটাতে।

পথ পালটাল শান্তশীল। কিন্তু কোন দিকে যাবে তা স্থির করতে মন চাইল না। উদাসভাবে হাঁটতে লাগল শুধু। দেখল, কোনও লাভ হচ্ছে না। তার অভ্যস্ত সংস্কার, তার জৈব চেতনা তাকে ঠিক নিয়ে যাচ্ছে একটা চেনা পথের দিকেই। নির্দিষ্ট লক্ষ্যে।

বাড়ির দারোয়ান তাড়াতাড়ি উঠে একটা অভিবাদন জানাল।

সাব, তবিয়ৎ ঠিক তো হ্যায়?

হ্যাঁ।

সিঁড়ি ভেঙে ওঠা বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে কি? তার অ্যাপার্টমেন্ট পাঁচতলায়। অনেকটা পথ হেঁটেছে শান্তশীল। অন্তত মাইলতিনেক। সে ঘামছে। একটু হাঁফ ধরেছে তার।

একটু ভেবে লিফটে উঠে দরজা বন্ধ করে দিল শান্তহীন। তারপর চোখ বুজে দম নিল শান্তভাবে।

কলিং বেল একবার মাত্র বাজাল সে। কেউ দরজা খুলল না। তাহলে কি মধুশ্রী এখনও ফেরেনি। কাজের মেয়েটা অবশ্য নেই, দেশে গেছে শুনেছে সে। তাহলে কি ফিরে যাবে শান্তশীল?

দরজাটা হঠাৎ সামান্য একটু ফাঁক হল। খুব সামান্য। একটা চোখ সেই ফাঁক দিয়ে তাকে বিদ্ধ করল।

তারপরই একটা ক্ষীণ ভয়ার্ত গলায় আর্তনাদ, কে?

শান্তশীল বুদ্ধের মতো শান্তভাবে চোখটার দিকে ঘুরে তাকাল। কিছু বলল না। চোখটা মধুশ্রীর। তাকে চিনতেও পারছে। তবু দরজাটা হাট করে খুলল না তো!

খুব ধীরে-ধীরে দরজাটা খুলল মধুশ্রী। তার চোখে অপার বিস্ময়।

তুমি! তুমি কী করে এলে?

শান্তশীল দেখল, মধুশ্রীর চুল এলোমেলো, পরনে তাড়াহুড়োয় চাপানো হাউসকোট, যার বোতামের-সঙ্গে-বোতামের ঘর ঠিকঠাক মেলেনি। বাঁ-গালে টাটকা একটা কামড়ের দাগ।

শান্তশীল ভদ্রভাবে চোখটা অন্যদিকে ফিরিয়ে নিয়ে বলল, আমার আসবার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু কেন যে চলে আসতে হল। এর কোনও মানে হয় না।

দ্বিধাগ্রস্ত মধুশ্রী দরজা মেলে ধরে বলল, এসো।

শান্তশীল ঘরে ঢুকল। মস্ত বড় বসবার আর খাওয়ার ঘর। ইন্টিরিয়র ডেকরেটর দিয়ে সাজানো হয়েছিল। অবিশ্বাস্য রকমের চকচকে। এত সাজানো যে, এই অ্যাপার্টমেন্টে থাকতে তেমন স্বস্তি হয় না।

শান্তশীল ঘরে ঢুকে বুঝল, মধুশ্রী ভীষণ রকমের নার্ভাস। মুখ বিবর্ণ।

শান্তশীল খুব ঠান্ডা মাথায় বলল, আমি একটু বাথরুমে যাব।

ওঃ, আচ্ছা।

শোওয়ার ঘরের দরজাটা আপনা থেকেই কি বন্ধ হয়ে গেল? নিঃশব্দে? শান্তশীল একটু থামল। মধুশ্রীর দিকে চেয়ে বলল, দশ মিনিটের জন্য।

অ্যাঁ?

দশ মিনিটের জন্য বাথরুমে গেলে তোমার হবে তো?

মধুশ্রী অবোধ জন্তুর মতো চেয়ে রইল। বোবা।

দশ মিনিটের বেশিই সময় নিল শান্তশীল। বুকটায় আবার ভার। একটা ঘুনঘুনে ব্যথা ছড়িয়ে পড়ছে বুকে। বেসিনে উপুড় হয়ে শান্তশীল মুখেচোখে জলের ঝাপটা দিল অনেকক্ষণ। তোয়ালে দিয়ে মুখটা মুছবার সময় টের পেল, শরীর ভেঙে আসছে ক্লান্তিতে, অবসাদে। কিন্তু ঈর্ষা নেই, ক্রোধ নেই, অপমান নেই।

যখন বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল শান্তশীল তখন মধুশ্রীর মুখ বিবর্ণ, চোখে ভয় তবে সামলে নিয়েছে অনেকটা। হাউসকোটের বোতাম ঠিকঠাক লাগানো, চুল এলোখোঁপায় বাঁধা, শুধু বাঁ-গালে একটা দাঁতের দাগ জ্বলজ্বল করছে। সামান্য পাউডারের প্রলেপ সেটা ঢাকতে পারেনি।

শান্তশীল এই শরীরে কী করে নার্সিংহোম থেকে চলে এল, কেন এল এইসব জরুরি প্রশ্ন মধুশ্রী করল না। সে শান্তশীলের দিকে তাকাতেই পারছে না।

শান্তশীল বাইরের ঘরেই সোফায় বসল। বুকে ঘনিয়ে উঠছে ব্যথা। ঘাম হচ্ছে। ঘাড়ে দপদপ করছে একটা রগ। মাথার মধ্যে চক্কর। তবু শক্ত গলায় বলল, বিছানার চাদরটা পালটে দাও। যাও।

মধুশ্রী ছুট পায়ে চলে গেল।

শান্তশীল বুকে হাত রাখল। দুষ্ট হৃদযন্ত্র এখনও রক্ত পাম্প করে যাচ্ছে। কিন্তু বড্ড দ্রুত। বড্ড বেশি দ্রুত। কান ঝাঁঝা করছে। সে কি মরে যাচ্ছে?

মাথাটা একবার ঝাঁকাল শান্তশীল। একবার ককিয়ে উঠল। তারপর হঠাৎ টের পেল, তার ভারী ঈর্ষা হচ্ছে। ভীষণ। তার রাগ হচ্ছে। তার খুন করতে ইচ্ছে করছে—

মধুশ্রী যখন তাকে নিতে এল ঘরে তখন এলিয়ে পড়ে আছে শান্তশীল। চোখ বোজা। ঘামে ভিজে যাচ্ছে গা।

মধুশ্রী ফোনের কাছে ছুটে গেল।

শান্তশীল তার যন্ত্রণার মধ্যেও বুদ্ধের মতো শান্ত গলায় বলল, আমি ভালো আছি। ফোন কোরো না। বরং—কিছু খেতে দাও।

খুব ধীরে-ধীরে ফোনটা নামিয়ে রাখল মধুশ্রী। তারপর স্বামীর দিকে ফিরে তাকাল।

শান্তশীল মৃদুস্বরে বলল, আরোগ্য।

কিছুই বুঝল না মধুশ্রী। শুধু মনে হল, তার পাথরের মতো প্রতিক্রিয়াশীল স্বামী বোধ হয় আসলে রক্তমাংসেরই মানুষ।

সম্পর্ক

লাচ্চু আমেরিকায় গিয়েছিল জাহাজে। তখন তার কুড়ি বছর বয়স। ডাকাবুকো, উচ্ছৃঙ্খল এবং বন্ধনহীন। বাপের সঙ্গে বনিবনা ছিল না, কারণ তার বাবা ননীগোপাল রাগি মানুষ। ছেলেকে শাসন করাকে অত্যধিক গুরুত্ব দিতেন। লাচ্চুকে মাঝে-মাঝে বদমায়েশির জন্য এমন মার দিতেন যে পরে ডাক্তার ডাকতে হত। কতবার যে বাবার মার খেয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছে লাচ্চু তার হিসেব নেই।

বিশ বছর পেরোয়নি তখনও, লাচ্চু তার এক বন্ধুর দাদাকে ধরে মালের জাহাজে খালাসির চাকরি পেল। মতলব ছিল জাহাজ আমেরিকায় যদি কখনও যায় তখন লাচ্চু পালাবে।

সুযোগ এল প্রায় সাত মাস বাদে। সাত মাসে জাহাজে সি সিকনেস, আমাশা এবং দুজন সমকামী খালাসির অত্যাচার তাকে সইতে হয়েছিল। তবে তার বাড়ির জন্য মন কেমন করত না। বরং একটা জ্বালা ছিল, একটা প্রতিহিংসাপরায়ণতাও।

জাহাজটা ছিল স্প্যানিশ। হামবুর্গ থেকে মাল নিয়ে সাত মাসের মাথায় নিউইয়র্কে পৌঁছোল। পৌঁছনোর কথা ছিল না। আটলান্টিকে প্রবল ঝড়ে জাহাজ যায়-যায় হয়েছিল। তিন দিন টানা ঝড়। লাচ্চু বাঁচার আশাই করেনি। যখন নিউইয়র্কে পৌঁছল তখন মনে হল, বেঁচে যখন আছি তখন একটা কিছু করতেই হবে।

ভয়ডর জাহাজেই কেটে গিয়েছিল লাচ্চুর। অচেনা, অজানা জায়গা, অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ, বিপদের আশঙ্কা, ধরা পড়ার সম্ভাবনা এসব নিয়ে সে বিশেষ মাথা ঘামাল না। তবে হট করে না পালিয়ে সে দিনতিনেক অপেক্ষা করল। তারপর একদিন ডকে নেমে সুযোগ বুঝে ভিড়ে মিশে গেল।

দেশটা কঠিন। চট করে যে এখানে কিছু করে বা হয়ে ওঠা যাবে না এটা সে জানত। আর জানত কোনও গির্জা-টির্জা বা মিশনারির আশ্রয় নিলে বেঁচে যাবে। প্রথম দিনদুয়েক মাইনের টাকা ভেঙে খেল আর বড়-বড় ফ্লাই ওভারের নীচে শুয়ে রাত কাটাল। ভাগ্য ভালো যে তখন শীতকাল ছিল না।

নিউইয়র্ক শহরে পায়ে হেঁটে ঘুরতে-ঘুরতে সে একদিন বাস্তবিক ভাগ্যক্রমে একটা হোম ফর দি ডেস্টিটিউটস পেয়ে যায়। তারা যে তাকে দু-হাত বাড়িয়ে কোলে তুলে নিল তা নয়, তবে সে কাজকর্ম করে দেবে বলে প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় ঠাঁই হয়ে গেল।

কাজকর্ম মেলাই ছিল। লাচ্চু খাটত খুব। মাসখানেক পরে ইতালিয়ান একটা দোকানে চাকরি হল তার। থাকত নিউইয়র্কের কুখ্যাত বস্তিতে, যেখানে হেন পাপ নেই যা হয় না। এখানেই সে শেখে, মার্কিনিরা যেসব জিনিস ফেলে দেয় সেগুলো কুড়িয়ে এনে কিছু লোকের জীবিকা নির্বাহ হয়।

লাচ্চুর মাথা পরিষ্কার। লেখাপড়ায় মাথাটা না খুললেও তার প্রিয় হল যন্ত্রপাতি, কলকবজা ইত্যাদি। মাঝে-মাঝে সে জাঙ্ক থেকে টিভি বা টু-ইন-ওয়ান কুড়িয়ে এনে খুলে ফেলে ভিতরকার মেকানিজম বুঝবার চেষ্টা করত। দিনকতক চেষ্টার পর সে একটা টিভি সেট সারিয়ে ফেলল। মেরামত করল একটা সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটর এবং একটা বাতিল ক্যামেরা। আত্মবিশ্বাস বাড়ছিল তার।

আমেরিকানরা বেশির ভাগ জিনিসই খারাপ হলে ফেলে দিয়ে নতুন একটা কেনে। এই যে গারবেজ করার প্রবণতা এর কারণ অনুধাবন করে লাচ্চু বুঝল, জিনিস খারাপ হলে তা সারাতে যে মজুরি লাগে তা ভয়াবহ। তার চেয়ে নতুন কেনাই লাভজনক।

লাচ্চু একটা হোম সার্ভিস খোলার চেষ্টা করতে লাগল। টিভি বা ছোটখাটো ইলেকট্রনিক জিনিস খারাপ হলেই ফেলে না দিয়ে অল্প পয়সায় সারিয়ে নিতে আমেরিকানদের কেমন লাগবে? সব আমেরিকানই তো আর বড়লোক নয়!

কষ্টে কিছু টাকা জমিয়ে এবং ফাঁকে-ফাঁকে সারাইয়ের কাজ লিখে লাচ্চু তৈরি হতে লাগল। সে আলাপি এবং মিশুকে ছেলে। টকাটক বেশ কিছু জানপয়চান হয়ে গেল তার। যন্ত্র সারানোর ডাকও আসতে লাগল ঘনঘন। সেইসঙ্গে ডলার।

দু-বছর বাদে জেনারেল অ্যামনেস্টি ঘোষণা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে আমেরিকান নাগরিক হয়ে গেল। বাঁচোয়া। ব্রংকস বরোতে একটা ঘিঞ্জি পাড়ায় শেয়ারে একটা দোকানঘর করল সে। সেখানে পুরোনো যত ফেলে দেওয়া জিনিস থেকে পার্টস খুলে নিয়ে গুছিয়ে রাখত সে। পরে অন্য সব মেশিনে সেগুলো লাগাত।

মজা হল আমেরিকানরা সব জিনিসই খারাপ হলে ফেলে দিতে চায় না। কোনও জিনিসের সঙ্গে হয়তো স্মৃতি জড়িয়ে আছে। কাজেই লাচ্চু যখন স্থানীয় একটা দৈনিক পত্রে বিজ্ঞাপন দিল তখন তার দোকানে বেশ খদ্দের আসতে লাগল, এবং ডলারও।

নর্মা নামে একটি মার্কিন মেয়েকে সে বিয়ে করে তেইশ বছর বয়সে। কিন্তু মেয়েটা বড্ড উড়নচণ্ডী। বিয়েটা আপসে ভেঙে গেল এক বছর বাদে। দ্বিতীয় বিয়েটা সে করল পঁচিশ বছর বয়সে। ছাব্বিশে সেটাও ভাঙল। পরের বিয়েটা সে করল একটা বাঙালি মেয়েকে। দেখা গেল, মেয়েটা পাগল। বাপ-মা পাগলামির কথা চেপে রেখে বিয়ে দিয়েছিল যখন মেয়েটার কিছুদিনের জন্য স্বাভাবিকত্ব ফিরে এসেছিল। সাতাশ বছর বয়সের মধ্যেই তিন-তিনটে বিয়ে ও বিচ্ছেদ থেকে লাচ্চুর ধারণা হল, বিয়ে তার কপালে নেই, ও তার সইবে না। সে টাকা রোজগারে মন দিল।

ঊনত্রিশ বছর বয়সে লাচ্চু এখন মাঝারি ধনী। তার তিনটে দোকান বেশ রমরম করে চলে।

লাচ্চুর সঙ্গে একদিন দেখা হল পুরোনো এক বন্ধুর। সে আমেরিকায় পড়তে এসেছিল। লাচ্চুর সঙ্গে বাড়ির কোনও যোগাযোগই ছিল না। শমিতের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল ম্যানহাটনের রাস্তায়। অনেক কথার পর অবশেষে বন্ধু শমিত বলল, বাড়ির কোনও খবর রাখিস না?

না। কেন বল তো!

তোর বাবা চার বছর আগে মারা গেছেন।

সে কী!

তুই পালিয়ে যাওয়ায় শক পেয়েছিলেন তো। তাই—

লাচ্চুর মনটা তার অত্যাচারী বাবার শোকে বেশ কাতর হয়ে পড়ল। চোখে জল এল। ঠিক কথা যে, ছেলেবেলা থেকে বাবার আদর বা প্রশয় সে পায়নি। রাগি বাবা কারণে-অকারণে বেধড়ক মারত। এও সত্যি বাবার হাত থেকে বাঁচবার জন্যই সে বাড়ি থেকে পালায়। বাড়ির সঙ্গে তার সম্পর্কের পূর্ণচ্ছেদও সেইখানেই ঘটে যায়। তবু আজ হঠাৎ মৃত্যুসংবাদটা পেয়ে মনটা কেমন উদাস হয়ে গেল তারও।

সে বলল, মা কি বেঁচে আছে?

শমিত একটু গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, আছে।

কিন্তু শমিতের মুখের ভাব অন্য কথা বলছে। লাচ্চু বলল, তুই একটা কিছু চাপছিস। খুলে বল।

তুই পালিয়ে আসার পর তোর মা পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিল। বাড়ি-বাড়ি ঘুরে তোকে খুঁজত। সারা রাত সদর দরজা খুলে বসে থাকত। তারপর একদিন পিছনের পুকুরে ভোরবেলা তার লাশ পাওয়া যায়।

লাচ্চু অস্থির হল না। কিন্তু কাঁদল। বাবার মৃত্যু নয়, মায়ের মৃত্যুর জন্য সে সরাসরি দায়ী। বলল, বাবা কি আবার বিয়ে করেছিল?

হ্যাঁ। তো সেই মা বেঁচে আছে।

আমার ছোট বোনটা! তার খবর কী?

বিয়ে হয়ে গেছে।

তারা কি জানে যে, আমি এখানে আছি?

শমিত মাথা নাড়ল, না। তোর খবর কেউই তো জানে না। সবাই ধরেই নিয়েছে, হয় তুই বেঁচে নেই, না হলে সাধু হয়ে গেছিস। কিন্তু তুই তো দেখছি আমেরিকায় বেশ জাঁকিয়ে বসেছিস।

অনেক লড়াই করতে হয়েছে, ধৈর্য ধরতে হয়েছে।

শমিত একটু হতাশার গলায় বলল, আমি তো অনেক লেখাপড়া শিখে এসেছি, এখানেও পি এইচ ডি করলাম, কিন্তু আমার যা সাকসেস বা টাকা হয়েছে বা হবে তুই তার চেয়ে অনেক বেশি এগিয়ে আছিস।

কুইনসে একটা বাড়ি কিনেছে লাচ্চু। বেশ বড় বাড়ি। দু-খানা দামি গাড়ি আছে তার। শমিতকে বাড়ি নিয়ে গিয়ে একদিন আটকে রাখল সে।

শমিত বলল, এত বড় বাড়িতে একা থাকিস, বিয়ে করিসনি কেন?

করেছি। তিনবার। তারপর নাক-কান মলেছি, আর বিয়ে নয়।

কেন রে? বিয়ে কি টিকল না?

প্রথম দুটো বউ ছিল আমেরিকান। প্রথমটা তো একেবারে দুশ্চরিত্র। দ্বিতীয়টার ছিল টাকার খাঁই। বছরখানেকের মধ্যেই টাকাপয়সা একেবারে দুয়ে নিয়েছে। তিন নম্বরটা পাগল।

বলিস কী! তোর কথা শুনে তো বিয়ের কথা ভাবতেই ভয় করছে।

এ দেশে বিয়ে করিস না। দেশে গিয়ে করিস।

আজকাল বাঙালিরাও কি আর ভালো আছে?

তা হয়তো নেই, কিন্তু তারতম্য হয়তো আছে। তবে আমার মনে হয়, বিয়ে জিনিসটাই বাজে।

তুই তা হলে সিঙ্গল থাকবি?

অবশ্যই।

তোর গার্ল ফ্রেন্ড আছে?

না, তাও নেই। আমার মাথায় কাজের চিন্তা এত প্রবল যে সেক্স নিয়ে ভাবিই না।

তা হলে তোর রাত কাটে কী করে?

লাচ্চু হাসল, মোষের মতো ঘুমোই। শোন, আমার একটা বউয়ের দরকার ছিল বটে, কিন্তু বেড পার্টনার হিসেবে নয়। বউ হতে পারত আমার ব্যাবসার মস্ত সহায়। আমার বিশ্বাসযোগ্য একজন বন্ধু। নইলে একটা মেয়েমানুষকে তার শরীরের জন্য পুষব এই আইডিয়াটাই আমার ভালো লাগে না।

যাই হোক, তোর একজন পার্টনার কিন্তু দরকার।

সে পরে ভাবা যাবে। আমার কাছে দু-দিন থাক তা হলেই বুঝবি আমার দিন কেমন উড়ে যায়। রোমান্সের ছিটেফোঁটাও নেই। তবে টাকা আছে।

তুই কি অনেক টাকা করেছিস?

এখানে অনেক মানেও তো যথেষ্ট নয়। নিউইয়র্কে চারদিকে চেয়ে টাকার কী খেলাটাই না দেখতে পাই। না রে, আমেরিকার তুলনায় আমার কিছুই সম্বল নয়। তবে চলে যায়।

লাচ্চু নিজে কথা বলতে-বলতে বারবার মা-বাবার কথা ভাবছিল।

শমিত বলল, তুই আজ খুব আনমনা।

লাচ্চু মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ। অনেকদিন ডলার ছাড়া আর কিছুই চিন্তাই করিনি। এখানে এসে কষ্ট আর লড়াই কম করতে হয়নি। মা-বাবা বা বোনটার কথা মাঝে-মাঝে মনে পড়ত বটে কিন্তু টাকা ছিল না। আজ হঠাৎ তোর মুখে মা আর বাবার মৃত্যুসংবাদ শুনে হঠাৎ কেমন রুটলেস লাগছে। বাংলায় বোধহয় ছিন্নমূল বলে।

শমিত তিন নম্বর দুঃসংবাদটা দিল বিদায় নেওয়ার আগে। লাচ্চু তাকে বলেছিল, দেখ, দুনিয়ায় তো আমার আপনজন বলতে এখন শুধু বোনটা। তার ঠিকানা জানিস?

শমিত একটু দ্বিধায় পড়ল। তারপর বলল, দেখ, তোকে পরপর খারাপ খবর দিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে না। তবু দিচ্ছি। তার কারণ, লক্ষ করলাম তুই বেশ শক্ত মানুষ। শোক-সংবাদগুলো তোকে কাহিল করেনি তেমন।

লাচ্চু উদ্বেগের সঙ্গে বলে, তার মানে কী? সাবিত্রী কি বেঁচে নেই?

না। বিয়ের এক বছর বাদে বাচ্চা হতে গিয়ে ইনফেকশানে মারা যায়।

লাচ্চু মাথায় হাত দিয়ে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে বলল, মা-বাবার তবু বয়স হয়েছিল, কিন্তু সাবুটার তো অল্প বয়স। হ্যাঁ রে, তিন-তিনজন মরে গেল? এরকমও হয় নাকি?

ব্যাড লাক রে ভাই, কী করবি?

তা হলে কি আমার আর কেউ নেই?

ভারচুয়ালি না। তবে যদি সৎমাকে ধরিস তা হলে বলতে হবে, আছে।

দুর! সৎ মায়ের সঙ্গে সম্পর্ক কীসের?

শমিত কথাটা স্বীকার করল। বলল, হ্যাঁ, সৎমায়েদের সম্পর্কে আমরা ভালো কথা কখনও শুনিনি বিশেষ। তবে এই ভদ্রমহিলাকে আমি দেখেছি। খুবই রোগাভোগা মানুষ। দুটো বাচ্চা, একটা ছেলে আর একটা মেয়ে। তোর বাবা তো তোর বোনের বিয়ে দিতে গিয়েই ফতুর হয়ে যান, ফলে এদের জন্য বিশেষ কিছু রেখে যাননি। ভদ্রমহিলা খুব সামান্য একটা আয়া বা ওই ধরনের কাজ করেন। খুব কষ্ট।

লাচ্চুর ভিতরে কথাগুলো ঢুকলই না। তার চোখে আজ বারবার জল আসছিল। অতীতটা একেবারেই মুছে গেল। শিকড়ের আর কোনও বন্ধন নেই। তিনটে মুখ বারবার ঘুরেফিরে স্মৃতিতে ভেসে উঠছিল। মা, বাবা, সাবি।

এক উইক এন্ডের শেষ রবিবার বিকেলে শমিত চলে যাওয়ার পর একা হল লাচ্চু। একা হয়েই বুঝতে পারল, কতখানি একা সে। চারদিকটা যেন খাঁখাঁ করছে। ধূধূ করছে। কুড়ি বছর বয়সে যখন বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিল তখন লাচ্চুর পিছুটান ছিল না। সামনে ছিল শুধু অনির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ, বুকে ছিল বেপরোয়া সাহস এবং আত্মনির্ভরতা। উনত্রিশ বছর বয়সে এখন লাচ্চু আর তা নেই। আমেরিকার কাজ পাগল সমাজে

এমনিতেই মানুষ একটু একা। তার ওপর এখানে পারিবারিক বন্ধন জিনিসটা তেমন দৃঢ় নয়, তাই মানুষ আরও একা। কাজ নিয়ে থাকে, তাই ওসব নিয়ে মাথা ঘামায় না। লাচ্চু আমেরিকান নাগরিক বটে, কিন্তু চরিত্রে তা নয়। ফলে তার মধ্যে একটা হঠাৎ অসহায় একাকিত্ব আজ বারবার গুমরে উঠছে। কুইনসের এই মাঝারি বাড়িটা যেন বড্ড ছমছম করছে। লাচ্চু রাতে খেল না। অনেক রাত অবধি কাঁদল। ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে।

শেষ রাতে একটু ঘুমোল। সকালে উঠে ঝাপিয়ে পড়ল নিত্যদিনের কাজে। কাজ, কাজ ছাড়া এই একাকিত্বকে ভুলে থাকবার কিছু নেই। সে মেরামতির কারবার একজন গুজরাটিকে বিক্রি করে দিয়েছে। এখন সে কম্পিউটারের ব্যাবসা করে। বেশিরভাগই কন্ট্রাক্ট মেইনটেনেন্স। তাতে তার প্রচুর ডলার আয় হয়।

লাচ্চুর সংসার নেই, মদ খায় না, ফূর্তি করে না, বেড়াতে ভালোবাসে না। সুতরাং তার ডলার শুধু ব্যাঙ্কে জমা হয়। কিছু খাটে শেয়ার বাজারে। এই অর্থাগমটা তার ক'দিন হল অর্থহীন লাগছে।

মাসখানেক বাদে সে শমিতকে ফোন করল। এ-কথা সে-কথার পর হঠাৎ জিগ্যেস করল, আচ্ছা সেই ভদ্রমহিলার নাম কী বল তো!

কোন ভদ্রমহিলা?

আমার বাবার দ্বিতীয় পক্ষের কথা বলছি।

কেন বল তো?

ভাবছি, ভদ্রমহিলা কষ্টে আছেন, কিছু টাকা পাঠিয়ে দেব।

শমিত উৎসাহের গলায় বলল, ভালোই হবে রে, এটা বেশ ভালো একটা ডিসিশন নিয়েছিস। তবে একটা কথা বলে রাখি তোকে, উনি কিন্তু খুব পারসোনালিটিওলা মহিলা। সহজে কারও কাছে হাত পাতেন না। তোর বাবা মারা যাওয়ার পর অনেকেই ওকে পরামর্শ দিয়েছিল কোনও এমএলএ-র কাছে যেতে। উনি যাননি। একটা পুজো কমিটি থেকে কিছু সাহায্য দেওয়া হয়েছিল, তাও নেননি। আত্মসম্মানবোধ খুব বেশি। যদি টাকা পয়সা পাঠাস তাহলে একটা নরম করে চিঠি দিস।

যদি রিফিউস করে তাহলে?

সম্ভাবনা আছে।

তা হলে থাক বাবা, পাঠানোর দরকার নেই।

তবু নামটা জেনে রাখ। ওঁর নাম সবিতা রায়।

লাচ্চু প্যাডে নামটা নোট করে নিল বটে, কিন্তু সেটা যে কোনও কাজে লাগবে না তাও মনে হল তার।

লাচ্চুর হাড়ভাঙা পরিশ্রম এবং ছোটাছুটির মধ্যে আবার হারিয়ে গেল সবিতা রায় এবং তার দুই বাচ্চার কথা। মনে রাখার কথাও নয় লাচ্চুর। নিউইয়র্কের বাঙালি কমিউনিটির সঙ্গে লাচ্চুর মাখামাখি না থাকলেও সম্পর্ক আছে। বাঙালিদের অনুষ্ঠানে চাঁদা দেয়, বাংলা নাটক দেখতে যায়, বাঙালি গায়ক-গায়িকা এলে টিকিট কেটে গান শুনে আসে, দুর্গাপুজো বা বঙ্গ সম্মেলনেও যায় ফি বছরই। তবে এসব বাঙালিয়ানার ব্যারাম তার কাছে গভীর কিছু নয়। কুইনসে উইক এন্ডের এক দুর্গাপুজোয় হাজির ছিল লাচ্চু। বাঙালিদের বেশ সুন্দর একটা জমায়েত। খিচুড়ি রান্না হচ্ছে, চমৎকার নিরামিষ তরকারির গন্ধ ছড়াচ্ছে বাতাসে। পেপার মাসের তৈরি দুর্গামূর্তির সামনে রেকাবিতে ডলার প্রণামী জমা হচ্ছে। মন্ত্রপাঠ, অঞ্জলি, কোনওটাই বাদ নেই। সেই জমায়েতে এক বৃদ্ধ এসে তাকে ধরলেন, তুমি লাচ্চু না?

লাচ্চু চিনল। তাদের পাড়ার মোহিতবাবু। ছেলে আমেরিকায় এসেছে বছরদুয়েক। সেই সুবাদেই এসেছেন। এ-কথা সে-কথার পর বললেন, তুমি যে বেঁচে আছ এটাই তো জানা ছিল না আমাদের। তোমার পুরো ফ্যামিলিটাই তো শেষ। তবে সবিতা আছে, সে বড় ভালো মেয়ে।

লাচ্চু বলল, আমি তো ওঁকে চিনি না।

না চেনারই কথা।

ওঁরা খুব কষ্টে আছেন?

কষ্ট বলে কষ্ট? তোমার বাবা তো কিছু রেখে যাননি। সবিতারও বাপের বাড়ি বলতে কিছু নেই, এক মামার কাছে মানুষ। খুবই কষ্ট ওদের। বাড়িটা আছে বলে রক্ষে। নইলে ভেসে যেত।

লাচ্চু আবার ভাবনায় পড়ল। তার অনেক টাকা। যদি বিয়ে না করে বা পুষ্যি না নেয়, তা হলে তার মৃত্যুর পর টাকাপয়সার গতি কী হবে কে জানে! না, সবিতা রায় বা তার ছেলেমেয়ে তার আপনজন নয়, তবু ক্ষীণ একটা সম্পর্ক আছে বোধ হয়।

অনেক ভাবল সে। তারপর তার পার্টনারকে ব্যাবসা চালানোর ভার দিয়ে সে কয়েক দিনের ছুটি নিয়ে ভারতমুখী প্লেনের টিকিট কেটে উড়ে গেল।

দুই

সবিতার রোগাভোগা শরীরের মধ্যে প্রকট মাত্র দুটি চোখ। লোকে বলে সবিতার চোখ নাকি জ্বলে। সবিতা অবশ্য সে-খবর রাখে না। তার জীবনটা কেটেছে আদ্যন্ত ঘৃণা ও আক্রোশের এক বলয়ের মধ্যে। শিশুকালে পিতৃ-মাতৃহীন সবিতা ছিল মামার গলগ্রহ। আক্ষরিক অর্থেই তাকে লাথি-ঝ্যাঁটা খেয়ে বড় হতে হয়েছে। সে ছিল কার্যত মামার বাড়ির বিনা পয়সার ঝি। খাণ্ডার মামি দুনিয়ার যত ঝাল ঝাড়ত তারই ওপর। মামাও যে ভালো কিছু ছিল তা নয়। সবিতাকে ক্লাস ফোর অবধি পড়িয়েছিল মামা। তার পর স্কুল থেকে ছাড়িয়ে পুরোপুরি গৃহকর্মে লাগিয়ে দেয়। সবিতার প্রাণের জোর ছিল বটে। নইলে একবার কলেরা, একবার টাইফয়েড এবং সবশেষে প্লুরিসি হয়েও সে বেঁচে যায়। প্রতিবারই তাকে পাঠানো হয়েছিল অস্বাস্থ্যকর হাসপাতালের জেনারেল বেড-এ। টি বি হয়েছিল আঠার বছর বয়সে। মামা বা মামি কেউই তাকে ঘরে ঠাঁই দিতে রাজি ছিলেন না আর। সবিতা কার্যত আশ্রয়হীন হয়ে পড়েছিল। শেষে যাদবপুরের টি বি হাসপাতালে ঠাঁই হয়। এবং আশ্চর্যের বিষয়, নিছক প্রাণশক্তির জোরেই সে আরোগ্য লাভ করে। মামা-মামি সন্দিহান থেকেও তাকে ফের ঘরে ঠাঁই দেন বটে, কিন্তু খুশি হয়ে নয়। মাত্র তেইশ বছর বয়সে তার বিয়ের জোগাড় হল। পাত্রর বয়স ছাপ্পান্ন, বিপত্নীক।

বিয়ের আনন্দ কিছু ছিল না, শুধু স্থান বদলের স্বস্তিটা আশা করেছিল সবিতা। এই বয়স্ক পুরুষের কাছ থেকে প্রত্যাশাই বা কী ছিল তার? লোকটাকে ভালোবাসার কোনও চেষ্টা সে করেনি, সম্ভবও ছিল না। তবে লোকটা দুঃখী মানুষ। ছেলে নিরুদ্দেশ, বউ মারা গেছে, ঘরে বয়সের মেয়ে। এই মেয়ে সাবিত্রীর বিয়ে দিতে হবে বলেই লোকটা সবিতাকে বিয়ে করেছিল পাঁচ হাজার টাকা নগদ নিয়ে। সেই পাঁচ হাজার আর সবিতার দেড় ভরি গয়না নিয়ে আর কিছু ধারকর্জ করে সাবিত্রীকে পার করল। তারপর বছর না ঘুরতেই সাবিত্রী গেল, তারপর লোকটাও গেল। রেখে গেল দুটো সন্তান।

ঘৃণা আর আক্রোশ ছাড়া সবিতা জীবনে কিছুই পায়নি। এখনও সে মানুষের কাছ থেকে তাই পায় এবং তাতেই স্বস্তি বোধ করে। মানুষ তাকে দয়া বা করুণা করলেই বরং সে ভয়ঙ্কর অস্বস্তি বা অপমান বোধ করে। ও তার অভ্যস্ত জিনিস।

তথাকথিত স্বামীর মৃত্যুর পর সবিতা তথাকথিত বিধবা হল। সধবা আর বিধবার তফাত সামান্যই। দুর্দশা বা দুর্গতি যেমন ছিল তেমনই রইল। দুটো সন্তান তার কোনও ভালোবাসার ফসল নয়। তবু সন্তান আঁকড়েই বেঁচে থাকার একটা চেষ্টা করতে হলো

তাকে। লেখাপড়া জানা নেই, কোনও হাতের কাজটাজও শেখেনি, চাকরিটা হবে কীসে? সবিতা কারও কাছে হাত পাতল না, অযাচিত সাহায্য ফিরিয়ে দিল এবং চাকরি খুঁজতে লাগল। মেয়েটা ছয় বছরের, ছেলেটার পাঁচ। ছয় বছরের মেয়ে প্রয়োজনের তাগিদে শিশু বয়সেই সাবালিকার মতো দায়িত্ব নিতে শিখে গেল। প্রয়োজনে মানুষ সব পারে। তার হেফাজতে ছেলেকে রেখে সবিতা বাইরে বেরুতে লাগল। কাজ জুটল আয়ার। এক হাসপাতালে।

আয়ার কাজে বাঁধা বাইনে নেই। কাজ পেলে বাঁধা রেটে টাকা। কখনও-সখনও বকশিস বা শাড়িটা জামাটা পাওয়া যায়। গ্রাসাচ্ছাদন চলে বটে তার। কিন্তু এত কষ্ট যে বলার নয়। সবিতাকে পাঁচ-দশ পয়সারও হিসেব করে চলতে হয়। অসুখ-বিসুখ হলে অগাধ জল।

তার তথাকথিত স্বামী বাড়িটাই যা রেখে গেছেন। ছোট এবং পুরোনো দু-ঘরের এই বাড়িটুকুই এই গোটা দুনিয়ায় তার সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। তবে পাড়া-পড়শিরা অনেকেই তাকে ভয় দেখায়, আছ তো বাপু ভালোই, কিন্তু লাচ্চু যদি ফিরে আসে তা হলে এই বাড়িতে কি থাকতে পারবে? সে তোমাকে তাড়িয়ে ছাড়বে। ভীষণ বদমাশ ছেলে। লাচ্চুর কথা সে তার তথাকথিত স্বামীর কাছে শুনেছে। হ্যাঁ, লাচ্চু মস্ত দাবিদার। যদি ফিরে আসে এবং সবিতাকে তাড়ায় তাহলে সে কোথায় যাবে তা ভেবে পায় না। এই একটা ভয় তার আছে। লাচ্চু। কেউ-কেউ বলে, সে সাধু হয়ে গেছে, কেউ বলে মরে গেছে, কেউ বলে সে জীবনে উন্নতি করে ফেলেছে। লাচ্চুর আসল খবর কারও জানা নেই। এবং সেইটেই চিন্তা এবং ভয়ের বিষয়।

পাশের বাড়িটা পরেশ সাহার। পরেশবাবু ইদানীং হঠাৎ ব্যাবসা-বাণিজ্যে উন্নতি করেছে। ইদানীং তিনি মাঝে-মাঝে সবিতার কাছে বাড়িটা কিনে নেওয়ার প্রস্তাব দিচ্ছেন। দামটা খারাপ দেবেন না। কিন্তু সবিতা রাজি হয়নি। তার কারণ টাকা সে রাখতে পারবে না। মাঝখান থেকে পৃথিবীর শেষ আশ্রয়টুকু হাতছাড়া হবে। তার ওপর এ বাড়ি তো তার একার নয়। লাচ্চুরও ভাগ আছে। পরেশবাবু অবশ্য বলেছেন, লাচ্চু বেঁচে নেই বউমা। যদি থাকেও তা হলে তার দায় আমার। আমি ওর সঙ্গে বুঝে নেব।

পরেশ সাহাকে ইদানীং একটু ভয় পাচ্ছে সবিতা। টাকার ক্ষমতা যে অনেক তা সে জানে। পারেশ সাহা ইচ্ছে করলে তাকে যে-কোনও উপায়ে উচ্ছেদ করে দিতে পারে।

কিন্তু সবিতা তো কখনও স্বস্তিতে থাকেনি। তার সারা জীবনটাই তো নানা বিরুদ্ধতার সঙ্গে বেঁচে থাকা মাত্র। ভয় সে পায় বটে, কিন্তু খুব একটা অসহায় বোধ করে না। বস্তি আছে, ফুটপাত আছে। বাচ্চা দুটোকে নিয়েই যা চিন্তা।

খুব সম্প্রতি মাত্র দুদিন আগে পরেশ সাহার লোক বাসু বলে একটা ছেলে এসেছিল। সে একটু চোখ রাঙিয়ে গেছে। সবিতা বুঝতে পারছে বাড়িটা হয়তো সে রাখতে পারবে না। আজ সে তাই বস্তিতে ঘর দেখতে গিয়েছিল।

সন্ধেবেলা ফিরে সে এখন জিরোচ্ছে একটু। মেয়েটা পড়তে বসেছে। ছেলেটা তার কাছ ঘেঁষে বসে আছে। তার ছেলে এবং মেয়ে দুজনেই শান্ত। ওইটুকু বাচ্চা, তবু তারা মায়ের শ্রান্তি ক্লান্তি হতাশা এবং মেজাজ টের পায়।

দরজায় কড়া নড়তেই মেয়েটা উঠে গিয়ে খিল খুলল।

দরজার বাইরে একজন ভালো পোশাক-পরা যুবক দাঁড়িয়ে। দাড়ি আছে, গোঁফ আছে, চোখে কালচে চশমা, হাতে একটা স্যুটকেস।

বলল, ভিতরে আসতে পারি?

সবিতার চোর ডাকাতের ভয় নেই। চোর এলে বরং সবিতার পক্ষে লজ্জারই ব্যাপার। তবে এরকম সম্ভ্রান্ত চেহারার যুবককে দেখে সন্ত্রস্ত হল। তাড়াতাড়ি উঠে বলল, আসুন।

ছেলেটা ঘুরে ঢুকে বলল, আমি কিছু প্রোডাক্ট নিয়ে এসেছি।

সবিতা বলল, তার মানে?

ছোকরা স্যুটকেসটা নড়বড়ে টেবিলটার ওপর রেখে খুলে ফেলল। তারপর একগাদা জিনিস বের করে টেবিলে সাজিয়ে রাখতে লাগল। চকোলেট বার, সিরিয়াল, টিনের দুধ, খেলনা, সেন্ট, সাবান কত কী।

সবিতা সভয়ে বলল, এসব কী!

ছেলেটা হেসে বলল, আমি একটা বড় কোম্পানির সেলসম্যান। আমরা এসব জিনিস তৈরি করি। এগুলো ফ্রি স্যাম্পল। আপনাকে দাম দিতে হবে না। যদি ব্যবহার করে পছন্দ হয় তবেই কিনবেন।

সবিতা কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলল, আমরা বড্ড গরিব। ওসব জিনিস কেনার সাধ্য আমাদের নেই। আপনি নিয়ে যান।

ছেলেটা হেসে বলল, তাতে কী? না কিনলে, না কিনবেন। কোম্পানি তো এগুলো ফ্রি-ই দিচ্ছে।

ছেলেটা চারদিকে একটু চেয়ে বলল, এটা কি আপনার বাড়ি?

হ্যাঁ, একরকম তাই। আমার স্বামীর বাড়ি। তবে কতদিন রাখতে পারব জানি না।

কেন বলুন তো?

আমরা গরিব তো, পয়সাওয়ালারা তুলে দিতে চাইছে। অনাথা বিধবা, কিছু তো করার নেই।

ও! আচ্ছা, আজ আসি।

ছেলেটা চলে যাওয়ার পর সবিতা টেবিলের কাছে এসে যা দেখল তাতে তার চোখ চড়কগাছ। মাখন, চিজ থেকে শুরু করে বিস্কুট, টিনের খাবার, এসব ছাড়াও একটা হাতঘড়ি অবধি দিয়ে গেছে। এরকম হয় নাকি? সে স্বপ্ন দেখছে না তো!

ছেলেমেয়েরা জীবনে এত সুখাদ্য খায়নি। সবিতার রাতে ভালো করে ঘুম হল না। বারবার ছেলেটার দাড়িওলা মুখটা ভেসে উঠল চোখের সামনে।

দুদিন বাদে পরেশ সাহা এক সকালে এসে হাজির। মুখে বিরক্তি। বউমা, এসব কী? বাড়ি বিক্রি করবে না তা সাফ জানিয়ে দিলেই হত। পুলিশে খবর দিতে গেলে কেন?

সবিতা অবাক হয়ে বলল, খবর দিইনি তো!

না দিলে তারা এসে আমাকে এমনি শাসিয়ে যায়?

আরও দিনসাতেক পরে ছেলেটা এক সন্ধেবেলা এসে হাজির। আজও হাতে স্যুটকেস।

সবিতা তাড়াতাড়ি ছেলেটাকে একটা চেয়ার পেতে বসতে দিয়ে বলল, সেদিন আপনি ভুল করে একটা ঘড়ি রেখে গেছেন।

না, ভুল করে নয়।

ভুল করে নয়?

না, ভুল করে রাখব কেন?

আপনার কোম্পানি কি ঘড়িও তৈরি করে?

ছেলেটা হেসে বলল, না। তবে সেলস প্রমোশনের জন্য কাস্টমারকে ছোটখাটো উপহার দেওয়া হয়।

কিন্তু আমি তো কাস্টমার নই!

আমরা ভবিষ্যতের কথা ভেবে কাজ করি। আপনার নাম আমাদের কম্পিউটারই সাজেস্ট করেছে।

এসব কথার অর্থ জানে না সবিতা। তবে সে আজ এই সুঠাম যুবকটিকে ভালো করে দেখল। স্বাস্থ্যবান, ছমছমে চেহারা, সবিতার মতোই বয়স হবে। হ্যাঁ, এরকম একটি যুবকের সঙ্গেই তো বিয়ে হতে পারত তার। এক অক্ষম, গরিব, বৃদ্ধ দোজবরের সঙ্গে নামমাত্র বিয়ে কেন হল তার? সবিতার ব্যর্থ যৌবন কোনও পুরুষকেই আকাঙ্ক্ষা করতে পারেনি ভয়ে। আজ অযাচিত সাহায্যকারী এই যুবকের দিকে মুগ্ধ চোখে একটু চেয়ে রইল সে। লাচ্চুও চেয়ে ছিল। মহিলার বয়স ত্রিশ-একত্রিশ হতে পারে। দারিদ্র্যের অবশ্যম্ভাবী রসকষহীনতাকে বাদ দিলে মহিলা সুশ্রীই। স্বাস্থ্য ফিরলে এঁর রূপ উপেক্ষা করার মতো হবে না।

লাচ্চু স্যুটকেস খুলে বলল, আজ কিন্তু পোশাক-আশাক আছে। রেখে যাচ্ছি।

যেসব জিনিস স্যুটকেস থেকে বেরোল তা দেখে আতঙ্কিত সবিতা বলল, এসব কী করছেন? আমাকে বিক্রি করলেও যে দাম উঠবে না।

কয়েকটা শাড়ি, ফ্রক, জামা-প্যান্ট নামাল লাচ্চু। তারপর সবিতার দিকে ফিরে বলল, আপনার বাড়িটার সংস্কার দরকার।

হ্যাঁ। কিন্তু আমার সাধ্য তো নেই।

শুনুন। আমাদের ফার্মটা হচ্ছে ফ্রেন্ড অফ দি আনলাকিজ। অর্থাৎ যাদের ভাগ্য খারাপ আমাদের ফার্ম তাদের সাহায্য করে। কিন্তু সেটা দয়া বা করুণা নয়। আপনাকে কোম্পানির তরফ থেকে কুড়ি হাজার টাকার একটা লোন দিয়ে যাচ্ছি। এখন নয়, দশ বছর পর থেকে আপনি লোনটা ধীরে-ধীরে শোধ করবেন।

সবিতার কেমন যেন ধন্ধ লাগছিল। সে হঠাৎ বলল, আমার এসব কথা কেন যেন বিশ্বাস হচ্ছে না। এরকম হয় না।

হয়। হবে না কেন?

সবিতার আত্মসম্মানবোধ প্রবল। কিন্তু এই সুঠাম যুবকটির দিকে চেয়ে আজ তার বুকে একটা অদ্ভুত দোলা আর আবেগ কাজ করছে। সে একে প্রত্যাখ্যান করতে পারছে না। সবিতার চোখে জল এল। সে লিত কণ্ঠে বলল, আপনি আমাকে দয়া করছেন।

একদম নয়। আমার সঙ্গে লোনের কাগজপত্র আছে। আপনি পড়ে সই করে দিন।

একটুও বিশ্বাস করল না সে ছেলেটাকে। কিন্তু এক চোরা আনন্দে বুক ভেসে যাচ্ছিল তার। এমনকী হতে পারে যে, এই যুবক তার প্রেমে পড়েছে? সবিতা সই করল এবং করকরে কুড়ি হাজার টাকা নিল।

দুদিন বাদে ছেলেটা একটা ঝকঝকে গাড়ি নিয়ে এল সকালবেলায়।

চলুন, আপনাদের একটু আউটিং-এ নিয়ে যাই।

সবিতা মুচকি হেসে বলল, এটাও কি সেলস প্রমোশন?

হ্যাঁ, এ সবই সেলস প্রমোশন।

ছেলেটার দেওয়া নতুন শাড়ি পরল সবিতা, বাচ্চাদেরও সাজিয়ে নিল। এবং জন্মে যা কখনও করেনি আজ তাও করল সে, একটু সাজল। চোখে কাজল, কপালে টিপ।

ছেলেটা নিজেই গাড়ি চালিয়ে নিয়ে গেল কলকাতার বিভিন্ন জায়গায়। রেস্টুরেন্টে দারুণ খাওয়াল এবং কিনে দিল আরও নানা দামি উপহার। সেই উপহারের মধ্যে সবিতার জন্য চার ভরি সোনার একটা হার, চার গাছা সলিড সোনার চুড়ি এবং বাচ্চাদের জন্য হার আর আংটি।

সবিতা বারণ করার অনেক চেষ্টা করেও পারল না। ঠিক কথা আজ সবিতা অনেকটা বিবশ, রসস্থ। সে তেমন দৃঢ়তার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করতেও পারল না। তার মনে হচ্ছে, তার জীবনে এই প্রথম একজন সত্যিকারের পুরুষের সবল প্রবেশ ঘটছে। সে ঠেকাবে কেন সেই অনুপ্রবেশ? জীবনে সে তো কিছুই পায়নি।

বিকেলে তারা একটা থিয়েটার দেখল। বাচ্চাদের একপাশে রেখে সবিতা ইচ্ছে করেই ছেলেটার পাশে বসল। অন্ধকারে সে ইচ্ছে করেই হাত ধরল ছেলেটার। ধরে রইল।

ছেলেটা আসতে লাগল ঘন ঘন। সবিতার এখন পুষ্টিকর খাবারের অভাব হচ্ছে না। বাড়িটার শ্রী ফিরেছে। বেশ ভালো সময় যাচ্ছে তার। তবে ছেলেটা কখনও প্রেমের কথা বলে না। তাকায় আর হাসে। সবিতার কাছে তাই যথেষ্ট।

সবিতা এক সন্ধেবেলা একটু ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করে বলল, তুমি কি আমার কাছে কিছু চাও? চাইলে মুখ ফুটে বলো না কেন?

তিন

লাচ্চু একেবারে একটা খাদের কিনারায় এসে ঠেকেছে। লাফ দেবে? সম্পর্কটা সংস্কার ছাড়া আর কী? এই ভদ্রমহিলাকে তার বৃদ্ধ বাবা অন্যায়ভাবে বিয়ে করেছিল। সেই অন্যায়কে স্বীকৃতি না দিলে ক্ষতি কী? দুনিয়া তো চলেছে সংস্কার ভাঙার দিকেই। সবিতাকে কয়েকদিন দেখে তার মেয়েদের সম্পর্কে অনেক বদ্ধমূল ধারণা ভেঙে গেছে। দারিদ্র্য, অপমান, অবিচার সয়ে বড় হওয়া এই মহিলা যেমন সাহসী—তেমন সহনশীলা। লাচ্চু কি চোখ বুজে লাফটা দেবে? আমেরিকার মুক্ত সমাজে সব চলে। অতীত লুপ্ত হয়ে যাবে। দেবে লাফ?

লাচ্চুর অতীত বলতে যা, সেটা মনে না রাখলেও চলে। সব ভুলে যাওয়া যায়। একটা দুটো কথা মাঝে-মাঝে হানা দেবে ঠিকই। কিন্তু ওসব মাছির মতো উড়িয়ে দেওয়া যাবে। নতুন একটা সম্পর্ক হোক।

সন্ধেবেলা লাচ্চু গিয়ে দেখল আজ বাড়িটা একটু সাজানো হয়েছে। টেবিলের ওপর তার বাবার ছবি বসানো, গলায় মালা, সামনে ধূপ জ্বলছে।

এসব কী?

সবিতা একটু লজ্জা পেয়ে বলল, বিলু তার বাবার জন্মদিন পালন করছে।

আজ কি বাবার জন্মদিন?

হ্যাঁ। এসব বিলুই মনে রাখে। বাবাকে খুব ভালোবাসত তো? আঠাশে কার্তিক করে আসে ঠিক হিসেব রাখে।

ও।

ওর বাবা ওকে বলত একটা ছেলে ছিল, একটা মেয়ে, কাউকেই আদর দিতে পারিনি। দুটোই হারিয়ে গেল। তোরা হারিয়ে যাস না। আমাকে মনে রাখিস। শোনো, আজ তুমি এখানেই খেয়ে নাও। রান্না করছি।

লাচ্চু খেল। মাথা নীচু করে, শক্ত হয়ে এবং কথা না বলে। এ-বাড়িতে বাবার একটা ছবি ছিল, এটা খেয়াল ছিল না তার। টেবিলের ওপর বাবার গড়ানে বয়সের ছবি থেকে একজোড়া চোখ তাকে স্থির দৃষ্টিতে দেখছিল।

একটা ছবি সব ভণ্ডুল করে দিল নাকি? বড় গ্লানি লাগছে যে ভিতরে।

লাচ্চু পরদিন রাতে প্লেন ধরল। ফিরে এল নিউইয়র্কে তার কুইনসের বাড়িতে। চুপচাপ এবং একা কাটাল দুটো দিন। তারপর সাহস করে একটা এয়ারোগ্রাম বের করে

সবিতার ঠিকানায় লিখল। তারপর আরও একটু সাহস করে পাঠ লিখল, শ্রীচরণেষু মা...

পোকা

রিক্তা ধীরে-ধীরে উঠে দাঁড়াল। অন্তহীন ক্লান্তি। হৃতসর্বস্বের মতো অবসাদ। বিকেল পাঁচটা বাজে। তার কাজ শেষ হয়েছে। হলঘরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে আরও কয়েকজন ক্লান্ত মানুষ। তাদেরও ছুটি হয়েছে। এবার তারাও বাড়ি যাবে। প্রত্যেকের মাথার পিছনে একটা করে উড়ন্ত পোকা। কেউ কারও সঙ্গে কথা বলল না, তাকাল না পর্যন্ত। বিষণ্ণ, উদাস মুখে তারা দরজার সামনে এসে দাঁড়াল সারিবদ্ধভাবে। নিশ্চুপ। টাইম লক লাগানো দরজা ধীরে সরে গেল। তার পর চলন্ত করিডোর। দুশো মিটার দূরত্বে একটা স্থির প্ল্যাটফর্ম। নিঃশব্দে নেমে পড়ল সবাই। সামনেই এসকালেটার। ক্লান্ত কয়েকজন মানুষ আগুপিছু সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে পড়ল। তাদের মাথার পিছনে, দু-ফুট দূরত্বে সেই পোকা। দেখছে, জরিপ করছে।

দুশো মিটার উচ্চতায় মুক্তি। খোলা আকাশের নীচে পৃথিবী। চারদিকে গাছপালা। প্রথম শীতের হিমেল বাতাস বইছে। অন্ধকার নামছে মিহি ঝরোখার মতো।

পোকাগুলো কখনও শব্দ করে না। শুধু পিছু নেয়, শুধু চেয়ে থাকে, শুধু জরিপ করে।

কখনও একা হতে পারে না রিক্তা, কখনও নিশ্চিন্ত হতে পারে না। সারাক্ষণ ওই পোকা তাকে দেখছে আর দেখছে। তার প্রতিটি পদক্ষেপ, নড়াচড়া, তার হার্টবিট, রক্তচাপ সব কিছুর খবর পাঠাচ্ছে একটি স্টোর হাউসে। চব্বিশঘণ্টার মনিটারিং। সে শুনেছে, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কলকবজায় তৈরি এইসব পোকারা মানুষের ইচ্ছাশক্তি, ক্ষুদ্র পিপাসা এবং এমনকী ঘুমের মধ্যে দেখা স্বপ্ন অবধি টের পায়। টের পায় বিষণ্ণতা, আনন্দ, উদ্দীপনা। মাথার পিছনে সবসময়েই উড়ছে, অনুসরণ করছে, এক পলকের জন্যও তাকে এড়ানোর জো নেই।

বাইরে গাছপালার ভিতর দিয়ে সরু একটা রাস্তা। জঙ্গলের ভিতর দিয়ে চলে গেছে। এই রাস্তায় কোনও লোক চলাচল নেই। কোনও গাড়ি চলে না। আলো নেই, পথ ঢেকে যাচ্ছে ঘাসে, আগাছায়। রিক্তা বাঁদিকে মস্ত গ্যারেজে ঢুকল। ভিতরে ঢুকবার দরকার নেই। দরজার মুখেই একটা প্যানেল। তাতে নম্বরের চাবি। সবাই সার দিয়ে দাঁড়িয়ে নিজের-নিজের কোড নম্বর স্পর্শ করে বেরিয়ে যাচ্ছে। আর একটা দরজা দিয়ে গ্যারেজ থেকে বেরিয়ে আসছে গাড়ি। আপনা থেকেই।

রিক্তার গাড়িটা আর সকলের মতোই। ছোট, পলকা, গাড়ি চালানোর দরকার হয় না। কোড টিপলেই ছোট গাড়িটা টুক করে ওপরে উঠে গন্তব্যের দিকে ভোঁ করে উড়ে যায়। শব্দ নেই, কাঁপুনি নেই, অন্ধকার, শূন্য ভেদ করে রিক্তার গাড়ি যখন ছুটছে, তখনও বড় অবসাদ আচ্ছন্ন করে আছে তাকে। সে একবার পিছু ফিরে পোকাটাকে দেখল। দু-ফুট দূরত্বে পোকাটা স্থির হয়ে আছে। দেখছে, জরিপ করছে।

আশেপাশে তার মতো আরও অনেক গাড়ি বিভিন্ন দিকে উড়ে যাচ্ছে। এসব গাড়িতে কোনও জ্বালানি নেই। আছে খুব ছোট পরমাণু ইঞ্জিন। আছে আশ্চর্য বুয়োয়েনসি স্ট্যাবিলাইজার। আছে অতি ক্ষুদ্র কম্পিউটার। আছে অত্যাধুনিক যন্ত্র মস্তিষ্ক। আছে শীতাতপ-নিয়ন্ত্রণ। আছে মিউজিক সিস্টেম, টেলিফোন, টিভি এবং অতি আরামদায়ক আসন। এই গাড়ি কখনও দুর্ঘটনায় পড়বে না। এর যন্ত্র কখনও খারাপ হয় না। আর পরস্পরকে কখনও ধাক্কা মারে না গাড়িরা, বিনীতভাবে কাটিয়ে যায় এ ওকে, ও একে।

রিক্তার কিছু করার নেই। সে চোখ বুজে বসে রইল।

রিক্তা তার বাঁ-হাঁটুর কাছে একটা সুড়সুড়ি টের পাচ্ছিল। চোখ চেয়ে যা দেখল, তা আতঙ্কিত হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। একটা কাঁকড়াবিছে হাঁটুর ওপর উঠে এসেছে পাতলুন বেয়ে। রিক্তা সভয়ে চেয়ে ছিল। এ ঘটনা আগে কখনও ঘটেনি। কোথা থেকে এল বিছেটা? আচমকাই পোকাটা ছুটে এল সামনে। রিক্তা দেখতে পেল পোকাটার মুখে ঝকঝক করছে একটা সরু ছুঁচের মতো কিছু। চোখের পলকে বিছাটার ওপর গিয়ে পড়ল পোকাটা। তারপর ছুঁচে বিঁধে সেটাকে নিয়ে গেল রিক্তার পিছনে, মাথার দু-ফুট দূরত্বে। রিক্তা ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল, পোকার মুখে বিছেটা ছটফট করছে। তারপর। ধীরে ধীরে বিছেটা নির্জীব হয়ে গেল। স্থির হয়ে গেল। তারপর রিক্তা দেখল, বিছের নিথর দেহটা যেন এক তীব্র তাপে কুঁকড়ে ছোট হয়ে যাচ্ছে। অঙ্গার হয়ে যাচ্ছে। ছাইগুলো খসে পড়ল নীচে। একটা সাকশন যন্ত্র চালু হল পায়ের তলায়।

ছাইগুলো উধাও হয়ে গেল। ঘটনাটার আর কোনও চিহ্ন রইল না।

রিক্তা চোখ মেলে বসে রইল। জঙ্গলের ওপর দিয়ে গাড়িটা উড়ে যাচ্ছে। নীচে ঘনায়মান অন্ধকার। জঙ্গল বাড়ছে। পৃথিবী সবুজ হচ্ছে ক্রমে। জনসংখ্যা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছে। পৃথিবীতে খাদ্য ও সম্পদের আর কোনও অভাব নেই। অভাব নেই স্বাধীনতারও। রিক্ত কি স্বাধীন? সে একবার পোকাটার দিকে ফিরে চাইল। মাথার দু-ফুট পিছনে স্থির হয়ে ভেসে আছে। রক্ষক? না, গত দশ বছরেও রিক্তা ঠিক বুঝতে পারল না পোকাটার সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক তৈরি হয়েছে কি না। এক হাজার মিটার নীচে গাছপালায় ঘেরা একটা বাড়ি হঠাৎ ঝলমল করে উঠল। বাড়ির ছাদের ওপর সবুজ আলোয় লেখা, সেক্টর থ্রি। এটাই রিক্তার বাড়ি। একটা আশিতলা স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাস। ছাদে গাড়ি নামা আর রাখার জায়গা। নীচে হাজারো ফ্ল্যাট। নীচের তলায় বাজার, হাসপাতাল, পোস্ট অফিস, সুইমিং পুল ইত্যাদি।

মানুষ একা থাকে। কারও সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রচিত হয় না। বিয়ে নেই। তবে নরনারীর মিলন অবাধ ও ইচ্ছাধীন। প্রয়োজনে সন্তান হয় বটে, কিন্তু সন্তানের সঙ্গে মায়ের কোনও সম্পর্ক নেই। সন্তান বড় হয় ক্রেশে এবং পরবর্তীকালে শিশু নিকেতনে। মা বা বাবার পরিচয় বলে তার কিছু থাকে না। রিক্তার গাড়ি ছাদে নেমে এল। দরজা খুলে গেল। অবসন্ন রিক্তা নেমে এল। পাশেই আর-একটা গাড়ি থেকে দুটি মানুষ নেমেছে। একজন পুরুষ, অন্যজন মেয়ে। তারা কথা বলছে না। নেমে সিঁড়ির দিকে হেঁটে চলে গেল। ওরা হয়তো রাতে একসঙ্গে থাকবে। কেউ কারও নাম বা পরিচয়ও হয়তো জানতে চাইবে না। সকালেই যে যার নিজের জায়গায় চলে যাবে। জীবনে হয়তো আর দেখাও হবে না।

বাড়ির গঠন সাধারণ। যেমনটা হয় আজকাল। একটা চত্বরঘিরে বাড়িটা চৌকোনো গড়ে ওঠে। মাঝখানটা ফাঁকা। অনেকখানি জায়গা মাঝখানে। ওপর থেকে নীচ অবধি দেখা যায়। এই ফাঁকা জায়গাটার মাঝখানে কয়েকটা লিফট বিদ্যুৎগতিতে ওঠানামা করছে। লিফট পর্যন্ত যাওয়ার জন্য আছে সরু ক্যাটওয়ে। ক্যাটওয়েগুলো কাচের টিউবের মতো, ওপর-নীচ-আশপাশ সব স্পষ্ট দেখা যায়। আশিতলা থেকে নীচের দিকে তাকালে একটু ভয়-ভয় করে রিক্তার। হাতে সময় থাকলে সে চলন্ত সিঁড়ি দিয়েই নামে। আজ তার শরীরে বড় অবসাদ। সে ক্যাটওয়ে দিয়ে হেঁটে লিফটের কাছে এল। কাচের স্বচ্ছ লিফট। রিক্তার ভয়-ভয় করে।

লিফট জানে সে পঁচিশ তলায় যাবে। তার বশংবদ পোকাটা সম্পূর্ণ কোডেড। ওই পোকার কোড বুঝে নিয়ে লিফট নামতে লাগল অনেকটা পতনের মতো দ্রুতবেগে।

তারপর থামল। ক্যাটওয়ে ধরে এসে চলন্ত করিডোরে পা রাখল সে। নিজের ফ্ল্যাটের সামনে এসে করিডোর থেকে প্ল্যাটফর্মে উঠল।

দরজায় তালা চাবি কিছু নেই। এখানেও কোড। সে দরজার সামনে দাঁড়াতেই দরজা খুলে গেল।

একখানা ছোট বসবার ঘর। একখানা আরও ছোট শোওয়ার ঘর। খেলাঘরের মতো ছোটো একটু রান্নার জায়গা। টয়লেট। কাচের শার্সি দিয়ে একটা দেওয়াল তৈরি হয়েছে। পরদার ব্যবস্থ নেই, কিন্তু সুইচ টিপলেই স্বচ্ছ কাচ সম্পূর্ণ অস্বচ্ছ হয়ে যায়। ঘরে ঢুকতেই একটা রোবট এগিয়ে এসে তার পোশাক খুলে দিল। পরিয়ে দিল ঘরের সংক্ষিপ্ত পোশাক। চায়ের জল চড়িয়ে দিল রান্নাঘরের আগুনবিহীন উনুনে। আজকাল আগুনের চল নেই। রান্না হয় একটা ইথারিয় কম্পনে।

রিক্তা দু-চুমুক চা খেল। রোবট বাথরুমে গিয়ে টাবে তার জন্য সঠিক তাপমাত্রায় স্নানের জল তৈরি করল। চালু করল গানের ক্যাসেট। তারপর তার গা ম্যাসাজ করে দিতে লাগল। রোবটের হাতে প্যাড লাগানো। ম্যাসাজটা চমৎকার। ম্যাসাজটা নানারকম হয়। সেইভাবে প্রোগ্রাম করে দিতে হয় রোবটকে।

ম্যাসাজের মাঝপথে হঠাৎ প্রোজেক্ট কোনও সঙ্কেত দিল, টুং, দেওয়ালের গায়ে হঠাৎ একটা চৌখুপি আলোকিত হল। একটা মেয়ের মুখ। একে চেনে না রিক্তা।

মেয়েটা তার দিকে চেয়ে হঠাৎ ধমকের স্বরে বলল, আমি কে?

রিক্তা বলল, তার আমি কী জানি! আই ডি-কে জিগ্যেস করো।

আই ডি হল আইডেন্টিটি ডিপার্টমেন্ট। মানুষ একা থাকতে-থাকতে মাঝে-মাঝে একটু নিজেকে হারিয়ে ফেলে। আজকাল প্রায়ই এটা হয়। আই ডি তখন তার পরিচয় ধরিয়ে দেয়।

মেয়েটা রাগের গলায় বলল, ওরা ভুল বলছে।

কী বলছে?

বলছে আমি জবা।

তা হলে তাই।

না। আমি জবা নই। আমি পূর্ণা। আমার সেক্টর ফোর। আই ডি বলছে থ্রি। ওরা ভুল বলছে।

ওরা যা বলছে তাই ঠিক। মেনে নাও।

কী করে মানব? আমি তো পূর্ণা।

না, তুমি জবা।

কিছুতেই না। তুমি দেখতে বেশ সুন্দর তো!

রিক্তা ভ্রূ কোঁচকাল, সুন্দর! সুন্দর দিয়ে আজকাল কিছু হয় না।

কেন হবে না? তুমি সুন্দর।

তুমিও সুন্দর। আজকাল সবাই সুন্দর। যারা সুন্দর নয়, তারাও কসমেটিক সার্জারি করে সুন্দর হয়ে যায়।

না, তুমি অন্যরকম সুন্দর। আমার ঘরে আসবে? একাত্তর তলায়, ফ্ল্যাট বি ফোর। চার নম্বর ক্যাটওয়ে।

আমি খুব টায়ার্ড।

আমি যে জবা নই, কী মুশকিল!

না হলেও বা। যা-ই হও, কিছু যায় আসে না।

তুমি কে?

আমি রিক্তা।

আমি তোমার কাছে একটু আসতে পারি?

না। আমি ক্লান্ত। আমি এখন স্নান করব। তারপর ঘুমোব।

ঘুমোবে? কী আশ্চর্য, আমি ঘুমুতে পারি না।

ঘুমোনো তো সোজা। স্বপ্ন-পালঙ্কে শুয়ে পড়লেই ঘুম আসবে।

কত শুয়েছি, তবু ঘুমোতে পারি না।

হতেই পারে না। স্বপ্ন পালঙ্ক অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরি। ঘুম হবেই।

আমার হয় না।

তাহলে হাসপাতালে যাও।

ভয় করে।

ভয়! ভয় কীসের?

মন্দিরা তো হাসপাতালে গিয়েছিল। ওরা ওকে পাঁচ বছরের জন্য ঘুম পাড়িয়ে দিল। বলল, ওর যা সব নার্ভের কমপ্লিকেশন তা পাঁচশো বছর ঘুমোলে তবে ঠিক হবে।

আমাকেও যদি তাই করে?

করুক না। ভালোই তো।

আমি অতদিন ঘুমোতে চাই না। ওটা তো মৃত্যু। পাঁচশো বছর পর কি আমার মনে থাকবে আমি কে?

তোমার তো এখনও মনে নেই তুমি কে।

আমি পূর্ণা।

আই ডি তো তা বলছে না।

ওরা ভুল বলছে।

রিক্তা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রোবটকে বলল, ফোনটা অফ করে দাও।

ফোনটা অফ হয়ে গেল।

মাঝে-মাঝে সমস্যাটা রিক্তারও হয়। দিনের পর দিন কেউ তার নাম ধরে ডাকে না। কেউ কথা বলে না। মুখের দিকে তাকায় না। তখন মাঝে-মাঝে হঠাৎ মনে হয়, আরে, আমি কে?

রিক্তা স্নান করল। রোবট তার খাবার তৈরি করে সাজিয়ে দিল টেবিলে। একটু স্যুপ, একটু সবজি সেদ্ধ। খাওয়ার পর রিক্তা তার স্বপ্ন-পালঙ্কে শুয়ে পড়ল। ঘুমের আগে দেখে নিল, পোকাটা তার ব্রহ্মতালুর ঠিক দু-ফুট পিছনে ভেসে আছে।

স্বপ্ন-পালঙ্ক এক আশ্চর্য প্রযুক্তির ফল। এই পালঙ্কে শুলেই একটা মৃদু কম্পন, শব্দ, সুর ও আবেশ মানুষকে আচ্ছন্ন আর শিথিল করে দেয়। তবু মেয়েটার ঘুম আসছে না কেন? রিক্তা ঘুমিয়ে অনেকক্ষণ ধরে একটা স্বপ্ন দেখল। পৃথিবীতে কেউ নেই। সে একা বেঁচে আছে। একদম একা। সে একটা নদীর ধারে মৃদু পায়চারি করছে। তার মাথার পিছনে পোকাটা। দেখছে, জরিপ করছে। হঠাৎ রিক্তা পোকাটার দিকে চেয়ে বলল, এখনও কেন আমাকে অনুসরণ করছ? কার জন্য? আমি তো একা...একা...একা...

পোকাটা তবু বিচলিত হল না।

রিক্তা তখন মিনতি করে বলল, এবার ছাড়ো আমাকে। একবারটি ছাড়ো। আমাকে সত্যিকারের একা হতে দাও। একবারটি...

পোকাটা নড়ল না।

রাত দুটোয় ঘুমের চটকটা ভেঙে গেল রিক্তার। সে উঠে বসল। রোবট এগিয়ে এল সঙ্গে-সঙ্গে।

রিক্তা বলল, শোনো, জবা নামে মেয়েটিকে ট্র্যাক করো। আমাকে ওর ঘরে প্রোজেক্ট করো।

দেওয়ালে ছবি ভেসে উঠল। জবা চুপ করে একটা চেয়ারে বসে আছে।

জবা! এই জবা!

আমি পূর্ণা।

আমি তোমার ঘরে একটু আসতে পারি?

এসো। আমার খুব অদ্ভুত লাগছে। আমি কি নতুন? জবা এবং পূর্ণা!

জবার ঘরে পৌঁছোতে বেশি সময় লাগল না তার। অবিকল তারই মতো একটা ফ্ল্যাটে থাকে জবা। সব কিছুই একরকম। দরজা খুলে দিল রোবট, কারণ এই দরজা তো রিক্তার কোডে খুলবে না।

আমি রিক্তা।

তুমি খুব সুন্দর।

তোমার ঘুম আসছে না?

না। আজ ঘুম আসছে না। আজ আমার আইডেন্টিটির প্রবলেম হচ্ছে। জানো, আমি পোকাটাকে মেরে ফেলেছি।

রিক্তা স্তম্ভিত হয়ে বলল, মেরে ফেলেছ? কী করে?

আমার কাছে একটা রে গান আছে। তাই দিয়ে।

ও মা! কেন মারলে?

আমাকে একটুও একা হতে দেয় না যে!

সর্বনাশ! এর শাস্তি কী জানো?

জানি ওরা আমাকে বদলে দেবে তো! দিক না। আমার আর এরকম থাকতে ভালো লাগছে না।

ওরা তোমাকে হাফ মেকানিক্যাল হাফ হিউমান ফর্ম দিয়ে পাঠাবে কায়িক শ্রমের জায়গায়। সেখানে অবিশ্রান্ত কাজ আর কাজ।

জানি। তাও ভালো।

রিক্তা হঠাৎ চুপ করে গেল। তার সব কথা ও প্রতিক্রিয়া রেকর্ড হয়ে যাচ্ছে। কাজটা ভালো হচ্ছে না। সে হঠাৎ বলল, তোমার অস্ত্রটা কোথায়?

ওই যে। টেবিলে পড়ে আছে।

রিক্তা হঠাৎ কিছু না ভেবে-চিন্তে অস্ত্রটা তুলে নিল হাতে। তারপর ঘুরে হঠাৎ ট্রিগার টিপে দিল। একটা ঝলকানি। নীলচে বিদ্যুৎ। পরমুহূর্তেই পোকাটা যেন বিস্ফোরিত হয়ে গেল। রিক্তা অবাক হয়ে দেখল, আর নেই। কোথাও নেই। দশ বছর ধরে ছিল। এখন নেই।

রিক্তা জবার দিকে চেয়ে হঠাৎ একটু হাসল।

জবাও হাসল।

তারপর দুজনেই বহু-বহু বছর পর খুব হাসতে লাগল। ভীষণভাবে।

বাবা

সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠেই দিদিমার কাছে শুনলাম, বহুকাল পরে আমাদের বাবা এসেছে। শুনেই হুড়মুড় করে আমরা দুই ভাই, বোন উঠে পড়লাম। তারপর ছুট লাগালাম বাইরে।

আমাদের বাস গঞ্জে, মামাবাড়িতে। বাড়িটা একটু খোলামেলা, গাছপালা আছে। বারবাড়িতে একটা কদমগাছের তলা দাদামশাই গোল করে বাঁধিয়ে নিয়েছেন। বিকেলে এখানে দাদামশাইয়ের আড্ডা বসে।

সেই বাঁধানো জায়গাটায় গাছের মোটা কালো মতো একটা লোক বসে আছে। তার ভুঁড়ো গোঁফ, মাঝখানে সিঁথি, ছোট কুতকুতে চোখ। পরনে মোটা কাপড়ের পাঞ্জাবি, ধুতি, পায়ে বিশাল জুতো। পাশে স্যুটকেস, শতরঞ্জিতে বাঁধা বিছানা আর একটা ছাতা। এই শীতকালেও লোকটা বেশ ঘেমেছে। মাকে জন্মে ঘোমটা মাথায় দিতে দেখিনি। এই প্রথম দেখলাম, মা মাথায় ঘোমটা টেনে লোকটাকে হাতপাখা দিয়ে বাতাস করছে।

আবার বোন রেবা নাক কুঁচকে বলল, এইটে বাবা নাকি?

আমারও এই বাবা তেমন পছন্দ হয়নি। অবাক হয়ে বাবা দেখতে-দেখতে বললাম, তুই ঠিক বাবার চেহারা পেয়েছিস।

অন্য সময় হলে রেবা আমাকে চিমটি কাটত বা কিল মারত। কিন্তু এখন বাবার এই চেহারা দেখে সে অবাক। বলল, কিন্তু ফটোতে কক্ষনো এরকম চেহারা নয়। দূর! এ বাবা হতেই পারে না।

বাবার আগের চেহারা আমিও দেখিনি। পিঠোপিঠি আমরা দুই ভাইবোন জন্মানোর কিছু পরেই মামাবাড়ির সঙ্গে ঝগড়া করে বাবা ইগতপুরীতে চলে যায়। গত বারো-তেরো বছরে

আর দেশে ফেরেনি। কী নিয়ে রাগারাগি তা আমরা খুব ভালো জানি না। তবে শুনেছি বিয়ের পর নাকি বাবা দাদামশাইয়ের কাছ থেকে কিছু টাকা ধার নিয়েছিল তামাকের ব্যাবসা করবে বলে। ব্যাবসা ফেল মারে। মামারা তখন একজোট হয়ে বাবার সঙ্গে ঝগড়া করে। বাবা তখন বেকার, তার ওপর সদ্য ব্যাবসায় মার খেয়ে পাগল-পাগল। আবার সে ঝগড়ায় নাকি মাও ছিল বাবার বিরুদ্ধে। বাবা একবস্ত্রে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। জ্ঞান হয়ে অবধি আমরা শুনে আসছি, আমাদের বাবা সাধু হয়ে চলে গেছে। কেউ বলত, মরে গেছে। যা হোক, বছর পাঁচেক বাদে মহারাষ্ট্রর ইগতপুরী থেকে একখানা পোস্টকার্ড আসে মায়ের নামে 'আমি বাঁচিয়া আছি। চিন্তা করিও না। ইতি বসন্ত চট্টোরাজ।'

ঠিক বটে বাবার যেসব ফোটো আছে তাতে বাবার এ চেহারা নয়। বরং ছিপছিপে ফিটফাট বাবু চেহারা। খুব সুন্দর না হলেও, চলে! কিন্তু এই বাবাকে বন্ধুদের দেখাব কী করে?

রেবা মৃদুস্বরে বলল, বাবা নয়। অন্য লোক। সেজে এসেছে।

আমি দৃঢ়স্বরে বললাম, বাবাই। দেখছিস না তোর মতো চেহারা। কালো কুতকুতে চোখ।

উহুঁ। সেজে এসেছে। কিছুতেই বাবা নয়।

দরজার আড়াল থেকে আমরা অনেক্ষকণ দৃশ্যটা দেখলাম। জামাই এসেছে বলে তিন মামা পুকুরে জাল ফেলেছে, দুই মামাকে নিয়ে স্বয়ং দাদামশাই গেছেন বাজারে। দিদিমা ঝিকে দিয়ে অ্যাই মস্ত একতাল ময়দা আবডালে ঘি ময়ান দিয়ে ঠাসাচ্ছেন নিজে দাঁড়িয়ে থেকে। বড় মামিমা ছেলে হতে বাপের বাড়ি গেছে। মেজো আর সেজো মামি ঘরদোর সাজাচ্ছে। দুই মামি আয়না কাড়াকাড়ি করে নিজেরা সাজছে। শুধু আমরা দুই-ভাই-বোন বাসি মুখে বাবা দেখতে এসেছি।

হঠাৎ দেখলাম বাবা চনমন করে চারদিকে চাইছে। তারপর মাকে জিগ্যেস করল, 'আরে লেড়কা-লেড়কি দুটো কোথায়? ও-দুটোকে নিয়ে আসো।'

কথায় একেবারে পশ্চিমা টান। আমাদের মন আরও খারাপ হয়ে গেল।

মা পাখা রেখে যেই ঘরের দিকে পা বাড়িয়েছে অমনি রেবা হঠাৎ ফুঁপিয়ে উঠে অস্ফুট গলায় বলল, বাবা নয়। বাবা নয় বলতে-বলতে এক দৌড়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেল। তারপর পাছদুয়ার দিয়ে বেরিয়ে কোথায় যে চলে গেল কাঁদতে-কাঁদতে, একটা বেলা তাকে খুঁজেই পাওয়া গেল না।

আমি রেবার মতো বোকা নই। খুঁতখুঁতেও নই। আসলে রেবা ভারী সুন্দর। টকটকে ফরসা রং, টানা টানা চোখ। সবাই সুন্দরী বলে ওর মাথাটাই বিগড়ে দিয়েছে। অহঙ্কারও খুব। বাবার চেহারাটা আর হাবভাব ওর অহঙ্কারে ঘা দিয়েছে।

মা এসে আমাকেই ধরে নিয়ে গেল বাবার কাছে। বলল, এই তোমার ছেলে। মেয়েটা এই সাত সকালে কোথায় পাড়া বেড়াতে গেছে বোধ হয়। বাবা এসেছে, এ খবরটা সবাইকে দিতে হবে তো।

বাবা কুতকুতে চোখ যতটা বড় করা যায় তত বড় করে আমাকে হাঁ হয়ে দেখল খানিক। তারপর চুকচুক করে খুব হাসতে লাগল। বলল, বাপরে! এইসন বড়া হয়ে গেছে নাকি বাচ্চাগুলান!

মা মৃদু হেসে বলে, তা হবে না! বারোটি বছর পার করে তো ফিরলে।

বাবা সঙ্গে-সঙ্গে ভালোমানুষি গলায় বলে, হাঁ হাঁ, ও বাত তো ঠিক। কিন্তু বাপরে! কত বড়!

আমরা লোকের কাছে শুনেছি, বাবা লোকটা খুব সরল, পরিশ্রমী কিন্তু বুদ্ধি ততটা ধারাল নয়। তা ছাড়া ছেলেবেলায় তার বাপ-মা মরে যাওয়ায় এবং তিন কুলে কেউ না থাকায় খুব কষ্টে মানুষ হয়েছে। তাই লোকটার জন্য আমার একটু মায়া ছিল। মামাবাড়িতে আমরা যদিও যথেষ্ট আদরে মানুষ, তবু আমাদের বিশ্বাস ছিল বাবা এলে আমরা এর চেয়ে দশ গুণ সুখে থাকব।

তা এই নিতান্ত সাদামাটা লোকটাকে দেখে আমার স্বপ্নগুলো সব ভেঙেচুরে পড়ে গেল। রূপকথার বাবা তো এ নয়, এ নিতান্তই গণেশখুড়ো কী রামজ্যাঠা কিংবা হারাধন দাদুর মতো আর একজন। আলাদা কিছু নয়। ঘামে বাবার পাঞ্জাবিটা ভেজা-ভেজা, গাড়ির নোংরা লেগেছে তাতে। গালে দুদিনের দাড়ি খোঁচা-খোঁচা হয়ে আছে। বাবা আমাকে খুব শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখল।

মা বলল, প্রণাম কর।

বাবা অমনি আঁতকে পা দুটো টেনে আসনপিঁড়ি হয়ে বসে বলল, না, না, থাক-থাক। পরে হবে, পরে হবে।

আমারও প্রণাম করার তেমন রুচি হচ্ছিল না। বাঁচলাম।

বাবা আবার চুক চুক করে হেসে বলল, লম্বা খুব হইছে। কিন্তু তাকতওলা হয় নাই। কী খোকা, এত রোগা কেন? ভরপেট খাও না?

আমি মাথা নেড়ে বললাম, খাই তো।

খাও? বাঃ বাঃ! বাবা খুব খুশি।

বুঝতে পারছিলাম বাবা আমাকে লজ্জা পাচ্ছে। অস্বস্তি বোধ করছে। যেন বা বিশ্বাস করতে পারছে না যে আমি তার ছেলে। আসলে রেবার মতো না হলেও আমি বেশ ফরসা, লম্বা, ছিপছিপে। দিদিমা আমাকে যে গৌরগোপাল নাম দিয়েছে তা এমনি তো নয়, সুন্দর বলেই। আমরা দুই ভাইবোনই মামাবাড়ি ধাঁচের চেহারা পেয়েছি। এই ফুটফুটে চেহারা দেখে বাবা বোধহয় আরও ঘাবড়ে গেছে।

এ সময়ে মামিরা সেজেগুজে এসে বাবাকে পাকড়াও করে ভিতরবাড়িতে নিয়ে গেল। বাবা সব ব্যাপারেই খুব হাসছে। দাড়িটাড়ি কামিয়ে স্নান করে আসার পরও বাবার চেহারা তেমন কিছু খোলতাই হল না। তবে দেখলাম, লোকটা মোটা হলেও ভুঁড়িওলা মোটা নয়। রীতিমতো পালোয়ানি স্বাস্থ্য। আমি টারজান ইত্যাদি বীরদের পরম ভক্ত। বাবার সেই টারজানি চেহারা দেখে দুঃখটা একটু কমল। কিন্তু রেবা তো টারজান চায় না। চাইলেও সে ফরসা টারজান নয়, সুন্দর টারজান চায়।

দুপুরে যখন সবাই বিশাল ভোজে বসেছি তখন বাড়ির বুড়ো চাকর খুঁজে-খুঁজে কোত্থেকে যেন রেবাকে ধরে নিয়ে এল। তার মুখচোখ লাল, গম্ভীর, চোখের কোলে অনেক কান্নার চিহ্ন। কারও দিকে তাকাচ্ছে না।

দাদামশাই হাঃ হাঃ করে হেসে বাবাকে বললেন, কী হে বসন্ত, মেয়েকে চিনতে পারো?

বাবা রেবার দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ, সশ্রদ্ধ। গরাস গিলে আবার খুব হাসল। তারপর উদ্বেগের গলায় বলল, খুঁকিকে কেউ মারল নাকি? আঁ!

রাত জেগে গাড়িতে এসেছে বলে খাওয়ার পরই বাবাকে আলাদা করে কোণের ঘরে শুইয়ে দেওয়া হল। তার প্রচণ্ড নাক ডাকতে লাগল।

আমরা দুই ভাই-বোন পরামর্শ করতে বসলাম। এই লোকটাকে নিয়ে এখন আমরা কী করব? লোকটা সুন্দর নয়, সেটা না হয় মেনে নেওয়া গেল, কিন্তু ওই উজবুকের মতো কথাবার্তা! ওই হিন্দিমেশানো বুলি! ওই বোকা-হাবা গোবেচারা ভাব। চোখে ওই চোর-চোর অপরাধী-অপরাধী চাউনি। আমাদের চাকর লক্ষ্মণদাও যে ওর চেয়ে চালাক চতুর।

রেবা মাথা নেড়ে বলল, আমি কিছুতেই বাবা বলে ডাকতে পারব না।

তবে কী বলে ডাকবি? বসন্তবাবু?

ইঃ বাবু বলতে গেছি কিনা! একটুও বাবুর মতো চেহারা নয়। দেখলেই মনে হয়, কারও বাড়ির চাকর।

এ ব্যাপারে শুধু আমরা দুই ভাইবোনই নয়, মামা-মামিরাও একমত। এমনকী দুই মামি পর্যন্ত হাসাহাসি করছে আড়ালে। জামাই বোকা, জামাই গেঁয়ো, জামাই কালো। সেসব শুনে আমাদের আরও মন খারাপ হয়ে গেল।

শুধু মা'র মুখচোখেই একটা চাপা আনন্দের আভা। চোখ দুটো উজ্জ্বল, ফরসা মুখে রক্ত ফেটে পড়ছে যেন।

বিকেলে আমাদের মালি খেত কোপাচ্ছিল। বাবা গিয়ে মালির হাত থেকে কোদাল নিয়ে এক চোপাটে অনেকটা জায়গা কুপিয়ে মস্ত-মস্ত মাটির চাংড়া তুলে ফেলল। আমরা বাবার কাণ্ড দেখছিলাম দাঁড়িয়ে। বাবা লাজুক হেসে আমাকে বলল, মাটি কোপালে একসারসাইজ হয়। ভুখ লাগে। তুমি মাটি কোপাও না?

আমি মাথা নেড়ে বলি, না।

কোপালে ভালো হয়। কসরত না করলে কি শরীরে তাগত হয়?

দিন দুইয়ের মধ্যে বাবার সঙ্গে আমার একটু-একটু ভাব হয়ে গেল। রেবা অবশ্য বাবার কাছে একদমই ঘেঁষত না। কিন্তু আমাকে ডেকে নিয়ে জিগ্যেস করত, লোকটা কী বলছে রে? আমার কথা কিছু জিগ্যেস করে? বাস্তবিকই বাবা রেবার কথা জিগ্যেস করত। বলত, রেবা আমার কাছে আসে না কেন বলো তো! আমি কালো বলে নাকি?

হাঃ-হাঃ। মেয়েটা খুব সুন্দর হইছে তো।

আমি সে কথা রেবাকে বললে রেবা একটু যেন খুশি হত।

মা আমাদের মনের অবস্থা বুঝতে পেরেছিল ঠিকই। কিন্তু মুখে কিছু বলত না। তৃতীয় দিনে মা রেবার হাতে এক গ্লাস দুধ দিয়ে বলল, তোর বাবাকে দিয়ে আয়।

ভয়ে মায়ের মুখের ওপর 'না' বলতে পারল না রেবা। আস্তে-আস্তে গিয়ে বাবার সামনে গ্লাসটা রেখে 'এই যে আপনার দুধ' বলেই দৌড়ে পালিয়ে গেল।

বাবার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাশীল করে তোলার জন্য মা আমাদের কাছে তার অনেক গুণের কথা বলত। আসলে বসন্ত চট্টোরাজ খুব সৎ মানুষ। দাদামশাইয়ের কাছ থেকে যে পঁচিশ হাজার টাকা উনি নিয়েছিলেন তা শোধ দেওয়ার পর উনি এ-বাড়িতে পা দিয়েছেন।

উনি মহারাষ্ট্রে গিয়ে প্রথম কুলিগিরি করেন, ডকে কাজ করেন। অমানুষিক কষ্টে ধীরে-ধীরে নিজের একটা ব্যাবসা দাঁড় করিয়েছেন। ইত্যাদি।

আমি মাকে জিগ্যেস করলাম, আমরা কি বাবার সঙ্গে ইগতপুরী চলে যাব?

মা বলল, যেতে তো হবেই। তবে উনি এবারে আমাদের নেবেন না। কয়েক মাস পরে এসে নিয়ে যাবেন। ওখানে আমাদের বাড়িটা তৈরি হচ্ছে। সেটা শেষ হলেই যাব।

রেবা জেদ করে বলল, আমি যাব না। আমার এ জায়গাই ভালো।

মা বড় বড় চোখে রেবার দিকে চেয়ে বলল, এটা তোমাদের আসল বাড়ি নয়। বড় হলে বুঝবে মামাবাড়িতে চিরকাল থাকা যায় না। থাকা ভালো না। মামার বাড়িতে মানুষ হওয়াটা অমর্যাদার।

পরদিনও রেবা বাবাকে গিয়ে এই যে আপনার দুধ বলে দুধ দিয়ে এল। কিন্তু দৌড়ে পালিয়ে এল না। আস্তে-আস্তে এল।

আমার সঙ্গে আরও ভাব করার জন্যই বোধহয় বাবা একদিন আমাকে বলল, খোকা, তোমার বইপত্র সব নিয়ে এসো তো দেখি, কেমন পড়িলিখি করছ।

অগত্যা আমি বইপত্র নিয়ে তার কাছে গেলাম। বাবা অবশ্য পড়াল না। কাছে বসিয়ে আমার পিঠে অনেক হাত বুলিয়ে দিল আর মহারাষ্ট্রে কী-কী পাওয়া যায় তার গল্প করতে লাগল।

আমার মাথায় দুষ্টুবুদ্ধি খেলে গেল। বললাম, রেবাকে বই নিয়ে আসতে বলি?

বাবা আঁতকে উঠে বলল, উ বাবা! উকে আমি খুব সামঝে চলি। উ তো আমাকে জাম্বুবান বলে ভাবে কিনা। ভাবে, বুঝি জঙ্গল থেকে আসছি। এই বলে খুব হাঃহাঃ করে হাসল বাবা।

রেবা না পারলেও আমি কিন্তু আস্তে-আস্তে বাবাকে বাবা বলে মেনে নিতে পারছিলাম। লোকটা দারুণ ভালো, খুব সরল, প্রাণভরা মায়াদয়া আর ভালোবাসা। চেহারাটা টারজানের মতো হলেও লোকটা পিঁপড়েকেও মারতে জানে না।

দিন দশেক কেটে যাওয়ার পর একদিন স্কুল থেকে ফেরার সময় আমরা ভাইবোনে হঠাৎ দেখলাম, আমাদের বাড়ির সামনে অনেক লোক জড়ো হয়েছে আর ভিতরে ভীষণ চেঁচামেচি হচ্ছে।

আমরা দৌড়ে বাড়িতে গিয়ে ঢুকে দেখি, সামনের ঘরে বাবা একটা লোহার চেয়ারে মুখ নীচু করে বসা, তাকে ঘিরে আমার পাঁচ মামা রুদ্রমূর্তিতে দাঁড়িয়ে। ভিতরের দরজায় পাথরের মতো মা। পরদার আড়ালে মাসি আর মামিদের মুখ উঁকি মারছে।

বড়মামা গর্জন করছে, জোচ্চোর! জোচ্চোর! চরিত্রহীন! কেন আগে বলোনি যে, তুমি সেখানে আর একটা বিয়ে করেছ? আগে জানা থাকলে এ বাড়িতে তোমাকে ঢুকতে দিতাম ভেবেছ? বদমাশ কোথাকার, এই মুহূর্তে বাড়ি থেকে বিদেয় হও।

মেজোমামা বরাবরই একটু গুন্ডা প্রকৃতির। এতক্ষণ ফুঁসছিল, হঠাৎ আমাদের দেখে তার রাগ ফেটে পড়ল, এই দুটো ফুলের মতো শিশু, এদের কথা তোমার মনে পড়ল না লুম্পেন কোথাকার? অ্যাঁ! এদের কী হবে? বলতে-বলতে মেজোমামা হঠাৎ গিয়ে বাবার চুল ধরে মাথাটা খুব জোরে নাড়া দিয়ে ঠাস-ঠাস করে কয়েকটা চড় কষাল গালে। আমরা হতভম্ব। বাকরহিত। রেবা আমাকে ধরে কাঁপতে লাগল।

ওদিকে সব মামাই তখন বাবাকে গিয়ে ধরেছে। ধাক্কা দিচ্ছে, টানছে, ঠেলছে। একটু বাদে টিনের চেয়ারটা উলটে পড়ে গেল।

দাদামশাই কোথায় ছিলেন জানি না। হঠাৎ তিনি গম্ভীর মুখে ঘরে ঢুকে ছেলেদের বললেন, বসন্তকে ছেড়ে দাও। এ-বাড়ির একটা সম্মান আছে মনে রেখো। ওকে চলে যেতে দাও।

মামারা তবু গজরায়। কিন্তু সরেও আসে। বাবা মাঝে থেকে আস্তে-আস্তে ওঠে। পাঞ্জাবিটা একটু ছিঁড়ে গেছে ঘাড়ের কাছে, চুলগুলো দাঁড়িয়ে আছে। মুখে একটা ভ্যাবলা-ক্যাবলা ভাব, ভীতু চাউনি। বাবা অবশ্য কারও দিকেই তাকাল না। ঘরের দেওয়ালের সঙ্গে তার স্যুটকেস আর বিছানা দাঁড় করানোই ছিল। বোধহয় বিপদ বুঝে পালাচ্ছিলই বাবা। এখন উঠে গিয়ে সেই স্যুটকেস এক হাতে আর অন্য বগলে বিছানাটা তুলে নিল।

বেরোবার মুখে একবার শুধু আমাদের দিকে চাইল বাবা। আমার দিকে একটুক্ষণ, রেবার দিকে তার চেয়ে কিছু বেশি সময়। একবারও বুঝি ঠোঁট নড়ল। কিন্তু কোনও কথা বেরোল না। তার বদলে তার দুই চোখে একফোঁটা করে জল গড়িয়ে পড়ল।

পাড়া-প্রতিবেশীর ছিছিককার, মামাদের তর্জন-গর্জন এবং মায়ের পাথরের মতো শীতল দৃষ্টির ভিতর দিয়ে বসন্ত চট্টোরাজ ধীর পায়ে বেরিয়ে গেল। আমাদের বাড়ি থেকে। আমাদের জীবন থেকে চিরকালের মতো বোধহয়। তখনও তার মাথার চুল খাড়া হয়ে আছে, পাঞ্জাবির ঘাড়টা ছেঁড়া। নাগরার শব্দ ধীরে-ধীরে মিলিয়ে গেল রাস্তায়।

সেদিন রাত্রে আমরা ভাইবোনে শুয়েছি বিছানার দু-ধারে। মাঝখানে মায়ের বালিশ। কিন্তু মা তখনও শুতে আসেনি। কখন আসবে তা বলা মুশকিল। মা কথা বলছে না, সারাদিন নিস্তব্ধ আর স্থির হয়ে বসে আছে ঠাকুরঘরে।

আমাদের আর পাঁচজনের সামনে মুখ দেখানোর উপায় নেই। কী লজ্জা! বাবা শুধু বিয়েই করেনি, তার তিন-তিনটে ছেলে আছে। ইগতপুরীতে। নির্মলা দেবীর নামে একটা খামে চিঠি লিখেছিল বাবা। সেটা ডাকে দিতে গিয়ে ছোটমামার সন্দেহ হয়। হিন্দিতে লেখা চিঠিটা খুলে মামা ডাকঘরে এক হিন্দি জানা লোককে দিয়ে পড়ায়। তখনই সব ফাঁস হয়ে যায়। কিন্তু এখন আমরা লোককে মুখ দেখাই কী করে? রাগে আমি ভিতরে-ভিতরে জ্বলে যাচ্ছিলাম। বসন্ত চট্টোরাজ তার ছাতাটা ফেলে গেছে। আমি ঠিক করে রেখেছি, ছাতাটা কাল ভেঙেচুরে পুকুরে বিসর্জন দেব।

রেবা ডাকল, দাদা!

কী?

সবাই লোকটাকে অমন করে মারল কেন রে?

আমি গর্জন করে উঠি, মারবে না? কত বড় সর্বনাশ করেছে আমাদের জানিস?

রেবা মৃদুস্বরে বলল, জানি। তারপর একটু চুপ করে থেকে রেবা আপনমনে একটা হিসেব করতে-করতে বলল, তোকে নিয়ে লোকটার চারটে ছেলে, কিন্তু মেয়ে নেই। মেয়ে বলতে একমাত্র আমি। তাই না? লোকটা তাই আমাকে ভীষণ ভালোবাসত। চলে যাওয়ার সময় কী বলল রে?

আমি অবাক হয়ে বলি, কী সব বলছিস? চুপ কর।

রেবা অনেকক্ষণ চুপ করে মটকা মেরে পড়ে রইল। তারপর হঠাৎ ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

আমি ওর চুল টেনে বললাম, কী হয়েছে বলবি তো?

রেবা কান্না জড়ানো গলায় হেঁচকি তুলে বলল, সবাই মিলে কেন অমন করে মারল বাবাকে? কেন মারবে এরা? কেন আমার বাবাকে সবাই মারবে?
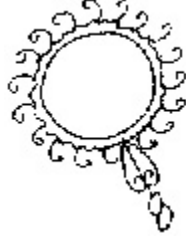
দোলা

গাড়ি বদল করতে হয় মধুডিহি জংশনে।

আর যে-গাড়ি নিয়ে যাবে আপনাকে লামডিঙে তা আগাগোড়া ছবি-আঁকা। কী নরম আর চকচকে গদির আসন গাড়ির ভিতরে। আর কী মিঠে ইনজিনের ভেঁপু। কু-ঝিক-ঝিক ট্রেন মধুডিহি ছাড়িয়েই বাঁক নেবে মায়াবী জগতে। সবুজ অরণ্যের ডালপালা এসে হাত বুলোবে রেলগাড়ির গায়ে। একটু দুলে-দুলে চলবে মন্থর গাড়ি। খেয়াল করে শুনবেন গাড়ির চাকা ঠিক যেন পালকির গান গাইছে। কোথাও-কোথাও গাড়ি থামে, জল নেয়। ছোট্ট-ছোট্ট পুতুলবাড়ির মতো রঙিন স্টেশন। রাঙা মোরামে ছাওয়া প্ল্যাটফর্ম নিবিড় গাছের ছায়ায় ঝিম মেরে আছে। অনেক পাখির শিস শোনা যায় আর নেপথ্যে কুলুকুলু কোনও প্রবাহিত ছোট নদীর শব্দ। গাড়ি রেলপোল পার হয়ে মলের শব্দ তুলে। মাঝে-মাঝে ছোট উপত্যকায় দেখা যাবে শান্ত গভীর দল চরছে। দেখা যাবে মাটির ওপর নেমে এসেছে রাঙা গোধূলির মেঘ।

জ্যোৎস্নারাত্রি। আকাশভরা সোনালি চাঁদ। চারদিকে ম-ম করা ফুলের গন্ধ। নাতিশীতোষ্ণ এক বাতাস বয়ে যাচ্ছে। সন্ধের একটু পরেই যখন লামডিঙের ছোট্ট স্টেশনে গাড়িটি থামবে তখন চারদিকে চেয়ে আপনি অবাক হয়ে বলে উঠবেন, আরে! ঠিক এরকম একটা জায়গাই তো আমি খুঁজছিলুম।

সবাই খোঁজে, ভাগ্যবানেরা পৌঁছে যায়।

এরকমই এক জ্যোৎস্নাময় রাতে লামডিঙের একমাত্র দুঃখী মানুষ জীবনলাল পথে-পথে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তার দুঃখের তেমন কোনও কারণ অবশ্য নেই। কিন্তু কিছু লোক দুঃখী থাকতে ভালোবাসে। জীবনলাল চাঁদ উঠলে দুঃখ পায়, পাখি ডাকলে দুঃখ পায়,

ভালো খাবার খেলে দুঃখ পায়, ভালো স্বপ্ন দেখলে দুঃখ পায়। কেবল বলে, চারদিকে এত দুঃখ! এত দুঃখ!

একদিন বুড়ো সূর্যকান্ত জীবনলালকে রাস্তায় পাকড়াও করলেন, হ্যাঁ হে জীবনলাল, তোমার দুঃখটা ঠিক কীসের তা বুঝিয়ে বলতে পারো?

জীবনলাল দুঃখের সঙ্গে মাথা নেড়ে বলল, আমার দুঃখের কি শেষ আছে? চারদিকে যেন দুঃখেরা ওত পেতে বসে আছে। আকাশে দুঃখ, বাতাসে দুঃখ, জলে স্থলে দুঃখ।

কিন্তু কই আমরা তো কিছু টের পাই না?

এ কথায় জীবনলাল আরও কত দুঃখ পেয়ে বলল, তাহলে কি আমি ভুল বলছি?

সূর্যকান্ত তাঁর লম্বা পাকা দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললেন, লামডিঙে থাকতে-থাকতে দুঃখের ব্যাপারটা আর আমার স্মরণ হয় না। খাওয়া পরার দুঃখ নেই, ঝগড়া কাজিয়া নেই, শোক তাপও নেই, তবে দুঃখটা যে কীসের সেটা বুঝতে পারছি না।

জীবনলাল একটা বুক কাঁপানো দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, লামডিঙ তো দুঃখেরই দেশ। গাছে গাছে যে ফুল ফোটে ফল ফলে তাও আসলে দুঃখেরই প্রকাশ। আকাশে দুঃখের নীল। দুঃখের জ্যোৎস্নায় চারদিকে বান ডেকে যায়। বড় দুঃখ। বড়ই দুঃখ।

জীবনলাল চলে গেলে সূর্যকান্ত তাঁর পাকা দাড়িতে হাত বোলাতে-বোলাতে গম্ভীর মুখে আপনমনেই 'হুঁ' দিলেন। ব্যাপারটা তাঁর সত্যিই বোধগম্য হচ্ছে না। লামডিঙে দুঃখ! কীসের দুঃখ? কোথায় দুঃখ?

হাতের লাঠিটা বাগিয়ে ধরে তিনি হনহন করে হাঁটতে লাগলেন। সামনে দুঃখ, ওপরে দুঃখ, নীচে দুঃখ। জীবনলাল যেদিকে চায় সেদিকেই দুঃখ দেখতে পায়। সব সময় তার বুক হু-হু করে। চোখ ছলছল করে, মাথার ভিতরটা ধূসরবর্ণ হয়ে থাকে।

কে যেন বলে উঠল, এই যে জীবনভায়া, খবর-টবর কী?

জীবন দেখল, বেঁটে মতো একটা লোক বগলে দাবার ছক নিয়ে তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে খুব হাসছে। এ হল বটেশ্বর, ভারী ঝগড়ুটে লোক। প্রায় সকলের সঙ্গেই তার ঝগড়া।

জীবন শুষ্ক মুখে বলল, খবর আর ভালো কী? দুঃখের জীবন যেমন কাটবার তেমনি কাটছে।

দুঃখী জীবনলালের দুঃখের কথা সবাই জানে। বটেশ্বর তাই মাথা নেড়ে বলল, তা তো বটেই। তা আজ কী কাণ্ডটা হল তা কি জানো? সাধুচরণকে দিলুম হারিয়ে। ব্যাটার সঙ্গে

অনেকদিন ধরেই একটা ঝগড়া পাকানোর তালে ছিলুম। আজ লেগেও গেল। একেবারে গো-হারান যাকে বলে তাই হারালুম। দুটো গজ, একটা ঘোড়া, দুটো নৌকা আর মন্ত্রী সমেত হেরে গেল।

লামডিঙের নিয়ম হল, ঝগড়াঝাঁটি চলবে না। তবে নিতান্তই কারও সঙ্গে কারও ঝগড়া লেগে গেলে দু-পক্ষই দাবা খেলতে বসবে। যে জিতবে সে-ই ঝগড়ায় জিতেছে বলে ধরা হবে। দাবা খেলাই হচ্ছে লামডিঙের ঝগড়া।

জীবনলাল গম্ভীর মুখে বলল, তাহলে তো আপনার খুব সুখের দিন আজ।

বটেশ্বর খুশিতে ডগমগ হয়ে বলল, তা তো বটেই। ভারী আনন্দ হচ্ছে।

আমার হচ্ছে না।

এই বলে বিরস মুখে জীবনলাল ফের হনহন করে হাঁটতে লাগল।

উলটোদিকে বটেশ্বরও হাঁটতে লাগল, তবে হনহন করে নয়। সাধুচরণকে যে সে আজ হারিয়েছে এই সাঙ্ঘাতিক খবরটা জনে-জনে দিতে হবে তো। হেঁকে-হেঁকে সে চারদিককে শুনিয়ে বলতে লাগল, দিয়েছি হারিয়ে সিংহের বাচ্চাটাকে। খুব বাড় বেড়েছিল। আজ একেবারে লেজে-গোবরে করে ছেড়েছি বাঘের বাচ্চাটাকে।

আসলে বটেশ্বর সাধুচরণকে শুয়োরের বাচ্চা বা কুকুরের বাচ্চাই বলতে চাইছে। তবে এগুলো গালাগাল বলে চিহ্নিত থাকায় লামডিঙের মাতব্বরেরা একদিন পাঁচমাথা এক হয়ে ঠিক করলেন, শুয়োর কুকুরও জন্তু, বাঘ সিংহও জন্তু। আর বাঘ সিংহ কুকুর বা শেয়ালের চেয়ে কিন্তু উঁচু দরের জন্তুও নয়। তবু কুকুরের বাচ্চা বা শুয়োরের বাচ্চা বললে মানুষ রেগে যায়, কিন্তু বাঘের বাচ্চা বা সিংহের বাচ্চা বললে ভারী গৌরব বোধ করে। তাই ঠিক করা হল, কেউ কাউকে শুয়োরের বাচ্চা বলতে চাইলে সিংহের বাচ্চা আর কুকুরের বাচ্চা বলতে চাইলে বাঘের বাচ্চা বলবে। সেই নিয়মই চালু রয়েছে।

অনেকটা হেঁটে ক্লান্ত জীবনলাল একটি বনস্থলীতে ঢুকে পড়ল। লামডিঙে এরকম বড়-বড় কুঞ্জবন মেলা রয়েছে। এসব বনভূমির সৌন্দর্য দেখার মতো। চারদিকে বড়-বড় গাছের অবরোধ পেরিয়ে ভিতরে ঢুকলে ফুলের বন্যা। মাঝখানে দীর্ঘ সরোবর। তাতেও নানা জলজ ফুল ফুটে আছে। নানা আকারের ছোটো বড় বর্ণময় নৌকো বাঁধা রয়েছে ঘাটে। যে-খুশি নৌকাবিহারে বেরিয়ে পড়তে পারে। কুঞ্জবনে অনেক পাখি ডাকছে, প্রজাপতি ও মধুকরেরা উড়ে বেড়াচ্ছে।

জীবনলাল কুঞ্জবনের নরম ঘাসের ওপর বসে জীবনের নানা দুঃখের কথা ভেবে ঘন-ঘন দীর্ঘশ্বাস ফেলতে লাগল। সূর্য অস্তাচলে চলে যাচ্ছে, পাখিরা নীড়ে ফিরছে, দিন শেষ হয়ে আসছে, এসবও জীবনলালের দুঃখের কারণ।

লামডিঙের ভূতেদের খ্যাতি ও অখ্যাতি দুই-ই আছে। তারা ভালোও করে, মন্দও করে। লামডিঙের মজারু ভূত ঘেন্টু একটা কদম গাছের ডালে বসে চারদিককার শোভা দেখছিল। শোভা দেখতে সে ভারী ভালোবাসে। শোভা দেখতে দেখতে সে হঠাৎ দেখতে পেল, জলের মধ্যে একটা ছোট্ট নীল ডোঙায় একটি ভারী সুন্দরী মেয়ে মুখখানা গোমড়া করে বসে আছে। এরকমটা হওয়ার কথা নয়। লামডিঙে একমাত্র জীবনলাল ছাড়া আর গোমড়ামুখো মানুষ কেউ নেই।

তবে ঘেন্টু ভালো করে নিরীক্ষণ করার পর বুঝল মেয়েটি হল টগর। টগরের একটা দুঃখ আছে ঠিকই। তার বিয়ের বয়স হয়েছে, কিন্তু কোনও ছেলেকেই তার পছন্দ হচ্ছে না। তার কারণ ছেলেগুলো কেমন যেন ছ্যাবলা, মোটা, অতিরিক্ত আহ্লাদী, কোনও কাজের নয়। সেইজন্য ইদানীং টগরের ভারী মন খারাপ যাচ্ছে। ডোঙায় বসে তাই সে নানা কথা ভাবছে।

ঘেণ্টু ঘাসবনের মধ্যে দুঃখী জীবনলালকেও দেখতে পাচ্ছিল। বিরস মুখে বসে জীবনলাল ঘন-ঘন দীর্ঘশ্বাস ফেলছে।

ঘেণ্টুর মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। সে গাছের ডালে বসে ঠ্যাং দোলাতে-দোলাতে হাতে হাত ঘষে মন্ত্রপূত ফুঁ দিল। সঙ্গে-সঙ্গে চারদিকে একটা ঝড়ের বাতাস উঠল। জলে বড়-বড় ঢেউ দিতে লাগল। ডোঙাটা মাঝ-দীঘিতে ভীষণ দুলতে লাগল। টগর তার বাঁশির মতো গলায় চেঁচিয়ে উঠল, বাঁচাও! বাঁচাও!

দুঃখী জীবনলাল চারদিকে দুঃখের ঝড় উঠতে দেখে আরও মুহ্যমান হয়ে পড়েছিল। সে চোখ বুজে ভাবছিল, এত দুঃখ নিয়ে, দুঃখের ওপর দুঃখ নিয়ে কী করে বেঁচে থাকা যায়?

ঠিক এই করুণ মুহূর্তে তার দুঃখিত হৃদয়কে আরও রক্তাক্ত করে দিতে টগরের আর্তস্বর কানে এসে পৌঁছোল। সে উঠল এবং জলের ধারে গিয়ে অনেক দূরে মাঝদরিয়ায় বিপন্ন ডোঙাটি দেখতে পেল। এই দুঃখময় লামডিঙে বেঁচে থাকার যদি কোনও মানেই হয় না, তবু জীবনলালের মনে হল, এই মেয়েটি হয়তো বাঁচতে চায়। এখানকার বোকা সুখী লোকেরা তো বাঁচতেই চাইবে।

জীবনলাল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। বোকা-সুখী মেয়েটিকে বাঁচাতে হবে। বড়-বড় ঢেউ কেটে এগিয়ে গিয়ে জীবনলাল ডোঙাটি ধরল এবং ডাঙায় টেনে আনল।

সঙ্গে-সঙ্গে ঝড় থেমে গিয়ে দিনশেষের সোনালি আলোয় চারদিকটা স্বপ্ন পুরীর মতো হয়ে গেল। আর সেই আলোয় জীবনলালের মুখের দিকে চেয়ে অবাক হয়ে গেল টগর, এরকম দুঃখী সুন্দর মুখশ্রী তো সে এর আগে আর কারও দেখেনি!

জীবনলালও মেয়েটির মুখে একটা বিমর্ষতা লক্ষ করছিল, যা লামডিঙের কোনও মেয়ের মুখে সে কখনও দেখেনি।

ঘেণ্টু কদমগাছের ডালে বসে বড়-বড় দাঁত বের করে খুব হি-হি করে হাসছিল। মাঝে মাঝে রগড় না করলে তার পেটে বড় বায়ু হয়।

তা সোনালি আলোটা আজ রইলও অনেকক্ষণ। টগর আর জীবনলালের ব্যাপারটার একটা হেস্তনেস্ত না দেখে সূর্যদেবও পাটে বসতে পারছিলেন না। কোনও কাজ আধখ্যাঁচড়া হয়ে থেকে গেলে তাঁরও ভারী বায়ুর উৎপাত হয়। তাই তিনি সাত ঘোড়ার লাগামটা চেপে রইলেন। ওদিকে চাঁদমামা উঠে পড়েছেন আকাশে, কিন্তু সূর্যদেব বিদেয় না হলে তাঁরও বিশেষ খাতির হচ্ছে না। তাই তিনি রীতিমতো চটে উঠে বললেন, ওরে বাপু, এসব হৃদয়ের কারবারে তোমাকে কে আবার কবে ডেকেছে বলো তো! ওসব আমার কেস। চাঁদ না হলে কি হৃদয় এক হয় রে ভাই। এখন বাড়ি যাও তো, আমার কাজ আমাকেই করতে দাও।

তা চাঁদটাও উঠল আজ বড় জোর। যেন একেবারে পিচকিরি দিয়ে জ্যোৎস্না ছিটোনো হতে লাগল চারধারে। সোনার গুঁড়ো দিয়ে বৃষ্টি ঝরালে যা হয় অবিকল তাই।

তা টগর আর জীবনলাল বাক্যহারা হয়ে পরস্পরের দিকে চেয়ে রইল।

এরপর ঘণ্টাখানেকের ঘটনা আমরা চেপে যাই বরং। তবে ঘণ্টাখানেক বাদে টগর ধরা-ধরা গলায় জিগ্যেস করল, তোমার দুঃখ কি ঘুচেছে?

জীবনলাল ঘাড় কাৎ করে বলল, এক্কেবারে নেই। তবে কী জানো, দুঃখ যে চলে গেল সেটাও একটা দুঃখ। আমার যেন দুঃখ হচ্ছে।

শুধু জীবনলাল আর টগরকে নিয়ে থাকলেই তো আর চাঁদমামার চলে না, তাঁর আরও পাঁচটা যজমান আছে, খদ্দের আছে, ফ্যান আছে। সবাইকেই দেখতে হয়। আজ চাঁদমামার হাতটাও বেশ দরাজ। ধামা ধামা সোনার গুঁড়ো ঢালছেন ইচ্ছেমতো।

সূর্যকান্তের পাকা দাড়িতে সোনার গুঁড়ো মেলাই জমে গেল। তিনি একটা চিরুনি দিয়ে দাড়ি আঁচড়াতে আঁচড়াতে সোনার গুঁড়ো ঝেড়ে ফেলে দিতে লাগলেন। আর সঙ্গে-সঙ্গে ভাবতে লাগলেন, আচ্ছা জীবনলালের দুঃখটা কীসের? দুঃখ জিনিসটাই বা কীরকম? এত বয়স হয়ে গেল, একটু দুঃখ চেখে দেখলে হত। দুঃখের স্বাদই যে বুঝলুম না। ভাবতে-ভাবতে তিনি বাগানে বেড়াতে লাগলেন।

লামডিঙের বিখ্যাত ভূত হল ঘড়িরাম। সে কাছাকাছি থাকলেই টিকটিক শব্দ পাওয়া যায়। টিকটিক শব্দটা শুনেই সূর্যকান্ত গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন, ইয়ে, ওহে ঘড়িরাম, একটা কথা।

ঘড়িরাম অদৃশ্য থেকে দৃশ্যমান হয়ে সামনে দাঁড়াল, তার রীতিমতো জোয়ান চেহারা। মাথাটা কামান। মুখখানা খুব গম্ভীর। ঘড়িরামের বউ মেরিও তার পাশে দাঁড়ানো। ভারী সুন্দর ফুটফুটে মেমসাহেব।

ঘড়িরাম গম্ভীর গলায় বলল, কী কথা?

ইয়ে দুঃখ জিনিসটা কীরকম বলতে পারো?

ঘড়িরাম খুব গম্ভীর হয়ে বলল, দুঃখ কাকে বলে তা জানতাম বটে, কিন্তু অনেককাল হয়ে গেল, এখন আর ঠিক মনে নেই। তবে জিনিসটা খুব খারাপ।

সূর্যকান্ত মাথা নেড়ে বললেন, তাই হবে। কিন্তু জিনিসটা একটু চোখে না দেখলে ঠিক জুত হচ্ছে না।

ঘড়িরাম দুঃখিতভাবে মাথা নেড়ে বলল, আজ্ঞে আমার কিছু করার নেই। দুঃখ জিনিসটা কেমন তা আমিই কবে ভুলে মেরে দিয়েছি।

ঘড়িরাম আর মেরি চলে যাওয়ার পর সূর্যকান্ত একা একা জ্যোৎস্নায় পায়চারি করতে লাগলেন। দুঃখ জিনিসটা ঠিক কীরকম? দুঃখ হলে কীরকম লাগবে?

ঠিক এই সময় জ্যোৎস্না ফুঁড়ে নাট্যকার বিপুলবিহারী দশাসই চেহারা নিয়ে এসে হাজির। বিপুলবিহারীর হাতে একখানা টেস্ট টিউব। তাতে খানিকটা জ্যোৎস্না ভরে নিয়ে একটু নেড়ে ছিপিটা বন্ধ করে দিয়ে বললেন, এই যে সূর্যদা, কী খবর-টবর?

আচ্ছা বিপুলবিহারী, দুঃখ জিনিসটা কেমন বলতে পারো?

বিপুলবিহারী প্রবলভাবে অট্টহাস্য করে বললেন, আমি তার কী জানি বলো? সারাদিন নানা নাটকের মহড়া করে চলেছি আপনমনে। সুখ দুঃখ কিছুই টের পাই না। এই

জ্যোৎস্নার সঙ্গে খানিকটা গ্লিসারিন মিশিয়ে তবে নায়িকার চোখের জল বানাতে হবে। দেশের এমন দুর্দশা যে নায়িকা কাঁদতে পর্যন্ত শেখেনি। আর শেখাবেই বা কে বলো? এদেশে একটা লোকও কি কাঁদতে জানে? ধরেছিলুম দুঃখী জীবনলালকে, তা সে বলল, আমার বড় দুঃখ, ওসব নাটুকে কান্না শেখানোর মতো মন আমার নেই।

সূর্যকান্ত বললেন, তাই তো হে, এ তো ভারী বিপদের কথা।

বিপুলবিহারী চলে গেল। সূর্যকান্ত একা জ্যোৎস্নায় একটা পাথরের ওপর বসে রইলেন। দুঃখ জিনিসটা না চাখলে মুখটাই যে মাটি হবে তাঁর। দুঃখ জিনিসটা কেমন তা না বুঝলে সুখটাকেই বা চেনা যাবে কী করে? বটেশ্বর আজ রাতে আর-এক পাট্টি দাবা না খেলে পারবে না। সাধুচরণটা বড্ড অল্পেই হেরে গেল। কিন্তু বটেশ্বর আর খেলুড়ি খুঁজে পাচ্ছে না। এমনকী ঘেণ্টুটা অবধি পিছিয়ে গেল দাবার নাম শুনে।

তবে ভয় নেই। লামডিঙের দক্ষিণের বনের ধারে রোজ রাতেই অন্য গ্রহের জীবেরা ঘাসপাতা খেতে তাদের মহাকাশযান করে চলে আসে। বটেশ্বর দাবার ছক বগলে চেপে, হাতে ঘুঁটির পুঁটুলি নিয়ে সেইদিকেই রওনা হল।

ঠিক বটে, আজও গোটা দুই বিটকেল মহাকাশযান নেমেছে। লিকলিকে চেহারার কয়েকটা জীব ঘাসপাতা খাচ্ছে আর ইতিউতি তাকাচ্ছে। ভারী ভীতু জীব।

বটেশ্বর হাঁক দিল, ওহে, ভয় নেই, এসো একটু দাবা খেলা যাক।

প্রথমটায় কেউ ভয়ে কাছে এল না। বেশ কিছুক্ষণ ডাকাডাকির পর একটা জীব এগিয়ে এল।

বটেশ্বর মহা খুশি। দাবার ছক সাজিয়ে ফেলল ঘাসের ওপর বসে। জীবটা ব্যাপারটা বুঝতে পারছে না বলে চালগুলো শিখিয়েও দিল। কিন্তু খেলা শুরু হতে না হতেই বটেশ্বর বুঝতে পারল, জীবটা ভারী বুদ্ধিমান। দারুণ খেলছে। বটেশ্বরের চার চারটি জোরালো বল মেরে দিল দশ চালের মধ্যে। বাইশ চালে মাত হয়ে গেল বটেশ্বর। জীবটার গলা জড়িয়ে ধরে বটেশ্বর গদগদ স্বরে বলল, আহা, কী খেলাটাই খেললে হে, দেখার মতো।

পিছন থেকে ঘড়িরামের গম্ভীর গলা বলে উঠল, আপনার লজ্জা করছে না বটেশ্বরবাবু? অন্য গ্রহের জীবদের কাছে হেরে গেলেন! যাই বলুন, আমি ব্যাটাকে ঢিট করছি।

ঘড়িরাম একটু চাঁছাছোলা লোক। বটেশ্বর তাকে ভয়ও খায়। সে তাড়াতাড়ি সরে বসল। ঘড়িরাম বসে পড়ল খেলতে।

জ্যোৎস্নাটা বড্ড জোর নেমেছে আজ। ভাসিয়ে দিচ্ছে চারধার।

মৃত্যুপুরীর চারজন মুশকো পেয়াদা আজ ডিউটি দিতে লামডিঙের আনাচে কানাচে ঘুরঘুর করে। খুব যে সুবিধে করতে পারে এমন নয়। লামডিঙের লোকদের আয়ু বেজায় লম্বা। আর তাদের কাছে পরোয়ানাও বড় একটা থাকে না যে কাউকে নিয়ে যাবে। তবু লামডিঙে রোজই তারা এসে ঘুরঘুর করে। এখানকার বিখ্যাত জ্যোৎস্নায় বসে একটু গা জুড়োয়। কথিত আছে লামডিঙের জ্যোৎস্নায় গেঁটে বাত, সর্দিকাশি আর বায়ু রোগে খুব উপকার হয়। লামডিঙের বাতাসে হাঁফানি, পিত্তের দোষ আর ধাতু দৌর্বল্য সেরে যায়। লামডিঙের জলের তো তুলনাই নেই, পেটের সব গণ্ডগোল সাফ করে দেয়। লোকে বলে, লামডিঙের লোকদের ইচ্ছামৃত্যু। কিন্তু সেই ইচ্ছাটাও বড় একটা কারও হয় না।

তা পেয়াদারা তবু আসে, আনাচে কানাচে ঘোরে, কারও মরার ইচ্ছে জাগে কি না তা খেয়াল রাখে।

পেয়াদাদের লামডিঙের লোকেরা ভালোই চেনে। তবে বিশেষ পাত্তা দেয় না। দেখা হলেই মুখ ফিরিয়ে নিয়ে চলে যায়।

আজ রাতে পেয়াদারা হরগোবিন্দবাবুর দুশো বাইশ বছর বয়সি ঠাকুমার ঘরের কাছে ঘুরঘুর করল খানিক। যথেষ্ট বয়স হয়েছে। এ বয়সে মাঝে-মাঝে মানুষ শখ করেও তো এক আধবার বলে, আর কেন, এবার মরলেই হয়।

কারও মুখ থেকে একবার এরকম একটু ইচ্ছের কথা বেরোলেই পেয়াদারা অমনি সাপুটে ধরে আত্মাটাকে এক ঝাঁকুনিতে বের করে দেবে। পেয়াদারা হরগোবিন্দর ঠাকুমার ঘরের খোলা জানলায় ঘাপটি মেরে কান পেতে রইল। কিন্তু বুড়ি মহা ট্যাটন। আপনমনে নানা কথা বকবক করে যাচ্ছে বটে, মরবার কথাটি মুখে আনছে না।

সূর্যকান্ত বাগানে বেড়াতে-বেড়াতে ভারী চিন্তিত হাত দাড়িতে বোলাচ্ছিলেন এমন সময় পাশেই হরগোবিন্দর বাড়ির জানালায় চারটে মুশকোমতো লোককে দেখে হেঁকে বললেন, কে ওখানে?

পেয়াদারা ভারী জড়সড়ো হয়ে কাঁচমাচু মুখে বলল, এই আজ্ঞে, আমরা।

সূর্যকান্ত পেয়াদাদের ভালোই চেনেন।

ছেলেবেলা থেকেই দেখে আসছেন। বললেন, তা সুবিধেটুবিধে কিছু করতে পারলে হে বাপু?

হেড পেয়াদা দুঃখের সঙ্গে মাথা নেড়ে বলল, আজ্ঞে না, একেবারেই সুবিধে হচ্ছে না। কাজ কারবার লাটে উঠবার জোগাড়।

কেউ মরছে না বুঝি?

মোটেই মরছেন না। সেই বছর দশেক আগে বটেশ্বরবাবাকে জুতমতো পেয়ে গিয়েছিলুম। তারপর থেকে একেবারে জালে মাছিটি পড়ছে না।

বটেশ্বর! কোন বটেশ্বর বলো তো! বেঁটে বটেশ্বর নাকি?

আজ্ঞে তিনিই।

যে দাবা খেলে বেড়ায়।

আজ্ঞে দাবাড়ু বটেশ্বরই বটেন।

সূর্যকান্ত ভারী চটে উঠে বললেন, মরেছে যে খবরটা তো হতভাগা একবারও মুখ ফুটে আমাকে বলেনি। অথচ রোজ দেখা হচ্ছে। এই একটু আগেও তো দেখলুম তাকে।

বোধহয় চেপে যেতে চাইছেন।

সূর্যকান্ত দাড়ি নেড়ে উত্তেজিত গলায় বললেন, চেপে গেলেই হল! জন্মমৃত্যুর একটা রেজিস্টার আছে তো। তা ছাড়া বাঁচা লোক আর মরা লোকে কিছু তফাতও আছে। তফাতটা না থাকলে চলবে কী করে?

হেড পেয়াদা মাথা চুলকে বলল, বটেশ্বরবাবু যে মরেছেন তা তিনি স্বীকার করতেই চান না যে!

মরতে তাকে বলেছিলই বা কে?

নিজেই বলেছিলেন। সেবার বাঘা দাবাড়ু কালীকেষ্টকে হারিয়ে ভারী খুশি হয়ে বলে ফেলেছিলেন, আহা এরকম এক চাল খেলতে পারলে মরে গেলেও দুঃখ নেই। যেই বলা অমনি আমরা ঘপাৎ করে—

বুঝেছি। তা মরাটা খুব কঠিন ব্যাপার নাকি?

আজ্ঞে মোটেই না। ব্যথাটেথা নেই, ধড়ফড়ানি নেই, একেবারে জামা ছাড়ার মতো সহজ ব্যাপার।

সূর্যকান্ত চোখ ছোট করে বললেন, আর সুবিধেটুবিধে কী দিচ্ছ? মানে, একটা লোক কিছু না পেলে খামোখা মরতেই বা যাবে কেন?

হেড পেয়াদা একটু আশার আলো দেখতে পেয়ে ভারী উৎসাহের সঙ্গে বলতে লাগল, আজ্ঞে সুবিধে মেলা। বেঁচেবর্তে যেমন আছেন প্রায় তেমনই থাকবেন। সুবিধে হল,

ইচ্ছেমতো অন্তর্ধান করা যায়। ইচ্ছে হলে গ্রহ নক্ষত্রে ঘুরে আসা যায়। স্বর্গ-মর্ত পাতাল কোথাও যাওয়া আটকায় না। তারপর ধরুন কাজকর্মও কিছু নেই, সারাদিন ফূর্তি করে বেড়ালেই হয়। হোঁচট খেয়ে যদি পড়ে যান, দরজায় যদি আঙুল চিপে যায়, ছাদ থেকে যদি পড়ে যান তাহলেও ব্যথা লাগবে না। তারপর ধরুন, রোগবালাই নেই, খিদেতেষ্টা নেই, খরচাপাতি নেই। একেবারে ঝাড়া হাত-পা হয়ে গেলেন আর কি।

সূর্যকান্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মাথা নেড়ে বললেন, দূর। ও আর এমনকী? সুখে-সুখে জীবনটা একঘেয়ে হয়ে গেল, মরার পরও যদি কেবল সুখ ছাড়া আর কিছু না থাকে তাহলে ফের একঘেয়ে লাগবে। না হে বাপু, মরাটরা আমার পোষাবে না।

হেড পেয়াদা হতাশ হয়ে করুণ গলায় বলল, একবার একটু মরে দেখতে পারতেন কিন্তু। খারাপ লাগত না। শুনতে যতটা খারাপ আসলে মরা ব্যাপারটা ততটা খারাপ নয়।

সূর্যকান্ত মাথা নেড়ে বললেন, উহুঁ, অন্য জায়গায় দ্যাখো গে বাপু। আমার কাছে সুবিধে হবে না।

দুঃখী জীবনলাল আর টগর জ্যোৎস্নায় পাশাপাশি হাঁটছিল। সোনার গুঁড়োয় দুজন একদম মাখামাখি। দুজনে খুব ঘেঁষাঘেঁষি। জীবনলাল ফের তার দুঃখের কথাই বলছিল, দুঃখ ঘুচে যাওয়ার দুঃখ।

টগর শুনছিল। শুনতে তার ভারী ভালো লাগছিল।

পেয়াদারা কিছুক্ষণ তাদেরও পিছু নিল। দুঃখের কথা বলতে-বলতে যদি জীবনলালের একবারটি অন্তত মরার ইচ্ছে জাগে। তাহলে ঘপাৎ করে—

তা এইসব নিয়েই হল লামডিং। রোজ সেখানে জ্যোৎস্না ফোটে। রোজ সেখানে অন্য গ্রহের জীব আসে। রোজ ভূতুড়ে আর অদ্ভুতুড়ে নানা ঘটনার স্রোত বয়ে যায়। কিন্তু লামডিঙের গল্প কখনও শেষ হয় না।

ছেলেটা কাঁদছে

গজপতি হাট বসিয়েছে তেজোময়ীর জমিতে। গেল হপ্তায় দু-দিনই খুব জমেছিল। ভোরবেলা থেকে গরুর গাড়ি, রিক্সা, সাইকেল ভ্যানে চারদিক ছয়লাপ। জিনিস পড়তে পায়নি। সন্ধের আগেই হাট সাফ। তাও ছাউনিগুলো এখনও সব তৈরি হয়নি, জমি উঁচু করতে যে কাদা মাটি ফেলা হয়েছিল তা এখনও ভসভসে। তাতে হাজার পায়ের ছাপ রোদে শুকিয়ে ঢেউ-ঢেউ হয়ে আছে। দুপুরবেলা জনমনিষ্যি নেই। এক হাতে মাথায় ছাতা, অন্য হাতে হ্যান্ডেল ধরে সাইকেল চালিয়ে নাড়াল থেকে ফেরার পথে গজপতি ফাঁকা হাটটার সামনে এসে নেমে পড়ল। তার মনটা ভালো নেই। লম্বা ছাউনি মোট চোদ্দোখানা, ছোট গোটা দশেক। খড়, বাঁশ আর কাঠের খুঁটির এইসব চালা পয়লা ঝড়েই উড়ে যাবে। গজপতির খুব ইচ্ছে, চালার মেঝেগুলো ইট দিয়ে বাঁধিয়ে দেয়। খরচের ভয় তেমন নেই। প্রথম ছ'মাসটা খাজনা না নিলেও তারপর থেকে হাটের আয় ভালোই হবে। পুষিয়ে যাবে। কিন্তু মুশকিল হল, জমিটার একজন চার আনির হিস্যাদার আছে। সে যে কবে এসে উদয় হয়।

ঠেকা দেওয়ার কাঠিতে সাইকেলটা দাঁড় করিয়ে এই রোদে গজপতি জমিতে নেমে পড়ল। দুটো চালা এর মধ্যেই একটু হেলে পড়েছে। কয়েকটার চালের খড় টেনে নিয়ে গেছে কেউ। এসব অবশ্য হবেই। গজপতি ঘুরে-ঘুরে পায়ের ছাপই দেখে। স্বর্গত তেজোময়ীর এই হাটে মানুষ আসছে। মানুষ যেখানে আসে সেটাই তো তীর্থ।

রাজবাড়ির পিলখানায় বহুকাল আগে একসঙ্গে চোদ্দোটা হাতি দেখেছিল গজপতি। শুঁড় দোলাচ্ছে, শরীর দোলাচ্ছে। একসঙ্গে চোদ্দো হাতি। কী যে সুন্দর, কী যে অবাক-করা দৃশ্য। ইচ্ছে ছিল নিজে একটা পিলখানা বানাবে, ঠিক ওই রকম চোদ্দোটা হাতি থাকবে

তাতে। সারাদিন দুলবে আর দুলবে। ছেলেবেলায় মনের জমিতে কত আগাছা জন্মায়। বড় হয়ে আগাছা নিড়িয়ে বিষয় বুদ্ধির বীজ বুনে দিতে হয়। এই হাট বসানোর মধ্যে গজপতির বিষয়বুদ্ধিটাই সবাই দেখবে। তা দেখুক। রাজবাড়ির পিলখানা খালি করে সেই স্বপ্নের হাতিরা চলে গেছে। তবু এখনও চোখ বুঝলেই সেই চোদ্দো হাতির ধীর লয়ে নাচের দোল যেমন দেখতে পায় গজপতি, তেমনি এই হাটটাকেও সে দেখতে পেত। তার জমি-জিরেত নেই, পয়সাকড়ি নেই। বলতে কি একটা বয়েস পর্যন্ত সে তেজোময়ীর পোষা কুকুরটার মতোই ছিল। জামবনিতে নিজের পৈতৃক বাড়ির রাবণের সংসারে একটা রোগা বউ আর একটা বোকাসোকা ছেলে কষ্টে-সৃষ্টে বেঁচেছিল মাত্র। বিয়ের বছর দুইয়ের মধ্যেই তেজোময়ী বেঁচে থাকতে বউ ছেলের কাছে ফিরে যায়নি। বউ আসতে চায় না। বোকা ছেলেটাকে গাঁসুদ্ধু ছেলেপুলেরা খ্যাপায়। নষ্ট মেয়েমানুষ বলে তেজোময়ীর নিজেরও দুঃখ ছিল। অনুতাপ ছিল। সেই জ্বালা-পোড়ায় বুড়ো হওয়ার আগেই মরে গেল। মরার সময়েও ভারী সুন্দর দেখতে ছিল তেজোময়ী। আর তেজও কিছু কম ছিল না। সকলের নাকের ডগাতেই বিধবা হয়ে গজপতির সঙ্গে বাস করত। কেউ কিছু বলতে সাহস পায়নি। এমনকী ইস্কুলের হেডমিসট্রেস পদ থেকে তাকে সরানোর কথাও ওঠেনি কখনও।

তেজোময়ীর স্বপ্ন ছিল ওই ইস্কুলটা। দিন রাত তার ওই ছিল ধ্যান-জ্ঞান। গজপতি তেজোময়ীর কাজে লাগত বটে, কিন্তু তার জীবনের কোনও অংশে সে ছিল না। গজপতি ভাবে, সে না হয়ে অন্য কেউ হলেও বোধহয় তেজোময়ীর চলে যেত। শুধু জ্যোৎস্না ফুটলে তেজোময়ী বারান্দার ইজিচেয়ারে বসত, সিঁড়িতে বসে বাঁশি বাজাত গজপতি। মাঝে-মাঝে তখন সে তেজোময়ীর চোখে জল চিকচিক করতে দেখেছে। এ ছাড়া আর কোনও দুর্বলতা ছিল না। নামের সঙ্গে স্বভাবের এমন ছিল মিল। আর গজপতির উলটো। সেই চোদ্দটা হাতি গজপতির সাত জন্মেও হওয়ার নয়, তবু ভারী নামটা বয়ে বেড়াতে হচ্ছে। তবে হাতি না হোক একটা হাট বসানোর স্বপ্ন বহুদিন হল দেখছে গজপতি। মেলা লোক জড়ো হয়, বিকিকিনি করে, মেলামেশা হয়, হাটের এই চরিত্রটা বড় ভালো লাগে তার। হাটবাজারের মতো জিনিস নেই। কিন্তু এখন এই খাঁখাঁ দুপুরে হাটের চালার নীচে বসে হাট বসানোর অর্থহীনতাই টের পায় গজপতি। মানুষ চলে যায়। তার পায়ের ছাপও চিরকাল থাকে না। তবে থাকে কী? দু-বিঘে জমি, কিছু নগদ টাকা গজপতি পেল তেজোময়ী মরার পর, তাই দিয়ে এই হাট। কিন্তু চার আনার হিস্যাদারটা যে কে তা বুঝে উঠতে পারছে না। দু-খানা চিঠি দিয়েও জবাব মেলেনি। বেঁচে থাকতে তেজোময়ীর মুখ থেকেও নামটা কখনও ফসকায়নি। তাহলে লোকটা কে? এই চিন্তায় গজপতির চুল পাকতে লেগেছে, রাতে দুঃস্বপ্ন দেখছে, ভালো হজম হচ্ছে না।

হাট বসানো বড় সহজ কথা নয়। জমির দখল পেতে বিস্তর ঝামেলা যাচ্ছে। এখনও সত্যিকারের দখল পায়নি। হাট বসানোর অনুমতি আদায় করা, ঢোল শহরত করে লোককে জানান দেওয়া, ব্যাপারীদের ঠেলেঠুলে নিয়ে আসা, এই করতে গিয়ে গজপতির কণ্ঠমণি বেরিয়ে পড়েছে। তবু একটু খুঁত থেকে গেল। সে ওই যোগেন ঘোষ, চার আনার হিস্যাদার। মনে-মনে তাকে ছকে ফেলেছে গজপতি, দৈত্যের মতো বিকট চেহারা। রোমশ। রেগে গেলে বিপুল দুই হাতে বুক চাপড়ায়। চোখের দৃষ্টি খুনির মতো। হয়তো সত্যিকারের খুনিই। গজপতি কাল রাতেও স্বপ্ন দেখেছে, যোগেন ঘোষ এসে তার গলা ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলছে, চার আনা মানে? পুরো ষোলো আনাই আমার। তুই তো তেজোময়ীর কেপ্ট ছিলি, তোর আবার হিস্যা কীসের? ভয়ের কথা হল, তেজোময়ীর পদবিও ছিল ঘোষ। যোগেনের সঙ্গে তার রক্তের সম্পর্ক থেকে থাকলে কোর্ট-কাছারিতে অনেক দূর গড়াবে। অন্যদিকেও খবর সুখের নয়। নাড়াল থেকে জামবনি কাছে হয়। সরাসরি জামবনিতে গিয়ে ডাকাবুকো ভাইপোদের পাল্লায় পড়তে সাহস হয়নি বলে নাড়ালে ঘাপটি মেরে বসে কাল থেকে বউ ছেলের খোঁজ করছিল গজপতি। নাড়ালের হাবু নস্কর বন্ধু লোক। মুরুব্বিও বটে। তাকে ধরে খোঁজ নিয়ে জেনেছে, ভাইপোরা খুব সেয়ানা হয়েছে। কাকার খবরও তারা রাখে। তবে ফাঁকা গাঁয়ে ঢুকলেই ঠ্যাং ভেঙে দেবে। বউকেও খবর পাঠিয়েছিল গজপতি। কিন্তু বউ হারুকে বলেছে, সেই মানুষটার সঙ্গে এতকাল যখন ঘর করিনি তখন আর শেষ বয়সে করতে যাব কেন? এ বাড়িতে ঝিয়ের মতো খাটছি, তাই খাটব। গজপতির বোকা ছেলেটা সে বাড়িতে গরু-টরু রাখে। সে নাকি ভারী বিয়েপাগলা। গাঁয়ের লোকেরা তার পিছুতে লাগে অহরহ। ভাবলে কষ্ট হয়। বোকা ছেলেটার পিছুতে লাগে কেন সবাই? ছাতাটা মুড়ে একটা চালার নীচে বসে আছে গজপতি। বৈশাখের রোদে আদিগন্ত জ্বলছে। বড্ড খরা। তেজোময়ীর কোনও ছেলেপুলে ছিল না। কথাটা ভাবতে-ভাবতে সে একটা ময়লা ন্যাতার মতো রুমাল বের করে মুখের ঘাম আর ধুলো মুছল। গলাটা শুকিয়ে আছে তেষ্টায়। হাটে জলের বন্দোবস্ত নেই. করতে হবে। নইলে এই মাঠের হাট অকালে পাততাড়ি গোটাবে। গেল হপ্তায় দু-দিনই হাটের লোক আশেপাশের পুকুর বা টিউবয়েলে জল খেতে গিয়ে পড়শিদের ঢিল আর গালমন্দ খেয়েছে।

হবে, সবই হবে। মস্ত ইঁদারা বা পুকুর, টিপকল। মাঠটা ছেয়ে যাবে দোচালায়। এত বড় হাট কেউ দেখেনি। পূর্বধারে একটা গোহাটা করারও ইচ্ছে আছে গজপতির। শিবরাত্রিতে মেলা বসাবে! কে জানে, তেজোময়ী খুব শিবরাত্রি করত। নীচু চালা থেকে একটা গরু খড় টেনে খাচ্ছিল। সেটাকে তাড়িয়ে গজপতি ফের ছাতা মাথায় সাইকেলে চাপল।

বাড়িটাও তেজোময়ীর। উইল অনুসারে এখন গজপতির। তবে সর্বত্রই ওই এক অদেখা চার আনার হিস্যাদার। বাড়িতে দুটো মাত্র ঘর। একটু বারান্দা। ভিতরে একটু উঠোন। উঠোনে পাতকুয়ো। এর চার আনা ভাগাভাগি কী করে যে হবে তা মাথায় আসে না গজপতির। আর ভাগাভাগিই যে হবে তার কোনও ঠিক নেই। দৈত্য যোগেন ঘোষ এসে যদি তাকে ঘাড় ধরে ভিটে-ছাড়া করে তাহলেও তো কেউ গজপতির পক্ষ নেবে না। তেজোময়ীর জারকে এই অঞ্চলের লোক ভালো চোখে দেখে না। তারা ঠিক যোগেনের পক্ষ নেবে। গজপতি পাতকোর ঠান্ডা জলে স্নান করে ভাত রেঁধে খেল। একটু গড়িয়ে নিল। সন্ধেবেলা মস্ত চাঁদ উঠলে পর সিঁড়িতে বসে বাঁশি ধরল গজপতি। বারান্দার ইজিচেয়ারে তেজোময়ীও এসে বসল। চোখ বুজে বাঁশির মধ্যে বুকের সবটুকু বাতাস উজাড় করে দিতে-দিতে স্পষ্টই টের পায় সে তেজোময়ীকে। এত লোক থাকতে ওই সুন্দর মেয়েটা যে কেন গজপতিকেই তুলে এনেছিল তা কখনও জেনে নেওয়া হয়নি। সত্যি বটে, বয়সকালে গজপতির চেহারাটা ছিল কেষ্ঠঠাকুরের মতো। মাজা রং। ঢুলু-ঢুলু চোখ। টল-টলে মুখ। আর ছিল বাঁশি। কিন্তু শুধু এইটুকুতেই ভুলবার মানুষ তো তেজোময়ী ছিল না। তবে? জ্যোৎস্নাটা বড় ধাঁধাঁ করছে। গুলিয়ে যাচ্ছে সবকিছু। একটা বয়সের পর জ্যোৎস্নাটাও ভালো লাগে না বোধহয়। কিছুই তো আর থেমে নেই। সব পালটে যাচ্ছে। গজপতির কেষ্ঠঠাকুরের মতো চেহারাটা এখন শুকিয়ে হত্তুকি। বাঁশির দমেও আজকাল টানাটানি। তেজোময়ী নেই, খামোকা চাঁদটা জ্যোৎস্নার কেরদানি দেখাচ্ছে। ভারী ছটফট করছে মনটা। তার বোকা ছেলেটাকে কারা ঢিল মারে?

একটা রিক্সা এসে থেমে আছে সড়কে। এতক্ষণ লক্ষ করেনি গজপতি। একটা মোটা মতো লোক নেমে পয়সা দিচ্ছে এতক্ষণে। গজপতি চেয়ে রইল। লোকটা একটা বাক্স হাতে সোজা সামনে এসে বলল, বেশ বাজান তো মশাই। শুনতে ইচ্ছে করে।

গজপতি জ্যোৎস্নায় লোকটাকে ঠাহর করতে একদৃষ্টে চেয়েছিল।

লোকটা বলল, চিনবেন না। রাণীগঞ্জ থেকে আসছি চিঠি পেয়ে। আমার নামই যোগেন।

যেমন চমকাবার কথা তেমন চলকাল না গজপতি। বোধহয় যোগেন যে একদিন আসবেই তা বুঝতে পেরে মনটা ভিতরে-ভিতরে তৈরি ছিল। গজপতি ঠক করে উঠে পড়ে বলল, রাতে এখানেই খাবেন তো। ভাত চাপাই গে।

যোগেন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, আর খাওয়া। তা চাপাবেন'খন। এই বুঝি বাড়ি? গজপতি বেশি কথায় গেল না। সত্যি বটে, যোগেনের চেহারাটা দত্যির মতো না হলেও

দশাসই। তবে টপ করে গলা টিপে ধরার লোকও নয়। বয়স গজপতির কাছাকাছি, দু-চার বছর কম। লণ্ঠন নিয়ে ঘুরে-ঘুরে বাড়িটা দেখায় গজপতি।

ক'কাঠা জমি?

মোট তিন।

বেচলে কত পাওয়া যাবে?

হাজার দশ-পনেরো।

ধুস। তার সিকিভাগ আর কত হবে?

রাত্রে আলুর দম রাঁধল গজপতি। বেশ হল সেটা খেতে। যোগেন প্রথম দফা ভাত শেষ করে আরও দু-হাতা নিয়ে বলল, উনি ছিলেন আমার মা।

তেজোময়ী? গজপতি হাঁ।

সৎ মা। বাবার দ্বিতীয় পক্ষ।

তবে যে শুনি, তেজোময়ীর স্বামী অল্প বয়সে মারা যায়।

পঁয়ষট্টি আর বয়স কী? মরার বয়েস তো নয়।

তাহলে তেজোময়ীর সঙ্গে আপনার আত্মীয়তা তো বেশ ঘনিষ্ঠই বলতে হবে।

ঘনিষ্ঠ নয়? মা বলে কথা। বাপের বউ। এক মাস অশৌচ পাললাম কি এমনি-এমনি? না পেলে উপায় কী, বেঁচে থাকতে সম্পর্ক ছিল না মায়ের চরিত্রদোষের জন্য। তা বলে তো আর সমাজ ছাড়বে না। আপনারও শুনেছি বউ-বাচ্চা আছে।

গজপতি চুপ করে থাকে। যোগেন আর একবার আলুর দম চেয়ে নেয়। বলে, আমি অবশ্য মায়ের দোষ দেখি না। কাঁচা বয়সের বিধবা। অমন হতেই পারে। আপনি বাঁশিটাও বেশ ভালোই বাজান। গজপতি লজ্জা পায়। ভাত নাড়াচাড়া করে।

পরদিন সকালে যোগেনকে রডে বসিয়ে সাইকেল মেরে হাটে নিয়ে এল গজপতি।

এই সেই হাট, যার কথা বলছিলাম।

যোগেন খুব আলগোছে দেখছে। তেমন আগ্রহ প্রকাশ করছে না। শুধু বলল, নতুন বসিয়েছেন বুঝি? চলছে কেমন?

খুব চলবে।

ভালো। চললেই হল।

এর নাম দিয়েছি তেজোময়ীর হাট, নামটা ভালো না?

মায়ের নামে হাট তার আর ভালোমন্দ কী।

হঠাৎ গজপতি যোগেনের হাতটা চেপে ধরে বলে, হাটটা যখন হয়েছে তখন থাক। তুলে দেবেন না। যোগেন তার ঘন ভ্রূ তুলল, আমি কে? মোটে তো চার আনার হিস্যা।

রাণীগঞ্জে আপনি কী করেন?

অনেক কারবার ছিল মশাই। সব তুলে দিয়েছি। এখন একটু কয়লার বিজনেস টিমটিম করে চলেছে। লাখোপতি সব ঠিকাদার চারদিকে হাজার-হাজার টাকা ঘুস ফেলছে। আমি কুড়িয়ে বাড়িয়ে যা পাই।

তাহলে এসে এখানেই বরং জেঁকে বসুন।

আর আপনি?

আমার একটা কাজ আছে।

কী কাজ?

একটা ন্যালাখ্যাপা ছেলে আছে আমার। কাল খবর পেয়েছি ছেলেটার পেছনে নাকি গাঁয়ের ছেলেরা খুব লাগে। ঢিল-টিল মারে। সেই থেকে মনটা খুব বিগড়ে আছে। ন্যালাখ্যাপা ছেলেটাকে সবাই ঢিল মারবে কেন বলুন।

ঠিক কথাই তো।

তাই ভাবছি। গিয়ে ছেলেগুলোকে খুব কড়কে দেব।

তাই তো উচিত।

আর নিজের ছেলেটাকেও শেখাব, অন্যে ঢিল মারলে কি করে উলটে ঢিল মারতে হয়।

যোগেন সরল হাসি হেসে বলে, সেও তো উচিত কথাই।

গজপতি বলে, আর এইসব করতে করতেই বাকি জীবনটা চলে যাবে। কী বলেন?

খুব যাবে, খুব যাবে।

যাই তাহলে?

পিলখানার সেই চোদ্দোটা হাতি স্বপ্নে মিলিয়ে গেছে কবে। তেজোময়ী নেই, যোগেন ঘোষও এসে গেল। বাঁশির দম ফুরিয়েছে। তবে আর কী? গজপতি সাইকেলে উঠে পড়ে। জামবনি অনেক দূর। সাইকেলের চাকায় তেমন হাওয়া নেই। মোড়ের দোকানে হাওয়া ভরে নেবে। ন্যালাখ্যাপা ছেলেটাকে বড় ঢিল মারছে ছেলেরা। গাছতলায় দাঁড়িয়ে ছেলেটা হয়তো ''বাবা বাবা'' বলে কাঁদছে।

লামডিঙের আশ্চর্য লোকেরা

লামডিঙে খুবই অদ্ভুত-অদ্ভুত ধরনের ঘটনা ঘটত। এই ছোট্ট শহরে কৃপণ, লোভী, রাগি, চোর, সাধু, ম্যাজিসিয়ান, ডাকাত, সাহসী, ভীতু নানারকমেরই লোক ছিল। সকলেই সকলকে চিনত।

মগন ছিল চোর এবং খুব একটা উঁচু দরের চোরও নয়। প্রায়ই চুরি করতে কারও বাড়ি ঢুকে ধরা পড়ে যেত। সত্যসিন্ধুবাবুর বউ একদিন তাকে রান্নাঘরে ধরে ফেললেন। চুরি করার আগে মগন জালের মিটসেফ থেকে মাছের ঝোল আর ভাত বের করে খাচ্ছিল আপন মনে। খেয়েদেয়ে বাসনপত্র নিয়ে সটকাবার মতলব। ধরা পড়ে যাওয়ায় খুব বিগলিত মুখে বলল, চারটি খাচ্ছি মাসিমা। গরিবের তো এই একটাই দোষ, বড্ড খিদে পায়। সত্যসিন্ধুবাবুর বউ তাতে গললেন না, চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করলেন। লোক জড়ো হয়ে মগনকে নাকে খৎ দেওয়ালো। এতে প্রতিবেশী গগনবাবু একটু অসন্তুষ্ট হয়ে রীতিমতো উঁচু গলায় কালীবাবুকে বললেন মশায় মগনটা একেবারে কাঁচা চোর বটে, কিন্তু চোর তো? এ তল্লাটে ওই মোটে একটাই চোর, তা ও যদি চুরি ছেড়েই দেয় তবে গেরস্তকে সজাগ রাখার আর তো উপায়ই রইল না। চোর ছ্যাঁচড় থাকলে মানুষ সাবধান হতে শেখে, নষ্টচন্দ্রার দিন যে চুরির প্রথা আছে তাও হল ওই জিনিসই। আমি বলি কি, মগন যদি চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েই তবে আমাদের উচিত তাকে হাসিমুখে ক্ষমা করা। মগন আমাদের একটা মৌলিক শিক্ষা তো দেয়। সতর্কতার শিক্ষা।

কালীবাবু কথাটার যুক্তিযুক্ততা মেনেই বোধহয় আমতা-আমতা করে বললেন, মগনের উচিত চুরিটা আরও ভালো করে শেখা। নইলে প্রায়ই ব্যাটা ধরা পড়ে মাঝরাতে আরামের ঘুমটার দফা রফা হয়ে যায়। এ মোটেই ভালো কথা নয়।

গগনবাবু দুঃখ করে বললেন, কে শেখাবে বলুন? সেরকম গুরু কি আর আছে? আমরা ছেলেবেলায় দেখেছি করিম-চোর সামন্ত দারোগার কোমরের বেল্টখানা বাজি রেখে দিনে দুপুরে চুরি করল।

কালীবাবু গম্ভীর গলায় বললেন, দুপুরে দারোগারা খুব ঘুমোয় আর ঘুমোনোর সময় বেল্ট খুলে রাখে। এটা খুব খারাপ অভ্যাস।

গগনবাবু মাথা নেড়ে বললেন, মোটেই নয়। কোমরে পরা অবস্থায় খুলে নিয়ে করিম বাজিকে বাজি জিতল তার ওপর সামন্ত দারোগা। পাঁচ টাকা দিয়ে আশীর্বাদ করে বললেন, জীবনে এরকম চোর আর দেখিনি। তুই ডাকাত হ।

পরদিনই সকালবেলা মগন বাজারে গিয়ে গোপেশ জাদুকরকে ধরল। গোপেশদা, দু-চারটে হাতসাফাই এবারে শিখিয়ে দিন। নইলে ইজ্জত থাকছে না।

গোপেশ যাদুকর লোকটা মজার মানুষ। সময়ে এবং সর্বত্রই সে হাতসাফাই দেখায়। ম্যাজিক ছাড়া সে একদম থাকতে পারে না। বাজার করার সময়েও সে কত সময়ে মাছ, ফুলকপি, আলু বা দোকানে ঢুকে বিস্কুটের প্যাকেট, ক্রিমের শিশি সকলের চোখের সামনেই হাওয়া করে দেয়। তবে মগনের সঙ্গে তার তফাত হচ্ছে, সে আবার জিনিসগুলো ফিরিয়ে দেয়। সে তো চোর নয়।

রোজকার মতোই সে মগনকে বোঝাতে লাগল, চোর যদি জাদুকর হয় বা যাদুকর যদি হয় চোর তাহলে সমাজের ঘোর বিপদ। চুরি করা যদি ছেড়ে দিস তবে শেখাতে পারি।

মগন মাথা চুলকে বলে, আচ্ছা ভেবে দেখি।

আসলে মগনের বিপদ হয়েছে পায়রাকে নিয়ে। পায়রা নামে একটি মেয়ের সঙ্গে তার খুব ভাব। কিন্তু পায়রার বাপ পাঁচশো টাকা পণ চেয়ে বসেছে। সেটা জোগাড় না হলে বিয়ে হওয়ার নয়। পায়রা রোজ খোঁটা দিচ্ছে, হিঃ খুব জানা আছে, কেমন মুরোদের চোর।

মগনকে বিদায় করে গোপেশ নানা মজার কাণ্ড করতে-করতে বাজার সারে। শৈবালবাবু অতি সতর্ক লোক। তার জামার ভিতরে গুপ্ত পকেট, তাতে টাকা রেখে সেফটিফিন দিয়ে আটকে তবে বাজারে আসেন এবং সারাক্ষণ পকেটে হাত চেপে থাকেন। সেই শৈবালবাবু আজ শীতের প্রথম ফুলকপি কিনে দাম দিতে গিয়ে থ'। পকেটে টাকা নেই।

গোপেশ পাশেই দাঁড়িয়ে পালং শাক কিনছিল। একটু হেসে বলল, আরে তাতে কী! আমি কিছু ধার দিচ্ছি কপিটা কিনেই বাড়ি যান।

শৈবালবাবু হেঁ-হেঁ করে কিছুক্ষণ জামার পকেটটা চুলকোলেন। তারপর গোপেশকে বললেন, ইয়ে বুঝলে কথাটা পাঁচ কান কোরো না। ষষ্ঠীপদর সঙ্গে একটা বাজি ধরেছিলুম, যদি কেউ আমার পকেট কখনও মারতে পারে তাহলে পাঁচশো টাকা হারব। যা টাকা গেছে যাক, বাজিটা না হারি।

গোপেশ গম্ভীর হয়ে বলল, তাই বা কেন, টাকাটা তো মনে হয় বেশি দূর যায়ওনি। ওই তো ব্রিজলাল বেগুনওলার কাঁধের গামছাটায় কী যেন একটা বাঁধা আছে, দেখুন তো।

বলাই বাহুল্য ব্রিজলালের গামছায় বাঁধা অবস্থায় শৈবালবাবুর টাকা পাওয়া গেল এবং ব্রিজলাল খুবই অপ্রতিভ হাসি হেসে বলল, গোপেশবাবু, আপনি তো আমাকে জেল খাটিয়ে মারবেন।

বাজার টাজার সেরে গোপেশ যখন ফেরে তখন মোড়ের মাথায় গোলবাড়ির বারান্দায় বসে-থাকা অহীনবাবু তাঁকে ধরবেনই, ও গোপেশ, আরে এসো-এসো এদিকে একটু, মাছটা কী কিনলে একটু দেখিয়ে যাও।

বুড়ো মানুষ বলে গোপেশ বা আর কেউই তাঁকে এড়াতে পারে না। অহীনবাবু বেশ ভোরে উঠে একটু মর্নিংওয়াক সেরে এসেই বারান্দায় দক্ষিণ কোণটায় মোড়া পেতে বসে থাকেন। অহীনবাবুর এই কোণটায় বসবার একটা কারণ হল, ওদিকটায় বড়লোক আশুতোষ ঘোষের বাড়ির রান্নাঘর। সকাল থেকেই রান্নাঘরের নানারকম ভালো ভালো গন্ধ আসতে শুরু করে। রুটি সেঁকার গন্ধ, ডিম ভাজার গন্ধ, মাংসের গন্ধ, মাছের কালিয়া বা পোলাওয়ের গন্ধ। অহীনবাবু নিজের পয়সায় ভালো জিনিস কখনওই খান না। কিন্তু গন্ধের নেশায় তাঁর অর্ধেক খাওয়া হয়ে যায়। তাঁর আর এক নেশা হল, কে কী কিনে আনছে বাজার থেকে তা দেখা।

বসে বসেই হাঁক মারেন, ওহে ও শিকদার, বলি সব ভালো তো? তা মাছটা মনে হয় আজ জব্বর কিনেছ! মুখখানা তোমার বেশ হাসিহাসি দেখছি যেন। দেখি-দেখি, আমরাও একটু হাসি।...বাঃ বাঃ এ যে সরল পুঁটি গো, ভারী তেলালো মাছ, একটু সর্ষেবাটা আর কাঁচা লঙ্কা দিয়ে রাঁধতে বোলো বউমাকে। এক্কেবারে চাকুম চাকুম লেগে যাবে'খন।...আরে মুখুজ্জেমশাই নাকি? প্রাতঃপেন্নাম। আজও কি কাটাপোনা নাকি? থলেটা একটু ফাঁক করুন দাদা, আপনার কাটাপোনাকে একটা গুডমর্নিং জানিয়ে দিই। ব্রাহ্মণের ভোগে লাগবে, ব্যাটার কপালটা ভালোই।...আরে আরে কে ও? কালী না? বলি পালাচ্ছ কোথায়, তোমার মাছ না দেখে কি ছাড়ব?...ও বা-বা এ যে দেখছি ফুলকপি আর কই মাছ। আজ তো একেবারে খুনখারাপি করে ফেলেছ হে...সবাই চলেটলে গেলে অহীন ধীরে সুস্থে বাজারে বেরোন। বেশি বেলায় বাজারে তেমন কিছু থাকে না। ঝড়তি পড়তি যা পান

সস্তায় কেনেন। কপি পাতাটাতা অনেক সময় দোকানিরা ফেলে দেয়। অহীনবাবু সকলের অলক্ষ্যে তাও কয়েকটি কুড়িয়ে নেন।

এই সময়ে বাজারে অহীনবাবুর সঙ্গে প্রায় দিনই বিধুবাবুর দেখা হয়ে যায়। বিধুবাবু লোকটার ভারী ভুলো মন। সকালবেলায় বাজারে তিনি প্রায়দিনই কিছু না কিছু হারিয়ে যান। হয় পয়সা, না হয় চশমা, কিংবা ঘড়ি, অথবা পকেটের পেন, কখনও পায়ের এক পাটি চটি, কোনওদিন রুমাল, কিংবা মাছের থলে। সেটা আবার খুঁজে দেখতে তাকে বাজারে ফিরতে হয়।

বিধুকে দেখেই অহীনবাবু হাঁক দেন, বলি ও বিধু, বাজারে আবার দেখছি যে! কিছু ফেলে গেছ নাকি? আচ্ছা তুমি সবসময়ে এত কী ভাব বলো তো!

বিধু মাথা চুলকে বলেন, ভাবছি দুনিয়াটার হচ্ছেটা কী।

কেন দুনিয়াটার কী এমন হচ্ছে। এই তো আজও পূর্বদিকে সূর্য উঠেছে। মাছের দাম বেড়েছে। শীতকালে শীত বেড়েছে।

বিধুবাবু তবু মুখটা গোমড়া করে বলেন, তবু দুনিয়াটার একটা কিছু হচ্ছে।

অহীনবাবুর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, তা হবে।

গল্পগুজব করতে-করতে অহীনবাবু আর বিধুবাবু যখন ফেরেন তখন প্রায়ই রসো পাগলা এসে অহীনবাবুর পথ আটকায়, এই যে বাবু, কিছু ভিক্ষে দিবেন?

রসো পাগলাকে দেখলে অহীনবাবু ভারী বিব্রত বোধ করতে থাকেন। বলেন, আঃ, যাও যাও, অন্যদিকে দ্যাখো।

রসো ছাড়ে না। পিছু-পিছু আসতে থাকে আর খিকখিক করে হাসে আর বলে, জীবনে একটা দিন দিয়ে দেখুন, মনটা কেমন ফুরফুরে লাগবে, গান গাইতে ইচ্ছে করবে, গিন্নিমা মুখ করবেন না।

আঃ যাও না হে, বলছি তো নেই।

রসো বিড় বিড় করতে থাকে, না দিলে আজ আপনার ডাল সেদ্ধ হবে না, মাছে নুন বেশি পড়ে যাবে, গলায় কাঁটা ফুটবে...

গোটা লামডিঙে রাসো পাগলাই একমাত্র লোক যে চাঁদ দেখলেও খুশি হয়, অমাবস্যাতেও আনন্দে গান গেয়ে ঘুরে বেড়ায়। সে রোদেও খুশি বৃষ্টিতেও তার আহ্লাদ।

শীত, গ্রীষ্ম সব ঋতুতেই তার মন নাচে। সর্বদাই রসো খুশি বটে, কিন্তু খিদে পেলে ভারী রেগে যায়।

রসোর খিদে পায় সকালেই। ঘুম থেকে উঠেই সে যে-কোনও বাড়ির সামনের রাস্তায় পায়খানা করে সেই বাড়ির উদ্দেশ্যে তর্জন গর্জন করতে থাকে, সব তো বেরিয়ে গেল, এখন ভিতরটা ফাঁকা হয়ে গেছে না? নিজেরা তো দিব্যি সাঁটছ, রসোর কথা একটু ভাবতে হবে না?

লোকে রসোর নোংরামি দেখে চটে যায় বটে, কিন্তু তাদের অভ্যাসও হয়ে গেছে। খেতে দিলে অবশ্য রসো নিজেই নোংরাটা সাফ করে দেয়।

দুপুরে রসো খায় জৈনদের লঙ্গরখানায়। রাতে এঁটো-কাঁটা জুটে যায়। খাওয়ার সময়টুকু বাদ দিলে রসো ভারী আনন্দে আছে। রাত্রিবেলা সে গিয়ে নয়নসাধুর আখড়ায় পড়ে থাকে। আর ভূতেরা নাকি তার গা-হাত-পা টিপে দেয়।

বলাই বাহুল্য লামডিঙের মতো জায়গায় ভূত না থাকলে যেন মানায় না। বাস্তবিক লামডিঙে ভূতের এতই বাড়বাড়ন্ত এবং খ্যাতি ছিল যে, নানা জায়গা থেকে অনেক সাধু তান্ত্রিক আর ফকির ভূত ধরতে লামডিঙে চলে আসত। বিশেষ করে শীতে আর বর্ষায় নাকি ভূতেরা চারদিক গিজগিজ করে। করবেই। কারণ, বর্ষায় আর শীতেই বুড়ো আর থুত্থুড়েরা খুব মরে। তাই তো ভূত হয়ে চারদিকে ঘোরে।

বেশি নয়, নয়নসাধু মোট পাঁচটা ভূত ধরেছিল। তার মধ্যে একটা হল খাঁটি মেম সাহেব। নয়নসাধু কথাটা খুব বড়াই করে বলেও বেড়ায়, আমার পাঁচজনের মধ্যে একটা মেম বুঝলি? মাটির তলা থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এসে আর একটা কবরের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে কাকে যেন খুব আদর করছিল। আমি গিয়ে খপ করে চুলের ঝুঁটি চেপে ধরে বললাম, কী রে মেম, এখানে কী হচ্ছে? অমনি হাউমাউ করে কেঁদে উঠে বলল, সাধুবাবা, আমি আমার ছেলেকে আদর করছি। মাত্র তিন বছর বয়সে মরে গিয়েছিল কলেরায়—তা মেমটার জন্য দুঃখ হল। ছেলের আত্মা তো স্বর্গে চলে গেছে। নিষ্পাপ শিশু, তার আত্মা তো আর পাপের দুনিয়ায় পড়ে থাকবে না। সেই থেকে মেমটাকে বুঝিয়েসুঝিয়ে রেখেছি পুষে।

মেমভূতটাকে নয়নসাধু ধরলেও মল্লিকবাবুদের বাড়ির ঘড়িরামকে সে ধরতে পারেনি। ঘড়িরামকে ধরা অত সহজও ছিল না। ঘড়িরাম যখন জীবিত ছিল তখন একটাই নেশা ছিল তার। ঘড়ির নেশা। খুবই গরিব ছিল বলে ঘড়িরামের পক্ষে ঘড়ি কেনা ছিল দুঃসাধ্য। সে কুলির কাজ করত রেল স্টেশনে। কী করে এবং কেনই বা যে তার ঘড়ির শখ হল

বলা মুশকিল তবে ছোট্ট একটা কাচে ঢাকা বাক্সর মধ্যে তিনটে কাঁটা ঘুরছে এ দৃশ্য দেখলে সে মুগ্ধ হয়ে যেত। শোনা যায়, ঘড়িরাম বিস্তর মেহনত করে না খেয়ে পয়সা জমিয়ে বহুদিনের চেষ্টায় সস্তায় একটা ঘড়ি কিনেছিল এক জুয়াড়ির কাছ থেকে। কিন্তু যেদিন ঘড়িটা সে কেনে তার পরদিনই পুলিশ এসে তাকে চুরির দায়ে ধরে নিয়ে যায়। ঘড়িরামকে জেল খাটতে হয়েছিল ক'মাস। জেল থেকে বেরিয়ে এসেই ঘড়িরাম অন্য মূর্তি ধরল। বিনা দোষে জেল খাটার শোধ তুলতে সে এমন ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল যে, লামডিংকে প্রায় ঘড়িশূন্য করে দিয়েছিল সে। ছোরা নিয়ে সন্ধের পর সে বিভিন্ন রাস্তার মোড়ে অপেক্ষা করত এবং যে যেত তারই হাতের ঘড়ি কেড়ে নিত। মোট তিন হাজার সাতশো সাতষট্টিটা ঘড়ি সে সংগ্রহ করে মল্লিকবাবুদের পরিত্যক্ত বাড়ির মাটির নিচে জমিয়ে রেখেছিল। অবশেষে পুলিশ তার সন্ধান পেল এবং বাড়ি ঘিরে ফেলল। ঘড়িরাম পালানোর চেষ্টা করল না, আত্মসমর্পণও করেনি। সে ছোরা হাতে পুলিশকে তেড়ে এল মারতে। ফলে পুলিশের গুলিতে সে মরে গেল। কিন্তু আশ্চর্য এই যে মরে পড়ে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই ঘড়িরামের শরীর থেকে একটা বায়ুভূত ঘড়িরাম বেরিয়ে এসে পুলিশকে তাড়া করল। দ্বিতীয় ঘড়িরামের তাড়া খেয়ে পুলিশ পালাতে পথ পেল না। সেই থেকে মল্লিকবাবুদের বাড়ির ধারেকাছে কেউ ঘেঁষে না। কিন্তু আশপাশ দিয়ে দিনের বেলা যারা যায় তারা তিন হাজার সাতশো সাতষট্টিটা ঘড়ির সমবেত টিকটিক আওয়াজ শুনতে পায়।

টিকটিক শব্দটা অবশ্য লামডিঙে নতুন কিছু নয়। বরং এ শব্দ লামডিঙের একটি অতি পরিচিত শব্দই বলা যায়। ছোট্ট একধরনের টিনের খেলনা আছে যা হাতের তলায় লুকিয়ে নিয়ে চলা যায়, টিনের একটু পাত আছে সেটাতে আঙুলের চাপে টিকটিক করে শব্দ করে।

ফুলু নামে একটা মেয়ে রোজ তার বাড়ির জানালা দিয়ে নন্টু নামে একটা ছেলেকে দেখতে পেত। নন্টু বেশ ভালো ছেলে, কোনওদিকে তাকায় না, ক্লাসে ফার্স্ট হয়, প্রাইজ পায়। দেখতেও সুন্দর। কিন্তু ফুলুর খুব ইচ্ছে নন্টু একটু তার দিকে তাকাক। ফুলুও দেখতে খুব সুন্দর, কিন্তু পোলিও রোগে তার দুটো পা এমনভাবে কুঁকড়ে গিয়েছিল যে, দোতলা থেকে সে নামতেই পারত না। ফুলুই একদিন ফেরিওয়ালার হাতে ওই খেলনার শব্দ শুনে একটা কিনে নেয়। নন্টু যেই যেত অমনি বাজাত। নন্টুও দোতলার দিকে তাকাত। চোখাচোখি হত দুজনে। ফুলুও হাসত, নন্টুও হাসত। ফুলু হাসত আনন্দে উত্তেজনায়, নন্টু হাসত করুণায়।

কিছুদিন পরেই নন্টু পাশ করে বড় শহরে পড়তে চলে গেল এবং ফুলু খেলনাটা অবহেলায় ফেলে রাখল বিছানার পাশে টেবিলে। সেখান থেকে সেটা একদিন নিয়ে নিল

তার ছোট ভাই টুলু।

টুলু খেলনাটা বাজিয়ে তার ঘুমন্ত মাকে চমকে দিত। কুকুর বেড়ালকে ভয় দেখাত। তারপর সে একদিন সেটার প্রতি আকর্ষণ হারিয়ে ফেলল। টুলু ও ফুলুর বাবা ও মার মধ্যে একদিন বেশ ঝগড়া হল। কথা বন্ধ হয়ে গেল কিন্তু টুলুর বাবার চা চাই, জল চাই, সময় মতো ভাত চাই। অথচ কথা বন্ধ। ওদিকে টুলুর মার হয়তো দোকান থেকে কিছু আনাতে হবে বা অসময়ে টাকার দরকার পড়েছে। টুলুর বাবা হঠাৎ হাতের কাছে টিকটিক খেলনাটা পেয়ে সেটা বাজালেন এবং তাঁর বউও সংকেত বুঝে চা বা জল দিয়ে গেলেন। খেলনাওলা আবার আসায় টুলুর মাও ওরকম একটা খেলনা কিনে কাছে রাখলেন। দুজনের মধ্যে প্রায়ই ভাব ঝগড়া এবং আবার ভাব হয়। কিন্তু ঝগড়া হলেই দুজনে ওই যন্ত্রের সাহায্যে পরস্পরকে সংকেতবাক্য পাঠাতে থাকেন।

দেখাদেখি আরও স্বামী স্ত্রীরাও অনুরূপ খেলনা কিনে ফেললেন। খেলনাটার নাম দেওয়া হলো কটকটি।

তারপর থেকে লামডিঙে টিকটিক শব্দের আর কোনও অভাব রইল না। সর্বত্র এবং প্রায় সর্বদাই টিকটিক শোনা যেতে লাগল।

এই শব্দই একদিন ব্রজেশ্বরকে তাঁর ঘরের বাইরে টেনে আনল।

ব্রজেশ্বর বসু যে লামডিঙে থাকেন এটা অনেকের জানা ছিল বটে, কিন্তু মানুষটা গত বিশ বছর তাঁর ঘর থেকে বেরোননি। বাজার-হাট দোকানপাট কোথাও তাঁকে কখনও দেখা যায় না। তাঁর বাজার হাট করেন প্রৌঢ়া স্ত্রী। ব্রজেশ্বর তাঁর ঘরে বসে গত বিশ বছর যাবৎ একটানা সৃষ্টিতত্ব বিষয়ে একটা গুরুতর গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন বলে কেউ কেউ শুনেছে। তবে মানুষটাকে কেউ চোখে না দেখতে পাওয়ায় মোটামুটি তাঁর কথা সবাই ভুলে গিয়েছিল।

সেদিন রাতে চোর মগন এসে পায়রার জানলার কাছে দাঁড়িয়ে কটকটি বাজিয়ে তাকে সংকেতে ডাকছিল। চুরি করতে বেরোনোর আগে পায়রার সঙ্গে রোজই সে দেখা করে যায়। গগনবাবুর সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর ঝগড়া চলছে কিছুদিন। গগনবাবু কটকটি বাজিয়ে তাঁর স্ত্রীর কাছে ভাত চাইছিলেন। কালীবাবুর বাড়িতে বেড়ালে দুধে মুখ দিয়েছে বলে তাঁর ছেলে বাবু আনন্দে কটকটি বাজাচ্ছিল। আজ রাতে তাকে আর দুধ খেতে হবে না।

কাছাকাছি এতগুলো কটকটি একসঙ্গে বেজে ওঠায় ব্রজেশ্বর দীর্ঘ বিশ বছরের মধ্যে এই প্রথম সচকিত হলেন। তাঁর মনে হল, একটা কোনও বিপর্যয় আসন্ন। তিনি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলেন। বেরিয়ে এসে তিনি দেখলেন, পৃথিবীটা বিশ বছরে অনেক পালটে গেছে।

যেখানে গাছ ছিল সেখানে বাড়ি উঠেছে, যেখানে মাঠ ছিল সেখানে রাস্তা হয়েছে। সেদিন খুব ফুটফুটে জ্যোৎস্না ছিল। ব্রজেশ্বর মুগ্ধ হয়ে চারিদিকটার দৃশ্য দেখতে লাগলেন এবং ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

তাঁদে দেখে পায়রা 'ভূত-ভূত' বলে চিৎকার করে অজ্ঞান হয়ে গেল এবং মগন 'রাম-রাম' বলতে বলতে প্রাণভয়ে ছুটে পালাল। মগনের কটকটি যন্ত্রটা পড়ে গিয়েছিল, ব্রজেশ্বর সেটা কুড়িয়ে পেলেন এবং বাজিয়ে দেখলেন। গত বিশ বছর তিনি ঘরের বাইরে আসেননি। তাই তিনি জানেন না, মানুষ এই ক'বছরে কী কী আবিষ্কার করেছে। তিনি দেখে খুবই বিরক্ত হলেন যে, মানুষ এই বিশ্রী যন্ত্রটা আবিষ্কার করেছে। কটকটিটা হাতে নিয়ে তিনি আনমনে হাঁটতে লাগলেন।

সামনেই একটা ভাঙা বাড়ি এবং পরিত্যক্ত বাগান। বাগানের ধারে তিনি এক যুবক এবং একটি যুবতীকে খুব ঘনিষ্ঠভাবে দাঁড়িয়ে কথা বলতে দেখলেন। যুবক এবং যুবতীরা জ্যোৎস্না রাতের নির্জনতায় দাঁড়িয়ে কী করতে পারে তা ব্রজেশ্বর চিন্তা করলেন না। তিনি সোজা গিয়ে তাদের সামনে হাজির হয়ে কটকটিটা বাজিয়ে ক্রুদ্ধস্বরে বলতে লাগলেন, মানুষ গত বিশ বছরে এইসব আবিষ্কার করে দুনিয়াটাকে উচ্ছন্নে দিচ্ছে আর তোমরা এখানে নিশ্চিন্তে দাঁড়িয়ে ফিসফাস করছ?

যুবতীটি জলভরা চোখে যখন ব্রজেশ্বরের দিকে ফিরে চাইল তখন ব্রজেশ্বর অবাক হয়ে দেখলেন মেয়েটি মেমসাহেব। মেয়েটি ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। ছেলেটা ব্রজেশ্বরের দিকে কটমট করে চেয়ে বলল, আমরা দুঃখের কথা বলছিলাম আর আপনি এসে সব ভণ্ডুল করে দিলেন। মানুষ কী করেছে তা আমরা জানি না। জানতে হলে মানুষদের কাছে যান। আমরা মানুষ নই।

ব্রজেশ্বর অবাক হয়ে বললেন, তবে তোমরা কী?

আমি ঘড়িরাম আর এ হচ্ছে মেরি, আমরা দুজনে দুজনকে ভালোবাসি। ব্রজেশ্বর ভালোবাসা কথাটার তেমন মানেই জানেন না, মাথা চুলকে বললেন, ও তা সে বেশ তো।

কিন্তু মনে-মনে ব্রজেশ্বর খুব ভাবতে লাগলেন, ভালোবাসা জিনিসটা গোল না চৌকো, লাল না সবুজ। ঘড়িরাম আর মেরি সেই জ্যোৎস্নারাত্রে ব্রজেশ্বরকে পেয়ে তাদের দুঃখের কথা বলতে লাগল। ঘড়িরাম মেরিকে বিয়ে করতে চায়, কিন্তু নয়নসাধু বলেছে ঘড়িরাম তিন হাজার ঘড়ি পণ না দিলে সে কিছুতেই মেরিকে ছাড়বে না। অথচ ঘড়ি ঘড়িরামের প্রাণ।

অনেকক্ষণ ধরে শোনার পর ব্রজেশ্বরের মাথা হঠাৎ পরিষ্কার হয়ে গেল, ভালোবাসা জিনিসটা তিনি ভুলেই গিয়েছিলেন, বহুকাল পর স্মৃতিপটে আবার সেসব ভেসে উঠল। ঠিকই তো, তিনিও তাঁর বউকে একসময় ভালোবাসতেন। তারপর সৃষ্টিতত্ত্বের পাল্লায় পড়ে জিনিসটা একদম উবে গিয়েছিল মন থেকে।

ব্রজেশ্বর আর দাঁড়ালেন না। প্রায় দৌড়ে বাড়ি ফিরে এসে দেখলেন তাঁর প্রৌঢ়া স্ত্রী ঘুমোচ্ছেন। মুখখানায় দুঃখ-দুর্দশার ছাপ পড়েছে বটে, কিন্তু এখনও লক্ষ্মীশ্রী লেগে আছে। বউকে ঘুম থেকে জাগিয়ে একটু আদর করতে ইচ্ছে করছিল তাঁর। কিন্তু বহুকাল বউকে ডাকেননি বলে নামটিও মনে আসছিল না।

হঠাৎ হাতের কটকটির দিকে নজর পড়ায় হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন ব্রজেশ্বর। বউয়ের কানের কাছে কটকটিটা নিয়ে বাজাতে লাগলেন।

বহুদিন বাদে সেই রাতে দুজনের খুব ভালোবাসা হল। তাঁরা দুজনেই খুব হাসলেন, একটু কাঁদলেনও, অনেক জমা কথা ছিল, সেগুলোও বলতে লাগলেন। কথার ফাঁকে কৌশলে বউয়ের নামটাও জেনে নিলেন ব্রজেশ্বর। উমা। নামটা তাঁর বেশ পছন্দই হল। আর সবচেয়ে বড় কথা, কটকটি জিনিসটাকে তাঁর আর অপছন্দ হল না। খুবই উপকারী জিনিস। মানুষের অনেক কাজে লাগে।

পরদিন থেকেই ব্রজেশ্বরকে পথে ঘাটে হাটে বাজারে সর্বত্র দেখা যেতে লাগল। হাতে কটকটি। যখন তখন বাজাচ্ছেন। লোকে জ্বালাতন হয়ে গেল।

লামডিঙের লোকের অবশ্য জ্বালাতনের অভাব ছিল না। কোজাগরী পূর্ণিমায় লামডিঙের আশেপাশে বনের মধ্যে যেসব সাদা সুন্দর ডল পুতুলের মতো পরিরা নেমে আসত, তাদের কথা সকলেই জানে। লামডিঙের পরিদের মতো সুন্দর পরি অন্য কোথাও দেখা যায় না। তারা বুনো ফুলের মধু খেত ঘুরে-ঘুরে উড়ে-উড়ে। বাতাসে ভেসে তারা কতরকমের নাচের মুদ্রা তৈরি করত। চারদিকটা ভরে উঠত তাদের গায়ের আশ্চর্য সুগন্ধে।

কিন্তু জ্বালাতন এল অন্য দিক থেকে। ভিন্ন গ্রহের যেসব প্রাণী মহাকাশ থেকে প্রায়ই লামডিঙের বনে বাদাড়ে তাদের বেলুনের মতো বা চুরুটের মতো বা পিরিচের মতো মহাকাশযানে করে নামত তাদের সঙ্গে কারও কখনও ঝগড়া বিবাদ বা যুদ্ধ হয়নি। তারা নেমে এসে লামডিঙের সরস সতেজ ঘাস কেটে নিয়ে যেত, ছিঁড়ে নিয়ে যেত লেবু বা করমচার পাতা। তাদের চেহারা খুবই অদ্ভুত, পোশাকও অন্যরকম। লামডিঙের লোকেরা তাদের দূর থেকে দেখত। কাছে যেত না। শুধু রসো পাগলা গিয়ে তাদের কছে বিড়ি

চাইত। ভিন্ন গ্রহের প্রাণীরা যে বিড়ি খায় না এ তো সকলেই জানে। তবে তারা ঘাস ও গাছের পাতা খেতে খুবই ভালোবাসে। ভিন্ন গ্রহের একজন প্রাণী একবার সত্যসিন্ধুবাবুর নাতনির হাত থেকে রসগোল্লা কেড়ে নিয়ে খেয়েছিল বলে শোনা যায়। এবং রসগোল্লা খাওয়ার পরই সে সম্পূর্ণ মাতাল হয়ে টলতে-টলতে কোনওরকমে তার মহাকাশযানে ফিরে গিয়েছিল। একবার তাদের নজর পড়ল ওই পরিদের দিকে। সেবার কোজাগরী পূর্ণিমার দিনে যখন পরিরা এসে জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে আনন্দ করছে তখন অনেকগুলো মহাকাশযান চারদিকে নেমে এল এবং ভিন্ন জগতের প্রাণীরা দলে-দলে জালদড়ি আর আঠাকাঠি নিয়ে এল পরিদের ধরতে। তারপর বনের মধ্যে সে কী হুর যুদ্ধ!

রসো পাগলাই প্রথম খবরটা দিল সবাইকে ছুটে এসে। লামডিঙের লোকেরা খুব বীর নয়, কিন্তু পরিরা হল তাদের নিজেদের ছেলেমেয়ের মতো। লাঠিসোঁঠা নিয়ে তারাও ছুটল পরিদের বাঁচাতে।

কিন্তু ভিন্ন গ্রহের প্রাণীরা অনেক বেশি শক্তিশালী ও বুদ্ধিমান। তারা নানারকম অস্ত্রশস্ত্র বের করে ভয় দেখাতে লাগল। অন্যদিকে পরিরা তখন প্রাণপণে ছুটোছুটি করছে। আর একদল ভিন্নগ্রহের প্রাণী তাদের নানা কলাকৌশলে ঝপাঝপ ধরে ফেলছে।

এই যখন অবস্থা তখন হঠাৎ ঘড়িরাম কোথা থেকে এসে হজির হল। তার হাতে ছোরা। সঙ্গে মেরি, মেরির হাতে একগাছা ঝাঁটা। তারপর সে এক লণ্ডভণ্ড কাণ্ড। ভিন্ন গ্রহের প্রাণীরা যতই গুলি করুক আর রশ্মি ছুঁড়ুক ঘড়িরামের কিছুই হয় না। কিন্তু ঘড়িরামের পরাক্রমে তাদের নাজেহাল অবস্থা। মেরির ঝাঁটাও কম গেল না। নয়নসাধুর পাঁচটা ভূতও এসে হাত লাগাল। তাদের চেহারা রোগা এবং ধোঁয়াটে হলেও ভিন্ন গ্রহের প্রাণীরা তাদের কাছে গো-হারান হেরে পালাল।

পরিরা আবার খেলতে লাগল বনের মধ্যে।

লামডিঙের গল্প সহজে শেষ হওয়ার নয়। এক গল্প থেকে আর একটা গল্পে এবং তা থেকে আর এক গল্পে চলে যেতে কোনও বাধা নেই। চোর সাধু ম্যাজিসিয়ান লোভী কৃপণ সবরকমের মানুষ এবং অমানুষ নিয়ে লামডিং। নিত্যই সেখানে নতুন-নতুন সব ঘটনা শুরু হচ্ছে। কিন্তু সব ঘটনাই যে শেষ হচ্ছে এমন নয়। আসলে পৃথিবীর কোনও গল্পই বোধেহয় পুরোপুরি শেষ হয় না। নানা শাখাপ্রশাখায় তা ছড়িয়ে যেতে থাকে। কিন্তু আমাদের তো এক জায়গায় থামতেই হবে।

নবদুর্গা

গ. দুইতে নারু আসছে ওই যে। বৈষ্ণবদীঘির পার দিয়ে বাঁশতলা পেরিয়ে। ভারী সুন্দর জায়গা ওটা। মিষ্টি তেঁতুলের একটা সার আছে ওখানে। সে ভারী সুন্দর তেঁতুল, পাকলেই মিষ্টি। কিন্তু সেটা বড় কথা নয়। এই বিকেলের দিকে গড়ানে রোদ্দুরের আলোয় ওই তেঁতুলবনে যে আলোছায়ার চিকরিমিকরি তৈরি করে তা যেন রূপকথার মতো।

এ-বাড়ির সবাই গরু দুইতে পারে। তবু নারুকে আসতে হয় লছমীর জন্য। ভারী দুষ্টু গরু। জগা খুড়ো বলে, বাপ রে, ও হল লাথ মারুয়া গরু, ওর কাছে যেতে আছে? অথচ লছমী দুধ দেয় এককাঁড়ি। আবার লাথি বা ঢুঁসো মারতেও কসুর করে না। কিন্তু নারুর কাছে তার মাথা হেঁট। তার কাছে কোনও জারিজুরি খাটে না। নারু খুব যত্ন করে লছমীর পিছনের পা দুটো গামছা দিয়ে বাঁধে। তারপর পেতলের বালতিতে চ্যাংচুং শব্দে দুধ দোয়ায়। লছমী চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে, একটুও দুষ্টুমি করে না।

আচ্ছা নারুদাদা, তোমাকে কি লছমী ভয় পায়?

নারু হাসে। বলে, না রে পাগলি, ভয় পাবে কেন? ও আমাকে ভালোবাসে।

তা তোমাকেই বাসে, আর আমাদের বাসে না কেন? আমরা তো ওকে খড় বিচালি দিই, জাবনা দিই, ভাতের ফ্যান তরকারির খোসা খাওয়াই, কত আদর করি গলকম্বলে হাত বুলিয়ে।

কোনও-কোনও গোরু ও রকম হয়।

জগা খুড়ো বলে, তুমি নাকি মন্তরতন্তর জানো।

খুব হাসে নারু, শোন কথা। মন্তরতন্তর কোথা থেকে জানব? আমাদের কি তত ক্ষমতা আছে? জগা খুড়ো হলো মাথা-পাগলা মানুষ, কত কী বলে।

নবদুর্গার খুব ইচ্ছে করে লছমীর সঙ্গে ভাব করতে। ইচ্ছে হবে না-ই বা কেন? কী সুন্দর দেখতে লছমী! দুধসাদা রঙের ওপর কালো ছোপ। তেমনি মায়াবী দু-খানা চোখ। বলতে নেই, লছমী বেশ বড়সড় গরু, তেজও তেমনি। নবদুর্গার সঙ্গে কি তা বলে লছমীর ভাব নেই? আছে। লছমী যখন মাটির কালো গামলায় জাবনা খায় তখন তো নবদুর্গাই জাবনা নেড়ে চেড়ে দেয়। তখন গলায় হাত বোলালে লছমী ভারী আরাম পায়। কিন্তু তাদের অন্য আর পাঁচটা গরু যেমন মাটির মানুষ আর বাধ্যের মানুষ, ডাকলেই কাছে আসে, লছমী তেমনটি নয়। আর এই যে নারুদার ওপর লছমীর একটু পক্ষপাত এতেও নগদুর্গার একটু হিংসে আছে। হিংসে হবে না, বলো! এত ভালোবাসে সে লছমীকে, আর লছমী কিনা অমন!

নবদুর্গার একটু হিংসে টিংসে আছে বাপু। ওই যে তার খেলুড়ি বন্ধুরা এসে জামতলায় জড়ো হয়েছে ওদের মধ্যে যেমন তোটন আর রমলা তার খুব বন্ধু অন্যরা কি তেমন? তোটনের সঙ্গে পুষ্পর যদি বেশি ভাব দেখতে পায় নবদুর্গা তবে তার হিংসে হয়। কেন, তা কে বলবে।

তোটন অবশ্য বলে, তোর একটুতেই বড্ড গাল ফোলে।

তা ফোলে বাপু, নবদুর্গা মিথ্যে কথা বলতে পারবে না।

জগা খুড়ো ওই যে আছে তার দাওয়ায় এক কোণটিতে। নগদুর্গাদের মস্ত উঠোন। তাও একটা নয়, চারখানা। বেশির ভাগই মাটির ঘর। একতলাও আছে, দোতলাও আছে। হালে একখানা পাকা দোতলাও উঠেছে ওই ধারে। জগা খুড়ো এ-বাড়ির কেউ নয়, আছে মাত্র। তিন কুলে কেউ নেই। ঘরে বসে নানারকম কিম্ভুত ওষুধ, আচার এ সব বানায় আর ধর্মের বই পড়ে। এই যে বিকেলটি হয়ে আসছে, এই সময়টায় জগা খুড়ো এসে দাওয়ায় বসবে মাদুর পেতে। সামনে একখানা জলচৌকি, কত কী পাঠ করে সুরেলা গলায়। সন্ধের পর জগা খুড়োকে ঘিরে বাড়ি আর পাড়ার বউ-ঝি আর বুড়ো-বুড়িদের জমায়েত হয়। জগা খুড়ো একদিন তাকে বলেছিল, নরক কা মূল অভিমান। তোর অত কথায়-কথায় গলা ফোলে কেন রে? ওরকমটা ভালো নয়।

তা কী করবে নবদুর্গা? তার যে হয়! নরক কা মূল অভিমান—কথাটা মনে হলে তার একটু ভয়ও হয়। তার যে কথায় কথায় গাল ফোলে ভগবান? তবে কি নরকেই যেতে হবে তাকে? মাগো! বাজিতপুরের হাটে নরকের একখানা বড় পট দেখেছিল নবদুর্গা। পাজি মেয়েদের কী দুরবস্থা বাবা! ফুটন্ত হাঁড়িতে ফেলছে একজনাকে তো অন্যজনকে চুলের মুঠি ধরে গদা দিয়ে পেটাচ্ছে। একজনকে তো ন্যাংটো করে—মাগো!

দুধে ভরা পেতলের বালতিটা নারুদার হাত থেকে নিতে-নিতে কে জানে কেন নগদুর্গা বলে ফেলল, তুমি খুব ভালো লোক নারুদাদা।

নারু হেসে লজ্জার ভাব করে বলে, শোনো কথা। আমরা কেমন করে ভালো লোক হতে পারি বলো। আমাদের কি জ্ঞান আছে? অজ্ঞানী যে বড্ড।

তুমি নিশ্চয়ই ভালো লোক, নইলে কি লছমী তোমাকে অত ভালোবাসত?

এটা কোনও কথা হল নবদিদি? গরু দিয়ে কি মানুষ চেনা যায়? তোমার যেমন কথা!

খেলুড়িরা সব জামতলায়। পেতলের বালতিটা ভাঁড়ারঘরে মায়ের কাছে পৌঁছে দিয়ে নবদুর্গা বলল, খেলতে যাচ্ছি মা!

দিন-রাত খেলা আর খেলা। কীসের খেলা রে? ধিঙ্গি-ধিঙ্গি মেয়েরা বসে-বসে কেবল গুজগুজ ফুসফুস। ওটা খেলা নাকি?

কথাটা মিথ্যে নয়। আজকাল তারা একটু পেকেছে। আগে যেমন পুতুলে খেলা, এক্কা-দোক্কা, চোর-চোর, গোল্লাছুট ছিল এখন আর তেমনটি ইচ্ছে যায় না। বসে-বসে গল্প করতেই ভালো লাগে। হ্যাঁ বটে, তার মধ্যে আজকাল রসের কথাও কিছু থাকছে।

সে কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলল, যাই না মা!

মা একবার কঠিন চোখে তার দিকে চেয়ে বলল, কাল তোমাকে দেখতে আসছে গোবিন্দপুরের লোকেরা। কথাটা মনে রেখো। শেফালীকে বলে দে কাল সকালে নাপতেবুড়ি এসে যেন তোর পা ঝামা ঘষে পরিষ্কার করে দিয়ে যায়, আর বিকেল-বিকেল এসে খোঁপা বেঁধে দিয়ে যাবে।

পাত্রপক্ষের কথা নবদুর্গা জানে। এর আগেও দুটো পক্ষ এসে দেখে গেছে। এক পক্ষ পছন্দই করেনি, আর-এক পক্ষ পছন্দ করলেও দেনা-পাওনায় মেলেনি।

বিয়ের কথা ভাবতে যে তার ইচ্ছে হয় না তা নয়। কিন্তু ওই যে একলাটি সে এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে, অচেনা এক মানুষ আঁচলে গেরো দিয়ে টেনে নিয়ে যাবে তাকে এ কথা ভাবলে বুকে একটা কষ্ট হয়। মা, বাবা, ভাই, বোন, খেলুড়ি বন্ধুরা, ভুলো কুকুর কিংবা টেনি বেড়াল, এই গাঁ, ওই ষষ্ঠীতলা, আর ওই যে মিষ্টি তেঁতুলের ঝিরিঝিরি ছায়া, লছমী বা রাঙা গাই, এদের সবাইকে ফেলে যেতে হবে তো। তার কাছে সবাই মানুষের মতো। এমন কি বেড়াল, কুকুর, গাছ, গাঁ সব সব সব। এদের ছেড়ে গিয়ে সে কি বাঁচবে?

মায়ের যখন মেজাজ ভালো থাকে তখন মা বলে, বাঁচবি রে বাঁচবি। মেয়ে হয়ে জন্মেছিস তো পরের ঘরের জন্যই। এ জন্যই তো মেয়ে দিয়ে বংশরক্ষা হয় না। না বাঁচে কে বল তো! এই তো আমি কেমন বেঁচে আছি দেখছিস না। সব ছেড়ে আসিনি আমি? আবার সব পেয়েছিও তো!

সাঁজবেলাতে এমনিতেই মন একটু খারাপ হয়। পাত্রপক্ষের কথা শুনে আরও একটু হল। গোবিন্দপুর কেমন গাঁ কে জানে! সেখানে হয়তো সবাই গোমড়ামুখো, সবাই রাগি। কে জানে কী।

খেলুড়িরা গোল হয়ে বসে ছিল। নবদুর্গা কাছে যেতেই চারি বলল বাব্বাঃ রে বাব্বাঃ। কতক্ষণ বসে আছি তোর জন্য। এই তোর আসার সময় হল!

ধুস আমার কিছু ভালো লাগছে না।

কেন, কী আবার হলো?

কারা যেন দেখতে আসবে কাল।

পটলী একটু কম কথা কয়। সে ভারী ভালোমানুষ। খুব ছোটখাটো, রোগা আর কালো।

ফস করে বলে, উঠল, আমি জানি।

কী জানিস রে?

গোবিন্দপুরে আমার জ্যেঠতুতো দিদির শ্বশুরবাড়ি। দিদি আজই এল সকালে। মাকে বলছিল ওখানে সমীরণ না কে একটা ছেলে আছে, তার সঙ্গেই তোর সম্বন্ধ।

সমীরণ নামটা খুব এটা খারাপ লাগল না নবদুর্গার। ঠোঁট উলটে অবশ্য বলল, বয়েই গেছে বিয়ে করতে।

পটলী বলল, দিদি বলছিল সে নাকি পাগলা মানুষ।

বলিস কী? বলে সবাই চমকে উঠল।

হিহি করে হাসল পটলী, পাগলা বলতে তেমন নয় কিন্তু। খেয়ালি।

তার মানে কী? বিড়বিড় করে নাকি?

সে আমি জানি না। দিদি বলছিল, ছেলে নাকি মন্দ নয়।

চারি বলল, কেমন দেখতে? মুশকো, কালো, ঝ্যাঁটা গোঁফ নাকি?

তা কে জানে। অত শুনিনি।

নবদুর্গা বলল, তাই হবে। আমার কপালে কি ভালো কিছু জুটবে?

মান্তু বলল, কেন বাবা, তোর কপালটা এমন কি খারাপ। আমাদের মতো তো তোর গরিব ঘর নয়। দশ-বিশ হাজার টাকা খরচ করতে পারে জ্যাঠামশাই, আমার বাবা পারবে?

কয়েক মাস আগে লোহাগঞ্জের মস্ত এক পরিবারে মান্তুর বিয়ে ঠিক হয়ে গিয়েছিল। দশ হাজার টাকা পণের জন্য ভেস্তে যায়।

মান্তুর মুখখানা দেখে ভারী কষ্ট হল নবদুর্গার। গরিব ঘরের হলেও মান্তু দেখতে বেশ। বড়-বড় চোখ, রংটাও ফরসার দিকে, ভারী ঢলঢলে মুখ। ভালো ঘরেই বিয়ে হয়ে যাচ্ছিল প্রায়। মান্তুর বাবা হরিপদ ধারকর্জের চেষ্টাও করেছিল কম নয়। পায়নি।

মান্তুর কথাটার পরই আজকের জমায়েতটার কেমন যেন তাল কেটে গেল। কারও আর কথা আসছিল না। তাদের যা বয়স এখন, তাতে সকলেরই দিন আসছে। কার ভালো বিয়ে হবে, কার খারাপ তা যেন রথের মেলায় মোয়াওয়ালা ফটিকের ঘুরণচাকি। পঞ্চাশটা পয়সা ফেললেই ফটিক তার চাকির কাঁটা বাঁই করে ঘুরিয়ে দেবে। চাকির গায়ে নম্বর লেখা। কাঁটা যে ঘরে থামবে ততটা মোয়া। কারও ভাগ্য দশও ওঠে, কারও ভাগ্য শূন্য। বিয়েটাও হল তাই। আর সে জন্যই তাদের বুকে একটা গোপন দুরদুরুনি আছে। মাঝে-মাঝে যেন শ্বাসকষ্ট হয়।

আজ জোরদার পাঠ হচ্ছে জগা খুড়োর দাওয়ায়। দশ-বারোজন জুটেছে। খেলুড়িরা একে- একে চলে যাওয়ার পর জামতলা থেকে ফেরার সময়ে দৃশ্যটা দেখতে পেল নবদুর্গা। একখানা পেতলের ঝকঝকে হ্যারিকেন জ্বেলে নিয়ে বসেছে জগা খুড়ো। যাই-যাই শীত। খুড়োর গায়ে নস্যি রঙের র্যা পার।

নবদুর্গারও একটু শীত করছিল। সে অন্তি জ্যাঠাইমার দাওয়ায় পাতলা অন্ধকারে বসে চেয়ে রইল। গোবিন্দপুর কতদূর? যাবে কি সেখানে? সমীরণ নামটা কিন্তু বেশ।

দিঘির জলে সূর্য ডুবে গেল একটু আগে। পশ্চিমের আকাশে একটা ছেঁড়া ন্যাকড়ার মতো মেঘ এসে শেষ আলোটুকুও পুঁছে দিচ্ছিল। এ সময়ে নবদুর্গার কেন যে রোজ কান্না পায়! রোজ পায়।

লছমীর ডাক শোনা যাচ্ছে। একটু চমকে ওঠে নবদুর্গা। লছমী খুব কমই ডাকে। আজ ডাকছে কেন? জাবনার গামলার মধ্যে মুখ দিচ্ছে না তো! ঘাড় ফিরিয়ে-ফিরিয়ে কাকে

দেখছে যেন।

হঠাৎ নবদুর্গার বুকের ভিতরটা ধক করে উঠল। রোজ সে লছমীর সোহাগ পাওয়ার জন্য জাবনাটা নেড়ে দেয়। আজ দেয়নি। তাই কি খুঁজছে? যদি তাই হয়? ইস, আনন্দে বুকটার মধ্যে যেন একটা বাতাস বয়ে গেল।

নবদুর্গা এক ছুটে গিয়ে হাঁফাতে-হাঁফাতে বলল, আমাকে খুঁজছিস, ও লছমী? আমাকে? ও আমার সোনালক্ষ্মী, ও আমার বুকের ধন...

নবদুর্গা হাত দিল গামলার মধ্যে। আর কী আশ্চর্য ভগবান, এমনও হয় নাকি? লছমী একটা বড় শ্বাস ফেলে জাবনা খেতে লাগল মসমস করে।

নবদুর্গার চোখের জল বাঁধ মানল না। হাপুস কাঁদতে-কাঁদতে বলল, তা হলে তুই আমাকে ভালোবাসিস লছমী! এত ভালোবাসিস?

কত সোহাগ বল দুজনে। এ সব কেউ বুঝবে। শুধু সে বোঝে এ সব অদ্ভুত আশ্চর্য আবিষ্কার।

রাত্রিবেলা যখন পাঠ শেষ করে ঘরে বসে জগা খুড়ো খই দুধে মেখে খাচ্ছে তখন গিয়ে তার ঘরে হানা দিল নবদুর্গা। জগা খুড়ো তার মস্ত অবলম্বন।

জগা খুড়ো, একটা কথা। গোবিন্দপুর থেকে কাল আমাকে কারা দেখতে আসছে গো।

তা আসুক না।

শোনোনি?

আমাকে কি কেউ কিছু বলে? পড়ে আছি একধারে কুকুরটা বেড়ালটার মতো।

এই জগা খুড়োই না বলে নরক কা মূল অভিমান!

কী হল গো তোমার খুড়ো!

জগা খুড়ো খইয়ের বড় বাটিটা মেঝের ওপর রেখে উদাস মুখে বলল, কী মনে হয় জানিস? মনে হয় বয়সকালে সংসারধর্ম করাই ভালো ছিল। তাতে তো আপনজন হত কয়েকজন। ওই দেখ খই দুধে কেমন মিশ খেয়ে গেছে। তেমনধারা মিশ খেতে পারলুম কই তোদের সংসারের সঙ্গে?

তুমি কি কালকের ঝগড়ার কথা কইছ খুড়ো? নগেনকাকা তো মাথাগরম মানুষ, সবাই তো জানে।

জগা খুড়োর সঙ্গে কাল নগেনকাকার লেগেছিল খুব। তেমন কিছু ব্যাপার নয়। নগেনকাকা তার ছেলে মদনকে খুব মারধর করছিল কাল, ঝড়ুপট্টিতে গিয়ে ভিডিও দেখে রাত কাবার করে ফিরেছিল বলে। নগেনকাকার মার মানে পুলিশের মারকেও হার মানায়। মোটা বেতের লাঠি দিয়ে যখন মারে আর মদন যখন চেঁচায় তখন আশপাশে মানুষ থাকতে পারে না। জগা খুড়ো গিয়ে তখন মাঝখানে পথে পড়েছিল। নগেনকাকার তাই রাগ, তুমি কে হে বারণ করার? আমি আমার ছেলেকে শাসন করছি, তুমি বলতে আসো কেন? ভালোমানুষি দেখাতে এসো না, ছেলেটা যদি নষ্ট হয় তো তাতে তোমার তো ক্ষতি হবে না, হবে আমারই...তোমার আর কী...এইসব। গায়ে না মাখলেও চলে।

জগা খুড়ো খইয়ের বাটিটা ঠেলে দূরে সরিয়ে দিয়ে বলল, মাঝে-মাঝে ইচ্ছে হয় তোদের সংসার ছেড়ে হিমালয়ে চলে যাই।

তুমি গেলে আমি কাঁদব কিন্তু। ওরকম বলে না। কালকেই দ্যাখো, মদনকাকা এসে তোমার কাছে গাঁইগুঁই করবে।

ফোঁস করে একটা শ্বাস ছেড়ে জগা খুড়ো বলল, তা আর করতে হবে না। মনটাই আমার ভেঙে গেছে। তা কী বলতে এসেছিলি?

আগে খই-দুধ খাও, বলছি। বলে বাটিটা হাতে তুলে দেয় নবদুর্গা।

একটু চুপ করে থেকে জগা খুড়ো বলে, সংসারটা নরক।

আর নরক কা মূল অভিমান, তাই না খুড়ো?

জগা খুড়ো ভ্রূ কুঁচকে বলে, কোথা থেকে শিখলি কথাটা?

যার কাছ থেকে শিখি। তুমি গো।

অ। পেকেছ খুব। বৃত্তান্তটা কী? গোবিন্দপুর তো?

হ্যাঁ। পাত্রের নাম সমীরণ। তারা কেমনধারা লোক?

তার আমি কী জানি?

দুই

এ কাজটা কার তা বলা কঠিন। হাটুরে ধুলোয় লোকটা পড়ে আছে। একটু আগে মুখ দিয়ে রক্ত আর গোঙানি বেরোচ্ছিল। এখন গোঙানিটা নেই। মরে গেল নাকি? নাঃ, শ্বাস চলছে।

যারা মেরেছিল তারা এখন তফাত হয়েছে। সে চারদিকটা দেখে নিল একবার। নীলুদাদু কি সাধে বলে, লোকের ভালো করতে নেই। যতবার ভালো করতে গেছে সে ততবারই গণ্ডগোল হয়েছে। তবু এই ভালোটা না করেও সে পারে না। লোকটা চোর এবং পাকা চোর। মার কি আর এমনি খায়? লোকে খেটেপিটে রোজগার করে আর এ ব্যাটা ফাঁকতালে। তবে এরও হয়তো বালবাচ্চা এণ্ডিগেণ্ডি, বাপ মা আছে। এটাই কষ্টের। চোর গুন্ডা খুনে যা-ই হোক—তাদেরও জন থাকে। জনগুলোরই কষ্ট।

লোকটাকে কাঁধে তুলেই ফেলল সে। খুব ভারী মানুষ নয়। কাঁধে দো ভাঁজ চাদরের মতো নেতিয়ে পড়ল। কুমোরপাড়া পেরোলেই সাউ ডাক্তারের ঘর।

ডাক্তারবাবু, আছেন নাকি?

ডাক্তার আছে। আজ হাটবার, মেলা রুগি। এ দিনটা সাউ সেঁটে থাকে।

কে রে?

আজ্ঞে আমি, সমীরণ।

সাউ মুখ বেঁকাল, অ। তা কী মনে করে? কাঁধে আবার কোন গন্ধমাদন বয়ে আনলে বাপ?

এ ব্যাটা হাটুরে ঠ্যাঙানি খেয়েছে। বাঁচবে কি না দেখে দিন তো!

ও বাবা, ও আপদ বিদেয় করে এসো। হাটের জিনিস হাটেই পড়ে থাকত বাবা, বয়ে আনার কী ছিল? কলজের জোর থাকলে হাওয়া বাতাসেই আরাম হবে, ওষুধ লাগে না ওদের।

একটু দেখে দিন তবু।

ভিজিটটা দেবে কে?

দেওয়া যাবে।

কেন যে বাপু এ সব ঝামেলায় আমাকে জড়াও। সদ্য চেম্বার বন্ধ করতে যাচ্ছিলাম...গজগজ করতে-করতে ডাক্তার সাউ লোকটাকে দেখল। দেখতে-দেখতে বলল,

বলেছি না এ শালা বেজম্মাদের ওষুধ লাগে না। দিব্যি বেঁচে আছে। মারের চোটে ভিরমি খেলেও কিছু নয়। টিকে যাবে। নিয়ে যাও।

একটু ওষুধ-টসুধ দেবেন না?

পয়সা?

হবে।

দ্যাখো বাপু। বাকি কারবারে ফেলো না। অনেক ভিজিট মার গেছে আমার জীবনে।

তা ওষুধ হল, পট্টি লাগানো হল। লোকটা একটু ঘোলা চোখে চাইলও।

সমীরণ বারোটা টাকা হিসেবমতো দিয়ে দিল। তারপর লোকটাকে দাঁড় করিয়ে বলল, চল ব্যাটা। বেঁচে গেছিস।

লোকটা টলতে-টলতে বেরিয়ে এল সঙ্গে-সঙ্গে।

কুমোরপাড়ার রাস্তায় পড়ে লোকটা সটান হল। বলল, বাবু কি আমাকে পুলিশে দিচ্ছেন?

দেওয়াই উচিত।

ও শালা পুঙ্গির ভাইয়েরা যে পেটাল ওদের কী করছেন?

হাটসুদ্ধু কি পুলিশ দেওয়া যায়? বেশ করেছে মেরেছে।

বেশ করা আমিও বের করে দেব, দেখবেন। বনমালীর দোকান থেকে—বললে বিশ্বেস করবেন না—মোটে পাঁচটা টাকা কুড়িয়েছি তাইতেই ওই কাণ্ড।

কুড়িয়েছ মানে?

বনমালী ক্যাশবাক্স খুলে টাকা খাবলে কাকে যেন খুচরো ফেরত দিতে যাচ্ছিল, পাঁচ টাকার নোটটা উড়ে এসে পড়ে মাটিতে। সেইটে কুড়িয়ে গস্ত করায় এই হেনস্থা।

তুমি চোর নও তা হলে?

কোন শালা নয়। সব চোর। হাটে বাজারে পথেঘাটে দাঁড়িয়ে যে দিকে তাকাব সব চোর।

জানি। বাড়ি যাও।

গেলেই হবে?

তার মানে?

শুধু হাতে গিয়ে মা কালীর মতো জিব বের করে দাঁড়াব নাকি মাগের সামনে? সে আমার ট্যাঁক দেখবে না? তবে যদি ঢুকতে দেয় ঘরে।

ভালো জ্বালা দেখছি।

আপনি ভালো লোক। সমীরণবাবু তো!

চিনলে কী করে?

গোবিন্দপুরে থাকেন, রায়বাড়ির ছোট ছেলে। সবাই জানে।

কী বলে জানে? বোকা না পাগল?

দুটোই। তা ওরকমধারাই ভালো। বোকা যদি না হতেন, ছিটিয়াল যদি না হতেন তা হলে আজ এই রকম শর্মার কি প্রাণখানা থাকত দেহপিঞ্জরে?

কত চাই?

যা দেন। দশ-বিশ।

খাঁই তো কম নয় দেখছি।

দশটা টাকা পেয়ে নয়ন সেলাম বাজিয়ে হাওয়া হল। তখন ভারী বোকা-বোকা লাগল নিজেকে সমীরণের। ঠকে গেল নাকি? হিসেবটা সে করতে চায় না। আবার করেও ফেলে। কত ঠকল জীবনে?

ঠকেও সে। আবার পুরোপুরি ঠকেও না। এ তিন বছর আগেকার কথা। নয়ন শর্মা এর পরে, তাদের বাগানের বেড়া বেঁধে দিয়ে গেছে। গোয়ালঘর ছেয়ে দিয়ে গেছে। একটা কুড়ুল আর একখানা বাটি চুরি করে নিয়ে গেছে। এই লেনদেন নিয়ে সংসার—সমীরণ যা বোঝে।

সে যে খানিক পাগল এটা সে জানে। আবার জানেও না। বাসুলি পুকুরে হরিমতিপিসির নারকোল তুলতে গিয়ে বিপদ হয়েছিল সেবার।

নারকোল বেচেই বুড়ির চলে। সেবার ঝড়বৃষ্টিতে মেলা নারকোল পড়ল জলে আর ডাঙায়। সমীরণ ফিরছিল তার তাঁতঘর থেকে। বুড়ি ধরে পড়ল, ও বাবা, নারকোল কটা তুলে দিয়ে যা। নইলে সব তুলে নিয়ে যাবে। যা হারামি সব ছেলেপুলেগুলো।

তা নেমেছিল সমীরণ। মোট কুড়িখানা নারকোল ডাঙায় ছুড়ে দিয়ে যখন উঠে আসছে তখনই মস্ত এক সাপ। ফণা তুলে সামনে দাঁড়ানো। একেবারে নাগালের মধ্যে, মুখোমুখি। বাঁচার উপায় অনেক ছিল। উলটে জলে পড়লেই হত। কিংবা হাতের একখানা নারকোল ছুড়ে মারলেও হতে পারত।

কিন্তু সমীরণের স্তম্ভনটা অন্য কারণে। সাপটা অদ্ভুত। বুকখানা টকটকে লাল। আর পিঠটা সাদা চিকরিমিকরি, এরকম অদ্ভুত সাপ সে জন্মে দেখেনি। ভয় পাবে কি, সাপ দেখে সে মুগ্ধ। বিড়বিড় করে বলেও ফেলল, তুমি কী সুন্দর! কী সুন্দর!

কয়েক সেকেন্ড ফণা তুলে দুলল সাপটা। সমীরণ দাঁড়িয়ে। শরীর ভেজা। টপটপ করে জল পড়ছে। বুকে একটুও ভয় নেই।

সাপটা তাকে দেখল কিছুক্ষণ। বোধহয় বোকা আর পাগল বলে চিনতেও পারল। তাই হঠাৎ একটা শ্বাস ফেলে মাথাটা সরসর করে নামিয়ে ঘাসবনে অস্ত গেল।

কাউকে বলেনি সমীরণ। বললে লোকে বলবে, তুমি সত্যিই পাগল হে।

বাড়ি গিসগিস করছে লোকে। তাই সমীরণের জায়গা হয় না। আসলে একটু দাপের লোক হলে জায়গায় অভাব হয় না। কিন্তু সমীরণের মতো মুখচোরার দ্বারা তা হওয়ার নয়। নবীনদাদু মরার পর তার ঘরখানা সমীরণের পাওনা ছিল। কিন্তু গদাইকাকা এসে ঘরখানার দখল নিয়ে ফেলল, বলল, তুই একাবোকা মানুষ, তোর আস্ত একখানা ঘরের দরকারটা কী? যখন বিয়ে করবি তখন দেখা যাবে।

সমীরণ তাই একটু ফাঁকে থাকে। ঘর নয়। রাঙাকাকার ঘরের লাগোয়া দাওয়ার উত্তর দিকটা একটু বেড়া দিয়ে ঘিরে নিয়েছে। সেই ঠেকখানা তেমন মজবুত নয়। শীতের হাওয়া, গরমের হাওয়া দুইই ঢোকে, বৃষ্টির ছাঁট আসে, ব্যাং লাফায়, ইঁদুর দৌড়োয়, কুকুর বেড়াল ঢুকে পড়ে। বেড়ালদের বাচ্চা দেওয়ার সময় হলে তারা আর কোথায় যাবে সমীরণের চৌকির তলা ছাড়া? সমীরণের বিয়ের উদ্যোগ হচ্ছে। সে ভাবে, বিয়ে না হয় হল, কিন্তু এই এক চিলতে ঘরে বউ আর সে বড্ড ঘেঁষাঘেষি হবে না? তার ওপর ওই একটা সরু চৌকি, রাতবিরেতে হয় তার ধাক্কায় বউ পড়ে যাবে, নয় তো বউয়ের ধাক্কায় সে। কী কেলেঙ্কারিটাই হবে তা হলে! ভালোমানুষের মেয়েকে কষ্ট দেওয়া বই তো নয়।

সকালবেলাটায় সমীরণের মনটা বেশ ভালো থাকে। আজও ছিল। সোনাজ্যাঠা এসে সেটা কেমন উলটে দিল। এসে ঘরের ভিতরে উঁকি মেরে দেখে নিয়ে নাক সিঁটকে বলল, এ ঘরটায় এমন মুতের গন্ধ কেন রে?

সমীরণ অবাক হয়ে বলল, নাকি?

নয়? তোর তো দেখছি তূরীয় অবস্থা, মুতের গন্ধ পায় না এমন আহাম্মক কে?

সমীরণ ভারী কাঁচুমাচু হল। মুতের গন্ধের দোষ কী? মোতি নামের বেড়ালটার প্রসব হয়েছে কদিন। চৌকির তলায় তার আঁতুরঘর। অপকর্মটা হয়তো মোতিই করে। কে জানে বাবা।

নবাবগঞ্জের মেয়েটা বাতিল হয়ে গেল, বুঝলি!

বুঝল না সমীরণ। বলল, কোন মেয়ে?

আমার খুব পছন্দ ছিল। গণেশদাদাও বলছিল দুর্গাপ্রতিমার মতো দেখতে। কিন্তু সেজবউ বলল, মেয়ের খুঁত আছে। কী খুঁত তা ভেঙে বলল না। মেয়েলি ব্যাপার, কে জানে বাবা কী। মোটমাট বাতিল।

ও। আচ্ছা। সমীরণ এর বেশি আর কী বলবে?

সমীরণ চেয়ে রইল।

ও মেয়ে দেখার পর সেজবউ ভয় পেয়েছে, সুন্দরী বলে তার যে গ্ল্যামার ছিল তা এবার যাবে। নবদুর্গা এলে তাকে কেউ ফিরেও দেখবে না। তা বলে মুখের ওপর অমন কটমট করে কথা না শোনালেও পারত।

কী কথা জ্যাঠা।

এই হেনতেন, মেয়েদের অনেক কায়দা জানা আছে। বিঁধিয়ে-বিঁধিয়ে এমন বলে। মেয়েটা ভারী দুঃখ পেল।

সমীরণ একটু বিষণ্ণ হল। মুখের ওপর কাউকে বাতিল করা কি ভালো?

তুই মুতের গন্ধ পাস না কেন রে? এঃ বাবা, নাক যে জ্বালা করছে।

সমীরণ পায় না তা কী করবে। ভারী দুঃখী হয়ে সে বসে রইল। হোক মুতের গন্ধ, তা বলে কি সে মোতিকে বাচ্চাসমেত ঘরের বার করতে পারে? সমীরণ অনেক কিছুই পারে না যা পারা উচিত।

তাঁতঘরে আজ সারাদিন ভারি আনমনা রইল সমীরণ। অন্যদিন তাঁতের শব্দ তার সঙ্গে নানা কথা বলে। শুনলে লোকে তাকে আরও পাগল বলবে বলে সে কথাটা কাউকে বলে না। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি তাঁতের সঙ্গে তার নানা কথা হয়। তাঁতও তার কথা বুঝতে পারে, সেও বোঝে তাঁতের ভাষা।

আজ তাঁত বলল, পরশু শিবরাত্রি।

হ্যাঁ, তা জানি, তাতে কী?

জানো? ভালো। এই বলছিলাম আর কি, শিবরাত্রি ভারী ভালো দিন।

অ। তা হবে। আজ আমার মনটা ভালো নেই।

ভালো না থাকারই কথা। বলি কি শিবরাত্রির দিনই গিয়ে নবাবগঞ্জে হানা দাও। মেয়েটার কাছে ক্ষমা চেয়ে নাও।

যাব?

যাও। খুঁতো মেয়ে বলছে, তা খুঁতো নয় কে? সবাই খুঁতো।

সমীরণ একটা শ্বাস ফেলল। বলল, দুনিয়াটা কেমনধারা বলো তো!

তোমার জায়গা নয় হে এটা। তুমি হলে পাগল আর বোকা।

তা তো জানি।

ওরকমই থাকো। অন্যরম হওয়ার কথা নয় তোমার। ঠাকুর যেমনটি করেছেন তোমায় তেমনটিই থাকো।

তিন

জগা খুড়ো এসে বলেছিল, তোর কপালে হলে হয়। ছেলে পাগল ঠিকই, বোকাও হয়তো, কিন্তু ভগবান কাউকে কাউকে পাঠান। এ তার নিজের লোক।

পাগল আর বোকা! মাগো!

জগা খুড়ো যেন কেমনধারা পাগুলে চোখে আনমনা চেয়ে থেকে বিড়বিড় করে বলল, সংসারী হিসেবে সে এমন কিছু আহামরি নয়। তবে অন্য একটা হিসেবও তো আছে। অন্য হিসেব—

এই অন্য হিসেবটা বোঝে না নবদুর্গা। সে তো সংসারী মানুষ, বুঝবে কী করে? আবার তার মনটা মাঝে-মাঝে ভারী অন্যরকম, তখন সে ঠিক সংসারী থাকে না। তখন তারও হিসেব উলটেপালটে যায়।

গোবিন্দপুরের লোকেরা এসেছিল। তাকে নাকচ করে গেছে মুখের ওপরেই। ভগবানের লোকের সঙ্গে তার বিয়েটা হচ্ছে না। একটা বউ এসেছিল তাদের সঙ্গে—দেখতে ভারী ঢলঢলে। কিন্তু জিবের যা ধার। মিষ্টি-মিষ্টি করে এমন সবকথা বলল, রংটা তো তেমন নয়, চুলের গোছ কী আর ভালো, দাঁতগুলো অমন কেন, পান খাও নাকি? পোকা নয় তো! খ্যামোকা কথা সব। বলতে হয় বলে বলা।

কাল শিবরাত্রির উপোস গেছে। আজ নবদুর্গার শরীর ভারী দুর্বল। সকালে কাঁচা মুগ ভেজানো গুড় দিয়ে খেয়েছে আর মিছরির শরবত। শরীর নয়, মনটাই যেন আজ তেমনধারা। শিবরাত্রি করে কী হয়? কচু হয়? কিছু হয় না। ন'বছর বয়স থেকে শিবরাত্রি করে আসছে সে। কিছু হল?

জগা খুড়ো এল বেটা ন'টা নাগাদ।

আছিস নাকি ঘরে?

আছি গো, কেন?

শরীর খারাপ নাকি?

ব্রত করলাম না?

ও, তাই তো বটে!

জগা খুড়োর মুখে কেমন যেন বোকা-বোকা হাসি। মাথাটাথা চুলকে বলল, ওই একটা ব্যাপার হয়েছে।

কী ব্যাপার খুড়ো?

বাড়ির লোক টের পেলে কী করবে কে জানে।

ভয় খেয়ে নবদুর্গা উঠে বসল। তার যে বুক দুরদুর করছে!

কী হল খুড়ো?

আমার ঘরটায় একবার যা। একজন এসে বসে আছে। বড্ড দুঃখী মানুষ।

কে গো?

যা না। দেখে যদি বুঝতে পারিস তবেই হয়। যা একবার।

নবদুর্গার বুকের মধ্যে কেমন যেন আছাড়ি পিছাড়ি ভাব। বড্ড মোচড় দিচ্ছে পেটের মধ্যে। মুখ শুকিয়ে কাঠ। সে তবু উঠল।

খুড়োর ঘর পর্যন্ত যেতে উঠোনটা যেত তেপান্তরের মাঠ। সিঁড়ি মোটে এক ধাপ। তাও পেরোতে যেন হাঁটু ভেঙে এল। ঘরের দাওয়ায় উঠে দরজা অবধি যেন যেতেই পারছিল না। দরজায় থমকে গেল।

একে সে এ জন্মে দেখেনি ঠিক। কিন্তু এ তার সাত জন্মের চেনা। এ কি আজকের?

অপরাধী একজোড়া চোখ তুলে সে চাইল। তারপর তার চোখও পলকহীন। চিনেছে কি?

হ্যাঁ চিনেছে। সেই চেনার ঝিকিমিকি চোখে উথলে উঠল।

নবদুর্গা একটু হেসে মাথা নোয়াল।

দুজনের কোনও কথা হল না। শুধু আড়াল থেকে জগা খুড়োর মৃদু গলা খাঁকারির একটা শব্দ হল। উঠোনের ওধার থেকে লছমী হঠাৎ ডেকে উঠল অকারণে। কিংবা কে জানে তত অকারণে হয়তো নয়।

সাইকেল

বউ দিয়ে সে কী করবে? তার দরকার একখানা সাইকেল। সাইকেলের মতো জিনিস হয় না। ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হওয়ার মতো করে উঠে পড়লেই হল। তারপর দু-খানা সরু চাকার খেল। এই খেলটাও বড়ই আশ্চর্যের। পড়ে যাওয়ার কথা, কিন্তু পড়ে না। ঘটুর দুনিয়াখানা এখন এসে জড়ো হয়েছে সাইকেলে। আর সাইকেলের রকমারি কম নয়। মদনবাবুর ছেলে কুঁড়োরাম কী জিনিসটাই কিনেছে। সবুজ রং, নীচু হ্যান্ডেল, যায় যেন পক্ষীরাজ। হরিপদর সাইকেলে একখানা বাহারি বাতি আছে, পিছনের চাকায় তার কল। কলখানা চাকার গায়ে ঠেসে দিলেই হল, সাইকেল চালালেই টর্চবাতির মতো আলো। অত বাহারের অবশ্য দরকার নেই ঘটুর। নন্তের মতো পিছনের চাকার রডে একখানা পিচবোর্ডের টুকরো বেঁধে নেবে। চালালে চাকার স্পোকে লেগে শব্দ হবে ফটফট-ফটফট, ঠিক যেন মোটর সাইকেল যাচ্ছে।

বউয়ের দরকার না থাক, সাইকেলের জন্য বিয়ে করতেও রাজি আছে ঘটু। কিন্তু তাকে সাইকেল দেনেওলা শ্বশুর কি তল্লাটে ঢুঁড়লেও পাওয়া যাবে? হাড়হাভাতে ঘটুকে মেয়েই দিতে চাইবে না কেউ, তো সাইকেল!

তা বলে কি ঘটুর বউয়ের অভাব? তা নয়। হাড়হাভাতে মেয়ের বাপ মেলাই আছে। তারা মেয়ে পার করতে পারলে বেঁচে যায়, ঘটু চাইলে বিয়ের অভাব ঘটবে না। তা ঘটু সেটা চায় না। সে চায় সাইকেল।

ব্রজমাস্টার অবশ্য ভরসা দেয়। বলে, সাইকেল দেনেওলা শ্বশুর তোরও জুটবে। হাতের কাজটা আর-একটু শিখে নে, তারপর দেখবি। সাইকেল তো সাইকেল, সঙ্গে সেলাইমেশিন, এমন কি রেডিও অবধি পেয়ে যাবি। শুধু চাইলেই তো হবে না, চাওয়ার মতো পাত্তরও তো হতে হবে।

ব্রজমাস্টার হচ্ছে এ অঞ্চলের নামকরা টিপকলের মিস্তিরি, শ্যালো আর টিউবওয়েল বসানোর কাজে তার মতো এ তল্লাটে আর কেউ নেই। ব্রজমাস্টার মরুভূমি থেকেও জল বের করতে পারে। মজুরিটি ন্যায্য, কাজে গাফিলতি নেই, কথার খেলাপ হয় না। ব্রজমাস্টারের তাই সারা বছর দম ফেলার সময় থাকে না। শুধু নতুন কল করাই তো নয়, পুরোনো কল খারাপ হলে মেরামতির কাজেও তাকেই চতুর্দিক থেকে ডাকাডাকি।

ব্রজমাস্টারের সাকরেদ হওয়াও চাট্টিখাটি কথা নয়। পিছন-পিছন ঘুরলেই হবে না। ব্রজমাস্টার যাকে নেয় দেখেশুনেই নেয়। যারা বেশি খায় বা বেশি ঘুমোয় তারা প্রথমেই খারিজ। একবারে কথা বুঝতে পারে না বা বেশি ফড়ফড় করে তারাও বাতিল। যারা কথা কইতে ভালোবাসে বা নেশাভাঙ বেশি করে ফেলে তাদেরও সুবিধে নেই। ব্রজমাস্টার নেয় শুধু কাজের লোক।

ঘটু কাজের লোক কি না, তা সে নিজেও জানে না। কানাই মণ্ডল হল ব্রজ মিস্তিরির ভগ্নীপোত। ঘটু আজ বছরতিনেক কানাইয়ের তাঁবেদারি করে যাচ্ছে। সব কাজেরই যে ফল ফলে তা নয়। তবে কানাই ঘটুর জন্য এটুকু করেছিল। ব্রজ মিস্তিরির সঙ্গে জুতে দিল তাকে। খোরাকিটা হয়ে যায়। দু-পাঁচ টাকা হাতে থেকেও যায়। আপাতত এটুকুই। তবে কাজ শিখে যদি হাতযশ হয় তাহলে হাত উপুড় করলেই পর্বত।

তা ঘটু লেগে আছে। ছিনে জোঁকের মতোই লেগে আছে। কারণ তার যাওয়ার জায়গা নেই। তাদের সমাজে মা মরলেই বাপ তালুই। অর্থাৎ তখন বাপে আর তালুইমশাইতে তফাত থাকে না। বাপ আবার বিয়েতেও বসেছে। সুতরাং ওদিকের পাট চুকেবুকে গেছে বলে ধরাই ভালো।

পিছনের দিকটার ঝাঁপ পড়ে গেছে বটে, কিন্তু সামনের দিকটা খোলা। ব্রজমাস্টারের হাতের কাজটি নিজের হাতের তুলে নিতে পারলেই হল। তুলছেও ভালো। গোরাচাঁদের পাম্প মেশিনে জল উঠছিল না। ব্রজমাস্টার তখন অন্য কাজে ব্যস্ত। বলল, যা দিকিনি, ব্যাপারটা দেখে এসে আমায় বল। ডিফেক্টটা যদি ধরতে পারিস তবে বুঝব কাজ শিখেছিস।

তা গিয়ে দেখেশুনে এসে ঘটু বলল, কেসিং পাইপে ফুটো হয়ে হাওয়া ঢুকে যাচ্ছে। নতুন করে পাইপ বসাতে হবে বলে মনে হচ্ছে।

ব্রজমাস্টারও গিয়ে দেখল, তাই। বলল, ঠিকই ধরেছিস তো!

গাঁয়েগঞ্জে গেলে গাহেকের বাড়িতেই থাকা-খাওয়া। খাবারদাবারও বেশিরভাগ সময়েই সুবিধের নয়। মোটা ভাত, ডাল, একটা ঘ্যাঁট হলেই যথেষ্ট। তবে উঁচু নজরের লোকও কি

নেই? মাঝে-মাঝে তারাও আছে বলেই ঝপ করে পাতে একটা মাছের টুকরো বা একখানা আস্ত ডিম নেমে আসে।

তবে সব মিলিয়ে ফুর্তিতেই আছে ঘটু। এক জায়গায় বাঁধা জীবন নয়। এ-গাঁ ও-গাঁ-গঞ্জ ঘুরে-ঘুরে বেশ কাটে সময়। তে কাঠির বাঁশ, পুলি, রেঞ্চ বয়ে-বয়ে বেড়ানো।

সাইকেলের বাইটা চাপল পিরপুরে গিয়ে। পিরপুর বড় জায়গা, মস্ত পিরের দরগা আছে। হরেরাম মুস্তফির বাড়িতে কাজ হচ্ছিল। বিকেলের দিকটায় একটু ফুরসত পেয়ে মুস্তফির বাড়ির বাইরের মাঠের ধারে দাঁড়িয়ে ঘটু দেখছিল, মুস্তফির তেরো-চৌদ্দ বছরের ছোট ছেলেটা সাইকেল চালাচ্ছে। হঠাৎ সেই ছেলেটা তাকে বলল, চালাবে? চালাও।

ছেলেটা দেখতে যেমন ফুটফুটে সুন্দর তেমনি বড্ডই ভালো। এরকমধারা আজকাল কি আর কেউ কাউকে বলে? ঘটু খুব খুশি। কিন্তু সমস্যা হল সে জন্মে সাইকেল চালায়নি। সে কথা বলতেই ছেলেটা বলল, আরি বাঃ, তা হলে শিখে নাও। খুব সোজা।

কথাটা সোজা হলেও কাজটা সোজা ছিল না। আর সাইকেলও সোজা জিনিস নয় মোটেই, কেবল এ-কাত ও-কাত হয়ে ঢলে পড়ে। ঘণ্টাটাক অনেক কসরত করল ঘটু। বারদশেক আছাড় খেল। শিখতে পারল না বটে, কিন্তু সাইকেল সেই যে তার মাথায় ঢুকল আর বেরোতে চায় না।

উদয়পুরে কাজ হচ্ছে। মহিম মণ্ডলের বাড়িতে শ্যালো বসছে। পাইপ টেনে খেত বরাবর নিতে হবে। অনেক টাকার কাজ। সন্ধের পর কাজের ছুটি হল। মহিম মণ্ডল বড় গেরস্ত। সাঁঝবেলায় ধামাভরতি মুড়ি আর কয়েক চাকা গুড় পাঠিয়ে দিলে ঝিয়ের হাতে।

গুরুপদ, সাধু গায়েন, তারানাথ, পচা, হাঁদু আর ঘটু গোল হয়ে বসে গেল মুড়ি খেতে। গুড়টার স্বাদ বড্ড ভালো।

গুরুপদ বড় মিস্তিরি। নিজের কারবার খোলার তালে আছে। মুড়ি খেতে-খেতে বলল, আর হাজার দুই টাকা পেলেই আমার হয়ে যায়।

কী হয়ে যায় সবাই জানে। গুরুপদর বাড়ি জমি মহাজনের কাছে বাঁধা আছে। খেটেপিটে রোজগার করে কর্জটা মেরে এনেছে প্রায়। বাড়ি জমি ছাড়াতে পারলেই গুরুপদ নিজে ব্যাবসা করবে। কাজও জানে ভালোই।

ঘটু বলল, তা দুহাজার হতে আর কতদিন লাগাবে মনে হয়?

মেরেকেটে দুটো মাস।

তারপর তো তুমি রাজা।

গুরুপদ উদাস সুরে বলল, ধুর। রাজা গজা আবার কী রে? বাপ পিতেমোর ভিটে, সেইটুকু রক্ষে করতে পারলেই যথেষ্ট। কুলাঙ্গার বলেই না বাঁধা রেখেছিলাম। তা ওই ভিটেটুকু আর তিন বিঘের চাষ ছাড়া আর কী আছে যে রাজা হব! তবে ওটুকু হাতে এলে একটা মনের জোর হয়। তখন লড়া যায়।

পাম্প মিস্তিরির কাজই করবে তো?

তা ছাড়া আবার কী? একটু টাকা-পয়সা হলে একখানা মুদির দোকান দেওয়ার ইচ্ছে আছে। বউ সেটা চালাবে। আমাদের গাঁয়ে মুদির দোকান তেমন নেই। হরি সাউয়ের একখানা দোকান আছে বটে, কিন্তু লোকটা বড় ক্যাচালে। কেউ তাকে তেমন পছন্দ করে না।

সাধু গায়েন মুড়ি চিবোতে-চিবোতে বলে, তাও তোমার একখানা বাড়ি আছে, আমার তো তাও নেই। যাও-বা ছিল তা সব বেচেবুচে দিয়ে সেবার মায়ের চিকিৎসা করালাম। তা মাও বাঁচল না।

ঘটু বলল, তা হলে তোমার পরিবার থাকে কোথায়?

সে অনেক বৃত্তান্ত। নব দাস নামে এক গেরস্তবাড়িতে আমার বউ কাজের লোক। তা সেই বাড়িতেই গোয়ালঘরের পাশে একখানা লাকড়ির চালায় থাকে। জায়গা মোটে নেই। সেখানে আবার আমার থাকা বারণ। দিনমানে গিয়ে দেখা করা যায়, সন্ধের পর আর নয়। বর্ষাকালে ঘরে একহাঁটু জল হয়, তার মধ্যেই বউ দুটো বাচ্চা নিয়ে থাকে কোনওক্রমে।

তারানাথ খুব হাসছিল। বলল, ওই জন্যই তো বিয়েটা করিনি। বোনের বিয়ে দিতে গিয়ে সব ফরসা হয়ে গেল। দাঁতে কুটো চেপে এই পড়ে আছি মাস্টারের সঙ্গে। মাস্টার যদি কোনওদিন পেছুতে লাথি মেরে তাড়ায় তা হলেই হয়ে গেল।

গুরুপদ বলল, আহা, একাবোকা মানুষের আর চিন্তা কীসের? নিজের একখানা পেট ও ঠিক চলে যাবে। কাজও শিখছিস তো!

এ কাজের ভরসা কী বলো! লাইনে মিস্তিরি কিছু কম আছে? আর একাবোকাই কি চিরটাকাল থাকার ইচ্ছে ছিল?

ওরে কলের মিস্তিরির ভাত মারে কে? লেগে থাকলে কখনও না খেয়ে মরবি না।

পচা আর হাঁদুর বয়স কম। তাদের বিয়ে-টিয়ে হয়নি। তবে সংসারের খাঁই আছে। তারা ইদিকে কান না দিয়ে মুড়ি খেতে-খেতে হিন্দি সিনেমার গল্প করছিল। পরশু রাত্তিরেই একখানা মেরে এসেছে ভিডিও হল-এ। পচা মুড়ি খেতে-খেতেই সেই ছবির একখানা হিট গানের কলি গলায় খেলানোর চেষ্টা করছিল।

ঘটুর বয়স পচা বা হাঁদুর মতো কম নয়। তার বাইশ চলছে। সেও একাবোকা লোক। তারও থাকার জায়গা নেই। কিন্তু সেসব নিয়ে তার মাথা গরম হয় না। চোখ বুজলেই সে একখানা সাইকেল চোখের সামনে ভাসতে দেখে। মানুষ মেলা যন্তর আবিষ্কার করেছে বটে, কিন্তু সাইকেল হল একেবারে গন্ধমাদন। নির্ঝঞ্ঝাট জিনিস। পাঁইপাঁই করে উধাও হয়ে যাও। আবার সময়মতো ধীরেসুস্থে ফিরে এসো।

তা গুরুপদ যদি মাস্টারকে ছেড়ে নিজের ব্যাবসা খোলে তা হলে একটা জায়গা খালি হবে।

সেই জায়গায় উঠবে সাধু গায়েন। সাধু গায়েনের জায়গায় এক ধাপ উঠবে তারানাথ। তখন ঘটুর চাকরি পাকা হবেই।

চাকরি পাকা হলে মজুরি বাড়বে।

মজুরি বাবদে ব্রজমাস্টারের কিছু গণ্ডগোল আছে। ব্রজমাস্টার একটা মোটা হিসেবে খদ্দেরের কাছ থেকে টাকা নেয়। কর্মচারীদের দেয় নিজের হিসেবমতো। গুরুপদ বা সাধু গায়েন যা পায় তারানাথ তা পায় না। তা সে হতেই পারে। পুরোনো লোক বলে কথা! কিন্তু সেই হিসেবে পচা বা হাঁদুর চেয়ে বেশি পাওয়ার কথা ঘটুর। কেন না সে ওদের চেয়ে মাস ছয়েকের পুরোনো। কিন্তু কে সে কথা বলতে যাবে?

তবে মাস্টার খুব একটা মন্দ লোক নয়। কর্মচারীদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে না। ধর্মভীরুও আছে। আর খুব কাজ পাগল লোক।

গাঁ দেশে সন্ধের পর আর কিচ্ছুটি করার থাকে না। মুড়ি খেয়ে গুরুপদ বারান্দার এক কোণে মাদুর বিছিয়ে শুয়ে পড়ল। সাধু গায়েন আর তারানাথ বসে-বসে নানা সুখ দুঃখের কথা ফেঁদে বসল। পচা আর হাঁদু বেরিয়ে পড়ল ফের ভিডিও দেখবে বলে। উদয়পুর থেকে মাইলটাক উজিয়ে গেলেই মেহেরগঞ্জে আজ হাট। ভিডিও সেখানে আছেই। পচা একবার আলগোছে জিগ্যেস করল বটে, যাবে নাকি ঘটুদা? ঘটুর ইচ্ছে হল না। ঝাড়পিট আর আশনাই আর নাচা-গানা সবসময়ে ভালো লাগে না। বরং চোখ বুজে একখানা স্বপ্নের সাইকেলে সওয়ার হলে অনেক ভালো।

সাইকেলখানা দিব্যি দেখতে পাচ্ছিল ঘটু। শ্যাওলার মতো সবজে রং, ঝকঝকে ক্যারিয়ার, গোল ডিবের মতো বেল, একটু নীচু হ্যান্ডেল। সাঁই সাঁই করে যাচ্ছে পাকা রাস্তা ধরে। সিটের ওপর ঘটু...

ব্রজমাস্টার আর মহিম মণ্ডল কথা কইতে কইতে ভিতর-বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল।

ব্রজমাস্টার কথা বলছিল, এত তাড়াতাড়ি কি এসব কাজ হয় মহিমবাবু? সবে তো বাঁশটাশ লাগানো হল। এরপর বড় পাইপ ঢুকবে। তারপর জলের পাইপ, চাট্টিখানি কথা তো নয়। আজ শনিবার, সামনের শনিবারের আগে হচ্ছে না, যদি তাও হয়।

মহিম মণ্ডল ঠান্ডা গলাতেই বলল, সবই বুঝি হে ব্রজ। বলছি তো তিনগুণ মজুরি দেব।

করে দাও। মেয়ের বিয়েটা হুট করে ঠিক হয়ে গেল কিনা। বুধবার বিয়ে। তুমি বুধবার সকালের মধ্যে কাজ সেরে দাও।

বুধবার যে অসম্ভব মহিমবাবু। তিনশো ফুটের ওপর পাইপ ঢোকান কি চাট্টিখানি কথা?

তুমি ওস্তাদ লোক, মন করলে কী না পারো! দিনরাত কাজ করলে হয়ে যাবে। মজুরি চারগুণ দেব।

টাকা বাড়ালেই তো হবে না। এগুলো তো মানুষ, মেশিন তো নয়। চারদিন টানা চব্বিশ ঘণ্টা কাজ করলে যে মরে যাবে।

আমার সম্মানটা রাখো মাস্টার। পাত্রপক্ষ বড়লোক, তাদের কথার নড়চড় নেই। পাত্র গোরক্ষপুর থেকে এসেছে, বিয়ে করে শুক্রবার বউভাত সেরেই চলে যাবে কাজের জায়গায়। এ পাত্র হাতছাড়া হলে তো চলবে না।

কী মুশকিল! পাত্র হাতছাড়া হতে যাবে কেন? হোক না বিয়ে, আমরা না হয় বিয়েটা ফাঁক রেখে দু-দিন পরেই কাজ করব।

আহা, আমি যে শ্যালো বসালুম তা তাদের দেখাতে হবে না? তারা বড়লোক, কিন্তু আমিও কম কীসে? শ্যালোতে ভটাভট জল উঠবে, ট্যাঙ্কে জমা হবে, হুড়-হুড় করে পাইপ দিয়ে পড়বে, দেখে তাদের চোখ ট্যারা হয়ে যাবে, তবে না!

এ যে বড় মুশকিলে ফেললেন মশাই। আমি রাজি হলেও আমার লোকেরা কি রাজি হবে ভাবছেন?

ডাকো তাদের, মজুরি চারগুণ তো পাবেই, তার ওপর আমি প্রত্যেককে দুশো টাকা করে বকশিস দেব।

সাধু আর তারানাথের বাক্যালাপ থেমে গেছে। গুরুপদও উঠে বসেছে অন্ধকারে।

তারানাথ চাপা গলায় বলল, শুনলে?

গুরুপদ বলল, শুনলাম।

সাইকেলের দরদাম জানে না ঘটু। দুশো টাকায় কি হয়? হোক-না-হোক, সাইকেলটা যেন আবডাল থেকে খুব খুশির ঘণ্টি বাজাতে লাগল। সে এসে পড়তে চাইছে।

মাস্টার হাঁক মারল, গুরুপদ! ও গুরুপদ, একবার আয় তো এদিকে ভাই।

গুরুপদ উঠে পড়ল। সঙ্গে সাধু গায়েন আর তারানাথও।

ঘটু গুরুতর কথায় থাকে না। তবে আড়ালে কান খাড়া করে রইল সে।

এই যে গুরুপদ, বাবু কী বলছে শোন। পারবি চার দিনে কাজ তুলে দিতে?

দশ দিনের কাজ চার দিনে? ও বাবা।

মহিম মণ্ডল বলল, বাপু হে, হওয়ার কথাটা ভাবো, না হওয়ার কথাটা ভেবো না। দশ দিনে পারলে চার দিনেও পারা যায়। খাটুনিটা বাড়িয়ে দেবে।

আজ্ঞে মানুষের শরীর তো?

মানুষ কি কম কিছু করছে? পাহাড়ে উঠছে, সমুদ্দুর পেরোচ্ছে সাঁতরে, আরও কত কথা শুনি। আমার যে সম্মানের প্রশ্ন হে!

আজ্ঞে মজুরিটা কত দেবেন।

যা পাও তার তিনগুণ, আর দুশো টাকা করে বকশিশ।

মাপ করবেন, ওতে পারব না।

কত চাও?

মজুরি চার ডবল করুন। আর হাতে-হাতে তিনশো করে টাকা।

সুযোগ বুঝে বাড়াচ্ছে হে!

আজ্ঞে না। শরীরের রসকস নিংড়ে দিতে হবে যে। চার দিন না ঘুমিয়ে, জিরিয়ে কাজ করলে মানুষের কী অবস্থা হয় তা তো জানেন।

মহিম মণ্ডলের পয়সা আছে, পয়সার গরমও আছে। হঠাৎ হুঙ্কার দিয়ে উঠল, তাই পাবে। লেগে পড়ো, বুধবার বেলা বারোটার মধ্যে কাজ সারা চাই। জামাই আসবে সাড়ে পাঁচটায়। তার আগে এমন করে সব সারতে হবে যে, সদ্য হয়েছে বলে বোঝা না যায়।

তা হয়ে যাবে।

আজ রাত থেকেই শুরু করে দাও। আমি ইলেকট্রিক মিস্ত্রি সাধনকে খবর দিচ্ছি, সে এসে একটা ডুম জ্বালানোর ব্যবস্থা করে দিক লাইন টেনে।

যে আজ্ঞে।

ও ঘটু, পচা আর হাঁদুকে দৌড়ে গিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। বেশি দূর যায়নি বোধ হয়।

তারানাথের হাঁক শুনে ঘটু উঠে ছুটল। আর ছুটতে-ছুটতে তার মনে হল, এই অবস্থায় একখানা সাইকেল থাকলে? আঃ, শুধু প্যাডেল মারো আর উড়ে যাও।

পচা আর হাঁদু গাঁ পেরোনোর আগেই ধরে ফেলল ঘটু। বৃত্তান্ত শুনে তারা পড়ি-কি-মরি করে ছুটে এল। সাজো সাজো রব।

মহিম মণ্ডল ভারী খুশি হয়ে বলল, এই তো চাই। ভালো করে কাজ করো বাবাসকল, আজ রাতে খাসির মাংস খাওয়াব।

ব্রজমাস্টার হাত জোড় করে বলল, ওটি করবেন না। গুরুভোজন হয়ে গেলে সবাই ঢুলবে, কাজ এগোবে না। বরং রুটি তরকারির বন্দোবস্ত করুন। ঊন-পেটে থাকলে রাত জাগতে সুবিধে হয়।

পুবের আকাশে সূয্যি ঠাকুরের মতো মাংসটা উদয় হচ্ছিল, কিন্তু অস্তও হয়ে গেল। বেজার মুখে ঘটু কাজে নেমে পড়ল।

কাজও বড় সোজা নয়। কার্তিক মাস, হিমেল হাওয়া দিচ্ছে। দু-খানা ডুমের আলোয় বড় বড় ছায়া ফেলে তারা কেসিং-এর পাইপ পুঁততে লাগল। হ্যামার মারতে মারতে হাঁদু, পচা আর ঘটুর গা ঘেমে গেল কয়েক মিনিটেই। তা ঘামুক, মণ্ডলের পো পুষিয়ে দিচ্ছে।

ভোর হতে না হতেই চারখানা পাইপ নেমে গেল নীচে।

ব্রজমাস্টার একখানা ঢিবির ওপর বসে দেখছিল সব। বলল, এবার যাও, চোখেমুখে জল দিয়ে একটু জিরিয়ে নাও। মুড়িটুড়ি যা জুটবে খেয়ে ঘণ্টা দুই ঘুমোও। একেবারে না ঘুমোলে শরীর দেবে না। কাজটা তোলা চাই। শরীর পাত হয়ে গেলে কাজ তুলবে কে? মুড়ি এল, সঙ্গে সেই গুড় তো আছেই, মণ্ডলের পো একধামা বেগুনিও পাঠিয়েছে

গরমাগরম। কিন্তু ব্রজমাস্টার বেগুনির ধামা সরিয়ে নিল। বলল, ও জিনিস চলবে না। খাটুনির পর এসব ভাজাভুজি পেটে গেলে আর দেখতে হবে না।

শেষ অবধি দয়াপরবশ হয়ে দু-খানা করে দিল।

দুপুর অবধি কাজ অনেকটাই এগোল। দুপুরে যখন পেটে খাণ্ডবদাহনের খিদে তখন যা জুটল তা ব্রজমাস্টারের হুকুমেই। তেতোর ডাল, একটা ঘ্যাঁট আর ভাত। সঙ্গে আলু সেদ্ধ। ব্রজমাস্টার বলল, গুরুপাক খেলে শরীর দেবে না। ঊন খাওয়াই ভালো। কাজ তুলে দে, তারপর বিয়ের ভোজ তো আছেই।

খাওয়ার পর ফের ঘণ্টাখানেক ঘুমিয়ে নিলে তারা। তারপর ফের কাজ। পাইপ নামছে। কাজ এগোচ্ছে। তবে রাতের মধ্যেই ঘটু বুঝতে পারল শরীরের নাম মহাশয়। চোখে ঢুলুনি। হাত পায়ে সেই দুনো জোর আর নেই। তিনশো টাকা আর তিন ডবল মজুরিতে তার সাইকেলখানা হয়ে যাবে, এই আশায় হ্যামার মারতে লাগল ঘটু। গুরুপদ খাটছে, দু-হাজার টাকার খানিক উশুল করবে বলে। সাধু গায়েন বউকে উঞ্ছবৃত্তি থেকে রেহাই দেবে। তারানাথ বিয়ে বসবে। পচা আর হাঁদু টাকাটা ওড়াবে ইচ্ছেমতো, কিছু বাড়িতেও দেবেথোবে। নানান ধান্ধায় মহিম মণ্ডলের শ্যালো নামছে মাটিতে। গভীরে।

সোমবার উদয়পুরের হাট। মহিম মণ্ডলের বাড়ির পাশের মাঠ থেকেই হাটের শুরু। রবিবার বিকেল থেকেই ব্যাপারীরা এসে হাজির হচ্ছিল পিলপিল করে। সোমবার সকালে হাঁকেডাকে জমজমাট।

খাওয়াটা তেমন জুতের হচ্ছে না, বুঝলে? আরে খাটলে পিটলে একটু পোস্টাইও তো চাই। এই বলে পচা আর হাঁদু যখন ব্রজমাস্টার সকালে মাঠপানে গেছে, তখন হাটে গিয়ে ভরপেট ঘুগনি মেরে এল। মহিম মণ্ডলের চারটে মোষ আর বারোটা গরু। পিছনের উঠোনে সকাল বিকেল যখন দোয়ানো হয় তখন মচ্ছব লেগে যায়। পচা আর হাঁদু এক ফাঁকে গিয়ে এক ঘটি করে মোষের দুধ কাঁচাই গিলে এল। রাখাল লোকটা দিলও, কারণ বাবুর গুরুতর কাজ হচ্ছে, মিস্তিরিরা জান কয়লা করে খাটছে, না দেবেই বা কেন?

বিকেলের মধ্যেই দুজনের পেট নামল সাংঘাতিক। কাজ করবে কি, হাতের জলই শুকোয় না। তার ওপর তারানাথের এল কম্প দিয়ে জ্বর।

এঃ, এ যে তীরে এসে তরী ডুবতে বসল দেখছি। বলে মুখ বেজার করল ব্রজমাস্টার।

মহিম মণ্ডল বলল, গতরে খাটার লোক দিতে পারব। তবে তারা এ ব্যাপারে আনাড়ি।

তাই দিন। কাজ তো চালাতে হবে।

দুটো মুনিশ আর ঘটু মিলে ফের লেগে পড়ল। সোমবার মাঝরাতে কেসিং-এর পাইপ তিনশো ফুট নামল বটে, কিন্তু ঘটুর তখন হাতে-পায়ে সাড় নেই।

মাঝখানের পাইপ নামানো সাবধানের কাজ। রেঞ্চ দিয়ে ঠিকমতো আটকে না রাখলে একখানা পাইপও যদি পিছলে ভিতরে পড়ে যায় তো চিত্তির। সব পরিশ্রমই বৃথা যাবে। এ কাজ আনাড়ি দিয়ে হওয়ার নয়। জ্বর গায়েই তারানাথ এসে হাত লাগাল। পচা আর হাঁদুও লেগে পড়ল ফের। হাঁদু চুপিচুপি ঘটুকে বলল, আমার ঠাকুরদা রক্ত আমাশায় মারা গিয়েছিল। আমারই সেটাই হয়েছে, তলপেটে বড্ড যন্ত্রণা।

সাত-আট ঘণ্টা খাটার পর দু-ঘণ্টা ধরে ঘুমোচ্ছে তারা। কিন্তু তাতে শরীরের আবল্যি যাচ্ছে না। পাইপ নামানোর সময় রেঞ্চ ধরা হাত দু-খানা থরথর করে কাঁপছিল ঘটুর। দাঁতে দাঁত চেপে ধরে রইল। চোখ বুজলেই সাইকেল। সাইকেলখানা দেখতে পেলেই বুকখানা যেন ভরে যায়। নীচু হ্যান্ডেল, শ্যাওলা সবজে রং, ঝকঝকে ক্যারিয়ার।

হড়াক করে একটা শব্দ হওয়ায় চটকা ভাঙল ঘটুর। সবাই চেঁচাচ্ছে, গেল! গেল! রেঞ্চ তার ঘুমন্ত হাত থেকে আলগা মেরে পাইপ সরসর করে নেমে যাছিল। ঘটু প্রাণ হাতে নিয়ে দুহাতে সাপটে ধরল পাইপ। কাদা জলে পিছল হাত। আর চারখানা জোড়ের ভারী পাইপ। ধরে রাখতে হাতির জোর চাই। তবু ধরে রইল ঘটু। অন্য সবাই হাত না লাগালে হয়ে যেত।

না, ব্রজমাস্টার বকল না। বরং বলল, ওর দোষ কী? শরীর বলে কথা। ও ঘটু, যা বরং জর্দা দিয়ে একটা পান খেয়ে আয় ঘুমের চটকাটা যাবে।

পান আর খেতে হল না। দু-খানা হাতের তেলোর দিকে চেয়ে ঘটু জলভরা চোখে দেখল, হাত দু-খানা ছড়ে কেটে একশা। ভারী পাইপ ধরে রাখতে গিয়ে কেসিং-এর কানায় চেপে গিয়ে গর্ত হয়ে কেটেছে পঞ্জার তলার দিকটা। কলের মতো রক্ত পড়ছে। সাধু গায়েন রেঞ্চটা নিজের হাতে নিয়ে বলল, যা, ঘাস থেঁতো করে লাগা।

তাই লাগাল ঘটু। বাবুভাইদের হাত হলে ভোগাত। মিস্তিরির হাত বলে তেমন গা না করলেও চলে। তবে বসে থাকতে ভয় হচ্ছে ঘটুর। মহিম মণ্ডল যদি কথা তোলে, আমার মুনিশ খাটছে, তোমার লোক বসে আছে, আমি মজুরি কাটব। মুনিশ দুটোকেও তো দিতে হবে। তারা তো মাগনা খাটছে না!

কথাটা তারানাথের কানে দিল ঘটু। তারানাথ বলল, না রে, মহিম দিলদরিয়া লোক। কাটবে না।

মঙ্গলবার রাতে যখন পাইপ নেমে গেল, আর মুখ সিল করা হল তখন ঘটুর হাতে বড় বড় ফোস্কা। লেবুকাঁটা দিয়ে ফোস্কা গেলে মরা চামড়া সরিয়ে দিল সে নিজেই। তারপর বিষহরি তেল লাগাল। গরিবের হাত এতেই সারে। না সারলে কি চলে?

সারারাত জল ঢালা হল পাইপে। প্রথমে গোরবগোলা, তারপর সাদা জল। পাম্প চালিয়ে জল বের করা হতে লাগল। সবাই টান টান। জলের প্রেশার যেমন, ঠিকমতো মোটা নালে ওঠে কি না ওঠে।

বুধবার ভোরবেলা ভোগবতী মহিম মণ্ডলের পাইপ বেয়ে উঠে এলেন। ফুরফুরে জল। পরিষ্কার ঝকঝকে।

বিয়েবাড়ির তুমুল হইরইয়ের মধ্যেও মহিম ছুটে এসে পিঠ চাপড়ে দিল ব্রজমাস্টারের, কাজ দেখালে বটে বাপু! তাজ্জব!

জল ট্যাঙ্কে উঠে যাচ্ছে ডিজেল পাম্পে। বিয়েবাড়ি ভাসাভাসি।

কাজ শেষ করে তারা বাইরের দিককার ঘরের বারান্দায় বসে আছে পাশাপাশি। সামনের ফাঁকা মাঠে রাতারাতি মস্ত ম্যারাপ বাঁধা হয়ে গেছে। এই ম্যারাপের নিচেই সাঁঝবেলায় বিয়ের আসর বসবে। মণ্ডলের পো জামাইকে ঢেলে দিচ্ছে। স্কুটার, টিভি, আরও কী-কী সব যেন। জামাইও জম্পেশ। মস্ত চাকরি।

কাজের মেয়ে বলে গেছে আজ মুড়ির সঙ্গে গরম বোঁদে দেওয়া হবে, আর দুখানা করে সন্দেশ। আর বেগুনিও। কিন্তু কারোই তেমন গা নেই। শরীর নিংড়ে দিতে হয়েছে গত চার দিনে। কাজটা উঠে গেছে এই যা একটা ভালো খবর।

গুরুপদ হিসেব কষছিল। কষে বলল, আরও হাজারখানেক হলেই হয়ে গেল।

সাধু গায়েন দেওয়ালে হেলান দিয়ে চোখ বুজে বসেছিল। বলল, আমার এখনও ঢের দেরি। যতীন মজুমদারের জমিটা আড়াই কাঠা। তাও দশ হাজার চাইছে।

এইসব কথাবার্তা হচ্ছিল। সকলেরই দমসম অবস্থা। গড়িয়ে নিতে পারলে হয়। হঠাৎ একটা শোরগোল মতো শোনা গেল ভিতরবাড়ি থেকে।

গুরুপদ সোজা হয়ে বসে বলল, গোল কীসের?

তারানাথ বলল, বিয়েবাড়িতে অমন হয়। আত্মীয়স্বজনের মধ্যেই পুরোনো খার থাকে কিনা।

একটু বাদেই হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে এল ব্রজমাস্টার, ওরে, সর্বনাশ হয়েছে। বাবুর মেয়ে পালিয়ে গেছে।

সবাই সোজা হয়ে বসল।

ব্রজমাস্টার উত্তেজিত হয়ে বলল, সকালে কুয়োপাড়ে মুখ ধোয়ার নাম করে গিয়েছিল। সেখান একটা ছোকরা সাইকেল নিয়ে তৈরি ছিল। রডে তুলে নিয়ে হাওয়া।

তারানাথ বলল, তা হলে কী হবে?

কী আর হবে। মহিমবাবু মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছেন। গিন্নি মূর্ছা গেছেন। চারদিকে লোক গেছে মেয়ে খুঁজতে। কিন্তু খুঁজে পেলেও লাভ নেই। রা পড়ে গেছে। পাত্রপক্ষ গায়ে হলুদের তত্ব নিয়ে এসেছিল, তারাও জেনে গেছে। বিয়ে ভেস্তেই গেল ধরে নাও।

ঘটু উঠে সোজা হয়ে বসে বলল, সাইকেল?

ব্রজমাস্টার অবাক হয়ে বলে, সাইকেল! সাইকেলের কথা উঠছে কেন?

ঘটু একগাল হেসে বলল, সাইকেলের কথাই তো বললেন! সাইকেলে করেই তো পালিয়েছে!

হ্যাঁ। তাতে কী?

ঘটু উজ্জ্বল চোখে চেয়ে রইল। একখানা সাইকেল হলে কত কী না করা যায়!

গণ্ডগোল

রামী কেমন মেয়ে তাও কুমুদ জানে না। অথচ রামী একরকম তার বিয়ে করা বউ। খবর যা পাচ্ছে কুমুদ তা মোটেই ভালো নয়। রামীর নাকি বিয়ে! গণ্ডগোল মানেই হল কুমুদ। তার গোটা জীবনটাই নানা গণ্ডগোল, গুবলেট আর কেলোর একটা যোগফল। বাপের দুটো বউ আর তেরোটা ছেলেমেয়ে। তার ওপর বাপটা রগচটা, দুই মায়ের উস্তম কুস্তম ঝগড়া। সব মিলিয়ে নরক গুলজার। তেরোটা ছেলেমেয়ে যে যার মতো ষণ্ডাগুণ্ডা বাঁদর গরু তৈরি হচ্ছে। কুমুদ ছিল তার মধ্যে আরও সরেস। মাস্টাররা মারত, বাপ পেটাত, মা ঠ্যাঙাত, দাদা দিদিরাও উত্তম মধ্যম দিতে কসুর করত না। যাত্রা দলে নাম লেখাতে গিয়েছিল বলে অবশেষে ঠিক চৌদ্দ বছর বয়সে কুমুদকে তার বাপ জুতো পেটা করে বাড়ির বার করল।

ভেবে দেখল কাজটা ঠিকই হয়েছিল। বাপের তেমন দোষ দেওয়া যায় না। চৌদ্দ বছর বয়সে আরও অনেক গুণ দেখা দিয়েছিল তার। বিড়ি খাওয়া, গাঁজা টানা, হাঁড়িয়া পচাইও বেশ চলে যেত। নষ্ট হওয়ার পথে চৌদ্দ বছর বয়সটা খুবই কাঁচা ছিল। তা ছাড়া ভেবে দেখলে তেরোটা ছেলেমেয়ের মধ্যে এক-আধটা কমে গেলে বাপের তেমন ক্ষতিও ছিল না, কে কার কড়ি ধারে।

কুমুদ জুতো পেটা হয়ে যখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল তখন চারিদিকে উদোম উধাও পৃথিবী। যেদিকে খুশি যাও, যা খুশি করো, কিছু বলার নেই কারও।

চৌদ্দ বছর বয়সে সে এক ভারী মজার ব্যাপার। প্রথম রাতটা জল খেয়ে গাছতলায় কাটিয়ে দিল কুমুদ। বেশ লাগল। একটু খিদে পায়, এই যা মুশকিল। কুমুদ চার-পাঁচ গাঁ

তফাতে গিয়ে এক বাড়িতে চাকরের কাজ নিল। ঠিক তিন দিন বাদে ফাঁক বুঝে গিন্নিমার সোনার বালাটা হাতিয়ে কেটে পড়ল।

মতি স্যাকরা খুব ঠকিয়েছিল। মাত্র দেড়শো টাকা তাও মেলা ঝোলাঝুলির পর দিয়েছিল।

ধড়িবাজ লোক, বালাটা হাতে নিয়ে তার দিকে এক ঝলক তাকিয়ে বলল, 'এ তো চুরির মাল বাপু, ধরা পড়লে তোমারও হেনস্থা আমারও হেনস্থা।'

দেড়শো টাকায় কয়েকটা দিন একেবারে রাজার হালে কেটে গেল কুমুদের। তারপর সে আরও তফাত হতে লাগল। দশ-বিশ গাঁ আর দুটো গঞ্জ ছেড়ে ফুলপুরে বাসা গাড়ল। তুচ্ছ কাজ, একটা পুরোনো কালীমন্দির, ঝাঁট-পাট দেওয়া আর ধোয়া মোছার কাজ। মাইনে পাঁচ টাকা আর দু-বেলা খাওয়া।

এ কাজটা কুমুদের বেশ ভালোই লাগত। খবরদারি কারার লোক নেই, ছড়িদার নেই, খাটুনিও কিছু নয়। একদিন কালীমন্দিরে দুপুরবেলা এক ঝুব্বুস বাবাজি এসে হাজির। জটাজুট, দাড়ি আর ময়লা রক্তাম্বর। আর গায়ে যে বোঁটকা গন্ধ। বাবাজি নানারকম হু-হুঙ্কার ছেড়ে আর অং-বং চিৎকার করে আসার জমাতে চেষ্টা করল। সুবিধে হল না। তারপর কুমুদকে ধরে পড়ল, 'দুটো টাকা দে সাপ ধরা শিখিয়ে দেব।'

দুটো টাকার তখন মেলা দাম। কুমুদ রাজি হল না। হতাশ হয়ে বাবাজি তখন নাট মণ্ডপে শুয়ে ভোঁস-ভাঁস করে ঘুমোতে লাগল।

এমনই কপাল, ঠিক সেই সময়েই একটা গোখরো সাপ বেরোল মন্দিরের দক্ষিণ কোণে। সাপ! সাপ!

বাবাজি চেঁচামেচিতে উঠে পড়ল। তারপর এলেম দেখাল বটে।

সাপটা সবে নাট মন্দিরে নীচের ধাপে কিলবিল করে ঘাস জঙ্গলে পালাবার ফিকির খুঁজছিল, বাবাজি গিয়ে খপ করে লেজে ধরে সেটাকে তুলে ফেলল। অন্তত আড়াই হাতের পাকা গোখরো।

বাবাজি সাপটাকে হাতে ঝুলিয়ে পাকা চোখে সর্বাঙ্গ দেখে নিয়ে বলল, 'গাভীন আছে। পেট ভরা ডিম।'

চিমটে দিয়ে দুটো বিষদাঁত উপড়ে সাপটাকে ফের ঘাস জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে কুমুদের দিকে চেয়ে বলল, 'সবক'টা ডিম ফুটে যখন বাচ্চা বেরোবে তখন গরমের সময় ঘাসে পা দিতে পারবি না, ঠুকে দেবে।'

সাপের ভয় কুমুদের তেমন নেই। জন্মাবধি সাপখোপ নিয়েই বসবাস। তবে বাবাজি বেশ খপ করে সাপটাকে ধরে ফেলল তাতে সে বুঝল, বাবাজি এলেমদার লোক।

দুটো টাকা কবুল করে সে বাবাজির কাছে সাপ ধরা শিখিল দু-দিন ধরে। অবশ্য দু-টাকায় হল না। গাঁজার পয়সা, ভাতের ভাগও দিতে হল।

অভাবে পড়লে কুমুদ সাপ ধরে বেচে দিয়ে আসত গঞ্জে। বিষ আর চামড়া দুইয়েই কিছু দাম আছে। তবে তেমন কিছু নয়।

বুড়ো পুরুতের মেয়ে পুতুলকে কু-প্রস্তাব দিয়েছিল বলে যে কী ঠ্যাঙানটাই না ঠ্যাঙাল গাঁয়ের মোড়ল মাতব্বররা। হেনস্তার আর শেষ ছিল না। ভেবে দেখলে কুমুদ কাজটা খারাপই করেছিল। পুতুল বড় ভালো মেয়ে।

ঠ্যাঙানিটা খেয়েছিল বিকেল বেলায়। মেরে গাঁয়ের বাইরে একটা গাছতলায় টেনে ফেলে দিয়েছিল তাকে। জ্ঞান যখন ফিরল তখন অনেক রাত। গায়ে গতরে সাংঘাতিক ব্যথা। চোখেও ভালো দেখছে না। কিছুক্ষণ জিরিয়ে কুমুদ ফের গাঁয়ে ঢুকল। সোজা কালীমন্দিরে গিয়ে কালীর নথ আর দু-চারটে বাসন নিয়ে চম্পট দিল। নথটা সোনার, জানা ছিল কুমুদের।

এর পরের ঠেকটা বেশ ভালোই জুটে গেল কুমুদের। মানুষের মেলায় একটা চপের দোকানে সে তখন জোগানির কাজ করে। সেদ্ধ আলু মাখে, নেড়ো বিস্কুট গুঁড়ো করে উনুনে হাওয়া দেয়, খদ্দেরকে চপ কাটলেট পরিবেশন করে, পাতা ফেলে। মেলায়-মেলায় ঘুরতে হয়। দোকানের মালিক লোক তেমন সুবিধের নয়, একটু খেঁকি গোছের। নানুরের মেলায় এক খদ্দেরের নতুন শালে চা চলকে পড়ায় মালিক উঠে এসে দু-তিনটে থাপ্পড় কষালে। কিন্তু শালওয়ালা লোক ভালো। প্রথমে গালাগাল করলেও মারধর দেখে সে-ই এসে মেটাল। কুমুদের খুব দুঃখ হয়েছিল সেদিন। মালিক চড় থাপ্পড় দিয়েও ক্ষান্ত থাকেনি, জবাবও দিয়েছিল। মালিকের সন্দেহ ফাঁক পেলেই কুমুদ পয়সা সরায়। ক'দিন ধরেই তাড়াব তাড়াব করছিল। তা মালিকের দোষ নেই। পয়সা কুমুদ সরাত বটে।

দোকান থেকে বেরিয়ে ফ্যাফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছিল কুমুদ। হঠাৎ সেই শালওয়ালার সঙ্গে দেখা।

'এই যে খোকা—তোমাকে কি লোকটা তাড়িয়ে দিল?'

'হ্যাঁ। আপনার জন্যেই তো, চায়ের দাগ দুধ দিলেই উঠে যায়। ঝুটমুট আমার চাকরিটা খেলেন।' শালওয়ালা ভারী অপ্রস্তুত। বলল, 'তা বটে, তাহলে আর কী করা। চলো, আমার সঙ্গে, মানুষকে নিরাশ্রয় দেখলে আমার ভারী কষ্ট হয়।'

তা সেই শালওয়ালার বাড়িতে কয়েদিন তোফা কাটল কুমুদের। আসলে শালওয়ালার তিনকূলে কেউ নেই। হরিগঞ্জ গাঁয়ে বেশ বড় বাড়ি। অবস্থাও ভালো। লোকটা ইস্কুলে মাস্টারি করে। আর নানা বায়ু আর বাতিকে ভোগে। ঘন-ঘন হোমিওপ্যাথি ওষুধ খায়। কোথায় পয়সা রাখে তা বেবাক ভুলে যায়। দুটো চাকর আর-এক জন রান্নার লোক যে কেন লাগে কে জানে!

সে বাড়িতে থেকে বেশ দু-পয়সা আয় হতে লাগল কুমুদের। খ্যাঁটের বন্দোবস্তও বেশ ভালো। আর দুটো চাকর, রান্নার লোক আর কুমুদ চারজনই হাত লাগাত। বেশ জমে গিয়েছিল চারজনে।

শালওয়ালার নাম ছিল গিরিনবাবু। তা গিরিনবাবু একদিন তাকে ডেকে চুপিচুপি বলল, 'শোন কুমুদ, আমি ঠিক করেছি তোমাকে পুষ্যি নেব। উইল করে আমার বিষয় সম্পত্তি সব তোমাকেই দিয়ে যাব। এক জ্যোতিষী বলেছে আমার আয়ু আর বেশিদিন নয়।'

কুমুদের কাছে এ প্রস্তাব স্বপ্নের মতো। সে তক্ষুনি রাজি হয়ে গেল।

তবে পুষ্যি নেওয়াটা মুখে মুখেই হল। কাগজপত্র কিছু লেখা থাকল না। গিরিনবাবু মাথাপাগল লোক, তাঁর খেয়ালও কম।

কুমুদকে যে গিরিনবাবু পুষ্যি নিয়েছেন একথাটা কিন্তু তাঁর দুই চাকর ভজা আর কানু বিশ্বাস করল না। ঠাকুর নন্দলালও গায়ে মাখল না। অথচ এদের ওপরে খবরদারি করতে না পারলে তার পুষ্যি হয়েই লাভটা কী? তবে গিরিনবাবুকে সে প্রকাশ্যে বেশ খোলা গলায় 'বাবা' বলে ডাকতে শুরু করে দিল।

গিরিনবাবুর হঠাৎ একদিন খেয়াল হল কুমুদের বিয়ে দেওয়া দরকার। ব্যস, সঙ্গে-সঙ্গে তিনি পাত্রী খুঁজতে লোক লাগিয়ে দিলেন। গাঁয়ে গঞ্জে পাত্রীর অভাব নেই। মেয়ের বাপেরা মুখিয়ে বসে আছে। নবীগঞ্জের পরেশ পালের মেয়ে রামীকে পছন্দ করে এলেন গিরিনবাবু। তারপর বেশ বাজনা-টাজনা বাজিয়ে ফস করে বিয়েও হয়ে গেল। রামী তখন নিতান্তই বালিকা। ন-দশ বছর বয়েস। কথা ছিল বিয়ের পর বউ বাপের বাড়িতেই দু-চার বছর থাকবে।

কিন্তু গোলমাল বাধল অন্য জায়গায়। বিয়ের পর পরেশ পালের জ্ঞানের চোখ খুলল। তার কাছে যে কুমুদ সজাত হলেও গিরিনবাবুর ছেলে নয়, পুষ্যি। তার ওপর কুমুদের নানা কীর্তি কাহিনীও ততক্ষণে চাউর হয়ে গেছে। পরেশ পাল এসে একদিন খুব হাত-পা নেড়ে গিরিনবাবুকে পাঁচ কথা শুনিয়ে গেল।

গিরিনবাবু সেই অপমানের পর শয্যা নিলেন। এবং তিনদিন বাদে একদিন সকালে দেখা গেল, ঘুমের মধ্যে গিরিনবাবু ইহলোক ছেড়েছেন। তার তিনদিনের মধ্যে কোথা থেকে পিল পিল করে গিরিনবাবুর একগাদা ভাইপো ভাইঝির আগমন ঘটল। তারা এসেই বাড়িটাড়ি দখল করে ফেলল, আর ঘাড় ধরে কাজের লোকেদের তাড়াতে লাগল।

কুমুদ বোঝানোর চেষ্টা করেছিল যে, সে আজ্ঞে কাজের লোক নয়। হু-হু বাবা, সে হল পুষ্যি পুত্তুর।

একথায় তারা এমন হেসে উঠল যে, কহতব্য নয়।

কুমুদ তবু গাঁইগুই করছিল। তখন গিরিনবাবুর ভাইপোরা ধরে খুব আড়ং ধোলাই দিল তাকে। তারপর জুতো পেটা করে তাড়াল। অবশ্য শুধু হাতে বিদায় নেওয়ার পাত্র কুমুদ নয়। দুশো টাকা আগেই সরিয়েছিল, যাওয়ার সময় দু-চারখানা বাসন, একখানা অ্যালার্ম ঘড়ি, তিনজোড়া জুতো সরিয়ে নিল।

কখনও-কখনও আমও যায় ছালাও যায়। গিরিনবাবুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে সে নবাবগঞ্জের শ্বশুর বাড়িতেও একবার গিয়েছিল। পরেশ পাল তাকে বারবাড়ি থেকেই কুকুরের মতো খেদিয়ে দেয়। স্পষ্টই বলে দেয় যে মেয়ে তার কুমারীই আছে। আবার বিয়ে দেব। কুমুদকে সে জামাই হিসেবে মানে না। কুমুদ মাথা নেড়ে স্বীকার করে নিয়ে বলল, 'মানা উচিতও নয়।'

সুখের পর দুঃখটা বেশ গায়ে লাগে। কুমুদেরও লাগল। গিরিনবাবুর বাড়িতে তোফা কয়েকদিন কাটানোর পর ফের খিদের কষ্ট সহ্য হচ্ছিল না।

কিন্তু গিরিনবাবুর মতো আর-এক জন মাথাপাগলা লোক না পাওয়া গেলে এসব সমস্যার সুসারও হয় না। কুমুদের ফেরেববাজি করে দিন কাটতে লাগল।

নোনাপুকুরের শ্মশানে একদল সন্ন্যাসী ডেরা গেড়ে ছিল। তারা সব হিমালয়ে থাকে। গঙ্গাসাগরে এসেছিল ফিরে যাচ্ছে। তাদের কাছে জরিবুটি কিছু পাওয়া যায় কি না এই আশায় কুমুদ গিয়ে তাদে সঙ্গে ভিড়ল, গাঁজা সেজে দেওয়া, পা দাবানো সবই করল। কিন্তু বুঝল সাধুগুলো কেপ্পন গোছের। কিছু ভাঙতে চায় না।

দু-দিন বাদে সাধুগুলো ডেরা গুটাল। আশায়-আশায় তাদের সঙ্গ নিল কুমুদ। গায়ে ছাইটাই মেখে নিল। জটা হয়নি তবে যথাসাধ্য ধুলোটুলো ঘসে মাথাটারও একটা ব্যবস্থাও করে ফেলল। কমণ্ডুল, শূল, আর কৌপীনও ধারণ করে নিল। সাধু সাজলেও এদেশে কিছু রোজগার বাঁধা। তাকে তাড়াল না সাধুরা।

হাঁটতে-হাঁটতে দুটো জায়গায় রাত কাটিয়ে পরদিন দুপুর নাগাদ যে গাঁয়ে পৌঁছল সেটা কপালক্রমে নবীগঞ্জ। কুমুদের শ্বশুর বাড়ি। শ্মশানে সাধুরা ধুনি জ্বালিয়ে চায়ের জল চাপাল, কুমুদের ওপর হুকুম হল দুধ জোগাড় করে আনতে।

মনটা ভালো ছিল না কুমুদের। সাধু হয়ে হিমালয়ে চলে যেতে হচ্ছে, নিজের বাপ তাড়িয়ে দিয়েছে, পাতানো বাপ পটল তুলেছে, শ্বশুর বাপ মুখ দেখতেও নারাজ। ভরসা শুধু সাধুবাবা সকল। তারাও বেশি ভরসা দিচ্ছে না। বুড়ো সাধু বিবেচক, অনেকবার তাকে বলেছে পাহাড়ের শীতে বাঙালিদের আমাশা হয়। সে আমাশা ওষুধে সারে না। আর সেখানে শীতও সাংঘাতিক, ডাল সেদ্ধ হয় না, কাঠ জোগাড় করতে দম বেরিয়ে যায়। শুনে ভয় খাচ্ছে কুমুদ। একটা লোটা নিয়ে দুধ জোগাড় করতে বেরিয়ে শ্বশুর বাড়ির গাঁ-খানা ভালো করে শেষবারের মতো দেখে নিচ্ছিল সে।

রামীকে তার ভালো মনে নেই। দেখনা-দেখনা করে বছর চারেক কেটে গেছে শুভদৃষ্টির পর। হ্যাজাকের আলোয় কচি মুখখানা দেখেছিল সেটা ভুলেই গেছে। এতোদিনে তার ডাগরটি হওয়ার কথা। বিয়েও হয়ে গেছে বোধহয় এত দিনে।

এধার-ওধার ঘুরল সে। চট করে শ্বশুর বাড়িতে গিয়ে হাজির হতে তেমন সাহস হল না। সাধু দেখে সবাই তাকাচ্ছে, দু-একজন পেন্নামও করে ফেলল। গয়লা গাড়িতে পো টাক দুধ ভিক্ষেও পেয়ে গেল সে। ফেরার আগে শ্বশুর বাড়িটা একটু দেখে যেতে ইচ্ছে করছিল বড্ড। শেষ দেখা।

ল্যাংটার নেই বাটপাড়ের ভয়। লেংটি পরে শ্বশুর বাড়ি যেতে একটু লজ্জা ভাব ছিল তার। হিমালয়ের কথা ভেবে সেটা ঝেড়ে ফেলল। সে যখন সাধুই হয়ে যাচ্ছে আর আমাশাতে মৃত্যু যখন লেখাই আছে কপালে, তখন আর ভয়টা কীসের?

শ্বশুর বাড়ির ঝুমকো লতায় ছাওয়া ফটকের বাইরে দাঁড়িয়ে সে একটানা পেল্লায় হাঁক ছাড়ল, 'জয় শিব শম্ভো।'

কাজ হল। একটা ঝি গোছের বয়স্কা মহিলা বেরিয়ে এসে 'ওম্মা গো' বলে চেঁচিয়ে ভিতর বাড়িতে পালিয়ে গেল।

তারপর বেরিয়ে এল পরেশ পাল নিজে। বুকটা একটু কেঁপে উঠল কুমুদের।

'এখানে সুবিধে হবে না বাবাজি, সরে পড়ো।' কুমুদ কটমট করে তাকিয়ে বলল, 'পাপী, পাপী!' পরেশ পাল একটু ভ্যাবাচাকা খেয়ে মিইয়ে গেল। বলল, 'বাড়িতে অসুখ আছে বাবাজি, অসুখ থাকলে ভিক্ষে দিতে নেই।'

কুমুদ কিছুদিন যাত্রা করেছিল। রাবণ রাজার হাসিটা এবার হাসল সে। হাঃ-হাঃ-হাঃ।

তারপর বলল, 'মরবি-মরবি ঝাড়ে বংশে মরবি।' এই বলে পিছু ফিরতেই পিছনে একটা নারী কণ্ঠের আর্তনাদ শুনতে পেল সে, দাঁড়াও বাবাজি, যেও না।'

কুমুদ ফিরে দেখল তার শাশুড়ি! বেশ টসকালো চেহারা। হাতজোড় করে বলল, 'বাড়িতে অশান্তি বাবা। আমার পনেরো বছরের মেয়েটা সদ্য বিধবা হয়ে শয্যা নিয়েছে।'

কুমুদ এমন হাঁ হয়ে গেল যে বলার নয়। বিধবা মানে? সে জলজ্যান্ত বেঁচে থাকতে রামী বিধবা হোল কোন সুবাদে?

সে হুঙ্কার ছেড়ে বলল, 'বটে! তা কী করে টের পেলি যে তোর মেয়ে বিধবা?'

'জামাইয়ের দুই বন্ধু ছিল ভকু আর কালু। তারাই কাল বলে গেল কিনা, জামাই নাকি মরেছে।'

'ডাক দেখি তোর মেয়েকে। এরকম তো হওয়ার কথা নয়?'

'ডেকে আনাই বাবা। বসো।'

শাশুড়ি গিয়ে রামীকে ধরে-ধরে নিয়ে এল। রামীর পরনে ধুতি, মুখখানা নামানো, চোখের কোলে অনেক কান্নার চিহ্ন।

ভারী খুশি হয়ে পড়ল কুমুদ। আনন্দে ঠ্যাং নাচাতে লাগল সে। পরেশ পাল তাকে স্বীকার না করলে কী হবে। তার মরার খবরে মেয়ে তো বিধবা হল? তবে? হেঃ-হেঃ তাহলে এখনও তার দাম আছে। সবাই তাকে ঝেড়ে ফেলে দেয়নি।

আর রামীকে দেখেও ভারী খুশি লাগছিল তার। তেমন রূপসি কিছু নয় বটে, তবে বয়সের টানে চেহারাখানা দিব্যি হয়েছে। ছিপছিপে আঁটো গড়ন। মুখখানা ভারী মিষ্টি।

পরেশ পাল অনেকক্ষণ ধরে চুপচাপ দেখছিল, লক্ষ্য করেনি কুমুদ। হঠাৎ চোখে চোখ পড়তেই চমকে উঠল। বলল, 'কল্যাণ হোক, আমি চলি।'

পরেশ যদি চিনতে পারে তাহলে হয়তো ব্যাপারটা কেঁচে যাবে। এরকমই থাক। সে বরং হিমালয়ে গিয়ে সত্যি মরাই মরবে। এটুকু তো জানা গেল যে, তার অভাবে দুনিয়ায় অন্তত একজনও বিধবা হয়ে কান্নাকাটি করেছে।

কুমুদ একটু জোরেই হাঁটা দিয়েছিল। কিন্তু মাধবী লতার ফটক পেরিয়ে আমবাগানে পড়তেই পরেশ পাশ ধরে ফেলল তাকে।

'এই যে বাজাজি।'

কুমুদ সভয়ে বলল, 'কাকে বলছিস?'

'তোমাকেই হে। চিনতে পেরেছি।'

চিনে আর লাভ নেই। আমি সাধু হয়ে হিমালয়ে চলে যাচ্ছি।'

পরেশ খপ করে হাতখানা চেপে ধরে বলল, 'ঘাট হয়েছে বাপু। ফিরে চল।'

কুমুদ চোখ পাকিয়ে বলল, 'কোথায় ফিরে যাব আমার কি যাওয়ার জায়গা আছে?'

পরেশ একটু থতমত খেয়ে বলল, 'ইয়ে এখন না হয় আমার বাড়িতেই চলো। পরে না হয়—'

'পরে তো হিমালয়। না গো পরেশবাবু, সুবিধে হবে না—মেয়েকে তোমার বিধবা বলেই ধরে নাও।'

'পায়ে ধরছি বাপু। আমি তোমার গুরুজন, তবু ধরছি।'

'ব্যবস্থাটা কী হবে?'

'ঘরজামাই রাখব।'

'বটে! শেষে ঘরজামাইকে চাকর মুনিষের অধম করে খাটাবে না তো। গরু চরানো, গোয়াল পরিষ্কার করা, খড় কাটা, মাঠের কাজ এসব?'

'আরে না। ভেবেই রেখেছি, তুমি হবে আমার ধানকলের ম্যানেজার। চলো।'

কুমুদের হঠাৎ ভারী লজ্জা করল। বলল, 'লেংটি পরে যাব?'

পরেশ ধমক দিয়ে বলল, 'এতক্ষণ তো দিব্যি ছিলে। নাও বরং আমার আলোয়ানখানা একটু ঝুল রেখে জড়িয়ে নাও। লোক পাঠিয়ে ধুতি জামা সব আনাচ্ছি।'
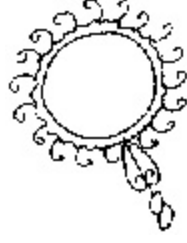
বিয়ের রাত

আচ্ছা মশাই, আত্মবিশ্বাস জিনিসটা আসলে কীরকম বস্তু তা বলতে পারেন?

বলা কঠিন। তবে যতদূর মনে হয় লোহার রডের মতো একটা শক্ত জিনিস মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়ে ঠেলে মাথা অবধি ওঠে। তাতে হয় কি, ঘাড়-গর্দান সব সোজা থাকে, মাথাটাও সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে না। আমাদের পটলবাবুকে তো দেখেছি, সবসময়ে যেন খাড়া হয়ে আছেন।

তাই হবে। ওই রডটা আমার নেই।

বেশিরভাগ লোকেরই থাকে না। রেয়ার জিনিস হলেই সাপ্লাই কম হয়। খুঁজে দেখেছি আমারও নেই।

দুজনেরই দুটো দীর্ঘশ্বাস পড়ল।

আত্মবিশ্বাস জিনিসটা খুব কাজের জিনিস, কী বলেন?

খুব। তবে না হলেও যে চলে না তা নয়। এই ধরুন ফ্রিজ। থাকলে খুব ভালো—বাসি স্যাঁতা সব জমিয়ে রাখা যায়, তিন-চারদিন রান্না না চাপালেও চলে। চমৎকার কাজের জিনিস। কিন্তু ধরুন, যাদের নেই তাদেরও কি চলে না?

তা অবিশ্যি ঠিক।

আপানার যা-যা নেই তার একটা লিস্টি তৈরি করে ফেলুন। ধরুন, আত্মবিশ্বাস নেই, সাহস নেই, বিবেক নেই, বিবেচনা নেই, শক্তি নেই, বুদ্ধি নেই, মেধা নেই, জেদ নেই, উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই, সততা নেই, চরিত্র নেই, ব্যক্তিত্ব নেই, স্মার্টনেস নেই, অনুভূতি নেই, কল্পনাশক্তি নেই ইত্যাদি-ইত্যাদি। নেই-এর একটা লিস্টি থাকলে কী-কী আছে তার

একটা হদিস বেরিয়ে আসবে। ডেবিট ক্রেডিটের মতোই। তাতে হবে কি, অল্পসল্প যা আছে তাই দিয়েই কাজ চালিয়ে নেওয়ার একটা সুলুকসন্ধান করতে সুবিধে হবে।

ঠিকই বলেছেন। তবে নেই-এর লিস্টিটা বড্ড বড় হয়ে যাবে মনে হচ্ছে।

বেশিরভাগ লোকেরই তাই। নেই-এর লিস্টি আমারও খুব বড়। এত বড় যে তাই দিয়ে ঘুড়ির লেজ বানান যায়। আচ্ছা, কীসের গন্ধ আসছে বলুন তো! দিব্যি খুশবু।

ওঃ, এ গন্ধটা! দাঁড়ান বলছি! এ হল বিরিয়ানির গন্ধ। জাফরান পড়েছে, আর খোয়া ক্ষীর। আর ক্যাওড়ার জলও।

বাঃ, আপনার নাক তো খুব শার্প।

হ্যাঁ, আমি বড্ড গন্ধ পাই।

বাঃ, তা হলে ওটা আছে-র লিস্টিতে ধরবেন। তা আর কী-কী আইটেম আছে আজ জানেন?

খুব জানি। পয়লা পাতে রাধাবল্লভী, বেগুনভাজা, ছোলার ডাল, ফিশ ফ্রাই। তারপর বিরিয়ানি, কষা মাংস। শেষ পাতে চাটনি, আইসক্রিম, সন্দেশ আর রসগোল্লা। পাঁপড়ভাজাও আছে।

নেমন্তন্ন বাড়ির খাওয়া সবই প্রায় একরকম হয়ে যাচ্ছে। একটা অন্যটার কার্বন কপি। কী বলেন?

যে আজ্ঞে।

তা মশাই, এই বিয়েবাড়ির মেনু আপনি জানলেন কী করে? আপনি কী কন্যাপক্ষের কোনও কর্মকর্তা?

না। পাড়ায় থাকি। বীরেশবাবু একটু স্নেহ করেন।

অ। তাই তাঁর মেয়ের বিয়েতে খাটছেন বুঝি?

আজকাল আর বিয়েবাড়ির খাটনি কোথায়? সব তো ডেকোরেটর, ক্যাটারার এরাই করে দেয়। ক্যাটারারের সঙ্গে আমার একটু ভাবসাব আছে, আমিই ঠিক করে দিয়েছিলাম।

তাই বলুন।

একশো কুড়ি টাকা করে প্লেট।

একশো কুড়ি! সে তো সস্তা মশাই। গেল হপ্তায় সত্যেনবাবুর ছেলের বিয়ে খেলে এলুম, শুনলুম দুশো টাকা করে প্লেট।

দুশো! ও বাবা, দুশো টাকা তো বিরাট ব্যাপার।

আপনার আমার কাছে বিরাট, সত্যেনবাবুর কাছে তো আর নয়। সত্যেনবাবুরা নমস্য ব্যক্তি। আপনার আর আমার যেমন নেই-এর লিস্টিটা অনেক লম্বা, সত্যেনবাবুদের তেমনি আছে-র লিস্টিটা বেজায় বড়। তবে কিনা এমন অনেক লোক আছে যাদের কাছে সত্যেনবাবুও নস্যি।

খুব ঠিক কথা। আরও-র কোনও শেষ নেই।

এই তো বুঝেছেন। লোককে কোনও কথা বোঝাতে পারলে আমি বড় খুশি হই। ভারী তৃপ্তি পাই। মুশকিল কি জানেন, আজকাল বেশিরভাগ লোককেই কোনও কথাই যেন বুঝিয়ে উঠতে পারি না। তখন সন্দেহ হয় আমি হিব্রু ভাষায় কথা বলছি না তো! এটা বেশিরভাগ কোথায় হয় জানেন? বাড়িতে। নিজের বাড়ির লোকেরা এই আমার বউ, ছেলে, মেয়ে—এদের সঙ্গে কথা বলতে গেলেই ভয়ঙ্কর ল্যাংগুয়েজ প্রবলেম হয় মশাই।

কেন, আপনার স্ত্রী কি মাদ্রাজি না জার্মান?

নৈকষ্যি বাঙালি মশাই। কোলাঘাটে বাপের বাড়ি। না-না, ভাষাগত সমস্যা ঠিক ওরকম নয়। আসল কথা, তারা আমার বক্তব্য বুঝতে চায় না। কিংবা বলতে পারেন গ্রহণ করে না। আমি হয়তো খুব মোলায়েম করে বললুম, ওগো, বাড়িওলার সঙ্গে ঝগড়া করার দরকার নেই। জলে বাস করে কুমিরের সঙ্গে বিবাদ কি ভালো? সঙ্গে-সঙ্গে আমার বউ খেপে উঠে বলল, ঝগড়া করব না মানে? একশোবার করব। অন্যায়ের প্রতিবাদ না করে করেই তো দেশটার আজ এই অবস্থা! তোমার মতো মেনিমুখোদের দিয়ে সংসার চলে না —ইত্যাদি। যা বোঝার বুঝে নিন।

বুঝেছি।

তারপর ধরুন, হয়তো অফিস থেকে ফিরে এসে দেখলুম আমার ডায়েরির মধ্যে কে যেন একটা চিরুনি গুঁজে রেখেছে। চিরুনির তেলে ডায়েরির পাতায় জলছাপ। পুরুষ সিংহ নই জানি, তবে হয়তো সামান্য একটু হেঁকে কথাটা বলতে গেছি, সঙ্গে-সঙ্গে মেয়েও এসে গলা মেলাল। তাদের ধারণা, এরকম চেঁচামেচি নাকি নারী নির্যাতন ছাড়া কিছু নয়। যুগ-যুগ ধরে নারীরা পুরুষদের হাতে যে কীভাবে নিরন্তর নির্যাতিত হয়ে আসছে তা নাকি নির্যাতনকারী পুরুষেরা নির্যাতনে অভ্যস্ত বলে বুঝতেও পারে না।

একটা দীর্ঘশ্বাসের শব্দ হল, খুবই খারাপ অবস্থা তো!

খুব। আচ্ছা, এই ছত্তিশগড়, ঝাড়খণ্ড, গোর্খাল্যান্ড হচ্ছে, আপনি কি জানেন আলাদা নারী রাজ্য বা নারীল্যান্ড নিয়ে কোনও দাবি দাওয়া উঠেছে কিংবা আন্দোলন হচ্ছে কি না?

না তো। আমি শুনিনি।

উঠছে না কেন বলুন তো।

মনে হয় নারীল্যান্ডে চাকরবাকরদের অভাব দেখা দিতে পারে বলেই দাবি উঠছে না।

বাঃ, বেশ বলেছেন মশাই। অতি ঠিক কথা। নারীল্যান্ড হলে ফাইফরমাস করার জন্য পুরুষ জুটবে কোত্থেকে? তাই তো, কথাটা আমার মাথায় আসেনি। এটা কিন্তু আপনার আছে-র লিস্টিতে যায়। বুঝলেন?

বুঝেছি।

তা ফার্স্ট ব্যাচের ডাক কখন পড়বে বলতে পারেন?

মোটে সাতটা বাজে। আরও আধঘণ্টা বা থ্রি কোয়ার্টার ধরে রাখুন।

আমি তো সেই দমদম পার্কে ফিরব, তাই বলছিলাম। তা লগ্ন কটায় জানেন নাকি?

খুব জানি। রাত বারোটা বিয়াল্লিশ মিনিট।

ও বাবা!

ভয় পাবেন না, লগ্ন দেরিতে বলে ব্যাচ দেরিতে বসবে না। দমদম পার্কে ফেরার সবচেয়ে ভালো রুট হল এখান থেকে বাস বা ট্যাক্সিতে গিয়ে রাসবিহারীর মোড় থেকে পাতালরেল ধরা।

সেটাই তো প্ল্যান মশাই। আর ব্যস্ত হচ্ছি সেই কারণেই। পাতাল রেল তো বোধ হয় সাড়ে নটায় বন্ধ হয়ে যায়।

তার মধ্যেই পারবেন। এখান থেকে রাসবিহারীর মোড় তো হাঁটা পথ। বাসে পাঁচ সাত মিনিট, ট্যাক্সিতে মিনিট তিনেক। কিংবা আরও কমও হতে পারে।

বলছিলাম কি তাড়াহুড়ো করলে খাবারের স্বাদ সোয়াদ তেমন পাওয়া যায় না। বিরিয়ানির গন্ধটা বেশ ভালোই ছেড়েছে মশাই।

হ্যাঁ, কারিগর খুবই ভালো।

বীরেশবাবু তা হলে বেশ খরচা করেই মেয়ের বিয়ে দিচ্ছেন, কী বলেন?

হ্যাঁ, খরচ তো আছেই।

তা পাত্রটি কেমন পেলেন? ইঞ্জিনিয়ার না কী যেন শুনেছিলাম।

আমারও শোনা কথা। কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার।

বেশ গালভরা কথা। কিন্তু কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার ব্যাপারটা কী তা কি আমাকে একটু বুঝিয়ে বলতে পারেন? তারা কি কম্পিউটার বানায় না মেরামত করে? আসল ব্যাপারটা কী?

আপনিও যে তিমিরে আমিও সে তিমিরে।

বীরেশবাবু বলছিলেন আমেরিকা না কোথা থেকে যেন ঘুরে এসেছে। তা আজকাল ওই এক দেশ হয়েছে। সবাই শুনি ল্যাজ তুলে সেখানে দৌড়োচ্ছে। আগে বিলেতের কদর ছিল, এখন তো সেটা বোষ্টমঘাটার মতো এলেবেলে জায়গা হয়ে গেছে।

কিছুদিন সবুর করুন, আমেরিকাও তাই হয়ে যাবে।

তাই হোক মশাই, তাই হোক। এই আমরা যারা আমেরিকা-টিকা যাইনি তাদের ভারী আত্মগ্লানি হচ্ছে। বাড়িতেও সবাই ঠেস দিয়ে কথা কয় কিনা।

বাড়ির লোকদের নিয়ে আপনার একটু প্রবলেম আছে, তাই না?

সবারই আছে মশাই, সবারই আছে। আমি পেট পাতলা মানুষ বলে কবুল করে ফেলি, অন্যেরা চেপেচুপে রাখতে পারে। আপনার তো বয়স কম, বুঝবেন না। বলি, বিয়ে-টিয়ে করেছেন?

আজ্ঞে না।

আগে করুন, তারপর বুঝবেন। বাইরে আপনি যত বড় কেওকেটা মানুষই হন না কেন, বাড়ির লোকের কাছে পাপোশের বেশি সম্মান আশা করবেন না।

কিন্তু আপনি তো সেই বাড়িতেই ফিরে যাওয়ার জন্য ভারী ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন দেখছি।

ওটাই তো জীবনের ট্র্যাজেডি। কতবার সন্ন্যাসী-বিবাগি হওয়ার কথা ভেবেছি, পেরে উঠিনি, সুইসাইড করব বলে মনস্থির করেও রণে ভঙ্গ দিতে হয়েছে। কেন জানেন?

কেন বলুন তো।

তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে বটে, মুখনাড়াও দেয় আবার শরীর-টরির খারাপ হলে বা বিপাকে পড়লে হামলে এসে আগলায়ও তো! সংসার এক রঙ্গ মশাই।

সেরকমই শোনা যায় বটে।

এতক্ষণ ধরে কথা কইছি কিন্তু আপনার সঙ্গে ভালো করে পরিচয়ও হয়নি। তা আপনি কি বীরেশবাবুর আত্মীয়-টাত্মীয় নাকি?

না, না, এই কাছেই থাকি, চেনাজানা আছে আর কি।

আমার নাম দিবাকর দত্ত, সরকারি ঠিকাদার। বীরেশবাবুর এই বাড়িটা আমিই করে দিয়েছিলাম।

আপনি সরকারি ঠিকাদার! তা হলে তো বড়লোক মানুষ আপনি!

আরে না। ঠিকাদারদের আজকাল আর বেশি মার্জিন থাকে না। একে ওকে তাকে দক্ষিণা দিতে-দিতেই সব উজাড় হয়ে যায়। পেমেন্ট পেতেও নাভিশ্বাস। শুনতেই ভালো।

গাড়ি-টাড়ি নেই?

তা থাকবে না কেন? কিন্তু কলকাতার যা হাল হয়েছে গাড়ি নিয়ে পারতপক্ষে বেরোয় কোন আহাম্মক!

ঠিকই বলেছেন।

তা আপনার নামটি কী?

সুজিত।

বামুন না কায়েত?

কায়েত।

তা কী করা হয়-টয়?

এই টুকটাক হাতের কাজ।

চাকরি করেন না?

ওই সামান্য একটা।

বয়স তো বোধহয় সাতাশ-আঠাশ।

আঠাশ।

তা এই বয়সে আপনার আত্মবিশ্বাসের অভাব হচ্ছে কেন?

ব্যাপারটা হঠাৎ আজ সকালেই ধরা পড়ল কিনা। সকালে ঘুম থেকে উঠেই মনে হল, আমার যেন আত্মবিশ্বাসটা নেই।

তার মানে কি আগে ছিল, এখন নেই?

আগে ছিল কি না ঠিক মনে করতে পারছি না। তবে এখন নেই, এটা বেশ বুঝতে পারছি। কেমন একটু নার্ভাস লাগছে।

হ্যাঁ, আপনি যে বেশ নার্ভাস তা বুঝতে পারছি নইলে আলটপকা এসে আমাকে জিগ্যেস করতেন না যে, আত্মবিশ্বাস জিনিসটা কী রকম। কিন্তু হঠাৎ নার্ভাসই বা লাগছে কেন?

বলা মুশকিল। মাঝে-মাঝে জীবনে এক একটা দিন আসে যখন কোনও একটা সত্য উদঘাটিত হয়ে যায়।

বাঃ, বেশ বলেছেন। ও রকম আমারও হয়। এই তো বছরটাক আগে পাঞ্জাব মেল থেকে হাওড়া স্টেশনে নামছি, দরজার কাছটায় উঠন্ত কুলি আর নামন্ত যাত্রীদের মধ্যে খুব ঠেলাঠেলি। হাতের অ্যাটাচিকেসটা সামলাতে পারছি না। প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ানো একটা বেশ মিষ্টি দেখতে ছেলে হঠাৎ ভিড়ের মাথার ওপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে বলল, দিন না, অ্যাটাচিকেসটা আমার হাতে দিন। তারপর নামুন। এ সব লোকেরা বোধ হয় খানিকটা হিপনোটিজমও জানে। কে জানে কেন ছেলেটাকে আমার বেশ চেনাচেনাও ঠেকল, তাই দিব্যি অ্যাটাচিকেসটা দিয়ে দিলাম। নেমে এক গাল মাছি। কোথায় সেই ছোকরা, আর কোথায় বা অ্যাটাচি। তা সে দিন আমি বুঝলাম যতই লোক চরিয়ে খাই না কেন, আমি একটি গাড়ল।

আপনাকে কিন্তু গাড়ল বলে মনে হয় না। যদিও এ জায়গাটার তেমন আলো নেই, তবু মনে হচ্ছে আপনি বেশ বুদ্ধিমান লোক।

কথাটা যে খুব ভুল বলেছেন তা নয়। আমি বুদ্ধিমানও বটে, আবার গাড়লও বটে। কোনও কোনও ব্যাপারে বুদ্ধিমান কোনও কোনও ব্যাপারে গাড়ল। সব মানুষই এরকম। নিউটন বড় আর ছোট বেড়ালের জন্য কক্ষে দুটো দরজা করেছিলেন, মনে আছে তো?

হ্যাঁ, মনে আছে।

আমরা আসলে আমাদের বুদ্ধিটাকে সর্বত্র প্রয়োগ করি না। এক বিষয়ে বুদ্ধির খেল দেখিয়ে বাহবা কুড়োচ্ছি, অন্য বিষয়ে আকাট বোকার মতো কাজ করে ছিছিক্কার পাচ্ছি। এই ধরুন ঠিকাদারির কাজে আমাকে বোকা বানাতে পারে এমন লোক কমই পাবেন, আবার সেই আমিই যে কী করে বাজার থেকে বুড়ো ঢেঁড়শ বা পাকা পটল নিয়ে আসছি সেটা আমার কাছেও রহস্য। কাজেই আমি বুদ্ধিমানও বটে, বোকাও বটে। কিন্তু আপনার কথাটাই শোনা গেল না। আপনি যেন কেন আজ নার্ভাস বোধ করছেন!

ওই যে বললাম, আজ সকালে উঠেই মনে হচ্ছে আমার আত্মবিশ্বাস বলে কিছু নেই।

ঘাবড়াচ্ছেন কেন? যখন বিয়ে করবেন তখন থেকে টের পাবেন আপনার আরও অনেক কিছুই নেই। বউ এসে আপনার এমন অ্যাসেসমেন্ট করতে শুরু করবে যে আপনি নিজেই অবাক হয়ে যাবেন।

ওরে বাবা!

ভয় পেলে চলবে কেন? এটাই তো দুনিয়ার দস্তুর।

বিয়ে না করলে কেমন হয়?

ব্যাচেলর থাকবেন? তা হলে তো আরও চিত্তির। ব্যাচেলরকে সবাই এক্সপ্লয়েট করে। আত্মীয়স্বজন থেকে বন্ধুবান্ধব কেউ ছাড়বে না। তা ছাড়া ব্যাচেলাররা একটু বায়ুগ্রস্তও হয়ে পড়ে কি না। প্রথম ব্যাচটা বসল কি না একটু খেয়াল রাখবেন। সাড়ে সাতটা বাজতে চলল কিন্তু।

না-না, সাতটা সতেরো। ফার্স্ট ব্যাচ বসার আগেই আমি আপনাকে জানিয়ে দেব।

আপনি কি বিয়েবাড়ির ম্যানেজমেন্টে আছেন নাকি?

না, ঠিক ম্যানেজমেন্টে আছি বলা যায় না। তবে দেখাশোনা করছি আর কি।

বিয়েতে দেনা-পাওনা কীরকম হচ্ছে জানেন?

তেমন কিছু শুনিনি।

নগদ আছে নাকি?

যতদূর জানি, না। অবশ্য নগদের প্রশ্নও ওঠে না। শুনেছি নাকি মেয়েটি পছন্দ করে বিয়ে করছে।

ল্যাভ ম্যারেজ নাকি মশাই?

তা ওরকমই বোধহয় কিছু।

সে কী! আপনি পাড়ার ছেলে হয়ে এ সব জানেন না!

একটা দীর্ঘশ্বাসের শব্দ হল।

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন নাকি?

ঠিক ফেললাম না। বেরিয়ে গেল।

বীরেশবাবুর মেয়ে রিয়া বেশ সুন্দরী, তাই না?

আজ্ঞে।

কীরকম সুন্দরী বলে আপনার মনে হয়?

খুব।

সুজিতবাবু, একটা কথা জিগ্যেস করব?

করুন না।

ভাই এনি চান্স, রিয়ার প্রতি আপনার কোনও দুর্বলতা নেই তো!

এ কথা কেন মনে হল আপনার?

আত্মবিশ্বাসের অভাবের কথা বলছিলেন তো, তার ওপর দীর্ঘশ্বাস!

দুর্বলতাই তো মানুষকে খায়। আপনি খুবই বুদ্ধিমান।

তা হলে ঠিক ধরেছি?

ঠিকই ধরেছেন।

আত্মবিশ্বাসের অভাবের ফলেই এগোতে পারেননি তো!

সেটাও একটা ফ্যাক্টর বটে।

ভেঙে পড়বেন না মশাই। আপনার এখনও বয়স পড়ে আছে। কত কী ঘটতে পারে। বীরেশ মিত্রের মতো বড়লোকের মেয়েকে প্রেমের প্যাঁচে ফেলে বিয়েতে গেঁথে তুলতে পারলেও হয়তো পরে পস্তাতেন। বড়লোকের আদুরে মেয়ের বায়নাক্কা সামলানো তো সোজা কথা নয়।

সে তো বটেই।

তা হলে খারাপটা কী হয়েছে বলুন। ভালোই তো হয়েছে।

আপনি যেভাবে ধরছেন সেভাবে ধরলে বলতে হয় ভালোই হয়েছে।

আরে মশাই, সবসময়ে জীবনের উজ্জ্বল দিকগুলোর কথাই তো আমাদের ভাবা উচিত, তাই না? আচ্ছা, আপনার চাকরিটা কী রকম?

সামান্যই।

সরকারি না বেরসরকারি?

বেসরকারি।

ওই তো মুশকিল। বেসরকারি ফার্মগুলো বড্ড এক্সপ্লয়েট করে।

আজ্ঞে হ্যাঁ।

জব সিকিউরিটিও তেমন থাকে না।

যথার্থই বলেছেন।

মাইনে-টাইনে কেমন দেয়?

মোটামুটি দেয়, আমার চলে যায়।

খাটুনি কেমন?

খুব। মোষের মতো খাটতে হয়। দৌড়ঝাঁপও আছে।

ওই তো বেসরকারি ফার্মে চাকরির মুশকিল। আপনি তো বললেন হাতের কাজ জানেন।

আজ্ঞে যৎসামান্য।

ভালো করে শিখলে হাতের কাজ জানা লোকের অবশ্য চাকরির অভাব হয় না। তা আপনার হাতের কাজটা কী ধরনের?

এই একটু কম্পিউটার নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতাম। তাই একটু-আধটু শিখেছি।

আজকাল তো কম্পিউটারেরই যুগ। লেগে থাকুন, হবে।

লেগেই তো আছি।

কোন কোম্পানিতে আছেন?

ইনফো টেকনো।

ইনফো টেকনো? না! নামটা শুনেছি বলে মনে হয় না।

শোনার মতো নয়। মোটে দু-বছর হল খুলেছে।

এবার একটু অ্যালার্ট হবেন মশাই। সাড়ে সাতটা বাজে কিন্তু।

হ্যাঁ, ওটা আমার খেয়াল আছে। এখন আপনি ধীরে-ধীরে রওনা হতে পারেন, তবে গিয়ে সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়াতে হবে। পাঁচ মিনিট পর ডাকবে।

তা হলে উঠি?

হ্যাঁ, আসুন।

আপনার পুরো নামটা কী যেন!

সুজিত বসু!

সুজিত বসু! নামটা চেনা-চেনা লাগছে কেন বলুন তো!

চেনা লাগবার কথা তো নয়। আমি বিখ্যাত লোক নই।

তা হলেও কেমন যেন চেনা ঠেকছে। আচ্ছা ইয়ে বীরেশবাবুর জামাইয়ের নামটা কী বলুন তো!

সুজিত বসু!

তাই তো! সেই জন্যই চেনা ঠেকছিল। আপনার নামও তা হলে সুজিত বসু! তা কী করে হয়?

আর একটা দীর্ঘশ্বাস।

হয়। হয়ে যায়।

তার মানে কি আপনি বলতে চান রিয়ার সঙ্গে একজন সুজিত বসুর বিয়ে হচ্ছে যিনি আপনি নন?

আর একটা দীর্ঘশ্বাস।

সেরকম হলেই বোধহয় খুশি হওয়া যেত। কিন্তু লোকটা আমিই।

অ্যাঁ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

পরপুরুষ

করালী গরু খুঁজতে বেরিয়েছিল। আর তারক বেরিয়েছিল বউ খুঁজতে।

কালীপুরের হাটে সাঁঝের বেলায় দুজনে দেখা।

বাঁ-চোখে ছানি এসেছে, ভালো ঠাহর হয় না। তবু তারককে চিনতে পেরে করালী বলল, তারক নাকি?

আর বলো কেন দাদা। মাগি সকালে থেকে হাওয়া।

ঝগড়া করেছিস?

সে আর কোনদিন না হচ্ছে! আজ আবার বাগান থেকে মস্ত মানকচুটা তুলে নিয়ে বেরিয়েছে। আমি ভাবলুম কচু বেচতে যদি হাটে এসে থাকে।

বাঁধা বউ, ঠিক ফিরে যাবে। আমার তো তা নয়। গরু বলে কথা, অবোলা জীব। হাটে যদি হাতবদল হয় তো মস্ত লোকসান।

গো-হাটা ঘুরে দেখেছ?

তা আর দেখিনি! পেলুম না।

ভেবো না। গরুও ফিরবে। চল, পরানের দোকানে বসি।

পরাণ তাড়ির কলসি সাজিয়ে বসে, একখানা বারকোশে ভাঁড় আর কাচের গেলাস সাজানো। আশেপাশে খদ্দেররা সব উবু হয়ে বসে ঢকাঢক গিলছে। দুজনে সেখানে সেঁটে গেল।

কালীপুরের হাট একখানা হাটের মতো হাটই বটে। দশটা গাঁ যেন ভেঙে পড়ে। জিনিস যেমন সরেস দামও মোলায়েম। এই সন্ধের পরও হ্যাজাক, কারবাইড, টেমি জ্বেলে

বিকিকিনি চলছে রমরম করে। হাটেবাজারে এলে মনটা ভালো থাকে তারকের। পেটে তাড়ি টাড়ি গেলে তো আরও তর হয়ে যায়। তবে কিনা বউটা সকালবেলায় পালিয়ে যাওয়ায় আজ সারাদিন হরিমটর গেছে। রান্নাটা আসে না তারকের। ছেলেবেলায় এই কালীপুরের হাটেই এক জ্যোতিষী তার মাকে বলেছিল, বাপু, তোমার ছেলের কিন্তু অগ্নিভয় আছে। আগুন থেকে সাবধানে রেখো। তাই মা তাকে গা ছুঁইয়ে বাক্যি নিয়েছিল, আগুনের কাছে যাবে না। মায়ের কথা ভাবতেই চোখটা জ্বালা করল। মা মরে গিয়ে ইস্তক কিছু ফাঁকা হয়ে গেছে যেন। দুপুরে গড়ানো বেলায় মুকুন্দর দোকানে চারটি মুড়ি-বাতাসা চিবিয়েছিল। এখন খিদেটা চাগাড় মারছে।

করালী যেন মনের কথা টের পেয়েই বলল, নন্দকিশোরের মোচার চপ খাবি?

খুব খাব।

পয়সা দিচ্ছি, যা নিয়ে আয়।

নন্দকিশোরের মোচার চপের খুব নামডাক। সারা দিনে দোকানে যেন পাকা কাঁঠালে মাছির মতো ভিড়। এখন সন্ধেবেলায় ভিড় একটু পাতলা হয়েছে। সারা দিনে না হোক কয়েক হাজার টাকার মাল বিক্রি করে নন্দকিশোরের হ্যাদানো চেহারা। চারটে কর্মচারীও নেতিয়ে পড়েছে যেন।

নন্দকিশোর মাথা নেড়ে বলল, মোচা কখন ফুরিয়ে গেছে। ফুলুরি হবে। তবে গরম নয়।

আহা একটু গরম করে দিলেই তো হয়।

উনুন ঝিমিয়ে পড়েছে বাপু। এখন আঁচ তুলতে গেলে কয়লা দিতে হবে। শেষ হাটে আর আঁচ তুলে লোকসান দেব নাকি দু-টাকার ফুলুরির জন্য?

তা বটে। তারক এধার-ওধার খুঁজে দেখল। শেষে মুকুন্দ দলুইয়ের দোকানে গরম চপ পেয়ে নিয়ে এল।

খালি পেটে ঢুকে চপ যেন নৃত্য করতে লাগল। তার ওপর তাড়ি গিয়ে যেন গান ধরে ফেলল। ভিতরে যখন নাচগান চলছে তখন তারক বলল, কালীপুরের হাট বড় ভালো জায়গা, কী বলো কারালীদা!

জিবে একটা মারাত্মক কাঁচালঙ্কার ঘষটানি খেয়ে শিসোচ্ছিল করালী। এক গাল তাড়িতে জলন্ত জিবটা খানিক ভিজিয়ে রেখে ঢোঁক গিলে বলল, সেই কোমরে ঘুনসি-পরা বয়সে বাপের হাত ধরে আসতুম, তখন একরকম ছিল। এখন অন্যরকম।

তারকের বাঁ-পাশে একজন দাঁত উঁচু লোক তখন থেকে দুখানা সস্তা গন্ধ সাবান বাঁ-হাতে ধরে বসে আছে। ডান হাতে গেলাসে চুমুক দিচ্ছে আর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সাবান দু-খানা দেখছে বারবার।

পেটের মধ্যে নৃত্যগীত চলছে, মেজাজটা একটু ঢিলে হয়েছে তারকের। লোকটার দিকে চেয়ে বলল, সাবান বুঝি বউয়ের জন্য?

লোকটা উদাস হয়ে বলল, বউ কোথা? ঘাড়ের ওপর দু-দুটো ধুমসি বোন, মা-বাপ। মুকুন্দ বিশ্বেস সাফ বলে দিয়েছে, আগে পরিবার থেকে আলগা হও, তারপর মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেব।

তা আলগা হতে বাধা কী? হলেই হয়। আজকাল সবাই হচ্ছে।

ভয়ও আছে। মুকুন্দ বিশ্বেসের ছেলের সঙ্গে তার ঝগড়া। মেয়ের বিয়ে দিয়েই মুকুন্দ আর তার বউ আমার ঘাড়ে চাপবার মতলব করছে।

ও বাবা! সেও তো গন্ধমাদন।

তাই আর বিয়েটা হয়ে উঠছে না।

করো কী?

ভ্যানরিকশা চালাই। নয়াপুর থেকে কেশব হালদারের মাল নিয়ে এসেছি। হাটের পর ফের মাল নিয়ে ফেরা। আর সাবানের কথা বলছ! সে কি আর শখ করে কেনা! লটারিতে পেলুম।

বাঃ। লটারি মেরেছ, এ তো সুখের কথা।

ছাই। ওই যে লোহার রিং ছুড়ে-ছুড়ে জিনিসের ওপর ফেলতে হয়। রিং-এর মধ্যিখানে যা পড়বে তা পাবে। ফি বার দু-টাকা করে। তিরিশখানা টাকা গচ্চা গেল। তার মধ্যে একবার এই সাবান দু-খানা উঠল। যাচাই করে দেখেছি, এ সাবান চার টাকা পঞ্চাশ পয়সায় বিকোয়।

লটারি মানেই তো তাইরে ভাই। তুমিই যদি সব জিতে যাও তাহলে লটারিওয়ালার থাকবে কী?

দাঁত-উঁচু লোকটা এক চুমুক খেয়ে বলল, সবারই সব হয়, শুধু এই ভ্যানগাড়িওয়ালারই কিছু হয় না, বুঝলে! মা একখানা ফর্দ ধরিয়ে দিয়েছিল, ট্যাঁকে আছে এখনও। সেসব আর নেওয়া হবে না। ক'টা বাজে বলো তো!

তারকের হাতে ঘড়ি নেই। আন্দাজে বলল, তা ধরো সাতটা সাড়ে-সাতটা হবে।

উরেব্বাস রে! কেশব হালদার মাল গোটাতে লেগেছে। যাই।

করালী শিসোচ্ছিল।

উঠবে নাকি গো করালীদা।

করালী একটা হাই তুলে বলল, গরুটার কথাই ভাবছিলুম।

কী ভাবলে?

বাঁজা গরু। পুষতে খরচ আবার বেচতেও মন চায় না। কিনবেই বা কে বল!

তাই বলো, বাঁজা গরু। তা গেছে আপদই গেছে। ভাবনার কী?

আছে রে আছে। আমার ছোট মেয়ে পদীর বড় ভাব গরুটার সঙ্গে।

পাল খাইয়েছ?

কিছু বাকি রাখিনি। আর দুটো গরু বিয়োয়, দুধও দেয়। এটাই দেয় না।

এত বড় হাটে বউ খোঁজা মানে খড়ের গাদায় ছুঁচ খোঁজার শামিল। এসে থাকলেও এত রাত অবধি তো আর হাটের মাটি কামড়ে সে নেই। বউ যদি রাতে না ফেরে তাহলে রাতেও হরিমটর। তারক ভাবছিল আরও কয়েকখানা চপ সাঁটিয়ে নেবে কি না। তারপর এক ঘটি জল খেয়ে নিলেই হল। কিন্তু পয়সার নেশাটা চৌপাট হয়ে গেলে মুশকিল।

২

পুরুষমানুষ আর মেয়েমানুষের সম্পর্ক নাকি চিড়েতন। আ মোলো। সম্পর্কের আবার চিড়েতন, হরতন, ইস্কাপন, রুইতন হয় নাকি? হলেও বাপু, যমুনা কি সেসব বোঝে! তবে কিনা নরেনবাবু ভদ্রলোক, মেলা জানেশোনে। নরেনবাবুর কথা তো আর ফ্যালনা নয়।

একদিন জিগ্যেস করেছিল, চিড়েতনটা আবার কী, বলো তো বাবু?

নরেনবাবু হেসেটেসে বলল, এই ধর তুই আর আমি। আমিও কারও কেউ নই, তুইও কারও কেউ নোস। যেমন জলের মাছ, কে কার মা-বাপ জানে ওরা? তবু তো ডিম ছাড়ছে, বাচ্চা বিয়োচ্ছে। ব্যাপারটা ওরকমই আর কি। চিরন্তন মানে হচ্ছে আদি সম্পর্ক—বুঝলি না?

যমুনা বুঝি-বুঝি করেও স্পষ্ট বুঝতে পারছিল না। তবে এটা ঠাহর হল যে, ওই চিড়েতনের মধ্যেই প্যাঁচটা আছে।

প্যাঁচ বুঝতে যমুনার কেন—কোনও মেয়েমানুষেরই দেরি হয় না। যমুনার এই সতেরো বছর বয়স হল। এক বছর হল পুরুষমানুষ ঘাঁটছে। পুরুষটা হল তার বর তারক। একদিন মিটমিট করে হেসে বলেছিল, বাবুর বাড়িতে কাজে যাস, তা কখনও পিট-ঠিট চুলকে দিতে বললে দিস। নরেনবাবুর মেলা পয়সা। প্যাঁচ বুঝতে যমুনার দেরি হয় না।

আর একদিন বলল, আহা, বাবুর বউটা বোবা, পীরিতের কথা-টথা কইতে পারে না। পুরুষমানুষ একটু ওসব শুনতে-টুনতে চায়।

প্যাঁচ। যমুনা বুঝতে পারে। চিড়েতনটা বুঝতেও তার অসুবিধে হয়নি।

নরেনবাবুর বউ মলয়া বোবা-কালা। তবে সে পয়সাওলা নিতাই রায়ের মেয়ে। নিতাই রায় পঞ্চাশ হাজার টাকায় নরেনবাবুকে কিনেছে। এ কথা সবাই জানে। নগদ ছাড়াও বাড়িঘর ঠিকঠাক করে দেওয়া, মেয়ের নামে জমিজমা লিখে দেওয়া তো আছেই। নরেনবাবুকে তাই আর কিছু করতে হয় না। শুয়ে বসে আড্ডা দিয়ে সময় কাটছিল। তবে বেকার জামাই বলে লোকে টিটকিরি না দেয় সেজন্য ইদানীং নয়নপুরের বাজারে একখানা ওষুধের দোকানও করে দিয়েছে নিতাই রায়। গাঁয়ের দোকান, সেখানে ওষুধ ছাড়াও নানা জিনিস রাখতে হয়। তা নরেন হল বাবু মানুষ। সকালের দিকে শ্রীপতি নামে এক কর্মচারী দোকান দেখে, সন্ধেবেলা নরেনবাবু গিয়ে ঘণ্টা দুয়েক কাটিয়ে আসে। সেখানে কিছু ইয়ারবন্ধুও জোটে এসে। শোনা যাচ্ছে, নরেনবাবুর গদাইলস্করি চালে সুবিধে হয়েছে শ্রীপতির। সে দু-হাতে লুটে নিচ্ছে। তারকের তাই ইচ্ছে, শ্রীপতিকে সরিয়ে চাকরিটা সে বাগায়।

সোজাসাপটা ব্যাপার। এতে কোনও প্যাঁচ নেই। মানুষ কত কী চায়, আর চাইবেই তো! নেই বলেই চায়। কিন্তু চাইলেই তো হল না। দিচ্ছে কে? আর তখনই প্যাঁচটা লাগে।

মলয়ার দুটো মেয়ে। একটা সাড়ে তিন বছরের, একটা দু-বছরের। তারা কেউ বোবা-কালা নয়। বড়টা পাড়ার খেলুড়িদের সঙ্গে খেলতে শিখেছে, আর ছোটটা সারা বাড়িতে গুটগুট করে হেঁটে বেড়ায়। এ দুটো মেয়ে হচ্ছে মলয়ার জান। যখন আদর করে তখন খ্যাপাটে হয়ে যায়। আর সারা দিনে মাঝে-মাঝেই মেয়েদের আঁ-আঁ করে ডাকে। মেয়ে দুটো মায়ের ডাক ঠিক বুঝতে পেরে ছুটে আসে। মেয়ে দুটোর দেখাশোনা করত উড়নচণ্ডী পটলী। ছোট মেয়েটা তখন সবে হামা দেয়। পটলী তাকে বারান্দায় ছেড়ে দিয়ে উঠোনে দিব্যি এক্কা-দোক্কা খেলছিল। মেয়েটা গড়িয়ে পড়ে হাঁ করে এমন টান ধরল যে দম বুঝি

ফিরে পায় না। মাথা ফুলে ঢোল। শোনার কথাই নয় মলয়ার। তবু মায়ের মন বলে কথা। কোথা থেকে পাখির মতো উড়ে এসে মেয়ে বুকে তুলে নিল। তারপর সে কী তার ভয়ঙ্কর চোখ আর ভৈরবী মূর্তি। পটলী না পালালে বোধহয় খুনই হয়ে যেত মলয়ার হাতে। বোবাদের রাগ বোধহয় বেশিই হয়। কথা দিয়ে দুরমুশ করতে পারে না, গালাগাল দিয়ে বুক হালকা করতে পারে না, তাই ভিতরে ভিতরে পোষা রাগ গুমরে ওঠে।

পটলীর জায়গায় এখন যমুনা। মেয়েদের দেখে শোনে, ধান শুকোয়, ঢেঁকি কোটে, গেরস্ত বাড়িতে তো কাজের আকাল নেই। আবার ছুটে গিয়ে ঘরের অকালকুষ্মাণ্ড ওই তারকের জন্যও রেঁধে রেখে আসতে হয়। তা বলে খারাপ ছিল না যমুনা। খাটনিকে তো তার ভয় নেই, চিরকাল গতরে খেটেই বড়টি হল। কিন্তু ভয়টা অন্য জায়গায়। সে হল ওই মলয়া। বোবা কালা হলে কী হয়, যমুনার বিশ্বাস, মলয়া অনেক কিছু টের পায়। শুনতে না পেলেও টের পায়। মাঝে-মাঝে কেমন যেন বড়-বড় চোখ করে তার দিকে অপলক চেয়ে থাকে। একটু ভয়-ভয় করে যমুনার।

নরেনবাবু ধীরে-ধীরে এগোচ্ছে। একদিন বলল, নারী আর নদীতে কোনও তফাত নেই, বুঝলি মেয়েছেলে হল বওতা জল, ডুব দিয়ে উঠে পড়ো। নদী কি তাতে অশুদ্ধ হল? এই যে গঙ্গায় কত পাপী-তাপী ডুব দেয়, গঙ্গা কি তাতে ময়লা হয় রে!

আগে যমুনা শুধু শুনত, কিছু বলত না। আজকাল বলে। সে ফস করে বলে ফেলল, তোমার কি কোনও কাজ নেই বাবু? সকালের দিকটায় দোকানে গিয়ে বসলেও তো পারো। শ্রীপতি তো শুনি দোকান ফাঁক করে দিচ্ছে।

নরেনবাবু একটা ফুঃ শব্দ করে বলল, দিক না, তাতে আমার কী? দোকান শ্বশুরের, শ্রীপতিও তার লোক। সে বুঝবে। আমার ওতে মাথা গলানোর কী? আমি খাব-দাব ফুর্তি করব। বোবা-কালা বিয়ে করেছি কি মাগনা?

শ্বশুর কি আর চিরকাল থাকবে? দোকান তো তোমারই হবে একদিন।

আমার নয় রে, আমার নয়। দোকান ওই বোবা-কালার নামে। ও আমি চাইও না। দু টাকার জিনিস চার টাকায় বিক্রি করে পয়সা কামানোর ধাতই আমার নয়। আমাকে কি তাই বুঝলি?

আর-একদিন আরও একটু এগোল নরেনবাবু। কথা নয়, একখানা তাঁতের শাড়ি দিয়ে বলল, কাল সকালে পরে আসিস। তোকে মানাবে। এসে একটু ঘোরাফেরা করিস চোখের সামনে।

খুশি হল তারকও। বলল, বাঃ-বাঃ, এই তো কাজ এগোচ্ছে।

তার মানে?

নরেনটা তো ভিতুর ডিম। ভাবছিলুম আর বুঝি এগোবে না।

কী বলতে চাও তুমি বলো তো!

দোষ ধরিসনি। একটু মাখামাখি করলে যদি কাজ হয় তো ভালোই।

তাই যদি হবে তাহলে তো বাজারে গিয়ে নাম লেখালেই পারতুম।

চটিস কেন? পেটের দায় বলে কথা। শ্রীপতি শালা তো শুনছি, কৈলাসপুরে চার কাটা জমি কিনে ফেলেছে।

তাতে তোমার কী?

জ্বলুনি হয়, বুঝলি, বুকের মাঝখানটায় বড্ড জ্বলুনি হয়। ঘরামির কাজ করে করে হাতে কড়া পড়ে গেল, সুখের মুখ দেখলাম না। প্রথমটায় বাধো-বাধো ঠেকলেও পরে দেখবি ব্যাপারটা কিছুই না। আমিও যা, ওই নরেনবাবুও তা।

তোমার মুখে পোকা পড়বে।

ওরে শোন, ও চাকরির মতো সুখের চাকরি নেই। মালিক চোখ বুজে থাকে, হিসেব চায় না। এমনটা আর কোথায় পাবি?

এই টানা পোড়েনের মধ্যে দিন কাটছিল যমুনার। একদিন বিকেলে ভিতরের বারান্দায় বসে মলয়ার চুল বাঁধছিল যমুনা। বেশ চুল মেয়েটার। দেখতেও খারাপ নয় কিছু। মায়াও হয়। খোঁপায় কাঁটা গুঁজে হাত-আয়নাটা মলয়ার হাতে যখন ধরিয়ে দিল তখন হঠাৎ আয়নাটা ফেলে ঘুরে বসল মলয়া। সেই বড়-বড় চোখ। দু-হাতের হঠাৎ যমুনার দু-কাঁধ খিমচে ধরে ঝাঁকায় আর বলে, আঁ-আঁ-আঁ-আঁ-আঁ...

ভয়ে আত্মারাম, ডানা ঝাপটাচ্ছিল বুকে। কী জোর মেয়েটার গায়ে!

কী করছ বউদি, কী করছ? আমি তো কিছু করিনি।

মলয়া ঝাঁকানি থামিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে চেয়ে রইল তার চোখের দিকে। তারপর সাপে ব্যাং ধরলে ব্যাং যেমন শব্দ করে তেমনি এক অবোধ শব্দ বেরোতে লাগল তার গলা থেকে। আর দু-চোখে জলের ধারা।

নরেনবাবু পরদিনই বলল, শহরে বেড়াতে যাবি দু-দিনের জন্য? শুধু তুই আর আমি। একটু ফুর্তি করে আসি চল।

ফুঁসে উঠতে পারল না যমুনা। তার কি সেই জোর আছে? জোর হল স্বামীর জোর। তার তো সেখানেই লবডঙ্কা। যমুনা সুতরাং অন্য পন্থা ধরে বলল, তোমার শ্বশুরকে যদি বলে দিই তাহলে কী হয়?

ও বাবা! এ যে আমার শ্বশুর দেখায়! কেন রে, শ্বশুরের কাছে কি টিকিখানাও বাঁধা রেখেছি? নিতাই রায়ই বা কম কীসে? পটলডাঙায় তার বসন্তকুমারীর ঘরে যাতায়াত কে না জানে? কী করবে সে আমার? তুই বড্ড বোকা মেয়েছেলে তো!

শোনো বাবু, বউদি কিন্তু সব টের পায়।

সোহাগের কথা আর বলিসনি। টের পায় তো পায়। কী করবে সে?

যমুনার ভাবনা হল। নরেনবাবুর সাহস বড়ই বেড়েছে. এবার তার বিপদ।

শুনে খ্যাঁক করে উঠল তারক, বিপদ আবার কী? তোকে তো কতবার বলেছি, ওতে কিছু হয় না। তোর আমিও রইলুম। কখনও কলঙ্ক রটিয়ে তোকে বিপদে ফেলব না। নরেনবাবুর সঙ্গে আমার পষ্টাপষ্টি কথা হয়ে গেছে।

কী কথা?

সামনের মাসে চাকরিতে জয়েন দেব।

নরেনবাবু অন্য মেয়েমানুষ দেখে নেয় না কেন?

যার যাকে পছন্দ। তোকে চোখে লেগেছে। ও বড় সর্বনেশে ব্যাপার। যাকে চোখে লাগে তার জন্য পুরুষমানুষ সব করতে পারে।

আমি কালই বাপের বাড়ি যাচ্ছি। লাথি-ঝাঁটা খাই, শুকিয়ে মরি, তাও ভালো। তবু নষ্ট হব না।

বিপদে ফেললি দেখছি। বলি, আমার মতো একটা মনিষ্যিকে যদি তোর সব দিয়ে থাকতে পারিস তবে নরেনবাবু দোষটা কী করল? সে দেখতে আমার চেয়ে ঢের ভালো। ফরসা চোখমুখে শ্রী-ছাঁদ আছে। আমি তার পাশে কী বল তো!

তুমি আমার স্বামী।

ওই তো তোর দোষ। স্বামীর মতো স্বামী হলেও না হয় বুঝতুম।

তুমি খারাপ লোক নও। তোমাকে লোভে পেয়েছে।

তোর মাথাটাই বিগড়েছে। আমি খারাপ নই? খুব খারাপ। কেউ আজ অবধি আমাকে ভালো বলেনি।

আমি বলছি। ভালো করে ভেবে দ্যাখো।

নরেনবাবু তোকে চায়। এমনকী এ কথাও বলেছে, সে তোকে বিয়ে করতেও রাজি।

বিয়ে! বলে এমন অবাক হয়ে তাকাল যমুনা যেন ভূত দেখছে।

ভয় পাসনি। তোর একটু ধর্মভয় আছে আমি জানি। আমি সাফ বলে দিয়েছি, বিয়ে-টিয়ে নয় মশাই। আম বউ ছাড়ছি না। দু-দিন চার-দিন বড় জোর।

তোমার একটু বাধল না বলতে? নরকে যাবে যে!

সে দেরি আছে। নরকে মেলা লোকই যাবে। কলিকালে কি নরকযাত্রীর অভাব রে! আগে এ জন্মে কিছু জুত করে নিই। নরক তো আছেই কপালে।

যমুনা রাগ করে বলল, দেখ, আমি সাবিত্রী বেউলো নই, তবে যা বুঝেছি তাই বুঝেছি। আমাকে দিয়ে ওকাজ হবে না।

তুই বোকাও বটে রে! নরেনবাবুর কী মেয়েছেলের অভাব? তোর কত বড় ভাগ্য যে এত মেয়েছেলে থাকতে তুই-ই ও শালার চোখে পড়েছিস। আমি বলি, সময় থাকতে এসব ভাঙিয়ে নে। রূপ-যৌবন সব ভাঙিয়ে মা লক্ষ্মীকে ঘরে এনে তোল আগে।

মা-লক্ষ্মী এমন ঘরে লাথি মারতেও আসবে না।

মনটা ঠিক করে ফেলেছিল যমুনা। এখানে থাকলে যে তার আর পরকাল বলে কিছু থাকবে না তাও বুঝেছে। কিন্তু যায় কোথা? বাপের বাড়ি বলতে তুলসীপোঁতা গাঁয়ে একখানা ঝুপড়ি। এণ্ডি-গেণ্ডি অনেক ভাইবোনের সংসার। তার বাবা দাদ আর হাজার মলম বিক্রি করে, মা বেচে ঘুঁটে।

৩

বাঁশঝাড়ের মধ্যে একটা তোলপাড় হচ্ছিল। ভোঁস-ভোঁস শ্বাসের শব্দ, সেইসঙ্গে কে যেন আঁদাড়-পাঁদাড় ভাঙচে।

তারক ভয় খেয়ে দাঁড়িয়ে গেল, ও কী গো?

করালী চাপা গলায় বলল, চুপ!

কান খাড়া করে শুনছিল করালী। বাঁশবনের মধ্যে দুটো চোখ চকচক করে উঠল হঠাৎ।

আহ্লাদের গলায় করালী বলল, ওরে পাজি মাগি, এখেনে সেঁধিয়ে রয়েছিস! আয় আয় বলছি শিগগির।

বাঁশবনে প্রলয়ের শব্দ তুলে আর ফোঁস-ফোঁস করে শ্বাস ফেলতে-ফেলতে গরুটা বেরিয়ে এল। গরু না হাতি বোঝা ভার। বিশাল চেহারা।

উরেব্বাস রে! এই তোমার গোরু?

গরুটা করালীর গা-ঘেঁষে দাঁড়াল, তার গলা এক হাতে জড়িয়ে ধরে করালী বলল, আহা, বাঁজা বলেই ওর মনে সুখ নেই কিনা। মনের দুঃখে মাঝে-মাঝে বনবাসে যায়। ফিরেও আসে। চ' চ' পা চালিয়ে চ'। মেয়েটা এতক্ষণে পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসেছে।

তারক একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, তুমি কপালওলা মানুষ, গরুটা দিব্যি পেয়ে গেলে। এখন আমার বউ কোথা পাই বলতে পারো? আমার কপাল তো আর তোমার মতো নয়।

পাবি-পাবি। বাঁধা বউ যাবে কোথায়? মারধর করিস নাকি?

আরে না। সেসব নয়, নরম-সরম আছে, গায়ে হাত তোলার দরকার হয় না। তবে গোঁ আছে খুব। যেটা না বলবে সেটাকে হ্যাঁ করায় কার সাধ্যি।

রথতলার কাছ বরাবর করালী বাঁয়ের রাস্তা ধরল, তারক ডাইনে।

সামনেই মলয়া ফার্মেসি। আলো জ্বলছে। দিব্যি পাকা ঘর। দোকানও বড়সড়োই। আজ নরেনবাবু নেই। শ্রীপতি একা বসে মাছি তাড়াচ্ছে।

তাকে দেখে শ্রীপতি বিশেষ খুশি হল না। হওয়ার কথাও নয়। মুখটা আঁশটে করে বলল, বাবু নেই।

আসেনি আজ?

না। সকাল থেকেই পাত্তা নেই। বাড়ি থেকেও লোক এসে খুঁজে গেছে।

অ্যাঁ। তবে তো—

শ্রীপতি চেয়ে আছে। বুকটা ধকধক করছিল তারকের। তাড়ির নেশাটা কেটে যাওয়ার উপক্রম।

গেল কোথায় নরেনবাবু?

শ্রীপতি ঠোঁট উলটে বলল, তা কে জানে। বলে যায়নি কিছু। বাড়ির লোকও খুঁজছে।

দুইয়ে-দুইয়ে তবে কি চারই হল? যমুনা আর নরেনবাবু যদি একসঙ্গেই হাওয়া হয়ে থাকে তো শ্রীপতির জায়গায় সামনের মাসে সে-ই জয়েন দেবে।

তারক বসে গেল।

দোকানে বিক্রিবাটা কেমন হে?

বিক্রি কোথায়? ওষুধের স্টকই নেই।

নেই কেন?

ওষুধ কি মাগনা আসবে? টাকাটা দেবে কে?

কেন, নিতাইবাবু দেবে।

দিচ্ছে কোথায়? অন্য সব কারবারে টাকা আটকে আছে। দোকান চলছে, নমো-নমো করে।

ইয়ে—তা উপরি-টুপরি কেমন?

উপরি! সেটা আবার কী? মাসমাইনেরই দেখা নেই তো উপরি।

তারক মৃদু-মৃদু হাসছিল। শ্রীপতি তো আর পাঁঠা নয় যে তার কাছে কবুল করবে।

নরেনবাবু বাড়িতে কিছু বলে যায়নি?

তা কে জানে। ঠসা-বোবা বউ, তাকে বলাও যা না-বলাও তা।

তারক উঠে পড়ল। নাঃ, এতদিনে যমুনার তাহলে সুমতি হয়েছে। নরেনবাবুর সঙ্গেই যদি গিয়ে থাকে—গেছেই—তাহলে তো মার দিয়া কেল্লা। ওষুধের দোকান মানে কাঁচা পয়সা।

ঘরে ফিরে টেমি জ্বেলে বসে-বসে খানিক ভাবল তারক। খবর নিয়েছে, শ্রীপতির মাইনে মাসে তিনশো টাকা। কম কীসের? বসা চাকরি। তার ওপর উপরি তো আছেই।

মনটা বেশ ভালোই লাগছে তারকের। সে টেমি নিবিয়ে শুয়ে পড়ল।

কত রাত হবে কে জানে, হঠাৎ একটা চেঁচামেচি শুনে ঘুম ভাঙল তারকের। কোথা থেকে চেঁচামেচিটা আসছে তা প্রথমে ঠাহর হল না। কারও বিপদ আপদ হল নাকি?

দরজা খুলে বেরিয়ে এল তারক। মনে হল পুরো গাঁ-ই চেঁচাচ্ছে। মেয়েপুরুষের গলা শোনা যাচ্ছে।

ডাকাত! ডাকাত!

তারক লাফ দিয়ে উঠোনে নামল। তারপর নরেনবাবুর বাড়ির দিকে ছুটতে লাগল। গণ্ডগোলটা ওখানেই হচ্ছে যেন!

নরেনবাবুদের পুরোনো ভাঙা বাড়ি সারিয়ে দালান তুলে দিয়েছে নিতাই রায়। বেশ বড়সড়ো বাড়ি। উঠোনে ধানের মরাই, টিপকল, পিছনে গোয়াল, ঢেঁকিঘর। বাড়িটা হাতের তেলোর মতোই চেনে তারক।

চেঁচালেও পাড়ার লোক কেউ বেরোয়নি ভয়ে। বাইরের উঠোনে মশাল হাতে কালিঝুলি মাখা একটা লোক দাঁড়িয়ে। হাতে একখানা বড়সড় ছোরা চকচক করছে। আর ভাঙা দরজা দিয়ে আর দুজন টেনে হিঁচড়ে বাইরে বের করে আনছে নরেনবাবুর বোবা-কালা বউটাকে। বউটার শাড়ি খুলে লম্বা হয়ে ছড়িয়ে গেছে ঘর অবধি। তার মুখে কথা নেই, কেবল আঁ-আঁ চিৎকার।

তারক চেঁচিয়ে বলল, ডাকাতি করছ করো, বউটাকে ওরকম করছ কেন হে? অ্যাঁ, ওকে ছেড়ে দাও। বোবা-কালা মানুষ।

উঠোনের ছোরা হাতে লোকটা একবার তার দিকে ফিরে দেখে একটা হাঁক মারল, ভাগ শালা শুয়োরের বাচ্চা। পেট ফাঁসিয়ে দেব...

তারক থমকে গেল। হচ্ছেটা কী? ডাকাতি করবি কর। কিন্তু মেয়েছেলেটাকে টেনে বের করছিস কেন? অবোলা মানুষ।

হঠাৎ ঝাঁক করে মাথাটা পরিষ্কার হয়ে গেল তারকের। এ শালারা ভাড়াটে খুনে নয় তো?

চুলের মুঠি ধরে ছেঁচড়ে সিঁড়ি দিয়ে নামিয়ে আনছে মলয়াকে। একজন খেঁটে মোটা একটা লাঠি দিয়ে পেটাচ্ছে অমানুষিক জোরে। হাড়গোড় ভেঙে যাওয়ার কথা।

আঁ-আঁ-আঁ-আঁ চিৎকারটা চারদিকে ছড়িয়ে যাচ্ছে সাইরেনের মতো। সেই চিৎকারে মড়া মানুষও শিউরে উঠবে। মশালের আলোয় তারক দেখতে পেল, মলয়ার মুখ দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে।

উঠোনের লোকটা ছোরা হাতে এগিয়ে যাচ্ছিল মলয়ার দিকে।

তারক জন্মে মারদাঙ্গা করেনি। সে ভিতু মানুষ। কিন্তু আজ মাথাটা যেন বড্ড তেতে গেল হঠাৎ। চারদিকে ঢেলা আর ইটের অভাব নেই। পুরোনো বাড়ির ভাঙা টুকরো চারদিকে ছড়ানো। তারক একখান ইটের টুকরো তুলে খানিক দৌড় দিয়ে টিপ করে মারল। একটা, দুটো, তিনটে...

মার শালাকে! মার শালাকে...বলে চেঁচাচ্ছিল তারক।

তার পয়লা ইটেই ছোরাওলা মাথা চেপে বসে পড়েছিল। আর ইটগুলো লাগল কি না কে জানে, তবে লোকগুলো ভড়কে ছিটকে গেল এদিক-ওদিক। তারক লাফ দিয়ে গিয়ে উঠোনে ঢুকল।

সামনে একটা খেঁটে লাঠি পড়েছিল। সেইটে তুলে নিল সে। তারপর বসা ডাকাতটা উঠতে যেতেই পাগলের মতো মারতে লাগল তাকে।

কে একজন চেঁচাল, পালা-পালা...লোক আসছে...

ডাকাতের জান বলে কথা। অত পিটুনি খেয়েও লোকটা হঠাৎ উঠে প্রাণভয়ে দৌড় লাগাল। কে কোথায় গেল কে জানে। তবে মেয়েটা বেঁচে গেল এ যাত্রা।

গাঁয়ের লোক বোধহয় তারকের সাহস দেখেই বেরিয়ে এল এতক্ষণে। লহমায় লাঠিসোঁটাধারী পুরুষ আর মেয়েছেলেতে উঠোন ভরতি। মেয়েদের কারও হাতে বঁটি অবধি। চেঁচামেচিতে কান পাতা দায়।

মলয়াকে ধরে তুলতে হল। বোবা মেয়েটা থরথর করে কাঁপছে, চোখে ভূতুড়ে দৃষ্টি। সোজা হয়ে দাঁড়াতেও পারছে না। তারক পাঁজাকোলে করে তাকে ঘরে এনে শোওয়াল বিছানায়। মেয়ে দুটো চেঁচিয়ে কাঁদছে।

নরেনবাবু কোথায়? নরেনবাবু কি খাটের নীচে নাকি? নাকি পালিয়ে গেছেন? এসব নানা জন জিগ্যেস করতে লাগল।

একজন মুনিশ এগিয়ে এসে বলল, বাবু আজ সাতসকালেই একটু শহরে গেছেন। আজ ফিরবেন না।

তারকের গা জ্বালা করছিল হঠাৎ। নরেনশালাই মলয়াকে খুন করতে লোক লাগায়নি তো। শালার যে যমুনার ওপর দারুণ লোভ। তারকের কাছে বিয়ের প্রস্তাব অবধি দিয়ে রেখেছে।

মাথাটা বড্ড গরম হচ্ছিল তারকের। সবাই এসে পিঠ চাপড়ে যত তার বীরত্বের প্রশংসা করছিল আর ততই তারকের গায়ের রোঁয়া দাঁড়িয়ে যাচ্ছিল রাগে। ব্যাপারটা তার কাছে পরিষ্কার। ডাকাতি নয়, ডাকাতরা অকারণে খুন করে না। এরা খুন করতেই এসেছিল।

তপন হালদারের ছেলে মিতুল মোটরবাইকে করে কালীপুর থেকে মন্মথ ডাক্তারকে নিয়ে এল। গাঁয়ে হোমিওপ্যাথি জগন্নাথ কী সব ওষুধ খাইয়ে দিয়েছিল মলয়াকে। যাই হোক বউটার চোট তেমন মাত্রাছাড়া নয়। মন্মথ ডাক্তার দেখেটেখে বলল, হাড়-টাড় ভাঙেনি। তবে ভোগান্তি আছে।

তারক ভিড়ের বাইরে উঠোনের এক ধারে এসে দাঁড়িয়ে ওপরে চেয়ে আকাশটা দেখল। সে অমানুষ ঠিকই, কিন্তু তার চেয়েও ঢের অমানুষ তো পৃথিবীতে আছে দেখা যাচ্ছে।

কালীপুর থানা থেকে পুলিশও এসে পড়ল জিপে করে। জবানবন্দি দিতে দিতে রাত প্রায় ভোর। তারপর তারক বাড়িমুখো রওনা হল। মনটা খারাপ লাগছে। বউটা এঁটো হয়ে পড়ল!

বাঁশঝাড় পেরনোর সময়ে কে যেন বলে উঠল, আমি তো জানতুম তুমি খারাপ লোক নও।

তারক হাঁ।

কে? কে?

আমি।

অন্ধকারেও কি আর চিনতে ভুল হয়?

তুই! তুই নরেনবাবুর সঙ্গে যাসনি?

তোমার কি মুখে কিছু আটকায় না? তার আগে গলায় দড়ি দেব।

তাহলে কোথায় ছিলি?

কোথায় আবার! বউদি লুকিয়ে রেখেছিল নতুন গোয়ালঘরে। ডাকাত যখন পড়ল তখন বেরিয়ে এসে কাণ্ড দেখে খড়ের গাদার পিছনে লুকিয়ে পড়ি। তুমি না এলে আজ কী যে হত!

নরেনবাবু তাহলে কার সঙ্গে গেল?

তার আমি কী জানি! নিয়ে যেতে চেয়েছিল বলেই তো পালিয়েছিলুম।

ও শালা মহা হারামি। একবার ভেবেছিলুম পুলিশকে বলে দিই, খুনটা ও শালাই করাচ্ছিল।

না-না, ওসব বলার দরকার নেই। আমাদের তো এ গাঁয়েই থাকতে হবে। আমরা গরিব মানুষ।

হুঁ।

আর আমাকে বেচতে চাইবে না তো!

তারক একটু হাসল। তারপর হাত বাড়িয়ে যমুনার একটা হাত ধরে বলল, সেই তারকটা ভেগে গেছে। এখন যে-তারকের হাত ধরে হাঁটছিস সেটা একটা পরপুরুষ।

তারকের হাতে একটা জোর চিমটি কাটল যমুনা।

সাহেবের তলোয়ার

.গাঁসাইনি?

—আইজ্ঞা।

—আইলানি?

—আইজ্ঞা আইলাম।

—বহ বহ, খবর বার্তা কও।

—খবর বার্তা ভালো নয়। রাসুবাবু ঘাড় কাইত করলেন না।

—কও কী? মাইনকা ঢিপির মইধ্যে পড়লাম নাকি হে গোঁসাই?

—আইজ্ঞা মাইনকা ঢিপি বইলাই তো মনে হয়।

—পাকঘরে একখান চুপি মাইরা দেইখ্যা আসো তো, তাইন পাকঘরে নাকি!

—আইজ্ঞা চুপি মারতে হইব না। এইখান থিক্যাই ছ্যাক ছোক শব্দ পাইতেছি।

—তা হইলে নিশ্চিন্তে কথা কওন যায়। রাসুবাবু কয় কী?

—এয়ারলিং মানে জানেন?

—এয়ারলিং? না হে গোঁসাই। ইংরাজি শব্দ নাকি?

—তাই তো মনে হয়। কইলেন, এইটা হইল আমাগো এয়ারলিং। বেচুম ক্যান? এইটা বেচলে তো নিজেরেও বেচন যায়।

—ঘাড়খানা অখনও তেড়াই আছে, না?

—আইজ্ঞা। আমারে তো একরকম খেদাইয়াই দিলেন। কইলেন, পরেশরে গিয়া কইও, তার যে টাকার গমর হইছে হেইটা আমি জানি। কিন্তু টাকা দিয়া কি সব কিনন যায় হে?

—এত বড় কথা?

—আইজ্ঞা, কথা উনি বড়ই কন।

—ফুটানি যায় নাই। আর সব গেছে, ফুটানি যায় নাই।

অন্ধকার চেপে বসেছে চারদিকে। ঘর থেকে একটা লণ্ঠনের আলোর চৌখুপি এসে পড়েছে উঠোনে। তার আভায় দেখা যাচ্ছে, উঠোনে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে দুটো দিশি কুকুর। উত্তর আর পুবদিকে আরও দু-খানা ঘর। আশেপাশে কচু বন, বাঁশঝাড়। জোনাকি পোকা উড়ছে খুব। মশার শব্দ হচ্ছে। শীতের প্রথম দিককার কুয়াশাও ঘন হয়ে আছে চারদিকে। একটা মাছ ভাজার গন্ধ ভাসছে চারদিকে। পরেশ ঘোষ তার নিবন্ত হুঁকোটায় দুটো নিষ্ফল টান দিয়ে একটা হাঁক মারল, বুচি রে, তামুক সাইজ্যা দিয়া যা।

ফ্রক-পরা আট নয় বছরের একটা মেয়ে এসে হুঁকো থেকে কলকেটা তুলে নিয়ে গেল। মাছ ভাজার গন্ধটা বড়ই ভালো লাগছিল কানু গোঁসাইয়ের। সারাদিন ঘুরে তার পেটে এখন উথাল পাথাল খিদে। বাড়ি ফিরতে এখনও দেড় মাইল পথ। নাকটা তুলে গন্ধটা প্রাণ ভরে শুঁকছিল সে। বুচি এসে হুঁকোর মাথায় কলকে বসিয়ে গেল।

—তামুক খাইবা গোঁসাই?

—ন, থাউক গা।

—রাসু আমার টাকা দেখত্যাছে, কিন্তু আর কিছু দেখে না ক্যান কও না? প্যাটে গামছা বাইন্ধা, উদয়াস্ত খাইট্যা তবে না দুইটা পয়সার মুখ দেখছি। কেউ কইতে পারব পরেশ ঘোষের ফুটানি আছে?

—আমি কই কী, আপনি নিজে একবার গিয়া খাড়ান। আপনে গিয়া খাড়াইলে রাসুবাবু না কইতে পারবেন না।

পরেশ মাথা নেড়ে বলল, উপায় নাই হে গোঁসাই।

—ক্যান, কাইজ্যা হইছে নাকি?

—কাইজ্যা বলে কাইজ্যা? তার সামনে যাওনের উপায় নাই।

—হইছে কী কইবেন তো?

—শোনবা?

—কইয়া ফ্যালান।

অখন কওন যায়। পুরোনো ঘটনা তো, অখন কইলে দোষ নাই।

পরেশ ঘোষ কিছুক্ষণ তামাকে টান দিল। গুড়ুক গুড়ুক মিষ্টি শব্দের সঙ্গে এসে মিশল প্যাঁচার ডাক। মাছ ভাজার গন্ধটা মিইয়ে গিয়ে জিরা বাটা লঙ্কা আর হলুদের টগবগ করা ঝোলের টাটকা গন্ধটা ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। কানু গোঁসাইয়ের পেটের অস্বস্তিটা বাড়ল। এই শীতের মরসুমে মেলা মাছ উঠছে বাজারে। তেলাল সরপুঁটি, ভ্যাদা, ট্যাংরা, কই। একটু ধনেপাতা ছিটিয়ে রাঁধলে অমৃত। কিন্তু কানু গোঁসাইয়ের ট্যাঁকের জোর নেই। বাড়ি ফিরে চারটি ভাত আর একটু শাকপাত, কচু, ঘেঁচু জুটলেই বহুত। পরেশ ঘোষ আজ কিছু দেবে। দিলে কাল না হয় দুর্গা বলে কিনেই ফেলবে একটু মাছ। গন্ধটা তাকে বড্ড কাহিল করে ফেলেছে।

—রাসুর বইন চন্দ্রিমার কথা শোনছ?

—খুব শুনছি। কুসারি পাড়ায় শ্রীশ দাসের লগে বিয়া হইছে যার।

—হেই। তার লগে আমার একখান সম্বন্ধ আইছিল।

—নাকি?

—সতেরো আঠারো বছর আগেকার কথা। বিয়া পাকা, আশীর্বাদও হইয়া গেছিল, নিমন্ত্রণের চিঠিও বিলি হইয়া গেছে, এমন সময়ে আমার পিতৃদেব একখান কাণ্ড কইর‍্যা বইলেন। পাঁচ হাজার টাকা নগদের কথা আছিল, কিন্তু তাইন হঠাৎ বাইক্যা বইস্যা কইলেন, আমাগো দক্ষিণের ঘর ভাইঙ্গা পড়ছে, ঘর না মেরামত করলে পোলা আর বউ থাকব কই? সুতরাং ঘর তোলনের লিগ্যা আরও পাঁচ হাজার লাগব।

—ছিল না?

—পাঁজ হাজার কি ফাইজল্যামি নাকি হে, গোঁসাই? রাসুর বাপের অবস্থা তখন পড়তি, ঘরে কর্জ কইরাই বিয়া দিত্যাছিল। গেল বিয়া ভাইঙ্গা।

—ইস রে! চন্দ্রিমা তো শুনছি খুব সুন্দরী।

—আরে হেই লিগ্যাই তো বাবার লগে আমার বনে নাই। বুড়া টাকা-টাকা কইরা দাপাইয়াই মইরা গেল। শ্যাষে কুলতলির এই কুচ্ছিৎটারে আমার গলায় আইন্যা ঝুলাইয়া দিল।

—কী যে কন! বউঠাইন তো লক্ষ্মীপ্রতিমা।

—তোমার মাথা। যেমন রূপ তেমনই গলার জোর। মাথার চুলগুলি কি আমার উইঠ্যা গেল সাধে? এই মাগির লিগ্যা উঠতে-বসতে অশান্তি।

—কী যে কন ঘোষমশায়?

—মাগির গায়ের রংখান দেখছ? লণ্ঠনের কালি, ধলা না হইল, এমন কালাও মানুষ হয়? আর দেখো এই মাগির লিগ্যাই রাসুর পায়ে তেল দিতে হইতাছে।

—বৃত্তান্তখান কী?

—কী লেন, কী দেন, কী বৃত্তান্ত কইতে গেলে রাইত ফুরাইব। সংক্ষেপে কই, আমার শালা ব্রাউন নামে কোন এক সাহেবের লগে নারায়নগঞ্জে স্টিমার কোম্পানি খুলছে। পয়সা লুটতাছে মন্দ না। তবে সাহেবটার বাতিক আছে। গ্রামে গঞ্জে ঘুররা কেবল পুরোনো জিনিস খুইজ্যা বেড়ায়। রাসুর বাড়িতে গিয়াও হানা দিচ্ছিল। পুরোনো তরোয়ালখান দেইখ্যা খুব পছন্দ। শুনছি এক হাজার টাকায় কিনতেও চাইছিল। রাসু দেয় নাই।

—তাই কেন?

—খাড়াও, কথা অখনও শেষ হয় নাই।

রাসুর লগে না পাইরা অখন আমার শালা রামপদরে ধরছে সাহেব। যত টাকা লাগে লাগুক, তরোয়ালখান তার লাগব।

—সাহেব কততে উঠব?

—ওই যে তোমারে যা কইয়া দিছি, তিন হাজার। তিন হাজারে ষাইট বিঘা জমি হয়। সোজা কথা নাকি? সাহেবটা পাগল বইল্যা শ্যান টাকাটা জলে ফালাইতে চাইত্যাছে।

খিদেটা হঠাৎ যেন উধাও হল কানু গোঁসাইয়ের। টাকার কথা শুনতে তার ভালোই লাগে। একটা তরোয়ালের এত দাম হতে পারে তা তার ধারণায় ছিল না। সোনার কাজ করা, রুপোর খাপে মোড়া তরোয়ালটা নাকি রাসুদের পূর্বপুরুষের সম্পত্তি। বিস্তর পুরোনো। কিন্তু দামটাও বেজায় বেশি হয়ে যাচ্ছে।

সে বলল, সাহেবটা পাগলই।

—আর কইও না। সাহেব কইছে, তরোয়ারলখানা না পাইলে রামপদর লগে আর কারবারই করব না। আর হেই লিগ্যাই রামপদর গুণধরী বইন, আমার অর্ধাঙ্গিনী আমারে উঠতে বইতে তিষ্ঠাইতে দিত্যাছে না।

—রামপদ নিজে যায় না ক্যান?

—গেছিল। খেদাইয়া দিছে।

—খেদাইয়া দিল ক্যান? রামপদ তো আর আমার মতো ছাতামাতা মানুষ না।

—আর কইওনা হে গোসাই। রামপদ একটা বলদামি কইরা ফালাইছিল। গিয়া কথায় কথায় কইয়া ফালাইছে পরেশ ঘোষ আমার ভগ্নীপতি। ভাবছিল আমার নাম কইলে রাসু ভড়কাইব। আর যাইবা কই? এই মারে কি সেই মারে। কইছে কী জানো?

—আইজ্ঞা, ভালো কথা না নিশ্চয়ই?

—কইছে তোমরা ভগ্নীপতির বংশ খারাপ, তোমার ভগ্নীপতি হারামি, আরও কত কথা। মুখ তো না, ফ্যান ছিটাল।

—আইজ্ঞা, রাসুবাবুর বায়ু একটু চড়া। হইব না ক্যান কন। কত বড় বংশ অ্যাছিল। হাতি ফান্দে পড়ছে ঠিকই, তবে অখনও হামবড়াইটা তো যায় নাই।

—আরে রাসু হইল ফোতো কাপ্তান। অর আছেটা কী? বংশ ধুইয়া কী জল খাইব?

—আইজ্ঞা, কথাটা ঠিকই। শোনলাম গত মাসেও পঞ্চাশ বিঘা জমি বেইচ্যা কর্জ শোধ করতে হইছে। সোনাদানাও বোধহয় আর বেশি কিছু নাই।

—আরে, থাকব কইথিকা? বেইচ্যা-বেইচ্যাই তো এতকাল খাইল। অকাল কুষ্মাণ্ড আর কারে কয়? তবু ফুটানি ছাড়ে না।

—আইজ্ঞা, যা কইছেন।

মাছের ঝোল নেমে গেছে উনুন থেকে। এবার একটা সোনামুগ ডালের গন্ধ ছড়াচ্ছে। জ্বালাতন আর কাকে বলে। এ সব গন্ধের পর বাড়ি ফিরে কচুর ঝোল দিয়ে আউস চালের মোটা ভাত কি মুখে রুচবে?

—কিছু দিবেন নাকি ঘোষমশায়?

পরেশ হুঁকোটা বাঁশের খুঁটির গায়ে ঝুলিয়ে রেখে বলল, আরে রও দিমু। কিন্তু কামটা উদ্ধার কইর‍্যা দাও।

—ক্যামনে?

—য্যামনে পারো। কথার লড়চড় হইব না। যদি তরোয়ালখানা বাগাইয়া আনতে পারো, তোমারে কড়কড়া পঞ্চাশটা টাকা দিমু।

—পঞ্চাশ?

—ক্যান, পঞ্চাশ কি কম হইল?

—আইজ্ঞা না, কথাটা ভালো শুনতে পাই নাই বইলাই আর একবার শুইন্যা নিলাম।

—যাওন আহনের খরচা আলাদা দিমু। কিন্তু কামটা উদ্ধার কইর‍্যা দাও। রামপদ পরশু দিন আইয়া মেলা কাকতি মিনতি কইরা গেছে। সাহেব যদি তারে খেদায় তবে তার গণেশ উল্টাইব। খোঁটার জোরে যেমন মেড়া কোন্দে, তেমন আমাগো রামপদ কোন্দে ব্রাউনের জোরে।

—বুঝছি।

—আরও একটু বুইঝ্যা যাও। এই যে কালি মাগিরে লইয়া ঘর করি সেই মাগি কিন্তু আমারে খাবলাইয়া খাইত্যাচে। তার ভাইরে উদ্ধার করতে না পারলে আমার আর শান্তিতে ঘরে বইয়া তামুকটুকু খাওনেরও উপায় থাকব না। কাজ কারবার লাটে উঠব। বোঝলা?

—ভাবতে দ্যান।

—বেশি ভাবতে হইব না। আমি জানি তুমি বুদ্ধিমান লোক। উপায় একটা করতে পারবাই।

—একটা চোরারে কামে লাগামু ঘোষমশায়?

—চোর! কও কী?

—আইজ্ঞা, এই মাইনকা চিপি থিক্যা রক্ষা পাইতে হইলে আর উপায় কী? লাটু দাসেরে চিনেন?

—হবিবগঞ্জের লাটু নাকি?

—আইজ্ঞা। তারে লাগাইলে হয়। ব্যাটার খুব নামডাক। আমার লগে চিনা আছে।

পরেশ পাল মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে বলল, আরে বাঃ, এই মতলব তো আমার মাথায় আসে নাই হে গোঁসাই? তা হইলে তারেই লাগাও।

—দশ বিশ টাকা খর্চ লাগব কিন্তু।

—ঠিক আছে। জিনিসটা আইন্যা আগে আমার হাতে দাও। খর্চ তো আছে। খাড়াও, তোমার দক্ষিণাটা দিতাছি।

মুগডালের গন্ধ তীব্র হচ্ছে। এ তো শুধু সেদ্ধর গন্ধ। এরপর ফুটন্ত ডালে জিরেবাটা, আদাবটা আর হলুদ পড়বে। তারপর পড়বে ঘি দিয়ে জিরে ফোড়ন। ওঃ, তখন যা গন্ধ ছাড়বে না, গোলাপ ফুলকে বলবে ওদিকে থাক।

পাঁচটা টাকা আশা করেনি কানু গোঁসাই। দুটো-একটা টাকাই জোটে। আজ পাঁচ টাকা পেয়ে বুকটা নেচে উঠল।

—গোঁসাই, কাইল সকালেই গিয়া লাটুরে ধইর‍্যা ফালাও। দেরি কইরো না। সাহেবের মতিগতি কুনদিন বদলাইয়া যায় ঠিক কী?

কানু গোঁসাই উঠে পড়ল। তার ট্যাঁকে ঘড়ি নেই ঠিকই, কিন্তু সময়ের আন্দাজ আছে। এখন রাত বড় জোর নটা। এ সময়ে চাঁদিপুরের রতন জেলে নদীয়াল মাছ ধরে এনে ঘাটে বসে। ভাগ বাঁটোয়ারা করে। অনেক সময়ে পাওয়া যায়। চার-ছ'আনার মাছ কিনতে পারলে আজ রাতে পেট ভরে দুটো ভাত খাওয়া যাবে।

—সে বলল, তা হইলে আসি গিয়া ঘোষমশয়।

—আহ গিয়া। মনে থাকে য্যান—

না, মাছ পেল না কানু গোঁসাই, ঘরে ফিরে ঠান্ডা ভাত আর মানকচুর ঝোলই খেতে হল। তা হোক, পকেটে পাঁচটা টাকা থাকায় আজ তেমন খারাপ লাগল না। মনটা নাচলে সবই ভালো লাগে।

মনের নাচ বন্ধ হল যখন হবিবগঞ্জের ঘাটে লাটুর সঙ্গে দেখা হল পরদিন দুপুরে। রোগা ছোটখাটো চালাক চেহারার লাটু কথাটা শুনেই বলে উঠল, খ্যাফচেন নাকি গোঁসাই? রাসুবাবুর যে বন্দুক আছে হেইটা নি জানেন?

—বন্দুক? বন্দুকের ভয় পাও নাকি রে বাসি? তা হইলে আর কাজটা করলা কী?

—না মশয়, পাঁচ-সাত টাকায় আমার পোষাইব না।

—কত চাও?

—পঞ্চাশ টাকা দিলে ভাইব্বা দেখতে পারি।

পঞ্চাশ? পঞ্চাশ দিলে আর কানুর থাকে কী? সে বলল, এক বিঘা জমির দাম চাও?

—আমি চামু ক্যান? আপনে চুরিধারি করেন নাই, আপনে বুঝবেন ক্যামনে চোরের কাম কত কঠিন।

—আইজ্ঞা, বিশ টাকাই দিমু।

—আপনার এত পয়সা হইল কবে? করেন তো পুরুতগিরি।

—আরে কাম আমার না, আমি নিমিত্ত মাত্র।

—হেইরে বুঝছি। আপনার পিছনে কেডা আছে কন তো।

—কওন যাইব না হে।

—তা হইলে মাপ করবেন মশয়, পারুম না।

—পোষাইল না নাকি হে? কামটা তো কঠিন না হে। একখান তরোয়াল বাইর কইরা আনবা।

—বন্দুক ফুটাইলে তো প্রাণটা আপনার যাইব না, যাইব তো আমার। বালবাচ্চা লইয়া ঘর করি মশয়, গুল্লি খাইয়া মারতে পারুম না।

লাটুকে যতটা বীর ভেবেছিল কানু, ততটা বীর সে নয় দেখে একটু হতাশই হল। সন্ধেবেলা ফের পরেশ ঘোষের কাছে এসে বলল, না ঘোষমশয়, লাটু একখান ভেড়ুয়া।

পরেশ ঘোষ তামাকটা একটু ঘন ঘনই খায়। উত্তেজিত হলে টানটাও দেয় উপর্যুপুরি।

বেশ কিছুক্ষণ তামাক খেয়ে বলল, তুমিই একবার চেষ্টা কইরা দেখবা নাকি?

আজ ফুলকপি সাঁতলানোর মাতাল গন্ধটা আসছিল। আহা, নতুন কপি, তার গন্ধই আলাদা। ঘোষের কথাটা কানেই গেল না। ফুলকপির গন্ধ কথাটা খেয়ে নিল।

—কিছু কইলেন নাকি ঘোষমশয়?

—কইলাম। ঠেকায় পড়লে মাইনষে কী না করে?

—যা কইছেন। কিন্তু কামটা কী?

—লাটুর বদলে তুমিই লাইমা পড়।

—বুঝাইয়া কন।

—আরে, কৃষ্ণও তো ননী মাখন চুরি করত। করত না?

—আইজ্ঞা।

—হেই কথাই কই। তুমি চালাক মানুষ, লাটু পারলে তুমিই বা না পারবা ক্যান? রাসুর বাড়ির তো ঝুরঝুরা অবস্থা, বিড়ালের লাথিতে কপাট ভাইঙ্গা পড়ে। আমি কই রাত বিরাইতে গিয়া যদি ভিতরে ঢুইক্যা পড়, কাম ফরসা।

কানু গোঁসাই বিষণ্ণ মুখ করে বলল, চোরও হইতে কন? এই দুই হাতে পূজা করি।

—শোনো হে বাপু, মূল্য দিলে দোষ থাকে না। চুরি তো নিজের লিগ্যা করবা না, আমার লিগ্যা করবা। তার মূল্য ধইরা দিলে আর দোষ থাকব না। তুমি নিমিত্ত মাত্র।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কানু বলে, আমি গরিব ঠিকই, তবে পইচ্যা যাই নাই ঘোষমশয়।

—চুরির বুদ্ধিটা কিন্তু তুমিই দিছিলা।

—তা দিছিলাম।

—তা হইলে আমার দোষ কী কও।

—দোষ আমার কপালের।

—চেইত্যো না হে গোঁসাই। মাথা ঠান্ডা কর।

—চেতি নাই। ভাবত্যাছি আসলে কথাটা কইলেন কেমনে। গরিবরে কি হগ্গলই কওন যায়?

—দোষের কথা কিছু কই নাই। মাথা ঠান্ডা কইরা ভাবলেই দিশা পাইবা। যাউকগা, কাজটা তো উদ্ধার করতে হইব। একখান বুদ্ধি বাইর কর।

কানু গোঁসাই ফের ফুলকপির গন্ধ পাচ্ছিল। এবার ঝোলের গন্ধ। নতুন আলু দিয়েই বোধ হয় হচ্ছে ঝোলটা। কই মাছ দিয়ে কি? হতেও পারে। ফুলকপি দিয়ে কই মাছ দেবভোগ্য। একটা ঢোঁক গিলে ফেলল কানু গোঁসাই।

—কিছু ভাবলা গোঁসাই? আগে ব্রাহ্মণরাই আছিল পরামর্শদাতা। তাগো বুদ্ধিতেই সমাজ চলত। তাগো ট্যাকে পয়সা নাই, গায়ে জোর নাই, কিন্তু বুদ্ধি আছিল ক্ষুরধার।

—আইজ্ঞা।

—কামটা উদ্ধার কইরা দাও গোঁসাই।

—রামপদর কি খুবই বিপদ ঘোষমশয়?

—বছরে ব্রাউন সাহেবের টার্ন ওভার জানো? লাখ টাকার ওপরে। রামপদ কম কইরাও বছরে ত্রিশ চল্লিশ হাজার টাকা কামায়। ব্রাউন যদি তারে ছাড়ে তা হইলে রামপদরে গলায় দড়ি দিতে হইব। বোঝলা?

—মেলা টাকা।

টাকার গল্প শুনতে কানু গোঁসাই খুবই ভালোবাসে। রামপদ বছরে ত্রিশ-চল্লিশ হাজার টাকা কামায় শুনে কান জুড়িয়ে গেল। বড়লোকের দুঃখ সে সইতে পারে না। বড়লোকেরা তো আর এমনি-এমনি বড়লোক হয়নি, ভগবান তাদের দিয়েছেন বলেই না তারা বড়লোক।

পরেশ ঘোষ হুঁকোটা মুখ থেকে সরিয়ে বলল, হ, মেলা টাকা। এখন তুমিই কও গোঁসাই, ব্রাউন সাহেব রামপদরে ছাড়লে রামপদ যদি গলায় দড়ি দেয়, তা হইলে তার বইন আমারে পিছার বাড়ি না দিয়া ছাড়ব?

—ব্রাউন সাহেব তিন হাজার টাকার ওপরে উঠব?

—কইতে পারি না। তবে তিন হাজারে যে উঠেছে এইটাই আমার বিশ্বাস হইতে চায় না।

—সমস্যা কী জানেন? রাসুবাবু টাকারে টাকা মনে করে না। ছিড়া ত্যানা পইরা থাকলেও অহঙ্কার যায় নাই।

—ঘাড় ত্যাড়া হারামজাদা। একখান জং ধরা তরোয়াল পইড়া আছে, হেইটা দিয়া তর হইব কী রে নিব্বইংশার পো?

—এয়ারলিং না কী জানি কইছিল।

—হ, এয়ারলিং না ঘোড়ার ডিম।

তরোয়ালখান অর ইসের মইধ্যে ঢুকাইয়া দিতে পারলে মেজাজটা আমার ঠান্ডা হইত।

—আইচ্ছা, ঘোষমশয়, রামপদর বিয়া দিতে আছেন না ক্যান? সাতাইশ-আটাইশ বছর বয়স তো হইল।

—নবাবপুত্তুর বিয়া করলে তো? কইয়া দিছে, বিয়া টিয়া করব না, কেবল টাকা কামাইব। টাকারেই বিয়ে করছে ধইরা লও।

হ্যাঁ, কইমাছই বটে। এইবার ঝোলের গন্ধে কই মাছের গায়ের গন্ধও যেন পেল কানু গোঁসাই। কই মাছের সঙ্গে ফুলকপির বিয়েটা যেন রাজযোটক। নাঃ, আর বসে থাকলে

কচুর ঝোল আর ভাত মুখে রুচবে না। কানু উঠে পড়ল।

—গেলা গিয়া নাকি?

—আইজ্ঞা।

—খাড়াও, তোমারে কিছু দিই।

আজ দুটো টাকা এল হাতে। খারাপ কী!

পরদিন বাইশপুরের ঘাটে গিয়ে রামপদকে ধরল কানু। ধরা সোজা কথা নয়। রামপদ ব্যস্ত মানুষ। মালের স্টিমারে এখানে সেখানে বেঘোরে ঘুরতে হয়। তাকে ধরতে তিন চার জায়গায় হানা দিতে হল কানুকে। শেষে খবর পেল, ব্রাউন সাহেবের লঞ্চ বাইশপুরের ঘাটে মাল নামাচ্ছে। রামপদ সেখানে। দুপুরে সেইখানে গিয়ে হাজির হল কানু। রামপদ দাঁড়িয়ে পাটের গাঁট গুনছিল। গোনা শেষ করতে সময় লাগল। ততক্ষণে নদীর ঠান্ডা হাওয়ায় ফের শীত ধরে গেছে কানুর।

—রামপদ, কথা আছে।

—আসেন গোঁসাইদা, লনচে আইস্যা বসেন।

—বহনের সময় নাই। মেলা কাম।

—কী কাম?

—তোমারই কাম। ব্রাউন সাহেবের তরোয়ালখান লইয়াই কথা।

রামপদর মুখ উজ্জ্বল হল, কিছু উপায় করলেন? সাহেব তো আমার মাথা খাইয়া ফালাইল। কইয়া দিছে এক মাসের মইধ্যে তরোয়াল না পাইলে আমারে ত্যাজ্যপুত্র করব।

—আমার লগে তোমারে একখানে যাইতে হইব।

—কোনখানে?

—যেইখানে লইয়া যামু। যা কই শোনবা।

—তা যাইতে পারি। বাইশপুর থিক্যা মাল উঠব। লঞ্চ খান দুই দিন এইখানেই থাকব।

—তা হইলে লও, অখনই বাইর হইয়া পড়ি।

—চলেন। তার আগে নদীতে ডুব দিয়া চাইট্টা ভাত খাইয়া লই। আপনেও আসেন, কাজরী মাছের ঝোল দিয়া ভাত।

অনেকদিন পর কাজরী মাছ। জিব থেকে পেট অবধি যেন পদ্মার ঢেউ খেলে গেল আজ কানুর।

—যাইবেন কই গোঁসাইদাদা?

—রাসুর কাছেই যামু।

—সর্বনাশ, আমারে দ্যাখলে তো তার ঊনপঞ্চাশ বায়ু কুপিত হইব।

—জানি, তবে তোমর লিগ্যা একখান শ্যাষ চেষ্টা তো করতে হইব। তোমার ভগ্নীপতিও ঠেকায় পড়ছে তোমারে লইয়া। মাইনকা ঢিপি।

—আইজ্ঞা। তরোয়ালখান না পাইলে সাহেব যে কী করব আর না করব তার ঠিক নাই। আমার সোনার কারবার ছারেখারে যাইব গোঁসাইদা।

—বুঝছি। অখন লও, এখখান ডিঙ্গা ভাড়া করো। রাসুর গ্রাম বেশ দূরে না।

ডিঙেয় বসে কানুর একটু ভাতঘুম হল। তার ফাঁকে-ফাঁকে রামপদর কিছু দুখের কথা। বড়লোকের দুঃখ কানুর ঠিক সয় না। দুঃখ-টুঃখ যা কিছু তা এই তার মতো গরিবরাই করবে। বড়লোকদের দুঃখ হওয়ার দরকার কী? ভগবান তো তাদের দুঃখ করার জন্য পাঠাইনি। এই সাদা সাপটা ব্যাপারটা কানু পাকা বুঝেছে।

রাসুর দেখা পাওয়া গেল তার বাগানে। খুরপি হাতে বাগানে ফুলগাছের জমি উসকোচ্ছে। বিশাল বাগান, বিশাল বাড়ি তবে পড়তি অবস্থা দেখলেই বোঝা যায়। বাড়ির গায়ে চাপড়া খসে পড়ে খোস পাঁচড়ার মতো দাগ। বাগানের ঘের-পাঁচিল বহু জায়গায় ভেঙে পড়েছে, সেখানে কঞ্চির বেড়া দেওয়া। না, রাসুর অবস্থা খারাপই। শুধু হামবড়াই ছাড়া কিছু নেই।

—নমস্কার রাসুবাবু।

—কেডা রে? আরে গোঁসাই! আবার আইছ?

—আইলাম রাসুবাবু।

—আবার তরোয়ালের খোঁজে নাকি? পরেশ তোমায় কত টাকায় কিনছে কও তো?

—আইজ্ঞা, আমার মতো মাইনষের দাম কী কন?

—তোমারে তো কইয়াই দিছি, টাকার মলম দিয়া আমারে নরম করতে পারব না। টাকা আমি জীবনে মেলা দেখছি।

—আইজ্ঞা, একখান কথার মানে জিগাইতে আইছি।

—কী কথা?

—হেইদিন যে কইলেন তরোয়ালখান আপনগো এয়ারলিং—হেই কথাটার মানে কী?

রাসু কিছুক্ষণ বেকুবের মতো চেয়ে থেকে বলল, কইছিলাম নাকি?

—কইছিলেন, পরেশবাবুও কথাটার মানে জানে না।

রাসু মাথা নেড়ে বলল, আমিও জানি না। ব্রাউন সাহেব কইছিল, হেইরেই কইলাম।

কানু হেসে বলল, আমি রামপদরে জিগাইছিলাম। হ্যায় কিন্তু জানে।

—কী জানে?

—এয়ারলিং মানে হইত্যাছে বংশের স্মারক। উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া দ্রব্য।

—তাই নাকি?

—আইজ্ঞা।

—তাতে হইল কী?

—কইতাছিলাম, আপনের তো একখান মাইয়া, পোলা নাই। আপনেরটা পাইব কেডা?

—ক্যান কমলি পাবি।

—হেই কথাই কইতে আইলাম। কমলিই যদি পায় তা হইলে তো আর বংশে জিনিসটা থাকব না। বেহাতি হইবই।

—তরোয়ালখান লইয়া আর মাথা ঘামাইও না হে গোঁসাই। এখন আস গিয়া। আমার কাম আছে।

—আমি কই কি, তরোয়ালখান দিয়া গিটঠুটা কাইট্যা ফালান।

—তার মানে?

—কমলির বয়স চৌদ্দো গিয়া পনেরোয় পড়ছে। ঠিক কইছি?

—হ, হঠাৎ কমলির বয়স লইয়া কথা ক্যান?

—গিটঠুটা কাটনের লিগ্যা। রামপদ পাত্র ভালো। বছরে ত্রিশ-চল্লিশ হাজার টাকা রোজগার।

—কও কী? পরেশ ঘোষের মতো ছোটলোক যার ভগ্নীপতি তার লগে মাইয়ার বিয়া?

—আইজ্ঞা, পরেশ ঘোষের বংশ খারাপ হইলে কি তার শ্বশুরবাড়িতেও দোষ অর্শায়? আপনে তো আহাম্মক নন, একটু ভাইব্যা দেখেন।

রাসুর মুখটা একটু ঝুলে পড়ল, গলার স্বরটাও নেমে গেল, ফান্দে ফালাইতে আইছ নাকি হে?

—আইজ্ঞা। ফান্দে না ফালাইলে সংসার চলে কেমনে? হগ্গলেই হগ্গলরে ফান্দে ফালায়। সংসারের নিয়ম।

—দেখো হে, রামপদ পাত্র খারাপ না। কিন্তু তার বাপেও যদি পরেশ ঘোষের বাপের মতো হারামজাদা হয় তা হইলে?

—রামপদর বাপ নাই। বিধবা মা আছে। রামপদ বিয়া টিয়া না করিয়া জীবনটা কাটাইব বইল্যা ঠিক কইরা ফালাইছিল। তারেও ফান্দে ফালাইতে হইছে।

—রাজি আছে?

—আইজ্ঞা, রাজি না হইলে সাহেব যে তারে ত্যাজ্যপুত্র করব।

—নাকি? মাইয়া না দেইখ্যাই রাজি হইল?

—দেখে নাই কে কইল? কমলি ওই জামতলায় এক্কাদোক্কা খেলত্যাছে। লইয়া গিয়া দেখাইয়া দিছি। কী আর কমু, ওইরকম সুন্দরী মাইয়া পছন্দ না হইয়া উপায় কী? রামপদর তো অখন লোল পড়ত্যাছে।

—রামপদ! তারে লইয়া আইছ নাকি?

—আনছি। হ্যায় ডিঙ্গায় বইস্যা আছে। আপনেরে ভয় পায়।

—আরে, আরে, কী কাণ্ড! যাও, যাও, তারে লইয়া আস। এই বাড়ির একটা মান মর্যাদা আছে।

রামপদ এল, ভারী লাজুক মুখ, মুখে রক্তাভাও। আর রাসুর মুখেও আজ অমায়িক হাসি। রামপদ রাজি, রাসু রাজি, তলোয়ারও রাজি। চারদিকটায় যেন আজ রাজি-রাজি ভাব।

কথাবার্তা একরকম পাকাই হয়ে গেল। এমনকি রাসু বিয়েটা মাঘ মাসে পিছিয়ে দিতে চেয়েছিল, রামপদই মৃদু স্বরে বলল, না, অঘ্রানেই হউক।

ফেরার সময়ে রাসু আড়ালে ডেকে বলল, না হে গোঁসাই, তুমি বাহাদুর লোক, এক কোপে দুই গিটঠুই কাটলা।

এক গাল হেসে কানু বলল, আইজ্ঞা, আমি বড়লোকের দুঃখ সহ্য করতে পারি না।

স্বপ্নের ভিতরে মৃত্যু

"This is the way the world ends

Not with a bang, but a whimper."

একদিন, জুন মাসের এক বিকেলে মাখনলালের মন ভালো ছিল না।

সেদিন অফিসে অনেকক্ষণ ধরে একটানা একটা জরুরি কাজ করতে হয়েছে। যখন অবশেষে হাই তুলে আড়মোড়া ভেঙে সে ঘড়ি দেখল তখন ছ'টা বেজে সতেরো মিনিট। তার মেরুদণ্ড ব্যথা করছিল, মাথার ভিতরে কোথায় একটা রগ বিদ্যুতের মতো চমকে-চমকে উঠছে। পাখার হাওয়ায় কোথায় একটা কাগজ উড়ছে—মাখনলাল দেখতে পেল না —কিন্তু সেই শব্দে তার শিরা-উপশিরা শিউরে উঠেছিল। তার চারদিকে জনশূন্য নিঃশব্দ ঘরটা প্রকাণ্ড হয়ে আছে। মনে হল তাকে অন্যমনস্ক রেখে সারা বিকেল ধরে তার জ্বর এসেছে।

করিডোরে বেরিয়ে এসে সে দারোয়ান রামজীবনের পায়ের শব্দ পায়। নাগরা জুতো অন্ধকারে হাতুড়ির মতো ঠুকতে-ঠুকতে সে অনেকক্ষণ ধরে দোতলার সিঁড়ি ভেঙে নেমে আসছিল। চাবির গোছার শব্দ, কাশির শব্দ, দেহাতি গানের কলি পরস্পর মিশে যায়। সে এই বুড়ো অফিস বাড়িটার সিল করবার গালার অদ্ভুত গন্ধ, পুরোনো গঁদ, কাঠ আর বার্নিশের গন্ধ পায়। অল্প অন্ধকার, দীর্ঘ করিডোরটা পায়ে-পায়ে পেরিয়ে যেতে-যেতে হঠাৎ মনে হয় বয়স ঢের বেড়ে গেছে। আর মনে হয় বাইরে কোথায় তাকে বাদ দিয়ে একটা উৎসব চলতে-চলতে শেষ হয়ে এল। সিঁড়ি ভেঙে সে বাইরের আলো আর শব্দের মাঝখানে নেমে আসতে-আসতে স্পষ্ট টের পেল রামজীবনের গানের কলি হঠাৎ লক্ষ্যহীন

অন্ধের মতো টাল খেতে-খেতে পুরোনো অফিস বাড়িটার কড়ি বরগা আর দেওয়ালের পলেস্তারার ভিতরে ঢুকে স্তব্ধ হয়ে গেল।

বাইরে হাওয়ায় দোকানের উজ্জ্বল আলো আর লোকজনের ভিড়ের ভিতরে নেমে এসে হঠাৎ ঘুম এবং স্বপ্ন ভেঙে গেলে যেমন হয়, তার তেমনি সবকিছু খুব অচেনা লাগছিল। মনে পড়ল সে অনেকক্ষণ সিগারেট খায়নি, জল খায়নি, কোনও খাবার খায়নি। অন্যদিন এই সময়ে তার বাড়ি ফিরে যাওয়ার কথা। মনে হয় ললিতা তার অপেক্ষায় আছে কিন্তু আজ এক্ষুনি তার বাড়ি ফিরে যেতে ইচ্ছে করল না। মনে পড়ে কতকাল সে কলকাতার রাস্তায়, ময়দানে, এসপ্ল্যানডে ঘুরে বেড়ায়নি, দোকানের শো-কেসে সাজানো জিনিস, আলো, লোকজন দেখতে-দেখতে দু-পয়সার বাদাম শেষ করে খামোকা কোনও রেস্টুরেন্টে ঢুকে পড়েনি। এইসব—খানিকক্ষণ ফুটপাথে দাঁড়িয়ে ভেবে নিল সে। তারপর আস্তে-আস্তে ট্রাম রাস্তা পেরোল মাখনলাল।

জুন মাসে পরপর কয়েকদিন অনাবৃষ্টি গেছে। জ্বরগ্রস্ত ফুটপাথ থেকে, দেওয়ালের গা থেকে ভাপ উঠে আসছে। ধুলোয় ঘুলিয়ে উঠছে এসপ্ল্যানেডের আলো, গা ঘেঁষে বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটের মন্থর ট্রাম চলে যায়। নীচু বুকচাপা দোকানঘর থেকে চামড়ার কটুগন্ধ। বুক গুলিয়ে ওঠে। বৃষ্টি হবে কি? মাখনলাল চোখ তুলে আকাশ দেখল। মেঘ না তারা না,—কিছুই দেখা যায় না।

আলো অন্ধকার, অবয়ব চোরাগুলি, মুণ্ডের সারি চোখের ওপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছে। শো-কেসে সাজানো রেডিও, গলফ স্টিক, হাওয়াই শার্ট। স্যুটপরা 'ডামি' আলোর নীচে চকিতে হেসে উঠল। একটা সিনেমা হল। লবিতে নিঃসঙ্গ সাদা একটা ওজন নেওয়ার যন্ত্র। মাখনলাল পেরিয়ে যাচ্ছিল। যেতে-যেতে কী ভেবে দাঁড়িয়ে ফিরে এল। এখন বিকেলের শো চলছে। লবিটা নির্জন। মাখনলাল ওজন নেওয়ার যন্ত্রটার দিকে এগিয়ে গেল।

ওজন নেওয়ার যন্ত্রের ভিতর পয়সাটা ফেলে দেওয়ার পর...যখন ঠিনঠিন করে একটা জটিল গলিঘুঁজির পথ দিয়ে সেটা নেমে যাচ্ছিল তখন মাখনলাল যন্ত্রটাকে লক্ষ করল। পয়সাটা কোথায় ধাক্কা মারল কে জানে—হঠাৎ ভিতরে কোথায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো শিউরে লাফিয়ে উঠল যন্ত্রটার হৃৎপিণ্ড। কোথায় একটা স্প্রিং শিরার মতো টিকটিক করে কাঁপতে থাকে। লিভারের ওঠানামার সঙ্গে-সঙ্গে সে যন্ত্রটার জেগে ওঠা টের পেল। মনে হয় এতক্ষণ স্তব্ধ থাকবার পর যন্ত্রটার শিরা ধমনীর ভিতর দিয়ে রক্তস্রোত প্রবলভাবে বয়ে যাচ্ছে।

টিক করে টিকিট পড়ল ছোট্ট খোপের মধ্যে।

কয়েক পলক মাখনলাল সাদা মসৃণ সুন্দর যন্ত্রটার দিকে তাকিয়ে রইল। ঠান্ডা ঘুমন্তের মতো। মনে হয়, একটুক্ষণের জন্য জেগে ওঠে, তারপর জাগরণ ক্লান্তিকর দেখে যন্ত্রটা আস্তে-আস্তে আবার তার শীতল চিন্তাহীন ঘুম এবং স্বপ্নের ভিতরে চলে গেছে।

মাখনলাল ওজনের টিকিট তুলে একটা মেয়ের ছবি দেখতে পেল। ছবির নীচে তার ভাগ্য দেওয়া আছে। ওজন ছাপানো টিকিট হাতে মাখনলাল সিনেমা হলের লবি থেকে বেরিয়ে হাঁটতে লাগল।

টিকিটের ওজন ছাপানো দিকটায় ভালো খবর প্রায়ই থাকে। সে দেখল, এবার পাঁচ পাউন্ড কম! লম্বার অনুপাতে তার ওজন বরাবরই চার-পাঁচ পাউন্ড কম ছিল। তাহলে সবসুদ্ধ—মাখনলাল হিসেব করে দেখল, তার যতটা ওজন হওয়া উচিত—তার চেয়ে এখন তার ওজন আট-নয় পাউন্ড কম!

তার মন আস্তে-আস্তে বিষণ্ণ হয়ে যাচ্ছিল। ওজন নিয়ে সে কখনও বড় একটা ভাবেনি। কিন্তু হাঁটতে-হাঁটতে একসময়ে টের পেল চারদিকে ভ্রাম্যমাণ লোকজনদের যাতায়াত, স্টেট বাসের শব্দ—এইসব আলোকিত দৃশ্যের ভিতরে থেকেও সে আজ কেবলই নিজের ওজনের কথা ভাবছে!

এইভাবে কিছুক্ষণ হাঁটল মাখনলাল। তারপর রাস্তার ওপাশে একটা খুব ঝলমলে সিগারেটের দোকান দেখতে পেয়ে ট্রামরাস্তা পেরোল।

ব্যস্ত দোকানির দিকে পয়সা বাড়িয়ে 'এক প্যাকেট চারমিনার' বলে সে দোকানের অসম্ভব সরু লম্বা আয়নায় হঠাৎ নিজের মুখ এবং কোমর পর্যন্ত দেখতে পেয়ে চমকে উঠল। নিজের লাবণ্যহীন দুর্বল মুখের দৈনন্দিন বিষণ্ণতা আর অবসাদ সে দেখে নিল। সে জানে তার শরীরও ছোটখাটো—কোনওখানেই তা শক্ত কিংবা পুরুষালি নয়। অনেকদিন ধরে সে রক্তহীনতা রোগে ভুগছে কি? কিংবা বহুদিন ধরে অন্যমনস্কতার সুযোগে তার কোনও গোপন অসুখ তৈরি হয়ে গেছে! সে বুঝল না।

সিগারেটের প্যাকেট বাড়িয়ে দিয়ে দোকানি তাকে লক্ষ করছে টের পেয়ে মাখনলাল চোখ সরিয়ে নিল। একটা সিগারেট ধরিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে সে ভাবছিল কোথায় যাওয়া যায়। ওজন নেওয়ার টিকিটটা তখনও হাতে ধরা ছিল। সেটা ছুড়ে দেওয়ার আগে মাখনলাল তার ভাগ্যটা পড়ল, যার অর্থ দাঁড়ায় 'শিগগিরই আপনি খুব বিপদে পড়বেন, তবে সেটা বেশিদিন স্থায়ী হবে না।' বিপদ! মাখনলাল ভ্রূ কোঁচকাল। আবছা রহস্যময় একটা কার্যকারণসূত্রকে সে টের পাচ্ছিল। সে জানে কোনও যুক্তির সূত্রে লেখাটা তার হাতে আসেনি—এর কোনও মানে নেই। তবু কোথায় সূক্ষ্মভাবে সে সচেতন হয়ে

উঠেছিল। সিগারেটের তীব্র ধোঁয়া তার স্নায়ুপুঞ্জে, গলার স্বরনালীতে, বুকে দয়াহীন ছড়িয়ে পড়ছিল। সে টিকিটটা দুমড়ে ছুড়ে ফেলে দিল।

তারপর রাস্তায় দোকানের উজ্জ্বল আলো, কাটা-কাটা নাক-মুখ-চোখ গলির মুখে চোরা অন্ধকার দেখতে-দেখতে খানিকক্ষণ বোধহীনের মতো হাঁটল মাখনলাল। সে এসপ্ল্যানেডের বড় রাস্তা, চেনা পথ ছেড়ে আধো অন্ধকার অচেনা রাস্তায় ধাঁধার ভিতরে উদ্দেশ্যহীনের মতো ঘুরছিল। কখনও মন খারাপ হয়ে যেতে থাকলে—সে দেখেছে কিছুই করার থাকে না। সে নিজের ভীষণ অন্যমনস্কতা টের পেল। টের পেল তার ভয়ংকর খিদে পেয়েছে, তেষ্টায় বুক জ্বলছে। অচেনা গলির মুখে ছিমছাম একটা রেস্টুরেন্ট দেখতে পেয়ে তার দরজায় উঠে দাঁড়াল মাখনলাল। কাচের পাল্লা ঠেলে ভিতরে একটা পা বাড়াল।

ভিতরে কোথাও রেডিও বা গ্রামোফোন কোনও অদ্ভুত ড্রামের বাজনা দমকে-দমকে বাজছে। পলকের জন্য তার মনে হল শব্দটা নেড়ি কুকুরের মতো গায়ে গা ঘষটাতে-ঘষটাতে আর্ত চিৎকার করে তাকে এই ঘরে ঢুকতে বারণ করছে। ভিতরে ধু-ধু আলো জ্বলছে—সেই আলো কাচ বসানো টেবিল ছাইদানি, পিরিচ, চেয়ার টেবিলের চকচকে বার্নিশের ওপর থেকে বিচ্ছুরিত হয়ে আলপিনের মতো তার চোখে বেঁধে। মনে হয় এর লম্বাটে হলঘরের মতো ঘরটার সবকিছুই আলো বিকিরণ করছে। ভিতরে খুব বেশি ভিড় নেই। যারা আছে তাদের প্রায় সকলকেই বিদেশি কিংবা জাহাজের লোক বলে মনে হয়। বাঁ-দিকে দেওয়ালের কাছে কাউন্টারে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে একটি মেয়ে—তার কালো মুখে বেশি পাউডার কিংবা রং মাখা বলে মুখটা ছাইরঙা—রক্তশূন্য। রুক্ষ চুল, উঁচু চোয়াল আর মভ রঙের শাড়িতে তাকে সাজানো ডামি বলে মনে হয়। শিরাবহুল কালো একটা হাত কাউন্টারের ওপর প্রাণহীন—কেউ এসে তুলে নেবে বলে অপেক্ষা করছে।

দু-একজন ফিরে তাকিয়ে মাখনলালকে দেখে। যারা বসে আছে তারা সবাই খুব লম্বা চওড়া আর জোয়ান বলে তার বোধ হল। সে টেবিলের ওপর ছড়িয়ে থাকা কতগুলো মজবুত কবজি দেখছিল। দমকে-দমকে ছড়িয়ে যাওয়া গান, তালে-তালে মৃদু মাথা নাড়া—সবকিছুরই অতিরিক্ত এখানে। তাকে কেউ গ্রাহ্য করল না। যেন সে তার তুচ্ছ শরীর, রক্তশূন্য মেয়েলি মুখ, দুর্বল হৃৎপিণ্ড নিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে এখানকার ভীষণ পুরুষালি একটা আবহাওয়াকে নষ্ট করে দিচ্ছে। এইসব আলো গান, মেয়ে, তার জন্যে নয়। মনে হল—সে ভুল জায়গায় এসেছে, ভাবল—ফিরে যাই।

কাউন্টারে বসা প্রকাণ্ড একটা লোক—হাতছানি দিয়ে সে মাখনলালকে একটা খালি টেবিল দেখিয়ে দেয়। অকারণে খুনখারাপি রঙের ঠোঁট ফাঁক করে মেয়েটা হাসে। চোখ সরিয়ে নিচ্ছিল মাখনলাল। বমি হওয়ার আগের মুহূর্তের দমকা ঘূর্ণি শরীরের ভিতর থেকে

উঠে আসছে টের পেয়ে মাখনলাল হাত নেড়ে লোকটাকে জানাতে চাইল—বসবে না। লোকটা একটা মোটা আঙুল মুখে পুরে মাড়ি পরিষ্কার করতে-করতে তার দিকে নিস্পৃহ তাকিয়ে দেখে।

মাখনলাল নিজে কী করছে বুঝতে পারছিল না। বেরিয়ে আসবার জন্য সে অন্ধের মতো কাচের পাল্লাটার দিকে হাত বাড়াল। সেই মুহূর্তেই সাদা দাড়িওয়ালা বুড়ো এক বেয়ারা দরজার কাছে এসে দাঁড়ায়। সে বোঝে—তার জন্যেই। ফিরে তাকাতেই হঠাৎ বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো চমকে উঠে তার মনে হল ভিতর থেকে কেউ আগুনের মতো একজোড়া চোখ তার দিকে ছুড়ে দিয়েই নামিয়ে দিল। পয়সার মতো কী একটা বস্তু তার শরীরের জটিল ফুসফুস মেরুদণ্ডের পথ বেয়ে ঠিনঠিন করে হঠাৎ গড়িয়ে গেল। উন্মাদ ড্রামের শব্দ সেই মুহূর্তেই খুব উঁচু গ্রাম থেকে হঠাৎ চূর্ণীকৃত ভগ্নাংশে লয় পেয়ে যাচ্ছিল। পলকের জন্য মাখনলাল নিজের জেগে ওঠা টের পাচ্ছিল। কার চোখ কে দেখতে পেয়েছে —বুঝল না।

বিনীতভাবে পাগড়ির ছায়ায় ঢেকে বুড়ো বেয়ারাটা মাখনলালকে কিছু বলছিল। মাখনলাল শুনল না কিংবা শুনেও কিছু বুঝল না। সে জানত না—যেন তার অজান্তেই কোনও ঘটনা এখানে ঘটে আছে। যেন এরা এতক্ষণ দোকান সাজিয়ে তার জন্যেই অপেক্ষা করছিল। সে দ্রুতচোখে শেষবারের মতো রেস্টুরেন্টের ভিতরটা দেখে নিচ্ছিল। মনে হল, এখানে কোথাও কোনও জরুরি জিনিস সে ফেলে যাচ্ছে। ভিতরের আলো, সহস্র তল থেকে প্রতিধ্বনিত বাজনার শব্দ, তালে-তালে মৃদু মাথা নাড়ার ভিতরে কোথায় যেন যুদ্ধ যাত্রার প্রাক্কালে সৈনিকদের মতো বে-পরোয়া ভাব ছিল। মেয়েটার স্থির অবয়ব কাউন্টারে হেলানো, প্রকাণ্ড লোকটা হঠাৎ ঘাড় হেলিয়ে সিলিং দেখছে, বুড়ো বেয়ারাটা দাদুর মতো স্নেহময় দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। কিন্তু এদের ভিতর তার চোখ সে দেখতে পেয়েছে বুঝল না। চোরা মারের মতো তাকে আঘাত করেই চোখটা বিবরে সরে গেছে। যেন কেউ আংটি পরা হাত আলোর সামনে এনেই সরিয়ে নিল—বিচ্ছুরিত আলো পলকের জন্য তার চোখে বিঁধেছিল।

কেন তার এমন মনে হল! কাচের পাল্লাটা ঠেলে, সিঁড়ি ভেঙে ফুটপাথে নেমে যেতে-যেতে সূক্ষ্ম একটা অস্বস্তিকে টের পায় মাখনলাল। যেন হঠাৎ জেগে উঠে সে ঠিক কোথায় এসেছে—চারপাশে তাকিয়ে বুঝবার চেষ্টা করল। শ্বাস নিতে তার সামান্য কষ্ট হচ্ছিল—খুব উত্তেজনার পর যেমন হয়। সে স্থিরভাবে কোনও কিছুর দিকে তাকাতে পারছিল না, বুঝতে পারল না কোথায় এসেছে। যেন তার হাত পা কোনও কিছুই তার বশে নেই। কেন সে এখানে এসেছিল! চকিতে তার মনে পড়ে যায়, অন্যদিন এতক্ষণে সে তার

শহরতলির ছোট্ট বাসায় ফিরে গেছে। তার দেরি দেখে নিশ্চিত ললিতা এখন ছয় বছরের বুকুকে পাশে নিয়ে মেঝের ওপর গড়াচ্ছে। সে ফিরলে উঠে দরজা খুলে দিতে ললিতার ঘুমন্ত মুখ বেয়ে পড়া চুল, লিত আঁচল দেখা যাবে।

খানিকক্ষণ—যেন ঘুমের ভিতরে—হেঁটে গেল মাখনলাল। কিছুক্ষণ আগেকার গুমোট ভাবটা আর নেই। দূরে কোথাও বৃষ্টি হচ্ছে—মনে হয়। অবাস্তব এসপ্ল্যানেড দুলে-দুলে সরে যায়। ভেঙে-পড়া দুর্গের অবশিষ্ট একটিমাত্র স্তম্ভের মনুমেন্ট। কারা তার সঙ্গে হাঁটছে, উলটোমুখো হাঁটছে, সামনে পিছনে এলোপাথাড়ি তাকে পেরিয়ে যাচ্ছে। তাদের অবয়ব, মুখ এবং শো-কেসে, আয়নায় প্রতিবিম্বিত তাদের গোলাকার, কখনও লম্বাটে অ্যাবস্ট্রাক্ট চলন্ত ভগ্ন অবশেষ। কেন এমন হয় সে ভাবছিল। কার চোখ সে দেখেছিল! কার চোখ! খুব নিষ্ঠুর কেউ কি! অমন নিষ্ঠুর চোখের লোক পৃথিবী থেকে যত কমে যায় তত ভালো। কেমন নিঃসঙ্গ লাগছিল মাখনলালের। বুকে লুকোনো কোনও মাইক্রোফোন থেকে কে যেন কেবলই কথা বলছে। তার ঠোঁট নড়ছিল। সে কিছুই শুনতে পেল না। বুঝল না। হাজার কোণ থেকে, স্মৃতি থেকে, স্বপ্ন থেকে তির্যক, ভাঙা যৌগিক দৃশ্য ও শব্দ তার ওপর ঝরে পড়ছিল।

নাকি—বৃষ্টি! সুরেন ব্যানার্জি রোড পার হতে গিয়ে ট্রাফিক পুলিশের উত্তোলিত হাতে বাধা পেয়ে সে জুন মাসের প্রথম বৃষ্টিপাত দেখল। হাজারটা থার্মোমিটার ফুটপাথে আছড়ে পড়ে ভাঙছে।

সংবিৎ পেয়ে দৌড়ে শিয়ালদার বাসে উঠতে গিয়ে সে দেখল ডবল-ডেকারে বেজায় ভিড়। বাস-স্টপেজের শেড-এর নীচে কিছুক্ষণ দাঁড়াল মাখনলাল। শেড-এর তলায় ভিড় ক্রমশ বাড়ছিল। ভিড়ে দাঁড়িয়ে সকলের গায়ের গরম অসুস্থ ভাপ, নিশ্বাস, সিগারেট ধোঁয়ার শ্বাস নিতে-নিতে সে দূরগামী হরিণের লঘু পদশব্দের মতো বৃষ্টির শব্দ শুনছিল। মনে হয় চারপাশের সবকিছু হঠাৎ কোথায় যেন লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে। সিঁড়িতে, ফুটপাথে, রাস্তায়, ডবল-ডেকারে—সবকিছুর ওপর চরাচর জুড়ে প্রবল হরিণের মতো লাফিয়ে ছুটছে বৃষ্টি। রাস্তার চৌ-মাথা, পুলিশ, লম্বা অফিস-বাড়ি, উজ্জ্বল দেখান—সব কেমন আড়ালের মতো স্থির থেকে ভিজে যাচ্ছে।

বৃষ্টির প্রথম দমকটা কেটে গেলে মাখনলাল ঘড়ি ঢেকে কবজিতে রুমাল বেঁধে রাস্তায় নামল। কিছুটা হেঁটে গেলে আবার বৃষ্টির জোর বাড়তে থাকে। জলের ফোঁটার প্রবল আঘাতে তার মুখের চামড়া ফেটে যাছিল। মাথাটা ভিজে যাচ্ছে—চুল বেয়ে জল ভেজা ঘাড়ের কাছ দিয়ে অজস্র আঁকাবাঁকা কেঁচোর মতো পিঠ বেয়ে নামছিল। হাঁটার তালে

কিংবা বাতাসে হঠাৎ জামাটা পিঠের চামড়ার ওপর থেকে সরে যাচ্ছিল বলে তার বোধ হচ্ছিল কেউ তার চামড়া ছাড়িয়ে নিচ্ছে।

রাস্তাটা ধু-ধু করা বাষ্পাকার জলকণায় আদি অন্তহীন। একটা স্কুটার তীব্রভাবে জল কেটে লঞ্চের মতো চলে যায়। সামনে পা ফাঁক করে বলিষ্ঠ একটি ছেলে লোহার হাতে হ্যান্ডেল ধরে আছে। পিছনের সিট-এ জড়োসড়ো রুমালে ঢাকা মুখ মেয়েটি ছেলেটির পিঠে এলিয়ে আছে। সামনে পিছনে ছায়ার মতো কয়েকজন কোলকুঁজো হয়ে রাস্তা পার হয়ে যাচ্ছে। স্কুটারটা বৃষ্টির ভিতরে দূরে চলে যেতে-যেতে হঠাৎ বাঁক নিল, লাফিয়ে উঠে টাল খেয়ে তীরের মতন মিলিয়ে গেল। উলটে পড়ল না—আশ্চর্য! মাখনলাল দেখল।

চারিদিকে এখন এই বৃষ্টি ছাড়া কিছু নেই। রাস্তার দুধারে যে প্রকাণ্ড উঁচু বাড়িগুলোর তলায় দাঁড়ালে নিজেকে ভীষণ হীন বলে মনে হয়, সে বাড়িগুলো এখন ঝাপসা—পটে-আঁকা—নিসর্গের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া ঝুপসি-ঝুপসি গাছের মতো দাঁড়িয়ে জড়সড়ো হয়ে ভিজছে। নিঃসঙ্গ একা মাখনলাল বৃষ্টির ভিতরে হেঁটে যেতে-যেতে টের পেল চারধারে এই বৃষ্টি এক প্রবল ঘেরাটোপের মতো ঘিরে আসছে—ঝাপসা ধোঁয়াটে পুরোনো ছবির মতো ঘরবাড়ি দোকান, দু-একটা মানুষ—এরা সব অ-সত্য।

কোথায় যেন এই বৃষ্টির সঙ্গে সে একাকার হয়ে যাচ্ছিল চেনা রাস্তা, তবু তার মনে হল কোনওদিন কখনও সে এই রাস্তায় আসেনি। এই বৃষ্টি যেন তার চেনা পরিচয়কে ধুয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। যেন সে এক অদ্ভুত পরদার আড়ালে আছে, পরদা সরালেই দেখতে পাবে—বিদেশ। স্রোতের মতো জল ফুটপাথ থেকে তার জুতোয় চলকে উঠে বয়ে যাচ্ছে। সে খেয়াল করল না।

এমন বৃষ্টির মতো স্বাস্থ্যকর আর কী আছে! মনে পড়ে কতদিন সে বৃষ্টিতে ভেজেনি, রোদে আপদমস্তক পোড়েনি। মনে হয় প্রেমহীন প্রকৃতিহীন কতগুলো দিন সে স্বপ্নের ভিতরে কাটিয়ে দিয়েছে। কখনও ফিরেও দেখেনি দিনগুলি। কোনও স্মৃতি থাক তাও চায়নি। মনে হয় বহু দৃশ্য, শব্দ, চলার ভঙ্গি, অনেক নিস্তব্ধতা, মৃত্যুশোক এইভাবে তাকেই উদ্দেশ্য করে ঝরে গেছে।

দূরের চিৎকার, অস্পষ্ট মন্থর ট্রামের শব্দ, পাখির ডানার শব্দ, পাতা ঝরে পড়বার শব্দ তার উদ্দেশ্যে কেউ নিক্ষেপ করছিল। এমন স্বজনহীন, বান্ধবহীন সন্ধেবেলা সে আর দেখেনি। কেন সে বৃষ্টিতে এল। কেন? মনে হয় এমনতরো সাধ তার কিছু-কিছু রয়ে গেছে। মনে পড়ে কোনও শীতের দুপুরে কার্জন পার্কে গাছের ছায়ায় সারাদিন শুয়ে থাকবার সাধ তার কখনও মেটেনি। মানুষের কাছে নয়—কিন্তু অন্য কোথায় যেন সে ফিরে যেতে চেয়েছিল। পুব বাংলায়—তাদের পুরোনো বাড়ির জানলার ধারে এতদিনে শেফালি

ফুলগুলি ম্লান হয়ে এল। পানা পুকুরের কালো পাড়ে শ্যাওলা—কচুপাতায় বাতাস লাগবার শব্দ—কামরাঙা গাছ থেকে একটি মাত্র ঘুঘুর ডাকে কত গভীর দুপুর হঠাৎ দেউলিয়া হয়ে গেল।

কার চোখ সে দেখেছিল! সে কি খুব অচেনা কেউ? নিজেকে এমনতরো উদ্বাস্তু তার আগে কখনও মনে হয়নি। ছেলেবেলায় ঘরের দেওয়াল ঘড়িটার শব্দ সে যেমন সবসময়ে খেয়াল করে শুনত না—কিন্তু ঘর নির্জন হয়ে এলে কিংবা মাঝরাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে তার দম শেষ করে দেওয়ার অদ্ভুত একরোখা শব্দ শুনে চমকে উঠে ভেবেছে 'আরে—ঘড়িটা! তাই না!' তেমনি হঠাৎ নির্জন নিঃশব্দ হয়ে গিয়ে সে তার যন্ত্রণাকে টের পেল। বিষণ্ণতার ভিতর দিয়ে শিয়ালদা স্টেশনে এসে আটটা পঁয়তাল্লিশের ট্রেন ধরল মাখনলাল।

বৃষ্টি পড়ছে না। বাইরে জুন মাসের আকাশ ঘোলা হয়ে আছে। মেঘ না, তারা না—কিছুই দেখা যায় না। ট্রেনের জানলার হাওয়ায় মাথা রেখে চোখ চেয়ে ছিল মাখনলাল। ভেজা মাথা বুক ঠান্ডা বাতাসে চিড় খেয়ে যাচ্ছে। ট্রেনের চাকা দ্রুত লাইন বদল করছিল। জং-ধরা লোহালক্কড়ের শব্দ, কাপলিং-এর শব্দ, স্প্রিং আর ঢিলেঢোলা নাটবল্টুর শব্দ, অবিরাম তার শরীরের ভিতর থেকে উঠে আসতে থাকে। উলটো মুখো ট্রেনের ভৌতিক জানলায় কার হাত সাপের মতন নড়ে যায়। কার চশমার কাছে বাইরের অন্ধকার নিসর্গের বিকৃত দোমড়ানো প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল।

একটু রাতে তার শহরতলির ছোট্ট বাসায় ফিরল সে। দরজা খুলে দিতে-দিতে ললিতা অস্পষ্ট—যেন স্বপ্নের ভিতর থেকে কথা বলছিল। চকিতে মাখনলাল তার ঘাড়ের ওপর দিয়ে ওপাশের দেওয়ালের ক্যালেন্ডারের দূর সূর্যাস্তের দিকে বহমান তিনটে নৌকোর ছবি দেখতে পায়। মেঝের ওপর বুকু ঘুমোচ্ছে। অচেনা মিশ্র এক জনতার ভিতর থেকে এসে ঘরের দরজায় পা দিয়ে সে নিজেকে আলাদা অনুভব করছিল।

হাতমুখ ধুয়ে ঢাকা ভাত খেয়ে নিতে-নিতে আস্তে-আস্তে সে স্বাভাবিক বোধ করছিল। ললিতা খেতে বসলে দু-একটা কথা বলছিল মাখনলাল। তারপর কী বলছিল—ভুলে গেল।

খাটের ওপর আলাদা বিছানায় শুয়ে মাখনলাল দেখছিল ছোট্ট বিছানায় বুকুর পাশে শুয়ে পড়বার আগে ললিতা টর্চ জ্বেলে মশারির ভিতরে মশা খুঁজছে। মনে পড়ে কবে কোন ভিড়ের ট্রামে কিংবা বাস-এ কার হাতের চামড়ায় সবুজ উল্কিতে আঁকা একটা ন্যাংটো পরির ছবি দেখেছিল। পিঠে কাকের পাখার মতো দুটো পাখা লাগানো। বয়সে হাতটার চামড়া কুঁচকে এসেছিল—পরিটার শরীর হয়েছিল বেঢপ—এবড়ো-খেবড়ো—নাক-মুখ-চোখ কিছুই বোঝা যায় না। মনে হয়েছিল—হাতের ওপর পরিটার বয়স অনেক হয়ে গেল—তবু হাত ছেড়ে উড়ে যাওয়ার সে কী প্রাণান্তকর চেষ্টা!

ঘর অন্ধকার হয়ে গেলে মাখনলাল চোখ বুঝবার আগে ললিতাকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'বুঝলে, ছুটি পেলে খুব দূরে কোথাও বেড়াতে যাব।'

অনেক রাতে দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুম ভাঙল মাখনলালের। কিছুক্ষণ সে কোথায় কীভাবে আছে না বুঝে চেয়ে রইল। মাথার ভিতরে একটা স্কুটারের শব্দ ঘুরে-ঘুরে যায়। সে টের পেল তার হাত পা, মাথা—সব অদ্ভুত ভঙ্গিতে ছড়ানো—চিৎ হয়ে শোয়া, দুটো হাত বুকের ওপর। কারা যেন চোরাগলিতে পরিত্যক্ত নির্জনে একটা ম্যানহোলের ঢাকনা খুলে রেখে তার জন্যই অপেক্ষা করছিল। সে গলিজোড়া সেই হাঁ-করা ম্যানহোলের দিকে পা বাড়িয়ে হঠাৎ মাধ্যাকর্ষণের কোনও এক মুখ দিয়ে শূন্যতা এবং সময়হীনতার মধ্যে গড়িয়ে পড়ছিল। কিন্তু খুব বেঁচে গেছে মাখনলাল। ঠিক সময়ে ঘুম না ভাঙলে সেই গর্তে—অন্ধকারে—পূতিগন্ধে নগণ্য ইঁদুরের মতো মৃত্যু হত।

অস্থিরতা টের পেয়ে মাখনলাল উঠে বসল। লিত অচেনা গলায় ডাকল—'ললিতা!' কেউ উত্তর দিল না। কারও জেগে থাকবার শব্দ তার শুনতে ইচ্ছে করছিল। বাইরে বৃষ্টিপাত থেমে গেছে। কিন্তু কোথায় যেন বৃষ্টির সঞ্চিত জল চুইয়ে কোনও শূন্য টিনের কৌটোর ওপর পড়ছিল। প্রতিটি ফোঁটার সেই ভারযুক্ত শব্দকে কে যেন তার উদ্দেশ্যে শব্দভেদী বাণের মতো নিক্ষেপ করছিল।

অনেকক্ষণ ঘুম এবং জাগরণের মাঝখানে এক অদ্ভুত নিশ্চেষ্টতার ভিতরে সে বসে রইল। বুকের বাঁ-পাশে একটা অস্পষ্ট ব্যথা ডাক-টিকিটের মতো লেগে আছে। মনে হল স্বপ্নগুলো এখনও তার মাথা থেকে সম্পূর্ণ ভিতরে—ঢাকনা খুলে রাখা ম্যানহোলে টেনে নিয়ে যাবে। এক ঝলক নীল বিদ্যুতের আলোয় ঘরটা অস্পষ্টভাবে তার চোখের সামনে লাফিয়ে উঠেই মিলিয়ে গেল। যদি আবার ঘুমিয়ে পড়ে সে? সঞ্চিত জলের সেই প্রতিটি ফোঁটার জ্যা-মুক্ত শব্দশূন্য টিনের ক্যান—নির্জনতা তাকে অন্ধকারে স্বপ্নের ভিতরে ঠেলে দিচ্ছিল। সে টের পেল তার সারা শরীরের শাঁসওয়ালা ব্রণের মতো শিউরানো রোমকূপ খাড়া হয়ে আছে।

চৌকির পাশেই রাখা টুলের ওপর থেকে গ্লাস তুলে নিয়ে অনেকটা জল খেল মাখনলাল। তারপর সিগারেট ধরাল। বৃষ্টির পর গুমোট গরমে ঘরটা ফেঁপে আছে। তার শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল। বুক এখনও ভার। অস্পষ্টভাবে তার মনে হচ্ছিল, কোনও দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার আগেই ললিতাকে ডাকা উচিত। কিন্তু অতটা সময় পেল না মাখনলাল। ঘুম তটভূমি অতিক্রম করে তার জাগরণের ভিতরে আছড়ে পড়েছিল। কে যেন তাকে ধীরে টেনে নিচ্ছিল ঘুমে স্বপ্নের ভিতরে! স্কুটারের শব্দটা প্রচণ্ড বেগে তার মাথার ভিতর ঘুরতে থাকে। চকিতে মাখনলালের মনে হয় কে যেন বরাবর তার আগে আগে হেঁটে এসেছে।

ওজন যন্ত্রের ভিতর ঠিক টিকিটটা তার জন্যে সাজিয়ে রেখেছিল কে? অচেনা রেস্টুরেন্টে এক মুহূর্তের জন্য মুখোশ খুলে তার ভিতরের আগুন মাখনলালকে দেখতে দিয়েছিল কে? উত্তল কচের তির্যক বিম্বের মতো চকিতে বিদ্যুতের আলোয় ঘরটা আবার লাফিয়ে উঠলে মাখনলাল দেখতে পায়—সে। সাদা দেওয়ালের মতো বুক—সাদা দেওয়ালটাই। ঈশ্বরের বুকের মতো সাদা দেওয়ালটায় চকিতে আবার বিদ্যুৎ বিস্ফোরিত হলে সে—মাখনলাল—সেখানে নিখুঁত সুন্দর একটা বুলেটের ছ্যাঁদা দেখতে পায়। মুহূর্তেই যন্ত্রণায় কুঁকড়ে গিয়ে সাদা দেওয়াল অন্ধকার দিয়ে ক্ষতস্থান কামড়ে ধরল।

সিগারেটটা কোথায় ফেলল মাখনলাল! কোথায়...? সে প্রাণপণে উঠে বসবার জন্য চেষ্টা করতে করতে ললিতাকে ডাকতে চাইল। চেষ্টা করে দেখল মাখনলাল—ওঠা যায় না। পিয়ানোর রিড টিপে কে যেন মুহুর্মুহু বিদ্যুতের আলো ফেলছে। সে হাত বাড়িয়ে খুঁজছিল—সিগারেটটা। এই ঘরেই কোথায় কোন অন্ধকার কোণে সেটা পড়ে আছে...জ্বলছেও, তার পোড়ো গন্ধ আগুনের তাপ সে অনুভব করল। সে নিশ্চিত বুঝল—কোথাও জড়ো করে রাখা কাপড়-চোপড়ে, কাঠের টেবিলের পায়ার সঙ্গে লেগে, কিংবা বিছানায় কারও অসতর্ক চুলের ভিতরে সিগারেটটা নির্দয় জ্বলছে।

'কেন এভাবে! কেন!' মাখনলাল প্রশ্ন করে। মনে হয় বহুকাল ধরে একটা অন্ধকার ঘরের ভিতরে কোথায় একটা সিগারেট জ্বলছে—সে খুঁজছে। খুঁজছে। সিগারেটটা আছে কোথাও—তার জ্বলা সে টের পাচ্ছিল। প্রাণপণে উঠবার, কাউকে ডাকবার জন্য সঙ্গে ছটফট করছিল।

রাতের প্রথম কুকুরটা ডেকে উঠতেই আস্তে-আস্তে হাল ছেড়ে দিল মাখনলাল। বুঝতে পারল—সে মারা যাচ্ছে। ইঁদুর আরশোলার মতো তুচ্ছভাবে। কাল ক্ষতস্থান থেকে দু-ফোঁটা রক্ত দু-চোখে গড়িয়ে পড়লে ওজন যন্ত্রটা ট্রাফিক পুলিশের মতো হাত বাড়িয়ে তার হাতে একটা টিকিট তুলে দেয়। মাখনলাল কিছুই দেখতে পায় না। নিশ্চিত শেষ স্বপ্নের ঢেউটা এসে পড়লে সে চকিতে শুনতে পায় ললিতা তাকে ডাকছে।

কিন্তু তখন তটভূমি ছেড়ে দিয়ে ঢেউয়ে দুলে-দুলে যাওয়ার মতো মাঝ সমুদ্রের দিকে চলে যাচ্ছিল মাখনলাল।

পেঁপেসেদ্ধ

যারা টিফিনে পেঁপেসেদ্ধ খায় আমি তাদের খুবই শ্রদ্ধা করি।

কেন মশাই, যারা পেঁপেসেদ্ধ খায় তাদের শ্রদ্ধা করার কী আছে?

যারা এভারেস্টে ওঠে, বানজি জাম্প দেয় বা ট্রাপিজের খেলা দেখায় তাদের প্রতি কি আমাদের শ্রদ্ধা হয় না? আমি যা পারি না তা আর একজন যখন অনায়াসে পারে তখন শ্রদ্ধাকে ঠেকানো মুশকিল।

আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে আপনি পেঁপেসেদ্ধ পছন্দ করেন না।

আমি পেঁপেকে শ্রদ্ধা করি, যে খায় তাকেও শ্রদ্ধা করি।

বুঝেছি মশাই, আপনার কথার মধ্যে একটা প্যাঁচ আছে। প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ এবং চোরা ব্যঙ্গ। আমি পেঁপেসেদ্ধ খাচ্ছি বলে আপনার অসুবিধে হচ্ছে না তো!

না। মানুষকে খেতে দেখলে আমার বড় ভালো লাগে। পার্কের ওই দক্ষিণ কোণের ফুটপাথে দেখবেন দুপুরে পশ্চিমিরা পেতলের থালায় ছাতু মেখে খায়। আমি সুযোগ পেলেই দাঁড়িয়ে তাদের খাওয়া দেখি। কিংবা ধরুন অফিস পাড়ায় টিফিনের সময় বাবুরা যে রাস্তায় চাউমিন, রোল বা ঘুঘনি দিয়ে রুটি সাঁটে সেই দৃশ্যটাও কিন্তু ভারী সুন্দর। তারপর ধরুন, সুন্দরী মেয়েরা যখন আকাশমুখো হয়ে হাঁয়ের মধ্যে জলভরা ফুচকা ফেলে তখন সেই দৃশ্য দেখে আমার বড় আনন্দ হয়। মানুষ খাচ্ছে, তাদের পেট ভরছে, তৃপ্তি হচ্ছে এ তো অতি সুন্দর ঘটনা। আপনি যে এই নিরিবিলিতে দুপুরের পার্কে গাছের ছায়ায় বসে পেঁপেসেদ্ধ খাচ্ছেন এরও সুষমা আছে।

পেঁপে সম্পর্কে আপনার বিরূপ ধারণা থাকতেই পারে, কিন্তু একথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে, পেঁপের মধ্যে প্রচুর ভিটামিন, খনিজ এবং হজমের সহায়ক উপাদান আছে। তাই নয় কি?

হ্যাঁ, পেঁপে অত্যন্ত উপকারী জিনিস।

তাহলেই বলুন। আর ভগবান কিন্তু সব খাদ্যের মধ্যেই এক একটি স্বাদ দিয়ে রেখেছেন। পেঁপের স্বাদও কিন্তু অতি ভালো। আমার বউ এতে বিটনুন এবং গোলমরিচ মাখিয়ে দেয় বলে স্বাদটা আরও খোলে।

হ্যাঁ, পেঁপের স্বাদগন্ধের গুণগ্রাহী মহান মানুষেরা আমাদের ঈর্ষারই পাত্র।

আপনি বেশ গোলমেলে লোক মশাই। তা সে যাই হোক, আমি রোজই কিন্তু এই পেঁপেসেদ্ধ দিয়েই টিফিন করি। ওই যে হলুদ বাড়িটা দেখছেন ওইটেই আমার অফিস। স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া। আড়াইটের পর একটু ফাঁক পেয়ে আমি এই পার্কে চলে আসি। প্রকৃতির মধ্যে বসে, গাছের ছায়ায় নিশ্চিন্তে টিফিন খাই। এটাই আমার বিলাসিতা।

আপনি ঠিক কাজই করেন। যে কোনও আস্বাদনের জন্য নিরিবিলিতে বসা প্রয়োজন। জীবনানন্দের কবিতা, বিভূতিভূষণের উপন্যাস, রবীন্দ্রনাথের নাটক ওসব ঠিক নিরিবিলি না হলে সুবিধে হয় না।

আপনি ওসব পড়েন বুঝি! সেইজন্যেই আপনার কথায় একটু সাহিত্য-সাহিত্য গন্ধ পাচ্ছি। কম বয়সে আমিও পড়তাম। শরৎচন্দ্রের দেবদাস তো এক সময়ে প্রায় মুখস্থ ছিল। তারপর রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতা, নীহার গুপ্তের হাসপাতাল। এখন আর পড়াটড়া হয় না।

ভালোই করেন। সাহিত্য না পড়েও দুনিয়ার বারো আনা লোকের দিব্যি চলে যাচ্ছে। আমারও দৌড় বেশি দূর নয়। বেকার জীবনে সময় কাটত না বলে পড়তাম।

বেকার ছিলেন বুঝি? এখন কি চাকরি পেয়েছেন?

ওই সামান্য একটা। তবে বেকারজীবনটা বড্ড ভালো ছিল।

কেন মশাই, বেকারজীবনে ভালোটা কী? বাড়িতে গঞ্জনা, দোকানে ধারবাকি, পকেটমানির অভাব।

হ্যাঁ-হ্যাঁ, তা বটে। তবু কতটা সময় পাওয়া যেত বলুন।

বেশিদিন বেকার থাকাটা মোটেই কাজের কথা নয়। তাতে ভিতরে-ভিতরে মরচে পড়ে যায়। আপনার নামটি কী মশাই?

শুভাশিস মিত্র।

আমার নাম পীযূষ গুহ। আপনি চাকরি করেন, কিন্তু এই উইক ডে-তে দুপুরবেলা পার্কে এসে বসে আছেন যে?

আসলে আমার অফিসটাও কাছেই। দুপুরবেলা টিফিনের একটু ছুটি হলে আমি হাঁপ ছাড়তে এখানে চলে আসি কিংবা রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরি। অফিসের বন্ধ ঘরে বসে থাকার ধাতটা এখনও তৈরি হয়নি। বেকারজীবনে ফ্যা-ফ্যা করে ঘুরে বেড়ানোর নেশাটা একটু ঘুরে গেছে।

না-না, এটা ভালো কথা নয়। নতুন চাকরি, প্রথমেই অত লিবার্টি নেবেন না। বরং ছুটির পরেও কিছুক্ষণ কাজ করবেন, তাতে ইমপ্রেশন ভালো হয়। আমি পঁচিশ বছর চাকরি করছি মশাই, সব জানি। তা সরকারি চাকরি না বেসরকারি?

বেসরকারি।

বড় কোম্পানি?

না, মাঝারি।

তা হোক, লেগে থাকাটাই আসল। চাকরির যা বাজার, একটা যেমন তেমন চাকরি পাওয়াও কঠিন।

তা তো ঠিকই।

বাড়িতে কে কে আছে?

মা, আর আমি।

বাবা কি নেই?

আছেন।

কোথায়?

দিল্লিতে।

দিল্লিতে।

চাকরি করেন বুঝি?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

দিল্লি বড় ভালো জায়গা। নিট অ্যান্ড ক্লিন। তা আপনার বাবা মাঝে-মাঝে আসেন তো!

সময়ে পেলে আসেন।

আপনারা যান না?

তাও যাই।

ভাইবোন নেই?

আজ্ঞে না।

আপনার চাকরিটা কী ধরনের?

সব চাকরিই তো ফাইফরমাশ খাটবার কাজ। তাই না? এটা করো, সেটা করো, ওটা ভুল হল কেন?

না মশাই, আপনার হাবভাব আমার ভালো ঠেকছে না। চাকরিতে মন নেই কেন আপনার?

আমার মাও ওই কথাই বলে। আমার নাকি চাকরিতে মন নেই।

এ বাজারে চাকরি গেলে আবার পাওয়া মুশকিল।

জানি। ওপরওয়ালা আমাকে তেমন পছন্দও করেন না। বলছে, তোমরা স্বভাবটা বড় উড়ু উড়ু।

সর্বনাশ! একে প্রাইভেট অফিসে চাকরি, তার ওপর কর্তৃপক্ষের বিষনজর! আপনি তো বিপদে পড়বেন মশাই।

বিপদ! হ্যাঁ, বিপদই তো! তবে যদি চাকরিটা চলে যায় তাহলে আমার খুব একটা দুঃখ হবে না। বেকারজীবনটার কথা ভেবে আমার খুব কষ্ট হয়।

এই রে! অতিরিক্ত সাহিত্যপাঠের এটাই হল কুফল। এই জন্যই বাড়িতে সাহিত্য-টাহিত্য আমি ঢুকতে দিতে চাইনি।

তবু কি সাহিত্য আপনার বাড়িতে ঢুকে পড়েছে?

আর বলবেন না মশাই। আমার বউটির জন্যই। সে আবার সাহিত্যপাগল লোক। বই না পড়লে ভাত হজম হয় না। ওই বদ অভ্যাস আমার ছেলেমেয়ে দুটিও পেয়েছে। তবে ভাগ্য ভালো যে, তারা উচ্ছন্নে যায়নি। লেখাপড়ায় ভালোই। মেয়ে তো চাকরিও করছে।

বাঃ!

দেখবেন মশাই, যা করার চাকরি বাঁচিয়ে করবেন।

চাকরিটা নিয়েই তো সমস্যা। চার দেওয়ালের ভিতরে যতক্ষণ আটকে থাকি, ততক্ষণ মনে হয় যেন কবরখানা। বাইরে বেরোলেই মনে হয় মুক্তি।

হ্যাঁ-হ্যাঁ, সে তো আমাদের সকলেরই প্রথম প্রথম একটু খারাপ লাগে। কিন্তু পরে অভ্যাস হয়ে যাবে দেখবেন। এখন মাথার ওপর বাবা আছেন বলে হয়তো সংসারের প্রেশার টের পাচ্ছেন না। কিন্তু প্রেশার যখন আসবে তখন বুঝবেন চাকরিটার মূল্য কতখানি।

হ্যাঁ-হ্যাঁ, সে তো বটেই।

তারপর ধরুন, বিয়েও তো করতে হবে, তখন দায়িত্ব বাড়বে। চাকরি না হলে কি চলে?

বিয়ে?

নয় কেন? বাপের এক ছেলে, বংশরক্ষা করতে হবে না?

কিন্তু বিয়ে করলে যে আরও মুশকিল হবে।

কীসের মুশকিল?

আরও বন্ধন। ইচ্ছে করলে চাকরি ছেড়ে বেরোতে পারব না।

চাকরি ছাড়ার কথা ভাবছেন কেন?

আমি ভাবছি না, চাকরিটাই ছেড়ে দিতে চাইছে আমাকে।

মাইনে কত দেয়?

দেয় কিছু। আমার চলে যায়।

চার-পাঁচ হাজার?

ওরকমই। কিছু কমবেশি।

খুব খারাপ তো নয়। তাহলে চাকরিটা আপনার ভালো লাগছে না কেন?

আমার তো সেটাই প্রবলেম। আমার কলিগরাও আমাকে খুব বোঝানোর চেষ্টা করে।

প্রেমেট্রেমে পড়েছেন কখনও?

কেন বলুন তো!

অনেক সময়ে প্রেমে পড়লে উড়ুউড়ু উড়নচণ্ডী ভাবটা কেটে যায়। স্বভাব বাউণ্ডুলেদের দাওয়াই হল প্রেম।

না, মেয়েরা আমাকে পছন্দ করে না।

কেন, আপনি তো বেশ হ্যান্ডসাম, স্মার্ট লুকিং।

প্রেমের ব্যাপারেও আমি বোধহয় সিরিয়াস নই। মেয়েরা আমাকে অ্যাট্রাকটিভ মনে করে না।

হাসালেন মশাই, আজকালকার মেয়েরা কত অপদার্থ, ভ্যাগাবন্ড আর কাঁকলাস চেহারার ছেলেদের প্রেমে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে, আর আপনার মতো উজ্জ্বল চেহারার ইয়ংম্যানের লাভার জুটছে না এ কি হয়? আপনি বোধহয় মেয়েদের ভয় পান।

ঠিক উলটো। আমার মনে হয়, মেয়েরাই আমাকে অ্যাভয়েড করে।

কেন করে ভেবে দেখেছেন?

না।

তাহলে ভাবুন এবং নিজেকে মেরামত করুন। ও কি, মুখটা অমন করুণ হয়ে উঠল কেন?

আমি তাহলে একটা ঘটনার কথা বলতে পারি।

বলুন না।

কিন্তু আপনার হাতে কি সময় আছে? আপনি তো পেঁপেসেদ্ধ শেষ করে টিফিনের বাক্স বন্ধ করে ফেলেছেন। এবার বোধহয় অফিসে ফিরবেন?

আরে তাতে কি? পঁচিশ বছর চাকরি হয়ে গেছে, আর চোদ্দো মাস পরে রিটায়ার করব। এখন একটু-আধটু লিবার্টি নিতেই পারি। দেরি হলেও কেউ কিছু বলবে না।

তাহলে বলব কি?

স্বচ্ছন্দে?

আমি যখন বেকার অবস্থায় ভ্যাগাবন্ডের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছি সেই সময়ে হঠাৎ একদিন সকালে রাস্তায় একটি মেয়েকে দেখে ভারী অবাক হয়ে যাই। মেয়েটি খুব একটা লম্বা নয়, বেঁটেও নয়, খুব ফরসা নয়, কালোও নয়। রোগাটে হলেও রোগাও বলা যায় না। কিন্তু আশ্চর্য এবং অদ্ভুত হল তার মুখখানা। মুখখানা যেন মুখের সীমানা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। এত নমনীয়, কোমল লাবণ্য চোখেই পড়ে না। আর ভারী মিষ্টি ছিল তার চোখ দুখানা। মায়ায় ভরা। তাকে দেখেই কেমন যেন আমার অস্তিত্বের মূল টলে গেল। তার আগে বা পরে কোনও মহিলাই আমাকে এত বিচলিত করেনি। আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো, হিপনোটিক একটা স্পেলের মধ্যে তাকে পাছে হারিয়ে ফেলি এই ভয়ে ফলো করতে শুরু করি। আজকাল মেয়েদের ফলো করা-টরা উঠেই গেছে। ওসব আপনাদের আমলে ছিল।

তা বটে।

কিন্তু আমি এগিয়ে গিয়ে তার সঙ্গে আলাপ করার সাহস পেলাম না, যদিও সেটাই স্বাভাবিক হত। ফলো করে করে আমি শেষ অবধি একটা গলির মুখ অবধি যেতে পেরেছিলাম। মেয়েটা গলির মধ্যে ঢুকে যাওয়ায় আমি আর সাহস করে এগোতে পারলাম না। খুব নার্ভাস লাগছিল।

আচ্ছা, তারপর?

আমি গলিটা চিনে রাখলাম। পরদিন সকালে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম গলির উলটোদিকে। ঘণ্টাখানেক বাদে সে বেরোল এবং আমি তাকে আবার ফলো করতে শুরু করলাম। কলেজ অবধি।

কোন কলেজে?

এসব এখন গোপন থাক।

ঠিক আছে, ঠিক আছে। বলুন।

বাড়ির গলি এবং কলেজ দুটোই আমার চেনা হল। এবং রোজই ফলো করা চলতে লাগল। এবং আমার নার্ভাসনেস, ভয় এবং লজ্জা আরও বাড়ল। বাড়ল তার প্রতি আকর্ষণ। মেয়েটা প্রথম কিছুদিন আমাকে লক্ষ করেনি। তারপর করল।

কী করে বুঝলেন?

ওসব বোঝা যায়।

মেয়েটা আপনাকেই প্রশ্রয় দিচ্ছিল কি?

আজ্ঞে না। বরং মুখে বিরক্তি এবং পায়ে সন্ত্রস্ত ভাব দেখতে পেতাম। তেমন জাঁহাবাজ মেয়ে হলে গার্জিয়ান বা পাড়ার দাদাদের দিয়ে হামলা করাতে পারত। সেসব করায়নি। কিন্তু কাঠিন্য দিয়ে বুঝিয়ে দিল যে, ব্যাপারটা সে পছন্দ করছে না।

এমন হতেই পারে। হয়তো তার কোনও বয়ফ্রেন্ড ছিল। আজকাল তো লেজুড় জুটতে দেরি হয় না।

হ্যাঁ, সেটা একটা সম্ভাবনা বটে। আমারও তাই মনে হয়েছিল। কিন্তু তার বয়ফ্রেন্ড থাকলে কোনও না কোনও সময়ে দেখা যেত হয়তো। কিন্তু সেরকম কাউকে মঞ্চে অবতীর্ণ হতে দেখিনি। আমার চিন্তারাজ্যের যাবতীয় লজিক উধাও হল, আমি সবসময়ে তাকে নিয়ে নানা সম্ভব-অসম্ভব চিন্তা করতাম এবং সবই পরাবাস্তব চিন্তা। ঠিক এরকম ইনফ্যাচুয়েশন এ যুগের ছেলেদের হওয়ার কথাই নয়।

হুঁ-হুঁ, খুব কঠিন।

মেয়েটির ব্যক্তিত্ব ছিল সাংঘাতিক। কখনও উগ্র সাজে সাজত না। খুব সাদামাটা পোশাক পরত, সঙ্গীসাথীও বিশেষ দেখিনি। যখন কলেজ থেকে বেরোত তখন দুজন বা তিনজন বান্ধবী কখনও-সখনও সঙ্গে থাকত।

নামটাম বা ঠিকানা জানার চেষ্টা করেননি?

না। কারণ উপায় ছিল না।

তাহলে তো লস্ট কেস।

ঠিক তাই। মাত্র মাস তিনেক বাদে একদিন মেয়েটি গলি থেকে বেরোল না। পরদিনও না। তারপর দিনও না। মেয়েটি সম্পূর্ণ মুছে গেল।

অ্যাঁ! কোথায় গেল?

আমার অনুমান কোনও একটা ছুটির মধ্যে তারা বাড়ি পালটে অন্য কোথাও চলে গিয়েছিল।

এঃ হেঃ। আপনি তখন কী করলেন?

বুঝতেই পারছেন। আমি কয়েকদিন সম্পূর্ণ বেহেড হয়ে গিয়েছিলাম। তারপর এম বি এ পড়তে দিল্লি চলে যাই।

কী বললেন! এম বি এ?

হ্যাঁ।

বাপ রে! দিল্লির সেই বিখ্যাত ইনস্টিটিউটে নাকি?

ইয়ে—ওই আর কি!

তাহলে তো আপনি সোজা লোক নন! এম বি এ পাস। আহা, অমন লজ্জা পাওয়ার কি আছে! শিক্ষা কি লজ্জার ব্যাপার?

ওটা কিছু নয়। গুরুত্ব দেবেন না।

ঠিক আছে, দিচ্ছি না। তারপর?

কলকাতায় এসে আমি এই অফিসটায় চাকরি পেয়ে যাই।

বেতনের কথাটা কি আবার জিগ্যেস করব?

আর লজ্জা দেবেন না। এটা অর্থনৈতিক গল্প নয় কিন্তু।

বুঝলাম। বলুন।

চাকরি পেয়ে যাওয়ার পরই অবিশ্বাস্য ঘটনাটা ঘটল। আমি দেখলাম, মেয়েটিও এই অফিসেই চাকরি করছে।

বলেন কি?

হ্যাঁ, সে আমার সহকর্মী।

এ তো দারুণ গল্প! এবার নিশ্চয়ই—

না। আপনি যা ভাবছেন তা নয়। মেয়েটা ঠিক আগের মতোই কঠিন ও অবিচল। লক্ষ করলাম, অফিসের কেউই তাকে ঘাঁটায় না। সবাই প্রবল সমীহ করে এবং দূরত্ব বজায় রাখে।

মেয়েটা কি আপনাকে চিনতে পারল?

না পারার কথা নয়। কিন্তু সেটা একেবারেই প্রকাশ করল না। এমনকী কোনও সূত্রেই আমার সঙ্গে পরিচয় বা বাক্য বিনিময়ও করল না।

এরকমও হয় নাকি?

খুব প্রয়োজন হলে সে বেয়ারা দিয়ে আমার কাছে নোট পাঠায়। কখনও নিজে যেচে কথা বলে না।

আর সকলের সঙ্গে বলে?

হ্যাঁ। প্রয়োজনে সকলের সঙ্গেই কথা বলে। বাদ শুধু আমি।

লক্ষণটা ভালো না খারাপ?

জানি না। এসব ব্যাপারে আমি খুবই অনভিজ্ঞ।

আপনি নিজে কথা বলার চেষ্টা করেননি?

পাগল নাকি? মেয়েটিকে দেখেই আমি এমন নার্ভাস হয়ে পড়ি যে ভালো করে তাকাতেও পারি না।

আপনার অফিসে ক'টা মেয়ে কাজ করে?

অনেক। অধিকাংশ স্টাফই তো মহিলা। তাদের মধ্যে কয়েকজন বেশ সুন্দর দেখতে। আমাদের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার তো কোনও একটি বিউটি কন্টেস্টে মিস কী যেন হয়েছিল।

তাদের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কীরকম?

অত্যন্ত ফ্রেন্ডলি। জড়তাহীন সম্পর্ক।

আপনি কি ওই মেয়েটির কারণেই চাকরি ছাড়ার জন্য ব্যস্ত হয়েছেন?

বোধহয় ওই মেয়েটিই প্রধান কারণ।

সে কি আপনার অধস্তন?

আমাদের অফিসে ঠিক ওরকম কিছু হায়ারার্কি নেই। সবাই নিজের-নিজের কাজ করে। প্রত্যেকেই প্রফেশনাল। প্রাইভেট অফিসে কেউ কোনও সুবিধে পায় না। সবাইকেই প্রচণ্ড কাজ করতে হয়। বসিং ব্যাপারটা দরকার হয় না। অফিসের মোটো হচ্ছে, ইট ইজ এ ফ্যামিলি।

হ্যাঁ। আজকাল এরকম একটা স্লোগান শোনা যাচ্ছে বটে। তাতে নাকি কাজ ভালো হয়।

হ্যাঁ।

আপনার কোম্পানির অন্য কোনও ব্রাঞ্চ নেই?

আছে। বোম্বে, দিল্লি, ব্যাঙ্গালোর। হেড অফিস দিল্লি।

আপনি বদলি হয়ে যেতে পারেন না?

পারি। কিন্তু কলকাতার অফিসটা নতুন। এখানে কনসেনট্রেট করা বেশি প্রয়োজন বলেই আমাকে এখানে কাজ দেওয়া হয়েছে। অবশ্য আমাকে অন্যান্য অফিসেও ট্যুর করতে হয়।

একটা কথা বলব?

বলুন।

মেয়েটির কোনও বয়ফ্রেন্ড আছে কিনা খোঁজ নিন।

দিগন্তে সেরকম কোনও মেঘ এখনও দেখা যায়নি।

যা দেখা যায় না তা কি নেই? হয়তো বয়ফ্রেন্ড এখন বিলেত বা আমেরিকায়। কিংবা অন্য কোথাও চাকরি করছে। মেয়েটি তার জন্যই অপেক্ষায় আছে।

সর্বনাশ!

কী হল?

একথাটা ভাবিনি তো!

এটাও তো সম্ভব!

হ্যাঁ। খুবই সম্ভব।

লক্ষণ দেখে আমার সে কথাই মনে হচ্ছে।

হাঁ। আমারও তাই মনে হচ্ছে।

তাহলে?

সেক্ষেত্রে আমার কিছু করার নেই। বয়ফ্রেন্ড না থাকলেও কিছু করার ছিল না অবশ্য।

আমি কি আপনার জন্য কিছু করতে পারি?

কী করবেন?

আমি মেয়েটিকে অ্যাপ্রোচ করতে পারি।

করে?

আমি একজন বয়স্ক মানুষ, কাজেই সে আমাকে হয়তো অসম্মান করবে না। আমি তার অবস্থানটা জানবার চেষ্টা করতে পারি।

সেটা কি খুব খারাপ দেখাবে না?

হুঁ। আপনি তো বেশ পাকিয়ে তুললেন দেখছি।

সমস্যা আছে বটে। সমাধানও আছে।

কী সেটা?

আমার ফের ভ্যাগাবন্ড হয়ে যাওয়া। মাকে আমি বলেছি যে, চাকরি করতে আমার ভালো লাগছে না। আমাদের গ্রাসাচ্ছদন কোনওরকমে চলে যাবে। আমার মা তাতে খুব একটা আপত্তি করেনি। মা বরাবরই আমার সাপোর্টার।

ভ্যাগাবন্ড হলেই কি সমস্যা মিটবে?

হ্যাঁ। ছুটি পেলে আমি ফের আগের মতো রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরব। গাঁয়ে-গঞ্জে চলে যাব। আপনার জানার কথা নয়, যে, আমি গান লিখি, সুর দিই এবং গাই।

তাই নাকি?

আমি ছবি-টবিও আঁকতে পারি। এক সময়ে সেসবই আমার প্রিয় বিষয় ছিল। অফিসে বন্দি হওয়ার জন্য আমার জন্ম নয়। মুক্ত, চিন্তাশীল, দায়িত্বহীন জীবনে ফিরে যেতে পারলে আমি এসব ছোটখাটো ব্যাপার ভুলে যেতে পারব।

আপনি যে একজন কালচারগেঁড়ে তা আপনাকে দেখেই আমি বুঝেছি। সত্যি কথা বলতে কি আপনি একজন দায়িত্বজ্ঞানহীন, বাস্তববোধবিবর্জিত, ইমপ্র্যাকটিক্যাল, ভাবালু এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষাহীন মানুষ।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক তাই। আমি ঠিক ওইরকম।

এইসব ভর্ৎসনা শুনেও আপনি যে বিন্দুমাত্র অপমান বোধ করলেন না এবং আপনার চোখ যে উজ্জ্বল হয়ে উঠল তাতেই বুঝতে পেরেছি যে, আপনার জীবনে উন্নতির কোনও আশা নেই। এ যুগের মেয়েরা আপনার মতো পুরুষকে পছন্দ করার মতো আহাম্মক নয়। তবে একথাও আমাকে কবুল করতে হবে যে, আপনার মতো দু-একটা পাগল ধারে কাছে না থাকলে পৃথিবীটা সহনীয় হত না। আপনার সম্পূর্ণ অপদার্থতা সত্বেও আপনাকে আমার বেশ ভালোই লাগছে।

ধন্যবাদ, অজস্র ধন্যবাদ।

যদিও আপনার মতো ভাবালু লোক কোনও মহিলাকে বিয়ে করলে তার জীবনটাই বরবাদ হবে, তবু আপনার মতো লোকেরই বিয়ে করাটা জরুরি। তেমন মেয়ে হলে সে আপনার মাথা থেকে ভাবের ভূত ঝেড়ে তাড়াবে। বিয়ের পর পুরুষদের নানারকম পরিবর্তন হয়ে থাকে।

আপনি বেশ বিজ্ঞ মানুষ।

বিজ্ঞ নই, অভিজ্ঞ।

সঞ্চিত অভিজ্ঞতাই তো বিজ্ঞতা!

তাহলে এই বিজ্ঞ লোকটির একটা কথা শুনুন। এইবেলা চোখ বুঝে চট করে একটা বিয়ে করে ফেলুন। তাতে প্রেমজ্বর সেরে যাবে। যে মেয়েটা আপনাকে পাত্তা বা মূল্য দিচ্ছে না, ফিরেও তাকাচ্ছে না, তুচ্ছতাচ্ছিল্য করছে তার জন্য বিবাগি হওয়াটা কি পুরুষ মানুষের কাজ? সুন্দরী, শিক্ষিতা মেয়ের তো অভাব নেই।

সেটা কি নিজের সঙ্গেই বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে না? যে মেয়েটিকে আমি বিয়ে করব তার প্রতিও হয়তো অবিচারই করা হবে।

আরে মশাই, বিয়ের পর দেখবেন ওই ধিঙ্গি মেয়েটাকে ভুলে যেতে আপনার সাতদিনও লাগবে না। আমার মেয়েকেও তো আমি ওই কথাই বলি।

কী বলেন?

এমনিতে আমার মেয়ে ভীষণ স্ট্রং মর্যোলের মেয়ে, ছেলেদের পাত্তা দেয় না, সিরিয়াস টাইপের। পড়াশুনো আর নিজের কাজ নিয়ে থাকে। কথাও বলে কম। কিছুদিন হল দেখছি খুব অন্যমনস্ক, অস্থির, রাতে ভালো ঘুম হয় না। চাপা স্বভাবের বলে কিছু ভেঙে বলেও না। আমরা বুঝতে পারছি, কারও প্রেমেট্রেমে পড়েছে এবং সেটা ঠিক মেনে নিতে পারছে না। ওর মা অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করেও কথা বের করতে পারেনি। তবে আমার ছেলের কাছে নাকি একদিন বলেছে, সে চাকরি ছেড়ে দেবে।

সে কী? চাকরি ছাড়ার মতো কী হল?

আমাদের কাছে তো বলে না। তবে দাদার সঙ্গে খুব ভাব। দাদাকে নাকি কথায়-কথায় বলেছে, সে তার টপ বসের প্রতি মনে-মনে ভীষণ সফট হয়ে পড়েছে, কিন্তু এক্সপ্রেস করা সম্ভব নয়। তাই চাকরি ছাড়তে চায়। চাপা এবং অহংকারী মেয়েদের তো ওটাই প্রবলেম কি না।

ঠিকই বলেছেন। ভীষণ প্রবলেম।

আমাদের প্রবলেম কী জানেন?

কী বলুন তো!

মেয়েকে কিছুই বলার মতো সাহস আমাদের নেই। আমার মেয়ের ভীষণ স্ট্রং পারসোনালিটি। শি ইজ অ্যান অ্যাভিড অ্যানিম্যাল লাভার, যে কারণে নিরামিষ খায়, তার ওপর স্বাস্থ্যবিধি নিয়ে চিন্তাভাবনা করে বলে জাংক ফুড বা ভাজাভুজি বাড়িতে একরকম বন্ধ করে দিয়েছে। ওর জন্য আমরা তটস্থ। নিজের কোনও প্রবলেম হলে বরাবর নিজেই সলভ করে, কখনও আমাদের সাহায্য নেয় না। এই যে দশ-বারো হাজার টাকা বেতনের চাকরিটা পেল এটাও সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায়। কারও সুপারিশে নয়।

হ্যাঁ, আমি জানি।

আপনি জানেন! তার মানে?

না, মানে ওরকম মেয়ের পক্ষে ওটাই তো স্বাভাবিক কি না।

একজ্যাক্টলি। মাঝখানে আমরা ওর বিয়ের জন্য একটু সম্বন্ধ-টম্বন্ধ করছিলাম। কিন্তু পাত্রপক্ষ দেখতে আসবে শুনলে এমন খেপে যায় যে, আমরা রণে ভঙ্গ দিয়েছি।

আমি ভদ্রমহিলার পোট্রেটটা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি।

ভিসুয়ালাইজ করলেন তো!

হ্যাঁ।

আমার ছেলেও ভালো চাকরি করে। কেমিক্যাল ইনজিনিয়ার। সে একটি মেয়েকে ভালোবাসে। সেই মেয়েটি আমাদের বাড়িতে প্রায়ই আসেটাসে, আমাকে বাবা আর আমার স্ত্রীকে মা বলে ডাকে। সবর্ণ, পালটি ঘর। নো প্রবলেম। আসা করি স্মুথলি বিয়েটাও হয়ে যাবে। কিন্তু মেয়েকে নিয়ে কী করি বলুন তো! যাকে ভালোবাসে তাকে একবার চোখ বুজে বলে ফেললেই তো হয় ব্যাপারটা। তাও বলবে না, দগ্ধে দগ্ধে মরবে। কী যে জ্বালা আমাদের।

বস বলেই বুঝি সংকোচ বোধ করছেন?

আরে না মশাই, তা নয়। দাদাকে তো বলেছে, বস হওয়ার অনেক আগে থেকেই নাকি ও ছেলেটার ইয়েতে পড়েছে। তা মুখে বলতে না পারিস আজকাল তো ই-মেলটেল করা যায়, তাই কর না। ঠিক কি না বলুন?

ঠিকই তো! বিশেষ করে বসটি যখন অবিবাহিত এবং ইকুয়ালি ইল লাক।

কিছু বললেন?

একটা স্বগতোক্তি করছিলাম আর কি। মাঝে-মাঝে স্বগতোক্তি করা ছাড়া আমার আর কিছুই করার থাকে না কি না।

আচ্ছা, আপনিও তো সেই মেয়েটিকে একটা ই-মেলে করতে পারেন!

পারি। কিন্তু মেয়েটা হয়তো জবাব দেবে না। হ্যাংলা ভাববে।

কী মুশকিল! আপনিও তো দেখছি আমার মেয়ের মতোই সনাতন যুগের লোক। এ যুগের ছেলেমেয়েরা মেন্টালি কত ফ্রি, কত স্মার্ট!

হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন। আমাদের খুব মিল। সনাতন যুগ থেকে বেরিয়ে আসতে পারছি না।

আপনার কোম্পানির নামটা কী যেন?

টাইট রোপ।

অ্যাঁ। ঠিক শুনলাম কি? টাইট রোপ?

আপনি ওভাবে তাকিয়ে আছেন কেন? ঠিকই শুনেছেন।

টাইট রোপের অফিস তো ক্যামাক স্ট্রিটে?

ক্যামাক স্ট্রিটেই।

তাহলে যে বললেন, আপনার অফিস কাছেই?

ক্যামাক স্ট্রিটটাই বা কী এমন দূর বলুন! আপনি কি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন?

ফেললাম।

কেন?

কারণ পেঁপেসেদ্ধ সম্পর্কে আপনার মতামত এর পর হয়তো পালটাতে হবে।

পেঁপেসেদ্ধ খেতে কি খুবই খারাপ? আপনার মুখ দেখে তো মনে হচ্ছিল যেন অমৃত খাচ্ছেন।

পেঁপেসেদ্ধর মতো খারাপ জিনিস দুটো হয় না মশাই। আর শুধু পেঁপেসেদ্ধই বা কেন? পেঁপেসেদ্ধর পরদিন কাঁচকলাসেদ্ধ, তারপর গাজর বিন টমেটোসেদ্ধ, তারপর বরবটি আর ঢ্যাঁড়শসেদ্ধ, পরদিন আলু আর ঝিঙেসেদ্ধ। জিভ অসাড় হয়ে গেছে, বুঝলেন! কিন্তু ওই একরত্তি মেয়ের শাসনে এসব খেয়েই আমাকে বেঁচে থাকতে হচ্ছে। খেতে যখন হবেই তখন সোনাহেন মুখ করেই খাই। তবে হ্যাঁ, একটা কথা কবুল করতেই হবে যে, এসব খাই বলে গ্যাস অম্বল বা পেটের কোনও কমপ্লেন হয় না। ভেবে দেখুন, পারবেন তো?

মানুষ তো এভারেস্টেও ওঠে, তাই না?

তা ওঠে বইকি। আজকাল তো শুনি এভারেস্টে কুম্ভমেলার ভিড়।

হ্যাঁ, তাই ভেবেচিন্তে আমি খুঁজে-খুঁজে আপনার কাছেই এসেছি। পেঁপে এবং অন্যান্য সেদ্ধ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞের মত জানার জন্যই।

ভালো করছেন মশাই, ভালো করেছেন। আমি বলি পৃথিবীর অপ্রিয়তম কাজটি করার সময়ে হাসিমুখে করবেন, মনটাকে পজিটিভ রাখবেন এবং ভয়কে পরিহার করবেন। বাই দি বাই, মেয়েটা কি কোনও সিগন্যাল দিয়েছে?

গতকাল অনেক সাহস সঞ্চয় করে আমি তাকে একটা ই-মেল করেছিলাম। তাতে শুধু ছিল, ওয়াই অর এন—?

বটে! কী জবাব এসেছে?

ওয়াই।

বুদ্ধিরাম

বুদ্ধিরাম শিশিটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছিল। লেবেলে ছাপ অক্ষর সবই খুব তেজাল। 'ইহা নিয়মিত সেবন করিলে ক্রিমিনাশ, অম্ল পিত্ত ও অজীর্ণতা রোগের নিবারণ অবশ্যম্ভাবী। অতিশয় বলকারক টনিক বিশেষ। স্নায়বিক দুর্বলতা, ধাতুদৌর্বল্য ও অনিদ্রা রোগেরও পরম ঔষধ। বড়-বড় ডাক্তার ও কবিরাজরা ইহার উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন।...' ছাপা অক্ষরের প্রতি বুদ্ধিরামের খুব দুর্বলতা। ছাপা অক্ষরে যা বেরোয় তার সবটাই তার বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে।

আদুরি অবশ্য অন্য ধাতের। বুদ্ধিরামের সঙ্গে তার মেলে না। বুদ্ধিরাম যা ভাবে, বুদ্ধিরামের যা ইচ্ছে যায় আদুরির ঠিক তার উলটো হয়। বুদ্ধিরাম যদি নরমসরম মানুষ তো আদুরি হল রণচণ্ডী। বুদ্ধিরাম যদি নাস্তিক, তো আদুরি হল ঘোর আস্তিক। বুদ্ধিরামকে যদি কালো বলতে হয়, তো আদুরিকে ফরসা হতেই হবে। বিধাতা (যদি কেউ থেকে থাকে) দুজনকে এমন আলাদা মালমশলা দিয়ে গড়েছেন যে আর কহতব্য নয়।

আর সে জন্যই এ জন্মে দুজনের আর মিল হল না। বলা ভালো, হতে-হতেও হল না। এখন যদি বুদ্ধিরামের বত্রিশ-তেত্রিশ তো আদুরির সাতাশ-আঠাশ চলছে। দুজনের কথাবার্তা নেই, দেখাশোনাও একরকম কালেভদ্রে, মুখোমুখি যদি বা হয় চোখাচোখি হওয়ার জো নেই। আদুরি আজকাল বুদ্ধিরামের দিকে তাকায় না।

কিন্তু বুদ্ধিরাম লোক ভালো। লোকে জানে, সে নিজেও জানে। বুদ্ধিরাম আগাপাশতলা নিজেকে নিরিখ করে দেখেছে। হ্যাঁ, সে লোক খারাপ নয়। মাঝে-মাঝে বুদ্ধির দোষে দু-একটা উলটোপালটা করে ফেললেও তাকে খারাপ লোক মোটেই বলা যাবে না।

খারাপই যদি হবে তবে সাত মাইল পথ সাইকেলে ঠেঙিয়ে চকবেড়ের হাটে কখনও আসে মন্মথ সেনশর্মার পিওর আয়ুর্বেদিক টনিক 'হারবল' কিনতে? মাত্র মাস চারেক

আগে প্লুরিসিতে ভুগে উঠল বুদ্ধিরাম। এখনও শরীর তেমন জুতের নয়। কাদের মুখে কথাটা শোনা গিয়েছিল, আদুরির নাকি আজকাল খুব অম্বল হয়। তা এরকম কত মেয়েরই হয়। কার তাতে মাথাব্যথা? বুদ্ধিরাম মানুষ ভালো বলেই না খোঁজখবর করতে লাগল।

তেজেনের কাছে শুনল। হারবল খেয়ে তার পিসির অম্বলের ব্যথা সেরে গেছে। কথাটা মানিক মণ্ডলের কাছেও শোনা, হ্যাঁ, হারবল জব্বর ওষুধ বটে, তিন শিশি খেতে না খেতে তার বউ চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। আর একদিন পরিতোষও কথায় কথায় বলেছিল, হারবল একেবারে অম্বলের যম। তবে পাওয়া শক্ত। মন্মথ কবিরাজ সেই শিবপুরের লোক, আশির ওপর বয়স। বেশি পারেও না তৈরি করতে। কয়েক বোতল করে ছাড়ে। দারুণ চাহিদা। চকবেড়ের হাটে একজন লোক নিয়ে আসে বেচতে।

খবর পেয়েই আজ মঙ্গলবারে স্কুলের শেষ দুটো ক্লাস অন্যের ঘাড়ে গছিয়ে সাইকেল মেরে ছুটে এসেছে এত দূর। অশ্বত্থ গাছের গোড়ায় আধবুড়ো খিটখিটে চেহারার একটা লোক। ময়লা চাদর পেতে কয়েকটা বিবর্ণ ধুলোটে শিশি সাজিয়ে বসেছিল। ভারী বিরস মুখ।

বুদ্ধিরাম জিগ্যেস করল, হারবল আছে?

লোকটা মুখ তুলে গম্ভীর গলায় বলল, আছে। সতেরো টাকা।

সতেরো টাকা শুনে বুদ্ধিরাম একটু বিচলিত হয়েছিল। দু-শিশি কেনার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু কুড়িয়ে বাড়িয়েও পকেট থেকে আঠাশ টাকার বেশি বেরল না।

আচ্ছা দু-শিশি নিলে কনসেশন হয় না?

লোকটা এমন তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের চোখ তাকাল যেন মরা ইঁদুর দেখছে। মুখটা অন্য ধারে ফিরিয়ে নিয়ে বলল, পাচ্ছেন যে সেই ঢের। মন্মথ কবরেজের আয়ু ফুরল বলে। তারপর হারবলও হাওয়া। মাথা খুঁড়ে মরলেও পাওয়া যাবে না।

একটা শিশি কিনে বুদ্ধিরাম বলল, সামনের মঙ্গলবার আবার যদি আসি পাব তো!

বলা যাচ্ছে না।

কথাটা যা-ই হোক সেটা বলার একটা রংঢং আছে তো। লোকটা এমনভাবে 'বলা যাচ্ছে না' বলল যা আঁতে লাগে। মানুষকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করাটাই যেন বাহাদুরি। বেচিস তো বাপু কবরেজি ওষুধ, তাও গাছতলায় বসে, অত দেমাক কীসের!

শিশিটা নিয়ে বুদ্ধিরাম হাটে ঘুরে বেড়াল। চকবেড়ের হাট বেশ বড়। বেশ গিজগিজে ভিড়ও হয়েছে। চেনা মুখ নজরে পড়বেই। আশপাশের পাঁচ-সাত গাঁয়ের লোকই তো আসে। বুদ্ধিরামের এখন চেনা কোনও লোকের সঙ্গে জুটতে ভালো লাগছে না। মাঝে-মাঝে তার একটু একাবোকা থাকতে বড় ভালো লাগে।

জিলিপি ভাজার মিঠে মাতলা গন্ধ আসছে। ভজার দোকানের জিলিপি বিখ্যাত। শুধু জিলিপি বেচেই ভজা সাতপুকুরে ত্রিশ বিঘে ধানজমি, পাকা বাড়ি করে ফেলেছে। কিনেছে তিনটে পাঞ্জাবি গাই। ডিজেল পাম্প সেট আর ট্র্যাক্টরও। ছেঁড়া গেঞ্জি আর হেঁটো ধুতি পরে এমন ভাবখানা করে থাকে যেন তার নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। আজও ভজার সেই বেশ। নারকোলের মালার ফুটো দিয়ে পাকা হাতে খামি ফেলছে ফুটন্ত তেলে। চারটে ছোকরা রসের গামলা থেকে টাটকা জিলিপি শালপাতার ঠোঙায় বেচতে হিমিসিম খেয়ে যাচ্ছে। রাজ্যের মানুষ মাছির মতো ভনভন করছে দোকানের সামনে।

বুদ্ধিরাম কাণ্ডটা দেখল খানিক দাঁড়িয়ে। ডান হাতে বাঁ-হাতে পয়সা আসছে জোর। ক্যাশবাক্সটা বন্ধ করার সময় নেই। আর তার ভিতরে টাকা পয়সা এমন গিজগিজ করছে যে, চোখ কচকচ করে। টাকাপয়সার ভাবনা বুদ্ধিরাম বিশেষ ভাবে না বটে, কিন্তু একসঙ্গে অতগুলো টাকা দেখলে বুকের ভিতরটায় যেন কেমন করে।

বুদ্ধিরাম বেঞ্চে একটু জায়গা খুঁজল। ঠাসাঠাসি গাদাগাদি লোক। সকলেই জিলিপিতে মজে আছে। এমন খাচ্ছে যেন এই শেষ খাওয়া। ভোমা ভোমা নীল মাছি ওড়াউড়ি করছে বিস্তর। ভিতরভাগে তিনখানা বেঞ্চের একটা থেকে দুজন উঠে যেতেই বুদ্ধিরাম গিয়ে বসে পড়ল। এখনও আশ্বিনের শেষে তেমন শীতভাব নেই। দুপুরবেলাটায় গরম হয়। উনুনের তাপ আর কাঠের ধোঁয়ায় চালাঘরের ভিতরটা রীতিমতো তেতে আছে। বুদ্ধিরাম বসেই ঘামতে লাগল।

পাশের লোকটা এখনও জিলিপি পায়নি। বৃথা হাঁকডাক করছে, বলি ও ভজাদা, আধঘণ্টা হয়ে গেল হাঁ করে বসে আছি। দেবে তো!

দিচ্ছি বাপু, দিচ্ছি। দশখানা তো হাত নয়।

আর আমাদেরই বুঝি মেলা ফালতু সময় আছে হাতে?

এই চড়াটা হলেই দিচ্ছি গো।

লোকটা ফস করে বুদ্ধিরামের থেকে বোতলটা কেড়ে নিয়ে দেখল। তারপর মাতব্বরের মতো বলল, হারবল? মন্মথ কবরেজের ওষুধ। দূর-দূর, কোনও কাজের নয়। তিন শিশি খেয়েছি।

বুদ্ধিরাম তার হাত থেকে বোলতটা ফের নিয়ে বলল, তা বেশ। কাজ হয় না তো হয় না।

লোকটা ভারী কড়া চোখে বুদ্ধিরামকে একটু চেয়ে দেখল। জিলিপি এসে পড়ায় আর কিছু বলতে পারল না। মুখ তো মাত্র একটা, একসঙ্গে দু-কাজ তো করা যায় না। তার ওপর ভজার জিলিপি মুখকে ভারী রসস্থ করে দেয়। কথা বলাই যায় না।

বুদ্ধিরামকে লোকে বলে ভাবের লোক। কথাটা মিথ্যেও নয়। বুদ্ধিরাম বড় ভাবতে ভালোবাসে। ভাবতে-ভাবতে তার মাথাটা যে তাকে কাঁহা-কাঁহা মুলুক নিয়ে যায়, কত আজগুবি জিনিস দেখায় তার কোনও ঠিক ঠিকানা নেই। বুদ্ধিরাম ভজার জিলিপির দোকানে বসে-বসে ভাবতে লাগল, এই যে ভজা বাঁ-হাতে ডান হাতে হরির লুটের মতো পয়সা কামাচ্ছে এতে হচ্ছেটা কী?

এত জমিজিরেত, ঘরবাড়ি, বিষয়-সম্পত্তি, এসব ছেড়ে একদিন ফুটুস করে চোখ ওলটাতে হবে। তখন ভজার ছেলেরা কেউ জিলিপির প্যাঁচ কষতে আসবে না। ভাগ বাঁটোয়ারা নিয়ে লাঠালাঠি মারামারি করে ভাগ ভিন্ন হবে। ভজা কি আর তা জানে না। তবু খেয়ে-না-খেয়ে মেলায়-মেলায় রোদ জল মাথায় করে গিয়ে চালা বেঁধে কেবল জিলিপি খেলিয়ে যাচ্ছে। টাকার নেশায় পেয়েছে লোকটাকে।

বসে থাকতে-থাকতে বুদ্ধিরামের পালা এসে গেল অবশেষে। ঠোঙায় আটখানা রসে মাখামাখি গরম জিলিপি। আহা, এইরকম এক ঠোঙা যদি আদুরির হাতে গরমাগরম পৌঁছে দেওয়া যেত!

প্রথম জিলিপিটা দাঁতে কাটতে গিয়েই টপটপ করে অসাবধানে দু-ফোঁটা রস পড়ে গেল টেরিকটনের পাঞ্জাবিতে। বড় সাধের পাঞ্জাবি। ঘি রঙের, গলায় আর পুটে চিকনের কাজ করা। বুদ্ধিরাম রুমালে মুছে নিল রসটা। মনটা খুঁত-খুঁত করতে লাগল। এক্কেবারে নতুন পাঞ্জাবি। কাঁচি ধুতির ওপর এটা পরে আদুরির বাড়ির সামনে খুব কয়েকটা চক্কর দিয়েছিল সাইকেলে। আদুরি অবশ্য বেরোয়নি। কিন্তু বুদ্ধিরামের ধারণা যে, আদুরি তাকে আড়াল থেকে ঠিকই দেখে।

জিলিপির দাম দিয়ে বুদ্ধিরাম উঠে পড়ল। দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে তেড়াবেঁকা আয়নায় নিজেকে একটু দেখে নিল। না, বুদ্ধিরাম দেখতে খারাপ নয়। রংটা যা একটু ময়লা। কিন্তু মুখচোখ বেশ কাটা-কাটা। নিজেকে দেখে সে একটু খুশিই হল। রুমাল দিয়ে মুখের ঘামটা মুছে নিল।

একটা দোকানে পঞ্চাশ পয়সার কড়ারে সাইকেল জমা রেখেছিল। সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

চারদিকে উধাও মাঠঘাট, ধানখেত। আকাশটা কী বিশাল। বাঁশবনের পেছনে সূর্য একটু ঢলে গেছে। ফুরফুরে হাওয়া।

বুদ্ধিরাম ধানখেতে নেমে পড়ল। চওড়া আল। খানিকদূর গিয়ে রাস্তা।

ধানক্ষেতের ভিতরে নেমে বুদ্ধিরামের মনটা আবার কেমন যেন হয়ে গেল। আদুরি কি ওষুধটা খাবে? এমনিতেই মেয়েরা ওষুধ খেতে চায় না, তার ওপরে বুদ্ধিরামের পাঠানো ওষুধ। আদুরি বোধহয় ছোঁবেও না। এত পরিশ্রম বৃথাই যাবে। তা যাক। বুদ্ধিরামের কাজ বুদ্ধিরাম করেই যাবে।

পুজোয় একটা শাড়ি পাঠিয়েছিল বুদ্ধিরাম। বুদ্ধিরামের বোন রসকলি গিয়ে দিয়ে এসেছিল। হাত বাড়িয়ে নেয়ওনি। বিরস মুখে নাকি জিগ্যেস করেছিল, কে পাঠিয়েছে রে?

রসকলি বোকা গোছের মেয়ে। ভয়ে-ভয়ে শেখানো কথা বলেছিল, মা পাঠাল।

তোর মা আমাকে শাড়ি পাঠাবে কেন?

তা জানি না। এটা পরে অষ্টমী পুজোর অঞ্জলি দিয়ো।

শাড়িটা ভালোই। কালু তাঁতির ঘর থেকে কেনা। লাল জমির ওপর ঢাকাই বুটি।

শাড়িটার দিকে তাকায়ওনি আদুরি। শুধু দয়া করে বলেছিল, ওখানে কোথাও রেখে যা।

সেই শাড়ি আজ অবধি পরেনি আদুরি। নজর রেখে দেখেছে বুদ্ধিরাম। খোঁজ খবরও নিয়েছে। শাড়িটা পরেনি। তবে নিয়েছে ফিরিয়ে দেয়নি, এটাই যা লাভ হয়েছিল বুদ্ধিরামের। তারপর একদিন হঠাৎ নজরে পড়ল, সেই শাড়িটা পরে রসকলি ঘুরে বেড়াচ্ছে।

শাড়িটা কোথায় পেলি?

ভয়ে ভয়ে রসকলি বলল, আদুরদিদি দিল।

দিল বলেই নিলি?

তা কী করব?

বুদ্ধিরাম আর কিছু বলেনি। রাগটা গিলে ফেলেছিল। মনটা বড্ড উচাটন ছিল কয়েকদিন অপমানে।

দোষঘাট মানুষের কি হয় না?

তখন বুদ্ধিরাম তো আর এই বুদ্ধিরাম ছিল না। আজকের এক গেঁয়ো স্কুলের মাস্টার বুদ্ধিরামকে দেখে কে বিশ্বাস করবে যে, ইস্কুলে সে ছিল ফার্স্ট বয়। পাশটাও করেছিল জব্বর, দু-দুটো লেটার নিয়ে। বিয়ের কথাটা তখনই ওঠে। বুদ্ধিরাম যখন ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার কেওকেটা হওয়ার স্বপ্ন দেখছে।

বুড়ি ঠাকুমা তখন এতটা বুড়ো হয়নি। একদিন আদুরিকে একেবারে কনে-সাজে সাজিয়ে নিয়ে এসে বলল, দেখ তো ভাই, পছন্দ নয়? হলে দেগে রাখি। পাশ-টাশ করে থিতু হলে মালাবদল করিয়ে দেব।

আদুরি অপছন্দের মেয়ে নয়। ফরসা তো বটেই মুখচোখ রীতিমত ভালো।

কিন্তু গাঁয়ের মেয়ে, নিত্যি দেখাশোনা হয়। যাকে বলে ঘর কা মুরগি, তাই বুদ্ধিরাম ঠোঁট বেঁকিয়ে বলেছিল, ফুঃ, এর চেয়ে গলায় দড়ি দেওয়া ভালো।

কেন রে, মেয়েটা কি খারাপ? দেখ তো কেমন মুখচোখ! কেমন ফরসা।

সাতজন্ম বিয়ে না করে থাকলেও ও মেয়ে আমার চলবে না। যাও তো ঠাকুমা, সঙ বন্ধ করো।

একেবারে মুখের ওপর থাবড়া মারা যাকে বলে। আদুরির খুব অপমান হয়েছিল। তার তখন বছর বারো বয়স। এক ছুটে পালিয়ে গেল। আর কোনওদিন এল না। খুব নাক গড়াগড়ি খেয়ে কেঁদেছিল মেয়েটা। দিন তিনেক ভালো করে খায় দায়নি।

বুদ্ধিরামের তখন এসব দিকে মাথা দেওয়ার সময় নেই। চৌদ্দো মাইল দূরের মহকুমা শহরে কলেজে যেতে হয়। নতুন বন্ধুবান্ধব, নতুন রকমের জীবন। সেখানে কে একটা গেঁয়ো মেয়েকে নিয়ে ভাবার মতো মেজাজটাই তার নেই।

আরও একটা ঘটনা ঘটেছিল। বুদ্ধিরামের সঙ্গে মেলা মেয়েও পড়ত। তাদের একজন ছিল হেনা। দেখতে-শুনতে ভালো তো বটেই, তার কথাবার্তা চাউনি টাউনিও ছিল ভারী ভালো। কথাবার্তা বলত টকাস টকাস।

বুদ্ধিরাম ছাত্র ভালো। সুতরাং হেনা তার দিকে একটু ঢলল। বছর দেড়েক হেনার সঙ্গে বেশ মাখামাখি হয়েছিল বুদ্ধিরামের। তবে সেটাকে ভাব ভালোবাসা বলা যাবে কি না তা

নিয়ে বুদ্ধিরামের আজও সংশয় আছে।

তবে হেনা আর যা-ই করুক না করুক বুদ্ধিরামের লেখাপড়ার বারোটা বাজাল। কলেজের প্রথম ধাপটা ডিঙোতেই দম বেরিয়ে গেল বুদ্ধিরামের। ডিঙোলো খোঁড়া ঘোড়ার মতো। কিন্তু হেনা দিব্যি ভালো পাশ-টাশ করে কলকাতায় ডাক্তারি পড়তে চলে গেল।

বুদ্ধিরামের পতনের সেই শুরু। বি. এসসি, পাশ করল অনার্স ছাড়া। বাবা ডেকে বলল, পড়াশুনোর তো দেখছি তেমন উন্নতি হল না। তা গেঁয়ো ছেলের আর এর বেশি কীই বা হওয়ার কথা!

বুদ্ধিরাম সে-ই গাঁয়ের ছেলে গাঁয়ে ফিরে এল। ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হওয়া আর হল না। পাশের গাঁ বিষ্টুপুরের মস্ত ইস্কুলে তখন সায়েন্সের মাস্টার খোঁজা হচ্ছে। বুদ্ধিরামকে তারা লুফে নিল।

বুদ্ধিরামের মনের অবস্থা তখন সাঙ্ঘাতিক। রাগে দুঃখে দিনরাত সে ভিতরে ভিতরে জ্বলে আর পোড়ে। লেখাপড়ায় একটা মারকাটারি কিছু করে বিজয়গর্বে গাঁয়ে ফিরে আসবে, এই না সে জানত। আর সে জায়গায় ঢিকিয়ে-ঢিকিয়ে মোটে বি. এসসি.! বুদ্ধিরাম কিছুদিন আপনমনে বিড়বিড় করে ঘুরে বেড়াত পাগলের মতো, দাড়ি রাখত, পোশাক আশাকের ঠিক ছিল না। আত্মহত্যা করতে রেল রাস্তায় গিয়েছিল তিনবার। ঠিক শেষ সময়টায় কেমন যেন সাহসে কুলোয়নি।

তারপরই একদিন একটা ঘটনা ঘটল। এমনি দেখতে গেলে কিছুই নয়। কিন্তু তার মধ্যেই বুদ্ধিরামের জীবনটা একটা মোড় ঘুরল। আম বাগানের ভিতর দিয়ে বিশু আর বুদ্ধি জিতেন পাড়ুইদের বাড়ি যাচ্ছিল মিটিং করতে। জিতেন সেবার ইউনিয়ন বোর্ডের ইলেকশনে নেমেছে। জিতেনকে জেতানোর খুব তোড়জোড় চলছে। বুদ্ধিরাম তখন যা হোক একটা কিছু নিয়ে মেতে থাকার জন্য ব্যস্ত। জীবনের হাহাকার আর ব্যর্থতা ভুলে মাথাটাকে কোনও একটা ভূতের জিম্মায় না দিলেই নয়। নইলে জিতেনের সিলেকশন নিয়ে কেনই বা বুদ্ধিরামের মাথাব্যথা হবে।

আমবাগানের শরৎকালের একটা সোনালি রূপালি রোদের চিকরিকাটা আলোছায়া। সকালবেলটায় ভারী পরিষ্কার বাতাস ছিল সেদিন। ঘাসের শিশির সবটা তখনও শুকোয়নি।

উলটোদিক থেকে একটা ছিপছিপে মেয়ে হেঁটে আসছিল। একা, নতমুখী। তার চুল কিছু অগোছালো এলো খোপায় বাঁধা। আঁচলটা ঘুরিয়ে শরীর ঢেকেছে। দেখে কেমন যেন মনটা ভিজে গেল বুদ্ধিরামের।

কে রে মেয়েটা?

দূর শালা! চিনিস না? ও তো আদুরি।

আদুরি! বুদ্ধিরাম এত অবাক হল যে কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে থাকল হাঁ হয়ে। এক গাঁয়ে বাস হলেও আদুরির সঙ্গে তার দীর্ঘকাল দেখা হয়নি। কারও দিকে তাকায়ও না বুদ্ধিরাম। সেই আদুরি কি এই আদুরি?

আদুরি মাথা নীচু করে রেখেই তাদের পেরিয়ে চলে গেল। ভ্রূক্ষেপও করল না।

আর সেই ঘটনাটা সারাদিন বুদ্ধিরামের মগজে নতুন একটা ভূত হয়ে ঢুকে গেল।

বাড়ি ফিরেই সে ঠাকুমাকে ধরল, শোনো ঠাকুমা, একটা কথা আছে।

কী কথা?

সে-ই আদুরি মনে আছে?

আদুরিকে মনে থাকবে না কেন?

ওকেই বিয়ে করব। বলে দাও।

ঠাকুমা তার মাথায় পিঠে হাতটাত বুলিয়ে বলল, বড্ড দেরি করে ফেললি ভাই, আদুরির তো শুনছি বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। হরিপুরের চন্দ্রনাথ মল্লিকের ছেলে পরেশের সঙ্গে।

বুদ্ধিরাম এমন তাজ্জব কথা যেন জীবনে শোনেনি। আদুরির বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে! তাহলে তো খুব মুশকিল হবে বুদ্ধিরামের।

সেই দিনই সে গোপনে তার দু-একজন বিশ্বস্ত বন্ধুর সঙ্গে পরামর্শে বসে গেল।

কেষ্ট বলল, বিয়েটা না ভাঙতে পারলে তার আশা নেই। ভাঙতে হলে সবচেয়ে ভালো উপায় হল চন্দ্রনাথ মল্লিককে একখানা বেনামা চিঠি লেখা।

তো তাই হল। কেষ্ট নানা ছাঁদে লিখতে পারে। তার সাইন বোর্ডের দোকান আছে। চিঠিটা সেই লিখে দিল।

দিন সাতেক বাদে শোনা গেল, বিয়ে ভেঙে গেছে।

বুদ্ধিরাম ভেবেছিল, এবার জলের মতো কাজটা হয়ে যাবে। সে গিয়ে ফের ঠাকুমাকে ধরল, শুনছি আদুরির বিয়েটা ভেঙে গেছে। তা আমি রাজি আছি বিয়ে করতে।

ঠাকুমা গেল প্রস্তাব নিয়ে। বুদ্ধিরাম নিশ্চিন্তে ছিল। এরকম প্রস্তাব তো মেয়ের বাড়ির পক্ষে স্বপ্নের অগোচর।

কিন্তু সন্ধেবেলা ফিরে এসে ঠাকুমা বিরস মুখে বলল, মেয়েটার মাথায় ভূত আছে।

কেন গো ঠাকুমা?

মুখের ওপর বলল, ও ছেলেকে বিয়ে করার চেয়ে গলায় দড়ি দেওয়া ভালো।

বুদ্ধিরাম একথায় এমন হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল যে বলার নয়। বলল? এত বুকের পাটা? সেই রাতে বুদ্ধিরাম ঘুমোতে পারল না। কেবল ঘরবার করল, দশবার জল খেল, ঘন-ঘন পেচ্ছাব করল। মাথায় চুল মুঠো করে ঘরে বসে রইল। রাগে ক্ষোভে অপমানে তার মাথাটাই গেল ঘুলিয়ে।

ভোরের দিকে সে একটু ঝিমোল। ঝিমোতে-ঝিমোতে ভাবল, বহোৎ আচ্ছা। এইরকমের তেজি মেয়েই তো চাই। গেঁয়ো মেয়েগুলো যেন ভেজানো ন্যাতা। কারও ব্যক্তিত্ব বলে কিছু নেই। আদুরির আছে, এটা তো খুব ভালো খবর।

সকালবেলায় সে একখানা পেল্লায় সাত পৃষ্ঠার চিঠি লিখে ফেলল আদুরিকে। মেলা ভালো ভালো শব্দ লিখল তার মধ্যে। অন্তত গোটা পাঁচেক কোটেশন ছিল সবশেষে লিখল...'তোমাকে ছাড়া আমার জীবন বৃথা।'

রসকলির হাত দিয়ে চিঠিটা পাঠিয়ে সে ঘরে পায়চারি করতে লাগল তীব্র উত্তেজনায়। আজ অবধি সে কোনও মেয়েকে প্রেমপত্র লেখেনি। এই প্রথম।

রসকলি ঘণ্টাখানেক পর ফিরে এসে বলল, ও দাদা, চিঠিটা যে না পড়েই ছিঁড়ে ফেলল গো।

চুপ। চেঁচাস না। কিছু বলল না?

কী বলবে? শুধু জিগ্যেস করল চিঠিটা কে দিয়েছে। তোমার কথা বলতেই খামসুদ্ধু চিঠিটা কুঁচি-কুঁচি করে ছিঁড়ে ফেলল।

বোনের কাছে ভারী অপদস্থ হয়ে পড়ল বুদ্ধিরাম। তবে রসকলি হাবাগোবা বলে রক্ষে।

বুদ্ধিরাম বলল, কাউকে কিছু বলিস না। ভালো একটা জামা কিনে দেব'খন।

তখন অপমানে লাঞ্ছনায় বুদ্ধিরামের পায়ের তলায় মাটি নেই। সারাদিনটা তার কাটল এক ঘোরের মধ্যে। কিন্তু দু-দিন বাদে সে বুঝতে পারল, আদুরি যত কঠিনই হোক তাকে

জয় করতে না পারলে জীবনটাই বৃথা। তবে বুদ্ধিরাম আর বোকার মতো চিঠি চাপাটি চালাচালিতে গেল না। আদুরির ধাতটা বুঝবার চেষ্টা করতে লাগল সে।

গাঁয়ের মেয়ে। সুতরাং তাদের বাড়ির সকলের সঙ্গেই আজন্ম চেনাজানা বুদ্ধিরামের। তবে সে দেমাকবশে কারও বাড়িতেই তেমন যেতটেত না। ঘটনার পর দিনকয়েক আদুরিদের বাড়িতে হানা দিতে লাগল সে। আদুরির কাকা জ্যাঠা মিলে মস্ত সংসার। বড় গেরস্ত তারা। তিন-চারখানা উঠোন, বিশ-পঁচিশটা ঘর। সারা দিন ক্যাচ ম্যাচ লেগেই আছে। বুদ্ধিরাম গিয়ে যে খুব সুবিধে করতে পারল তা নয়। বাইরের দাওয়ায় বসে হয়তো কখনও আদুরির কেশোদাদুর সঙ্গে খানিক কথা কয়ে এল। না হয় তো কোনওদিন আদুরির জ্যাঠা হারুবাবুর কিছু উপদেশ শুনে আসতে হল।

চা-বিস্কুটও যে জোটেনি তা নয়। সে গাঁয়ের ভালো ছেলে। খাতির একটু লোকে করেই। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে যাওয়া সেদিকে কিছুই এগোল না।

কিছুদিন পর সে বুঝল, এভাবে আদুরির কাছে এগোনো যাবে না। মহিলা মহলে ঢুকতে হবে। তা তাতেও বাধা ছিল না। আদুরিদের অন্দরমহলেও ঢুকতে সে পারে। আদুরির এক বউদি হঠাৎ মুখ ফসকে বলে ফেলল, হ্যাঁ গো বুদ্ধি ঠাকুরপো, কোনওকালে তো তোমাকে এ বাড়িতে যাতায়াত করতে দেখিনি তোমার মতলবখানা কী খুলে বলো তো! আমার তো বাপু, তোমার মুখচোখ ভালো ঠেকছে না।

এ কথায় আর এক দফা অপমান বোধ করল বুদ্ধিরাম। সে পুরুষ মানুষ কোনও লজ্জায় মা-মাসি বউদি শ্রেণির মেয়েদের সঙ্গে বসে গল্প করে?

সুতরাং বুদ্ধিরামকে জাল গোটাতে হল।

তারপরই আবার বিপদ। আদুরির ফের সম্বন্ধ এল। চেহারাখানা ভালো, কিছু লেখাপড়াও জানে, সুতরাং আদুরিকে যে দেখে সে-ই পছন্দ করে যায়।

দ্বিতীয় পাত্রপক্ষকেও বেনামা চিঠি দিতে হল। ভেঙেও গেল বিয়ে। কিন্তু তাতে বুদ্ধিরামের যে কাজ খুব এগোল তাও নয়। বরং উলটে একটা বিপদ দেখা দিল। কেউ যে বেনামা চিঠি দিয়ে আদুরির বিয়ে ভাঙছে এটা বেশ চাউর হয়ে গেল। লোকটা কে তার খোঁজাখুঁজিও শুরু হল। তৃতীয়বার যখন আদুরিকে পছন্দ করে গেল আর-এক পাত্রপক্ষ তখন আদুরির বাপ জ্যাঠা পাত্রপক্ষকে বলেই দিল, বেনামা চিঠি যেতে পারে, আমল দেবেন না। কোনও বদমাশ লোক করছে এই কাজ।

খুবই ভয়ে ভয়ে রইল বুদ্ধিরাম। কেউ ভরসা দিয়ে বলল, আরে ঘাবড়াচ্ছিস কেন? এমন কলঙ্কের কথা লিখে দেব যে, পাত্রপক্ষ আঁতকে উঠবে।

কিন্তু এই তৃতীয়বার বুদ্ধিরাম ধরা পড়ে গেল। আদুরির সাত সাতটা গুন্ডা ভাই একদিন বাদামতলায় চড়াও হল তার ওপর। সতীশটা মহা ষণ্ডা। সে-ই সাইকেল থেকে টেনে নামাল বুদ্ধিরামকে।

বলি, তোর ব্যাপারটা কী?

কীসের ব্যাপার?

ন্যাকা! আদুরির বিয়ে ভাঙতে চিঠি দেয় কে?

আমি না।

তুই ছাড়া আর কে দেবে!

আমার কী স্বার্থ?

মেজবউদি বলছিল তুই নাকি আমাদের বাড়িতে ঘুরঘুর করতিস!

বুদ্ধিরাম বুদ্ধি হারিয়ে ফেলছিল। সত্য গোপন করার অভ্যাস তার নেই। গুছিয়ে মিথ্যে কথা বলা তার আসেও না। সে আমতা-আমতা করতে লাগল।

সতীশ অবশ্য মারধর করল না। বলল, যদি আদুরিকে বিয়ে করতে চাস তো সে কথা বললেই হয়। গাঁয়ে তোর মতো ছেলে ক'টা? আর যদি নিতান্তই বদমাইসির জন্য করে থাকিস তাহলে...

বুদ্ধিরাম কেঁদে ফেলেছিল। একটু সামলে নিয়ে বলল, বিয়ে করতে চাই।

শাবাশ বলে খুব পিঠ চাপড়ে দিল সতীশ। বলল, একথাটা ঘুরিয়ে নাক দেখানোর মতো হল। আগে বললেই ব্যবস্থা হয়ে যেত।

কিন্তু ব্যবস্থা হল না। পরদিনই সতীশ এসে তাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বলল, মুশকিল কী হয়েছে জানিস? তোর ওপর আদুরি মহা খাপ্পা। কী করেছিলি বল তো!

সব শুনেটুনে সতীশ বলল, আচ্ছা, চুপচাপ থাক। দেখি কী করা যায়!

বলা পর্যন্তই। সতীশ কিছু করতে পারেনি। চিঁড়ে ভেজেনি।

কিন্তু এরপর থেকে আদুরির আর সম্বন্ধ আসত না। এলেও আদুরি বেঁকে বসত।

এ সবই সাত-আট বছর আগেকার কথা। এই সাত-আট বছরে বুদ্ধিরাম আড়াল থেকে আদুরির উদ্দেশে তার সব অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োগ করেছে। প্রতিবার পুজোয়ে শাড়ি পাঠায়,

টুকটাক উপহার পাঠায়, কোনওটাই আদুরি নেয় না। নিলেও ফেলে টেলে দেয় বা অন্য কাউকে দান করে।

কিন্তু বয়স তো বসে নেই। আদুরির বিয়ের বয়স পার হতে চলল। বুদ্ধিরামও ত্রিশ পেরিয়েছি। কোনও দিকেই কিছু এগোল না। আদুরির কপাট বজ্র আঁটুনিতে বন্ধই রইল।

ধানক্ষেতের ভিতর দিয়ে সাইকেলে ঠেলে নিয়ে যেতে-যেতে এসব কথাই ভাবছিল বুদ্ধিরাম।

বড় রাস্তায় উঠে সে সাইকেলে চাপল। পাঞ্জাবির পকেটে ভারী শিশিটা ঝুল খাচ্ছে। কষ্ট করাই সার হল। কোনও মানে হয় না এর।

গাঁয়ে ঢুকবার মুখে বাস রাস্তায় কয়েকটি দোকান। আঁধার হয়ে এসেছে। টেমি জ্বলছে দোকানে দোকানে। মহীনের চায়ের দোকানে দু-চারজন বসে আছে। ষষ্ঠী হাঁক মারল, কে রে! বুদ্ধি নাকি?

বুদ্ধি নেমে পড়ল। সাইকেলটা স্ট্যান্ডে দাঁড়ি করিয়ে বসে গেল। একটু ঠান্ডা-ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে এখন। এক ভাঁড় চা হলে হয়।

ষষ্ঠী একটু বেশি কথা কয়। নানা কথা বকবক করে যাচ্ছিল। সে একটু তেলানো মানুষ। যাকে দেখে তাকেই একটু-একটু তেল দেওয়া তার স্বভাব। পুরোনো কথার সূত্র ধরে বলল, তোর কত বড় হওয়ার কথা ছিল বল তো! গাঁয়ে আজ অবধি তোর মতো বেশি নম্বর পেয়ে কেউ পাশ করেছে? বসন্ত স্যার তো বলতই, বুদ্ধিরামের মতো ছেলে হয় না। যদি লেগে থাকে তো জজ ম্যাজিস্ট্রেট কিছু একটা হয়ে ছাড়বে।

এসবই পুরোনো ব্যর্থতার কথা। বুদ্ধিরাম যা খুঁচিয়ে তুলতে চায় না। ধীরে-ধীরে তার আঁচ নিবে গেছে। সে গাঁয়ের মাস্টার হয়ে ধীরে-ধীরে নিজেকে মাপে ছোট করে ফেলেছে। সয়েও গেছে সব। কিন্তু কেউ খুঁচিয়ে তুললে আজও বুকটা বড় উথাল-পাথাল করে।

ষষ্ঠী, চুপ কর, ওসব কথা বলে আর কী হবে!

আমরা যে তোর কথা সবসময়েই বলাবলি করি। চোখের সামনে দেখছি কিনা। কী জিনিস ছিল তোর ভিতরে।

বুদ্ধিরাম ভাঁড়টা ফেলে দিয়ে উঠল। বলল, যাই, ছাত্ররা সব এসে বসে থাকবে।

যা।

বুদ্ধিরাম সাইকেলে চেপে বড় রাস্তা থেকে গাঁয়ের পথে ঢুকে পড়ল। অন্ধকার রাস্তায় হাজার হাজার জোনাকি জ্বলছে। তাদের মিটিমিটে আলোয় কিছুই প্রতিভাত হয় না। অথচ জ্বলে। লাখো লাখো জ্বলে। তাহলে কী লাভ জ্বলে।

মোট দশ জন ছাত্র তার বাড়িতে এসে পড়ে। মাথা পিছু কুড়ি টাকা করে মাস গেলে দুশো টাকা তার আসার কথা। কিন্তু নগদ টাকা বের করতে গাঁয়ের লোকের গায়ে জ্বর আসে। বাকি বকেয়া পড়ে যায় অনেক। তবু বুদ্ধিরাম সবাইকেই পড়ায়। বেশির ভাগই গবেট। দু-একজন একটু-আধটু বোঝে-সোঝে।

পড়াতে বসবার আগে পাতুকে ডেকে শিশিটা ধরিয়ে দিয়ে বলল, ও বাড়িতে গিয়ে দিয়ে আয়। তার হাতে দিস।

রসকলির বিয়ে হয়ে গেছে। একটু বয়সকালেই হল। এখন রসকলির জায়গা নিয়েছে বুদ্ধিরামের ভাইঝি পাতু। আদুরি আর বুদ্ধিরামের ব্যাপারটা দুবাড়ির কারও আর অজানা নেই। সুতরাং নাহক লজ্জা পাওয়ারও কোনও মানে হয় না।

হাত-মুখ ধুয়ে পড়াতে বসে গেল বুদ্ধিরাম। কিছুক্ষণ আর অন্যদিকে মনটা ছোটাছুটি করল না। ছাত্রের মুখের দিকে চেয়ে অনেক কিছু ভুলে থাকা যায়।

এই ভুলে থাকাটাই এখন বুদ্ধিরামের কাছে সবচেয়ে বড় কথা। যত ভুলে থাকা যায় ততই ভালো। জীবনটা আর কতই বা লম্বা। একদিন আয়ু ফুরোবেই। তখন শান্তি। তখন ভারী শান্তি।

পড়িয়ে যখন উঠল বুদ্ধিরাম তখন বেশ রাত হয়েছে। ছাত্ররা যে যার লণ্ঠন হাতে উঠোন পেরিয়ে চলে যাচ্ছে। বুদ্ধিরাম দাওয়ায় দাঁড়িয়ে দেখল। এরপর তার একা লাগবে। খুব একা।

পাতু ফিরে এসেছে। বারান্দায় ঘুরে-ঘুরে কোলের ভাইকে ঘুম পাড়াচ্ছিল।

হাতে দিয়েছিস তো!

হ্যাঁ গো।

কিছু বলল?

না। শিশিটার গায়ে কী লেখা আছে পড়ল। তারপর তাকে রেখে দিল।

ভাতের গন্ধ আসছে। জ্যাঠামশাইয়ের কাশির শব্দ। কে যেন কুয়ো থেকে জল তুলছে ছপাৎ- ছপাৎ করে। দুটো কুকুরে ঝগড়া লেগেছে খুব। দাওয়ায় দাঁড়িয়ে বুদ্ধিরাম বাইরের

কুয়াশা মাখা জ্যোৎস্নার দিকে আনমনে চেয়ে রইল।

না, বেঁচে থাকাটার কোনও মানেই খুঁজে পায় না সে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে নিজের ঘরে ঢুকল। বাড়ির সবচেয়ে ছোট ঘরখানা তার। ঘরে একখানা চৌকি, একটা টেবিল আর চেয়ার আর একখানা বইয়ের আলমারি।

বুদ্ধিরাম চেয়ারে বসে লণ্ঠনের আলোয় একখানা বইয়ের পাতা খানিকক্ষণ ওলটাল। বইটা কী, কোন বিষয়ের তাও যেন বুঝতে পারছিল না। বইটা রেখে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে রইল। গাছের ফাঁক দিয়ে জ্যোৎস্না দেখা যাচ্ছে। জ্যোৎস্নারও কোনও অর্থ হয় না। ঝড়-বৃষ্টি, শীত-গ্রীষ্ম কোনওটারই কোনও অর্থ হয় না। অথচ বেঁচে থাকতে হবে। এ কী জ্বালা রে বাপ?

বউদি এসে খেতে ডাকল বলে বেঁচে গেল বুদ্ধিরাম। খাওয়ারও কোনও অর্থ হয় না। তবু সেটা একটা কাজ। কিছুক্ষণ সময় কাটে। কথাবার্তা হয়, হাসিঠাট্টা হয়। সময়টা কেটে যায়। বুদ্ধিরাম গিয়ে সাগ্রহে খেতে বসল।

খেয়ে এসে বুদ্ধিরাম ফের কিছুক্ষণ বসে রইল চেয়ারে। চেয়ারে বসে-বসেই কখন ঘুমিয়ে পড়ল, কে জানে।

পাতু এসে জাগাল, ওঠো সেজকা, বিছানা করে মশারি ফেলে গুঁজে দিয়েছি। শোওগে।

হাই তুলে উঠতে যাচ্ছিল বুদ্ধিরাম, পাতু ফের বলল, আজ ও বাড়ির সকলের মন খারাপ। নিবারুণদাদুর অবস্থা ভালা নয়। আদুরি পিসির চোখ লাল। খুব কাঁদছিল।

নিবারণ মানে হল আদুরির বাবা। বুদ্ধিরাম খবরটা শুনল মাত্র। মনে আর কোনও বুজকুড়ি কাটল না। কলঘর ঘুরে এসে শুয়ে পড়ল। বাপ যদি মরে তো আদুরির মাথা থেকে ছাদ উড়ে যাবে।

ভাবতে-ভাবতে ঘুমোল বুদ্ধিরাম। আজকাল নির্বোধের মতোই সে ঘুমোতে পারে। মাথাটা আস্তে আস্তে বোকা হয়ে যাচ্ছে তো। বোধবুদ্ধি কমে যাচ্ছে। আজকাল তাই গাঢ় ঘুম হয়।

মাঝরাতে আচমকা চেঁচামেচিতে ঘুমটা ভাঙল। ভাঙতেই সোজা হয়ে বসল বুদ্ধিরাম। চেঁচামেচিটা অনেক দূর থেকে আসছে। আদুরির বাপের কি তবে হয়ে গেল?

উঠবে কি উঠবে না তা ভাবছিল বুদ্ধিরাম। ও বাড়ির সঙ্গে তার সম্পর্ক কীই বা আর? না গেলেও হয়। রাতে একটু শীত পড়েছে। পায়ের কাছে ভাঁজ করা কাঁথা। সেটা গায়ে

টেনে নিতেই ভারী একটা ওম আর আরাম হল। বুদ্ধিরাম চোখ বুজল।

ঘুমিয়েই পড়ছিল প্রায় এমন সময় দরজায় ধাক্কা দিয়ে মেজদা বলল, বুদ্ধি, ওঠ। নিবারণ জ্যাঠার হয়ে গেল। একবার যেতে হয়। ও বাড়ি থেকে ডাকতে এসেছে।

বুদ্ধিরাম উঠল। যারা বেশি রাতে মরে তাদের আক্কেল বিবেচনার বড় অভাব। বলল, যাচ্ছি।

গামছাখানা কাঁধে ফেলে বেরিয়ে পড়ল বুদ্ধিরাম। গাঁসুদ্ধু জেগে আছে। আজকাল গাঁয়ে লোকও বেড়েছে খুব। রাস্তায় নামলেই বেশ লোকজন দেখা যায়। এই মাঝরাতেও ঘুম ভেঙে অন্তত জন ত্রিশ-চল্লিশ লোক নেমে পড়েছে রাস্তায়, আদুরিদের বাড়ি যাবে বলে।

একটা হাই তুলল বুদ্ধিরাম। শরীরটা এখনও ঘুমজলে অর্ধেক ডুবে আছে। শরীরের যেটুকু জেগে আছে সেটাকেও চালানো যাচ্ছে না।

বাইরের উঠোনেই নিবারণ জ্যাঠাকে তুলসীতলায় শোয়ানো হয়েছে। চেঁচিয়ে এ ওর গলাকে ছাপিয়ে কান্নার কম্পিটিশন চলেছে। কোনও মানে হয় না। জন্মালেই তো মানুষের মধ্যে মৃত্যুর বীজ পোঁতা হয়ে গেল। এভাবেই যেতে হবে। সবাই যায়।

গোটা দশেক লণ্ঠন আর দু-দুটো হ্যাজাক বাতির আলোতেও এই ভিড়ের মধ্যে আদুরিকে দেখতে পেল না বুদ্ধি। আদুরি খুব চাপা স্বাভাবের মেয়ে। চেঁচিয়ে কাঁদবে না, জানে বুদ্ধিরাম। আর সে আসায় হয়তো ঘরে গিয়ে সেঁধিয়েছে। মুখ দেখতেও বুঝি ঘেন্না হয় আজকাল।

মাস চারেক আগে প্লুরিসি থেকে উঠেছে বুদ্ধিরাম। বুক থেকে সিরিঞ্জ দিয়ে জল টেনে বের করতে হয়েছিল গামলা গামলা। তার ঠান্ডা লাগানো বারণ। কিন্তু সে কথা বুদ্ধিরাম ছাড়া আর কে-ই বা মনে রেখেছে।

শ্মশানে গেলে স্নান করতে আসতে হবে। শেষ রাতের শীতে হিম বাতাস লাগবে শরীরে। ডাক্তার ঠান্ডা লাগাতে বারণ করেছিল।

বুদ্ধিরাম একটু হাসল। সে রেলরাস্তায় গলা দিতে গিয়েছিল। মরণকে তার ভয়টয় নেই। একভাবে না একভাবে তো যেতেই হবে।

কান্নাকাটির মধ্যেই কিছু লোক বাঁশ-টাশ কাটতে লেগেছে। দড়িদড়া এসে গেছে। বুদ্ধিরাম একটু দূরে দাঁড়িয়ে দেখছে। কিছুই দেখার নেই অবশ্য।

মোড়লদের মধ্যে শলা-পরামর্শ হচ্ছে। সেই দলে বুদ্ধির বাপ জ্যাঠাও আছে। অন্য ধারে গাঁয়ের অল্পবয়সি ছেলেরা কোমরে গামছা বেঁধে তৈরি।

আচমকাই—একেবারে অপ্রত্যাশিত, আদুরিকে দেখতে পেল বুদ্ধিরাম। উত্তরের ঘরের দাওয়ায় তিন-চারজন মহিলা দাঁড়িয়ে ছিল, সেই দলে বুদ্ধির জ্যাঠাইমাও। আদুরি হঠাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সোজা বুদ্ধির দিকে তাকাল। গত দশ বছরে বোধহয় প্রথম।

বুদ্ধি একটু হতবুদ্ধি হয়ে গেল। না, ভুল দেখছে না। হ্যাজাকের আলো স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে। বাপের মড়া উঠোনে শোওয়ানো। তবু আদুরি সোজা তার দিকেই চেয়ে আছে। একেবারে নিষ্পলক।

আজ বুদ্ধিরামই চোখ সরিয়ে নিল। তারপর আড়ে-আড়ে চাইতে লাগল। মেয়েটার হল কী?

আদুরি তার জ্যাঠাইমার কানে কানে কী যেন বলল। তারপর একটু সরে দাঁড়াল। আঁচলে মুখ চাপা দিয়ে নরম ভঙ্গিতে খুঁটিয়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল। তাতে যেন ভারী ফুটে উঠল আদুরি। কী যে দেখাচ্ছে।

জ্যাঠাইমা হাতছানি দিয়ে তাকে ডাকছিল।

বুদ্ধিরাম অগত্যা গিয়ে বলল, কী গো জ্যাঠাইমা?

মড়া ছুঁয়েছিস নাকি?

না। তবে এবার তো ছুঁতে হবেই।

কাজ নেই বাবা। বাড়ি যা। গায়ে গঙ্গাজল আর তুলসীপাতা ছিটিয়ে গিয়ে শুয়ে পড়। তোকে শ্মশানে যেতে হবে না।

কেন?

কেন আবার। ক'দিন আগে কী অসুখটা থেকেই না উঠলি। ঠান্ডা লাগলে আর বাঁচবি নাকি?

আমার কিছু হবে না জ্যাঠাইমা, ভেবো না।

কেন, তোরই বা যেতে হবে কেন? শ্মশানে যাওয়ার কি লোকের অভাব? কত লোক জুটে গেছে। আদুরি মনে করিয়ে দিল, তাই। যা বাবা, ঘরে যা।

আর-একবার শুনতে ইচ্ছে করছিল, বলল, কে মনে করিয়ে দিল বললে?

আদুরি অদূরে দাঁড়িয়ে সব শুনতে পাচ্ছে। নড়ল না।

জ্যাঠাইমাও আর তাকে আমল না দিয়ে অন্য মহিলাদের সঙ্গে কথা কইতে লাগল।

বুদ্ধিরাম ধীরপায়ে ছেলে ছোকরাদের দঙ্গলটার কাছে এসে দাঁড়াল।

বুদ্ধিদা, যাবে তো!

তা গেল বুদ্ধিরাম। মড়া কাঁধে নেচে-নেচে গেল। বহুকাল পরে তার এক ধরনের আনন্দ হচ্ছিল আজ। না, প্রতিশোধ নেওয়ার আনন্দ নয়। প্রতিশোধের মধ্যে কোনও আনন্দ নেই। আজ তার আনন্দ হচ্ছিল একটা অন্য কারণে। ঠিক কেন তা সে বলতে পারবে না।

মড়া পুড়ল। বুদ্ধিরাম কষে স্নান করল নদীর পাথুরে ঠান্ডা জলে। দুনিয়ার একজনও অন্তত তার অসুখটার কথা মনে রেখেছে, এখন আর মরতে বাধা কী!

ভেজা গায়ে যখন উঠে এল বুদ্ধিরাম তখন শেষ রাতের হিম বাতাসে সে থরথর করে কাঁপছিল। সবাই কাঁপছে। কিন্তু তাঁর কাঁপুনিটা আলাদা। লোকে বুঝতে পারল না। শুধু বুদ্ধিরামের নিজের ভিতরে যে নানা ভাঙচুর হচ্ছিল তা নিজেই টের পেল সে।

হোঁৎকা সতীশ কাছেই দাঁড়িয়ে গামছা নিংড়োচ্ছিল। হঠাৎ কী খেয়াল হতে বুদ্ধিরামের দিকে ফিরে বলল, হ্যাঁরে বুদ্ধি, তুই যে বড় স্নান করলি?

করব না তো কী?

সতীশ মুখে একটা চুকচুক শব্দ করে বলল, তোর না কী একটা অসুখ হয়েছিল ক'দিন আগে।

কে বলল তোকে?

সতীশ গামছাটা ফটাস-ফটাস করে ঝেড়ে নিয়ে মাথা মুছতে-মুছতে বলল, বেরোবার মুখে আদুরি এসে ধরেছিল আমায়। বলল বটে, রাঙাদা, বুদ্ধিরামের কিন্তু শরীর ভালো নয়। হিমজলে স্নান করলে মরবে। ওকে দেখো।

বুদ্ধিরাম কোনও কথা বলল না। গলার কাছে একটা দলা আটকে আছে। চোখে জল আসছিল।

সতীশ গা মুছতে-মুছতে বলল, তোর আক্কেল নেই? কোন বুদ্ধিতে এই সকালে স্নান করলি?

দূর শালা! আজই তো স্নানের দিন। আজ স্নান করব না তো কবে করব?

পারিজাত ও ছোটকাকা

আপনি কি পুলিশের লোক?

কেন বলুন তো! আমাকে কি পুলিশের লোক বলে মনে হয়?

আজকাল কাউকে দেখে কি কিছু বোঝা যায়, বলুন! আমাদের নিমাইবাবুর কথাই ধরুন না কেন! দিব্যি মোটাসোটা, হাসিখুশি, দিলদরিয়া, নির্বিরোধী মানুষ। ভিখিরিকে ভিক্ষে দেন, কীর্তন শুনে কাঁদেন, পাড়ার বাচ্চাদের সঙ্গে ছুটির দিনে ব্যাটবল খেলেন, ঘরে ঠাকুর দেবতার ছবি আছে। অথচ একদিন সকালে তাঁর বাড়ি পুলিশে-পুলিশে ছয়লাপ। তাঁর শোওয়ার ঘরের খাটের তলা থেকে দুটো এ কে ফর্টি সেভেন অ্যাসল্ট রাইফেল, দুটো বেলজিয়ান পিস্তল, আর ডি এক্স, কার্তুজ আরও কী-কী সব যেন বেরোল। আমাদের এক গাল মাছি।

নিমাইবাবু ধরা পড়লেন বুঝি!

পাগল! শুনলুম, ওই থলথলে চেহারা নিয়েও তিনি নাকি নিজের বাড়ির ছাদ থেকে পাশের বাড়ির ছাদে লাফিয়ে পড়ে হাওয়া হয়েছেন। তাই বলছিলুম, লোক দেখে আজকাল আর কে যে কী তা চেনা মুশকিল। শুনলুম নিমাইবাবু নাকি কোন টেররিস্ট দলের সর্দার। বুঝুন কাণ্ড!

তা আমাকে দেখে কী মনে হয় আপনার?

শার্লক হোমস হলে বলতে পারতুম। তবে এমনিতে আপনাকে একজন মধ্যবয়স্ক, মধ্যবিত্ত, মধ্যশিক্ষিত, মধ্যম উচ্চতা ও মধ্যম স্বাস্থ্যের ভদ্রলোক বলেই মনে হয়। একজোড়া সন্দেহভাজন জম্পেশ গোঁফ থাকলেও আপনাকে ভয়ঙ্কর মানুষ বলে মনে হয় না। আর ওইটেই হয়েছে মুশকিল। আজকাল লোক দেখে চেনার উপায় নেই কিনা।

কথাটা যে খুব ভুল বলেছেন তা নয়। আমি ভয়ঙ্কর লোক নই। তবে আমাকে যে কেন পুলিশ বলে আপনার মনে হল সেইটেই বুঝতে পারছি না।

বলছি বলে কিছু মনে করবেন না। আজ ছুটির দিনটা বাড়িতে বসে কাটাব না ঠিক করে সকালে রুটি তরকারি খেয়ে যখন বেরোলাম তখন শরৎকালের আকাশ দেখে মনটা ভারী খুশি হয়ে উঠল। শরৎ আমার ভারী প্রিয় ঋতু। যদিও কলকাতা শহরে শিউলি বা কাশফুল বড় একটা দেখা যায় না, হিমেল ভাবটাও ডিজেল আর জনসংখ্যার জন্য তেমন নেই। তবু যাকে বলে স্মৃতিতাড়িত হয়েই বেরিয়ে পড়েছিলুম। ভাবলুম আজ একটু প্রকৃতিচর্চা করে কাটাব।

আপনি কি একটু প্রকৃতি-প্রেমিক?

প্রকৃতিপ্রেমিক কে নয় বলুন তো! আমাদের পূর্বপুরুষেরা তো বনজঙ্গলেই থাকতেন। ফলে এর একটা উত্তরাধিকার আমাদের রক্তে আছেই। ইট, কাঠ, পাথরের মধ্যে নিজেকে মানিয়ে নিই বটে, কিন্তু প্রকৃতি আমাদের সর্বদাই ডাকে।

অতি সত্য কথা। তাই আজ প্রকৃতির ডাকে বেরিয়ে পড়লেন বুঝি?

হ্যাঁ। তবে কলকাতায় প্রকৃতির জনপ্রিয়তা এতই বেশি যে কোথাও গিয়ে শান্তি নেই। ময়দানে যান, গুচ্ছের লোক। লেক-এ যান, গুচ্ছের লোক। নিরিবিলিতে যে উড়ু-উড়ু মন নিয়ে বসে থাকবেন তার জো নেই। তাই আজ ভাবলুম, লোকাল ট্রেনে চেপে বারুইপুর কি লক্ষ্মীকান্তপুর কিংবা ক্যানিং কোথাও গিয়ে কয়েক ঘণ্টা কাটিয়ে আসি।

তা গেলেন না কেন?

আরে মশাই, সেই কথাই তো বলছি। বাড়ি থেকে বেরিয়ে বাস স্টপে গিয়ে দাঁড়িয়েছি, তখনই দেখতে পেলুম বাসস্টপে একটা লোক আমাকে আড়ে-আড়ে লক্ষ করছে। এ ব্যাপারটা কিছু অভিনব। কারণ আমাকে লক্ষ করার মতো কিছু নেই। আমি অতি সাদামাটা, নগণ্য মানুষ। অথচ লোকটা বারে-বারেই আমার দিকে বেশ তীক্ষ্ণ চোখে তাকাচ্ছিল। এবং সেই লোকটা আপনি।

তা হবে হয় তো। আমি ইচ্ছে করেই যে তাকাচ্ছিলাম তা নয়। আসলে আমি খুব ভুলো মনের মানুষ। ভাবতে-ভাবতে কোনও দিকে হয়তো তাকিয়ে থাকি, কিন্তু কিছু দেখি না।

আপনাকে খুব আনমনা লোক বলে মনে হয় না কিন্তু।

কিন্তু একটু আগে আপনিই তো বলছিলেন লোক দেখে কে কেমন তা ঠিক বোঝা যায় না।

হ্যাঁ মশাই, তা বলেছি। তাহলে আপনি নিজেকে ভুলো মনের মানুষ বলেই দাবি করছেন?

দাবিদাওয়া কীসের? আমি ভুলো মনের মানুষ কি না তাও সঠিক জানি না। তবে গত তেত্রিশ বছর ধরে আমার বউ বলে আসছে আমি নাকি বেজায় ভুলো মনের মানুষ। বউ যা বলে তা নাকি আমি বেমালুম ভুলে যাই। শুনে শুনে আজকাল কথাটা আমার বিশ্বাস হয়ে গেছে।

কিন্তু মুশকিল কি জানেন, বাস স্টপে আমি আপনাকে এড়ানোর জন্য তিনটে বাস ছেড়ে দিই। বাস ফাঁকাই ছিল, তবু আমি উঠিনি। দেখলুম, আপনিও হিসেব কষেই ওই তিনটি বাস ছেড়ে দিলেন।

তাই নাকি?

আজ্ঞে হ্যাঁ। ঠিক তাই। চতুর্থ বাসটায় উঠতেই দেখলুম আপনিও উঠে পড়েছেন। তখনই মনে একটা খটকা লাগল।

খটকা! খটকা লাগবে কেন? এরকম তো হতেই পারে। প্রতিদিন এই কলকাতা শহরেই কত লোক তিনটে বাস ছেড়ে দিয়ে চার নম্বর বাসে ওঠে। এতে খটকা লাগার কী আছে? আপনি একটু সন্দেহবাতিকগ্রস্ত, তাই না?

সন্দেহ তো এমনি হয় না মশাই, কারণ থাকলেই হয়। শ্যামবাজার থেকে শেয়ালদা যেতে-যেতে আমি বারবারই লক্ষ করছিলাম যে, আপনি আমার ওপর নজর রাখছেন। আমি তখন আকাশ পাতাল ভেবেও বুঝতে পারছি না আমার ওপর কারও নজর রাখার কারণ কী হতে পারে। তাই আপনাকে বাজিয়ে দেখার জন্যই আমি শেয়ালদা না গিয়ে মানিকতলার মোড়েই নেমে পড়লুম। কাছেই আমার মেজো মাসির বাড়ি। অনেক কাল যাওয়া হয় না। প্রকৃতিচর্চা ছেড়ে অগত্যা মাসির বাড়িতেই এ-বেলাটা কাটিয়ে দেব বলে মনস্থিরও করে ফেললুম। কিন্তু কী আশ্চর্য! দেখলুম আপনিও ঠিক ওই স্টপেই নেমে পড়েছেন এবং দিব্যি আমার পিছু পিছু আসছেন।

আপনার কি মনে হয় যে মানিকতলায় আমারও কেউ থাকতে নেই? বললে হয়তো বিশ্বাস করবেন না, ওই মানিকতলায় আমার জ্যেঠতুতো ভাই পরেশের বাড়ি। পরেশ বেশ নামকরা লোক, করপোরেশনের কাউন্সিলার। সমাজসেবা-টেবা করে। শোনা যাচ্ছে সামনের ইলেকশনে এম এল এ হওয়ার জন্যও ভোটে দাঁড়াবে।

খুব ভালো কথা। ফ্যামিলিতে একজন পলিটিক্যাল লোক থাকা খুব ভালো। বিপদে আপদে খুব কাজ দেয়।

তা যা বলেছেন। আজকাল পলিটিক্স ছাড়া বেঁচে থাকাই শক্ত।

দুঃখের বিষয় কী জানেন? আমার কোনও পলিটিক্যাল দাদা বা ভাই নেই। পলিটিক্যাল মুরুব্বি না থাকায় আমাদের মতো সাধারণ মানুষকে নানা ধরনের ইনসিকিউরিটিতে ভুগতে হয়। খুঁটির জোর না থাকার ফলে আমরা কোনও সাহসের কাজই করতে পারি না।

খুবই ঠিক কথা। আজকাল সাহসের কাজ না করাই ভালো। অন্যায়ের প্রতিবাদ বা অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ এসব করতে গেলে উলটো বিপত্তি হতে পারে।

হ্যাঁ। তা শেষপর্যন্ত আপনি তো আপনার ভাই পরেশবাবুর বাড়িতে যাননি!

কে বলল যাইনি?

আমিই বলছি। আজ মাসির বাড়িতেই একটা বেলা কাটিয়ে দেব বলেই স্থির ছিল। মাসিও আমাকে দেখে বেজায় খুশি। দুপুরে না খাইয়ে ছাড়বে না কিছুতেই। কিন্তু কিছুক্ষণ বসার পরই আমার কেমন উসখুশ শুরু হল।

কেবলই মনে হতে লাগল, লোকটা যে আমাকে ফলো করেছিল সে কি রাস্তায় এখনও ওৎ পেতে আছে? তিনতলার জানালা দিয়ে চেয়ে অবশ্য রাস্তায় আপনাকে দেখতে পাইনি।

আপনার মাসির বাড়ির নম্বরটা বলুন তো?

তিনের সি।

পরেশের বাড়ি তিনের সি বাই ওয়ান। পাশেই। আপনার মেসোমশাইয়ের নাম কি বিপুলকান্তি সেন?

ও বাবা! আপনি যে অনেক খবর রাখেন মশাই?

বিপুল সেন মস্ত অ্যাডভোকেট। পরেশের সঙ্গে খুব দহরম মহরম।

পরেশ গুপ্তর নাম অবশ্য আমি শুনিনি। তবে আপনার কথা সত্যি হলেও অবাক হওয়ার ঘটনাও অস্বীকার করা যাচ্ছে না। মাসির সঙ্গে অনেকদিন পরে দেখা। সুখ-দুঃখের কথাও মাসির অনেক জমে আছে। কিন্তু উদ্বেগ আর উসখুশনির চোটে আমার দু-দণ্ড বসে থাকার জো রইল না। কেবলই মনে হতে লাগল, লোকটা এখনও নিশ্চয়ই আমার জন্য রাস্তায় অপেক্ষা করছে। মাসি পর্যন্ত আমার অস্বস্তি লক্ষ করে বলে উঠল, কী হয়েছে

তোর? অমন ছটফট করছিস কেন? কথাটা ভেঙে মাসিকে বলতেও পারি না, মাসি নিশ্চয়ই হেসে উড়িয়ে দেবে। আমার মতো একজন অপদার্থর পিছু নিয়ে সময় নষ্ট করার মতো আহাম্মক কে আছে বলুন! তাই সামান্য কিছুক্ষণ বসে দুপুরের খাবার না খেয়েই বেরিয়ে পড়লাম।

দুপুরে না খাওয়াটা আপনার আহাম্মকিই হয়েছে। নিশ্চয়ই মাসি আজ ভালোমন্দ রেঁধেছিলেন। বিপুল সেনের অনেক টাকা, রোজই ভালোমন্দ খায় নিশ্চয়ই।

তা কথাটা আপনি খারাপ বলেননি। মাসির রান্নার লোকটি খুবই উঁচু জাতের।

বামুন নাকি?

আরে না, সেই জাতের কথা বলিনি। বলছি হাই গ্রেড রাঁধুনি। চাইনিজ, মোগলাই সব রাঁধতে জানে। আজ তো শুনলুম গুলাবি বিরিয়ানি আর রেশমি কাবাব রান্না হয়েছিল। তা বলে ভাববেন না ওরা রোজ এরকম রিচ খাবার খায়। আজ মাসির বেয়াইবাড়ি থেকে কারা যেন আসবে। সেইজন্যেই ওসব স্পেশাল ডিশ।

একটু টেস্ট করে আসতেও পারতেন।

টেস্ট কি মশাই! সত্যি কথা বলতে কি পৃথিবীতে একটা জিনিসই আমি সত্যিকারের ভালোবাসি। আর তা হল খাওয়া। ভালো খাবারের প্রতি আমার আকর্ষণ দুর্নিবার। সুতরাং মাসির বাড়িতে আজ আমার পাত পেড়ে আকণ্ঠ খাওয়ার কথা। কিন্তু তাতে বাদ সেধেছেন আপনি। কে আমাকে ফলো করছে, কেন ফলো করছে সেই দুশ্চিন্তায় আমার অ্যাপেটাইট-টাই আজ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। শেষ অবধি এক কাপ কফি কোনওরকমে খেয়ে বেরিয়ে এলাম। মাসি অবশ্য খুবই মনঃক্ষুণ্ণ হল। হওয়ারই কথা। আমার মা-মাসিরা তিন বোন। একমাত্র আমার মা ছাড়া কারওই ছেলে নেই। দুই মাসিরই দুটি করে মেয়ে। ফলে আমি তাদের খুবই আদরের বোনপো।

আপনারা তো বোধহয় দুই ভাইবোন, তাই না?

আশ্চর্য তো! আপনি কী করে জানলেন?

জানি না তো! আন্দাজে বললাম। আপনি বোধহয় আমার 'বোধহয়' কথাটা লক্ষ করেননি!

করেছি। আপনি বলেছেন, আপনারা বোধহয় দুই ভাইবোন, তাই না?

আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি তাই বলেছি। অনুমানের ওপর নির্ভর করে।

অদ্ভুত আপনার অনুমানশক্তি। অবশ্য যদি সেটা সত্যিই অনুমান হয়ে থাকে। আমার মন বলছে আপনি আমার বিষয়ে সব খোঁজখবরই রাখেন।

আরে না না। আপনি সন্দেহবাতিকে ভুগছেন। এই তো একটু আগেই আপনি বললেন পরেশ গুপ্তের নাম আপনি শোনেননি। যদি তা নাই-ই শুনবেন তাহলে পরেশ যে গুপ্ত তা কী করে জানলেন বলুন তো! আমি আপনাকে পরেশের নামটা বললেও পদবিটা কিন্তু বলিনি। পরেশ যে গুপ্ত তা তো আপনার জানার কথাই নয়।

বলেছি নাকি?

হ্যাঁ বলেছেন।

তাহলে না জেনেই আন্দাজে বলেছি।

আমিও তো সেটাই বলতে চাইছি। আন্দাজে বলা অনেক কথা মিলে যায়।

আপনি খুব বুদ্ধিমান লোক, আর সেটাই ভয়ের কথা।

আপনার রজ্জুতে সর্পভ্রম হচ্ছে।

সেটা হওয়াই বরং ভালো। সর্পতে রজ্জুভ্রম হওয়া যে আরও মারাত্মক।

আপনার বিচলিত হওয়ার মতো কিছুই তো হয়নি!

সেটা আপনিই বলতে পারেন বটে, কিন্তু আমার সিচুয়েশনে পড়লে বিচলিত না হয়ে আপনারও উপায় থাকত না। কারণ মাসির বাড়ি থেকে দুপুরবেলা বেরিয়ে আমি আপনাকে কোথাও দেখতে না পেয়ে তাড়াতাড়ি কেটে পড়ার তালে ছিলুম। কিন্তু হঠাৎ দেখলুম আপনি মোড়ের পানের দোকানের সামনে দাড়িয়ে একজন মোটাসোটা লোকের সঙ্গে কথা কইছেন এবং আমার দিকেই তাকিয়ে আছেন। এমনকি সঙ্গের লোকটাকে ইশারা করে আমাকে দেখিয়ে দিলেন বলেও আমার মনে হল। কারণ লোকটাও হঠাৎ ঘাড় ঘুরিয়ে আমাকে দেখল।

আহা, ওই তো পরেশ। ব্যাপারটা হয়েছিল কি, পরেশের বাড়িতে আমার একটু কাজ ছিল। সেটা সেরে বেরোতে যাব, পরেশ বলল, চলো দাদা, তোমাকে মোড় অবধি এগিয়ে দিই, কয়েক খিলি পানও কিনতে হবে। আমার আবার শিবুর পান ছাড়া চলে না। তা তাই পরেশের সঙ্গে দাঁড়িয়ে একটু কথা কইছিলুম। খারাপ কথাও কিছু নয়। বাগবাজারের এক গলির মধ্যে আমার পৈতৃক বাড়ি। তিনতলা বেশ বড় বাড়িই। তা পুরোনো বাড়ি ভেঙে বহুতল করার একটা কথা চলছে। কিন্তু বাদ সাধছে করপোরেশন। তারা বলছে ওই

সংকীর্ণ গলির মধ্যে বহুতলের পারমিশন দেওয়া অসম্ভব। তা সেসব নিয়েই পরেশের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। বলতে কি আপনাকে আমি লক্ষই করিনি।

লক্ষ করেছেন কি না তা জানি না। তবে তাকিয়েছিলেন।

তা ওরকম তো আমরা কতই তাকাই। তাকানো মানেই কি আর দেখা! সবকিছুর দিকেই তাকাচ্ছি অথচ কিছুই দেখছি না, এমন অবস্থা কি আপনার কখনও হয় না?

তা হবে না কেন? সবসময়েই হয়। ভুলো মনের মানুষদের তো আরও বেশি করেই হয়। তবু আমার কেন যেন মনে হচ্ছিল আপনি তাকাচ্ছেন এবং দেখছেনও। তাই ভয়ে আমি তাড়াতাড়ি বড় রাস্তায় এসে দক্ষিণের একটা বাসে উঠে পড়ি।

আপনি এরপর কী বলবেন আমি জানি। আপনি বলবেন যে ওই বাসে আমিও সওয়ার হয়েছিলাম, তাই তো?

যদি অন্তর্যামী না হয়ে থাকেন তবে তা-ই। হাসছেন যে!

হাসছি কি আর সাধে? কাকতালীয় আর কাকে বলে! আমারও যে আজ দক্ষিণ কলকাতার বালিগঞ্জে আমার বড় মেয়ের বাড়িতে যাওয়ার কথা ছিল। তার শাশুড়ির অসুখ। যাব যাচ্ছি করে আর যাওয়া হয়ে উঠছিল না। আজ গিন্নি একেবারে মাথার দিব্যি দিয়ে বললেন, না-যাওয়াটা খুবই দৃষ্টিকটু হচ্ছে। আমাদের কিছু হলেই ওরা এসে দেখা সাক্ষাৎ করে যান।

কাকতালীয় কথাটার অর্থ আমি কিন্তু সঠিক জানি না। কাক আর তাল মিলিয়ে শব্দটা যা দাঁড়ায় তার কোনও মানে হয় কি?

সত্যি কথা বললে বলতে হয়, আমিও জানি না। ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি তাই বলি। বাংলা ভাষাটা যাচ্ছেতাই। বরং ইংরিজি শব্দগুলো একটু বোঝা টোঝা যায়। তা আপনি তো ইংরিজির এমএ, কাকতালীয় কথাটার ইংরিজি কী হবে বলুন তো!

স্ট্রেঞ্জ কো ইনসিডেন্স।

বা! এই তো বেশ বোঝা গেল। স্ট্রেঞ্জ কো ইনসিডেন্স!

না মশাই, বোঝা গেল না। বরং আরও ঘোরাল হল।

কেন বলুন তো!

আমি যে ইংরিজির এম.এ তা আপনি কি করে জানলেন?

মোটেই জানি না মশাই, আন্দাজে একটা ঢিল ছুড়লাম। লেগে গেল।

বটে! আন্দাজে ঢিল ছুঁড়তে থাকলে এক-আধটা লাগতে পারে, সবক'টা লাগে কি?

তাহলে মশাই, কথাটা আপনাকে ভেঙেই বলি।

আজ্ঞে, আমি তো তার জন্যই অপেক্ষা করছি।

আসলে কারও কোয়ালিফিকেশন বা বেতন কিংবা জাত জিগ্যেস করাটা ঘোর অভদ্রতা। তাই আমি কারও বেতন জানবার দরকার হলে তাকে গিয়ে বলি, আরে রামবাবু আপনি তো মাসে চল্লিশ হাজার টাকা বেতন পান, তাহলে বারো টাকার বেগুন কিনতে পিছোচ্ছেন কেন। তখন রামবাবু বলে উঠলেন, কে বলল চল্লিশ? আমার বেতন মোটে বাইশ হাজার সাতশো টাকা। কিংবা কারও জাত জানবার দরকার হলে তাকে গিয়ে বললাম, ওঃ আপনারা বামুনরাই দেশটার সর্বনাশ করলেন মশাই। তাতে লোকটা একটু তেড়িয়া হয়ে বলল, মোটেই আমি বামুন নই, আমরা বদ্যি। তেমনি কারও কোয়ালিফিকেশন জানার দরকার হলেই আমি তাকে বলি, আরে, আপনি তো ইংরিজির এমএ বলুন দেখি এই শব্দটার ইংরিজি কী হবে। খুবই প্রাচীন এবং বহু ব্যবহৃত কৌশল। কাজও ভালো দেয়। আচ্ছা, আপনি কি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন?

ফেলিনি। আপনা থেকেই বেরিয়ে গেল।

দীর্ঘশ্বাস ফেলার মতো কিছু ঘটছে কি?

ঘটেছে।

কী বলুন তো?

আমার বেতন চল্লিশ হাজার, আমি বদ্যি এবং ইংরিজির এমএ।

বলেন কি মশাই? এঃ, আজ তো দেখছি আমার লটারি মারার দিন ছিল। কেন যে একটা রয়াল ভুটানের টিকিট কেটে রাখিনি!

আপনার মতো বুদ্ধিমান লোকেরা লটারির টিকিট কেটে পয়সা রোজগার করার স্বপ্ন দেখে না। লটারির টিকিট কাটে বোকারা। আপনার মতো লোকেরা বুদ্ধি খাটিয়ে লটারির চেয়ে অনেক বেশি টাকা কামাতে পারে।

কেন যে আমাকে লজ্জায় ফেলছেন জানি না। কয়েকটা কাকতালীয় ব্যাপার থেকে এতটা ধরে নেওয়া কি ঠিক?

তা কাকতালীয় ব্যাপারগুলো আজ এমন হিসেব করে ঘটছিল যে ঘটনাগুলোকে নিতান্তই বেহায়া এবং বেশরম বলতে হয়। বাসটা যখন ল্যান্সডাউন দিয়ে যাচ্ছে তখন আমি দুশ্চিন্তায় রীতিমতো ঘামছি। আপনার হাত এড়ানোর জন্য আমি অগত্যা আচমকাই একটা স্টপে নেমে পড়লাম।

বুঝেছি! বুঝেছি! ওই ন্যাপার দোকানের সামনে তো! দেখুন যোগাযোগ আর কাকে বলে। মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে যাচ্ছি অথচ খালিহাতে। গিন্নি পইপই করে বলে দিয়েছিলেন, ওগো বেয়াই বাড়িতে খালি হাতে যেও না কিন্তু, ভালো দোকান থেকে একশো টাকার ভালো মিষ্টি নিয়ে যেও। কথাটা একদম খেয়াল ছিল না। মনে পড়তেই ওই ন্যাপার দোকানের স্টপে নেমে পড়লাম।

হ্যাঁ, সেখানে একটা বড় মিষ্টির দোকান ছিল বটে।

থাকতেই হবে, নইলে নামব কেন?

কিন্তু মশাই, নেমে আপনি তো দাঁড়িয়ে দোকানের সাইনবোর্ড পড়তে লাগলেন, মিষ্টি তো কিনলেন না।

বলিনি বুঝি আপনাকে? আমারও দেখছি আপনার হাওয়া লেগেছে। জরুরি কথা বেমালুম ভুলে যাই। আসলে সমস্যা হল, আমার বেয়াইমশাই হলেন ব্লাড সুগারের রুগি। চারশোর নীচে সুগার মোটে নামেই না। কিন্তু মিষ্টি খাওয়ার এমনই লোভ যে ঠাকুরের বাতাসা অবধি চুরি করে খান। তাই সে বাড়িতে মিষ্টি নিয়ে যাওয়া কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। বাস থেকে নেমেই কথাটা মনে পড়ে গেল বলে আমি আর মিষ্টি কিনিনি।

ব্লাড সুগার খুবই খারাপ জিনিস। আমার বাবারও সম্প্রতি ধরা পড়েছে এবং তাঁরও খুব মিষ্টি খাওয়ার ঝোঁক।

তাহলেই বুঝুন, এক বর্ণ মিথ্যে বলিনি।

আপনি বলেনও ভারী আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে। শুনলে বিশ্বাস করতে ইচ্ছেও করে।

তাই তো বলছি। সত্যি কথার একটা আলাদা জোর আছে। বিশ্বাস না করেই পারা যায় না।

আপনার বড় মেয়ের শ্বশুরবাড়িটা কোথায় যেন?

সাউথে।

সাউথ তো বিরাট জায়গা। বেহালা, টালিগঞ্জ, গড়িয়া, কসবা। শুধু সাউথ বললে কিছুই বোঝা যায় না।

কথাটা আপনি খারাপ বলেননি। সাউথ কথাটা ভারী গোলমেলে। আজকাল তো সোনারপুর-টুরও শুনি সাউথের মধ্যে চলে এসেছে। কলকাতা শহরের পরিধি যে শেষ অবধি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে সেইটেই বোঝা যাচ্ছে না। বাসন্তী, গোসাবা, সবই না শেষে কলকাতার মধ্যে চলে আসে।

খুব ঠিক কথা। সাউথ ক্রমশ স্ফীত হচ্ছে। নর্থও হাত পা গুটিয়ে বসে নেই। মধ্যমগ্রাম, বিরাটি, বারাসাত, রাজারহাট ছাড়িয়ে সেও ধাওয়া করেছে উত্তর চব্বিশ পরগনা গ্রাস করে নিতে।

আপনি তো ছোকরা মানুষ। আমরা একটু বয়স্করা তো দেখেছি। ওই যে আপনাদের ঝাঁ চকচকে সল্ট লেক সিটি, একসময়ে কী অখদ্দে জায়গাই না ছিল। সাপ গোসাপের আড্ডা, জলা, ভেড়ি। আমরা তো বলতাম বাদা অঞ্চল। এখনও সেখানে মাঝে মাঝে সাপখোপ বেরোয়।

শেয়ালের ডাকও শোনা যায়।

আগে এই লেকেই কত শেয়াল ছিল। আমাদের আমলের কথা বলছি।

আপনার বয়স কত?

সাতান্ন।

প্লাস?

ওসব প্লাস মাইনাস ঠিক বুঝতে পারি না। গত শ্রাবণে সাতান্ন কমপ্লিট করেছি। সার্টিফিকেটে অবশ্য দু-বছর কমানো আছে।

আপনাদের আমলে বয়স কমানোর একটা ব্যাড হ্যাবিট ছিল, তাই না?

হ্যাঁ, তা ছিল। ছেলে যাতে বেশিদিন চাকরি করতে পারে। মেয়ে যাতে বুড়ি হলেও ছুঁড়ি থাকে তার জন্যই বয়স কমানো হত।

ব্যাপারটা কিন্তু মিথ্যাচার।

তা তো বটেই।

তবু আপনারা যাঁরা বয়স্ক তাঁরা নিজেদের আমলের পঞ্চমুখে প্রশংসা করেন।

ও হল নস্টালজিয়া। আপনিও বয়স হলে এই আমলের প্রশংসা করবেন।

বয়স তো আমার কিছু কম হল না!

তাই নাকি? আমার হিসেবমতো আপনার বয়স ঊনত্রিশ বছর দু-মাস হতে পারে।

কত বললেন?

উনত্রিশ বছর দু-মাস। খুব আন্দাজেই বলছি।

দাঁড়ান মশাই, হিসেব করে দেখি। আমারও তো অত অ্যাকিউরেট হিসেব করা নেই কিনা। দাঁড়ান। জাস্ট এ মিনিট।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, সময় নিন না। এখনও বেশি রাত হয়নি। মোটে তো আটটা বাজে।

আপনাকে কিন্তু পুলিশে দেওয়া উচিত।

কেন মশাই, কী করলাম?

আমার বয়স সত্যিই ঊনত্রিশ বছর দু-মাস। কিন্তু আপনি সেটা কী করে জানলেন?

জানার প্রশ্ন উঠছে না। চেহারা দেখেই বয়স অনুমান করা যায়।

তা যায়। কিন্তু এতটা অ্যাকুরেট ক্যালকুলেশন করা যায় না।

তাও যায়। আমার মনে হচ্ছিল আপনার বয়স আঠাশ থেকে ত্রিশের মধ্যেই হবে। তাই একটা মাঝামাঝি রফা করে নিয়ে বলে দিলাম। তা সেটা লেগেও গেল দেখছি। এক-একদিন এরকম হয় মশাই, মানুষের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বা তৃতীয় নয়ন যা-ই বলুন, বেশ ভালো কাজ করতে থাকে।

ভালো কথা, আপনার বড় মেয়ের শ্বশুরবাড়িটা কোথায় যেন বলছিলেন।

সাউথে। এখান থেকে কাছেই।

সাউথে এবং এখান থেকে কাছেই—এই কথা দুটোর কোনও অর্থ হয় না।

কেন মশাই, বাংলা কথাই তো।

হ্যাঁ, কিন্তু ও থেকে কিছু বোঝা যায় কি?

আহা, বুঝবার দরকারটাই বা কি? আমার বড় মেয়ের শ্বশুরবাড়ি দিয়ে আমাদের তো কোনও প্রয়োজন সিদ্ধ হবে না।

হবে। কারণ, আপনি সেখানেই যাবেন বলে বেরিয়ে শেষ অবধি সেখানে যাননি। আমার মৌটুসির শ্বশুরবাড়ি বালিগঞ্জেই এবং আমার সেখানেই যাওয়ার কথা ছিল বটে। কিন্তু হঠাৎ মনে পড়ে গেল যে, তার চেয়েও একটা জরুরি কাজ আমার আছে।

সেটা কি টালিগঞ্জের মেজো মেয়ে মৌবনের শ্বশুরবাড়িতে যাওয়া!

আশ্চর্য! অতি আশ্চর্য! বয়সে নিতান্তই আমার ছেলের বয়সি না হলে আমি আপনাকে একটা নমস্কার জানাতাম।

কেন মশাই, আমি তেমন ভালো কাজ তো কিছু করিনি!

করেছেন বইকী! আমার মেজো মেয়ের নাম যে মৌবন সেটা আপনার জানার কথাই নয়। এমনকী আরও আশ্চর্যের ব্যাপার হল তার শ্বশুরবাড়ি যে টালিগঞ্জে সেটাই বা আপনি জানলেন কী করে?

জানি না মশাই, আমি কিছুই জানি না। আপনি কী-কী অজুহাত দিতে পারেন তা আন্দাজ করতে গিয়ে যা মুখে এসেছে বলে দিয়েছি। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বা তৃতীয় নয়ন কিছুই আমার নেই।

কিংবা একটু বেশি মাত্রাতেই আছে। আমার মেজো মেয়ের নাম বা তার শ্বশুরবাড়ি কোথায় তা ঠিকঠাক বললেও একটা জায়গায় আপনার ভুল হচ্ছে। আমি কিন্তু বড় মেয়ের বদলে মেজো মেয়ের বাড়িতে যাচ্ছিলাম না। আসলে হঠাৎ মনে পড়ে গেল, মহেন্দ্র সিং নামে একটা লোকের কাছে আমি ছ'হাজার টাকা পাই। লোকটা অনেকদিন ধরে লেজে খেলাচ্ছে। গতাকালই তাকে তার মোবাইল ফোনে ধরে কিছু হুমকি দেওয়াতে সে টাকাটা আজই দিয়ে দেবে বলে কথা দিয়েছে। অধমর্ণদের তো জানেন, যতক্ষণ পারে টাকাটা আটকে রেখে সুদে খাটিয়ে দেয়। তা কথাটা মনে পড়তেই আমি গন্তব্য বদল করে মহেন্দ্র সিং-এর কাছেই যাচ্ছিলাম।

কিন্তু যাননি।

কেন যাইনি তারও গভীর কারণ আছে। মহেন্দ্র সিং ল্যান্সডাউনের একটা গলিতে থাকে। ন্যাপার দোকান থেকে একটুখানি পথ। যাব বলে পা বাড়িয়েই হঠাৎ দেখি মহেন্দ্র, পাশে তার বউ।

আপনি কি চেঁচিয়ে মহেন্দ্র সিংকে ডেকেছিলেন?

আহাম্মক হলে ডাকতাম। মহেন্দ্র সিং-এর গাড়ি এয়ারকন্ডিশন, জানলার কাচ আঁট করে বন্ধ ছিল।

তারপর?

তারপর আর কী? তারপর অগত্যা কিছুক্ষণ হাঁটা।

হ্যাঁ। আমার পিছু-পিছু।

শুধু আপনি কেন, আমার সামনে আরও অনেক লোক হাঁটছিল।

আমার খুব জানতে ইচ্ছে করছে, এত জরুরি কাজ ফেলে অবশেষে আপনি এই লেক-এর ধারে এসে বসে আছেন কেন? আপনি কি জানেন, আপনার জন্য আজ দুপুরে আমার খাওয়া হয়নি?

আপনি কি আমাকে আজ দুপুরে খেতে দেখেছেন?

না, তা দেখিনি।

আমারও আজ দুপুরে খাওয়া হয়নি। কাছেই সার্দান অ্যাভনিউয়ে একটা ভালো চিনে রেস্তোরাঁ আছে। যাবেন নাকি?

এটা কি আরও একটা ষড়যন্ত্র?

খিদের মধ্যে ষড়যন্ত্রের কী আছে বলুন। আপনি আমার ওপর একটু ক্ষুব্ধ হয়ে আছেন, তাই আমার খুব ইচ্ছে করছে আপনাকে কিছু খাওয়াই। চাইনিজ তো আপনি ভালোই বাসেন।

না মশাই, আমার অ্যাপেটাইট নেই। ধন্যবাদ।

প্রেমে পড়লে দুরকম হতে পারে। কারও খুব খিদে হয়, আবার কারও একদম খিদে থাকে না। দুটোই এক্সট্রিম।

কিন্তু আমি প্রেমে পড়িনি তো!

দেশবন্ধু পার্কে রোজ সকালে যে স্বপ্নের মতো একটা মেয়ে ঘুরে বেড়ায়, তার দিকে কি আপনি খুব হতাশ চোখে চেয়ে থাকেন না?

অ্যাঁ!

আহা লজ্জা পাওয়ার কী আছে বলুন তো! আপনি তো আপনার প্রিয় বন্ধুদের বলেইছেন যে ওই স্বপ্নের মতো মেয়েটি এতটাই স্বপ্নের মতো যে, আপনি আজ অবধি তার সঙ্গে ভরসা করে কথাটাও বলে উঠতে পারেননি। আর যতই তাকে দেখেছেন ততই মেয়েটিকে আরও অধরা মনে হচ্ছে। আপনার নাকি ধারণা হয়েছে মেয়েটি রিয়াল নয়।

ইয়ে...দেখুন...এসব...

ঘাবড়ানোর মতো কিছু তো নয়। এরকম তো হতেই পারে। প্রেমে পড়লে অনেক সময় আত্মবিশ্বাস কমে যেতে থাকে। কত কী মনে হয়। মনে হয়, আমি তো কুচ্ছিৎ, আমি তো আনস্মার্ট, আমি তো ভিতু, আমি তো মোটেই ওর যোগ্য নই, আমাকে নিশ্চয়ই পাত্তা দেবে না। হয় না বলুন!

ইয়ে, মানে আমি...

আহা, আরও একটু ধৈর্য ধরে শুনুন না।

আপনি এসব কী করে...

ওটা কোনও কথা নয়। ঘটনাটা সত্যি কি না সেটাই আসল কথা। দীর্ঘশ্বাস ফেললেন নাকি?

হ্যাঁ। আসলে ও মেয়েটা সত্যিকারের রক্তমাংসের মানুষ নয়।

তাহলে তো চিমটি কেটে দেখতে হয়।

ছিঃ, কী যে বলেন! কিন্তু আপনি কী করে এসব...?

রবার্ট ব্লেক এজেন্সির নাম শুনেছেন?

রবার্ট ব্লেক এজেন্সি? না তো! তারা কারা?

একটা প্রাইভেট গোয়েন্দা সংস্থা।

ও বাবাঃ হঠাৎ তাদের কথা কেন?

আপনার সম্পর্কে গত এক মাসে তারাই সব তথ্য সংগ্রহ করেছে।

ও বাবা! কেন?

গূঢ় কারণ আছে যে!

কী কারণ?

ওই মেয়েটিই।

ওই মেয়েটি। কেন, সে কি আমাকে পুলিশে দিতে চায়? কিন্তু শুধু তাকিয়ে থাকা ছাড়া আমি তো আর কোনও অসভ্যতা করিনি! তা ছাড়া, আমি ড্যাব-ড্যাব করেও তো চেয়ে থাকি না। খুবই বিশুদ্ধ চোখে তাকে আলতোভাবে দেখি। হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন, আমি খুব

হতাশা নিয়েই চেয়ে থাকি। কারণ, তাকে আমার মর্তের মানবী বলেই মনে হয় না। কিন্তু আমি তাকে কখনও ডিস্টার্ব করিনি।

করেছেন বইকি! ডিস্টার্ব না করলে এত জলঘোলা করার দরকারই হত না।

তাহলে ঠিকই ধরেছিলাম। আপনি পুলিশের লোক।

আমি কথাটা অস্বীকার করছি না।

মেয়েটি কি আমার নামেই অভিযোগ করেছে?

আপনার নামেই।

আর কেউ নয় তো! মানে অনেক দুষ্টু লোক তো থাকে, সুন্দর মেয়েদের পিছনে লাগে। ওরকম কারও সঙ্গে আমাকে গুলিয়ে ফেলেনি তো!

না। লম্বা, ফরসা, হ্যান্ডসাম, বাঁ-গালে আঁচিল। আপনিই।

বুঝেছি। আমাকে অ্যারেস্ট করার আগে আমি আপনাকে একটা অনুরোধ করতে পারি কি?

পারেন।

আমাকে দয়া করে ইভ টিজার হিসেবে অ্যারেস্ট করবেন না। সেটা লজ্জার ব্যাপার হবে। আমাদের পরিবারটি সম্ভ্রান্ত, তাদেরও মান থাকবে না। দয়া করে আমাকে একজন উগ্রপন্থী বা তোলাবাজ বা সাট্টা ডন যা খুশি অভিযোগে গ্রেফতার করুন। ইভ টিজারের চেয়ে এসবও বরং ভালো।

তার মানে আপনি ইভ টিজিং-এর মতো পেটি ক্রাইমের আসামি হতে চান না! কিন্তু অভিযোগ করলেই তো হবে না। অভিযোগ প্রমাণ হবে কীসে?

আমি অভিযোগ স্বীকার করে নেব।

ও বাবা! আপনি তো ডেনজারাস লোক মশাই!

বিশ্বাস করুন, ইভ টিজার হিসেবে আমাকে আদালতে তুললে আমার মা বাবা আমার আর মুখদর্শন করবে না। মেয়েটা হয়তো আমাকে খানিকটা শাস্তি দিতে চায়। তা যে কোনও অভিযোগে আমি কিছুদিন জেল খাটলেই তো হল! কী বলেন?

কথাটা ভেবে দেখতে হবে।

পুলিশ তো ঘুষটুষ খায়, তাই না? এ বাবদে না হয় আমি দু-পাঁচ হাজার টাকা দেব।

বলছেন?

বলছি বলে কিছু মনে করবেন না যেন। খারাপ ভেবে বলিনি। চাইনিজ খেতে চাইছিলেন, চলুন আজ আপনাকে আমিই না হয় খাওয়াচ্ছি।

সেটা কি খুবই খারাপ দেখাবে না? আমি বয়সে বড়, সম্পর্কেও বড়।

বয়সে বড় মানছি। কিন্তু সম্পর্কেও বড়টা বুঝতে পারলাম না। তা সে না হয় না-ই বা বুঝলাম। চলুন, যাওয়া যাক।

আরে মশাই, ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? কথাটা আগে খোলসা হোক।

বেশ খোলসা হোক। আপনি কত চান?

সেটা পরে ঠিক করা যাবে। তার আগে আজকের চাইনিজ ডিনারের দামটা কার দেওয়া উচিত সেটা পরিষ্কার হওয়া দরকার।

আমিই দেব।

সেটা যে হয় না।

কেন হয় না?

তাহলে একটু ব্যাকগ্রাউন্ডটা যে আপনার জানা দরকার।

ওর আর ব্যাকগ্রাউন্ড কী?

আছে মশাই। ব্যাকগ্রাউন্ড হচ্ছে ভোরবেলার দেশবন্ধু পার্ক। সেখানে আপনি একখানা বেঞ্চে বসে থাকেন আর সামনে একটা স্বপ্নের মেয়ে ঘুরে বেড়ায়, তাই তো?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

আপনি বলছেন মেয়েটাকে আপনি ডিস্টার্ব করেন না!

আজ্ঞে না।

অথচ মেয়েটা বলছে আপনি ওকে রীতিমতো ডিস্টার্ব করছেন।

যে আজ্ঞে।

ডিস্টার্ব করা বলতে আপনি কী বোঝেন?

পিছু নেওয়া, সিটি দেওয়া, ফলো করা, মন্তব্য ছুড়ে দেওয়া। চিঠিচাপাটি পাঠানো। এইসব আর কি।

আরও একরকমভাবে ডিস্টার্ব করা সম্ভব।

সেটা কীভাবে?

আপনি এক্সটারনালি মেয়েটিকে ডিস্টার্ব করেননি ঠিকই। কিন্তু ইন্টার্নালি হয়তো করেছেন। হয়তো নয়, করেছেনই।

আজ্ঞে না।

কী করে বুঝলেন করেননি? আপনি কি মেয়েটির মনের ভেতরটা দেখেছেন?

আরে না। মেয়েটা তো আমাকে কখনও লক্ষই করেনি। যে আমাকে লক্ষই করেনি তাকে আমার পক্ষে মানসিক উৎপীড়ন করা কি সম্ভব?

সম্ভব।

কীভাবে?

উৎপীড়ন না বলে যদি নাড়া দেওয়া বলি তাহলে কেমন হয়?

নাড়া দেওয়া! এ কথাটার অর্থ কি একটু আলাদা হয়ে যাচ্ছে না?

তা যাক না। ধরুন সেটাই হয়েছে।

একটু বুঝিয়ে বলুন।

খুব সাদামাটা কথায় বললে বলতে হয় পারিজাতবাবু, আপনি যেমন আড়চোখে মেয়েটিকে লক্ষ করেছেন তেমনভাবে মেয়েটিও আপনাকে লক্ষ করেছে। এবং সে একটু নাড়া খেয়েছে। এবং তারও মনে হয়েছে তার স্বপ্নের পুরুষটি রোজ সকালে নিতান্ত ভদ্র এবং কাপুরুষ বলে কখনও মেয়েটিকে হৃদয়ের কথা জানাতে পারেনি। অগত্যা মেয়েটি তার ছোটকাকার শরণাপন্ন হয়। ছোটকাকা ডাকসাইটে পুলিশ অফিসার। সে ওই রবার্ট ব্লেক এজেন্সিতে ছেলেটি সম্পর্কে খোঁজ খবর সংগ্রহ করতে লাগায়। সংগৃহীত তথ্যে দেখা যাচ্ছে, পারিজাত সেনগুপ্ত মেধাবী, কৃতবিদ্য, লম্বা বেতন, সম্ভ্রান্ত পরিবারওলা ছেলে। কাপুরুষ সন্দেহ নেই। কিন্তু বরণীয়া। আপনার চোখ ছলছল করছে কেন?

বিশ্বাস হচ্ছে না।

আপনি আজ সকাল থেকে আগাগোড়াই আমাকে অবিশ্বাস করে আসছেন।

এখনও করছি। তবে ডিনারের বিলটা আপনি দিলে আমি আপত্তি করব না।

তাহলে চলুন, ওঠা যাক। এখন খিদে পাচ্ছে, তো?

হ্যাঁ, এখন বেশ খিদে হয়েছে ছোটকাকা।